জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) ॥ জন্ম গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১ জানুয়ারি ১৯১৪। ঔপন্যাসিক। এক দরিদ্র ধীবর পরিবারে জন্ম। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। গ্রামের মালোরা চাঁদা তুলে তাঁর পড়ার খরচ চালাতো। ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস (১৯৩৩)। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে কিছুদিন আই.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন। ১৯৩৪-এ জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় গমন। সেখানে মাসিক 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় শুরু করেন তাঁর সাংবাদিক ও কর্মজীবন। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'নবশক্তি' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগদান (১৯৩৬)। এর সম্পাদক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন। নবশক্তি প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদকের সহকারী হিসেবে যোগদান। তিন বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। এ সময়ে একই সঙ্গে দৈনিক আজাদেও সাংবাদিকতা। নবযুগ, কৃষক ও যুগান্তর পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৪৫-এ সাপ্তাহিক দেশ-এ সম্পাদকের সহকারী পদে নিযুক্তি লাভ। আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন। আয় বাড়াবার জন্য বিশ্বভারতীর প্রকাশনা শাখায় পার্ট টাইম চাকরি গ্রহণ। তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম* প্রথম মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত। কয়েকটি অধ্যায় মুদ্রিত হওয়ার পর এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাস্তায় হারিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধব ও পাঠকদের আগ্রহে পুনরায় কাহিনীটি লেখেন। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাওয়ার আগে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে যান। লেখকের মৃত্যুর কয়েক বছর পর উপন্যাসটি *তিতাস একটি নদীর নাম* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই একটি মাত্র উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে এতে ধীবর সমাজের জীবনসংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। তাঁর গ্রন্থপ্রীতি ছিল অসাধারণ। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও বই কিনেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধুরা রামমোহন লাইব্রেরির হাতে তাঁর গ্রন্থভাণ্ডার তুলে দেন। সাহিত্য, দর্শন ও চারুকলা বিষয়ক এমন সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত সংগ্রহ দুর্লভ। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ এই সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগ্রহকে একটি পৃথক বিভাগে রক্ষা করেছেন। মৃত্যু. ষষ্ঠীপাড়া, কলকাতা, যক্ষ্মায়, ১৬ এপ্রিল ১৯৫১।

[সূত্র : চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা]

ড. ইসরাইল খান ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ অনার্সসহ এমএ এবং ১৯৯৫ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাময়িকপত্র বিষয়েও তিনি গবেষণা করেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: *পূর্ব বাংলার সাময়িকপত্র* (১৯৯৯), *বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তান পর্ব* (২০০৪), *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৩১-৪৭)*, *বন্দি বিবেক সমাজ ও সাহিত্য জগতে বৈশ্যবৃত্তি* (১৯৯০), *বাঙলাদেশের রাজনীতি ও ভাষা পরিস্থিতি* (১৯৯১), *মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : জীবন ও চিন্তাধারা* (১৯৯৮)।

প্রচ্ছদ

মোমিন উদ্দীন খালেদ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী

[অখণ্ড]

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (১৯১৪-২০১৪)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী

[১৯৪৫ সালে 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত
দুস্প্রাপ্য *তিতাস একটি নদীর নাম* ও অসংখ্য দুর্লভ তথ্যসহ]

সংগ্রহ ও সম্পাদনা
ড. ইসরাইল খান

ঢাকা, বাংলাদেশ

জন্মশত বর্ষ সংস্করণ
Birth Centenary Edition

প্রকাশক □ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন □ ০১৭৬৬-১০৯৫০২

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী
সংগ্রহ ও সম্পাদনা : ড. ইসরাইল খান

প্রথম সূচীপত্র সংস্করণ □ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ □ মোমিন উদ্দীন খালেদ
বর্ণবিন্যাস □ মাইক্রোটেক কম্পিউটার্স
মুদ্রণ □ সাদাত প্রিন্টিং প্রেস, ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক □ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক □ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com,
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক □ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন,
কানাডায় পরিবেশক □ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্‌টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ □ www.rokomari.com/sucheepatra

Advaita mallabarmana Rachanabali
Collected & edited by Dr. Israil Khan

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph : (880-2) 01766-109502
e-mail : saeedbari07@gmail.com,
www.facebook.com/sucheepatra
Price : BDT. 1200 Only. US$ 50.00. £ 40.00

মূল্য : ৳ ১২০০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-8558-99-7

এই বইয়ের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকার ও সম্পাদকের নিজস্ব -প্রকাশক

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমরা সত্যিই গর্বিত যে মনস্বী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলাদেশেই জন্মেছিলেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল এখানেই। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হন যখন—তখনও তিনি বাংলাদেশেই। তাঁর সাহিত্যভাবনা ও গবেষণার মৌল-উপাদান উপকরণও সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব বাংলার জীবন ও জগৎ থেকে। শিল্পী-স্রষ্টার যে-মনন অদ্বৈতের, তাও গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ ও বাঙালি-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে। জগৎ ও জীবনের একান্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই রূপকল্প বাংলাদেশে জনপ্রিয়তাও পেয়েছে অসামান্য। সাহিত্যে চলচ্চিত্রে নাটকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'র জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়।

অথচ বাংলাদেশ থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর চিন্তাচর্চার জন্য গড়ে ওঠেনি জাতীয় পর্যায়ের কোনো সংগঠন। সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়নি অকালপ্রয়াত এই লেখকের রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোনো পরিকল্পনা। বাংলাদেশের সাহিত্য তথা প্রকাশনা জগতের এই দৈন্য ও গ্লানি মোচনের জন্য এগিয়ে এসেছেন সূচীপত্রের কর্ণধার খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্যিক ও সংগঠক জনাব সাঈদ বারী। তাঁকে সুধীসমাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ যে মরমীশিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণের যাবতীয় রচনাদি পাঠকসমাজে সুলভ করার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেন। স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকাসহ *তিতাস একটি নদীর নাম*, *শাদা হাওয়া* ও *রাঙামাটি*-এই তিনটি মৌলিক উপন্যাস নিয়ে একটি *উপন্যাসসমগ্র* ও *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন* ও *কর্ম* শীর্ষক তিনটি গ্রন্থ পাঠক সমাজে সহজলভ্য করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এবার তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর সকল মৌলিক রচনা ও অনুবাদ একত্রে জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি আমাকে অশেষ আনন্দ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। এজন্য তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মনীষী অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রতি প্রথম আমাকে আকৃষ্ট করেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। পত্র-পত্রিকার ওপর কাজ করার সময়ে তিনি বারবার বলেন মাসিক মোহাম্মদীতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়...। এ থেকেই পত্র-পত্রিকায় অদ্বৈত

মল্লবর্মণের নাম দেখলেই আমি শ্রদ্ধাভরে নোট নিয়েছি। ঢাকা ও কলকাতার লাইব্রেরি থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন রচনা সংগ্রহ করে তাঁকে দিয়েছি। তিনি 'লোকায়ত' পত্রিকায় কিছু কিছু একালের পাঠকদের জন্য তা প্রকাশও করেছেন। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও তাঁর অনেক দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করে টীকাভাষ্য সহকারে প্রকাশ করেছি।

আর এই সুবাদে পরিচিত হই কলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার শ্রী রণবীরসিংহ বর্মণের সঙ্গে। রণবীরসিংহ বর্মণ মহাশয় আমাকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রাপ্ত সকল রচনার সকল সংস্করণ ও উৎস পেতে সাহায্য করেন। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি প্রভৃতি থেকে আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনার কপি লাভ করেছি। এক্ষণে সকলের ঋণ আমি স্মরণ করছি।

অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস অদ্বৈতর আরো রচনা কোথায় কী আছে খুঁজে দিতে অনুরোধ করলে আমি আমার অনুসন্ধান সুদৃঢ় করি। বাংলাদেশের কোনো এক সরকারি প্রতিষ্ঠান অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনাবলী প্রকাশের আগ্রহ জানিয়ে আমাকে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে বললে আমি এই উদ্যোগকে সুসংগঠিত করি। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় সূচীপত্রের প্রস্তাব আমাকে আনন্দ দেয়।

আমরা জানি অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক *ভারতের চিঠি পার্লবাককে* কেবল তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯৫৬ সালে কলকাতার পুথিঘর প্রাইভেট লিঃ থেকে প্রকাশিত হয় *তিতাস একটি নদীর নাম*। ১৯৬১ সনে *ভারতের চিঠি পার্লবাককে* পুনর্মুদ্রিত হয় কলকাতার বিশ্ববাণী থেকে। ১৯৯০ সনে দেবীপ্রসাদ ঘোষ সাপ্তাহিক নবশক্তি থেকে ১৮টি এবং *দেশ* ও *আনন্দবাজার* থেকে ৪টি মোট ২২টি নাতিদীর্ঘ রচনা সংগ্রহ করে *বারমাসী গান ও অন্যান্য* নামে প্রকাশ করেন। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় *শাদা হাওয়া* ও *রাঙামাটি*। এসব দিয়ে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের সম্পাদনায় কলকাতার দে'জ পাবলিশিং থেকে ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় অদ্বৈত *মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র*। এই রচনাসমগ্রে সংকলিত হয়েছে উপর্যুক্ত রচনাদি এবং আরভিং স্টোনের উপন্যাস *Lust for life*-এর অনুবাদ *জীবন তৃষা*– আর চারটি গল্প ও ছয়টি কবিতা।

কিন্তু এতো কিছুর পরও এখনো বাংলাদেশ থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনাবলী প্রকাশের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ আমাদের সংগ্রহে রয়েছে আরও এমন সব রচনা এবং তথ্যাবলী যা এ পর্যন্ত সংকলিত

হয়নি। আর বাংলাদেশের লেখকের বই বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রকাশের অধিকারও তো রয়েইছে।

রচনাবলীতে মুদ্রিত রচনাগুলোর এই পাঠ তৈরি করা হয়েছে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর একাধিক সংস্করণ এবং সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক মোহাম্মদী, সোনারতরী ও চতুষ্কোণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাথমিক রূপের সঙ্গে মিলিয়ে। বানান, বাক্য, স্তবক ও অধ্যায় বিন্যাস প্রভৃতিতে যথেষ্ঠ পরিমার্জনা আছে। ফলে অন্যান্য সংস্করণ থেকে এতে স্বাতন্ত্র্য এসেছে।

তিতাস একটি নদীর নাম প্রসঙ্গে বলা দরকার, পুথিঘর প্রকাশিত তিতাস একটি নদীর নাম-এ সব সময় পৃষ্ঠা নম্বর ছাড়া একটি সূচীপত্র দেয়া হত। ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রমিকে আটটি শিরোনাম দেয়া হয়।– যার কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যেতো না। পেঙ্গুইন বুকস্ প্রকাশিত *A Rever called Titash*-এও চারটি চ্যাপ্টারে পৃষ্ঠা নম্বর সহকারে আটটি শিরোনাম রক্ষিত হয়েছে। আমরা পেঙ্গুইন বুকস্-এর অনুকরণে পুস্তকের সৌন্দর্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৃষ্ঠা নম্বরসহ আটটি শিরোনামকে আটটি অধ্যায় গণ্য করে পুস্তকটি বিন্যস্ত করেছি।

গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আধুনিক করার প্রয়াস আছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন পূর্বসূরি অদ্বৈত গবেষকগণ। তাদের ঋণ স্বীকার করছি। এই রচনাবলী সুধী পাঠকসমাজে সমাদৃত হলে আমরা আরো কাজের জন্য উৎসাহ পাব।

ইসরাইল খান

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

বাংলা সাহিত্যের অমর শিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সজীবনে অবহেলিত, অ-মূল্যায়িত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' নিয়ে সিনেমা হওয়ায় এবং বাংলাদেশ ও বিদেশের বহু কারিকুলামে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পাঠ্য বিষয়সূচিভুক্ত করার বদৌলতে তার সম্পর্কে দু'চার কথা জানেন না এমন স্বাক্ষর ব্যক্তিকে এখন খুঁজে পেতে কষ্ট হবে– কিন্তু তাঁর একটি জীবন বৃত্তান্ত ও পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী প্রকাশের বা প্রস্তুতির কোন যথাযথ উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ে না। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো একজন মহৎ-শিল্পীর ওপর প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধের সংখ্যা হাতের আঙুলেই গুণে শেষ করা যাবে। অথচ তার সম্পর্কে লেখা বইয়ের সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল যেন সীমাপরিসীমা নেই। সে যাহোক, অদ্বৈতর একটি জীবনপঞ্জি আমরা তৈরি করেছি।

১৯১৪ : জন্ম। পিতার নাম : অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। মাতার নাম অজ্ঞাত। তিন ভাই, এক বোন। জন্মস্থান : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণঘাট।

১৯৩৩ : ম্যাট্রিকুলেশন পাস। প্রথম বিভাগ পান। অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আইএ পরীক্ষা দেয়া হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি।

১৯৩৪ : কলকাতায় গমন। 'মাসিক ত্রিপুরা' পত্রিকার কাজে যোগদান। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তর মালিকানায় নবপর্যায়ে 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হলে তাতে সহকারী-সম্পাদকের পদে যোগদান।

১৯৩৭ : নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৪১ পর্যন্ত সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন। ৭ বর্ষ চলার পর স্মৃতি-বিজড়িত সাপ্তাহিক নবশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে 'আজাদ', 'কৃষক', মোহাম্মদী প্রভৃতিতে পার্টটাইম কাজ করে অর্থ উপার্জন ও ব্যাপকভাবে বই কেনা, পাঠ করা এবং লেখালেখির তথা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। নবশক্তির পাতায় নামে বেনামে অনেক বিচিত্র লেখা ছাপা হয়।

১৯৩৯ : চয়নিকা পাবলিশিং হাউস গঠন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুরা—যথা কালিদাস মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস চক্রবর্তী, সতীকুমার নাগ, সনৎকুমার নাগ প্রমুখ। ঠিকানা : ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা।

১৯৪০ : 'দলবেঁধে' গল্প সংকলন সম্পাদনা। যৌথ সম্পাদক ছিলেন কালিদাস মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস চক্রবর্তী, সতীকুমার নাগ। প্রকাশক : সনৎকুমার নাগ।

১৯৪২ : 'শাদা হাওয়া' রচনা শেষ করেন ১৯.১২.১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। 'সোনারতরী' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯৪৮ বা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে।

'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকরূপে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মনোনয়নে তারই সহকারীরূপে যোগদান। ক্রমে মোহাম্মদীর সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল কর্তাব্যক্তিতে পরিণত হন। নামে-বেনামে মোহাম্মদীতে বেশ কিছু রচনার প্রকাশ। ১৯৪৫ পর্যন্ত মোহাম্মদীতে দায়িত্ব পালন। পাশাপাশি যুগান্ত র, নবযুগ, আজাদ, কৃষক, প্রভৃতিতে কাজ করেন, লেখেন প্রধানত অর্থের অভাব পূরণের জন্য।

১৯৪৩ : 'ভারতের চিঠি-পার্ল বাক্‌কে' গ্রন্থাকারে প্রকাশ নিজেদের চয়নিকা পাবলিশিং হাউস থেকে।

'রাঙামাটি' উপন্যাস রচনা। অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, এটি ১৯৪৩-৪৫ সময়ের লেখা। প্রকাশিত হয় মাসিক 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৩৭১/১৯৬৪ সালে। ১৩৭১-এর বৈশাখ থেকে চৈত্র ১২ সংখ্যায় ১টি বাদ দিয়ে ১১ দফায় ছাপা হয়।

১৯৪৫ : 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকায় সাগরময় ঘোষের সহযোগিতায় চাকরিলাভ। এ সময়ে বেতন ভাল ও নিয়মিত পেতেন। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় যাওয়া উদ্বাস্তু আত্মীয়পরিজনদের সাহায্য করতেন।

অর্থের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে সাগরময় ঘোষ প্রমুখ বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগেও খণ্ডকালীন চাকরি প্রাপ্তি এবং ১৯৫০ পর্যন্ত (মৃত্যুর পূর্ববর্তী সক্ষম সময়কালে) এতে দায়িত্ব পালন। মোহাম্মদীতে তিতাস একটি নদীর নাম প্রকাশ শুরু।

১৯৪৬ : মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর প্রাথমিক খসড়া (৭ কিস্তিতে) প্রকাশ।

১৯৪৮ : (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) : শারদীয়া 'সোনারতরী' পত্রিকায় 'শাদা হাওয়া' উপন্যাস প্রকাশ (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৯৬, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের সম্পাদনায়, কলকাতা থেকে।)

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। বন্ধুদের সাহায্যে/পীড়াপীড়িতে কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি। রোগমুক্ত হয়ে ষষ্ঠীতলার বাসায় ফেরত গমন।

১৯৪৯ : ১৯ মার্চ ১৯৪৯ ৫ চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'দেশ' এ আর্ভিং স্টোন-এর উপন্যাস Lust for life এর অনুবাদ 'জীবন-তৃষা' প্রকাশ শুরু করেন। ৬২ কিস্তিতে 'দেশ'-এ প্রকাশ শেষ হয় ২০ মে ১৯৫০ ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭-তে।

১৯৫০ : হঠাৎ আবার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে নীত হন এবং সেখান থেকে আবার পালিয়ে যান।

আবার ভর্তি..... ইত্যাদি।

১৯৫১ : ১৬ এপ্রিল নারকেল ডাঙার ষষ্ঠীতলার বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ | ৮৭৩

সম্পাদকীয়-স্তম্ভ | ৯৪৯

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : স্বরূপের সন্ধানে

আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে অদ্বৈত নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম। রবীন্দ্র-নজরুল-অদ্বৈত কেবল এক একটি নাম নন, এখন তাঁরা এক একটি প্রতিষ্ঠান– বাংলা সাহিত্যে এমন সম্মান লাভকারী কবি সাহিত্যিকদের নাম খুঁজতে গেলে দুইশ বছরের মধ্যে কজনকে পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালের শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কার নাম আনা যায় যে, একক একটি নামের পতাকাতলে গোটা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের এক বৃহদাংশ সমবেত হয়েছেন বা জমায়েত হতে ভালোবাসেন? কিন্তু এই স্মরণীয়দের মধ্যেও অদ্বৈত ছিলেন হতদরিদ্র, অব্যবস্থিত, ঐতিহ্যহীন পরিবারের ছেলে।

তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী সংলগ্ন গোকর্ণঘাট গ্রামে নিঃস্ব-রিক্ত 'জেলে'-পিতা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণের পর্ণকুটিরে ১৯১৪ বা তার দুএক বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (সনদপত্র অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি ১৯১৪)। এ পর্যন্ত তাঁর মায়ের নাম কোথাও উদ্ধৃত হয়নি। তাঁরা চার ভাইবোন (তিন ভাই ও এক বোন) ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে হারিয়ে চরম মর্মন্তুদ এতিম-এ পরিণত হন।

অতএব অর্থ-বিত্ত-ঐতিহ্য আত্মীয় পরিজনহীন অদ্বৈতর বাল্য ও কৈশোরকাল অতিক্রম করা এবং শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কী রকম নিদারুণ করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজে অনুমেয়। কেবল এটুকুই এখানে আজ স্মরণ করি, অসীম ধৈর্য সহকারে প্রচণ্ড মেধাবী, মরমীমনের, সৃজনশীল কবি-প্রতিভা অদ্বৈত নিজেকে চিনেছিলেন বলেই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তিনি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন নিজের পরিবেশকে। 'মানুষ শুধুই প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলে বাধা অবস্থার দাস নয়। মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই শক্তিও, যে-শক্তির বলে মানুষ অবস্থার প্রভুও হতে পারে।'– অদ্বৈত এই মহাজন-বাক্যকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন।

১৯৩৩ সনে অদ্বৈত ম্যাট্রিকুলেশন প্রথম বিভাগে পাশ করেন। কলকাতায় যান ১৯৩৪ সনে জীবিকার সন্ধানে। সেখানে তিনি 'মাসিক ত্রিপুরা' পত্রিকায় কাজ পান। এরপর তিনি 'সাপ্তাহিক নবশক্তি' পত্রিকায় যোগ দেন সহকারি সম্পাদকের মর্যাদায়। সাপ্তাহিক নবশক্তি পত্রিকা ১৯২৯ সনে প্রকাশিত হয়ে পাঁচ বছর চলার পর ১৯৩৩ এর এপ্রিল মাসে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সময় সম্পাদক ছিলেন শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী। লিবার্টি হার্ডস, ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে শ্রীশশীভূষণ গাঙ্গুলী ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ প্রেসে ছেপে তা প্রকাশ করতেন। নবশক্তির তখনকার পরিচালক ছিল কলকাতার লিবার্টি পেপারস লিমিটেড।

এরপর ত্রিপুরার শ্রীকাইলের ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত নবশক্তির প্রথম সংখ্যা প্রথম বর্ষ প্রকাশিত হয় ৩০ নভেম্বর ১৯৩৪ সনে। এ সময় সম্পাদক শ্রী বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, অদ্বৈত সহকারি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র কর্তৃপক্ষের বেঙ্গল ইউমিনিটি কোং-এর বিজ্ঞাপন-লেখক ছিলেন। সম্পাদক হিসেবে নবশক্তিতে নাম ছাপা হত শ্রী বিজয়ভূষণ দাশগুপ্তর। ১৯৩৫ সন পর্যন্ত তাঁর নামই ছাপা হয়। অথচ অদ্বৈতের জীবনীকারগণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত নবশক্তিতে অদ্বৈত সহকারিরূপে যোগ দেন বলে উল্লেখ করে যাচ্ছেন–যা সঠিক তথ্য নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম সম্পাদক হিসেবে নবশক্তিতে ছাপা হয়েছে ১৯৩৬–৩৭ সনে দুই বছর।

এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্র নবশক্তির দায়িত্ব পরিহার করলে অদ্বৈতর নামই সম্পাদক হিসেবে ১৯৩৮ থেকে ছাপা হয়। ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায়ই নবশক্তি বের হয় এবং এই পত্রিকাতে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সহকারি সম্পাদকরূপে সাংবাদিকতায় শিক্ষানবিশী করেন, পরবর্তী কালের 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রী সাগরময় ঘোষ। অনেকে সাগরময় ঘোষকেও 'দেশ' এর সম্পাদকরূপে জেনে আসছেন। কিন্তু 'সাপ্তাহিক দেশ' ১৯৩৩ এ আত্মপ্রকাশ করে যখন, তখন সাগরময় ঘোষ ছাত্র। এর সম্পাদক ছিলেন অনেকদিন যাবৎ–শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সেন। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে সহ-সম্পাদক ছিলেন শ্রী সাগরময় ঘোষ। বঙ্কিমচন্দ্র সেন যখন 'দেশ' এর সম্পাদক, তখনই ১৯৪৫ সনে অদ্বৈত আবার 'দেশ' পত্রিকার সহকারি বা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। সাগরময় ঘোষ 'দেশ' এর সম্পাদক হন অদ্বৈতের মৃত্যুর পর।

মধ্যবর্তী সময়ে অদ্বৈত কাজ করেন মাসিক মোহাম্মদী (১৯৪১-৪৫), দৈনিক আজাদ (১৯৩৯-৪৫) দৈনিক নবযুগ (১৯৪১-৪২), সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'কৃষক' প্রভৃতি পত্রিকায়। কিন্তু ভাগ্নেদের ভরণ-পোষণ এবং নিজের অনুশীলন অধ্যবসায়ের উপকরণ ও বই পুস্তক কেনার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হলে অদ্বৈত অন্যত্র বেশি বেতনের চাকরি খুঁজছিলেন। সে চাকরি তিনি 'দেশ' এ লাভ করেন। 'দেশ' এর সমকালে তিনি বিশ্বভারতী প্রকাশনা সংস্থাতেও পার্টটাইম কাজ করতেন। সম্ভবত এককালের সহকর্মী সাগরময় ঘোষের সুপারিশ এক্ষেত্রে কাজ করে থাকবে। কারণ অদ্বৈত ছিলেন নিরিবিলি নির্বিরোধ, একান্তই কাজ-পাগল মানুষ। তাঁকে নির্ভর করা চলতো। সে কারণেই তিনি মোহাম্মদী পত্রিকারও কার্যত সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যা আবুল কালাম শামসুদ্দীন নিজেই স্বীকার করেছেন। মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন।

অতএব তিনি মোহাম্মদীর কাজ ছেড়ে দেশ-এ গেলেও মোহাম্মদী-গ্রুপের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব বজায় ছিল। এ কারণেই ১৯৪৫ সনে 'দেশ'-এ যোগ দিলেও তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' ঐ সময়ই মোহাম্মদীতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য পেশ করেন এবং তাতে তা ছাপা হয় প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৫ এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৬ সনের মে-জুন পর্যন্ত সময়ে।

আরও যোগ করতে হয় প্রসঙ্গত যে, মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশের কালে একই সংখ্যায় তাঁর অপরাপর গল্প (বন্দী বিহঙ্গ) ও কবিতা (শুশুক) ছাপা হয়েছে। এবং সত্যিকথা বলতে কি, মোহাম্মদীতে তিনি সংযুক্ত হয়েছিলেন আরো অনেক আগেই, অন্তত ১৯৪০ সনে। অর্থাৎ নবশক্তির শেষ পর্যায়ে পত্রিকার আর্থিক অবস্থা যখনই খারাপ হয়ে আসছিল, – মালিকও পত্রিকার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না এবং পাশাপাশি তাঁর বেতনবৃদ্ধি না-পেলেও ব্যয় বেড়েছিল, – ফলে তাঁর পার্টটাইম কাজের দরকার হয়ে পড়েছিল।

আর সেই পার্টটাইম কাজ তিনি করতেন আজাদ ও মোহাম্মদী, নবযুগ, কৃষক, যুগান্তর প্রভৃতিতে। এর প্রমাণ পাই মাসিক মোহাম্মদীর পাতায় অদ্বৈতর লেখা প্রকাশের তথ্যে, অন্যতম অদ্বৈত-গবেষক অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস এর একটি খবরে। তিনি লিখেছেন :

> "... ১৯৩৭-৩৮ থেকেই কি কর্তৃপক্ষের নজরে 'নবশক্তি' গুরুত্ব হারাচ্ছিল? ১৯৪৪ নাগাদ ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত অত্যন্ত গভীর আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সূচনা হয়ে থাকবে। 'নবশক্তি' বন্ধ হচ্ছে একথা বোধ হয় জানতেন অদ্বৈত। তিনি মোহাম্মদী পত্রিকায় একটি কাজ জুটিয়ে নেন। এই কাজের পেছনে শৈলেন বাবুর ভূমিকা আছে। .... মোহাম্মদী পত্রিকায় অদ্বৈত বেনামে কিছু কবিতাও ছাপিয়েছিলেন। এ সংবাদ দিয়েছেন শৈলেন রায়। একদিন শৈলেন বাবুকে তিনি 'মোহনলালের খেদ' নামে একটি স্বরচিত কবিতা টুকে তাঁর নাম দিতে বলেছিলেন। শৈলেন বাবুর স্পষ্ট মনে আছে, সেই কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল। এরকম আরও কিছু থাকতে পারে।" (দ্র ঃ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম সম্পাদনা ও ভূমিকা : অচিন্ত্য বিশ্বাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ-২৫, ২৭)

অচিন্ত্য বিশ্বাসের উপর্যুক্ত তথ্য পরীক্ষা করার জন্য মোহাম্মদীর নথি যাচাই করে দেখা যায় 'মোহনলালের খেদ' শীর্ষক বেনামী (শৈলেন রায়ের নামে) রচনাটি মোহাম্মদীর 'সিরাজ স্মৃতি সংখ্যা', অর্থাৎ ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭ সালে ছাপা হয়। ঐ সংখ্যায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' বিভাগে 'সিরাজের কাল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন অদ্বৈত নিজ নামে এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর নায়ক 'কিশোর' বা নবকিশোর এর নামে অদ্বৈত দুটি কবিতা লিখেছিলেন যার একটি ছাপা হয় ১৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা এবং আর একটি ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যায়, শিরোনাম– 'হীরামতি' ও 'হলওয়েল স্তম্ভ'।

মোহাম্মদী ভাদ্র ১৩৪৭, ১৩ বর্ষ ১১ সংখ্যায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের অন্যান্য তিনজনের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দল বেঁধে' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'নূরী' অর্থাৎ আজাদ ও মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত আবুল কালাম শামসুদ্দীন যার আলোচক। এই সমালোচনাও 'দলবেঁধে' বই সম্পর্কে এবং অদ্বৈত সংক্রান্ত আরও কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে। বিভিন্ন গ্রন্থে, প্রবন্ধে অদ্বৈত সম্পর্কে আলোচনাকারীগণ শোনা কথার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন

করেছেন। কেউ লিখেছেন 'দলবেঁধে' অদ্বৈতর সম্পাদিত গল্প-গ্রন্থ যাতে দশটি গল্প ছিল। কেউ বলেছেন পঞ্চাশটি গল্প ছিল। কিন্তু কেউই উল্লেখ করেননি এই গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন চারজন– যাঁদের অন্যতম ছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। এই বই তাঁদের বন্ধুদের মিলিত প্রয়াস ছিল। এতে ৫২টি গল্প ছিল। মুসলমান কোন লেখকের গল্প তাতে ছিল না। যে গল্পগুলো এ বইয়ের মধ্যে ভালো 'নূরী' তার মধ্যে অদ্বৈতের 'স্পর্শদোষ' গল্পটির নামোল্লেখ করেছেন। (সংযোজনী দ্রষ্টব্য।)

মাসিক মোহাম্মদীর ১৩ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭-এ ছাপা হয় শৈলেন রায়ের ছদ্মনামে 'পলাশী' ও 'সিরাজ' শীর্ষক দুটি গান। এই গানদুটি বিখ্যাত শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে আকাশবাণীতে গীত হয় বলেও উল্লেখ রয়েছে।

অদ্বৈতের রচনাবলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় কিংবা অন্যান্য কর্মের হিসাব নিলে দেখা যায়, ১৯৪০ সন থেকে তিনি চয়নিকা পাবলিশিং হাউস গঠন করে 'দলবেঁধে' প্রকাশ করেন এবং এখান থেকেই 'ভারতের চিঠি–পার্ল বাক্‌কে' ছাপা হয় ১৯৪২-৪৩ সনে। আজাদ-কৃষক-নবযুগের খণ্ডকালীন চাকুরীসহ মোহাম্মদীর সম্পূর্ণ ভার তাঁর ওপর। তদুপরি 'শাদা হাওয়া' ও 'রাঙামাটি' প্রণয়নসহ 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর জন্য উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচুর বই কেনা ও পড়াশোনার মধ্যে ডুবে আছেন তিনি। এই-ই ছিল ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁর ব্যস্ততার কারণ। সেজন্যে মোহাম্মদীতে রচনা প্রকাশের সংখ্যা কম। কেন যেন তাঁর মনে হয়েছিল জীবন ফুরিয়ে এসেছে, যা কিছু করার জগতে স্থায়ী আসন লাভের জন্য, তা তাঁকে অচিরেই অল্প সময়ের মধ্যে করে ফেলতে হবে। সেজন্য তাঁর জীবন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য দেখা যাবে। কারণ সমকালে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা উচ্চবর্ণ হিন্দুর কর্তৃত্বাধীন কলকাতা শহরে তেমন ছিল না। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতেন মুসলিম সাহচর্যে, মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাতেই তাই তিনি বেশি লিখেছেন, চাকরি করেছেন। যতোগুলো পত্রিকাতে তিনি কাজ করেছেন–নবযুগ, কৃষক, আজাদ, মোহাম্মদী–সবই মুসলিম মালিকানার। 'দেশ' পত্রিকার চাকরি করার সময় অদ্বৈত মিত্র-ঘোষ-বোস-মুখুজ্যে-চাটুজ্যেদের সাথে যাতে দেখা না হয়, সেইজন্য আগে ভাগেই কাজ শেষ করে তিনি দেশ কার্যালয় ত্যাগ করে চলে যেতেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার কারণেই তিনি মোহাম্মদীর পাতাতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপতে দিয়েছিলেন।

এমনও হতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বের হবার দশ বছর পর 'তিতাস একটি নদীর নাম' নকল কিংবা অমৌলিক রচনার অভিযোগে হিন্দুদের সম্পাদিত যতো ভাল কাগজ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মোহাম্মদীতে এটা ছাপাতে দেন এবং লক্ষণীয় 'দেশ' কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিয়ে অনুবাদই করান। দেশ এ প্রকাশিত অদ্বৈতর রচনার অধিকাংশই অনুবাদ বা কোন বিদেশী রচনার অনুসরণে লিখিত কিংবা সাংবাদিক রিপোর্টাজ জাতীয় রচনা। এবং এক সময় মোহাম্মদীতে লেখাও দেশ-কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখেননি বলে হয়ত তিতাস মোহাম্মদীতে ছাপা

বন্ধ করে দেন। অথবা এমনও হতে পারে, তিনি 'তিতাস....' কে নতুনভাবে লেখার কাজে মন দেন।

অথচ আমাদের দেশের বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' শীর্ষক জীবনী-গ্রন্থে এবং 'চরিতাভিধান'-এও এমনভাবে তথ্যবিন্যাস করা হয়েছে যে, – যে কোন পাঠক মনে করবেন অদ্বৈত হিন্দু লেখক বলে মোহাম্মদীতে তাঁর উপন্যাস সম্পূর্ণ ছাপা হয়নি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারণেই 'মোহাম্মদী' থেকে তিনি (অদ্বৈত) চাকরিচ্যুত হন বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'দেশ'-এ যেতে বাধ্য হন। তাঁর প্রেক্ষিতে কলকাতার গবেষকগণও সেটাকে বড় করে প্রচার করে চলেছেন। যদিও অচিন্ত্য বিশ্বাস অনেক 'মিথ্যা' ও 'মিথ্' যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে মোহাম্মদী থেকে তিতাসের পাণ্ডুলিপি হারানোর ঘটনাকে গালগল্প বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'দে'জ পাবলিশিং' কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র' (২০০০)-র উৎসর্গ পত্রে, ঐ একই অভিযোগের প্রতিফলন না-ঘটিয়ে তিনি পারেননি। তিনি লিখেছেন : "মোহাম্মদী থেকে কর্মচ্যুত অদ্বৈতকে যিনি নিয়ে যান 'দেশ' পত্রিকায়/অদ্বৈতের রোগ নিরাময়ে যাঁর চেষ্টা ছিল আন্তরিক ..... প্রয়াত সাগরময় ঘোষের স্মৃতিতে" ইত্যাদি। অথচ 'দেশ' এর পাতাতেই ছাপা হয়ে আছে অদ্বৈতকে না চিনবার, প্রকৃত মূল্যায়ন না-করবার ছবি। লেখা হয় :

> "... এক বৎসর হইল, আমাদিগের প্রিয় সহকর্মী অদ্বৈত মল্লবর্মণ ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু দিবসটি বৎসরান্তে আমাদিগের চিত্তে নিতান্ত বেদনার এক স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহা ভুলিতে পারিনা যে, তিনি যেন তাঁহার জীবনের সকল ব্রত ও কর্মের মাঝখান হইতেই হঠাৎ সরিয়া গেলেন। ভুলিতে পারিনা, মৃত্যু আসিয়া নিতান্ত অকালেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। .... বিত্ত, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বাজারে তরুণ বাণীসাধক অদ্বৈত মল্লবর্মণ হয়তো আর পাঁচজন শ্রুতকীর্তির মত সফলতা লাভ করেন নাই। কিন্তু জীবনের যে ক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি বহু খ্যাতিমান ও কীর্তিমানের তুলনায় অগ্রণী। তিনি তাঁহার জীবনকে যে নিঃস্বার্থতা, সেবকতা ও কল্যাণশীলতার দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য সোনারূপায় গড়া যে-কোনো কৃতি জীবনের মূল্য হইতে অনেক বেশি। ... "
>
> (সূত্র : দেশ, ৬ বৈশাখ ১৩৫৯, পৃ. ৬৯৫)।

উদ্ধৃতিটি পাঠ করলে মনে হয়, তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া শরণার্থী উদ্বাস্তুদের যে নিজ আয় থেকে খরচের টাকা দিয়ে সেবা করেছেন সেটাই ছিল তাঁর বড়গুণ। সৃজনশীলতায়ও যে বড়, সেটা অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। এ উক্তির সপক্ষে অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত রচনাসমগ্রের ভূমিকায় উদ্ধৃত সাগরময় ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করা হলো।

'জীবনতৃষা' আরভিং স্টোনের বিখ্যাত উপন্যাস 'লাস্ট ফর লাইফ' এর অনুবাদ। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত উপর্যুক্ত বইখানা অচিরেই বেস্ট সেলার হয়ে সারা বিশ্বের

সাহিত্যামোদীদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। অদ্বৈতের মৃত্যুর দুদিন পর ১৮.৪. ১৯৫১ তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয় অদ্বৈতের করা 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই রচনা জীবন তৃষা তাঁর 'ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন'। "তখনও তিতাস গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সুতরাং উক্ত মন্তব্য অনেকাংশে ঠিক। ..... সাগরময় ঘোষ .... (এর) অনুরোধে অনুবাদটি করেন অদ্বৈত।..... "

সাগরময় ঘোষ সাক্ষাৎকার দানকালে অচিন্ত্য বিশ্বাসকে বলেছিলেন : "ভেবেছিলাম অদ্বৈতকে দিয়ে একটি মৌলিক উপন্যাস লেখাব,– হল না" (অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ৩০)।

অর্থাৎ 'দেশ' এর অন্যতম কর্তাব্যক্তি সাগরময় ঘোষ অদ্বৈতকে তাঁর সহকারিরূপে ১৯৩৮ বা তার সামান্য আগে ও পরে নবশক্তির চাকুরীসূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে চিনলে-জানলেও এবং সাগরময়ের আগ্রহে অদ্বৈত 'দেশ' এ চাকুরী পেলেও [বলা হয়], এবং এমনকি মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর সাত কিস্তি প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও সাগরময় বাবুরা তিতাসকে কোনো উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম মনে করেননি। যেজন্য ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত 'দেশ'-এ চাকুরীকালীন সময়ে ঘৃণাক্ষরেও তাঁকে তাঁরা বলেননি যে আপনার তিতাসকেই পূর্ণাঙ্গরূপে লিখে 'দেশ' এ দিন, অথবা অন্য কোনো উপন্যাস 'দেশ' এর জন্য লিখে দিন, ছাপা হোক।

এজন্যই অদ্বৈত 'দেশ' কার্যালয়ে কাজ করলেও সেখানকার সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিজের গল্প-উপন্যাস লেখার বিষয়ে আলাপ করতেন না, বা করতে পছন্দ করতেন না। কারণ হয়তো আগেই তিনি এ ব্যাপারে প্রস্তাব করে বিফল হয়েছিলেন; অভিমানে মুখ ফুটে কিছু না বলে অফিসিয়াল ডিউটি স্বরূপ লাস্ট ফর লাইফ 'জীবনতৃষা' নামে লিখে দিচ্ছিলেন এবং এই অনুবাদ সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষের খবরদারি ছিল–সেজন্য আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় প্রথম দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতের লেখনীশক্তি জয়ী হয়। তিনি উপন্যাসটি সামনে নিয়ে নিজের মত করে একটি মৌলিক বাংলা উপন্যাস লিখেছেন। অতএব ছায়া অবলম্বনে এটিও মৌলিক রচনা তাঁর। বাংলা সাহিত্যে এমন বই বঙ্কিম থেকে শুরু করে অনেক বড় লেখকই লিখেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের কনকুয়েস্ট অব হ্যাপীনেস-এর মোতাহার হোসেন চৌধুরীকৃত অনূবাদিত গ্রন্থ 'সুখ' যার একটি উদাহরণ।

যা হোক, তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, 'রাঙামাটি' শীর্ষক উপন্যাসটি তিনি ১৯৪৩-৪৫ সময়ের মধ্যেই লিখেছিলেন। কিন্তু জীবিতকালে তা ছাপা হয়নি। 'শাদা হাওয়া' উপন্যাসটিও তিনি ১৯.১২.৪২ তারিখে লিখে শেষ করেছিলেন এবং ১৯৪৫ থেকে 'দেশ'-এ তিন বছর চাকুরি করার পরে ১৯৪৮ সনে অন্যত্র ছাপাতে দিয়েছিলেন (সোনারতরী পত্রিকার ১৩৫৫ বা ১৯৪৮ সনের শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কিন্তু 'দেশ' তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব স্বীকার করেনি। দেশ এর 'জীবনতৃষা'র প্রভাবে ভারতে, আরভিং স্টোনের অন্যতম উপন্যাস–LOVE IS ETERNAL 'লাভ ইজ

ইটারন্যাল' গীতা দেবী কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'প্রেম মৃত্যুহীন' নামে বোম্বের পার্ল পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড কোলকাতার মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস ও রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ছেপে ১৯৫৮ তে দুই খণ্ডে প্রকাশ করলেও বাংলা প্রকাশনা জগতের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান আনন্দবাজার প্রকাশনা অদ্বৈতের অনূদিত জীবনতৃষা তাঁর মৃত্যুর ৫৬ বছরের মধ্যেও প্রকাশের গরজ বোধ করেনি। যদিও এটি তাঁদেরই বেতনভুক্ কর্মচারী অনুবাদ করেছিলেন যারপর নেই শ্রম দিয়ে, যক্ষ্মারোগের সঙ্গে বসবাসকালীন সময়ে। এটা ছাপা ছিল তাঁদেরই পত্রিকায়। এবং 'দেশ'-এ ছাপা থাকার কারণে তা দীর্ঘদিন অন্য প্রকাশক পুনঃপ্রকাশের চিন্তাও করে নি। তাই আনন্দবাজার গ্রুপের অন্যতম কর্মচারী খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিমল মিত্র যখন লেখেন :

> "ছোট আকারের শরীর, ততোধিক ছোট একটা টেবিলে বসে তিনি নিখুঁত নিষ্ঠার সঙ্গে 'দেশ' সাপ্তাহিকের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন। বেশিরভাগ দিনই তাঁকে দেখা যেত না। কারণ আমরা যারা বাইরের লোক তারা বেশির ভাগই বিকেলের দিকে গিয়ে হাজির হতাম। তখন তিনি কাজ শেষ করে বাড়ি চলে গেছেন। এক একজন মানুষ থাকে যারা সব সময় নিজেকে আড়াল করতেই ব্যস্ত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন আসলে সেই জাতীয় মানুষ। তাই বিকেল বেলার দিকে যে আমাদের লেখকদের জমায়েত হতো, তাতে তিনি নিয়মিত ভাবেই অনুপস্থিত থাকেন। শুনেছিলাম উত্তর কলকাতার একটা বাড়ির ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি পুরোনো বই এর গাঁইড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে পুরাতত্ত্ব নিয়ে অবসর সময়টুকু যাপন করতেন।
>
> কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে উপন্যাস লিখছেন তা আমরা জানতুম না। নিজে চাকুরী করতেন 'দেশ' পত্রিকায়। কিন্তু একদিন অন্য একটি অখ্যাত পত্রিকায় (মোহাম্মদীকে 'অখ্যাত' বলছেন। অথচ মোহাম্মদী নামটি সবসময় বিখ্যাত ছিল।) তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সে উপন্যাসটির নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম–এত কাগজ থাকতে আপনি ঐ পত্রিকায় লিখছেন যে? অদ্বৈত মল্লবর্মণ বলেছিলেন–ওঁরা চাইলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওটা তাঁর সত্যভাষণ নয়। .... অদ্বৈতকে দেখে আমার মনে হতো তিনি যেন সব সময় নিজেকে নিয়ে বিব্রত কিংবা নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিড়ম্বিত। অথচ তাঁর এমন সাহস ছিল না যে, সেই দুর্ভাগ্যের বিবরণ অন্য কাউকে শুনিয়ে নিজের বোঝা লাঘব করেন। ... " (সূত্র : দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১, পৃ. ৯৭-১১২)।

এখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অদ্বৈত 'দেশ' কার্যালয়ে কীরকম দমবন্ধ করা পরিবেশে কাজ করতেন। বিমল মিত্র শিল্পী মানুষ। তিনি অদ্বৈত সম্পর্কে সার সত্যকথা বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো গবেষকই তাঁর এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে স্বকীয় মননকে নিয়োগ করেননি।

কেন অদ্বৈত সকলে আসার আগে চলে যেতেন? কেন অন্য লেখকদের সঙ্গে আড্ডায় বসতেন না? একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষক, শিল্পী ও দার্শনিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেনো কোন আড্ডাকে এভয়েড করেছেন?

কারণ হলো, অপরাপর লেখকদের প্রকৃতি বা জাতের থেকে তাঁর লেখক প্রকৃতি ও জাত ছিল ভিন্ন। মানুষটি এবং তার বৈশিষ্ট্য চারিত্র সবই আলাদা জাতের ছিল বলে খাপ খেতোনা কারো সঙ্গে। তাই কৃত্রিমভাবে মিশতে চাইতেন না তিনি। যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, সেখানে নিজেকে জোর করে বসিয়ে রেখে কৃত্রিম হাসি হেসে আড্ডা দিতে তিনি চাননি। আড্ডা দেবার তাঁর সময়ও ছিলনা। আড্ডা দেবার মতো তাঁর আর্থিক সঙ্গতিও ছিলনা। আড্ডাকালে তিনি অন্যদের নাক উঁচু কায়স্থ বাবু বা ব্রাহ্মণ ভাবাপন্ন ব্যবহার দ্বারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের হেয় দৃষ্টির শিকার হয়েছেন বলে অতঃপর তা পরিহার করে চলেছেন।

এবং সবশেষে যেটা বিবেচ্য সেটা হলো, তিনি নিজে সচেতন স্বশিক্ষিত উচ্চ মানসিকতার লোক ছিলেন বলে তাঁর যক্ষা রোগাক্লিষ্ট শরীর নিয়ে সকলের সঙ্গে মিশতে চাননি। নিজের ভেতরকার বিবেকের তাড়না দ্বারা তিনি সকলের থেকে দূরে থাকার অনুপ্রেরণা পেতেন। জীবিকার জন্যে 'দেশ'-এ চাকুরি করলেও তিনি সেখানকার সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাননি। আবার চাকুরি না করলেও নিজের জীবন বাঁচে না। এ কারণে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কাজের জন্য সেই সময়টাকে, যখন কেউ-ই অফিসে থাকতেন না বা আসতেন না।

উপরন্তু তিনি মনে করতেন–গল্প করলে উড়ে যাবে হাওয়ায়। লিখে রেখে গেলে আজ যাঁরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন, তাঁরাই মাথায় করে নাচবেন এককালে। সত্যিই ত্রিপুরা সরকারের 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তনের পরে, কয়েকটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেও উপলব্ধি করেছি–মন্ত্রী মিনিস্টার, বড় বড় জাত বংশের উচ্চবিত্তের অধিকারী লেখক-গবেষক অনেকে আজ অদ্বৈতের নামাঙ্কিত পদকে ভূষিত হতে চান। আজ ধর্ম বর্ণ দেশ গোত্র নির্বিশেষে অনেকে অদ্বৈত স্মারক পুরস্কারের জন্য মুখিয়ে থাকেন। যদিও অদ্বৈত মল্লবর্মণ মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল স্মৃতির অন্তরালে অবহেলা অনাদরে পত্র-পত্রিকার পাতার মধ্যে আটকা পড়ে ছিলেন।

১৯৫৬ সনে তাঁর বন্ধু সিলেটের হবিগঞ্জের মানুষ অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী, যাঁর সঙ্গে বি. বাড়িয়ার এক স্কুলে লেখাপড়া করেছেন অদ্বৈত, তাঁর হাতে তিতাসের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন : "তিতাসের পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেলাম, – বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা সংযোজন করে, ছাপিও।" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, সেই সুবোধ চৌধুরী মহাশয় ১৯৫৬ সনে (১৩৬৩) পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড, বিধান সরণী, কলকাতা থেকে ছেপে বের করেন অমর কথাসাহিত্য–'তিতাস একটি নদীর নাম'।

কলকাতার আরও কতিপয় মৎস্যজীবী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সুধী–রণবীর সিংহ বর্মণ, সুশান্ত হালদার প্রমুখ গঠন করেন ১৯৬৯ সনে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি, উদ্দেশ্য অদ্বৈতচর্চা। অদ্বৈত চর্চার লক্ষ্যে বা সুবিধার্থে ১৯৯৫ সনে তাঁরা আরও গঠন

করেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি (১৪৮ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা)। তিতাস অবলম্বনে নাটক পরিচালন করেন উৎপল দত্ত ১৯৬৩ সনে। সিনেমা হয় ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ১৯৭৩ সনে। ১৯৯০ এর পরে তিতাসের লেখককে নিয়ে কৌতূহল বাড়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য গৃহীত হন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য অদ্বৈতর জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস অদ্বৈতের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর পিএইচডি গবেষণা পরিচালনা করেন।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখের আগ্রহে অদ্বৈত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজে পাঠ্য হয়। তথ্য সংগ্রহ করে মোটামুটিভাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন শান্তনু কায়সার ও অচিন্ত্য বিশ্বাস। তিতাশ চৌধুরী সহ অনেকের প্রয়াসে লুপ্ত রচনা উদ্ধারের ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গেছে। অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করতে করতে ইতোমধ্যেই অদ্বৈতর জীবনীসংক্রান্ত তথ্যে নানা মিথ্যা বর্ণনা ও মিথ ঢুকে পড়েছে, যা প্রকৃত গবেষকদের সত্য অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অদ্বৈত চর্চাকারীদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে মোহাম্মদী-গ্রুপের প্রতি যে বিদ্বেষ জন্মেছে, তাঁকে মোহাম্মদী থেকে বিচ্যুত করার স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের গালগল্প–জনমনে ভ্রান্ত যে ধারণার জন্ম দিয়েছে তা পরিবর্জন, পরিহার অবশ্য জরুরি বিবেচিত হয়েছে। এবং বলা বাহুল্য এই সাথে পুনর্মুদ্রিত অদ্বৈতের দুষ্প্রাপ্য কিছু রচনা থেকেও তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার, হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা উঠে যাক, প্রতিষ্ঠিত হোক মহৎ অদ্বৈত...। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ হয়নি বলেই এই বিভ্রান্তি জেঁকে বসেছে–যা এখন সত্যের আলোকে পুনর্বিচার করা প্রয়োজন।

উপসংহার : অনুসন্ধানে দেখা যায়, অদ্বৈতের মৃত্যুর পরের বছর 'দেশ' এর স্মৃতিতর্পণে, তিতাস একটি নদীর নামের সূচনায় মুদ্রিত সুবোধ চৌধুরীকৃত মুখবন্ধে এবং কলকাতার সংসদ চরিতাভিধানে যে তথ্য প্রচার করা হয়, তাই-ই ঘুরে ফিরে এখনও বলাবলি হচ্ছে। ঐসব কথাই ছাপা হয় পরিবর্ধিত আকারে ঢাকার চরিতাভিধানে ১৯৮৫ সনে। তারপর শান্তনু কায়সার জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশ করেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ'। এই সব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে অনেক মিথ্যা ও মিথ রচিত হয়। অচিন্ত্য বিশ্বাস অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর জীবনের ঘটনাসহ রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। দেবীপ্রসাদ ঘোষ 'নবশক্তি', 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' থেকে কিছু রচনা উদ্ধার করে ছোট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, তাঁর ক্ষুদ্র জীবনের একটি পঞ্জিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হয়নি এখনও।

যে সব পত্রিকায় তিনি কাজ করেছেন বলে দাবি করা হয়,– সেসব পত্রিকার প্রকাশকাল ও তাতে অদ্বৈতের কার্যকাল সুষ্ঠুভাবে শনাক্ত করণের কাজ সারা হয়নি। ঐ

সকল পত্র-পত্রিকায় তাঁর কতো সব রচনা ছিল সেসব খোঁজা হয়নি। তাঁর সমকালীন আর সব পত্র-পত্রিকায় কোনো লেখা ছিল কিনা– দেখা হয়নি। শান্তনু কায়সার দুই দেশ থেকেই বই বের করে পুরস্কৃত হয়েছেন–কিন্তু 'মোহাম্মদী'র ফাইলটি তিনি নিজে এ পর্যন্ত খতিয়েই দেখেননি। মতিউল ইসলামের 'রক্তনিশান' শীর্ষক কবিতা ছাপার অপরাধে মোহাম্মদী থেকে অদ্বৈতের চাকরি চলে যায়– শান্তনু কায়সার এ রকম কল্পকাহিনী রটনা করে মোহাম্মদী গ্রুপের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিযোগ-অভিমান চাউর করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতই ঐ নামের কবিতা 'মোহাম্মদী'তে মতিউল ইসলাম লিখেছিলেন কীনা বা তা ছাপা হয়েছিল কীনা–তা তিনি মিলিয়ে দেখেননি এবং মতিউল ইসলামের 'রক্তনিশান' মোহাম্মদীতে ছাপা হলেও তাতে চাকরি যাবার কোনো কারণ নিহিত ছিল কিনা– সেসবও পরীক্ষা করে দেখেননি।

শান্তনু কায়সার আরও প্রচার করেছেন, মোহাম্মদীতে চাকরিকালীন সময়ে ঐ পত্রিকায় তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয়। চাকরি চলে যাবার পরে মোহাম্মদীতে তিতাসের প্রকাশনাও স্থগিত হয়ে যায়। পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায় ইত্যাদি। যেন মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষই তা ফেলে দেয়। এমন একটি সাম্প্রদায়িক উস্কানিযুক্ত অভিযোগ সবসময়ই করা হয়। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হতো আগাগোড়া মোহাম্মদীর ফাইল নেড়েচেড়ে দেখলে, যা বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এখনও পাঠের জন্য সহজলভ্য এবং মোহাম্মদী কলকাতায় না থাকলেও নবশক্তি যে কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় তাও সেখানকার গবেষকদের ভালো ভাবে দেখা হয়নি। আর দেখা হয়নি বলে এখনও অদ্বৈত মল্লবর্মণের সমস্ত লেখার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়নি। অথচ বাংলাদেশ ও কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার শতাধিক গবেষক অদ্বৈতকে নিয়ে এখন গবেষণা করছেন। দলিত সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক পুরস্কার দিচ্ছেন, পাচ্ছেন, নিচ্ছেন ইত্যাদি।

আসলে অদ্বৈতের জীবনীর সঙ্গে মতিউল ইসলাম সগর্বে সম্পৃক্ত হবার জন্য তাঁর কবিতা ছাপার অভিযোগে মোহাম্মদী থেকে অদ্বৈতের চাকরি চলে যাবার গল্প ফেঁদেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর 'রক্তনিশান' নামের কোনো কবিতা মোহাম্মদীতে ছাপা হয়নি। মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কতিপয় রচনা– যা এগ্রন্থে মুদ্রিত হল, তাতে দেখা যাবে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত অদ্বৈত মোহাম্মদীতে আদৃত লেখক ছিলেন।

বলা হয়, মতিউল ইসলামের ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য সংবলিত 'রক্তনিশান' কবিতা ছাপার জন্য মোহাম্মদী থেকে চাকরি চলে যায় এবং তাঁর তিতাস ছাপা স্থগিত হয়ে যায়। এ বক্তব্য যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ– তিতাসের শেষ কিস্তি ছাপা হয় মোহাম্মদীতে মাঘ ১৩৫২ অর্থাৎ ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রকৃতপক্ষে পুরাতন মাসিক পত্রিকার মাঘ ১৩৫২ সংখ্যা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩তেও ছাপা হতে পারে। বৈশাখ ১৩৫৩ মানে হলো ১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাস। তখন তিনি 'দেশ' এর পুরনো কর্মচারি। তো, দেশ-

এ চাকরি করা অবস্থাতেও মোহাম্মদীতে তিতাস ছাপা হলে উপর্যুক্ত বক্তব্য অসার প্রমাণিত হয়।

বস্তুগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৯৪০ সনেই তিনি মোহাম্মদীতে সম্পৃক্ত হন। 'দৈনিক আজাদ' ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত হয়– এপত্রেও ১৯৪০ বা তার আগেই তিনি সম্পৃক্ত হন। কাজী নজরুল ইসলামের 'নবযুগ' ১৯৪১ সনে বের হয়ে কএক বছর টিকেছিল। তাতে কাজ করলেও এ সময়ই করেছিলেন। 'কৃষক' নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক বের হতো ১৯৩৮ থেকে। এটি ছিল নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির মুখপত্র। ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে।

তাছাড়া ১৯৪৬ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৪০ সনে লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' পাশ হবার পর 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' জাতীয় অনেক কবিতা তখন থেকেই মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছে। আজাদ-মোহাম্মদী পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র ছিল সবাই জানে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মোহাম্মদী অনেক কথাই বলেছে পাকিস্তান অর্জনের জন্যে–অতএব কবি মতিউলের কবিতা ছাপানো অপরাধ বলে গণ্য হবার নয়। আর মতিউল ইসলাম ১৯৪৫ এর অনেক আগে থেকেই ব্রিটিশ-সরকারের একজন খাস কর্মচারী ছিলেন। পাকিস্তানকালেও তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছেন।

অতএব, মতিউল ইসলাম সরকার-বিরোধী কবিতা লিখতেই পারেন না। তাছাড়া মতিউল রোমান্টিক ধারার কবি বলে খ্যাত, বিপ্লবী ধারার নয়। তাই এসবে গবেষকদের বর্ণিত তথ্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে এই অসঙ্গতিতেও–অনেকের কাজের ফলে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর তথ্য জড়ো হয়েছে।

সংযোজনী

অদ্বৈত ও অন্যান্য সম্পাদিত **'দলবেঁধে'** বই এর নূরীকৃত মোহাম্মদীতে প্রকাশিত আলোচনা (সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী ১৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৭, 'নূরী' আবুল কালাম শামসুদ্দীনের কলমী নাম)।

"এই গল্প সঞ্চয়ন গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন : অদ্বৈত মল্লবর্মণ, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, রাখাল দাস চক্রবর্তী ও সতীকুমার নাগ। প্রকাশক : সনৎ কুমার নাগ, চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৭নং নবীনকুণ্ড লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালীস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

চারশ' ছত্রিশ পৃষ্ঠার বিরাট গল্পগ্রন্থ। ইহাতে মোট ৫২টি গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে বাঙলার গল্প-সাহিত্যের আদিকাল হইতে বাছা বাছা গল্প চয়ন করার চেষ্টা করা হয় নাই,– আধুনিক গল্প লেখকদের লেখা হইতে এই বইয়ের গল্পগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া সম্পাদকের প্রচেষ্টা নতুনত্ব দাবি করিতে পারে। বস্তুত এই ধরনের একটা গল্প সঙ্কলনের খুবই দরকার ছিল। সম্পাদকগণ এজন্য বাঙলার সাহিত্যিকদের ধন্যবাদার্হ নিশ্চয়ই। এই সঙ্কলন হইতে বাঙলার আধুনিক গল্পধারা কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

দুঃখের বিষয় আধুনিক মুসলমান গল্প লেখকদের কোনো গল্প ইহাতে চয়ন করা হয় নাই। আমরা বলিতে বাধ্য, এই সঙ্কলনের ইহাই সব চাইতে বড় ত্রুটি। মুসলমান গল্প সাহিত্য এখনো দানা বাঁধিয়া না উঠিলেও তাহাতে ভালো গল্পের অভাব নাই। আমরা আশা করি ভবিষ্যত সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে।

এই সঞ্চায়ন গ্রন্থের গল্পগুলি মোটামুটি আমাদের বেশ ভালো লাগিয়াছে। তাহার মধ্যে যেইগুলি আমাদের খুবই ভালো লাগিয়াছে, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করিতেছি : সহযাত্রিনী, অসুর সমস্যা, বিপ্লব, মৃত্যুরূপ, শোক, গুপী কবিরাজ, বাড়ীওয়ালা, মরীচিকা ভুল, বিচিত্র, তারা দুজন, স্পর্শদোষ। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ বাঁধাই সুরুচির পরিচায়ক। আমরা এই সুন্দর গল্প-গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণের সমাজ ও সাহিত্যদৃষ্টি

জীবন-শিল্পী অদ্বৈত মল্লবর্মণের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা তেমন হয়নি বললেই চলে। কিন্তু অদ্বৈত-রচনার বিষয়বস্তু, চরিত্রাবলী ও সংলাপ-এর মতো তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কর্মজীবনে সাংবাদিক বা সম্পাদক ব্রত নিয়ে লিখিত 'সাহিত্য' কর্মের মধ্যে এ পর্যন্ত কেবল 'নবশক্তির' সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলো, তিনটি উপন্যাস, কতিপয় কবিতা ও ভারতের চিঠি—পার্লবাক্‌কে শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধে প্রতিফলিত তাঁর সামাজিক দর্শন এককথায় স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত নিম্নবর্গের হিন্দু হিসেবে তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণ ও ধর্ম বৈষম্যবোধ বা বিকার বিকৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি। এক অসামান্য নির্লিপ্ততায় তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের হত-দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, জলমজুর ও বিত্তহীন অশিক্ষিতদের উন্নতি কামনা করেছেন।

গতানুগতিক বা প্রচলিত ইতিহাসের ভেতরে থেকেও সত্য দৃষ্টি তাঁর আচ্ছন্ন হয়নি। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে মুসলিম জাগরণের কালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র হিন্দু-গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ইংরেজ লেখকদের অনুকরণে লিখিত মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসের পুনর্বিচার করা হয়। মোহাম্মদী গোষ্ঠী তথা মুসলিম সম্প্রদায় ১৯৪০-এর কিছু আগে পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি বার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পত্রিকা তরফে 'সিরাজ স্মৃতি' সংখ্যাও প্রকাশ করা হয়। এই সকল সংকলনে অদ্বৈত কতো লিখেছিলেন, তাঁর হদিস পাওয়া যায় না। কিন্তু মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সিরাজ-স্মৃতি সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৭) তিনি নামে ও বেনামে যে রচনাসমূহ প্রকাশ করেন, তাতেই পাওয়া যায় তাঁর মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টির সুপরিচয়। এই বোধের স্বাক্ষর পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তাঁর স্ব-সম্পাদিত 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধেও।

মাসিক মোহাম্মদীর উপর্যুক্ত 'সিরাজ-স্মৃতি সংখ্যা'য় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' বিভাগে 'সিরাজের কাল' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি আলোচনা লেখেন সাধু-রীতির গদ্যে। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি তাঁর একান্তই স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত। শক্তিশালী প্রাবন্ধিক রূপেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করত যদি আরও কিছু প্রবন্ধ, আলোচনা-সমালোচনা তিনি লিখে যাবার অবসর পেতেন, কিংবা যৎকিঞ্চিৎ লিখিত রচনাগুলোও যদি সব উদ্ধার করা সম্ভব হতো।

'সিরাজের কাল' শীর্ষক রচনাটি তিনি আরম্ভ করেছেন এভাবে :

"ইতিহাস সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতির অবমাননা করিলে সেই অবমাননার জন্য দায়ী সাহিত্যই। সাহিত্য ইতিহাসকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাসজাত সত্য-মিথ্যার সকল দায়িত্বকে। সিরাজের প্রতি বিদেশীয়গণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণেরও কেহ

কেহ ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। এইজন্য এদেশীয় সাহিত্যের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত।"

অদ্বৈত মন্তব্য করেন, সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে যিনিই আলোচনা করুন না কেন, তাঁর প্রতি ইতিহাসের অবিচার-প্রসঙ্গে দেশীয় ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকগণও তাঁর কৃতকর্মের ফিরিস্তি দেবেনই। 'ইংরেজগণ স্বার্থের খাতিরে' যা রটনা ও রচনা করেছেন, কেউ অনুরূপ মিথ্যা আবৃত্তি করে, কেউবা 'ইংরেজের পদাঙ্কানুসরণে তাহাদের মিথ্যা কথা সমর্থন করিয়া ইতিহাস-অবমাননা ও সাহিত্যের মানহানির দায়ে পড়িয়াছেন।' তবে তাঁদেরকে নিন্দা করে এখন আর কোন লাভ নেই। কারণ 'তাহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে। মীরজাফর জগৎশেঠ উমিচাঁদ প্রভৃতি দুর্ভাগাদের প্রতি জাতির যে রকম পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষ্যমাণ লেখকগণের প্রতি তাহা অপেক্ষা কম প্রকাশ পাইয়াছে বলা যায় না। কাজেই বহুবার বলা কথার পুনরাবৃত্তি না করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বেশি লাভবান হইব।'

অদ্বৈত মনে করেন, বহুদিন ধরে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক-বিরোধে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ধর্মগতভাবে কতকটা অজ্ঞতা ও কতকটা ভুল-বোঝা তার কারণ। দৃঢ় ভাষায় তিনি বলেন, হিন্দুগণের একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সাধারণ অবিদ্বান ও স্বল্পবিদ্বান হিন্দুরা ধর্মের কিছুমাত্র না বুঝে কেবল বিশ্বাস-সংস্কার বলেই ধর্মকে ধারণ করে আছে।

> "ধর্ম তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে, একথা বলা যায় না। এইরূপ একটু খানি বিশ্বাসমাত্রকে সম্বল করিয়া অপর ধর্মের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সত্য শ্রদ্ধা পোষণ করিবে এতখানি আশা করা যায় না। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য হইলেও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। ... সকলেই জানেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের দিক দিয়া যোগসূত্র স্থাপনে খ্রিস্টান মিশনারীদের 'মিশন' যতখানি কাজ করিয়াছে অপর কেহ সেরূপ করেন নাই।"

হিন্দুরা ইংরেজদের কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভ্রম প্রমাদপূর্ণ ধারণাই যে গ্রহণ করেছেন কেবল, তাই নয়। প্রথম শ্রেণির কবি-সাহিত্যিকরা ইংরেজদের উপকরণ দ্বারা সিরাজ-সংক্রান্ত 'শুদ্ধ-সাহিত্য' তথা 'পলাশীর যুদ্ধ' জাতীয় কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি লিখেও ক্ষতি করেছেন সমূহ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন এক প্রকারে। অদ্বৈত তাই ক্ষোভে-দুঃখে লিখতে বাধ্য হন যে :

> "পলাশীর যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া নবীন সেন দেশের উপকার ও অপকার দুই-ই করিয়াছেন। উপকারের সপক্ষে অধিক কিছু না বলিয়া দেশ দরদী পাঠকগণের ছাত্রজীবন স্মরণ করিতে বলি। পাঠ্যাবস্থায় অধিকাংশ যুবকই নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' বলিতে অজ্ঞান। জাতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল মনিরূপে গ্রন্থখানি এককালে বহু কর্তৃক পঠিত হইত। ইহার এই বহুল প্রচার মিথ্যাপ্রচারে বহুল সহায়তা করিয়াছে। স্বাদেশিকতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা বক্তব্যাদিও সুললিত ছন্দে বিস্তৃতরূপে প্রচার লাভ করিয়াছে একথা মিথ্যা নয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, সিরাজ সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথাই আমরা বহিপত্রে পাঠ

করিনা কেন, সর্ব মিথ্যাকে আড়াল করিয়া পাঠের পরবর্তী সময়ে বাংলার খাঁটি সিরাজকেই স্ব-দীপ্তিতে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা আজকার কোন পাঠকের মনে বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করে না। আর আমরা মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি।" (দ্রষ্টব্য : মাসিক মোহাম্মদী, ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭)

নবশক্তির সম্পাদকীয়সমূহের কয়েকটি থেকেও অদ্বৈতর বিচিত্র বিষয়ে মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন : 'সাহিত্য ও রাজনীতি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন :

"রাজনীতি ও সাহিত্য বিভিন্ন বিষয় হইলেও উভয়ের মধ্যে আত্মিকযোগ সন্ধান অসম্ভব কিছু নয়। সাহিত্য মানুষ গড়ে, রাজনীতি গড়ে মানুষের ভবিষ্যৎ। সাহিত্য রাজনীতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাহার চরম বিকাশ দেখিতে পাই রাশিয়াতে।.... বাংলাও একটি দেশ, ইহারও নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা রহিয়াছে। ... কিন্তু ইহার সাহিত্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই, রাজনীতিতে তো সংঘাত লাগিয়াই আছে।"

লেখকের সক্ষোভ মন্তব্যে সাহিত্যের 'স্বেচ্ছাচার' ধিকৃত হয়েছে, কারণ তাতে 'গণজীবনের রূপায়ন' নেই। রাজনীতিতেও গণস্বার্থ দেখা যায় না। ত্রিশের আধুনিকদের লক্ষ্য করেই তিনি লিখেছেন, 'শরৎ রাবীন্দ্রিক যুগকে সদম্ভে অস্বীকার করার আড়ম্বর আছে, নাই নবসৃষ্টির শক্তি।' সুষ্ঠু, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ধারার গলদ ধরাতেই সকলে ব্যস্ত, কিন্তু সকলের জন্য কল্যাণকর সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য 'পথ প্রদর্শন' করার শক্তি কারো নেই কিংবা সে প্রচেষ্টাও নেই। সেজন্যই ১৯৪০-৪১ সনে মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে বাংলায় দেখা দেয় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি, দাঙ্গা প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে নজরুল ইসলাম 'ঢাকার দাঙ্গা' শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন দৈনিক নবযুগে, ১৯৪১ সনে। সেই কবিতা অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর নবশক্তিতে পুনঃমুদ্রণ করেন। 'ঢাকার দাঙ্গা'র কটি লাইন উদ্ধৃত করি :

'এল কুৎসিৎ ঢাকার দাঙ্গা আবার নাঙ্গা হয়ে
এল হিংসার চিল ও শকুণ নখর চঞ্চু লয়ে।
সারা পৃথিবীর সম্মানের ভূত প্রেতেরা সর্বনেশে
ঢাকার বক্ষে আখা জ্বালাইতে জুটিল কেমনে এসে?
এদের চিতার ধোঁয়া, ইহাদের বীভৎস চীৎকার
অরুণোদয়ের পূর্বাচলেরে করেছে অন্ধকার।
এরা কি মানুষ? ....' এযেন অদ্বৈতরই নিজের কথা কিংবা প্রিয়কথা।

এই মানসিকতা স্মরণ করে পাঠযোগ্য তাঁর 'জিজ্ঞাসা' শীর্ষক কবিতার ন্যায় সম্পাদকীয়টি :

"মনে হয় আমরা মৃত্যুর অতল অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। আমাদের মনুষ্যত্ব যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এই যে শোণিত লোলুপ মানুষ—রক্তে তাহার মৃত্যুর উন্মাদনা, দৃষ্টিতে যাহার হিংস্র নির্মমতা, এই যে হানাহানি রক্তপাত তার মধ্যে সেই বিরাট মানবসত্তা, সেই

মানুষের তপস্যা, সেই মানুষে মানুষে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপনের সাধনা যেন বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত হইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সেই অখণ্ড মানব সমাজের কল্যাণ কামনা, মানুষের পরম এবং সার্বিক আত্মাকে আবিষ্কার করিবার ও প্রতিষ্ঠা করিবার বিরামহীন প্রচেষ্টা আজ হিংসা ও শোণিতের বন্যায় বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত। মানুষ কি চায়? কেন আজ এই আত্মবিক্ষেপ, এই বিক্ষোভ, এই বিদ্রোহ? বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির এই সংঘাতের মধ্যেই কি সেই পরম সত্যের সন্ধান মিলিবে যেখানে মনুষ্যত্ব চরম পরিণতি লাভ করিবে? এই সংঘর্ষের হলাহলের মধ্যেই কি জন্মলাভ করিবে মনুষ্যধর্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি, মানবাত্মার পূর্ণতম প্রকাশ?" (সম্পাদকীয়, নবশক্তি, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)।

সাম্প্রদায়িকতা রোধের জন্য 'মৈত্রী সম্মেলন' ডাকা হয়। ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৪১ সনের ঐ মৈত্রী-সম্মেলন সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে অদ্বৈত বলেন : লাট ভবনে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের লক্ষ্যে আহূত নেতৃ-সমাবেশের ফলাফল যাই-ই হোক, এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

"কারণ যাহাই হোক,– বিরোধ-বিদ্বেষ ও ঈর্ষার বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ-বাতাস আজ প্রধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। অসুস্থ মন ও অস্বচ্ছ আবহাওয়ার মধ্যে একটা জাতি বাঁচিতে পারে না, কলহ ও ঈর্ষার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে একটি জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না– এই সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করিবার মত শুভবুদ্ধিও যদি এই সম্মেলনের ফলে আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে মনে করিব। যাহারা মনে করেন, বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ আজ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এমনই একটা সংস্কৃতিগত বিরোধ যে ইহার কোন সমাধান নাই, তাহাদের সহিত আমি একমত নই। আমাদের মতে এই বিরোধ এমনই একটা ঠুনকো কাল্পনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে যে আমাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলেই এই বিরোধের অবসান ঘটান যাইবে।... প্রকৃতপক্ষে ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে, মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের সংঘাত মাত্র।" (সম্পাদকীয়, নবশক্তি, ২১ মার্চ ১৯৪১)

এই সম্প্রীতিবোধের বহিঃপ্রকাশ তাঁর ম্যাগনাম ওপাস 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'ভারতের চিঠি-পার্লবাক্'কে, সহ অপরাপর বহু রচনায় পাওয়া যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জীবনদানের প্রস্তাব তাঁর সেরকম ভাবনা থেকেই, তাও বোঝা যায়। কিন্তু ধর্মীয়বোধ আধুনিক বিশ্বে কট্টর হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে অদ্বৈতর চিন্তার মূল্য স্বীকৃত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুও ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম মিলনের পথ প্রশস্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা ভারতীয় সরকার প্রধানদের মধ্যে তথা সরকারি নীতিতে এখনও দেখা যায়।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্ব স্ব ধর্মের মৌলিকত্ব সংরক্ষণের প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। এরই নাম দেয়া হয়েছে মৌলবাদের পুনর্জাগরণ–কিন্তু এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নেতাদেরই তো বড় ভূমিকা বহুদিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে। তাই তেজ বাহাদুর সাপ্রুর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যা বলেছিলেন সেদিন, সেটা বিশ্ব মানবিকতাবোধের

প্রেক্ষাপটে আজ এই বিশ্বায়নের যুগে প্রাগ্রসরই মনে হবে– কিন্তু বাস্তবসম্মত কতোটা, তাও প্রশ্নবোধক হয়েই থেকে যাবে।

অদ্বৈত লিখেছেন : "... এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা আজ সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া বাঁচিতে পারি না– আজ উত্তর মেরুর মানুষের সহিত দক্ষিণ মেরুর মানুষের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কূপমণ্ডুকত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং আমরা আর তথাকথিত স্বকীয় এবং সনাতন সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ" করে রাখতে পারি না। বিগত পাঁচ বা ছয় শতাব্দী ধরে যে সংস্কৃতি ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ মুসলিম শাসনোত্তর সংস্কৃতি "তাহা হিন্দুর নহে, মুসলমানের নহে, তাহা ভারত বর্ষের। আজ তর্ক ও কলহের দ্বারা আমরা সেই ভারত বর্ষীয় সংস্কৃতির অভ্যুত্থান রোধ করিতে পারি না। ভারতীয় জাতীয়তা, ভারতীয় সংস্কৃতি ইহারই পরিবর্ধন আজ আমাদের শিক্ষার ও সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

তাঁর মতে রাজনৈতিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্ষুদ্র কলহ ও বিরোধের সমাধান সর্ব ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চাতেই নিহিত রয়েছে। ১৯৪১ সনের আদমশুমারির সময়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সরকারি, তথা সরকারের হিন্দু কর্মচারিদের কারসাজি ও কারচুপির জন্য উত্থাপিত অভিযোগের বিবরণ ইতিহাসে সু-প্রচুর এবং সুলভ। নবশক্তিতেও এ বিষয়ে অদ্বৈত মন্তব্য করেন :

"আমরা হিন্দু ও আমরা মুসলমান ইহার অধিক পরিচয় আজ আমাদের নাই। আমরা যে মানুষ এবং সবার উপরে যে মানুষ সত্য এই সহজ কথাটা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মন্দির ও মসজিদ লইয়া বিরোধ বাঁধিয়াছে, অকারণে তুচ্ছ কলহে দেশের আবহাওয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। মক্তব ও বিদ্যাপীঠে বিরোধ, টুপি ও টিকিতে বিরোধ, প্রতীক লইয়া বিরোধ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী ও পদ্ম' প্রতীক বা মনোগ্রাম অপসারণের আন্দোলন সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে), উপাসনার পদ্ধতি লইয়া বিরোধ, সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গী লইয়া বিরোধ"– জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বিরোধ ঘণীভূত হয়ে ওঠার কারণে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী ভারতীয় সমাজ থেকে তিরোহিত হয়েছে। তবে এর কী প্রতিকার নেই?

"লোক গণনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস রূপ আজ প্রকট" হয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে দেশের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত ও সংহত করার প্রয়োজন সেদিন তিনি অনুভব করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন : "কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের সাধনায় মনুষ্যধর্মের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সর্ব মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মৈত্রীর যে আদর্শ আজ যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের কাম্য হইয়া রহিয়াছে তুচ্ছ অকারণ কলহ ও বিদ্বেষ-দুষ্ট বিরোধের দ্বারা তাহা আমরা ধ্বংস করিতে বসিয়াছি।" (সম্পাদকীয়, নবশক্তি, ৭ মার্চ, ১৯৪১)

দেখা যায় সাধারণত যে অতি বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, নিম্নস্তর থেকে আবির্ভূত কোনো লেখক-সাহিত্যিক কলম ধরলেই তাতে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই ক্ষোভ বিকার বিকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। রূপলাভ করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর সংলাপের মধ্য দিয়ে। কিন্তু মৎস্য কৃষি-আশ্রিত সমাজের হতদরিদ্র শ্রেণির সদস্য

অদ্বৈত বিরল প্রতিভাবলে সৃজনশীলতার জগতে যে প্রশান্ত, সৌম্য, সৌহার্দ্যপূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রশংসনীয়।

এরই উজ্জ্বল সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তার 'তিতাশ একটি নদীর নাম' উপন্যাসেও। সেখানে দরিদ্র মানুষের পরাজয়ের পরও বিদ্রোহ নেই। কিন্তু সে সব বিবরণ পাঠ করলে পাঠক বিদ্রোহী হয়ে উঠার কারণ ও প্রয়োজন অনুভব করেন। দলিত, অবহেলিত, মানবিকতার দৃষ্টিতে নিষ্পীষ্ট জেলে মজুর তাঁতি কৃষক শ্রমিক অনগ্রসর বাংলার তিতাস পারের মানুষের জীবনেতিহাস পাঠ করলে বোধসম্পন্ন মানুষ শিহরিত হয়। হৃদয় বেদনাপ্লুত হয়। যে এক বিরল মহান নিস্পৃহ দৃষ্টিতে অদ্বৈত তিতাস উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা পাওয়া যায় কেবল মহাকাব্য প্রণেতা মহাকবিদের মধ্যে। মহাভারত রামায়ন ইলিয়ড ওডিসি প্রভৃতি পাঠ তাকে মহাকাব্যিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত করেছিল। সাহিত্যিক পাঠ ছিল তাঁর গভীর এবং সাহিত্যিক হবার স্বপ্নও ছিল তাঁর সুকঠিন অধ্যবসায় অনুশীলন ও সাধনালব্ধ। ১৯৩৪ সনে ছাত্রাবস্থায় লিখিত কাব্যসমালোচনা-মূলক পত্রটি পাঠ করে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, অদ্বৈত মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই– কী ধরনের সাহিত্যিক লেখক বা কবি তিনি হবেন–তা স্থির করে নিয়েছিলেন এবং সেই সাহিত্যিক পাঠ তিনি যেন জন্মগতভাবেই পেয়ে গিয়েছিলেন।

জ্ঞান হবার পর থেকেই অসাধারণ মেধাবী অদ্বৈত সেই পাঠ নিতেই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মগতভাবেই কবি প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন ভীষণ রোমান্টিক এবং তিনি ছিলেন ভীষণরকম আত্মপ্রত্যয়ী, জেদী, সংযমী এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ছোট্ট পরিসরের এই পত্রে তাঁর সেই চারিত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর নিকট প্রেরিত অনুজপ্রতীম জনাব মতিউল ইসলামের কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি দায়িত্বশীল সাহিত্য সমালোচক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হবু কবিকে অকারণ প্রশংসা করেননি। কঠোর সমালোচনা করে হবু কবিকে সাধনার পথে আহ্বান করেছিলেন এই বলে যে 'উহা ভয়ানক কঠিন কাজ'। অদ্বৈত নিজে একজন নতুন লেখক হয়েও তখন যেন (১৯৩৪ সনে) হয়ে গিয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ এক সাহিত্য স্রষ্টা, এক মহাকাব্যিক রচনার রচয়িতা। এই পত্রখানিকে বিবেচনা করা যায় অদ্বৈতের জীবনবেদ, তথা সাহিত্যিক চিন্তাধারার মৌল প্রেরণা বা দিক্ নির্দেশনা। এই সাহিত্যিক ফিলসপি দ্বারা চালিত হয়েই তিনি রচনা করেছেন তার সমগ্র সাহিত্যকর্ম–

> "... আমার যা বক্তব্য তা আমি এই পত্রে আপনার নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। ... এখানে কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করিয়া ফেলুন। গীতিকাব্য (Lyrical poems), খণ্ডকাব্য (Narrative Poems) ও মহাকাব্য (Epic)। আপনাকে প্রথমত গীতি কবিতায় হাত পরিষ্কার করিতে হইবে।" যেন নিজেকেই তিনি বলেছেন– "Picture ই গীতি কবিতার প্রাণ। কাজেই আপনি Picture ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তারপর খণ্ডকাব্যে হাত দিবেন।"

সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে এই কথা কয়টির মধ্যে, তিনি লিখেছেন: 'অতীত বা বর্তমান ঘটনাবলি লইয়া আপনি খণ্ডকাব্য লিখিতে পারেন, তবে

অতীতকে নিয়ে লেখাই প্রথমত আপনার সুবিধাজনক হইবে। কারণ অতীতের উপর লেখকের কল্পনাকে উদ্দাম গতিতে চালানো যায়। বর্তমান সম্বন্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা, আপনি উহা ক্রমে ক্রমে বুঝিবেন। কিন্তু সাবধান, এখন আপনি epic এ হাত দিবেন না। উহা ভয়ানক কঠিন কাজ। বিশেষ সিদ্ধহস্ত হইলে পর আপনি epic লিখিতে পারেন।"

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কবিতা লিখেছেন, অতীতের লোক-কবিতা, গান, ছড়া, কাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং একখানা মহাকাব্যিক রচনার জন্য সিদ্ধহস্ত হবার সাধনা চালিয়েছেন। লক্ষ্য করলেই আমরা দেখব মৃত্যুর সময়ে ১৯৫১ সনে তিনি যে বাংলার লোকজীবনের মহাকাব্যিক বর্ণনাসম্পন্ন উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নামের পাণ্ডুলিপি রেখে গিয়েছিলেন–তাতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সংগৃহীত অপ্রকাশিত পল্লী কবিতা, গীতিকা, গাথা-কাহিনী, প্রবন্ধে গল্পে উপন্যাসে চিঠিতে ব্যক্ত, প্রস্ফুটিত করেছেন, সাহিত্য-সম্পদের সুনিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর আর সব লিখিত রচিত কবিতা প্রবন্ধে, গল্পে উল্লিখিত সংগৃহীত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-লৌকিক উপাদান উপকরণের পরিচয় নেবার পরে তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি পাঠ করলে মনে হয় লেখক এই সব তথ্য বা বক্তব্য সুর ও সৌন্দর্য আগে বর্ণনা করেছেন। এই যে প্রথম জীবনে খণ্ড-খণ্ড অল্প-অল্প করে সংগ্রহ করে বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়াস-প্রযত্ন– তা ছিল স্থায়ী মহৎ ও বৃহৎ কিছু করার পরিকল্পনারই অংশ। মোহাম্মদীতে প্রকাশিত সাত কিস্তির তিতাস উপন্যাসের পরিবর্জন-পরিবর্তন পরিমার্জনার নথিপত্র আমাদেরকে সে প্রমাণই দেয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে– গদ্যে তিনি নয় সর্গ বিশিষ্ট মহাকাব্য লেখার পরিকল্পনাই করেছিলেন– তিতাস একটি নদীর নামে আমরা আটটি অধ্যায় বা সর্গ পাচ্ছি–আমরা জানি যে, অদ্বৈত মল্লবর্মণ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি তাঁর বন্ধু বিশ্বস্ত, অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরীর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী মাস্টারি করেছেন সৃজনশীল লেখকের ওপরে রচনা কাটছাট করতে গিয়ে এবং তিনি এই মহাকাব্যিক সাংগঠনিক পরিকাঠামোটি রক্ষা করতে পারেননি। একথা জোর করেই বলা যায়– প্রায় সকল লেখকের ভাগ্যে যেমন ঘটে, তেমনি যদি অদ্বৈত নিজের তত্ত্বাবধানে, প্রুফ দেখে সংশোধন পরিবর্তন পরিবর্জনের মাধ্যমে মুদ্রণ কাজ শেষ করতে পারতেন– তাহলে কলকাতার পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড থেকে যে ভাবে ও রূপে 'তিতাস একটি নদীর নাম' বেরিয়েছে– সেভাবে বেরুত না। মনযোগ দিয়ে পড়লে মনে হয় উপন্যাসে যেভাবে পৃষ্ঠা নম্বর ছাড়া একটি সূচীপত্র দেয়া হয়েছে– তা নিরর্থক। চারটি অধ্যায়ের নীচে আটটি শিরোনাম দেয়া হয়েছে– তিতাস একটি নদীর নাম, প্রবাস খণ্ড, নয়াবসত, জন্মমৃত্যু বিবাহ, রামধনু, রাঙা নাও, দুরঙা প্রজাপতি ও ভাসমান। লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি উপন্যাসের আটটি শিরোনামের একটি উল্লিখিত হয়েছে, 'প্রবাস খণ্ড' নামে–অথচ সমগ্র উপন্যাসে আর কোন খণ্ড বা সর্গ নেই। এথেকেই আমার মনে হয়েছে– লেখকের নবম খণ্ড বিশিষ্ট গদ্য মহাকাব্য রচনার পরিকল্পনা মৃত্যুর কারণে সফল হয় নাই। অনেক বই বের হবার পরও থাকে অসম্পূর্ণ। লেখকের মৃত্যুর ফলেই

তিতাস একটি নদীর নাম অসম্পূর্ণ উপন্যাস। অদ্বৈতর লেখা কতখানি ফেলে দেয়া হয়েছে– তা আর আজ বের করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু এই সাহিত্যিক বন্ধুটি সাহিত্যের একটি বড় ক্ষতি করেছেন তাঁর মাস্টারি-বুদ্ধি দিয়ে। এটাও অদ্বৈতকে কাছের মানুষ হয়ে কম মূল্য ও মর্যাদা দেবারই পরিণতি।

অদ্বৈত তিতাসকে মহাকাব্যের আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন–মহাকাব্য রচনার আদর্শ রপ্ত করার এই পরামর্শ যেন নিজের প্রতিই নিজের উপদেশ।

"হিন্দু শাস্ত্রে epic সম্বন্ধে বলে যে উহাতে atleast নয়টি সর্গ থাকিবে। অতীত হইতে Meterial সংগ্রহ করিতে হইবে। Style খুব grand হওয়া চাই। একাধিক ছন্দ ব্যবহার করা যায় না। ইত্যাদি। Narrative বা epic এর Materials আপনি হিন্দু বা মুসলিম mythology কিংবা history হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। ... প্রকৃতিকে লইয়াই কবির কারবার, আর "nature is itself a grand picture". এই জন্যই বলিতেছিলাম, আপনি picture ফুটাইতে বিশেষ যত্ন করিবেন। আর এক কথা lyrics সামান্য বিষয়ের উপরই লিখিবেন। বড় বড় জিনিসের উপর রস ফুটাইয়া তোলাই কবির কৃতিত্ব। এ সম্বন্ধে আপনি যতই Culture করিবেন ততই আনন্দে আত্মহারা হইবেন"

অদ্বৈতর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সহায়ক তাঁর এই উক্তিটিও গুরুত্বপূর্ণ-তিনি লিখেছেন– "কাহাকেও follow করিবেন না। সর্বদা সর্বত্র আপন ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিবেন। ... সাধনা ঢাক করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকেনা। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে। ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে তবে আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অনবরত লিখিতে থাকুন।" [অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র, কলকাতা ২০০০ দ্রষ্টব্য]

এই চিঠির বক্তব্য অদ্বৈত জীবন দিয়ে প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। সাধনা তিনি নীরবে নীরবেই করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ নীচু জাতবংশের বিত্তহীন পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁকে ব্যক্তিত্ব সচেতন বলেই গণ্য করেছেন সবাই। সাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি স্বতন্ত্র ধারায় অবগাহন করেছেন। তিতাস পারের বাংলাদেশের জীবনচিত্র তাঁর মতন লৌকিক আঞ্চলিক ভাষায় কেউ-ই তাঁর আগে লিপিবদ্ধ করেননি। মালোদের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার, শব্দ ও বাক্য তথা ভাষারীতি এমন অকপটে অকৃত্রিমভাবে তাঁর আগে কেউ লিখতে পারেননি। তাঁর প্রতিভা বিলম্বে হলেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে অদ্বৈত চর্চা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর সকল রচনা আশা করি উদ্ধারের কাজে অনেকেই ব্রতী হবেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তাঁর লুপ্ত রচনার খোঁজে

অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখে বাংলা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছেন। কিন্তু ১৯৫১ সনে মৃত্যুরও প্রায় এক যুগ পর পর্যন্ত তিনি বিস্মৃতির অন্তরালেই ছিলেন। ১৯৫৬ সনে গ্রন্থাকারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছেপে বের করার পর এটি সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ উপন্যাস উৎপল দত্তের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্য ও সৌভা সেনের সাড়া জাগানো অভিনয়ে নাটক হিসাবে কলকাতার মিনার্ভা মঞ্চে ১৯৬৩ সনের ১০ মার্চ থেকে শততম রজনী প্রদর্শিত হয়। এতেই তাঁর খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনাধীন চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' ১৯৭৩ সনে মুক্তিলাভের পরে।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৯০-এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর লেখক খ্যাতি আবদ্ধ থাকে উচ্চস্তরের বিদগ্ধ পাঠক-শ্রোতা ও পণ্ডিত সমাজের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের দুই খ্যাতিমান গবেষক, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এ অনেকখানি জায়গা দিয়ে উচ্চমূল্যে উক্ত গ্রন্থটির আলোচনা লেখেন। এ সকল গ্রন্থে তিতাস-এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব স্বীকৃতি লাভ করায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠিত বিশ্লেষিত হবার সম্মান পেয়ে যান। বহির্বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যসমাজেও অদ্বৈত চর্চা নব্বইয়ের দশকেই সুবিস্তৃত হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের স্ব-সম্প্রদায়ের সামর্থ্যবান শিক্ষিত সুধীজনেরা, যথা রণবীর সিংহ বর্মণ প্রমুখ ১৯৬৯ সনে অদ্বৈতকে স্মরণ-বরণ করার লক্ষ্যে গঠন করেন 'পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমিতি'। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি স্মরণ-সভা তথা 'তিতাস-সন্ধ্যা'র আয়োজন করে তাঁরা বৃহত্তর বিদ্বৎ ও সুধী সমাজের কাছ থেকে অদ্বৈতের সম্মান ও স্বীকৃতি আদায়ের সফল আন্দোলন করেন। ১৯৯৫ সনে তাঁরা গঠন করেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি'। 'ভাসমান' নামের দুটি বার্ষিকী প্রকাশ ছাড়াও তাঁদের অন্যতম সদস্য সুশান্ত হালদার অদ্বৈতের 'রাঙামাটি' উপন্যাসটি সম্পাদনা করে ১৯৯৭ সনে পুঁথিঘর থেকে প্রকাশ করেন। আরেক সদস্য দেবীপ্রসাদ ঘোষ 'সাপ্তাহিক নবশক্তি' ও 'সাপ্তাহিক দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এর পাতা থেকে ২২টি নাতিদীর্ঘ রচনা 'বারোমাসী গান ও অন্যান্য' শিরোনামে ১৯৯০ সনে প্রকাশ করেন। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস ও অন্যরা মিলে 'চতুর্থ দুনিয়া' পত্রিকার 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যা : ১৯৯৪' প্রকাশ করেন 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'র ব্যানারে। এসবে অদ্বৈতসংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়ে সম্প্রচার লাভ করেছে। অচিন্ত্য বিশ্বাস অদ্বৈতের 'শাদা হাওয়া' (১৯৯৬), 'রাঙামাটি' (১৯৯৭) ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৯৮) সম্পাদনাপূর্বক প্রকাশ করেন। এই সময়ের (১৯৯২) সেরা

কাজ কল্পনা বর্ধনের অনুবাদে 'পেঙ্গুইন বুকস' থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ইংরেজি ভার্সনের প্রকাশ।

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহে ক্রমাগত অদ্বৈত সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও বিশ্লেষিত এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতা থেকে তাঁর কতিপয় রচনা সঙ্কলিত হয়। এই উদ্যোগ বাংলাদেশেও দেখা যায়। আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত লোকায়ত পত্রিকার ১৯৯৮ সনের দুটি সংখ্যায় 'ভারতের চিঠি—পার্ল বাক্‌কে' ও 'বন্দী-বিহঙ্গ' শীর্ষক রচনা ছাপা হয়। আরিফ হাসান সম্পাদিত সাহিত্যলোক-এ 'শুশুক' ও অন্যত্র 'বিদেশী নায়িকা' শীর্ষক দুটি কবিতা উদ্ধৃত ও সঙ্কলিত হয়। এগুলো আমি সংগ্রহ করি এবং আমি মোহাম্মদীর পৃষ্ঠা থেকে তেরো শতকের একটি আরবীয় কবিতার অনুবাদ 'যোদ্ধার গান' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সাত কিস্তির ফটোকপি কলকাতার অদ্বৈত গবেষকদের কাছে পাঠাই। এসবে ফল হয়। মোটামুটিভাবে একটি রচনা সমগ্রের রূপ লাভ করে অদ্বৈতর লেখাসমূহ।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মোহাম্মদীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনার সন্ধান তাঁদের কাছে পাঠালেও বিষয়বস্তুর কারণেই তা সম্ভবত রচনাসমগ্রে বর্জিত হয়েছে এবং কিছু রচনার সন্ধান এখনও কেউ নিচ্ছেন না। যেমন : মোহাম্মদীর 'সিরাজ স্মৃতি সংখ্যা'য় (আষাঢ় ১৩৪৭) 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' বিভাগে 'সিরাজের কাল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন অদ্বৈত, যার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হিন্দু পণ্ডিত ও গবেষকগণ কর্তৃক নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনুকরণে কালিমা প্রক্ষেপণের অপপ্রয়াস সম্পর্কে কটাক্ষ করা। অদ্বৈত সংক্রান্ত পুস্তকাদিতে 'মোহন লালের খেদ', 'সিরাজ', 'পলাশী' প্রভৃতি কবিতা ও গানের উল্লেখ থাকলেও আগেই বলেছি, সম্ভবত বিষয়বস্তু ও রচনার চেতনাগত তাৎপর্যের কারণেই রচনাসমগ্রে বর্জিত হয়েছে। যদিও বিগত ৫০ বছর যাবত কলকাতার আলোচকগণ বলে আসছেন যে, অদ্বৈত স্বনামে ও বেনামে নবশক্তি, আজাদ, নবযুগ, কৃষক, মোহাম্মদী, যুগান্তর, দেশ ইত্যাদি পত্রিকায় অনেক লিখেছিলেন পেটের দায়ে কিংবা চাকরির প্রয়োজনে। কিন্তু সেসব সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ প্রমাণিত হয় না। হয়ত এমনও হতে পারে, ঐ সকল রচনা অদ্বৈতের এমন এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লেখক সত্তার উন্মোচন করে, যা অদ্বৈত গবেষকদের আগ্রহকে স্তিমিত করে দেয়।

কিন্তু এতসব কূটতর্কে সাধারণ পাঠকশ্রেণির কৌতূহল কম থাকারই কথা। যেটুকু পরিচয় অদ্বৈত পাঠকেরা পেয়েছেন, তাতেই তাঁরা গণমানুষের কবি ও সাহিত্যিক এই মানুষটিকে আপনজন ভেবে বরণ করে নিয়েছেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চিন্তা, কর্ম ও সাহিত্যচর্চা ও তাঁর সুনাম বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। এই একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে 'দলিত সাহিত্য আন্দোলন'ও দানা বেঁধেছে। নীচু শ্রেণির মানুষের ভিতর থেকে উঠে এসে সেই শ্রেণির মানুষজনের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার সংগ্রামকে সাহিত্য শিল্পে অঙ্কনের ঘটনা অদ্বৈতের বেলায় যেভাবে স্ফূর্তি ও সাফল্য লাভ করেছে তেমন আগে খুবই কম ঘটেছে বলে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তাঁকে

স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ১৯৯৮ সন থেকে প্রবর্তন করেছেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মারক পুরস্কার'।

বাংলাদেশেও প্রগতিবাদী লেখক, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বিভিন্ন সভা-সমিতিতে অদ্বৈতের সাহিত্যদৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছেন নানাভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত করে। তাঁর ও অন্যদের প্রচেষ্টার ফলে 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ও হয়েছে। সব মিলিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেছেন। ১৯১৪ থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত যে মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের ক্ষুদ্র জীবনকাল তিনি বিধাতার বিধানে যাপন করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারও বেশি কাল তিনি তলিয়ে ছিলেন অনাদর-অবহেলার বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। তবে কেউ না জানলেও অদ্বৈত জানতেন, ধ্রুব বিশ্বাস আমাদের, তিনি শীর্ষ সবার এক সারিতে অধিষ্ঠিত হবেন। তাঁর সকল রচনার পাঠ শেষে এই প্রতীতি জন্মেছে বর্তমান পাঠকের অন্তরে।

যে কোন খ্যাতিমানের জীবনকথার মতোই অদ্বৈতের খ্যাতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপরও লেখালেখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে হঠাৎ বৃদ্ধির অসতর্ক মুহূর্তে অদ্বৈত সম্পর্কে আমাদের সাহিত্যসমাজে নানা 'মিথ্যা' ও 'মিথ্' গড়ে উঠেছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই মিথ্যা ও মিথ্ প্রচারের সূচনা করেছিলেন অদ্বৈত বন্ধু সুবোধ চৌধুরীই। তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধু অদ্বৈতর কাছ থেকে ছাপাবার অনুরোধসহ সংরক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মুখবন্ধে অসত্যবচন মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি লিখেছিলেন :

> "আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের দিনে আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণকে বেদনার্তচিত্তে স্মরণ করি। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাইবার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে ইহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই। লেখকের মৃত্যুর পরও কয়েকটি বৎসরই কাটিয়া গেল।... 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রথমত মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইতেছিল। গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সময়ই এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারাইয়া যায়। বলাবাহুল্য, অদ্বৈতের জীবনে এই ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। বন্ধুবান্ধব এবং পাঠকদের আগ্রহাতিশয্যে লেখক আবার ভগ্নহৃদয়ে তিতাসের কাহিনী লইয়া বসিলেন...." ইত্যাদি।

কী কারণে জানি না, ঢাকার বাংলা একাডেমি 'চরিতাভিধান'-এ ও একই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। এতে পাঠকের ভ্রম হয় যে, মোহাম্মদীতে চাকরিকালীন সময়ে কোন কারণে কর্তৃপক্ষের রূঢ় আচরণে বিক্ষুব্ধ-মন ও বিপর্যস্ত-চিত্ত অদ্বৈত পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে বসেন। আবার শান্তনু কায়সার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ "অদ্বৈত মল্লবর্মণ'-এ লিখেছেন আর এক গুরুতর কাহিনী :

> "অদ্বৈত ... তিন বছর .... মাসিক মোহাম্মদীতে ছিলেন। ... এখানে কর্মরত থাকার সময়ই তিতাসের তৎকালীন লেখাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাসিক মোহাম্মদীর চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হয়ত কোন কারণে তাঁর মতবিরোধ হয়ে থাকবে। কবি মতিউল ইসলাম বলেন,

মোহাম্মদীতে একবার অদ্বৈত তাঁর চারটি কবিতা 'রক্তনিশান' শিরোনামে ছাপেন। ঐ কবিতা চতুষ্টয়ে ব্রিটিশ-সরকার-বিরোধী বক্তব্য থাকায় পত্রিকার ওপর যে 'ঝঞ্ঝাট' নেমে আসে তার দায়িত্ব নিশ্চিতই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ওপর বর্তায়।" (পৃ. ৫)।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে সকলেরই মনে হবে, মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষ অবিচার করেছিলেন অদ্বৈতের ওপর। সকল অদ্বৈতানুরাগীই সে-জন্যে মোহাম্মদীওয়ালাদের ওপর ক্ষুব্ধ। তার প্রমাণ, দেশে-বিদেশে অদ্বৈতের ওপর রচিত সকল রচনাতেই খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় এই 'চাকরিচ্যুতি', 'পাণ্ডুলিপি হারানো' এবং মোহাম্মদীতে হঠাৎ করে অসম্পূর্ণ রেখেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপানো 'স্থগিত' করে দেয়ার মর্মন্তুদ ঘটনাসমূহ।

কিন্তু অদ্বৈতের কর্মজীবনের সকল তথ্য পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে শান্তনু কায়সার প্রমুখ অদ্বৈত গবেষকবৃন্দের বক্তব্য অসত্য, অযৌক্তিক, পারম্পর্যহীন প্রমাণিত হয়। আরও মনে হয় অদ্বৈতের ওপর যাঁরাই গবেষণা করেছেন– তাঁরা অদ্বৈত যে সকল পত্রিকায় কাজ করতেন– সে সকল পত্রিকার আয়ুষ্কাল যেমন জানেন না, তেমনি তা কোথায় পাওয়া যায় সে সন্ধান রাখেন না। রাখলেও সেসবের পৃষ্ঠা ওল্টাবার ধৈর্য ধারণ করেন না। অন্তত এ কথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, দুই দেশের সেরা দুই অদ্বৈত গবেষক অচিন্ত্য বিশ্বাস ও শান্তনু কায়সার অদ্বৈতের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয় যে মোহাম্মদীতে এবং অদ্বৈতর নামের সঙ্গে হরিহর-আত্মারূপে মিশে গেছে যে নবশক্তির স্মৃতি,– সেই 'মোহাম্মদী' ও 'নবশক্তি'ই যখন দেখেননি– তখন অন্য পত্রপত্রিকার প্রচ্ছদ উল্টে দেখার সুযোগও তাঁদের হয়নি (ব্যতিক্রম দেবীপ্রসাদ ঘোষ, তিনি নবশক্তির ১৮টি রচনা উদ্ধার করেন। তবে আরও যত্ন নিলে তিনি রত্ন উদ্ধার করতে সক্ষম হতেন নবশক্তির পৃষ্ঠা থেকে)।

বহুবার লেখা হয়েছে যে, তিনি সাপ্তাহিক নবশক্তি (১৯৩৪-৪১), মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭-৪৭, ৪৯-৭০), দৈনিক আজাদ (১৯৩৬-৮৬), দৈনিক নবযুগ (দ্বিতীয় পর্যায়, (১৯৪১-৪৭), সাপ্তাহিক ও দৈনিক কৃষক (১৯৩৮-৪৭), যুগান্তর (১৯০৫–) সাপ্তাহিক দেশ (১৯৩৩–) ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন। এবং তাতে লিখেছেন চাকরির প্রয়োজনে, অর্থ পাবার প্রত্যাশায়। নিজ রচনা প্রকাশের সৃষ্টিশীলতার আনন্দলাভের আশায়ও তিনি লিখেছেন গল্প, কবিতা ও উপন্যাস– 'ভারতবর্ষ', 'মৃত্তিকা', 'ত্রিপুরালক্ষ্মী', 'সোনারতরী', ও ঐ কালের অন্যান্য সাময়িকীতে। এই সকল পত্রপত্রিকার প্রকাশকাল, স্থায়িত্ব প্রভৃতির সঙ্গে অদ্বৈতের লেখা প্রকাশের সূত্র মেলালে দেখা যাবে– তাঁর জীবনপ্রবাহের ছক যেভাবে আঁকা হয়েছে, তা কিছুটা ভেঙে যাবে এবং নতুন করে গড়তে হতে পারে তাঁর জীবনীপঞ্জি। কারণ আনন্দবাজার গ্রুপে কর্মকালীন সময়ে যে মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয়েছে এই তথ্য সর্বত্র চেপে গেছেন জীবনীকারগণ।

জীবনীকারেরা মোহাম্মদী খুলে দেখলে এর প্রমাণ পাবেন। শান্তনু কায়সার লিখেছেন, মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ধারাবাহিকভাবে তিন কিস্তি প্রকাশ

পায় (দ্রঃ পৃ. ২২)। প্রকৃতপক্ষে সাত কিস্তি সাত সংখ্যায় প্রকাশ পায়। যে 'কবিতা চতুষ্টয়' ছেপে অদ্বৈত মোহাম্মদীর চাকরি হারান বলে শান্তনু কায়সার জ্বলজ্যান্ত বক্তব্য দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন– সে প্রেক্ষিতে মোহাম্মদী থেকে চাকরিচ্যুতির সময়কাল ১৯৪৫-৪৬ সনের মোহাম্মদীতে 'রক্তনিশান' নামের কোন কবিতাই ছাপা হয়নি। হলেও তাতে চাকরি যাবে না, কারণ মতিউল ইসলাম ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করতেন, তিনি বিপ্লবী কবিতা লিখতে পারেন না, অন্তত স্বনামে। যদি লেখেনও তাহলেও ১৯৪৫ সালে তা ছাপার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিরক্ত হয়ে মোহাম্মদীকে ধমক দেবে তা হয় না। আর মোহাম্মদীও অদ্বৈতের চাকরি সেজন্য খাবে না, কারণ, তখন ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন করে দিয়ে চলে যাবার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। অতএব অদ্বৈতের চাকরিচ্যুতির জন্য যে সকল কাল্পনিক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না।

শান্তনু কায়সারের বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইটি অবিকৃত অবস্থায় কলকাতা থেকে বের হয়। দুইটি বইয়ের দ্বারা তিনি দুই দেশে যত মিথ্যা ও মিথ্ ছড়িয়েছেন– তত আর কেউ করেননি। যেমন 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় অদ্বৈতর কোন গল্পই এখনও পাওয়া যায়নি এবং শান্তনু কায়সার এ যাবত অদ্বৈতর একটি গল্প, কবিতারও সন্ধান দেননি। কিন্তু শোনা কথার ওপর বেমালুম লিখে ফেলেছেন : "দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি প্রচুর গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।" (দ্রঃ পৃ. ২৩) সঙ্গত কারণেই অধ্যাপক তিতাশ চৌধুরী অতিশয় দুঃখে দৈনিক সংবাদ (১৯৯৬)-এ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন : "অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনীকার শান্তনু কায়সার তাঁর গ্রন্থে কোন কবিতা সংযোজনে ব্যর্থ হয়েছেন।" অথচ তিনি অদ্বৈত গবেষণার জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। অনুরূপভাবে অদ্বৈতের 'রচনাসমগ্র' বলে যা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে, তাও সম্পূর্ণ নয়।

প্রশ্ন জাগে তাই মনে, এমন একজন মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের সমগ্র রচনা উদ্ধার ও প্রচারে সাহিত্যসমাজের অনীহা কেন? যে তিতাসের জন্যই অদ্বৈত বিখ্যাত, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস জানিয়েছেন, সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও সুবোধ চৌধুরী ১৯৫৬ সনে প্রকাশের সময় ইচ্ছামত বাদ-ছাদ দিয়ে ছেপেছেন!! এই ঘটনা বাংলা ভাষার এক মহান লেখকের প্রতি চরম অবহেলা-অপমানের শামিল। তাই এখন কর্তব্য অবিকৃত 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশিত করা। মোহাম্মদীর পাঠটি লেখক এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে, দুটো আলাদা লেখা হয়ে রয়েছে। অন্তত বিখ্যাত একটি উপন্যাসের পরিশিষ্টে 'ভিন্ন পাঠ' সংযোজন করা সাহিত্য সমাজের রীতি। সে-রীতি অনুযায়ী মোহাম্মদীর সাত সংখ্যায় ছাপা হওয়া 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর খসড়া সঙ্কলনের গুরুত্বও খাটো করে দেখা চলে না।

রচনাসমগ্রে মুদ্রিত 'ভারতের চিঠি–পার্ল বাক্‌কে' বই আকারে তিনবার বের হয়। 'শাদা হাওয়া' ও 'রাঙামাটি' দুটো পত্রিকায় উপন্যাস আকারে ছাপা হয়–যা খুবই জানাশোনার মধ্যে ছিল। সেসব অপুরাতন পত্রিকাও সহজলভ্য। 'দেশ' একটি

সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। তবে এর পৃষ্ঠা থেকে 'জীবন তৃষা' সঙ্কলনের মধ্যে কৃতিত্ব আছে। নবশক্তি, দেশ, আনন্দবাজার, মৃত্তিকা, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকেও বিভিন্ন গবেষক যে সকল রচনা সাম্প্রতিককালের পত্রপত্রিকায় সঙ্কলিত বা পুনর্প্রকাশিত করেছেন তার মধ্যেও গৌরব আছে। কিন্তু নবশক্তি, মোহাম্মদী, সওগাত, কৃষক, নবযুগ, আজাদে প্রকাশিত অদ্বৈতের অন্য রচনাগুলো সংগ্রহ না করে এমনকি সন্ধান জানা লেখাগুলোও বর্জন করে কলকাতার দে'জ থেকে 'রচনা-সমগ্র' প্রকাশের তাৎপর্য কী, তা বুঝতে চেয়েও যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিশেষত, কলকাতার গ্রন্থাগারগুলোতে (তখনকার বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হতো) সহজলভ্য সাপ্তাহিক ও দৈনিক কৃষক, দৈনিক নবযুগ, দৈনিক আজাদ, মাসিক সওগাতসহ হিন্দু-মুসলমান পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি আরও কি লিখেছিলেন–তাও কি অনুসন্ধান করা উচিত ছিল না? ঐ সকল পত্রিকার লেখাগুলো আবিষ্কার হলে অদ্বৈতকে নতুন করে বিচার করতে হবে। অন্তত নবশক্তিতে স্বনামে-বেনামে লেখা সম্পাদকীয় ও বিভাগীয় আলোচনাগুলো উদ্ধার করা গেলে 'সমাজসচেতন সাংবাদিক ও সম্পাদক অদ্বৈত'কে স্বরূপে চিনতে সহজ হতো।

নবশক্তির পৃষ্ঠায় 'সন্ধ্যা-বিরহিনী' শীর্ষক একটি কবিতা এখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তাছাড়া মোহাম্মদীতে ছাপা 'সিরাজের কাল', 'মোহনলালের খেদ', 'সিরাজ', 'পলাশী' এগুলো এখনও পত্রিকার পাতাতেই আবদ্ধ আছে। নবশক্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা যায়, চতুর্থ বর্ষ থেকে তিনি স্বনামে সম্পাদক তো বটেই, অন্য কর্মচারীও নেই বলে সে সময় অদ্বৈত একাই বিভিন্ন লেখা লিখে পত্রিকা ভরাতেন। সেসব রচনা বেছে বের করা কষ্টসাধ্য হলেও সম্পাদকীয় আলোচনাসমূহকে অদ্বৈতের রচনা বলে (ভাষা ও রচনারীতির আলোকে) সহজেই চেনা যায়। এরকম প্রায় এক শ' সম্পাদকীয় শিরোনাম এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'সাপ্তাহিকী' নামে ১৯৩৯ সনের সংখ্যাগুলোতে অদ্বৈত আলোচনা লিখতেন– যা তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ১৯৪১ নবশক্তির শেষ বছর। এ সময় পত্রিকার আর্থিক সঙ্গতি কমে যায়। লোকবলও। পত্রিকার পাতায় তখন 'ম্যাটার' ছিল কম। বড় পাতায় ছোট লেখা দিয়ে আধুনিক কবিতার বইয়ের মতো ঝরঝরে করে ছাপা হতো। এই কালের নবশক্তির সম্পাদকীয় আলোচনাগুলোও অন্য যে সব কারণে তাৎপর্যপূর্ণ তাহলো তখন 'পাকিস্তান' প্রস্তাব (১৯৪০) পাস হয়ে গেছে। ১৯৪১ সনের লোক গণনা (আদমশুমারী) হবে। অদ্বৈতরও চিন্তার পরিপক্কতা এসেছে। তাই দেখা যায় তাঁর একালের রচনা বয়স্ক রাজনৈতিক লেখকের ন্যায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারিত। সংক্ষেপে সার বক্তব্য উপস্থাপনের আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেন অদ্বৈত এই সকল আলোচনায়। তাঁর 'সাহিত্য ও রাজনীতি', 'জিজ্ঞাসা', 'লোকগণনা', 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ও 'মৈত্রী সম্মেলন', 'সিরাজের কাল' প্রভৃতি শিরোনামের লেখাগুলোতে তিনি পৃথিবীর বাতাস বুঝে আজকের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের বক্তাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে দূরদর্শিতার পরীক্ষা হয় অদ্বৈতর।

এ ছাড়া নবশক্তির প্রথম পর্বে (১-৩ বর্ষ) সহকারী সম্পাদক হিসাবে এবং সকলের কনিষ্ঠ কর্মচারীরূপে অদ্বৈতকে বেনামে অনেক যে লিখতে হতো সাগরময় ঘোষসহ অনেকেই তা জানিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করে 'নবশক্তি'র নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় অদ্বৈতের প্রথমদিকে লেখা কিছু গল্প ও আলোচনা এতে রয়েছে এবং খুব সম্ভব 'বিয়ে ও তারপর' শীর্ষক তাঁর আরও একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাসও মিলে যেতে পারে। সুধী গবেষকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করছি। চতুর্থ বর্ষের প্রথম খণ্ডে জানুয়ারি ১৯৩৮ থেকে জুন পর্যন্ত যখন অদ্বৈত পুরো সম্পাদক তখন এটি ইন্দিরা বর্মণের নামে ধারাবাহিক ছাপা হয়। এই পত্রিকার 'মহিলা মহল'-এর পরিচালিকা-লেখিকা ছিলেন শ্রীমতী কল্যাণী বর্মণ। 'দূরবীণে দুনিয়া' বিভাগে 'বিশ্বদূত' লিখতেন আন্তর্জাতিক ঘটনার বিশ্লেষণাত্মক রচনা। পার্ল এস বাককে লিখিত ভারতের চিঠির লেখক অদ্বৈতের দ্বারা এটি লেখা খুবই স্বাভাবিক। 'পীঠ ও পট' লিখতেন 'ভাস্কর' নামে সিনেমার আলোচনা। সিনেমার সিরিয়াস দর্শক ও সমালোচক ('ছায়াছবির কাহিনী' শীর্ষক 'দেশ'-এ ছাপা প্রবন্ধের কথা স্মর্তব্য) অদ্বৈতের লেখা বলে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ এই বিভাগীয় রচনাগুলো এক এক সংখ্যায় এক এক নামে লেখা হতো। অদ্বৈত পত্রিকায় কখনও 'অদ্বৈত বর্মণ' কখনও 'শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ' নামে লিখতেন। এই 'বর্মণ' পদবীর লেখকেরাও কখনও 'ইন্দিরা বর্মণ' কখনও 'শ্রীমতী কল্যাণী বর্মণ'। 'বর্মণ' পদবীর লেখকদের মধ্যে অদ্বৈতের আগে বা সমকালে কি কেউ ছিলেন? শ্রী নির্মল বর্ধনের কবিতা ও গল্পও আছে নবশক্তিতে। এই লেখকের নামও অদ্বৈতের মতো কখনও 'শ্রী নির্মলচন্দ্র বর্মণ' কখনও 'নির্মল বর্ধন' লেখা হতো। এঁরা কারা? – প্রশ্ন জাগে। 'মহিলা মহল' অদ্বৈতের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত নবশক্তির নতুন বিভাগ, যা তাঁরই চিন্তাপ্রসূত। ঐ সময় থেকে 'সম্পাদকী' শিরোনামে লেখা হতো সম্পাদকীয়-আলোচনা। পরবর্তীকালে বিষয়ভিত্তিক শিরোনাম দেয়া হয়েছে সম্পাদকীয়ের। নবশক্তির লেখক ছিলেন যাঁরা, অথবা, ঐকালের জীবিত লেখকদের কাছ থেকে ঐ সকল 'বর্মণ', 'বর্ধন' পদবীর লেখক আদৌ ঐকালে ছিলেন কিনা– যাচাই করে 'অদ্বৈতর রচনাসমগ্র' পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। আমার যতটুকু ধারণা জন্মেছে, তাতে সন্দেহ জেগেছে। নিশ্চিত হবার অবকাশ পেলে নিশ্চয়ই তাও করে দেয়া যাবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেনামী রচনা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। কারণ সাংবাদিকতা পেশা দ্বারা তখন আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেত না। বারে বারে তাই তাকে এ কাগজে সে কাগজে কাজের জন্য ছোটাছুটি করতে হয়েছে এবং নিম্নশ্রেণির মালো বা জেলে পরিবারের কালো গাত্রবর্ণের চোখে না পড়ার মতো বেশভূষার মানুষটি কলকাতার উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক-সাংবাদিক সমাজে মোটেই আদৃত হতে পারেননি বলে কাজের ও লেখার ছাপাবার কাগজের জন্য তাই অদ্বৈত নির্বাচন করেছেন পূর্ব বাংলা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের মানুষজনকে আর মুসলিম পরিচালিত কাগজগুলোকে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, অদ্বৈত বেশির ভাগ মুসলিম মালিকানার কাগজে কাজ করেছেন, লিখেছেন–এ কারণে পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের কাছে অদ্বৈত সম্পূর্ণ উন্মোচিত হচ্ছেন না। কারণ মুসলিম সম্পাদিত কাগজ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও উদাসীন। আবার বাংলাদেশের গবেষকরাও যে অদ্বৈতর সম্পূর্ণ রচনা খুঁজে পেতে তালিকাভুক্ত করবেন–তাও সম্ভব নয়। কারণ সেকালের অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই কলকাতাতেই সহজলভ্য। বাংলাদেশে নমুনাস্বরূপ কিছু আছে। কিন্তু পুরো সেট না পেলে কোনো পত্রিকা থেকে কোন লেখকের সব লেখা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে মনে করা যায় না। এসব কারণে অদ্বৈতর রচনাবলী এখনও নিত্যনতুনভাবে উদ্ধার হতে থাকবে এবং সে কাজ অদ্বৈতানুরাগী তথা বাংলা সাহিত্যের দায়িত্বশীল কমিটেড গবেষকদের করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কোন একক প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর নয়। এটি কারও একার কাজও নয়, দায় তো নয়-ই। এটা জাতীয় দায়িত্ব-ই।

সে যা হোক, বাংলাদেশ ও কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারসমূহে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার খবর মোটামুটি গ্রহণ করতে পারার ফলে খুবই সহজলভ্য সোর্স থেকেও অদ্বৈতের রচনা এখন এই ২০০২ সালেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এসবের কিছু কিছু কয়েকটা মাসিক পত্রে কিংবা সংকলনে প্রকাশও করা গেছে। তাই সেসবের কথা মাথায় রেখে অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেনামিতে ছাপা মোহাম্মদীর 'হলওয়েল স্তম্ভ' শীর্ষক কবিতাটি যে তারই এবং এ বিষয়ে তিনি স্বনামেও যেসব রচনা লেখেন তার সম্পর্কেই গুটিকয়েক তথ্য উপস্থাপন করা যায়।

এ কথা সকলেই এখন জানেন যে, মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদে অদ্বৈত মল্লবর্মণ পার্টটাইম কিংবা ফুলটাইম চাকরি করতেন। আর এটা ঘটে ১৯৪০ সনের আগে ও পরে। তখন তিনি সাপ্তাহিক নবশক্তির সম্পাদনার সাথে সাথে দৈনিক আজাদে পার্টটাইম করতেন। একই কার্যালয়ে মোহাম্মদীর অফিসও ছিল। অদ্বৈত মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গের হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক হলেও উদার মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক হওয়ার জন্য তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বেও ছিলেন। ফলে মুসলিম জাগরণের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে বিশেষত মোহাম্মদী-আজাদ

গ্রুপের নেতৃত্বে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার ওপর ইংরেজ ও হিন্দু গবেষক লেখকদের আরোপিত কলঙ্কমোচন অভিযানের সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বনামে মোহাম্মদী পত্রিকার সিরাজ-স্মৃতি সংখ্যায় লিখেছিলেন 'সিরাজের কাল'। ঐ একই সংখ্যায় 'মোহনলালের খেদ' ও 'হলওয়েল স্তম্ভ' শীর্ষক দুটি কবিতা লিখেছিলেন ছদ্মনামে। মোহাম্মদীর অন্য এক সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল 'সিরাজ' ও 'পলাশী' শীর্ষক দুটি গান–যা শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে আকাশবাণী থেকে গীত হয়ে প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য, 'হলওয়েল স্তম্ভ' শীর্ষক কবিতাটি অদ্বৈত প্রকাশ করেন 'তিতাস একটি নদীর নামের' একটি লেখক-প্রিয়-চরিত্র– কিশোর বা নবকিশোরের নামে। এই একই নামে তিনি মোহাম্মদীর ১৩ বর্ষ ৮ সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) 'হীরামতি' নামেও একটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা লেখেন, যার একটি চরিত্র ফটিকচান্দ, বেনামে যেন অদ্বৈতই। ফটিকচান্দ 'গাওয়ের পরধান মদন সরকারে'র ছেলে। মদন সরকার আবার 'রতন জাওলার বেটা'। এই জেলের ছেলে ফটিকের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের তাঁতিঘরের মেয়ে হীরামতির প্রেম হয় এবং সে প্রেম সার্থকতাও লাভ করে ত্যাগের মহিমায়। 'হলওয়েল স্তম্ভ' ও 'হীরামতি' যে অদ্বৈতের রচনা, তাতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই। ভাষাতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন সমালোচক গবেষকগণের পুনঃপরীক্ষার সুযোগ অবারিতই আছে যেহেতু, সেহেতু এক্ষণে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচনের অভিলাষী অদ্বৈত হলওয়েল মনুমেন্ট সংক্রান্ত প্রচারণাকে কীভাবে জেনেছেন তা দেখা যাক। বলাবাহুল্য, লেখক মনে করেন এই মনুমেন্ট স্থাপনের ফিলসপি অলীক, মিথ্যা ও স্বপ্ন-কল্পনামাত্র।

হলওয়েল স্তম্ভ

তোমায় দেখে সবাই মোরা ঘৃণায় ফিরাই মুখ,
তবু তুমি রইবে চেয়ে একি গো কৌতুক।
অলীক তুমি মিথ্যা তুমি, স্বপ্ন তুমি ভাই,
এই কথা তো নিজেই বুঝো, সন্দেহ কি তাই।
গঞ্জিকাতে পোক্ত সে-কোন্ বিষম গল্পবাজ।
বঙ্গ শিরে হান্‌লো তোমায়–কলঙ্কেরি তাজ। ....

['কবিতা' বিভাগে পুরো কবিতাটি সংকলিত আছে। 'হীরামতি' ও।]

অদ্বৈত মল্লবর্মণের আরও কতিপয় রচনা

অদ্বৈত-মল্লবর্মণের রচনাবলীতে অসংকলিত, অসংগৃহীত আরও কতিপয় রচনা সংগ্রহ করা গেছে- যা এখানে সংকলিত হল। এতে তাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রকৃতি অনুধাবনে পাঠক গবেষকদের সহায়তা করবে। রক্ষণীয় অদ্বৈত সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল।

নবশক্তি পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্বনামে সম্পাদক ছিলেন, অতএব সম্পাদকীয় তিনিই লিখতেন।

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়। সপ্তম বর্ষ পঞ্চাশ সংখ্যা ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়ে নজরুল এর 'নবযুগ' চলছিল, আরও চলতিল কৃষক (সাপ্তাহিক ও দৈনিক) আজাদ (দৈনিক), 'মাসিক মোহাম্মদী' এবং সাপ্তাহিক 'দেশ'। অদ্বৈত এগুলোতে কাজ করেছেন। লিখেছেন। নবশক্তির কিছু সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরিচয় নিম্নরূপ যা তাঁর রচনা-সংগ্রহে সাংবাদিক রচনা ও সম্পাদকীয়-কর্মের নিদর্শন স্বরূপ সংকলিত হওয়া দরকার।

১. ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাখ্যা (৪/১, ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮)
২. হিংসাবাদ বিরোধী আন্দোলন (৪/১, ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮)
৩. কংগ্রেস ও কৃষক সংঘ (ঐ)
৪. কংগ্রেস ও শ্রমিক আন্দোলন (ঐ)
৫. পরলোকে শরৎচন্দ্র (৪/৩, ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮)
৬. ছাত্র সংহতি ও ভেদ-নীতি (ঐ)
৭. জিন্নাহ-রাজেন্দ্রপ্রসাদ চুক্তি (ঐ)
৮. সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র (৪/৪, ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৮)
৯. বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন (ঐ)
১০. মানবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালায় আগমন (ঐ)
১১. মোহামেডান সোস্যালিজম (ঐ)
১২. বিষ্ণুপুরের বাণী (৪/৫, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)
১৩. কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন (ঐ)
১৪. সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী দিবস (ঐ)
১৫. কংগ্রেস ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (ঐ)
১৬. কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলে মুসলমান (ঐ)
১৭. বাঙালীর সামরিক শিক্ষা (ঐ)
১৮. হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যু (৪/৬, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)
১৯. বঙ্গীয় কংগ্রেস অফিসে হানা (ঐ)
২০. বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠন (ঐ)
২১. সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ (ঐ)

শ্রী ভার্গব শর্ম্মা' নামে 'চলতি দুনিয়া' (পৃ. ১৩) বিভাগের লেখাটিও অদ্বৈতর হতে পারে–কারণ এই নামের কোনো লেখক ছিলেন বলে জানা যায় না।

২২. জিন্না-জওহরলাল প্রসঙ্গ (৪/৭, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)
২৩. রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি (ঐ)
২৪. রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ (৪/৮, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)

২৫. কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ (ঐ)
২৬. ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন (ঐ)
২৭. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (৪/৯, ৪ মার্চ (১৯৩৮)
২৮. বাঙ্গালার বন্দীসমস্যা (ঐ)
২৯. ঐক্য সম্মেলন (৪/১০, ১১ মার্চ ১৯৩৮)
৩০. দমনমূলক আইন প্রত্যাহার (ঐ)
৩১. সুভাষচন্দ্রের সংকল্প (৪/১২, ২৫ মার্চ ১৯৩৮)
৩২. বাংলার মন্ত্রিসভা (৪/১৩, ১ এপ্রিল ১৯৩৮)
৩৩. সুভাষচন্দ্রের প্রথম আপোষ (৪/১৪, ৮ এপ্রিল ১৯৩৮)
৩৪. কংগ্রেস দখলের কথা (ঐ)
৩৫. এম. এন. রায়ের অভিযোগ (ঐ)
৩৬. বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন (ঐ)
৩৭. বঙ্কিম-উৎসব (৪/১৫, ১৫ এপ্রিল ১৯৩৮)
৩৮. জাতীয় সপ্তাহ (ঐ)
৩৯. বিহারে বাঙালীর সমস্যা (ঐ)
৪০. হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী (৪/১৬, ২২ এপ্রিল ১৯৩৮)
৪১. শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য (ঐ)
৪২. মি. জিন্নার রাজনীতি (৪/১৭, ২৯ এপ্রিল ১৯৩৮)
৪৩. হক সাহেবের হুমকি (ঐ)
৪৪. পরলোকে কবি ইকবাল (ঐ)
৪৫. ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ (ঐ)
৪৬. মহীশূরের শিক্ষা (৪/১৮, ৬ মে ১৯৩৮)
৪৭. কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র (ঐ)
৪৮. গণমতের দাবি (৪/১৯, ১৩ মে ১৯৩৮)
৪৯. নবাবী জুলুম (ঐ)
৫০. হক-কথা (ঐ)
৫১. ভারতের কৃষক জাগরণ (৪/২০, ২০ মে ১৯৩৮)
৫২. জাতীয়তার ভিত্তি কি (রেজাউল করিমের বইয়ের ওপর ..., ঐ)
৫৩. সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সন্ধানে (ঐ)
৫৪. মিলনের রাজপথ (ঐ)
৫৫. মি. জিন্নার অগ্নিপরীক্ষা (৪/১১, ২৭ মে ১৯৩৮)
৫৬. দূরের আলো (৫/২৪, ১৬ জুন ১৯৩৯)
৫৭. কংগ্রেসের আধুনিক রূপ (৫/২৮, ১৪ জুলাই ১৯৩৯)
৫৮. নির্বোধের খেলাঘরে (৫/৩০, ২৮ জুলাই ১৯৩৯)

'সাপ্তাহিকী' নামে ১৯৩৯ সালের সংখ্যাগুলোতে আলোচনা লেখা হয়। এগুলোও অদ্বৈতের।

১৯৪১ সালে নবশক্তির সপ্তম বা শেষ বর্ষ চলে। এই সময় নবশক্তির আর্থিক সংগতি কমে যায়। লোকবলও। ফলে অদ্বৈত একাই প্রায় বেনামে-স্বনামে লিখে পাতা ভরাতেন। তখন ম্যাটার কম ছিল। বড় পাতায় ছোটো লেখা দিয়ে আধুনিক কবিতার বইয়ের মত ছাপা হত।

এই কালের কতিপয় সম্পাদকীয় আলোচনা–যা খুবই পরিপক্ক, বয়স্ক রাজনীতিক লেখকের মতো। সংক্ষেপে, সার-বক্তব্য নিবেদনের আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করেন অদ্বৈত এই সকল আলোচনায়,– যেমন 'সাহিত্য ও রাজনীতি'; 'জিজ্ঞাসা'; 'লোকগণনা'; 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ও 'মৈত্রী সম্মেলন' প্রভৃতি আলোচনাগুলো।
এছাড়া যে সকল আলোচনা উল্লেখযোগ্য, তা হলো :

৫৯. স্বাধীনতার সংকল্প (৭/৫, ১১ জানুয়ারি ১৯৪১)
৬০. সাহিত্য ও রাজনীতি (৭/৬, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)
এই সংখ্যাটি কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে প্রকাশিত হয়েছে– যা প্রকাশের তারিখ দেখলেই বুঝা যায়।
৬১. জিজ্ঞাসা (৭/৭, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)
৬২. শিরোনামহীন সম্পাদকীয় (৭/৮, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)
৬৩. মানুষ (৭/৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১)
৬৪. লোকগণনা (৭/১০, ৭ মার্চ ১৯৪১)
৬৫. ভারতীয় সংস্কৃতি (৭/১১, ১৪ মার্চ ১৯৪১)
৬৬. মৈত্রী সম্মেলন (৭/১২, ২১ মার্চ
৬৭. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (৭/১৩, ২৮ মার্চ ১৯৪১)
৬৮. নতুন নেতৃত্ব (৭/১৪, ৪ এপ্রিল ১৯৪১)
৬৯. বিনষ্টির আহ্বান (৭/১৫, ১১ এপ্রিল ১৯৪১)
৭০. নববর্ষ (৭/১৭, ১১ এপ্রিল ১৯৪১)
৭১. কিসের আশায় (৭/১৮, ২ মে ১৯৪১)
৭২. গুরুদেবের জন্মতিথি (৭/১৯, ৯ মে ১৯৪১)
৭৩. জীবনধর্ম (৭/২০, ১৬ মে ১৯৪১)
৭৪. দুঃখের বরষায় (৭/২১, ২৩ মে ১৯৪১)
৭৫. শ্রীকাইল কলেজ ত্রিপুরা (৭/২৩, ৬ জুন ১৯৪১)
৭৬. পরাজয় (৭/২৪, ১৩ জুন ১৯৪১)
৭৭. দেশবন্ধু স্মৃতি দিবসে (৭/২৫, ২০ জুন ১৯৪১)
৭৮. নূতন আলোক (৭/২৬, ২৭ জুন ১৯৪১)
৭৯. ততঃকিম (৭/২৭, ৪ জুলাই ১৯৪১)
৮০. দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন (৭/৩০, ২৫ জুলাই ১৯৪১)
৮১. গতি (৭/৩১, ১ আগস্ট ১৯৪১)

৮২. প্রফুল্ল চন্দ্র (৭/৩২, ৮ আগস্ট ১৯৪১)

এই সম্পাদকীয়টি প্রফুল্লচন্দ্রের ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লেখা হয়েছিল।

এখানে প্রফুল্লচন্দ্রের একটি উক্তি উদ্ধৃত ছিল :

....."অর্ধশতাব্দীর উপর হইল, নিরন্তর দেশবাসীকে আমার বক্তব্য শুনাইয়াছি। অশিক্ষিত উৎপীড়িত অনশনক্লিষ্ট আমার দেশবাসীগণ। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পীড়নের লাঘব ও ক্ষুধার অন্নসংস্থান–এইতো প্রধান কর্তব্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। আজ জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বাঙালী জাতির মধ্যে শিল্পের ও বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ প্রসার দেখিয়া মনে কিছু শক্তি লাভ করিতেছি। তবে দেশবাসীর এই উদ্যম নিষ্প্রভ না হয় এবং স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এই আমার বর্তমানের একান্ত কামনা।"

৮৩. রবীন্দ্রনাথ (৭/৩৩, ১৫ আগস্ট ১৯৪১)

৮৪. কবিগুরুর শেষ রচনা (৭/৩৪, ২২ আগস্ট ১৯৪১)

৮৫. রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা (৭/৩৫, ২৯ আগস্ট ১৯৪১)

৮৬. নানাকথা (৭/৩৬, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১)

ক. সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা (ঐ)

খ. বর্ষা (ঐ)

গ. পরলোকে বর্দ্ধমানরাজ (ঐ)

ঘ. গান্ধীজীর বাণী (ঐ)

৮৭. নানাকথা : রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি (৭/৩৭, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ ও গ্রামোদ্যোগ

৮৮. বিজয়ার সম্ভাষণ (৭/৩৯, ১০ অক্টোবর ১৯৪১)

৮৯. বর্তমানের প্রয়োজন (৭/৪৬, ২৪ অক্টোবর ১৯৪১)

৯০. নানাকথা (৭/৪৫, ২১ নভেম্বর ১৯৪১)

৯১. পৃথিবীর বাতাস (৭/৪৬, ২৮ নভেম্বর ১৯৪১)

৯২. নানাকথা : হক মন্ত্রীসভার বিদায়/হিন্দুমহাসভার অধিবেশন ইত্যাদি। (৭/৪৭, ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংক্রান্ত একটি বিতর্ক

[অদ্বৈতমল্লবর্মণ সম্পর্কে *দৈনিক জনকণ্ঠে* এবং *মাসিক ঐতিহ্যে* আমার দুটো লেখা প্রকাশিত হলে অধ্যাপক শান্তনু কায়সার 'ভিন্নমত' নামে একটি প্রতিক্রিয়া লেখেন *দৈনিক জনকণ্ঠে*। এর জবাব দিই আমি। দুটো লেখাই এখানে প্রকাশিত হল। এতে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যাবে।]

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'গবেষণা'

দৈনিক জনকণ্ঠের সাময়িকীর ২১ জুন ২০০২ সংখ্যায় ইসরাইল খানের 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তাঁর লুপ্ত রচনার খোঁজে' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই লেখকই 'ঐতিহ্যর' আষাঢ় ১৪০৯ সংখ্যায় লিখেছেন 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ : স্বরূপের খোঁজে'। দু'টি লেখাতেই তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনোভাবের উৎকট প্রকাশ ঘটেছে। 'জনকণ্ঠে'র লেখায় তিনি আমার অদ্বৈত জীবনী সম্পর্কে লিখেছেন, 'দু'টি বইয়ের দ্বারা তিনি দুই দেশে যত মিথ্যা ও মিথ ছড়িয়েছেন তত আর কেউ করেননি'। 'ঐতিহ্য'-এ তিনি লিখেছেন, "... আমাদের দেশের বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' শীর্ষক জীবনীগ্রন্থ এবং 'চরিত্রাভিধান'-এ-ও এমনভাবে তথ্য বিন্যাস করা হয়েছে যে, যে কোন পাঠক মনে করবেন অদ্বৈত হিন্দু লেখক বলে মোহাম্মদীতে তাঁর উপন্যাস সম্পূর্ণ ছাপা হয়নি এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারণেই তিনি (অদ্বৈত) চাকরিচ্যুত হন বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'দেশ'-এ যেতে বাধ্য হন।"

আমার 'মিথ্যা' প্রসঙ্গে ইসরাইল খান বলেছেন, আমি জীবনীগ্রন্থে লিখেছি, "দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি প্রচুর গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন।" বাহুল্য মনে হলেও না বলে উপায় নেই, সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি শুধু গল্প নয়, প্রবন্ধ ও অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু আমি যে পবিত্র সরকার ও 'দেশ'-এর কর্মী ও অদ্বৈতর সহকর্মী জ্যোতিষ দাশগুপ্তর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও তাঁর সমর্থনেই তা বলেছি, যা আমি 'দেশ'-এর সুবর্ণজয়ন্তি সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করেছি, খুবই চাতুর্যের সঙ্গে তা অনুল্লিখিত রেখে ইসরাইল খান এটা 'প্রমাণ' করতে চেয়েছেন যে, আমি নিজেই ঐ 'মিথ' রচনা করেছি। একইভাবে 'শাদা হাওয়া'কে সুবৃহৎ উপন্যাস বলার দায় প্রাথমিক ও সম্পূর্ণভাবে আমার নয়। এও উল্লেখ্য, যে সময়ে আমি বাংলাদেশে অদ্বৈতচর্চার শুরু করি তখন আমাদের এখানে বা পশ্চিমবঙ্গে অদ্বৈতর খ্যাতিলাভের কাল ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ইসরাইল খানের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চাতুর্যের একটি প্রমাণ দেয়া যায়। তাঁর কথিত 'মিথে'র মধ্যে 'তিতাসে'র কথিত পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি উভয় লেখায় অনেক কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা সমগ্র'র সম্পাদক অচিন্ত্য বিশ্বাসের এ সংক্রান্ত মিথকে নাকচ করার

কথাও উল্লেখ করেছেন। এ 'রচনা সমগ্র' প্রকাশিত হয় ২০০০-এর জানুয়ারিতে। অথচ ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তিতাস'-এর রূপান্তরের উদাহরণ প্রক্রিয়া ও প্রবণতা ব্যাখ্যা করে ঐ অসম্ভাব্যতার প্রতি আমিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইসরাইল খান এ সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এমন ভাব প্রকাশ করেছেন, যেন আমিও পাণ্ডুলিপি হারানোর একজন প্রচারক। যে 'গবেষণা' এ রকম প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করতে চায় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যায় তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছাড়া আর কী বলবো?

এবার আরেকটি প্রত্যক্ষ তথ্যের সাক্ষ্য নেয়া যাক। 'মোহাম্মদী' থেকে অদ্বৈতর চাকরিচ্যুতিকে তিনি গালগল্প বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন এবং একে আমি বা আর কেউ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছি বলে তাঁর ধারণা। কেন তাঁর এ করম ধারণা হলো আমি জানি না, কিন্তু ঠাকুর ঘরে কে, বললে কেউ যদি গায়ে পড়ে 'কলা খাইনা' বলে তার দায় নিশ্চিতই বর্তমান লেখকের নয়। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি এই কারণে যে, ঢাকার বাংলা একাডেমি ও কলকাতার নয়া উদ্যোগ থেকে প্রকাশিত আমার উভয় বইতেই যেখানে তথ্যসূত্রে এই চাকরিচ্যুতি প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'অতীত দিনের স্মৃতি'র স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেখানে তিনি এর দায় শুধু আমার কাঁধে চাপাতে চেয়েছেন কেন? যে ইসরাইল খান দু'টি লেখাতেই প্রাথমিকসূত্র যাচাই করেননি বলে অন্যের প্রতি কটাক্ষ করার সামান্যতম সুযোগও ছাড়েন না, তিনি কেন এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সূত্রকে বার বার এড়িয়ে যান? তার কারণ কি এই নয় যে, তাহলে তাঁর তথাকথিত যুক্তির ভিত্তিটিই ধসে পড়বে?

আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে আর যাই হোক তার কথিত 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি'র তথাকথিত পক্ষ-বিপক্ষের মোহাম্মদী গ্রুপের বিপক্ষ হিসেবে যে দাঁড় করানো যাবে না সেটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ড. খানও ভালই জানেন। সে কারণে এ বিষয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বললেও এ কথাটি একবারও বলেন না যে, 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্পষ্টভাবে বলেছেন, "অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রায় বৎসর তিনেক 'মাসিক মোহাম্মদী'র সংশ্রবে ছিলেন। তারপর যে কারণেই হোক তাঁকে এ-চাকুরী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়।" পরে তিনি আরো লিখেছেন, "... উপন্যাসটি 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তিনি শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।"

পাঠক লক্ষ্য করুন, আমি নই, আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছেন, 'চলে যেতে বাধ্য হতে হয়', 'বিদায়গ্রহণ করতে হয়।' আর যে তিন বছরের কথা বলে তিনি আমাকে কটাক্ষ করেছেন, তাও আমি নই, আবুল কালাম শামসুদ্দীনই বলেছেন, আমি তা ব্যবহার করেছি মাত্র। এখন উভয় লেখাতে ইসরাইল যেখানে তাঁকে সাক্ষ্য মেনেছেন ও উদ্ধৃত করেছেন সেখানে তাঁর তথ্য ব্যবহার করে আমি হয়ে গেলাম 'সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি'র ধারক! সত্যি সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই গবেষণা! আমার নিন্দা করতে গিয়ে প্রায় সর্বত্র তিনি এই কাণ্ড করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি অবশ্য স্ববিরোধিতার শিকার না হয়েই পারেননি। 'জনকণ্ঠে' লিখেছেন, "... দেশে

কর্মকালীনই (১৯৪৫-৫১) যে মোহাম্মদীতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাপা হয়েছে এই তথ্য সর্বত্র চেপে গেছেন জীবনীকার।" আবার 'ঐতিহ্য'-এ ইসরাইল খানই লিখেছেন, 'মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। তাই তিনি মোহাম্মদীর কাজ ছেড়ে 'দেশ'-এ যোগ দিলেও তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' ঐ সময়েই মোহাম্মদীতে ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য পেশ করেন...।"এখন পাঠক বলুন, প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত তাঁর কোন কথাটি বিশ্বাস করবো? আমি না হয় 'চেপে' গিয়েছি কিন্তু তিনি কী উন্মোচন করেছেন, পরস্পরবিরোধী তথ্য?

এখানে অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিমল মিত্রের স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ইসরাইল খান যেখানে তিনি অদ্বৈত সম্পর্কে লিখেছেন "ছোট আকারের শরীর, ততোধিক ছোট একটা টেবিলে বসে তিনি নিখুঁত নিষ্ঠার সঙ্গে 'দেশ' সাপ্তাহিকের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতেন। বেশিরভাগ দিনই তাঁকে দেখা যেত না। কারণ আমরা যারা বাইরের লোক তারা বেশিরভাগই বিকেলের দিকে হাজির হতাম। তখন তিনি কাজ সেরে চলে গেছেন।" অন্যদিকে 'দেশ'-এ তাঁর সহকর্মী সাগরময় ঘোষ জানাচ্ছেন 'উনি বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে একটি কাজ জুটিয়ে নিলেন–পার্টটাইম কাজ। সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সেখানে কাজ করে আমাদের দপ্তরে আসতেন। রাত্রি সাত-আটটা অবধি কাজ করতেন একটানা।' (দ্রষ্টব্য : অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত কলকাতা থেকে ১৯৯৪-র ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'চতুর্থ দুনিয়া'র অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিশেষ সংখ্যায় তাঁর সাক্ষাৎকার)। এই দুই বিবৃতি নিশ্চয়ই একসঙ্গে সত্যি হতে পারে না। হতে পারে, বিমল মিত্র তাঁর সাময়িক অথবা তাৎক্ষণিক (ভিন্ন সময়ের) পর্যবেক্ষণ থেকে ঐ মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু ইসরাইল খান যেভাবে ব্যাপারটিকে হিন্দু-মুসলমান অথবা 'মিত্র ঘোষ বোস মুখুজ্যে চাটুজ্যেদের' ব্যাপার করে তুলেছেন, নিশ্চিতই বিষয়টি তা ছিল না। বর্ণশাসিত হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের শিকার হলেও অদ্বৈত নিশ্চিতই মূর্খ কিংবা মূঢ় অভিমানী ছিলেন না। নিজ মাতৃভূমি ও বিশ্বপটভূমির ইতিহাস-সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব তাই অবশ্যই তাঁকে ঐ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতেও শিখিয়েছিল, সমাজবিচ্ছিন্ন হতে নয়। নিজের 'তত্ত্বে' নিজেই আস্থা রাখতে না পেরে ইসরাইল খান তাই একদিকে যেমন মোহাম্মদী ও তৎসম্পর্কিত পত্রপত্রিকায় অদ্বৈতর প্রচুর রচনা প্রকাশের সংবাদ দেন তেমনি আবার অন্যদিকে মোহাম্মদীতে তার রচনা প্রকাশের সংখ্যা কম কেন তাও 'ব্যাখ্যা' না করে পারেন না। আসলে অন্ত্যজ সমাজের একজন মানুষ হিসাবে অদ্বৈত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে নির্মোহ ও ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন। এভাবেই অদ্বৈত ক্রমাগত অদ্বৈত হয়ে উঠেছেন। সে কারণে ইসরাইল খান উদ্ধৃত রচনাসমূহেও তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বা বর্ণপ্রথার নেতিবাচকতার পরিবর্তে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য'র ওপর মূল ও প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইসরাইল খানই বলেছেন, অদ্বৈত চাকরির প্রয়োজন ও অর্থের প্রত্যাশায় প্রচুর লিখেছেন কিন্তু সেজন্যই ইসরাইল যেমন বলেছেন, তাঁর পক্ষে হিন্দু-মুসলমান বিবেচনা সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। 'দল বেঁধে' গল্পগ্রন্থে এতজনের গল্প সঙ্কলিত হলেও সেখানে যে একজন মুসলমানের গল্প ছিল না তার দায় কার? অন্যতম সম্পাদক অদ্বৈতর তখনকার বাস্তবতার, উল্লেখযোগ্য মুসলমান গল্পলেখকের অভাব, না অন্য কিছু? এর কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও আমাদের বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ হতে হবে। দু'টি লেখাতেই ইসরাইল খানের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করলে একে ত সাম্প্রদায়িকই বলতে হয়, কিন্তু লক্ষণীয় তিনিও তা বলেননি, এর কারণ অবশ্য এও হতে পারে, তাহলে যে তাঁর 'তত্ত্ব'ই মিথ্যে প্রমাণিত হয়। আসলে এসব ক্ষেত্রে অতিসরলীকরণের সুযোগ নেই, ইসরাইল খান তাঁর দু'টি লেখায় সাধারণভাবে যা করেছেন। তবে আশার কথা এই, তাঁকেও থামতে হয়েছে। একেবারে খাদের কাছে এসে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, হয়তো গরজে পড়েই। তবু এও ভাল। অদ্বৈতর চাকরিচ্যুতি প্রসঙ্গে আমি কবি মতিউল ইসলামের কবিতা চতুষ্টয় 'রক্তনিশান' প্রসঙ্গে যা বলেছি, সে প্রসঙ্গে ইসরাইল খান ঐ বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে মতিউল ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন, যেহেতু তিনি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে সরকারি চাকুরি করেছেন, সেহেতু তার পক্ষে ঐ ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব নয়। 'মোহাম্মদী'র মূল ফাইল দেখার ব্যাপারে ড. খানের খুব গর্ব রয়েছে। তিনি কেন ১৩৫২'র আশ্বিন সংখ্যা 'মোহাম্মদী'তে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর তৃতীয় কিস্তি প্রকাশের আগের পৃষ্ঠায় মতিউল ইসলামের 'বিচ্ছেদ' কবিতার এই অংশ পড়ে নিলেন না। 'তারপর ফিরে এল বহ্নিল বহুদিন,/ অনেক কাহিনী,/ ঘাসের গালিচা পরে দেখিলাম সুতীক্ষ্ণ সঙিন, দানব বাহিনী/' তার চাকুরিকালে স্বনামেই তিনি লিখেছেন এ ধরনের প্রতিবাদী পুঁজিবাদী শাসন শোষণবিরোধী অসংখ্য পঙ্‌ক্তি। দাবানল, নির্ঘুম প্রভৃতি কবিতা এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এ প্রসঙ্গে আমার ভুলের কথাও স্বীকার করি। 'মোহাম্মদী'তে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর আমি যেমন বলেছি, তিন কিস্তি নয়, সাত কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমি যখন ঐ কথা লিখি, তখন 'মোহাম্মদী'র একটি সেটে তিন কিস্তিই পাই। তৃতীয় কিস্তি পড়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'তিতাস'-কে মিলিয়ে দেখে আমার ঐ কথা মনে হয়, যা আমি আমার বইতেও ব্যাখ্যা করি। পাঠকও দেখবেন, তৃতীয় কিস্তিতে মূল উপন্যাসটির শেষাংশই যেন প্রতিভাত হয়েছে। বাকি চার কিস্তি যেন আগে প্রকাশিত তিন কিস্তির প্রক্ষিপ্ত সম্প্রসারণ। এ কারণেই অদ্বৈত তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিটি আবার লিখেছেন, মানে তাঁর না লিখে উপায় ছিল না। এটি ঔপন্যাসিকের শিল্পান্বেষণের রূপ ও প্রকাশ। সুবোধ চৌধুরী একে 'ইচ্ছামত' পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হয় না। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিই তার প্রধান সাক্ষ্য। তবে এর 'ভিন্ন পাঠ'ও প্রকাশ করা যেতে পারে, যাতে পাঠক ও গবেষকের পক্ষে মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয়।

তবে ইসরাইল খান যাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর বই 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ'র 'অদ্বৈত মল্লবর্মণের কবিতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কিছু কথা' অংশে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আমার বইটির একটি অংশের তথাকথিত জবাব দিতে গিয়ে যে ধূর্ততা ও অসততার পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে কেন আমি এই নিম্নরুচির বিতর্কে জড়াতে চাই না। তিনি লিখেছেন, "তাঁর নিবন্ধের কোথাও

আবার অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্যের উলঙ্গ প্রকাশ ঘটেছে। যেমন 'তিতাস লিখেছে' ইত্যাদি বাক্য গঠন থেকেই তা আন্দাজ সহজ...।" কিন্তু পাঠক যদি আমার বইয়ের ১৩৯ থেকে ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েন তাহলে দেখবেন সকল ক্ষেত্রেই 'লিখেছেন' মুদ্রিত হয়েছে, কোথাও 'লিখেছে' নয়। বইটির ঐ অংশের ফটোকপিতে নির্দিষ্ট শব্দাবলী আমি নিম্নরেখাঙ্কিত করে দিয়েছি। তৃতীয় শ্রেণির এই অসততা বিষয়ে মন্তব্য করতেও আমার রুচিতে বাধে। আমার অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পাওয়ায় ইসরাইল খান ক্ষুব্ধ হলেও লিখতে ভোলেননি। ইসরাইল খান 'ঐতিহ্যের লেখাটিতে জানিয়েছেন, ধর্ম-বর্ণ-দেশ-গোত্র নির্বিশেষে অনেকে নাকি অদ্বৈত পুরস্কারের জন্যে 'মুখিয়ে থাকেন।' ড. খানের লেখা দুটিও ঐ মুখিয়ে থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের চিনতে সাহায্য করে। এ জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ।

ভুলের প্রসঙ্গে অদ্বৈতরও একটি 'ভুলে'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইসরাইল খান উদ্ধারকৃত দুষ্প্রাপ্য রচনার অন্যতম 'মোহনলালের খেদ' ও 'পলাশী' কবিতায় ১৭৫৭'র ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের প্রসঙ্গে যে মোহনলালের কথা বলা হয়েছে তিনি এক মিথ ও মিথ্যা মোহনলাল। কারণ এই মোহনলাল পলাশী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি কিংবা তাতে 'শহীদ' হননি। এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের বোনই ইতিহাসখ্যাত লুৎফা (নবাবের দেয়া নাম) যদিও তাঁর সঙ্গে সিরাজের আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়নি। অনেকেই তাঁকে মির্জা ইরাজ খার কন্যা ওমদাতুন্নেসা বলে ভুল করেন, যার সঙ্গে সিরাজের বিয়ে হয়েছিল, যদিও তাঁদের সম্পর্ক ছিল খুবই খারাপ। মোহনলাল পলাশী যুদ্ধের দীর্ঘদিন পরেও জীবিত থেকে ইংরেজদের সঙ্গে আফিংয়ের ব্যবসা করেন। ইসরাইল খান ত গবেষক। অদ্বৈত প্রসঙ্গেই না হয় তিনি আমাদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।

আমি যখন অদ্বৈতচর্চা শুরু করি তখন এই লেখকের প্রতি আমার ভালবাসাই ছিল এর মূল কারণ। প্রান্তিক মানুষের জীবনকে এত আন্তরিক ও শিল্পিতভাবে বাংলা সাহিত্যে কেউ আর তুলে আনেননি। সেইসময় তথ্যের অপ্রতুলতার চেয়েও তাঁর প্রতি আমার ভালবাসাকেই বড় করে দেখেছি। এভাবে কবি মতিউল ইসলামের কাছে পেয়েছি তাঁকে লেখা অদ্বৈতর চিঠি। 'মোহাম্মদী' থেকে তাঁর চাকরিচ্যুতি প্রসঙ্গে কবিকে যখন 'অতীত দিনের স্মৃতি'র কথা জানাই তখন তিনি 'রক্তনিশানে'র কথা বলেন। সেভাবেই আমি বিষয়টি উল্লেখ করি, কোনো হিন্দু-মুসলমান বিবেচনা থেকে নয়। কটাক্ষ নয়, সত্যানুসন্ধানই হোক আমাদের বিবেচ্য।

শান্তনু কায়সার

অদ্বৈত মল্লবর্মণকে নিয়ে
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 'গবেষণা'-র সপক্ষে

অদ্বৈত মল্লবর্মনের লুপ্ত রচনাদির সন্ধানমূলক একটি নিবন্ধ জনকণ্ঠের সাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর ২১ জুন ও ১২ জুলাই ২০০২ তারিখে জনাব শান্তনু কায়সার দুটো বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে অদ্বৈত সংক্রান্ত আমার অন্য একটি লেখাকেও তিনি আমলে নিয়েছেন। যদিও এর যৌক্তিকতা আছে কীনা তা আমাকে ভাবিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তিনি এগুলোকে তাঁর বিরুদ্ধে 'অভিযোগ' আকারে কেন নিয়েছেন। আর ফরিয়াদের ভঙ্গিতে 'পাঠক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি' বলেই বা কেন জবাব লিখেছেন। তাছাড়া লেখককে অবাঞ্ছিত ভর্ৎসনাও করতে চেয়েছেন তিনি। তাই কেউ কেউ শান্তনু কায়সারের অসংযত বাক্যালাপে বিরক্তও হয়েছেন। কারণ সাহিত্যিক বিতর্ককে তিনি ব্যক্তিগত ঝগড়ারূপে পর্যবসিত করেছেন।

সে যাহোক, শান্তনু কায়সারের 'ভিন্নমত'-এর প্রতিক্রিয়া সম্ভবত পাঠক সমাজ প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভিন্নমতে কোনো নতুন তথ্যযুক্তি উপস্থাপন করেছেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ সহজ বিষয়টাকে জটিল করে তুলেছেন। মুদ্রণ প্রমাদকেও লেখকের ভুল বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এরকম ভুল তাঁর রচনাতেও রয়ে গেছে। যেমন মতিউল ইসলামের বিচ্ছেদ কবিতার যে চার লাইন উদ্ধৃত করেছেন– তাতে 'ফেনিল' শব্দটাই বাদ পড়ে গেছে। আর এই কবিতাটি উদ্ধৃত করে তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন 'রক্তনিশান' এর কারণে অদ্বৈত মল্লবর্মণের চাকুরিচ্যুতি মোহাম্মদী থেকে হয়নি। কিন্তু ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের নকলে পুরোমাত্রায় রোমান্টিক ধারার কবিতা 'বিচ্ছেদ'কে বৈপ্লবিক-প্রকৃতির কবিতারূপে উদ্ধৃত করে তিনি আবারও সত্যকে বিকৃত করতে চেয়েছেন। মূলে না গিয়ে পরের ওপরে নির্ভর করে পাণ্ডিত্য জাহির করতে গেলে এমনই হয়। পাঠকদের সদয় জ্ঞাতার্থে মতিউল ইসলামের 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি এখানে পুরো উদ্ধৃত করছি–

বিচ্ছেদ
মতিউল ইসলাম

তোমাকে অন্বেষি' ফিরি বিমথিয়া অতল শর্বরী
নব সূর্য্য-করে,
তোমাকে ডাকিয়া মরে ক্ষোভ-ক্ষুণ্ন আমার বাঁশরী
বন-বনান্তরে।
বসন্তে ফুলের বৃন্তে মধুচ্ছন্দা দক্ষিণ পবন
ক্ষণিকের তরে

তোমার অঙ্গের ঘ্রাণ সযতনে করে সঞ্চয়ন
আনে মোর ঘরে।

যে রক্ত জবার রঙে নিরক্ত প্রান্তরে রঙ লাগে
সেই রঙ দিয়া,
তোমাকে রেখেছি ধ'রে আমার প্রাণের পুরোভাগে
হৃদয় জুড়িয়া।
তুমি কি ভেবেছ কভু কি মাগিছে অরণ্যের ভাষা,
সিন্ধুর মুরলী,
তোমার অধর প্রান্তে কাহার অন্তিম ভালবাসা
মেলে নীল কলি।
বিংশ শতকের এক প্রাণবন্ত অহিংস প্রহরে
দিলে তুমি ডাক,
আমার আকাশে এল আনন্দ-চঞ্চল ডানা ভ'রে
পাখী এক ঝাঁক।
বিপুল বিশ্বের মাঝে রোমাঞ্চিত কম্প্র কলেবরে
আমি জাগিলাম,
প্রাণের সুষমা মোর তোমার রক্তিম ওষ্ঠাধরে
লুটিয়া দিলাম।

তারপর দিন এল রঙিন ফেনিল বহুদিন,
অনেক কাহিনী,
ঘাসের গালিচা পরে দেখিলাম সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন্
দানব বাহিনী।
ছিন্ন হল আমাদের কৈশোরের সবুজ স্বপন
রক্তঝরা পথে,
নিষ্ঠুর কালের চক্রে ভিন্ন-মুখী চলেছি দু'জন
সেইদিন হতে!

[সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী, ১৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৫২, পৃ: ৫৭০]

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, সাতচল্লিশের অব্যবহিত পূর্বকালের রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া বাল্যবন্ধুকে স্মরণ করে লেখা 'বিচ্ছেদ' বিরহ-বেদনাজাত।

সত্যি কথা বলতে কী, শান্তনু কায়সার বা কোনো অদ্বৈত-গবেষককে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই আমি উক্ত রচনাদুটো লিখিনি। দেশ-বিদেশের সকলে মোহাম্মদী থেকে অদ্বৈতর চাকুরি পরিবর্তনকে সাম্প্রদায়িক বিচারে 'চাকুরিচ্যুতি' বলে ব্যাখ্যা করাতেই বিষয়টি নিয়ে লেখার তাড়না বোধ করি। দেখি যে, সকলে অদ্বৈতর জীবনীকার শান্তনু কায়সারের বক্তব্য অবলম্বনে এখনও তাই করে চলেছেন। অচিন্ত্য বিশ্বাসতো

সাম্প্রদায়িক জোসের চোটে লিখেই ফেলেছেন (তাঁর বইয়ের উৎসর্গপত্রটি দ্রষ্টব্য) : "…. 'মোহাম্মদী' থেকে কর্মচ্যুত অদ্বৈতকে যিনি নিয়ে যান 'দেশ' পত্রিকায়… প্রয়াত সাগরময় ঘোষের স্মৃতিতে"– ইত্যাদি।

শান্তনু কায়সার কবি মতিউল ইসলাম ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর উৎস ব্যবহার করে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত জীবনীতে এবং সামান্য অদল বদল করে লেখা কলকাতার নয়া উদ্যোগ থেকে প্রকাশিত বইয়ে (যথাক্রমে ৫ ও ১৬ পৃ. দ্র.) লিখেছেন :

> "তিন বছর তিনি মাসিক মোহাম্মদীতে ছিলেন। ঐ সময় একই সঙ্গে তিনি দৈনিক আজাদ এ কাজ করতেন। এখানে কর্মরত থাকার সময়ই ১৩৫২'র শ্রাবণ থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর তৎকালীন লেখনটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগেই অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাসিক মোহাম্মদীর চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মোহাম্মদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হয়তো কোনো কারণে তাঁর মতবিরোধ হয়ে থাকবে। কবি মতিউল ইসলাম বলেন, মোহাম্মদীতে একবার অদ্বৈত তাঁর চারটি কবিতা 'রক্তনিশান' শিরোনামে ছাপেন। ঐ কবিতা চতুষ্টয়ে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বক্তব্য থাকায় পত্রিকার ওপর যে-'ঝঞ্ঝাট' নেমে আসে, তার দায়িত্ব নিশ্চিতই অদ্বৈত মল্লবর্মণের ওপর বর্তায়। আর যিনি স্কুল জীবনেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে কী ছিল তা না বললেও চলে।'

উপরের আলোচনায় 'রক্তনিশান' এর কথা সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন আবুল কালাম শামসুদ্দীনের 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে কী লেখা হয়েছে দেখা যাক। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠাদ্বয়ে অদ্বৈত সম্পর্কে বর্ণনা আছে–যার অধিকাংশই প্রশংসামূলক, যেমন–

> "… অদ্বৈত মল্লবর্মণ সে-সময়ে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'তে কাজ করছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে 'নবশক্তি' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি আমার কাছে এসে, কোনো কাজে তাঁকে রাখা যায় কিনা সে সন্ধান করছিলেন। আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম… তারপর যে-কারণেই হোক, তাঁকে এ-চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়। … অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন সত্যিই একটি সোনার মানুষ। এমন খাঁটি সাহিত্যমনা ও বিনয়-নম্র স্বভাবের মানুষ অল্পই আমি দেখেছি।…"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন বয়সে অদ্বৈতর পিতৃতুল্য, তাঁর বক্তব্যে কোনো খারাপ ইঙ্গিত নেই। তিনি ইঙ্গিত করেছেন কেবল কোনো কারণে তিনি চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। প্রয়োজনটা ছিল অদ্বৈতরই। তাহলো পূর্ববঙ্গ থেকে যাওয়া স্বজনদের ভরণ পোষণের জন্য অতিরিক্ত টাকা। মোহাম্মদীতে তা জুটছিলনা। 'দেশ'-এর বেতন-স্কেল মোহাম্মদীর থেকে উচ্চ ছিল বলেই তিনি নিজ-গরজে ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন আজাদ-মোহাম্মদী গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কথাটাকে ডিপলোমেটিকেলি বলতে চেয়েছেন। এই কথাকে শান্তনু কায়সার

অপব্যাখ্যা করে মিথ সৃষ্টি করেছেন। আমার এই মূল বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্যে শান্তনু কায়সার যতোই যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করুন না কেনো, খণ্ডন কি করতে পেরেছেন? তিনি অভিযোগ করেছেন আমি তাঁর উৎস উল্লেখ করিনি। কিন্তু সেসবের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সবাই জানেন, লেখক নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যেই খুঁটি-স্বরূপ উৎস উল্লেখ করেন। যার যার বইয়ের বক্তব্য, সেই সেই লেখকের। অতএব উৎস বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক। সে-কারণেই শান্তনু কায়সারের "... পাঠক লক্ষ্য করুন, আমি নই, আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেছেন, ...এখন উভয় লেখাতে ইসরাইল যেখানে তাঁকে সাক্ষ্য মেনেছেন ও উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে তাঁর তথ্য ব্যবহার করে আমি হয়ে গেলাম সাম্প্রদায়িক ... সত্যিই সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই গবেষণা। ..."এই বর্ণনা হাস্যকর। রথখোলার বাজার থেকে একই গরুর দুধ কিনে কেউ বানান 'মরণ চাঁদের দই'। কেউ বানান 'আলাউদ্দিনের মিষ্টি'। কে বুঝাবে তাঁকে এই সৃষ্টি-রহস্য। বোঝেন না বলেই কোনো গবেষণাকে তিনি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' আখ্যায়িত করে আনন্দ পান। কিন্তু উদ্দেশ্য আদর্শ ছাড়া কি কোনো কাজ হয়? যে-কোনো যাত্রার যেমন গন্তব্য থাকে, তেমনি থাকে লেখকদের লেখারও এক একটি মহৎ উদ্দেশ্য। আমার লেখার উদ্দেশ্য তো রয়েছেই। তবে তা অদ্বৈত চর্চাকারীদের থেকে একটু ভিন্ন। বৈচিত্র্যই আমার পরম আরাধ্য। কারণ নতুনত্ব-বৈচিত্র্যই শিল্প-সাহিত্যের প্রাণ।

তাঁর রচনায় অনেক বিকৃত প্রক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে।

জনাব শান্তনু কায়সারকে ধন্যবাদ তিনি আমার লেখাকে আমলে নিয়েছেন। আশা করি তাঁর বইয়ের বক্তব্য সংশোধন করবেন॥

ইসরাইল খান

উপন্যাস

তিতাস একটি নদীর নাম

প্রথম অধ্যায়

তিতাস একটি নদীর নাম

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।

ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণা পল্লীতটিনীর চোরা কাঙ্গালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে–উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সে-সব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়ত তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখ্ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী।

তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।

ঝরণা থেকে জল টানিয়া, পাহাড়ি ফুলেদের ছুঁইয়া ছুঁইয়া উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনকালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আত্মবিলয়ের আনন্দও কোনকালে তার ঘটিবে না। দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ তীরটা একটু মচ্‌কাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে–মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লীরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক–কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলায়াকৃতি।

অনেক নদী আছে বর্ষার অকুণ্ঠ প্লাবনে ডুবিয়া তারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটা নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের উপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকা-গুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে টানিয়া নেয়। এপারে ওপারে ক্ষেত। চাষীরা দিনের রোদে তাতিয়া কাজ করে এপারের চাষী ওপারের জনকে ডাকিয়া ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে। ওপারের চাষী ঘাম মুছিয়া জবাব দেয়। গরুগুলি নামিয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। অবগাহন স্নান। কিন্তু গা ডোবে না। কাক-স্নান করা মাত্র সম্ভব হয় কোন রকমে। নারীরা কোমরজলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হইয়া দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু-করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবানে পা ঘষে। অল্প দূরে ঘর। পুরুষমানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে; তাই ব্যস্ততা নাই।

কিন্তু সত্যি কি ব্যস্ততা নাই? যে-মানুষটা এক-গা ঘাম লইয়া ক্ষেতে কাজ করিয়া বাড়ি গেল, তার ভাত বাড়িয়া দিবার লোকের মনে ব্যস্ততা থাকিবেইত। দুপুরে নারীরা ঘাটে বেশী দেরি করে না। কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় দেরি করে। পুরুষেরা এজন্য কিছু বলে না। তারা জানে এ নদী দিয়া কোনো সদাগরের নৌকার আসা-যাওয়া নাই।

শীতে বড় কষ্ট। গম্ গম্ করিয়া জলে নামিতে পারে না। জল খুব কম। সারা গা তো ডোবেই না; কোমর অবধিও ডোবে না। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে হুম্ করিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিবার উপায় নাই; একটু একটু করিয়া শরীর ভিজে। মনে হয় একটু একটু করিয়া শরীরের মাংসের ভিতর ছুরি চালাইতেছে কেউ। চৈত্রের শেষে খরায় খাঁ খাঁ করে। এতদিন যে জলটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও একটু একটু করিয়া শুষিতে শুষিতে একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। ঘামের গা ধুইবার আর উপায় থাকে না। গরুরা জল খাইতে ভুল করিয়া আসিয়া ভাবনায় কাতর হয়। মাঘের মাঝামাঝি সরষে ফুলে আর কড়াই-মটরের সবুজিমায় দুই পারে নক্‌সা করা ছিল। নদীতেও ছিল একটু জল। জেলেরা তিন-কোণা ঠেলা জাল ঠেলিয়া চাঁদা পুঁটি টেংরা কিছু-কিছু পাইত। কিন্তু চৈত্রের খরায় এ সবের কিছুই থাকে না। মনে হয় মাঘমাসটা ছিল একটা স্বপ্ন। চারিদিক ধু-ধু করা রুক্ষতায় কাতরায়। লোকে বিচলিত হয় না। জানে তারা, এ সময় এমন হয়।

তিতাসের তেরো মাইল দূরে এমনি একটা নদী আছে। নাম বিজয় নদী। তিতাসের পারের জেলেদের অনেক কুটুম বিজয় নদীর পারের পাড়াগুলিতে আছে। তিতাসের পারের ওরা ওই নদীর পারের কুটুম-বাড়িতে অনেকবার বেড়াইতে গিয়াছে। বিয়ের কনের খোঁজে গিয়াছে। সে সব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুকায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে

থাকে। সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা এক সময় হতাশ হইয়া পড়ে। যারা বর্ষার সময় চাঁদপুরের বড় গাঙ্ এ নৌকা লইয়া প্রবাস বাহিতে গিয়াছিল, তারা সেখানে নিকারীর জিম্মায় নাও জাল রাখিয়া রেলে চড়িয়া আসিয়া পড়ে। তাদের কোন চিন্তা থাকে না। হাতের টাকা ভাঙিয়া এই দুর্দিন পার করে। কিন্তু যারা বর্ষায় ঘরের মায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই তারাই পড়ে বিপদে। নদী ঠন্‌ঠনে। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন-কোণা ঠেলা-জাল কাঁধে ফেলিয়া আর-এক কাঁধে গলা-চিপা ডোলা বাঁধিয়া এ-পাড়া সে-পাড়ায় টই-টই করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানা পুকুর আছে, মালিকহীন ছাড়া-বাড়িতে। চার পাড়ে বন বাদাড়ের ঝুপড়ি। তারই ঝরাপাতা পড়িয়া, পচিয়া, ভারি হইয়া তলায় শায়িত আছে। তারই উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিয়া ছোট মাছেরা ফুট দেয়। গলা-জল শুকাইয়া কোমর-জল, কোমর-জল শুকাইয়া হাঁটু-জল হইয়াছে। মাছেদের ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু অধিক ভাবিতে হয় না। গোপাল কাছা-দেওয়া দীর্ঘাকার মালো কাঁধের জাল নামাইয়া শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে এক সময় খেউ দিয়া তুলিয়া ফেলে। মাছেদের ভাবনা এখানেই শেষ হয়, কিন্তু মাছ যারা ধরিল তাদের ভাবনার আর শেষ হয় না। তাদের ভাবনা আরও সুদুর-প্রসারী। সামনের বর্ষাকাল পর্যন্ত।

বর্ষাকালের আর খুব বেশি দেরি নাই। সঙ্কট অবসানের সম্ভাবনায় অনেক মালো উদ্বেগের পাহাড় ঠেলিয়া চলিয়াছে, হাতে ঠেলা-জাল লইয়া চুনো পুঁটি যা পায় ধরিয়া পোয়া দেড়-পোয়া চাউলের যোগাড় করিতেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মালোর দিন আর চলিতে চায় না। একদিন অনেক খানাডোবায় খেউ দিয়া কিছুই পাইল না, নামিলে টগবগ করিয়া পচা জলের ভুরভুরি উঠে, আর খেউ দিলে তিনচারিটা ব্যাঙ্ জাল হইতে লাফাইয়া এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়।

উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুকাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গসুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতেই শুকাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তনদুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গসুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুকাইয়া-যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ, বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে! থাকিলে, আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনাই নাই।

সত্যি নিত্যানন্দর আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বউ ঝিমাইতেছে। ছেলেমেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া কেবল তামাক টানিতেছে।

পশ্চিমের ভিটায় গৌরাঙ্গসুন্দরের ঘর। ডালিম গাছে কাঁধের জাল ঠেকাইয়া দিয়া ডোলাটা ছুঁড়িয়া ফেলিল দাওয়ার একদিকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের ভিটা খালি। তাদের দুই কাকা থাকিত। এক কাকা মরিয়া গিয়াছে এবং তার ঘর বেচিয়া তার শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। আরেক কাকা ঘর ভাঙিয়া লইয়া আরেক গাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ অকারণে খেঁকাইয়া উঠিল, 'খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?'

'কি খামু তবে?'

না, লোকটার কেবল পেটই শুকায় নাই। মাথাও শুকাইয়া গিয়াছে।

'চল যাই বুধাইর বাড়ি।'

নয়ানপুরে বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়। বাড়িতে চার পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে রোজগারী লোক। বোধাই হাতীর মত মোটা ও কাল। শরীরে হাতীর মত জোর। তার কারবার অন্য ধরনের। বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে। মাছ বাড়িতে থাকে, আর তারা তিন বাপ বেটায় লোকজন লইয়া জাল ফেলে, মাছ তোলে, মাছ চালান দেয়। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। নদীতে জল না থাকিলে, মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাইর বাড়িতে।

কিন্তু তিতাসে কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সব দিক দিয়াই সে অকৃপণ।

আর বিজয়-নদীর তীরে-তীরে যে-মালোরা ঘর বাঁধিয়া আছে, তাদের কত কষ্ট। নদী শুকাইয়া গেলে তাদের নৌকাগুলি অচল হইয়া থাকে আর কাঠ-ফাটা রোদে কেবল ফাটে।

তিতাস-তীরের মালোরা যারা সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে, চৈত্রের করায় নদী কত নিষ্করুণ হয় দেখিয়া আসিয়াছে, রিক্ত মাঠের বুকে ঘূর্ণির বুভুক্ষা দেখিতে দেখিতে ফিরতি-পথে তারা অনেকবার ভাবিয়াছে, তিতাস যদি কোনদিন এই রকম করিয়া শুকাইয়া যায়! ভাবিয়াছে, এর আগেই হয়ত তাদের বুক শুকাইয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পাশের জনকে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে বলিয়াছে ঃ 'বিজ্‌নার পারের মালোগুস্টি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা!'

যারা বিজয় নদীর দশা দেখে নাই, বছরের পর বছর কেবল তিতাসের তীরেই বাস করিয়াছে, তারা এমন করিয়া ভাবে না। তারা ভাবে তিন-কোণা ঠেলা-জাল আবার একটা জাল। তারে হাঁটু জলে ঠেলিতে হয়, ওঠে চিংড়ির বাচ্চা। হাত তিনেক তো মোটে লম্বা। বিজয়ের বুকে তা-ই ডোবে না। তিতাসের জলে কত বড় বড় জাল ফেলিয়া তারা কত রকমের মাছ ধরে। এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে নাকের চারিদিক থেকে বায়ুটুকু সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হইত। ওদের মতো ঠেলা-জাল ঘাড়ে করিয়া গ্রামগ্রামান্তরের কানা-ডোবা খুঁজিয়া মরিতে হইত দুই আনা আর দশ পয়সার মোরলা ধরিবার জন্য।

জেলেদের বৌ-ঝিরা ভাবে অন্যরকম কথা—বড় নদীর কথা যারা শুনিয়াছে। যে-সব নদীর নাম মেঘনা আর পদ্মা। কি ভীষণ! পাড় ভাঙে। নৌকা ডোবায়। কি ঢেউ।

কি গহীন জল। চোখে না দেখিয়াই বুক কাঁপে! কত কুমীর আছে সে-সব নদীতে। তাদের পুরুষদের মাছ ধরার জীবন। রাতে-বেরাতে তারা জলের উপরে থাকে। এতবড় নদীতে তারা বাহির হইত কি করিয়া! তাদের নদীতে পাঠাইয়া মেয়েরা ঘরে থাকিতই বা কেমন করিয়া! তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামীপুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বৌরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।

বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাঁচ। সাদা, ঢেউ-তোলা জটা। কোন্ মহাস্থবিরের চুম্বন-রস-সিক্ত বাংলা। তার জটাগুলি তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়া সাপ-খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিম্নাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এ সবই নদী।

সবগুলি নদীর রূপ এক নয়। উহাদের ব্যবহার এবং উহাদের সহিত ব্যবহার তাও বিভিন্ন রকমের। সবগুলি নদীই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে আসে। কিন্তু এ কাজে আসার নানা ব্যতিক্রম আছে। বড় নদীতে সওদাগরের নৌকা আসে পাল উড়াইয়া। উহার বিশাল বুকে জেলেরা সারাদিন নৌকা লইয়া ভাসিয়া থাকে। নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে। মাছ ধরে। সব বিষয়ে একটা কঠোর রূপ এখানে প্রকটিত। তীরে তীরে বালুচর, তাল নারিকেল সুপারির বাগ। স্রোতের খরায় তীরের মাটি কাটে, ধ্বসে। ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভাঙিয়া খসিয়া পড়ে। গৃহস্থালি ভাঙে। খেত-খামার ভাঙে, তাল-নারিকেল, সুপারির গাছগুলি সারি বাঁধিয়া ভাঙিয়া পড়ে। ক্ষমা নাই। ভাঙ্গাগড়ার এক রুদ্র দোলার দোলনায়—করাল এক চিত্তচঞ্চল ক্ষিপ্ত আনন্দ....সে-ই এক ধরনের শিল্প।

শিল্পের আরেকটা দিক আছে। সৌম্য শান্ত করুণ স্নিগ্ধ প্রসাদ-গুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করিয়াছে।

এ-শিল্পী যে-ছবি আঁকে তা বড় মনোরম। তীর-ঘেঁষিয়া সব ছোট ছোট পল্লী। তারপর জমি। তাতে অঘ্রাণ মাসে পাকা ধানের মৌসুম। মাঘ মাসে সর্ষেফুলের অজস্র হাসি। তারপর পল্লী। ঘাটের পর ঘাট। সে ঘাটে জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে ডুবাইয়া চুবাইয়া তোলে। বৌ-ঝিরা সব কলসী লইয়া ডুব দেয়। পরক্ষণে ভাসিয়া উঠে। অল্প দূর দিয়া নৌকা যায়, একের পর এক। কোনটাতে ছই থাকে, কোনোটাতে থাকে না। কোনো কোনো সময় ছইয়ের ভিতর নয়া বউ থাকে। বাপের বাড়ি থেকে স্বামী তার বাড়িতে লইয়া যায়; তখন ছইয়ের এ-পারে ও-পারে থাকে বউয়েরই শাড়ি-কাপড়ের বেড়া। স্বামীর বাড়ি থেকে যখন বাপের বাড়ি যায়, তখন কিন্তু কাপড়ের বেড়া থাকে না। থাকে না তার মাথায় ঘোমটা। ছইয়ের বাহিরে বসিয়া ঘাটগুলির দিকে চাহিয়া থাকে সে। স্বামীর বাড়ির ঘাট অদৃশ্য না হইলে কিন্তু সে ছইয়ের বাহিরে আসে না।

তারা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায় অনেক হাসি-কান্নার ঢেউ বুকে লইয়া। যে বৌ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল। এরা সব ভিন্ জাতের বৌ। বামুন, কায়েত, নানা জাতের। জেলেদের বৌরা জেলে-নৌকাতেই যায়। তারা অত সুন্দরীও নয়। অত তাদের আবরুরও দরকার হয় না। কিন্তু ওরা খুব সুন্দরী। জেলের ছেলেরা কপালের দোষ দেয়। অমন সুন্দর বৌ তাদের জীবনে কোনদিন আসিবে না। ভালো করিয়া চায় তারা। ভালো করিয়া চাইতে পারিলে প্রায়ই ছইয়ের ফাঁক দিয়া বাতাসে শাড়িটা একটু সরিয়া গেলে, চকিতে তারই ফাঁক দিয়া, টুকটুকে একখানা মুখ আর এক জোড়া চোখ চোখে পড়িবে। বৌয়ের অভিভাবক ছইয়ের দুই মুখে গুঁজিয়া দিয়াছে শাড়ির বেড়া; তাতে বৌকে সকলে দেখিতে পারে না, কিন্তু বৌ সকলকে দেখিতে পায়। তিতাসের জলে অনেক মাছ। মালোর ছেলের স্ফূর্তি রসাইয়া ওঠে। জালের দিকে চোখ রাখিয়াই গাহিয়া ওঠে, 'আগে ছিলাম ব্রাহ্মণের মাইয়া করতাম শিবের পূজা, জালুয়ার সনে কইরা প্রেম কাটি শণের সূতা রে, নছিবে-এই ছিল।' বৌ ঠিক শুনিতে পাইবে।

গ্রামের পর খাল। নৌকাখানা সেখানে ঢুকিয়া পড়ে। সাপের জিহ্বার মত চকিতে সে-খাল গ্রামখানাকে ঘুরিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। হয়ত আরো দূরে গিয়াছে। আরো কয়েকখানি গ্রামের পাশ দিয়া জের টানিতে টানিতে গিয়া, তারই কোনটাতে বৌকে লইয়া যাইবে। খালের পাড়েই বাড়ি। দুষ্টু ছেলে-পিলেরা তৈরি হইয়া আছে, বৌকে কি করিয়া চমকাইয়া দিবে। তৈরি হইয়া আছে হয়ত আরও কেউ। খালটা এইখানে শুকাইয়া গিয়াছে। এইখানে নৌকা হইতে উঠিয়া বৌকে খানিকটা হাঁটিয়া যাইতে হইবে। শিল্পী শান্ত সবুজ সুজির রঙে ক্ষেতগুলির বুকে-বুকে যে নক্সা আঁকিয়া রাখিয়াছে তাহারই আল দিয়া বৌকে হাঁটিতে হইবে। তিতাসের তীরে না থাকার কি কষ্ট। যে-বৌয়ের যাওয়ার বাড়ি একেবারে তিতাসের তীরে, কর্ম-চঞ্চল ঘাটখানাতে তার নৌকা লাগে। দশ-জোড়া নারীর চোখের দরদে স্নান করিয়া সে বৌ নৌকা থেকে নামে। তারপর বাপের বাড়ি হইলে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট ভাইবোনেদের বুকে চাপিয়া ধরে। আর স্বামীর বাড়ি হইলে পিঠের কাপড় সুদ্ধ টানিয়া তুলিয়া ঘোমটা বড় করে, তারপর আগে-পিছে দুই-চারিজন নারীর মাঝখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে জড়িত পায়ে ঘাটের পথটুকু অতিক্রম করে।

পথটুকু অতিক্রম করিয়া জমিলা বাহির-বাড়ির মসজিদ-লগ্ন মক্তবের কোণে পা দিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। তার স্বামী মাঝির সঙ্গে তখনও কেরায়া নিয়া দরদস্তর করিতেছে। দুই-এক আনা ফেলিয়া দিলেই মাঝি খুশি হইয়া চলিয়া যায়। বুড়া মাঝি। যা খাটিয়াছে! সঙ্গে মাত্র দুই ননদ। তাও ননদের ছোট সংস্করণ! সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভয় করে না বুঝি! লোকটা যেন কি! তাদের আসিতে বলিয়া নিজে আসিতেছে না। বাড়ির পথে বড় বড় ঘাস। সাপ বাহির হইয়াছে হয়ত। ব্যাঙ মনে করিয়া এখনই জমিলার পায়ের বুড়ো আঙুলে যদি ছোবল দেয়!

ছমির মিয়া হিসাবী লোক। কাউকে এক পয়সা ঠকায় না। বেহুদা কাউকে এক পয়সা বেশিও দেয় না। সব কাজ ওজন করিয়া করে। মাঝি হার মানিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলে, ছমিরের মনে অনাহূত এক ছোপ প্রসন্নতা রঙ গুলাইয়া দিল। আজ তার কিসের রাত! এ রাতে কেউ কোন দিন মাঝিকে ঠকায়! কেউ যেন না ঠকায়!

মাঝি দশ মিনিট ঝগড়া করিয়া যাহা পায় নাই, এক মিনিট চুপ করিয়া তাহার চারিগুণ পাইল! চক্‌চকে সিকিটা সাদা নদীর খোলসা অল্প-আলোকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া লগিতে ঠেলা দিল।

ছমির কাছে আসিলে জমিলার মনে হইল—এতক্ষণ এতগুলি সাপ তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটিকে ঘিরিয়া কিল্‌বিল্ করিতেছিল, এখন সব কয়টা সরিয়া পড়িয়াছে। কি ভাল তার মানুষটি!

কিন্তু তার চাইতেও ভাল একজনকে সে দেখিয়া আসিয়াছে সেই মালোপাড়ার ঘাটে। বড় ভাল লাগিয়াছে তার মানুষটাকে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সেও কি তেমনি ভালবাসে নাই? কেমন অনুরাগের ভরে চাহিয়াছিল। আর কেমন মানুষ গো! একবার দেখিয়াই মনে হইল যেন কতবার দেখিয়াছি। বেলা ফুরাইতেছে। একটু একটু বাতাস বহিতেছে। আর সেই বাতাসে আমার শাড়ির বেড়া খুলিয়া গেল, আর তখনই তাকে আমি দেখিতে পাইলাম। যদি না খুলিত, তবে ত দেখিতেই পাইতাম না।

এমনি কত লোককে যে আমরা দেখিতে পাই না। অথচ দেখিতে পাইলে এমনি করিয়া আপন হইয়া যাইত। আমরা কি আর দেখি? যে দেখাইবার, সে-ই দেখায়! তা না হইলে সে যখন জলে ঢেউ খেলাইয়া কলসী ডুবাইল, ঠিক সেই সময়ে আমার শাড়ির বাঁধন খুলিল কেন? বর্ষায় আমার বাপ ওদের গাঁয়ে ভিজা নালিতার আঁটি-বোঝাই নৌকা লইয়া যায়, পাট ছাড়াইবার জন্য। আবার যখন বাপের বাড়ি যাইব, বাপকে বলিয়া রাখিব, এইরকম এইরকম মেয়েটি, দেখিতে ঠিক আমার মত; তার বাপকে বলিয়া দেখিও, আমার মেয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে সই পাতিতে চায়, তুমি রাজি আছ কিনা।

আগে যা বলিতেছিলাম।

—এ শিল্পী মহাকালের তাণ্ডব-নৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ-শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পী মেঘনা-পদ্মা-ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করে।

এ শিল্পী যে ছবি আঁকে তা বড় মনোরম। তীর ঘেঁষিয়া সব ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামের পর জমি। অগ্রহায়ণে পাকা ধানের মরসুম। আর মাঘে সর্ষেফুলের হাসি। তারপর আবার গ্রাম। লতাপাতা গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা সবুজ গ্রাম। ঘাটের পর ঘাট। সে ঘাটে সব জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস-নুদুস শিশু ছেলেমেয়েকে চুবাইয়া তোলে। আর বৌ-ঝিয়েরা কলসী লইয়া ডুব দেয়। অল্প একটু দূর দিয়া নৌকা যায় একের পর এক।...

তিতাস একটি নদীর নাম। এ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তার তীরের লোকেরা জানে না। জানিবার চেষ্টা কোনদিন করে নাই, প্রয়োজন বোধও করে নাই। নদীর কত ভাল

নাম থাকে—মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, সরস্বতী, যমুনা। আর এর নাম তিতাস। সে কথার মানে কোনদিন অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নদী এ-নামে যত প্রিয়, ভালো একটা নাম থাকিলে তত প্রিয় হইতই যে, তার প্রমাণ কোথায়!

ভাল নাম আসলে কি? কয়েকটা আখরের সমষ্টি বৈ ত নয়। কাজললতা মেয়েটিকে বৈদুর্যমালিনী নাম দিলে, আর যাই হোক, এর খেলার সাথীরা খুশি হইবে না। তিতাসের সঙ্গে নিত্য যাদের দেখাশুনা, কোনো রাজার বিধান যদি এর নাম চম্পকবতী কি অলকানন্দা রাখিয়া দিয়া যায়, তারা ঘরোয়া আলাপে তাকে সেই নামে ডাকিবে না, ডাকিবে তিতাস নামে।

নামটি তাদের কাছে বড় মিঠা। তাকে তারা প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাই এই নামের মালা তাদের গলায় ঝুলানো।

শুরুতে কে এই নাম রাখিয়াছিল, তারা তা জানে না। তার নাম কেউ কোনদিন রাখিয়াছে, এও তারা ভাবে না। ভাবিতে বা জানিতেও চায় না। এ কোনদিন ছিল না, এও তারা কল্পনা করিতে পারে না। কবে কোন্ দূরতম অতীতে এর পারে তাদের বাপ পিতামহেরা ঘর বাঁধিয়াছিল একথা ভাবা যায় না। এ যেন চির সত্য, চির অস্তিত্ব নিয়া এখানে বহিয়া চলিয়াছে। এ সঙ্গী তাদের চিরকালের। এ না হইলে তাদের চলে না। এ যদি না হইত, তাদের চলিতও না। এ না থাকিলে তাদের চলিতে পারে না। জীবনের প্রতি কাজে এ আসিয়া উঁকি মারে। নিত্যদিনের ঝামেলার সহিত এর চিরমিশ্রণ।

নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে। কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নেই। নদীরও বহার শেষ নাই। কতকাল ধরিয়া কাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়াছে! তার বুকে কত ঘটনা ঘটিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে। কত মানুষ বিশ্রী ভাবে মরিয়াছে—কত মানুষ না খাইয়া মরিয়াছে—কত মানুষ ইচ্ছা করিয়া মরিয়াছে—আর কত মানুষ মানুষের দুষ্কার্যের দরুণ মরিতে বাধ্য হইয়াছে। আবার শত মরণকে উপেক্ষা করিয়া কত মানুষ জন্মিয়াছে। তিতাসও কতকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তার চলার মধ্যে তাঁর তীরে তীরে কত মরণের কত কান্নার রোল উঠিয়াছে। কত অশ্রু আসিয়া তার জলের স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। কত বুকের কত আগুন, কত চাপা বাতাস তার জলে নিবিয়াছে। কতকাল ধরিয়া এ-সব সে নীরবে দেখিয়াছে, দেখিয়াছে আর বহিয়াছে। আবার সে দেখিয়াছে কত শিশুর জন্ম, দেখিয়াছে আর ভাবিয়াছে। ভাবী নিগ্রহের নিগড়ে আবদ্ধ এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না, হাসির নামে কত বিষাদ, সুখের নামে কত ব্যথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

ওরা কারা? ওরা মালোদের ছেলেরা। আর মালোদের মেয়েরা। ওরা তারা নয় যাদের দেয়াল-ঘেরা বাড়ি, সামনে আছে পুষ্করিণী, পাশে আছে কুয়া, যাদের আঙিনার পার থেকেই শুরু হইয়াছে পথ—সে-পথ গিয়াছে শহরের দিকে, পাশের গাঁগুলিতে এক একটা শাখাপথ ঢুকাইয়া দিয়া। সে পথে ঘোড়ার গাড়ি চলে।

আর মালোদের ঘরের আঙিনা থেকে শুরু হইয়াছে যত পথ সে-সবই গিয়া মিশিয়াছে তিতাসের জলে। সে-সব পথ ছোট ছোট। পথের এধার থেকে বুকের শিশু কাঁদিয়া উঠিলে ওধার থেকে মা টের পায়। এধারের তরুণীর বুকের ধুক্‌ধুকানি ওধারের

নৌকার মাচানে বসিয়া মালোদের তরুণরা শুনিতে পায়। এপথ অতি খর্ব। দীর্ঘপথ গিয়াছে মাঝ-তিতাসের বুক চিরিয়া। সে পথে চলে কেবল নৌকা।

তিতাস সাধারণ একটা নদী মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা, তার বুকে যুযুধান দুই দলের বুকের শোণিত মিশিয়া ইহাকে কলঙ্কিত করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই?

পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস হয়ত কেউ জানে, হয়ত কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য। এর পারে পারে খাঁটি রক্তমাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানুষিকতার অনেক চিত্র আঁকা হইয়াছে। হয়ত তিতাসই সেগুলি মুছিয়া নিয়াছে। কিন্তু মুছিয়া নিয়া সবই নিজের বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। হয়ত কোনোদিন কাহাকেও সেগুলি দেখাইবে না, জানাইবে না। কারো সেগুলি জানিবার প্রয়োজনও হইবে না। তবু সেগুলি আছে। যে-আখর কলার পাতায় বা কাগজের পিঠে লিখিয়া অভ্যাস করা যায় না, সে-আখরে সে সব কথা লেখা হইয়া আছে। সেগুলি অঙ্গদের মত অমর। কিন্তু সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ। কে বলে তিতাসের তীরে ইতিহাস নাই।

আর সত্য তিতাস-তীরের লোকেরা! তারা শীতের রাতে কতক কতক কাঁথার তলাতে ঘুমায়। কতক জলের উপর কাঠের নৌকায় ভাসে। মায়েরা, বোনেরা আর ভাই-বৌয়েরা তাদের কাঁথার তলা থেকে জাগাইয়া দেয়। তারা এক ছুটে আসে তিতাসের তীরে। দেখে, ফরসা হইয়াছে; তবে রোদ আসিতে আরও দেরি আছে। নিস্ত রঙ্গ স্বচ্ছ জলের উপর মাঘের মৃদু বাতাস ঢেউ তুলিতে পারে না। জলের উপরিভাগে বাষ্প ভাসে—দেখা যায়, বুঝি অনেক ধোঁয়া। তারা সে ধোঁয়ার নীচে হাত ডোবায়, পা ডোবায়। অত শীতেও তার জল একটু উষ্ণ মনে হয়। কাঁথার নীচের মায়ের বুকের উষ্ণতার দোসর এই মৃদু উষ্ণতাটুকু না পাইলে তারা যে কি করিত।

শরতে আকাশের মেঘগুলিতে জল থাকে না। কিন্তু তিতাসের বুকে থাকে ভরা-জল। তার তীরের ডুবো মাঠময়দানে সাপলা-শালুকের ফুল নিয়া, লম্বা লতানে ঘাস নিয়া, আর বাড়ন্ত বর্ষাল ধান নিয়া থাকে অনেক জল। ধানগাছ আর সাপলা-শালুকের লতাগুলির অনেক রহস্য নিবিড় করিয়া রাখিয়া এ জল আরও কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া থাকে। তারপর শরৎ শেষ হইয়া আসে। কে বুঝি বৃহৎ চুমুকে জল শুষিতে থাকে। বাড়তি জল শুকাইয়া গিয়া তিতাস তার স্বাভাবিক রূপ পায়। যে-মাটি একদিন অথৈ জলের নীচে থাকিয়া মাখনের মত নরম হইয়া গিয়াছিল, সে মাটি আবার কঠিন হয়। আসে হেমন্ত।

হেমন্তের মুমূর্ষু অবস্থায় কখন ধানকাটার মরসুম শুরু হইয়া গিয়াছিল। পারে সব খানেই গ্রাম নাই। এক গ্রাম ছাড়াইয়া আরেক গ্রামে যাইতে মাঝে পড়ে অনেক ধানজমি। জমির চাষীরা ধানকাটা শেষ করিয়া ভারে ভারে ধান এদিক ওদিকের

গ্রামগুলিতে বহিয়া নিয়া চলে। তারা তিতাসের ঠিক পাড়ে থাকে না। থাকে একটু দূরে। একটু ভিতরের দিকে। সেখান হইতে মাঘের গোড়ায় আবার তারা তীরে তীরে সর্ষে বেগুনের চারা লাগায়। তীরের যেখানে যেখানে বালিমাটির চর, সেখানে তারা আলুর চাষ করে। এ মাটিতে সকরকন্দ আলু ফলায় অজস্র।

জোবেদ আলীর জোয়ান ছেলেরা ওপারে আলু লাগাইয়া তিন ভাইয়ে এক-সমানে আলী আলী আলী বলিয়া তাদের লম্বা ডিঙিখানি ভাসাইয়া তাতে উঠিয়া পড়িল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হালের চারিজোড়া বলদ ও দুইজোড়া ষাঁড় পার করাইতে হইবে; সে কাজ করিবে তাদের মুনীস-দুইজন। সারা বছর তারা জোবেদ আলীর বাড়িতে জন খাটে। খায় দায়, মাহিনা পায়। সারাদিন—ভোর হইতে রাত-অবধি খাটে, রাতের খানিকটা সময় গিয়া নিজেদের বাড়িতে পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আসে দিনমানে আর দেখা হয় না। পরিবারেরাও এর বাড়ি ওর বাড়ি ধান ভানিয়া পাট গুটাইয়া কিছু-কিঞ্চিৎ উপায় করে। এইভাবে দিন গুজরায় তারা। কাজেই জোবেদ আলীর ছেলেরা যখন আলী আলী বলিয়া নৌকায় নদী পার হইতে থাকে, মুনীস-দুইজন তখন চারিজোড়া বলদ ও দুইজোড়া ষাঁড়ের অনিচ্ছুক দেহমন শীতের জলে নামাইয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া গরুদের ল্যাজে ধরিয়া আল্লা আল্লা মোমিন বলিয়া সাঁতার দেয়।

সকালে এপার হইতে ওপার যাইবার বেলা লাঙল কাঁধে করিয়া সর্ষে ক্ষেত-গুলির আলের উপর দিয়া গিয়াছে। তীর-অবধি সর্ষেফুলের হলদে জৌলুষে হাসিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইয়াছিল কে বুঝি তিতাসের কাঁধে নক্সা-করা উড়ানি পরাইয়া রাখিয়াছে। অর্বাচীন গরুগুলি পাছে তাতে মুখ দেয়, তার জন্য কত না ছিল সতর্কতা। এখন এ-পারে উঠিয়া গায়ের জল মুছিতে মুছিতে চারিদিকে আঁধার হইয়া আসে।

আঁধারে সব একাকার, গরু কোথায় মুখ দিবে! দিনের শ্রমে শ্রান্ত গরু। আর শ্রান্ত এ দুইজন মানুষ। সারাদিন অসুরের বল নিয়া ক্ষেতে খাটিয়াছে। এবার বাড়িতে যাইবে। তাই এত ব্যস্ততা। কিন্তু কার বাড়িতে যাইবে! তাদের প্রভু জোবেদ আলীর বাড়িতে। নিজের বাড়িতে নয়। পাখিরাও এ সময় নিজের বাসায় যায়। তারা যাইবে মুনিবের বাড়িতে। গিয়া গোয়ালে গরু বাঁধিবে। ঘাস কাটিবে। মাড় দিবে, খইল ভুষি দিবে। জোতদার চাষীর বাড়িতে কত কাজ। এটা সেটা টুকিটাকি কাজ করিতে করিতে হাজারগণ্ডা কাজ হইয়া যায়। প্রকাণ্ড চওড়া উঠান। চার ভিটায় বড় বড় চারিটা ঘর। বাহিরের দিকে গোয়াল-সুদ্ধ আরো তিন-চারিটা ঘর। দড়ি পাকানো হইতে বেড়াবাঁধা পর্যন্ত এই এতবড় বাড়িতে কত কাজ যে এই দুইজনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। কাজ করিতে করিতে রাত বাড়িয়া চলে। এক সময় ডাক আসে—'অ করমালী অ বন্দালী খাইয়া যাও!'

খাওয়ার পর কাঁধের গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে পথে নামিয়া বন্দে আলী বলে, 'ভাই করমালী নিজে ত খাইলাম ঝাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক ভাত আজ জুটল নি, কি জানি?'

করমালী বলে, 'বন্দালী ভাই, কইছ কথা মিছা না। তোমার আমার ঘরের মানুষ! তোমার আমার ঘরই নাই, তার আবার মানুষ। দয়া কইরা রাইতে থাকতে দেয়—থাকি;

ফজরে উইঠ্যা মুনিবের বাড়ি গিয়া ঘুমের আলস ভাঙি। ঘরের সাথে এইত সমন্দ।–কি খায়, কি পিন্ধে কোনোদিন নি খোঁজ রাখতে পারছি? তা যখন পারছি না তখন তোমার আমার কিসের ঘর আর কিসের মানুষ।'

বন্দে আলী খানিক ভাবিয়া নিয়া বলে, 'বেবাকই বুঝি করমালী ভাই। তবু মুনিবের ঘরে পঞ্চ সামিগ্রী দিয়া খাইবার সময় ঘরের কথা মনে হয়; গলায় ভাত আইটকা যায় আর খাইতে পারি না।'

শুনিয়া করমালী বলে, 'আমার কিন্তু তাও মনে পড়ে না। হ, আগে মাঝে মাঝে পড়ত। এখন দেখি, পড়ে না যে, ইটাই ভাল।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বন্দে আলী বলে, 'সারাদিনের মেহ্নতে নাস্তানাবুদ হইয়া ঘরে যাই, গিয়া দেখি ছিঁড়া চাটাইয়ে শুইয়া আছে। ঝুপ কইরা তার পাশে শুইয়া পড়ি; জাগাই না।–একদিন তার একখানা হাত আইয়া আমার বুকের উপর পইড়া যায়। হাতখান হাতে লইয়া দেখি, কি শক্ত! কড়া পড়ছে, পরের বাড়ির ধান ভানতে ভানতে।'

করমালীর বউ ধান ভানে না। লোকের বাড়ি-বাড়ি কাঁথা সেলাই করিয়া দেয়। কাঁথা সেলাইয়ের ধুম পড়িয়াছে। তার মোটে অবসর নাই। ডান হাতের সুঁচের ফোঁড় বাঁ হাতের আঙুলের ডগায় তুলিতে তুলিতে আঙুলে হাজার কাটাকুটি দাগ পড়িয়াছে। করমালী প্রায়ই ঘরে গিয়া দেখে বিছানা খালি।

একটু বিমর্ষ হাসি হাসিয়া করমালী বলিল, 'বন্দালী ভাই, তুমি ত গিয়া দেখ, বউ ঘুমাইয়া রইছে। আমি ছিঁড়া কাঁথায় গাও জড়াইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ির কাঁথা সিলাই করে আর সে সূঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে! তার আইতে আইতে রাইত শেষহীন হয়–আগ-আন্ধাইরা রাইত্–দেখি আন্ধাইর গিয়া চাঁদ উঠছে–ভাঙা বেড়ার ফাঁকে দিয়া রোশনি ঢুকে, কেডায় যেমুন ফক ফক কইরা হাসে।'

কথা শেষ হইলেও করমালীর মুখের ম্লান হাসিটুকু মিলাইয়া যায় না। বন্দে আলীর বুক ছাপাইয়া আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়। কোনোরকমে সেটা চাপা দিতে দিতে বলে, 'করমালী ভাই, আছ ভাল। কামে-কাজে থাক, খাও দাও। তার কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে খালি শুইবার সময়। আমার হইছে বিষম জ্বালা! উঠতে বইতে খালি মনে হয় তারে আমি দুখ দিতাছি। একটু সুখ না, শান্তি না–আমরা কি অভাইগ্যা ভাই করমালী!'

করমালী প্রায় দার্শনিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে বলিল, 'আমার ভাই অত কথায় কথায় শ্বাস পড়ে না! তুমি আমি বড় মুনিবের কাম করি, ভাল খাই! বউরা ছোট মুনিবের কাম করে, ভাল খাইতে পারে না।–আম্রার জমি নাই, জিরাত নাই, পরের জমি চইয়া জান কাবার করি। যদি জমি থাকত তা' অইলে বৌরা নিজেরার ঘরে খাটত, তোমারে আমারে মুনিবের মত দেখত।'

বন্দে আলীর মন এই ধরনের চিন্তায় সায় দেয় না! সে ভাবে, করমালীর প্রেমিক মন বড় নিষ্ঠাহীন। তার মতে স্ত্রীর প্রতি প্রেম ভালবাসা এসবের বুঝি কোনো দাম নাই।

হাঁ দাম নাই-ই তো। তার মতো ভূমিহীন চাষীর কাছে এসবের কোনো দাম নাই। জীবনে যদি বসন্ত আসে তবেই এসবের দাম চোখে ধরা পড়ে। তাদের জীবনে বসন্ত আসে কই!

আসে বসন্ত। এই সময় মাঠের উপর রঙ থাকে না। তিতাসের তীর ছুঁইয়া যাদের বাড়িঘর তারা জেলে। তিতাসের মাছ ধরিয়া তারা বেচে, খায়। তাদের বাড়ীপিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। বসন্ত তাদের মনে রঙের মাতন জাগায়।

বসন্ত এমনি ঋতু—এই সময় বুঝি সকলের মনেই প্রেম জাগে। জাগে রঙের নেশা। জেলেরা নিজে রঙ মাখিয়া সাজে—তাতেই তৃপ্তি পায় না। যাদের তারা প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাদেরও সাজাইতে চায়। তাতেও তৃপ্তি নাই। যাদের প্রিয় বলিয়া মনে করে তারাও তাদের এমনি করিয়া রঙ মাখাইয়া সাজাক তাই তারা চায়। তখন আকাশে রঙ, ফুলে ফুলে রঙ, পাতায় পাতায় রঙ। রঙ মানুষের মনে মনে। তারা তাদের নৌকাগুলিকেও সাজায়। বৌ-ঝিরা ছোট থালিতে আবির নেয়, আর নেয় ধানদূর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকাতে যে পুরুষ থাকে সে থালির আবির নৌকার মাঝের গুরায় আর গলুইয়ে নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধানদূর্বাগুলি দুই অঙ্গুলি তুলিয়া ভক্তিভরে আবির-মাখানো জায়গাটুকুর উপর রাখে। এই সময়ে বৌ জোকার দেয়। সে-আবিরের রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশি বাকি নাই। তখনো আকাশ বড় রঙিন। —তিতাসের বুকের আরসিতে যে-আকাশ নিজের মুখ দেখে, সেই আকাশ।

চৈত্রের খরার বুকের বৈশাখের বাউল বাতাস বহে। সেই বাতাসে বৃষ্টি ডাকিয়া আনে। আকশে কালো মেঘ গর্জায়। লাঙল-চষা মাঠ-ময়দানে যে ঢল হয়, ক্ষেত উপচাইয়া তার জল ধারা-স্রোতে বহিয়া তিতাসের উপর আসিয়া পড়ে। মাঠের মাটি মিশিয়া সে-জলের রঙ হয় গেরুয়া। সেই জল তিতাসের জলকে দুই এক দিনের মধ্যেই গৈরিক করিয়া দেয়। সেই কাদামাখা ঠাণ্ডা জল দেখিয়া মালোদের কত আনন্দ। মালোদের ছোট ছোট ছেলেদেরও কত আনন্দ। মাছগুলি অন্ধ হইয়া জালে সহজে আসিয়া ধরা দেয়। ছেলেরা মায়েরা শাসন না মানিয়া কাদাজলে দাপাদাপি করে। এই শাসন-না-মানা দাপাদাপিতে কত সুখ! খরার পর শীতলের মাঝে গা ডুবাইতে কত আরাম।

প্রবাস খণ্ড

তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্‌লি—সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।

নদীটা যেখানে ধনুকের মত বাঁকিয়াছে, সেইখান হইতে গ্রামটার শুরু। মস্ত বড় গ্রামটা,—তার দিনের কলরব রাতের নিশুতিতেও ঢাকা পড়ে না। দক্ষিণ পাড়াটাই গ্রামের মালোদের।

মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়িল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘমণ্ডলের ব্রত।

এ-পাড়ার কুমারীরা কোনোকালে অরক্ষনীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়। তবু এই বিবাহের জন্যে তারা দলে দলে মাঘমণ্ডলের পূজা করে।

মাঘ মাসের ত্রিশদিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করিয়াছে; প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়িতে আসিয়া ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়া সিঁড়ি পূজিয়াছে, মন্ত্রপাঠ করিয়াছে ঃ 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটির জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।' আজ তাদের শেষ ব্রত।

তরুণ কলাগাছের এক হাত-পরিমাণ লম্বা করিয়া কাটা ফালি, বাঁশের সরু শলাতে বিঁধিয়া ভিত করা হয়। সেই ভিতের উপর গড়িয়া তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি-ঘর। আজিকার ব্রত শেষে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথায় করিয়া তিতাসের জলে ভাসাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-কাঁসি বাজিবে, নারীরা গীত গাহিবে।

দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী পড়িল বিষম চিন্তায়। সব বালিকারই কারো দাদা, কারো বাপ চৌয়ারি বানাইতেছে,—ফুলকাটা, ঝালরওয়ালা, নিশান-উড়ানো কত সুন্দর সুন্দর চৌয়ারি। সংসারে তার একটি ভাইও নাই যে কোনরকমে একটা চৌয়ারি খাড়া করিয়া তার মাঘব্রতের শেষ-দিনের অনুষ্ঠানটুকু সফল করিয়া তুলিবে। বাপের কাছে বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাপ গম্ভীর মুখে আগুন-ভরা মালসা, টিকা-তামাক-ভরা বাঁশের চোঙা, আর দড়িবাঁধা-কল্‌কে-ওয়ালা হুকা লইয়া নৌকায় চলিয়া গিয়াছে। 'কাঠায়' লাগিয়া কাল তার জাল ছিঁড়িয়াছে, আজ সারা দুপুর বসিয়া বসিয়া গড়িতে হইবে।

মেয়ের এই মর্মবেদনায় মার মন দয়ার্দ্র হইল। তার মনে পড়িয়া গেল কিশোর আর সুবলের কথা। দুইটি ছেলেতে গলায় গলায় ভাব। এইটুকু বয়সেই ডানপিটে বলিয়া পাড়াতে নামও করিয়াছে। বাসন্তীর মার ভালই লাগে এই ডানপিটে ছেলেদের।

ভয় ডর নাই, কোনো কাজের জন্য ডাকিলে উড়িয়া আসে, মা বাপ মানা করিলেও শোনে না। বিশেষতঃ কিশোর ছেলেটি অত্যন্ত ভাল, যেমন ডানপিটে তেমনি বিবেচক।

বাসন্তীর মার আহ্বানে কিশোর আর সুবল বাসন্তীদের দাওয়ায় বসিয়া এমন সুন্দর চৌয়ারি বানাইয়া দিল যে যারা দেখিল তারাই মুগ্ধ হইয়া বলিল,—বাসন্তীর চৌয়ারি যেন রূপে ঝলমল করিতেছে। নিশানে ঝালরে ফুলে উজ্জ্বল চৌয়ারিখানার দিকে গর্বভরে চাহিতে চাহিতে বাসন্তী উঠান-নিকানো শেষ করিলে, তার মা বলিল, 'উঠান-জোড়া আলিপনা আকমু; অ বাবা কিশোর, বাবা সুবল, তোমরা একটা হাতি একটা ঘোড়া, আর কয়টা পক্ষী আইক্যা দেও।'

বাল্যশিক্ষা বই খুলিয়া তাহারা যখন উঠানের মাটিতে হাতী ঘোড়া আঁকিতে বসিল, বাসন্তীর তখন আনন্দ ধরে না। সারা মালোপাড়ার কারো উঠানে হাতীঘোড়া নাই; কেবল তারই উঠানে থাকিবে। শিল্পীদের অপটু হস্তচালনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বাসন্তী এক সময় খুশিতে হাসিয়া উঠিল।

আলিপনার মাঝখানে বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়া একখানি চৌকিতে বসিল। ছাতাখানা সে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে লাগিল এবং তার মা ছাতার উপর খই আর নাড়ু ঢালিয়া দিতে লাগিল; হরির লুটের মত ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া সে-নাড়ু ধরিতে লাগিল। সবচেয়ে বেশি ধরিল কিশোর আর সুবল।

নারীরা গীত গাহিতেছে ঃ 'সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কালাচাঁদ আইলো।' বহুদিনের পুরানো গীত। সাত বছর আগে বাসন্তী যখন পেটে আসে, তখনও তারা এই গানই গাহিত উৎসবের এই দিনটিতে। আজও উহাই গাহিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে দুখাই বাদ্যকর ঢোল ও তার ছেলে কাঁসি বাজাইতেছে। প্রতি বছর একই রকম তালে তারা ঢোল আর কাঁসি বাজায়। আজও সেই রকমই বাজাইতেছে। সবই একই রকম আছে, পরিবর্তনের মাঝে কেবল দুখাইর ঢোলটা আরো পুরানো হইয়াছে, তার ছেলেটা আরো বড় হইয়াছে।

বাসন্তীর মাথায় জবজবে তেল, পরনে মোটা শাড়ি। এই কালকের থেকেই যেন আজ তাকে অনেকখানি বড় দেখাইতেছে! এই ভাবেই বাসন্তী আরো বাড়িয়া উঠিবে, এই ভাবেই কিশোরও বড় হইয়া উঠিবে, সুবলও বড় হইয়া উঠিবে। তবে কিশোর ছেলেটি অনেক ভাল, বাসন্তীকে তার পাশেই ঠিক মানাইবে।—বাসন্তীর মার চিন্তায় বাধা পড়িল মেয়ের ডাকে : 'মা, ওমা, দেখ সুবলদাদা কিশোরদাদার কাণ্ড! আমি চৌয়ারি জলে ছাড়তে-না-ছাড়তে তারা দুইজনে ধরতে গিয়া কি কাইজ্যা। এ কয় আমি নিমু, হে কয় আমি নিমু। ডরে আর কেউ কাছেও গেল না। শেষে কি মারামারি! আমি কইলাম, দুইজনে মিল্যা বানাইছ, দুইজনেই নিয়া রাইখ্যা দেও। মারামারি কর কেনে? শুইন্যা কিশোর দাদা ভালোমানুষের মত ছাইড়া দিল। আর সুবলদাদা করল কি—মাগ্‌গো মা, দুই হাতে মাথাত্ তুইল্যা দৌড়!'

সেদিন মালোপাড়ার ঘাটে ঘাটে সমারোহ। ঢোল সানাই বাজিতেছে, পুরনারীরা গান গাহিতেছে, দুপুরের রোদে তিতাসের জল চিক্ চিক্ করিতেছে। মালোর কুমারীরা আন্‌কোরা শাড়ি পরিয়া, তেল-জবজবে মাথায় চিত্র-বিচিত্রি চৌয়ারি তুলিয়া, জলে

ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু মালোর ছেলেদের তর সহিতেছে না। মেয়েরা অনুনয় করিতেছে, এখনই ধরিও না, জলে আগে ভাসাই, তখন ধরিও।

সব চৌয়ারিই জলে ভাসিল। ছেলেরা দৌরাত্ম্য করিয়া প্রায় সব কটাকেই ধরিল, কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িল, এবং ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় মাথায় করিয়া বাড়িতে ফিরিল। কিন্তু তাহাদের দস্যুতামুক্ত হইয়া কয়েকখানা চৌয়ারি তিতাসের মন্দ স্রোতে আর মৃদু তরঙ্গে অনেক বাহির-জলে চলিয়া গেল। তীর হইতে দেখা গেল যেন জলের উপর এক একটা ময়ূর পেখম ধরিয়াছে। কিন্তু তাদের যারা ভাসাইল, তারা সুখী হইল কি? ছেলেরাই যদি ধরিতে না পারিল, তবে মেয়েদের উহা ভাসাইবার সার্থকতা কই?

কিশোরের জন্য বাসন্তী মনে বড় ব্যথা পাইল। এমন সুন্দর চৌয়ারিটা সে পাইল না, পাইল সুবলে। কিন্তু সে ছাড়িয়া দিল কেন? এমন নির্বিবাদে, ভালোমানুষের মত ছাড়িয়া দিল! কিন্তু মনে যে কষ্ট পাইয়াছে তা ঠিক। মানুষটাই এই ধাঁচের। বন্ধু যেন আর লোকের থাকে না! মানি, বন্ধু নিতে চাহিলে কোনো জিনিস নিজে আঁকড়াইয়া থাকে না। কিন্তু বন্ধুর জন্য চোখ বুঝিয়া ভাল জিনিস এমন ছাড়িয়াও কেউ দেয় না!

সুবলের বাপ গগন মালোর কোনোকালে নাও-জাল ছিল না। সে সারাজীবন কাটাইয়াছে পরের নৌকায় জাল বাহিয়া। যৌবনে সুবলের মা ভর্ৎসনা করিত, 'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেনে?'

কিন্তু নিশ্চেষ্ট লোককে ভর্ৎসনা করিয়া ফল পাওয়া যায় না।

'খাইবা বুড়াকালে পরের লাথি উষ্ঠা, যেমন মানুষ তুমি।'

গগন এসব কথায়ও কর্ণপাত করে নাই।

বুড়া কাল যখন সত্যই আসিল, তখন বলিত, 'অখন বুঝ নি?' ইহার উত্তরে গগনচন্দ্র বলিত, 'আমার সুবল আছে। আমি ত করতাম পারলাম না, নাও-জাল আমার সুবলে করব। অত ভেন্ ভেন্ করিস্ না।'

কাজেই সুবলের বাপ যখন মারা যায়, সুবলকে নৌকা গড়াইয়া দিয়া যাইতে পারে নাই। সুবল 'মাথা-তোলা' হইয়া কিশোরের নৌকায় গিয়া উঠিল। এবং তার সঙ্গেই জাল বাহিয়া চলিল। নিজের নাও-জাল করার কথা আর তার মনেই আসিল না। কিশোর বয়সে তার মাত্র তিন বছরের বড়। আশৈশব বন্ধু তারা। তদের মধ্যে ভাব ছিল গলায় গলায়। শৈশবে দুইজনে বর্ষাকালে সাপেভরা বটের ঝুরিতে বসিয়া খোপের মধ্য দিয়া বঁড়শি ফেলিত। শিং মাছের জাল বুনিয়া আঁধার রাতে বুকজলভরা পাটক্ষেতের আল ধরিয়া অনেক দূরে গিয়া পাতিয়া আসিত। রাত থাকিতে উঠিয়া শিংমাছ-কৈমাছ-গাঁথা জাল তুলিয়া আনিত। এসব জালে অনেক সময় সাপ গাঁথা পড়ে। কিন্তু মালোর ছেলেরা তাতে ভয় পায় না। অনেক মালোর ছেলে এভাবে মারা পড়ে দেখিয়াও ভয় পায় না। কেননা অনেক মরিয়া গিয়াও তারা অনেক বাঁচিয়া থাকে।

একদিন দুইজনেরই বাপ তাদের পাঠশালায় পাঠাইল। প্রথম দিন তারা চুপচাপ কাটাইল। পরের দিন ভিন্ন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করিয়া শিক্ষকের মার খাইল। তার পরের দিন নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া শিক্ষকের হাতে যে মার

খাইল, তাহার মাত্রা সহনাতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দুইজনেই একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। পাঠশালায় আর গেল না। গুরুজনের মার খাইল, তবু গেল না, বরং সেদিন কিশোর কলাগাছের খোল কাটিয়া চটি জুতার মতো পরিল, সাথীকে ধমকাইয়া বলিল, 'হেই সুব্‌লা, দেখ্‌, আমি বৈকণ্ঠ চক্রপত্তি, তুই আমারে ভক্তি দে।'

শিক্ষকের কাকা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী চটিপায়ে উঠানে রোদে বসিয়া তামাক টানিত আর পালেরা বণিকেরা পথ চলিতে তাঁহাকে পা ধরিয়া প্রণাম করিয়া যাইত। কিশোর ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

তারপর একদিন দুজনেরই উপর তাগিদ আসিল—সূতা পাকাও জাল বোনো।

তিতাস নদীর প্রশস্ত তীর। সেখানে এক দৌড়ের পথ লম্বা করিয়া সূতা মেলিত। বাঁশের চরখিতে কাঠি লাগাইয়া দুইজনে এক দুই তিন বলিয়া এমন জোরে পাক লাগাইত যে, কাঠি ভাঙিয়া চরকি কাত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত। বর্ষায় যে বটের ঝুরিতে বঁড়শি ফেলিত, সুদিনে তারই তলা ছিল গরমের দুপুর কাটাইবার উত্তম স্থান। জাল লইয়া দুইজনে সেখানে গিয়া বসিত। জাল পায়ের বুড়া আঙুলে ঠেকাইয়া দুইজনেই সমান গতিতে তকলি চালাইত। তাতে জালে অনেক বাজে গিট পড়িত সত্য কিন্তু বোনা খুব আগাইত।

তারপর এক সময়ে কিছুদিন আগেপিছে দুজনেরই নাও-জালে হাতেখড়ি হইল। অল্প দিনের মধ্যেই পাকা জেলে বলিয়া পাড়ার মধ্যে তাদের নাম হইয়া গেল।

মাছের জো ফুরাইয়া গিয়াছে। মালোদের অফুরন্ত চাহিদা মিটাইতে গিয়া, দিতে দিতে তিতাস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দুপুর পর্যন্ত জাল-ফেলা জাল-তোলা চলিল, কিন্তু একটি মাছও নৌকায় ফেলিতে পারিল না। জালের হাতায় হ্যাঁচকা একটা টান মারিয়া কিশোর বলিল, 'জগৎপুরের ডহরে যা সুব্‌লা, ইখানে ত জালে-মাছে এক করা গেল না।'

কিন্তু ডহরের অতলস্পর্শী জল জালের খুঁটিতে দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়াও মাছের হদিস মিলিল না। কিশোর পায়ের তলা হইতে বাঁশের গুড়ি ছাড়িয়া দিয়া একটানে বাঁধ খুলিয়া ফেলিল। আচম্‌কা আঘাতে ডহরের নিস্তরঙ্গ জল কাঁপিয়া উঠিল। তারই দিকে চাহিয়া কিশোর বলিল, 'জান্‌ বাঁচাইতে চাস্‌ ত, উত্তরে চল্‌ সুব্‌লা।'

একদিন কয়েকখানা নৌকা সাজিল। উত্তরে যাইবে। প্রবাসে। তাদের সঙ্গে কিশোরের নৌকাও সাজিল।

তারা পুরাণো ছই নূতন করিল, নৌকা ডাঙায় তুলিয়া গাবকালি মাখাইল। জালগুলিকে কড়া গাব খাওয়াইয়া তিনদিন বিশ্রাম দিল। অতিরিক্ত কিছু বাঁশ আর দড়াদড়িও যোগাড় করিল।

কিশোরের বাপ সঙ্গে গেলে বাড়িতে থাকিবার কেউ থাকে না। বুড়া মানুষ বাড়িতে থাকিয়া সকাল সন্ধ্যা ঘাটে কিনিয়া-বেচিয়া যা পাইবে, সংসার চালাইবে। আরেকজন ভাগীদার দেখা দরকার।

কিশোরের বাপ ভাবিয়া দেখিল, দুইজনই বালক, কোনোদিন বড় নদী দিয়া বিদেশ যায় নাই। সেখানে গিয়া অনেক কথা বলিতে হইবে। বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করিতে হইবে। ডাকাতে ধরিয়া জাল ছিনাইয়া নিতে চাহিলে, সামান্য জাল নিয়া কেবল

গরীবকেই মারা হইবে, আর কোনো লাভ হইবে না বলিয়া ডাকাতের মন ভিজাইতে হইবে। একজন বয়স্ক লোকের দরকার। জলের উপর ছয় মাস চরিয়া বেড়াইতে হইবে। তিলক চাঁদ প্রবীণ জেলে। একটু বেশী বুড়া। তা হোক। সঙ্গে দুইজন জোয়ান মানুষ ত রহিলই।

রাব-তামাক মাখিয়া গুল করিতে করিতে কিশোরের বাপ বলিল, 'তিলক চাঁদ জানেশুনে। তারে নে। গাঁও-এর নাম শুকদেবপুর। খলার নাম উজানি নগরের খলা। মোড়লের নাম বাঁশিরাম মোড়ল।'

এক দিন উষাকালে তিনজনে নৌকায় উঠিল।

বিদায় দিবার জন্য নদীর পারে যারা গেল, তাদের সংখ্যা সামান্য। একজন আধবুড়ি—কিশোরের মা। আর একজন বাসন্তীর মা, আর তার মেয়ে বাসন্তী—এগারো বছরের কুমারী কন্যা।

বুড়ি বলিল, 'অ মাইয়ার মা, জোকার দেও না।'

বুড়ির ঠোঁটে জোকার বাজে না। বাসন্তী ও তার মা জোকার দিল। দেড়জনের উলুধ্বনি বলিয়া তাহা উষার বাতাসকে কাঁপাইল মাত্র। কলরব তুলিল না। কিশোরের বাপ নদীতীরে যায় নাই। ঘরে বসিয়া ঘন ঘন কেবল তামাক টানিতেছিল। ছেলেকে বিদায় দিয়া ঘরে আসিয়া বুড়ি কাঁদিয়া উঠিল।

পাঁচপীর বদরের ধ্বনি দিয়া প্রথম লগি ঠেলা দিল তিলক। সুবল হালের বৈঠা ধরিল। তার জোর টানে নৌকা সাপের মতো হিস্ হিস্ করিয়া ঢেউ তুলিয়া ঢেউ ভাঙিয়া চলিল। তিলকচাঁদ গলুইয়ে গিয়া দাঁড় ফেলিয়াছে। কিন্তু তার দাঁড়ে জোর বাঁধিতেছে না। শুধু পড়িতেছে আর উঠিতেছে। ছইএর উপর একখানা হাত রাখিয়া কিশোর মাঝ-নৌকায় দাঁড়াইয়া ছিল। দেখিতেছিল তাদের মালোপাড়ার ঘরবাড়ি গাছপালাগুলি, খুঁটিতে বাঁধা নৌকাগুলি, অতিক্রান্ত উষার স্বচ্ছ আলোকেও কেমন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে সারাটি গ্রাম, আর গোচারণের মাঠ। অদৃশ্য হইতেছে কালীসীমার ময়দান আর গরীবুল্লার বটগাছ দুইটি। জলের উষ্ণতায় শীতের প্রভাতী হাওয়াও কেমন মিষ্টি। গলুইর দিকে আগাইয়া গিয়া কিশোর বলিল, 'যাও তিলক, তামুক খাও গিয়া। দাঁড়টা দেও আমার হাতে।'

তিতাস যেখানে মেঘনাতে মিলিয়াছে, সেইখানে গিয়া দুপুর হইল। কিশোর দাঁড় তুলিয়া খানিক চাহিয়া দেখিল। অনুভব করিল মেঘনার বিশালত্বকে, আর তার অতলস্পর্শী কালো জলকে। এপারের শক্ত মাটিতে এক সময়ে ভাঙন হইয়া গিয়াছে। এখন আর ভাঙিতেছে না। কিন্তু ভাঙনের জয়পতাকা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে পর্বতের মতো খাড়া পাড়টা। ছোট ছোট ঢেউয়ে মসৃণ হইয়া রহিয়াছে বড় বড় মাটির ধ্বস্। ওপারে—অনেক দূরে, যেখানে গড়ার সমারোহ—দেখা যায় সাদা বালির ঢালা রূপালি বিছানা। ভাঙিয়াছে গাছে-ছাওয়া জনপদ, গড়িয়াছে নিষ্ফলা ধূ ধূ বালুচর।

তিলককে ভাত চাপাইতে বলিয়া কিশোর গলুইয়ে একটু জল দিয়া প্রণাম করিল। তারপর আবার দাঁড় ফেলিল।

সন্ধ্যা হইল ভৈরবের ঘাটে আসিয়া।

এখানে কয়েকঘর মালো থাকে। ঘাটে খুঁটি-বাঁধা কয়েকটি নৌকা, পাড়ে বাঁশের উপর ছড়াইয়া দেওয়া কয়েকটি জাল, এখানে-সেখানে মাটিতে কালো চারকোণা গর্তে গাবের দাগ, পাশে গাবের মট্‌কি গামলা বেতের ঝুড়ি—দেখিলেই চেনা যায় এখানে মালোরা থাকে।

গ্রামের পাশে সূর্য ঢাকা পড়িলেও আকাশে একটু একটু বেলা আছে। নৌকা বাহিলে আরো একটা বাঁক ঘোরা যাইত। কিন্তু সম্মুখে রাত কাটাইবার ভাল জায়গা তিলক স্মরণ করিতে না পারায় কিশোর বলিল, 'এই জাগাত্‌ই রাইত্‌ থ্যাইক্যা যাই রে সুব্‌লা।'

এখান হইতে বাড়িগুলিও দেখা যায়। গ্রাম আগে বড় ছিল। মালোদের অনেক জায়গা রেলকোম্পানি লইয়া গিয়াছে। বৃহত্তর প্রয়োজনের পায়ে ক্ষুদ্র আয়োজনের প্রয়োজন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। তবু এ গাঁয়ের মালোরা গরীব নয়। বড় নদীতে মাছ ধরে। রেলবাবুদের পাশে থাকে। গাড়িতে করিয়া মাছ চালান দেয়। তারা আছে মন্দ-না।

'কিশোরদাদা, ভৈরবের মালোরা কি কাণ্ড করে জান নি? তারা জামা-জুতা ভাড়া কইরা রেলকোম্পানির বাবুরার বাসার কাছ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বইআ তামুক টানে আর কয়, পোলাপান ইস্কুলে দেও,—শিক্ষিৎ হও, শিক্ষিৎ হও।'

তিলক ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, 'হ, শিক্ষিৎ হইলে শাদি-সম্বন্দ করব কি না! আরে সুব্‌লা, তুই বুঝ্‌বি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর।'

ব্যাপারটার মীমাংসা করিয়া দিল কিশোর; হাসিয়া বলিল, 'না তিলক চাঁদ, না। চোখ রাখে বড় মাছের উপর। যা শোনা যায় তা না। তা হইলে কি জাইন্যা শুইন্যা নগরবাসী এই গাঁওএ সমন্দ ঠিক করত।'

'কিশোর দাদা, চল মাইয়ারে একবার দেইখ্যা যাই। বাড়ি চিন নি?'

'বাড়ি চিনি না, কেবল নাম জানি,—ডোলগোবিন্দর বাড়ি।'

মেয়েরা দিনের শেষে জল ভরিতে আসিয়াছে। দলে দেখা গেল কয়েকটি কুমারী কন্যাকে।

কিশোর চোখ টিপিয়া বলিল, 'গিয়া কি করবি? এর মধ্যে থাইক্যা দেইখ্যা রাখ্‌।'

সারারাত সুখে ঘুমাইয়া তারা ঊষার আলোকে নৌকা খুলিয়া দিল।'

ভৈরব খুব বড় বন্দর। জাহাজ নোঙর করে। নানা ব্যবসায়ের অসংখ্য নৌকো। কোন নৌকাই বেকার বসিয়া নাই। সব নৌকার লোক কর্ম-চঞ্চল। নৌকার অন্ত নাই। কারবারেরও অন্ত নাই। লাভের বাণিজ্যে সকলেই তৎপর, আপন কড়াগণ্ডা বুঝিয়া পাইবার জন্য সকলই ব্যস্ত। যারা পাইয়াছে তারা আর অপেক্ষা করিতেছে না। আগের যারা অবেলায় পাইয়াছে, তারা রাতটুকু কাটাইয়া কিশোরের নৌকা খোলার সময়েই নৌকা খুলিয়াছে। বেশির ভাগ গিয়াছে—যে দিক হইতে আসিয়াছে সেই দিকে; কিশোরেরা যাইতেছে সামনের দিকে। বন্দরের এলাকা পর্যন্তই কর্মচাঞ্চল্য। এর সীমা অতিক্রম করিতেই দেখা গেল সকল প্রাণস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে।

বন্দরের কলরব ধীরে ধীরে পশ্চাতে মিলাইয়া গেল। সম্মুখে বিরাট নদী তার বিশালতা লইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। শীতের নদী। উত্তরের হাওয়া সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণের বাতাস এখনো বাহির হয় নাই। নদীতে ঢেউ নাই, স্রোতের বেগও নাই। আছে কেবল শান্ত তৃপ্ত স্বচ্ছ অবাধ জলরাশি। এই অনন্তের ধ্যান ভাঙিয়া, এই প্রশান্তের মৌনতা বিঘ্নিত করিয়া কিশোরের নৌকার দুইখানা দাঁড় কেবল ওঠানামা করিতেছে।

এতক্ষণ কূল ঘেঁসিয়া চলিতেছিল। ঢালা বালিরাশির বন্ধ্যা কূল। লোকের বসতি নাই, গাছপালা নাই, ঘাট নাই। কোনোখানে একটি নৌকার খুঁটিও নাই। এমনি নিষ্করুণ নিরালা কূল। রোদ চড়িলে, শীত অন্তর্হিত হইল। সুদূরের ইশারায় এই নির্জনতার মাঝেও কিশোরের মনে যেন আনন্দের ঢেউ উঠিল। নদীর এই অবাধ উদার রূপ দেখিতে দেখিতে অনেক গানের সুর মনে ভাসিয়া উঠিল। অদূরে একটা নৌকা। এদিকে আসিতেছে। কিশোর গলা ছাড়িয়া গান জুড়িল—

উত্তরের জমিনেরে　　　সোনা-বন্ধু হাল চষে
লাঙলে বাজিয়া উঠে খুয়া।
দক্ষিণা মলয়ার বায়　　　চান্দমুখ শুকাইয়া যায়,
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।

নৌকাটা পাশ কাটাইবার সময় তারা কিশোরের গানের এই পদটি শুনিল—

নদীর কিনার দিয়া　　　গেল বাঁশি বাজাইয়া
পরার পিরীতি মধু লাগে।
কু-খেনে বাড়াইলাম পা　　　খেয়াঘাটে নাইরে না
খেয়ানীরে খাইল লঙ্কার বাঘে।

একজন মন্তব্য করিল, 'বুড়ারে দাঁড় টানতে দিয়া জোয়ান বেটা খাড়াইয়া রইছে, আবার রস কেমুন, পরার পিরীতি মধু লাগে।'

কিশোর আঘাত পাইয়া বলিল, 'যাও তিলকচাঁদ, তুমি গিয়া ঘুমাইয়া থাক।'

তিলক নৌকার মালিকের আদেশ অগৌণে পালন করিল।

আবার নির্জনতা। যত দূর দেখা যায়, শুধু জল।

দাঁড়ের উপর মনের পুলক ঢালিয়া কিশোর বলিল, 'বা'র গাঙ্ দিয়া ধর্‌ত দেখি সুব্‌লা। খালি বালু দেখতে আর ভাল লাগেনা। ধর্ কোণাকুনি ধর্। পার বাইবি ত অই পার দিয়া ধর্। এই পারে কিচ্ছু নাই।'

কিন্তু ও-পার তখনো চোখের আড়ালে। যা দৃষ্টির বাহিরে, তারই হাতছানির মায়ায় তারা বিপদে পা দিল। কিশোরের বুক একবার একটু কাঁপিয়াছিল একটা গান মনে পড়িয়া 'মাঝিভাই তোর পায়ে পড়ি, পার দেখিয়া ধর পাড়ি।' কিন্তু শেষের কথাগুলি সুন্দর, 'পিছের মাঝি ডাক দিয়া কয় নৌকা লাগাও প্রেম-তলায়। হরি বল তরী খুল সাধের জোয়ার যায়।' কিশোর নিজের মনকে প্রবোধ দিল, বৈঠার আওয়াজ বেসুরা

হইতেছে দেখিয়া সুবলকেও সাহস দিল, 'না সুবলা, ডরাইস্না। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে। বা'র গাঙে মা-গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে।'

তিলকচাঁদের ঘুম ভাঙিল। বাহিরে আসিয়া দেখে বেলা নাই। নৌকার লক্ষ্য যে তীরের দিকে, সে তীরের ভরসা নাই, পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে যে তীর, তারও ভরসা নাই।

শীতের বেলা ফুরাইল ত একেবারেই শেষ হইয়া গেল। নদীর উপর যাও বা একটু আলো ছিল তাও অদৃশ্য হইল। তারপর তারা কূলহারা হইয়া কেবল মেঘনার বুকেই নিরুদ্দেশ হইল না, আঁধারের বুকেও আত্মসমর্পণ করিল।

সুবল বৈঠা রাখিয়া ছইয়ের ভিতর আসিল, টিমটিমে একটা আলো তিলক জ্বালাইয়াছিল, সেটা রাগ করিয়া নিভাইয়া ফেলিল। তিলক তামাক টানিতেছিল, সেটা একটানা টানিয়া চলিল। শুধু কিশোর নিরাশ হইল না। সুবলের পরিত্যক্ত হালখানা হাতে লইয়া জোরে কয়েকটা টান দিল। হঠাৎ নৌকাটা কিসের উপর ঠেকিল, ঠেকিয়া একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল। আতঙ্কিত হইয়া তিলক বলিয়া উঠিল, 'আর আশা নাই সুবলা, কুমীরের দল নাও কান্ধে লইছে।'

'আমার মাথা হইছে। নাও আটকাইছে চরে। বাইর অইয়া দেখ না।'

বাহির হইয়া দেখিয়া তিলক বলিল, 'ইখানে পাড়া দে।'

রাত পোহাইলে দেখা গেল এখানে নদীর বুকে একটুখানি চর জাগিয়াছে, তারই উপরে লোকে নানা জাতের ফসল বুনিয়াছে। চারাগুলিতে ফুল ধরিয়াছে। মাছিমাকড়েরা ইহারই মধ্যে বাসা করিয়াছে। পাখ্ পাখালিরাও খোঁজ পাইয়া সকাল বেলাতেই বসিয়া গিয়াছে। মেলার মতো।

ভোরের রোদে নৌকা খুলিয়া দুপুর নাগাদ অনেক পথ আগাইয়া তারা পূবপার ধরিল। ঘাটে নৌকা বাঁধা, পাড়ে জাল টাঙানো—সেখানেও এক মালো পাড়া।

'চিন নি তিলক, ইটা কি গাঁও?'

তিলক চিনিতে পারিল না।

'ইখানেই নাও রাখ্ সুবলা। দুপুরের ভাত ইখানেই খাইয়া যাই।'

'হ, খাওয়াইবার লাইগ্যা তারা তৈয়ার হইয়া রইছে।'

'ভাত খামু নিজে রাইন্ধা, পরের আশা করি নাকি?'

ঘাটে সারি সারি নৌকা বাঁধা। তারই একটার পাশে সুবল নৌকা ভিড়াইল।

একজন নৌকায় বসিয়া ছেঁড়া জাল গড়িতেছিল। কৌতূহলী হইয়া আগন্তুক-নৌকার দিকে তাকাইল। মালোদের নৌকা, দেখিলেই চেনা যায়। ভিড়িতেই, কোন্ গ্রামের নৌকা, কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিল।

তারাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গ্রামের নাম নয়াকান্দা। ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো থাকে। নয়া বসতি করিয়াছে। আগে ছিল পশ্চিম পারের এক শিক্ষিত লোকের গ্রামে। নদীর পারে যেখানে তারা নৌকা বাঁধিত জাল ছড়াইত, জমিদার সে-জমি তাদের নিকট হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া অন্য জাতের কাছে বন্দোবস্ত দিয়াছে। তাই তারা সেই অবিচারের গ্রাম ছাড়িয়া এখানে আসিয়া নূতন বাড়ি বাঁধিয়াছে। এখানে জমিদার নাই।

বেশ শান্তিতে আছে। হাট-বাজার দূরে। কিন্তু ঘাটে নৌকা আছে, দেহে ক্ষমতা আছে। তারা দূরকে সহজেই নিকট করিতে পারে।

কিশোর মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে হাতের হুকা তার দিকে বাড়াইয়া দিল।

'আমার হুক্কাও আইতাছে। দেও আগে তোমারটাই খাই।'

এই সময়ে একটি ছোট দিগম্বরী হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে আসিতেছে দেখা গেল। বাড়ি থেকে হুকা লইয়া আসিয়াছে। শরীরের দুলানির সঙ্গে সঙ্গে হুকাটা ডাইনে-বাঁয়ে দুলিতেছে; নৌকার কাছে আসিয়া ডাকিল, বাবু, আমারে তোল্।'

মেয়ের হাত হইতে হুকা লইয়া কিশোরের দিকে বাড়াইয়া লোকটি বলিল, 'আমি খাই তোমার হুকা, তুমি খাও আমার ঝিয়ের হুক্কা।—আমার ঝি।'

মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি গো মা, জামাই দেখছ নি? বিয়ে দিয়া দেই?'

'কার ঠাঁই?'

'এই বুড়ার ঠাঁই।'

'ন্‌না, বুড়ার ঠাঁই না। আমার জামাই হইব যবুনার জামাইর মত সুন্দর। মায় কইছে।'

'তা অইলে এই জামাইর ঠাঁই দেই?'

কন্যাকর্তা সুবলের দিকে হাতের তক্‌লি বাড়াইল। সুবল কিশোরের দিকে চাহিয়া মুচকিয়া হাসিল।

'নাও লইয়া আইছ, নিয়া যাইবায় বুঝি?'

সুবল বলিল, 'হ, লইয়া যামু অনেক দূর। এই দেশের কাওয়ার মুখও দেখ্‌তে পারবা না।'

মেয়ের চিন্তিত মুখ দেখিয়া বাপের দয়া হইল, 'না না আমার মায়েরে যাইতে দিমু না। জামাই আম্‌রা ঘর-জামাই রাখমু।'

বাড়ি যাইবার সময় লোকটি কিশোরকে বলিয়া গেল, 'শোন মালোর পুত্, তোম্‌রার পাক আমার বাড়িতে হইব। আমার ঝি তোম্‌রারে নিমন্তন করল।—কি কও?'

'না না, আম্‌রা নাওই রান্ধমু। তুমি খাও গিয়া। রাইতের জালে যাও বুঝি।'

'ইখানে রাইতের জাল বাওন লাগে না। বেহানে কটা বিকালে কটা খেউ দিলেই হয়। অদৈন্য মাছ। কত মাছ ধরবায় তুমি।'

লোকটি মেয়েকে স্নান করাইল, নিজে স্নান করিল, গামছা পরিয়া কাপড় নিংড়াইয়া কাঁধের উপর রাখিল। তারপর মেয়েকে কোলে তুলিয়া গ্রামপথে পা বাড়াইল। কিশোরের চোখে ভাসিয়া উঠিল সুন্দর একটি পরিবারের ছবি, যে-পরিবারে একটি নারী আছে, একটি নন্দিনী আছে, আর পুরুষকে সারারাত নদীতে পড়িয়া থাকিতে হয় না। তার মনে একটা ঔদাস্যের সুর খেলিয়া গেল। নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিল 'কইরে সুব্‌লা, কি কর্‌বে কর্।—নাও ভাসাইয়া দিমু।'

কিছুই করিতে হইল না। গলায় মালা কপালে তিলক একজনকে পল্লীপথে বাহির হইয়া আসিতে দেখা গেল। তার মুখময় হাসি। কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল, 'দেখ

মালোর পুত। দোহাই তোমার দোহাই তোমার বাপের। আমার ঘাটে যখন নাও লাগাইছ, সেবা না কইরা যাইতে পারবায় না।'

সবল তার কথা বলার ভঙ্গী। প্রত্যেকটি কথা আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ়। কিশোরের মৃদু প্রতিবাদ তৃণের মতো উড়িয়া গেল।

খাইতে বসিলে, সেই নন্দিনী-গর্বিত পাত্রান্বেষী লোকটি বলিল, 'এ-ই। তখনই আমি মনে কর্‌ছিলাম, আমার হাতে ছাড়া পাইলেও সাধুর হাতে ছাড়ান নাই। তাই ঘাটে কিছু না কইয়া জানাইয়া দিলাম সাধুরে।'

খাওয়ার পর সাধু ধরিল, আজ রাতটুকু থাকিয়া যাও। একটু আনন্দ করিবার বাসনা হইয়াছে।

তিলক বলিল, 'আম্‌রা ত বাবা গান জানি না।'

'জান না! কোন জায়গাতে বিরাজ কর তোমরা?'

'গ্রামের নাম গোকনঘাট—'

'আমি সেই কথা কই না। আমি কই, তোমরা বিরাজ কর বৃন্দাবনে না কৈলাসে—তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী না শিবমন্ত্রী।'

'এই দেখ, গুরু মিলাইছে। আনন্দ করার গানে ত জানা-অজানার কথা উঠে না বাবা, কেবল নামের রূপ-মাধুরী পান করতে হয়। ষোল নাম বত্রিশ আখরের মাঝে প্রভু আমার বন্ধন-দশায় আছে। শাস্ত্রে কয় বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন। বিবর্তবিলাসের কথা। সে হইল নিত্য-বৃন্দাবনের কথা। তিনি লীলা-বৃন্দাবনে আইসা সুবলাদি সখা আর ললিতাদি সখীসহ আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধিকারে লইয়া লীলা কইরা গেছেন। সেই লীলা-বৃন্দাবনে অখন আর তান্‌রা নাই, আছেন নিত্য-বৃন্দাবনে। সেই নিত্য-বৃন্দাবন আছে এই দেহেরই মধ্যে। তবেই দেখ—তান্‌রা এই দেহের মধ্যেই বিরাজ করে। তারপর নদীয়া নগরের প্রভু গৌরাঙ্গ-অবতারের কথাখান ভাব না কেনে। পদকর্তা কইছে ঃ 'আছে মানুষ গ সই, আছে মানুষ গওরচান্দের ঘরে, নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই, আছে মানুষ॥ এক মানুষ বৈকুণ্ঠবাসী, আরেক মানুষ কালোশশী, আরেক মানুষ গ সই, দেহের মাইঝে রসের কেলি করে—নিগূঢ় বৃন্দাবনে গ সই আছে মানুষ॥'

কথাগুলির অর্থ তিলক কিছু কিছু বুঝিল। কিশোর ও সুবল মুগ্ধ আনুগত্যের দৃষ্টি দিয়া বক্তার কথাগুলি উত্তমরূপে শুনিয়া লইয়া মনে মনে বলিল, এসব তত্ত্বকথা, অত্যন্ত শক্ত জিনিস। যে বুঝে সেই স্বর্গে যায়। আমি তুমি পাপী মানুষ। আমরা কি বুঝিব!

অনেক রাত পর্যন্ত গান হইল। সাধু নিজে গাহিল। পাড়ার আরো দু'চারজন গাহিল। তিলকও তাহার জানা 'উঠান মাটি ঠন্‌ঠন্ পিড়া নিল সোতে, গঙ্গা মইল জল-তিরাসে ব্রহ্মা মইল শীতে', গানটি গাহিল। সাধুর নির্বন্ধাতিশয্যে কিশোর আর সুবল দুইজনে তাহাদের গাঁয়ের সাধুর বৈঠকে শোনা দুই-তিনটা গান গাহিয়া সাধুর চোখে জল আনিল।

তাদের গান শুনিয়া সাধু মুগ্ধ হইল। ততোধিক মুগ্ধ হইল তাদের সরল সাহচর্যে। মনে মনে বলিল ঃ বৃন্দাবনের চির কিশোর তোমরা, কৃষ্ণে তোমাদের গোলকের আনন্দ দান করুক। আমাকে যেমন তোমরা আনন্দ দিলে তোমরাও তেমনি আনন্দময় হও।

পরদিন তারা এখান হইতে নৌকা খুলিল। ছপ্ ছপ্ ছলাৎ শব্দ করিয়া নৌকা দুই তরুণের দাঁড়ের টানে ঢেউ ভাঙিয়া আগাইয়া চলিল। তীরে দাঁড়াইয়া সাধু। নৌকা যতই দূরে যাইতেছে, তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে। তার কেউ নাই। সকলের মধ্যে থাকিয়াও সে একা। তারা আনন্দ করিতে জানে না, আনন্দ দিতে জানে না। যারা আনন্দ দিতে পারিল, তাকে একটানা দৈনন্দিনতার মধ্যে ফেলিয়া তারা ঐ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অকূল মেঘনার অবাধ জলরাশির উদার শুভ্র বুকের উপর একটি কালো দাগের মতো ছোট হইতে হইতে তারা এক সময় মিলাইয়া গেল।

সাধুর বুক ছাপাইয়া বাহির হইল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। তারা দিয়া গেল অনেক কিছু, কিন্তু নিয়া গেল তার চাইতেও অধিক।

এইখানে পাড়টা ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে। বাঁকা অংশ জুড়িয়া স্রোতের আবর্ত এত জোরে পাক খাইয়া চলিতেছে যে, তীরে লাগিয়া অমন শক্ত মাটিকেও যেন করাত-কাটা করিতেছে, ছিন্নমূল তালগাছের মত ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে এক একটা অতিকায় মাটির ধ্বস। ভাঙনের এই সমারোহে পড়িয়া পাড়টা খাড়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলে ভয় হয়। ইহার নিকট দিয়া নৌকা চালাইতে বিপদের আশঙ্কা আছে। যদি একটি ধ্বস ভাঙিয়া নৌকার উপরেই পড়ে! যা স্রোত। আগানো বড় কঠিন। তবু আগাইতে হইবে।

সকাল হইতে নৌকা বাহিয়া সুবল দুপুরে খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটানা রাতের-জালে যাওয়ার এমনি অভ্যাস। জালে না গেলেও রাতে চোখে ঘুম আসে না। দুপুরে চোখে ঘুম আসে, ঘুমাইতে হয়। তিলক সে কাজ দুপুরের আগেই সারিয়াছে। হুকা হাতে শুইয়া ছিল। হাতের হুকা হাতেই ছিল। দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন চাহিয়াই আছে। চোখ খোলা। অথচ এরই মধ্যে ঘুমাইয়া নিয়াছে। এখন গলুইয়ে বসিয়া ঝপাঝপ দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে জলের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এইবার যা মাছ পড়ব কিশোর। জলের রূপখান চাইয়া দেখ্।'

মেঘনার বিশালতা এখানে অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভাঁটিতে থাকিতে এপার হইতে ওপার একটা রেখার মতো দেখা যাইত। এখন উজানে আসিয়া, এপারে থাকিয়া ওপারের খড়ের ঘরগুলি পর্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বিকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সুবল অবাক হইল।

'তিলক, ইটা কোন্ গাঙ?'

'কোন্ গাঙ আবার। যে-গাঙ দিয়া আসা অইছে।'

'ইখানে মেঘনা অত ছোট?'

'যত উজানে যাইবা ততই ছোট।'

আরো কত উজানে যাইতে হইব? উজানিনগরের খলা আর কতদূর? শুকদেবপুরের বাঁশিরাম মোড়লের বাড়ি আর কতদূর?

'আবার ঘুমাইয়া থাক। একেবারে তাঁর ঘাটে নাও ভিড়াইয়া ডাক দিমু, হুক্কা হাতে লইয়া।'

'যাও আর ঠিসারা কইর না।'

দূরে একখানা ছায়াচ্ছন্ন পল্লী। গাছপাতায় সবুজ। তাকে পাশে রাখিয়া যেন অকস্মাৎ নদী টানা ধনুকের মত বাঁকিয়া সোজা পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হইয়াছে। পশ্চিম পারের আড়ালে পড়ায় এখান হইতে তাকে আর দেখা যাইতেছে না। বাঁকানো ঢালা পার। পড়ন্ত রোদে তার বালিরাশি চিকচিক করিতেছে। সেই বালিঢালা পারের উপর একস্থানে দশ-বারখানি বড় বড় খড়ের ঘর। গাছপালা একটিও নাই; কোনোখানে সবুজের চিহ্নমাত্র নাই। কেবল বালি আর কয়েকখানা ঘর—মরুর বালুকায় পান্থ-নিবাসের মত। ব্যতিক্রম কেবল সচল অজগরের মত এলাইয়া পড়া নদীটি।

আরো একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিলে তিলক তার বৃদ্ধ চক্ষু দুইটির প্রতি অসীম করুণায় কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে বলিল, 'ঐ দেখা যায় শুকদেবপুর আর ঐ উজানিনগরের খলা।'

কিশোর আর কোন কথা বলিল না। যেখানটার পরে নদী আর দেখা যাইতেছে না সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

বাঁশিরাম মোড়লের ঘাটে যখন নৌকা ভিড়িল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

মোড়ল খুব প্রতাপশালী লোক। এখানে নদীর পাঁচ মাইল তাঁর শাসনে। এখানে মাছ ধরিতে হইলে তাঁরই সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে হয়।

পরদিন সকালে মোড়লের বাড়ি হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, দুপুরে তাঁর বাড়িতে সেবা করিতে হইবে।

দুপুরে স্নান করিয়া তিনজনে সেখানে উপস্থিত হইল।

মোড়লের বাড়িতে চার ভিটাতে চারটি খড়ের ঘর। সংস্কারাভাবে জীর্ণ। তারই একটা বারান্দায় বসিয়া সে এক বাক্স রূপার টাকা গুনিতেছে। তার শরীর পাথরের মত নিরেট, অসুরের মত শক্ত। রঙ কালো। বয়স পঞ্চাশের উপর। কিন্তু মাংসে চামড়ায় বার্ধক্য ধরে নাই। কণ্ঠার দুইপাশের মোটা হাড়ে অজস্র দৈহিক বলের পরিচয়। কিশোর মনে মনে বলিল, 'তোমার মত মুনিসের পঁচিশটায় শ।' তোমার চরণে দণ্ডবৎ।'

মোড়ল তার নূতন জেলেদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

'নাম ত জান্‌লাম কিশোর। পিতার নাম ত জান্‌লাম না।'

'পিতার নাম রামকেশব।'

'হ, চিনতে পারছি। তোমরা ক' ভাই?

'ছোট এক ভাই আছিল; মারা গেছে। অখন আমি এক্‌লা।'

'পুত্রসন্তান কি?'

'আমার পুত্রসন্তান আমিই।'

'হ, বুঝলাম। বিয়া করছ কই?'

কিশোর চুপ করিয়া রহিল। কথা বলিল সুবল। এইবার দেশে গিয়ে করিবে। সম্বন্ধ নিজ গ্রামেই ঠিক হইয়া আছে।

রান্না যা কিছু হইয়াছে সবই বড়মাছের। কিশোরেরা ছোট মাছের জেলে। বড় মাছ একটা মুখে পড়ে না, কেন না এ সব মাছ তারা ধরিতে পারে না। কোনোদিন কোনো বড় মাছ পথ ভুলিয়া তাদের জালে আসিয়া পড়িলেও পয়সার জন্য বেচিয়া ফেলিতে হয়।

মোড়ল খায় যেমন বেশি, খাওয়ার উপর তার মনোযোগও তেমনি অখণ্ড। খাওয়ার ফাঁকে একবার তার অতিথিদের কথা মনে পড়িল।

'জাল্লা ভাই, যা খাইবা কেবল হাতের জোরে।'

কিশোর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কারণ আয়োজনের এত প্রাচুর্যের মধ্যে পড়িয়া তার খুব লজ্জা করিতে লাগিল। রুইমাছের মাথার খানিকটা চিবাইতে চিবাইতে উত্তর দিল তিলক, 'কি যে তুমি কও মোড়ল।'

কিশোরেরও একটা কিছু বলা দরকার। নৌকার মহাজন সে। কিন্তু এসব উত্তর চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় দিতে হয়। সে-ভাষা কিশোরের জানা নাই। সরল মানুষ সে। তার কথাও সরল ঃ 'আমার দেশে অত বড় মাছ পাওয়া যায় না। বড় মাছ অত বেশি আম্‌রা খুব কম খাই।'

শুনিয়া মোড়ল গিন্নি আর এক বাটি মাছ আনিল। কিশোর প্রবল আপত্তি জানাইল, 'না না, না না।'

মোড়ল-বৌ বুদ্ধিমতী। কিশোরের এঁটো পাতে বাটিটা শব্দ করিয়া ঠেকাইল। এবার কিশোরকে মাছগুলি খাইতেই হইবে।

মোড়ল-বৌ লম্বা ঘোমটা টানিয়া পরিবেশন করিয়াছে। মুখ দেখা যায় নাই। মুখ দেখা গেল খাওয়ার পর তারা বারান্দায় বসিলে যখন পান দিয়া গেল, তখন। মোড়ল চৌকির উপর বীরাসনে বসিয়াছে। তাকে ছেলেবেলার গল্পে-শোনা হনুমান ভীমাদি কোন বীরের মত দেখাইতেছে। কিশোর তাকে চোরা দৃষ্টিতে দেখিতেছে আর ভাবিতেছে, রাগ নাই, অহংকার নাই, মানুষটার আছে কেবল শক্তি। উহার বুকের কাছটিতে একবার বসিতে পারিলে ঝড়তুফানেও কিছু করিতে পারিবে না।

এমন সময় গিন্নি স্বামীর হাতে হুকা দিয়া গেল। একটু পরে পানের বাটা সাজাইয়া আনিয়া চারিজনের মাঝখানে রাখিতেই তার ঘোমটা সরিয়া গেল। কিশোর মুহূর্তের জন্য তার মুখখানা দেখিতে পাইল। শ্যামাঙ্গী ক্ষীণকায়া তরুণী। ভৈরবকায় মহাদেবের পাশে বালিকা-বধূ গৌরীকে যেমনটি দেখাইত এ-বৌ তাঁর পাশে বসিলে ঠিক তেমনই দেখাইবে। কিশোর চিন্তিত মনে বসিয়া রহিল।

মোড়ল বলিল, 'কি ভাবছ, আমার স্তিরাচার।'

কিশোর আঘাত পাইল, 'আমি বুঝি এই ভাবছি।'

'আর কি ভাবৃবা। আমার ঘরে এই ছাড়া আর কেউ নাই। আর যে ছিল, মারা গেছে সে। থাকলে তোমারে লইয়া অখন কত ঠার-ঠিসারা করত!'

'মোড়ল!'

'কি জাল্লা!'

'তোমার দিকে চাইয়া আমার শিবঠাকুরের কথা মনে পড়ে। তোমার অত নামডাক, কিন্তু বাড়ি-ঘরের ছিরি নাই। তাজ্জবের কথা।'

মোড়ল তার আয়ত চোখ দুটি মেলিয়া তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি কিশোরের চোখ দুটির মধ্যে ডুবাইয়া দিল।

'আমার মনে পড়ে যে-শিবের কথা, সে-শিব বুড়া। সকলের দরবারে তার নামডাক। কিন্তু ঘরে তার দৈন্যদশা।'

শিশুর মত বাধিত হইয়া মোড়ল বলিল, 'তুমি আমারে শিব ঠাকুর বানাইলা। না জাল্লা, তুমি আমারে বুড়া শিব বানাইলা, আমার গৌরী বড় ভাল, তারে আবার নাচাইও না। আর, আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আম্‌রা কিষ্ণুমন্ত্রী। তোম্‌রা কোন্ দেশের দেশী?'

জবাব দিল তিলক, 'বিন্দাবনের।'

'অ, বুঝলাম, তোমরাও কিষ্ণুমন্ত্রী। কিষ্ণে মিলাইছে। রাইতে আনন্দ করা চাই, মনে থাকে যেন। অখন একটু গড়াইয়া যাও।'

উত্তম ভোজন পাইলে তিলকের পেট উঁচু হইয়া উঠে, নির্লজ্জভাবে অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। উহার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তিলক বলিল, 'ঠিক কথাই কইছ মোড়ল। যা খাওয়াইছ, গড়াইয়াই যাইতে লাগ্‌বে, খাড়া হইয়া যাওয়ার ভরসা খুব কম।'

রসিকতা। মোড়ল শশব্যস্তে প্রতিবাদ করিল, 'সে কথা কই না জাল্লা, আমি কই পাটি বিছাইয়া দেউক, একটু গড়াইয়া লও, তারপর যাইও। রাইতে আবার উজাগর করতে লাগব।'

'অ, একটা শীতলপাটি বিছাইয়া দিলে গড়াইয়া যাইতে পারি।'

'তুমি জাল্লা বড় ঢঙ্গী। তোমারে আমার বড় ভাল লাগে।'

সেদিন তারা আর নৌকাতে ফিরিল না। শীতলপাটিতে গড়াইয়া বিকালে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইল। তিলক বুড়া মানুষ। তার কাপড় হাঁটুর নিচে নামে না। কিন্তু কিশোর সুবল ধুতি পায়ের পাতা অবধি ঢিলা করিয়া কার্তিকের মত কোমরে গেরো দিয়াছে। কাঁধে চড়াইয়াছে এক একখানা গামছা।

সুবলের বয়সের দোষ। সে শুধু দেখিল কার বাড়িতে ডাগর পাত্রী বিবাহের দিন গুনিতেছে। অনেককে দেখিল এবং সকলকেই মনে ধরিল। ইহাদের বাপ-মা সুবলকে লক্ষ্য করিতেছে, এবং ওগো ছেলে, যাওয়ার পথে আমার মেয়েকে নিয়া যাইও, বাতাসে ভর করিয়া সুবলের কানে এই কথা পাঠাইতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া সুবল মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিল।

কিশোর ভাবিতেছে আর একরকম কথা। এগাঁয়ের লোকগুলি কি স্বাস্থ্যবান! নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ী, সকলের গায়েই জোরের জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে, আটকায় সাধ্য কার। সকলেরই রঙ্‌ কালো। তবে হালকা রঙ্‌চটা কালো নয়, তেলতেলে পাথরের সুগঠিত মুর্তির মত কালো। কিশোরদের গাঁয়ের লোকও বেশির ভাগই কালো। কিন্তু মাঝে মাঝে পরিষ্কার লোকও আছে। নারীরাও অনেকেই কালো আবার অনেকেরই রঙ্‌ ফরসা। বাসন্তীর রঙ্‌ তো রীতিমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মেয়ের মত। কিন্তু এ গাঁয়ের নারী-পুরুষ সকলেই কালো।

আর একটা ভাল জিনিস কিশোরের চোখে পড়িয়াছে। এখানে ঘরে ঘরে জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই একপাশে জালের সরঞ্জাম, আর এক পাশে হালের সরঞ্জাম। একদিকে আছে গাবের মটকি, জালের পুঁটলি, দড়াদড়ি, ঝুড়ি ডোলা আরেকদিকে লাঙল-জোয়াল, কাঁচি নিড়ানি, মই। অযত্নরক্ষিত ঘর দুখানার একখানাতে যেমন দুই এক পুরুষের পুরানো জালের পুটলি পুরাতন পঞ্জিকার মত

জমিয়া উঠিয়াছে, তেমনি অন্যখানাতে বিভিন্ন বয়সের গরুবাছুরের ঘাসে ফেনে গোবরে থম্‌থম্ করিতেছে। ইহাদের জীবনদেবতা আকাশের আদম সুরতের মত দুই দিকে আঙুল বাড়াইয়া রাখিয়াছে। একদিকে নদী যাছে ভরভর আর আরেক দিকে মাঠ ফসলে হাসি-হাসি। কোনোদিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করিয়া ফেলে, আর নদীর জল চুমুক দিয়া মুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না। ক্ষেতে শস্য ফলাইবে। এক হাতে ক্ষেতে শস্য ফলাইবে আরেক হাতে জালগুলি নৌকাগুলি আগের মত ঠিক করিয়া লইবে। যথাকালে বর্ষার জল নামিয়া নদীটাকে আবার যৌবনবতী করিয়া দিবে। ইহারা মরিবে না। কিন্তু আমরাও কি মরিব। আমাদের গাঁয়ের মালোদের কারো খেত খামার নাই। কিন্তু তিতাস নদী আছে। তাকে শোষণ করিবে কে!

'আরে, অ কিশোর, তামুক পাওয়া যায় কই! এক ছিলুম তামুক।' তিলক এই বলিয়া কিশোরের ধ্যান ভঙ্গ করিল।

সন্ধ্যার পর গানের আসর বসিল।

প্রথম গান তুলিল তিলক। সুবল গোপীযন্ত্র বাজাইল। কিশোর কেবল হাততালি দিয়া মাথা দুলাইয়া তাল রাখিয়া চলিল।

কৃষ্ণমন্ত্রী শিবমন্ত্রী দুই মতের লোকই আসিয়াছে। প্রথমে আসর-বন্দনা গাওয়ার পর দেখা গেল, এক কোণে কয়েজন গাঁজার কল্‌কে সাজাইতেছে। তিলক ও-জিনিস কালেভদ্রে গ্রহণ করিয়া থাকে। এবারও এক টান কসিল। নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িল। তারপর সুবলের দিকে রক্তচক্ষু করিয়া বলিল, 'বাজাও।'

সুবল গোপীযন্ত্র পেটে ঘষিয়া তাল ধরিল।

মোড়ল মাঝ-আসরে বসিয়া ছিল। তার দিকে হাত বাড়াইয়া তিলক গান জুড়িল, 'কাশীনাথ যোগিয়া—তুমি নাম ধর নিরাঞ্জন, সদাই যোগাও ভূতের মন, ভূত লইয়া কর খেলন, শিঙ্গা ডম্বুর কান্ধে লয়ে নাচিয়া'—

অপর পক্ষের একজন বলিল, 'গান বড় বে-ধারায় চল্‌ছে মোড়ল। ইখানে এই গানটা মানাইত—'এক পয়সার তেল হইলে তিন বাতি জ্বালায়। জ্বেলে বাতি সারা রাতি ব্রজের পথে চলে যায়।'

মোড়ল নিষেধ করিতে যাইতেছিল, 'বিদেশী, মানুষ ছন্দি ধর কেনে?' কিন্তু তাহার মুকের কথা মুখেই রহিয়া গেল। অনেক দিনের অভ্যাসের পর তিলকের মগজে গাঁজার ধোঁয়া গিয়াছে। সামলাইতে পারিল না। অনেক কষ্টে মাথা খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া এক সময় মোড়লের কোলের উপর এলাইয়া পড়িল। নেতৃহারা হইয়া কিশোরেরা আর গান গাহিল না। কেবল শুনিয়া চলিল। বিরোধী দল অনেক রকম গান গাহিবার পর যখন রাধাকৃষ্ণের মিলন গাহিয়া আসর শেষ করিল, তখন মোড়লের একটা লোক বাতাসার হাঁড়ি হাতে আগাইয়া আসিয়া কিশোরকে বলিল, 'লও'। কিশোর স্বপ্নোত্থিতের মত সচেতন হইয়া হাত পাতিল, তারপর তিলককে ডাকিয়া তুলিল। তিলক যখন চোখ মেলিল, আসরে তখন ভাঙন ধরিয়াছে।

নদীর বুকে সকাল বড় সুন্দর। তখনো সূর্য উঠে নাই। আকাশে নীলাভ স্বচ্ছতার আভাস। চারিদিকে নীলাভ শুভ্রতা। এ শুভ্রতা মাখনের মত স্নিগ্ধ। চারিদিকের অবাধ

নির্মুক্তির মাঝে এ-স্নিগ্ধতার আলাপন মনের আনাচে কানাচে সুরধ্বনি জাগায়। নদীর বুকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-শিশুর অস্ফুট করতালি জাগায় যে মুক্ত বাতাস, তারই মৃদু স্পর্শ তিলকের বৃদ্ধ সঙ্কুচিত বুকখানাও পূর্ণতায় প্রসারিত করিয়া তুলিল।

পূর্বদিকে মোড়লদের পল্লী। গাছগাছালিতে ঢাকা উত্তরদিকে নদীটা বাঁকিয়া বাঁ দিকে অদৃশ্য হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে নদী একেবারে তীরের মত সোজা, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল জল আর জল। দুইটি তীরের বাঁধনে পড়িয়া সে-জল দৈর্ঘ্যে অবাধ। তিলকের দৃষ্টি, যেখানে নদীর জলে আর আকাশের কোলে একাকার হইয়া মিশিয়াছে, সেইখানে। তারও অনেক দক্ষিণ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে ফাল্গুন মাসের এই মৃদুমন্দ হাওয়া। সেই দিকে চাহিয়া তিলক বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইল। বড় উদার আর অকৃপণ সে হাওয়া।

নৌকার পিছন দিক খুঁটিতে বাঁধা। গলুই বাতাসের অনুকূলে উত্তর দিকে লম্বমান। মাঝ নৌকায় দাঁড়াইয়া তিলক কথা বলিল, 'কিশোর, জাল লাগাইবার সময় হইছে।'

অন্ধকার পাতলা হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের ঘুমও পাতলা হইয়া আসিয়াছে। তিলকের ডাকে তার শেষ সূতাটুকুও ছিঁড়িয়া গেল।

কিশোর ক্ষিপ্র হস্তে হুকা ধরাইয়া সুবলকে ডাকিয়া তুলিল। সুবল ঘুমের গাধা। কিন্তু হুকার আওয়াজ পাইয়া তারও ঘুম টুটিয়া গেল।

পাড়াটার আওতা ছাড়াইয়া তারা দক্ষিণে আগাইয়া গেল। পারের খানিকটা ঢালু। একটু উপর দিয়া সোজা একটা পায়ে-চলা পথ। তার ওপাশে ধানিজমি। যতদূর চোখ যায় কেবল ধানগাছ। ভোরের বাতাসে তাদের শিশু শিরগুলি দুলিতেছে, তাতে একটানা একটা শব্দ হইতেছে। আকাশ বাতাস ঢেউ সব কিছুর প্রাতঃকালীন কোমলতার সহিত তাল রাখিয়া এ শব্দের সুরও ক্রমাগত কোমলে বাজিয়া চলিয়াছে। কিশোরের চোখ জুড়াইয়া গেল। মোড়লের গ্রামের লোকেরা এসকল ধানের জমি লাগাইয়াছে। ধান হইলে ইহারাই সব কাটিয়া নিয়া ঘরে তুলিবে। বাত্যা-বাদলায় নদীতে নামিতে না পারিলেও কিশোরের দেশের মালোদের মত ইহাদের উপবাস দিতে হইবে না।

'বাঁশটা আস্তে চালাইও তিলক। ধানগাছ নষ্ট না হয়। কার জানি এই ক্ষেত। মনে কষ্ট পাইব।'

'তোমার যত কথা। কত রাখালে পাঁজনের বাড়ি দিয়া ক্ষেত নষ্ট করে, কত গাই-গরু চোরা-কামড় দিয়া ধানগাছের মাথা ভাঙে, আম্‌রারে চিন্‌ব কোন্‌–'

তিলকের অর্বাচীনতায় কিশোর চটিয়া উঠিত। কিন্তু এই স্নিগ্ধ সকালবেলার সহিত চটিয়া ওঠা বড় বেমানান। কিশোরের মনের গোপনতায় যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধ সব সময় প্রচ্ছন্ন থাকে, তারই ইঙ্গিত এবার তাকে চটিতে দিল না। সে আগেই তীরে নামিয়াছিল। তিলকের ছুঁড়িয়া-ফেলা বাঁশের আগাটা ক্ষিপ্রগতিতে ধরিয়া তার গতিরোধ করিল এবং তার উদ্যত আঘাত হইতে অবোলা ধান-গাছগুলিকে বাঁচাইল।

জাল লাগানো শেষ হইলে কিশোর নৌকায় উঠিয়া বাঁশের গোড়ায় পা দিল। সুবল পাছার কোরায় হাত দিলে গলুইয়ে গিয়া তিলক লগি ঠেলিয়া নৌকা ভাসাইল। নৌকা মাঝ নদীতে গেলে কিশোর জাল ফেলিল এবং এক আঁজলা জল মুখে পুরিয়া কুলি করিয়া জালে 'বুলানি' দিল।

কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া কিশোর তাহার প্রথম খেউ তুলিল। ইঞ্চিপরিমাণ সরু সরু মাছ—রূপার মত রঙ্, ছোট ছোট ঢেউয়ের মত জীবন্ত। কিশোর ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া এক ঝট্‌কায় 'ডরা'তে ফেলিল, মাছগুলি অনির্বচনীয় ভঙ্গিতে নাচিতে লাগিল। প্রথম খেউয়ের মাছ দেখিয়া কিশোরের চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছে। মাছগুলি দেখিতে এই সকাল বেলার মতই স্নিগ্ধ।

এক সময়ে ধাঁ করিয়া সূর্য উঠিল। নদীর উপর রোদ বিছাইয়া দিল। তাপের আভাস পাইয়া মাছ একযোগে অথই জলে ডুবিয়া গেল। এখন আর তারা জালে ধরা দিবে না। একবার কিশোর জালটা ধপাস করিয়া ফেলিল। এই রকমে ফেলার অর্থ—আজ এই পর্যন্তই। তিলক কোরা গুটাইয়া আগাইয়া আসিল। তারপর দুইজনে মিলিয়া দড়াদড়ির বাঁধাছাঁদা খুলিয়া ফেলিল।

মোড়ল আগেই ঘাটে বসিয়াছিল। প্রথম দিনের মাছ দেখিয়া খুশি হইল। বলিল, 'ছোট জাল্লা, তোমার ত খুব সাইৎ। চল, মাছ ডাঙ্গিতে লইয়া যাই।'

সাঁ সাঁ করিয়া বসন্তের বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলের উপর ঢেউ তুলিয়া। কিশোর ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া যায়। নদীর তাতা থৈ থৈ নাচনের সঙ্গে তার বুকখানাও নাচিয়া উঠে। আকাশে রোদ বাড়ে। সে রোদ যেন নৌকার উপর, তিলকের সুবলের মাথার উপর, আর কিশোরের বুকের উপর সোনা হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোন্ অদৃশ্য শিল্পী এক না-দেখা মোহের তুলি বুলাইয়া তার মনের মাঝখানে অদৃশ্য আনন্দের এক একটা ছোপ লাগাইয়া যায়; থাকিয়া থাকিয়া তার মনে সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম চিন্তার আবির্ভাব হয়। শুকদেবপুরে পল্লীটা কখনো সুবলকে লইয়া একপাক ঘুরিয়া আসে। অনেক গাছগাছালি আছে শুকদেবপুরে। তাতে অনেক আগে পাতা ঝরিয়া গিয়াছিল। এখন নূতন পাতা মেলিয়াছে। কি তুলতুলে মসৃণ পাতা। কিশোরের হৃদয়ের পরদার মত মসৃণ। চাহিয়া থাকিতে খুব ভাল লাগে। একটি বাড়িতে তুলসীলতার পাশে বেড়া দিয়া ফুলের গাছ করিয়াছে। অনেক সুন্দর ফুল ধরিয়াছে। পাপড়িগুলিতে কি সুন্দর বর্ণ-সমাবেশ। কি ফুল চিনিতে না পারিয়া কিশোর দাঁড়াইল। সামনা দিয়া এক কুমারী কন্যা যাইতেছে একগোছা সূতা হাতে করিয়া। কিশোর চলমান সুবলকে হাত ধরিয়া থামাইয়া বলিল, 'দাঁড়া, ফুলেরে আগে দেইখ্যা লই। বড় রঙ্গিলা ফুল। কিন্তু চিন্‌তে পারলাম না। এই মাইয়ারে জিগা, ইটা কি ফুল কইয়া যাক্।'

অকবি সুবল, মনে রঙ-ধরা কিশোরের সমজদার সাথী হওয়ার অনুপযুক্ত সুবল, নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, 'তুমি জিগাও না, আমারে লইয়া টানাটানি কর কেনে?'

'বেশ, আমিই জিগাই।'

বিচারকের সামনে আসামীর মত, এক ফোঁটা মেয়েটার সামনে জোয়ান কিশোর এতটুকু হইয়া গিয়া কোনো রকমে বলিল, 'বিদেশী মানুষ। এ দেশের এই ফুলেরে চিন্‌লাম না। নামখান কি কইয়া যাইতে পার।'

মেয়েটি লজ্জায় উচ্ছলিত হইয়া বলিল, 'মুগরাচণ্ডী। এর নাম মুগরাচণ্ডী ফুল।' বলিয়া, কিশোরের চোখের দিকে চাহিল। কিন্তু চোখ আর নামাইতে পারিল না। সর্পমুগ্ধের মত চাহিয়া থাকিয়াই পরনের বসন-আঁচলে বুকের শিশু স্তনদুটিকে ঢাকিয়া

দিল। তারপর ভয়-পাওয়া হরিণীর মত বড় বড় পা ফেলিয়া একটা ঘরের আড়ালে চলিয়া গেল।

সুবল কিছু টের পাইয়া বলিল, 'যা কও দাদা, তোমার বাসন্তীর মত একটা মাইয়াও কিন্তু শুকদেবপুরে দেখলাম না।'

'আমার বাসন্তী! তুই কি কইলি সুব্‌লা?'

'তোমার সঙ্গে বিয়া হইব। এই ক্ষেপের টাকা লইয়া দেশে গেলেই তোমার সঙ্গে বিয়া হইব। তোমার বাসন্তী কমু না, তবে কি আমার বাসন্তী কমু?'

কিশোর হাসিল ঃ 'নারে সুব্‌লা, না, ঠিসারার কথা না! বাসন্তীরে আমার, তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।'

'মনরে চোখ ঠার' কেনে কিশোর দাদা? বাসন্তী যে তোমার হাঁড়িত্ চাউল দিয়া রাখছে—তুমি ত কম জান না।'

'নারে সুব্‌লা, আমার মন যেমন কয়, কথাখানা ঠিক না। যারে লেংটা থাইক্যা দেখতাছি—ছোটকালে যারে কোলে পিঠে লইছি—হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডর দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি—তারে কি বিয়া করন যায়। বিয়া করন যায় তারে, যার লগে কোনোকালে দেখাসাক্ষাৎ নাই। দেখাসাক্ষাৎ খালি মুখাচণ্ডীর সময়—গীত-জোকারের লগে পিড়ির উপর শাড়ীর ঘোমটা তুইল্যা যখন চোখ মেইলা চায়।—সে হয় সত্যের স্তিরি। আর সগল তো ভইন।'

সুবল ভাবে, কিশোরের মাথার ঠিক নাই। কিন্তু যদি সত্যিই বাসন্তীর সহিত কিশোরের বিবাহ না হয়, তবে বাসন্তীর বিবাহ হইবে কাহার সহিত। সুবল ভাবে।

মনের ভিতর একটা কিছু হইতেছে টের পাইয়া কিশোর কিছু লজ্জিত হয়। বলে, 'আর পাড়া বেড়াইবার দরকার নাই সুব্‌লা, চল্ ফিরা যাই।'

সে-অজানা ভাব অধিকক্ষণ থাকে না। থাকিলে কিশোর পাগল হইয়া যাইত।

সেই স্নিগ্ধ নীলাভ ফাল্গুনী প্রভাত আসে। জাল লাগাইয়া মৃদু নৃত্যপরা তটিনীর বুকের গহনে গুঁজিয়া দেয় সেই জাল। তুলিয়াই দেখে মাছ। রূপার মত সাদা, ছোট ছোট প্রাণচঞ্চল অজস্র মাছ। এক একটা মাছে এক একটা প্রাণ। নৌকার ডরাতে জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে কেমন খেলা করে। দুই মিনিটেই যাদের মৃত্যু, তাঁরা মরণকে অবহেলা করিয়া এমন শান্তচিত্তে ভাসে কি করিয়া। কিন্তু বড় ভাল লাগে দেখিতে। দ্রুততালে জাল তোলা-ফেলার মাঝে কিশোর আত্মহারা হইয়া যায়। তার মনের সকল রকম অস্বস্তি কোথায় আত্মগোপন করে।

চৈত্রের মাঝামাঝি। বসন্তের তখন পুরা যৌবন। আসিল দোল পূর্ণিমা। কে কাকে নিয়া কখন দুলিয়াছে। সেই যে দোলা দিয়াছিল তারা তাদের দোলনায়, স্মৃতির অতলে তারই ঢেউ। অমর হইয়া লাগিয়া গিয়াছে গগনে পবনে বনে বনে, মানুষের মনে মনে। মানুষ নিজেকে নিজে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না—তখন তারা আত্মপর বিচার না করিয়া, সকলকেই রাঙাইয়া আপন করিয়া তুলিতে চায়।

তেমনি রাঙাইবার ধুম পড়িয়া গেলা শুকদেবপুরের খলাতে।

তারা ঘটা করিয়া দোল করিবে, দশজনকে নিয়া আনন্দ করিবে। শুকদেবপুর গ্রামের সকলকেই তারা নিমন্ত্রণ করিল। মোড়লের গাঙের রায়ত হিসাবে কিশোররাও নিমন্ত্রিত হইল। কাল সকাল থেকে রাত অবধি হোলি, গানবাজনা, রঙখেলা, খাওয়া-দাওয়া হইবে।

'খলাতে দোল-পুন্নিমায় খুব আরব্বা হয়। মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে! নাচেত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। পায়ে ঘুঙুরা, হাতে রাম-করতাল। এ নাচ যে না দেখ্‌ছে, সে মায়ের গর্ভে রইছে।'

তিলকের এই কথায় সুবলের খুব লোভ হইল। কিন্তু তার মন অপ্রসন্ন। ধুতি গামছা দুইই তার ময়লা।

কিশোর সমাধান বাতলাইয়া দিল : নদীর ওপারে হাট বসে। সাবান কিনিয়া আনিলেই হয়।

কিন্তু এক টুকরা সাবানের জন্য এত বড় নদী পাড়ি দেওয়া চলে না।

শেষে সমাধান আপনা থেকেই হইয়া গেল।

ভাটিতে বেদের বহর নোঙর করিয়াছে। বেদেনীরা আয়না চিরুনি সাবান বঁড়শি, মাথার কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা লইয়া নৌকা করিয়া শুকদেবপুরের ঘাটে বেসাত করিয়া যায়। সাপের ঝাঁপিও দুই একটা সঙ্গে থাকে।

কিশোরেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। বেলা বাড়িয়াছে। আর একটু বাড়িলে মাছেরা অতলে ডুব দিবে। এখনি যত ছাঁকিয়া তোলা যায় নদী হইতে। উঠিতেছেও খুব। এমন সময়ে এক বেদেনী ডাক দিল। 'অ দাদা, মাছ আছে?'

কিনিতে আসিয়া তারা বড় বিরক্ত করে। তিলক ঝানু লোক। বলিল, 'না মাছ নাই।'

বেদেনীর বিশ্বাস হইল না। বৈঠা বাহিয়া তার বাবুই পাখির বাসার মত নৌকাখানা কিশোরদের নৌকার সঙ্গে মিশাইল। সে তার নিজের নৌকার দড়ি হাতে করিয়া লাফ দিয়া কিশোরের নৌকায় উঠিল। ডরার দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি জাল্লা, মাছ না নাই! চাইর পয়সার মাছ দাও।'

কিশোরের জালে অনেক মাছ উঠিয়াছে। বাঁশের গোড়ায় পা দিয়া, জালের হাতায় টান মারিয়া সে বুক চিতাইল; তার পিঠ ঠেকিল বেদেনীর বুকে।

বেদেনী তরুণী। স্বাস্থ্যবতী। তার স্তনদুইটি দুর্বিনীতভাবে উঁচাইয়া উঠিয়াছে। তার কোমল উন্নত স্পর্শ কিশোরের সর্ব-শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ তুলিল। বাঁশের গুড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া, হাত পা ভাঙিয়া সে হয়ত একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। বেদেনী এক হাত ডান বগলের তলায় ও অন্য হাত বাম কাঁধের উপরে দিয়া বুক পর্যন্ত বাড়াইয়া কিশোরকে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। অবলম্বন পাইয়া কিশোর পড়িয়া গেল না। কিন্তু দিশা হারাইল। বেদেনীর বুকটা সাপের মত ঠাণ্ডা। তারই চাপ হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, 'অ দাদা পড় কেনে। আমারে ধরবার পার না?'

তিলক গলুই হইতে ডাকিয়া বলিল, 'অ বাদ্যানী, তুমি তোমার নাওয়ে যাও।'

'তুমি বুড়া মানুষ, তোমার সাথে আমার কি? আমার বেসাতি এই জনার সাথে।' সে কিশোরের কাঁধের উপর হাত দিয়া আবার তার বুকখানা কিশোরের পিঠে ঠেকাইতে গেল।

'এ জনা তোমার কোন্ জনমের কুটুম গো?'

'শকুন্যা বুড়া, উকুইন্যা বুড়া, তুই কথা কইস্ না, তুই কেম্‌নে জান্‌বি এজনা আমার কি?'

নিজের লোককে গাল দিতেছে। উভয়সঙ্কটে পড়িয়া কিশোর বলিল, 'অ বাদ্যানী, তুমি অখন তোমার নাওয়ে যাও।'

'মাছ দিলেই যাই। বাস করতে কি আইছি?'

'এই নেও চাইর পয়সার মাছ। এইবার যাও।'

'মাছ পাইলাম, কিন্তু মানুষ ত পাইলাম না। তুমি মনের মানুষ।'

'নাগরালি রাখ। আমার তিলকের বড় রাগ।'

'রাগের ধার ধারি না। মনের মানুষ থুইয়া যাই, শেষে বুক থাপড়াইয়া কান্দি। অত ঠকাঠকির বেসাতি আমি করি না।'

কিশোরের হাসি পাইল। বলিল, 'এক পলকে মনের মানুষ হইয়া গেলাম। তোমার আগের মনের মানুষ কই?'

'উইড়া গেছে, সময় থাকতে বান্ধি নাই, তোমারে সময় থাকতে বান্ধ্‌তে চাই।'

'কি তোমার আছে গো বাদ্যানী, বান্ধ্‌বা কি দিয়া?'

'সাপ দিয়া। ঝাঁপিতে সাপ আছে—'

বেদেনী ঝাঁপি খুলিয়া দুই হাতে দুইটা সাপ বাহির করিয়া আনিল। আগাইয়া দিল কিশোরের গলার কাছে।

কিশোর ভয় পাইয়া বলিল, 'অ বাদ্যানী, তুমি তোমার সাপ সরাও। বড় ডর করে।'

'সরাইতে পারি, যদি আমার কথা রাখ'।

'কি কথা, কও না।'

'আর দুইটা মাছ ফাও দেও—'

'এই নেও!' কিশোর অপ্রসন্ন মুখে কতকগুলি মাছ তুলিয়া দিয়া বলিল, 'এইবার তুমি যাও।'

'যাই। তুমি বড় ভাল মানুষ। তুমি আমার নাতিন-জামাই।'

কিশোর স্বর্গের ইন্দ্রসভা হইতে এক ঠেলায় মাটিতে পড়িয়া গেল!

বেদেনী বিজয়িনীর বেশে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সুবল ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'অ বাদ্যানী, তোমার কাছে সাবান আছে? আমারে দুই পয়সার সাবান দিয়া যাও।'

গান শুরু হওয়ার আগেই তিন জনে সাজ-গোজ করিয়া খলায় উপস্থিত হইল। সাজের মধ্যে, ধুতি ঢিলা করিল, গামছা কাঁধ হইতে কায়দা করিয়া বুকে ঝুলাইল। পেশীবহুল বাহু বুক এই সজ্জাতেই শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। গিয়া দেখে অপরূপ কাণ্ড।

মোড়লের বড় বড় চারিটা বিল আছে। বর্ষাকালে চারি দিক জলে একাকার হইয়া যায়। তখন দেশদেশান্তরের মাছ, এই সব বিলে আসর জমায়। জল কমিয়া আসিলে মোড়লের লোকেরা বিলগুলিতে বাঁধ দেয়। সব মাছ তখন বন্দী হয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ রুই কাতলা নান্দিল মৃগেল মাছ। দূরদূরান্তরের গ্রাম হইতে মালোদের অনেক নৌকা আসে। এক-একটি নৌকাতে থাকে চার পাঁচজন পুরুষ ও পনের কুড়িজন স্ত্রীলোক। এমন ভাবে বারো গাঁয়ের বারো রকম মালো নরনারী এক জায়গায় জড়ো হয়। ছয় মাসের স্থায়িত্ব নিয়া বড় বড় চালাঘর উঠিতে থাকে। একেকটা চালা একদৌড়ের পথ লম্বা।

কারোর সঙ্গে কারোর কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। এখানে আসিয়া সকলে এক সংসারের লোক হইয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে খায়, থাকে, কাজ করে। মহোৎসবের রান্নার মত স্তূপাকারে ভাত তরকারি রান্না হয়। ঢালা পংক্তিতে বসিয়া খায়। মুখ ধুইয়া আবার কাজে বসে।

কি অত কাজ? না, মেয়েরা বঁটি মেলিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া যায়। পুরুষেরা মাছের ঝুড়ি ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাহাদের পাশে স্তূপ করিতে থাকে। মেয়েদের হাত চলে ঠিক কলের মত। এতবড় মাছটাকে পলকে ঘুরাইয়া পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া মারে, সে-মাছ যথাস্থানে জড় হয়। আরেক দল পুরুষ সেখান হইতে নিয়া ডাঙ্গিতে তোলে শুকাইবার জন্য। দিনের পর দিন এই ভাবে তিন মাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সারিয়া তারা যার যার দেশে পাড়ি জমায়। ইহাকে বলে 'খলা-বাওয়া।'

তারা ঝুড়িভরা আবির আনিয়াছে। গামলাভরা রঙ্ গুলিয়াছে। চৌকোণা চার-থাকের একটা মাটির সিঁড়ির উপর দুই পাশে পোঁতা দুইখানা বাঁশের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া একখণ্ড সালু কাপড়ে একটি ছোট গোপাল ঝুলাইয়াছে। নিতান্তই নাড়ু গোপাল। পাশে রাধা নাই। হামা দিয়া হাত বাড়াইয়া লাল কাপড়ের বাঁধনে লট্‌কাইয়া একা একাই ঝুলিতেছে। এক-একজন আসিয়া তার গায়ে মাথায় আবির মাখাইয়া একটা করিয়া দোলা দিয়া যায়। তারই দোলনে সে অনবরত দুলিয়া চলিয়াছে।

এ-পক্ষ প্রস্তুত। শুকদেবপুরের দল এখনো আসিয়া পৌঁছায় নাই। আপ্যায়নকারীদের একজন তিলকদিগকে ঠাকুরের কাছে নিয়া ঝুড়ি হইতে কয়েক মুঠা আবির একখানা ছোট পিতলের থালিতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'ঠাকুরের চরণে আবির দেও।'

প্রেমের দেবতা কোথায় কার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখে কেউ কি তা বলিতে পারে? উজানিনগরের খলাতে কিশোর এমনি একটা ফাঁদে ধরা পড়িল। কার সঙ্গে কার জোড়াবাঁধা হইয়া থাকে তাও কেউ বলিতে পারে না। যাকে জীবনে দেখি নাই হঠাৎ একদিন তাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন চিরজনমের আপন। প্রেমের দেবতা অলক্ষ্যে কার সঙ্গে কখন কার গাঁটছড়া বাঁধিয়াছেন কেউ জানে না।

তারা ত তিনজনে গোপালকে আবিরে রঞ্জিত করিল। তারপর কয়েকজন পুরুষ মানুষ তাহাদের গালে মাথায় আবির দিয়া রাঙাইবার পর তিন চার জন স্ত্রীলোক আবিরের থালা লইয়া আগাইয়া আসিল। কয়েকজন কিশোরের কাছে মাতৃসমা। তারা কিশোরের কপাল রাঙাইল। আশীর্বাদের মত সে-আবির গ্রহণ করিয়া কিশোর নিজে তাদের পায়ে আবির মাখাইয়া কপালে পায়ের ধুলা ঠেকাইল।

কয়েকজন তরুণী। বোন বৌদিদের বয়সী। তারা আবির লাগাইল গালে আর কপালে। কিশোর নীরবে গ্রহণ করিল। গোলমালে ফেলিল আর একজন।

অবিবাহিতা মেয়ে। দেহে যৌবনের সব চিহ্ন ফুটিয়াছে। সে-সব ছাপাইয়া বহিয়াছে রূপের বান। বসন্তের এই উদাত্ত দিবসে মনে লাগিয়াছে বাসন্তী রঙ্। প্রাণে জাগিয়াছে অজানা উন্মাদনা। পঞ্চদশী। বড়ই সাংঘাতিক বয়স এইটা। মনের চঞ্চলতা শরীরে ফুটিয়া বাহির হয়। হইবেই। মালোর মেয়েরা বিবাহের আগে অত বড় থাকে না। অতখানি বড় হয় বিবাহের দুই তিন বছর পরে। কোথা হইতে কেমন করিয়া এই অনিয়ম এখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিশোরের গালে আবির দিতে মেয়েটার হাত কাঁপিল; বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তার ছন্দময় হাতখানার কোমল স্পর্শ কিশোরের মনের এক রহস্যলোকের পদ্মরাজের ঘোমটা-ঢাকা দলগুলিকে একটি একটি করিয়া মেলিয়া দিল। সেই অজানা স্পর্শের শিহরণে কাঁপিয়া উঠিয়া সে তাকাইল মেয়েটির চোখের দিকে। সে-চোখে মিনতি। সে-মিনতি বুঝি কিশোরকে ডাকিয়া বলিতেছে ঃ বহুজনমের এই আবিরের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমারই জন্যে। তুমি লও। আমার আবিরের সঙ্গে তুমি আমাকেও লও।

থালা সুদ্ধ তার অবাধ্য হাত দুইটি কাঁপিতেছে। লজ্জায় লাল হইয়া সে চোখ নত করিল। তাকে বাঁচাইল তার মা। মাথার কাপড় একটু টানিয়া সলজ্জভাবে তার মেয়েকে নিজের বুকে আশ্রয় দিল।

কিশোরের ধ্যান ভাঙিল সুবল। হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, 'অ দাদা, গানের আসরে চল।'

শুকদেবপুরের অর্ধেক পুরুষ মাছধরায় গিয়াছে। মোড়ল গিয়াছে একটা শুক্না বিল লইয়া বাসুদেবপুরের লোকদের সঙ্গে পুরানো একটা বিবাদ মিটাইতে। শুকদেবপুরের নারীরা আসিয়া খলার নারীদের সহিত মিশিল। পুরুষেরাও আসিল ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া।

পুরুষেরা কতক্ষণ রঙ-মাখামাখি করিয়া শ্রান্তদেহে চাটাইয়ের উপর বসিয়াছে। ওদিকে মেয়েদের রঙ-মাখামাখির পালা চলিতেছে, এদিকে পুরুষদের হোলি-গান শুরু হইয়াছে। একজনকে সাজাইয়াছে হোলির রাজা। তার গলায় কলাগাছের খোলের মালা, মাথায় কলাপাতার টোপর, পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। মাঝে মাঝে উঠিয়া কোমর বাঁকাইয়া নাচে, আবার বসিয়া বিরাম নেয়। বুড়া মানুষ।

বহুদিন পরে আনন্দের আমেজ পাইয়া তিলকের এইরূপ হোলির রাজা হইবার ইচ্ছা করিতেছিল। কিশোরের কানে কানে বলাতে উত্তর পাইল, 'আমরা বিদেশী মানুষ। সভ্য হইয়া বইসা থাকাই ভাল। নাচানাচি করলে তারা পাগলা মনে করব।' কিন্তু তিলক

দমিবার লোক নয়। সে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল। গানের সম যখন চড়িবে, ঝুমুরের তাল উঠিবে, তখন সে কোনেদিকে না চাহিয়া আসরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নাচিবে। একবার কোনোরকমে উঠিয়া কয়েক পাক নাচিতে পারিলে, লজ্জা ভাঙিয়া যায়, কোনো অসুবিধা হয় না।

গায়কেরা দুই দলে পৃথক হইয়া গান জুড়িল। রাধার দল আর কৃষ্ণের দল।

রাধার দল ভদ্রভাবে গান তুলিল ঃ

সুখ-বসন্তকালে, ডেকোনারে
অরে কোকিল বলি তুমারে৷৷
বিরহিনীর বিনে কান্ত হৃদাগ্নি হয় জ্বলন্ত,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে হয়নারে শান্ত।
সে-যে ত্যজে' অলি কুসুম-কলি রইল কি ভুলে৷৷

কৃষ্ণের দল সুর চড়াইল :

বসন্তকালে এলরে মদন—
ঘরে রয় না আমার মন৷৷
বিদেশে যাহার পতি,
সেই নারীর কিবা গতি,
কতকাল থাকিবে নারী বুকে দিয়া বসন৷৷

রাধার দল তখনও ধৈর্য ঠিক রাখিয়া গাহিল :

বনে বনে পুষ্প ফুটে,
মধুর লোভে অলি জুটে,
কতই কথা মনে মনে উঠে সই—
ব্যথা কার বা কাছে কই৷৷
দারুণ বসন্তকাল গো,
নানা বৃক্ষে মেলে ডাল গো,
বসিয়া তরুর শাখে কুহু কুহু কোকিল ডাকে,
আরে সখিরে এ-এ-এ—

কৃষ্ণের দল এবার অসভ্য হইয়া উঠিল :

আজু শুন্ ব্রজনারী,
রাজোকুমারী, তোমার যৌবনে করব আইন-জারি।
হস্তে ধরে নিয়ে যাব,
হৃদ্কমলে বসাইব—রঙ্গিনী আয় লো—
হস্তে ধরে নিয়ে যাব, হৃদকমলে বসাইব।
বসন তুলিয়া মারব ঐ লাল-পিচোকারী—

রাধার দল এই গানের কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, এমন সময় মেয়েদের তরফ হইতে আপত্তি আসিল, পুরুষদের গান এখানেই শেষ হোক। দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। এখন মেয়েদের গান আরম্ভ করিতে হইবে।

রসাল প্রসঙ্গ পাইয়া তিলক মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়াছিল রাধার দল কৃষ্ণপক্ষকে কড়া একটা উত্তর দিয়া আরও চেতাইবে, তারপর কৃষ্ণপক্ষের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে উঠিবে। তার আশাভঙ্গ হইল।

দোল-মণ্ডলের চারিদিকে খলার ও শুকদেবপুরের মেয়েরা সেদিন একাকার হইয়া গিয়াছে। কারো হাতে একজোড়া রাম-করতাল কারো বা শুধু-হাত।

একসঙ্গে অনেকগুলি করতাল বাজিয়া উঠিল। ঝা ঝা ঝম্ ঝম্ ঝা ঝা ঝম্ ঝম্ শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দিল। তার সঙ্গে অনেকগুলি কাঁকনপরা হাতের মিলিত করতালি। তারপর অনেকগুলি মেয়ের পা একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল। অনেকগুলি মেয়ের কণ্ঠ একসুরে গাহিয়া উঠিল। কিশোরের মন এক অজানা আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেল।

দলের ভিতরে সেই মেয়েটিকেও দেখা গেল। মার পায়ের দিকে তাকাইয়া সেও তালে তালে পা ফেলিতেছিল। কিশোরের সহিত চোখাচোখি হইয়া সে তাল কাটা পড়িল। পা আর উঠিতে চাহিল না। মা সস্নেহে মুখ ঘুরাইয়া চাহিয়া দেখে, মণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া মেয়ের পা দুটি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আর ঘন ঘন লাজে রাঙা হইয়া উঠিতেছে। কারণ কি, না, অদূরে দাঁড়াইয়া কিশোর তাহাকেই দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া যেন গ্রাস করিতেছে।

মণ্ডলের তালভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া মা তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। মণ্ডল-ছাড়া হইয়া সে আরও বিপন্ন বোধ করিল। এইবার সে কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। দমকা হাওয়ার মত একটা আকস্মিক শব্দে মেয়েদের কণ্ঠপদ স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃদু তরঙ্গায়িত অনুরাগে যেন সহসা জাগিল ঝঞ্ঝার বিক্ষোভ। শুকদেবপুরের পুরুষ যারা উপস্থিত ছিল, চক্ষুর পলকে উঠিয়া মালকোঁচা মারিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। যে-ঘরে লাঠিসোঁটা থাকে সে ঘরে ঢুকিয়া কয়েকজনে বিদ্যুতের গতিতে লাঠির তাড়া বাহির করিয়া আনিল। সাজ সাজ রবে খলা তোলপাড় হইয়া উঠিল।

মেয়েদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আক্রমণকারীদের কয়েকজন লাঠি হাতে মেয়েদের দলে পড়িয়া লাফালাফি করিতেছে। একজন সেই বিমূঢ়া মেয়ের দিকে আগাইয়া আসিতেছে যেন। এইবার কিশোরের চৈতন্য হইল। সে লাফাইয়া মেয়েটার সামনে পড়িয়া দুর্বৃত্তের গতিরোধ করিল। তার লাঠি তখন আকাশে আস্ফালন করিয়া কিশোরের মাথায় পড়ে আর কি। ঠিক সেই মুহূর্তে শুকদেবপুরের একজনের বিপুল এক লাঠির ক্ষিপ্ত আঘাত আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করিল। তার হাতের লাঠি লক্ষ্যচ্যুত হইয়া কিশোরের মাথায় না পড়িয়া হাতে পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে মুমূর্ষুর হাত হইতে সেই লাঠি ছিনাইয়া লইয়া সে আগাইয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে টান পড়ায় ফিরিয়া দেখে তার ধুতির খুঁট দুই হাতে মুঠা করিয়া ধরিয়া মেয়েটা মূর্ছা যাইতেছে।

তারপর শত শত কণ্ঠের সোরগোলের মধ্যে শত শত লাঠির ঠকাঠক ঠকাঠক শব্দ হইতে লাগিল। কারো হাত ভাঙিল, পা ভাঙিল, কারো মাথা ফাটিল। আক্রমণকারীদের অনেকেই আর ফিরিয়া গেল না। রক্তাক্ত দেহে এখানেই পড়িয়া রহিল। অন্যেরা লাঠি ঘুরাইয়া পিছু হটিতে হটিতে খোলা মাঠে নামিয়া দৌড় দিল।

ইহারই পটভূমিকায় কিশোর মূর্ছিতা মেয়েটাকে পাঁজা-কোলা করিয়া তুলিয়া ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল, 'এর মা কই, এর মা কই! ডরে অজ্ঞান হইয়া গেছে। জল আন, পাংখা আন।'

মেয়েটার চুলগুলি আল্‌গা হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। গলা টান হইয়া মাথাটা এলাইয়া পড়িয়াছে। বুকটা চিতাইয়া এতখানি উঁচু হইয়াছে যে, কিশোরের নিঃশ্বাস লাগিয়া বুঝিবা আবরণটুকু খসিয়া যায়।

মা এক জায়গায় দাঁড়াইয়া তখন কাঁপিতেছিল। কিশোরের ডাকে সম্বিৎ পাইয়া ভাঁড়ারঘর হইতে তেলজল পাখা আনিয়া দিল। কিশোর তেলে-জলে এক করিয়া গায়ের জোরে ঘুঁটিয়া দিয়া হাতের তালুতে চাপিয়া চাপিয়া মাথায় দিতে দিতে মেয়েটা চোখ মেলিয়া চাহিল।

'আপনের মাইয়া আপ্‌নে নেন', বলিয়া কিশোর ত্যাগ দেখাইল!

কথা কয়টি ঠিক জামাইর মুখের কথার মত হইয়া মেয়ের মার কানে গিয়া ঝঙ্কার তুলিল।

সেইদিন হইতে এক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়া রহিল। বাসুদেবপুরের ওরাও কম নয়। সংখ্যায় তারা বেশি, দাঙ্গাতেও খুব ওস্তাদ। শুকদেবপুরের মালোরাও বিপদ আসিলে পিছ-পা হয় না। বিশেষত, তাহাদের মোড়লকে ইহারা আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঝগড়টা ছিল অনেক দিন আগের। বিনা রক্তপাতে যাহাতে মীমাংসা হয় তারই চেষ্টা করিতে মোড়ল তাহদের গ্রামে গিয়াছিল। আর ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই শুকদেবপুরের মালোরা স্থির থাকিবে কি করিয়া? একটা মহাপ্রলয়ের আভাস লইয়া প্রহরগুলি অতিক্রান্ত হইতে থাকিল। পুরুষদের প্রস্তুতির আড়ম্বর আর নারীদের আতঙ্কের নিঃশ্বাসে শুকদেবপুরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। প্রতি ঘর হইতে বাহির হইতে লাগিল লাঠির তাড়া, চোখাচোখা মুলিবাঁশের কাঁদি, এককেঠে, কোচ, চল্ প্রভৃতি নানাবিধ সরঞ্জাম। সবকিছু সাজাইয়া গোছাইয়া লইয়া মালোরা একটিমাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিশোরের মনে একটা অস্বাভাবিক আশা জাগিয়াছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে। আশাটা আরও অস্বাভাবিক এইজন্য : সে নিজে কাউকে কিছু বলিতে পারিবে না, তাকেই বরং কেউ আসিয়া বলুক। মনে মনে সে কল্পনার রঙ ফলায় : আচ্ছা এমন হয় না, মেয়েপক্ষ কেউ আসিয়া তাকে বলে, 'অ কিশোর, এই কন্যা তোমারে দিলাম, লইয়া গিয়া বিয়া কর।'

খলার কাছে নদী-স্রোতের একটা আড় পড়িয়াছে। বিকালে সেখানে জাল ফেলিতে যাইয়া কিশোর বলিল, 'আজ জাল লাগামু গিয়া খলার ঘাটে।'

খলার ঘাটে গিয়া কিশোর বাঁশের আগায় জাল জুড়িতেছে আর তৃষিতের দৃষ্টিতে ঘরগুলির দিকে তাকাইতেছে।

তাহারই সমবয়সের একটি তরুণকে খলার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখা গেল। লাকটা কিশোরের নৌকার দিকেই আসিতেছে। তার এদিকে আসার কি হেতু থাকিতে পারে?

কিশোর ভাবিয়া রোমাঞ্চিত হইল ঃ এ বোধ হয় তারই কোনো ভাই হইবে। আসিতেছে সম্বন্ধের কথা চালাইতে। এ না হইয়া যায় না।

সত্যই লোকটা কিশোরের নিকট আসিয়া আত্মীয়তার ভঙ্গিতে কথা বলিল।

'আপ্নেরার দেশ নাকি সুদেশ। দেখতে ইচ্ছা করে। কায়স্থ্ আছে, বরাহ্মন্ আছে, শিক্ষিৎ লোক আছে। বড় ভাল দেশে থাকেন আপ্নেরা।'

সময় নাই। এখনই জাল ফেলিতে হইবে। শিক্ষিৎ লোকের দেশে থাকার যে কি কষ্ট, আর এদের মত দেশে থাকার যে কি সুখ, এ কথাগুলি অনেক যুক্তিপ্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিবার কিশোরের সময় নাই। কিশোর কেবল শুনিয়া গেল।

'আপ্নের সাথে একখান্ কুটুম্বিতা করতে চাই।'

কিশোরের সকল শিরা-উপশিরা একযোগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

বলিল, 'আম্‌রা গরীব মানুষ, আম্‌রার সাথে কি আপ্নেরার কুটুম্বিতা মানায়?'

'গরীব ত আম্‌রাও। গরীবে গরীবেই কুটুম্বিতা মানায়। কি কন্ আপ্নে?'

এই কুটুম্বিতার জন্য কিশোর যে কতখানি ব্যাকুল, এই অনভিজ্ঞ ছেলেটাকে কিশোর সে কথা কি করিয়া বুঝাইবে। না বলিয়া দিলেও সে কি নিজেনিজেই বুঝিয়া লইতে পারে না?

কিশোরের মনের আকাশে রঙ ধরিল। জানিয়া শুনিয়াও কেবল পুলকের তাড়নায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কুটুম্বিতা করতে চান?'

'বন্ধুত্তি, আপ্নের-আমার মধ্যে বন্ধুত্তি। কত দেশে ঘুরলাম, মনের মত মানুষ পাইলাম না। আপ্নেরে দেইখ্যা মনে অইল, এতদিনে পাইলাম।'

'আচ্ছা, বন্ধুত্তি করলাম বেশ।'

'মুখে-মুখের বন্ধুত্তি না। বাদ্য-বাজনা বাজাইয়া কাপড়-গাম্‌ছা বদল কইরা—'

বাদ্য-বাজনা বাজাইয়া একটা আড়ম্বর করা যায় কি রকম কাজে—সে কেবল, ঐ মেয়েটাকে লইয়া করা যায়। মিতালি করা মুখের কথাতেই হয়। ওকাজে কি বাদ্য-বাজনা জমে, না, ভাল লাগে? কিশোর খুশির স্বর্গ হইতে মরুর বালিতে পড়িয়া বলিল, 'আমার সাথে না, সুব্‌লার সাথে গিয়া আপ্নে বন্ধুত্তি করেন।'

একদিন দুপুরের রোদ ঠেলিয়া বিলের পার দিয়া মোড়লকে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল।

মোড়লের মুখের দিকে তাকানো যায় না। পর্বতপ্রমাণ কাঠিন্য আসিয়া আশ্রয় করিয়াছে। ভয়ঙ্কর একটা-কিছু যে ঘটিতে যাইতেছে তাহাতে কাহারো দ্বিমত রহিল না!

এইরূপ সময়ে একদিন মোড়লের বাড়িতে কিশোরের ডাক পড়িল।

কিশোর ছিল অন্যরকম চিন্তায় বিভোর। সে রাতদিন কেবল ভাবিয়া চলিয়াছিল ঃ কোনো-একটা অলৌকিক উপায়ে ঐ মেয়েটির সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন হইতে পারে কিনা। তাহা না হইলে কিশোরের বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? কে তাহার পক্ষ হইতে উহাদের কাছে কথাটা তুলিবে।

মোড়লের কাছে খুলিয়া বলা যাইত। কিন্তু তার মনের যা অবস্থা।

এমন সময়ে মাড়লের ডাকে কিশোর ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মোড়লের কথা বলিবার সময় নাই। হাতে ইসারা করিয়া মুখে শুধু বলিল, 'আমার স্তি রাচারে ডাক্‌ছে।'

এখানে কাজ এত আগাইয়া রহিয়াছে, অথচ কিশোর ইহার কিছুই জানে না। সে মোড়ল-গিন্নির পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইতেই, গিন্নি তাহাকে একটা ঘরের ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে নূতন একটা শাড়ি পরিয়া, পানের রসে ঠোঁট রাঙা করিয়া, এবং গালে-মুখে তেলের ছোপ লইয়া সেই মেয়েটা বারবার লাজে রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

মোড়ল গিন্নির হাতে দুইটি ফুলের মালা। একটি কিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'শাস্ত্র মতে বিয়া কইর' দেশে গিয়া। অখন মালাবদল কইরা রাখ।'

মালাবদল হইয়া গেলে, মোড়ল-গিন্নি হঠাৎ ঘরের বাহির হইয়া শিকল তুলিয়া দিল।

মেয়েটি ভয় পাইয়াছিল। দরজা বন্ধ, অন্ধকার ঘর। কারো মুখ কেউ দেখিতে পায় না। অবশেষে কিশোর তাহার ভয় দূর করিল।

পরে মোড়ল-গিন্নি শিকল খুলিয়া বন্দীকে মুক্তি দিয়া বাহির করিয়া দিল; আর বন্দিনীকে ভগিনীস্নেহে স্নান করাইয়া দিয়া রান্নাঘরে নিয়া বসাইল। কিশোরকে বলিয়া দিল, 'দেখ জাল্লা উতলা হইয়া পাখির মত পাখ্‌ বাড়াইও না, রইয়া-সইয়া আগমন কইর।'

পরের দিন মেয়ের মা দেখিতে আসিল। মোড়ল-গিন্নিকে বলিল, 'মালাবদল হইয়া গেছে ত?'

'হ, হইয়া গেছে।'

'আর দেখাসাক্ষাৎ করাইও না মা। অমঙ্গল হয়। দেশে গিয়া আগে শাস্ত্রমতে বিয়া হোক। কপালের কি গরদিস মা। জামাই পাইয়া মাইয়া আমার পর হইয়া গেল। আমার ত তাতে কোন অনাহলাদ নাই। অখন ঘরের মানুষরে নিয়া কথা। সে-মানুষে না জানি কি করে।'

সকল কথা শুনিয়া সুবল আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলে, 'দাদা, তা অইলে বাসন্তীরে তুমি এখানেই পাইয়া গেলা। অখন দেশের বাসন্তীরে কার হাতে তুইল্যা দিবা কও।'

'তোর হাতে দিয়া দিলাম।'

সুবলের মনে একটা আশার রেশ গুন্ গুন্ করিয়া উঠে।

যে-মেঘ একটু একটু করিয়া আকাশে দানা বাঁধিতেছিল, তাহাই কাল-বৈশাখের ঝড়ের আকারে ফাটিয়া পড়িল।

মোড়লের মোটে সময় নাই। এক ফাঁকে দুই এক কথায় জানাইয়া দিল, খলার পরবাসীদিগকে দুই একদিনের মধ্যেই খলা ভাঙিয়া যার যার দেশের দিকে পাড়ি দিতে হইবে। কিশোরকেও মোড়ল ভুলিল না। মেয়ের বাপের সামনে তাহাকে ডাকাইয়া নিয়া বলিল, কন্যা পাইয়াছ। দেশে নিয়া ধর্মসাক্ষী করিয়া বিবাহ করিও। সে তোমার

জীবনের সাথী, ধর্মকর্মের সাথী, ইহকাল পরকালের সাথী। তাকে কোনদিন অযত্ন করিও না।—আর, কাল তোমার শুক্‌না মাছ বিক্রি হইয়া যাইবে। খলাভাঙার দলের সাথে তুমিও দেশের দিকে নাও ভাসাইও। আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।

মোড়লের সত্যই সময় নাই। মোড়ল উঠিয়া পড়িল।

মেয়ের বাপ সামনে বসিয়া আছে। রাগী মানুষ। তাহার কাছে কিশোর নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিল।

বাপ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'নাম কি আপ্‌নের?'

'শ্রীযুক্ত কিশোরচান মুলব্রেক্ষণ। পিতা শ্রীযুক্ত রামকেশব মুলব্রেক্ষণ। নিবাস গোকন্নঘাট, জিলা ত্রিপুরা।'

লোকটা এক টুক্‌রা কাগজে টুকিয়া লইল।

কিশোর নত হইয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, লোকটা খলার দিকে চলিয়া যাইতেছে।

খলার ঘাটে সবগুলি নৌকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। ওপারে বাসুদেবপুরবাসীরা এরই মধ্যে লাঠি কাঁধে ফেলিয়া মালকোঁচা মারিয়া পথে নামিয়া পড়িয়াছে। এপারে খলার ঘাট হইতে তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; কিশোরের মনে হইতেছিল, আকাশকোণের কোনো মেঘলোক হইতে একখন্ড কালো মেঘ যেন ঝটিকার আভাস লইয়া দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। অতদূর হইতেও ইহাদিগকে কি ভীষণ আর কি কালো দেখাইতেছে। মোড়লকে ফেলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া কিশোরের মনে বড় কষ্ট হইল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, এত লোকজন, এত টাকাপয়সা, কাজ-কারবারের মধ্যে থাকিয়াও লোকটা কত অসহায়। আর মোড়ল-গিন্নি! সে আরও অসহায়। কিন্তু যাইতেই হইবে, মোড়লের কড়া হুকুম—গাঙের বিদেশী রায়তদের সে কিছুতেই বিপদে জড়াইবে না।

আজ বিলের পাড়ে প্রলয় কাণ্ড হইবে। তার আগেই নৌকা-বিদায়ের পালা।

নৌকা বিদায় বড় মর্মস্পর্শী। নববধূকে নৌকায় তুলিয়া দিতে আসিয়া মোড়লগিন্নি কাঁদিয়া ফেলিল। তার চোখে জল দেখিয়া কিশোরেরও বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চায়।

বধূ পা ধুইয়া নমস্কার করিয়া নৌকায় উঠিলে, দুইখানা নৌকা এক সঙ্গে বাঁধন খুলিয়া দিল। একটি কিশোরের অন্যটি মেয়ের বাপের।

কতক্ষণ তাহারা পাশাপাশি চলিল। তারপর মেঘনার পশ্চিম পারের একটা শাখানদীর মুখ লক্ষ্য করিয়া উহাদের নৌকার মুখ ঘুরাইল। উহাদের নৌকাখানা দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখনো অনেক দূরে যায় নাই। এখনো মানুষগুলিকে চেনা যায়। এখনো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ও-নৌকায় একটি যৌবনোত্তীর্ণা নারী চোখে আঁচল-চাপা দিয়া কাঁদিতেছে। এখন গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। আরও ওই যে কঠিন-হৃদয় পুরুষ মানুষটি, তারও কাঠিন্য গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। সে কাঁধের গামছা তুলিয়া নিয়া দুই চোখে চাপা দিয়াছে।

তাহাদিগকে আর চেনা যায় না। কিশোরের নৌকার একটি নারী-হৃদয়ের তখন সকল বাঁধ ভাঙিয়া কান্নার প্লাবন ছুটিয়াছে।

সারা বেলা নৌকা বাহিয়া, বিকাল পড়িলে তিলকের মাথায় এক সমস্যা আসিয়া ঢুকিল। খানিক ভাবিয়া নিয়া, নিজেনিজেই সেই সমস্যার সমাধান করিয়া বলিল, 'ডাকাইতের মুলুক দিয়া নাও চালামু, তার মধ্যে আবার মাইয়ালোক। আমি কই, কিশোর, তুমি একখান কাম কর। পাটাতনের তলে বিছনা পাত। কেউ যেমুন না দেখে, না জানে।'

কিশোর নৌকার তলায় কাঁথা বালিশ দিয়া বধূর প্রবাস-জীবনের স্থায়ী শয্যা রচনা করিল।

রাত্রি হইলে এক স্থানে নৌকা বাঁধিয়া রান্না-খাওয়া সারিল, বৌকে তুলিয়া খাওয়াইল, আবার সেইখানেই লুকাইয়া রাখিল।

শুইবার সময় কিশোরের হাবভাব লক্ষ্য করিতে করিতে তিলক এক ধমক দিয়া বলিল, 'আমি বুড়া-মাইন্‌ষে একখান কথা কইয়া থুই কিশোর, নাওয়ের ডরার ভিত্‌রে নজর লাগাইও না কিন্তুক্।'

লজ্জা পাইয়া কিশোর সুবলকে লইয়া এক বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরের দিন আবার আঁধার থাকিতে নাও খুলিয়া দিল।

তিলকের এমনই কড়া শাসন যে, তাহাকে স্পর্শ করাত দূরের কথা তাহাকে চোখে দেখার পর্যন্ত উপায় নাই। খাওয়ানো-শোওয়ানোর ভার পড়িয়াছে সুবলের উপর। কিশোর নিজে নৌকার মালিক হইয়াও এ বিষয়ে তিলকের আইন মানিয়া লইতে বাধ্য হইল।

নৌকার পাছায় কোড়া টানিতে টানিতে সুবল জিজ্ঞাসা করিল, 'অ দাদা, বৌ তুমি মনের মত পাইছ ত?'

কিশোর সলজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, 'কি কইরা কইরে ভাই। ভাল কইরা দেখলাম না, জানলাম না। কোন্ দিন দেখছিলাম, মনেঅ নাই। বিস্মরণ হইয়া গেছে। অখন আর চেহারা-নবুনা মনেই পড়ে না। কেউ বদলাইয়া দিয়া গেলেও চিন্‌তে পারুম না।'

চৈত্রমাস গিয়াছে। গ্রীষ্মের বৈশাখেই এ নদীতে জল বাড়িতে থাকে আর উজানি স্রোত বহিতে শুরু করে। নদীর তীরে ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত। তার সরু আল অবধি জল লুটাইয়া পড়িয়াছে। গুণের কাঠি হাতে কিশোর লাফ দিয়া তীরে নামিল।

কিশোর অমানুষিক শক্তিতে গুণ টানে আর নৌকা সাপের মত সাঁতার দিয়া স্রোত ঠেলিয়া চলে। লম্বা গুণ। অনেক দূরে থাকিয়া টানিতেছে। সুবল হাল ঠিক রাখিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। তাহাকে ছোট দেখাইতেছে। একটি জায়গা হইতে নদীর পার ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাতা-জল ভাঙিতে ভাঙিতে এক সময়ে হাঁটু জলে গিয়া পড়িল হাঁটু জল ক্রমে কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইল। কটির কাপড় ভিজাইয়া কিশোর কোমর জল ভাঙিয়াই গুণ টানিতেছে। সুবল চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু লক্ষ্য ছিল না। যখন লক্ষ্য হইল, সে হা হা করিয়া উঠিল, 'অ কিশোর দাদা, তুমি করতাছ কি? গুণ মার, গুণ মার। নাইল্যা ক্ষেতে অখন পানক সাপ থাকে। তুমি গুণ মাইরা নাও এ উঠ।'

চৈতন্য পাইয়া কিশোর গুণ মারিয়া নৌকায় উঠিল।

সুবল তিরস্কার করিল, 'দাদা, তোমারে কি মধ্যে মধ্যে ভূতে আমল করে?'

সে-কথার জবাব না দিয়া কিশোর বলিল, 'ভাই, আর কদিনের পথ সামনে আছে?'

'ইখান থাইক্যা আগানগরের খাড়ি একদিনের পথ। আর একদিন একটানা নাও বাইতে পারলে ভৈরব ছাড়াইয়া নাও রাখুম নিয়া কলাপুড়ার খাড়িতে। সেইখান থাইক্যা তিতাসের মুখ আর এক দুপুরের পথ।'

হিসাব মত একদিনে আগানগরের খাড়ি পাওয়া গেল। সেখানে রাত কাটাইয়া নৌকা খোলা হইল। কিন্তু একদিনের স্থলে দুই দিন গত হইয়া যায়, ভৈরব বাজার আর দেখা দেয় না।

সামনা হইতে হু হু করিয়া জোরালো বাতাস আসিতেছে। মেঘনার বুক জুড়িয়া ঢেউ এর তোলপাড় চলিয়াছে। নৌকা এক হাত আগায়, তো আর এক হাত পিছাইয়া যায়। দুইটি প্রাণী গলুইয়ে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। বড় বড় ঢেউয়ের মুখে পড়িয়া নৌকা একবার শূন্যে উঠিতেছে, আবার ধপাস্ ধপাস্ আছড়াইয়া পড়িতেছে। গলুইয়ে দাঁড় হাতে প্রাণী দুইটি এক একবার কোমর অবধি ডুবিয়া যাইতেছে। ঝলকে ঝলকে নৌকায় জল উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া কিশোর সে-জল সেঁউতিতে করিয়া সেচিয়া ফেলিতেছে। নাওয়ের পাছায় সুবল বাতাসের ঝাপ্‌টায় আর জলের ছাঁটে ভেজা কাকের মত হইয়া গিয়াছে। তবু এক একবার গায়ের সবটুকু জোর নিংড়াইয়া লইয়া চাপ দিতেছে। দম-দেওয়া কলের মত নৌকাটা সে-চাপে একটু আগাইয়া গিয়াই দমভাঙ্গা হইয়া পিছনে সরিয়া আসিতেছে। তিলকের মুখে কথা নাই। কিশোর স্খলিতস্বরে বলিল, 'ভাইরে সুবল, আর বুঝি দেশে যাওয়া হইল না।'

শুনিয়া, ব্যথিত সুবল আরও জোর খাটাইল; একেবারে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল।

রাঁধা খাওয়ার সময় নাই। বিশ্রামের অবসর নাই। এক ছিলিম তামাক খাওয়ারও অবকাশ নাই। কোথাও নৌকা বাঁধিয়া বিশ্রাম নিবে, তারও উপায় নাই। নদীর দুইদিকে চাহিলে বুক শুকাইয়া যায়। কেবল জল। কোথাও এতটুকু তীর নাই। অবলম্বন নাই, অথৈ, অপার জল, নির্ভরসায় বুক শুকাইয়া যায়। একটা খালের মুখও চোখে পড়িতেছে না।

এই দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঝাড়া তিনদিন লড়াই চলিল। শেষে তারা ঝিমাইয়া পড়ার আগে দুর্যোগ নিজেই ঝিমাইয়া পড়িল। যে বাতাস দৈত্যের নাসিকা গর্জনের মত বহিতেছিল, তাহা এখন প্রজাপতির পাখার হাওয়ার মত কোমল হইয়া গেল। মেঘনার বুকে আলোড়ন থামিয়া একেধারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

এইত ভৈরবের বন্দর। এখানে আসিয়া মনে হইল বাড়ির কাছেই আসিয়াছি। স্রোতের আড় পাইয়া নৌকা অল্প মেহনতেই হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছ। ভৈরব বন্দরের মালোপাড়া দেখিতে দেখিতে অনেক পিছনে পড়িয়া গেল। তাহাদিগকে সমুখে আগাইবার নেশাতে পাইয়াছে। এই কলাপুড়ার খাড়ি। নৌকা বাঁধিবার চমৎকার জায়গা। কিন্তু আকাশের কোণে আরও একটু বেলা রহিয়াছে। কিশোর বলিল, 'চলুক নাও। রাখুম গিয়া একেবারে নয়া গাঙের খাড়িতে। যত আগাইতে পার আগাও।'

সূর্য ডুবিবার আগেই নয়া গাঙ দেখা দিল।

মেঘনা সরল হইয়া চলিতে চলিতে এই খানটায় একটু কোমর বাঁকাইয়াছিল। পশ্চিম পারে ছিল একটা খালের মুখ। বর্ষায় জলে ভরিয়া উঠিত আর সুদিনে শুকাইয়া ঠনঠনে হইয়া যাইত। কখনো ককনো সামান্য একটু জল থাকিলে তাহাতে বৈকুণ্ঠপুর আর তাতারকান্দী গাঁয়ের ছেলেরা গামছায় ছাঁকিয়া পুঁটিমাছ ধরিত। সেই খালেরই মুখ। একদিন সে মুখে ফুলচন্দন পড়িল। কি করিয়া মেঘনার এইখানটাতে একটা স্রোতের বড় আবর্তের সৃষ্টি হইল, আর খালের মুখে ধরিল সর্বনাশা ভাঙন। ভাঙিয়া চুড়িয়া মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া মেঘনার অকৃপণ জলরাশি আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল খালের দুই দিকের পাড়ে। তাতেও ধরিল ভাঙন। হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল স্রোত। সাঁই সাঁই করিয়া ফুটিল আবর্ত। হিস্ হিস্ করিয়া জাগিল উচ্ছ্বাস। হুস্ হুস্ করিয়া পড়িতে লাগিল মাটির ধ্বস। মাটি ক্ষেত প্রান্তর ভাঙিয়া, ছোট বড় পল্লী নিশ্চিহ্ন করিয়া, রাশি রাশি গাছপালা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া সে জলধারা দিনের পর দিন উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল। কার সাধ্য তার গতিরোধ করে। দুর্বার, দুর্মদ, প্রলয়ঙ্কর এ গতি।

চাষীরা প্রমাদ গণিয়া অকালে ফসল কাটিয়া ঠাঁই করিয়া দিল, পল্লীবাসীরা সন্ত্রাসে বিমূঢ় হইয়া তৈজসপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া, গরুবাছুর হাঁকাইয়া লইয়া, অনেক পশ্চিমে গিয়া ডেরা বাঁধিল। কালক্রমে অনেক কিছু হইয়া গেল। যে ছিল একদা একটা খাল, সে এখন স্বয়ং মেঘনা হইতেও অনেক প্রশস্তা, অনেক বেগবতী, সমধিক ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে। সবিস্তারে এই কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে তিলকের চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথা কিছু নূতন নয়। তাদের গাঁয়ের মালোরা অনেকেই এখানে মাছ ধরিতে আসে। আর নয়া গাঙের নয়া স্রোতে মাছও ধরা পড়ে অনেক। কিশোর সুবলেরাও নয়া গাঙের এই কালান্তক, দিগন্তবিসারী মোহনাটি কয়েকবার দেখিয়াছে, কাহিনীটিও শুনিয়াছে। তবু তিলক তাহা আবেগপূর্ণ ভাষা দিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিল। ইহাই জেলেদের রোমান্স। নদীর রহস্য তারা শুনিয়াও আনন্দ পায়, শুনাইয়াও আনন্দ পায়। আর শ্রোতা যদি ইতিপূর্বে না শুনিয়া থাকে, অধিকন্তু শ্রোতা যদি বক্তার কাছে নূতন মানুষ কেউ হয়, তাহা হইলে বক্তার বলার উদ্দীপনা বাঁধ মানে না। পাটাতনের তলার মানুষটি সম্বন্ধে তিলক খুবই সজাগ। নয়া গাঙের এই রহস্যময় কাহিনী সে নিশ্চয়ই কান পাতিয়া শুনিতেছে।

পরিশেষে তিলক বলিল, এত কাণ্ড করিয়াও শেষে নয়া গাঙ কিনা মূল মেঘনাতেই গিয়া পড়িয়াছে!

মোহনাটি সত্যই ভয়ঙ্কর। এপার হইতে ওপারের কূল-কিনারা চোখে ঠাহর করা যায় না। হু হু করিয়া চলিতে চলিতে স্রোত এক একটা আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। দুই ধারের স্রোত মুখোমুখি হইয়া যে ঝাপটা খাইতেছে, তাহাতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া জল অনেক উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। একটানা একটা সোঁ সোঁ শব্দ দূর হইতেই কানে ভাসিয়া আসিতেছে।

এই ভয়ঙ্করের একপাশে খাড়িটি বড় সুন্দর। বড় নিরাপদ স্থান। খালের মত একটা সরু মুখ দিয়া ঢুকিয়া অল্প একটু গেলেই এক প্রশস্ত জলাশয়ের বুক পাওয়া যায়। শান্ত শিষ্ট জলাশয়। প্রচণ্ড বাতাসেও বড় ঢেউ উঠে না।

তারা ভিতরে ঢুকিয়া দেখে, সেখানে অনেক নৌকার সমারোহ। তার বেশির ভাগই ধান-বেপারী, কাঁঠাল-বেপারী, পাতিল-বেপারীর নৌকা। সকলেই এখানে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়াছে। ভোর হইলে চলিয়া যাইবে।

তারাও শ্রান্ত ক্লান্ত। খাইয়া দাইয়াই শুইবে। কিন্তু বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের এই নদী-বিহারীদের কতকগুলি নিজস্ব সম্পদ আছে। অমনিতেই তারা শুইয়া পড়ে না। ঐগুলিকে বুক দিয়া ভোগ করিয়া নিয়া তবে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নেয়। কোনো নৌকায় মুর্শিদা বাউল গান হইতেছে ঃ

এলাহির দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা।
জলের আসন জলের বসন দেইখ্যা সারাসারি,
বালুচরে নাও ঠেকাইয়া পলাইল বেপারী।

কোনো নৌকায় হইতেছে বারোমাসি :

এহী ত আষাঢ় মাসে বরিষা গম্ভীরে,
আজ রাত্রি হবে চুরি লীলার মন্দির।

কোনো নৌকায় টিমটিমে কেরোসিনের আলোর কাছে আগাইয়া জরাজীর্ণ একখানা পুঁথি সুর করিয়া পড়িতেছে ঃ

হাম্মক রাজার দেশেরে—
উত্তরিল শেষে রে।

কোনো নৌকায় কেচ্ছা হইতেছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গান ভাসিয়া আসিতেছে ঃ

আরদিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।
আজোকা উঠ্‌ছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে।

স্বচ্ছ আকাশের উজ্জ্বল চাঁদ মাথার উপর অবধি পাড়ি দিয়াছে। সাদা ছেঁড়া মেঘ তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু নাগাল পাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে কিশোরদের চোখে ঘুম আসিয়া পড়িল।

পা টিপিয়া টিপিয়া চলার শব্দ, আর চাপা গলার ফিস্‌ফাস্ কথা বলার আওয়াজ প্রথমে তিলকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। নাঃ, কিশোরটা বেহায়ার হদ্দ। তাকে নিয়া আর পারা যাইবে না। বিরক্ত হইয়া তিলক পাশ ফিরিয়া শুইতেছিল। এমন সময় পায়ে জোরে একটা টান পড়ায় তার তন্দ্রা পাতলা হইতে হইতে একেবারে ভাঙিয়া গেল। পুরা সম্বিত পাইয়া দেখে, ছইয়ের ভিতরে শুইয়াছিল, তারা তিনজনেই এখন ছইয়ের বাইরে। আর তিন-জনেরই পা নৌকার গুরার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা। নৌকা আর সেই

খাড়ির ভিতরে নাই। হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নয়া গাঙের সেই সর্বনাশা মোহনার দিকে।

তিলক চিৎকার করিয়া উঠিল, 'অ কিশোর, আর কত ঘুমাইবা, চাইয়া দেখ, সর্বনাশ হইয়া গেছে।'

এক ঝটকায় পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া কিশোর এক নিঃশ্বাসে ছইয়ের ভিতরে গিয়া পাটাতন খুলিল। সে নাই।

'অ তিলক! সে নাই আমার! হাওরে-ডাকাতি হইয়া গেছে।'

একটা হাতবাক্সে বেসাতের মুনাফা দুই শত টাকা ছিল। তালাস করিতে গিয়া তিলক দেখিতে পাইল না। বাক্স সুদ্ধ তাহাও লইয়া গিয়াছে।

'হায়, কি হইল রে' বলিয়া কিশোর পাগলের মত গলা ফাটাইয়া এক চীৎকার দিল। চারিপাশের জলোচ্ছ্বাসের উপর দিয়া সেই চীৎকার-ধ্বনি ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। কোনো প্রতিধ্বনিও আসিল না।'

এদিকে মাঝ-মোহনার জলের উচ্ছ্বাস-ধ্বনি ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। নৌকাটা চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইয়া সেদিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। আর আকাশে তখন অজস্র জোৎস্না।

তিলক সচেতন হইয়া বলিল, 'সুবলা, পাছায় গিয়া হালের কোরায় হাত দে।'

প্রবলভাবে আপত্তি জানাইয়া কিশোর বলিল, 'না না তিলক, নাও আর ফিরাইও না। যার দিকে রোখ করছে তার দিকেই যাউক।'

সুবল ও তিলকের আপ্রাণ চেষ্টায় নৌকাখানা কোনমতে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল। রাত্রির বিভ্রান্তিতে কূল-কিনারা দেখা যাইতেছিল না; তাহাও শেষে পাওয়া গেল। রাতটা বিশ্রী রকমের দীর্ঘ। ফুরাইতেছিল না। অবশেষে তাহাও ফুরাইয়া সকাল হইল। কিন্তু রাতের ঝড়ে পাখীর সেই যে ডানা ভাঙিল, সে-ডানা আর জোড়া লাগিল না।

কিশোর দাঁড়ে গিয়া বসিয়াছিল। বার বার হাত হইতে দাঁড় খসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তিলকের দয়া হইল, 'যাও কিশোর, দাঁড় তুইল্যা ছইয়ার তলে যাও।'

কিশোর ছইয়ের ভিতরে আসিয়া পাটাতনের উপরে বসিল। পাটাতনের নিচেই সে ছিল। এখন সে কোথায়!

সুবলের হাতে হালের বৈঠাও নিস্তেজ হইয়া আসিল। কেবল তিলকের বৃদ্ধ হাতের দাঁড়টানাকে সম্বল করিয়া নৌকা মন্থরগতিতে আগাইতে লাগিল।

এখানে তিতাসের মোহনা। মেঘনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া এখন ইহারই মুখ দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। যাইবার সময় মুখটা আরো সংকীর্ণ ছিল। এখন বর্ষার জলে সে-মুখ অনেক বড় হইয়া গিয়াছে।

তিতাসের মুখের ভিতর ঢুকিয়া খানিক আগাইবার পর সুবল দুত্তোরি বলিয়া দাঁড় তুলিয়া ফেলিল। বাঁশের খুঁটিটা একটানে তুলিয়া লইয়া মাটিতে ঠেকাইয়া কয়েকটা পাড় দিল। তারপর তার সঙ্গে নৌকার দড়ি বাঁধিয়া ছইয়ের ভিতরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল।

আরো একটু বেলা ছিল। আরো একটু আগানো যাইত। কিন্তু তিলক মুখ খুলিয়া একথা বলিতে সাহস পাইল না।

আবার রাত আসিল। রাত গভীর হইল এবং এক সময়ে ফুরাইয়া গেল। পূর্বদিকের আকাশ খোলসা হইয়া আসিতেছে। কিশোর কি ভাবিয়া উঠিল। মাঝনৌকায় দাঁড়াইয়া সেদিকে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপর গলুইয়ে গিয়া হাত বাড়াইয়া জল স্পর্শ করিল।

হাত জলে লাগে নাই। কিসে যেন লাগিয়াছে। কিন্তু বড় নরম। আর কি ভীষণ ঠাণ্ডা। ঘাড় বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেখিয়া কিশোর খুব জোরে একটা চিৎকার দিল।

একটা নারীদেহ ভাসিয়া রহিয়াছে। কোমর হইতে পা অবধি একেবারে খাড়া জলের নীচে। বুকটা চিতাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। গলা টান হইয়া মাথা পিছন দিকে ঢলিয়া রহিয়াছে। লম্বা চুলগুলিকে লইয়া তিতাসের মৃদু স্রোত টানাটানি করিতেছে।

'অ তিলক, দেইখ্যা যাও!'

চোখ কচলাইয়া তিলক বলিল, 'কি কিশোর?'

'তারে পাওয়া গেছে?'

তিলক উঠিয়া আসিয়া মড়াটাকে দেখিয়া, রাম রাম বলিতে বলিতে সুবলকে ডাকিয়া তুলিল। তারপর কালবিলম্ব না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

কিশোর ছইয়ের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

দাঁড় টানিতে টানিতে ক্লান্ত হইয়া তিলক ছইয়ের ভিতরে আসিয়া বসিল। আগে লক্ষ্য করে নাই। মালসার আগুনে টিকা ডুবাইয়া তামাকের চোঙাটা কোথায় কিশোরকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন লক্ষ্য করিল কিশোরের চোখ দুইটা অস্বাভাবিক রকমের বড় আর জবাফুলের মত লাল হইয়া গিয়াছে। মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীষণ এক দানবীয় ভাব। মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে নীচে উপরে চোখ ঘুরাইতেছে।

আঁতকাইয়া উঠিয়া তিলক চিৎকার দিল, 'অ সুবলা দেইখ্যা যা, কিশোর পাগল হইয়া গেছে।'

তৃতীয় অধ্যায়

নয়া বসত

চার বছর পরের কথা।

শীতের সকালে একটা মরা নদীতে অল্প জলটুকু যাই-যাই করিতেছিল। রাতের জোয়ার যে-টুকু জল ভরিয়া দিয়াছিল, ভোরের ভাঁটা তাহা টানিয়া খসাইয়া নিতেছে। স্রোত চলিয়াছে শিকারীর তীরের মতো। একটু পরেই শুকাইয়া ঠন্‌ঠনে হইয়া যাইবে। দুই বুড়ার ব্যস্ততার শেষ নাই। ডিঙ্গি নৌকায় বাঁশের মাচান পাতিতে পাতিতে একজন রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'অ গৌরা!'

গৌরার হাতের মোটামোটা আঙুলগুলি শীতে কুঁকড়াইয়া আসিতেছিল। একরাশ এলোমেলো দড়াদড়ি। তার গিঁট খুলিয়া ওঠা এ আঙুলের সাধ্যের বাইরে। তবু খুলিতে হইবে। বারবার চেষ্টা করে, পারে না; মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠে। রোদ উঠিতে এখনো ঢের দেরি, মালসার আগুনে হাতদুটি তাতাইয়া নেওয়া দরকার। কিন্তু মালসা কোথায়?

'তুই একবার যা গৌরা, বরুণ-গাছের তলাত্ গিয়া ডাক দে।'

স্রোত থাকিতে নৌকা খুলিতে না পারিলে, নদীর জল নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন কোমরে দড়ি বাঁধিয়া কাদার উপর দিয়া টানিয়া নিতে হইবে, আর নৌকায় কাঁধ ঠেকাইয়া ঠেলিতে হইবে।

ওদিকের ঘাটে আরেকখানা ডিঙ্গি খুলিতেছে। সেখান হইতে ডাক আসে, 'অ, নিত্যানন্দ দাদা, অ গৌরাঙ্গ দাদা!'

কান পর্যন্ত ঢাকিয়া মাথায় জড়ানো নেকড়ার রাশ। দুই বুড়া শুনিতে পায় না। কাছে আসিয়া ডাকিতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু সে নৌকাতেও মালসা নাই দেখিয়া গৌরাঙ্গ বিমর্ষ মুখে দড়ির গিঁট খোলাতে মন দিল। যত খোলে, আবার জট লাগে। মাচান পাতা শেষ করিয়া দড়ির গেরোয় দাঁড় ঢুকাইতে গিয়া নিত্যানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিল, 'কিরে ছিনিবাস, বেপারে যাইবি?'

'হ দাদা। গাঙে মাছ পড়ছে। অখন কি না গিয়া পারি? তোমরা যাইবা না?'

'যামু। আইজ না, কাইল। আইজ রাজার ঝিরে লইয়া গোকনঘাটে যামু কিনা।'

দড়ি-খোলা ও বৈঠা-বাঁধা শেষ করিয়া গৌরাঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ির দিকে পা বাড়াইল। তার মুখে রাগে ও বিরক্তিতে কথা ফুটিতেছিল না। সে শুধু বিড় বিড় করিয়া 'রাজার ঝি', 'রাজার ঝি' করিতে লাগিল। উঠানে পা দিয়া গৌরাঙ্গের যত রাগ জল হইয়া গেল।

রাজার ঝি পা মেলিয়া বসিয়া বিলাপ করিতেছে।

বুড়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সত্যি এই দুঃখী মেয়েটাকে দুই ভাই বড় স্নেহ করে। কিন্তু তার বুকভরা কান্না জুড়াইতে তাদের বুড়া-হৃদয়ের স্নেহই যথেষ্ট নয়। ছেলেটা ঘরের এক কোণে মলাটের বাক্সে তার রূপকথার রাজ্য সাজাইতেছে। কয়েকটি

ছবির টুকরা, দেশলাইর খালি-বাক্স, জাল বুনিবার দুই একটা ভাঙা উপকরণ, কিছু সূতা, ছেঁড়া একখানা ভক্তিতত্ত্বসার, একটুকরা পেন্সিল। মলাটের বাক্সে সযত্নে সাজানো হইলে মাকে হাত ধরিয়া উঠাইল। রোগা একটুকরা ছেলেটার ইচ্ছার নিকট পরাজয় মানিয়াই যেন যুবতী মা কান্না থামাইয়া উঠিয়া পড়িল। এবার যাত্রা করিবার পালা।

ধরা গলায় গৌরাঙ্গ বলিল, 'আর কিছু বাকি নাই ত?'

আর একটি কাজ বাকি আছে। তারা তুলসীতলায় প্রণাম করিতে গেল।

নৌকা স্রোতের টানে বেশ চলিল। গ্রাম্য নদী। খাল বলিলেও চলে। দুই পারে যেন ছবি আঁকা। রোদ উঠিয়াছে। দুই পারে গ্রামের পর মাঠ, তার পর গ্রাম। গ্রাম ছাড়াইয়া নৌকা চলিয়াছে।

অনন্ত মার কোল ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল। নৌকাতে এই প্রথম উঠিয়াছে। আজ তার আনন্দের সীমা নাই। দুই চোখে এক রাজ্যের বিস্ময়। নদীর দুইটি তীরই এত কাছে। গ্রাম ছাড়াইয়া যখন মাঠে পড়ে,—জমির আলের উপর ক্ষেতের লোকে তামাক টানে, লাঙ্গলে-বাঁধা গরু দুটি তার দিকে তাকায়।

নৌকাটা এক সময়ে আটকাইয়া গেল। ভাঁটার তখন শেষ টান। সবটুকু জল শুষিয়া নিয়া স্রোতের বেগ মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পিছনে, নদীর মরিবার পালা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রোগীর যেমন পা হইতে মরিতে মরিতে সবশেষে মাথায় আসিয়া শেষ মৃত্যু হয়, তাদের এ পোড়া গাঙেরও সেই দশা। যে-নৌকা যেখানে থাকে সেইখানেই আটকাইয়া থাকে।

গৌরাঙ্গ তখন হতাশ হইয়া হালের দাঁড় খুলিয়া ফেলিল। ইহার পর যে-কাজ করিতে হইবে, শীতের দিনে তাহা একান্ত বিরক্তিকর।

অনন্তর মা আগেই কল্‌কেতে তামাক দিয়াছিল। মালসা হইতে এইবার জ্বলন্ত টিকাটি তুলিয়া গৌরাঙ্গের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। হুঁকা হাতে করিয়া সামনের দিকে চাহিতে গৌরাঙ্গ দেখে তিতাসে পড়িতে আর বেশি দেরি নাই। এবার অনন্তর দিকে চাহিয়া তার মনে মমতা উছলিয়া উঠে। অনন্তর বড় গাঙ দেখার অত সাধ। বড় গাঙের কথা, তার বুকে মাছ ধরার কথা, রাত জাগার কথা, ভাসিয়া থাকার কথা, শুনিতে শুনিতে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এ ছেলে বড় হইলে খুব বড় জেলে না হইয়া যায় না। তখন কি সে এই গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের মত এই মরা নদীর হাঁটুজলে টেংড়াপুঁটির জাল ফেলিবে। সে তখন তিতাসের অগাধ জলে ভেসাল জাল, ভৈরব জাল, ছান্দি জাল পাতিয়া বসিবে। কে জানে আরো বা'র গাঙে, মেঘনার বুকে গিয়া জগৎ-বেড়ই হয়ত ফেলিবে। তখন কি এই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দর কথা তার মনে থাকিবে!

কুড়াইয়া-পাওয়া তার মা হয়ত হইবে বড় নদীর বড় জেলের মা, সেও কি তখন অনন্তকে মনে করাইয়া দিবে যে, অনন্ত, তোর মা ডাকাতের নৌকা হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া এক দুর্দিনের রাতে বড় নদীতে পড়িয়াছিল, তুই তখন পেটে। তোর মা মরি-বাঁচি করিয়া একটা বালুচরে উঠিয়াছিল মাত্র। আর কিছু মনে নাই। তারপর এই দুই বুড়া, তোর দুই দাদা, কোথা থেকে কোথায় নিয়া আসিল। কোথায় ভবানীপুর গ্রাম, কোথায় কি। দেখ্ অনন্ত, আ-ঘাটাতে ঘাট হয়, আ-পথে পথ হয়, আ-কুটুমে কুটুম হয়। এই

দুই বুড়া যদিও কেউ না, তবু এরা সব-কিছু। এরা দুজন আমার বাপ আর খুড়া। এ দুইজনকে তুই কোনোদিন ভুলিস না।

শীত ছাড়িয়া যাওয়ায় নিত্যানন্দ তাজা হইয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন মুখে বলে, 'অনন্তরে ভাই, তুই না বড় গাঙের পাগল, ঐ দেখ্ বড় গাঙ্।'

অনন্তর ছোট শরীর। তার পক্ষে এত দূরে থাকিতে বড় নদী দেখা সম্ভব নয়। বুড়োর বুকে-পিঠে কাপড় জড়ানো। তার উপর দিয়া টানিয়া তুলিয়া সে অনন্তকে বড় নদী দেখাইল।

এইখান হইতে বৈঠা অচল। গৌরাঙ্গ কোমরে দড়ি বাঁধিয়া জলে নামিল। সে টানিবে। নিত্যানন্দ নামিল পিছনের দিকে। সে কাঁধ ঠেকাইয়া ঠেলিবে। নৌকা হাল্কা করিবার জন্য অনন্তকে লইয়া তার মাও তীরে নামিল। তারা বাঁক ঘুরিয়া বড় গাঙে নাও নামাইবে।

এইবার বড় নদী।

অনন্ত কোল হইতে নামিয়া পড়িল। একটা নেংটি ইঁদুর বুঝি ধানক্ষেতের প্যাঁচ হইতে বাহির হইয়া রূপকথার দেশের এক নদীর পারে গিয়া দেখিল সামনে রূপার নদী। গলানো উপচানো রূপার নদী। সে তো নদী নয়, হাজার বছরের না-শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে।

অনন্তর মুখে কথা নাই। সে নীরবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জলে নমস্কার করিল। তারপর মায়ের দেখাদেখি হাত পা মুখ ধুইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

মা হুঁকা জ্বালাইয়া নিত্যানন্দ বুড়ার দিকে হাত বাড়ায়। বুড়ার দিকে সে চাহিতে পারে না। চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। অসহায় দুই বুড়া। দুজনেরই বৌ কোন্ যৌবন কালেই মরিয়া গিয়াছে।

স্ফটিকস্বচ্ছ জলের দিকে অনন্ত একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিল। জলে তার ছোট মুখের ছায়া পড়িয়াছে। তারই ভিতর দিয়া দেখা যায় জলের স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া জাগিয়া আছে বালিময় তলদেশ। দুই একটা শামুক হাঁটিয়াছে, তার রেখা বালির বুকে আঁচড় কাটিয়াছে। ছোট ছোট বেলেমাছ সে বালিতে বুক লাগাইয়া চুপ করিয়া আছে, যেন হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। একটুও নড়িবে না। আর সেই শামুক চলার দাগ, কম জল হইতে ক্রমে বেশী জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। জলের নীচে বালিমাটি ক্রমে ঢালু হইয়া চলিয়াছে—এখানটা স্পষ্ট দেখা যায়, ওখানটা একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট হইয়াছে, তারপর ওখানটাতে কিছুই আর দেখা যায় না। জল ওখানে বেশী কিনা। শামুকগুলি ওখানটাতেই গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের পায়ে চলার দাগগুলিও অদৃশ্য হইয়াছে। ওখানটাতে কি রহস্য! নামিলে পায়ে মাটি ঠেকিবে না। আরও একটু দূরে বুঝি ঐ দাঁড় দিয়াও মাটি ছোঁয়া যাইবে না। সেখানটাতে আরও কত রহস্য! কত কি যে আছে সেখানে, হাজার চেষ্টা করিলেও অনন্ত কোনোদিন দেখিতে পাইবে না। তার চোখ আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল। বেলে বাচ্চাগুলি এখনো শুইয়া আছে। হাত দিয়া জল নাড়িতেই মাছ ক'টা চড় চড় করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। জলের উপর ভাসিয়া উঠিল না। বালিমাটিতে বুক লাগাইয়াই ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল, কোথায় জলের

গভীরতার দিকে, যেখানে অনন্ত অনেক কিছুর মতই তাহাদিগকেও দেখিতে পাইবে না সেখানে।

শামুকের দাগগুলি দৃষ্টিসীমার যেখান থেকে উধাও হইয়াছে, সেখানটাতে অনন্ত আরো অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিত, মা তাকে টানিয়া কোলের কাছে বসাইল, চুলের ভিতর আঙুল চালাইবার জন্য।

মাতাপুত্রের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া নিত্যানন্দ বলে 'তিতাসের জল এত ফরসা! মাছ ত এই জলে মারা পড়ে না, মারা পড়ে ঘোলা জলে। এই সংকটকালে কি খাইয়া বাঁচ্‌বি মা, আমি তাই ভাবি।'

মাছের জো সামনে। তারজন্যে জেলেরা এখন থেকেই শক্ত জাল বোনে। তার জন্য চাই শনসূতা। সে-গাঁয়ে গিয়া বসিতে পারিলে এখন থেকেই সে মিহি ও মোটা দুই রকমের সূতা কাটিবে। বেচিবে। তাতে মা ছেলেতে দুর্দিন কাটাইবে।

'খাই না-খাই দিন আমার যাইব, রাইত্ আমার পোহাইব। কিন্তু তোমরা ত জন্মের লাগি পর হইয়া গেলা।'

তারাও যদি এ-নদীর পারে ঘর বাধিত! কিন্তু জন্ম-ভিটার এমনি তাদের মায়া, বুড়া হইয়াছে, সব ছাড়িবে, তবু জন্ম-ভিটা ছাড়িবে না।

তিতাসের জলের মতই অনন্তর মার চোখের ফরসা জল হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতে চায়।

হালের দড়ি পরাইয়া নিত্যানন্দ যৌবন-বেগে দুই-তিন টান দিয়া বলিল, 'গৌরাঙ্গসুন্দর!'

'কি দাদা!'

'আমার গাতিটা খুইল্যা দে। শীত পলাইছে।'

গৌরাঙ্গসুন্দর নৌকার গলুই ধুইতেছিল। দাদার আদেশ পাইয়া তার পিঠের বড় গেরো খুলিয়া পরতে পরতে পেঁচানো কাপড়ের নিবিড় বন্ধন হইতে দাদাকে মুক্ত করিল। গাতি তাদের শীতের পোষাক।

এবার গৌরাঙ্গসুন্দর গঙ্গা-মার নাম স্মরণ করিয়া লগি ঠেলিয়া নৌকা ভাসাইল।

অনন্তকে মা আরো কাছে টানিয়া নিল। সে নীরবে মার বাহুর বেড়ায় বাঁধা পড়িল, কিন্তু তখন তার মন না ছিল মার দিকে না ছিল দাদাদের দিকে। নৌকাখানার অস্তিত্ব পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল। তার চোখের সামনে জাগিয়া রহিল শুধু একটা নদী। সে নদী তার সকল সত্তাকে, সারা অনুভূতিকে, লূতাতন্তুর মত টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ভূত-ভবিষ্যত বিস্মৃত হইয়া সে এই সদ্যজাগ্রত মুখর বর্তমানের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তার প্রকৃত যাত্রা শুরু যেন হইয়াছে এইখান থেকে।

দুপুর গড়াইয়া গেল। একটু পরেই বিকাল হইবে। অনন্তর মা সে গাঁ কোনো দিন চোখে দেখ নাই। শুধু জানে গাঁ খানা তিতাস নদীর তীরে। নদী সোজা উত্তর দিকে আসিয়া এ গাঁয়ের গা ঘেঁসিয়া পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরিয়াছে। এক একটা গ্রামের ছায়ায় নৌকা আসিলে চমকাইয়া উঠিয়াছে, বিহ্বলের মত চাহিয়াছে, এই বুঝি সেই গাঁ। গাঁ খানা তার মনকে টানিয়াছে শুধু আজ নয়, অনন্ত যখন পেটে, তখন থেকে। অত বিস্মৃতির মাঝেও, বিপদের অত ঝড়তুফানের মাঝেও, গাঁ খানার নাম সে মনে

রাখিয়াছে। আর কিছু তার মনে নাই। এই গাঁ হইতেই সে প্রবাসে গিয়াছিল। তার নামও মনে নাই, দেখিতে যেন কি রকম ছিল তাও তার মনে নাই। কতবারই বা দেখিয়াছে। সেই প্রথম দিনের দেখা! সারা অন্তর তাকে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভাল করিয়া কি তার দিকে চাহিতে পারিয়াছে। অত লোকের সামনে গান বাজনা, হৈ চৈ, মারামারি সব কিছু মিলিয়া সেদিন তাকে মূর্ছিত করিয়াছিল না? সেইত তখন আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছিল, না হইলে মাটিতে গড়াইয়া পড়িতাম, যারা মারামারি করিতেছিল তাদের পায়ের তলায় পড়িয়া মরিয়া যাইতাম।

মনে পড়ে সেদিন তাকে একান্ত ভাবে পাইলাম। আমার বড় ভয় করিতেছিল। দুরু দুরু বুকে তার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সে আসিয়া বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া ভয় দূর করিল। এ যেন একটা পুতুল খেলার মত খেলা হইয়া গেল। আরো দুই একবার দেখিয়াছি; কিন্তু লোকের সামনে তার দিকে চাহিতে কেমন লজ্জা করিত, এজন্য পরিপূর্ণ ভাবে কি তাকে দেখিতে পারিয়াছি যে, চেহারা মনে থাকিবে!

মনে পড়ে নৌকাতে যখন মাচানের তলে ছিলাম বন্দী, তার বন্ধু আসিয়া খাওয়াইত, কিন্তু সে থাকিত দূরে দূরে। বন্ধুকে সে বলিয়াছিল, আমি দেখিতে কেমন সে তা ভুলিয়াই গিয়াছে। আমার না হয় চাহিতে বাধা, তার চাহিতে বাধাটা ছিল কোথায়। এত ভোলা যার মন, সে কি এখনো দেখিলে চিনিতে পারিবে? চিনিতে পারা না পারা আমার কাছে দুইই সমান। চিনিতে পারিলে বলিবে, ডাকাতে যাকে ছুঁইয়াছে, তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। আর চিনিতে না পারিলে বলিবে, অনাথা বিধবা, তাই সম্বন্ধ জড়াইয়া ঠাঁই করিয়া লইতে চায়। সামনে পতি নাই; হাতে নোয়া কপালে সিঁদুর পরনে শাড়ি মানায় না। বাপ জোর করিয়া বিধবার বেশ পরাইয়াছে। আপত্তি করিলে বলিয়াছে, ডাকাতে যখন ধরিয়াছিল, নিশ্চয়ই কাটিয়া ফেলিয়াছে, তা না হইলে, মোহনার স্রোতের পাকে যখন পড়িয়াছিল, নৌকা কি আর ছিল, নিশ্চয়ই ডুবিয়া গিয়াছিল। আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরদিন আমাকে মেয়ের মত কাছে রাখিবে বুড়ার মতলব ছিল এই। প্রতিবেশীদের কাছে তখন পরিচয় দিয়াছে, এর স্বামীকে ডাকাতে মারিয়া ফেলিয়াছে; একেও মারিয়া ফেলিত, জলে ঝাঁপ দিয়া বাঁচিয়াছে। সেই থেকে বিধবার বেশ। কিন্তু সে তো বাহিরের। মনে মনে জানি সে আছে। সে ঐ গাঁয়েই আছে। কিন্তু না জানি তার নাম, না জানি তার বন্ধুর নাম।

রোদ কড়া হইয়া উঠিয়াছে। নৌকাখানা তাতিয়া উঠিয়াছে। দুই বুড়ার শক্ত চামড়াও তাতিয়া উঠিয়াছে। অনন্তর মার স্নেহ উথলিয়া উঠিল। বার বার ইচ্ছা করিল তার সাদা কাপড়ের আঁচল দিয়া তাদের গায়ে ছায়া দেয়। কিন্তু সে অসম্ভব। একটা বালিকাবয়সী নারীর আঁচলে গা ঢাকা দেওয়ার বয়স তাদের নাই। সে-আঁচলে সে অনন্তর রোদে-তাতা ছোট শরীরখানা সূর্যের আড়াল করিল। কড়া রোদে, মায়ের মিষ্টি ছায়ার আড়ালে থাকিয়া অনন্ত কোনো এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক কিছু দেখিতে পারিত, ঘুমাইয়া পড়াতে দেখিতে পারে নাই। হয়ত স্বপ্নে তাহার সবই দেখিতে পাইয়াছে।

ঘাটে গিয়া নৌকাখানা শব্দ করিয়া ঠেকিল। চলতি নৌকা। গৌরাঙ্গ দাঁড় ঠেকাইয়া গতিরোধ করিল, কিন্তু সবটুকু গতি রুদ্ধ হইল না। মাটিতে ঠেকিয়া অবশিষ্ট গতিটুকু

রুদ্ধ হইতেই নৌকাটা ঝাঁকুনি খাইল। সেই ঝাঁকুনিতে অনন্তর মার চমক ভাঙিল। এতক্ষণ সেও বুঝি স্বপ্নরাজ্যেই ছিল। এখন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, কাপড় চোপড় সামলাইল, অনন্তকে ডাকিয়া উঠাইল। অনন্ত জাগিয়া চোখ কচলাইয়া ঘাটখানা একবার দেখিয়া লইল। তারপর নদীর দিকে ঘাটের লোকজনের দিকে আর ঘাটের অদূরবর্তী ছায়াঢাকা গ্রামখানার দিকে চাহিয়া দেখিল। ছোট চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, দেখিল, একটির পর একটি করিয়া বাঁধা নৌকা। সব নৌকা একই আকারের, একই গড়নের। সারি সারি বাঁশের খুঁটি পোঁতা আছে। তারই একটির সঙ্গে একটি করিয়া নৌকা বাঁধা। নৌকার পেছনের দিকে এক একটা ছই। ছইয়ের দুই দিকই খোলা।

দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। বেলা করিয়া যারা স্নান করিতে আসিয়াছে, ঘাটে নূতন নৌকাতে নূতন মানুষ দেখিয়া তারা কৌতূহলী চোখে চাহিয়া দেখিতেছে। অনন্তর মা এদের কাউকে চিনে না। কোনো দিন দেখে নাই। কিন্তু এরাই হইবে তার পড়শী। এদের বাড়ির পাশ দিয়াই উঠিবে তার কুটির। এদেরই সঙ্গে কাটাইতে হইবে তার সুখ দুঃখের দিনগুলি। পাড়ে উঠিয়া দৈনন্দিন কাজকর্মে এদেরই সঙ্গে সে মিশিয়া যাইবে। তার খুব আনন্দ হইল, এরা যেন কত আপন। তিতাসের ছোট ঢেউ তীরে আসিয়া মাথা রাখিতেছে। আমার বুকের ঢেউ বুঝি ঐ নারীদের বুকে মাথা রাখিবার জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

একটা পাগলকে দুই বুড়াবুড়ি টানিতে টানিতে ঘাটের দিকে লইয়া আসিতেছে। পাগল একটা যুবক। হয়ত সুন্দরই ছিল। এখন কদাকার হইয়া গিয়াছে। হাড় দেখা দিয়াছে, চামড়ায় খড়ি উঠিতেছে। বিড়বিড় করিয়া কত কি যে বকিতেছে। বুড়াবুড়ির হাত ছাড়াইবার জন্য হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। বুড়া তার শীর্ণ হাতখানা তুলিয়া গায়ের সব জোর একত্র করিয়া ঠাস-ঠাস পাগলটাকে মারিতেছে। মার খাইয়া পাগলটা ককাইয়া উঠিতেছে। কিছুতেই জলে নামিবে না। তারাও জলে না নামাইয়া ছাড়িবে না। স্নান তাকে করাইবেই। পাগলের গায়ে এবার যেন হাতীর জোর আসিল। এক ঝট্‌কায় বুড়ার হাত ছাড়াইয়া দৌড় দিতে যাইতেছিল সে। হাতের কাছে একখণ্ড কঞ্চি পাইয়া বুড়ি সপাং সপাং করিয়া পাগলটাকে মারিল। পাগল এবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বুড়ার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছে। বুক জোড়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আক্ষেপ করিতে লাগিল, 'হায়রে বিধাতা, হায়রে উপরোল্লা, এ কি করলে, কোন্ পাপে তুই আমারে এ শাস্তি দিলে। সাধ করছিলাম জোয়ান পুতের কামাই খামু, তারে বিয়া-শাদি করামু, বউ ঘরে আনুম, নাতি কোলে নেমু। হায়রে আমার কাপাল।'

বুড়া ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর ছেলেও বাপের গলা জড়াইয়া একটানা বিলাপ করিতে করিতে জলে নামিল। কাঁদিতেছে না কেবল বুড়িটা। হয়ত তার মা। কিন্তু কি পাষাণ। সব কান্না তার শুকাইয়া গিয়া বুঝি বা জমাট বাঁধিয়াছে। সে কেবল দুই হাতে জল তুলিয়া গামছা দিয়া পাগলের দেহটা ঘষিয়া দিতেছে। ঘাটের নারীরা স্তব্ধ হইয়া দেখিতেছে। তাদের দৃষ্টিতে দরদ ঝরিয়া পড়িতেছে। কারো চোখ সজল হইয়া উঠিতেছে। অনন্তর মার মনে হইল এই সকল নারীর সবাই তার আপন। এদের বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া সেও পাগলটার দিকে দরদভরা দৃষ্টিতে তাকায়, সেও ঘরে যাওয়ার কথা ভুলিয়া পাগলটার দিকে জলভরা

চোখে চাহিয়া থাকে। ইচ্ছা হইল পাগলটার দিকে জলভরা চোখে চাহিয়া থাকে। ইচ্ছা হইল পাগলটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সেও খানিক গলা ছাড়িয়া কাঁদে।

অনন্তর মা অনন্তকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

এ গাঁয়ে একজন নূতন বাসিন্দা আসিয়াছে, খবরটা যারাই পাইল তারাই খুশি হইল। মালোপাড়ার সবচেয়ে যে ধনী ছিল, তারই গিন্নি কালোর মা ছেলেদের বলিয়া একখানা পোড়ো ভিটি কম দামে ছাড়িয়া দিল; ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করিয়া তার আগাছা সাফ করিয়া, তারপর পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়া তার উপর একখানা ঘর তুলিয়া দিল।

নূতন ঘরে অনন্তদিগকে রাখিয়া একদিন দুই বুড়া বিদায় হইল। বিদায় দিতে ঘাটে আসিয়া অনন্তর মা অনেকক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়া ছিল। ঘাটের মেয়েরা কাজ ফেলিয়া এই বিদায়দৃশ্য দেখিতেছে।

তাদের নৌকাখানা মাঝ-নদীতে পড়িয়া আগাইয়া চলিয়াছে। এতটুকু পথ গিয়াই বুঝি দুই বুড়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। দাঁড় বাহিতে বাহিতে হাতের কব্জিতে তারা কি কপালের ঘাম মুছিতেছে। অনন্তর মার মনে হইল তারা ঘাম মুছিবার ছল করিয়া দুজনেই চোখের জল মুছিতেছে।

নৌকা আরো দূরে সরিয়া যাইতেছে। আরো আরো দূরে। অনেক ছোট দেখাইতেছে নৌকাখানাকে। মানুষ দুজনকেও এবার দেখাইতেছে অনেক অনেক ছোট। যেন দুটি শিশু—যেন চাঁদের দেশের দুটি শিশু যাত্রাগানের বুড়ার পোষাক পরিয়া নাও বাহিয়া চলিয়াছে। এ জগতের নয় তারা। কেন আসিয়াছিল—আর থাকিবে না; ক্রমেই উপরে উঠিয়া ছোট হইয়া যাইতেছে—এখনই মিলাইয়া যাইবে।

অনন্তর মা এবার কাঁদিয়া উঠিল।

হয়ত মাটিতে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিত। এই সময়ে একজন কে আগাইয়া আসিয়া তাকে ধরিয়া ফেলিল।

অশ্রুভরা চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, সে তারই সমবয়সী। তারই মত সে-জনারও বিধবার বেশ।

পাড়ার কৌতূহলী নারীরা বলাবলি করে সে কে, কোন্ দেশে বিয়া হইয়াছিল। ছেলের বাপ কবে মরিয়াছে—ছেলে তখন পেটে, না কোলে, না হাঁটিতে শিখিয়াছে।

কালোর মা মেজাজী মানুষ। স্বামী অনেক টাকা রাখিয়া মারা গিয়াছে। ছেলেরাও রোজগারী। পাড়ার সবাই মান্য করে। বছরে তার ঘরে পাঁচ ছ মণ শণ সূতা কাটা হয়। তাতে বড় বড় জাল বোনে, সে-জালে বড় বড় মাছ ধরে। অনেক টাকা ঘরে আসে।

সেই কালোর মারও কৌতূহল হয়। সকালে একবার দেখিয়া গিয়াছে। বিকালেও দেখিতে আসিল। কথাটা কি করিয়া তোলা যায় ভাবিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, 'কি লা মা, তোর মা-আবাগি কি আমার মত?'

'হ মা, ঠিক তোমার মত।'

'আছে?'

'জানি না ত মা।'

'আ কপাল!'

ঘর বানাইতে হাতের সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। বাকি দিন কি ভাবে কাটিবে, কালোর মা চলিয়া গেলে সে তাই ভাবিতে বসে।

কিন্তু লোকে তাকে ভাবিবার অবকাশ দেয় না। একটু পরেই একদল বর্ষীয়সী নারী আসিল। কালোবরণের বাড়িকে বড়বাড়ি বলে। তার বাড়ি আর এ-বাড়ির মাঝখানে একটি বাঁশের বেড়া। সেই বেড়াতে কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। সেখানা আনিয়া বিছাইয়া দিবে কিনা ভাবিতেছে। তারা ভাবিবার অবসর না দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

একজন বলিল, 'পান আছে মা?'

আরেকজন বলিল, 'তামুক খাওয়া। আছে নি হুক্কা-কল্‌কি? তামুক আছে নি?' অনন্তর মা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। তার ঘরে এসবের কিছুই নাই।

একজন কোমর হইতে সুচারু কাজ করা একটি ছোট রঙিন থলে বাহির করিয়া হাতে হাতে পান বাটিয়া দিল। অনন্তর মাকেও একটা পান লইতে হইল। সে-নারীর দাঁতগুলি পানে কালোবর্ণ। দুই তিনটা পান গালে পুরিয়া আঙুলের ডগায় খানিকটা চুন লাগাইল। চিবানোর ফাঁকে ফাঁকে তারই খানিকটা দাঁতে লাগাইতেছে। মুখখানা হইয়াছে টকটকে লাল। অনন্তর মা অবাক হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।

'কি দেখ্‌ছ মা, অপাক হইয়া? আমি খুব বেশী বটপাতা খাই! না? আমি আর কত খাই! আমার শাশুড়িএ যা বটপাতা খাইত!'

'বটপাতা?' অনন্তর মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

সে-নারী সঙ্গিনীর দিকে ইঙ্গিত করাতে কথাটা সে বুঝাইয়া দিল, 'তাইনের শ্বশুরের নাম পাণ্ডব। পান কইতে পারে না, পানেরে কয় বটপাতা।'

—'আর তামুক খাইত আমার শ্বশুর। মাথায় এক ঝাঁকড়া বাবরি চুল। যমদূতের চোউখ। আমরা ডরাইতাম। সারিন্দা বাজাইত আর তামুক খাইত।'

—'আর আমার নন্‌দের শাশুড়ি! জামাই আইলে তারে ঠকান চাই। পান সাজাইয়া কইত, 'পান খাও রসিক জামাই কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারে পানের জন্ম কথা, ছাগল হইয়া খাও শাওড়া গাছের পাতা।'—খাইত কোন জামাই পান তার সামনে?"

এসব হাসিঠাট্টার কথাতে অনন্তর মার মন বসে না। বর্ষিয়সী রঙ্গিনীরা তার মন পায় না। মনে করে এ নারী অনেক দূরের। এইত একমুঠা মেয়ে। তাকেও দলে পাইবে না! এত দেমাক!

কিন্তু অনন্ত উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এরা বুঝি রূপকথার দেশের। এদের মনে মনে অনেক গল্প জমা আছে, বলিলে কোনোদিন ফুরাইবে না।

—একজন গল্পের ঝাঁপি খুলিল, 'আমার শ্বশুরের অনেক কিচ্ছা আছে। তুম্‌রি খেলা জানত। উঠানের দুই দিকে দুই উস্তাদ খাড়াইত। একজন মন্ত্র পইড়া সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ুর চালাইয়া সেই সপ্প সংহার করত। সেই মন্ত্র না জানা থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফির্‌তি আগুন চালান দিত, অন্য একজন বরুণ মন্ত্রে মেঘ নামাইয়া আগুন নিভাইত। একবার কামরূপ কামিখ্যা হইতে এক উস্তাদ বাদ্যানী আইল আমার শ্বশুরের লগে তুম্‌রি খেলতে। পরথম খেলা হইল গাওয়ের আর এক উস্তাদের লগে।

বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পইড়া উস্তাদের পরাণ টিপ্যা ধর্‌ল—বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরোর মধ্যে টিপা দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়া গল্‌গল্‌ কইরা রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পালটা মন্ত্র জানত না। আমার শ্বশুর আছিল কাছেই। বাদ্যানীরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফালাইয়া সরষা-বন্ধন খুইল্যা উস্তাদরে বাঁচাইল। বাদ্যানী রাইগ্যা আগুন। কইল, বাপের বেটা হওত, এই মারলাম ভীমরুল বাণ, বাঁচাও নিজেরে। আমার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলরে কানা কইরা দিল, আর পাল্টা এমন এক বাণ মারল—বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠে, কেবল উপ্‌রের দিকে উঠে। দুই হাতে যতই নিচের দিকে টাইন্যা রাখ্‌তে চায়, শাড়ি ততই ফরাত্‌ কইরা গিয়া উপ্‌রে উঠে। শেষে বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নাওএর ভিতরে গিয়া লাজ বাঁচাইল।—'

আর বলা হইল না। কালোর মা আসিয়া আসর ভাঙিয়া দিল। সূর্যের উদয়ে যেমন আঁধার সরিয়া যায়, কালোর মার আবির্ভাবে তেমনি গল্পবাজ নারীরা, বেলা বেশী নাই এই অজুহাতে সরিয়া পড়িল।

বেলা কালোর মারও বেশী নাই। তিন বৌ সারারাত সূতা কাটিয়া শেষরাতে শুইয়াছিল। অল্প একটু ঘুমাইতেই কালোবরণের জালে যাওয়ার সময় হইল। ভোররাতে রোজ এরা জাল লইয়া নদীতে যায়। বেচারী বৌরা কি আর করে। স্বামীরা পাশ হইতে উঠিয়া কেউ তামাক-টিকার ডিবা, কেউ মালসা খলুই জালের পুঁটলি হাতে নিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ততক্ষণে ফরসা হইতে থাকে। পাখ্‌পাখালির ডাক শুরু হয়। কালোর মা যতদিন বাঁচিয়া আছে এই সময়ে বৌদের উঠিতেই হইবে। সকল বাড়ির বৌদের আগে কালোর বাড়ির বৌদের স্নান করিয়া আসা চাই।

তারপর পূবের আকাশ রাঙা করিয়া সূর্য উঠিলে তিন-চারিটা পড়ো ভিটাতে জালের ঘের দিয়া আগের দিনের মাছ শুকাইতে দেওয়া চাই। কালোর মা ততক্ষণ তরুণ রোদ গায়ে লাগাইতে লাগাইতে তিতাসের পাড়ে গিয়া বাজারের ঘাটের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। রাতের জেলেদের মাছেভরা নৌকাগুলিতে বাজারের ঘাট ছাইয়া ফেলে। তার উপর শত শত বেপারী ওঠা নামা করে। সোরগোলের অন্ত থাকে না। তাদেরই একজন কালোবরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলে, তোমার মা দাঁড়াইয়া আছে। মার দাঁড়াইবার ভঙ্গিটিও রাজসিক। অল্পেতেই চোখে পড়ে। কালোবরণের ভাই এক দৌড়ে একঝাঁকা মাছ মার হাতে দিয়া যায়। বাড়িতে আনিলে পড়ে কোটার ধুম। দুই বেলার রান্নার মাছ রাখিয়া বাকি মাছ সেই জালের তলাতে রাখিয়া আসে। সারা গাঁয়ের কাক তখন মালোপাড়ায় ভিড় করে। এ পাড়ায় আসিলে কাকেদেরও বেহায়াপনা বাড়ে। মানুষের চোখে ধূলা দিয়া কি করিয়া এক ফাঁকে জালের ঘেরের ভিতর থেকেই শোয়ানো মাছ টানিয়া নেয়।

কিন্তু কালোর মা সজাগ। চৌকি পাতিয়া কঞ্চি হাতে নিয়া বসে। কাকের কয়েকটা ছেঁড়াপালক দড়িতে বাঁধিয়া কঞ্চির আগাতে ঝোলায়। সেই কঞ্চি নাড়িলে কাক কাছে আসে না, কেবল দূরে থেকে কা কা করে। কয়েকটি নাতি নাতনি আছে। ছোট ছোট টুকরিতে মুড়ি লইয়া বুড়ির কোল ঘেঁসিয়া কেউ বসে, কেউ দাঁড়ায়। যেটি হাঁটিতে পারে না, শুধু দাঁড়াইতে পারে, তার হাত ধরিয়া, অন্য হাতে কঞ্চি দোলাইয়া বুড়ি ছড়া কাটে, 'কাউয়ার দাদী মরল, কলা দিয়া ঢাকল, দূর হ কাউয়া দূর!'

এই কালোর মার কাছে সময়ের দাম আছে। তার কাছে অনন্তর মা তো দুগ্ধপোষ্য। যারা বিনা কাজে সময় কাটাইতে আসিয়াছিল, তারা চলিয়া গেলে বলিল, 'কামকাজ নাই কোনো?'

কাজের মধ্যে ঘাটে গিয়া এক কলসি জল আনিতে হইবে। এ ছাড়া আর কি যে করিতে হইবে ভাবিয়া পায় না অনন্তর মা। অথচ করিতে হইবে অনেক কিছু। কাজ সে করিবে। কে তাকে হাতে ধরিয়া কাজ করার সন্ধান দেখাইয়া দিবে। কালোর মা কেবল কাজের তাড়া দিতে জানে, কাজের পথ দেখাইতে জানে না।

কাজের পথ যে-জন দেখাইয়া গেল সে সুবলার বৌ।

অল্প বয়সে বিধবা। সেদিন ঘাটে সেই তাকে ধরিয়াছিল। তার সেই সমবেদনার নিঃশ্বাস এখনো অনন্তর মার চোখে মুখে বুকে লাগিয়া আছে।

সুবলার বৌ এ কয়দিন কেবল উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। একা থাকিলে দেখে মুখখানা ভার; গোমরা মুখের সঙ্গে ভাব করিতে যাওয়া নিরর্থক। যখন কাছে মানুষ থাকে, তখন মানুষ বলিতে ঐ কালোর মা। সুবলার বউ এই কালোর মাকেই সহিতে পারে না।

হরিণী যেমন নিজের কস্তরীর গন্ধ অনুভব করে, সুবলার বউয়ের আর্বিভাবও অনন্তর মা তেমনি করিয়া অনুভব করিল। জেলে রমণীর ঘরে থাকিবে কাটা আ-কাটা সূতা, এক আধখানা অসমাপ্ত জাল, আর সূতাকাটার জালবোনার নানা কিসিমের সরঞ্জাম। এই যদি না রহিল তো জেলেনীর ঘরে আর কায়স্থানীর ঘরে তফাৎ রহিল কোথায়। ঘটিবাটিগুলিও দুই দিন মাজা হয় নাই, তাও তার দৃষ্টি এড়াইল না। মনে মনে সুবলার বউ বলিল, এর আলসেমি দুইদিনেই ভাঙিতে হইবে। তার মাথার চুলে দেবদুর্লভ অজস্রতা। সাধ হয় খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। মুখখানা মলিন। তবু সুন্দর। চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিলে বেশ হইত। সুন্দর চোখ দুইটি শুভদৃষ্টির সময় কার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! কেমন না জানি ছিল সে জন। কিন্তু সে তো আর নাই। এও তো আমারি মত বিধবা।

'ছাওয়ালের বাপ কবে স্বগ্গে গেল দিদি!'

'জানি না।'

'বলি, মারা গেছে ত?'

'জানি না।'

'বিয়া হইছিল কোন্ গাঁয়ে?'

'জানি না।'

'আমি কই, বিয়া একটা হইছিল ত?'

'জানি না দিদি।'

সুবলার বউ না চটিয়া পারিল না, 'পোড়া কপাল! কই, এই ছাওয়ালটা হইছে বিয়া হইয়া ত ?'

মনে মনে খানিক ভাবিয়া নিয়া এবারও আগের মতই জবাব দিল, 'জানি না ত দিদি।'

'খালি জানি না, জানি না, জানি না। তুমি কি দিদি কিছুই জান না।—না কি জিভে কামড় শিরে হাত, কেম্‌নে আইল জগন্নাথ? আস্‌মান থাইক্যা হইছে বুঝি।'

অনন্তর মা অপমানে মরিয়া যাইতে থাকে।

'ঘরখানা যেন শূদ্রাণীর মন্দির। না আছে এক বোন্দা সূতা, না আছে একখানা তক্‌লি। নিজে যেমন ফুল-বামনি,—'

'সূতা পাওয়া যাইব আইজ দুপুরে। ঐ বাড়ির বউঠাক্‌রাইনে দিবে।'

'ও, কালোর মা? দর কত?'

'জানি না। ধারে দিবে।'

সুবলার বউ গম্ভীর হইয়া গেল। এইত জগৎবেড় ফেলিয়াছে। এ দিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে।

'ভাল মানুষের হাতেই পড়ছ দিদি!'

'দিদি তুমি কি যে কও। কি সোনার মানুষ গো দিদি। কত আদর করে আমারে আর অনন্তরে।'

সুবলার বউ মনে মনে হাসে।

'তুমি তাদের সন্দে কর কেনে?'

'সন্দে করি কেনে? আমার অন্তরে বড় জ্বালা দিয়া রাখ্‌ছে। এমন জ্বালা, যা কইবার উপায় নাই, দেখাইবার সাধ্য নাই।'

'বুঝলাম।'

বাপের ঘরে এক নাল সূতা কাটিতে হয় নাই। শিখিবারও সুযোগ পায় নাই কোনোদিন। দশ সের সূতা লইয়া সে অথৈ জলে পড়িল।

দুপুরের পরে সুবলার বউ কতকগুলি সূতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সূতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সূতার। আর এই একখানা পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা। তার পর রইদে শুখাইবা। রাইতে আইয়া সব শিখাইয়া দিমু।'

অনন্তর মা'র প্রথম চেষ্টার ফল দেখিয়া সুবলার বউ হাসিয়া খুন। বলে, 'আমার দিদি কাটুনি সূতা কাটতে পারে। এক-নাল সূতায় হস্তী বান্ধা পড়ে।'

দ্বিতীয় দিনের ফল দেখিয়া খুশি হইয়া বলিল, 'এইবার কাট চিকন সূতা ছোট টাকু লইয়া।'

সাত দিনে চৌদ্দ 'নিড়ি' সূতা হইল। সাতটা মোটা সূতার, সাতটা সরু সূতার। মোটা এক টাকা ও সরু দুই টাকা সের দরে একদিন কৈবর্ত পাড়ার লোক আসিয়া পরমাদরে কিনিয়া নিল।

সূতা বিক্রির পর কালোর মা আসিয়া বসিল, বলিল, 'পোড়া চোউখের জ্বালায় বাঁচি না। বাওচণ্ডীর মত বাইর হইয়া গেল মানুষটা কে গ মা, কে?'

'নাম ত জানি না মা। খালি মুখ চিনি। ঐ যে সূতা আনতে গেছলাম—'

'ও চিন্‌ছি। সুব্‌লার বউ। সুব্‌লা নাই, তার বউ আছে। আগে ডাকত বাসন্তী। আমি ডাকতাম রামদাসার ভাগ্‌নি। আমার ছোট পুতের সাথে বিয়ার কথা হইছিল, সেই

বিয়া হইল গগনের পুত সুবলার সাথে। সেই সুবলা মরল। ছেমড়ি তার নামের জয়ঢাক হইয়া রইল। অখন ছোট বড় সগলেই ডাকে সুবলার-বউ।'

'আপ্‌নের ছোট ছাওয়ালের সাথে কথাবার্তা ঠিক হইয়া গেছল বুঝি?'

'হ মা। তারও আগে হওনের কথা আছিল, রামকেশবের ঘরের কিশোরের সাথে। যে কিশোর অখন পাগল হইয়া বনে বনে ফিরে।'

দুপুরে মঙ্গলার বউ বাসন লইয়া ঘাটে যাইবার সময়, পাশের রাস্তা দিয়া না গিয়া, অনন্তর মার উঠান দিয়া গেল এবং ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল। ফিরিবার সময়েও তেমনিভাবে ঘরের দিকে চাহিতে, ঘর হইতে সুবলার বউ ডাকিয়া বলিল, 'অ মহনের মা, আজ যে দেখি আ-ঘাটাতে চন্দ্র উদয়।'

মঙ্গলবার বউ বিরক্ত হইল। সুবলার বউ যে উহাকে দিন-রাত আগলাইয়া রাখে ইহা ভাল লাগে না। একদণ্ড একা পাইবার যো নাই।

বিরক্তি মানুষকে অনেক সময় নির্মম করিয়া তোলে। মঙ্গলার বউ একটু আগাইয়া ছাঁইচের তলায় আসিয়া এক-পা বারান্দার উপরে আর এক-পা নীচে রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। তারপর হাতের তালুতে গাল ঠেকাইয়া বলার কথাটাকে গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিল, 'কি লা সুবলার বৌ, আজ নগরে বাজারে কি সমস্ত কথাবার্তা শুনা যাইতেছে।'

'কি সমস্ত কথাবার্তা?'

'দশের বিচারের মধ্যে নাকি তাঁর কথাখান 'উদাল্লচন' হইব।'

'কার কথা গো, অ মহনের মা, কার কথা!'

'ছাওয়ালের মার।' মঙ্গলার বউর কণ্ঠে শ্লেষ।

সুবলার বউ কথা না বাড়াইয়া তার ভুল শোধরাইয়া দিল, 'দশজনের বিচারে তার কথা উঠব কেনে গো! সে কি কেউর বাপের ধন সাপরে দিয়া খাওয়াইছে, না পথের মানুষ ডাইক্যা আন্‌ছে যে দশজন তার বিচার করব! ভাল কইরা না শুইন্যা তোম্‌রার মত উপর-ভাষা আমি কোনো কথা কই না, মহনের মা।'

সুবলার বউ সত্যই এত সহজে থামিল না, রাত্রের বৈঠকের সকল কথাই সে বলিয়া রাখিল—মাতব্বরেরা সকলে এতদিন বাড়িতে ছিল না। কেউ গিয়াছিল উত্তরে, বেপার করিতে; কেউ গিয়াছিল উজানে ধান কিনিতে, কারো হইয়াছিল জ্বর। এখন সব লোক গাঁয়ে আসিয়াছে। যার শরীর ভাল ছিল না তার শরীর ভাল হইয়াছে। গাঁখানা লোকজনে থমথম করিতেছে। সামাজিক বৈঠক হওয়ার এইত সময়। কত কথা জমিয়া আছে। কত লোকের নামে আচার-বিচার বাকি আছে। কালীপূজা সম্বন্ধে, গাঙের মাথট সম্বন্ধে, কথা তুলিবার আছে। সব কথার শেষে অনন্তর মারও একখান কথা উঠিতে পারে—সে সমাজ করিবে কার সঙ্গে,—তোমার সঙ্গে, না আমার সঙ্গে, না কালোর মার সঙ্গে।

সুবলার বৌয়ের কথার তোড়ে মঙ্গলার বৌ ভাসিয়া গেল।

কিন্তু অনন্তর মার ভয় করিতে লাগিল। দশজনের মধ্যে কথা উঠিবে ভাবিতে বুক দুরদুর করে। নূতন গাঁয়ে নূতন মানুষ হইয়া আসার এমন ঝকমারি।

সন্ধ্যার অল্প আগে দুইটি ছেলে বাড়িবাড়ি নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। ছেলে দুটি পাড়ার এক প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক বাড়িতে বলিয়া গেল, 'ঠাকুর সকল, ঘরে

নি আছ, আমার একখানা কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোম্‌রার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের দশ কথা শুনবা।'

বাঁধা কথা। অনন্তর মাও বাদ পড়িল না। বিশেষত বৈঠকের সঙ্গে যার মামলা জড়ানো থাকে, ঘোষক জনগণের আহ্বান তাকে বিশেষভাবে জানাইবে ইহাই নিয়ম।

অনন্তর মা একা কিছুতেই যাইত না। সুবলার বউ তাকে টানিয়া বাহির করিল।

তারা যখন ভারতের বাড়ি উপস্থিত হইল, বৈঠক তখন পুরাপুরি জমিয়া গিয়াছে।

ভারতের বাড়ির উঠান খুব প্রশস্ত। চারদিকের ভিটায় বড় বড় চারিটা ঘর। মাঝখানে উঠান উঁচু। কিছুদিন আগে এ উঠান এত প্রশস্ত ছিল না। ভারতের শুটকির কারবার। উঠানের মাঝখানে গভীর গর্ত খুঁড়িয়া নয় মাস আগে শুঁটকির খাদ দিয়াছিল। এখন চড়া বাজারে সেই শুঁটকি তুলিয়া পাইকারী দরে বেচিয়া ফেলিয়াছে। খাদ ভাঙিয়া উঠান সমান করিয়াছে, কিন্তু গর্ত বুজানোর পরও উদ্বৃত্ত মাটি থাকিয়া যাওয়াতে উঠানটা গরবিনীর মত বুক টান করিয়া রাখিয়াছে।

মেয়েরা যেখানে রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, মুড়ি-চিড়া করে, মাথায় তেল দেয়, উকুন বাছিয়া দেয় পরস্পরের, সেখানটাতে একটা আবদ্ধ বেড়া। তার ভিতর থেকে তারা উঠানের সবাইকে দেখিতে পায়, উঠান হইতে কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। সেখানে বসিয়াছে মেয়েরা।

উঠান জুড়িয়া পাল খাটানো। মাঝখানে উত্তম বিছানায় বসিয়াছে পাড়ার গণ্যমান্য লোক কয়জনা। তাদের সবাই বড়—কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে। তবে যাদের বিচারবুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি কিংবা কথার প্যাঁচ খাটানোর প্রতিভা আছে, সকল বৈঠকে তাদের প্রাধান্য। এই শ্রেণির কেউ যদি ভ্রাতৃ ও অর্থবলে বলীয়ান হয়, তার কথার উপর কথা বলার সাহস কম লোকেরই হইয়া থাকে। এমনই যে ব্যক্তিটি মাঝখানে বসিয়া আছে, তার চোখমুখের চেহারা ও বসিবার ভঙ্গি অনন্তর মা'র দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করিল।

সুবলার বউ বুঝাইয়া দিল, 'এই জনেরেই কয় বড় মাতব্বর।' কানের কাছে মুখ নিয়া বলিল, 'নাম রামপস্‌সাদ।'

'শিবের মতন চোখ, মণিগোঁসাইর মতন দাড়ি, এ-জনেরে দেইখ্যা, আমার জেঠার কথা মনে পড়ে ভইন। কোন্ দিক দিয়া বাড়ি?'

'এ গাওয়ে থাকে না। কালোর বাপের সাথে বিবাদ কইরা দশবচ্ছর আগে ঘরদুয়ার লইয়া যাত্রাবাড়ি গেছে। ঘাটে গেলে তিতাসের বাঁকে যে মঠ দেখা যায় তারই পরে কুড়ুলিয়া খাল। খালের ঐ পারের গাওয়ের নাম যাত্রাবাড়ি। সেই গাওয়ে আর মালো নাই, খালি কৈবর্তরা থাকে।'

তাঁর পরেই যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁর চোখমুখ দুর্বাসার মত ক্রোধারক্ত। বয়স হইলেও যুবকের মত সটান।

—বড় মাতব্বরের পরেই এজনের কথা গ্রাহ্য হয়। কায়েত পাড়ায় যাত্রার দল হয়, তাতে তিনি মুনি-ঋষির পাঠ করেন। কৌপীন পরিয়া নামাবলি গায়ে দিয়া খড়ম পায়ে তিনি যখন আসরে ঢোকেন, ভয়ে তখন কারো মুখ দিয়া কথা ফোটে'না। পৈতা ধরিয়া যখন রাজাকে অভিশাপ দিবার জন্য গর্জন করিতে করিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া

পড়েন, তখন আসরের চারিপাশের গরীব লোকগুলি তো দূরের কথা, অমন যে রাজা, হাতে তলোয়ার গায়ে ঝক্‌মক্‌ করা পোষাক, সেও থর-থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁর পায়ের কাছে নত হয়। এমন তেজ এই জনের। নাম দয়ালচাঁদ।

জানিবার ও বুঝিবার মত আরো কয়েকজন এই দলে ছিল। সময় অল্প। দুই-এক কথাতে সুবলার বৌ দুই-একজনের পরিচয় দিল। এই জনের নাম নিতাইকিশোর। ঘুষ খাইয়া পেট মোটা করিয়াছে, কিন্তু চালে এক মুঠা ছন নাই। আর এই যে কানামানুষ, তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ায়,' তার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। এই 'দেড় নিয়তির' জন্য চক্ষুধন খাইয়াছে।

আসরের চারিধারের আর যত সব নর-নারায়ণ, তারা কেবল কথা শোনার লোক, তামাক টানার লোক। কয়েকটি ছেলে হুকাকল্‌কে মালসা ডিবা লইয়া বসিয়া গিয়াছে। অনবরত ছিলিম ধরাইয়া হাতে হাতে চালাইয়া দিতেছে, আর সে সব হুকা পুরানো হইয়া পর পর তদের হাতে ফিরিয়া আসিতেছে।

একটা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে বড় কাঁসার থালাতে কয়েক বিড়া ধোয়ামোছা পান, সুচিক্কণ সুপারি, মাজাঘষা কয়েকখানি বাটিতে চুন ও অন্যান্য মসলা। থালাখানা হাতে করিয়া মধ্য বিছানায় নমস্কার করিল ভারত, 'দশজন পরমেশ্বর, আমার একখান কথা। পান নি দেওয়ার সময় অইছে?'

সকলেই সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকাইল। পরে রামপ্রসাদের দৃষ্টির ইঙ্গিত পাইয়া ভারত নিজে মাতব্বরদিগকে পান বাটিয়া দিল। পরে পাড়ার একটি ছেলের হাতে থালাখানা তুলিয়া দিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে এই জনারণ্যে পান বাটা শুরু করিল। কিন্তু শেষ না করিতেই বৈঠকের 'কথা' আরম্ভ হইয়া গেল।

দয়ালচাঁদ দুর্বাসাসুলভ ভঙ্গিতে চারিদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর রামপ্রসাদের মুখের উপর চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু হইল।

রামপ্রসাদের বয়স হইয়াছে। রঙ ঈষৎ তাম্রবর্ণ। যৌবনে এর সোনার কান্তি ছিল। চামড়ার বার্ধক্য ঠেলিয়া নিজেকে জাহির করিয়াছে যে মোটা হাড়গুলি তারাই প্রমাণ দেয়, যৌবনে এর শরীরে অসুরের শক্তি ছিল। চোখ দুটিতে দেবসুলভ আবেশ। তার মধ্যে থেকেই দৃঢ়তার ক্ষাত্রতেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সৃষ্টিশীল প্রতিভা যেন এখনো তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। কোন্‌ এক সত্যবস্তুর সন্ধানে সুদূরে মেলিয়া রাখিয়াছে তাহার অনন্ত প্রশ্নের জবাব-না-পাওয়া বড় বড় দুটি চোখ।

দয়ালের নীরব জিজ্ঞাসায় সে চোখ প্রথমেই পড়িল কৃষ্ণচন্দ্রের উপর, 'কই নগরের বাপ, কথা তোল।'

অন্ধের চোখ তুলিয়া চাওয়া আর না চাওয়া সমান। সে চোখ নীচের দিকেই নিবিষ্ট রাখিয়া খানিক পিট পিট করিয়া লইল, তারপর ভদ্র গলায় বলিল, 'ভারত কই রে।'

'কাকা, এইত আমি ইখানে।'

'ইখানে থাক্‌লেই সারব? ত'র বাড়িতে দশজনেরে কি জন্য ডাকাইলে ক'।'

বক্তব্য সকলেরই জানা। ঘরের মালিক তার বাসিন্দা। কিন্তু মাটির মালিক জমিদার। জমিদারের সঙ্গে সে-বাড়ির কোনো যোগ নাই। সে থাকে তার রাজসিক ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবিয়া। তহসিলদার রাখে। সেই আদায়পত্র করে, আদায় না হইলে

নালিশ করিয়া প্রজা উচ্ছেদ করে জমিদারের সই লইয়া, সে-ই। প্রজা উচ্ছেদ হয়, সে জায়গাতে আরেক প্রজা আসিয়া বসে। জমিদার নিজে আসিয়া সেখানে বাড়ি বাঁধে না। বাঁধিলে অনেক জমিদারের প্রয়োজন হইত। তারা সত্য নয় বলিয়াই সংখ্যায় তারা কম। মানুষের মধ্যে তারা ব্যতিক্রম। রায়তেরাই সত্য। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটির মালিক হয় তারাই। কাগজপত্রের মালিক নয়, বাস করার মালিক। সেইরূপ তিতাসের মালিক জেলেরা। কাগজ-পত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।

প্রাচীন কালে নিয়ম ছিল মালোরা রাজবাড়িতে বছরে একবার দশ ভার করিয়া মাছ দিবে। নির্দিষ্ট দিনে তারা দশ জনে ভারি-ভারি দশটি ভার কাঁধে তুলিয়া বাতাসে ঢেউ তুলিয়া দৌড় দিত। কৃষ্ণচন্দ্র যৌবন কালে ইহা দেখিয়াছে। কিন্তু নদীর মাছ অনিশ্চিত বস্তু। কোনো নির্দিষ্ট দিনে দশ ভার পূর্ণ করিবার মত এত মাছ ধরা নাও দিতে পারে। কৃষ্ণচন্দ্র তখন যুবক। কর্তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকা কালে সে-ই গিয়া তাঁদের পায়ে ধরাধরি করিয়া গ্রামের পক্ষ হইতে বড় রকমের একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিয়া আসিল। আর মাছ দিতে হইবে না। বছরে একবার করিয়া মাছের বদলে, মাথট তুলিয়া রাজ-সরকারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেই চলিবে। পৌঁছাইয়া দিবার ভারও পড়িল তারই উপরে। গত তিন বৎসরের কথা। সকলেই যার যার মাথট তার হাতে দিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি রাজ-পিয়াদা জানাইয়া গিয়াছে, তিন বৎসরের খাজনা বাকি পড়িয়াছে, অতঃপর আর বাকি পড়া উচিত হইবে না। এবং অবিলম্বে সেই বাকি পড়া খাজনা লইয়া রাজসরকারে এ-গাঁয়ের মালোদের উপস্থিত হওয়া উচিত।

আজিকার সভাতে রাজদূতের সেই ভীতিপ্রদর্শনের বিষয় প্রধান আলোচ্য হইলেও সামাজিক ব্যাপারের এবং কারো কারো ব্যক্তিগত বিষয়ের অনেক কথাই আলোচনার জন্য অপেক্ষমান। কিন্তু তাহার নিজের কৃতকর্মের কথাই সকলের আগে উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্র জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া নত মুখেই বলিল, 'কি আর কইব! ভারতের মাইয়ারে বিয়া দিতে লাগব, তারই কথা উদারূচন করবার জন্য বৈঠক ডাকাইছে, কথা কি আর আমরা বুঝতে পারি না। হাঁ করতে আলাজিহ্বার টের পাই।'

ভারত তার আড়াই বছরের নগ্না নন্দিনীকে রোরুদ্যমান অবস্থায় একটু আগে কোল হইতে নামাইয়া আসিয়াছে। তাহারই সম্পর্কে রসিকতা উঠিয়াছে দেখিয়া সেও চটপট উত্তর দিল, 'মাতবর কাকা থাকতে আমার মাইয়ার আবার বিয়ার ভাবনা। কাকা রাজি হইলে এই বৈঠকেই সাতপাক ঘুরাইয়া দিতে পারি।'

কথাটা খুব হাসির। কৃষ্ণচন্দ্র মুখনিচু করিয়াই হাসিল। কেউ কেউ সে-হাসিতে যোগ দিল; অনেকেই দিল না। যারা যোগ দিল না, একটু পরে ভারত যখন মূল কথা উত্থাপন করিল, তাদের মধ্যে তখন একটা অসন্তোষের গুঞ্জন উঠিয়া মিলিয়া গেল।

আসরের চারিপাশে সর্বসাধারণের স্তরের যারা বসিয়া ছিল, তাদের মধ্যে অনবরত হুকা চলিতে লাগিল এবং কাসির মাত্রাটাও এই সময়ে চারিদিকেই একটু বাড়িল। মনের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশের ভাষা হয়ত ইহাদের আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সাহসের স্বভাব-সুলভ অভাবই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে। তাই ইহারা

আগাইয়া আসিয়া সরবে মনের আলোড়নকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোন যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে দেশে এরা আগাইয়া সামনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তের দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়। কোথাও হাসিয়া, কোথাও কাঁদিয়া, কোথাও শিষ্ দিয়া। আবার কোথাও তৈজসপত্র ভাঙিয়া বা দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ও কেরোসিন-সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে দেশলাইর কাঠি ধরাইয়া। গোকনঘাট গ্রামের মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল সেদিন হুকা টনিবার ছলে অনেকে এক সঙ্গে কাসিয়া।

দয়ালচাঁদের মুখ দিয়া অনুচ্চ স্বরে বাহির হইল, 'আমি হইলে তিতাসের জলে তলাইয়া গিয়া মান বাঁচাইতাম।'

'দশের বৈঠকে লক্ষ্মণ-বর্জনের পালাখান তুমি কইর না দয়াল বেপারি। ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ নাই।'

'কোন্ ক্রেতাযুগে কি কইরা রাখ্‌ছ অখন তারে ধুইয়া জল খাও।'

নিজেদের মধ্যে ব্যাপার। তাই মাতব্বররা ওর বেশী কথা বাড়াইল না। কেবল রামপ্রসাদ তিরস্কার করিল, 'কৃষ্ণচন্দ্র, মাতব্বরগিরির মানমজ্জাদা তুমি বুঝি আর রাখ্‌তে চাও না।'

কৃষ্ণচন্দ্র খুব লজ্জা পাইল, বলিল, 'আর কটা দিন ক্ষেমা কর।'

'ঠাকুর-সকল, আমার একখান কথা।'

রামপ্রসাদ ফিরিয়া দেখে তার ঠিক পিঠের কাছেই রেশমি চাদর গায়ে একজন কথা কহিয়া উঠিয়াছে।

'কি কইতে চাও কও না।'

যারা এখান হইতে মাছ কিনিয়া শহরে গিয়া বিক্রি করে তাদের সামনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়াছে। সে সমস্যার সে একজন ভুক্তভোগী। মোড়লের আশ্বাস পাইয়া জানাইল আনন্দবাজারের মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাহিতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগকে বাজারে বসিতে দিবে না।

রামপ্রসাদের চোখে মুখে একটা কঠোরতার ছায়া পড়িল। সে-বাজারের ইতিহাসখানা চকিতে তার মনের পরদায় ছায়া ফেলিল। জগৎবাবু আর আনন্দবাবু শহরের এই দুজন গণ্যমান্য জমিদার একই সময়ে নিজ নিজ নামে দুইটি বাজার বসায়। দুইজনেই চায় নিজেরটা জমুক, অন্যেরটা না জমুক। দুজনেরই লোকে মালোদের ধরিয়া পড়িল। মালোরা কার কথা মান্য করিবে ভাবিয়া পায় না। রামপ্রসাদের কাছে সকালে আসিল জগৎবাবুর লোক, বিকালে আসিল আনন্দবাবুর লোক। সে যার পক্ষে টলিবে, মালোরা তারই বাজার জমাইবে। সকালে যারা আসিল, গোপনে জানাইল, বাবু তোমাকে তিনশ টাকা দিবে, তুমি কথা কও। সে কথা কহিল না। বিকালে যারা আসিল, তারা জানাইল, বাবু মালোদের প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা নগদ দিবে, আর একখানা করিয়া ধুতি দিবে। রামপ্রসাদ তাহাদিগকে পানতামাক খাওয়াইল।

পরের দিন মালোরা দলে দলে মাছের ভার লইয়া আনন্দবাজারে পশরা সাজাইল। যারা বেপারী তারা ত গেলই, যারা বেপারী নয়, তারাও নৌকা ঘাটে বাঁধিয়া এক এক ভার মাছ লইয়া বাজার আলো করিল। কি জমাইটাই না জমিয়াছিল সেদিনকার বাজার। সেদিন হইতে জগৎবাজার কানা। আনন্দবাবুর সেদিন মুখে হাসি ধরিতেছিল না। সে আনন্দবাবু আজ নাই। তাঁর লোকেরা আজ গোকর্ণঘাটের মালোদের কাছে খাজনা চায়।

'শুন বেপারি, বাবুরে সাফ্ কথা কইয়া দিও, মালোরা মাছ বেচ্‌তে কোনো সময় মাশুল দেয় নাই, দিবেও না। জায়গা দেউক আর নাই দেউক। মালোরা বাজার জমাইতে যেমুন জানে, ভাঙতেও জানে। তারা যেখানে যায়, আ-পথে পথ হয়, আ-বাজারে বাজার হয়।'

তামসীর বাপের কানে এসকল কথা ঢুকিতেছিল না । সে নিজের কথা ভাবিতেছিল। এই বৈঠকে তার কথাও উঠিবে। মনে মনে সে নিজেকে অপরাধী স্থির করিয়া রাখিল। সত্যই ত, পাড়ার মধ্যে ঐক্য রাখা ও পাড়ার স্বার্থ দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। তারা আমার কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজাপার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলিয়া আসিতে হয়। সে-পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধুতি-চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।

এমন সময় তার ডাক পড়িল।

ডাকিল দায়ালচাঁদ, 'তামসীর বাপ শুনছ নি?'

'হ কাকা, শুনছি, কও।'

দয়ালচাঁদ বলিয়া চলিল, বাজারের কাছে তোমার বাড়ি। বাজারের কায়েতরা তোমার বাড়ি আসিয়া নাকি তবলা বাজায় আর মেয়েদের দিকে নজর দেয়। ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবেনা। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসনও দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কল্‌কেখানা। না না, কাজখানা তুমি ভাল করিতেছ না।

অনুতপ্ত তামসীর বাপ শুধু এই কথা কয়টি বলিতে পারিল, 'দশজন পরমেশ্বর, অনেক কাঁদছি, আর আমারে কাঁদাইও না।'

সবশেষে উঠিল অনন্তর-মার কথা। তার বুক দুরদুর করিতে লাগিল।

একথাটাও ভারতকেই তুলিতে হইল, নতুন যে লোক আসিয়াছে, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তারে নিয়া কিভাবে সমাজ করিতে হইবে আপনারা বলিয়া যান। তারে কার সমাজে ভিড়াইবেন, কিষ্টকাকার, না দয়ালকাকার, না বসন্তর বাপকাকার--

কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'কোন্ গুষ্টির মানুষ আগে জিগাইয়া দেখ্, কোন্ কোন্ জাগায় জ্ঞেয়াতি আছে জান্।'

আদেশমত সুবলার বৌ তাকে জিজ্ঞাসা করিল।

অনন্তর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ভইনসকল গুষ্টি-জ্ঞিয়াতির কথা আমি কিছু জানি না।'

শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইল। কেহই তাহাকে নিজের সমাজে লইতে আগ্রহ দেখাইল না।

কৃষ্ণচন্দ্র বলিল, 'আমার সমাজ বিশ ঘরের। ঘর আর বাড়াইতে চাই না।'

দয়ালচাঁদের সমাজও দশ ঘরের। প্রত্যেকটাই বড় ঘর। তার সমাজেও ঠাঁই হওয়া অসম্ভব।

মঙ্গলা বসিয়াছিল সকলের পশ্চাতে। ঠেলিয়াঠুলিয়া আগাইয়া আসিয়া সে বলিল, আমার সমাজ মোটে তিন ঘরের।'

রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কারে কারে লইয়া তোর সমাজ?'

'সুবলার শ্বশুর আর কিশোরের বাপেরে লইয়া।'

'তা হইলে নতুন মানুষ লইয়া তোর সমাজ হইল চাইর ঘর।'

'হ কাকা।'

কৃষ্ণপক্ষের রাত। দশমী কি একাদশী হইবে। কালিঢালা আঁধারের ভিতর দিয়া রামপ্রসাদ চলিয়াছে।

তার সারা দেহে বার্ধক্য যেন জোর করিয়া ছাপ মারিয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রান্থিবন্ধন যেন অনেক কষ্টে শিথিল হইতে পারিয়াছে। আবেশায়ত চোখদুটি হইতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি যেন সবলে অপসৃত হইয়াছে। রামপ্রসাদের আজ যেন কি হইয়াছে। রামপ্রসাদ পথ হারাইয়া ফেলিল।

যে পথ চিনিয়া চলে তার পথ একটি, আর যে দিশাহারা হইয়া চলে তার পথ শত শত। মালীবাড়ির পথের পর আরেকটা পথে পা দিয়া তার আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার স্তব্ধতায় সহসা ঢেউ জাগাইল এই মালিনী। অনেক সময় এক একটা চিন্তা মানুষের মনে আসিয়া ঢোকে আকস্মিকভাবে, আগে একটুও খবর না দিয়া। তার অবচেতন মনের চিন্তার সঙ্গে সে-চিন্তা যোগ রাখিয়া আসেনা, একেবারে আকাশ ফাঁড়িয়া আবির্ভূত হয়,—সে মীমাংসা মনস্তাত্ত্বিকের কাজ। আমরা দেখিতে পাই, সে-চিন্তা আকস্মিক আসিলেও আগের চিন্তা-গুলির তাহা অনুপূরক। তাই মালিনী তার মনে আকস্মিক হইলেও, সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল সে একটা প্রসঙ্গের আবছা তরীতে ভর করিয়াই আসিয়া নামিয়াছে তার চিন্তার জোয়ারে।

হয়ত রামগতির উঠানে জড়ানো জাল দেখিয়া মনে হইয়াছিল বিভ্রান্ত রামপ্রসাদের, যে এটা মালিনীর বাঁশের ঝাড়। হয়ত পথ চলিতে চলিতে এও মনে হইয়াছিল, আমার পথের একটু ডানদিকেই একটা বাড়ি আছে, সেটাকে বলে মালীবাড়ি। সে বাড়ি এখন পোড়ো। তার পাশ দিয়া যে পথ গিয়াছে রাতে সে পথে কেউ হাঁটে না। বেঘোরে মরা মালিনীর প্রেতাত্মা এখানে মূর্তি ধরিয়া পথিককে ভেংচায়। আর নানারকমের সাপ এপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যাঙ ধরে।

কিন্তু এবাড়ি আগেত এমন ছিল না। এর চারদিকে মালঞ্চঘেরা ছিল। একদিকে ফুলবাগান, একদিকে বেগুন ক্ষেত, একদিকে বাঁশঝাড়, আমগাছ, আর পূর্বদিকে পুষ্করিণী। ফুলগুলিতে মৌমাছি গুন্‌গুন্‌ করিত। আমগাছে বসন্তের কোকিল ডাকিত। বাঁশঝাড়ে দিনরাত পাখ্‌পাখালিতে কলরব করিত। মালিনীর যখন বয়ঃসন্ধি সে তখন কলাপাতা লইয়া এই পথ দিয়া পাঠশালায় গিয়াছে। ভরা যৌবনেও মালিনীকে দেখিয়াছে। এখনো মনে পড়ে দাওয়ায় বসিয়া মালী ও মালিনীতে ধুচনি বুনিতেছে, শেষে একদিন মালী মরিয়া গেল। তখনও মালিনীর ভরা যৌবন। সেই অবারণ যৌবনভার আগলাইয়া বহুদিন সে কাটাইয়া দিল। বাড়ির চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া তখনো ছিল। তার মনের বাঁধন যতই আলগা হইতেছিল, মালঞ্চের বাঁধনকে ততই সে শক্ত করিয়া তুলিতেছিল। সেখানে ঢুকিয়া কিন্তু ফুলে হাত দিবার সাধ্য কারো ছিল না। মুখে প্রণয়ের মধুভাণ্ড ধারণ করিয়াও সে-বাড়িতে পা ফেলিতে অনেকের বুক শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইত। আজ মুখে কালকূটের বোঝা লইয়া জাতকেউটেরা অসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এরকম হইল কেন? কেন মালিনীর যৌবনের ছেলেপুলেগুলি, বার্ধক্যের নাতি-নাতনিগুলি এবাড়ির আঙিনায় খেলাইতে নামিল না। তার থেকে কেন আরো দশটা জোয়ান পুরুষ-নারী ঘর্মক্লান্ত দেহে এই বাড়ির ফুলফলের ভার সাজাইতে আজ এখানে কর্মব্যস্ত নয়। সংখ্যায় বাড়িয়া, এই বাড়িতে স্থানের অকুলান দেখিয়া, আরো জঙ্গল কাটিয়া, খানায় মাটি ফেলিয়া তারা কেন আরো দুই চারিটা মালীবাড়ির গোড়াপত্তন করিল না? ইহাতে বাধা জন্মাইল কিসে? এসবের সহজ পন্থার বিরাট সম্ভাবনা কেন এক মালিনীর বুকের কানাচে শুকাইয়া মিলাইয়া গেল। এমন করিয়া কেন বাড়ি খালি হইয়া পড়ে। একদা যারা বাস করে, পরে তারা কোথায় চলিয়া যায়। কেন আবার নতুন মানুষ আসে না। মালিনী অনেকবার বাঁশের মাচাতে লাউকুমড়ার গাছ লতাইয়া দিয়াছে। তাতে ধরিয়াছে অজস্র লাউকুমড়া। সে নিজে কেন একটা শক্ত মাচাকে আশ্রয় করিয়া ফলবতী হইয়া উঠিতে পারিল না। তবেত এ বাড়ির চেহারা আগের মতই অম্লান থাকিয়া যাইত। নূতন যুগের সম্ভাবনা লইয়া নূতন মানুষ এর আঙ্গিনায় খেলিয়া বেড়াইত। নূতন শিল্পীরা যুগের চাহিদা পূরণ করিয়া, নূতন চাহিদা জাগাইতে নূতন রকমের শিল্পরচনা করিয়া যাইত। কেউটে সাপ এ-বাড়ির ত্রিসীমায় ঘেঁষিত না।

শরীয়তুল্লা বাহারুল্লা দুই ভাই শহরে গিয়াছিল। ফিরিতে রাত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের অন্ধকার পথগুলি একসঙ্গে অতিক্রম করিয়া বাড়ির কোণে আসিয়া ছাড়াছাড়ি হইল। পাশাপাশি দুই বাড়ি। মাঝখানে বেড়া। তারা যার যার পরিবার নিয়া আলাদা থাকে। ছোটভাই শরীয়তুল্লা ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত বাহারুল্লা দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ঘুরিয়া কয়েক পা হাঁটিয়া নিজের হিস্যায় পা দিল। দিয়া, চমকাইয়া উঠিল। উঠানের কোণে ধানসিদ্ধ করার যে দু-মুখো উনান আছে সেখানে একটা ছায়ামূর্তি নত হইয়া কি যেন হাতড়াইতেছে। কাঁধের লাঠি হইতে আস্ত গজার মাছটা খুলিয়া লাঠিখানা বাগাইয়া একেবারে তার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে।

'মাত্‌বর তুমি। অত রাইতের পর ইখানে।'

'বাহারুল্লা ভাই, আমি পথ বিস্মরণ হইয়া গেছি। গেছ্‌লাম সমাজের বৈঠকে। এমন ভুল ত হয় না আমার।'

বাহারুল্লা তাহাকে হাত ধরিয়া বারান্দায় উঠাইল।

তার পরিবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিতেই উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া দরজা খুলিল। সে ঘরে ঢুকিয়া গামছা-বাঁধা পুঁটলিটা মাটিতে রাখিল। একটা পিঁড়ি হাতে বারান্দায় আসিতে আসিতে পরিবারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, 'একটু তামুক নি খাওয়াইতে পারে।'

পরিবার বৌ নয়, গিন্নি। তার তিন ছেলের তিন বৌ স্বামী লইয়া তিন ঘরে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গিন্নি ক্ষিপ্রহাতে হুকা ধরাইয়া কপাটের কোণে ঠেকাইয়া, বাহারুল্লার ভাতের জন্য পাকঘরে গেল। মাঝঘরের বিছানাটা বারান্দা হইতে দেখা যায়। এই বাড়ির গৃহিনী একটু আগে এখান হইতেই উঠিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ছেলেপুলে বুকে পিঠে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রামপ্রসাদ তামাক টানিতে টানিতে একবার সেদিকে আর একবার বাহারুল্লার দিকে চাহিল। বাহারুল্লার বয়স তারই কাছাকাছি। তার ভরপুর সংসার। জমিগুলি সব নিজের। তিন ছেলেকে লইয়া চারজোড়া বলদ দিয়া চারখানা হাল চালায়। যত ধান ঘরে ওঠে, গিন্নি বৌদের নিয়া ভানিয়া ডোল ভরতি করে। এবার অনেক ধান উঠিয়াছে। কাটার বাকিও রহিয়াছে অনেক। ভোর হইলেই ছেলেদের ডাকিয়া মাঠে পাঠাইয়া দিবে, বৌদের ডাকিয়া তুলিবে আর চারজনে মিলিয়া ধান সিদ্ধ করিতে বসিবে। রাঁধে দুমুখো উনানে, কিন্তু ধানসিদ্ধ করে চারমুখো ছমুখো উনানে। একসঙ্গে চার-ছ হাঁড়ি সিদ্ধ হইয়া যায়। মোরগডাকার আগে সিদ্ধ শুরু করিয়া রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে-ধান উঠানময় ছড়াইয়া দিবে। সারাদিন রোদ লাগিবে ধানে।

লণ্ঠনের আলোতে সাদা মাটি উঠানটা চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। হুকাটা ফিরাইয়া দিতে দিতে রামপ্রসাদ বলিল, 'ধান ত এইবার খুব ফলছে।'

'হ মাত্‌বর।'

'জারি গাইবা না?'

'না, এইবার ক্ষেমা দিলাম। ধান যে রকম গম্‌গমাইয়া পাক্‌তে লাগছে, জারির উস্তাদের খোঁজে ঘোরার সময় কই?'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া রামপ্রসাদ উঠানের দিকে একবার চাহিল। এ উঠানে কত জারি গান হইয়াছে। মুল্লুকের সেরা ওস্তাদ আনা হইত। একমাস ধরিয়া সে-ওস্তাদ পাড়ার ছেলেদের শিখাইত। তারপর নিমন্ত্রণ করিয়া পাল্টা দল আনা হইত। দুই দলে হইত প্রতিযোগিতা। ছেলে ও যুবার দল কাঁধে-কাঁধে কোমরে-কোমরে ধরিয়া বীরের নাচ নাচিত। সারা উঠান কাঁপিয়া উঠিত। গান যা জমিত!

'বাহারুল্লা ভাই, গানগুলি কি ভাল লাগত! এই দুইটা গানের সুর অখনো মরমে গাঁথা হইয়া আছে—'মনে লয় উড়িয়া যাই কারবালার ময়দানে,' আর 'জয়নালের কান্দনে, মনে কি আর মানে রে, বিরিক্ষের পত্র ঝরে।'

'হ মাত্‌বর, এই সগল গানই খুব জমত। আরেকটা গানও বেশী জমত, মনে পড়ে নি মাত্‌বর,–'বাছা তুমি রণে যাইওনা, চৌদিকে কাফিরের দেশ, জহর মিলে ত পানি মিলে না।' এই সগল গান ক বছর শুনি না। আমার এই উঠানে জারিগান কতবার হইছে।'

সে গানে মালোরাও নিমন্ত্রণ পাইত। রামপ্রসাদ কতদিন এই উঠানেই বসিয়া শুনিয়াছে। বীররস করুণরসের এসকল গান শুনিতে বসিলে ওঠা যায় না। কয়েক বৎসর ভাল ফসল হয় না। চাষীরা কেবলই দেনায় জড়াইয়া যাইতেছে। লোন কোম্পানীর টাকা আনিয়া কত চাষী আর শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রতি কিস্তিতে কত শাসানি কত ধমক খাইয়া মরিতেছে। জারি গাহিবে তারা কোন্ আনন্দে? এবার ভাল ধান হইয়াছে। সে ধান তুলিয়াই সারা হইতেছে। জারিগান গাহিবার সময় কই?

'মালোগুষ্টির কালীপূজার দেরি কি, মাত্‌বর?'

'বেশী দেরি নাই। সামনের অমাবস্যায়।'

'এইবার গান দিবা না?'

'হ, আট পালা। চাইর পালা যাত্রা আর চাইর পালা কবি।'

'আ–ট পালা? এই টেকা দিয়া তারা মালোপাড়ায় যদি একটা ইস্কুল দিত।'

'আর ইস্কুল। মালোরা পুলকে বাঁচে না, তারা দিব ইস্কুল!'

'দেখ মাত্‌বর, নিজেত আঙ্গি ক খ শিখলাম না। কিন্তু 'কালা আখর' যে কি চিজ অখন কিছু কিছু টের পাই। মজিদের কিনারে এজমালির যে মক্তব জমাইছি, বেহানে তার কাছ দিয়া যাইতে যাইতে খাড়া হইয়া থাকি, তারা পড়া করে, আমার কানে মধু বরিষণ করে।'

'বাহারুল্লা ভাই, উচিত কথা কইলে মালোরা লাঠি মারতে চায়। এই দুঃখেইত গাঁও ছাইড়া দেশান্তরী হইলাম।'

জোরে একটা টান দিয়া হুকাটা রাখিতে রাখিতে বাহারুল্লা বলিল 'মালোগুষ্টি সুখে আছে। মরছি আমরা চাষারা। ঘরে ধান থাক্‌লে কি, কমরে একখান গামছা জুটেনি পাঠ বেচবার সময় কিছু টেকা হয়। কিন্তু খাজনা আর মহাজন সাম্‌লাইতে সব শেষ। কত চাষায় তখন জমি বেচে। তোম্‌রা-তারার দোয়ায় অখন অব্‌ধি আমার জমিতে হাত পড়ছে না। পরে কি হইব কওন যায় না।'

'এই কামও কইর না বাহারুল্লা ভাই। জান্ থাকতে জমি ছাইড় না। মালোগুষ্টির কথা আল্‌গা। তারা জলের উপ্‌রে জলটুঙ্গি বাইন্ধা আছে। জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। মাটির সাথে সম্বন্ধ-ছাড়া মানুষের জীবনের কোন বিশ্বাস নাই, বাহারুল্লা ভাই।'

'চল মাত্‌বর তোমারে আগাইয়া দেই।'

রামপ্রসাদ উঠানে নামিয়া দেখে, চাঁদ উঠিয়াছে। বড় তেজালো চাঁদ। সামনের দিকে যেন রথ ছুটাইয়া আসিতেছে।

'জোছনা উঠ্‌ছে বাহরুল্লা ভাই, তুমি ঘরে যাও, খাও গিয়া। অখন আমি একলাই যাইতে পারমু।'

যে-শিশু আকাশ-কোণে হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়াছিল, সে এখন ধাপে ধাপে আগাইয়া আসিতেছে। সুনীল স্বচ্ছ আকাশখানা দূরের না-দেখা-জগৎ হইতে অনেকখানি নীচে যেন নামিয়া আসিয়া ঘুমন্ত মালোপাড়ার উপর চাঁদোয়া ধরিয়াছে। গায়ে-গায়ে লাগানো ছনের ঘরগুলি বিমল আলোর ধারায় স্নান করিয়া এককালে মাথা তুলিয়া আছে। কানাচে কানাচে পড়িয়াছে ছোট ছোট ছায়া। তাই মাড়াইয়া চলিতে লাগিল রামপ্রসাদ। মালোপাড়ায় জোৎস্নার এমন অজস্রতা। এর প্রতিঘরের উপর গলিয়া-পড়া রূপলোকের এমন পরিপূর্ণ হাসি। নির্মল আকাশের স্বচ্ছতার সঙ্গে মাথা উঁচুকরা ঘর-বাড়িগুলির এমন আবেগময় আলিঙ্গন। এ দৃশ্য পাড়ার আর কেউ দেখিল না, দেখিল কেবল রামপ্রসাদ।

আরো একজন দেখিতেছিল। কিন্তু সে দেখা অর্থহীন, অনুভূতিহীন। রামপ্রসাদ গিয়া রামকেশবের উঠানে পা দিতেই দেখে, সে ধাঁ করিয়া উঠানের একধার হইতে অন্যধারে চলিয়া যাইতেছে।

রামকেশবের উঠানে আলোর তেজ কম। সারা উঠান ঢাকিয়া বাঁশের আগায় জাল ছড়াইয়া রাখিয়াছে। মাটির উপর তার ছায়া পড়িয়াছে। জালের খোপের ভিতর দিয়া মাছেরা মাথা গলাইতে পারে না, কিন্তু চাঁদের আলোরে আটকায় কার সাধ্য। প্রতি খোপের ফাঁক দিয়া সে আলো উঠানের স্বচ্ছ মাটিতে পড়িয়াছে। কোন্ সুচতুরা মালোর মেয়ে বুঝি অপার্থিব ক্ষমতায় আলোর জাল বুনিয়া রামকেশবের উঠানের মাটিতে বিছাইয়া দিয়াছে।

উত্তরের ভিটির ঘর রামকেশবের। দুইচালের ঘর। সামনে একফালি বারান্দা। অনুচ্চ ভিটির কিনারাগুলি স্থানে স্থানে ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘরের পূবের অংশ অন্দরমহল। এককালে আবরু-বেড়া ছিল। ভাঙিয়া পড়িয়াছে অনেক দিন। আগে ছেঁড়া জাল দিয়া ভাঙা জায়গাগুলি ঢাকিবার চেষ্টা হইত। এখন আর সেরূপ চেষ্টা নাই, দেখিলেই মনে হইবে এ বাড়ির আবরু রক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

বারান্দার উপরে একপাশে চালের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে কতকগুলি এলোমেলো দড়াদড়ি। তার পাশে কয়েকটা ছেঁড়া জালের পুঁটুলি উপরি-উপরি মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তারই উপরে কুকুর-কুণ্ডলী দিয়া বোধ হয় লোকটা শুইয়াছিল। ধাঁ করিয়া উঠানে নামিয়া রামপ্রসাদের সামনা দিয়া ভৌতিক ক্ষিপ্রতায় তিন লাফে উঠান পার হইয়া গেল। খালি গা। পরনে একখানি গামছা। মাথায় একবোঝা আলুথালু চুল। মুখ ভরতি দাড়ি। যাইবার সময় জালের নিচেকার বুনানো আলোছায়ায় তার মাটিমাখা কালো শরীরটা চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিল। একটু অস্বাভাবিক ফোলা শরীর।

রামপ্রসাদ দেখিয়া চিনিল।

সে ঝুলানো হাত দুটি ঘনঘন নাড়িতে নাড়িতে মুখ বাড়াইয়া আক্রমণের ভঙ্গিতে আগাইয়া আসিল। রামপ্রসাদের মুখের কাছে মুখ আনিয়া বিকৃত মুখে ম্লান একটু

হাসিয়া বিজ্ঞের মত আস্তে বলিল, 'অ, মাত্‌বর, অতদিন পরে। আচ্ছা বারিন্দায় উঠ, দেখ কি কাণ্ডখান হইয়া আছে।

'কি কাণ্ড হইয়া আছে। আরে শালা কি কাণ্ড?'

'দেখ না গিয়া।'

হাত ধরিয়া বারান্দায় তুলিয়া নিয়া দেখাইল। দা দিয়া মাটিতে তিন চারিটা গর্ত খুঁড়িয়াছে। লম্বা গর্ত। একটার মুখ খুঁড়িতে খুঁড়িতে আরেকটার গায়ের উপর তুলিয়া দিয়াছে। সেইখানে আঙুল ঠেকাইয়া বলিল, 'দেখ চাইয়া, কি হইতাছে। মাইয়া চুরি হইতাছে! এই তোমার মেঘনা গাঙ, অইখানে খাড়ি। খাড়িতে আছিল নাও, বড় গাঙে কি কইরা গেল। জাইগ্যা দেখি মাইয়া চুরি হইতাছে। বাইরে জোছনা ফট্‌ফট্‌ করে, ভিতরে আন্ধাইরে মাইয়া চুরি হয়। কি কও মাত্‌বর।'

রামপ্রসাদ কিছুই কহিল না। তিতাসের শুশুক মাছগুলি যেমন সন্ধ্যার ছায়া পাইয়া ভাসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়ে, জালের পুঁটলিগুলির উপর বসিতে বসিতে ফোস্‌ করিয়া একটা নিঃশ্বাসের শব্দ তার নাক দিয়া বাহির হইল।

ঘরের ভিতর রামকেশব অকাতরে ঘুমাইতেছে। নাক-ডাকার শব্দ শোনা যায়। শেষরাতে জালে যাইবে। এখন তাকে ডাকিয়া জাগান মর্মান্তিক। ঘুমভাঙা মানুষ মাথা ঠিক রাখিয়া জাল ফেলিতে পারে না। তার রোজগারটাই মাটি হইবে। শেষরাতের আর দেরি কত।

রামপ্রসাদ অধিক ভাবিতে পারিল না। চিন্তাতে বিমনা, ক্লান্তিতে অবশ রামপ্রসাদকে জালের উষ্ণতাটুকুর মাঝে ঘুম একেবারে কাত করিয়া ফেলিয়া দিল।

রাত শেষ হইবার আগেই একবার ঘুম ভাঙিয়াছিল। পাগল তাহার একান্ত কাছে। হাতের কাছে মাটি খুঁড়িবার একটা দা রাখিয়াছে। একটা কিছু করিয়া ফেলা স্বাভাবিক। চোখ মেলিবার সঙ্গে সঙ্গে এ-ভয়ই সে করিতেছিল। চোখ খুলিয়া দেখে, একজন তার অতি কাছে বসিয়া, মুখখানা তারই মুখের কাছাকাছি। ভয় পাইবার আগে জড়তাগ্রস্ত চোখ কচলাইয়া দেখিল—রামকেশব। তাকে আগলাইয়া রাখিয়াছে। বুড়ার দাড়িগুলি তার দাড়িগুলির একান্ত কাছে। প্রশস্ত লোমশ বুকখানাও তার বুকের অতি নিকটে। তার লোমশ বুকের উষ্ণতা রামপ্রসাদের বুকেও লাগিতেছে।

রামকেশবের বয়স তার চাইতে আরো বেশী। শরীর তার মতই শক্তির পরিচয় দিলেও, তার চাইতে বেশী ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চুল দাড়ি চোখের ভ্রূ কানের লোম এখনো কাঁচাপাকা। রামপ্রসাদের শণের মত সাদা চুলদাড়ির নিকট তাকে আকাশের পথে কাত-হইয়া-দৌড়-দেওয়া চাঁদের বারান্দায়-ঢুকিয়া-পড়া আলোতে নাবালকের মত দেখাইতেছে। যেন দুইটি প্রাগৈতিহাসিক শিশুর অপার্থিব সমন্বয় ঘটিয়াছে, যার ইতিহাস স্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর একজন যে জানে, তার কোনো অনুভূতি নাই।

দুইজনের মধ্যে এই রকম কথাবার্তা হইল—

—মাতবরের ছেলে, ডাক দিলে না, কোন্‌ সময়ে আসিয়াছ জানিলাম না। শীতে কষ্ট পাইলে।

—না মালোর ছেলে, শীতে কষ্ট বেশী পাই নাই। ঘুমাইয়া পড়িলে আবার কষ্ট কি। ভাবিলাম তুমি যখন শেষরাতে নদীতে যাইবে, তোমার নৌকায় আমি যাইব। তুমি আমাকে যাত্রাবাড়িতে নামাইয়া দিবে।

—সারা রাতে একবার বাহির হইয়াছিলাম। বাহির হইয়া দেখি একটা মানুষ। কাছে আসিয়া দেখি তুমি। জাগাইলাম না। পাগলটা কাছে। তাই বসিয়া গেলাম শিয়রে। রাতের জালে যাওয়া আর বাবা আমারে দিয়া কুলাইবে না। খেউ তুলিয়া জালে হাত দিলে হাত ঠক ঠক করিয়া কাঁপে। গাঙের বাতাসে কান-কপাল ভাঙিয়া নামায়। বুক যেন ভোঁতা ছুরি দিয়া কাটে। আমার কি আর বাবা মাছ ধরার সময় আছে। আমার এখন গুফার মধ্যে বসিয়া বসিয়া তামাক টানিয়া কাটাইবার দিন। বিধি তারে কোন্ পাগল বানাইল। কত পাগল ভাল হয়, আমার পাগল আর ভাল হইল না। ঘরে আসিয়া বস, আমি তামাক জ্বালাই।

মাটির গাছাতে কেরোসিনের আলো মিটমিট করিতেছে। বাহির হইবার সময়েই রামকেশব জ্বালিয়াছিল। তারই মলিন আলোতে ঘরখানার মলিনতা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙা চাটাইর উপর ময়লা ছেঁড়া কাঁথা পাতিয়া বিছানা। দুইটি বালিশের একটিতে তুলা বাহির হইয়াছে। সেটিতে রামকেশব শুইয়াছিল, চুলে দাড়িতে একটু একটু তুলা এখনো লাগিয়া রহিয়াছে। অন্য বালিশটিতে মাথা রাখিয়া যে শুইয়া আছে, খুব ভারী রোঁয়াওঠা কাঁথাতে তার পা থেকে মাথার বালিশ অবধি ঢাকা। সে রামকেশবের পরিবার।

'অ বুড়ি, উঠ্ চাইয়া দেখ্—'

কাঁথার পুঁটলি নড়িয়া উঠিল। মলিন কন্থাবরণের অন্তরাল হইতে উন্মোচিত হইয়া ততোধিক মলিন মুখখানা প্রশ্ন করিল, 'অত রাইতে বাড়িতে কোন্ কুটুমের পাড়া।'

'বজ্জাত বুড়ি, কথা কইস্ না। জামাই।'

জামাই! জীর্ণ স্মৃতির ছেঁড়া সূতাগুলি মিলাইতে অনেকবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তার বাড়িতে জামাই কে আসিতে পারে হিসাবে মিলাইতে পারিল না। পিচুটি-পড়া চোখে ঘুমের ঘোর। ছাপপড়া খড়িওঠা চামড়ার মুখমণ্ডলে ঘুমের জড়-প্রলেপ। তার উপর ফাঁকে ফাঁকে দাঁত না থাকায় মুখের হাঁ—এ সকল মিলাইয়া বুড়ির হতবুদ্ধির মত তার দিকে চাহিয়া থাকাকে রামকেশববের নিকট এত কুৎসিত মনে হইল যে, আর সহ্য করিতে পারিল না। হাত ধরিয়া তাকে এক টানে তুলিয়া বসাইল। খুলিয়া-যাওয়া কটির ও বুকের কাপড় অশেষ চেষ্টায় ঠিক করিতে করিতে বুড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই আইল কোন খান থাইক্যা, না কইলে কেম্নে বুঝি কও।'

'যাত্রাবাড়ির জামাই। বসন্তর বাপ।'

ভাগ্নী-জামাই। দেশদেশান্তরে মান্য করে। ভাগ্নী মরিয়া গিয়াছে। তাই এবাড়িতে আর আসা-যাওয়া নাই।

বুড়ির মাথা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হওয়ার পর ঘোমটা টানিয়া দেওয়ার কথা মনে পড়িল।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া অনেক দূরে মোরগ ডাকিয়া উঠিল। যারা খাটিয়া খায় ইহা তাহাদের নিকট ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই সময়ে চাষীর মেয়েরা ধানসিদ্ধ করিবার জন্য উনুনের মুখে আগুন দেয়। মালোর মেয়েরা চোখে মুখে জল দিয়া শণসূতাকাটিতে বসে। পুরুষেরা যারা আগ-রাতে যায় নাই, এই সময়ে জাল-কাঁধে রওনা হয়।

কাঁধে জাল হাতে হুকা রামকেশব বাহিরে পা দিতে দিতে বলিল, 'মাত্‌বরের পুত্‌, আইজ কিন্তু যাইও না।'

প্রতিটি ঘরের আঙিনাতে রোদ নামিয়াছে। সকালের সোনালি রোদ। কারো বৌ-ঝি বসিয়া নাই। কারো ছেলে মেয়ে বিছানায় পড়িয়া নাই। তারা আঙিনায় নামিয়া পড়িয়াছে। মায়েদের শাড়ি দুই ভাঁজ করিয়া গা ঢাকিয়া গলাতে বাঁধা ছিল। রোদ পাইয়া খুলিয়া দিয়াছে। খালি গায়ে এখন খেলাতে মগ্ন। কালোতে ফরসাতে মেশা সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুর দল।

রামপ্রসাদ তাহাই দেখিতে দেখিতে নদীর দিকে চলিল। তার চোখে আজ রোদের সোনা মিশিয়া চারদিক সোনাময় হইয়া গিয়াছে। আজ এরা যেন সব সোনার শিশু। সোনার খেলনা হাঁড়িখুঁড়ি লইয়া রূপার বালিতে ভাত চাপাইয়া চাঁদসুরুজের দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। তবে নেহাৎই খাইবার স্থূল নিমন্ত্রণ।

অনন্তও আঙিনাতে নামিয়া খেলায় মাতিয়াছে। মায়ের সাদা পাড়ের কাপড়খানা দুই ভাঁজ করিয়া গলায় বাঁধা।

রামপ্রসাদ তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেও এই সাদাচুল দাড়িওয়ালা লোকটার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা কি ভাবিয়া বারান্দার উপর উঠিয়া ডাকিল, 'মা।'

মা বারান্দায় নামিয়া, এমন মানুষকে তার আঙিনায় এমন বিহ্বল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এত বিস্মিত হইল যে, না পারিল ভিতরে চলিয়া যাইতে, না পারিল মাথার ঘোমটা টানিয়া দিতে।

রামপ্রসাদ আরও অগ্রসর হইয়া অনন্তর একখানা হাত ধরিয়া হাসিমুখে বলিল, আমাকে দেখিয়া তোর ভয় করে? আমি তো তোর এখানে কোন বিচার করিতে আসি নাই। আসিয়াছি কেবল তোকে দেখিবার জন্য। ভিন্ন গ্রামের মানুষ আমি। আমার বাড়িতে তোর মার মত মা নাই। আমার আঙিনাতে তোর মত ছোট দাদুভাইয়েরা খেলা করে না। মা যদি এ গাঁয়ে না উঠিয়া আমার গাঁয়ে গিয়া উঠিত, এক ঘর আছি, আমার গাঁয়ে তাহা হইলে দুই ঘর হইত।

চতুর্থ অধ্যায়

জন্ম মৃত্যু বিবাহ

জন্ম মৃত্যু বিবাহ তিন ব্যাপারেই মালোরা পয়সা খরচ করে। পাড়াতে ধুমধাম হয়। অবশ্য সকলেই খরচ করিতে পারে না। যাদের পয়সা কড়ি নাই তারা পারে না।

তবু প্রতি ঘরেই জন্ম হয়, বিবাহ হয়, মৃত্যু হয়। এ তিনটি নিয়াই সংসার। এ তিনের সাহায্যেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। জন্মের পরে দীর্ঘ ব্যবধান অন্তে বিবাহ এবং তারপরে দীর্ঘ ব্যবধান অন্তে মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু যে সমস্ত ঘরে জন্মের পরেই মৃত্যু হইয়া যায় তারা দুর্ভাগা। কারণ তিনটি ব্যাপারেই খরচপাতি করা হইলেও বিবাহ ব্যাপারের খরচই সব চেয়ে আনন্দ ও অর্থপূর্ণ। বিবাহে যৌবনের সৃষ্টির যে নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে-লোকে পৌঁছানোর পথ যেমন খাটো, তেমনি পথের দুই পাশে থাকে ফুলের বন, প্রজাপতি আর রামধনু। সে পথের শুরু হয় বসন্তের হরিৎ উত্তরীয়-বিছানো রঙিন সিঁড়ির প্রথম ধাপে। শেষ যখন হয় তখন দেখা যায় সবুজ তরুর ফুলের সমারোহ শেষ হইয়া সে-তরুতে ফল ধরিয়াছে।

কিন্তু সে ফল পাকিয়া শুকাইয়াও তো যায় না। তখন তার ঝরিয়া না পড়িয়া উপায় কি। কালক্রমে সে তরু বন্ধ্যা হইয়া পত্রগুচ্ছ খসিয়া শিথিল হইয়াও তো যায়। তখন তার মূল উপড়াইয়া পড়িয়া না যাইয়া উপায় কি? সেরূপ ফলের জন্যও মানুষের ক্ষোভ নাই। সে রকম তরুর জন্যও মানুষের রোদন নাই।

কেন না, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এ তিন নিয়াই সংসার।

এ তিন বস্তু প্রতি ঘরেই স্বাভাবিক ঘটনা হইলেও এমনও ঘর দেখা যায় যে-ঘরে কোন কালে হয়ত বস্তু তিনটিকে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু বর্তমান হইতে দৃষ্টি করিয়া সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চোখ মেলিয়া যতক্ষণই চাহিয়া থাকি না কেন—তিনটিই পর পর আসিবে এমন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। অতীতকে নিয়া হাসিতে পারি, কাঁদিতে পারি, স্বপ্ন সাজাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া তাকে পাইতে পারি না। হাতের মুঠায় পাইতে চাই তো বর্তমান, আশায় আশায় বুক বাঁধিতে চাই তো ভবিষ্যৎ। কোন্ কালে কি হইয়াছিল সে-কথা তুলিয়া লাভ দেখি না।

একবার যে জন্মিয়াছে সে একদিন মরিবেই। কাজেই যে ঘরে মানুষ আছে মৃত্যু সে ঘরে ঘটিবেই। কিন্তু ঘরে মানুষ আছে বলিয়াই এবং সে ঘরে মৃত্যু একদিন ঘটিবে বলিয়াই জন্ম এবং বিবাহও সে ঘরে ঘটিবেই এ কথার অর্থ হয় না। তবে এমন ঘর চোখে পড়ে খুব কম এই যা।

মালোপাড়ায় এই দুর্ভাগ্যের অধিকারী একমাত্র রামকেশবের ঘর। বুড়াবুড়ির এখন ঝরিয়া পড়ার পালা। এ শুষ্ক তরুতে কখনো ফল ধরিবে, পাগলেও এ আশা পোষণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে। আর বিবাহ? জন্মিয়া পরে বিবাহ না করিয়া যে ব্যক্তি পাগল হইয়া গিয়াছে তার বিবাহের কথা ভাবিতে দ্বিধা বোধ করিবে স্বয়ং পাগলেও।

কোন কালে এঘরে না পড়িবে জনিুবার উলুধ্বনি, না শোনা যাইবে গায়ে-হলুদের গান। কিছুদিন পরে হোক, অধিকদিন পরে হোক, সে-ঘরে শোনা যাইবে শুধু একটি মাত্রই ধ্বনি। সে ধ্বনি শুনিয়া কেবল বুক কাঁপিবে, মনে এক ফোঁটা আনন্দ জাগিবে না।

কিন্তু রামকেশবের ঘর লইয়াই মালোপাড়ার সব নয়। এখানে কালোবরণের ঘরও আছে। এ-ঘর অল্পদিনের ব্যবধানে তিনতিনটা বিবাহের চেলিপরা মুখ দেখিয়াছে। তিন বৌ-ই ফলন্ত লতা। তিন জনেরই পাল্লা দিয়া ছেলেমেয়ে হইতেছে। এক একটি শিশুর জন্মের উৎসবও করে জাঁকজমকের সঙ্গে। অন্নপ্রাশন করে আরো জাঁকাইয়া।

কিছুদিন আগে মেজবৌ সন্তানসম্ভবা হইয়াছিল। কোনো-দিন স্বামীর ও নিজের খাওয়ার পর এঁটোকাঁটা ফেলিবার জন্য যদি আস্তাকুড়ের নিকটে আসিত, সেখান হইতে অনন্তর মার ঘরের সবটা চোখে পড়িত। দেখা যাইত অনন্ত তখন কতকগুলি বাঁশ বেত, একটা দা, আরো কিছু নগণ্য খেলার সামগ্রী লইয়া নিবিষ্ট মনে তুচ্ছ বস্তুকে প্রার্থনাতীত মর্যাদা দিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে।

মেজবৌর ক্লান্তিবিকৃত মুখ আর অস্বাভাবিক রকমের দৈহিক স্ফীতির কোনো কিনারা সে করিতে পারিত না।

একদিন কালোর মাকে খুব ব্যস্ত দেখা গেল। এক দৌড়ে অনন্তদের উঠানে আসিয়া হাঁক দিল, 'অনন্তর মা, জোকার দিয়া যা।'

অনন্তর মা গেল। আরো পাঁচ বাড়ির পাঁচ নারী আসিয়া মিলিত হইল। একখানা ছোট ঘরের দরজার মুখে তারা সকলে মিলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা। তাদের মাঝে অনন্তর মাও গিয়া দাঁড়াইল। মার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল গিয়া অনন্ত। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, অনন্ত জানিল না। একজনে মনে করাইয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিল, 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়।' অনন্তর নিকট একথাও অর্থহীন।

কালোর মা ঘরখানার ভিতরে থাকিয়া কি সব হুলুস্থুলু করিতেছিল, গলা বাড়াইয়া বলিল, 'বিপদ সাইরা গেছে সোনা-সকল। মন খুশি কইরা জোকার দেও।'

নারীরা উঠান ফাটাইয়া পাঁচবার উলুধ্বনি করিল।

নবাগতকে মাঙ্গলিক অভ্যর্থনা জানানো শেষ করিয়া নারীরা উঁকি দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। অনন্তও সকৌতূহলে দেখিল মেজবৌর সে স্ফীতি আর নাই। শীর্ণ। উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। চুল আলুথালু। চূড়ান্ত সময়ের প্রাককালে তার মুখের ভিতর নিজের চুল পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে চুল এখনো কতক কতক মুখে করিয়া বৌ বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। রক্তে একাকার। তারই মধ্যে রক্তের চেলির মত একফালি মানুষ। ননীর মত নরম, পুতুলের মত দুর্বল। বৌর পেট ফাঁড়িয়া এত দুর্বল ছোট মানুষটি বাহির হইল কি করিয়া!

একটা নেকড়ার সাহায্যে তুলিয়া কালোর মা দরজার কাছে আনিল সমাগতা নারীদিগকে দেখাইবার জন্য। সকলেই দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। অনন্ত একবার দেখিয়া পিছাইয়া গেল।

ছয় দিনের দিন ঘরে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি।

অষ্টমদিনে আট-কলাই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনন্তরও ডাক পড়িল। খই, ভাজা-কলাই, বাতাসা সেও কোঁচড় ভরিয়া পাইল।

তের দিন পরে অশৌচ-অন্ত। সব কিছু ধোয়া-পাখলার পর নাপিত আসিয়া কালোবরণাদি তিন ভাইয়ের তের দিনের খাপছাড়া দাড়ি কামাইয়া গেল। মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত উঠিয়া গেলে, উঠানে একটি চাটাই পাতিয়া তাতে ধান ছড়াইয়া দেওয়া হইল। নূতন একটা শাড়ি পরিয়া, নূতন একটা রঙিন বড় রুমালে জড়াইয়া ছেলেকোলে মেজবৌ বাহির হইল। চাটাইর উপর উঠিয়া ধানগুলি পা দিয়া সারা চাটাইয়ে ছড়াইয়া দিল। এদিকে পুরনারীরা এক সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিয়া চলিল, 'দেখ রাণী ভাগ্যমান, রাণীর কোলেতে নাচে দয়াল ভগবান। নাচ রে নাচ রে গোপাল খাইয়া ক্ষীর ননী, নাচিলে বানাইয়া দিব হস্তের পাচনি। একবার নাচ দুইবার নাচ তিনবার নাচ দেখি, নাচিলে গড়াইয়া দিব হস্তের মোহন বাঁশি।'

দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতে করিতে কালোবরণ পুরোহিতকে বলিল, 'দেখেন ত কর্তা, মুখে-পস্‌সাদের ভাল দিন নি আছে। দুই কাম এক আয়োজনেই সারা করতে চাই, কি কন্।'

পঞ্জিকা দেখিয়া পুরোহিত বলিয়া দিল, পরশুই একটা ভাল দিন অন্নপ্রাশনের।

ছোটবউর ছেলে বাড়িয়া উঠিতেছে। বসিয়া নিজের চেষ্টাতে মাথা ঠিক রাখিতে পারে। কিন্তু ইদানীং অত্যন্ত পেটুক হইয়া উঠিয়াছে। যাহা পায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়। কালোর মা বলে, মুখে-প্রসাদ দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

কাজেই দুইদিন পরেই বাড়িতে আরো একটা উৎসবের আয়োজন হইল।

সেদিনও অনন্তর মার ডাক পড়িল। আরো অনেক নারীর ডাক পড়িল। গীত গাহিবার জন্য।

প্রথমে স্নানযাত্রা। ছেলেকোলে ছোটবৌকে মাঝখানে করিয়া গান গাহিতে গাহিতে নারীরা তিতাসের ঘাটে গেল। ছোট বৌ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তার মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিয়া তারা চলিল রাধামাধবের মন্দিরে। সঙ্গে একথালা পরমান্ন। সেখানে পরমান্নকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ করা হইল। ছোট বউ একটুখানি তুলিয়া ছেলের মুখে পুরিয়া দিল, বাকি সবটাই উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

মালোরা বিবাহে সবচেয়ে বেশী উল্লাস পায়। বিবাহ করিয়া সুখ, দেখিয়া আনন্দ। বিবাহ যে করিতেছে তার তো সুখের পার নাই। পাড়ার আর সব লোকেরাও মনে করে, আজকের দিনটা অতি উত্তম।

যারা সবচেয়ে প্রিয়, যারা সবচেয়ে নিকটের, তাদের বিবাহ করিয়া বউ লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে দেখিলে মালোরা খুব খুশি হয়। যে বিবাহ করিতে পারে না, সে রাত কাটায় নৌকাতে।

এ পাড়ার গুরুদয়াল সেই দলের। বয়স চল্লিশের উপর।

তার সঙ্গে একদিন নৌকাতে কালোবরণের ছোট ভাইয়ের ঝগড়া হইয়া গেল।

গুরুদয়াল বলিয়াছিল সেদিন বাজারের ঘাটে, তিন বিবাহের তিন ছেলের বাপ হইয়া শ্যামসুন্দর বেপারী আবার যদি বিবাহ করে তো পূবের চাঁদ পশ্চিমে উদয় হইবে।

কালোর ভাই প্রতিবাদ করিয়াছিল, রাখিয়া দাও। কাঠের কারবার করিয়া অত টাকা জমাইয়াছে কোন্ দিনের জন্যে। শেষকালে স্ত্রী কাছে না থাকিলে বেপারী কি রাত কাটাইবে তুলার বালিশ বুকে লইয়া? একবার যখন মুখ দিয়া কথা বাহির করিয়াছে, তখন বিবাহ একটা না করিয়া ছাড়াছাড়ি নাই।

'হ। কইছ কথা মিছা না। শেষ-কাটালে ইস্তিরি কাছে না থাকলে মরণ-কালে মুখে একটু জল দিবে কেডায়? পুত ত কুত্তার মুত।'

কালোর ভাই সম্প্রতি একটি পুত্র লাভ করিয়াছে। সে এখন পুত্রগর্বে গর্বিত। পুত্র জাতটার উপর এই একচেটিয়া অপবাদ দিতে দেখিয়া সে চটিয়া উঠিল, 'তুমি যেমুন আঁটকুড়ার রাজা, কথাখানও কইছ সেই রকম।'

পিতৃত্বহীনতার অপবাদ! অসহ্য। গুরুদয়ালের মুখ দিয়া অভিশাপ বাহির হইল, 'অখন থাইক্যা তোরে যেন ঈশ্বরে আঁটকুড়া বানাইয়া রাখে।'

'দূর হ, শ্যাওড়াগাছের কাওয়া, এর লাগি-ঐ তোর চুল পাক্‌ছে, দাড়ি পাক্‌ছে, তবু শোলার মুটুক মাথায় উঠ্‌ল না।'

'নইদার পুতে কি কয়! আমার মাথায় শোলার মুটুক উঠ্‌ল না, তার লাগি কি তোর মাথা নুয়ান লাগ্‌ছে দশজনের বৈঠকে? আমি কি রাইত্ কালে গিয়া তোর ঘরের বেড়া ভাঙছি কোনদিন, কেউ কইতে পারবে?'

'খাড়া, হেই শালা গুরু-দাওয়াল, অখনই বাপের বিয়া মার সাঙা দেখাইয়া দেই।'

এ নৌকা হইতে কালোর ভাই লগির গোড়া গুরুদয়ালের মাথা লক্ষ্য করিয়া ঘুরাইল। ও নৌকা হইতে গুরুদয়ালও একটি লগি তুলিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

নৌকায় অন্যান্য লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেউ বলিল, 'আরে রামনাথ ক্ষেমা দে।' কেউ বলিল, 'ও গুরুদওয়াল, ভাটি দেও। রামনাথ অবুজ হইতে পারে, তুমি ত অবুজ না।'

শেষে কালোর ভাইয়ের কথাই ঠিক হইল। শ্যামসুন্দর বেপারী উত্তর মুলুক হইতে কাঠ আনাইয়া এখানে কারবার করে। সেই মুলুক হইতে একটা লোক রেলগাড়িতে করিয়া বৌ নিয়া তার বাড়িতে আসিল। শ্যামসুন্দরের নিজে যাইতে হইল না। চিঠিপত্রেই সব হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ হইবে সেদিন বৈকালে কয়েকজন বর্ষীয়সী অনন্তর মার বারান্দায় পাড়া-বেড়াইতে আসিল। তারা প্রথমেই তুলিল আজকের বিবাহের কথা।

একজন বলিল, 'নন্দর-মা আছিল বেপারের পয়লা বিয়ার বৌ। আমার বাপের দেশে আছিল তারও বাপের বাড়ি। এক বছরই দুইজনার জন্ম, বিয়াও হইছে একই গাওয়ে। সে পড়্‌ল বড় ঘরে আমি পড়লাম গরীবের ঘরে। তার হাতে উঠল সোনার কাঠি, আমার হাতে ভাতের কাঠি। থাউক সেই কথা কই না, কই ভইন এই কথা, আজ

যার সাথে বিয়া হইতাছে—এযে নন্দর-মার নাতিনের সমান। এরে লইয়া বুড়া করব কি গো? এর যখন কলি ছিট্‌ব, বুড়া তখন ঝইরা পড়ব।'

অন্যমনস্ক অনন্তর মার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অন্য একজন বলিল, 'কাকের মুখে সিন্দুইরা-আম লো মা।'

তৃতীয়ার মনের বনে রঙের ছোঁয়া লাগিয়াছে। প্রবীণা হইলেও মন বুঝি তার মস্‌গুল। পরের বিবাহের বাজনা শুনিলেই নিজের বিবাহের দিনটির কথা মনে পড়ে। মনের খুশি চাপিতে না পারিয়া অনন্তকে লইয়া পড়িল, 'কিরে গোলাম! বিয়া করবি?'

বিবাহের কথা অনন্ত তিন চার দিন ধরিয়া শুনিতেছে। কথাবার্তার ধরন হইতে আসল বস্তু কিছু বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিয়াছে বিবাহ করা একটা খারাপ কিছু নয়। অতি সহজভাবে সে উত্তর দিল, 'করমু।'

'ক দেখি, বিয়া কইরা কি করে?'

প্রশ্নটা একটু জটিল ঠেকিল। কিন্তু খানিক বুদ্ধি চালনা করিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, 'ভাত রান্ধায়।'

'হি হি হি, কইতে পার্‌লি না গোলাম, কইতে পার্‌লি না। বিয়া কইরা লোকে বৌয়ের ঠ্যাং কান্ধে লয়, বুঝলি, হি হি হি।'

উত্তরটা অনন্তর মনঃপূত হইল না মোটেই। ভাবিল উঁহু, এ হইতেই পারে না। কিন্তু সত্যি হইলে ত বিপদ।

'আমারে বিয়া করবি?'

মোটা মোটা ট্যাং দুটির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া অনন্ত বলিল, 'না।'

সন্ধ্যার পর মার সঙ্গে বিবাহ দেখিতে গিয়া অনন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেল। সে যেন বিবাহ দেখিতেছে না, একটা চমৎকার গল্প শুনিতেছে। প্রভেদ শুধু এই, গল্প যে বলিতেছে তাকে দেখা যাইতেছে না, আর তার কথাগুলি শোনা যাইতেছে না। সে যা যা বলিতেছে অনন্ত সে-সব চোখের সামনে দেখিতেছে।

সামনে যে টোপর মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সে বিরাট এক দৈত্য। ছোট মেয়েটাকে তার দলে লোকেরা ধরিয়া আনিয়া তার গুহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটা চাহিয়া দেখে চারিদিকে লোকজন, পালাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। তার চেয়ে এই ভাল। আপাততঃ দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ফুল ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। তার লোকজন অন্যমনস্ক হইলে যেই একটু ফাঁক পাওয়া যাইবে অমনি মেয়েটি এখান হইতে পলাইয়া যাইবে। কোথায় যাইবে? যেখানে তার জন্য খেলার সাথীরা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। পালাইয়া অনন্তদের বাড়িতে গিয়া উঠিলে মন্দ হয় না। মা তাকে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবে। দৈত্যটা তাকে পাড়াময় বৃথাই খুঁজিয়া মরিবে। পাইবে না। অবশেষে একদিন মনের দুঃখে তিতাসের জলে ডুবিয়া মরিবে।

অনন্তর ধ্যান ভাঙিল তখন, যখন বড় বাতাসার হাঁড়ি হাতে একজন একমুঠা বাতাসা তুলিয়া তার হাতের কাছে নিয়া বলিল, 'এই নে, বাতাসা নে। কোন্ দিকে চাইয়া রইলি।'

অনন্ত হাত পাতিয়া বাতাসা লইল। ততক্ষণে বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহ সমাপ্তির মধু-চিহ্ন রূপে নাপিত ভাই 'গুরুবচন' বলিতেছে–

শুন শুন সভাজন শুন দিয়া মন,
শিবের বিবাহ কথা অপূর্ব কথন।
কৈলাস-শিখরে শিব ধ্যানেতে আছিল,
উমার সহিতে বিয়া নারদে ঘটাইল।
শিবেরে দেখিয়া কাঁদে উমা দেবীর মা,
এমন বুড়ারে আমি উমা দিব না।...
শিবেরে পাইয়া উমা হরষিত হইল,
সাঙ্গ হইল শিবের বিয়া হরি হরি বল।

গুরুবচনের মাঝখানটায় শ্যামসুন্দর চমকাইয়া উঠিয়াছিল ঃ এ সব কথা ঠিক তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে না তো! যা হোক, বচনের শেষের দিকটা আশাপ্রদ। উমার মা যাহাই মনে করুক না কেন, উমা নিজে খুশি হইয়াছে।

বিবাহবাড়ি খালি হইবার আগেই অনন্তর মা অনন্তকে হাত ধরিয়া বাড়ির পথে পা দিয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে হাতের বাতাসাগুলিকে অনন্তর অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে লাগিল। মনের দিক দিয়া সে এই একটি দিনের অভিজ্ঞতাতেই অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। কয়েকটা অজানার আগল ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়াছে।

এই বিবাহেও শ্যামসুন্দর অনেক টাকা খরচ করিয়াছে। মালোপাড়ার সবাইকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়াছে।

কিন্তু কালীপূজাতে হয় সব চাইতে বেশী সমারোহ। বিদেশ হইতে কারিগর আসে। পূজার একমাস আগে মূর্তি বানানো হয়।

প্রকাণ্ড বাঁশের কাঠামটা ছিল অনন্তর চোখে পরম বিস্ময়। তৈরী করিতে পাঁচ দিন লাগিল। এক বোঝা খড় আসিলে, পাটের সরু দড়ি দিয়া খড় পেঁচাইয়া তৈরী হইল নির্মস্তক সব মূর্তি। সেগুলি কেবল বাঁশের উপর খাড়া করা; খাড়া কাঠামে পিঠ-লাগানো। মানুষের আকার নিয়াছে হাত পা শরীরে, নাই কেবল মাথা।

একদিন এক নৌকা বোঝাই মাটি তিতাসের ঘাটে লাগিল। ছোট করিয়া কাটা পাটের কুচি সে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া জল ঢালিয়া মালোর ছেলেদের জিম্মায় দেওয়া হইল। তারা নাচিয়া কুদিয়া পাড়াইয়া মাড়াইয়া সে মাটি নরম করিল। এই মাটিতে আকাশছোঁয়া মূর্তি তৈয়ার হইবে। সে মাটির কাজ করা বড় গৌরবের, বিশেষ ছেলেদের পক্ষে।

কারিগরেরা সে মাটি লাগাইয়া দেহ সংগঠন করিল।

মূর্তির গলার উপর যেদিন মাথা পরান হইল সেদিন মনে হইল এত বড় মূর্তি যেন কথা কহিতে চায়।

মূর্তির গায়ে খড়িগোলা লাগাইয়া পালিশ করাতেই অনন্ত ভাবিল কারিগরের কাজ ফুরাইয়াছে, এই মূর্তিরই পূজা হইবে।

'মূর্তি ত বানান হইল, পূজা কোন্ দিন?'

'দূর বলদ, মূর্তির অখনো মেলাই বাকি। সাদা খড়ির উপরে রঙ লাগাইব, নানান রঙের রঙ। যেদিন চক্ষুর্‌দান হইব, সেইদিন কাম সারা। পূজা হইব সেইদিন রাইতে।'

সুবিজ্ঞ সাথীর আশ্বাস অন্তরে নিয়া অনন্ত পরের দিন সেখানে গেল। কিন্তু নিরাশ হইল। পাল খাটাইয়া মন্ডপের সামনাটা ঢাকিয়া দিয়াছে। কারিগরদের যাওয়া-আসার জন্য একটুখানি ফাঁক আছে এক কোণে। সেখানে চোখ ডুবাইয়া দেখা গেল ছোট ছোট অনেক বাটিতে অনেক জাতের রঙ গোলা রহিয়াছে। সেই রঙে তুলি ডুবাইয়া কারিগরেরা দ্রুতবেগে হাত চালাইতেছে, আর প্রতিমা প্রতিক্ষণে নব নব রূপে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে।

কালোর-মা-ই নির্দিষ্ট করিয়া দিল, কাল যে কালীপূজা হইবে, তাতে কালোর-মা, অনন্তর মা আর বৃন্দার-মা সংযমী থাকিবে। সংযমী যারা থকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলী গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে। কম গৌরবের কথা নয়। তারা পুরোহিতের সাহায্যকারিণী। অর্ধেক পূজা তারাই সমাধা করে। পুরোহিত তো কেবল মন্ত্রের জোরে। অনন্তর মার গৌরব বাড়িল। কিন্তু সুবলার বৌয়ের জন্য দুঃখ পাইল। সে এসব কাজে কত পাকা অথচ কালোর মা তাকেই কিছু বলিল না।

সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে না দিয়া কারিগরেরা তুলির শেষ পোঁচ লাগাইয়া যখন পরদা সরাইল, আকাশের আলো ফুরাইয়াছে বলিয়া তখন পালের নীচে গ্যাসের আলোর আয়োজন চলিতেছে।

মা বলিয়া দিয়াছে, অত বড় প্রতিমা, প্রথমে পায়ের দিকে চাহিও, তারপর ধীরে ধীরে চূড়ার দিকে। একবারেই মুখের দিকে চাহিলে ভয় পাইবে। সে-কথা ভুলিয়া গিয়া অনন্ত একবারেই মুখের দিকে চাহিল কিন্তু ভয় পাইল না।

একটু পরেই দেখা গেল নৈবেদ্য হাতে করিয়া মা পূজারিণীর বেশে মণ্ডপে ঢুকিতেছে। শুদ্ধ শান্ত ধবলশ্রী বেশ। নূতন একখানা ধবধবে কাপড় পরিয়াছে মা। কোথায় পাইয়াছে কে জানে! কিন্তু এই বেশে মাকে যা সুন্দর দেখাইতেছে! মণ্ডপের বাহিরে একটা বাঁশবাঁধা। তার ওপাশে কাহাকেও যাইতে দেয় না। কেউ গেলে ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসে। এ অভিজ্ঞতা তার নিজেরও হইয়াছে। আর তারই মা কিনা অত সব পূজাসামগ্রী লইয়া মণ্ডপের ভিতরে একেবারে প্রতিমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে!

এত কাছে যারা যাইতে পারিয়াছে তারা সামান্য নয়। অনন্তর মত এত সামান্য ত নয়ই, তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেবতার কথাবার্তা চলে। মার প্রতি অনন্তর অনির্বচনীয় শ্রদ্ধা জন্মিল। অথচ এই মা'ই তাহাকে কোলে তুলিয়াছে, খাওয়াইছে পরাইয়াছে। একান্ত ইচ্ছা করিতেছে মা একবার তার দিকে দৃষ্টিপাত করুক। তাঁর দৃষ্টির প্রসাদ ঝরিয়া পড়ুক অনন্তর চোখেমুখে। কিন্তু না, বড় দুর্ভাগা সে। মা কোনদিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল। একবার চাহিয়াও দেখিল না তারই ছেলে অনন্ত দীনহীনের মত দূরে দাঁড়াইয়া। মার জন্য অনন্ত খুব গর্ববোধ করিল।

তারপর অনেক্ষণ মাকে আর দেখা গেল না। বোধ হয় বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

বাহিরে অমাবস্যার অন্ধকার। পালের বেড়া দেওয়া তীব্র আলোর রাজ্য হইতে বাহির হইয়া একেবারে অন্ধকারের সমুদ্রে গিয়া পড়িল। কোনমতে পথ চিনিয়া বাড়িতে আসিয়া দেখে দ্বার বন্ধ। মা আসে নাই। এত রাত। এত অন্ধকার। সে এখন যায় কোথায়। আবার সেখানে একা একা ফিরিয়া যাওয়া। একথা যে ভাবাও যায় না। তবু যাইতে হইবে। দুঃসাহসের জয়যাত্রা তাকে এখনই শুরু করিতে হইবে। দুর্জয় সাহসে বুক বাঁধিয়া অনন্ত কোন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া চলিল। গল্পের মধ্যে যাদের কথা সে শুনিয়াছে এখন তাদের সঙ্গে যদি দেখা হইয়া যায়। না তাদের কারো সঙ্গেই পথে দেখা হইল না। তারা বোধ হয় জানে না অনন্ত আঁধারে একা এপথ দিয়া যাইতেছে। জানিলে আসিত। অনেক লোক লইয়া তাদের কারবার। অনন্তর মত এত ছোট মানুষ কাউকে ভুলিয়া যাওয়া তাদের অসম্ভব নয়। তার আত্মসম্মানে আঘাত পড়িল। সে তাদের কথা অত জানে, অথচ অনন্তর কথা তারা জানে না।

এই বাড়িতেই পূজার সবকিছু দ্রব্য রাখা হইয়াছে। তার মা এই বাড়িতেই কোনো একটা ঘরে আছে হয়ত। অনেকগুলি পূজার উপকরণ সামনে লইয়া প্রদীপের পাশে বসিয়া আছে প্রতিমার মত। কাছে দেখিতে পাইয়া অনন্তকে তাড়াইয়া দিবে না ত? পূজার জন্য মা তার কাপড়খানা পরিষ্কার করিয়া দিলেও মার মত অত পরিষ্কার নয়। আর তাকে অত সুন্দর কোনকালেই দেখাইবে না। তবে ত এখন মার কাছে যাওয়া ঠিক হইবে না। কিন্তু আজ অন্ধকারে যে দুরন্ত সাহসের কাজ সে করিয়া ফেলিয়াছে, মা যদি তাহা জানে তবে নিশ্চয়ই তাকে কাছে ডাকিয়া নিয়া কোলে ঠিক না বসাইলেও পাশে বসাইয়া বলিবে, তুমি অমন ভাবে আঁধারে একা পথ চলিও না। সে বলিবে, তাতে কি মা, আমার তেমন ভয় করে নাই ত। মা বলিবে, তোমার ভয় না করিতে পারে কিন্তু আমার ভয় করে। তুমি আঁধারে হারাইয়া গেলে তোমার মত এমন আর একটি অনন্তকে আমি কোন কালে পাইব না। মা তাহা হইলে সত্য কথাই তো বলিবে। কোথায় পাইবে আমার মত আরেকটিকে। তেমন কাহাকেও দেখি না তা। না, মাকে কথাটা বলিতেই হইবে।

একটা ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। দরজা খোলা। ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তার আলোয় উঠানটাও কিঞ্চিৎ আলোকিত। এই আলোতে একটি ছেলেকে সন্দিগ্ধ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া কারো মনে সন্দেহ ঢুকিয়া থাকিবে, ছেলেটা পূজার কোনো দ্রব্য চুরি করিবার তালে আছে। সে খুব জোরে এক ধমক দিল। অনন্ত মাকে খুঁজিতেছে একথা বলিবার অবসর পাইল না। লোকটা আগাইয়া আসিয়া সরিবার পথ দেখাইলে অনন্ত নীরবে পূজামণ্ডপে চলিয়া আসিল।

তাকে অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কে একজন দয়াপরবশ হইয়া তার দিকে চাহিল।

'এই, তুই কার ঘরের?'

অনন্ত এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিল না।

'ও পুলা, তোর বাপ কেডা?'

বাপ নামক পদার্থটা যে কি, অনন্ত তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। এই পাড়ার সমবয়সী অনেক ছেলেরই বাপ নামক এক একটি লোক আছে। বাজারের ঘাট হইতে

ছোলাভাজা মটরভাজা বিস্কুট কমলা কিনিয়া দেয়। সকালে রাতের জাল বাহিয়া আসিয়া কারে বা কোলে নেয়, কারে বা চুমু খায়, কারে বা মিছামিছি কাঁদায়। দুপুরে নিজ হাতে তেল মাখাইয়া তিতাসের ঘাটে নিয়া স্নান করায়। পাতে বসাইয়া খাওয়ায়। মাছের ডিমগুলি বাছিয়া বাছিয়া মুখে তুলিয়া দেয়। এসব অনন্তর একদিনের দেখা অভিজ্ঞতা নয়। অনেক দিন দেখিয়া, মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, বাপেরা এইসব করে। আরো দেখিয়াছে মালো-পাড়ার ছেলেদের গায়ে যে লাল-নীল জামা, এসবও ঐ বাপেরাই কিনিয়া দেয়। যাদের বাপ আছে তারা শীতে কষ্ট পায় না। অনন্ত শীতে কষ্ট পায় তার বাপ নাই বলিয়া। এ ঠিক মার কাজ নয়। কিন্তু তারও বাপ থাকিতে পারে বা কেউ একজন ছিল এ প্রশ্ন কোনদিন তার মনে জাগে নাই। মাও কোনদিন বলিয়া দেয় নাই। অথচ মা কত কথা বলিয়া দেয়। বড় অদ্ভুত প্রশ্ন। আগে কেউ এ প্রশ্ন করে নাই। অনন্ত এর কোনো জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

'তুই কার লগে আইছস্?'

এইবারে প্রশ্নটা সোজা। একটু আগেই সে আঁধার জয় করিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে তার কেউ ছিল না। জানাইল, একলা আসিয়াছে।

'এই বলদটা কার ঘরের রে বিপিন?'

বিপিন নামক যুবকটি প্রশ্নকর্তার কৌতূহল এই বলিয়া নিবৃত্ত করিল, তুমি থাক পরের গ্রামে, নিজের গ্রামে কে গেল কে আসিল তুমি কি করিয়া জানিবে। এর মা বিধবা। গাঁয়ে নূতন আসিয়াছে। কালোবরণ বেপারীর বাড়ির কাছে বসতি নিয়াছে। রাত পোয়াইলে দেখিয়া যাইও ছোট ঘরখানাতে থাকে খায়।

বিপিন একটা পাতলা কাঁথা গায়ে জড়াইয়া উত্তর দিতেছিল। লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়া বলিল, 'ছোট ঘরে বসত করে বড় গুণবতী। হি হি হি।'

অনন্ত কি ভাবিয়া প্রতিবাদ করিল, না না।

কিন্তু তাকে শীতে কাঁপিতে দেখিয়া একজন নিজের দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

মণ্ডপের সামনে টিনের চাল বাঁশের খুঁটি দিয়া একখানা ঘরের মত খাড়া করিয়া সামনের দিক খোলা রাখিয়া আর তিনদিক চটে মুড়িয়া দিয়াছে। পূজা হইবে অনেক রাতে। ছেলে বুড়া অনেকেই কাঁথা নিয়া আসিয়া সেই ঘরের চটের ঢালা বিছানার উপর এখনই শুইয়া পড়িয়াছে। সেই ঘর আর মণ্ডপের মাঝামাঝি স্থানে মোটা মোটা আমের কাঠ দিয়া সারা রাতের মত আগুনের ধুনি করিয়াছে। ইহাকে ঘিরিয়া দশ বার জনে গায়ে গা ঠেকাইয়া বসিয়াছে। হাঁড়ি ভরা তামাক টিকা কাছেই আছে। পাঁচ ছটা হুকা জ্বলিতেছে নিবেতেছে। আগুনের তাপে আর তামাকের ধকে তারা একসঙ্গে উত্তাপিত হইতেছে।

এদের সকলেরই দেহে বয়সের ছাপ। কান পর্যন্ত ঢাকিয়া মাথা বাঁধা। কারো কারো গায়ে সুতি-কম্বল, অনেকের গায়ে কাঁথা। তার উপর মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। এই তীব্র আলোকের উজ্জ্বলতায় তাহাদিগকে অপার্থিব দেখাইলে তাহা অনন্তর চোখের দোষ নয়। তাদেরই একজনের আহ্বানে অনন্ত ধীরে ধীরে দ্বিধা-সঙ্কুচিত চিত্তে তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

'শীত করে?'

অনন্ত ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, 'করে।'

'পিরাণ নাই?'

মাথা নাড়িয়া জানাইল, নাই।

'ইখানে বইয়া পড়ু। শরতকাকা, একটু ঘুইরা বও। জাগা দেও। কাঁপ্‌তাছে।'

অনন্ত ঠিক তাদেরই মত করিয়া বসিল। তাদেরই মত করিয়া হাত বাড়াইয়া আগুনের উষ্ণতা ছিনাইয়া আনিয়া গালে মুখে মাখাইতে লাগিল।

সুবলার-বৌ পূজার আয়োজন দেখিতে আসিয়াছিল। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া ডাকিল, 'অ দিদি, অ অনন্তর মা, দেইখ্যা যাও তোমার অনন্তর কাণ্ড। বুড়ার দলে মিশ্যা তোমার পুলা বুড়া হইয়া গেছে।'

পূজার নৈবেদ্যগুলি সাজাইবার পর এই এখন তার ছেলের কথা মনে পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিল হাতে যখন কাজ নাই তখন ছেলেটাকে একবার তালাস করিয়া আসি। এমন সময় সুবলার বৌর ডাক। দেখিয়া তারও হাসি পাইল। বড় করুণাও জাগিল ছেলের উপর। ছেলের কেবল আধখানা পিঠ তখন দেখা যাইতেছে। সাতপরতা মেঘে যেমন চাঁদ ঢাকা পড়ে, অনন্তর দেহখানাও বুড়াদের জবর-জঙ্গিমার আড়ালে তেমনিভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। মা কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। একসময়ে দেখা গেল একখানা ছোট হাত দুইপাশের বুড়া দুইজনের কাঁথা-কাপড় সরাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কারণ, এই সময় ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করিয়া বুড়ারা আগুনের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। যাই হোক, চকিতের মধ্যেই মেঘের রাশি অপসারিত করিয়া ছোট মুখখানা জাগিয়া উঠিল। মা এদিকে আছে তারই জন্য বোধ হয় চাঁদ এদিকে ফিরিয়া দেখা দিল।

সে-চাঁদ গৌণে আবার মেঘে-ঢাকা পড়িল। ভাল মানুষের দলেই গিয়া মিশিয়াছে, এই কথা বলিয়া মাও অগৌণে কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

অনন্তর পূজা দেখা হইল না। ভিতরে যারা ঘুমাইয়া ছিল, ঘুম পাইলে তাদের দলে ভিড়িয়া অনন্তও এক সময়ে তাদের গা ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িল। এক সময়ে কাঁসি-ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা হইয়া গিয়াছে। তারা উঠিয়া পূজা দেখিল, প্রণাম করিল, প্রসাদ পাইল। যে-সব ছেলে বাপ ভাই জেঠা খুড়ার সঙ্গে আসিয়াছিল, তারা তাদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। অনন্ত কারো সঙ্গে আসে নাই। তার ঘুমও কেউ ভাঙাইল না।

ঘুম যখন ভাঙিল তখন অনেক বেলা। এঘরে একজনও শুইয়া নাই। কিন্তু যত ভিন্‌-পাড়ার ভিন্‌-গাঁয়ের লোক বিহানের বাজার করিতে আসিয়াছিল, তারা এখন প্রতিমার নিকট ভিড় জমাইয়াছে।

ঐ-বাড়িতে মা ছিল। যদি সেখানে গিয়া মাকে পাওয়া যায়। এই ভাবিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে-পথেই রওয়ানা হইল।

মা সেখানেই আছে। আর সেখানে জমিয়াছে একপাল তারই মত বয়সের ছেলেমেয়ে। বড় একটা পিতলের গামলাতে সবগুলি নৈবেদ্যের প্রসাদ ঢালিয়া তার মা নিজ হাতে মাখিতেছে। চিনি বাতাসা সন্দেশ কলা আর আলোচাল। আরো নানা জিনিস। সব একসঙ্গে মাখিয়া মা প্রসাদ বানাইতেছে; যত ছেলের দল চুপ করিয়া

চাহিয়া আছে সে প্রসাদের দিকে আর অনন্তর মার মুখের দিকে, প্রসাদ প্রস্তুতরত হাতখানার দিকে।

মার একেবারে সামনে গিয়া পড়া যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। সেও ছেলের দলে মিশিয়া তাদেরই একজন হইয়া যাকে দেখিতে লাগিল।

প্রসাদ মাখা শেষ হইলে অনন্তর মা মাধুকরির মত বড় এক এক দলা করিয়া এক এক জনের হাতে প্রসাদ দিতে লাগিল। অন্য ছেলেদের মত অনন্তও একবার ভিড়ের ভিতরে হাত বাড়াইল। সেও তেমনি বড় একদলা প্রসাদ পাইল।

অনন্ত স্পষ্ট দেখিয়াছে, দিবার সময় মা তার দিকে চাহিয়াছে আর একটুখানি হাসিয়াছে। রাতজাগা চাঁদের স্বচ্ছ পাণ্ডুর মমতামাখা হাসি শুধু একটুখানি হাসিয়াছে।

তারপর থেকে চারদিন এখানে অপরূপ কাণ্ড হইল। এক নাগাড়ে আট পালা যাত্রা আর কবিগান হইল।

চারদিন পর্যন্ত মালোরা রাত্রে যাত্রা দিনে কবি শুনিল। চার দিনের জন্য নৌকাগুলি ঘাটে বাঁধা পড়িল। জালগুলি গাবে ভিজিয়া রোদে শুকাইল। চারদিন তাদের না হইল আহার না হইল নিদ্রা।

কয়দিনের ধুমধামের পর মালোপাড়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। অত্যধিক আনন্দের অবসানে অনিবার্যরূপে যে অবসাদ আসিয়া পড়ে, তারই কোলে ঝিমাইয়া থাকিল মালোপাড়ার ঘেঁষাঘেঁষি ছোটবড় ঘরগুলি।

এর ব্যতিক্রম কেবল রামকেশবের ঘর। যার ঘরে নিত্য নিরানন্দ আনন্দাবসানের দুঃখের আঁধার সে-ঘরে দুলিয়া উঠে না। ঘনাইয়া আসে না শ্রান্তির অবসন্ন কালো মেঘ।

গরীব বলিয়া মাতব্বরেরা বলিয়াছিল, 'রামকেশব, তোমার পাগলার চাঁদা বাদ দিলাম। তোমার চাঁদা দিয়া দেও।'

তারা লণ্ঠন লইয়া উঠানে বসিয়াছে। দিবে না বলা চলিবে না। তাদের হাতে হুকা দিয়া রামকেশব ডাক দিল, 'মঙ্গলারে, অ মঙ্গলা, তুই না জাল কিন্‌তে চাইছিলি, টাকা থাকে ত লইয়া আয়।'

ঝড়ের ঢেউ বুকে করিয়া জালটা বাহির করিলে যার হাতে চাঁদার কাগজ ছিল সে বলিল, 'জালটা অখন বেইচ্চ না কিশোরের বাপ। তোমার চাঁদা ছাড়াও পূজা হইব, কিন্তু জাল বেচলে আবার জাল করতে দেরি লাগব। আমি মাত্‌ব্বররারে সমঝামু।'

এ জন্য রামকেশবের মনে একটা সঙ্কোচ ছিল। চাঁদা দিবে না অথচ পূজার প্রসাদ খাইবে। পরের চাঁদায় গান হইতেছে। সে গান যে বসিয়া বসিয়া শুনিবে, লোকে তার দিকে চাহিয়া কি মনে করিবে।

পূজার একরাত ও গানের চারদিন চাররাত সে পাগলকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিল। এবং নিজে না দেখিল পূজা, না পাইল প্রসাদ, না শুনিল গান। চাররাত ধরিয়া খালের মুখে একটানা জাল পাতিয়া রাখিল। তাহাতে সে প্রচুর মাছ পাইল এবং চড়া দামে বেচিয়া কিছু টাকা পাইল। কিন্তু গরীবের হাতে টাকা পড়িলে উড়িবার জন্য ছটফট করে। পরিবারকে জানাইল, পাগলের মঙ্গলের জন্য 'আলস্তির' দিনে সে কয়েকজন লোককে খাওয়াইবে।

বুড়ি বলিল, 'ঐ দিন ত ঘরে ঘরে খাওয়ার আরব্ব, তোমার ঘরে কেডায় খাইতে আইব কও।'

'কথাটা ঠিক।'

কালীপূজার সময় গান বাজনায় আমোদ আহলাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে সত্য, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে। এই দিন পৌষ মাসের শেষ। পাঁচ ছদিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে গুড়ি-কোটার ধুম পড়ে। মুড়ি ভাজিয়া ছাতু কুটিবার তোড়জোড় লাগে। চাউলের গুড়ি রোদে শুকাইয়া কোলাতে টালিয়া পিঠার জন্য তৈরী করিয়া রাখে। পরবের আগের দিন সারারাত জাগিয়া মেয়েরা পিঠা বানায়। পিঠা রকমে যেমন বিচিত্র, সংখ্যায়ও তেমনি প্রচুর। পরের দিন সকাল হইতে লাগে খাওয়ার ধুম। নারী পুরুষ ছেলে বুড়া অতি প্রত্যুষে জাগিয়া তিতাসের ঘাটে গিয়া স্নান করে।

যারা জালে যায় তারাও নৌকায় উঠিবার আগে গামছা পরিয়া ডুব দেয়। ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকায় মাছ ধরার কাজে সুবিধা হয় না। দুত্তোর, পরবের দিনে কিসের মাছ ধরা, এই বলিয়া দুই চার খেই দিয়াই জাল খুলিয়া ফেলে। ঘরে থাকিয়া নারীরা, আর ঘাটে যাইয়া ছেলেপিলেরা নদীর উপর চোখ মেলিয়া রাখে, কার নৌকা কত সকালে আসিয়া ভিড়ে। যারা যত সকালে আসিবে তারা তত সকালে খাইবে। এবং সকলে যত সকালে আসিয়া খাওয়া শেষ করিবে, গ্রামের নগর-কীর্তনও তত সকালে আরম্ভ হইবে।

সারাটা গ্রাম ঘুরিয়া কীর্তন করার জন্য সকলের আগে বাহির হয় মালোপাড়ার দল। সাহাপাড়া আর যোগীপাড়া হইতেও দেখাদেখি দল বাহির হয়। কিন্তু মালোদের মত কীর্তনে অত জৌলুস হয় না। তারা কীর্তন করে ঝিমাইয়া আর মালোরা করে নাচিয়া কুঁদিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া। তাই কদমা বাতাসাও ধরিতে পারে তারাই বেশী। সে যে কি আনন্দের! সে সময় পুরুষেরা কীর্তন করিয়া বাড়ি বাড়ি লুট ধরিতে যায় আর মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে।

ঘরে ঘরে এত প্রাচুর্যের দিনে রামকেশবের বাড়িতে খাইতে আসিবে কে।

তবু তার সাধ দুর্বার হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল রাধামাধবের বাড়িতে একটা 'সিধা' দিবে আর খাইতে নিমন্ত্রণ করিবে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ জামাইকে, বাড়ির পাশের মঙ্গলা আর তার ছেলে মোহনকে আর সুবলার শ্বশুরবাড়ির সব কয়জনকে। আরো একজনের কথা তার মনে জাগে, সে গ্রামের নূতন বাসিন্দা, অনন্তর মা। তার ছেলেটাকে বড় আদর করিতে ইচ্ছা করে। সে কি আসিবে। কালোর-মা হয়ত এতক্ষণে তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছে। সে-বাড়িতে খাইবেও অনেক ভাল।

নিমন্ত্রণ পাইয়া সুবলার শাশুড়ি মায়ে-ঝিয়ে অনেক চাউলের গুড়ি কুটিয়া রামকেশবের বাড়ি দিয়া আসিল। নিজেদের জন্য আগে যত গুড়ি কুটিয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাঠাইয়া দিল। এবারের পরব তাদের বাড়িতে না হইয়া ঐ বাড়িতেই হোক।

রামকেশব যে সাধ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করারও সাহস পায় নাই, সে সাধ পূর্ণ করিল সুবলার বৌ। গুড়ি গোলার প্রাথমিক কাজ মায়ে-ঝিয়ে শেষ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে সে গিয়া অনন্তর মাকে ধরিয়া বসিল, 'পিঠা বানাইতে হইবে দিদি, চল।'

'কই?'

'ঐ বাড়িত্ যে বাড়িত্ একটা পাগলা থাকে।'

অনন্তর মার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, 'না না ভইন, অচিনা মানুষ তারা। কোনদিন তারাও কিছু কয় নাই, আমিও যাই নাই। আমি দিদি যাইতে পারি না।'

'দিদি, তুমি মনে কইরা দেখ, আমিও অচিনা আছুলাম, চিনা হইলাম। মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে। তুমি দিদি, না কইর না। বুড়া মানুষ। কোন্ দিন মইরা যায়। তার মনে সাধ হইছে, লোকসেবা করাইব। এই পরবের দিনে লোক পাইব কই? এক লোক পাওয়া গেছে মন্দিরের রাধামাধবেরে, আর লোক পাওয়া গেছে আমার বাপেরে আর বড় মাত্‌বরেরে। আরেক লোক তোমার অনন্ত। তুমি-আমি কেবল পিঠা বানানোর লাগি, বুঝ্‌ছ নি।'

অনন্তর মাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়া সে অনন্তকে লইয়া রামকেশবের রান্নাঘরে ঢুকিল এবং প্রথম খোলার প্রথম পিঠাখানা রাধামাধবের জন্য তুলিয়া রাখিয়া পরের পিঠাখানা অনন্তর হাতে দিল, তাকে চৌকিতে বসাইয়া, খোলা হইতে পিঠা তুলিবার ফাঁকে ফাঁকে তার খাওয়া দেখিতে লাগিল।

অনন্তর মা ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া একটু পরেই দীপ নিভাইল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়া ঢুকিল। অনন্ত তখন সুব্‌লার বৌর ঠিক পাশটিতে বসিয়া মনোরম ভঙ্গিতে পিঠা খাইতেছে।

স্বামীপুত্রকে নদীতে পাঠাইয়া একটু পরে মঙ্গলার বৌও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। তারপর তিনজনে মিলিয়া খুব জোড়ের সহিত পিঠা বানাইতে লাগিল। এক বুড়ি কিশোরের মা আরেক বুড়ি সুব্‌লার শাশুড়ী তাদের সঙ্গে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কাজে ভুল করিতে লাগিল। রাত আরেকটু অধিক হইতেই দুই বুড়িই ঢুলিতেছে দেখিয়া তিনজনেই তাহাদিগকে ছুটি দিলে, তারা মাঝঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অনন্তও হইল তাদের শয্যার সঙ্গী। তখন তিনজনেই রহিল সমান সমান। তারা এমনভাবে কাজ করিয়া চলিল যে এ রাতের জন্য তারাই এ বাড়ির মালিক।

পাগলটার রাতে ঘুম নাই। আজ রাতে আবার পাগলামি বাড়িয়াছে। একটু আগে এ ঘরের মহিলাদিগকে অকারণে দেখিয়া গিয়াছে। তারপর বারান্দায় বসিয়া গান করিয়াছে, প্রলাপ বকিয়াছে এবং দা দিয়া মাটি কোপাইয়াছে। এত করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া আবার মহিলাদের ঘরের দিকে আসিতেছে দেখিয়া মঙ্গলার বৌ দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বন্ধ দুয়ার দেখিয়া সে আর দাঁড়াইল না, বারান্দায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলার বৌয়ের সহসা নিশি রাতে গল্প শুনিবার সাধ হইল। অনন্তর মাকে ধরিয়া বসিল, 'একখান পরস্তাব কও ভইন। নতুন দেশের নতুন মানুষ তুমি। অনেক পরস্তাব তুমি শুনাইতে পারবা।'

অনন্তর মা একটু ভাবিয়া দেখিল : তার নিজের জীবনে এত বেশী 'পরস্তাব' জমিয়া আছে, আর সে 'পরস্তাব' এত বিচিত্র যে, ইহা ফেলিয়া কানে-শোনা 'পরস্তাব' না বাঁধিবে দানা, না লাগিবে ভাল, না পারিবে দরদ দিয়া বলিতে। তার নিজের জীবনের বিরাট কাহিনীর নিকট আর যত সব কাহিনী নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু এ কাহিনী তো এখানে

বলিবার নয়। শুধু এখানে কেন, কোনোখানেই বলিবার নয়। এ কাহিনী নিজে যেমন কূলকিনারাহীন, এর ভবিষ্যৎও তেমনি কূলকিনারাহীন। এ কাহিনী সহজে কাউকে খুলিয়া বলা যায় না, কিন্তু গোপন করিয়া সহিয়া থাকিতে অসীম ধৈর্য, কঠোর আত্মসংযম লাগে। তাকে না বলিয়া মনের গোপনে লুকাইয়া রাখার জন্য মনের উপর অনেক বল প্রয়োগ করিতে হয়। তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে, যদি কোন দিন চূড়ান্ত সময় আসে সেদিন বলিবে, তার আগে বুক যতই মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া যাক সেখানেই উহাকে সযত্নে সংগোপনে লুকাইয়া রাখিবে।

তার অন্যমনস্কতাকে নির্মমভাবে আঘাত দিল মঙ্গলার বৌ, 'কি গ বিন্দাবনের নারী, কোন্ কালোচোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশির বাড়ি। পরস্তাব শুনাইবা ত শুনাও ভইন। ভাল লাগে না। না জানলে না কর, জানলে কও।'

কড়ার টগবগে তেলে হাতা দিয়া গোলা ছাড়িতে ছাড়িতে অনন্তর মা বলিল, 'আমি একখান পরস্তাব জানি, এক মাইয়ারে দেইখ্যা এক পুরুষ কেমুন কইরা পাগল হইল, কয় এরে বিয়া করুম।'

'বিয়া করল?'

একটু ভাবিয়া অনন্তর মা বলিল, 'করল।'

'তারপর কি হইল?'

'কপাল আমার। এই বুঝি তোমার পরস্তাব। কেবল একজন পুরুষ কি কইলাম, সংসারের সব পুরুষইত মাইয়া দেইখ্যা পাগল হয়, বিয়া না কইরা ছাড়ে না। কিন্তু বিয়া করার পরে কি হয় সেই খানইত আসল কথা। তুমি ভইন আসল কথাই শুনাইলা না, চাইপ্যা গেলা।'

'জানি না দিদি, জানলে কইতাম।'

এইবার কথা কহিল সুবলার বৌ। অনন্তর মার কথায় সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল। এ মেয়ে একথা জানে কি করিয়া। কথার পিঠে সে কথা দিল, 'আমি জানি ঐ মাইয়া-পাগল কি কইরা সত্যের পাগল হইয়া গেল, আর তার বন্ধু কি কইরা মারা গেল। কিস্তুক কমুনা।'

সুবলার বউ একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল—

পাগল আর বন্ধু যখন ছোট ছিল একজনের মা তখন তাদের দুজনকেই খুব ভালবাসিত। একজন তখন ন'দশ বছরের মেয়ে। মাঘমণ্ডলের দিনে দুই বন্ধু তার চৌয়ারি বানাইয়া দিয়াছিল। সেইদিন মা ঠিক করিয়া রাখিল দুইজনের যে-কোন জনকে মেয়ে সঁপিয়া দিবে। শেষে স্থির করিল বড়জনই বেশী ভাল, তাকেই মেয়ে দিবে। সে যেদিন পাগল হইয়া ফিরিয়া আসিল সেদিন মত গেল বদলাইয়া। মেয়ের বাপ তখন পাগলের বাপকে খালি এড়াইয়া চলিতে চায়। পাগলের বাপ ডাকিয়া বলে, তুমি আমাকে এড়াইয়া চল কেন। বাজারে যাইতে আমার উঠান দিয়া না গিয়া রামগতির উঠান দিয়া ঘুরিয়া যাও কেন। আমি কি জানি না, আমার কাপাল ভাঙিয়াছে। পাগলের নিকট বিয়া দিতে আমি কেন তোমাকে বলিব। তারপর একদিন ঢোলঢাক বাজাইয়া মেয়ের বিয়া হইয়া গেল। কার সঙ্গে হইল জানি, কিন্তু বলিব না।

—আরও জানি। বিয়ার পর বন্ধু গেল জিয়লের ক্ষেপ দিতে। বড় নদীতে একদিন রাত্রিকালে তুফান উঠিল। নৌকা সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়াছে, মানাইতে পারে না। মালিকেরা চতুর মানুষ। তারা নিজে কিছু না করিয়া, যাকে জন খাটাইতে নিয়াছে বিপদ আপদের কাজগুলি সব তাকে দিয়াই করায়। নৌকা তীরে ধাক্কা খাইয়া চৌচির হইবে। তার আগেই তো নৌকার পাঁচজনে তীরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাত দিয়া, কাঁধ লাগাইয়া, পিঠ ঠেকাইয়া নৌকার গতিরোধ করিবে। এই ঠিক করিয়া সকলে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কার্যকালে শুধু এক ঐ বন্ধু নামিল, আর কেউ নামিল না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল। শেষে ঐ বন্ধু নৌকার ধাক্কায় চিত হইয়া পড়িয়া গেল। একা সে। না পড়িয়া উপায় আছে। নৌকা তার বুকখানা মথিয়া পিণ্ড করিয়া দিল। আর সে-নৌকা কার নৌকা সবই জানি। কিন্তু বলিব না।

'জান যদি, তবে কইবা না কেনে?'

'চোখে জল আইয়া পড়ে দিদি। কইতে পারি না।'

'একজনের কথা যে কইলা, সে মাইয়া কে?'

'তার নাম বাসন্তী। সে অখন নাই। মারা গেছে।'

আবহাওয়া বড় করুণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। মঙ্গলার বৌ এই রকম আবহাওয়া সহিতে পারে না। হালকা করিবার জন্য কথা খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা বলিয়া উঠিল—

'আমিও জানি।'

মঙ্গলার বৌ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে কথাটা বলিয়া খোলার একখানা পিঠার প্রতি এমন মনোযোগ দিল যেন দুই জনে পায়ে ধরিয়া সাধিলেও যা জানে তা খুলিয়া বলিবে না।

মঙ্গলার বৌর রসাল গল্পটা শুরু না হইতেই আবহাওয়া আবার থমথমে হইয়া পড়িল। আজ দুইটি নারীর মনের কোথায় যে কাঁটা বিঁধিতেছে কে বলিবে। পাগল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তাদের মন আরো বেশী দোলা খাইতে লাগিল। হয়ত সে ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে। সে যে ভবিতে পারিতেছে ইহা কল্পনা করিয়া তাদের বুকে কোন্ সুদূরের ঢেউ আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

অনন্তর মার মন উদ্দাম হইয়া উঠিল, 'কও না গো ভইন, তোমার কথাখান বিস্তারিৎ কইরা, শুনি, পরাণ সার্থক করি।' কিন্তু মুখের শ্লেষে বুকের বেদনা ঢাকা পড়ে না। যে-কাহিনীর বিয়োগান্তিকা নায়িকা সে নিজে, সখীর সে কাহিনী আগাগোড়া জানা আছে কিন্তু যাকে নিয়া এত হইল সেই যে শ্রোতা, একথা সে জানে না, এর চাইতে আর বিচিত্র কি হইতে পারে।

অনন্তর মার নির্বন্ধাতিশয্যে সুবলার বৌ প্রবাস-খণ্ডে কিশোরের পত্নীলাভ এবং পত্নী-অভাবে পাগল হওয়ার বিবরণ বর্ণনা করিয়া কহিল, 'কন্যা, এই বর্তের নি এই কথা।'

অনন্তর মা অশ্রু গোপন করিয়া বলিল, 'হ।'

'তবে ঘটে দেও বেলপাতা।'

তার পরের যেটুকু অনন্তর মার জানা ছিল না, সে কাহিনী আরও করুণ। কিশোরকে বঞ্চিত করিয়া বাসন্তীর কি ভাবে বিবাহ হইল এবং সুবল কি করিয়া মারা গেল।

সুবলার বৌ ঘটনা কয়টি আর একবার বলিল—

তারপর পাগল তো বাড়ি আসিল। বাপ মনে করিয়াছিল আনিবে টাকা, সেই টাকায় বাসন্তীরে আনিবে ঘরে। কিন্তু তার বাড়াভাতে পড়িল ছাই। সে আসিল পাগল হইয়া।

বাসন্তীর বাপ দীননাথ। সে, রামকেশবকে এড়াইয়া চলে। আগে দুই জনে ভাব ছিল। পরে বাসন্তীকে কিশোরের সঙ্গে বিবাহ দিবার কানাঘুষা যখন চলিতে লাগিল, ভাবটা তখন খুবই বাড়িয়াছিল। এখন দীননাথ এ বাড়ির উঠানও মাড়ায় না। ঘাটে দেখা হইলে পাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়ে সে পাশ কাটাইয়া যায়।

একদিন কিন্তু কিছুতেই পাশ কাটাইতে পারিল না। রামকেশব তাহাকে হাত ধরিয়া শুনাইয়া দিল, 'আসমানে চান্দ উঠলে পর লোকে জানে। আমার কিশোর পাগল হইছে বেবাক লোকেই জানে। আমি কি আর ঘুর-চাপ দিয়া রাখছি?'

দীননাথ চুপ করিয়া থাকে।

'আমি কি মাথার কিরা দিয়া কই যে, বাসন্তীরে আমার পাগলের সাথে বিয়া দেও।'

'কি যে তুমি কও দাদা। সেই কথা তুমি কি কইতে পার। তোমাকে আমরা চিনি না?'

'তবে এমন এড়াইয়া বেড়াইয়া চল কেনে ভাই।'

'এড়াইয়া চলি, তোমার কষ্ট দেইখ্যা বুক কান্দে, তাই।'

'আমার কষ্ট নিয়া আমি আছি। তার জন্যে তোমরা কেনে কান্দ?'

দীননাথের বুক বেদনায় টনটন করিয়া উঠে! একমাত্র ছেলে। পাগল হইয়া গিয়াছে। ঘর দুয়ার ভাঙে। জিনিস-পত্র লণ্ডভণ্ড করে। গলা ফাটাইয়া কাঁদে। বুড়া তাকে নিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছে। একে শেষ বয়স। তার উপর এই দাগা। এই কয়মাসে তাকে দ্বিগুণ বুড়া বানাইয়াছে। আর বুড়ি। তার দিকে আর চাওয়াই যায় না। অনেক কান্না জমাট বাঁধিয়া তাকে বোবা বানাইয়াছে। তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা ইহাদিগকে এড়াইয়া চলা অনেক সহজ।

'বাসন্তীর বিয়া কোন্‌খানে ঠিক কর্‌লা?'

দীননাথ অপরাধীর মত বলে, 'আমি ত চুপ কইরা আছিলাম। গোলমাল লাগাইয়াছে আমার পরিবার। কয় সুবল খুব ভাল পাত্র। তারেই ডাক দিয়া বাসন্তীরে পার কর।'

একদিন সুবলের সঙ্গে বাসন্তীর বিবাহ হইয়া গেল। সেই এক রাত। আকাশে চাঁদ আছে তারা আছে। দীননাথের উঠানে কলাগাছের তলায় বাসন্তীকে সুবল হাতে হাত দিয়া বউ করিতেছে। মেয়েরা গীত গাহিতেছে হুলুধ্বনি দিতেছে। জোরে জোরে বাজনা বাজিতেছে। এত জোরে বাজিতেছে যেন রামকেশবের কানের পর্দা ছিড়িয়া যাইবে। একটা টিমটিমে আলোর সামনে রামকেশব তামাক টানিতেছে। হুঁকার শব্দে বাজনার শব্দ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। তার পাশে বুড়ি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। গভীর

ভাবে কিছু বুঝিবার মত বোধশক্তি তার আর অবশিষ্ট নাই। আর বোধশক্তি নাই পাগলটার। সে অর্থহীন ভাবে একটা পুরোনো জাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে।

অনেক রাত অবধি সে বাজনা চলিল। তারপর এক সময় উহাও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন বুঝি বিবাহবাড়ির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুড়াবুড়ির চোখে সে রাতে আর ঘুম আসিল না।

তারপর একটি দুইটি করিয়া পাঁচটি বছর গত হইল। এই পাঁচ বছরে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। কিন্তু কে মনে রাখিয়াছে।

তবে একটি ঘটনা মালাপাড়ার অনেকেই মনে রাখিয়াছে। সে হইতেছে সুবলের মৃত্যু। বড় মর্মান্তিকভাবে মরিয়াছে সুবল। কালোবরণের বড় নৌকায় করিয়া জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়াছিল। সুবল বলিয়াছিল আমাকে ভাগীদার হিসাবে নেও। তারা বলিয়াছিল নৌকা আমাদের পুঁজি আমাদের। ভাগীদার হিসাবে নিব কেন? মাসিক বেতনে নিব। শুনিয়া সুবলের বৌ বলিয়াছিল, তবে গিয়া কাম নাই। কিন্তু বিবাহ করিয়াছে, লোকজন খাওয়াইয়াছে। হাতের টাকাকড়ি খরচ হইয়া গিয়াছে। সামনে দুরন্ত আষাঢ় মাস। এই দুঃসময়ে সে নিজে কি খাইবে বৌকে কি খাওয়াইবে! কাজেই বেতনধারী হইয়া না গিয়াই বা সে কি করে!

এখন, লোক যদি হয় বেতনধারী, পুঁজিদার হয় তার মালিক, তাকে সেই মালিক তখন চাকরের মত জ্ঞান করে।

মেঘনা নদীর মাঝখান দিয়া কালোবরণ বেপারীর নৌকা চলিতেছিল। এমন সময় আসিল তুফান। ঈশান কোণের বাতাস নৌকাটাকে ঝাঁটাইয়া তীরের দিকে নিয়া চলিল। সকলে প্রস্তুত হইল তীরে ধাক্কা লাগিবার আগেই তারা লাফাইয়া নামিয়া পড়িবে এবং একযোগে ঠেলিয়া নৌকার গতিবেগ কমাইয়া আসন্ন দুর্ঘটনা নিবারণ করিবে। আগে সুবলের উপর আদেশ হইল, শীঘ্র লগি হাতে লাফাইয়া তীরে গিয়া পড়, পড়িয়া লগি ঠেকাইয়া নৌকাটাকে বাঁচা। তোর সঙ্গে আমরাও লাফ দিতেছি। বেতনধারী লোকের মনে মুনিবের প্রতি প্রবল একটা বাধ্যবাধকতাবোধ থাকে। তাই সুবল ফলাফল না ভাবিয়া মালিকের আদেশমত লাফাইয়া তীরে নামিল কিন্তু আর কেউ ভয়ে নামিল না। সুবল লগিটার গোড়াটা নৌকার তলার দিকে ছুঁড়িয়া, মাঝখানটাতে কাঁধ লাগাইতে গেল, তাহাতে নৌকার বেগ যদি একটু কমে। বেগ কমিল না। ঢালু তীর। সবেগে নৌকা তীরে উঠিয়া আসিল। সুবল নৌকার তলায় চাপা পড়িল, আর উঠিল না।

বাসন্তীর হাতের শাখা ভাঙিল, কপালের সিঁদুর মুছিল। কিন্তু জাগিয়া রহিল একটা অব্যক্ত ক্রোধ।

চারি পাঁচ বছরে সে অনেক কিছু ভুলিয়াছে। স্বামীর জন্য আর তার কষ্ট হয় না। স্বামী বড় নিদারুণ মৃত্যু মরিয়াছে। একথা মাঝে মাঝে মনে হয়। কল্পনা করিতে চেষ্টা করে একটা মনিবের অসঙ্গত আদেশ আর একটা নিরুপায় ভৃত্যের তাহা পালনের জন্য মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়ার দৃশ্যটা।

একটা পড়ার পুঁথির মত পাগলের মনের উপর দিয়া তার পাগলামির ইতিহাসখানা পাতার পর পাতা উল্টাইয়া গেল। পূর্ব স্মৃতি হয়ত তাকে খানিকক্ষণের জন্য আত্মস্থ করিয়া দিল, সে নিজের দিকে, জগতের দিকে তাকাইবার সহজাত ক্ষমতা ফিরিয়া

পাইল। না, হয়ত পাইল না। দুইটি নারী তার রান্নাঘরে পিঠা বানাইতেছে। দুইটির সহিতই তার জীবনের সম্পর্ক সুগভীর। ইহাদিগকে কাছে পাইয়া হয়ত ক্ষণকালের জন্য তার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। হয়ত ভরিয়া উঠে নাই। পাগলের মনের হদিস পাওয়া স্বাভাবিক মানুষের কাজ নয়। তবু মনে হয়, দুটি নারীর এতখানি কাছে অবস্থান তার মনে আলোড়ন জাগাইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে, হাঁড়িখুড়ি না ভাঙিয়া, জাল দড়ি না ছিঁড়িয়া ভাল মানুষের মত সে স্থির হইয়া বসিয়া কাঁদিবে কেন?

এ ঘরে সুবলার বউ কাহিনী শেষ করিয়া আনিয়াছে। আর এ ঘর হইতেই শোনা যাইতেছে বারান্দাতে পাগল ফোঁপাইতেছে তার শব্দ। অনন্তর মা অনেক করিয়াও মনের বেদনা চাপিতে পারিতেছে না। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিতেছে। বুঝি এখনই কান্নায় ফাটিয়া পড়িবে। কিন্তু সব কিছু চাপিতে চাপিতে এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, মনের জোরে সে পাথরের মতই শক্ত হইয়া যাইতে পারে।

কেরোসিনের আলোতে তার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সুবলার বৌ শিহরিয়া উঠিল। নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে মুখখানা একেবারে অপার্থিব আকার ধারণ করিয়াছে। ক্ষণেকের জন্য তার মনে একটা সন্দেহ উকি দিয়া গেল, এ কি সেই, নয়া গাঙের বুকে যাহাকে ডাকাতে লইয়া গিয়াছে।

দিনের আলোতে যাকে সত্য ও বাস্তব মনে করা যাইত, রাতের গহনে তাকেই অবাস্তব রহস্যে রূপায়িত করিয়া দেয়। সুবলার বৌর বাস্তববুদ্ধি লোপ পাইল। নিশার গহনতা তার কল্পনার দূরত্বকে অস্পষ্ট করিয়া দিল। তার মনে হইল, হাঁ সে-ই। তবে রক্তমাংসের মানুষ সে নয়। তার প্রেতাত্মা।

মঙ্গলার-বৌ কাছে না থাকিলে সুবলার বৌ চিৎকার করিয়া উঠিত।

মঙ্গলার বৌ তার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মনে করিল, ছেমড়ির ঘুম পাইয়াছে। বলিল, 'যা লা সুবলার বৌ, অনন্তর পাশে গিয়া শুইয়া থাক।'

শুইয়া, ঘুমন্ত অনন্তকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সুবলার বৌ বুঝিতে পারিল এতক্ষণে সে বাস্তবের মৃত্তিকা-স্পর্শ পাইয়াছে।

সকালে পাগল আবার যা ছিল তাই হইয়া গেল।

অনন্তর মা রাতে চোখ বুজে নাই। সুবলার বউ, মঙ্গলার বউ, অনন্ত অকাতরে ঘুমাইতেছে। আর ঘুমাইতেছে বুড়ি। বুড়া রাতের জালে গিয়াছে, আসিতে অনেক দেরি হইবে। বেলা হইয়াছে। কিন্তু অনন্তর মার দিকে কেহই চাহিয়া থাকে নাই। তার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। একখানি ধুচনিতে কয়েকখানি পিঠা তুলিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইল। মনে চিন্তার ঢেউ। পাগলের চোখে সারারাত ঘুম ছিল না। বারান্দায় বেড়া-দেওয়া খুপড়িতে সে ছিল। দা দিয়া মেঝের মাটি চষিয়া ফেলিয়াছে। অনন্তর মা তার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সে ঘাড় তুলিয়া চাহিল, দা উঁচাইয়া কোপ মারিতে আসিল। অনন্তর মা নড়িল না। এক হাতে ধুচনি আগাইয়া দিল আরেক হাতে তার পিঠে মাথায় স্পর্শ করিতে লাগিল। কোনো সুন্দরী যেন বনের এক জানোয়ারকে বশ করিতে যাইতেছে। পাগল তার দায়ের উদ্যত কোপ থামাইল, কিন্তু শান্ত হইল না। দায়ের ঘাড়ের দিকটা দিয়া অনন্তর মার পিঠে আঘাত করিল। অনন্তর মা ভ্রূক্ষেপ করিল না। এটকু হাসিবার চেষ্টা করিয়া একখানা পিঠা তার মুখে তুলিয়া দিল। পাগল মুখ ফিরাইয়া উঠানে নামিল, নামিয়া একদিকে দৌড় দিল।

অনন্তর মার বুক আশায় ভরিয়া উঠিল। তার পাগল হয়ত একদিন ভাল হইয়া যাইবে।

সেদিন সুবলার বৌর গলা জড়াইয়া অনন্তর মা অনেকক্ষণ কাঁদিল। কিন্তু সুবলার বৌ এ কান্নার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

মাঘের শীত গিয়া ফাল্গুনের বসন্ত আসিল। পাগলের বাড়ির মন্দার গাছে প্রায়ই একটা কোকিল ডাকে। অনন্তর মা সুযোগ পাইলেই গিয়া দাঁড়ায়। তাকে এক নজর দেখিয়া আসে। কিন্তু দেখা দেয় না, চোরের মত যায়, পাছে পাগলের নিকট নিজে ধরা পড়ে। চৈত্রের শেষে বসন্ত যাই যাই করিতেছে। এমন সময় আসিল দোলপূর্ণিমা। উত্তরের শুকদেবপুরের মত এ গাঁয়ের মালোরাও দোল করিল, হোলি-গান গাহিল। সুবলার বৌ নিজে স্নান করিল, অনন্তকে, তার মাকে স্নান করাইল। পরে অনন্তকে দিয়া বাজার হইতে আবির আনাইয়া বলিল, 'চল দিদি, উত্তরের আখড়ায় রাধামাধবেরে আবির দিতে যাই।'

রাধামাধব জ্যান্ত কেউ নয়। বিগ্রহ। তাকে আবির দিলে কি হইবে। সে তো আর পাল্টা আবির দিতে পারিবে না। চুপ করিয়া থাকিবে আর যত দেও তত আবির গ্রহণ করিবে। তবু এতে নূতনত্ব আছে। দশজন স্ত্রীলোকের মাঝে মিশিয়া একটু আনন্দ করা যাইবে। অনন্তর মা বলিল, 'চল যাই।'

পাগলের উঠান দিয়া পথ। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। আব্দার ধরিল, 'অ গোপিনী, আমারে আবির দে।'

সুবলার বৌ বিরক্ত হইয়া বলিল, 'ভারি আহ্লাদের পাগল। তারার পাগল তারা বাইন্ধা রাখতে পারে না। কয়, পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি। ছাইড়া দেয় কেনে? পাড়াপড়শীরে জ্বালা করার লাগি!' সে কোনমতে পাশ কাটাইয়া বিপদ হইতে মুক্তি পাইল। অনন্তর মা তার পিছনে ছিল। আবেগে চঞ্চল হইয়া এক ঝাঁকা চুলদাড়ির উপর মুঠামুঠা আবির মাখাইয়া দিল। চোখের কোণে রহস্য করিতে করিতে পাগল বলিল, 'আমার আবির কই হি হি হি।' বলিয়া সে এক ধাক্কায় আবিরের থালা অনন্তর মার হাত হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল।

সুবলার বৌ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, 'এ কি করলা তুমি দিদি।'

অনন্তর মা হাসিয়া বলিল, 'আইজকার দিনে সকলে সকলেরে রাঙাইছে। পাগলেরে ত কেউ রাঙাইল না ভইন। আমি একটু রাঙাইয়া দিলাম।'

'কেউ যদি দেখত?'

'তা হইলে কইতাম তারে, পাগলে আমরে পাগলিনী করছে।'

'মস্করা রাখ দিদি। কোন্‌দিন তোমারে ধইরা পাগলে না জানি কি কইরা বসে, আমি সেই চিন্তাই করি দিদি। কি কারণে পাগল হইছে সেই কথাখান ত তুমি জান না।'

'জানি গো জানি, মনের মানুষ হারাইয়া পাগল হইছে।'

'তুমি ত তার মনের মানুষ মিলাইয়া দিতে পার না।'

'তা পারি না! তবে চেষ্টা কইরা দেখতে পারি, আমি নিজে তার মনের মানুষ হইতে পারি কিনা।'

'বসন্তে তোমার মন উতলা করছে দিদি। তোমার অখন একজন পুরুষ মানুষ দরকার।'

অনন্তর-মা কথাটা মানিয়া নিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রতিবাদ করিয়া কথা বাড়াইল না। মার আঁচল ধরিয়া অনন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তার দিক ইশারা করিয়া চাপা গলায় বলিল। 'যা-তা কইও না ভইন। পুলা রইছে, দেখ না?'

অনন্ত আমোদ পাইতেছে। রূপকথার রাজ্যের লোকের মত পাগলটার চেহারা। আর তার মা ওটাকে আবির মাখাইতেছে। পাগলটা আবিরের থালা ফেলিয়া দিয়াছে। মার অতগুলি আবির নষ্ট হইয়াছে। অনন্ত নত হইয়া মাটি হইতে আবির তুলিতেছিল। সুবলার বউ তার একখানা হাত ধরিয়া জোরে সোজা করিয়া বলিল, 'দুত্তোরি, যামুনা রাধামাধবেরে আবির দিতে। তারে আবির দিয়া লাভ কি। আয়রে অনন্ত।'

ঘরে গিয়া সে অনন্তকে আবির মাখাইল, চুমা খাইল, বুকে চাপিয়া ধরিল, ছাড়িয়া দিয়া আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। অনন্তর মুখখানা সুন্দর, চোখ দুটি সুন্দর, শরীরখানা সুন্দর। যখন কথা বলে কথাগুলি সুন্দর। যখন কোনদিকে চাহিয়া থাকে তখন তাকে অনেক অনেক বড় মনে হয়।

'না দিদি, মন ঠাণ্ডা কর। পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেক মাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়। এই অনন্ত আম্‌রার আশা ভরসা। দুইজনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল। এ-ই একদিন আম্‌রার দুঃখ ঘুচাইব।'

অনন্তর মা যখন সূতা কাটিতে বসে, বৈশাখের উদাস হাওয়া তখন সামনের গাছগাছালি হইতে শুকনা পাতা ঝরাইয়া লইয়া তার ঘরে আসিয়া ঢোকে। এই সময়ের দমকা হাওয়া অনেককেই চমকাইয়া দেয়। অনন্তর মার বুকের শূন্যতাটুকু তখন বেশী করিয়া তার নিজের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু হাওয়া উদাস হইলে কি হইবে। বড় দুরন্ত। খামকা কতকগুলি ঝরাপাতা রাখিয়া দিয়া তার ঘরখানাকে নোংরা করিয়া যায়। ঝাঁটাইয়া দূর করিয়া দিয়াও উপায় নাই, সোঁ সোঁ করিয়া সেগুলি আবার ঘরেই ঢুকিয়া পড়ে। 'দুত্তোর মরার পাতার জ্বালায় গেলাম।'—নিরুপায় হইয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। এমন সময় এক ঝাপটা দমকা হাওয়ার মতই অনন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। আম কুড়াইতে গিয়াছিল। এ হাওয়াতে গাছের পাতা যেমন ঝরে, তেমনি আমও ঝরে। দুই হাতে যাহা পারিয়াছে, বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া তাহাই নিয়া আসিয়াছে। দরজা বন্ধ দেখিয়া ডাক দেয়, 'মা, দুয়ার ঘুচা, দেখ্ কত আম।' এই ডাকে সাড়া না দিয়া পারে না। দরজা খুলিয়া তাকে ঘরে নেয়। 'দেখি। কত আম। তোর মাসিরে ডাক দিয়া আন।' অনন্ত একদৌড়ে ছুটিয়া যায়। সে ডাকে সুবলার বৌও সাড়া না দিয়া পারে না।

বর্ষায় খুব কষ্টে পড়িল। অনন্তর মা খায় কি। এই সময়ে মাছ খুব পড়ে। কিন্তু তার আগেই সকলের জাল বোনা শেষ হইয়া যায়। তারপর আর কেউ সূতা কিনিতে আসে না।

সূতা কাটাতে আর হাত চলে না। বিক্রি হয় না, কাটিয়া কি লাভ! তার সংসার অচল হইয়া পড়িতেছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পারিয়া অনন্ত দিনদিন শুকাইয়া যাইতেছে।

সুবলার বৌ মা-বাপের চোখ এড়াইয়া এক আধ 'টুরি' চাউল আনিয়া দেয়, দুই একটা তরিতরকারি, এক-আধটা মাছ, একটু নুন, তেল, কয়েকটা হলুদ। তাতেই বা কত চলিবে। তাও বেশীদিন দিতে পারিল না। একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গেল। মা-বাপের সংসারে পড়িয়া আছে সে। জলের উপরে ভাসিতেছে। পা বাড়াইয়া মাটির কঠিনতা সে কোনোকালে পাইল না । সে আর কি করিবে। মা বকিল, বাপে বকিল। সকল গালমন্দ সে মুখ বুজিয়া সহিয়া লইল। তারা তাকে অনন্তর মার বাড়ি আসিতে নিষেধ করিল। সে নিষেধ মানিয়া নেওয়া ছাড়া তারও কোনো উপায় রহিল না।

অনন্তর মা কোনোদিকে চাহিয়া ভরসা দেখে না। খড়ের চাল ফুটা হইয়া গিয়াছে। রাতদিন জল ঝরে। বেড়া এখানে ওখানে ভাঙিয়া গিয়াছে। হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে। পরণের কাপড়খানাতে ভাল করিয়া কোমর ঢাকিতে গেলে বুক ঢাকা পড়ে না, বুক ঢাকিতে গেলে উরুদুইটির খানে খানে ফরসা চামড়া বাহির হইয়া পড়ে। যেখানটাতে জল পড়ে না তেমন একটু জায়গা দেখিয়া অনন্তকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কাঁথা বালিস ভিজিতেছে লক্ষ্য করিয়া সেগুলিকে কাছে নিয়া আগলাইয়া বসে। এভাবে অনন্তর মার দিন আর কাটিতে চায় না।

সুবলার বৌর মতিগতি খারাপ হইয়া যাইতেছে। একদিন তার মা ইহা আবিষ্কার করিল। পশ্চিম পাড়াতে থাকে, বাঁশের ধনু মাটির গুলি লইয়া পাখি মারিয়া বেড়ায়, মাথায় বাবরি চুল, নাম তার ময়না। আস্তাকুড়ের পাশের ছিটকি গাছের জঙ্গল। ময়না সেখানে একটা পাখিকে তাক করিয়াছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছিল, 'টিয়া পাললাম, শালিক পাললাম, আরও পাললাম ময়না রে। সোনামুখী দোয়েল পাললাম, আমার কথা কয় না রে।' সুবলার বউ আস্তাকুড়ে জঞ্জাল ফেলিতে গিয়া তার সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিয়াছে। আর তার মা নিজের চোখে দেখিতে পাইয়াছে। দেখিয়া, রাগে গরগর করিতে করিতে বুড়া বাড়ি আসিলে তাহাকে বলিয়া দিয়াছে।

দুইজনের ঝগড়া বকুনির পর সুবলার-বৌয়েরও মুখ খুলিয়া গেল, 'আমি ময়নার সাথে কথা কমু, তার সাথে পুরীর বাইর হইয়া যামু। তোমরা কি করতে পার আমার। খাইতে দিবা না, খামু না; পরতে দিবা না, পরুম না। কিন্তুক আমি বাইর হইয়া যামুই। তোম্‌রার মুখে চুনকালি পড়ব, আমার কি। আমার তিন কুলে কারুর লাগি ভাবনা নাই। একলা গতর আমি লুটাইয়া দেমু, বিলাইয়া দেমু, নষ্ট কইরা দেমু, যা মনে লয় তাই করুম, তোমরা কথা কইতে পারবা না। মনে কইরা দেখ কোন শিশুকালে বিয়া দিছলা। মইরা গেছে। জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝ-কালে ধর্মে কাঁচারাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনেবনে কাইন্দা ফিরি। তোমরা ত সুখে আছ। তোমরা কি বুঝ্‌বা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহলাদ নাই। আমার বুঝি কিছুর দরকার লাগে না।'

'হারামজাদী পোড়ামুখী কয় কি রে,' বলিয়া দীননাথ আগুন হইয়া খড়ম আনিতে গেল। পরিবার তাহাকে মানাইয়া বলিল, 'তুমি অখন বাইর হইয়া যাও। আমার মাইয়ারে আমি সমঝামু।'

মা সান্ত্বনার সুরে মেয়েকে বলিল, 'পোড়াকপালি তুই কি দশ-জনের বৈঠকে তোর বাপেরে ভক্তি দেওয়াইতে চাস। তার মান ইজ্জত আছে না।'

'আছে ত আছে। তাতে আমার কি এমন সাতবংশ উদ্ধার পাইছে? ভাবছিলাম আমারই দুঃখের দুঃখী অনন্তর মার মত সাথী পাইয়া, অনন্তর মত ছাইলা কোলে পাইয়া সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়ামু। তোমরা আমারে তার কাছে যাইতে দিবা না। দিবা না যখন, আমি মানুষ ধরুম। দেখি তোমরা কদিন আমারে ঘরে বাইন্ধা রাখতে পার।'

'আ-লো পোড়াকপালি, অখনই যা। অনন্তর মার কাছে তুই অখনই যা। তবু পুরুষ মানুষ থাইক্যা মনটারে ফিরাইয়া রাখ।'

'মা, তুমি ত জান, আজ দুই দিন অনন্তর মার পেটে দানাপানি নাই।'

'লইয়া যা। দুই টুরি চাউল লইয়া যা। একটা ঝাগুর মাছ আছে, লইয়া যা। আর যা যা তোর মনে লয়, লইয়া যা। আ-লো, অখনই যা।'

'মা! অনন্তর মার কাপড়খানা ছিড়া রোঁয়া রোঁয়া হইয়া গেছে। আমার ত তিনখান কাপড়। একখান দেই?'

'তোর ঠাকুরের কাছে জিগাইয়া পরে কমু, তুই অখন যা। না না, শুন্, তোর ঠাকুরেরে জানাইবার কাম নাই। অনন্তর মারে একটা কাপড় তুই দিয়া দে।'

সুবলার বৌয়ের পুরুষমানুষের অভাব সেই মুহূর্তেই মিটিয়া গেল।

ভাদ্রমাসে মাছের পুরা জো। এ সময় কাটা সূতার দর বাড়িয়া গেল। মাছের গুঁতায় অনেক নূতন জাল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। জেলেরা দামের দিকে চায় না। মোটা চিকন মাঝারি সবরকম সূতা তারা যে-কোনো দামে কিনিয়া নেয়। অনন্তর মার সকল সূতা একদিনে বিক্রি হইয়া গেল। তার একদণ্ড কথা বলার অবসর নাই। টেকো তার ঘুরিয়াই চলিয়াছে। একদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, টেকোতে পাক দিতে দিতে তার গৌরবর্ণ উরুতে কালো দাগ বসিয়া গিয়াছে। এত সূতা সে কাটিয়াছে। এত সব সূতায় তারই ঘরে জাল তৈয়ার হইতে পারিত। সে জালে সারারাত মাছ ধরার পর বিহানে তার ঘরে ঝাঁকাভরা মাছ আসিত। কোঁচড়ভরা টাকা পয়সা আসিত! আর সব লোকের বাড়িতে কত সমারোহ। তাদের পুরুষেরা কিসিম বলিয়া দেয়, নারীরা সেই অনুযায়ী সূতা কাটে। ভাল হইলে পুরুষেরা কত সুখ্যাতি করে। পাকাইতে গিয়া, ছিঁড়িয়া গেলে, মিষ্টি কথায় কত গালি দেয়। নারীরা মুখ ভার করিয়া বলে, যে-জন ভাল সূতা কাটে তারে নিয়া আসুক। কোন্দলের পরে ভাব হইয়া ঘরখানা মধুময় হইয়া উঠে। সে-সকল ঘরে পাঁচ রকমের কাজ হয়। আর তার ঘরে হয় কেবল এক রকম কাজ। সূতা কাটা।

সুবলার বৌকে পাইয়া অনন্তর মা মনের আবেগ ঢালিয়া দেয়, 'তুমি না কইছিলা ভইন আমার একজন পুরুষ চাই। হু, চাই-ইত। পুরুষ ছাড়া নারীর জীবনের কানাকড়ি দাম নাই।'

'পুরুষ একটা ধর না।'

'কই পাই।'

'পাগলারে ধর।'

'ধরতে গেছলাম। ধরা দিল না।'

'ঠিসারা কইর না দিদি।'

'আমি ভইন ঠিস্যারা করি না। সত্য কথাই কই। পাগলা যদি আমারে হাতে ধইরা টান দেয়, আমি গিয়া তার ঘরের ঘরণী হই। আর ভাল লাগে না।

সুবলার বউ হতবুদ্ধি হইয়া যায়, 'অত মানুষ থাক্‌তে এই পাগলার দিকে নজর গেল তোমার? অত যদি মন উচাটন হইয়া থাকে, জল আনতে গিয়া যারে মনে ধরে চোখের ঠার দিয়ো!'

'পুরুষ কি ভইন কেবল এর-ই লাগি? পরের ঘরে চাইয়া দেখ; সংসার চালায় পুরুষে। নারী হয় তার সঙ্গের সাথী। আমার যত বিড়ম্বনা।'

'না দিদি, তুমি পাগলের লাগি পাগলিনী হইয়া গেছ। এই পাগলেই একদিন তোমারে খাইব। আচ্ছা, সত্য কইরা কও তো দিদি, পাগলে যারে হারাইছে, সে জনা কি তুমি?'

'পাগলে কারে কই হারাইছে, তার আমি কি জানি। আমি কেবল জানি, এক্‌লাজীবন চলে না। পাগলেরে পাইলে তারে লখ্‌ কইরা জীবন কাটাই।'

সুবলার বউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে, 'আমারও দিদি সময় সময় মন অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখ্‌ছি, এই ভাবেই চালামু।'

তার সঙ্গে অনন্তর মার তফাৎ আছে। ভাবনীপুরে যতদিন ছিল তখন তার বুক ভরিয়া ছিল একদিকে অনন্ত, আর একদিকে শিশুর মত সরল দুই বুড়া। তিলেকের জন্যও কোনোদিন অনন্তর মার মন বিচলিত হয় নাই। মন তার বিচলিত আজকেও হয় নাই। নিজেকে শুধু সে শ্রান্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছে। যে আলোকস্তম্ভ লক্ষ্য করিয়া একদিন সে পথ চলিয়াছিল আজ তার পাদদেশের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দেখে, তার আর এখন চলার শক্তি নাই। পাগল নিজে আসিয়া তার ভার নিক, নয় তো তাকে ঘরে ডাকিয়া নিয়া মারিয়া ফেলুক। সুবলার বউর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে। কিন্তু অনন্তর মার মনে বাসা বাঁধিয়াছে এক সর্বনাশী সাংসারিক কামনা। সে সংসারী হইতে চায়। সে আসিয়া তাহাকে লইয়া ঘর বাঁধুক। কিন্তু পাগল কি কোনোদিন কারো মনের কথা বোঝে।

সুবলার বউ একদিন বলিয়াছিল, তিন বছর আগে দুইজন বিদেশী নারীপুরুষ আসিয়াছিল। খালের পারে তার বাপকে পাইয়া তারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রামকেশবের ছেলে কিশোর কোন বাড়িতে থাকে। আমাদিগকে সেই বাড়িতে নিয়া চল। সেই বাড়িতে আসিয়া দেখে ঘরে এক যম-কালো বুড়া আর এক শুক্‌না বুড়ি, আর, এক পাগল বারান্দাতে বসিয়া প্রেতকীর্তন করিতেছে। যাকে দেখিতে আসিয়াছে, তাকে দেখে না। পাগল চিনিতে পারিয়া তার হাত দুটি ধরিয়া বলে, 'অ কিশোর, আমার মাইয়ারে কোথায় লুকাইয়া রাখ্‌ছ বাবা, কও।' পাগল তখন ঠিক ভাল মানুষের মত বলে, 'নয়া গাঙের মুখে তারে ডাকাইতে লইয়া গেছে।' তারা আর তিলেক বিলম্ব করে নাই। তখনই স্টেশনে গিয়া গাড়ি ধরিয়াছিল।

তার বাপ মা যাহা জানিয়া গিয়াছে, তারপর আর কোনদিন তারা এদিকে আসিবে না।

এক বুড়া আছে। তাকে বাপ বলিয়া ডাক দিলে মেয়ের মত তুলিয়া নিবে। বলিবে আমার ঘরের লক্ষী ঘরে আসিয়াছে। কিন্তু সব কথা শুনিয়া বলিবে ডাকাতে তোমাকে

নষ্ট করিয়াছে। আমার ঘরে তোমার স্থান হইবে না। পাগল যদি কোনদিন ভাল হয়, সেও বলিবে, ডাকাতে তোমারে অসতী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তুমি যে সতী, তার কোন প্রমাণ নাই। তখন আমার অনন্তর যে কোনো উপায়ই থাকিবে না। অথচ ভগবান সাক্ষী, নৌকার ভিতর হইতে তুলিয়া নিবার সময় তারা একবার মাত্র ছুঁইয়াছিল। তারপর তাকে বসাইয়া নৌকা চালাইবার সময় সে ঝুপ্ করিয়া জলে পড়িয়া গেল। জেলের মেয়ে। নদীর পারে বাড়ি। শিশুকাল হইতে সাঁতারের অভ্যাস। দম বন্ধ করিয়া এক ডুবে অনেক দূর যাইতে পারে। ডাকাতেরা তাকে আর পায় নাই। নদীর কিনারাতে গিয়া সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্যে সে আর কারো হাতে না পড়িয়া গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ দুই বুড়ার হাতে পড়িয়াছিল। তারা দুই ভাই, ছোট নৌকায় বড় নদীতে মাছ কিনিতে যাইতেছিল। সকালবেলা তীরের দিকে চাহিয়া দেখে এই অবস্থা। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তারা তাকে বলিয়াছিল, তুমি কি মা কোনো বামুন কায়েতের মেয়ে। সে বলিয়াছিল না বাবা আমি জেলের মেয়ে। তারা বলিয়াছিল তোমার বাপের বাড়ি কোথায়, কি করিয়া পাঠাইব। সে বলিয়াছিল সেখানে আর পাঠাইবার কাজ নাই। তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল। এই তার ইতিহাস।

সে কি সব থাকিতেও এই অপরিচয়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু অনন্ত! সে তার বাপকে চিনিল না, তার বাপও তাকে চিনিল না, এ যে বড় নিদারুণ। সুবলার বউ কেবল একটা দিক বুঝিয়াই নাড়াচাড়া করে। সেও বুঝিবে না অনন্তর মার কতদিক ভাবিয়া দেখিতে হয়।

একটা ধারণা কি জানি কেন তার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে পাগল একদিন ভাল হইয়া যাইবে। রোজ রোজ অনন্তর মাকে দেখিতে দেখিতে তার মাথা ঠিক হইয়া যাইবে। তাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, পরোক্ষে তার সেবা পাইয়া তার প্রতি দরদী হইয়া উঠিবে। অনন্তর মাকে ভাল করিয়া কোনোদিন সে দেখে নাই। সে নিজে বলিয়া না দিলে ও কিছুতেই চিনিতে পারিবে না। যারা চিনিতে পারিত সেই তিলক, সুবল—তারা এখন স্বর্গে। কি ভাল মানুষ তারা ছিল। কতভাবে তারা সাহায্য করিয়াছে। ওর সঙ্গে তারা কত আত্মজনার মত কাজ করিয়াছে। তারা স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ করুক, পাগল যেন তাকে না চিনিয়া ভালবাসিয়া ফেলে। সেই ভালবাসারই সূত্র ধরিয়া সে যেন পাগলের ঘরণী হইতে পারে, একটা নতুন কাজ হইবে। লোকে নিন্দা করিবে। কিন্তু এ নিন্দা সহ্য করা অসাধ্য হইবে না।

তা ছাড়া, দেশে দেশে একটা কথা উঠিয়াছে বিধবাদের বিবাহ দেও। পুরুষ যদি বউ মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারে, নারী কেন স্বামী মরিলে আবার বিবাহ করিতে পারিবে না। তার স্বামী কি মরিয়াছে? হাঁ, তার স্বামী স্মৃতির দিক দিয়া মনের দিক দিয়া এখন মরিয়া আছে। সেই দিন তার পুনর্জন্ম হইবে। সে নিজেও সব জানিয়া শুনিয়া জড়ভরত হইয়া আছে। তাও প্রায় মরিয়া থাকারই মত। সেদিন তারও নবজন্ম হইবে। আর অনন্ত। তার কি হইবে। অনন্ত কার পরিচয়ে সংসারে মুখ দেখাইবে। সে সমস্যার সমাধান হইবে। তাকে একটা রূপকথা শুনাইব।—

অর্থাৎ আসল কথাটাই, যা ঘটিয়াছে সেই সত্য কথাটাই তাকে শুনাইয়া রাখিব। সে তাতে আমোদই পাইবে না, মার সাহসের কথা, কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতার কথা শুনিতে

শুনিতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইবে! গৌরব বোধ করিবে মার জন্য। পাগলকেও দুনিয়ার অজানা এমন সব স্মৃতিকথা শুনাইব যে, সে তার মনের গভীরে বিশ্বাসকে ঠাঁই না দিয়া পারিবে না, এই তার সেই মালাবদলের বউ। সেবায় যত্নে মুগ্ধ করিয়া, হাসিতে খুশিতে তার মন পূর্ণ করিয়া, ওর জীবনে তার অপরিহার্যতাকে কায়েম করিয়া নিয়া, একদিন সে সত্যের মূর্ত ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়া জানাইবে ডাকাতেরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে নাই। সেই রাত্রিত্রেই সে নদীতে পড়িয়া সব কিছু বাঁচাইয়াছে। তার পাগল নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে।

শীতের সময়ে পাগলের অবস্থা নিদারুণ খারাপ হইয়া গেল। বাঁধিয়া রাখা যায় না। ঘরের জিনিসপত্র তো আগেই ভাঙিয়াছে। এখন পরের জিনিসপত্রও ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। পথের মানুষকে ডাকিয়া আনিয়া মারে। পাগলামির এ অবস্থা বড় ভয়ানক।

তার বাপ গলা ছাড়িয়া কাঁদে। সহিতে না পারিলে মারে। মারের দরুণ দেহে জখমের অন্ত নাই।

একদিন কোথা হইতে আর এক পাগল আসিয়া জটিল। দুই পাগলে মিলিয়া তামাক খাইল এবং অনেক হাসির কাণ্ড করিল। সে-পাগল যাইবার সময় কিশোরের জখমগুলির উপর আরও জখম করিয়া গেল। সেই হইতে কিশোরের মাথায় এক দুর্বুদ্ধি চাপিয়াছে। সে নিজের গায়ে নিজে জখম করিয়া চলিল। তার গায়ে এত জখম হইল যে, তার দিকে আর তাকানোই যায় না। অনন্তর মা কুলের বাধা লাজের বাধা ঠেকাইয়া কাজে নামিল। সে নিজে ঘোরাঘুরি করিয়া এক কবিরাজের কাছ হইতে গাছগাছড়ার ওষুধ আনিল। সাবানে গরমজলে ঘা ধুইয়া সে ওষুধের প্রলেপ দিল। প্রথম প্রথম তাকেও খুব মারধর করিত। শেষে শ্রান্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিল।

লোকে দেখিল এক সুন্দরী একটা পোষা জানোয়ারকে সেবা যত্নে আবেগে দরদে ভাল করিয়া তুলিতেছে। মুখে কেউ কিছু বলিল না। অনন্তর মার বড় দয়ার শরীর, এই সুমন্তব্য করিয়াই নীরব রহিল। একটা লোক মরিতে যাইতেছে, মানবতার খাতিরে এক নারী পর হইয়াও আপন জনের মত ভাল সেবা যত্নে বাঁচাইয়া তুলিতেছে, এতে দোষ নাই, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়। এতে ধর্ম হয় পুণ্য হয়, আর, একজনার পুণ্যের জোরে সারা গাঁয়ের কল্যাণ হয়--সুবলার বউ পরিচিত অপরিচিত সকল মহলে এই কথা জোর গলায় প্রচার করাতে কারও মুখ দিয়া কোন বিপরীত কথা বাহির হইল না।

শীতের শেষে পাগলের রূপ বদলাইয়া গেল। আশায় অনন্তর মার বুক ভরিয়া উঠিল। সুবলার বউ মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিল, কয়েকটা ধারালো মন্তব্যে অনন্তর মাকে বিদ্ধ করিল। কিন্তু মন পড়িয়া রহিল কি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করার দিকে।

আবার বসন্ত আসিল।

অনন্তর মা একদিন তার মাকে বলিয়া দুই নারীতে ধরাধরি করিয়া তাকে ঘাটে লইয়া গেল। সাবান মাখাইয়া ঝাপাইয়া ঝুপাইয়া স্নান করাইল। প্রকাশ্য দিবালোকে সারা গাঁয়ের নারী-পুরুষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অনন্তর মা ভ্রূক্ষেপ করিল না কেবল ভাবিল, সে তারই ছেলের বউ, বুড়ি যদি একথাটা একটিবার মাত্র বুঝিত।

একটা ভিন্-রমণীর সেবাযত্ন পাইয়া কিশোর যেন ক্রমেই আমোদিত হইয়া উঠিতেছে। অনন্তর মার বুক দুরু দুরু করিতে থাকে।

কিশোর তার সকল অত্যাচার সহানুভূতি দিয়াই সহ্য করিয়া ছিল, বাঁকিয়া বসিল নাপিত ডাকিয়া চুলদাড়ি সাফ করিবে শুনিয়া। পীড়াপীড়ি করিলে পাগলামি বাড়িয়া যায়। অনন্তর মা আর বেশী আগাইল না।

তারপর আসিল দোলের দিন। অনন্তর মার কাছে এটি একটি শুভযোগের দিন। এই দিনটি তার জীবনের পাতায় গভীর দাগ কাটিয়া লেখা হইয়া আছে।

মালোরা সেদিন সকাল সকাল জাল তুলিয়া বাড়ি আসিল, আসিয়া তারা হোলির আসরে বসিয়া গেল। ঢোলক বাজাইয়া গান ধরিল, 'বসন্ত তুই এলিরে, ওরে আমার লাল ত এলো না।' এ গানের পর আর একজন ঘাড় কাত করিয়া গালে হাত দিয়া ওস্তাদি ভঙ্গিতে যে গান গাহিল, তার ধুয়া হইতেছে, 'তালে লালে লালে লালে লালে লালে লালে লাল।' যেন তার আকাশ ভুবন একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটা বোল। আগে শুধু বোলটাই গাহিয়া, শেষে উহাকে কথা দিয়া পূরণ করিল, 'ব-স-ন্-তে-রি জ্বালায় আমার প্রাণে ধৈ-র্য মানে না।' মূল গায়েন আবার বোল চালাইল, তালে লালে লালে লালে ইত্যাদি।

অনন্তর মার কুটীর খানাও লালে লাল। তার ঘরে অনেক আবির আসিয়াছে। সুবলার বউ বহু যত্ন করিয়া আবিরের থালা সাজাইয়া আনিয়াছে। অনন্তকে আজ একেবারে লালে লাল করিয়া দিবে। বেচারা না বলিবার অবসর পাইবে না। আবির দিতে গিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ছেলেটা যেন অনেক খানি বড় হইয়াছে। গালে মুখে আবির মাখাইতে চোখমুখের দিকে দৃষ্টি পড়িল। সে চোখ যেন আরেক রকম হইয়া গিয়াছে। সহজভাবে যেন চাওয়া যায় না। সুবলার বউ দুরন্ত। সে দমিতে জানে না। সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে ভালবাসে। এবারও সে তাকে বুকে চাপিয়া চুমু খাইল। কিন্তু এবার সে আর তাকে ছোট গোপালটির মত সহজ ভাবে নিতে পারিল না। এবার যেন আর এক রকমের অনুভূতি আসিয়া তার মনের যত সরলতা কাড়িয়া নিতেছে। তার চোখ বুজিয়া হাত দুটি আলগা হইয়া আসিল। কিন্তু অনন্তর হাত দুটি একখানি ফুলের মালার মত তখনও মাসির গলা জড়াইয়া রাখিয়াছে।

অনন্তর মা ভাবিতেছে আরেক কথা। তাদের প্রথম প্রেমাভিষেকের দিনটিকে সে কি ভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে। সে পাগলকে এমন রাঙানো রাঙাইবে যে, তাতে করিয়া তার সে দিনের সেই স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিবে, তার পাগলামি সে নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে তার প্রেয়সীর দিকে নয়নপাত করিবে। সে বড় সুখের বিষয় হইবে। তখনকার অত আনন্দ অনন্তর মা সহিতে পারিবে ত?

সুবলার বউ আর অনন্তর দৃষ্টি এড়াইয়া এক সময়ে অনন্তর মা পথে নামিল। ওদিকে দোলের উৎসব বাড়িতে হোলির গান তখন তালে-বেতালে বেসামাল হইয়া চলিয়াছে।

কিশোর রঙ পাইয়া প্রথম প্রথম খুব পুলকিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মার চোখে তাকে আজ কত সুন্দর দেখাইতেছে। আজ যদি সেই দিনটি তার মাধুর্য লইয়া, ঠিক ঠিক প্রতিরূপ লইয়া, ফিরিয়া আসে। অনন্তর মা অনেক কিস্‌সা-কাহিনী শুনিয়াছে প্রিয়জনের শোকে মানুষ পাগল হইয়া যায়, প্রিয়জনকে পাইলে আবার তার পাগলামি দূর হয়। এও শুনিয়াছে, প্রিয়দিনগুলির স্মৃতি জাগাইতে পারিলেও পাগলামি দূর হইয়া

যায়। পাগলামি ত আর দেহের অসুখ নয় যে ডাক্তার কবিরাজের ওষুধ লাগিবে। ওটা আসলে অসুখই নয়, মনের একটা অবস্থা মাত্র। এই অবস্থার গতিবেগ ফিরাইয়া দিতে পারিলে পাগল আর পাগল থাকে না। অনন্তর মা আরও ভাবিয়া বাহির করিয়াছিল—পাগল যদি ভাল হইবার হয় তো এভাবেই ভাল হইবে।

শুধু তার নিজের পাগল নয়, দুনিয়ার সব পাগল যেন এভাবেই ভাল হইয়া যায়। এ ছাড়া পাগল ভাল করার আর কোন পথ নাই। যদি থাকিত, সকল পাগলই ভাল হইত। কিন্তু ভাল হয় না।

সেও কেন আমাকে দুই মুঠা আবির মাখাইয়া দিতেছে না। সে কি পাষাণ। সে কি বোঝে না তার মন কি চায়। হাঁ বুঝিতে পারিতেছে ত। সেও ত একমুঠা আবির অনন্তর মার কপালে আর গালে মাখাইয়া দিল! কেউ ধারে কাছে নাই। বুড়ি ঝাঁপের ওপাশে ঝিমাইতেছে। বুড়া তার শ্বশুর গিয়াছে হোলি গাহিতে। এখানে কেউ নাই। এই বেড়া-দেওয়া বারান্দা। তারা দুজনে এখানে একা। অনন্তর মা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাকে অটল করিয়া তুলিল।

কিন্তু শেষ দিকে কিশোর একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তার পাগলামি আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে ক্ষিপ্রগতিতে হাত বাড়াইয়া তার প্রেয়সীকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিল। তুলিয়া জড়ের বেগে উঠানে নামিয়া চীৎকার জুড়িল, 'লাঠি বাইর কর্, ওরে লাঠি বাইর কর। সতীর গায়ে হাত দিছে, আইজ আর নিস্তার নাই। মার, কাট্, খুন কর। একজনও পলাইতে না পারে। কই, আমার লাঠি কই।' দম নিয়া আবার গলা ফাটাইয়া বলিল, 'তেল আন, জল আন, তোমার মাইয়া মূর্ছা গেছে।'

হোলির আসর ভাঙিয়া লোকজন তখন ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিশোর একবার লোকজনের দিকে আর একবার মেয়েটার দিকে চাহিতে লাগিল। তার চোখ দুটি আরও বড়, আরও লাল হইয়াছে। মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া, সাপের মত লম্বা চুল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বুকটা চিতাইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। এত উঁচু যে, কিশোরের নাকের নিঃশ্বাসে তার আবরণটুকুও সরিয়া যাইতেছে। সে মূর্ছা গিয়াছে। তার বুকের কাপড় শীঘ্রই সরিয়া গেল। কিশোর পুরাপুরি পাগল হইয়া সে বুকে মুখ ঘষিতে লাগিল। দাড়ি গোঁফের জবরজঙ্গিমায় বুঝিবা সেই নরম তুলতুলে বুকখানা উপড়াইয়া যায়।

'কি দেখতাছ রামকান্ত, কি দেখতাছ গঙ্গাচরণ, ধর ধর। পাগলের পাগলামি ছাড়াও।'

হোলির উদ্দীপনায় লোকগুলি আগে থেকেই উত্তেজিত ছিল। এবার সকলে মিলিয়া কিশোরকে আক্রমণ করিল। লাথি, চড়, কিল, ঘুষি, ধাক্কা এসব তো চলিলই, আরো অনেক কিছু চলিল। যেমন, কয়েকজনে লাঠি আনিয়া তার দেহের জোড়ায় জোড়ায় ঠুকিয়া ঠুকিয়া মারিল। তারপর কয়েকজনে বাহুতে ধরিয়া উপরে তুলিয়া উঠানের শক্ত মাটি দেখিয়া আছাড় মারিল। কয়েকজনে আবার চুলদাড়ি ধরিয়া উপরে তুলিল, তুলিয়া গোটা শরীরটা চারিপাশে ঘুরাইল। শেষে একবার দাড়ির গোড়া ছিঁড়িয়া, কিশোরের স্পন্দবিহীন দেহ উঠানের এক কোণে ছিটকাইয়া পড়িলে, মেয়ে লোকের গায়ে হাত

দেওয়ার উচিত শাস্তি হইয়াছে বলিতে বলিতে লোকগুলি নিরস্ত হইল। তারা এবার মূর্ছিতা মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আক্রান্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে কিশোরের চমক ভাঙিয়াছিল। কি করিতেছে বুঝিতে পারিয়া মেয়েটাকে আস্তে মাটিতে নামাইয়া দিয়াছিল। মেয়ের তখন মূর্ছার চরম অবস্থা। কতকগুলি স্ত্রীলোক তেলজল পাখা লইয়া তার সংজ্ঞা ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় সে চোখ মেলিয়া দেখে বাড়িঘর লোকে লোকারণ্য। কয়েকজনে তাকে সোজা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে সে আবার পড়িয়া যাইতেছিল। সুবলার বউ এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে; ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, আসিয়া নরনারীর মহারণ্য ভেদ করিয়া অনন্তর মাকে কোনো রকমে কাঁধের উপর এলাইয়া তার ঘরে আনিয়া তুলিল।

লোকগুলি তখন দলে দলে চলিয়া গেল। কিশোর উঠানের এক কোণে পড়িয়া ছিল। তার সংজ্ঞা ফিরাইবার জন্য কেউ চেষ্টা করিল না। এক সময় আপনার থেকেই সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। এত দিন পরে এই প্রথম সে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিল, 'বাবা, আমারে একটু জল দে।' জল খাইয়া বলিল, 'বাবা, আমারে ঘরে নে; আমি উঠতে পারি না।'

কিশোর রাত্রিটা কোন রকমে বাঁচিয়া ছিল। পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই মরিয়া গেল। তার মা-বুড়ি এতদিন বোবা হইয়া ছিল। চোখের জল বুকের কান্না জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। এবার তাহা গলিয়া প্রবাহের বেগে ছুটিল। সে অনেক কথা বলিয়া বলিয়া বিলাপ করিল, যেমন, মরিবার আগে জল খাইতে চাহিয়াছিল, সে জল সে ত খাইয়া গেল না। মরিবার আগে কি কথা যেন কহিতে চাহিয়াছিল, সে কথা সে ত কহিয়া গেল না।

অনন্তর মা মরিল চারিদিন পরে। সেইদিনই তার জ্বর হইয়াছিল। আর হইয়াছিল কি রকম একটা জ্বালা, কেউ জানে না কি রকম। সারা রাত ছটফট করিয়া সে মরিল ভোর হওয়ার পরে। সুবলার বৌয়ের কোলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া ছিল। আলো ফুটিতেছে, তারই দিকে চোখ মেলিয়া ছিল। যে আলো ফুটিতেছে অনন্তর ভোরের আকাশ রাঙাইয়া।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিনেতেই মালোরা পয়সা খরচ করে। সে পয়সাতে কাঠ আসিল, বাঁশ আসিল, তেল ঘি আসিল, আর আসিল মাটির একটি কলসী। সমারোহ করিয়া নৌকায় তুলিয়া তারা অনন্তর মাকে পোড়াইতে লইয়া গেল।

চিতাতে আগুন দিতে দিতে একজন বলিল, 'পাগলে মানুষ চিন্যাই ধরছিল। চাইর দিন আগে মরলে এক চিতাতেই দুজনারে তুইল্যা দিতাম। পরলোকে গিয়া মিল্যা যাইত।'

এক সময়ে তিনজনে মিলিয়া প্রবাসে গিয়াছিল। সেখান থেকে আরেক জনকে লইয়া তারা ফিরিয়া আসিতেছিল। এই চারিজন এইভাবে আগে পিছে মরিয়া গেল। তারা যে প্রবাসে গিয়া অত কিছু দেখিয়াছিল শুনিয়াছিল, অত আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিল, অত বিপদে আপদে পড়িয়াছিল, সে ছিল একটা কাহিনীর মত বিচিত্র। এই কাহিনী যারা সৃষ্টি করিয়াছিল তারা এখন চলিয়া গিয়াছে। এ সংসারে আর তাদের দেখা যাইবে না।

রামধনু

তিতাস নদী এখানে ধনুর মত বাঁকিয়াছে।

তার নানা ঋতুতে নানা রঙ, নানা রূপ। এখন বর্ষাকাল। এখন রামধনুর রূপ। দুই তীরে সবুজ পল্লী। মাঝখানে সাদা জল। উপরের ঘোলাটে আকাশ হইতে ধারাসারে বর্ষণ হইতে থাকে। ক্ষেতের গৈরিক মাটিমাখা জল শতধারে সহস্রধারে বহিয়া আসে। তিতাসের জলে মেশে। সব কিছু মিলিয়া সৃষ্টি করে একটা মায়ালোকের। একটা আবেশমধুর মরমী রামধনুলোকের।

বর্ষাকাল আগাইয়া চলে।

আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ শুরু হয়। সে বর্ষণ আর থামে না। তিতাসের জল বাড়িতে শুরু করে। নিরবধি কেবল বাড়িয়া চলে।

হু হু করিয়া ঠান্ডা বাতাস বহে। নদীর ঘোলা জলে ঢেউ তোলে। সে-ঢেউ জেলেদের নৌকাগুলিকে বড় দোলায়। তার চাইতে বেশি দোলায় আলুর নৌকাগুলিকে।

সকরকন্দ আলু বেচিতে রওয়ানা হইয়াছিল একটি নৌকা। পথে নামিয়াছে ঢল। ছোট নৌকা। তাতে কানায় কানায় বোঝাই বড় বড় আলু। আধসের থেকে একসের এক একটার ওজন। নৌকার বাতা ডুবে-ডুবে। তার উপর বৃষ্টির জল। এখনি না সেঁচিতে পারিলে হয়ত কোনো এক সময় টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইবে। বোঝাই নাও, সেঁউতি ঢুকে না। কাদির মিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়। শুকনো বাঁশপাতার মাথালটা চিবুক বেড়াইয়া মাথায় আঁটা। তাতে কেবল মাথাটাই বাঁচে। সমস্ত শরীরে লাগে বৃষ্টির অবারণ ছাঁট। মাথালশুদ্ধ মাথা বাঁকাইয়া কাদির তাকায় আকাশের দিকে আর কাদিরের ছেলে চায় বাপের মুখের দিকে। চার দিক একেবারে শূন্য দেখা যায়, মাথায় কোন বুদ্ধি জোগায় না। বাপ বলিতেথাকে 'অত মে'ন্নতের সাগরগঞ্জ আলু, বেবাক বুঝি যায় রসাতলে।' ছেলে বলে, 'বা-জান তুমি সাঁতার দিয়া পারে যাও। গরীবুল্লার গাছের তলায় গিয়া জান বাঁচাও, আমার যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যখন দেখুম নাও ডুবতাছে, দিমু সব আলু ঢাইল্যা তিতাসের পানিতে। তারপর ডুবা নাও প্যারে লাগাইয়া তোমারে ডাক দিমু।'

এমন সময় দেখা গেল পরিচিত জেলে নৌকা, সন্ধ্যায় ঘরে-ফেরা সাপের মত তিতাসের দীঘল বুকে সাঁতার দিয়াছে। দুই দাঁড় এক কোরা মচ্‌মচ্‌, ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া চলিয়াছে, জল কাটিয়া, ঢেউ তুলিয়া। তার ঢেউ লাগিয়াই বুঝিবা ছোট আলুর নৌকা ডুবিয়া যায়। কাদির ডাকিয়া বলে, 'কার নাও!'

পাছার কোরা হইতে ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলে, 'অ বনমালী, সেওৎখান তাড়াতাড়ি বাইর কর। একটা আলুর নাও ডুব্‌তাছে।'

চট্‌পট্‌ দু'খানা দাঁড় উঠিয়া গেলে ধনঞ্জয় হাতের কোরা চিত করিয়া চাপিয়া ধরিল। সাপের ফণার মত নৌকাখানা বাঁ দিকে চির খাইয়া কাদিরের নৌকা বরাবর রুদ্ধগতি হইয়া গেল।

ধনঞ্জয়ের বুদ্ধি অপরূপ। তার বুদ্ধি খেলিয়া গেল একান্তই ঠিক সময়ে। একটু দেরি হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইত।

তারপর জেলে নৌকার তিনজন, আলুর নৌকার দুইজন, পাঁচ জনের হাত চলিল সেলাইকলের সূঁচের মত ফর্‌ফর্‌ করিয়া। দেখিতে দেখিতে জেলে নৌকার প্রশস্ত ভরা এক বোঝাই আলুতে ভরিয়া গেল। আর আলুর নৌকা খালি হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

কাদিরের মাথার টোকা তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে তার মাথা বাঁচাইয়া চলিয়াছে। বিপদমুক্তির পরের অবসন্নতা তাকে কাবু করিল। মাচানের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা।'

এতক্ষণ বৃষ্টি ছিল রিমঝিমে, ছন্দমধুর। সহসা সে-বৃষ্টি ক্ষেপিয়া গেল। মার্‌ মার্‌ কাট্‌ কাট্‌ শব্দে বৃষ্টি আকাশ ফাঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। সাঁ সাঁ ঝম্‌ ঝম্‌ সাঁ সাঁ ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে কানে বুঝি তালা লাগিয়া যায়। তীরভূমি, তীরের মাঠ-ময়দান, গাঁ-গেরাম আর চোখে দেখা যায় না। ধোঁয়াটে সাদা আবছায়ায় চারিদিক ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

বনমালী মনে করিয়াছিল তারা তীরে নাও ঠেকাইয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু তীর কোথায়। কাছেই তীর; তবু চোখে দেখা যায় না। ধনঞ্জয় ছইয়ের পেছনের মুখ ধাপর দিয়া ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল, 'বনমালী ভাই, গাঙ খালে নাও চালাইয়া কোনো লাভ নাই। ইখানেই পাড়া দে।'

ভারী মোটা একটা বাঁশ জলে নামাইয়া নদীর মাঝখানেই দুই জনে পাড় দিতে দিতে পুঁতিয়া ফেলিল। তার সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়া নৌকাখানা বাঁধিয়া ধনঞ্জয় বলিল, 'থাউক, নাও অখন বাতাসের সাথে সাথে ঘুরুক। কই অ মিয়ার পুত, ছইয়ের তলে গিয়া বও।'

কাদির মাথা ঢুকাইতে ঢুকাইতে থামিয়া গেল দেখিয়া বনমালী বলিল, 'ছইয়ের তলে কিছু নাই, ভাত ব্যানুন সব খাওয়া হইয়া গেছে।'

পাঁচজনেরই ভিজা গা। সঙ্গে একাধিক কাপড় নাই যে বদলায়। ছোট ছইখানার ভিতরে তারা গা-ঠেকাঠেকি করিয়া বসিয়া রহিল। কাদিরের ভিজা চুল এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তার সাদা দাড়ি হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছে বনমালীর কাঁধের উপর। কাদির এক সময় টের পাইয়া হাতের তালুতে বনমালরি কাঁধের জলবিন্দুগুলি মুছিয়া দিল। বনমালী ফিরিয়া চাহিল কাদিরের মুখের দিকে। বড় ভাল লাগিল তাকে দেখিতে। লোকটার চেহারায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদের সঙ্গে। তারও মুখময় এমনি সাদা সোনালী দাড়ি। এমনি শান্ত অথচ কর্মময় মুখভাব। রামায়ণ মহাভারতে পড়া বাল্মীকি ও অন্যান্য মুনি-ঋষিদের যেন রামপ্রসাদ একজন উত্তরাধিকারী। সেবার গোকন-ঘাটের বাজারে মহরমের লাঠিখেলা হয়। বনমালী দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাদেরই গাঁয়ের একজন মুসলমানের সঙ্গে পথে তার দেখা হয়। তারই মুখে কারবালার মর্মবিদারক কাহিনী শুনিতে শুনিতে বনমালী প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল।

এর সঙ্গে আরও শুনিল তাদের প্রিয় পয়গম্বরের কাহিনী। সেজন বীরত্বে ছিল বিশাল, কিন্তু তবু তার আপন জনকে বড় ভালবাসিত। কাদির যেন সেই বিরাটেরই একটুখানি আলোর রেখা লইয়া বনমালীর কাঁধে দাড়ি ঠেকাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বনমালীর বড় ভাল লাগিতেছে। বাস্তবিক, যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া—এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটাঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে; আবার দাড়ির নিচে প্রশান্ত বুকটায় মুখ গুঁজিয়া, দুই হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেও ধমক দিবে না, কেবল অসহায়ের মত পিঠে হাত বুলাইবে।

বনমালীর চোখ সজল হইয়া উঠে। তার বাপও ছিল এমনি একজন কিন্তু সে আজ নাই। একদিন রাতের মাছধরা শেষে ভিজা জাল কাঁধে করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। পথের মাঝে তুফানে গাছ-চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

ছইয়ের বাহিরে বাঁশের মাচানগুলিতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া ভাঙিয়া চৌচির—শতচির হইয়া পড়িতেছে। নৌকার বাহিরে যতদুর চোখ যায় সবটাই তিতাস নদী। তার জলের উপর বৃষ্টির লেখা জোখাহীন ফোঁটাগুলি পাথরের কুচির মত, তার বুকে গিয়া বিঁধিতেছে আর তারই আঘাত খাইয়া ফোঁটার চারিপাশটুকুর জল লাফাইয়া উঠিতেছে। হাওয়া নাই, জলে ঢেউ নাই। তবু নদীর বুকময় আলোড়ন। আর, একটানা ঝা ঝা ঝিম ঝিম শব্দ। ছইয়ের সামনের দিক খোলা। এদিক দিয়া বাতাস ঢোকে না বলিয়া জলের ছাঁটও ঢোকে না। যে দিক দিয়া ঢুকিবার, সে পিছনের দিক। সেদিক বন্ধ আছে। কাদিরের চক্ষু ছিল নৌকার বাতার বাহিরে, যেখানে কোন সুদুর হইতে তীরের বেগে ছুটিয়া আসা ফোঁটাগুলি তীরের মতই তিতাসের বুকে বিঁধিয়া আলোড়ন জাগাইতেছে। বনমালী তার গামছাখানা খানিক বৃষ্টির জলে ধরিয়া রাখিয়া, চিপিয়া জল নিংড়াইয়া কাদিরের হাতে দিয়া বলিল, 'নেও বেপারি, গতর মোছ।' কাদির সস্নেহে তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বনমালীকে নিতান্ত ছেলেমানুষটির মত দেখাইতেছে, অথচ মালোর বেটার দেহের পেশীগুলি কেমন মজবুত।

'বেপার আমার বংশের কেউ করে নাই বাবা। চরের জমিতে আলু করছি। শনিবারে শনিবারে হাটে গিয়া বেচি। বেপারির কাছে বেচি না। বড় দরাদরি করে আর বাকি নিলে পয়সা দেয় না।'

'মাছ-বেপারিরাও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জাগায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।'

কাদিরের দৃষ্টি সামনের দিকে, যেখানে বৃষ্টির বেড়াজালে সব কিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'কি ঢল নামছে রে বাবা, গাঁও-গেরাম মালুম হয় না।' তাহার তামাক খাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। এই সময়েই অন্তর্যামী বনমালী নামক ছেলেটা তামাকের ব্যবস্থায় হাত দিল। বাঁশের চোঙার এক দিকে টিকা, আর এক দিকে তামাক রাখার ব্যবস্থা। কাদিরের ছেলে এইবার ভাবনায় পড়িল। সে যখন আরও ছোট ছিল, তখন বাপের সঙ্গে গ্রাম গ্রামান্তরের কত বামুন কায়েতের বাড়িতে দুধ বেচিতে গিয়াছে।

তারা তার বাপকে আদর করিয়া ডাকিয়া বসায়। নিজেরা চেয়ারে বসিয়া ছেলেপুলের হাতে একখানা ধূলিধূসর তক্তা আনাইয়া মুখে মিষ্টি ঢালিয়া দিয়া বলে, 'বও বও, কাদির বও। তামুক খাও।' তাদের নিজেদের হাতে তেলকুচকুচে মসৃণ হুকা। কাদিরের জন্য বাহির করিয়া দেয় মাচার তলায় হেলান-দিয়া-রাখা সরু খামচাখানেক আকারের থেলো। কাদির আলাপী মানুষ। বলিতে যেমন ভালবাসে শুনিতেও তেমনি ভালবাসে। আলাপে মজিয়া গিয়া লক্ষ্যই করে না কোথায় বসিল আর কি হাতে লইল। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া হুকার মুখে মুখ লাগায়। তার বাপ মাটির মানুষ, তাই অমন পারে। ওরা বড় লোক। তেলে জলে যেমন মিশে না, তাদের সঙ্গেও তেমনি কোনোদিন মেশার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরা জেলে। চাষার জীবনের মতই এদের জীবন। উঁচু বলিয়া মানের ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না এদের উপর; বরং সমান বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেই ভাল লাগে। কাটিলে কাটা যাইবে না, মুছিলে মুছা যাইবে না, এমনি যেন একটা সম্পর্ক আছে জেলেদের সঙ্গে চাষীদের। বনমালী তামাক সাজার আয়োজন করিতেছে। নিজের হুকায় সুখের টান দিয়া, সে যদি কলকেখানা খুলিয়া তার বাপের দিকে হাত বাড়ায়, সে তখন কি করিবে; বড়লোকের হাতের অপমানে চটা যায়, কিন্তু সমান লোকের হাতের অপমানে চটা যায় না, খালি ব্যথার ছুরিতে কলিজা কাটে।

এই ঘনঘোর বাদলের মাঝখানে বসিয়া মাথা বাঁচাইতে বাঁচাইতে কাদির হয়ত বনমালীর হুকা-বিচ্যুত কলিকাখানা খুশি মনে হাতে লইত। কিন্তু বনমালী মালসায় হাত দিয়া দেখে জলের ছাঁট লাগিয়া আগুনটুকু নিবিয়া গিয়াছে।

নদীর মোড় ঘুরিতে বাজার দেখা গেল। একটু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন চারিদিক ফর্সা। কিন্তু রোদ উঠে নাই। আকাশের কোন কোন দিক গুমোটে আচ্ছন্ন। মনে হয় কোথায় কোথায় যেন এখনও বৃষ্টি হইতেছে। এক একবার দমকা হাওয়া আসে। ঠান্ডা লাগে শরীরে। মেহনতের সময় এই বাতাস গায়ে বড় মিঠা লাগে। নৌকা একেবারে তীর ঘেঁষিয়া না চলিলেও, তীরের গাছ-গাছড়ার সবুজ ছায়া কাদিরের নৌকার ধমকে জলের ভিতর কাঁপিয়া মরিতেছে। ছায়াগুলি এত কাছে থাকিয়া কাঁপিতেছে, আর কাদিরের ছেলের বৈঠার আঘাত খাইয়া ভাঙিয়া শত টুকরা হইয়া যাইতেছে।

নদীর এ বাম তীর। দক্ষিণ তীর ফাঁকা। গ্রাম নাই, ঘর বাড়ী নাই, গাছ-গাছড়া নাই। খালি একটা তীর। তীর ছাড়াইয়া কেবল জমি আর জমি। অনেক দূরে গিয়া ঠেকিয়াছে ধোঁয়াটে কতকগুলি পল্লীর আবছায়ায়। যে সব খোলা মাঠ বাহিয়া বাতাস আসে, নদী পার হইয়া লাগে আসিয়া এ পারের গাছগুলির মাথায়।

ছোটবড় দুইটি নৌকাই একসঙ্গে গিয়া হাটের মাটিতে ধাক্কা খাইল।

পশ্চিম হইতে সোজা পূর্বদিকে আসিয়া এইখানটায় নদী একটা কোণ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই কোণের মাটিই বাজারের 'টেক'। তারই পূর্বদিক দিয়া একটা খাল গিয়াছে সোজা উত্তর দিকে সরল রেখার মত। নদীর বাঁক থেকে খালটা গিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় নদী চলিতে চলিতে এখানে দক্ষিণদিকে মুখ ঘুরাইয়াছে আর উত্তর দিকে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে তার মাথার লম্বা বেণীটা।

সেই খালের পূর্ব পারে একটা পল্লী নাম আমিনপুর। একদিকে কয়েকটা পাটের অফিস, আরেক দিকে কতকগুলি ঘরবাড়ি গাছ-গাছালি। খালের এপারে হাট বসিতেছে,

আর ওপারে গাছ-গাছালির মাথার উপর দিয়া আকাশে উঠিয়াছে একটা রামধনু। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পূবের আকাশে কণাকণা বৃষ্টির আভাসে ঝাপসা একটা ঠাণ্ডা ছায়া লাগানো। পশ্চিমের সূর্যের সাত রঙ পূবের আকাশের মেঘলার ফাঁদে ধরা পড়িয়া গিয়া উঠাইয়াছে এই রামধনু।

মাত্র ঘন্টা দুই আগে যে বৃষ্টি হইয়াছে তেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি খুব কমই দেখা যায়। নৌকাতে থাকিয়া ততটা বোঝা যায় না। বাড়িতে থাকিলে দেখা যাইত ঘরের চালের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে; চাল-বাহিয়া-পড়া একটানা বৃষ্টির জলে ছাঁচে লম্বা এক সারি গর্ত হইয়া গিয়াছে। কোথাও কোন নালা আটকাইয়া গিয়া উঠান জলে ভরিয়া গিয়াছে, তুলসীতলার উঁচু মাটিটুকু বাদে ভিটার নীচের সবটুকু জায়গা ডুবিয়া গিয়াছে; উঠানের কোণে অযত্নে যে-সব দূর্বাঘাস গজাইয়াছিল, সেগুলি জলে সাঁতার কাটিতেছে।

খালটা শুকনা ছিল। আজিকার ঢলে মাঠময়দান ভাসিয়াছে, হালদেওয়া ক্ষেতগুলির ভাঙা ভাঙা মাটি ঢলে গুলিয়া গিয়া কাদা হইয়াছে। সেই কাদাগোলা জল আল উপচাইয়া পড়িয়াছে আসিয়া খালে। শত দিক হইতে শত বাহু বাড়াইয়া দিয়া ক্ষেতেরা খালের দৈন্যদশা প্রাচুর্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খালে তখন উজানের ঠেলা। যে-খাল আগে নদীর জল টানিয়া নিয়া কোনরকমে শুকনা গলা ভিজাইয়া রাখিত, আজ সে খাল উল্লোসিত, কল্লোলিত, উথলিত হইয়া স্রোত বাঁকাইয়া ঢেউ খেলাইয়া বুক ফুলাইয়া তার ভরা বুকের উপচানো জল তিতাসের বুকে ঢালিয়া দিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সে দেওয়া এখনও থামে নাই। এখনও ধারায় ছুটিয়া আসিতেছে সেই কাদাগোলা জল।

কাদিরের পিপাসা হইয়াছিল। আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দেখে অর্ধেক তার মাটি। বনমালী দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল; 'থইয়া দাও, খাইতে পারবা না। খালের জলে গাঙের জলেরে খাইছে। মালো-পাড়ায় আমার কুটুম আছে। আলু তোলার পর নিয়া যামু তোমারে।'

'কি কুটুম? সাদি সম্বন্ধ করছ না কি?'

'না। ভইন বিয়া দিছি।'

বনমালীর সাহায্য পাইয়া কাদিরের সব আলু এক দণ্ডের মধ্যে হাটে গিয়া উঠিল। চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে এইজন্য কাদিরের ছেলে জলো-গাসের ন্যাড়া বানাইয়া আলু গাদার চারিপাশে গোল করিয়া বাঁধ দিল। সেই বাঁধ ডিঙাইয়া দুই চারিটা ছোট ছোট আলু এপাশ-ওপাশ ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। আর সেগুলি মালিকের অধিকারের বাইরে মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিতেছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভিখারীর ছেলে নয়, কিন্তু দেহের আকারে, বসনের অপরিচ্ছন্নতায় ও অপ্রাচুর্যে এবং অস্বাভাবিক কাঙালপনায় সেগুলিকে মনে হইল যেন ভিখারীর বাড়া।

ইহারা সবখানেই আছে, সব দেশে সব গাঁয়ে আর সব গাঁয়ের বাজারে। কাদিরেরা যারা আলু বেচিতে আসে তারা অমন দুই চারিটা আলুর জন্য ইহাদিগকে ধমক দেয় না, কিছু বলেও না। তাদের কত আলু, নিক না দুইচারিটা এই সব দুঃখীর ছেলেপিলে। পয়সা দিয়া ত কিনিতে পারে না।

কিন্তু ধমক দেয় বেপারীরা। আলুতে হাত দিলে চড়-চাপড় মারে, আলু কাড়িয়া নেয়; শুধু তাদের থেকে নেওয়া আলু নয়, অপর জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আলুও কাড়িয়া নেয় বেপারীরা। আর ছোট ছোট কচি গালগুলিতে মারে ঠাস করিয়া চড়। চড় খাইয়া ইহারা চীৎকর করিয়া কাঁদে না, গাল-মুখ চাপিয়া ধরিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়ে আরও মার খাওয়ার ভয়ে। কেবল যখন তাদের নিজের সঞ্চয় সুদ্ধ কাড়িয়া নেয়, কাকুতি করিয়া ফল হয় না, অনুরোধ করিলে উল্টা গাল খায় মা-বাপ সম্পর্কিত অশ্রাব্য ভাষায়, তখন কেবল অনুচ্চকণ্ঠে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে।

কাদির এ হাটে অনেক আলু বেচিয়াছে আর অনেক দিন হইতে ইহাদিগকে দেখিয়া আসিতেছে। বছরের পর বছর ইহারা আলু কুড়াইয়া চলিয়াছে, কতক মরিয়াছে, কতক বড় হইয়া সংসারে ঢুকিয়াছে, না হয়ত পুঁজিদার কারবারী নয়তো জমি-মালিক মজুর খাটানেওয়ালা বড়-চাষীর গোলামি করিয়া জান প্রাণ খুয়াইতেছে। কাদিরকে ইহারা আর চিনিতে পারিবে না, কাদিরও ইহাদের কাউকে সামনে দেখিলে ঠাহর করিতে পারিবে না।

কিন্তু তার বেশ মনে পড়ে, হাটের মাটিতে আলু ঢালিতে গিয়া ইচ্ছা করিয়া দশটা-বিশটা আলু এইসব কৃপা-প্রার্থীর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এখনও দিতে কৃপণতা করে না। হাটে প্রথম আলু উঠিয়াছে দেখিয়া এই ক্ষুদে ডাকাতের দল সবগুলি জোট পাকাইয়া আসিয়া এইখানে মিলিয়াছে। কারো হাতে ন্যাকড়ার একখানা ছোট থলে; পুরনো কাপড়ের লাল নীল পাড়ের সূতা দিয়া অপটু হাতের সূঁচের ফোঁড়ে তৈরি। কারো হাতে মালসা কারো বা কোঁচড়মাত্র সম্বল।

কি ভাবিয়া সহসা কাদির কল্পতরু হইয়া উঠিল। তাহার হয়ত ইচ্ছা হইয়াছিল ওদের হাতে অনেকগুলি আলু সে বিলাইয়া দেয়। কিন্তু সাবালক বড় ছেলে সামনে। কি মনে করিবে। বিক্রি করিতে হাটে আসিয়াছে, খয়রাত করিবার কোন অর্থ হয় না। ইচ্ছা করিয়া খুশি মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঘাসের বাঁধ উপচাইয়া কতকগুলি আলু চারিপাশে ছড়াইয়া দিল ওদের জন্য। ছেলের দৃষ্টি এড়াইলনা, 'না করলাম বোয়ানি, না করলাম সাইত; তুমি বাপ অখনই এইভাবে দিতে লাগছ!'

কাদির অজুহাত পাইল সঙ্গে সঙ্গেই, 'কাটা-আলু খরিদ্দারে নেয় না, বাছাবাছি কইরা থুইয়া রাখে। দিয়া দিলাম।'

ছেলে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, 'কিন্তু সাইত করলাম না'।

কাদির দিল-খোলা ভাবে হাসিয়া বলিল; 'করলাম এই এতিম ছাইলা-মাইয়ার হাতে পরথম সাইত। খাইয়া দোয়া করব। আল্লা বড় বাঁচান বাঁচাইছে আইজ।'

কাদিরের এই কাজকর্ম বনমারীর খুব ভাল লাগিতেছিল। বিস্ময়ের সহিত কাদিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাদির বনমালীর দিকে চাহিয়া তার ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'বড় আভাগ্যা এরা। কেউর মা নাই, বাপ নাই, লাখি ঝাঁটা খায়; কেউর মা আছে, কিন্তু দানা দিতে পারে না। কেউর বাপ আছে মা নাই। লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু।'

তামাক জ্বালাইয়া আনিয়াছিল। টিকায় ফুঁ দিতে দিতে বনমালী বলিল, 'একজনের যে মা মরছে, চোখের সামনেই দেখতাছি।'

কাদিরের দৃষ্টি পড়িল ছেলেটার দিকে। লম্বা, কৃশ, হাড় জিরজির করিতেছে। শিশুমুখেও মলিনতার ছাপ বেয়াড়া রকমের স্পষ্ট। দলের বাহিরে দাঁড়াইয়া বড় বড় চোখ দুইটি মেলিয়া রাখিয়াছে কাদিরের মুখের উপর। ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া হরির লুটের বাতাসার মত আলু ধরিতেছিল,আর সে নীরবে দাঁড়াইয়া আশাপূর্ণ মনে কামনা করিতেছিল কাদির বুড়ার মনের একটুখানি ছোঁয়া। যেন তাকে দেখিতে পাইলে অন্যান্য ছেলেদের থেকে আলাদা করিয়া শুধু তার একার জন্য বুড়ো করুণার ধারা বহাইয়া দিবে। এ যেন তার দাবি। চিরদিনের নির্ভরতা মাখানো এই দাবি দুনিয়া যদি পূর্ণ করে তবে ভালো কাজ করা হইবে, যদি না করে তো না করিবে, সে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এখান থেকে চলিয়া যাইবে।

কাদির দুই মুঠা আলু তুলিয়া তার চোখের দিকে চাহিয়া একদিকে সরিয়া আসার ইঙ্গিত করিল। তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্বচ্ছ আবদেরে হাসি; কিন্তু বড় ম্লান। সর্বাঙ্গে মাতৃরিষ্টির ধ্বজা ধারণ করিয়া সে ছিল নীরবে দণ্ডায়মান। কাদিরের ডাকে সহসা সে আগাইয়া আসিল না। দান প্রত্যাখ্যানের ভব্যতা।

'আরে নে, আগাইয়া ধর; না অইলে তারা নিয়া যাইব।'

ছেলেটা আদরে গলিয়া গিয়া ঘাড় নিচু করিল, তারপর ঘাড় ঘুরাইয়া অর্থহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল, আর চাহিল মাথা তুলিয়া একবার সামনের, খাল পারের, আমিনপুর গ্রামের উপরের পূর্ব আকাশের দিকে। কাদিরের অযাচিত দানের ধনগুলি তখন তার পায়ের কাছে মাটিতে লুটাইতেছে, আর সেই যে সে আকাশের দিকে চাহিল, একভাবে চাহিয়াই রহিল, মাথা আর নামাইতে পারিল না। কদির তার চাওয়ার বস্তুর খোঁজে তাকাইল, কিছু বুঝিতে পারিল না। বনমালী তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, আমিনপুরের গাছপাছালির মাথার উপর দিয়া আকাশে রামধনু উঠিয়াছে। ছেলেটা তারই দিকে চাহিয়া আছে।

'অ, ধেনু উঠছে। তাই দেখতাছে।' বলিল, বনমালী। জেলে সে। জেলেরা আর চাষীরা জল আর মাটি চষিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশের নীচে। উদয়ের মাধুরী আর অস্তের বিধুরতা কোনদিন গোপন থাকে না তাদের কাছে। কিন্তু তারা কি সে সব কখনো চাহিয়া দেখিয়াছে? দেখিয়াছে কেবল দুপুরের খরাটাকে, যখন মাথার উপর আগুনের মত আসিয়া পড়িয়াছে তখন।

শীতে শরতে সকালে বিকালে আকাশের গায়ে খামচা খামচা কত রঙিনী মেঘ ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে সূর্য চোখ মেলিলে তার বিপরীত দিকের আকাশে জাগিয়াছে কতদিন কত রামধনু। তারা কি কোনোদিন তাহা চাহিয়া দেখিয়াছে? হয়ত দেখিয়াছে। কিন্তু নতুন কিছু লাগে নাই চোখে। উঠে, মিলাইয়া যায়। চাহিয়া থাকিয়া দেখিবার কিছু নাই রামধনুতে। শিশুরা মায়ের কোলে থাকিয়া আকাশে চাঁদ দেখিয়া হাসে, হাততালি দেয়। কই বনমালীরা তো কোনোদিন চাঁদ দেখিয়া হাসে, হাততালি দেয়। কই বনমালীরা তো কোনোদিন চাঁদের দিকে চাহিয়া হাসেও নাই হাততালিও দেয় নাই।

কাদির মিয়াদের ঈদের চাঁদ দেখিবার কত আগ্রহ। কত আনন্দ আর পুণ্যের বাণী লইয়া আকাশের এক কোণে উঁকি দেয় রমজানের চাঁদ। একফালি দুর্বল, প্রভাহীন

চাঁদ—চাঁদের কথা বলিলেই চলে। কিন্তু সে চাঁদ যখন বড় হইয়া আকাশে সাঁতার কাটে তখন তো কই তারা চাহিয়াও দেখে না।

তেমনি রামধনু দেখিবে বালকে, দেখিবে এই বোকা অর্বাচীন ভিখারী ছেলেটা। দেখুক সে রামধনু; আর এদিকে তার পায়ের কাছে থেকে ছড়ানো আলুগুলি আর আর ছেলেরা কুড়াইয়া নিয়া যাক। বনমালীর ইচ্চা হইল আলুগুলি কুড়াইয়া দেয়। কিন্তু নাবালকের দেখাদেখি রামধনুর দিকে চাহিয়া সেও নাবালক হইয়া গেল।

সত্যই-ত, রামধনু দেখিতে অত সুন্দর। তার বোনটি যখন ছোট ছিল, সেও একদিন তেমনি করিয়া রামধনুর দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে অমন বোকার মত সব ভুলিয়া চাহিয়া থাকে নাই। হাতে নতুন দুগাছা কাঁচের চুড়ি কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাই বাজাইয়া হাততালি দিতেছিল আর একটা ছড়া কাটিতেছিল, 'রামের হাতে ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা।'

মেয়েদের ধারণা, এই মন্ত্র পড়িলে রামধনু মিলাইয়া যাইবে। বোনটিকে কতদিন ধরিয়া দেখিতে যাওয়া হয় নাই। এই গাঁয়েই তার বিবাহ হইয়াছে। এই হাটের অল্প দূরেই তার স্বামীর বাড়ি।

বিরাট আকাশের ধনু। আকাশের দুই কোন ছুঁইয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। মোটা তুলির যেন সাত রঙের সাতটি পোঁচ। বাঁকিয়া উঠিয়াছে। রঙগুলি সব আলাদা আলাদা, আর কি স্পষ্ট! পিছনের আকাশ হইতে খসিয়া যেন আগাইয়া আসিয়াছে। যত অস্পষ্টতা যত আবছায়া অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, দিক উজ্জ্বল করিয়া বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে এই রামধনুটা। কি উজ্জ্বল বর্ণ। কি স্নিগ্ধ আর সামঞ্জস্যপূর্ণ তার রঙের ভাঁজ। কোন্ কারিগর না জানি এই রঙের ভাঁজ করিয়াছে। চোখে কি ভালো লাগে; কি ঠাণ্ডা লাগে। কোথায় ছিল এতক্ষণ লুকাইয়া। কোথাও তো ছিল না। এখন কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল! চাঁদসুরুজের দেশ এটা। তারা নিত্য উঠে, নিত্য অস্ত যায়। পশ্চিমে ডুবিয়া ঘুমাইয়া থাকে, আবার সকালে পূর্বে উদয় হয়। কিন্তু রামধনু থাকে কোথায়? বড় একটা ত দেখা যায় না। অনেকদিন পর দেখা যায় একদিন উঠিয়াছে। কতদিন ঘুমায় এ ! কুম্ভকর্ণের মত ! উঠিবারও তাল-বেতাল নাই। ইচ্ছা হইলে একদিন উঠিলেই হইল। কিন্তু, কি বড়! বোন ঠিকই বলিয়াছিল তার ছড়াতে—রামের হাতেরই ধনু এটা। যে-ধনু অমন যে রাক্ষস, দশমাথা কুড়ি হাতের রাক্ষস,—জোর করিয়া সে ধনু তুলিতে গিয়া তারও মুখে রক্ত উঠিয়াছিল।

রামায়ণের বইয়ের সে কথা বনমালী শুনিয়াছে সীতার বিবাহের পালা গানে ছুটা-কীর্তনিয়ার মুখে। শেষে রাম তাকে হাতে তুলিয়া নেয়। হরধনু না কি বলিয়াছিল—তাই রামের হাতের ধনু। কিন্তু সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুঁছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত। তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল। রাম তাকে নিয়া অযোধ্যাতে আসিল। তারপর সীতা আর বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসে নাই। নাঃ, বোনটাকে দেখিতে যাইতেই হইবে। কতদিন তাকে নেওয়া হয় নাই।

কতক্ষণ পরে রামধনু মিলাইয়া গেল আকাশে। কিন্তু রাখিয়া গেল অনন্তর মনে একটা স্থায়ী ছাপ। কোনোদিন দেখে নাই। মায়ের কাছে গল্প শুনিয়াছিলঃ মানুষের অগম্য এক দ্বীপ-চরে এক জাহাজ নোঙর করিয়াছিল। খাইয়া দাইয়া লোকগুলি

ঘুমাইয়াছে, অমনি চারিদিক কাঁপাইয়া ধপাস ধপাস শব্দ হইতে লাগিল। আকাশ হইতে পড়িল কয়েকটা দেও-দৈত্য। এরা ছাড়াও আরও কত কিছু আছে, যারা মানুষ নয়; মানুষের মধ্যে, মানুষের বাসের এই দুনিয়ার মধ্যে যাদের দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেও-দৈত্য তো ভয়ের জিনিস। কত ভালো জিনিসও আছে তাদের মধ্যে। সকলেই তারা এই আকাশেই থাকে। এই যেমন চন্দ্র, সূর্য, তারা। তাহারাও আকাশেই থাকে। নিত্যি উঠে নিত্যি নামে, দেখিতে দেখিতে চোখে প্রায় পুরানো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেরই রহস্যভেদ এখনও করা হয় নাই। অলৌকিক রহস্যভরা অনন্তর আকাশ-ভুবন। আজও তাদেরই একটা আদেখা রসহ্যজনক বস্তু তার চোখের সামনে নামিয়া আসিয়াছিল পিছনের অনেক দূরের আকাশ হইতে, অদেখার কোল হইতে একেবারে নিকটে, আমিনপুরের জামগাছটার প্রায় মাথার কাছাকাছি।

বনমালীর মন হইতেও কল্পনার রামধনু মুছিয়া গেল; কেউ বুঝি নামাইয়া দিল তাকে বাস্তবের মুখে। ছেলেটার গায়ের রঙ ফর্সা। কিন্তু খড়ি জমিয়া বর্ণলালিত্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এক চিলতা সাদা মাঠা-কাপড় কটিতে জড়ানো। আর এক চিলতা কাঁধে। বিঘৎ পরিমাণ একখানা কুশাসন ডানহাতের মুঠায় ধরা। নৌকা গড়িবার সময় তক্তায় তক্তায় জোড়া দেয় যে দুইমুখ সরু চ্যাপ্টা লোহা দিয়া, তাহারই একটা দুইমুখ এক করিয়া কাপাস সূতায় গলায় ঝুলানো। পিতামাতা মারা যাওয়ার পর মাসাবধি হবিষ্য করার সন্তানের এই সমস্ত প্রতীক।

বনমালী দরদী হইয়া বলে, 'তোর নাম কি রে?'

'অনন্ত।'

'অনন্ত কি? যুগী, না পাটনী, না সাউ, না পোদ্দার?'

অনন্ত এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

'তোর মা মরছে না বাপ মরছে?'

'মা।'

'কোন্ হাটি বাড়ি তোর্?'

আঙুল দিয়া মালোপাড়া দেখাইয়া দিল।

'জাতে তুই মালো? আমরার স্বজাতি?'

অনন্ত ভাল করিয়া কথাটা বুঝিল না। আবছাভাবে বুঝিল, তার মাসীর মত, এও তারই একটা কেউ হইবে। তা না হইলে অত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন?

'তোর বাড়িত লইয়া যাইবি আমারে?'

গলার ধড়ার সূতাটা দাঁতে কামড়াইতে কামড়াইতে ঘাড় কাৎ করিয়া অনন্ত জানাইল, হাঁ, নিয়া যাইবে।

'বাজার জমছে। চল্ তোরে লইয়া বাজারটা একবার ঘুইরা দেখি।'

বাজারের তখন পরিপূর্ণ অবস্থা। কাদিরের দোকানের চারিপাশে অনেক আলুর দোকান বসিয়াছে। গণিয়া শেষ করা যায় না। ক্রেতাও ঘুরিতেছে অগণন। হাতে খালি বস্তা লইয়া তাহারা দরদস্তুর করিতেছে আর কিনিয়া বস্তাবন্দী আলু মাথায় তুলিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাজারের বাহির হইতেছে। একটানা একটা কলরব শুরু হইয়া গিয়াছে। কাছের মানুষকে কথা বলিতে হইলেও জোরগলায় বলিতে হয়, কানের কাছে মুখ নিয়া।

কাদির বড় এক পাইকার পাইয়াছে। খুচরা বিক্রীতে ঝামেলা। অবশ্য দর দুই চারি পয়সা করিয়া মণেতে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু মণামণি হিসাবের বিক্রি তার চাইতে অনেক ভাল। আগেভাগে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়া যায়। বয়স্কদের ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অনন্তর সঙ্গীরা হাট ঘন হইয়া জমার মুখেই সরিয়া পড়িয়াছে। অনন্ত চাহিয়া দেখে সচল চঞ্চল এক জনসমুদ্রের মধ্যে সে একা। বালক অনন্তর ইচ্ছা করে বনমালীর একখানা হাত ধরিতে।

কাদির শক্তহাতে দাড়িপাল্লা তুলিয়া ধরিল, একদিকে চাপাইল দশসেরী বাটখারা, আর একদিকে ডুবাইয়া তুলিল আলু। আর মুখে তুলিল কারবারীদের একটা হিসাবের গৎ ঃ আয়, লাভে রে লাভে রে লাভে রে লাভে, আরে লাভে! আয়, দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে, আরে দুয়ে! আয়, তিনে রে তিনে রে তিনে রে তিনে, আরে তিনে–

বেচা-বিক্রি চুকাইয়া কাদির বলিল, 'বাবা বনমালী, যাইও একবার বিরামপুরে, কাদির মিয়ার নাম জিগাইলে হালের গরুতে অবধি বাড়ি চিনাইয়া দিব। যাওই।'

গুণটানা নৌকার মতন বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছে। এই বাজারের ভিতর দিয়া অনন্ত রোজ চারিবার করিয়া হাঁটে। কিন্তু ভরা হাটের বেলা সে কোনদিন এখানে ঢোকে নাই। আজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এক জায়গায় বসিয়াছে পানের দোকান। দোকানের পর দোকান। বড় বড় পান গোছায় গোছায় ডালার উপর সাজানো। কাছে একটা গাঁড়িতে জল; দোকানীরা বার বার হাত ডুবাইয়া জল পানের উপর ছিটাইয়া দিতেছে, আর যত বেচিতেছে পয়সা সেই হাঁড়িটার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতেছে। বনমালী খুব বড় দেখিয়া এক বিড়া পান কিনিয়া অনন্তর হাতে দিল। হাতে লইয়া অনন্তর চোখ জলে ভরিয়া আসিতে থাকে। বনমালীকে বুক খুলিয়া শুনাইতে চায় ঃ হাটের দিন দুপুরের আগে এই দোকানীটা নৌকা হইতে পান তুলিয়া ভাঁজ করিতে বসে। একখানা চৌকির উপর বসিয়া পানের গোছা হাতে করিয়া তার মধ্য হইতে পচা আধ-পচা পানগুলি ফেলিয়া দেয়। সঙ্গীদের লইয়া সে কতদিন এই ছেঁড়াকোচা পচা পানগুলি কুড়াইয়া নিয়াছে। মা কোনদিন পয়সা দিয়া পান কিনিয়া খাইতে পারে নাই। তার হাতের কুড়ানো পচা-পান পাইয়া মা কত খুশি হইয়াছে।

একদিন অনন্ত তিতাস হইতে সেই লোকটাকে এক হাঁড়ি জল তুলিয়া দিয়াছিল। দোকানী সেদিন পচা-পান তো দিলই, সামান্য একটু দাগী হইয়াছে, একটু ছিড়িয়া ভাল পানের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে কেহ ধরিতে পারে না, এমন পানও তার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সেও অভ্যাসবশে ধরিয়াছে, কিন্তু তখন আর তাহার মা নাই। এই রকম ভাল ভাল পান ফেলিয়া দিবার কিছুদিন আগেই একদনি মা মরিয়া গেল। মাসী পান বড় একটা খায় না। দিলেও খুশি হয় না, না দিলেও রাগ করে না। মাসীর মা খায়–দিলে খুশি হয় না, না দিলে মারে।

কিন্তু এ সকল কথা এ লোকটাকে কি বলা যায়! মোটে একদিনের দেখা। আর দোকানিটা নিশ্চয়ই আমাকে মনে রাখিয়াছে। তার পাশে কত ঘুরিয়াছি আধ-পচা পানের জন্য। মনে কি আর রাখে নাই? সব সময়ই তো মনে ভাবিয়াছে এ ছেলেটা খালি আধ-পচা পানই নিবে। ফেলিয়ে দেওয়া পান। কোনদিন পয়সা দিয়া কিনিতে

পারিবে না। আজ সে দেখুক তার ডালার সব চাইতে দামী পানের বড় একটা গোছা তার হাতে। পয়সা দিয়া কেনা।

সুপারির গলি হইতে বনমালী কিছু কাটা-সুপারিও কিনিল। আরেক জায়গাতে কতকগুলি গেঞ্জির দোকান। মলাটের বাক্স খুলিয়া মাটির উপর বিছানো চটে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বুকে ফুলকাটা একটা গেঞ্জি কিনিল বনমালী। গলা হইতে বুক পর্যন্ত বোতামের এলাকায় লম্বা একটা সবুজ লতা, তাতে লাল ফুল ধরিয়াছে। এতক্ষণ খালি গা ছিল। এবার নতুন গেঞ্জিতে বনমালীকে রাজপুত্রের মত মানাইয়াছে বলিয়া অনন্ত মনে মনে আন্দাজ করিল। লতাটাও কত সুন্দর।

আরও সুন্দর বাজারের এদিকটা। মাঝখানে পায়ে চলার জায়গা খালি রাখিয়া দুইপাশে তারা পসরা সাজাইয়াছে। চলতি কথায় ইহাদিগকে বেদে বলে, কিন্তু সাপুড়ে নয়। অত্যন্ত লোভনীয় তাদের দোকানগুলি। এক ধারে অনেকগুলি কোমরের তাগা। পোষমানা সাপের মত শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কতক কালো, আর কতক হলদে লালে মিশানো। মাথায় এক একটা জগজগার টোপর। একদিকে এলাইয়া রাখিয়াছে কতকগুলি আরসি। একদিকে নানা রঙের ও নানা আকারের সাবান। আর একখানে পুঁতির মালা, রেশমী ও কাঁচের চুড়ি। আরও অনেক কিছু। এক একটা দোকানে এত সামগ্রী। বনমালী পাশে বসিয়া দুই তিনটা সাবানের গন্ধ শুঁকিয়া বলিল, জলে-ভাসা সাবান আছে? আছে শুনিয়া গন্ধ শুঁকিয়া দর করিয়া রাখিয়া দিল। কাঁচের চুড়ির মধ্যে তিন আঙ্গুল ঢুকাইয়া মাপ আন্দাজ করিল, তারপর রাখিয়া দিল। কিনিল না। কিনিল খালি কয়েকটা বঁড়শি। এক কোণে কতকগুলি বাল্যশিক্ষা, নব-ধারাপাত বই। অনন্ত ইত্যবসরে বসিয়া পাতা উল্টাইতে শুরু করিয়া দিল। দুইটা গরু নিয়া এক কৃষক চাষ করিতেছে ছবিটাতে চোখ পড়িতে না পড়িতে দোকানী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। অনন্তর আর দেখা হইল না।

বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ধনঞ্জয়কে বলিল, 'গাঁওয়ের নাপিতে চুল কাটেনা, যেমন রান্দা দিয়া পালিশ করে। নাওয়ে গিয়া থাইক্য, চুল কাটাইতে গেলাম।'

নাপিতের উঁচু ভিটাখানিতে গিয়া দেখা গেল কতক নাপিতের হাতের কাঁচি, চিরুণির উপর দিয়া কাচুম কাচুম করিয়া বেদম চলিয়াছে, আর কতক নাপিত ক্ষুর কাঁচি চিরুণি এবং নরুণ লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাথায় অগোছাল লম্বা চুল দেখিয়া বনমালীর উদ্দেশ্য তারা বুঝিল। বুঝিয়া নানা জনে নানা দিক হইতে তাহাকে ডাকিতে লাগিল। অনন্তর মাথার চুলও বেশ লম্বা হইয়াছে; কিন্তু তাহার গলায় ধড়া দেখিয়া কেহ তাহাকে ডাকিল না।

চুলকাটা শেষ করিয়া দেখে বেলা ডুবিয়া গিয়াছে। নাপিত একখানা ছোট আয়না বনমালীর হাতে তুলিয়া দিল, কিন্তু তার ভিতর দিয়া তখন কিছুই দেখা যায় না। অপ্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িল বনমালী। আবার অনন্তকে হাতে ধরিয়া বাজার-সমুদ্র পার করিয়া ঘাটের কিনারায় আনিল। হাট তখন ভাঙিয়া পড়িতেছে। ধনঞ্জয় একছালা গাব, দুইটা বাঁশ, সপ্তাহের মত হলুদ লঙ্কা লবণ জিরা মরিচ কিনিয়া তৈরি হইয়া আছে।

বনমালী মনে মনে বলিল, আজ আর ও-পাড়ায় যাইব না। রাত হইয়া গিয়াছে, আর একদিন আসিলে যাইব। প্রকাশ্যে বলিল, 'হেই পুলা, তুই আমার নাওয়ে যাইবি? আমি খালে-বিলে জাল লইয়া ঘুরি, মাছ ধরি মাছ বেচি, নাওয়ে রান্ধি নাওয়ে খাই। সাত দিনে একদিন বাড়িত যাই। যাইবি তুই আমার নাওয়ে?'

অনন্ত ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, হাঁ যাইবে।

'চল্ তা হইলে।'

অনন্ত নৌকায় উঠিবার জন্য জলে নামিল।

'আরে না না, অখনই তোরে নেমু না। তোর বাড়ির মানষেরে না জিগাইয়া নিলে, তারা মারামারি করতে পারে।'

অনন্ত ঘাড় দুলাইয়া বলিতে চাহিল, না কেহ মারমারি করিবে না।

'না না, তুই বাড়ি যা।'

অনন্ত জোর করিয়া নৌকার গলুই আঁকড়াইয়া ধরিল।

ধনঞ্জয়ের ধমক খাইয়া বনমালী নৌকায় গিয়া উঠিল, কিন্তু ছেলেটার জন্য তার বড় মায়া লাগিল। তাকে বাড়িতে আগাইয়া দিয়া আসা উচিত। এতক্ষণ সঙ্গে করিয়া ঘুরাইয়াছে।

ধনঞ্জয় লগি ফেলিয়া ঠেলা মারিলে, অনন্তর ছোট দুইখানা হাতের বাঁধন ছিন্ন করিয়া গলুই ডানদিকে ঘুরপাক খাইল এবং দেখিতে দেখিতে নৌকা অন্ধকারের মাঝে কোথায় চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না। বুকভরা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অনন্ত ডাঙায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চারিদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বাড়ির পথ তার চেনা। ভয়-ডরেরও কিছু নাই। তবু সে যেন কেমন মনে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছে। পা যেন তার বাড়ির দিকে চলিতে চায় না। বনমালীর শেষ কথা কয়টি রহিয়া রহিয়া তার কানে বার বার বাজিয়া উঠিতে লাগিল। তুই এখন বাড়ি যা। তোদের পাড়া আমি চিনি। আমার বোন বিয়া দিয়াছি তোদের পাড়াতে। আবার আমি আসিব।

তুমি বলিয়াছিলে আবার আসিবে, কিন্তু কখন আসিবে! আমার যে আর বাড়িতে যাইতে পা চলিতেছে না! কখন তুমি আসিবে।—

ভাবিবে ভাবিতে অনন্ত বাড়ির উঠানে পা দিল।

একটা পরিচিত গলার আওয়াজের আশঙ্কা সে করিতেছিল। শীঘ্রই সেটি শোনা গেল, 'তেলে-মরা বাতির মত নিম-ঝিম করে,— মরেও না। আইজ ত নিখোঁজ দেইখ্যা মনে করছিলাম, বুঝি পেরেতে ধরছে, অখন দেখি চান্দের ছটার মত হাজির! মনে লয় পোড়া কাঠ মাথায় মাইরা খেদাইয়া দেই, পোড়ামুখি মাইয়া আমার কাল করছে।'

সুবলার বৌ বাসন্তী একটু আগে নদীর পাড় হইতে খুঁজিয়া আসিয়া কাজে হাত দিয়াছিল। কিন্তু হাতে কাজ উঠিতেছিল না। দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, 'কি কও গো মা তুমি। মা-মরা, হাতে আগুন, মুখে হবিষ। তুমি কি সগল কথা কও। শত্রুরেও তো এমুন কথা কয় না।'

'শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম।'

সুবলার বউ এবার রণচণ্ডী হইয়া উঠিল, 'ইটা মরব কোন্ দুঃখে? তার আগে আমি মরি,—আমি ঘরের বাইর হই!'

মা হঠাৎ নরম হইয়া বলিল, 'অখন আর কিছু করলাম না। দিমু খেদাইয়া একদিন চেলাকাঠ পিঠে মাইরা।'

মাসী শুইয়া শুইয়া অনন্তকে আজ কতকগুলি নতুন কথা শুনাইলঃ মা যদি মরিয়া যায়, তবে সে মা আর মা থাকে না, শত্তুর হইয়া যায়। মরিয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, ছেলেকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সব সময়েই তার লক্ষ্য থাকে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত একমাস তো খুব ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়। তার আত্মা তখন ছেলের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না। একা পাইলে, কিংবা আঁধারে, কি বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, কিংবা নদীর পারে পাইলে, কাছে কেউ না থাকিলে লইয়া যায়। নিয়া মারিয়া ফেলে!

সেই রাত্রিতে অনন্ত মাকে স্বপ্ন দেখিল। মা কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথায় জড়াইয়া কোথা হইতে আসিয়া খালের পাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। অনন্তকে যে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কই, মারিয়া ফেলিবার মত জিঘাংসা, ক্রোধ কিছুইত তাঁর মধ্যে নাই, মা চাহিয়া আছে তার মুখের পানে বড় করুণ চোখে, বেদনায় কি মলিন মার মুখখানা! হাঁ, মা নিয়া যাইতে চায়; কিন্তু মারিয়া ফেলিবার জন্য নহে, কাছে কাছে রাখিবার জন্য। মার জন্য বড় করুণা জাগিল অনন্তর মনে।

হবিষ্য সাজাইতে সাজাইতে অনেক বেলা হইয়া যায়। কচি ছেলে। ক্ষুধায় আরও নেতাইয়া পড়ে। সুবলার বউ সবই বুঝে। কিন্তু কিছু করিবার নাই তার! বিধবা সে। বাপের সংসারে গলগ্রহ হইয়া আছে। তার উপর রক্তমাংসের সম্পর্কের লেশ নাই এমন একটা মা-মরা হবিষ্যের ছেলেকে আনিয়া ঝঞ্ঝাট পোহাইতেছে। শুধু কি নিজে ভুগিতেছে। বাপ-মাকেও ভোগাইতেছে। তার বাপ রাতে জাল বাইস করিয়া সকালে বাড়ি আসে। একঝাঁকা মাছ আনে। কাটিয়া কুটিয়া কতক জালের তলায় রোদে দিতে হয়, কতক ধুইয়া হাঁড়িতে চাপাইতে হয়। মা কেবল হুকুম চালাইয়া খালাস। এত সব করিয়া বাপকে খাওয়াইলে, তবে বাপ ঠাণ্ডা হয়; তারপর তার পয়সায় তারই হাতে বাজার হইতে কিছু আলো চাল আর দুই একটা কলা আনাইতে পারা যায়। সে চাল দিয়া সুবলার বউ মালসায় জাউ রাঁধিয়া দেয়। কলার খোল কাটিয়া সাতখানা ডোঙ্গা বানায়। তাতে জাউ আর কলা দিয়া তুলসীতলায় সারি সারি সাজায়। অনন্ত স্নান করিয়া আসিয়া তাতে জল দেয়। সরিয়া পড়িলে কাকেরা আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। যেদিন কাক আসে না, সেদিন অনন্ত ডোঙ্গা হাতে করিয়া আ আ করিয়া ডাকিয়া বেড়ায়— তারা বলিয়াছে, মা নাকি কাকের রূপ ধরিয়া আসিয়া অনন্তর দেওয়া জাউ-কলা খাইয়া যায়। অনন্ত যাহা কিছু শোনে, কিছুই অবিশ্বাস করে না। যে কাকগুলি খাইতে আসে, একদৃষ্টে তাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে—এর মধ্যে কোনটা তার মা হইতে পারে। এখন আর মানুষ নয় বলিয়া কথা বলিতে পারে না, কিন্তু খাইতে খাইতে ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া থাকে—বোধ হয় ঐটাই তাহার মা! কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে চায় না, খাওয়া শেষ না করিয়াই এক ফাঁকে উড়িয়া যায়।

অনন্তর কথা শুনিয়া ঘাটের নারীদের কেউ হাসিল, কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। খোলের ডোঙাগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সেগুলি হাতে লইয়াই সে ডুব দিয়া স্নান করিল। তারপর মাটির ছোট একটি ঘড়াতে জল ভরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। একজন স্ত্রীলোক তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, বলিল, 'তা হইলে, তোর মা কাউয়া হইয়া আইয়ে?'

'হ'।

'খাওয়া শেষ না কইরা উইড়া যায়!'

'হ'।

'খাইয়া যায় না কেন?'

'পাছে আমি তার লগে কথা কইতে চাই, এই ডরে বেশিক্ষণ থাকে না। যারা মইরা যায়, তারা ত জীবন্ত মানুষের সাথে কথা কইতে পারে না। তার লাগি মানুষের কথা শুনতেও চায় না, মনে মনে বুইঝ্যা চইল্যা যায়।' –অনন্ত মমতায় বিগলিত হইয়া পড়ে!

মা যখন বাঁচিয়া ছিল, অনন্ত সব সময়ে মার জন্য গর্ব অনুভব করিয়াছে। মার তুলনায় নিজেকে ভাবিয়াছে অকিঞ্চিৎকর! মা মরিয়া গিয়া লোকের কাছে যেন অনন্তর মাথা হেঁট করিয়া দিয়া গিয়াছে। এমন মার ছায়ায় ছায়ায় থাকিতে পারিলে অনন্ত যেন অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করিতে পারিত। এখন, মা নাই, তার যে আর কিছুই নাই; লোকের কাছে এখন তার দাম কানাকড়িও না। সে এখন মরিয়া গেলে কারো কিছু হইবে না। কেউ তার কথা মুখেও আনিবে না। কিন্তু মা? একমাস হইতে চলিল মরিয়াছে এখনও তার কথা কেউ ভুলিতে পারিয়াছে? ঘাটে জমিলে মেয়েরা তার মার কথা আলোচনা করে; দুঃখ করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বিশেষ করিয়া অনন্তকে দেখিলে তারা তখন তখনই তার মার কথা শুরু করিয়া দেয়। মার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অনন্তর বুক ভরিয়া উঠে।

ঘাটে আসিয়া যে-বধূটি সকলের চেয়ে বেশি দেরি করে, বেশি কথা বলে আর কথায় কথায় ছড়া কাটে, দুনিয়ায় তার পরিচয় দিবার উপলক্ষ মাত্র দুইটি–এক, সাদকপুরের বনমালীর বোন বলিয়া, আর দুই, লবচন্দ্রের বউ বলিয়া। তবে এখানে প্রথমোক্ত নামে তার পরিচয় বেশি নাই, শেষোক্ত নামেই সে মালোপাড়ায় অভিহিত। কথার মাঝে মাঝে সুন্দর ছড়া কাটিতে পারে বলিয়া সকল নারীরা তাকে একটু সমীহ করে; সে যেন দশজনের মাঝে একজন।

শ্রাদ্ধের দিন অনেক নারী দেখিতে আসিল। সেও আসিল। নাপিত আসিয়া অনন্তর মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসনখানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখানা সেই নারীর কথামত নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায় পুঁতিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুরোহিত চাউলভরা পাঁচটি মালসাতে মন্ত্র পড়িয়া অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করতঃ একটা সিকি ট্যাঁকে গুজিয়া চলিয়া গেলে, সেই স্ত্রীলোকটি তাড়া দিল, 'ভাত বাড়নের কত দেরি! কড়া ডিগা মানুষ। ভুখে মরতাছে!'

সুবলার বউর এক হাতে সব কাজ করিয়া উঠিতে দেরি হইল। তবু সে পরিপাটি করিয়া পাঁচটি ব্যঞ্জন রাঁধিল। অনন্ত এক স্থানে বসিয়া পড়িয়াছিল। মাসীর মা খেঁকাইয়া

উঠিল, 'নিষ্কর্মা গোঁসাই, আরে আমার নিষ্কর্মা গোঁসাই, একটা কলার খোল কাইট্যা আনতে পারলে না।'

সেই নারী প্রতিবাদ করিল, 'চিরদিন গালি দিও মা, আইজের দিনখান সইয়া থাক। দাও দাও, আমি খোল কাইট্যা আনি।'

লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল, রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোনদিন খাইতে আইব না।'

খোলের এককোণে একটু পান সুপারি, একটু তামাক টিকাও দেওয়া হইল।

সেই নারী সুবলার বৌকে বলিল, 'তোমার সাথে ত কত ভাব আছিল দিদি! তুমি যাইও না। আমি যাই তারে লইয়া।'

অনন্ত ভাত ব্যঞ্জন ভরতি খোলটা হাতে করিয়া নদীর পারের দিকে চলিল, সঙ্গে চলিল সেই স্ত্রীলোকটি। সেই নির্দেশ দিল, 'না-জল না-শুকনা, এমুন জায়গাত রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছের দিকে চাইস না।'

অনন্ত জন্মের মত মাকে শেষ খাবার দিয়া স্ত্রীলোকটির পিছু পিছু বাড়ি চলিয়া আসিল।

লোকে তেপথা পথে রোগীকে স্নান করায়, ফুল দিয়া রাখে। যে পা দিবে সেই মরিবে। এ আপদ একদিন কেন সেই পথ দিয়া আসে না!—হবিষ্যের সময় একবার করিয়া খাইত, এখন খায় তিনবার করিয়া। কোথা হইতে আসে এত খাওয়া?

—বুড়ির এই কথাটা ভাবিবার মত। বুড়া চিন্তা করে, একা মানুষ সে। তিন পেট চালায় তার উপর এই অবাঞ্ছিত পোষ্য। কিন্তু কি করা যায়!

একদিন বুড়ি প্রস্তাব করিল, 'ছরাদ্দ শান্তি হইয়া গেছে। অখন কানে ধইরা নিয়া জাল্লার নাওয়ে তুল।'

বুড়া ইন্ধন জোগাইল, 'হ। জাতারে ডহরের গহীন পানিত একদিন কানে ধইরা তুইল্যা দিমু ছাইড়া। আপদ যাইব।'

নদীর উপর নৌকাতে ভাসিয়া মাছ ধরার আনন্দ অনন্তর মনে দমকা হাওয়ার মত একটা দোলা জাগাইয়া দিল, কিন্তু বুড়া-বুড়ির কথার ধরন দেখিয়া উহা উবিয়া গেল।

তাহা সত্ত্বেও একদিন সন্ধ্যাবেলা জাল কাধে লইয়া বুড়া যখন হুকুম করিল, 'এই অনন্ত, হুঁক্কা-চোঙ্গা হাতে নে, আজ তোরে লইয়া জালে যামু।' অনন্ত তখন বিদ্যুতের বেগে আদিষ্ট দ্রব্যগুলি হাতে লইয়া পরম বাধিতের মত আদেশকারীর পাছে পাছে চলিল।

মাসী দৌড়াইয়া আসিয়া বাধা দিল। বাপ তার অত্যন্ত রাগী মানুষ। রাগ হইয়া যখন মারিতে আরম্ভ করিবে, একা নৌকায় অনন্তকে তখন বাঁচাইবে কে?

'হাতের আগুন নিবতে না নিবতে তুমি তারে জালে নিওনা বাবা। ছোট মানুষ। জলে পইড়া মরে, না সাপে খাইয়া মারে, কে কইব। অখন তারে নিওনা, আর একটু বড় হইলে নিও।'

মাসীর কথায় অনন্ত অপ্রসন্ন মুখে নিরস্ত হইল। এবং বুড়াবুড়ি নিরস্ত হইল আরো অপ্রসন্ন মুখে, ভবিষ্যতের এক প্রবল ঝড়ের আভাষ দিয়া।

মাঝেমাঝে ঝড় হয়। কোনোদিন দিনের বেলা, কখনো রাত্রিতে। দিনের ঝড়ে বেশি ভাবনা নাই; রাতের ঝড়ে বেশি ভাবনা। বাঁশের খুঁটির মাথায় দাঁড়ানো ঘরখানি কাঁপিয়া উঠে। মুচড়াইয়া বুঝিবা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাতেও অত ভয় করে না। কোনো রাতে ঝড় আরম্ভ হইলে সহজে কমিতে চায় না। সারারাত্রি চলে তার দাপট। কোনো কোনো সময়ে প্রতি রাতে ঝড় আসে। সারাদিন খায় দায়, সন্ধ্যার দিকে আসন্ন ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

ঈশান কোণের কালো মেঘ সারা আকাশে ধোঁয়ার মত ছড়াইয়া গিয়া হু হু করিয়া বাতাস আসে। তারপর আসে ঝড়। ভয় হয় ঘরটা বুঝিবা এ রাতেই পড়িয়া যাইবে। পড়ে না। কিনতু আজই ত শেষ নয়। কালকের ঝড়ে যদি পড়িয়া যায়! পরশুর ঝড়ে! কিন্তু তাতেও অত ভয় করে না–যত ভয় করে বুড়াকে। কোন ঝড়ের রাতে অনন্তকে টানিয়া লইয়া নৌকায় তুলিবে, মেয়ে মানুষ সে, বুড়া বাপ তার বাধা মানিবে না। কি সে করিবে। একটা নিঃসহায় নারীর শেষ গচ্ছিত ধন নষ্ট হইয়া যাইবে। ঝড়ে কোন গাঙের বাঁকে বুড়ার নাও উল্টাইয়া যাইবে। বুড়া ত মরিবেই, এটাকেও সঙ্গে নিয়া মারিবে।

দিনের ঝড় অনন্তর খুব ভাল লাগে। একদিন অকারণে পাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে ঝড় আসিয়া পড়িল। যার যার উঠানে ছেলেরা খেলা করিতেছিল বড়রা ডাকিয়া ঘরে নিয়া ঢুকিল। অনন্তকে কেউ ডাকিল না। কার ঘরে গিয়া উঠিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল যে স্ত্রীলোকটি তার মার শ্রাদ্ধের দিনে তার সঙ্গে নদীর পারে গিয়াছিল সে তার হাত ধরিয়া টানিতেছে। এক সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি দুই আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শিল পড়িল। অনন্তর ন্যাড়া মাথায় কয়েকটা শিল প্রচণ্ড আঘাত করিল, আর ঝড়ো হাওয়ার তোড়ে কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তার খড়িউঠা চামড়ায় তীরের মত গিয়া বিঁধিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই নারীর মাথার ঘোমটা খুলিয়া গেল, বাহির হইয়া পড়িল খোঁপাটা আর সিঁথির উপর সযত্নে আঁকা দগদগে লাল সিন্দুরের চিহ্নটা। বড় বড় কয়েকটা শিল সযত্নশোভিত খোঁপাটিকে থেতলাইয়া দিল, বড় বড় কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা তার সিন্দুরের দাগ গলাইয়া ফ্যাকাসে করিয়া দিল; তার ঘোমটার কাপড় দিয়া ইতিপূর্বেই সে অনন্তর থেলো মাথাটিকে ঢাকিয়া দিয়াছিল।

কারো ঘরে না গিয়া সে অনন্তকে নিয়া তার নিজের ঘরের বারান্দায় গিয়া থামিল। ততক্ষণে ঝড়ের প্রচণ্ড মাতামাতি শুরু হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের এত বড় আলামত অনন্ত জীবনে কোনোদিন দেখে নাই। চারিদিকে ঘরের চালগুলি কাঁপিতেছে, গাছগুলি মুচড়াইয়া এক একবার মাটিতে ঠেকিতেছে আবার উপরে উঠিতেছে, লতাপাতা ছিঁড়িয়া মাটিতে গড়াইতেছে, আবার কোথায় কোন দিকে বাতাস তাহাদিগকে ঝাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঝড় খুব শক্তিশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নারীও কম শক্তিশালী নহে। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সমানে সে চেঁচাইয়া চলিয়াছে, 'দোহাই ত্রিশ কোটি দেবতার।' কিন্তু ঝড় নির্বিকার। দাম্ভিক অঙ্গুলি হেলনে ত্রিশ কোটি দেবতাকে কাত করিয়া বহিয়াই চলিল। এববার তার গলার আওয়াজ কাঁপাইয়া অন্য অস্ত্র বাহির করিয়া দিল, 'এই ঘরে তোর ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা ছুঁইসনা–এই ঘরে তার ভাইগ্না বউ, ছুঁইসনা ছুঁইসনা।' কিন্তু ঝড় এ বাধাও মানিল না। পাশব শক্তিতে বিক্রম দেখাইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা

কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে নারীও দমিবার নয়। এবার সুর সপ্তমে চড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'যা বেটা যা, পাহাড়ে যা, পর্বতে যা, বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা!' এ-আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পরিয়াই বুঝিবা ঝড়টা একটু মন্দা হইয়া আসিল এবং ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া এক সময় তারও দম বন্দ হইয়া গেল। অনন্ত বিস্ময়ভরা চোখে তাকাইয়া রহিল তার মুখের দিকে। কি কড়া আদেশ। এমন যে ঝড়, সেও এই নারীর কথায় মাথা নত করিল!

ঝড়ে মালোপাড়ার প্রায়ই সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি করিয়া থাকে। তাদের অর্ধেক সম্পত্তি থাকে বাড়িতে, আর অর্ধেক থাকে নদীতে। যাদের ঘর বাড়ি ঠিক থাকে, তারা হয়ত তিতাসে গিয়া দেখে নাওখানা ভাঙিয়া গিয়াছে। আর যারা নাওয়ে থাকিয়া সারারাত তুফানের সাথে যুঝিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তারা হয়ত বাড়িতে আসিয়া দেখে ঘর পড়িয়া গিয়াছে।

আজিকার এত বড় ঝড়ে কিন্তু মালোপাড়ার অধিক লোকের ক্ষতি করিতে পারে নাই। ক্ষতি করিয়াছে মাত্র দুইটি পরিবারের। কালোবরণের বড় নাওখানা লইয়া মাছ কিনিবার জন্য বড় গাঙে গিয়াছিল। সে নাওখানা ভাঙিয়া গিয়াছে। লোকজন পায়ে হাঁটিয়া পরদিন বাড়ি আসিয়া জানাইয়াছে, একখানা তক্তাও পাওয়া গেল না। একেবারে চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে।

ঘর ভাঙিয়াছে অনন্তর মাসীর বাবার। যে ঘরে অনন্তকে লইয়া মাসী শুইত সেই ঘরখানা।

ঘরখানা আবার তুলিয়া লইয়া, হিসাব করিয়া দেখা গেল, বুড়ার গাঁটের সব টাকাকড়ি খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন দিন-আনা দিন-খাওয়ার অবস্থা। যেদিন মাছ না পাইবে সেদিন উপবাস করিতে হইবে। ঘোর দুর্দিনে এমন অবস্থায় একটা উপরি পোষ্যকে কিছুতেই রাখা চলে না। একথা বুড়ার জপমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর না বলিলেও মাসীর বুঝিতে কষ্ট হয় না। তার মার রকমসকম দেখিয়া মনে হয়, একদিন হয়ত সত্যই ছেলেটার পিঠে সে পোড়া কাঠ চাপিয়া ধরিবে।

অনেক দিন ধরিয়া সে কালোর মার কথা ভাবিতেছিল। একদিন তার কাছে গিয়া বলিল, 'আপনে ত তার মারে কত ভালবাসতেন। আমার কাছে তার কষ্টের পারাপার নাই। আপনে তারে লইয়া যান, দুই মুঠা খাইয়া বাঁচব।'

কিন্তু কালোর মার মন খারাপ। অতবড় নৌকা ভাঙিয়া গিয়াছে। এমন বিপদে কার না মন খারাপ হয়। এই সময়ে এসব ভাবনার কথা এড়াইয়া চলিতেই ভাল লাগে। তবে কালোর মা একেবারে নিরাশ করিল নাঃ বর্ষার পর সুদিন আসিলে কালোবরণ উত্তর হইতে কাঠ আনিবে, নূতন নাও গড়িবে। সে নাওয়ে যখন জিয়লের ক্ষেপ দিতে যাইবে, কালো তখন অনন্তকে সঙ্গে নিতে ভুলিবে না। এই কথা শুনিয়া সুবলার বৌর ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

আর একদিন খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। বাদলায় পান খুব পচে। তখন পচা-ভালো-মেশানো বিড়ায় বিড়ায় পান ফেলিয়া দেয় দোকানীরা। অনন্তর বয়সী ছেলেমেয়েরা এমন পান হাতভরতি করিয়া কুড়াইয়া আনিতেছে। মাসীর মা নিজের চোখে

দেখিয়াছে। তারা অনেক পান আনিয়াছে। আর তাদের মা'রা ডালায় করিয়া লইয়া ধুইয়া খাইয়া মুখ লাল করিয়াছে। অনন্ত কেন গেল না, গেলে ত আনিতে পারিত। অনন্তর খুব ভাল লাগে, হাটে-বাজারে ঘুরিতে। বুড়ির ইঙ্গিত পাইয়া সে খুশি মনে ছুটিল বাজারের দিকে।

বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে একটু আগে। বাজারের রাস্তা দিয়া তখনও জলের স্রোত চলিতেছে। কোথায় কোন ডোবা উপচাইয়াছে, তারই জল। দুএকটি পানাও আসে সেই জলের সঙ্গে। অনন্তর বয়সী কয়েকটি ছেলে, তাদের বাপদাদারা যেমন লম্বা বাঁশের আগায় জাল বাঁধিয়া খালের দুই পাড় আগলাইয়া জাল পাতে, তারই অনুকরণে রাস্তার দুইধার বন্ধ করিয়া দুইটি কঞ্চিতে দড়ি আর সূতা বাঁধিয়া জাল পাতিয়া বসিয়াছে। পায়ের গোড়ালির চাপে কঞ্চির আগা উচাইয়া, দড়ি টানিয়া, বুক চিতাইয়া, যেন কত মাছই জালে উঠিয়াছে এমন একটি ভাব-ভঙ্গিতে না-দেখা মাছ সব ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। অনন্তকে তারা একসাথে ডাক দিয়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দৌড়িয়া আসিয়া অনন্ত সকৌতূহলে বলিল, 'কি মাছ উঠেরে?'

'এই তর চান্দা বৈচা, তিত-পুঁটি। জব্বর মাছ উজাইছে, আইজকার ঢলে।'

অনন্তও তাদের সঙ্গে মাছ-ধরার খেলায় মাতিয়া গেল।

কতক্ষণ এই খেলা চলিল। শুধুই খেলা। মেয়েরা যেমন মাটির ভাত রাঁধিয়া রাঁধা-রাঁধা খেলা করে, তেমনি এ মাছ-ধরা-ধরা-খেলা। সহসা তাদেরই একজন আবিষ্কার করিল একটা সত্যিকারের কৈ মাছের বাচ্চা কানকো আছড়াইয়া উজাইবার চেষ্টা করিতেছে। সব কয়টি দস্যিছেলে একসঙ্গে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া গিয়া মাছটিকে লুঠ করিয়া আনিল। তারপর দেখা গেল—একের পর এক ছোট বড় কৈ মাছ স্রোত ঠেলিয়া উজাইতেছে। অনন্তর দলের তখন মহা স্ফূর্তি। যার পরণে যা ছিল, তারই কোঁচড় করিয়া তারা ইচ্ছামত কৈ মাছ ধরিল। ধরিতে ধরিতে বেলা ফুরাইয়া গেল। রাস্তার জলের স্রোতটুকু একসময় বন্ধ হইয়া গেল। কৈ মাছও আজিকার মত উজাইবার পালা সাঙ্গ করিল।

পানের কথা অনন্তর একবারও মনে পড়িল না। এক কোঁচড় জ্যান্ত কৈ মাছ লইয়া খুশি মনে সে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বাড়ির কর্তার মন ভাল না। খালে জাল পাতিয়া পুঁটি মাছে নাও বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এক পয়সাও বেচিতে পারিল না। বাদলার দিন বলিয়া ব্যাপারী আসিল না, হাটও বসিল না। বাদলার দিন বলিয়া শুকাইতেও দেওয়া চলিবে না। এত মাছ সে করিবে কি?

'আমি চাইলাম পান, লইয়া আইছে মাছ। মাছ দিয়া আমি কি করুম। আমার কি মাছের অভাব?' বুড়ি গজগজ করিতে লাগিল।

পরের দিন দুপুরে বুড়ির মনে পড়িয়া গেল, অনন্তকে তো পোড়া-কাঠ মারা হয় নাই। উনানের ধারে গিয়া দেখে সেখানে পোড়া কাঠ নাই। তার উনুনমুখী মেয়ে খড় দিয়া রান্না করিতেছে। অনন্ত কাছে বসিয়া কি যেন গিলিতেছে। বুড়ি খপ্ করিয়া একমুঠা পোড়া খড় উনান হইতে তুলিয়া লইল। একদিক তখনো জ্বলিতেছে। কিন্তু এ দিয়া তো পিঠে মারা যায় না। মুখে গুঁজিয়া দেওয়া যায়। বুড়ি এক হাতে অনন্তর হাত

ধরিয়া আরেক হাতে জ্বলন্ত খড় তার মুখে গুঁজিতে গেল। তার মেয়ে বাধা দিতে আসিলে তারও মুখে গুঁজিতে গেল। মেয়ে হেঁচকা টানে খড়গুলি বুড়ির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। আচমকা খড়ের আগুন হাতে লাগিয়া বুড়ির হাতের খানিকটা পুড়িয়া গেল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে মেয়ের গলা চাপিয়া ধরিল। তারপর মায়েতে মেয়েতে শুরু হইল তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। মেয়ে শেষে কায়দা করিয়া মাকে মাটিতে ফেলিয়া বুকের উপর বসিল। তারপর চুলের মুঠি ধরিয়া তার মাথাটা ঘন ঘন মাটিতে ঠুকিয়া শেষে ছাড়িয়া দিল। বুড়ি ছাড়া পাইয়া কোন রকমে উঠিয়া গিয়া ভাতের হাঁড়িটা বড় ঘরে টানিয়া তুলিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

মারামারির মাঝখানে অনন্ত বাহির হইয়া গিয়াছিল। যার আদেশে ঝড় থামিয়া গিয়াছিল, সেই নারীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। সে না হইলে এই যুদ্ধ থামাইবে কে? কিন্তু তাকে ঘরে পায় নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখে মাসী ম্লানমুখে বসিয়া আছে। চুলগুলি আলুথালু। পিঠের কাপড় খুলিয়া গিয়াছে। রণজয়ের ক্লান্তিতে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাসী। ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সহসা তার দিকে চাহিয়া মাসীর চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রের মত গর্জন করিয়া উঠিয়া সে বলিল, 'শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি? ঠ্যাঙের তলা, পায়ের ধূলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। তোর মা গেছে যে-পথে, তুইও সেই পথে যা।'

কিন্তু ওকি, অনন্তর অমন আদর-কুড়ানো ম্লান মুখখানা যে দৃঢ়তায় কঠোর হইয়া উঠিল! অমন ঢল ঢল আয়ত চোখ দুইটি যে শৈশব-সূর্যের মত লাল তেজালো হইয়া উঠিল! ওকি! সুবলার বউ কি স্বপ্ন দেখিতেছে!

কোন যুদ্ধজয়ী বীর যেন পলকে সব কিছু ফেলিয়া ছড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে। ছোট ছোট পা দুইখানাতে এত জোর। মাটি কাঁপাইয়া যেন চলিয়াছে অনন্ত। ছুটিতেছে না, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছে। কিন্তু কি শব্দ ! এক একটা পদক্ষেপ যেন তার বুকে আসিয়া আঘাত করিতেছে। বারান্দা হইতে উঠানে নামিয়াছে। তার বুকের সীমানাটুকু ছাড়াইয়া অনন্ত যেন এখনি কোন এক অজানা জগতে লাফ দিবে। সুবলার বউ আর স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া হাত বাড়াইয়া স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, অনন্ত! অনন্ত ফিরিল না। সুবলার বউ পড়িয়া যাইতেছিল। তার মা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধরিল। মার বৃদ্ধ বুকে মাথা রাখিয়া সুবলার বউ এলাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুইটিও বুজিয়া আসিল।

অন্তহীন আকাশের তলায় অনন্তর আজ পরম মুক্তি। কারো পিছুর ডাকে সে আর সাড়া দিবে না। প্রথমেই তিতাসের পাড়ে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লইল নদীটাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিয়াছে, দুরন্ত স্বপ্নের মত, উদাত্ত সঙ্গীতের মত। জল বাড়িতেছে। নৌকাগুলি চলিয়াছে। কোথাও বাধা বন্ধ নাই। সব কিছুতেই যেন একটা সচল ব্যস্ততা। আজিকার এই সময়ে সে যদি আসিত! আসিবে বলিয়া গিয়াছে। কতদিন ত হইয়া গেল। সে ত আসিল না! বাজারের ঘাটে যেখানে সে নৌকা

ভিড়াইয়াছিল সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। এখানে দিনের পর দিন বসিয়া থাকিবে। তার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। একদিন হাটবারে সে আসিবেই।

খালের মুখে মস্তবড় একটা ভাঙা নৌকা 'গেরাপী' দিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত তার উপর গিয়া উঠিল। ভয়ানক পিছল। বাতায় ধরিয়া ছইয়ের ভিতর ঢুকিল। নৌকায় আধ বোঝাই জল। চাহিলে ভয় করে। একবার পা ফসকাইয়া তলায় পড়িয়া গেলে অনন্ত সে-জলে ডুবিয়া মারা যাইবে। পাছার দিকে কয়েকখানা পালিস পাটাতন। রোদ বৃষ্টি কিছুই ঢুকিবে না। কেউ দেখিতে পাইবে না। ভারী সুন্দর। এখানে অনন্ত চিরদিন কাটাইয়া দিতে পারিবে। যতদিন সে না আসিবে, এখানেই কাটাইয়া দিবে।

এখান হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে নদীর গতি। চাহিলে শেষ অবধি দেখা যায়। বহু দূরদূরান্তর হইতে, দক্ষিণের রাজ্য হইতে কেউ বুঝি ঢেউ চালাইয়া দেয়, সেই ঢেউ আসিয়া লাগে অনন্তর এই নৌকাখানাতে। সেদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। কিন্তু সে ত ওদিক হইতে আসিবে না, সে আসিবে পশ্চিম দিক হইতে।

অনন্ত এক একবার পশ্চিম দিকে যতদূর চোখ যায়, চাহিয়া দেখে – সে আসে না। ব্যর্থতায় তার মন ভরিয়া যায়। আবার দক্ষিণ দিকে চায়, দেখে নদী কত দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা তার মন আশায় ভরাইয়া দেয়।

বিকালে ক্ষুধা পাইলে চুপি চুপি নামিয়া আসিয়া সেই পান-ওয়ালাটার সামনে দাঁড়াইল। আজ হাটবার নয়। পানওয়ালা তেমনি ডুবে পান ভাঁজাইয়া চলিয়াছে। তার ইঙ্গিত পাইয়া এক হাঁড়ি জল তুলিয়া দিল। সেও প্রতিদানে এক গোছা পান তার দিকে ফেলিয়া দিল। অনন্ত পান লইল না। কি ভাবিয়া লোকটা একটি পয়সা দিল। অনন্ত এক পয়সার ছোলাভাজা খাইয়া দেখিল পেট ভরিয়া গিয়াছে।

কালো আঁধার। পাটাতনে শুইয়া খুব ভয় করিতেছিল। কিন্তু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকালে জাগিয়া দেখে সারারাত তার মা ঠিক তার কাছটিতে শুইয়া গিয়াছে, তার দেহের উষ্ণতা এখনও পাটাতনে লাগিয়া পড়িয়াছে। সকালে জাগিয়া দেখে সারারাত তার মা ঠিক তার কাছটিতে শুইয়া গিয়াছে, তার দেহের উষ্ণতা এখনও পাটাতনে লাগিয়া রহিয়াছে। ওরা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। মা কি কখনও তার অনিষ্ট করিতে পারে? মা দিনের বেলা দেখা দিতে পারে না মরিয়া গিয়াছে বলিয়া, কিন্তু রাতে ঠিক আসিবে। আর সে কিছুরই ভয় করিবে না।

বড় ঘটা করিয়া, বড় তেজ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে ছেলেটা। যে-খানেই থাক, মরিবেনা ঠিক। একটা গোটা মানুষের মরিয়া যাওয়া কি এতই সহজ? সে যদি আর কখনো ফিরিয়া এঘরে না আসিত, কেউ যদি তাকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া নিয়া মানুষ করিত! কোন মুখে আর সে এঘরে আসিবে! ঈশ্বর করুন আর যেন সে ফিরিয়া না আসে! যার মা নাই, দুনিয়ার সব মানুষই তার কাছে সমান। আর কোনো মানুষের বাড়িতে সে চলিয়া যাক।

চারদিন পরের এক দুপুরে নারীদের মজলিসে বসিয়া সুবলার বউ এই কথাগুলিই ভাবিতেছিল। অনন্তর প্রসঙ্গ উঠিতেই বলিল, 'আপদ গেছে ভাল হইছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি? আমার পেটের না পিঠের না, আমার কেনে অত ঝকমারি। মা

খালি ঘরে পইড়া মরছে। কেউ নেয় না দেইখ্যা আমি গিয়া আনছিলাম। অখন শ্রাদ্ধশান্তি চুইক্যা গেছে, অখন যেখানে খুশি গিয়া মরুক। আমার দায় ফইরাদ নাই।'

নিজে এতগুলি কথা বলিল সকলের অনন্ত সম্বন্ধে বলিবার সকল কথা চাপা দিবার জন্য। তবু একজন বলিয়া বসিল, আমার বিন্দাবন দেখিয়াছে, গামছায় করিয়া হাটে খলসে মাছ বেচিতেছে।

আর একজন পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, আমার নন্দলাল দেখিয়াছে, পচা পানের দোকানের সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানী কত পচা তার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, সে একটিও না ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুবলার বউ আর শুনিতে চায় না। কিন্তু তৃতীয় একজন না শুনাইয়া ছাড়িল না। কাল রাতের আঁধারে লবচন্দ্রের বউয়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল কতকগুলি পানসুপারি নিয়া। লবচন্দ্রের বউ তাকে ভাত খাওয়াইয়া বিছানা করিয়া বলিল, শুইয়া, থাক; কিন্তু শুইল না, বাহির হইয়া ভূতের মতন আঁধারে মিলাইয়া গেল। দিনের বেলা লবচন্দ্রের বউ তার স্বামীকে দিয়া কি খোঁজাটাই না খোঁজাইয়াছে, কিন্তু কোথায় থাকে কেউ বলিতে পারে না। কেউ নাকি বলে, জঙ্গলের মধ্যে থাকে, কেউ বলে শিয়ালের গর্তে থাকে—কেউ বলে, যাত্রাবাড়ির শ্মশানে যে মঠ আছে, তার ভিতর থাকে! ছেলেটা দেওয়ানা হইয়া না গেলেই হয় দিদি।

খুব যে দরদ লবচন্দ্রের বউ-এর। স্বামীকে দিয়া খোঁজাইয়াছে। বলি কয়দিনের কুটুম? এতদিন দেখাশুনা করিয়াছে কে? মা যখন মরিল, লবচন্দ্রের বউ তখন কোথায় ছিল? আর মরিতে আসিলই যদি, এদিকের পথে ত কাঁটা দিয়া রাখে নাই কেউ। ভাত ভিক্ষা করিয়া খাইতে আসিয়া লবচন্দ্রের ঘরে কেন—এমন ভিক্ষা ত আমিও দিতে পারিতাম। কথাগুলি সুবলার বউ মনে মনে ভাবিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিল না।

রাত্রিতে পেট পুরিয়া খাইয়া শুইতে গিয়াছে, এমন সময় বিন্দার মা আসিয়া বলিল, 'অ সুবলার বউ, দেইখ্যা যা রঙ্গ।'

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া দেখে অনন্ত আঁস্তাকুড়ের পাশে বসিয়া বসিয়া আঁচাইতেছে, আর লবচন্দ্রের বউ হাতে একটা কেরোসিনের কুপি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এতখানি সামনে গিয়া পড়া সুবলার বৌয়ের অভিপ্রেত ছিল না। সে হকচকাইয়া গেল। ছেলেটা একটুও না চমকাইয়া হাতের ঘটি মাটিতে রাখিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল; কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

ফেরার পথে সুবলার বউ বলল, 'বিন্দার মা, একদিন ধইরা জন্মের শোধ মাইর দিয়া দেই, কি কও।'

বিন্দার মা কিছু বলিল না।

ভিতরে ভিতরে কি ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সুবলার বউকে কেউ কিছু জানিতে দিল না। একদিন দেখা গেল, লবচন্দ্রের বউর ভাই আসিয়াছে নাম নাকি তার বনমালী। যে-রহস্য কেউ ভেদ করিতে পারে নাই, সে-রহস্য সে ভেদ করিয়া ফেলিয়াছে। খালের মুখের এক গেরাপী-দেওয়া ভাঙা নৌকার খোপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে অনন্তকে। তারপরের দিন দেখা গেল তারা তিনজনে মিরিয়া নৌকায় গিয়া উঠিয়াছে।

সব কথা শুনিয়া সুবলার বৌর যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। বিন্দার মা জানে তার ব্যথাটা কোথায়। বলিল, 'এদ্দিন পাললি-লাললি, খাওয়াইলি ধোয়াইলি, আইজ পরে লইয়া যায়। কোনদিন দেখবি কি দেখবি না, শেষ দেখা একবার দেইখ্যা দে।'

হাঁ, শেষ দেখা একবার দেখিতে হইবে! সুবলার বউ উঠিয়া পড়িল।

ঘাটের কাছে অনেক নারী গিয়া জমিয়াছে। সাহা পাড়ার এক নারী ঝাঁকুনি মারিয়া কলসী কাঁকালের উপরে তুলিতে তুলিতে মালো পাড়ার এক নারীকে বলিল, 'কারে কে লইয়া যাইতাছে গো দিদি!'

—লবচন্দ্রের বউ উদয়তারাকে তার দাদা বনমালী নিতে আসিয়াছে, নিতেছে। আমার বাপের বাড়ি আর তার বাপের বাড়ি এক গাঁয়ে, পাশাপশি ঘর।

'বুঝলাম।'

নারীদের দলে গিয়া সুবলার বউও দাঁড়াইল। দেখিল দুইজনেই মহা খুশি। উদয়তারা মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া রঙ্গ করিতেছে আর অকৃতজ্ঞ কুকুরটা খুশি মনে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে।

উদয়তারা এখন আর লবচন্দ্রের বউ নহে; এখন সে বনমালীর বোন। গর্বিত দৃষ্টিতে ঘাটের নারীদের দিকে চাহিল সে। একটি বৌ ম্লান মুখে তাকাইয়াছিল উদয়তারার দিকে, তারও বাপের বাড়ি নবীনগর গ্রামে। তাকে খুশি করিবার জন্য উদয়তারা ডাকিয়া বলিল, 'কিগো নবীনগরের ছবি না, বহু দিন ধইরা যে দেখি না।?'

উদয়তারাকে যারা জানে তারা সকলেই হাসিয়া উঠিল।

সে বৌও অমনি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, 'জামাইঠকানী, কি কয় না?'

এই কয়জনার হাসি-তামাসার মধ্যে বনমালীর নৌকা তিতাসের জলে ভাসিয়া পড়িল।

আকাশটা বেজায় ভারী। মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। সারা দিন সূর্যের দেখা নাই। মাথার উপর যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বাদলার এই নুইয়া-পড়া আকাশটা। মানুষের অবাধে নিঃশ্বাস ফেলার অনেকখানি অধিকার আত্মসাৎ করিয়া ময়লা একখানা কাঁথা দিয়া বুঝি কেউ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে মালোপাড়াটাকে।

হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাথার কাপড়টুকু বুকে পিঠে দুই তিন পরতা জড়াইয়া সুবলার বউ একটা মেটে কলসী লইয়া নদীতে গেল।

পারের উঠানের মত ঢালা জায়গা এতদিন অবারিত ভাবে পড়িয়া থাকিত। জেলেরা জাল ছড়াইত, জেলের ছেলেরা লম্বা করিয়া মেলিয়া সূতা পাকাইত। ছেলেরা শিশুরা বয়স্কা বিধবারা রোদের জন্য সকালে গিয়া বসিত; বিকালে ছেলেরা খেলা করিত। ছুটিয়া আশা দুটি একটি গরু ছাগল ঘাস খাইত। রাক্ষুসী তিতাস ধাপে ধাপে বাড়িয়া আসিতে আসিতে তার অনেকখানি জায়গা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অবাধে কেউ এখানে নড়াচড়া করিবে সে উপায় নাই।

সুদিনে কোথায় কোন সুদূরে ছিল জল, ভরা কলসী লইয়া আসিতে পথ ফুরাইতে চাহিত না। এখন এত কাছে আসিয়াছে; বাড়ি হইতে নামিয়া পাড়ার বাহিরে পা দিলেই জল। তবু যা একটু জায়গা খালি আছে, আর দুইদিন পরে তাও জলে ভরিয়া যাইবে। —আগে যেখানে নামিয়া স্নান করিতাম, সেখানে আজ গাঙের তলা। বড় জালের বড়

বাঁশ ডুবাইয়াও সেখানকার মাটি ছোঁয়া যাইবে না। মাথার উপর কালো আকাশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাড়ার বাহিরে তিতাসের কালাপানি সাঁ সাঁ করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দুই দিক হইতেই চাপিয়া ধরার মতলব।

দক্ষিণ দিকে চাহিলে নির্ভরসায় বুক কাঁপিয়া উঠে! আষাঢ় শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ঘাট যতদিন ডাঙা ছিল, বৃষ্টির জল তাহাদের ধুইয়া মুছিয়া সাদা গেরুয়া অনেক মাটি লইয়া গিয়া নদীতে পড়িত। এখন সেসব মাঠ ময়দান জলের তলায় চাপা পড়িয়াছে। তাহাদের উপর এখন বুক জল সাঁতার জল। সব পলিমাটি জলের তলে থিতাইয়া রহিয়াছে, উপরে ভাসিয়া রহিয়াছে নির্মল জল। তিতাসের জল তাই সাদাও নয়, গৈরিকও নয়, একেবারে নির্মল। আর নির্মল বলিয়াই কালো। সেই কালো জলের উপর দিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া এখানে আছাড় খাইতেছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল কেবল আগাইয়া আসিতেছে।

জেলেদের হইয়াছে ঝকমারি। ঘন ঘন নাও-বাঁধা-খুঁটি বদলাইতে হয়। একদিন হাঁটুজলে গলুই রাখিয়া খোঁটা ছিল, পাছার খোঁটা ছিল বুক জলে। তিনদিনের দিন গলুইর খোঁটায় হইয়াছে কোমর জল আর পাছার খোঁটায় সাঁতার-পানি। নৌকায় উঠিতে কাপড় ভিজাইতে হইতেছে। তোল আবার খুঁটি, আগাইয়া আনো নাও আরও মাটির কাছে। এইভাবে খুঁটি তোলাতুলি করিতে করিতে শেষে নাওয়ের গলুই পল্লীর গায়ে আসিয়া ঠেকিল।

নতুন জল মালোপাড়ার গায়ে ধাক্কা দিয়া তার পূর্ণতা ঘোষণা করিয়াছে। ঘরবাড়ির কিনারায় বেতঝোপ, বনজমানী, ছিটকির গাছগাছালি ছিল—নতুন জলের তলায় এখন সেগুলির কোমর অবধি ডুবিয়া গিয়াছে। তার আশেপাশে ঢেউ ঢোকে না, স্রোত চলে, সেই স্রোতে নিরিবিলিতে উজাইয়া চলে ছোট ছোট মাছ। পুঁটি চাঁদা খলসে ডিম ছাড়িয়াছে, বাচ্চা হইয়াছে, সাঁতার কাটিতে আর দল বাঁধিয়া স্রোত ঠেলিয়া উজাইতে শিখিয়াছে সে-সব মাছেরা। থালা ধুইতে গেলে এত কাছ দিয়া চলে, যেন আঁচল পাতিয়াই ধরা যাইবে। অনন্ত এখানে একটা ছোট জাল পাতিলে বেশ ধরিতে পারিত! হাটে নিয়া বেচিতেও পারিত। এই সময় মাছের দর বাড়ে। উজানিয়া-জলে অঢেল মাছ ধরা দেয় না। কমিবার মুখে মরা জলে যত মাছ মারা পড়ে, তখন মাছের দর থাকে কম। এখন দর খুব বেশি।

ঘাটে লোক নাই। নিরালা ঘাট পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘাট অতিক্রম করিতেছে। এই রকম কত ঘাট ডিঙাইয়া আসিয়াছে, আরও কত ঘাট ডিঙাইতে হইবে, তারপর এত বাধা বিঘ্নের পাহাড় ঠেলিয়া কোথায় গিয়া তাহাদের যাত্রা শেষ হইবে, কোথায় তাহাদের পথের শেষ, কে জানে! কে তার খোঁজ রাখে? কিন্তু তারা উজাইবে। থালা দিয়া ঢেউ খেলাইয়া বাধা দাও, তারা আলোড়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু পিছু হটিয়া যাইবে। কিন্তু জল স্থির হইলে আবার তারা চলিতে থাকিবে। হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাও, নিকট দিয়া যাইতেছিল, দুই হাত বার-পানি দিয়া আবার পাল্লা ধরিবে, তবু তারা যাইবেই। ঘাটে অত্যধিক মানুষের আলোড়ন থাকে যখন, তারা গাছগাছড়ার ঝোপেঝাপে দলে দলে তিষ্ঠাইতে থাকিবে। বেশি বার-পানি দিয়া যাইতে পারে না;

ছোট মাছের অগাধ জলে বিষম ভয়, ঘাটের এধারে তারা দলে ভারী হইতে থাকিবে। ঘাট ঠিক চুপ হইলেই আবার যাত্রা শুরু করিবে। কেউ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

ঘাটে কেহ নাই। সুবলার বউ আঁচল পাতিয়া কয়েকটি মাছ তুলিয়া ফেলিল। তারা পুঁটিমাছের শিশুপাল। কাপড়ের বাঁধনে পড়িয়া ফরফরাইয়া উঠিল। জলছাড়া করিবার প্রবৃত্তি হইল না। আঁচল আলগা দিয়া ছাড়িয়া দিল। খলসে বালিকারা কেমন শাড়ি পরিয়া চলিয়াছে। চাঁদার ছেলেরা কেমন স্বচ্ছ—এপিঠ ওপিঠ দেখা যায়। সারা গায়ে বিজল। ধরিলে হাতে আঠা লাগে। একটা ঘন ছোট জাল পাতিয়া অনন্ত ইহাদের সবগুলিকেই ধরিতে পারিত!

আরও কিছুদিন পরে গলা-জলে জল-বন গজাইয়াছে, আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘন হইতে ঘনতর হইয়া সেগুলি মাছেদের এক একটা দুর্গে পরিণত হইয়াছে। মালোর ছেলেরা তখন বসিয়া নাই। বড়রা নৌকা লইয়া মাঝ নদীতে নানা রকমের জাল ফেলিতেছে তুলিতেছে, ছোটরা ছোট ছোট তিনকোণা ঠেলা জাল লইয়া সেই জলদুর্গে অবিরত খোঁচাইয়া চলিয়াছে।

কয়েক বারের খোঁচার পর জালখানা টানিয়া মাটির উপর তুলিলে দেখা যায় অসংখ্য চিংড়ি-সন্ততি শুয়া উঁচাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে থাকে। দশ বারো খেউ দিলেই মাছে ডোলা ভরিয়া যায়। অনন্তকে একখানা জাল বুনিয়া তিনখানা মোটা কঞ্চিতে বাঁধিয়া দিলে অনেক চিংড়ির ছা' মারিয়া হাটে গিয়া বেচিতে পারিত! সুবলার বউ যদি নিজে সূতা কাটিত জাল বুনিত, আর অনন্ত চিংড়ির বাচ্চা ধরিয়া হাটে বাজারে বেচিত, তাতে দুই জনের একটা সংসার চলিতে পারিত। মা-বাপের গঞ্জনা হইতে সুবলার বউ বাঁচিয়া যাইত।

থমথমে আকাশ এক এক সময় পরিষ্কার হয়। সূর্য হাসিয়া উঠে, কালো কেশরের গহনারণ্য ফাঁক করিয়া। বিকালের পড়ন্ত রোদ গাছগাছালির মাথায় হলুদ রঙ বুলাইয়া দেয়। পুরুষ মানুষেরা এই সময় অনেকেই নদীতে। যারা বাড়িতে থাকে, তারা ঘুমায়। নারীরা সূতা পাকাইবার জন্য উঠানে বাহির হয়। চোঙার মত মুখ একটা খুঁটি স্থায়ী ভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। তার উপর সূতা-ভরা চরকি বসাইয়া দেয়। টেকোয় সূতা বাঁধিয়া উঠানের এ-কিনারা থেকে ও-কিনারায় পোঁতা একটা বড় খুঁটি বেড়িয়া আনে। তার পর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন উরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘষা মারিয়া উরুতে টেকো ঘুরায়।

একবারের ঘুরানিতে টেকো হাজার বার ঘুরে। দশবারের ঘুরানিতে একবেড়ের সূতা পাকানো হইয়া যায়। তখন বুকের খানিকটা কাপড় তুলিয়া ডান হাতের তেলোয় টেকোর ডাঁট ঘুরাইতে থাকে। বাঁ হাত থাকে টেকোর ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলে সে নারী। এই ভাবে পাকানো সূতা টেকোতে গুটানো হইয়া যায়। নিতান্তই পুরুষের কাজ। কিন্তু মালোর মেয়েরা কোন কাজ নিতান্তই পুরুষের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারে না। রাখিলে চলেও না। নদীতে খাটিয়া আসে। সূতা পাকাইবে কখন? তাই, পুরুষের আনাগোনা না থাকিলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি সব বাড়ির মেয়েরাই এইরূপ চরকি-টেকো লইয়া উঠানে নামিয়া পড়ে।

তেলিপাড়ার একটা লোক একদিন এমনই সময়ে মালোপাড়ার ভিতর দিয়া কোথায় যাইতেছিল, যুবতী মালো-বৌদের এমন বে-আবরু ব্যবহার দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল সে। তারপর থেকে রোজ এমনি সময়ে একবার করিয়া সে পাড়াটা ঘুরিয়া যাইত। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, অমুকের বাড়ি যাইবে; অমুকের বাড়ির কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, অমুকের বাড়ি গিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম মেয়েরা তাকে গ্রাহ্য করে নাই। পরে যখন লোকটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে শুরু করিল, তখন মেয়েদের কান খাড়া হইল। সুবলার বউ দলের পাণ্ডা হইয়া একদিন রাত্রে তাকে ডাকিয়া ঘরে নিল, আর বাছা বাছা জোয়ান মালোর ছেলেরা তাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নৌকায় তুলিয়া বার-গাঙে নিয়া ছাড়িয়া দিল। স্রোতের টানে সে কোথায় চলিয়া গেল, কেউ জানিল না।

সারা মালো পাড়ার মধ্যে এক মাত্র তামসীর বাপই বামুন কায়েত পাড়ার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিত। তার বাড়ি বাজারের কাছে। বামুন কায়েতের ছেলেরা তার বাড়িতে আসিয়া তবলা বাজাইত। তামসীর বাপকে তারা যাত্রার দলের রাজার পাঠ দিত বলিয়া সে এসব বিষয় দেখিয়াও দেখিত না। এইজন্য তার উপর সব মালোদের রাগ ছিল। আর সেও মালোদিগকে বড় একটা দেখিতে পারিত না, বামুন কায়েতদিগকে দেখিতে দেখিতে তার নজর উঁচু হইয়া গিয়াছিল।

এত বড় টাকাওয়ালা একটা মানুষ তেলিপাড়া হইতে গুম হইয়া গেল, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। না হইল মামলা-মোকদ্দমা, না হইল আচার-বিচার। কিন্তু তামসীর বাপের মারফতে তেলিরা জানিতে পারিল, একাজ মালোদেরই। কিন্তু এমন সূত্রহীন জানার দ্বারা মামলা করা যায় না। কাজেই তেলিরা কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। শেষে বামুন, সাহা, তেলি, নাপিত, সব জাত মিলিয়া গোপনীয় এক বৈঠক করিল। কেউ প্রস্তাব করিল ঃ মালোদের নৌকাগুলি এক রাতে দড়ি কাটিয়া ভাসাইয়া নিয়া, তলা ফাঁড়িয়া ডুবাইয়া দেওয়া যাক; আর টাকা দিয়া লোক লাগাও, জালগুলি সব চুরি করিয়া আনিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলুক।

কিন্তু এ প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল না, গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইবে। কাজেই দ্বিতীয় প্রস্তাব উঠিল : সারা তেলিপাড়াতে রজনী পালের মাথা খুব সাফ। কূটনীতি তার বেশ খুলে। এসব ভোঁতা প্রস্তাবের অসারতা বুঝিতে তার বিলম্ব হইল না। সে প্রস্তাব করিল ঃ বিষ্ণুপুরের বিধুভূষণ পাল আমার মামা। সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার। ফিসারীর টাকা নিয়া সব মালোরা গিলিয়াছে। মাছে যেমন টোপ গিলে তেমনি ভাবে গিলিয়াছে, আর উগলাইয়া দিতে পারিতেছে না। সুদ কম বলিয়া, লোভে লোভে ধার করিয়াছিল। এখন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে বাড়িতেছে। জানইত সমবায় সমিতির টাকা কত অত্যাচার করিয়া আদায় করা হয়। মামাকে গিয়া জানাইয়া দেই, প্রত্যেক্ষ মালোকে যেন ব্যাঙ নাচানী নাচাইয়া ছাড়ে।

কিন্তু এ প্রস্তাবও কারো মনঃপূত হইল না। মামা কখন আসিবে কে জানে। বড় সুদূর-প্রসারী প্রস্তাব। গরম গরম কিছুই করা হইল না। শেষে একটা প্রস্তাব তুলিল রজনী পালের ভাই : যে-মাগী তাকে ডাকিয়া ঘরে নিয়াছিল, তাকে ধরিয়া নিয়া আস, কয়েক পাইট মদ কিন, তারপর নিয়া চল ভাঙা কালীবাড়ির নাটমন্দিরে। কিন্তু ব্যাপার আপাততঃ এর বেশি আর গড়াইল না। তেলিপাড়া ও মালোপাড়া উভয় পাড়ার প্রস্তাবই

প্রস্তাবে পর্যবসিত হইল। তবে মালোপাড়ার সঙ্গে আর সব পাড়ার একটা মিলিত বিরোধের যে গোড়াপত্তন সেইদিন হইয়া থাকিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না।

পথে রাত হইয়া গেল। বর্ষার প্রশস্ত নদীর উপর মেঘভরা আকাশের ছায়া দৈত্যের মত নামিয়া পড়িয়াছে। অনন্ত বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। পরে এক সময় চারিদিক গাঢ় আঁধারে ঢাকিয়া গেলে আর কিছু দেখা গেল না।

উদয়তারা দুই দিক খোলা ছইয়ের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল, 'আয় রে অনন্ত, ভিতরে আয়।'

বনমালী পাছায় থাকিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে হাল চালাইতেছে। তার দাপটে হালের বাঁধন-দড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর সারা না'খানা একটানা হেলিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছে। সেই দোলায়মান নৌকার বাঁশের পাতনির উপর দিয়া পা টিপিয়া পিটিয়া অনন্ত ছইয়ের ভিতরে আসিল। উদয়তারাকে দেখা যাইতেছে না। আন্দাজ করিয়া তার কাছে গিয়া বসিল। কিছু বলিল না। ঘুম পাইতেছিল পাটাতনের উপর ছোট শরীরখানা এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। মশার কামড়ে আর নৌকার দোলানিতে একবার তার ঘুম খুব পাতলা হইয়া আসিল। মাথাটা যেন নরম কি একটা জিনিসের উপর পড়িয়া আছে। তুলার মত নরম আর চাঁদের মত শীতল। আর রাশি রাশি ফুলঝুরি নামাইয়া-রাখা একপাট আকাশ কে বুঝি অনন্তর গায়ের উপর চাপাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

ঐ যে আকাশের উপর দিয়া এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে কি-একটা উজ্জ্বল সাঁকো—কিছু দিন আগের দেখা সেই রামধনুটারই যেন ছিল এটা। সাতরঙা ধনুটি গা-ঢাকা দিয়া আছে আর তার ছিলাটি অনন্তর জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে। উজ্জ্বল কাঁচা সোনার রঙ তার থেকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আর তার চারিপাশে ভিড় করিয়া আছে লাখ লাখ তারা। হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। আর তারই উপর ঝুলিয়া অনন্ত আকাশের এমন এক রহস্যালোকে যাত্রা করিবে যেখানে থাকিয়া সে কেবল অজানা জিনিস দেখিবে। তাহার দেখা আর কোনকালে ফুরাইবে না।

উদয়তারা মশার কামড় হইতে বাঁচাইবার জন্য অনন্তর গাটুকু শাড়ির আঁচলে ঢাকিয়া দিয়াছিল আর শক্ত পাটাতনে কষ্ট পাইবে বুঝিয়া মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া নিয়াছিল। আর বুকের উপর দিয়া বা হাতখানা বাড়াইয়া শাড়ির কিনারাটা পাটাতনের সঙ্গে চাপিয়া রাখিয়াছিল, যেন অনন্তর গা থেকে শাড়িটুকু সরিয়া না যায়। সেই হাতখানা ছেলেটা খাপছাড়া ভাবে হাতড়াইতেছে মনে করিয়া সে শাড়িটুকু গুটাইয়া কোল হইতে অনন্তর মাথাটা নামাইয়া দিল। ডাকিয়া বলিল, 'অনন্ত উঠ।'

অনন্ত জাগিয়া উঠিয়া দেখে দুনিয়ার আর এক রূপ। তারায় ভরা আকাশের তলায় অদূরে নদী অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেক দূরের আকাশের তারায় তারায় যেন সড়ক বাঁধিয়াছে। না জানি কত সুন্দর সে পথ, আর সে পথে চলিতে না জানি কত আনন্দ! পায়ের নীচে কত তারার ফুল মাড়াইয়া চলিতে হয়; আশেপাশে, মাথার উপরে, খালি তারার ফুল আর তারার ফুল। সে-পথ কত উপরে। অনন্ত কোনদিন তার নাগাল পাইবে না। কিন্তু দেবতারা প্রসন্ন। তিতাসের স্থির জলে তা'রা তারই একটা প্রতিরূপ ফেলিয়া রাখিয়াছে। সেটা খুব কাছে। বনমালী একটু বার-গাঙ দিয়া নৌকা বাহিলেই

সে পথে অনন্ত নৌকা হইতেই পা বাড়াইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু জলের ভিতরে সে পথ। কেবল মাছেরাই সে-পথে চলাফেরা করিতে পারে। অনন্ত তো মাছ নয়। তারার স্বল্প আলোয় নদীর বুক ঝাপসা, সাদা। তারই উপর দুই একটি মাছ ফুট দিতেছে আর তারাগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। অনন্তর বিস্ময় জাগে। উপরে তো ওরা এক এক জায়গায় আঁটিয়া লাগিয়া আছে; জলে কি তবে তারা আলগা। মাছেরা কেমন তাদের কাঁপাইতেছে, নাচাইতেছে; তাদের লইয়া ভাইবোনের মত খেলা করিতেছে। কি মজা! অনন্তর মন মাছ হইয়া জলের ভিতরে ডুব দেয়।

বনমালীর নৌকা তখন পল্লীর কোল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। বর্ষাকালের বাড়তি জল কেবল পল্লীকে ছোঁয় নাই, চুপে চুপে ভরাইয়া দিয়াছে। পল্লীর কিনারায় প্রহরীর মত দাঁড়ানো কত বড় বড় গাছের গোড়ায় জল শুধু পৌঁছায় নাই, গাছের কোমর অবধি ডুবাইয়া দিয়াছে। সে গাছে ডালপালারা লতায় পাতায় ভরভরন্ত হইয়া জলের উপর কাত হইয়া মেলিয়া রহিয়াছে। বনমালীর নৌকা এখন চলিয়াছে তাদের তলা দিয়া, তাদেরই ছায়া মাথায় করিয়া। এখন তারায় ভরা আকাশটাও দূরে, আকাশের আর্শির মত নদীর বুকখানাও তেমনি দূরে।

অনন্ত অত মনোযোগ দিয়া কি দেখিতেছে? না, আকাশের তারা দেখিতেছে। উদয়তারার একটা ছড়া মনে পড়িয়া গেল। এতক্ষণ বিশ্রী নীরবতার মধ্যে তার ভাল লাগিতেছিল না। আর এক ফোঁটা একটা ছেলের সঙ্গে কিই বা কথা বলিবে! আলাপ জমিবে কেন? পাড়া গুলজার করা যার কাজ, নির্জন নদীর বুক গুলজার করিবে সে কাকে লইয়া? শ্রোতা কই, সমজদার কই? কিন্তু অনন্ত আর সব ছেলেদের মত অত বোকা নিরেট নয়। আর সব ছেলেরা যখন চোখ বুজিয়া ঘুমায় অনন্ত তখন অজানাকে জানিবার জন্য আকাশের তারার মতই চোখ দুটি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর উদয়তারার ছড়াটিও তারারই সম্বন্ধে, 'সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই; সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই, --ক দেখি অনন্ত এ-কথার মানতি কি?'

এ-কথার মানে অনন্ত জানে না; কিন্তু জানিবার জন্য তার চোখ দুইটি চকচক করিয়া উঠিল।

'সু-ফুল ছিট্যা রইছে--এই কথার মানতি আসমানের তারা। আসমানে ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই।'

অনন্ত ভাবে ছিটিয়া থাকে বটে! মানুষের হাত অত দূরে নাগাল পাইবে না। কিন্তু স্বর্গে যে দেবতারা থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিবঠাকুর, তারাও কি তুলিতে পারে না ?

তারা ইচ্ছা করিলে তুলিতে পারে, কিন্তু তোলে না। তারাই ছিটাইয়া দিয়াছে, তারাই তুলিবে? রোজ রাতে ছিটাইয়া দিয়া তারা মানুষেরে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, দিলাম ছিটাইয়া যদি কেউ পার তুলিয়া নাও। কিন্তু তুলিবার লোক নাই। এখন দেবতার পূজা হইবে কি দিয়া! শেষে তারা মাটিতে নকল ফুল ফুটাইয়া দিল। সে-ফুল রোজ ফুটে, লোকে রোজ তুলিয়া নিয়া পূজা করে। যে-সব ফুল তোলা হয় না, তারা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। বাসি হইয়া থাকে না। বাসি ফুলে ত পূজা হইতে পারে না।

দেবতারা ডাকিয়া বলে, কিন্তু শুনিতে পাই না ত?

দেবতাদের ডাক সকলে বোঝে না। সাধুমহাজনেরা বোঝে। তারা তপ করে, ধেয়ান করে, পূজা করে। তারা দেবতার কথা বোঝে, দেবতারে খাওয়াইতে ধোয়াইতে পারে। তারা দেবতার কথা শুনে, দেবতা তাদের কথা শুনে।

আমার মার কথাও দেবতা শুনিত। একদিন—কালীপূজার দিন দেবতার একেবারে কাছে গিয়া মা কি যেন বলিয়াছিল। আমাকে কাছে যাইতে দেয় নাই লোকে। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, কিছু শুনিতে পাই নাই।

আরে, এমন পূজা ত আমরাও করি। আমি এই কথা বলি না। আমি বলি সাধুমহাজনদের কথা, তারা কিভাবে দেবতার কথা বুঝে। দেবতার মূর্তি যখন চোখের সামনে থাকে, দেবতা তখন চুপ করিয়া থাকে। দেবতা যখন চোখের সামনে থাকে না, তখন দেবতার মনে আর সাধুমহাজনদের মনে কথাবার্তা চলে। আমি বলি সেই কথা। চোখে দেখিয়া কথা শুনি, সেই হইল দেবতার কথা।

সে কথা যারা, সে-সব সাধুমহাজনেরা শুনিতে পায় তারা সেই সু-ফুল তোলে বুঝি।

তোলে। তবে এই জনমে তোলে না। মাটির দেহ মাটিতে রাখিয়া তারা যখন দেবতাদের রাজ্যে চলিয়া যায়, তখন তোলে। স্বর্গে রোজ কাঁসিঘণ্টা বাজে, আর একটিমাত্র ফুল তুলিয়া তারা পূজা করে। সে-ফুলটি আবার আসিয়া ছিটিয়া থাকে!

অনন্তর মনে শেষ প্রশ্ন এই জাগেঃ গাছ দেখি না, পাতা দেখি না, খালি ফুল ধরিতে দেখি। সে-সব ফুল কি তবে বিনা গাছের ফুল!

শীতলপাটীর মত স্থির, নিশ্চল তিতাসের বুকের উপর একবার চোখ বুলাইয়া উদয়তারা বলিল, 'আর সু-শয্যা পইড়া আছে, শুইবার লোক নাই —এর মান্‌তি কই শুন্। সু-শয্যা এই গাঙ। কেমন সু-বিছনা। ধূলা নাই, ময়লা নাই, উঁচা নাই নিচা নাই—পাটীর মত শীতল। শুইলে শরীর জুড়ায়, কিন্তু শুইবার মানুষ নাই।'

আছে, আছে, একজন আছে। সে অনন্ত। জলের উপর কঠিন একটুখানি আবরণ পাইলে সে হাত পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া কাত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিতে পারে। নদীর স্রোত তাহাকে দেশদেশান্তরে ভাসাইয়া নিবে, ঢেউ তাহাকে দোলা দিবে। চারিদিকের আঁধারে কেউ জাগা থাকিবে না। জাগিয়া থাকিবে সে আর তার চারিদিকের আঁধার আর উপর আকাশের তারাগুলি। আর জাগিয়া থাকিবে জলের মাছগুলি। সে ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া তারাও তার চারিধারে দল বাঁধিয়া ভাসিয়া চলিবে। জাগিতে জাগিতে ক্লান্ত হইয়া এক সময় তার ঘুম আসিবে; রাত ফুরাইবে, কিন্তু ঘুম ভাঙিবে না, সকাল হইবে, সূর্য উঠিবে, এ-পার ও-পার দুই পারে ছেলেমেয়ে নারী-পুরুষ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া দেখিবে আর ভাবিবে অনন্ত বুঝি জলে পড়িয়া গিয়াছে। হায় হায় কি হইবে, অনন্ত জলে পড়িয়া গিয়াছে! আর তখন ঘুম ভাঙিবে, তাহাদের দিকে চাহিয়া চোখ কচলাইয়া মৃদু হসিয়া আমি তখন জলের উপর উঠিয়া বসিব, তারপর আস্তে আস্তে হাঁটিয়া তাহাদের পাশ কাটাইয়া দিনের কাজে চলিয়া যাইব।

অনন্তর কল্পনার দৌড় দেখিয়া উদয়তারা হাসিয়া উঠিল, দেহে প্রাণ থাকিতে কেউ নদীর উপর শোয় না; প্রাণপাখী যখন উড়িয়া যায়, দেহখাঁচা তখন শূন্য, যারা

পোড়াইতে পারে না, জলসই করিয়া ভাসাইয়া দেয়। এই জল-বিছানায় শুইবার মানুষ শুধু ত সে, তুই শুইতে যাবি কোন দুঃখে! তুই কি লখাই পণ্ডিত?

'হ, আমি লখাই পণ্ডিত। মোটে একটা আখর শিখলাম না, আমি হইলাম পণ্ডিত।'

আরে পড়া-লেখার পণ্ডিতের কথা কই না, কই সদাগরের ছেলের কথা। লখাই ছিল চান্দ সদাগরের ছেলে। কালনাগের দংশনে মারা গিয়াছিল। তখন একটা কলাগাছের ভেলায় করিয়া তারে জলে ভাসাইয়া দিল, আর উজান ঠেলিয়া সেই ভেলো ভাসিয়া চলিল। তার বৌ ভেলইয়া সুন্দরী ধনুক হাতে লইয়া নদীর তীরে থাকিয়া ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

'লখাই পণ্ডিত ত মরা। একলা ভেলইয়া সুন্দরী চলল–সদাগরের নাও তারে তুইল্যা লইয়া গেল না?'

ধনাগোদার ভাই মনাগোদা নিতে চাহিয়াছিল; ভেলইয়া তাকে মামাশ্বশুর ডাকাতে ছাড়িয়া দিল। মামাশ্বশুর ডাকিলে সকলেই ছাড়িয়া দেয়।

'অ বুঝলাম। ভাসতে ভাসতে তারা গেল কই?'

গেল স্বর্গে। সেখানে দেবগণের সভাতে ভেলইয়া সুন্দরী নৃত্য করিল, করিয়া মহাদেব আর চণ্ডীকে খুশি করিল। তাদের আদেশে মনসা তখন লখাই পণ্ডিতেরে জিয়াইয়া দিল।

'মরা মানুষেরে জিয়াইয়া দিল ত!'

হাঁ, জিয়াইতে গিয়া দেখে পায়ের গোড়ালি নাই। মাছে খাইয়া ফেলিয়াছে।

মরা ছিল বলিয়াই খাইয়াছে। জ্যান্ত থাকিলে লখাই পণ্ডিত মাছদের ধরিয়া ধরিয়া বাজারে নিয়া বেচিত! কিন্তু নদীর উজান ঠেলিতে ঠেলিতে একদম স্বর্গে যাওয়া যায়? যেখানে দেবতারা থাকে?

হাঁ। নদীর 'সির্জন' হইয়াছে হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসারে মিলন হইয়াছে। 'দুধিষ্ঠির' মহারাজা সেই দেশে গিয়া, তারপর হাঁটিয়া স্বর্গে গেল।

চাঁদের দেশে তারার দেশে রামধনুকের দেশে তাহা হইলে হাঁটিয়াও যাওয়া যায়। আর একটু বড় হইলে যখন রোজগার করিতে পারিবে তখন হাতে কিছু পয়সা হইবে। সেই সময় অনন্ত একবার নদীর তীর ধরিয়া হিমাইল রাজার দেশে যাইবে, আর সে-দেশ হইতে পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গে যাইবে।

অনন্তর সব শ্রদ্ধা প্রণতি হইয়া লুটাইয়া পড়ে, তুমি অত জান! তোমারে নমস্কার।

নৌকাটা হঠাৎ কিসে ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। কোমর-জলে দাঁড়ানো মোটা মোটা গাছেরা জলের উপর দিয়া অনেক ডাল মেলিয়াছে, অজস্র পাতা মেলিয়াছে। সেই ডালপাতার গহনারণ্য মাথায় করিয়া নৌকা ঘাটের মাটিতে ঠেকিয়াছে। উদয়তারার তন্দ্রা আসিয়াছিল। সচকিত হইল। বনমালী পাছার খুঁটি পুঁতিতেছে, নৌকার একটানা ঝাঁকুনিতে টের পাইল উদয়তারা।

সুদিনে তার বিবাহ হইয়াছিল, সুদিনে সে এখান হইতে বিদায় হইয়াছে। তখন এসব জায়গা ছিল ডাঙা। জল ছিল অনেক দূরে, গাঙের তলায়। তারপর উদয়তারার কত বর্ষা কাটিয়াছে জামাইবাড়িতে। এখানে কোন বর্ষার মুখ বিবাহের পর থেকে দেখে নাই। তবু পরিচিত গাছগুলি আঁধারেও তার মনে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। তার তলার

মাটি তখন শুকনা ঠনঠনে, সে মাটিতে বসিত চাঁদের হাট। ছেলেরা খেলিত গোল্লাছুট খেলা, আর মেয়েরা খেলিত পুতুলের ঘরকন্নার খেলা। কত ঠাণ্ডা ছিল এর তার বাতাস। আর এখন এর তলায় ঠাণ্ডা জল থই থই করে। উদয়তারার বয়সী মেয়েরা চলিয়া গিয়াছে পরের দেশে পরের বাড়িতে, আর ছেলেরা এখন বড় হইয়া এ জলে স্নান করে।

পান সুপারির তিনকোণা থলে, একখানা কাপড় আর টুকিটাকি জিনিসের একটা ছোট পুঁটলি গুঁছাইয়া উদয়তারা অনন্তর হাত ধরিয়া মাটিতে পা দিল।

'দিশ্ কইরা পা বাড়াইবি অনন্ত, না হইলে পইড়া যাইবি! যে পিছলা।'

পদে পদে পতনোম্মুখ অনন্ত শক্ত করিয়া উদয়তারার হাতখানা ধরিয়া বলিল, 'আমি পইড়া যাই। তুমি ত পড় না?'

'আমার বাপ-ভাইয়ের দেশ। চিনা-পরিচিত সব। বর্ষায় কত লাই-খেলা খেলাইছি, সুদিনে কত পুতুলখেলা খেলাইছি।'

'খেলায় বুঝি খুব নিশা আছিল তোমার!'

'আমার আর কি আছিল। নিশা আছিল আমার বড় ভইন নয়ন-তারার। ছোট ভইন আসমানতারারও কম আছিল না। এই খেলার লাগি মায়ে বাবায় কত গালি দিছে। পাড়ার লোকে কত সাত কথা পাঁচ কথা শুনাইছে। তিন ভইন একসাথে খেলাইছি বেড়াইছি, কেউরে গেরাহ্য করছি না। তারপর তিন দেশে তিন ভইনের বিয়া হইয়া গেল।'

'সেই অবধি দেখা নাই বুঝি?'

'না। গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু ভইনে ভইনে দেখা হয় না। বড় ভালমানুষ আমার বড় ভইন নয়নতারা আর ছোট ভইন আসমানতারা।'

তারার মেলা। অনন্ত নামগুলি একবার মনে মনে আওড়াইয়া লইল।

বনমালীর একার সংসার। বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে অত রাতে ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। আশ্চর্য হইবার কথা। সাড়াশব্দ না করিয়া উদয়তারা হাঁটুর সাহায্যে দরজায় ধাক্কা দিলে দরজা মেলিয়া গেল এবং আশ্চর্যের সহিত দেখা গেল নয়নতারা আসমানতারা দুইজনে ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে–মেজ বোন উদয়তারারই গল্প। অতদিন পরে দুইবোনেরে একসঙ্গে পাইয়া উদয়তারা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু আনন্দে চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িল। কি করিয়া আসিল তারা এ দারুণ বর্ষাকালে?

আসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ বিদেশে মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনের বরের দেখা হয়। তারা ঠিক করিয়া ফেলে, অমুক মাসের অমুক তারিখে পরিবার নিয়া এখানে মিলিত হইবে। সেকথার কেহই খেলাপ করে নাই।

'তারা দুইজনা কই?'

'পাড়া বেড়াইতে গেছে।'

'তোরা পাড়া বেড়াইতে গেলি না?'

'আমরা রাইতে পাড়া বেড়াই না, বেলাবেলি পাড়া বেড়ান শেষ কইরা ঘরে দুয়ারে খিলি দিয়া রাখি। তোরা গোকনগাঁয়ের মানুষেরা বুঝি রাইতে পাড়া বেড়াস?'

বড় বোনের দিকে চোখ নাচাইয়া উদয়তারা গুনগুন করিয়া উঠিল, 'জানি গো জানি নয়ানপুরের মানুষ, সবই জানি; অত ঠিসারা কইর না।'

এমন সময় তারা দুইজন আসিল। ছোট বোনের জামাই সঙ্গে, কাজেই নয়নতারা ও উদয়তারা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। কেবল আসমানতারার ঘোমটা কপালের নীচে নামিল। বড় বোনদের দুর্দশা দেখিয়া সে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

মালোদের দূরের মানুষের সঙ্গে দেখা হইলে আগেই উঠে মাছের কথা। কুশল মঙ্গলের কথা উঠে তার অনেক পরে। নয়নতারার বরের সামনের দিকের কয়েকটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। গোছায় গোছায় চুল পাকিয়া উঠিয়াছে, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফেও সাদা-কালোর মেশাল। যৌবন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে—তবু গায়ের সামর্থ্যে ভাঁটা পড়ে নাই। মেজ শালীর হাত হইতে হুকাটা হাতে করিয়া, মুখে লাগাইবার আগে জিজ্ঞাসা করিল, 'তিতাসে আজকাইল মাছ কেমুন পাওয়া যায়?'

'ঘরের বৌয়ানি ঘরে থাকি, আমি কি জানি মাছের খবর! আমারে কেনে, পুরুষেরে যদি পাও জিগাইও।'

'জীবনে দেখলাম না তোমার পুরুষ কেমুন জন। সাথে আন না কেনে?'

'পুরুষ কি আমার মাথার বোঝা যে, তারে ফালাইয়া আই ইচ্ছা কইরা!'

'মাথার বোঝা হইবে কেনে। হাতের কঙ্কণ, গলার পাঁচ নরী। সাথে আন ত শরীরের শোভা। না আন ত খালি শরীর।'

'শীতলীয়া কথা কইও না সাধু, হাতের কঙ্কণ হাতে থাকে, গলার হার গলায় থাকে। আর সেই মানুষ তিতাসে মাছ ধরতে চইল্যা যায়। বাড়ি আইলে যদি কই অনেক দিন দাদারে দেখি না, চলনা গো, একদিন গিয়া দেইখ্যা আই, কয়, দাদারে নিয়াই সংসার কর গিয়া। তোমারে আমি চাই না। শুনছ কথা।'

'ভুল করলা দিদি। পরাণ দিয়া চায় বইল্যাই চাই না কইতে পারছে।'

তার গলার মোটা তুলসীমালার দিকে চাহিয়া উদয়তারার খুব শ্রদ্ধা হইল। আরও শ্রদ্ধা হইল যখন দেখিল, তার চোখ দুইটি আবেশমাখা—মুখ ভাবময় হইয়া উঠিতেছে—সে গান ধরিয়াছে—'ও চাঁদ গৌর আমার শঙ্খ-শাড়ি, ও চাঁদ গৌর আমার সিঁথির সিন্দুর চুল-বান্ধা দড়ি, আমি গৌর-প্রেমের ভাও জানি না ধীরে ধীরে পাও ফেলি!'—গানের তালে তালে তার মাথাটাও দুলিতে লাগিল।

পরিবেশে আধ্যাত্মিক ভাবটা একটু ফিকা হইয়া আসিলে উদয়তারা বলিল, 'দেখ মানুষ, আমার একখান কথা। দাদার লাগি কিছু একটা করলা না। এমন কার্তিক হইয়াই দাদা দিন কাটাইব? দাদার মাথায় কি শোলার মটুক কোন কালেই উঠব না?'

'বনমালীর কথা কও? তুমি ত জান দিদি, মা বাপ ভাই বেরাদর যার নাই, ক্ষেত-পাথর জাগা-জমি যার নাই, টাকা কড়ি গয়নাগাটি যার নাই, তারে লোকে মাইয়া দেয়? অন্ততঃ তিনশ' টাকা হাতে থাকত ত দেখতাম—মাইয়ার আবার অভাব।'

তিনশ' টাকা! পর পর তিনটা বোনের বিবাহ হইয়াছে বাবা বাঁচিয়া থাকিতে। পণ লইয়াছে তিনশ' টাকা করিয়া। আর এই টাকা দিয়া সমাজের লোক খাওয়াইয়াছে। এখন বনমালীর নিকট হইতেও তিনশ' টাকা পণ লইয়া মেয়ের বাপ তার সমাজকে

খাওয়াইবে। কি ভীষণ সমস্যা! উদয়তারা চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, 'তোমার একটা ভইনটইন থাকলে দিয়া দেও।'

'আপন ভইন নাই, আছে মামাত ভইন। কিন্তু আমার কোন হাত নাই!'

এমন সময় বনমালী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিল। তার হাতে কাঁধে কোমরে অনেক কিছু মালপত্র। আতপ চাউল, গুড়, তেল—এসব পিঠা করার সরঞ্জাম আনিয়াছে।

অনন্ত বিছানার একপাশে বসিয়া এতক্ষণ নীরবে তাহাদের কথা-বার্তা শুনিতেছিল। এইবার বড় বোন নয়নতারার দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। প্রত্যেকটি কথা যেন ছেলেটা গিলিয়া খাইতেছে, প্রত্যেকটা লোককে যেন নাড়ীর ভিতর পর্যন্ত দেখিয়া লইতেছে, এমনি কৌতূহল।

'এরে তুই কই পাইলি?'

'এ আমার পথের পাওয়া! মা বাপ নাই। সুবলার বউ রাঁড়ি মানুষ করত। পরে নি গো বুঝে পরের মর্ম, একদিন খেদাইয়া দিল। বড় মায়া লাগল আমার। লইয়া আইলাম, যদি কোনদিন কামে লাগে।'

বলে কি, পরের একটা ছেলে— মাটির পুতুল নয়, কাঠের পুতুল নয়, একটা ছেলে এমনি করিয়া পাইয়া গেল? একি দেশে মানে, না দুনিয়া মানে! পেটে ধরিল না, মানুষ করিল না, পথের পাওয়া—তাই কি আপন হইয়া গেল? এমন করিয়া পরের ছেলে যদি আপন হইয়া যাইত তবে আর ভাবনা ছিল কি? কিন্তু হয় না। পরের ছেলে বড় বেঈমান।

বনমালী ও পুরুষ দুইজন একটু আগেই অন্য ঘরে চলিয়া গিয়াছিল—কোন খালে কোন বিলে কোন সালে কত মাছ পড়িয়াছিল, তার সম্পর্কে তর্কাতর্কি তখন উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে আর এঘর হইতে শোনা যাইতেছে। আসমানতারার বরের গলা সকলের উপরে। সরেস জেলে বলিয়া প্রতিবেশী দশ বারো গাঁয়ের মালোদের মধ্যে তার নামডাক আছে। সেই গর্বে আসমানতারা বলিল, 'আমারে দিয়া দে দিদি, আমি খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মানুষ করি; পরে একদিন বেঈমান পক্ষীর মত উইড়া যাউক, আমার কোন দুঃখ নাই।'

'তোর-ত দিন আছে ভইন। ঈশ্বর তোরে দিব—কিন্তু আমারে কোনকালে দিব না—এরে দিলে আমি নাচতে নাচতে লইয়া যাই!' নিঃসন্তান বুকের বেদনা নয়নতারা হাসিয়া হাল্কা করিল।

কেন আমি কি দোকানের গামছা না সাবান! কোন সাহসে আমাকে কিনিয়া নিতে চায়।—অনন্ত এই কথা কয়টি মনে মনেই ভাবিল। প্রকাশ করিয়া বলিল না।

অনন্ত ও অন্যান্য পুরুষ মানুষদের খাওয়া হইয়া গেলে তিন বোনে এক পাতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খাইল। তারপর পাশের ঘরে তিন পুরুষের বিছানা করিয়া দিয়া, অনন্তকে এ ঘরে শোয়াইয়া, তিন বোন পিঠা বানাইতে বসিল।

রাত অনেক হইয়াছে। প্রদীপের শিখা তিন বোনের মুখে হাতে কাপড়ে আলো দিয়াছে। পিছনের বড় বড় ছায়া দেওয়ালে গিয়া পড়িয়াছে। ভাবে বোঝা গেল, তারা আজ সারারাত না ঘুমাইয়া কাটাইবে।

'ঘুম আইলে কি করুম?' ছোট বোন জিজ্ঞাসা করিল।

'উদয়তারা শিলোকের রাজা। শিলোক দেউক, আর আমরা মানতি করি—ঘুম তা হইলে পলাইবে।' বলিল বড় বোন।

উদয়তারা একদলা কাই হাতের তালুতে দলিতে দলিতে বলিল, 'হিজল গছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙা পড়ে—কও, এই কথার মান্তি কি?'

'এই কথার মান্তি হাট।' বলিল আসমানতারা।

'আচ্ছা,—পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে?'

বড় বোন মানে বলিয়া দিল—'কুয়াসা।'

এইভাবে অনেকক্ষণ চলিল। অনন্তর খুব আমোদ লাগিতেছিল, কিন্তু ঘুমের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া পারিল না। শুনিতে শুনিতে সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

নিশুতি রাতে আপনা-থেকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিন বোন তখনও অক্লান্ত ভাবে হেঁয়ালী বলিতেছে আর হাত চালাইতেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুদিয়া অনন্ত তখনও কানে শুনিতেছে—'আদা চাকচাক দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙাইলে বৃথা জন্ম।'

এর মান্তি—টাকা, বলিয়া এক বোন পাল্টা তীর ছাড়ে—

ভোরের আঁধার ফিকা হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তর ঘুম পাতলা হইয়া আসিল। উঠান দিয়া কে মন্দিরা বাজাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে,—

রাই জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো,
বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই জাগো গো।

অনন্ত উঠিয়া পড়িল। পিঠা বানাইতে বানাইতে তিন বোন কখন এক সময় শুইয়া পড়িয়াছিল। অর্ধসমাপ্ত পিঠাগুলি অগোছালো পড়িয়া আছে, আর তিন বোনে জড়াজড়ি করিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রদীপটা এখনও জ্বলিতেছে, তবে উস্কাইয়া দেওয়ার লোকের অভাবে আর জ্বলিতে পারিবে না, এ স্বাক্ষর তার শিখায় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অনন্ত বাহিরে আসিল। ও-ঘরে তিনজন ঘুমাইয়াছিল, তারা নাই। শেষরাতে বনমালী জালে গিয়াছে, অতিথি দুজনও সঙ্গে গিয়াছে, এখানকার মাছধরা সম্বন্ধে জানিবার বুঝিবার জন্য।

পূবের আকাশ ধীরে ধীরে খুলিতেছে। স্নিগ্ধ নীলাভ মৃদু আলো ফুটিতেছে। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝির ডাক। গাছে গাছে পাখির কলরব। মন্দিরা বাজাইয়া লোকটা এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় চলিয়া গিয়াছে। তার গানের শেষ কলি মন্দিরার টুনটুনাটুন আওয়াজের সঙ্গে অনন্তর কানে বাজে,—

শুক বলে ওগো সারী কত নিদ্রা যাও,
আপনে জাগিয়া আগে বন্ধুরে জাগাও;
আমার রাই জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো,
বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই জাগো গো।

অনন্ত উঠানের পর উঠান পার হইয়া চলিল। যুবকরা সব নদীতে গিয়াছে। বাড়িতে আছে বুড়ারা আর বৌ ঝি মায়েরা। বুড়ারা সকালে উঠিয়া তুলসীতলায় প্রণাম

করিতেছে। প্রত্যেক বাড়িতে তুলসী গাছ, মিষ্টি গন্ধ। বৌরা উঠানগুলি ঝাড় দিয়াছে, এখন গোবরছড়া দিতেছে। হাঁটিতে হাঁটিতে এক উঠানে গিয়া দেখে, আর পথ নাই, মালোপাড়া এখানে শেষ হইয়া গিয়াছে। এরপর গভীর খাদ, তারপর থেকে কেবল পাটের জমি। পুরুষপ্রমাণ পাটগাছ কোমরজলে দাঁড়াইয়া বাতাসে মাথা দুলাইতেছে। ক্ষেতের পর ক্ষেত, তারপর ক্ষেত, শেষে আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সীমার মাঝে অসীমের এই ভোরের আলোতে ধরা দেওয়ার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে তাহার চক্ষু দুইটি আপনি আনত হইয়া আসিল। প্রকৃতির সঙ্গে তাহার এত নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাধুর্য কিন্তু একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া সে গুনগুন করিয়া নরোত্তম দাসের প্রার্থনা গাহিতেছিল, কাছে আসিয়া তাহার মনে হইল, অসীম অনন্ত সংসার পারাবারের ও-পারে আপনা থেকে জন্মিয়াছে যে বৃন্দাজী গাছ, প্রকৃতির একটি ছোট্ট সন্তান তাহার দিকে চোখ মেলিয়া নিজের প্রণতি পাঠাইয়া দিতেছে। কাঁধে হাত দিয়া আবেগের সহিত বলিল, 'নিতাই, ওরে আমার নিতাই, কাঙালেরে ফাঁকি দিয়া এতদিন লুকাইয়া কোথায় ছিলি বাপ। আয় আমার কোলে আয়।'

তার বাহুর বাঁধন দুই হাতে ঠেলিতে ঠেলিতে অনন্ত বলিল, 'আমি অনন্ত।'

'জানি বাবা জানি, তুই আমার অনন্ত! অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া; আমি দান জানি না, ধ্যান জানি না, সাধন জানি না, ভজন জানি না;—কেবল তোমারেই জানি। ধরা যখন দিছ, আর ছাড়মু না তোমায়।'

অনন্ত বিস্ময়ে অবাক!

লোকটা সহসা সম্বিৎ পাইয়া বলিল, 'হরি হে, একি তোমার খেলা। বারবার তোমার মায়াজাল ছিড়তে চাই, তুমি কেন ছিড়তে দাও না? যশোদা তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদছিল, শচীরাণী তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদছিল, রাজা দশরথ তোমারে পুত্ররূপে পাইয়া কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিল। তবু তোমারে পুত্ররূপে পাওয়ার মধ্যে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ! পুত্ররূপে একবার আইছিলা, চইলা গেলা। ধইরা রাখতে ত পারলাম না। আইজ আবার কেনে সেই স্মৃতি মনে জাগাইয়া তুললা। ভুলতে দাও হরি, ভুলতে দাও! যা বাবা, কার ছেলে তুই জানি না, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরা যা। আমার অখন অনেক কাজ। গোষ্ঠের সময় হইয়া আইল; যাই বাছারে আমার গোষ্ঠে পাঠাই গিয়া।'

খেলাগরের মত ছোট একটা মন্দির। সে ঘরে একখানা রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, আর সালুকাপড়ে মোড়া খানদুই পুঁথি। সেখানে গিয়া সে গান ধরিল, 'মরি হায়রে কিবা শোভা! রাখালগণ ডাকতে আছে ঘনঘন বৃন্দাবনে।'

একটু পরে প্রশস্ত সূর্যালোকে পাড়াটা ঝলকিত হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠিল কর্মচাঞ্চল্য। এখানে হাটবাজার নাই। এ গাঁয়ের মালোরা দূরের হাটবাজারে মাছ বেচিয়া আসে। সূতাকাটা, বাঁশের জাল বোনা, ছেঁড়া জাল গড়া, জালে গাব দেওয়া,—কারো বাড়িতে অবসর নাই। অন্তঃপুরের মেয়েদেরও অবসর নাই। নানারকম মাছের নানারকম ভাজাভুজি ঝোলঝাল রাঁধিতে রাঁধিতে তারা গলদঘর্ম হয়। দুপুর গড়াইয়া যায়। পুরুষেরা সকালে পান্তা খাইয়া কাজে মাতিয়াছিল, মায়েদের আদেশে

ছেলেরা গিয়া জানায়, ভাত হইয়াছে, স্নান কর গিয়া। জলে ডুব দিয়া আসিয়া তারা খাইতে বসে। তারপর শুইয়া কতক্ষণ ঘুমায়, সন্ধ্যায় আবার জাল দড়ি কাঁধে করিয়া নৌকায় গিয়া ওঠে। বিরাম নাই।

অতিথিবৃন্দ যেমন একদিন আসিয়াছিল, তেমনি একদিন বিদায় হইয়া গেল। বনমালীর ঘর হাসি গান আমোদ আহলাদে থই থই করিতেছিল, নীরব হইয়া গেল।

শ্রাবণ মাস, রোজই রাতে পদ্মাপুরাণ গান হয়। বনমালী রাতের জালে আর যায় না। দিনের জালে যায়। আর রাত হইলে বাড়ি বাড়ি পদ্মাপুরাণ গান গায়। এক এক রাতে এক এক বাড়িতে আসর হয়। সুর করিয়া পড়ে সেই সাধুবাবাজী–যে-জন রোজ ভোরে মন্দিরা বাজাইয়া পাড়ায় নাম বিতরণ করে, যে জন অনন্তকে সেদিন ভোরে নিতাইর অবতার বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রধান গায়ক বনমালী। তার গলা খুব দরাজ। হাতে থাকে করতাল। আর দুইটা লোক বাজায় খোল। গায়ক আছে অনেকে। কিন্তু বনমালীর গলা সকলের উপরে। সেজন্য সাধু সকলের আগে তাকেই বলে, 'তোল।'

'কি? লাচারী না দিশা?'

একখানা ছোট চৌকিতে সালু কাপড়ে বাঁধা পদ্মাপুরাণ পুঁথি। কলমী। সাধু ছাড়া এযুগের কোন মানুষের পড়ার সাধ্য নাই। সামনে সরিষা-তেলের বাতি। সলতে উস্কাইয়া চাহিয়া দেখেন যেখান থেকে শুরু করিতে হইবে তাহা ত্রিপদী। বলিলেন, 'লাচারী তোল।'

বনমালী ডানহাতে ডানগাল চাপিয়া, বাঁহাত সামনে উঁচু করিয়া মেলিয়া কাক-স্বরে 'চিতান' ধরিল,–

'মা যে-মতি চায় সে-মতি কর, কে তোমায় দোষে,
বল মা কোথায় যাই দাঁড়াইবার স্থান নাই,
আমারে দেখিয়া সাগর শোষে,
মা, আমারে দেখিয়া সাগর শোষে।'

দুই একজনে দোহার ধরিয়াছিল, যুৎসই করিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিল। ছাড়িল না শুধু অনন্ত। সুরটা অনুকরণ করিয়া বেশ কায়দা করিয়াই তান ধরিয়াছিল সে। মোটা মোটা সব গলা মাঝপথে অবশ হইয়া যাওয়াতে তার সরু শিশুগলা পায়ের তলায় মাটি-ছাড়া হইয়া বায়ুর সমুদ্রে কাঁপিতে কাঁপিতে ডুবিয়া গেল। তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবাজী বনমালীকে বলিলেন, 'পুরান সুর। কিন্তু বড় জমাটি। আইজকালের মানুষ শ্বাসই রাখতে পারে না, এসব সুর তারা গাইব কি? যারা গাইত তারা দরাজ গলায় টান দিলে তিতাসের ঐ-পারের লোকের ঘুম ভাঙত। কর্ণে করত মধু বরিষণ। অখন সব হালকা সুর। হরিবংশ গান, ভাইটাল সুরের গান অখন নয়া বংশের লোকে গাইতে পারে না, গাঁওয়ে গাঁওয়ে যে দুইচার জন পুরান গাতক অখনো আছে, তারা গায়, আর গলার জোর দেইখ্যা জোয়ান মানুষ চমকায়! সোজা একটা লাচারী তোল বনমালী।'

বনমালী সহজভাবেই তুলিল–

'সোনার বরণ দুইটি শিশু ঝলমল ঝলমল করে গো,
আমি দেইখে এলাম ভরতের বাজারে।'

বাবাজী বলিলেন, 'না এইখানে এই লাচারী খাটে না। কাইল প্রহলাদের বাড়িতে লখিন্দররে সর্পে দংশন করছিল; অখন তারে কলার ভেলাতে তোলা হইছে, ভেলা ভাসব, যাত্রা করব উজানীনগর, আর গাঙের পারে পারে ধেনুক হাতে যাত্রা করব বেহুলা। দিশা কইরা তোল।'

'অ ঠিক, সুমন্ত্র চইলে যায়রে, যাত্রা কালে রাম নাম।'

'রামায়ণের ঘুষা। তরণীসেন যুদ্ধে যাইতাছে। আচ্ছা, চলতে পারে।'

ভেলা চলিয়াছে নদীর স্রোত ঠেলিয়া উজানের দিকে; তীরে বেহুলা, হাতে তীর ধনুক। কাক শকুন বসিতে যায় ভেলাতে, পার হইতে বেহুলা তীর নিক্ষেপের ভঙ্গি করিলে উড়িয়া যায়। কত গ্রাম, কত নগর, কত হাওর, কত প্রান্তর, কত বন, কত জঙ্গল পার হইয়া চলিয়াছে বেহুলা, আর নদীতে চলিয়াছে লক্ষিন্দরে ভেলা। এইখানে ত্রিপদী শেষ হইয়া দিশা শুরু।

'এইবার চান্দসদাগরের বাড়িতে কান্নাকাটি। খেদের দিশা তোল।' বনমালী একটু ভাবিয়া তুলিল–

'সাত পাঁচ পুত্র যার ভাগ্যবতী মা;
আমি অতি অভাগিনী একা মাত্র নীলমণি,
মথুরার মোকামে গেলা, আর ত আইলা না।'

এই গানে অনন্তর বুক বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

গানের শেষে পুঁথি বাঁধিতে বাবাজী বলিলেন : অমূল্য রতনের মত ছেলে এই অনন্ত। কৃষ্ণ তাকে বিবেক দিয়াছে, বুদ্ধি দিয়াছে, তবে ভবার্ণবে পাঠাইয়াছে। ইস্কুলে দিলে ভাল বিদ্যা পাইত। তোমরা যদি বাধা না দাও, চারদিকে এখন বর্ষা, জল শুকাইয়া মাঠে পথ পড়িলে তাকে আমি গোপালখালি মাইনর ইস্কুলে ভরতি করিয়া দেই। বেতন মাপ, আর আমি যখন দশদুয়ারে ভিক্ষা করি–কৃষ্ণের জীব, তাকেও কৃষ্ণে উপবাসী রাখিবে না।

কথাটি উপস্থিত মালোদের সকলেরই মনঃপূত হইলঃ মালোগুষ্টির মধ্যে বিদ্যামান লোক নাই, চিঠি লেখাইতে, তমসুকের খত লেখাইতে, মাছ বেপারের হিসাব লেখাইতে গোপালনগরের হরিদাস সা'র পাও ধরাধরি করি, ভাল ভাল মাছ খাওয়াই। এ যদি বিদ্যামান হইতে পারে মালোগুষ্টির গৈরব।

তবে আর তাকে উদয়তারার সাথে গোকনগাঁওয়ে দিয়া কাজ নাই, এখানেই রাখ। সামনে তিন মাস পরেই সুদিন।

বনমালী স্বীকৃত হইয়া বাড়ি আসিল। কিন্তু ব্যবস্থাটা উদয়তারার মনঃপূত হইল না।

কয়েক দিন আগে পাড়াতে একটা বিবাহ গিয়াছে। এখন জামাই আসিয়াছে দ্বিরাগমনে। যুবতীরা এবং অনুকূল সম্পর্কযুক্তা বর্ষীয়সীরা মিলিয়া ঠিক করিল জামাইকে আচ্ছা ঠকান ঠকাইতে হইবে। জামাই অনেকগুলি খারাপ কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ সে তাদের জন্য পান-বাতাসা, পানের মসলা এ-সব আনে নাই; দুপুরে তার স্নানের আগে মেয়েরা গাহিতে লাগিলঃ জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে, দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র কইলো না। জামাই যদি ভদ্র হইত, বাতাসার হাঁড়ি আগে দিত। জামাই

খাইতে জানে, নিতে জানে ইত্যাদি। কিন্তু, উঁহুঁ, তাতেও কুলাইবে না। খুব করিয়া ঠকাইতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে জব্দ করা যায় তাকে। একজন সমাধান করিল, 'ভয় কি জামাই-ঠকানী আছে, বনমালীর বোন জামাই-ঠকানী। সকলেই যেন সাঁতারে অবলম্বন পাইল, বলিল, লইয়া আয় জামাই-ঠকানীরে।' সমাগত নারীদের অবাক করিয়া দিয়া উদয়তারা জানাইল যাইতে পারিবে না।

শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণও পড়া শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। আর করিয়াছে 'জালা বিয়া'র আয়োজন। বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ী ও জা'দিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণ-রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।

পূজার দিন এক সমবয়সিনী ধরিল, 'দুই বছর আগে তুই আমারে বিয়া কইরা রাখ ছিলি, মনে আছে? এই বছর তোরে আমি বিয়া করি, কেমুন লা উদি।'

'না ভইন।'

'তবে তুই কর আমারে।'

'না ভইন। আমার ভাল লাগে না।'

বিয়ের কথায় অনন্তর আমোদ জাগিল, 'কর না বিয়া, অত যখন কয়।'

'তুই কস? আচ্ছা তা হইলে করতে পারি।'

কি মজা। উদয়তারা নিজে মেয়ে হইয়া আরেকজন মেয়েকে বিবাহ করিতেছে! দুইজনেরই মাথায় ঘোমটা, কি মজা! কিন্তু অনন্তর কাছে তার চাইতেও মজার জিনিস মেয়েদের গান গাওয়াটা। তারা গাহিতেছে এই মর্মের এক গানঃ অবিবাহিতা বালিকার মাথায় লখাই ছাতা ধরিয়াছে; কিন্তু বালিকা লখাইকে একটাও পয়সা কড়ি দিতেছে না; ওরে লখাই, তুই বালিকার মাথায় ছাতা ধরা ছাড়িয়া দে, কড়ি আমি দিব। তারপরের গান : 'সেই দোকানে যায় গো বালা ঘট কিনিবারে।'

সেই ঘটে মনসা পূজা হইল, কিন্তু মনসা নদী পার হইবে কেমন করিয়া। এক জেলে, নৌকা নিয়া জাল পাতিয়াছিল। মনসা তাকে ডাকিয়া বলিল, তোর না' খানা দে আমি পার হই, তোকে ধনে পুত্রে বড় করিয়া দিব।

উঁদয়তারার এক ননাসের নাম ছিল মনসা। তাই মনসাপূজা বলিতে পারে না। স্বামী যেমন মান্য, স্বামীর বড় বোনও তেমনি মান্য। সে কনে-বৌটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'শাওনাই পূজা ত হইয়া গেল ভইন, সামনে আছে আর নাও-দৌড়ানি। বড় ভাল লাগে এইসব পূজাপালি হুড়ুম-দুড়ুম নিয়া থাকতে।'

কনে-বৌ মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া কাঁসার থালায় ধানদূর্বা পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি তুলিতে তুলিতে বলিল, 'তারপর কত পূজাই ত আছে–দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, ভাইফোঁটা'–

'কিন্তু তা ত কত পরের কথা। শাওন মাস, ভাদর মাস, তারপরে ত আইব বড় ঠাকরাইন পূজা।'

কিন্তু দুই মাস ত মোটে–তেমনি কি বেশি। ক্ষেত-পাথারের জল কমিতে লাগিবে পনর দিন। তিতাসের জল কমিয়া তার পাড়ে পাড়ে পথ পড়িতে লাগিবে আরও পনর দিন। তখন বর্ষা শেষ হইয়া যাইবে। গাঙ-বিলের দিকে চাও, দেখিবে পরিষ্কার। কিন্তু ঘর বাড়ির দিকে চাও–পরিষ্কার দেখ কি? দেখ না। পরিষ্কার না করিলে পরিষ্কার দেখিবে কি করিয়া। চারিদিকে পূজা-পূজা ভাব। লাগিয়া যাও ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার কাজে। কিন্তু কি ঘরবাড়ি পরিষ্কার করিবে তুমি? ভাঙা ঘরবাড়ি? না, পুরুষ আছে কোন দিনের তরে?

বর্ষাকালে একটানা বৃষ্টির জলে ধা'র ভাঙিয়াছে, পিঁড়া ভাঙিয়াছে, ঘনঘন তুফানের ঠেলায় বেড়াগুলি মুচড়াইয়া গিয়াছে। পুরুষেরা ছন আনিবে, বাঁশ আনিবে, বেত আনিবে–আনিয়া ঘরদুয়ার ঠিক করিয়া দিবে, তারপর মেয়ে-বৌরা তিতাসের পারের নরম সোঁদাল মাটি আনিয়া ধা'র-পিঁড়া ঠিক করিবে, লেপিবে পুঁছিবে, আরসির মত ঝকঝকে তকতকে করিবে–তাতেও কোন-না পনর দিন লাগিবে? বাকি পনর দিনের মধ্যে সাত দিনে কাঁথা কাপড় কাচিবে, চাটাই মাদুর ধুইবে, তারপর সাতদিন বাকি থাকিতে তেল-সাবান মাখিয়া দেবী হইয়া বসিয়া থাকিবে–দিন আবার ফুরায় না!

'কি লা উদি, কথা কস না যে? দিন ফুরায় না!'

একটু আগে এই মেয়েটি তাকে সাত পাক ঘুরিয়াছে; পঞ্চপ্রদীপ তার কপালের মাঝখানে ঠেকাইয়া লইয়া তাহা আবার নিজের কপালে ঠেকাইয়াছে, কতকগুলি খই আর অতসী ফুল মাথার উপর ছিটাইয়া দিয়াছে–সত্যিকারের বিবাহের মতই ভাবভঙ্গি দেখাইয়াছে –অথচ অনেক অর্থহীন অনুষ্ঠানের মত ইহা একটি পূজাবিশেষের অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু কি মজার অনুষ্ঠান! সাত বছর আগের কথা মনে করাইয়া দেয়।

সেদিন উদয়তারার সামনে বসিয়া ছিল অজানা একটা নূতন পুরুষ মানুষ–চুলদাড়ি সুন্দর করিয়া ছাঁটা, মাথায় জবজবে তেল দিয়া বাঁকা টেরি কাটা–নতুন কাপড়ে তাকে সেদিন দেবতার মত দেখা গিয়াছিল। বাস্তবিক বিবাহের দিনে পুরুষ মানুষকে কত সুন্দরই না দেখায়। তাকেও কি খুব সুন্দর দেখাইয়াছিল না সেদিন! তিন চার জনে ধরিয়া তাহাকে চুল আঁচড়ানো, তেল-সিন্দুর পরানো, চন্দন-তিলক লাগানো প্রভৃতি কর্ম করিয়াছিল। একটা কলার ডিগা সে মানুষটার গালে বুলাইয়াছিল–সে তখন ছোট বালিকা মাত্র, বুকটা তার ভয়ে দুরু দুরু করিতেছিল। চাহিতে পারিতেছিল না লোকটার চোখের দিকে, অথচ চারিদিক হইতে লোকজনে চীৎকার করিয়া কহিতেছিল, চাও, চাও, চাও, দেখ, এই সময়ে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ–চারিজনে পিঁড়ির চারিটা কোণা ধরিয়া তাহাকে উঁচু করিয়া তুলিয়াছিল–এই সময়ে সে একটুখানি চাহিয়া দেখিয়াছিল–মাত্র একটুখানি, আর চাহিতে পারে নাই, অমনি চোখ নত করিয়াছিল। সেদিন মোটে চাওয়া যায় নাই তার দিকে। কিন্তু আজ! কতবার চাওয়া যায়, কোন কষ্ট

হয় না, কিন্তু সেইদিনের একটুখানি চাওয়ার মত তেমন আর লাগে কি! সে চাওয়ার মধ্যে যে স্বাদ ছিল, সে-স্বাদ কোথায় গেল!

ভাবিতে ভাবিতে উদয়তারা একসময় ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কনেবৌ চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, 'কি লা উদি, হাসলি যে?'

'হাসি পাইল, হাসলাম। আচ্ছা, আমি ত তোর বর হইলাম, আমার মুখের দিকে চাইতে তোর লাজ লাগে নাই?'

'শুন কথা। সত্যের বিয়ার বরেরেই লাজ করলাম না, তুই ত আমার জালা বিয়ার বর।'

'সত্যের বিয়ার বরেরে তোর লাজ করে নাই? ওমা কেনে, লাজ করল না কেনে?'

'সেই-কথা এক পরস্তাবের মত! বর আমার বাপের কাছে মুনী খাটত। মা বাপ কেউ আছিল না তার। সূতা পাকাইত আর জাল বুনত। আমার বয়স আট বছর, আর তার বার বছর। সেই না সময়ে বাপে দিল বিয়া। এক সঙ্গে খেলাইছি বেড়াইছি, মাছ ধরছি মাছ কাটছি, আমি নি ডরামু তারে!'

'ও মা! সেই কথা ক।'

'একটা মজার কথা কই, শুন। বিয়ার কালে আমি ত ফুল ছিটলাম তার মাথায়, সে যত ছিটতে লাগল, কোন ফুলই আমার মাথায় পড়ল না। ডাইনে-বাঁয়ে কাঁদে পিঠে পড়তে লাগল, কিন্তুক মাথায় পড়ল না। কারোরে আমি ছাইড়া কথা কই না, আর সে ত আমরার বাড়িরই মানুষ।—খুব রাগ হইল আমার। তেজ কইরা কইলাম, ভাল কইরা ছিটতে পার না? মাথায় পড়ে না কেনে ফুল? ডাইনে-বাঁয়ে পড়ে কেনে? কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোঁসাই!'

'বরেরে তুই এমুন গালি পাড়লি? তোর মুখ ত কম খরোধরো আছিল না? বর কি করল তখন?'

'এক মুঠ ফুল রাগ কইরা আমার চোখেমুখে ছুঁইড়া মারল'—

'খুব আস্পর্দা ত! তুই সইয়া গেলি?'

'না।'

'কি করলি তুই?'

'এক ভেংচি দিলাম।'

'তুই আমারে তেমুন কইরা একটা ভেংচি দে না!'

'ধেৎ! তুই কি আমার সত্যের বর? তুই ত মাইয়া মানুষ!'

'তবে আমি তোরে দেই।'

'ধেৎ, আমরা কি অখন আর ছোট রইছি?'

'কি এমুন বড় হইয়া গেছি। বারোবছর বয়সে বিয়া হইছিল, তারপর ন'বছর —মোটে ত একুশ বছর। এর মধ্যেই বড় হইয়া গেলাম?'

'বড় হইয়া গেলি কি গেলি না, বুঝতি যদি কোলে দুই একটা ছাও-বাচ্চা থাকত। জীবনে একটারও গু-মুত কাচাইলি না, তোর মন কাঁচা শরীল কাঁচা, তাই মনে হয় বড় হইলি না; যদি পুলাপান হইত, বয়সও মালুম হইত।'

'সেই কথা ক।'

তারপর চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল। সাদা সাদা অজস্র সাপলা ফুলে শোভিত, সর্পাসনা মনসা মূর্তিটি অনন্তর চোখের সামনে ঝাপসা হইয়া আসিল, অন্যান্য পুজারবাড়িগুলিরও গান ধুমধাম ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া একসময় থামিয়া গেল।

শ্রাবণ মাসের শেস তারিখটিতে মালোদের ঘরে ঘরে এই মনসা পূজা হয়। অন্যান্য পূজার চাইতে এই পূজার খরচ কম, আনন্দ বেশি। মালোর ছেলেরা ডিঙি নৌকায় চড়িয়া জলভরা বিলে লগি ঠেলিয়া আলোড়ন তোলে। সেখানে পাতাল ফুঁড়িয়া ভাসিয়া উঠে সাপের মতো লিকলিকে সাপলা। সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া বিল জুড়িয়া ছত্রাইয়া থাকে। যতদূর চোখ যায় কেবল ফুল আর ফুল–সাদা মাণিকের মেলা যেন। ঘাড়ে ধরিয়া টান দিলে কোন জায়গায় সাপলাটা ছিঁড়িয়া যায়, তারপর টানিয়া তোল–খালি টানো আর টানো, শেষ হইবে না শীঘ্র।

এইভাবে তারা এক বোঝাই সাপলা তুলিয়া আনে। মাছেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে–মালোর ছেলেরা কেমন সাপলা তুলিতেছে। সাপলা তোলার ফাঁকে ফাঁকে মালোর ছেলেরাও চাহিয়া দেখে। জল শুকাইবে, বিলে বাঁধ পড়িবে, তখন বেঘোরে প্রাণ হারাইতে হইবে–এসব জানিয়া শুনিয়াও বোকা মাছেরা, কিসের মায়ায় যেন বিলের নিষ্কম্প জলে তিষ্টাইয়া আছে। তিতাসের স্রোতাল জলে নামিয়া পড়িলে, অত শীঘ্র ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না, ধরা যদি পড়েও, পড়িবে মালোদের জালে; সেখান থেকে লাফাইয়াও পালানো যায়। কিন্তু নমশূদ্রের বাঁধে পড়িলে হাজার বার লাফাইলেও নিস্তার নাই।

মনসার পুষ্পসজ্জা শেষ হইলে পুরোহিত আসে। মালোদের পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ। একজন পুরোহিতকে দশবারো গাঁয়ে একা একদিনে মনসা পূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। গলায় একখানা চাদর ঝুলাইয়া ও হাতে একখানা পুরোহিত দর্পণ লইয়া আসিয়া অমনি তাড়া দেয়–শীঘগির। তারপর বারকয়েক নম নম করিয়া এক এক বাড়ির পূজা শেষ করে দক্ষিণা আদায় করে। এবং আধঘণ্টার মধ্যে সারা গাঁয়ের পূজা শেষ করিয়া তেমনি ব্যস্ততার সহিত কোনো মালোকে ডাকিয়া বলে, 'অ বিন্দাবন, তোর নাওখান দিয়া আমারে ভাটি-সাদকপুরে লইয়া যা।'

শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত পদ্মাপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুঁথি সমাপ্ত করা হয় না। লখিন্দরে পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে, সেদিন মালোরা জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মাপুরাণ গায় আর খোল করতাল বাজায়।

শেষ দিন বনমালীর গলাটা ভাঙিয়া গেল। এক হাতে গাল চাপিয়া ধরিয়া, চোখ দুইটি বড় করিয়া, গলায় যথাসম্ভব জোর দিয়া শেষ দিশা তুলিল, 'বিউনি হাতে লৈয়া বিপুলায়ে বলে, কে নিবি বিউনি লক্ষ টেকার মূলে।' কিন্তু সুরে আর জোর বাঁধিল না; ভাঙা বাঁশের বাঁশীর মতো বেসুরো বাজিল। অন্যান্য যারা দোহার ধরিবে তাদের গলা অনেক আগেই ভাঙিয়া গিয়াছে। তারাও চেষ্টা করিয়া দেখিল সুর বাহির হয় না। তারা পদ্মাপুরাণ পড়া শেষ করিল। বেহুলা বিজনী বেচিতে আসিয়াছে, জায়েদের নিকটে গোপনে ডোমনীর বেশ ধরিয়া। শেষে পরিচয় হইল এবং চাঁদসদাগরের পরাজয় হইল; সে মনসা পূজা করিয়া ঘরে ঘরে মনসার পূজা খাওয়ার পথ করিয়া দিল।

বন্দনা শেষ করিয়া পুঁথিখানা বাঁধা হইতেছে। এক বৎসরের জন্য উহাকে রাখিয়া দেওয়া হইবে। আবার শ্রাবণ আসিলে খোলা হইবে। একটা লোক ঝুড়ি হইতে বাতাসা ও খই বিতরণ করিতেছে। লোকে এক একজন করিয়া খই বাতাসা লইয়া প্রস্থান করিতেছে। যাহাদের তামাকের পিপাসা আছে তাহারা দেরি করিতেছে। এদিকে পূজার ঘরের অবস্থা দেখিলে কান্না পায়। আগের দিন পূজা হইয়াছে। তখন দীপ জ্বলিয়াছিল, ধূপ জ্বলিয়াছিল; দশ বারোটি তেপায়ায় নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সদ্য রঙ দেওয়া মনসামূর্তি যেন জীবন্ত হইয়া হাসিতেছিল; আর তার সাপ দুইটা বুঝিবা গলা বাড়াইয়া আসিয়া অনন্তকে ছোবলই দিয়া বসে—এমনি চকচকে ঝকঝকে ছিল। আজ তাদের রঙ অন্যরকম। অনিপুণ কারিগরের সস্তায় তৈয়ারী একদিনের জৌলুস, রঙচটা হইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। কোন অসাবধান পূজার্থীর কাপড়ের খুঁটে লাগিয়া একটা সাপের জিব ও আরেকটা সাপের ল্যাজ ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের দিকে চাহিলে অনুকম্পা জাগে। রাশি রাশি সাপলা ছিল মূর্তির দুই পাশে। ছেলেরা আনিয়া এখন খোসা ছাড়াইয়া খাইতেছে আর অটুট খোসাটার মধ্যে ফুঁ দিয়া বোতল বানাইতেছে। কেউ কেউ সাপলা দিয়া মালা বানাইয়া গলায় পরিতেছে। অনন্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। একটি ছোট মেয়ে তেমনি কয়েক ছড়া মালা বানাইয়া কাহার গলায় পরাইবে ভাবিতেছিল। অনন্তর দিকে চোখ পড়াতে তাহারই গলায় পরাইয়া দিল। অনন্ত চট করিয়া খুলিয়া আবার মেয়েটির খোঁপায় জড়াইয়া দিল। চক্ষুর নিমিষে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। মেয়েটির দিকে চাহিলে প্রথমেই চোখ পড়িবে এই খোঁপার উপর। ছোট মেয়ের তুলনায় অনেক বড় সে-খোঁপা। সাত মাথার চুল এক মাথায় করিয়া যেন মা বাঁধিয়া দিয়াছে।

খুশি হইয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কোনদিন ত দেখি নাই তোমারে; তোমার নাম কি?'

'অনন্ত। আমার নাম অনন্ত।'

'দূর, তা কেম্‌নে হয়! ঠিক কইরা কও, তোমার নাম কি?'

'ঠিক কথাই কই। আমার নাম অনন্ত।'

'তবে আমার মত তোমার খোঁপা নাই কেনে; আমার মত তুমি এই রকম কইরা শাড়ি পর না কেনে? তোমার নাক বিন্ধা নই কেনে, কান বিন্ধাইয়া কাঠি দেয় নাই কেনে; গোধানি কই, হাতের চুড়ি কই তোমার?'

'আরে, আমি যে পুরুষ। তুমি ত মাইয়া।'

'তবে তোমার নাম অনন্ত না।'

'না! কেনে?'

'অনন্ত যে আমার নাম। তোমার এই নাম হইতে পারে না।'

'পারে না? ওমা, কেনে পারে না?'

'তুমি পুরুষ। আমার নাম কি তোমার নাম হইতে পারে?'

'হইতে পারে না যদি, তবে এই নাম আমার রাখল কেনে। আমার মা নিজে এই নাম রাখছে। মাসীও জানে।'

'কেবল মাসী জানে? আর কেউ না?'

'যে-বাড়িতে আছি, তারা দুই ভাই-ভইনেও জানে।'

'এই? আর কেউ না! ওমা, শুন' তবে। আমার নাম রাখছে গণক ঠাকুরে। জানে আমার মায় বাবায়, সাত কাকায়, আর পাঁচ কাকীয়ে; আর ছয় দাদা আর তিন দিদিয়ে, চার মাসী দুই পিসিয়ে।'

'ও বাব্বা!'

'আরো কত লোকে যে জানে। আর কত আদর যে করে। কেউ মারে না আমারে।'

'আমারেও কেউ মারে না। এক বুড়ি মারত, মাসী তারে আটকাইত।'

'মাসী আটকাইত, ত মা আটকাইত না?'

'আমার মা নাই।'

মেয়েটি এইবার বিগলিত হইয়া উঠিল, 'নাই! হায়গো কপাল! মানুষে কয়, মা নাই যার ছাড় কপাল তার।'

অনন্তর নিজেকে বড় ছোট মনে হইল। চট করিয়া বলিল, 'মাসী আছে।'

মেয়েটি ভুরু বাঁকাইয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িল, 'মাসী আছে তোমার, তবু ভালা। মানুষে কয়, তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা।'– বলিয়া হঠাৎ মেয়েটি কোথায় চলিয়া গেল।

অনন্ত মনে মনে ভাবিল, বাব্বা, খুব যে শিলোক ছাড়ে। উদয়তারার কাছে একবার নিয়া গেলে মন্দ হয় না।

একটু পরেই পূজামণ্ডপের সামনে মেয়েটির সহিত আবার দেখা হইল।

'আচ্ছা, আমারে তোমার মাসীর বাড়ি লইয়া যাইবা?'

'কেমন লইয়া যামু। অনেক দূর যে। নাওয়ে গেলে এক দুপুরের পথ।'

'মানুষে কি মানুষেরে দূরের দেশে লইয়া যায় না?'

'যায়। কিন্তু অখন যায় না। বৈশাখ মাসে তিতাসের পারে মেলা হয়। তখন লইয়া যায়। অনেক দূর থাইক্যা অনেক মানুষ তখন অনেক মানুষেরে লইয়া যায়।'

'তখন আমারেও লইয়া যাইও। কেমুন?'

'আমার ত নাও নাই। আচ্ছা বনমালীরে কইয়া রাখুম। তার নাওয়ে যাইতে পারবা।'

'পরের নাওয়ে বাবা যাইতে দিলে ত?'

'খালের টেকের ভাঙা নাওয়ের খোড়ল থাইক্যা সাতদিনের উপাসী মানুষেরে যে-জন বাইর কইরা আনল, তারে কও তুমি পর! কি যে তুমি কও।'

মেয়েটির চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'খালের টেকে ভাঙা নাওয়ের খোড়লে তুমি থাকতা, ডর করত না তোমার? রাইতে দেও-দৈত্য যদি দেখা দিত। কও না, কি কইরা তুমি থাক্‌তা এক্‌লা–'

'সে এক পরস্তাবের কথা। কইতে গেলে তিনদিন লাগব।'

'তোমরার গাঁওয়ে আমারে লইয়া যাইবা? সেই নাওখান দেখাইবা?'

'আচ্ছা নিয়া যামু।'

'নিবা যে, তোমার মাসী আমারে আদর করব ত তোমার মত?'

'হ, তোমারে করব আদর! আমারেই বইক্যা বাইর কইরা দিল।'

'কও কি। বাইর কইরা দিল, আর ডাইক্যা ঘরে নিল না?'

'না।'

'তবে গিয়া কাম নাই। তুমি আমরার বাড়িতেই চল। কেউ তোমারে বাইর কইরা দিব না। যদি দেয়ও, আমি তোমারে ডাইক্যা ঘরে নিমু।'

কথাগুলো অনন্তর খুব ভাল লাগিল। একঘর ভরতি লোকের মধ্যে থাকিতে খুব ভাল লাগিবে। সেখানে দশটি লোকে দশ রকমের কথা বলিবে, বিশ হাতে কাজ করিবে, দশমুখে গল্প করিবে– একটা কলরবে মুখরিত থাকিবে ঘরখানা। তার মধ্যে এই চঞ্চল মেয়েটি তার সঙ্গে খেলা করিবে, জালবোনা মাছধরা খেলা। অনন্ত সত্যিকারের জেলে হইয়া নৌকাতে না উঠা পর্যন্ত তাকে এই খেলার মধ্য দিয়াই জাল ফেলা জাল তোলা আয়ত্ত করিতে হইবে।

একটা করুণ সুর তার মনে গুন গুন করিয়া উঠিল। তার জগৎ বেদনার জগৎ। এ জগতে হাসি নাই আমোদ নাই। আপনজন না থাকার ব্যথায় তার জগৎ পরিম্লান। আকাশে তারা আছে, কাননে ফুল আছে, মেঘে রঙ আছে। তিতাসের ঢেউয়ে সে-রঙের খেলা আছে, সব কিছু নিয়াও এই রূপোন্মত্ত বহির্বিশ্ব তার মনের ম্লানিমার সঙ্গে একাকার। একটার পর একটা সাগরের ঢেউয়ের মত কি যেন তার সারা মনটা ডুবাইয়া চুবাইয়া দেয়। তখন সে চাহিয়া দেখে, কূল নাই, সীমা নাই, খালি জল আর জল। দুই তীরের বাঁধনে বাঁধা তিতাসের সাধ্য কি সে জল আপলায়। এ যেন বার-দরিয়ার নোনা জল–ছোট তটিনীর সকল নৃত্যবিলাসকে তলাইয়া দিয়া জাগিয়া থাকে শুধু একটানা হাহাকার।

অনন্ত ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চায় মনে মনে। দেখে এত বিশাল বিপুল সময়ের মহাস্রোতে সে বুঝি বা একখণ্ড দুর্বল কুটার মতই ভাসিয়া চলিয়াছে। কিছুদিন আগে একমাত্র মাকে আপন বলিয়া জানিত। তারপর মাসী। কিন্তু সে যে আসলে তার কেউ না, অনন্তর এ বোধ আছে। বনমালী উদয়তারা এরাও দুইদিনের পথের সাথী। এরা যেদিন মাসীর মতই তাকে পর করিয়া দিবে সেদিন সে কোথায় যাইবে!

কোথায় আর যাইবে। একটা পান্থশালা জুটিয়া যাইবেই। যে ছাড়িতে পারে তার জুটিতেও বিলম্ব হয় না। পান্থশালারই মত এই মেয়েটির সংসারে ঢুকিয়া পড়িলে ক্ষতি কী?

তিনটি নারী একযোগে অনন্তর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসী তার একান্তই অসহায়। তিক্তবিরক্ত বাপ মার অনাত্মীয় পরিবেশে সে নিতান্তই অসহায়। অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানের যে যোগ-সূত্র আছে, ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াইয়া সে-সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। একটা নগণ্য খড়কুটার মতই সেও সময়ের মহাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তিতাসের জলে হাজারো খড়কুটা ভাসিয়া যায়; কিন্তু কোন না কোন মালোর জালে তারা আটকা পড়িবেই পড়িবে। কিন্তু মাসীর ভবিষ্যৎ, কোন অবলম্বনের গায়েই আটকা পড়িবে না।

আর উদয়তারা? অনেক বেদনা তার মনে জমা হইয়া আছে, কিন্তু বড় কঠিন এ নারী। হাস্য পরিহাসে, প্রবাদে শ্লোকে সব বেদনা ঢাকিয়া সে নারী সব সময়ে মুখের

হাসি নিয়া চলে। তাহাকে জব্দ করিবে এমন দুঃখ বুঝি বিধাতাও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মাসী তার মত সকল দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা পাইল না কেন? হায়, তাহা যদি সে পাইত, অনন্তর মন অনেক ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইত। আর এই হাস্যচঞ্চল মেয়েটি। এর জীবন সবে শুরু হইয়াছে। সে নিজে যেমন চাঁদের রোশনি, তেমনি অনেক থমথমে আকাশের তারাকে সে কাননের ফুলের মত বোঁটায় আঘাত করিয়া ফুটাইয়া ছিটাইয়া হাসাইতে মাতাইতে সক্ষম। সে যদি সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিত। তবে তার মনের ম্লানিমাটুকু একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া যাইত।

মেয়েটি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। অনন্ত চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'হাস কেনে?'

মেয়েটির চোখ দুটি নাচিয়া উঠিল, 'তোমার গলায় যে মালা দিলাম ; কারো কাছে কইও না কইলাম।'

'কইলে কি হইবে ?'

'তোমারে বর বইল্যা মানুষে ঠাট্টা করব।'

'দূর। আমি কি শ্যামসুন্দর বেপারী, আমার কি ঐ রকম বড় বড় দাড়ি আছে যে আমারে বর কইব !'

'বরের বুঝি লম্বা দাড়ি থাকে ? মিথ্যুক।'

'আমি নিজের চোখে দেখলাম। মা আমারে সাথে কইরা নিয়া দেখাইছিল। আরো কত লোক দেখতে গেছিল। তারা কইল, এতদিন পরে বরের মত বর দেইখ্যা নয়ন সার্থক করলাম।'

'ও, বুঝছি। বুড়া, বুড়া বর। সে ত বুড়া কিন্তু তুমি ত বুড়া না।'

অনন্ত বুড়া কিনা ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। এমন সময় ডাক আসিল, 'কইলো অনন্তবালা, ও সোনার-মা।'

মায়ের আহ্বান। আদুরে মেয়ে। মা তাকে ডাকিতে দুইটি নামই ব্যবহার করেন। খাওয়ার সময় হইয়াছে। তার আগে নাইবার জন্য এই আহ্বান।

অন্য একটি মেয়ে সাপলা চিরিয়া বোতল বানাইয়াছে, তাতে গ্রন্থি পরাইতেছিল। সে মাথা না তুলিয়াই ছড়া কাটিল, 'অনন্তবালা, সোনার মালা, যখনি পরি তখনি ভালা।'

'দেখলা ত, আমার নাম কতজনে জানে। আমার নাম দিয়া শিলোক বানাইছে। মা ডাক্‌তাছে। আমি যাই যে কথা কইলাম—কারো কাছে কইও না, কেমুন?'

'না।'

'আমি কিন্তু কইয়া দিমু।'

'কি?'

'তুমি আমার খোঁপায় মালা দিছ—এই কথা।'

'কার কাছে?'

'মার কাছে?'

অনন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

'আরে না না। মা তোমারে বকব না। আদর করব। তুমিও চল না আমরার বাড়িত!'

অনন্ত বলিল, 'না।'

মাসীর জন্য তার মনটা এই সময় বেদনায় টন টন করিয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় তিতাসের বুকে কিসের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ছেলের দল পূজার বাড়ি ফেলিয়া দৌড়াইয়া চলিল নদীর দিকে। সকলেরই মুখে এক কথা–দৌড়ের নাও, দৌড়ের নাও।

নামটা অনন্তর মনে কৌতূহল জাগাইল। অনেক নাও সে দেখিয়াছে, এ নাও ত কই দেখে নাই। ঘাটে গিয়া দেখে সত্যি এ দেখিবার জিনিসই বটে। অপূর্ব, অপূর্ব।

রাঙা নাও। বর্ষার জলে চারিদিক একাকার। এদিকে ওদিকে কয়েকটি পল্লী যেন বিলের পানিতে সিনান করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিতাসের বুক সাদা, তার পারের সীমার বাহিরে সাপলা-সালুকের দেশ, অনেক দূরে ধানক্ষেত পাটক্ষেত, তাহাও জলে ভাসিতেছে। নৌকাটি তিতাস পার হইয়া দূরের একখানা পল্লীর দিকে রোখ করিয়াছে। গলুইটা জলের সমান নিচু। সরু ও লম্বা পাছাটা পেটের পর হইতে উঁচু হইয়া গিয়া আকাশে ঠেকিয়াছে; হালের কাঠিটা তির্যকভাবে আকাশ ফুঁড়িবার মতলবে যেন উঁচাইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে ধরিয়া একটা লোক নাচিতেছে আর পাটাতনে পদাঘাত করিতেছে। লোকটাকে একটা পাখির মত ছোট দেখাইতেছে। ডরার উপর দাঁড়াইয়া একদল লোক খোল করতাল বাজাইয়া সারি গাহিতেছে। আর তাহারই তালে তালে দুই পাশে শত শত বৈঠা উঠিতেছে, নামিতেছে, জল ছিটাইয়া কুয়াসা সৃষ্টি করিতেছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পাওয়া গেল না। পল্লীর গাছপালা ঘরবাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ছেলেরা অনন্তকে সান্ত্বনা দিল, গাঁয়ের এই পাশ দিয়া আড়ালে পড়িয়াছে, ঐ-পাশ দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইবে। কিন্তু আর বাহির হইল না।

কেন বাহির হইল না জিজ্ঞাসা করিতে ছেলেরা জানাইল, হয়ত ঐ গাঁয়ের ঐ-পাশটিতে ওদের ঘরবাড়ি। নৌকা সাজাইয়া রঙ করাইয়া লোকজন লইয়া তালিম দিতে গিয়াছিল। পাঁচদিন পরেই বড় নৌকা-দৌড় কিনা। নাও কেমন চলে দেখিবার জন্য একপাক ঘুরিয়া আসিয়াছে। এখন ওদের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া যে-যার বাড়ি খাইতে চলিয়া গিয়াছে।

আর নয় তো ঐ-গাঁয়ের আড়াল দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে দূরের কোন খলায় দৌড়াইবার জন্য।

শেষের কথাটাই অনন্তর নিকট অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। যেরকম সাপের মত হিস হিস করিয়া চলিয়াছিল, ঐ-গাঁয়ে উহা থামিতেই পারে না। সারা গায়ে লতাপাতা সাপ ময়ূরের ছবি লইয়া রঙিন দেহ তার একের পর এক পল্লীর পাশ কাটাইয়া আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মন পাগল করিয়া ছুটিয়াই চলিয়াছে। সারাদিন চলিবার পর কোথায় রাত্রি হইবে কে জানে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাঙা নাও

চৈত্র মাসের খরায় যখন মাঠঘাট তাতিয়া উঠিয়াছিল, তখন বিরামপুর গ্রামের কিনারা হইতে তিতাসের জল ছিল অনেকখানি দূরে।

পল্লীর বুক চিরিয়া যে-পথগুলি তিতাসের জলে আসিয়া মিশিয়াছে, তারা এক একটা ছিল এক-দৌড়ের পথ। কাদিরের ছেলে ছাদির তার পাঁচ বছরের ছেলে রমুকে তেল মাখাইয়া রোজ দুপুরে এই পথ দিয়া তিতাসে গিয়া স্নান করিত। ছাদির তাহাকে কোলে করিয়া ঘাটে যাইত আর তার পেটের ও মুখের জবজবে তেল বাপের কাঁকালে ও কাঁধে লাগিত। বাঁ হাতে বাপের কাঁধ ধরিয়া ডান হাতে সেই তেল মাখাইয়া দিতে দিতে মাঝ পথে রমু জেদ ধরিত, 'বাজান, তুই আমারে নামাইয়া দে।' কিন্তু বাপ কিছুতেই নামাইত না। বরং তার নরম তুলতুলে শরীরখানা দিয়া নিজের শক্ত পেশীবহুল শরীরে রগড়াইতে থাকিত, আর মনে মনে বলিত, কি যে ভাল লাগে।

তারপর ঘাটে গিয়া এক খামচা বালি তুলিয়া নিজের দাঁত মাজিত এবং ছেলের দাঁতও মাজিয়া দিত। গামছা দিয়া ছেলের গা, নিজের গা রগড়াইয়া ছেলেকে লইয়া গলা-জলে গিয়া ডুব দিত। কখনও একটু আলগা করিয়া ধরিয়া বলিত, 'ছাইড়া দেই?' রমু তার কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, 'দে ছাইড়া।'

পরিষ্কার জল ফট ফট করে, তাতে মৃদুমন্দ স্রোত। কাটারিমাছ ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করে। বাপ-ব্যাটার গায়ের তেল জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তারই নীচে থাকিয়া ছোট ছোট মাছেরা ফুট ছাড়ে। রমু হাত বাড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে, পারে না।

ধরিত্রীর সারাটি গা ভীষণ গরম। একমাত্র ঠাণ্ডা এই তিতাসের তলা। জল তার বহিরবয়বে ধরিত্রীর উত্তেজনা ঠেলিয়া নিজের বুকের ভিতরটা সুশীতল রাখিয়াছে এই দুই বাপ-ব্যাটার জন্য। অনেকক্ষণ ঝাপাইয়া ঝুপাইয়াও তৃপ্তি হয় না, জল হইতে ডাঙায় উঠিলেই আবার সেই গরম। ছাদির শেষে ছেলেকে বলিল, 'তুই কান্ধে উঠ, তরে লইয়া পাতাল যামু।' রমু কার কাছে যেন গল্প শুনিয়াছে, জলের তলে পাতাল-নাগিনী সাপ থাকে। বলিল, 'না বাজান, পাতাল গিয়া কাম নাই, শেষে তরে সাপে খাইলে আমি কি করুম ক'।'

ছেলেপিলের ভয়-ডর ভাঙাইতে হয়। তাই ধমক দিয়া বলিল, 'সাপের গুস্টিরে নিপাত করি, তুই কান্ধে উঠ।' বাপের দুই হাতের আঙুল শক্ত করিয়া ধরিয়া রমু তার কাঁধে পা রাখিয়া এবং কাঁপিয়া কাঁপিয়া শরীরের ভারসাম্য রাখিতে রাখিতে অবশেষে সটান স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল। শেষে খুশির চোটে হাততালি দিতে দিতে বলিল, 'বাজান, তুই আমারে লইয়া এইবার পাতাল যা।'

ছেলের খুশিতে তারও খুশি উপচাইয়া উঠিল, সেও হাত দুইটা জলের উপর তুলিয়া তালি বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'দম দম তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই।'

ঘাটে নানা বয়সের স্ত্রীলোকেরা নাইতে ধুইতে আসিয়াছিল, কেউ কেউ বলিল—'কি রকম কুয়ারা করে দেখ।'

—'হইব না? কম বয়সে পুলা পাইছে, পেটে থুইব না পিঠে থুইব দিশ করতে পারে না।'

জল হইতে উঠিয়া ছেলের গা মুছাইয়া ছোট দুই-হাতি লুঙ্গিখানা পরাইয়া বলিল, 'এইবার হাঁইট্যা যা।'

কয়েক পা আগাইয়া শক্ত মাটিতে পা দিয়া দেখে আগুনের মত গরম। পা ছোয়াইলে পুড়িয়া যাইতে চায়। করুণ চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, 'বাপ আমারে কোলে নে, হাঁটতে পারি না।'

বাপের কোলে চড়িয়া তার বুকের লোমগুলির মধ্যে কচি গালটুকু ঘষিতে ঘষিতে রমু বলিল, 'বাপ, তুই আমারে খড়ম কিন্যা দে। এমুন ছোট্ট ছোট্ট দুইখান খড়ম, তা হইলে আর ত'র কোলে উঠতে চামু না।'

'পাওয়ে গরম লাগে! ওরে আমার মুনশীর পুত রে! পাওয়ে গরম লাগলে জমিনে কাম করবি কেমনে?'

উঠানে পা দিবার আরেকটু বাকি আছে। তিতাস হইতে এক চিলতা খাল গ্রামখানাকে পাশ কাটাইয়া সোজা উত্তর দিকে গিয়াছে। মেটে হাঁড়ি-কলসী বোঝাই একটা নৌকা জোয়ারের সময় খালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, ভাঁটায় আটকা পড়িয়াছে। লাল-কালো হাঁড়িগুলি খালের পাড় ছাড়াইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে দেখা যায়, রোদে সেগুলি চিক চিক করিতেছে। সেদিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া রমু বলিল, জমিনে কাজ করিবে না, পাতিল বেপার করিবে।

'ঠুনকা জিনিস লইয়া তারা গাঙে গাঙে চলা ফিরা করে, নাওয়ে নাওয়ে ঠেস্-টাকুর লাগলে, মাইট্যা জিনিস ভাইঙ্গা চুরমুচুর হইয়া যায়। তুই যে রকম উটমুইখ্যা, তুই নি পারবি পাতিলের বেপার করতে?'

'—তা অইলে আম-কাঠালের বেপার করুম।'

'নাওয়ে আম-কাঠাল বড় পচে। কোনো গতিকে দুই একটাতে পচন লাগলে, এক ডাকে সবগুলিতে পচন লাগে, তখন নাও ভরতি আম-কাঠাল জলে ফালাইতে হয়। লাভে-মূলে বিনাশ। তুই যে রকম হুঁস-দিশা ছাড়া মানুষ, পচা লাগলে টের নি পাইবি; শেষে আমার বাপের পুঁজি মজাইয়া বাপেরে আমার ফকির বানাইবি।'

'— তা হইলে বেপার কইরা কাম নাই।'

'—হ বাজি। বেপারীরা বড় মিছা কথা কয়। সাত পাঁচ বারো কথা কইয়া লোকেরে ঠকায়; কিনবার সময় বাকি, আর বেচবার সময় নগদ। আর যে পাল্লা দিয়া জিনিস মাপে, তারে কিনবার সময় রাখে কাইত কইরা, আর বেচবার সময় ধরে চিত কইরা। এর লাগি ত'র নানা বেপারীরে দুই চক্ষে দেখতে পারে না। তুই যদি বড় হইয়া ময়-মরুব্বির হাল-গিরস্তি ছাইড়া দিয়া বেপারী হইয়া যাস তা হইলে ত'র নানা ত'রেও চোর ডাকব, আর—'

'আর কি—'

'শালা ডাকব।'

রমু একটু হাসিয়া ফেলিল; অপমানাহত হইয়া বলিল, 'অখন আমারে নামাইয়া দে।' মুখে তার কৃত্রিম ক্ষোভের চিহ্ন।

ক্ষেতে কাজের ধুম পড়িয়াছে। ছাদিরের মোটে অবসর নাই। ছেলের দিকে চাহিবার সময় নাই। ছেলের মার হাতেও এত কাজ যে, দুই হাতের দশগাছা বাঙরীর মধ্যে দুইখানা ভাঙিয়া ফেলিল। ছেলের মা হওয়ার পর হইতে সংসারে তার গৌরব বাড়িয়াছে, কিন্তু শ্বশুর কাদির মিয়া তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিলেও তার বাপকে ছাড়িয়া কথা কহিবে না। কোন একবার খাইতে বসিয়া যদি দেখে বেটার বৌর হাতের অতগুলি বাঙরীর মধ্যে কয়েকটা কম দেখা যাইতেছে, তবে নিশ্চয়ই শালার বেটি বলিয়া গালি দিবে, কেহ আটকাইতে পারিবে না। সন্ধ্যায় বেদেনী আসিলে তাহার নিকট হইতে দুই পয়সার দুইটি বাঙরী কিনিয়া পুরাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পয়সা ছাদির দিলে ত! নিজেকে তাহার যেন বড়ই অসহায় মনে হইতে লাগিল। এই রকম মাঝে মাঝে হয়; তখন সে পুত রমুর দিকে তাকায়, তাকে আদর করে, কোলে নেয়, ভাবে, সে বড় হইয়া যখন সংসারের দায়িত্বের অংশ লইবে তখন কি তার মার কিছু কিছু স্বাধীনতা এ সংসারে বর্তাইবে না? এখনও রমুর দিকে চাহিবার জন্য তাহার চোখ দুইটি সতৃষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথায় রমু?

রমু ততক্ষণে খালের পাড়ে। হাঁড়ি-বোঝাই নৌকাটির জন্য সারাক্ষণ তার মন কৌতূহলী হইয়া থাকিত। বিকাল পড়িতে বাপকে অনুপস্থিত ও মাকে কাজে ব্যস্ত দেখিয়া সে একবার হাঁড়ির নৌকাখানা দেখিতে আসিয়াছে।

হাঁড়ির একটা পাহাড় যেন ঠেলিয়া মাথা উঁচু করিয়াছে। নৌকাখানা বড়। চারিদিকে খুঁটি গাড়িয়া খোঁয়াড় বানাইয়া হাঁড়ির কাড়ি পরতে পরতে বড় করিয়াছে। সকালে ঝুড়ি-ঝুড়ি হাঁড়ি বিক্রয় করিতে গাঁয়ে গিয়াছিল। ধান কড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিয়াছে, খাইয়াছে,—এখন উহারা বিশ্রামে ব্যস্ত।

বিরাট একটা দৈত্যের মত নৌকাখানা এখানে আটকা পড়িয়াছে। জল শুকনা। নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু লোকগুলির মনে সেইজন্য কোনই দুশ্চিন্তা দেখা যাইতেছে না। তারা যেন দিনের পর দিন এইভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি হাঁড়ি লইয়া গাঁওয়াল করিতে যাইবে। তারপর সব হাঁড়ি কলসী বিক্রয় হইয়া গেলে একদিন জোয়ার আসিবে, তিতাসের জল ঠেলিয়া খালে আসিয়া ঢুকিবে, এবং বহুদিন পর এই বিরাট দৈত্য গা নাড়া দিয়া উঠিবে। ইহার পর আর তাহাদিগকে কোন দিন দেখা যাইবে না। প্রতি বারে নতুন নতুন গাঁয়ে গিয়া ইহারা পাড়ি জমাইবে। তাই কি তাহাদের মনে স্ফূর্তি?

ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছে, একজন বারমাসী গান তুলিয়াছে—'হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ। আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ ॥ বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাপ মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই ॥

রমু তীরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল।

খালের ওপারে কাঁচি হাতে দাঁড়াইয়া আরও একজন শুনিতেছিল সেই গান। সে ছাদির। কি একটা কাজের কথা মনে পড়ায় সকাল সকাল কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল সে।

গান চলিতে লাগিল স্তবকের পর স্তবক—পদের পর পদ। বিরহ-বেদনাচ্ছন্ন করুণ সুরের গানখানা বৈকালিক ঠাণ্ডা হাওয়াকে বিষাদে ভারী করিয়া তুলিতেছিল। এক বিচ্ছেদাকুলা নারীর এক বুক-সেঁচা ফরিয়াদ পাতিল-ব্যাপারীর কণ্ঠস্বরে যেন ধরা দিয়াছে। সে-নারী মাসের পর মাস প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখভার গানের তানে হালকা করিয়া দিতেছে।

'আসিল আষাঢ় মাস হায় হায়রে। এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি। যেহ সাধু পাছে গেছে সেহ আইল আগে। হাম নারীর প্রাণের সাধু খাইছে লঙ্কার বাঘে ॥'

অবশেষে আসিল পৌষ মাস—'হায় হায়রে, এহিত পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী। এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি ॥ কেহ চায় রে আড়ে আড়ে কেহ চায় রে রইয়া। কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া ॥'

একটু পরে সন্ধ্যা নামিবে। বৌ-ঝিরা ওপারের ওই পথ দিয়া নদীতে যাইতেছে, কেহ কেহ ফিরিয়া আসিতেছে। গানের কথাগুলি শুনিয়া ছাদির ব্যথিত হইল। ডাকিয়া বলিল, 'অ পাতিলের নাইয়া, এই গান তোমরা ইখানে গলা ছাইড়া গাইও না, মানা করলাম।'

পলকে গান থামিয়া গেল। বাধা পাইয়া গায়কের মুখ বেদনায় মলিন হইয়া গেল। কোন উত্তর না দিয়া সে মাথা নিচু করিল।

ছাদিরের মনে বড় কষ্ট হইল। তাই তো ওতো কেবল গানই গাহিয়াছে, গানের কথার ভিতর কি আছে না আছে সেদিকে তো তার লক্ষ্য ছিল না। আপন সুরে আপনি মাতোয়ারা হইয়া সে তো কেবল কোন বিস্মৃত যুগের কোন বিরহিনী নারীর কথাগুলি বৈকালী-হাওয়ায় মাঠের বুকে ঢালিয়া দিয়াছে মাত্র। তার দোষ কোথায়? হাঁটুজলে খাল পার হইয়া ছাদির এপারে আসিল, তারপর ছেলের হাত ধরিয়া ফিরিতে ফিরিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'গান থামাইলা ক্যান, গুনগুনাইয়া গাও, গুনগুনাইয়া গাও।'

উঠানের বুকটা চিতানো। জল জমিতে পারে না, সব সময় শুকনা ঠনঠনে। বিকালে একপাল হাঁসমুরগী সেখানে ঝি-পুত লইয়া চরিয়া বেড়াইয়াছে এবং সারাটা উঠান নোংরা করিয়াছে। গোলায় অজস্র ধান। সারা বছর খাইয়া বিলাইয়া, হাঁড়ি-পাতিল খইয়ের-মোয়া রাখিয়াও সে-ধান কমে না, এমনি অজস্র। ঢেঁকিঘরে সাপের গর্ত ধরা পড়িয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গিয়া ধান ভানা চলে না। জ্যোৎস্না রাতের সাঁঝ। সেই উঠানেরই একদিকে ননদদের লইয়া ধান ভানিতে হইবে। মস্তবড় ঝাঁটাখানা দুই হাতে ধরিয়া কোমর কাঁকাইয়া অতবড় উঠানখানা ঝাড়ু দিয়া শেষ করিতে করিতে বেলাটুকু ফুরাইল; নমবী তিথির ঝাপসা চাঁদের আলোয় সেই উঠান চকচক করিয়া উঠিল। এমন সময় দেখা গেল খালের কিনারা হইতে গোপাটের পথ ধরিয়া একটা লোক আগাইয়া আসিতে আসিতে একেবারে উঠানের কোণে আসিয়া পা দিল। চার ভিটায় চারখানা বড় ঘর। কোণা-খামচিতে আরো ছোট ছোট ঘর কয়েকখানা আছে। উঠানের পূর্ব-দক্ষিন কোণ দিয়া দুইঘরের ছায়ায় আসিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় ডাক দল—'পেশকারের মা, অ, খুশী!'

খুশী ঝাঁটা নামাইয়া আগাইয়া আসিল, 'বা'জান তুমি?

'হ, আমি।'

'ঘরে আইঅ।'

হাঁ, ঘরেই আসিব, এবার আর বাহিরে থাকিব না। পিঠে 'গাতি' বাঁধিয়া আসিয়াছি; গালাগালি করিলে আমিও করিব; মারামারি করিলে আমিও মারিব। আমি তৈয়ার।

খুশী অপমানে মাথা নিচু করিল।

গহনার দেনা মিটাইতে পারে নাই বলিয়া তার বাপ এমন চোরের মত আসে।

তোর পেশ কার কই?

উত্তরের ঘরে বাপের সাথে কিচ্ছা শুনিতেছে।

'ও, বড় পেশ কার কই?'

খুশী ফিক করিয়া একটু হাসিল, 'হউরের কথা কও! বাজারে গেছে।'

কাদির বাজার হইতে আসিলে তিনজনে তাহার নিকট তিন রকমের তিনপ্রস্ত নালিশ জানাইবে, স্থির হইয়া রহিল। খুশীর পেটে রমুর কোন ভাই-বোন আসিতেছে। এই বিরাট সংসার হইতে সে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়া বাপের বাড়িতে যাইতে চায়। বাপ মুহুরী। তার বাড়িতে হাল নাই গিরস্তি নাই, সারাদিন কাজের ঝামেলা নাই। এই হাজার কাজের ঝামেলা হইতে দিন কয়েকের ছুটি নিয়া সেখানে একটু নিঃশ্বাস ফেলিতে চায় সে। বাপ এ কথাই জানাইতে আসিয়াছে কাদিরকে। কিন্তু তাহার নিজে বলার সাহস নাই। এতো আর আদালত নয় যে ধমক দিয়া মক্কেল দাবকাইবে। এ কাদির মিয়ার সংসার, এখানে তারই একচ্ছত্র অধিকার। বাপের অসহায়তা দেখিয়া খুশী নিজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে নিজেই বলিবে শ্বশুরকে, যে-কথা বাপ বলিতে আসিয়াও বলিতে পারিতেছে না, চোরের মত এক কোণে লুকাইয়া আছে।

আর এক আবেদন ছাদিরের। গত বছরের পাট বিক্রীর চারশ টাকা তার চাই, দৌড়ের নৌকা গড়াইবে। শৈশব হইতে বাপের সঙ্গে খাটিতে খাটিতে সে জান কালি করিতেছে। কোনদিন কোন সাধ-আহ্লাদ পূরণের জন্য বাপের কাছে নালিশ জানায় নাই। আজ সে এ নালিশটুকু জানাইবেই। তাতে বাপ রাগিয়া উঠুক আর যাই করুক।

তৃতীয় নালিশ রমুর। নানা তাহাকে শালা বলিরে, একথা শুনাইয়া তার বাপ প্রায়ই তাহাকে অপমান করে। আজ এর একটা হেস্তনেস্ত সে করিবে।

ছোট একটা ঝড়ই বুঝি-বা আসিল। কাদির মিয়া ঘরে ঢুকিলে তেমনি সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনজন নালিশকারীই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ কাহারও মুখে কোন কথাই জোয়াইল না। একটু দম নিয়া ছাদিরই কথা বলিতে আগাইয়া আসিল। নতুবা স্ত্রী ও পুত্রের নিকট তাহার মর্যাদা থাকে না।

'বা'জী তোমার হাতে কি?'

'হাতে খাইয়া-নাচুনী।'

—পরিষ্কার রাগের কথা। ছাদির নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। খুশী ঘোমটা টানিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গেল। রমু নিকটে বসিয়া প্রদীপের আলোয় নানার চকচকে দাড়িগুলোর ফাঁকে রাগে-কম্পিত ঠোঁট দুইটি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

খড়ম পায়ে দিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে কাদির মিয়া ডাকিল, 'অ ছাদির, অ ছাদির মিয়া!'

ছাদির উঠানে স্ত্রীর নিকট এক ঝুড়ি ধান নামাইয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'বা'জি আমারে ডাকছ?'

'হ, এক বিপদের কথা কই। উজানচরের মাগন সরকার মিছা মামলা লাগাইছে।'

'মামলা লাগাইছে?'

'হ, মিছা মামলা। বাপ দাদার আমলের জমি-জিরাত। নেয্য মতে চইয়া খাই! দরকার হইলে ধারকর্জ করি, পাট বিক্রীর পর শোধ করি। কারো ফসলের ক্ষেতে পাড়া দেই না, আমারো ফসলের ক্ষেতে কেউ পাড়া দেয় না। তার মধ্যে এমুন গজব!'

'কি বইলা লাগাইল মামলা?'

'তিসরা সনের তুফানে বড় ঘর কাইত হইয়া পড়ে, তখন দুই শ টাকা ধার করি। পরের বছর পাট বেচি বার টাকা মণে। কাঁচা টাকা হাতে। আমার বাড়ির গোপাট দিয়া মাইয়ার বাড়ি যাইবার সময় ডাক দিয়া আইন্যা সুদে আসলে দিয়া দিলাম। টাকা নিয়া যাইতে যাইতে কইয়া গেল, গিয়াই তমসুকের কাগজ ছিড়া ফালামু, কোন ভাবনা কইর না। এতদিন পরে সেই কাগজ লইয়া আমার নামে নালিশ করছে।'

'বা'জান তুমি বড় কাঁচা কাম কর!'

ইহাদের নামে কেউ কোন দিন মামলা করে নাই। এরাও কোন দিন কারো নামে নালিশ করে নাই। তাই এই দুঃসংবাদে সারা পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। চিন্তান্বিত মুখে সকলে কাদির মিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটা ঝানু মামলাবাজ অতিথি যে ঘরের কোণে আত্মগোপন করিয়া আছে সে কথা কেউ জানিল না, যাও বা খুশী জানিত, সেও ভুলিয়া গেল। কিন্তু মামলার নাম শুনিলে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার লোক সে নয়। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'কোন তারিখে, কার কোর্টে নালিশ লাগাইয়াছে কও!'

কাদির চমকাইয়া উঠিল; 'কেডা তুমি?'

'আমি নিজামত মুহুরী, বেয়াই!'

'বেয়াই! আমি মনে করছিলাম, বুঝি বউরূপী।'

'যা তুমি মনে কর। এই জীবনে কত বউরূপীরে নাচাইলাম। শেষে তোমার কাছে নিজে বউরূপী সাজতে হইল!'

'কও কি তুমি!'

'ঠিক কথাই কই। দুই একটা মামলাটামলা ত করলা না। কি কইরা জানবা মুহুরীর কত মুরাদ। ঘুড়িরে দেই আসমানে তুইল্যা, লাটাই রাখি হাতে। যতই উড়ে যতই পড়ে আমার হাতেই সব। জজ-মাজিষ্টর ত ডালপালা। গোড়া থাকে এই মুহুরীর হাতে। কি নাম কইলা? উজানচরের মাগন সরকার না? কোন চিন্তা কইর না। দুই চারটা সাক্ষীসাবুদ যোগাড় কইরা রাখ, মামলা তোমারে জিতাইয়া দেমু, কইয়া রাখলাম।'

ছাদিরও সমর্থন করিল, 'বা'জান তুমি ডরাইও না। হউরে যখন সাহস দেয়, তখন জিত হইবই বা'জান।'

কাদিরের মুখের শিরাগুলি কঠিন হইয়া উঠিল।

'বেয়াই তোমার কোনো ডর নাই! দেখ আমি কি করতে পারি। একবার দেখ—মিছা মামলা লাগাইছে, আমিও মিছা সাক্ষী লাগামু। মামলা নষ্ট ত করুমই, তার

উপর তার নামে, লোক লাগাইয়া গরুচুরি করার, না হইলে খামারের ধান চুরি করার পালটা মামলা লাগামু তবে ছাড়ুম। তুমি কিছু কইর না, খালি খাড়া হইয়া দেখ–'

কাদিরের মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল।

ছাদির শেষ চেষ্টা করিল, 'বা'জান–'

'না না, তারে আমি ডরাই না।'

'তবে চল আমার সাথে। দেখি, কই কি করছে। মামলার গোড়া কাটা যায় কিনা। চল কাইল সকালে।'

'হ, কাইল সকালেই যামু। কিন্তুক তোমার সাথে যামু না, আর তোমার অই আদালতেও যামু না। আমি একবার যামু তারই কাছে।'

'তার কাছে গিয়া কি করবা?'

'তার চোখে চোখ রাইখ্যা জিগামু–তার ইমানের কাছে জিগামু, আমার বাড়ির গোপাট দিয়া যাইবার সময় তারে বিনাখতে টাকা দিছি–সেই-কথাটা তার মনে আছে কি না।'

'যদি কয় মনে নাই?'

'পারব না। মুহুরী, পারব না। আমার এই চোখের ভিতর দিয়া আল্লার গজব তারে পোড়াইয়া খাক করব। কি সাধ্য আছে তার, এই রকম দিনে ডাকাতি, হাওরে ডাকাতি করব?'

ছেলে হতাশ হইয়া বলিল, 'বা'জান, তুমি বড় কাঁচা কাম কর।'

ততোধিক হতাশ হইয়া মুহুরী বলিল, 'পাড়াগাঁওয়ে থাক, পাড়াগাঁইয়া বুঝ তোমার। তোমারে খামকা উপদেশ দিয়া লাভ নাই। তোমারে কওয়া যা, ধান ক্ষেতে গিয়া কওনও তাই! থাক গরুর সাথে মাঠে, গরুর বুদ্ধিই তো হইব তোমার।'

এভাবে বুদ্ধির খোটা দেওয়ায় পিতাপুত্র দুজনেই চটিল।

'আমার কাছে কত লোক যায় মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে। তুমি শালা কোন দিন কি গেছলা? অত জমিজমা ক্ষেতপাথর তোমার। জীবনে দুইদশটা মামলা করলা না, কিসের তুমি কুঠিয়াল? পুঁটি মাছের পরাণ তোমার। মামলার নামে কাঁইপ্যা উঠ। নইলে দেখতা, মাগন সরকারেরে কি ভাবে আমি কাইত করি।'

একটু অহেতুক বচসার সৃষ্টি হইল। মুহুরী রাগিয়াই আসিয়াছিল। মুহুরী নামক জীবকে দুইচক্ষে দেখিতে পারে না কাদির, এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়াতে তার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। বলিল, 'থাকি আমি ভদ্রলোকের গাঁওয়ে, চলি আমি বাবু ভুঁইয়ার সাথে। কারো কাছে কি কই যে, আমি সম্বন্ধ করছি তোমার মত চাষার সাথে?'

'গরিবের বাড়িতে হাতীর পাড়া পড়ুক, এও আমরা চাই না বা'জি'। বাপের হইয়া জবাব দিল ছাদির।

বাপ তার এভাবে বসিয়া অপমানিত হইয়াছে, দেখিয়া খুশীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আড়াল হইতে সে সকলকে শুনাইয়া বলিল, 'এমন অসম্মানী হইবার লাগি এই গাঁওয়ে তুমি কেনে আইঅ বা'জি।'

মুহুরী জানাইল সে ভুল করিয়াছে। সে এখনই চলিয়া যাইতেছে। অতঃপর সব বাড়িতে যাইবে, কিন্তু চাষার বাড়িতে যাইবে না।

কাদির ততোধিক চটিয়া বলিল, রাত দুপুরে চলিয়া যাইবে। সাহস কত। যাও না যদি ক্ষমতা থাকে। মুহুরী যাইতে উদ্যত হইলে তাড়াতাড়ি কাদির দুইটা লাঠি বাহির করিল। মুহুরী হতভম্ব হইয়া গেল। কাদির একটা লাঠি নিজের হাতে লইল এবং বাকি লাঠিটা নাতি রমুর হাতে দিয়া বলিল, 'নে শালা, তর দাদারে মার।'

রমু লাঠিটা হাতে লইয়া গো-বেচারার মত একবার কাদিরের মাথার দিকে আরেকবার মুহুরীর মাথার দিকে তাকাইতে ল্যাগিল; কার মাথায় মারিবে বুঝি-বা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

সেইদিন বিকালবেলা, মাগন সরকার মামলা লাগাইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। তিতাস-নদীর তীর ধরিয়া পথ। সূর্য এলাইয়া পড়িয়াছে। তিতাসের ঐ পারে মাঠ ময়দান ছাড়াইয়া অস্পষ্ট গ্রামের রেখা। তারই ওপারে সূর্য একটু পরেই অস্ত যাইবে। পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তার সেই লালিমা আবার মেঘের স্তরে স্তরে নানা রঙের পিচকারী ছুড়িয়া মারিতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছে। চারিদিকে শান্ত সমাহিত ভাব। কাছেই বাড়িঘর। গাইগরু ধীরেসুস্থে আপন মনে বাড়িতে ফিরিতেছে। রাখালের তাড়া করার অপেক্ষা রাখিতেছে না। বামদিকে তটরেখা, ডানদিকে বেড়া। কি সব ক্ষেত লাগাইয়াছে, তারই জন্য বেড়া। গলায় ঝুলানো রেশমী চাদর হাওয়ায় উড়িয়া এক একবার বেড়ার কঞ্চিতে গিয়া লাগিতেছিল। পায়ের মসৃণ জুতায় লাগিতেছিল জমিনের ধূলা। সব কিছু বাঁচাইয়া পথ চলিতে মাগন সরকারের মন চিন্তায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এ মাঠেও তার অনেক জমি আছে। কত জমি, সে নিজেই অনেক সময় ঠাহর রাখিতে পারে না। মাঝে মাঝে গোলাইয়া যায়, কত জমি সে করিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া সে-সব করিয়াছে, সে-খবর জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই তার চোখের সামনে আজ যেন জ্বলজ্বল করিয়া দুই একবার জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময় পথে রশিদ মোড়লের সঙ্গে দেখা।

রশিদ মোড়লের খালি পা, লুঙি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া। বয়সে মাগন সরকারের মতই প্রবীণ।

'রশিদ ভাই!'

'কি?'

'দোলগোবিন্দ সা'র খবর শুনছ ত?'

'তা আর শুনছি না। কলিকাতা থাইক্যা তার ভাতিজার নামে চিঠি আইছে।'

'অবস্থা নাকি খারাপ?'

'হ। একেবারে হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা।'

'কি হইব দাদা!'

'কি আর হইব, মরব!'

'মইরা কি হইব?'

রশিদ একটু হাসিল, কিন্তু জানিল না যে, মাগনের একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস তিতাসের ছোট ঢেউয়ের মত বাতাসে একটু ঢেউ খেলাইয়া দিয়া গেল!

পরের দিন সকালে কাদির মিয়া আসিয়া ডাক দিল।

তার চোখ দুটি দেখিয়া মাগন সত্যই আঁতকাইয়া উঠিল। সে-দুটি চোখ জবাফুলের মত লাল। সারারাত তার ঘুম হয় নাই। কেবল ভাবিয়াছে, আল্লা মানুষ এত বেঈমান হয় কেন? মানুষ মানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করিবে না কেন? আর কেনই বা মানুষ বিশ্বাসের মাথায় এভাবে নিজ হাতে মুগুর মারিতে থাকিবে। মানুষ না দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব?

এদিকে মাগনেরও সারারাত ঘুম নাই। কাল রাত্রিতে বাড়িতে আসিয়া শুনিয়াছে, দোলগোবিন্দ সাহা আর ইহজগতে নাই। টেলি আসিয়াছে তার ভাইপোর নামে। হায় দোলগোবিন্দ! তুমি, আমি, রসিক ভাই একই ডিঙার কাণ্ডারী, একই চাকরিতে ঘুষ খাইয়া পয়সা করিয়াছি, একই উপায়ে লোককে ঋণের জালে জড়াইয়া ভিটামাটি ছাড়া করিয়াছি, জমিজিরাত দেনার দায়ে নিলাম করিয়াছি; আজ তুমি মরিয়া গিয়াছ। আমিও তো মরিয়া যাইব। হায় দোলগোবিন্দ! তুমি মরিয়া গিয়াছ!

কাদির দেখিয়া অবাক হইল, তারও চোখ দুইটি সন্ধ্যার অস্তরাগের মতই লাল।

কাদির কিছু বলিল না। চুপ করিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাগন শিহরিয়া উঠিল, দোহাই তোমার কাদির মিয়া শুধু একটি বারের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সর্বনাশ তো অনেকেরই করিলাম। আর কারোর সর্বনাশ আমি করিব না, শেষ বারের মতো শুধু তোমার এই সর্বনাশটুকু করিতে দাও। বাধা দিও না, প্রতিবাদ করিও না, শুধু সহ্য করিয়া যাও। এই আমার শেষ কাজ। দেখিবে, তোমাকে ঠকানোর পর থেকে আমি ভাল মানুষ হইয়া যাইব! আর কাউকে ঠকাইব না; এই শেষবারের মত শুধু তোমাকে ঠকাইতে দাও!

কাদির হতভম্ব হইয়া গেল। কিছু না বুঝিয়াই বলিল, তাই হোক মাগন বাবু, আমি সহ্যই করিয়া যাইব। তোমার কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে তুমি মামলা চালাও। কোনো সাক্ষী-সাবুদ আমি খাড়া করিব না। নীরবে সব স্বীকার করিয়া লইব এবং টাকা ডিক্রি হওয়ার পর নগদ না থাকে তো জমি বেঁচিয়া শোধ করিব। তবু তুমি ভাল হও।

পরের দিন খবর পাওয়া গেল, মাগন সরকার মরিয়া গিয়াছে। বড় বীভৎস সে-মৃত্যু। একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া মাটির দিকে নাকি সে লাফ দিয়াছিল।

এই সংবাদে কাদিরের মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল।

কাজেই ছাদির যখন একদিন প্রস্তাব করিল, এবার শ্রাবণে সে নৌকা দৌড়াইবে, এজন্য দৌড়ের নৌকা একটা বানাইতে হইবে, তার জন্য টাকা চাই, কাদির তখন ঝাঁপি খুলিয়া চার শ টাকা তার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'নে, নাও বানা, ঘর বানা, পানিতে ফালাইয়া দে। যা খুশি কর।'

অত সহজে কাজ হাসিল হইয়া গেল দেখিয়া ছাদিরের খুশি আর ধরে না।

ছাদিরের কাঠ কেনার প্রসঙ্গে একদিন ঘরে আলোচনা হইল।

ছাদির বলিল, 'সে এক পরস্তাব।'

গল্পের আভাস পাইয়া রমু তার কোল ঘেঁসিয়া বসিল এবং প্রকাণ্ড একটা বিস্ময়-ভরা জিজ্ঞাসা লইয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তারা নাকি দুজন মালো। গায়ে নাকি তাদের হাতীর মতন জোর। নামও তাদের তেমনি জমকালো—একজনের নাম ইচ্ছারাম মালো, আরেকজনের নাম ঈশ্বর মালো—নিবাস নবীনগর গাঁয়ে।

তারা কি করিয়াছে, না, পাহাড় হইতে বহিয়া আসে যে জলের স্রোত, তারই সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কাছি বাঁধিয়া বড় বড় গাছের গুঁড়ি টানিয়া নামাইয়াছে। সে গাছের গুঁড়ি চিরিয়া তক্তা করা হইবে, তাহাতে তৈয়ারী হইবে ছাদিরের দৌড়ের নৌকা, সে নৌকা সে হাজার বৈঠা ফেলিয়া আরও দশবিশটা দৌড়ের নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়া দৌড়াইবে, আর সব নৌকাকে পাছে ফেলিয়া জয়লাভ করিবে, করিয়া মেডেল পাইবে, পিতলের কলসী পাইবে আর পাইবে বড় একটা খাসি।

'বেহুদা—একেবারে বেহুদা! এর লাগি কত হাঙ্গামা কইরা নাও গড়াইবি?' কাদির টাকা দিবার পর একদিন প্রশ্ন করিয়াছিল।

ছাদিরও জবাব দিয়াছিল, 'জিনিসগুলো খুব থোরা দেখলা, না? কিন্তুক, জিতলে খালি তোমার আমার গৈরব না, সারা বিরামপুর গাঁওয়ের গৈরব।'

'একদিন হৈ-হাঙ্গামা করবি, জিতবি, পিতলা কলস পাইবি, মানলাম। তারপর এই-নাও দিয়া তুই করবি কি? কি কামে লাগব এই দেড়শ-হাতি লিকলিকা পাতাম নাও?'

—কেন, অনেক কাজে লাগিবে। বর্ষার যে-কয়মাস ক্ষেতে-খামারে পানি থাকিবে, এ নৌকা লইয়া বিলে গিয়া বোঝাই-ভরতি ঘাস কাটিয়া আনা যাইবে গাই-গরুর জন্য।

—সে কাজ তো একটা ঘাস কাটা পাতাম দিয়াই চলে।

—চলে, ঘাস কাটা পাতাম দিয়া তো আর নাও-দৌড়ানি চলে না। আর এই নাও দিয়া দৌড়ানিও চলে ঘাস কাটাও চলে।

—বিলের পানি শুকাইয়া গেলে তো এ নাও অচল, তখন তারে দিয়া কি করিবি? রোদে তখন সে ত খালি ফাটিবে।

—ফাটিবে কেন? গেরাপি দিয়া তারে তিতাসের পানিতে ডুবাইয়া রাখিব, তার পেটে কতগুলো ডালপালা রাখিয়া দিব, আশ্রয় পাইয়া মাছেরা আসিয়া জমিবে; তখন সময়-সময় জল সেঁচিয়া সে-মাছ ডোলা ভরিয়া বাড়িতে আনিব।

ছাদিরের বুদ্ধি দেখিয়া কাদির অবাক হইল, বলিল, 'মিয়া, বুদ্ধি বাৎলাইছ চমৎকার।'

রমু কয়েক রাত স্বপ্ন দেখিয়াছে সেই মালো দুজনকে—যে দুজন কোমরে কাছি বাঁধিয়া নদী নালা ভাঙিয়া তার বাপের জন্য কাঠ লইয়া আসিতেছে।

একদিন তিতাসের পারে গিয়া দেখে, দূর হইতে একখানা কাঠের 'চালি' ভাসিয়া আসিতেছে, ভেলার মত। তাহাতে ছোট একখানা ছই। সেই দুজনকেও দেখা গেল। তারা চালির দুই পাশ হইতে মোটা লগি ঠেলিতেছে। সেই ঈশ্বর মালো আর ইচ্ছারাম মালো নামে রূপকথার মানুষ দুইটা। পাহাড় পর্বত ভাঙিয়া, খালবিল ডিঙাইয়া, কত দেশদেশান্তরের বুক চিরিয়া তারা যেন এক বোঝাই গল্প লইয়া আসিয়াছে।

ছোট ছইখানার ভিতরে দুইজনার সংক্ষিপ্ত ঘরকরনা। পরণে দুইজনেরই এক একখানা গামছা, গা মসৃণ কালো। শুশুকের মতই যেন জল হইতে ভাসিয়া উঠিয়া কাঠের চালিতে লগি ঠেলিতেছে। কাঠ বিক্রী হইয়া গেলে, আবার যখন শুশুকের মতো একডুবে জলের ভিতর তলাইয়া যাইরে, তখন আর তাহাদের কোন চিহ্নই জলের বাহিরের এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

ছাদিরের সঙ্গে সামান্য দুই একটি কথাবার্তা শেষ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা প্রকাণ্ড একটা গুঁড়ি, চালির বাঁধন হইতে খুলিয়া রাখিয়া আবার আগাইয়া চলিল। ছাদির বলিতেছিল, মালোর পুত, আজ দুপুরে এখানে পাকসাক কর, থাক, খাও, কাল ফজরে উঠিয়া চালি চালাইও।

শুধু একটি মাত্র কথা তাহারা বলিল, না শেখের পুত। এখানে চালি থামাইব না, রমারম গোকনের ঘাটে গিয়া পাক বসাইব।

বলিয়াই তাহারা লগি ঠেলা দিল। মুখে কত বড় ব্যস্ততা। কিন্তু চলনে কতখানি ধীর! কোন আদিমযুগের যেন যান একখানা, একালের চলার দ্রুততার সঙ্গে এর যেন কোন পরিচয়ই নাই। অত ধীরে চলে, কিন্তু থামিয়া সময় নষ্ট করে না। রমু ভাবিয়াছিল, এই দুইজনের কাছে একবার সাহস করিয়া ঘেঁষিতে পারিলে অনেক কিছু জানিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। এমন ধীরে ধীরে, যেন হাঁটিয়া গিয়া অনায়াসে ইহাদিগকে পিছনে ফেলিয়ে রাখা যাইবে —এত ধীরে —কিন্তু কি গম্ভীর সে-চলা। দ্রুত হাঁটার মধ্যে কোথায় সেই গাম্ভীর্য!

রমু এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল, যারা অনেক দূরের অনেক কিছু খবরাখবর বহিয়া বেড়ায়, তারা অধিকক্ষণ থাকে না, এমনি ধীরে ও দৃঢ়তায়, এমনি ধীরে ও নিষ্ঠুরতায় তারা চলিয়া যায়।

পরের দিন সকালে প্রকাণ্ড অকর্ষিত জমির উপর একটা আড়া বাঁধিয়া, পাড়ার লোকজন ডাকিয়া প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িটাকে আড়াআড়িভাবে তাহাতে স্থাপন করিল, তারপর নীচে দুইজন উপরে দুইজন করাতী চান চুন চান চুন করিয়া করাত চালাইয়া দিল।

দুইদিনে সব কাঠ চেরা হইয়া গেলে, তক্তাগুলি পাট করিয়া রাখিয়া পারিশ্রমিক লইয়া করাতীরা বিদায় হইল, আর রমুর বয়সের ছেলেমেয়েরা একগাদা করাতের গুঁড়ায় দাপাদাপি করিয়া খেলায় মাতিয়া গেল।

বাপ আচ্ছা এক মজার কাণ্ড শুরু করিয়া দিয়াছে। এ গাঁয়ে যা কোনদিন কেউ করে নাই, তেমনি এক কাণ্ড। রমু মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

তারপর একদিন দেখা গেল, তিতাসের পারে একখানা অস্থায়ী চালাঘর উঠিয়াছে। কয়েকদিন পরে সে-ঘরের বাসিন্দারাও ছোট ছোট কয়েকখানা কাঠের বাক্স মাথায় করিয়া হাজির হইল। তারা চারিজন ছুতার মিস্ত্রী। নাও গড়াইবার যাবতীয় হাতিয়ার লইয়া সে-ঘরে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

আগাপাছার 'ছেউ' ঠিক করিয়া সেদিন তাহারা নাও 'টাঙ্গিল', সেদিন রমুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নৌকার মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের

ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, রমুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি তার কি পরিমাপ করিবে! কিন্তু মিস্ত্রী দুইজন অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ি পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে!

মাপজোখ লইয়া এই মেরুদণ্ড ঠিক করিতে কয়েকদিন লাগিল। তারপর পূরাদমে শুরু হইল কাজ। এই একটা তক্তায় কাদা মাখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া টানা দিয়া মোড়ন দিয়া বাঁকাইয়া, খাঁজ কাটিয়া জোড়া দেয়, আর পাতাম লোহার একদিকে বসাইয়া আস্তে হাতুড়ির টোকা দেয়, একদিকে সামান্য একটু বসিলে, আরেকদিক ঘুরাইয়া খাঁজের উপর বসাইয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিতে থাকে–ডুম ডুম–টাকুর টাকুর ডুম!

দেখিতে দেখিতে নৌকার অস্থিমাংস জোড়া লাগিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাইতে এখনও অনেক বাকি।

ছাদির বলিল, 'রমু, বা'জি একটা কাম কর। আমি ক্ষেতে যাই, তুমি মেস্তুরেরে তামুক জ্বালাইয়া দিও, কেমুন!'

একটা কাজ পাইয়া রমু বর্তাইয়া গেল। সেই হইতে বাড়িতে বড় একটা সে আসেই না। কেবল ঠিক-দুপুরে মিস্ত্রিরা যখন কাজ থামাইয়া রান্না চড়ায়, তখন সে একবার নিজের ক্ষুধাটা অনুভব করিয়া বাড়িতে আসে। কিন্তু মন পড়িয়া থাকে মিস্ত্রিদের উন্মুক্ত ছোট সংসারখানাতে। সেখানে শুধু কয়েকটি হাতুড়ি আর বাটালির কারসাজিতে কেমন লম্বা লিকলিকে একটা নৌকা গড়িয়া উঠিতেছে।

রমুর ভবিষ্যৎ লইয়া একদিন বাপ-ছেলেতে কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। ছাদির বলিল, তারে কিতাব হাতে দিয়া মক্তবে পাঠাইব। কাদির হাসিয়া বলিল, না, তারে পাচন হাতে দিয়া গরুর পিছে পিছে মাঠে পাঠাইব।

মাঠে পাঠাইলে সে আমার মূর্খ চাষাই থাকিয়া যাইবে। দুনিয়ার হাল-অবস্থা কিছুই জানিতে পারিবে না।

আর ইশকলে পাঠাইলে, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ীর বিছানায় বৌকে ও বৌয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণিতে পারিবে। কাজ নাই বাবা অমন লেখাপড়া শিখিয়া।

রমুর মার রাগ হইল। যত দোষ বুঝি আমার বাপের। আমার বাপ ঘুষ খায়; আমার বাপ চুরি করে; আমার বাপ ফলনা করে, তসকা করে–কি যে না করে!

তুই থাম, ছাদির ধমক দিল।

না, থামিব না, আমার বাপ যখন অত দোষের দোষী, তখন জানিয়া শুনিয়া এমন চোরের মাইয়া ঘরে আনিলে কেন? আর আনিলেই যদি, খেদাইয়া দিলে না কেন?

খেদাইয়া দিলে আরেক খানে গিয়া খুব সুখে থাকিতে পারিতিস, না?

আহা, কত সুখেই না আছি এখানে!

বিষমুখী তুই থামিবি, না চোপা বাজাইবি?

ইস থামিবে। আমি বিষমুখী, আমার বাপ চোর, আবার থামিবে।

রাগে ছাদির উঠিয়া গিয়া মারে আর কি। কাদির তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিল।

মেয়েটার মধ্যে এক বিদ্রোহের মূর্তি দেখা গেল এই প্রথম। কাদিরের মনের কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগিল। মুহুরীর মেয়ে জোর গলায় বলিয়া চলিল, 'চোর হোক ধাওর হোক, তারইত আমি মাইয়া। বাপ হইয়া মার মত পালছে, খাওয়াইছে ধোইয়াইছে–হাজার হোক, তবু বাপ। চোর হইলেও আমারই বাপ, আর কাউর বাপ না। আমি মরলে এই বাপেরই বুক খালি হইব। আর কোন বাপের বুক খালি হইব না।'

'না হইব না! চোরের মাইয়ার আবার টাস-টাইস্যা কথা। খালি হইব না তোমারে কইল কেডায়?' –কাদিরের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তার জমিলার কথা মনে পড়িয়া বেদনায় বুকটা টনটন করিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, মুহুরী যত দোষের দোষী না, তার চাইতে অধিক দোষী করিয়া আমরা এই অসহায় মেয়েটাকে সকলে মিলিয়া জর্জরিত করিতেছি। আমি যত দোষের দোষী না, তার চাইতেও অধিক দোষের দোষী করিয়া তারাও যদি আমার জমিলাকে এমনি জর্জরিত করিতে থাকে, জমিলা কি তখন নিথর পাষাণের মত চুপ করিয়া শোনে আর চোখের জল ফেলে?

জমিলা কি তার এতটুকু প্রতিবাদ করে না? করিলে তবু মেয়েটা বাঁচিয়া যাইত মন হালকা করিয়া, কিন্তু না করিলে, সে যখন নিরুপায়ের মত সহিতে হইবে মনে করিয়া তিলে তিলে ক্ষয় হইতে থাকিবে, তখন তাহাকে দুইটা সান্ত্বনার কথা শুনাইবে কে? জমিলা। সেও মা-মরা মেয়ে। এ যেমন মুহুরীর বুক-সেঁচা ধন, জমিলাও তেমনি কাদিরের বুক-সেঁচা ধন। তবে, বাপ হিসাবে মুহুরীতে আর কাদিরেতে তফাৎ কি? তফাৎ শুধু এই যে, মুহুরী আবার একটা শাদি করিয়াছে। কাদির তার ছেলের দিকে চাহিয়া তাহা করে নাই।

আরেকটা শাদি করিয়াও যখন মুহুরী মেয়েটাকে ভুলিতে পারে নাই, তখন কাদির ঘরে একটা গৃহিণী না আনিয়া ছেলেটার ও মেয়েটার উপর হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করিয়া দিয়া, জমিলাকে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে? কিন্তু তবু ভুলিয়া সে আছে ইহা ঠিক! যদি ভুলিয়া না থাকিত, কতদিন আগে একবার সে দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিল–সেই গত অঘ্রাণে–দুই দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে। অতদিন আগে সে আসিয়াছিল, ভুলিয়া না থাকিলে এতদিনের মধ্যে দুইবারও কি জমিলাকে এখানে আনা হইত না? কিন্তু কেন কাদির অত আদরের জমিলাকেও ভুলিয়া থাকিতে পারে? কেন? এই রাক্ষুসী মেয়েটারই জন্য নয় কি? সে আসিয়া এ বাড়িতে কাদিরের বুকে জমিলার যে স্থানটুকু ছিল, সেটুকু যদি অধিকার করিয়া না বসিত, বুড়া কাদির কি তাহা হইলে পরের ঘরে মেয়ে দিয়া বাঁচিতে পারিত!

রমুর মা খুশী তখনও গজরাইতেছে, সাধে কি লোকে বলে পরের ঘর! পরের ঘরই ত। যে-ঘরে আসিয়া বাপ হয় চোর, আর নিজে হয় বিষমুখী, সে-ঘর কি আপনা-ঘর! সে ঘর কি পরের ঘর নয়?

হ, হ, পরের ঘর। মুহুরীর মেয়েটা বলে কি? রাত না পোহাইতে উঠিয়া বিশটা গরুর গোয়াল সাফ করা, খইলভূষি দেওয়া, ঝাঁটা হাতে বাহির হইয়া এত বড় উঠানবাড়ি পরিষ্কার করা, কলসের পর কলস পানি তোলা, রান্ধা, খাওয়ানো, ধান শুকানো, কাক তাড়ানো, উঠান-ভরতি ধান রোদে হাঁটিয়া পা দিয়া উল্‌টানো পাল্‌টানো, তারপর খড় শুকানো, শোলা শুকানো, পাট ইন্দুরে কাটে, তারে দেখা, অত অত ধান

ভানা, ফের রান্নাবাড়া করা–এত হাজার রকমের কাজ–পরের ঘরে কি কেউ এত কাজ করে কোন দিন? শরীর মাটি করিয়া এত কাজ যে-ঘরের জন্যে করিতেছে, তারে কয় কিনা পরের ঘর! কহিলেই হইল আর কি, মুখের ত আর কেরায়া নাই।

খুশীর চোখে এবার দ্বিগুণ বেগে জল আসিয়া পড়িল। এবার সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কাঁদিবার পর তাহার মনে হইল, এমন কাঁদন কাঁদিয়াও সুখ।

পরিশেষে কাদির বলিল, 'দে, তোর পুতেরে মক্তবে দে, কিন্তু কইয়া রাখলাম, যদি মিছাকথা শিখে, যদি জালজুয়াচুরি শিখে, যদি পরেরে ঠকাইতে শিখে, তবে তারে আমি কিছু কমু না, শুধু তোমার মাথাটা আমি ফাটাইয়া দিমু, ছাদির মিয়া।'

পরের দিন রমু নতুন লুঙি জামা পরিয়া নতুন টুপি মাথায় দিয়া মক্তবে গেল। পড়িয়া আসিয়া মার কাছ হইতে কিছু খাবার খাইয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সেই চারজনকে ত নতুন লুঙি গেঞ্জি টুপি দেখানো হয় নাই। মক্তবের ছেলেরা কতবার চাহিয়া দেখিয়াছে। আর চারজন দেখিবে না।

নতুন পোশাকে সজ্জিত রমুকে তাহাদের জন্য তামাক সাজিতে বসিতে দেখিয়া তাহাদের একজনের বড় মায়া হইল, বলিল, থাক থাক মুনশীর পুত। তোমার আর টিকার কালি ঘাঁটিয়া দরকার নাই।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অদূরেই ঘাটের পথ। লাল-কালো, ডুরি-ডুরি শাড়ি পরা গেরস্থ বৌ-ঝিরা সেই পথ দিয়া তিতাসের ঘাটে যাইতেছে। কারো হাতে চালের ধুচনি কারো কাঁখে কলসী। কারো পায়ে রূপার মল।

দেখিয়া জনৈক ছুতারের গলায় গান জমিয়া উঠিলঃ ছোট লোকের খানা-পিনা রে বিহানে বৈকালে, বড় লোকের খানা-পিনা রাত্র নিশা কালেরে–হায় কান্দে, কান্দে রে দেওয়ান কটু মিয়ার মায়।

সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছুতার বাধা দিল, দেখ বুদ্ধিমানের পুত, ইহাদিগকে শুনাইয়া গান গাহিলে মাথা লইয়া দেশে যাইতে পারিবে না।

মাথা না হয় রাখিয়াই যাইব।

একটা লোক মাথা রাখিয়া আবার যায় কি করিয়া রমু ভাবিয়া পাইল না। তবে গানটা শুনিতে তার খুব ভাল লাগিল।

থামিলে কেন, গাওনা তোমার গান।

বড় মিস্ত্রী তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দুপুর বেলা আসিলে আমি গান শুনাইতে পারি, সকালে বিকালে পারি না।

দুপুরে যে আমি পড়তে যাই।

তবে গান শুনিয়া কাজ নাই।

কাজ নাই কেন?

পড়িতে হইলে গান শোনা হয় না, আর গান শুনিতে হইলে পড়া হয় না, এই রকম যখন অবস্থা, তখন পড়াই ভাল, গান শুনিয়া কাজ নাই।

শুক্রবারে মক্তব ছুটি থাকে। দুপুর বেলা রমু লুঙ্গি পরিল, টুপি পরিল, কিন্তু গেঞ্জি পরিতে ভুলিয়া গেল। তারপর সে মিস্ত্রিদের নিকট হাজির হইল। কিন্তু বড় মিস্ত্রী তাহাকে নিরাশ করিয়া জানাইল, হাতে বড় কাজ এখন সুবিধা হইবে না। আরও বলিয়া

দিল, বাড়িতে গিয়া বল, দুধ জ্বাল দেওয়ার ঝামেলা পোহাইবার আজকাল আর সময় নাই। দুধ যেন বাড়ি হইতেই জ্বাল দিয়া চিড়াগুড়ের সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়।

রমুর মা দুধ জ্বাল দেওয়ার কড়াখানাকে ঝামা দিয়া দুই তিন বার মাজিয়া দুধ ফুটাইল এবং বড় একটা লোটার গলায় ফাঁস পরাইয়া রমুকে দিয়া পাঠাইল। মাথায় চিড়ার বোঝা, হাতে দড়ি-বাঁধা দুধের লোটা এই বেশে রমুকে দেখিয়া মিস্ত্রিরা হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না।

তারপর দেখিতে দেখিতে একদিন গোটা একটা নৌকা তৈয়ারী হইয়া গেল। এখন শুধু বাকি রহিল, নৌকা কাত করিয়া তলার দিকটা পালিশ করা। সে কাজের ভার ছোট তিনজনার হাতে ছাড়িয়া দিয়া বড় মিস্ত্রী হুকা হাতে লইয়া বসিল এবং আস্তে আস্তে গান জুড়িয়া দিল—হস্তেতে লইয়া লাঠি, কান্ধেতে ফেলিয়া ছাতি, যায়ে বুরুজ দীঘল পরবাসে॥

তারপর, পথশ্রমে বুরুজ ক্লান্ত হইল এবং—চৈত্রি না বৈশাখ মাসে, পিঙ্গল রৌদ্রির তাপে, লাগিল দারুণ জল-পিপাসা ॥ তখন সে জলের জন্য এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও না নদী, না পুষ্করিণী। কিন্তু সহসা তার চোখে পড়িল—ঘরখানা লেপাপুছা, দুয়ারে চন্দনের ছিটা, এই বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ি ॥

বুরুজ নিজে ব্রাহ্মণ, কাজেই ব্রাহ্মণের বাড়ি চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। এত যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তখন এটা কোনও ব্রাহ্মণেরই বাড়ি না হইয়া যায় না। বুরুজ তখন আগাইয়া ডাক দিল—ঘরে আছে ঘরণীয়া ভাই, জল নি আছে খাইতে চাই, পরবাসী তিয়াস লেগে মরি ॥ তাহার আহ্বান ব্যর্থ হইল না—ডান হস্তে জলের ঝারি, বাম হস্তে পানের খাড়ি, যায়ে কন্যা জলপান করাইতে ॥ পিপাসাকাতর বুরুজ —জল খাইয়া শান্ত হইয়া, জিগাস করে তুমি কোন জাতের মাইয়া, (বলে) জাতে আমরা গন্ধভুইমালী ॥

বুরুজের জাতি গেল, হায়, হায়, ব্রাহ্মণ বুরুজের জাতি গেল। আগে পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া যার হাতের জল সে পান করিল, সে ত ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়। সে ছোট জাতের মেয়ে—আছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, পিছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে ॥ বুরুজের জাতি গিয়াছে। সে কি করিবে? না গেল প্রবাসে না গেল দেশে, ফিরিয়া যেখানে তাহার জাতি নষ্ট হইল, সেখানেই সে রহিয়া গেল, আর বলিয়া দিল—সঙ্গের যত সঙ্গীরা ভাই, কইও খবর মা বাপের ঠাঁই, জাতি গেল ভুঁইমালিয়ার ঘরে ॥

বেঘোরে একটা লোকের জাতি নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া রমুর খুব দুঃখ হইল। জীবনে ব্রাহ্মণ সে দেখে নাই। তবে তার সম্বন্ধে যতটুকু শুনিয়াছে, মনে মনে বিচার করিয়া রাখিয়াছে, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাহারা মাথায় অনেক উঁচু। তারা নাকি মন্ত্র বলে। তারা নাকি অনেক মোটা মোটা কিতাব পড়িয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আর মালী! তারা তো শুনিয়াছি হিন্দু বাড়ির বিবাহে কলাগাছ পুঁতিয়া দেয়। এ আর তেমন কি কাজ তারা করে। আর এইরকম এক মালীর ঘরেই অমন-একটা পণ্ডিত মানুষের জাতি নষ্ট হইয়া গেল। ব্রাহ্মণত্ব খোয়াইয়া সে মালী হইয়া মালী-বাড়িতে রহিয়া গেল। এখন কি

আর সে বিবাহ-বাড়িতে গিয়া মন্ত্র পড়িবে, না মোটা মোটা কিতাব মুখস্থ করিবে? এখন হইতে সে শুধু বিবাহ-বাড়িতে গিয়া কয়েকটা কলাগাছ পুঁতিয়া দিবে। এই সামান্য কাজের দরুণ কেউ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। কিন্তু তার অত বড় জাতি, সেটা নষ্ট হইল কেন? এ ত সাংঘাতিক কথা।

–তিয়াস লাগিল, এক গেলাস পানি খাইল, আর জাতি!

'গেল ত!'

'কেনে গেল!'

–গেল যে, তাই বা সে জানিতে পারিল কি করিয়া!

বড় মিস্ত্রী চুপ করিয়া রহিল। ছোট মিস্ত্রীদের একজন রাগিয়া উঠিলঃ ভারী ত চাষার ছেলে, পাচন হাতে গরু রাখিবে, তার কথার কেমন প্যাঁচ দেখ না।

সে-কথায় কান না দিয়া রমু বলিল, আমার হাতের পানি খাইলে তোমার জাত যাইবে?

শক্ত প্রশ্ন। বড় মিস্ত্রী চট করিয়া মীমাংসা করিয়া বলিল, না।

–আমার মার হাতের পানি খাইলে?

–না।

–আমার বাপের হাতের? নানার হাতের?

–না, না, না। তোমাদের সাথে জানা-পরিচিতি হইয়া গিয়াছে।

–জানা-পরিচিতি হইলে জাত যায় না?

–না।

–তবে বুরুজ ঠাকুরের যদি ঐ মাঝীর ছেমরীর সাথে জানা পরিচিতি হইয়া যাইত তবে পানি খাইলে জাত যাইত না?

বড় মিস্ত্রী হাঁ না কিছুই বলিল না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রমু সহসা হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

বড় মিস্ত্রী বিরক্ত হইয়া বলিল, হাসিলে যে।

–হাসিলাম একটা কথা মনে করিয়া। কথাটা এই, আমার ছোঁয়া পানি খাইলে তোমাদের যদি জাত যাইত তবে বেশ হইত।

বড় মিস্ত্রীর চোখ বিস্ফারিত হইল, কি রকম?

–বুরুজ ঠাকুরের মত তোমাদিগকেও আমাদের বাড়িতে থাকিয়া যাইতে হইত।

বড় মিস্ত্রী ঠকিয়া গিয়া কাজে মন দিল।

যে-দিন নাও গড়ানি শেষ হইল সেদিন মিস্ত্রিদের খুশি আর ধরে না। দীর্ঘদিনের চেষ্টা ও শ্রম আজ সফল হইল। এমন একখান চিজ তারা গড়িয়া দিল যে-চিজ অনেক–অনেকদিন পর্যন্ত জলের উপর ভাসিবে–কত লোক তাতে চড়িবে, বসিবে, নদী পার হইবে–এক দেশ হইতে আরেক দেশে যাইবে–কত জায়গায় দৌড়াইবে, বখশিস পাইবে–আর একজনার হাতের স্বাক্ষর স্বগর্বে বহন করিতে থাকিবে। কেউ জানিবে না,

কারা গড়িয়াছিল, কাদের বিন্দু বিন্দু শ্রম ও বুদ্ধির সঞ্চয় সম্বল করিয়া ধীরে ধীরে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাও? সে কি ভুলিয়া যাইবে এই চার জনকে? কিছুতেই না!

সেদিন তাদের খুশি উপচাইয়া উঠিল। লোকজন জড় করিয়া চারি জনে মিলিয়া তারা পায়ের পরে পা ফেলিয়া নাচিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়া গাহিল—গুনরে নগইরা লোক, নাও গড়াইতে কত সুখ ॥

নাও-গড়ানি শেষ করিয়া মিস্ত্রীরা পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া সত্যি একদিন কাঠের বাক্স মাথায় করিল, হাঁটুর কাপড় টানিয়া টানিয়া খাল পার হইল এবং গোপাটের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু দেখিতে তারা এক-একটা কাকের মত ছোট হইয়া গেল, তারপর এক সময় আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।

আর একদিন কোথা হইতে তিনজন কারিগর আসিয়া দিনরাত কাজ করিয়া নৌকায় তুলি বুলাইয়া রঙ লাগাইয়া গেল। দুই পাশে লতা হইল, পাতা হইল, সাপ হইল, ময়ূর হইল আর একজোড়া করিয়া পালোয়ান হইল।

তারপর একদিন নৌকা জলে ভাসিল। ছাদির পাড়ার লোক ডাকিয়া আনিয়াছিল আর আনিয়াছিল এক হাঁড়ি বাতাসা। তাহারা নৌকা গোরায় গোরায় ধরিল; একজন বলিল, জোর আছে? সকলে বলিল, আছে। আবার সকলে বলিল, যে জোর থুইয়া জোর না করে তার জোর খায় মরা কাষ্টে রে-এ-এ। এই বলিয়া এমন জোরে টান মারিল যে, নৌকা একটানেই জলে গিয়া পড়িল। কিন্তু তারা নৌকা থামিতে দিল না, সকলে মিলিয়া গায়ের জোরে ঠেলা দিল। ঠেলার বেগে নৌকা তিতাসের মাঝ পর্যন্ত গিয়া থামিল। ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল। রমুর দুই চোখও আনন্দে নাচিতে লাগিল। এমন অপূর্ব জিনিস আর দেখা যায় নাই! এমন রঙ, এমন শোভা! ধনুকের মত বাঁকা আসমানের রামধনুটা বুঝিবা উল্টাইয়া তিতাসের জলের উপর পড়িয়া গিয়াছে।

ভাদ্রের পয়লা তারিখে কাদিরের বাড়িতে খুব ধুমধাপ পড়িল। সকাল হইতে না হইতেই শত শত জোরদার চাষী তরুণ সেদিন তার বাড়িতে জমায়েত হইল। তারপর তারা রাঙা বৈঠা হাতে করিয়া নৌকায় উঠিয়া গোরায়-গোরায় বসিয়া গেল।

রমু এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করিতেছিল। এই সময় তার বাপকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বা' জান তোমরা নাও দৌড়াইতে যাইবা, আমারে নিবা না?'

'অখন কিসের নাও-দৌড়ানি? অখন ত খালি তালিম দিতে যাই। নাও-দৌড়াইতে যামু দুপুরের পর।'

'তখন আমারে নিবা না?'

'হ হ', বলিয়া ছাদির ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গেল।

গাঙ-বিলে ঘুরিয়া, গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া তালিম দিয়া আসিয়া দেখা গেল, নাও খুব ভাল হইয়াছে, চলেও খুব। সব লোকে একযোগে বৈঠা মারিলে সাপের মত হিস হিস করিয়া চলে, শিকারীর তীরের মত সাঁ সাঁ করিয়া চলে, গাঙের সোঁতের মত কলকল করিয়া চলে।

সকলে দুপুরের খাওয়া সারিয়া আবার যখন বৈঠা হাতে করিয়া নৌকায় উঠিল, রমুও তখন সকলের দেখাদেখি, রাঙা লুঙিখানা পরিয়া, গেঞ্জিখানা গায়ে দিয়া এবং রঙিন টুপিখানা মাথায় চড়াইয়া সকলের সমারোহের মধ্যে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুই পাশে দুই সারি লোক বৈঠা হাতে বসিয়া পড়িল। মাঝখানে কয়েকখানা তক্তার উপর, মাস্তুলের মত ছোট একখানা খুঁটি ঘিরিয়া কয়েকজন প্রবীণ লোক দাঁড়াইল। তারা সারি গাহিবে। একটি ঢোলক এবং কয়েক জোড়া করতালও উঠিল। আর উঠিল কিছু মারপিটের লাঠি।

সব কিছু উঠাইয়া ছাদির নিজে উঠিতে যাইবে, এমন সময় রমু তাহাকে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত আঁকড়াইয়া ধরিল, 'বাজান আমারে লইয়া যাও, অ বাজান আমারে লইয়া যাও।'

'কামের সময় দিক করিস না, ভাল লাগে না।' বলিয়া ছাদির তাহাকে এক ঝটকায় ছাড়াইয়া, ঠেলিয়া দিল, তারপর নৌকায় উঠিয়া হালের খুঁটিতে হাত দিল।

আলীর নাম স্মরণ করিয়া তাহারা নৌকা খুলিল, শত শত বৈঠা এক সঙ্গে উঠিল, পড়িল, জলের উপর কুয়াসা সৃষ্টি করিল, তারপর তিতাসের বুক চিরিয়া যেন একখানা শিকারীর তীর হিস হিস করিয়া ছুটিয়া চলিল।

ছাদির যখন হাল-কাঠি ধরিয়া সারিগানের তালে তালে তক্তার উপর পদাঘাত করিয়া নাচিতেছে, রমু তখন তিতাসের শূন্য তীরে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। নানা সাধিল, মা সাধিল, কিন্তু কারো কথা সে শুনিল না। মুখে তখনও সে বলিতেছে, 'বাজান, আমারে লইয়া যাও।'

তিতাসের বুকে সেদিন অনেকগুলো পালের নৌকা দেখা গেল। সব নৌকারই গতি এক দিকে। যে স্থানে আজ দুপুরের পর নৌকা-দৌড় হইবে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছোট বড় নানা আকারের পালের নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে। অনেক নৌকাতেই যত পুরুষ তার বেশি স্ত্রীলোক। বনমালীর নৌকাতেও তাই। পুরুষের মধ্যে বনমালী নিজে আর বড়-বাড়ির দুইজন। তাছাড়া অনন্ত। মেয়েদের মধ্যে আসিয়াছে বড়বাড়ির সকলে আর তাদের নন্দিনী অনন্তবালা, আর আসিয়াছে বনমালীর বোন উদয়তারা।

নৌকা-দৌড়ের স্থানটিতে গিয়া দেখে সে এক বিরাট কাণ্ড। তিতাসটা এইখান হইতে মাইল খানেক পর্যন্ত অনেকটা মোটা হইয়া গিয়াছে। তারই দুই পার ঘেঁষিয়া হাজার হাজার ছোট বড় ছইওয়ালা নৌকা খুঁটি পুঁতিয়াছে। কোথাও বড় বড় নৌকা গেরাপি দিয়াছে, আর তাহারই ডাইনে বাঁয়ে ও সামনের দিকে দশ বিশটা ছোট নৌকা তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই ভাবে যত দূর চোখ মেলা যায় কেবল নৌকা আর নৌকা, আর তাতে মানুষের বোঝাই। নদীর মাঝখান দিয়া দৌড়ের নৌকার প্রতিযোগিতার পথ।

সবে বেলা পড়িতে শুরু করিয়াছে। প্রতিযোগিতা শুরু হইবে শেষবেলার দিকে। এখন দৌড়ের নৌকাগুলো ধীরে সুস্থে বৈঠা ফেলিয়া নানা সুরের সারিগান গাহিয়া গাঙময় এধার ওধার ফিরিতেছে। হাজার হাজার দর্শকের নৌকা হইতে দর্শকেরা সে-

সব নৌকার কারুকার্য দেখিতেছে, বৈঠা মারিয়া কি করিয়া উহারা জলের কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহা দেখিতেছে।

এক সঙ্গে এতগুলি দৌড়ের নাও দেখিয়া অনন্তর বুক আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। একটা নাও ছাৎ করিয়া অতি নিকট দিয়াই চকিতে চলিয়া গেল, গানের কলিটাও শোনা গেল বেশ–আকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে, নাওয়ের গলুই পাইলাম না ॥

গানের মত গান গাহিতেছে বটে একখানা নৌকা। ধীরে সুস্থে চলিতেছে। বৈঠা জলে ছোঁয়াইয়া একসাথে শত শত বৈঠাকে উল্টাইয়া উপরে তুলিতেছে আর বৈঠার গোড়াটাকে একই সাথে নাওয়ের বাতায় ঠেকাইয়া বৈঠাধারীরা সামনের দিকে ঝুঁকিতেছে, আবার বৈঠা তুলিয়া জলে ফেলিতেছে। যেন হাজার ফলার একখানা ছুরি যাইতেছে আর তার সবগুলি ফলা একসাথে উঠিতেছে পড়িতেছে, আবার খাড়া হইয়া শির উঁচাইতেছে। মাঝখানে থাকিয়া একদল লোক গাহিতেছে, আর বৈঠাধারীরা সকলে এক তালে সে গানের পদগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছে।

তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গো, অ দিদি, প্রা-ণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে ॥

আমার বন্ধু খাইবে ভাত, কিন্যা আনলাম ঝাণ্ডর মাছ গো, অ দিদি, দুধের লাগি পাঠাইয়াছি, পয়সা কি সুকি, কি টেকা গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে ॥

আমার বন্ধু ঢাকা যায়, গাঙ পারে রান্ধিয়া খায় গো, অ দিদি, জোয়ারে ভাসাইয়া নিল হাঁড়ি, কি ঘটি, কি বাটি গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে ॥

আমার বন্ধু রঙ্গিঢঙ্গি, হাওরে বেন্ধেছে টঙ্গি গো, অ দিদি, টঙ্গির নাম রেখেছে উদয়তারা, কি তারা, কি তারা গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে ॥আমার বন্ধু আসবে বলি, দুয়ারে না দিলাম খিলি গো, অ দিদি, ধন থুইয়া যৈবন করল চুরি, কি চুরি, কি চুরি গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে ॥

উদয়তারা হাসিল, 'খুব ত গান। মাঝখানে আমার নামখানি ঢুকাইয়া থুইছে।'

সকলেই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সকল নৌকাতেই এমন সুন্দর গান হইতেছে তাহা নয়। একটি নৌকা হইতে শোনা গেল নিতান্ত গদ্যভাবের গান–চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে, আরে চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে, আরে চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে ॥ দর্শকদের এক নৌকা হইতে কেউ বলিয়া উঠিল, ও, চিনিয়াছি; বিজেশ্বর গ্রামের নাও, চর দখল করিতে গিয়া উহারাই খুনাখুনি করিয়াছিল। গানটা বাঁধিয়াছে সেই ভাব থেকেই।

তারপর যে দুইখানা নাও সারি গাহিয়া গেল, তাহাদের একটি হইতে শোনা গেল–জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো, যাইস না যমুনার জলে। যমুনার ঘাটে যাইতে দেয়ায় করল আন্ধি। পন্থহারা হইয়া আমরা কিস্ক বলে কান্দি ॥ যমুনার ঘাটে যাইতে বাইরে-ঘরে জ্বালা। বসন ধরিয়া টানে নন্দের ঘরের কালা ॥

পরের নাওখানার গান শুনিয়া বোঝা গেল রাধা বিপ্রলব্ধা হইয়াছে।

–আম গাছে আম নাই ইটা কেনে মারো, তোমায় আমায় দেখা নাই আঁখি কেনে ঠারো ॥ তুমি আমি করলাম পিরীত কদমতলায় রইয়া, শত্তুরবাদী পাড়াপড়শী তারা দিল কইয়া ॥

সঙ্গের একখানা ছইওয়ালা নৌকা হইতে বলিতে শোনা গেল, গোঁসাইপুরের নিকট রাধানগর আর কিষ্টনগর নামে দুই গাঁও আছে–সে দুই গ্রামেরই এই দুই নাও।

শুনিয়া বনমালী মন্তব্য করিল, তবে একখানাতে রাধাউক্তি আরেকখানাতে কিষ্ণউক্তি করিল না কেন? পূর্বোক্ত নৌকা হইতে জবাব আসিল, সবখানেই রাধা রে দাদা, সবখানেই রাধা।

চোখা মন্তব্যটা শুনিয়া আশেপাশের নৌকার লোকজন হাসিয়া উঠিল। এমন সময় বড়বাড়ির একজন উদয়তারার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল, এদিকে শুন ভইন কি মজার গানখান হইতেছে–

ও তোরে দেখি নাই রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে। থানায় থানায় চকিদার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, কোন কোন নারীর শুভ বরাত, আমার বরাত পুড়ে–বরাত পুইড়া গেলরে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে॥

হবিগঞ্জে নবীগঞ্জে কোণাকুণি পথ, প্রাণবন্ধু গড়াইয়া দিছে ইলশাপাট্যা নথ–সে নথ পইড়া গেল রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে॥

শুনিয়া উদয়তারা একটু হাসিল। পরে খানিকক্ষণ কান খাড়া রাখিয়া বলিল–এমন গান আরও কত আছে–অই শুন না, পেট মোটা পাতাম নাওয়ে কি গানখান হইতেছে–সামনে কলার বাগ, পূব-দুয়ারী ঘর, রাইতে যাইও বন্ধু, প্রাণের নাগর॥

আরেকখানা গান অনন্তবালার প্রতি সকলকে সচেতন করিয়া তুলিল–তীরের মত লম্বা নাও, কিন্তু চলিতেছে ধীরে ধীরে; চলিতেছে আর গাহিতেছে–ঝিয়ারীর মাথায় লম্বা কেশ, খোঁপা বান্ধে নানান বেশ, খোঁপার উপরে গুঞ্জরে ভোমরা॥ গাঙে আইলে আগুন মাগুন, বাড়িতে গেলে কেশের যতন, ঝিয়ারী জানি কোন পিরীতের মরা॥

গানটা শুনিতে শুনিতে অনন্তবালার বয়সাধিক বড় খোঁপাটা ধরিয়া উদয়তারা আস্তে একটু মোচড়াইয়া দিল।

অনন্ত আর অনন্তবালার চোখ অন্যদিকে। দুইটি প্রকাণ্ড মাটির গামলা বিচিত্র রঙে সাজাইয়া, দুইটি করিয়া হাত বৈঠা হাতে করিয়া দুইটি লোক উহাদিগকে লইয়া ভাসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের মুখে গান নাই, হাতে ছন্দ নাই। ফেশন করিয়া চুল দাড়ি ছাঁটাই করা, মাথায় জব জবে তেল, পরিষ্কার ধুতির উপর গায়ে সাদা গেঞ্জি। মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। আর জলে বৈঠা ডুবাইয়া এলোমেলো ভাবে টানিয়া আগাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে তারা অনন্তদের নৌকার একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, আর একটু অসাবধান হইলে তাহাদের নাওয়ের বাতায় ঠেকিয়াই গামলা ভাঙিবে। অনন্তবালা হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে গেলে লোক দুইটা বৈঠা দেখাইল। বনমালী মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিল, 'জুড়ি কেনে ধর না তোমরা, দেখতাম কে আগে যাইতে পারে।' কিন্তু লোকদুটি এসব কথায় কান দিতেছে না। তাদের দিকে গ্রাম গ্রামান্তরের মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে; ইহাতেই তাহারা খুশি।

'আমি কেনে একটা গামলা আনলাম না। তা হইলে ত বৈঠা মাইরা বেশ দৌড়াইতাম।' অনন্ত বলিল।

'তুমি একলা পারতা নাকি, জিগাই? তুমি কি ঐ লোকটার মতন চালাক, না চতুর? বৈঠা হাতে লইয়া চাইয়া থাকবা দৌড়ের নাওয়ের দিকে, আর কোনখানের কোন

যাত্রিকের নাও দিব ধাক্কা। ঠুনকা গামলা ভাঙলে তখন কি হইব। তুমি আমি দুইজনে থাকলে কোন ডর নাই; তুমি যখন একদিকে চাইয়া থাকবা, গামলারে আমি তখন সামলামু। আর গামলা যদি ভাইঙা যায়, তখন তুমি আমারে সামলাইও, কেমুন?'

'ঠিক কথা।'

তাহারা এইরূপ কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল, এমনি সময়ে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে উদয়তারা হাসিয়া উঠিল। উদয়তারা এমনি। মনে মনে কোন কিছু ভাবিতে থাকে। ভাবিতে ভাবিতে মন তার অনেক দূরে আগাইয়া যায়। কোথাও গিয়া তার চিন্তা ঠেকিয়া যায়। তখন সে কোনদিকে না চাহিয়া, কাহারও উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া, হঠাৎ আপন মনে হাসিয়া উঠে।

স্ত্রীলোকদের একজন, অনন্তবালার কাকীমা, মুখ ফিরাইয়া বলিল 'হাসলা কেনে দিদি।'

'হাসলাম ভইন একখান কথা মনে কইরা।'

'কি কথা বেঙের মাথা—কও না শুনি।'

উদয়তারা মনে মনে বলিল, সে কথা কি বলা যায়? যে-কথা মনে করিয়া ক্ষণে ক্ষণে হাসি, কারুরেই কইলাম না সে কথা—আর তুমি ত তুমি।

অনন্তবালার কাকী তরুণী। কৌতূহলে দুই চোখ ভরা। ছাড়িবার পাত্রী সে নয়। আবার ধরিল। 'কও না গ দিদি?'

'কি কমু গ ভইন।'

'কেনে হাসলা!'

'হাসি আইল, হাসলাম।'

'জেতা মানুষেরে ভাঁড়াইতে চাও। না কইবা ত না কইবা।'

'তবে কই শুন। যে-কথাখান মনে কইরা হাসলাম, সেই কথাখান এই—গাঙের উপর দিয়া কত নাও যায়। তারা কত রকমের গান গাইয়া যায়, ভালা গান, বুরা গান—ঘেন্নার গান অঘেন্নার গান। গাইয়া যায় ত?'

'যায়।'

'একটু আগেই ত শুনলা, কি বিটলা গান একখান তারা গাইতাছে।'

'শুনলাম।'

'তার একটু পরেই শুনলা, একখান সুন্দর গান গাইয়া গেল।'

'গেল।'

'আচ্ছা, এই যে ভালাবুরা গান গাইয়া যায়—আমি ভাবি, গাঙের বুকে ত সেই ভালাবুরার আর কোন রেখ ই থাকে না। থাকে কি?'

'না।'

'এইজন্যই হাসলাম।'

'আমিও কথাখান বুঝলাম।'

'বুঝলা যদি, তা হইলে আসল কথাখান কই। অনন্ত আর অনন্তবালা। নামে নামে মিলছে। মনে মনেও মিলছে। কথাখান এই।'

এমনি সময়ে পাশেই একখানা নৌকা ভিড়িয়াছে, তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে আরেকজন স্ত্রীলোক এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছে, 'চিন্তা কইরা শরীর কালা কইর না দিদি। গাঙের বুকে কত লোক কত গান গাইয়া যায়, গাঙে কি তার রেখ থাকে?'

এমন সময় অনন্ত ফিসফিস করিয়া অনন্তবালার কানের কাছে বলিল, 'মাসী।'

অনন্তবালার চোখ কৌতূহলে বড় হইয়া উঠিল। অনন্তর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে তার ঐতিহাসিক মাসীকে দেখিল।

বিধবা নারী। এখনও তরুণীর পর্যায়েই দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু শরীরের লাবণ্য ধুইয়া গিয়াছে। মুখখানা সুন্দর, কিন্তু মলিন। দেখিলে মায়া লাগে।

'এই মাসীই তোমারে তাড়াইয়া দিল।'

'দিল ত।'

মাসী ডাকে আকৃষ্ট হইয়া সুবলার-বৌ চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তারপর সহসা উদ্দাম হইয়া বলিয়া উঠিল, অনন্ত! আমার অনন্ত!

দুই নৌকার বাতা লাগানো ছিল। লাফাইয়া সে এ নৌকাতে আসিয়া উঠিল এবং অনন্তর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। মাসী মাসী বলিয়া অনন্তও হাত বাড়াইল। দেখিল, মাসীর দুই চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে। তাহার নিজের চোখও জলে ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় উদয়তারা পাষাণের মূর্তির মত নিবাত-নিষ্কম্প ভাবে আগাইয়া আসিল।

তার দিকে মন না দিয়া মাসী অনন্তকে আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর তার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, রুদ্ধ গলা কোন রকমে পরিষ্কার করিয়া বলিল, এতদিন তুই কোথায় ছিলি।

দুই চোখ বুজিয়া সে বলিয়া চলিয়াছে, এতদিন কোথায় ছিল, কার কাছে ছিলি, কে তোকে খাইতে দিত, কে শুইবার সময় গল্প শুনাইত, ঘুম পাড়াইত।

নির্মম নিষ্ঠুর উদয়তারার সুর সপ্তমে চড়িল, 'হ, যারে কুলার বাতাস দিয়া দূর কইরা দেয়, তারে কয় কে ঘুম পাড়াইত!'

অনন্তর পূর্ব-কথা স্মরণ হইল। তার মুখের শিরাগুলি, হাতের কব্জি দুইটি কঠিন হইয়া উঠিল। মাসীকে ছাড়িয়া দিয়া ঘাড় নিচু করিয়া বলিল, 'মাসী আমাদের তুমি ছাইড়া দাও।'

'তুইও আমার পর হইয়া গেলি অনন্ত!'

–আপন তো কোন কালে নই মাসী। মার সই তুমি। মা যতদিন ছিল, তোমার কাছে আমার আদরও ততদিনই ছিল। মা মরিয়া গেলে, সে আদর একদিন হাট-বাজারের মতই ভাঙিয়া পড়িল।

ভাঙিয়া পড়িল! কি করিয়া তুই বুঝিলি যে, ভাঙিয়া পড়িল?

–যাও যাও আমি সব বুঝি। যেদিন হইতে মা গেছে, সেদিন হইতে সব গেছে। সেদিন আমি ধরিয়া রাখিয়াছি পরবাসী বনবাসী আমি, –যে ডাকিয়া ঘরে লইবে তার ঘরই আমার ঘর, যে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিবে, তার ঘরই আমার পর।

'আরে বেঈমান কাউয়া, এই সগল কথা তোরে কে শিখাইল, কোন বান্দিনীর ঝিয়ে শিখাইল?'

উদয়তারা এবার ফাটিয়া পড়িল, 'আ লা বান্দিনীর ঘরের চান্দিনী। মুখ সামলাইয়া কথা ক, বুক সামলাইয়া বাড়ি যা। বেশি কথা তুলিস না, ছালার মুখ খুলিস না।'

সুবলার বউ আর সহ্য করিতে পারিল না। সাংঘাতিক একটা কিছু করিবার আয়োজনে সে আরও একটু আগাইয়া আসিয়া অনন্তর একখানা হাত ধরিল। অনন্তও জোর করিয়া মাসীর হাত ছাড়াইয়া উদয়তারার আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ করিয়া লইয়া বলিল, 'তুমি আমারে আদর জানাইও না মাসী।'

মাসীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অপমানে তার মাথা লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। উদয়তারা অবিশ্রাম গালি দিয়া চলিয়াছে। সবই অনন্তর জন্য। রাগে মাসীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, বলিল, আদর আমি তোকে জানাইবই, তবে, মুখে নয় হাতে। এই বরিয়া সে অনন্তর চুলের মুঠি ধরিয়া পিঠে দুমদুম করিয়া কিল মারিতে লাগিল। অনন্ত ভয়ার্ত চোখে মাসীর ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চোখ দুটির দিকে চাহিয়াই চোখ নত করিল এবং তার ক্রোধের আগুনে নিজেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিল। মার খাইতে খাইতে অনন্ত পাটাতনে নেতাইয়া পড়িল। সকলে থ হইয়া দেখিতেছিল। সহসা যেন সম্বিৎ পাইয়া উদয়তারা গর্জাইয়া উঠিল এবং সিংহিনীর থাবা হইতে হরিণ-শিশুর মত অনন্তকে মাসীর কবল হইতে মুক্ত করিল। অনন্ত তখন বলির কবুতরের মত কাঁপিতেছে।

তারপর যে কাণ্ড হইল তাহা বলিবার নয়। উদয়তারা সহ নৌকার সব কয়জন স্ত্রীলোক সুবলার বৌকে পাটাতনে শোয়াইল, তারপর সকলে সমবেতভাবে হাতেপায়ে প্রহারের পর প্রহারের দ্বারা জর্জরিত করিতে লাগিল। অনেক মার মারিয়া জব্দ করার পর, শেষে তাহারা ছাড়িয়া দিল। অতি কষ্টে দেহটা টানিয়া তুলিয়া সুবলার বউ বুকের ও উরুর কাপড় ঠিক করিল এবং আলুথালু বেশে টলিতে টলিতে নিজেদের নৌকায় গিয়া উঠিল। চারিদিকের নৌকাগুলি হইতে হাজার হাজার লোক তখন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অপমানে, লজ্জায় সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। সঙ্গিনীরা তাহাকে ধরিয়া বসাইলে সে পাটাতনের উপর শুইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উদয়তারার দল বিজয়গর্বে ফুলিতে লাগিল। কিন্তু অনন্ত তখনও কাঁপিতেছে। পুরুষেরা দাঁড় টানিয়া নৌকা সরাইয়া লইতেছে। আর কোনোদিন বোধ হয় দেখা হইবে না। অনন্ত ভয়ে ভয়ে ওদিকে ঘাড় ফিরাইল। মাসী পাটাতনের উপর উপুড় হইয়া ফোঁপাইতেছে। সেই নৌকায় পুরুষেরা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, থাক আর নাও-দৌড়ানি দেখিয়া কাজ নাই। চল ফিরিয়া যাই।

তাহারা ফিরিয়া চলিল। অনেক দূরপথ। কিন্তু তাড়া নাই। অনেক বেলা আছে। নৌকা-দৌড়ের এলাকা ছাড়াইয়া খোলা জায়গায় আসিয়া তাহারা হাফ ছাড়িল। দেখা গেল, এত দেরী করিয়াও একখানা নৌকা দৌড়ের এলাকার দিকে যাইতেছে। যাইতেছে আর সারি গাহিতেছে—সকলের সকলি আছে আমার নাই গো কেউ। আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ ॥ নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে। নাও আছে কাণ্ডারী নাই শুধু ডিঙা ভাসে ॥

সপ্তম অধ্যায়

দুরঙা প্রজাপতি

সুবলার বউয়ের জীবনে একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ছেলেবেলা মা বাবা তাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। কোনদিন তারা তার গায়ে হাত তোলে নাই। মালোদের পাড়ার মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হয়, গালাগালি করে। কিন্তু পাড়ার পাঁচজনের কেউ কোনদিন তার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে নাই। পাড়ার মধ্যে তার নিজের একটা মর্যাদা ছিল। একটা গর্ব ছিল। আজ তাহা একেবারে খর্ব হইয়া গিয়াছে।

আজ সে দেহে মনে বিপর্যস্ত। সমস্ত শরীরে ব্যথা; এখানে ওখানে ফুলিয়া গিয়াছে। নৌকা হইতে নামিয়া কোন রকমে বাড়ি আসিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটা পাটি বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। নৌকাতে অন্যান্য মেয়ে যারা ছিল, তাদের নিকট হইতে সকল প্রতিবেশীরা অগৌণে ঘটনাটা জানিতে পারিল। সকল কথা শুনিয়া তার মা এক-বাটি হলুদ-বাটা গরম করিয়া আনিয়া বলিল, 'কাপড় তোল, কুনখানে কুনখানে বেদনা করে ক' দেখি। ইস, গাও যে আগুনের মত তত্তা।'

আদর পাইয়া তার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

মা তার দুই চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'আ-লো নিশত্তুরি, তর নি এই দশা। তর বুকের না, পেটের না, তার লাগি তর কি!'

সুবলার বউ কোন কথা বলিল না।

—ঐ কলিজা-খেকোকে তুই কেন আদর জানাইতে গেলি। দশজনের মাঝে তুই বেইজ্জত হইলি!

সে এবারও নিরুত্তর রহিল।

তার মা আর কথা না বাড়াইয়া তারই কাছে শুইয়া পড়িল। বুড়া রাতের জালে গিয়াছে।

বুড়ি শুইয়া শুইয়াই তামাক টানিল, তারপর বাতি নিভাইল এবং সারা রাত মেয়েকে বুকে করিয়া রাখিল। তার স্তন দুটি শুকাইয়া দড়ির মত হইয়া গিয়াছে। মেয়ে তারই মধ্যে তার অলস স্তন দুটি ডুবাইয়া দিয়া গভীর আরাম পাইল। মা তার তোবড়ানো গালের সঙ্গে মেয়ের মসৃণ গৌরবর্ণ গালখানা মিশাইলে মেয়ের দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল। শরীরের ব্যথায় মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, আবার ঘুম আসে। এই চেতন-অবচেতনের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই তার মনে হইতে থাকে সংসারে কেবল মা-ই সত্য আর কিছু না।

পরের দিন তার শরীরের ফোলা কমিয়া গেল, ব্যথা কমিয়া গেল মনও অনেকটা হালকা হইয়া আসিল। মনে তখনো যেটুকু দাহ ছিল, জুড়াইবার জন্য সূতা-কাটা আর জাল-বোনাতে আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু পাড়াতে তার হারানো মর্যাদা আর ফিরিয়া পাইল না।

পাড়ার পাঁচজনের মুখ হইতে ঘটনাটা ভিন জাতের পাড়াতেও ছড়াইয়া পড়িল। এ ঘটনার পর পাড়ার যুবকদের নিকটই তার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিত। তার উপর বামুন কায়েতের যুবকরা পর্যন্ত উঠান দিয়া যাইবার সময় তার ঘরের দিকে উঁকি মারিতে থাকিত। এভাবে লাঞ্ছিত হইয়া শেষে সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিত, সারাদিন আর খুলিত না। কিন্তু তবু তার নিষ্কৃতি হইল না। একদিন থালা ধুইবার জন্য ঘাটে যাওয়ার সময়ে মঙ্গলার বউ তাকে পথে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'কি গ ভইন, বাড়ির কাছে বাড়ি, ঘরের কাছে ঘর, তবু যে দেখা পাওয়া যায় না, কারণ কি।'

'শরীর ভাল থাকে না দিদি। মধ্যে মধ্যে জ্বর জ্বর লাগে। আর বাপের জালখান পুরান হইয়া গেছে। মাছের গুঁতায় টিকে না। নতুন একখান জাল চাই। ঘরে কি পাঁচটা ভাই আছে না ভাই-বউ আছে। একলা আমারই ত বেবাক করন লাগে।'

মঙ্গলার বউ ইহার কোন উত্তর দিল না। বলিল–

'তা, দুয়ার বন্ধই কর আর যাই কর ভইন, কথাখান নগরে বাজারে জানাজানি হইয়া গেছে।'

সুবলার বউ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, 'কোন কথাখান, কি গ মহনের মা, কোন কথাখান।'

–আমার কোন দোষ নাই ভইন। বাজারের লোক যারা তামসীর বাপের বাড়ি তবলা বাজায় তারা কহিয়াছে। তারা বামুন, তারা কায়েত। তারা শিক্ষিত লোক। মালোদের চেয়ে তারা বুঝে শুনে বেশি। তাদের দোকান থেকে মালোরা জিনিস বাকি আনে। জিয়লের ক্ষেপে যাইবার সময় তমসুক দিয়া তাদের নিকট হইতে টাকা আনে। বিয়া-শাদিতেও টাকা ধার দেয় তারা। গ্রামের অধিক মালো তাদের বশ। তাদের কথা মালোরা কি গ্রাহ্য না করিয়া পারে। তারা যা বলিয়াছে মালোদের কাছে তা ব্রহ্মার লেখ। তারা বলিতেছে, বিধবা মানুষ দরজা বন্ধ করিয়া থাকে, লাজে মুখ দেখায় না, কি হইয়াছে আমরা কি তাহা বুঝিতে পারি না?

শুনিয়া সুবলার বউ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পায়ের তলা হইতে তার যেন মাটি সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু সম্বিৎ হারাইল না। পড়ি পড়ি করিয়া সে বাড়ি চলিয়া আসিল।

ইহার পর যে-কেহ তার দিকে তাকাইত, সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তার দিকে এমনি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত যে, সেখানে তার তিষ্ঠিবার উপায় থাকিত না। একদিন তামসীর বাপের বাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া যারা তবলা বাজায় গান গায়, তাদের লক্ষ্য করিয়া এমন গালি শুরু করিল যে, একঘণ্টার আগে থামিল না। পাড়ার আর সব মেয়েরা বলিতে লাগিল, মাগো মা, রাঁড়ি যেন একবারে 'বান্ধে খাড়া' হইয়াছে।

সে মালোপাড়া হইতে উহাদের পাট উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন পথ পাইল না। আগের মাতব্বররা এখন আর তেমন নাই, থাকিলে অনায়াসে একটা বিহিত করা যাইত। যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ মালো-সমাজে বিধবাবিবাহ চালাইতে গিয়া জব্দ হইয়াছে। গ্রামের চক্রবর্তী ঠাকুর পুরোহিত দর্পণ খুলিয়া মালোদিগকে বুঝাইয়াছে, বিধবার বিবাহ দিলে নরকে যাইতে হইবে। কাজেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা শিরোধার্য করিয়া রামপ্রসাদকে তাঁরা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এখন আর মালো-সমাজে তাঁর তত

প্রভাব নাই। দয়ালচাঁদ আগে উচিত কথা বলিত। তাদের যাত্রা দলে সেজন্য মুনিঋষি সাজিত। শহরে যাত্রা গাহিয়া তারা তাকে বড়-লোকের কাছ থেকে সোনারূপার মেডেল পাওয়াইয়াছে। ইহার পর দয়ালচাঁদও আজকাল ইহাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এখন আর আগের মত উচিত কথা কহিবে না।

কিন্তু সুবলার বউ এর মধ্যে বিপ্লবী নারী বাস করে। সে দমিতে জানে না।

'মহনের মা, এই গাঁওয়ের মাইয়া আমি, বিয়া হইছে এই গাঁওয়ে। আমি নি ডরাই বাজাইরা লোকেরে গো।'

মঙ্গলার বউ বলে, 'তুমি মাইয়া-মানুষ। তুমি কি করতে পার ভইন।'

'আমি সব পারি। আর কিছু না পারি আগুন লাগাইয়া গাঁও জ্বালাইয়া দিতে পারি।'

'গাঁওয়ের একঘরে আগুন লাগলে সহস্রেক ঘর পুড়া যায়। বাজাইরা পাড়া যেমুন পুড়ব মালোপাড়াও পুড়ব। তোমার ঘর পুড়ব, আমার ঘর পুড়ব। তারা যেমুন মরব, আমরাও ত মারা যামু ভইন।'

'অপমানের বাঁচনের থাইক্যা সম্মানের মরণও ভালা দিদি।'

কথাটা মালোর ছেলেদেরও মনে ধরিল। তিনজন লোক তবলা বাজাইয়া বেশি রাতের পর উঠিয়া বাড়ি যাইবার সময় মালোর ছেলেরা পথে পাইয়া তাহাগিদকে শুধু হাতে অনেক মার মারিল। মার খাইয়া দলের লোকজন ডাকাইয়া তারা একত্র মিলিত হইল, কি করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্য। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল তারা সামনাসামনি প্রতিশোধ নিবে না। মালোদের জানমাল বলিতে গেলে তাহাদেরই হাতে। মালোদিগকে তারা হাতে না মারিয়া অন্য উপায়ে মারিবে।

সেই দিন হইতে মালোপাড়ার আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া থাকিল। কেউ জানিল না তার ছায়া কালক্রমে কতখানি আতঙ্কের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

সেদিন কাদিরের ছেলের নতুন যে নৌকা দৌড়াইবার জন্য খলায় গিয়াছিল, সে নৌকা আর ফিরিল না। প্রতি বৎসরই এমন হয় কোন না কোন গাঁয়ের নৌকার সঙ্গে কোন না কোন গাঁয়ের নৌকার সংঘর্ষ লাগেই। পুরানো ঝগড়া থাকিলে তো কথাই নাই। সুযোগ দেখিয়া নৌকাখানা সটান শত্রু নৌকার পেটে ঢুকাইয়া দেয়। বিদীর্ণ হইয়া যায় সে নৌকা। মারের উপকরণ নৌকাতেই প্রস্তুত থাকে। শুরু হইয়া যায় মারামারি। কত লোকের মাথা ভাঙে, হাত, পা, কোমর ভাঙে। কত লোক জলে পড়িয়া গিয়া আর উঠে না। প্রতি বৎসরই এমন একটা দুটা মারামারি হয়। প্রতিযোগিতার সময় প্রতি বৎসরই কোন না কোন একটা নৌকা আর একটা নৌকার উপরে উঠিয়া পড়ে। এ বৎসর উঠিল ছাদিরের নৌকার উপরে।

ছাদিরের নৌকাখানাকে বিদীর্ণ করিয়া দিল যে নৌকাখানা, ছাদিরের লোক তাদের চেনে না। ঘটনাটা চক্ষুর নিমেষে ঘটিয়া গেল। একমুহূর্ত আগেও তার নৌকা ময়ূরের মত বৈঠার পেখম উড়াইয়া সর্পের গতিতে চলিতেছিল। পলক ফেলিতে দেখে তারা বিক্ষিপ্ত হইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে।

ঘর নিস্তব্ধ। কাহারো মুখে কথা নাই। সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছে। এ বাড়ির সকলের ভাগ্যে যেন একটা ঝড় বহিয়া এখন সব কিছু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কেরোসিনের বাতিটা টিমটিম করিয়া ঘরটাকে আলো দিয়া রাখিয়াছে মাত্র। আসলে সব

কিছুই যেন আঁধারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। সকলের আগে রমু। সে তার বাপের প্রত্যেকটি কথা গিলিতেছে। বাপকে তার কাছে খুব বড় বোধ হইতে লাগিল। এত বড় একটা বিপদ ঘাড়ে লইয়া বাঁচিয়া আসিল যে মানুষ, সে এত বড় যে নাগাল পাওয়া যায় না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কাদির মিয়া বলিল, 'খোদা মেহেরবান, তোরে বাঁচাইছে। আর সব লোকের না জানি কি গতি হইল।'

'জানি না বাপ। আমিই কি বাঁচতাম। জলে পইড়া দেখি, শতে বিশতে নাও। কোনটা গেল মাথার উপর দিয়া, কোনটা গেল ডাইনে দিয়া, কোনটা গেল বাঁয়ে দিয়া। কোনটার লাগল ছিটাপানি, কোনটার লাগল বৈঠার বাড়ি। শেষে আমি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখলাম ! এমন সময় দেখলাম তারে। চিনলাম। হাত বাড়াইলাম। ঝাঁপ দিয়া পানিতে পড়ল। আমারে পাছড়াইয়া শেষে তার নাওয়ে নিয়া তুলল। ঐ যে আলুর নাও ডুববার কালে যেজন বাঁচাইছিল সেই জাল্লা ভাই।'

সকৃতজ্ঞ চোখে সকলেই আর একবার বনমালীকে দেখিল। তার উপর রমুর অসীম শ্রদ্ধা হইল।

পাড়াতে একটা কান্নাকাটির রোল উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। পাড়ার যুবক বলিতে যারা ছিল সকলেই ছাদিরের নৌকাতে গিয়াছিল। এই বিপদের কথা শুনিয়া সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িল। এমন সময় তাদের দুই একজন করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া কাদির বলিলঃ এখন চঞ্চল হইও না, আর কতকক্ষণ বিলম্ব কর, খোদা আনিলে দেখিবে, সকলেই আসিয়া পড়িবে।

তার কথাই ঠিক হইল। এই পথে যত নৌকা আসিতেছে প্রায় সবগুলিতেই দুইজন চারিজন করিয়া তারা সকলেই প্রায় নিরাপদে ফিরিয়া আসিল।

রমুর ভাবনা হইল, যখন সকলেই আসিল, তখন নৌকাখানাও ফিরিয়া আসিলে ভাল হইত। এক সময় ছাদির সহসা অভিভূত হইয়া বলিল, 'বাজান তোমার পাঁচশ টাকা দিয়া আইলাম তিতাসের তলায়।' কাদির অনেক সান্ত্বনা বাক্যে তার মনের ভার লাঘব করিলে সে বনমালীর হাত ধরিয়া বলিল, 'তুমি ভাই হইলেও আছ, বন্ধু হইলেও আছ। চাইরটা জলচিড়া না খাওয়াইয়া ছাড়ছি না।'

কাদিরেরও মনে হইল, ঠিক কথা, ইহাদিগকে আপ্যায়ন করিতেই হইবে।

বাপ-বেটার মিলিত অনুরোধ তারা কিছুতেই এড়াইতে পারিল না।

রমুর মার বাপের-বাড়ি হিন্দুপাড়ার নিকটে। সে প্রশস্ত গোয়াল ঘরখানা বেশ করিয়া নিকাইয়া দিল। কলসী হইতে চিড়া বাহির করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কুলাতে করিয়া ঝাড়িয়া দিল। ছাদির ক্ষিপ্রহস্তে গাই দুহিয়া অনেক দুধ আনিয়া দিল। কাদির মিয়া কুমারপাড়া হইতে একদৌড়ে নিয়া আসিল একটা নতুন হাঁড়ি।

উদয়তারা তিনখানা মাটির ঢেলার উপর হাঁড়ি বসাইয়া কাঠের আগুনে দুধ জ্বাল দিতেছে। আগুনটা এককেবার কমে, আবার দপ করিয়া বাড়িয়া উঠে। যখন বাড়িয়া উঠে তখন উদয়তারার মুখটা লাল দেখায়। যখন নিভিয়া যায়, মুখটা নিচু করিয়া ফুঁ দেয়। তখনি সহসা জ্বলিয়া উঠে। সে আগুনে উদয়তারার মুখটা আবার লাল দেখায়।

দূরে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছিল জমিলা। কাদিরের একমাত্র মেয়ে সে। শেষে নিশ্চিত ভাবে চিনিয়া ফেলিল। রমুর মাকে বারান্দা হইতে টানিয়া নামাইয়া [illegible], '[illegible] ভাবী, এ যে সেই মানুষ। আমার পয়লা নাইওরের সময় পথে যারে দেখছিলাম। ডুবাইয়া ডুবাইয়া কলসী ভরছে সেই মানুষ। যার কথা কতবার কইছি।'

সারাদিনের শ্রান্তি। ঝগড়ার ঝামেলা। তার উপর ক্ষুধা। গোয়াল ঘরে বসিয়া কলাপাতায় দুধ-বাতাসা মিশাইয়া তারা সেদিন পরিতৃপ্তির সহিত 'জলচিড়া' খাইল। খাওয়ার পর জমিলা উদয়তারাকে টানিয়া অন্দরে নিয়া বসাইল, বলিলঃ বিয়ার পর আমার পয়লা নাইওর। আমি ছিলাম নৌকার ছইয়ের ভিতরে। ছইয়ের মুখ ছিল একখানা শাড়ি গুঁজিয়া বন্ধ করা। বাতাসে শাড়ির গোঁজাটা খুলিয়া গেল। তুমি তখন ঘাটে ঢেউ দিয়া জল ভরিতেছিলে। আমি তোমাকে দেখিলাম। মনে হইল যেন কত কালের চেনা। জানা নাই শোনা নাই, কি জানি কেন একজনকে দেখিয়া এত ভাল লাগে। তাই আমি বারে বারে দেখিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে দেখিলে না। পরের বারে এখানে আসিয়া বাপকে বলিয়াছিলাম, সই পাতিব। বাপ বলিল, নাম জানিনা, নিশানা জানিনা, কি করিয়া খুঁজিয়া পাইব। তারপর কতবার তোমার ঘাট দিয়া নাইওরে গিয়াছি। তখন আমি পুরানো। শাড়ির বেড়া নিজ হাতে খুলিয়া আতিপাতি করিয়া চাহিয়াছি, তোমাকে দেখিতে পাই কিনা। দেখিতে পাই নাই। আর কি কাণ্ড, আজ তুমি নিজে যাচিয়া আসিয়াছ। আসিয়াছ যখন, তখন তুমি এখানে দুইদিন বেড়াও। তোমার বাড়িতে আমারে নিয়া দুইদিন রাখ।

শুনিয়া উদয়তারা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার জমিলা নামটা খুব ভাল লাগিল। কিন্তু সে সংসার সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ দেখিয়া বেদনাবোধ করিল।

কালোমেঘ সরিয়া গিয়া চাঁদ উঠিলে দেখিতে কেমন সুন্দর হয়। তেমনি একটা খুব বড় বিপদ কাটিয়া গিয়া মনে সুখের উদয় হইলে সে সুখ কত মধুর হয়, তাহা কাদিরের বাড়িতে তখন যে না দেখিয়াছে তাহাকে কি বলিয়া বুঝান যায়।

নৌকায় ঝগড়া মারামারির দরুণ মনে যে অস্বস্তিটুকু ছিল কাদিরের বাড়ি অতিথি হইয়া তারা তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল। মনে স্নেহ ও প্রীতির অনুপম এক ছোপ লইয়া তারা নৌকাতে গিয়া উঠিল।

আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। তারই আলোকে তিতাসের ছোট ছোট ঢেউগুলি চিকমিক করিতেছে। সেই ঢেউ ভাঙিয়া নৌকা আগাইয়া চলিল। গেল না কেবল বনমালী আর অনন্ত। গৃহকর্তার নির্বন্ধাতিশয্যে তারা আজ এখানে রহিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে অনন্তর ঘুম ভাঙিলে বাহিরে গেল। গোয়াল ঘরে একপাল গরু ডাকাডাকি করিতেছে। বাছুরগুলি ছাড়া পাইয়া অকারণে লাফাইতেছে। অদূরেই বর্ষার জল থই থই করিতেছে। ছোট ছোট নানা জাতের গাছগুলি কোমর-জলে আটকা পড়িয়াছে। তারই সঙ্গে এক একটা ডিঙি বাঁধা। একটা খোলা জায়গাতে বাঁশের লম্বা 'আড়া' বাঁধিয়া তার উপর ঝুলাইয়া পাট শুকাইতে দিয়াছে। যেন খুব বড় একটা পাটের দেওয়াল বানাইয়া রাখা হইয়াছে। ভিজা পাটের গন্ধ দিগ্বিদিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। আকৃষ্ট হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং উড়িতেছে বসিতেছে। অনন্ত নিবিষ্ট মনে সেগুলি

দেখিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে একখানে মোড় ঘুরিবার সময় দেখিল রমু দাঁড়াইয়া আছে। অনন্তর মত তারও চোখেমুখে বিস্ময়। তার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য রমুর প্রাণ ছটফট করিতেছিল। সে শুধু ভাবিতেচিল তাহাদের বাড়িতে এরা রহিয়া গিয়াছে, কি মজা। কথা বলার উপলক্ষ খুঁজিতে খুঁজিতে এক সময় রমু বলিল, 'তুমি ফড়িং ধর না?'

অনন্ত বলিল, 'না।'

রমু আবার বলিল ঃ ওই বাঁশের পুল পার হইয়া যে-বাড়ি, সে-বাড়িতে থাকে গফুর, আমার চাচাত ভাই। সে খুব ফড়িং ধরে আর আড়কাঠি বিধাইয়া ছাড়িয়া দেয়, তারা ছটপট করিয়া মরিয়া যায়। দেখিয়া আমার মনে কষ্ট লাগে। তুমি ফড়িং ধরনা, তুমি কত ভাল।

এমন সময় রমুর মা গাদায় ফেলিবার জন্য গোয়ালঘর হইতে এক ঝুড়ি গোবর লইয়া যাইতেছিল। তারা দুইজনকে একসঙ্গে পরিচিতের মত কথা বলিতে দেখিয়া তার মাতৃহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যাইবার সময় শশা গাছ হইতে টুক করিয়া একটি শশা পাড়িয়া অনন্তর হাতে দিয়া বলিল, 'ধর বা'জি, খাও।'

শশাটা হাতে লইয়া অনন্ত বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। রমু বলিয়া দিল, মা।

মা নাম শুনিয়াই অনন্ত তার পায়ে টিপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া আসিল।

গ্রামে ফিরিয়া অনন্ত লেখাপড়ায় মন দিল। গোঁসাই বাবাজী যেদিন তাকে প্রথম 'কালো আখর' শিখাইল, সেদিন তার আনন্দ উপচাইয়া উঠিল। একটি নতুন জগৎ তাকে দ্বার খুলিয়া ডাকিয়া নিয়া গেল। তারপরে দুই আখরে তিন আখরে মিলিয়া এক একটা কথা হইল। এ সকল কথা মুখে যেমন বলা যায় তেমনি লিখিয়াও প্রকাশ করা যায়। দেখিয়া তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনকোণা, চারকোণা, গোল, নানা রকমের আখরগুলি কলাপাতায় নক্সা করিতে কি যে ভাল লাগে। রাতে শুইলেও সেগুলি আকার নিয়া চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিতে থাকে।

দেখিতে দেখিতে শিশুশিক্ষা শেষ হইয়া যায়। বনমালীর গর্ব হয়। সে বইটার যে-কোন একটা জায়গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে, এইখানে পড় দেখি। অনন্ত পড়ে। কোথাও ঠেকে না। মাঝে মাঝে বনমালীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। বলে, 'কালা আখর' কেমুন জিনিস সময় থাকতে জানলাম না, অখন তা-ই শিখলাম।'

শিশুশিক্ষা শেষ করিয়া বাল্যশিক্ষা ধরে। তার সঙ্গে ধারাপাত। ঘোড়ায় চড়িল আবার পড়িল, কথাগুলি নতুন কিন্তু আখরগুলি চেনা। শিশুশিক্ষাতেই এসবই পাওয়া গিয়াছে। এখানে একটা ছবি আছে। লোকটা ঘোড়া ছুটাইয়াছে। পড়িয়া যাওয়ার ছবি নাই। কোন সময় পড়িয়া গিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে, সেটা দেখিতে পায় নাই বলিয়াই ছবি দেয় নাই। তারপর আসিল যুক্তাক্ষর। এগুলি কঠিন এবং জটিল। কিন্তু এই কঠিনতায় জটিলতায় যে একটা মোহ আছে, অনন্তকে তাহা পাইয়া বসিল। তারা নতুন নতুন রূপ নিয়া তার মানসলোকে আপনা থেকে আসিয়া ধরা দিতে লাগিল।

অনন্তবালাকেও তার কাছে পড়িতে দেওয়া হইল। কিন্তু মেয়েটার পড়াতে বিশেষ মন নাই। কিছুই শিখিতে পারে না। পড়েই না শিখিবে কি করিয়া। সে কেবল একবার

অনন্তর দিকে চাহিয়া থাকে, আবার বাহিরে যেখানে ধানক্ষেতের সঙ্গে আকাশ মিশিয়াছে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। হয়ত দূরে যেখানে আর একটা গাঁ আছে তার দিকে চোখ মেলিয়া ধরে। আর সুযোগ পাইলেই কেবল কথা বলে। কোন অর্থ হয় না দরকারে লাগে না এমন সব কথা বলিতে থাকে। একবার বলিতে থাকিলে থামানো মুশকিল হয়।

কোনদিন বলে, আজ আমাদের বাড়িতে অনেক কথা হইয়াছে। তোমারে আমারে নিয়া। নামে নামে মিল আছে কিন্তু অত মিল ভাল নয়। তাই তোমার নামটা বদলাইলে আমার নামও বদলাইতে বলিব। জান, তোমার কি নাম রাখিবে। মা বলিয়াছিল হরনাথ রাখিতে। কিন্তু ছোটখুড়ির পছন্দ হইল না, বলে পীতাম্বর রাখিতে। কিন্তু এ নাম আবার বড়খুড়ির পছন্দ না হওয়াতে অনেক তর্ককর্তির পর বড়খুড়ি যে-নাম রাখিতে বলিল তাহা রাখা হইবে স্থির হইল। তোমার নাম হইবে গদাধর।

–এ নাম আমার মাসীর পছন্দ হইবে না।

–কিন্তু রাখা যখন হইয়া গিয়াছে, আর ত বদলাইতে পারিবে না।

–আমার নাম বদলাইবার আবার কি দরকার পড়িল।

–তুমি বুঝি জান না। মা জানে, বাবা জানে, আমি জানি। আর তুমি জান না। তোমাকে বলিতে আমায় নিষেধ করিয়াছে তাই বলিব না। তোমাকে নিয়া আমাদের বাড়িতে অনেক কথা হয়। তোমাকে চিরদিনের জন্য আমাদের বাড়িতে থাকিতে হইবে। তারা কোথাও যাইতে দিবে না। তারা বলে তোমাকে কেবল আমার সঙ্গেই মানাইবে, আর কারো সঙ্গে না।

–আমি যদি না থাকি।

–জোর করিয়া রাখিবে। বাঁধিয়া রাখিবে।

–হে, আমাকে বাঁধিয়া রাখিবে। এক সময় হুট করিয়া কোথায় চলিয়া যাইব। জানিলে ত।

অনন্ত সত্যই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পাঠশালার ফিরতি পথে এক নাপিত-বাড়িতে পেয়ারা গাছ ছিল। নাপিতানী একদিন তাকে পেয়ারা খাইতে দিয়াছিল আর ছুটির দিন তাকে গিয়া রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে বলিয়াছিল। রামায়ণ শুনিতে শুনিতে নাপিতানী তার মনে এক অনির্বাণ অগ্নি জ্বালাইয়া দিল।

–অনন্ত তোর রামায়ণ-পড়া আমার খুব ভাল লাগে। তোকে আমি ভাল পরামর্শ দিই। তুই চলিয়া যা। এখানে তোকে দ্বিতীয় শ্রেণি পড়াইয়া জেলে-নৌকায় তুলিবে। অধিক পড়া তোর হইবে না। কিন্তু তোকে আরো শিখিতে হইবে, বিদ্বান হইতে হইবে। বামুন কায়েতের ছেলেদের মত এলে-বিয়ে পাশ করিতে হইবে। এই তিনকোণা পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য ভূমণ্ডল সব তোকে জানিতে হইবে। সাতসমদ্দুর তের নদীর কথা, পাহাড় পর্বত হাওর প্রান্তরের কথা তোকে জানিতে হইবে। এ সংসারে কত বই আছে। হাজার হাজার বই লক্ষ লক্ষ বই। এক এক বইয়ে এক এক রকম কথা। তোকে সব পড়িতে হইবে, পড়িয়া সব শিখিতে হইবে।

'অত বই আছে সংসারে?'

–আছে। এখানে থাকিয়া তা তুই কি করিয়া বুঝিতে পারিবি। এখানে থাকিলে তুই আর কখানা বই পড়িতে পাইবি। শহরে চলিয়া যা। কাছের শহরে নয়। দূরের। তুই একেবারে কুমিল্লা শহরে চলিয়া যা।

'যামু যে, খামু কি কইরা। পড়ার টাকা পামু কই।'

–পরের মাকে মা ডাকিবি, পরের বোনকে বোন ডাকিবি। ভগবানে তোকে না খাওয়াইয়া রাখিবে না। তোর লেখাপড়াতে মন আছে দেখিলে তারা তোর নিকট পড়ার বেতন লইবে না। নিজের খরচে তোকে বই কিনিয়া দিবে।

অনন্ত এসব কথা শুনিয়া আসিত আর রাতদিন কেবল ভাবিত। অজানা একটা রহস্যলোক তাকে নিরবধি হাতছানি দিয়া ডাকিত। আনন্দের একটা অনাস্বাদিত উন্মাদনায় তার মন এক এক সময় ভয়ানক চঞ্চল হইয়া পড়িত।

শেষে শীঘ্রই একদিন সে তার প্রার্থিত বস্তুর সন্ধানে পথে পা বাড়াইল।

মালোদের একতায় যেদিন ভাঙন ধরিল, সেইদিন হইতে তাদের দুঃসময়ের শুরু। এতদিন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল বজ্রের মত দৃঢ়; পাড়াতে তারা ছিল আঁটসাট সামাজিকতার সুদৃঢ় গাঁথুনির মধ্যে সংঘবদ্ধ। কেউ তাদের কিছু বলিতে সাহস করে নাই। পাড়ার ভিতর যাত্রার দল ঢুকিয়া সেই ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিল।

যাত্রাদলের যারা পাণ্ডা, তারা অর্থে ও বুদ্ধিতে মালোদের চেয়ে অনেক বড়। তারা অনেক শক্তি রাখে। কিন্তু একসঙ্গে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া, অল্পে অল্পে প্রয়োগ করিতে লাগিল। যেদিন বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল তার পরের দিন তারা তামসীর বাপের বাড়িতে আরও জাঁকিয়া বসিল। এতদিন ছিল শুধু তবলা, এবার আসিল হারমনিয়াম, বাঁশি ও বেহালা। গীতাভিনয়ের তিন রকমের তিনটা বই আসিল। আগে কেউ নামও শুনে নাই এমনি একটা পালার তালিম দেওয়া শুরু হইল। তামসীর বাপ আগে সেনাপতি সাজিত, তাকে দেওয়া হইল রাজার পাঠ। জানাইয়া দিল মালোপাড়ার ছেলেদের তারা সখীর পাঠ দিবে। অভিভাবকেরা ছেলেদের যাত্রাদলে যোগ দিতে নিষেধ করিল। তারা বিড়ি খায়, ঘাড়-কাটা করিয়া চুল ছাঁটে, গুরুজনের সামনে বেলাহাজ কথা বলে। ঠাকুর দেবতার গান ছাড়িয়া পথেঘাটে সখীর গানে টান দেয়, এতে তাদের স্বভাবচরিত্র খারাপ হইয়া যায়।

অন্য পাড়া হইতে সখী সংগ্রহ হইল। কিন্তু সাজ-মহড়া হইল মালোপাড়াতে। তামসীর বাপের উপর মালোরা চটিল। কিন্তু মালোর মেয়েরা মহড়া দেখিতে গিয়া মুগ্ধ হইল, কাঁদিয়া ভাসাইল এবং ছেলেদের সখী সাজিতে দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল।

পরের মহড়ায় মালোপাড়ার কয়েকটি ছেলে অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সখী সাজিয়া নাচিল। বাম হাত কোমরে রাখিয়া ডান হাতের আঙুল চিবুকে লাগাইয়া গাহিল, 'চুপ চুপ চুপ লাজে সরে যাবে, ধীরে ধীরে চল সজনীলো। ধুলা দিয়ে সখী আমাদের চোখে গোপনে প্রণয় রেখেছে ঢেকে, এবার ভোমর যাবে লো ছুটে, চল, না যেতে যামিনী লো, চুপ চুপ' ইত্যাদি।

তাদের মায়েরা দিদিরা মুগ্ধ হইল। নাচখানা যেমন অপূর্ব গানখানাও তেমনি নতুন। এর ভাব, এর ভাষা, এর ভঙ্গি মালোদের গানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর

সুরও অন্য রাজ্যের। তারা মুগ্ধ হইল এবং পরদিন হইতে যাত্রাদলের প্রতি অনুরক্ত হইল।

অন্যান্য মালোরা তাদের বাধা দিল। একঘরে করিবার ভয় দেখাইল। বুঝাইতে চেষ্টা করিল যাত্রার ঐ গান গানই নহে। উহার ভাব খারাপ। অর্থ খারাপ। এতে ছেলেদের মাথা বিগড়াইবে। মেয়েদেরও মন খারাপ হইবে। কিন্তু তারা বিচলিত হইল না। বরং বলিলঃ আরে রাখ রাখ, মালোদের গান আবার একটা গান। এও গান আর আমরা যা গাই তাও গান। আমরা তো গাই—'আজো রাতি স্বপনে শ্যামরূপ লেগেছে আমার নয়নে। ফুলের শয্যা ছিন্নভিন্নছিন্ন রাধার বসনে ॥' কিবা গানের ছিরি। যাত্রার ঐ গানের কথা যেমন সুন্দর, সুরও তেমিন, শোনা মাত্রই মুগ্ধ করে। আমরা ছেলে যাত্রাদলে দিবই, তোমরা একঘরে কর আর যাই কর।

ফলে মালোদের মধ্যে দুইটা পক্ষ হইয়া গেল।

মঙ্গলার বউ একদিন ঘাটে পাইয়া জানাইল, 'পথে বিপদ আছে ভইন, একটু সাবধানে পা বাড়াইও। একজন নাকি তোমারে 'আজ নাইবে'। কথাখান আমার মহনের কানে আইছে।'

সে কে, জিজ্ঞাসা করাতে মঙ্গলার বউ যার নাম করিল সে পাটনীপাড়ার অশ্বিনী। বেটে-খাট চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আগে গয়নার নৌকা বাহিত। এখন যাত্রাদলে রাজার ভাই সাজে।

এর প্রমাণও একদিন পাওয়া গেল।

সুবলার বউ কলসী ও কাপড় লইয়া ঘাটে গেল, সহসা দেখিতে পাইল অশ্বিনী একটু দূরে থাকিয়া তাহাকে দেখিতেছে। চোখাচোখি হওয়া মাত্রই সে গান তুলিল, 'যেই না বেলা বন্ধুরে ধইল-ঘোড়া দৌড়াইয়া যাও, সেই বেলা আমি নারী সিনানে যাই। কুখেনে বাতাস আইলো, বুকের কাপড় উড়াইল, প্রাণবঁধু দেখিল সর্ব গাও।'

গানের অর্থ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইল।

দুপুরে ঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিল। এমন সময় সেই গানেরই আর একটা কলি শোনা গেল। উঠান দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে আর গান করিতেছে, 'যেই না বেলা বন্ধুরে রাজ-দরবারে যাও, সেই বেলা আমি রান্ধি। কাঁচা চুলা আর ভিজা কাষ্ঠরে বন্ধু, ধুঁয়ার ছলনা কইরে কান্দি।'

এতদূর পর্যন্তও সহ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু আরেকদিন যখন খাইতে বসিয়া সুবলার বউ আবার সেই গানেরই আরেক কলি শুনিল, 'যেই না বেলা বন্ধুরে বাঁশিটি বাজাইয়া যাও, সেই বেলা আমি নারী খাই। শাশুড়ি ননদীর ডরে কিছু না বলিলাম তোরে, অঞ্চল ভিজিল আঁখির জলে।' তখন সে আর সহ্য করিতে পারিল না। এঁটো হাতেই ছুটিয়া বাহিরে আসিল, চিৎকার করিয়া বলিল, 'আমার ঘরে শাশুড়ীও নাই ননদীও নাই। আমি কুন' বেটারে ডরাই না। নির্ভয়েই কই, তুই আয়। বাপের ঘরের হইয়া থাকিস তো, অখনই আয়। আশপড়সীর সামনে দিনে দুপুরেই তরে আমি ঘরে নিতে পারি, তুই আয়।'

তার গলা শুনিয়া মঙ্গলার বউ, দয়ালচাঁদের বিধবা ভগিনী, কালোবরণের মা সকলেই বাহির হইল। তার চীৎকারের কারণ শুনিয়া ওদিকে মঙ্গলার ছেলে মহন,

রামদয়াল গুরুদয়াল তারা দুই ভাই, লাঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। কিন্তু অশ্বিনী ততক্ষণে পাড়া ছাড়াইয়া বাজারে পা দিয়াছে।

'কিরে মহন, কি অ সাধুর বাপ, মধুর বাপ! ইটা আমার বাপের দেশ ভাইয়ের দেশ। ইখানে আমি কারুকে ডরাইয়া কথা কই না। ইখানে আমারে যেজন আজনাইব, এমন মানুষ মার গর্ভে রইছে। আমার কথা ছাড়ান দেও, আমি কই মালোপাড়ার কথা। দিনে দিনে কি হইল কও দেখি।'

রামদয়াল গুরুদয়াল সকলেই খুব চটিল এবং পাড়ার লোককেও চটাইল, আর তাকে সমুচিত শাস্তি দিবে বলিয়া সকলে সঙ্কল্পও করিল। কিন্তু যাত্রার মহড়াতে সে যখন দরাজ গলায় গানে টান দিল, 'হরির নামে মজে হরি বলে ডাক, অবিরাম কেন কাঁদবে বেটী-ঈ-ঈ।' তখনই মালোদের রাগ পড়িয়া গেল। কেবল মোহনের মনে সুবলার বউয়ের কথাগুলি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরিয়াছে। সেই গানে সেই সুরে প্রাণ ভরিয়া তান ধরিলে চিত্তের বিভূতিতে ভাব যেন আর আগের মত দানা বাঁধিতে চায় না, কোথায় যেন কিসের একটা বজ্রদৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়। যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে।

অনেকেই নিরাশ হইয়া কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল। নিরাশ হইল না কেবল মোহন। তার গলা ভাল। গানেও সে অনুরাগী। বাপ পিতামহের কাছ থেকে ভাটিয়ালী গান, হরিবংশ গান, নামগান অনেক শিখিয়াছিল। অধুনা মালোরা সে সব গান ভুলিয়া যাইতেছে। নতুন ধরনের হাল্কা ভাবের হাল্কা কবির গান আসিয়া সে সব গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রাণময়, ভাবসম্পদময় গানের স্থান অধিকার করিতেছে। এ দুঃখ সে মনের গভীরে বহুদিন অনুভব করিয়াছে। কিন্তু কালের স্রোত রুধিবার শক্তি কার আছে। এখন কালই পড়িয়াছে এই রকম। ভালো জিনিস পুরানো হইয়া হইয়া বাতিল হইয়া যাইবে আর হালকা জিনিস আসিয়া দশজনের আসরে জাঁকিয়া বসিবে। সে লোক ডাকিয়া খঞ্জনি ও রসমাধুরী যন্ত্র লইয়া দুপুর বেলাতেই গান গাহিতে বসিল।

কিন্তু তারা যখন গাহিল, 'গউর রূপ অপরূপ দেখলে না যায় পাসরা। আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী, ডুবল দুই নয়নতারা।' তখন অপর দুইজন মালোর ছেলে আর দুইটি যুগী ছেলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাশের বাড়ির উঠান হইতে তারস্বরে গাহিয়া উঠিল, 'সাজ সাজ সৈন্যগণ সাজ সমরে। তোমরা যত সৈন্যগণ যুদ্ধের কর আয়োজন, সাজ সাজ সৈন্যগণ সাজ সমরে।' দেখিয়া মোহনের মনে খেদ উপস্থিত হইল যে, তার

গান ঐ গানের মধ্যে কোথায় তলাইয়া যাইতেছে। তার দলের লোকেরাও যেন অন্যমনা হইয়া গিয়াছে। মনে মনে যেন সেই গানেরই তারিফ করিতেছে। আজকাল দুপুরবেলা আর গান জমে না, এই বলিয়া তারা বৈঠক ভাঙিয়া উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত যাহা শুনিতে বাকি ছিল, একদিন বৈকালে তাহাও শুনিতে পাওয়া গেল; আজ রাতে যাত্রার নতুন পালার মহড়া হইবে কালোবরণের বাড়িতে।

মালোদের এখনো যারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচাইতে তৎপর তারা শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। কেউ কেউ কালোবরণকে গিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলঃ দেখ বেপারী, মালোপাড়ার যারা মাথা, সেই দয়ালচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, হরিমোহন সবইত যাত্রার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ছিলাম এক, হইয়া গেলাম দুই, নিত্য রেষারেষি, নিত্য খোঁচাখুচি। কোন দিন আমরা নিজেরাই লগি-বৈঠা লইয়া মারামারি করিতে লাগিয়া যাইব তার ঠিক নাই।

মালোপাড়ার মাথায় যারা এই বজ্র ডাকিয়া আনিল, শেষ পর্যন্ত তুমি তাদের পথেই পা বাড়াইলে। না বেপারী, তুমি আমাদের দলে থাক। চল, মাতবরদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া আবার মালোপাড়াতে আগের মত একতা ফিরাইয়া আনি। আমরা যাত্রা গাহিব কেন। আমাদের কি গান নাই! মর-মুরুব্বিরা কি আমাদের জন্য গান কিছু কম রাখিয়া গিয়াছে। সে সব গানের কাছে যাত্রা গানতো বাঁদী। সামনে ঘোর দুর্দিন দেখিতেছি। যাত্রা লইয়া পাড়াতে যাহা শুরু হইয়াছে, তাহার শেষ না জানি কত ভয়ানক হইবে, সেই চিন্তাই করি। এখন তুমিই ভরসা। আজ তোমার বাড়িতে যাত্রা গাহিয়া যাওয়ার অর্থই সারা মালোপাড়ার বুকের উপর বসিয়া যাত্রা গাহিয়া যাওয়া।

কিন্তু কালোবরণ কথাগুলি শুনিয়াও যেন শুনিল না এইরকম ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

তারা ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিল।

'অ, মহন, অ মনমহন, আর ভরসা নাই। কালনাগে দেখি তারেও খাইছে।'

মনমোহন নিস্তেজ কণ্ঠে বলিল, আমাদিগকে ফেলিয়া সকলেই লঙ্কা পার হইতেছে। দয়ালচাঁদ গিয়াছে, কৃষ্ণচন্দ্র গিয়াছে। গৌর-কিশোর গিয়াছে, কালোবরণও গেল। সব যাইবে।

'না না, মহন , সব যাইব না।' সুবলার বউয়ের দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সকলেই যেন সচকিত হইয়া উঠিল।

–দয়ালচাঁদ গিয়াছে, কৃষ্ণচন্দ্র গিয়াছে। আরে মহন, তুইত যাস নাই। তুই আছিস, সাধুর বাপ মধুর বাপ আছে। ছ'কুড়ি ঘরের তিনকুড়ি গিয়াছে। আরো ত তিনকুড়ি আছে। এই নিয়াই আমরা শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিব। বেনালে বেঘোরে আমরা গা ভাসাইব না। যে ক' ঘর থাকিবে, তাই নিয়া আমরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া যাইব। মালোপাড়াতে যারা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে, এক গুয়া কাটিয়া যারা দুইভাগ করিয়াছে, আমরা কিছুতেই তাদের নিকট নতি স্বীকার করিব না। কালোবরণ বেপারীর বাড়িতে আজ যদি যাত্রা দেয় ত, তোর বাড়িতেও আসর জমা। আজ একটা পরীক্ষা হইয়া যাক।

সুবলার বউ মোহনকে লইয়া বসিল। দুইজনেই স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া যে সকল ভাল ভাল গান বিস্মরণ হইয়াছিল, মনের মধ্যে সেগুলিকে ডাকিয়া আনিল। তারমধ্যে আবার যেগুলি খুব জমে সেগুলিকে লইয়া মুখে মুখে একটা তালিকা প্রস্তুত করিল।

'এই-এইগুলি বিচ্ছেদ গান। দেহতত্ত্বের পরেই গাইবি। আর নিশি-রাতে গাইবি ভাইট্যাল গান। হরিবংশ গাইবি রাত পোহাইবার অল্প বাকি থাকতে। ভোরে ভোরগান আর সকালে গোষ্ঠগান গাইয়া তারপর মিলন' গাইয়া আসর ভঙ্গ করবি।'

যাত্রাওয়ালারা সন্ধ্যার পর বেহালা ও হারমনিয়ামের বাক্স এবং বাঁয়া-তবলা লইয়া কালোবরণের উঠানে বসিয়া যখন ঢোলকে চাপড়ি দিল তখন মোহনের দলও খঞ্জনি রসমাধুরী যন্ত্র লইয়া বসিয়া গেল। এবাড়িতে ওবাড়িতে দূরত্ব শুধু খানদুই ভিটা। ওবাড়িতে কথা বলিলে এ বাড়ি থেকে শোনা যায়।

ও বাড়িতে যখন বীরবিক্রমে বক্তৃতা চলিতেছে, এ বাড়িতে মোহনের দল দেহতত্ত্ব শেষ করিয়া বিচ্ছেদ গান শুরু করিয়াছেঃ ভোমর কইও গিয়া, কালিয়ার বিচ্ছেদে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া ॥ না খায় অন্ন না লয় পানি, না বান্ধে মাথার কেশ, তুই শ্যামের বিহনে রাধার পাগলিনীর বেশ ॥

সারা মালোপাড়া দুই ভাগে ভাগ হইয়া দুই বাড়িতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বেশির ভাগ গিয়াছে কালোবরণের বাড়িতে। তাদের চোখমুখে নতুনের প্রতি অভিনন্দনের ভাব। মোহনের বাড়িতে যারা আসরে মিলিয়া বসিয়া গিয়াছে তাদের চোখে মুখে সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ়তা।

রাধার বিচ্ছেদবেদনা সুরে সুরে লহরে লহরে উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত হইতেছে। সকলের প্রাণের মধ্যে একটা বেদনার হাহাকার গুমরিয়া উঠিতেছে। দলের বড় গায়ক উদয়চাঁদ রসমাধুরী ঠাট করিতে করিতে বলিল, এখানে এ গানটা চলিতে পারে, জীবন জুড়াব যেয়ে কার কাছে, দয়াল কৃষ্ণ বিনে বন্ধু ভবে কে আছে।' কারো কারো মনঃপুত না হওয়াতে বলিল, তবে এটা তুলতে পার, 'কি গো কালশশী, তোমার বাঁশি কেনে রাধা বলে, কৃষ্ণ বলে না। দুঃখিনী রাধারে হরি সঁপিলা কার ঠাঁই। ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে ঠাঁই মিলে না দাঁড়াইবার।'

তার চেয়েও উত্তম গান মোহনের স্মরণেই ছিল। বলিল, তার আগে এই গানটা হোক, 'এহি বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণে ঝুরিয়াছে দুই নয়ানে। পশুপক্ষী সবে কান্দিছে নীরবে হায় হায় কৃষ্ণ বলে।'

আজ কৃষ্ণের মথুরায় গমন। শূন্য বৃন্দাবন একসারে ক্রন্দন করিতেছে। পশুপাখী, গাভীবৎস, দ্বাদশবন, যমুনাপুলিন, চৌত্রিশ ক্রোশ ব্রজাঙ্গন একযোগে রোদন করিতেছে। ব্রজগোপীর চোখের জলে পথ পিছল। সে পিছল পথে রথের চাকা কতবার বসিয়া গিয়াছে। ব্রজগোপী কতবার গাহিয়াছে, 'প্রাণ মোরে নেওরে সঙ্গেতে, ব্রজনাথ রাখ রথ কালিন্দীর তটেতে।' কিন্তু তবু তার যাত্রা থামে নাই। ব্রজগোপীর বুকজোড়া কামনা হৃদয়ছোঁয়া ভালবাসাকে দলিত মথিত করিয়া, তার বুকখানা দুমড়াইয়া গুঁড়াইয়া

দিয়া তার রথ চলিয়া গিয়াছে। ব্রজগোপী সব দিক দিয়া আজ কাঙাল। তবু আশা ছাড়ে না। তবু বলে, 'ম'লে নি গো পাব, এ প্রাণ জুড়াব, যায় যায় চিত্ত জ্বলে।'

একটা বেদনা-বিধুর ভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে গানটা সমাপ্ত হইল। ও বাড়িতে তখন বিবেকের গলা শোনা গেল, 'লাগল বিষম যুদ্ধ এবার দেবতা দানবে—এ-এ। লাগল বিষম যুদ্ধ এবার।'

বিশ্রাম নিতে নিতে উদয়চাঁদ বলিল, 'লাগছে যখন, যুদ্ধ ভাল কইরাই লাগুক। ভাইট্যাল গান একটা স্মরণ কর মহন।'

রাত বাড়িয়া চলিয়াছে। কালোবরণের বাড়ি হইতে হাসির কলরোল ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ হয় কোনো হাসির পাঠ অভিনয় হইতেছে। মালোদের ছেলেমেয়ে বউঝি গিন্নিবান্নিরা পর্যন্ত সেখানেই গিয়া ভিড় বাড়াইতেছে। মোহনের বাড়ির জনতা পাতলা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যারা গাহিতেছে, জনতা বাড়িল কি কমিল সেদিকে তাদের লক্ষ্য নাই। এখন রাত গভীর হইয়াছে। এখন ভাটিয়াল গাহিবার সময়। এখন এমন সময়, যখন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে জীবনাতীত আসিয়া উঁকি দিয়া যায়। এখন কান পাতিয়া রাত্রির হৃদস্পন্দন শুনিতে শুনিতে অনেক গভীর ভাবের অজানা স্পর্শ অনুভব করা যায়। অনেক অব্যক্ত রহস্যের বিশ্বাতীত সত্তা এই সময় আপনা থেকে মানুষের মনের নিভৃতে কথা কহিয়া যায়। সে কথা ভাটিয়ালী সুরে যে ইঙ্গিত দিয়া যায় অন্য সময়ে তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না।

মোহনের দল এখন যে গান তুলিল, তিতাসের অপর তীরে গিয়া তাহা প্রতিধ্বনি জাগাইয়া দিল। 'কানাইরে বেলা হইল দুই রে প'র। প্রাণটি কাঁপে রাধার থর থর রে, মথুরার বিকি যায় রে বইয়া রে সুন্দর কানাইরে। কানাইরে, পার হইতে কংস রে নদী, নষ্ট হইল রাধার ভাণ্ডের দধি রে অ কানাই, নষ্ট করলি দধির ভাণ্ড ছুঁইয়া রে সুন্দর কানাইরে।'

এই রাধা বৃন্দাবনের প্রেমাভিসারিকা রাধা নহে। এ রাধা জন্ম-মৃত্যু দুই তীরের পারাপারশীল মানব আত্মা। কংসনদী অর্থাৎ যমুনা নদী এখানে জন্মমৃত্যুর সীমারেখা। আত্মা তার খেলাঘর ছাড়িয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে। নিঃসীম অন্ধকারে তার এপার ওপার আবৃত। কানাই বেশি ভূমাই তাহাকে পার করিয়া চালাইয়া নিবার মালিক, আত্মা নিষ্কলুষ হইলে কি হইবে, তার পার্থিব দধিভাণ্ডের প্রতি মায়া জাগে। কিন্তু নারায়ণ তাকে ঐহিক সবকিছুর কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে নির্মুক্ত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চান, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে। এই জন্য তিনি দধির ভাণ্ড স্পর্শ করিয়া সব দধি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকল মালো এর সব অর্থ না বুঝিলেও, গানের সুরে সুদূরের কি কথা যেন ভাসিয়া আসিয়া তাদের জীবনে এক জীবনাতীতের বাণী শুনাইয়া গেল। গানে তারা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

'কালো কালো কোকিল কালো, কালো ব্রজের হরি। খঞ্জন পক্ষীর বুক কালো, চিত্ত ধরিতে না পারি ॥ শুতিলে না আসে নিদ্রা বসিলে ঝুরে আঁখি। (আমি) শিথান বালিশ পইথান বালিশ বুকে তুইল্যা রাখি ॥' পরম প্রার্থিতের সঙ্গে মিলনের চরম ক্ষণ ঘনাইয়া আসিতেছে। রজনীর ক্রমবর্ধমান গভীরতা এই কথাই জানাইয়া দিতেছে। চতুর্দিকে

আদি অন্তহীন কালোবরণ। তারই স্নিগ্ধ অরূপ রূপমাধুর্যে চিত্ত পিপাসিত। এ পিপাসা অনন্তের রূপসুধা পানে উন্মুখ। মুহূর্তগুলি আর কাটিতে চাহিতেছে না। ক্রমেই অস্থিরতা বাড়িতেছে, এমন সময় আসিয়াছে যখন শুইলে না আসে নিদ্রা বসিলে ঝুরে আঁখি।

রাত বোধ হয় আর বেশি নাই। এখনই হরিবংশ গানের সময়। এর নাম কি কারণে হরিবংশ গান হইল, মালোরা তাহা জানে না। বাপ পিতামহের কাছ হইতে শিখিয়াছে এই গান, আর শিখিয়া রাখিয়াছে যে এর নাম হরিবংশ গান। এর কথা বিচ্ছেদবিধুর মানবাত্মার সুগম্ভীর আকুতি। এর সুর অত্যন্ত দরাজ। পুরা করিয়া টান দিলে দিকদিগন্তে তাহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এ গান এখন আর বেশি লোকে গাহিতে পারে না। পুরাপুরি সুর খুলিয়া গাহিতে পারে একমাত্র উদয়চাঁদ।

'মাটির উপরে বৃক্ষের বসতি, তার উপরে ডাল, তার উপরে বগুলার বাসা, আমি জীবন ছাড়া থাকিব কত কাল ॥ নদীর ঐ পারে কানাইয়ার বসতি, রাধিকা কেমনে জানে। ...' কথার ওজস্বিতায় না হোক সুরের উদাত্ততায় জীবন-রাধিকা কাণ্ডারী-কানাইকে সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিল এবং মরণ-নদী পার হইল। এদিকে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে। ওদিকে কালোবরণের বাড়ি হইতে তখনও গান ভাসিয়া আসিতেছে, 'সারারাতি মালা গাঁথি মুখে চুমু খাই রে, চিনির পানা মুখখানা তোর আহা মরে যাইরে।'

কিন্তু এ গান অপেক্ষা ভাটিয়াল গানের আকর্ষণ অধিক হওয়ায় দলে দলে লোক কালোবরণের বাড়ি হইতে মোহনের বাড়িতে চলিয়া আসিল। উৎসাহ পাইয়া উদয়চাঁদ তার সবচেয়ে প্রিয় গানখানাই এবার তুলিল। সকলেই জানে যে এ গানটি যতবার গাহিয়াছে প্রত্যেক বারই উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়াছে। এ গানে তার সঙ্গে আরও দুই একজনে উঠিয়া হাত নাড়িয়া নাচিয়া থাকে।

ও বাড়িতে তারা অন্যের গান কেবল শুনিয়াছে, গাহিবার যারা তারা একাই গাহিয়াছে। কিন্তু এবাড়ির গান মালোদের সকলেরই প্রাণের গান। যত দূরেই থাক, এর সুর একবার কানে গেলে আর যায় কোথা। অমনি সেটি প্রাণের ভিতর অনুরণিত হইয়া উঠে। কাছে থাকিলে সকলের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গায়। দূরে থাকিলে আপন মনে গুন গুন করিয়া গায়। আজও তারা উদয়চাঁদের সহিত স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ মিশাইয়া গাহিল ঃ

না ওরে বন্ধু বন্ধু বন্ধু, কি আরে বন্ধু রে,
তুই শ্যামে রাধারে করিলি কলঙ্কিনী।
মথুরার হাটে ফুরাইল বিকিকিনি ॥

না ওরে বন্ধু–
তেল নাই সলিতা নাই, কিসে জ্বলে বাতি।
কেবা বানাইল ঘর, কেবা ঘরের পতি ॥

না ওরে বন্ধু–
উঠান মাটি ঠন ঠন পিড়া নিল সোতে।
গঙ্গা মইল জল-তিরাসে ব্রহ্মা মইল শীতে ॥

এমন সময় কাক ডাকিয়া উঠিল। চারিদিক ফরসা হইয়া আসিল এবং আসরের বাতি নিভাইয়া দেওয়া হইল। কালোবরণের বাড়ি একেবারেই নীরব ও নির্জন হইয়া গিয়াছে। মোহনের উঠানে লোকের আর ঠাঁই কুলাইতেছে না। বিজয়ের গর্বে উল্লসিত মোহন বলিয়া উঠিল, 'ঠাকুর সকল, দুইখান নামগান গাইয়া যাও। আমি গিয়া খোল করতাল আনি।'

নামগান আরও কঠিন। তাই বহুদিন ধরিয়া গাওয়া হয় না। আজ অনেক দিন পরে এক উঠানে সব মালো সমবেত হইয়াছে। এমন সময় কোন দিন হইবে। তাই আজ একবার প্রাণ ভরিয়া নামগান গাহিতেই হইবে। এ গানের সুর খুব চড়া। গাহিতে খুব শক্তির দরকার। গায়কেরা চার ভাগে ভাগ হইয়া খণ্ডে খণ্ডে উহাকে গাহিয়া নামায়। একটি গান নামাইতে ঝাড়া এক প্রহর সময় লাগে।

মোহন বলিল, 'ঠাকুর সকল, সহচরী গাইবা না বস্ত্রহরণ গাইবা।'

'সহচরী'ই গাহিবে ঠিক হইল।

'সহচরী, উপায় বল কি করি,' এই বলিয়া রাধা তার আক্ষেপ শুরু করিল। আমার অতি সাধের সাধনার ধন হারাইলাম। আগে জানিলে কি সই করিতাম প্রেম, তারে দিতাম প্রেম, তারে দিতাম কুলমান। যা হোক, অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়া তাকে তো প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু তোরা একি করিলি, চিত্রপটে তার রূপ দেখাইয়া আমায় আবার কেন তাকে মনে করাইয়া দিলি। তোরা আমায় ধর; আমার জীবন যাইবার সময় উপস্থিত, তোরা আমায় ধর।

গান শেষ হইল, যখন রোদ চড়িল তখন। মালোদের মনও বুঝি এই কাঁচা রোদের মতই স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন পরে আজ তারা প্রাণ খুলিয়া মিশিল এবং গান গাহিয়া মনের গ্লানি দূর করিল।

কিন্তু দুইদিন পরে যখন কালোবরণের বাড়িতে বাক্স-বাক্স সাজ আসিল, এবং রাত্রিতে যখন সাজ পোষাক পরিয়া সত্যিকারের যাত্রা আরম্ভ হইল, মালোরা তখন সব ভুলিয়া যাত্রার আসর ভরিয়া তুলিল। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ কেউ বাদ রহিল না। সকলেই গেল। মাত্র দুইটি নরনারী গেল না। তারা সুবলার বউ আর মোহন। অপমানে সুবলার বউ বিছানায় পড়িয়া রহিল, আর বড় দুঃখে মোহনের দুই চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়

ভাসমান

এই পরাজয়ের পর মালোরা একেবারেই আত্মসত্তা হারাইয়া বসিল। তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তাদের নিজস্ব একটা সামাজিক নীতির বন্ধন ছিল, সেইটিও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হইয়া আলগা হইয়া গেল। একসঙ্গে কোন কাজ করিতেই তারা আর তেমন জোর পাইত না। সামান্য বিষয় নিয়া তারা পরস্পর ঝগড়া করিত। এমন কি, ঘাটে নৌকা ভিড়াইবার সময়, কে আগে ভিড়াইবে এই লইয়া মারামারি পর্যন্ত হইত। জাল ফেলিবার সময় কার আগে কে ফেলিবে এ নিয়া তীব্র প্রতিযোগিতা হইত। তারই পরিণতিতে তাদের প্রধান দুইটি দলের মধ্যে মাথা ফাটাফাটিও হইত। অথচ এর আগে এসব কোনকালেই হইত না।

তাদের ছেলেরা হুকা ছাড়িয়া সিগারেট ধরিল। তারা আগের মত গুরুজনদিগকে মানিত না। বাপখুড়াদের প্রতি তাদের ভক্তি যেমন হ্রাস পাইল, তেমনি সহানুভূতিও কমিয়া গেল। রোজগারের প্রতি তাদের মনও আর আগের মত রহিল না। তিতাসের মাছ ফুরাইয়া গেলে মালোরা আগে তোড়জোড় করিয়া প্রবাসে যাইত। এখন আর যায় না।

তাদের পাড়াতে তখন যাত্রাওয়ালাদেরই আধিপত্য। তারা যখন যার বাড়িতে খুশি, গিয়া বসিত। আলাপ জমাইত। সে আলাপে শেষে মেয়েরাও যোগ দিত। ইহা মালোদের কখনও কখনও অস্বস্তিকর লাগিত; কিন্তু ইহার প্রতিবাদ করার জোর পাইত না। মেয়েদের কাছে এই সব রাজা, রাজপুত্র, সেনাপতি, বিবেক এক একটা অসাধারণ পুরুষ। মালোরা বড় ভাইয়ের বউদের ডাকে শুধু বউ বলিয়া; আর এরা ডাকে, বউদি বলিয়া। মেয়েরা আরও খুশি হয়। ইহারা মালোপাড়ার বউঝিদের সম্বন্ধে নিজেদের পাড়ার যুবকদের কাছে নানা রসাল গল্প বলিত। ঐসব যুবকরাও কৌতূহলের বশে তাদের সঙ্গে আসিয়া মালোদের বাড়িতে বসিত। কথা বলিত। বলিত ভাল কথাই। কিন্তু মেয়েরা যখন ঘাটে যাইত, তারা তখন সুযোগ দেখিয়া শিষ দিত কিংবা আচমকা কোনো বিচ্ছেদের গানে টান দিত। এইভাবে মালোরা অন্তঃপুরের শুচিতা পর্যন্ত হারাইতে বসিল।

মালোরা এ সবই দেখিত এবং ইহার ফলাফলও বুঝিতে পারিত। কিন্তু প্রতিবাদ করার জোর পাইত না। চুপ করিয়া থাকিত এবং সময়ে সময়ে নিজেরাও এই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিত। মাঝে মাঝে এ নিয়াও ঝগড়া হইত। এবাড়ির লোক ওবাড়ির লোককে খোঁটা দিত। ওবাড়ির লোক রাগিয়া বলিত, ভেনভেন করিস না ত। আগে নিজের ঘর সামলা। তারপর পরের তরকারিতে লবণ দিতে আসিস। সত্য কথাই। তার নিজের ঘরের লোককে সামলাইতে গেলে, সেখানেও রাগারাগি হইত।

শেষে মেয়েদের বিলাসিতাও খুব বাড়িয়া গেল। সুযোগ পাইয়া স্যাকরারা নানারকম গহনার নমুনা লইয়া, মনোহারী দোকানের লোকেরা তেল গামছা সাবান

লইয়া ঘনঘন আসা যাওয়া করিতে লাগিল। রোজগারের সময় যা রোগজার করিত এইভাবে অপব্যয় হইয়া যাইত। দুর্দিনের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় থাকিত না। তখন তারা উপবাসে দিন কাটাইত। ছেলেমেয়েরা খাইতে না পাইয়া কাঁদিত। মেয়েরা অনেক কাণ্ড করিবে বলিয়া ভয় দেখাইত। খাইতে দিতে পারিতেছে না বলিয়া লজ্জা পাইয়া পুরুষরা চুপ করিয়া থাকিত এবং নিরুপায়ের মত কেবল একদিকে চাহিয়া থাকিয়া জোরে জোরে হুকা টানিত।

ক্রমে মনুষ্যত্বের পর্যায় হইতে তাহারা অনেক নীচে নামিয়া গেল। এত নীচে নামিয়া গেল যে, শত্রু নাকের ডগায় বসিয়া শত্রুতা করিয়া গেলেও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিত না। রোষকষায়িত চক্ষু ভূমির উপর নিবদ্ধ রাখিয়া এক দলা থুথু মাটিতে ফেলিয়া বলিত, 'দূর হ কাওয়া।' দিনে দিনে তারা আরও নীচে তলাইয়া গেল। শেষে এমনই হইল যে, লোন কোম্পানির বাবুরা বন্দুকধারী পেয়াদা লইয়া আসিয়া টাকা আদয়ের জন্য মালোদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া যথাসর্বস্ব লইয়া গেল, তখনও তারা কিছুই বলিতে পারিল না।

গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী ধনী ব্যক্তি মালোদের জন্য এখানে শহর হইতে ঋণদান কোম্পানির একটা শাখা আনিয়াছিল। সুদ খুব কম দেখিয়া মালোরা সকলেই হুজুগে মাতিয়া টাকা ধার করিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। সেই থেকে প্রতি বৎসর চক্রবৃদ্ধি হারে কেবল সুদই যোগাইয়া আসিতেছে, আসল আদায় হওয়া দরকার। তাই তারা পেয়াদা-সঙ্গে জবরদস্ত বাবু পাঠাইয়াছে, তার নাম বিধুভূষণ পাল। গ্রামের পালেদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা ছিল। তাদের নিকট মালোদের প্রকৃত অবস্থা জানিয়া লইয়া মালোপাড়াতে আসিয় রুদ্রমূর্তি ধরিল। বুড়াবুড়া মালোদের দাড়ি ধরিয়া টানিয়া জলে নামাইল। চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'ক' তোর কাছে কত আছে।' শীত কাল। তিতাসের জলে দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেও তাদের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হইত না। সর্বত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেও তিতাসের জলে নামিয়া মিথ্যা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কেউ বলিত দুই টাকা আছে; কেউ বলিত এক টাকা বার আনা আছে। কেউ বলিত কিছুই নাই। সব ছাঁকিয়া তুলিয়াও তেমন কিছুই আদায় হইল না দেখিয়া শেষে তারা ঘরের থালা ঘটি বাটি, সূতার হাঁড়ি জালের পুঁটুলি বাহির করিয়া নিয়া ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া চলিয়া যাইত। এর পর পড়িয়া যাইত কান্নাকাটির ধুম।

এমন যে গ্রামের সবচেয়ে বুড়া রামশেকব, যার ছেলে পাগল হইয়া মরিয়াছে, যাকে জীর্ণ দেহ টানিয়া টানিয়া প্রতিদিন নদীতে মাছ ধরায় যাইতে হয়, তাকেও তারা রেহাই দিল না। তার দাড়ি ছিল লম্বা। ধরিবার বেশ সুবিধা হওয়ায় বিধু পাল তাকেই জলে নামাইয়া পাক খাওয়াইয়াছিল সব চাইতে বেশি। কিন্তু সে কাঁদে নাই। নিজেরা কাঁদিয়া ও চোখ মুছিয়া মালোরা যখন তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল, সে বলিল, উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দ-সানকির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব।

পালেরা বাজারের দোকানি। মালোদের অনেক জিনিসপত্র বাকি দিয়া রাখিয়াছে। তাদেরও আদায় হওয়া দরকার। তাই রোরুদ্যমান মালোদের প্রবোধ দিতে আসিয়া

তারা বলিল, বিধু পাল কড়া মেজাজের লোক। কিন্তু লোক ভাল। সব নিয়াছে, কিন্তু তোমাদের নৌকাগুলিতে হাত দেয় নাই।

কিন্তু এ দুঃসময় বেশি দিন থাকে নাই। আবার তিতাস নদীতে মাছ পড়ে। আবার তাদের হাতে পয়সা আসে। ঘরে ঘরে সূতাকাটার ধুম পড়ে। নতুন নতুন জাল তৈয়ার হয়। সে জালে নানা জাতের মাছ পড়ে। মালোদের মুখে আবার হাসি ফোটে।

কিন্তু বৎসর ঘুরিতে সে হাসিও একদিন মিলাইয়া গেল।

এই পাড়ারই রাধাচরণ মালো কি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে। মালোরা তাহাই আগ্রহভরে শুনিতেছে। শুনিয়া কেউ কেউ বলিতেছে, আরে দূর বোকা, তা কি হইতে পারে। আবার কেউ কেউ শুকনো মুখে বলিল, হইতে ত পারে না। কিন্তু যদি হয়।

রাতে দেখে, রাতে ফুরাইয়া যায়। স্বপ্ন আবার কোনদিন সত্য হয় নাকি?

হয়। যশোদারাণী স্বপ্ন দেখিয়াছিল গোপাল মথুরার মোকামে চলিয়া যাইবে। গেল না? সুবলার শাশুড়ী স্বপ্ন দেখিয়াছিল, জিয়লের ক্ষেপে গিয়া সবুলা নাও-চাপা পড়িয়া মরিবে। মরিল না?

আরে সে ত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিল সুবলা মারা যাওয়ার পর। আগে ত বলিতে পারে নাই। তবেই বোঝ। তুইও এসব কথা প্রকাশ করিবি এখন না, স্বপ্ন ফলিয়া যাওয়ার পরে। এখন চুপ করিয়া থাক।

কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা চুপ করিল না। তার স্বপ্ন যে কেবল নিশার স্বপ্নমাত্র নয়, সে স্বপ্নের আনুমানিক অনেক কিছুই যে দিনের বেলাতে স্বচক্ষেও লক্ষ্য করিয়াছে এসব কথা খুলিয়া বলিল।

এতদিন আমি কিছু কইনা তোরা বিশ্বাস করবি না এর লাগি। যাত্রাবাড়ির টেক ছাড়াইয়া কুড়ুইলা খালের মুখ হইতে ছওসাতেক উজানে একটা কুড় আছে না? বাপ দাদার আমল হইতে দেখি সোত সিধা চলে। না কি! সেইদিন জাল ধইরা দেখি জালখানা উল্টাইয়া নিল। সোত ঘুইরা গেছে। এমুন আচানক কাণ্ড! তোমরা ত অখন রাতের জাল বাও না, খোঁজখবরও রাখ না। সারারাত জাল লাগাইয়া উজানভাটি ঘুরি। গাঙের হিসাবে কেমন একটা লড়চড় হইয়া গেছে। সোত যেখানে আড়, হইয়া গেছে সিধা; যেখানে সিধা, হইয়া গেছে আড়। সেই দিন হইতে মনে বিষম ভাবনা। কি জানি কি একটা হইব। মনে শান্তি নাই। আছে খালি ভাবনা। কাল রাইতে মড়াপোড়ার টেকে জাল পাতলাম, মাছ উঠল না; গেলাম পাঁচভিটার টেকে, মাছ নাই; গেলাম গরীবুল্লার গাছের ধারে, কিন্তু জালে-মাছে এক করতে পারলাম না।

যেখানেই যাই, দেখি সোত মন্দা। মাছেরা দূরে দূরে লাফায়, জালে পড়ে না। শেষে গেলাম কুড়ুইলার খালের মুখে। দেখলাম, সোত খালি লাটুমের মত ঘোরে। জাল নামাইয়া পাটাতনের উপর কাত হইলাম। চোখে ঘুম নাই। কেবল একই চিন্তা, তিতাসের কি জানি কি যেন একটা হইতাছে। কোন এক সময় চোখের পাতা জোড়া লাগল টের পাইলাম না। এমন সময় দেখলাম স্বপ্ন, তিতাস শুকাইয়া গেছে। এই স্বপ্ন কি মিছা হইতে পারে।

দেখলাম, যে-গাঙে বিশ-হাতি বাঁশ ডুবাইয়া তলা ছোঁয়া যায় না, সেই গাঙের মাঝখান দিয়া ছোট একটা মানুষ হাঁইট্যা চলছে। যে যে জায়গা দিয়া সে গেছে, একটু

পরেই দেখলাম সেই সগল জায়গায় আর জল নাই; শুকনা। ঠন ঠন করতাছে। বুকটা ছাৎ কইরা উঠল। হাত পাও কাঁপতে লাগল। নাওয়ে আমি একলা। এমুন ডর করতে লাগল যে একবার চিৎকার দিয়া উঠলাম। শেষে তিনবার রাম নাম লওয়াতে ডর কমল। এমন স্বপ্ন দেখলে নি আর ঘুম হয়। ঘুমাইলাম না।'

শ্রোতারা সমবেদনা জানাইল, আহা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে রাধাচরণ। মাথায় তেল দিয়া স্নান কর গিয়া।

তার স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়াই সকলে উড়াইয়া দিল। কেউ বিশ্বাস করিল না। কিন্তু একটা কালোছায়ার মত কৌতূহল-মিশ্রিত আশঙ্কা তাহাদিগকে পাইয়া বসিল। কুড়ুইলা খালের মুখ হইতে উজানের দিকে যখনই জাল ফেলিতে যায়, ভয়ে ভয়ে বাঁশ দুটিকে খাড়া করিয়া একটু বেশি করিয়া ডোবায়। আর দুরু দুরু বুকে মুহূর্ত গোণে মাটিতে ঠেকিল কি না। আর কোথায় স্রোতের কি নড়চড় হইল পই পই করিয়া খোঁজে। খুঁজিতে খুঁজিতে সত্যই দেখিল, হিসাবে মিলে না, কোথায় যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। তারা বহুপুরুষ ধরিয়া এই নদীর সঙ্গে পরিচিত। তাদের দিনে-রাতের সাথী বলিতে এই নদী। এর মনের অলিতে-গলিতে তাদের অবাধ পথ-চলা। এর নাড়ি-নক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। কাজেই স্রোতের একটুখানি আড় টিপিয়াই বুঝিতে পারে কোথায় এর ব্যাধি ঢুকিয়াছে। বুঝিতে পারে এর বুকে কাছেই কোথাও খুব বড় একটা চর ভাসিতেছে।

তাদের হিসাব ভুল হয় না।

ভাসমান চরটা একদিন মোহনের জালের খুঁটিতে ধরা পড়িয়া গেল। সেটা ছিল ভাঁটার শেষ দিন। বড় নদী তার বহু জল টানিয়া নিয়াছে। এমন সব ভাঁটাতেই নেয়। আবার জোয়ারে ফিরাইয়া দেয়। যত ইচ্ছা দিয়াও যা থাকে, তিতাস তাকে নিয়াই থমথম করে। জলগৌরব তার কোনো কালে ম্লান হয় না।

মোহনের বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগল।

সে ছোটবেলা গল্প শুনিয়াছে। কোন এক সাধু খড়ম পায়ে দিয়া এই তিতাসের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়া যাইত। সেটা শুধু মন্ত্রবলেই সম্ভব হইয়াছিল। পাঠকের নিকট শুনিয়াছে, বিশাল যমুনা নদী, অগাধ তার জলরাশি; আর ঝড়ে বৃষ্টিতে দুর্যোগপূর্ণ রাত। বাসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া জলে নামিল এবং খাপুর খুপুর করিয়া হাঁটিয়া পার হইয়া গেল। সেটা শুধু তারা দেবতা বলিয়াই সম্ভব হইয়াছিল।

আর এখানে দিনে-দুপুরে। চর্ম-চোখের সামনে। জালটা ফেলিতেই তার বাঁশ মাঝগাঙেও খুচ করিয়া তলার মাটিতে ঠেকিল। নৌকাটা কাঁপিয়া উঠিল, আর কাঁপিয়া উঠিল মোহন নিজে।

মোহন বাড়িতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। পাড়ার লোকেরা ডাকাডাকি করিলে সহসা সে রাগে ফাটিয়া পড়িল, 'মালোগুষ্টি যাত্রা করুক, কবি করুক, নাচুক, মারামারি কামড়াকামড়ি যা মন চায় করুক। আর ভাবনা নাই। গাঙ শুকাইছে।'

'কি কইলি, আরে মহন কি কইলি? আরে অ মন-মোহন কি কইলি।'

'কইলাম। গাঙে নাইম্যা দেখ গিয়া।'

এখান হইতে আধ মাইল দূরে যাত্রাবাড়ির টেক। নৌকা লইয়া তারা সেখানে গিয়া বাঁশ ফেলিল। এই টেক হইতে শুরু করিয়া এই অভাসিত চর উজানে কোথায় যে শেষ

হইয়াছে, তার কিনারা করিতে পারিল না। যারা স্নান করিতে নামিয়াছে, তাদেরই একজন বার পানির নেশায় পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে মাঝ নদীতে আসিয়াছে গেখা গেল। মাঝ নদীতে তার মোটে গলাজল। এমন আশ্চর্য ঘটনা তারা জীবনে এই প্রথম দেখিয়াছে।

বড় বড় নদীতে এক তীর ভাঙে, অপর তীরে চর পড়ে। ইহাই ধর্ম। কিন্তু তিতাসের ধর্ম তা নয়। এ নদীর কোন তীরই ভাঙে না। কাজেই তার বুকে যখন চর পড়িল, সে চর দিনে দিনে জাগিতে থাকে আয়তনে বাড়িয়া, চৌড়া বুক চিতাইয়া।

বর্ষাকালে জল বাড়িয়া তিতাস কানায় কানায় পূর্ণ হইল। বর্ষা অন্তে সে জল সরিয়া যাওয়াতে সেই চর ভাসিয়া বুক চিতাইয়া দিল। কোথায় গেল এত জল, কোথায় গেল তার মাছ। তিতাসের কেবল দুই তীরের কাছে দুইটি খালের মত সরু জলরেখা প্রবাহিত রহিল, তিতাস যে এককালে একটা জলেভরা নদী ছিল তারই সাক্ষী হিসাবে।

দুই তীরের উচ্চতা ডিঙাইয়া একদিন দূরদূরান্তের কৃষকেরা লাঠি-লাঠা লইয়া চরের মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া চরটিকে তারা দখল করিয়া লইল। জেলেরা তীর হইতে কেবল তামাসা দেখিল। এ জায়গা যতদিন জলে ছিল ডোবানো, ততদিনই ছিল মালোদের। যেই জল সরাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে, তখনি হইয়া গেল চাষাদের। এখানে তারা বীজ বুনিবে, ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিবে। তাদের এ দখল চিরকাল বর্তাইয়া রহিবে, কোনোদিন কেউ ঐ দখল হরণ করিয়া লইবে না। তাদের এ দখল যে বাস্তবের উপর; তা যে মাটির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট।

আর মালোদের দখল ছিল জলে; তরলতার নিরবলম্ব নিরবয়বের মধ্যে। কোনোদিন সেটা বাস্তবের গভীর স্পর্শ খুঁজিয়া পাইল না। পাইল না শক্ত কোনো অবলম্বন। কঠিন কোন পা রাখিবার স্থান। তাই তারা ভাসমান। পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালা, বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালি করুক, তারা বা[illegible]র মত ভাসমান। যতই তারা পৃথিবীর বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকুক, ধরার মটি তাহাদিগকে সর্বদা দুই হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে, ঠাঁই নাই, তোমাদের ঠাঁই নাই। যতদিন নদীতে থাকে জল, ততদিন তারা জলের উপর ভাসে। জল শুকাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

এখনো জোয়ার আসে। চরটা তখন ডুবিয়া যায়। সারা তিতাস তখন জলে জলময়। নদীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মালোরা ভাবিতে চেষ্টা করেঃ এই তো জলে-ভরা নদী। ইহাই সত্য। একটু আগে যাহা দেখা গিয়াছিল ওটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু ভাঁটা আসিলেই সত্যটা নগ্ন হইয়া উঠে। মালোদের এক একটা বুক জোড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়। তিতাস যেন একটা শত্রু। নির্মম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে সেই শত্রু। আজ সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইয়া গিয়াছে। এতদিন সোহাগে আহ্লাদে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। আজ যেন ঠেলিয়া কোন গহীন জলে ফেলিয়া দিতেছে। যেন মালোদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকাইয়া নিষ্করুণ কণ্ঠে বলিয়া দিতেছে, আমার কাছে আর আসিও না।

আমি আর তোমাদের কেউ না। বর্ষাকালে আবার সে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সুদূরবর্তী স্থান হইতে ভাসিয়া আসে তার ঢেউ। তখন তার স্রোতের ধারা

কলকল করিয়া বহিতে থাকে। আবার প্রাণচঞ্চল মাছেরা সেই স্রোতের তরী বাহিয়া পুলকের সঙ্গে উজাইয়া চলে। নতুন জলে মালোরা প্রাণ ভরিয়া ঝাঁপাঝাঁপি করে। গা ডোবায়, গা ভাসায়। নদীর শীতল আলিঙ্গনে আপনাদের ছাড়িয়া দিয়া বলে, তবে যে বড় শুকাইয়া গিয়াছিলে। বলিতে বলিতে চোখে জল আসিয়া পড়ে, বড় যে তোমাকে পর পর লাগিত; এখন ত লাগে না।

এত যদি স্নেহ, এত যদি মমতা, তবে কেন সেদিন নির্মম হইয়া উঠিয়াছিলে। এ কি তোমার খেলা! এ খেলা আর যার সঙ্গে খুশি খেলাও, কিন্তু জেলেদের সঙ্গে নয়। তারা বড় অল্পেতে অভিভূত হইয়া পড়ে। তোমার ক্ষণিকের খেয়ালকে সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়া তারা নিজেরাই আত্মনির্যাতন ভোগ করে। তারা বড় দীন। দয়াল তুমি, তাদের সঙ্গে ঐ খেলা খেলাইও না। ঐ রূপ দেখাইও না। তারা তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়াই অভ্যস্ত।

বিধির বিধানে বর্ষার স্থায়িত্বের একটা সীমারেখা আছে। তার দিন ফুরাইলে তিতাস আবার সেই রকম হইয়া গেল। তার বুকের চরটা নগ্ন হইয়া জাগিয়া উঠিল। এবার সেটা আয়তনে আরো বাড়িয়াছে। উজানের দূরদূরান্তর হইতে একেবারে মালোপাড়ার ঘাট পর্যন্ত সেটা প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

এবারও কৃষকেরা লাঠি লইয়া দখল করিতে আসিবে।

রামপ্রসাদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জেলেদের উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল, ওরা কৃষক। ওদের জমি আছে। ওরা আরো দখল করিবে? এতদিন জল ছিল, আমাদের ছিল দখল। এখন জল গিয়াছে। তার মাটিও এখন আমাদেরই। ওরা অতদূর হইতে আসিয়া দখল করিয়া নিবে, আর এত নিকটে থাকিয়া আমরা জেলেরাই বা নিশ্চেষ্ট থাকিব কেন।

নিজেদের মধ্যে দীর্ঘকাল দলাদলির ফলে তারা একযোগে কাজ করার ক্ষমতা একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাই মারামারির নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিল। বলিলঃ গাঙ শুকাইয়া গিয়াছে, তার সঙ্গে আমরাও গিয়াছি, এখন মাটি নিয়া কামড়াকামড়ি করিতে আমরা যাইব না। তোমার সাধ হইয়াছে তুমি একলা যাও।

রামপ্রসাদ একলাই গিয়াছিল। তার বাড়ি-সোজা চরের মাটি দখল করিবার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও ঝাঁপাইয়া পড়িল। জোয়ান ভাইদের পাশে রাখিয়া লড়াই করিতে করিতে বৃদ্ধ সেই মৃত্যুও বরণ করিল। করম আলি বন্দে আলি প্রভৃতি ভূমিহীন চাষীরাও আসিয়াছিল, কিন্তু মার খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ এক খামচা মাটিও পাইল না। তবে পাইল কে। দেখা গেল যারা অনেক জমির মালিক, যাদের জোর বেশি, তিতাসের বুকের নয়া-মাটির জমিনের মালিকও হইল তারাই।

তাতে জেলেদের কিছু যায় আসে না। কারণ যেদিন থেকে জল গিয়াছে সেদিন থেকে তারাও গিয়াছে।

উপরি উপরি কয়েকটা বছর ঘুরিয়া গেল। এবারের বর্ষার পর নবীনগর গ্রামের জেলেদেরও টনক নড়িল। ভাসমান চরটা ভাসিতে ভাসিতে তাদের গ্রাম পর্যন্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে।

অনন্তবালার বাপ বিষম ভাবনায় পড়িয়াছে। একদিন বনমালীকে ডাকিয়া বলিল, 'একবার দেখনা, তার নি খোঁজ পাও।'

অনন্তবালার বয়স বাড়িয়াছে। তার বয়সের অন্যান্য মালোর মেয়েরা সকলেই স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে। সে এখনো মাঘমণ্ডলের পূজা করে। অনন্ত নাকি তাকে বলিয়া গিয়াছে। লেখা-পড়া শিখিয়া সে যেদিন ফিরিয়া আসিবে, সেদিন যাহা বলিবে অনন্ত তাহাই করিবে। 'আমি আর কি বলিব। মা খুড়িমা যে কথা অহর্নিশি বলে, আমিও সে কথাই বলিব,' বলিয়াছিল অনন্তবালা। সেটা ছিল অবোধ বয়সের ছেলেমানুষি। এখন বয়স বাড়িয়া সে চিন্তাটা আরো প্রবল হইয়াছে। তার বয়সের অন্য মেয়েদের যখন একে একে বর আসিল, অনন্তবালা দেখিয়াছে, কিন্তু মনে করিয়া রাখিয়াছে, তারও একদিন বর আসিবে। সে বর আর কেউ নয়। সে অনন্ত।

দিনদিনই তাকে একটু একটু করিয়া বড় দেখায়। শেষে মা খুড়িমাদের চোখেও সে দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িল। তার চাইতে ছোট মেয়েরা দেখিয়া মাঝে মাঝে ছড়া কাটে, 'অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়া বিষম জ্বালা।' তারা মা একদিন তার বাপকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, 'মাইয়া রে যে বিয়া দেও না, সে কি কাঠের পালা যে ঘরে লাগাইয়া রাখ বা।'

'কথা শুন, বনমালী। তোমারে রেলের ভাড়া দেই, তুমি কুমিল্লা শহরে যাও, দেখ গিয়া, তার নি খোঁজ পাওয়া যায়।'

বনমালী গিয়াছিল। দুইদিন হোটেলে বাস করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঢুঁড়িয়াছে। কোন হদিস মিলে নাই।

হদিস মিলিয়াছিল সাত বছর পরে। অনন্তবালা তখন যোল ছাড়াইয়া সতেরোয় পা দিয়াছে। মালোর ঘরে অত বড় আইবুড়ো মেয়ে কেউ দেখে নাই বলিয়া সকলেই তার বাপ-খুড়াকে ছি ছি করিত। বয়স যতদিন কম ছিল, ভাল বর আসিলে অনন্তর আশায় তারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এখন অনন্তর আশা গিয়াছে; বর আসে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পক্ষ। তার উপর মূর্খ, দেখিতে কদাকার। তারই একটার সঙ্গে জুড়িয়া দিব, আর উপায় নাই, বলিয়া তার বাপ একদিন নির্মম হইয়া উঠিলে, সে দুঃখে অপমানে মরিতে চাহিল এবং বিস্তর কাঁদিয়া মা খুড়িমাদের তিরস্কারে ও অনুরোধে মন স্থির করিল। এমন সময় খবর নিয়া আসিল বনমালী।

--গাড়ি যখন কুমিল্লার ইস্টিশনে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইতেছে। এদিক দিয়া চেকার উঠিতেছে দেখিয়া আমি ওদিক দিয়া নামিয়া গেলাম। কাঁধে পোনার ভার। দৌড়াইতে পারি না। হাঁড়ি দুইটা ভাঙিয়া গেলে তুলেমুলে বিনাশ। ইষ্টিশনের পশ্চিমে ময়দান। ঠাকুর ডুবিতেছে। লুকাইতে গিয়া দেখি অনন্ত। আরো তিনজনের সঙ্গে ঘাসের উপর বসিয়া তর্ক করিতেছে। পরনের ধুতি ফরসা, জামা ফরসা। পায়ের জুতা পর্যন্ত পালিশ করা। আমার এ বেশ লইয়া তার সামনে দাঁড়াইতে ভয়ানক লজ্জা করিতে লাগিল। তবু সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। চিনিল না। শেষে পোনার হাঁড়ির দিকে মুখ রাখিয়া নিজে নিজে বলিলাম, আমাদের অনন্ত না জানি কোথায় আছে। সে কি জানে না তিতাস নদী শুকাইয়া গিয়াছে, মালোরা জল ছাড়া মীনের মত হইয়াছে। খাইতে পায় না। মাথারও ঠিক নাই। অনন্ত লেখাপড়া শিখিয়াছে, সে কেন আসিয়া গরমেন্টের কাছে

চিঠি লিখিয়া, মালোদের একটা উপায় করিয়া দেয় না। হায় অনন্ত, যদি তুমি একবার আসিয়া দেখিতে তিতাস-তীরের মালোদের কি দশা হইয়াছে।

দেখি অসুখে ধরিয়াছে। উঠিয়া কাছে আসিল। মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। চিনিতে পারিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বনমালী দা, তুমি এই রকম হইয়া গিয়াছ। আমি একলা হই নাই রে ভাই, সব মালোরাই এইরকম হইয়া গিয়াছে। তবু ত আমি বাঁচিয়া আছি, মাছের পোনার ভার কাঁধে লইয়া ঘোরাফেরা করিতে পারি; কত মালো যে মরিয়া গিয়াছে; কত মালো যে খাইতে না পাইয়া একেবারে বলবুদ্ধি হারাইয়া ঘর-বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

সে দেখি ধ্যানস্থ হইয়া গেল। ধ্যান ভাঙিলে বলিল, বনমালী দা, তুমি কি কর আজ কাল। বলিলাম, নদী শুকাইয়াছে, মালোদের মাছ ধরাও উঠিয়াছে। ব্যবসা ছাড়িয়া তারা দলেদলে জমুরি ধরিয়াছে। আমিও মজুরি ধরিয়াছি। একদিন চাটগাঁও হইতে এক মহাজন গেল মালোপাড়ায়। নাম কমল সরকার। বলিল, আমি এদেশে মাছের পোনা চালান দিব। এখানে দালাল থাকিবে। নানা গ্রামের পুকুরে সে পোনা ফেলিবে। তোমরা ত আর কোনো কালে মাছ ধরিতে পারিবে না। মজুরি কর। হাঁড়িতে জল দিয়া পোনা জিয়াইয়া ভার কাঁধে তুলিয়া দেয়, গামছায় বাঁধিয়া চিড়া দেয়, একখানা টিকেট কাটিয়া দেয়। দেশে গিয়া দালালকে বুঝাইয়া দেই। ক্ষেপ-পিছে একটা করিয়া টাকা দেয়। আমার গায়ে জোর আছে আমি পারি। অন্য মালোরা কি তা পারে। এবার আবার টিকেট কাটিয়া দিল না, বলিল, তোর পরনে ছেঁড়া গামছা, কাঁধে ছেঁড়া গামছা; মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি। তোকে ঠিক ভিখারীর মত দেখায়। চেকারবাবু তোকে কিছুই বলিবে না। তুই বিনা টিকিটেই যা। এক টাকার জায়গাতে না হয় পাঁচসিকা দিব। এতদূর আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে আসিয়া এত ভয় করিতে লাগিল যে নামিয়া পড়িলাম।

আমার শরীরের দিকে, কাপড়চোপড়ের দিকে, দাড়ির দিকে, চুলের দিকে চাহিয়া রহিল। এক সময়ে বলিল, বনমালী দা, তোমার একখানা ভাল গামছাও নাই! বলিলাম, আছে রে ভাই আছে। ভাল ধুতিও একটা আছে, কিন্তু তুলিয়া রাখিয়াছি। আর বিদেশ চলিতে এই পোষাকেই ভাল। আমাকে হোটেলে নিয়া খাওয়াইল। দোকান হইতে আমাকে একটা, গোকনঘাটের তার মাসী সুবলার বউকে একটা আর উদয়তারাকে একটা কাপড় কিনিয়া দিল। নিজের কাছে নিজের বিছানায় শোয়াইল। পরদিন সকালে টিকেট কাটিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গেল। বলিয়া দিল, বি-এ পরীক্ষার আর ছমাস বাকি। পরীক্ষা দিয়াই আমাদের দেখিতে আসিবে।

অনন্তবালা চুপি চুপি তাকে আসিয়া বলিল, 'অ' বনমালী দা, কাপড় দিল তোমারে একখান, মাসীরে একখান, উঁদি বোনদিরে একখান, আমারে একখান দিল না?'

–নিশ্চয়ই দিত। আমি যে তোমার কথা তাকে বলিই নাই।

–বল নাই। কেন বল নাই।

–চিনিতে পারিবে না যে। আমারেই কত কষ্টে চিনিয়াছে।

–চিনিতে পারিবে না কেন। আমার কি তোমার মত দাড়ি হইয়াছে, না, আমি তোমার মত বুড়া হইয়া গিয়াছি।

বনমালীর বোন উদয়তারারও বয়স বাড়িয়াছে। শরীরের লাবণ্য গিয়াছে। কিন্তু মনের রঙ মুছিয়া যায় নাই। নতুন বর্ষায় তিতাসে আবার নতুন জল আসিয়াছে। স্বপ্নের মত অভাবিত এই জল। কি স্বচ্ছ। বুকজলে নামিয়া মুখ বাড়াইলে মাটি দেখা যায়। এই মাটিটাই সত্য। এই মাটিই যখন জাগিয়া উঠিত প্রথম প্রথম দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। এখন ঐ মাটিই স্বাভাবিক। জল যে আসিয়াছে ইহা একটা স্বপ্নমাত্র। মনোহর। কিন্তু যখন চলিয়া যাইবে ঘোরতর মরুভূমি রাখিয়া যাইবে। সে মরুভূমি রেণু রেণু করিয়া খুঁজিলেও তাতে একটি মাছ থাকিবে না। তবু সেই জলেই গা ডুবাইয়া উদয়তারার খুশি উপচাইয়া উঠিল। সেই ঘাটে অনন্তবালাও গা মেলিয়া ধরিয়াছে। ছোট ঢেউগুলি তার চুলগুলিকে নাড়াচাড়া করিতেছে দেখিয়া উদয়তারা বলিয়া উঠিল, 'জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া। যতই দেখ মেওয়া-মিছরি কিছু এই জলের মতন ঠাণ্ডা লাগে না। অনন্তর ত অন্ত নাই। জলের তবু অন্ত আছে। লও, ভইন ডুব দেই।'

কেন গো দিদি। আমরা কি বাজারের গামছা না সাবান যে ডুইব্যা তলায় পইড়া ক্ষয় হমু। তোমার যদি জ্বালা হইয়া থাকে, জুড়াইতে চাও, তবে তুমি ডোব।'

'আমার ত ভইন কেশটি পড়িল দন্তটি নড়িল যৈবনে পড়িল ভাটি। আমার আবার জ্বালা কি।'

এইবার কথায় তার বয়সের খোঁটা আসিয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া অনন্তবালা জল হইতে উঠিয়া পড়িল। কাপড়খানা বুকের উপরে দুই তিন ভাঁজে বিছাইয়া বাড়িমুখো হইল।

'আহা আমি যেন মারছি না ধরছি' বলিয়া উদয়তারাও উঠিয়া পড়িল।

ভিজা কাপড়। আলুলায়িত চুল। কয়েক পা যাইতেই পাশের ঘাট হইতে দুইজনের কথাবার্তা তার কানে গেল। একটা লোক নৌকা ভিড়াইয়া খুঁটি পুতিল এবং দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধিল। অন্য লোকটি ঘাটে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, নিতে আসিয়াছ বুঝি? হাঁ। না দেখিলে বুঝি অন্তর দাহনি করে? করে। তা বেশ। বুদ্ধিমানের মতই কাজ করিয়াছ। গাঙে জল থাকিতে থাকিতে নিয়া যাও। সুদিনে গাঙ যতদিন শুকনা ছিল, ততদিন তুমি আস নাই। জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রেমও শুকাইয়া গিয়াছিল, কেমন কহিলাম? হাঁ, কথা কিছু মিছা বল নাই। তা শুকনা গাঙে তুমি কেমন করিয়াই আসিতে! নৌকা ত আর কাঁধে করিয়া আনিতে পারিতে না? না। তা তুমি যাই কও আর তাই কও, আমি কিন্তু সাঁচা কথাখান কই, 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ?' মনে থাকিলে গহীন গাঙে কি করিবে। মনে থাকিলে মরা গাঙেও আটাকইতে পারে না; গান আছে না, 'ভেবে রাধারমণ বলে, পিরিতের নাও শুকনায় চলে।' কেমন কহিলাম! হাঁ, কথা তুমি কিছু মিছা কও নাই।

উদয়তারাকে তার স্বামী নিতে আসিয়াছে।

আজ বনমালীর দিকে সে নতুন করিয়া চাহিল। নতুন এক রূপে তাহাকে দেখিতে পাইল। যতবার চায় তার বুক সমবেদনায় ভরিয়া উঠে। দাদাকে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে চায় সে।

বনমালী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। কিই বা তার বয়স তবু ইহারই মধ্যে তাহাকে অনেক বুড়া দেখাইতেছে। তার উপর একমাথা চুল একমুখ দাড়ি। কটিতে ছেঁড়া গামছা কাঁধে ছেঁড়া গামছা। গাঙ ত তার একার জন্য শুকায় নাই। সব জেলের জন্যই শুকাইয়াছে। তাঁরা বুঝি আর চিন্তা করে না। না কি দাদা সমস্তের চিন্তা একলা মাথায় করিয়া তারই ভারে নুইয়া পড়িতেছে। এখানো ত কিছু কিছু রোজগার হয়; পেটে দুইটা দানা পড়ে। পরে যখন রোজগারে আরো ভাঁটা পড়িবে, তখন কি সকলে না মরিতে দাদাই আগে মরিবে! দাদার প্রতি স্নেহে ও করুণায় বুক ভরিয়া উঠে; কিন্তু তারই আড়ালে জাগিয়া থাকে একটা অস্ফুট হাহাকার।

'দাদা, তুমি একটা ফুলের নাম কও ত।'

বনমালী মলিন মুখে একটু হাসিল, 'আমার লাগি তুই দিশা চাইবি বুঝি। আছিলি জামাই-ঠকানী, অখন হইলি গণক-ঠাকরাইন।'

'ঠিসারা রাখ। তুমি অত শুকাইয়া যাইতাছ কেনে? গাঙে জল ত অখনো আছে।'

—আছে টুনির মুত। বছরের পাঁচ রকম জো-এ পাঁচ কিসিমের জাল ফেলিতাম। রাজার হালে মাছ ধরিতাম। সেই দিন গেছে। তার কথা এখন স্বপ্নে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। স্বাধীন ভাবে জাল ফেলিতাম জাল তুলিতাম। এখন করি পরের গোলামি। পোনার ভার বহিতে বহিতে কাঁধে কড়া বাঁধিয়াছে, কোমরও কুঁজা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তার জন্যও ভাবি না। আমি ভাবি, সামনের সুদিনে মালোগুস্টির কি অবস্থা হইবে।

ধৈর্যহীন স্বামীর তাগিদে কাতর হইয়া উদয়তারা বনমালীর গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইল। বনমালী তার হাত ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিল, 'পাগলামি করিস না। কথা রাখ। অখন বুঝি তর কান্দবার বয়স আছে!'

উদয়তারা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, 'দাদা, তোমার মাথায় বুঝি আর শোলার মটুক উঠল না।'

'শোলার মটুক উঠব। মড়াপোড়ার টেকে গিয়া উঠব। তুই কান্দিস না।'

বনমালীর সঙ্গে উদয়তারার এই শেষ দেখা।

নদীতে নৌকা ভাসিলে উদয়তারা ছইয়ের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটি কথাও বলিল না। একটানা কোরা টানিতে টানিতে তার স্বামী অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর থাকিতে না পারিয়া শেষে নিজেই কথা কহিল, 'নিত্যর মামী, অ নিত্যর মামী, একটু তামুক নি খাওয়াইতে পারে।'

তারা নদীবক্ষে একে অন্যকে পাইয়াছে অনেক দিন পরে। কিন্তু উদয়তারার মনে কোনই উৎসাহ নাই। সে নির্লিপ্ত ভাবে কলকেতে তামাক ভরিল, মালসার আগুনে টিকা গুঁজিয়া দিল, লাল হইলে তুলিয়া হুকাটা ছইয়ের বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, 'নেউক, হুক্কা নেউক।'

বনমালীর জন্য এক অব্যক্ত বেদনা তার মনে অনবরত লুটোপুটি খাইতেছে, স্বামী কোরা টানিতেছে আর চারিদিক দেখিতেছে। দুই পারের চাষাদের গ্রামগুলি তেমনি সবুজ। কিন্তু মালোদের পাড়াগুলি যখনই চোখে পড়িতেছে, তখনই বেদনায় বুক টনটন করিয়া উঠিতেছে। গাছগাছালি আছে, কিছু দিন আগে যেখানে যেখানে ঘর ছিল তার

অনেকেই এখন খালি-ভিটা। ঘাটে আগে সারি সারি নৌকা ছিল, এখন আর নাই। মাঝে মাঝে দুই একটা কেবল বাঁধা রহিয়াছে। যেখানে তারা জাল শুকাইত, এখন সেখানে গরু চরিতেছে। ঘরগুলি কোথায় লুকাইয়াছে, ভিটাগুলি নগ্ন। তার উপরে বাঁশের খুঁটির গর্ত, ভাঙা উনানের গর্ত, শিলনোড়া রাখার সিঁড়ি, মাটির কলসী রাখার সিঁড়ি আধ-ভাঙ্গা পড়িয়া আছে। উঠানে ঝরাপাতার রাশি, তুলসীমঞ্চ ভাঙিয়া শত খান। প্রদীপ দেখাইবার কেউ নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি বাড়ি এখনো আছে। তারা বড়ঘর বেচিয়া ছোটঘর তুলিয়াছে।

'রাধানগর কিষ্টনগর গোঁসাইপুর সবখানের দেখি একই অবস্থা।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া হুকা লইল।

নৌকা ঘাটে ভিড়িলে, উদয়তারা নামতে নামিতে পাড়াটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তোমার গেরামেও ত দেখি একই অবস্থা।'

সে অনেক দিন পর স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে।

সুবলার বউ তখন এই ঘাটেই স্নান করিতেছে।

কিন্তু সেই যে গলা-জলে নামিয়া গা ডুবাইয়াছে, আর উঠিবার নামও করিতেছে না।

'কিলা বাসন্তী, জলে কি তোরে যাদু করছে। 'টানে' উঠবি না? তোর সাথে একখান কথা আছিল।'

সুবলার বউ গলা-জলে থাকিয়াই ঘাড় ফিরাইল, 'বাসন্তী আছলাম ছোটবেলা, যখন মাঘমাসে ভেউরা ভাসাইতাম। তার পরে হইলাম কার বউ, তার পরে হইলাম রাঁড়ি। মাঝখানে হইয়া গেছলাম অনন্তর মাসী। এখন আবার হইয়া গেলাম বাসন্তী।'

'আমারও ছোটকালেই বিয়া হইছিল। এই গাঁওয়ে আইয়া পাইলাম তোরে। বাড়ির লগে বাড়ি–দুইজনে এক সঙ্গে গলায় গলায় রইছি, তখনও যেমন তুই বাসন্তী অখনও তুই আমার তেমুনই বাসন্তী। নে উঠ কথা আছে।'

'তোর সাথে আমার না একখান ঝগড়া আছিল কোন সত্যিকালে, মনে কইরা দেখ। তোর সাথে কথা কওন মানা।'

উদয়তারার মন বেদনার্ত হইয়া উঠিল। যে-মানুষের গায়ে জীবনে কোনদিন 'ফুলটুঙির ঘা পড়ে নাই, তাকে সেদিন তারা কি নিষ্ঠুর ভাবে মারিয়াছিল। আজ সে নিস্তেজ, নিস্প্রভ। ঘাড়টা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে। গালদুটি কেমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মাথা-ভরতি কি লম্বা চুল ছিল। আজ সে চুলের অর্ধেকও নাই। বনমালীর মত এও যৌবন থাকিতে বুড়ি হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলেই মায়া জাগে। আজ হইলে উদয়তারা নিজের কপাল খাইয়াও তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারিত না।

অগত্যা সে নিজেই ধীরে ধীরে গলাজল পর্যন্ত নামিল। বলিল, 'একদিন তোর হাতের মার খাইলে বড় ভাল হইত ভইন, বুকটা ঠাণ্ডা হইত। তোরে মাইরা যে আনল জ্বলল, সে আনল আর নিবল না। মিছা না বাসন্তী। তুই মারবি আমারে?'

'আমি মারুম তোর শত্তুরেরে। নিশত্তুরী। তুই লাউয়ের কাঁটা ফুইট্যা মর, তুই শুকনা গাঙে ডুইব্যা মর।'

দুইজনের মনই হালকা হইয়া গেল।

'অনন্তর কথা জানবার মনে লয় না?'

'অনন্ত? ও অনন্ত। অনন্ত অখন কার কাছে থাকে?'

–অনন্ত কি এখনও তেমন ছোটটি আছে যে, কারো কাছে থাকিবে। সে কত বড় হইয়াছে। শহরে থাকিয়া এলে-বিয়ে পাশ করিয়াছে। দাদা পোনার ভার লইয়া আসিতে দেখিয়া আসিয়াছে। কত কথা বলিয়াছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকে। দেখিতেও হইয়াছে ঠিক যেন ভদ্রলোক।

–সুবলার বউ কেমন উদাস হইয়া যায়ঃ ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকে! ভদ্রলোকে যদি তারে যাত্রা শিখাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

–আ লো, না লো, তারা বাজারের ভদ্রলোক না, তারা পড়া-লেখার ভদ্রলোক। তোর একখানা আমার একখানা কাপড় কিনিয়া দিয়াছে। আমার খানা আমার পরনে তোর খানা ঐ 'টানে'। স্নানের শেষে একেবারে কোমরে গুঁজিয়াই বাড়ি যাইবি।

সুবলার বউ হঠাৎ আনমনা হইয়া যায়। কি ভাবিতে থাকে। কথা বলে না।

'কি লা বাসন্তী, মনে বুঝি মানে না। আমারও মানে না। আমার ত ভইন কৃষ্ণহারা ব্রজনারীর মত অবস্থা। কিন্তু পরের পুত, তোরও পেটের না, আমরাও পেটের না।'

–দূর নিশত্তুরী। আমি বুঝি তার কথা ভাবি। আমি ভাবি অন্য কথা। গত বর্ষার আগে চরটা ছিল ওই-ই খানে। তারপর এইখানে। এখন যেখানে গা ডুবাইয়া আছি। পরের বছর দেখবি এখানেও চর। গা ডোবে না। এইবারে যত পারি ডুবাইয়া নেই, জন্মের মত।

বছর ঘুরিতে মালোরা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িল। নদীর দুই তীর ঘেঁষিয়া চর পড়িয়াছে। একটিমাত্র জলের রেখা অবশিষ্ট আছে। তাতে নৌকা চলে না। মেয়েরা স্নান করিতে যায়, কিন্তু গা ডুবে না। উবু হইয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি গর্তের মত করিয়াছে। তাতে একবার চিৎ হইয়া একবার উপুড় হইয়া শুইলে তবে শরীর ডোবে। তাতেই কোন রকমে এপাশ ওপাশ ভিজাইয়া তারা কলসী ভরিয়া বাড়ি ফিরে। জেলেদের নৌকাগুলি শুকনা ডাঙ্গায় আটকা পড়িয়া চৌচির হইয়া যাইতেছে। জলের অভাবে সেগুলি আর নদীতে ভাসে না। মালোরা তবু মাছ ধরা ছাড়ে নাই। এক কাঁধে কাঁধ-ডোলা অন্য কাঁধে ঠেলা-জাল লইয়া তারা দলে দলে হন্যে হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় ডোবা, কোথায় পুষ্করিণী, তারই সন্ধানে। গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া কোথাও ডোবা দেখিতে পাইলে, শ্যেন দৃষ্টিতে তাকায়। দেহ হাড্ডিসার, চোখ বসিয়া গিয়াছে। সেই গর্তে-ডোবা চোখ দুইটি হইতে জিঘাংসার দৃষ্টি ঠিকরাইয়া বাহির হয়। জালের সামনাটা জলে ডুবাইয়া ঠেলা মারিয়া সামনের দিকে দেয় এক দৌড়। দুই চারিটা মৌরলা উঠে আর উঠে একপাল ব্যাঙ। ব্যাঙ গুলি লাফাইয়া পড়িয়া যায়। মাছগুলি থাকে। সেগুলি বেচিয়া কয়েক আনা পাইলে তাতে ঘরে চাউল আসে, না পাইলে আসে না।

মনমোহন সারাদিন ডোবায় ডোবায় জাল ঠেলিয়াছে, কিন্তু উঠিয়াছে কেবল ব্যাঙ। মাছ উঠে নাই। চাউল না লইয়া শুধুহাতে বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ডোলাটা একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জালটা একটা বেড়ায় ঠেকাইয়া রাখিল। তার বুড়ি মা

শুকাইয়া দড়ির মত হইয়া গিয়াছে। কয়েক বছর আগে সে বিবাহ করিয়াছিল। খাইতে না পাইয়া তার বউও শুকাইয়া যাইতেছে। তার দিকে আর তাকানো যায় না। তার বাপ দাওয়ার উপর বসিয়া তামাক টানিতেছে। মা আর বউ দুই-জনেই আগাইয়া আসিয়াছিল, চাউলের পুঁটুলি তার সঙ্গে দেখিতে না পাইয়া, নীরবে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। আজ কারো খাওয়া হইবে না। কালও হইবে কিনা তাও জানা যায় নাই। অথচ বাপ কেমন নিরুদ্বিগ্ন মনে তামাক টানিতেছে।

বাপের হাত হইতে হুকাটা লইয়া খুব জোরে জোরে কয়েকটা টান দিতেই মনমোহনও বুঝিল, না এই বেশ।

অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। যারা পরে গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র ফেলিয়াই গিয়াছে। তারা কোথায় গেল যাহারা রহিয়া গিয়াছে তারা জানিতেও পারিল না। তারা কতক গিয়াছে ধানকাটায়, কতক গিয়াছে বড় নদীর পারে। সেখানে বড় লোকেরা মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন করিয়াছে। মালোরা সেখানে খাইতে পাইবে আর নদীতে তাদের হইয়া মাছ ধরিয়া দিবে।

যারা দলাদলি করিয়াছিল, মাছ ধরা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাজারের পালেরা তাদের দয়া করিয়া কাজ দিয়া দিল, শহর হইতে তাদের জন্য মালের বস্তা ঘাড়ে করিয়া দোকানে আনিয়া দিবে আর রোজ চার আনা করিয়া পাইবে। সেই সব বস্তা বহিতে বহিতে তাদের কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে, তারা এখন বেঁকা হইয়া পড়িয়াছে। কাজ করিতে না পারিয়া তারা এখন কেবল মরিবার অপেক্ষায় আছে।

উদয়তারার স্বামী এই দলের। সে এখন লাঠির উপর ভর না করিয়া এক পাও চলিতে পারে না। সে কেবল জীর্ণ কোটরপ্রবিষ্ট চোখ মেলিয়া উদয়তারার দিকে চাহিয়া থাকে।

সুবলার বউ এতদিন সারারাত সুতা কাটিয়া অশক্ত বাপ-মার আর নিজের অন্ন জোগাইয়াছে। এখন আর কেউ সূতা কিনিতে আসে না। এখন সে উদয়তারাকে লইয়া 'গাওয়ালে' যায়। পানসুপারি আর কিছু পোড়ামাটি লইয়া সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘোরে, সন্ধ্যাবেলা এক এক পুঁটলি ধান লইয়া মেঠো পথ বাহিয়া ঘরে ফেরে।

কিন্তু তাতে কয়েক আনা পুঁজির দরকার। যাদের তাও নাই, তারা আর কি করে, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়া পড়ে। জয়চন্দ্রের বউ এই দলের। সে যুবতী। কয়েক দিন হয় জয়চন্দ্র মরিয়া গিয়াছে। হাতে যা ছিল পোড়াইতে খরচ হইয়া গিয়াছে। একটি শিশু বুকে দুধ টানে আরেকটা শিশু সারাদিন খাই খাই করে। সে আর কি করিবে। অনেক দূরের গ্রামে গিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে। ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার পর। ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা যেদিন পড়িল, সেদিন তার জয় জয়কার! আরও পাঁচজনে তাকেই অনুসরণ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইল। যেন সে একটা পথের সন্ধান দিয়াছে।

কিন্তু সে পথ বড় পিছল! অনেকে চলিতে চলিতে হোঁচট খাইয়া সেই যে পড়িল, মুখ দেখাইবার জন্য আর উঠিল না। মালোপাড়া হইতে তারা একবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

যারা মরিয়া গিয়াছে তারা রক্ষা পাইয়াছে। যারা বাঁচিয়া আছে তারা শুধু ভাবিতেছে, আর কতদূরে। তিতাসের দিক হইতে যেন উত্তর ভাসিয়া আসে, আর বেশি দূর নহে।

বর্ষা আর সত্যি বেশি দূরে নাই। তিতাসে নতুন জল আসিলে উহাদের দগ্ধ হাড় একটু জুড়াইত। কিন্তু মালোরা যেন জলছাড়া হইয়া ধুঁকিতেছে। আর অপেক্ষা করার উপায় নাই। জীবন-নদীতে যে ভাঁটা পড়িয়াছিল, তারই শেষ টান উপস্থিত। তিল তিল করিয়া যে প্রাণ ক্ষয় হইতেছিল, তাহা এখন একেবারেই নিঃশেষ হইয়া আসিল।

ঘরে ঘরে বিছানায় পড়িয়া তারা ছটফট করিতে লাগিল। পা টিপ টিপ করিতেছে; চোখ বসিয়া গিয়াছে; গাল ভাঙিয়া চোয়াল উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। পাঁজরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন প্রেতের মিছিল। এই দেহ টানিয়া টানিয়াই ঘাটের দিকে যায়। যদি দক্ষিণ হইতে স্রোত আসে, নদীতে যদি মাছ উজায়। কিন্তু আসিলেই বা কি। এই হাতে তারা না পারিবে নৌকা ভাসাইতে না পারিবে জাল ফেলিতে। এমনি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমনি শীর্ণ হইতে হইতে উদয়তারার স্বামী একদিন বলিল, 'আর ত খাড়া থাকতে পারি না।' সে বিছানা লইল।

তারপর বিছানা লইল বাসন্তীর বাপ-মা দুইজনে। তারা মরিয়া গিয়া বাসন্তীকে মুক্তি দিল। আর মুক্তি দিল মোহনকে তার বাপ। কিন্তু সে এক কাণ্ড করিয়া মরিল।

'আমি কতবার মাথা কুটলাম, গাঁও ছাইড়া যাই। আমার কথা কেউ 'বস্তুজ্ঞান' করল না। দেহে ক্ষমতা থাকতে নিজেও গেলাম না। অখন পড়ছি চৌদ্দ-সানকির তলায়।' এই বলিয়া সে টলিতে টলিতে বারান্দা হইতে উঠানে পড়িয়া গেল। পড়িবার সময় মোহনের দিকে হাত বাড়াইলে, মোহন ধরে নাই। মরিবার সময় মুখটা কি বিকৃত করিয়াছিল। চোখ দুটি খোলা। মরিতেছে না যেন মোহনের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপ করিতেছে।

সুবলার বউ নিজেও আর উঠিতে পারে না। পা টিপ টিপ করে। মাথা ঘোরে। চোখের সামনে দুনিয়ার রঙ আরেক রকম হইয়া যায়। সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, সকলের যা গতি হইয়াছে আমারও তাই হইবে। তার জন্য ভাবিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু ঘরে জল থাকা দরকার। শেষ সময়ে কাছে জল না থাকিলে নাকি ভয়ানক কষ্ট হয়। সকলেরই যখন এক দশা, তখন তার সময়ে কে কার ঘর হইতে জল আনিয়া তার মুখে দিবে। কলসী বহিবার সামর্থ্য নাই। দুই তিনটি লোটা লইয়া ঘাটে গেল। নদীতে তখন নতুন জল আসিয়াছে। চরটা জুড়িয়া ধানক্ষেত হন হন করিতেছে। তারই পাশ দিয়া জল পড়িতেছে। হু হু স্রোত বহিতেছে। ধানক্ষেতে কত ধান। এইখানেই তাদের মাছ ধরার অগাধ জল ছিল। ধীরে ধীরে একখানা নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। সে নৌকায় অনন্তবালা, তার বাপ কাকা, মা কাকীরা আসিয়াছে। অনন্তবালা চিনিতে পারিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, তারা দেশ ছাড়িয়া দিতেছে। এইখান হইতে পায়ে হাঁটিয়া শহরে গিয়া রেলগাড়িতে উঠিবে। তারা আসাম যাইবে।

সুবলার-বউ অত দুঃখের সময়ও অনন্তর কথা না তুলিয়া পারিল না। শুনিয়াছে, ছোট সময়ে এই দুইটিতে খুব ভাব ছিল। পরে উমা যেমন শিবের জন্য তপস্যা

করিয়াছিল সেও তেমনি তপস্যা করিয়া চলিয়াছিল। পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। মালোর ঘরের মেয়ে অত বড় হইয়াছে বলিয়া কত কথা তাকে শুনিতে হইয়াছে।

'অনন্তর কোনো খবর পাওয়া গেল না?'

'অনেক খবর পাওয়া গেছে', বলিয়া সে আরম্ভ করিল। বাবুদের সঙ্গে মিলিয়া সে লোকের উপকার করিয়া ফিরিতেছে। প্রথম যখন আসিল কেউ তাকে চিনিল না। বিরামপুরের ঘাটে নৌকা লাগাইয়াছিল। বলিয়াছিল, এ গাঁয়ের লোকের কি কষ্ট। কাদির মিয়া বলিয়াছিল আমরা চাষা। ক্ষেতের ধান ঘরে আনিয়াছি, আমাদের কোন কষ্ট নাই। কষ্টে পড়িয়াছে মালোগুষ্টি, গাঙ শুকাইয়া যাওয়াতে। কিন্তু কেউ তাকে চিনিল না। চিনিল কেবল রমুর মা। আগাইয়া আসিয়া বলিলঃ বাজি, তোমারে আমি চিনি। তোমার নাম অনন্ত। বনমালীর নৌকাতে তুমি ছোটবেলা এখানে আসিয়া ছিলে। আমার রমুর সঙ্গে খেলা করিয়াছিলে। বাড়িতে আস। বাড়িতে নিয়া তাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইল। সেই দিনই বনমালী দাদা মরিল। মালিকের কাছে পোনামাছ বুঝাইয়া দিয়া, খালি ভার লইয়া তিতাসের পারে চলিতে চলিতেই যেখানে পড়িয়া মরিল, সে কাদির মিয়ার বাড়িরই কাছে। অনেক লোক জড়ো হইয়া তাকে দেখিল। কাদির মিয়া দেখিল। অনন্ত ও গিয়া দেখিল। কাদির মিয়া আর থাকিতে পারিল না। এই লোক আমার কত উপকার করিয়াছে, বলিয়া ধানের গোলা খুলিয়া দিল। বাবুরা নিয়া মালোদের বিতরণ করুক। অনন্ত তার নৌকায় সেই ধান চাউল লইয়া আমাদের গ্রামে গেল। এক রাত্রি ছিল আমাদের বাড়িতে। কত কথা সে আমার কাকার নিকট বলিয়াছে।

–সব কথা বলিল, আর একখান কথা বলিল না?

–না। সেই কথা বলার তার সময় নাই। পরের দিন আরেক গ্রামে চলিয়া গেল। তোমাদের এ গ্রামেও কিবা আসে তারা।

সুবলার বউয়ের নিকট এ সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। এমন কি যে অনন্তবালা সামনে দাঁড়াইয়া আছে, সেও যেন একটা স্বপ্ন মাত্র। একমাত্র সত্য চরের ধানগাছগুলি। কি অজস্র ধান ফলিয়াছে। দক্ষিণের ঐ অনেক দূরের শিবনগর গাঁ হইতে আগে ঢেউ উঠিত। সে ঢেউ থামিত আসিয়া এই মালোপাড়ার মাটিতে ঠেকিয়া। এখন সেই সুদূর হইতে সেই ঢেউই যেন রূপান্তরিত হইয়া ধানগাছের মাথা উপর দিয়া বহিয়া আসে। সেই দিকে চাহিয়া সুবলার বউ ধীরে ধীরে চোখ মুদিল।

তখন মাঘ মাস। ঢোল বাজিতেছে, কাঁসি বাজিতেছে। নারীরা গান করিতেছে। তিতাসে কি জল। সেই জলে সে ভেউরা ভাসাইল, কাড়াকাড়ি করিয়া লইয়া গেল তারা দুইজনে। সুবল আর কিশোর তারপর আসিল বসন্ত কাল। 'পরস্তাবে'র এক অজানা নারী উত্তরের খলাতে দোলউৎসবে নাচিতে গিয়া এক অজানা পুরুষকে দেখিয়া ভুলিল। হইল অনন্তর জন্ম। আর আজ এক অনন্তবালা তপস্যা করিতে করিতে শুকাইয়া গিয়াছে। সে কি আসিবে না! সে আসিল। এক কায়স্থের কন্যা এলে-বিয়ে পড়িবার সময় তাকে ভুলাইয়াছিল। পরে তার মা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিল, অনন্ত ছেলেটি দেখিতে বেশ, পড়াশোনায় পণ্ডিত। কিন্তু ওতো জেলের ছেলে, তোর সঙ্গে তার কি? সেই কন্যা বুঝিল, বলিল, সত্যই ত তার সঙ্গে আমার কি?

মনে আঘাত পাইয়া অনন্ত বাউণ্ডুলে হইল। শেষে মনে পড়িল, আমি ছোট কিসে। আমার অনন্তবালা তো আমারই পথ চাহিয়া আছে। তারপর একদিন দেখিতেছি দুখাই বাদ্যকর ঢোল আর তার ছেলের কাঁসি বাজাইতেছে। তেমনি এক তালের বাজনা। তবে দুখাইর ঢোলটা অনেক পুরানো আর তার ছেলেটা অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জামাইর মা হইবে কে। আবাগী মরিয়া বাঁচিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিলে এখন না খাইয়া মরিত। ধরিতে গেলে আমারই দাবী সকলের আগে। আমি তার মা হইয়া ঘরের ছাঁইচে বসিব, সে বসিবে আমার কোলে। নারীরা তার মুখে চিনি দিবে, মুখে নিয়া সে চিনি থুথু করিয়া ফেলিয়া দিবে। নারীরা উলু দিবে।

তারপর সে মার কোল হইতে পালকিতে গিয়া বসিবে। কিন্তু উদয়তারাও তো মা হইতে চাহিতে পারে। ওদিকে রমুর মা রহিয়াছে। সে যদি আসিয়া বলে, আমি তাকে আর আমার রমুকে অভিন্ন দেখি। রমুর যদি মা হইতে পারি, আমি তবে তারও মা হইতে পারি। অথন এই সুবলার বউ ছাড়িয়া দিলেও, তারা তো ছাড়িয়া দিলোনা। বিয়ে বাড়িতে তুমুলকাণ্ড বাঁধাইবে। দূর একি স্বপ্ন! উদয়তারা মরিতেছে, মোহন মরিতেছে। মুখে জল দিতে হইবে। সে থাকিতে তারা তৃষ্ণা নিয়া মরিবে! জলে ঢেউ দিয়া ঘটি কয়টা ভরিল। সামনেই ধানক্ষেত। ধানগাছগুলি কোমরজলে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িতেছে। অত কাছে! লোটার ঢেউ সেগুলিকে গিয়া নড়াইয়া দিবে না ত! ওগুলি শত্রু। সারা গাঁয়ের মালোদের ওগুলিই তো মারিয়াছে। আবার চোখ বুজিয়া আসে।

পাড়াতে আর কেউ বাঁচিয়া নাই। কেবল দুইজন বাঁচিয়া আছে। ঘরদুয়ার কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। একটা খালি ভিটার উপর রান্না হইতেছে। একটা বড় হাঁড়িতে ভাত ভরতি। বাবুরা বিতরণ করিবে। বুড়া রামকেশব একটা মাটির সরা লইয়া টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইতে, সরাতে ভাত তুলিয়া দিল। সুবলার বউ একটা মালসা লইয়া দাঁড়াইলে তাকেও ভাত দিতে আসিল। সে অনন্ত। পাছে চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু একি স্বপ্ন! ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সুবলার বউ সে শব্দে চমকিত হইয়া দেখে জলভরা লোটা তার শিথিল হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে।

ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। চরে আর একটিও ধানগাছ নাই। সেখানে এখন বর্ষার সাঁতার-জল। চাহিলে কারো মনেই হইবে না যে এখানে একটা চর ছিল। জলে থই থই করিতেছে। যতদূর চোখ যায় কেবল জল। দক্ষিণের সেই সুদূর হইতে ঢেউ উঠিয়া সে ঢেউ এখন মালোপাড়ার মাটিতে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু এখন সে মালোপাড়ার কেবল মাটিই আছে। সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদী থেকে সংগৃহীত

তিতাস একটি নদীর নাম

১. দুই নদী

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলে-কূলে জল; তার বুকভরা ঢেউ। প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।

স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।

ভোরের বায়ু তাকে তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া তোলে; দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে ঘুম পাড়াইতে গিয়া, পারে না।

অতি বড় নয় সে। মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। নাই মারমুখো মাতনের বিপর্যয়। সে অতি ছোটও নয়। রমু মোড়লের মড়াই, মাধব কৈবর্তের 'ডাঙ্গি', যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া-যাওয়া শীর্ণা পল্লীতটিনীর চোরা কাঙালপনাও তার নাই।

তিতাস মাঝারো নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতারে ডিঙাইয়া অপমান করিতেও সাহস পাইবে না, আবার, ছোট্ট নৌকায় ছোট্ট বউ নিয়া মাঝি তার হাত-বৈঠা দিয়া এ-পার ও-পার করিতেও কোনোদিন ভয় পাইবে না।

তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই; কৃপণের মত কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়; কিন্তু কাঙাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফুলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না। তিতাসের বুঝি সব ব্যাপারেই নিজের একটা গরজ আছে।

তবু যদি ইতিহাসে কোনোদিন তার নাম থাকিত!

কত নদীর তীরে নীলের ব্যাপারী ফিরিঙ্গীদের কুঠী-কেল্লা একসময়ে ছিল; ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, কত নদীর বুকে মগদের ছিপ-নৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে। তীরে তীরে যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষ আর হাতীঘোড়ার রক্তে সে সব নদীর জল কত লাল, কত ঘোলা হইয়াছে। তারা ইতিহাসের অন্তর্গত। তারা হয়ত শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুঁথির পাতায় তারা রেখ্ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোনই রাজকীয় ইতিহাস নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিচিহ্ন নাই। সে শুধু একটা নদী।

তীর আছে, আর তীরের বাঁধনের জল আট্‌কা পড়িয়া আছে। তাই সে নদী। এ জল একদিন শুকাইয়াও যাইতে পারে, এ তীর ধ্বসিয়া সমান হইয়াও যাইতে পারে। তখন কোথায় বা থাকিবে তার নদী হওয়ার গৌরব, আর কোথায় বা থাকিবে তার ফুলিয়া উঠা ছন্দমাতাল ঝঙ্কার!

তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই। বড় বড় সওদাগরের নৌকারা বড় বড় পাল তুলিয়া তার বুকে স্বার্থ-তাড়নায় বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।

তিতাস শুধু একটা নদী। সুজলা পূর্ব বাংলার একধারে খানিকটা স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে। বাহিরের কেউ তাকে জানিল না, চিনিল না—দুই তীরে ঘর বাঁধিয়া যারা থাকে, যাদের সাথে তার নিত্য পরিচয়, খালি তারা ছাড়া। পাহাড় থেকে বয়ে আসার শ্রমমর্যাদা নাই তার, সাগরে বিলাইবার সম্পদের গৌরব নাই তার। ঝরণা থেকে জল টানিয়া, পাহাড়ী ফুলেদের ছুঁইয়া ছুঁইয়া, উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনদিন সে পাইল না। সাগরের অসীমকে বিরাট চুম্বনে গ্রাস করিবার আনন্দ কোনোকালে তার ঘটিবে না।

দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফস্‌কাইয়াছিল। বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়, স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটী খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত সহস্র গাঁ-গেরাম ঘুরিয়া, অনেক জঙ্গল, অনেক মাঠময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে, মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। খালি জানে, তিতাস একটা নদী। অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া উহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়া গিয়াছে। সাঁওতাল রমণীর হাতের কাঁকনের দুই মুখ যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি ফাঁক—কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়-আকৃতি।

তিতাস নিঃস্ব নয়। কখনো শীর্ণ হয় না সে। জোয়ারের সময়ে অতিমাত্রায় ফুলিয়া উঠিয়া চন্দ্রালোকে বেহায়া মেয়ের মতো খলখল করিয়া হাসিয়াও উঠেনা।

অনেক নদী আছে বর্ষার অকুণ্ঠ প্লাবনের অজস্রতায় ডুবিয়া তারা ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটা নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের উপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকাগুলো অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলোকে টানিয়া আনা-নেওয়া করে।

এপারে ওপারে ক্ষেত। চাষীরা দিনের রোদে তাতিয়া কাজ করে। এপারের চাষী ওপারের জনকে ডাকিয়া ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে। ওপারের চাষী ঘাম মুছিয়া জবাব দেয়। গরুগুলি নামিয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। অবগাহন স্নান। কিন্তু গা ডোবে না। কাক-স্নান করা মাত্র সম্ভব হয়। কোন রকমে। নারীরা কোমর-জলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হয়। দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু-করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলি সাবানে পা ঘসে। অল্প দূরে ঘর। পুরুষ-মানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে; তাই ব্যস্ততা নাই।

কিন্তু সত্যি কি ব্যস্ততা নাই? যে-মানুষটা এক-গা ঘাম লইয়া ক্ষেতে কাজ করিয়া বাড়ী গেল, তার ভাত বাড়িয়া দিবার লোকের মনে ব্যস্ততা থাকিবেইত। দুপুরে নারীরা ঘাটে বেশি দেরী করে না। কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় করে। পুরুষেরা এজন্য কিছু বলে না। তারা জানে এ নদী দিয়া কোনো সদাগরের নাওয়ের আসা যাওয়া নাই।

শীতে বড় কষ্ট। গম্ গম্ করিয়া জলে নামিতে পারে না। জল খুব কম। সারা গা তো ডোবেই না; কোমর অবধিও ডোবে না। শীতের কন্-কনে ঠাণ্ডা জলে হুম্ করিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিবার উপায় নাই; একটু একটু করিয়া শরীর ভিজে; মনে হয় একটু একটু করিয়া শরীরের মাংসের ভিতর ছুরি চালাইতেছে কেউ। চৈত্রের শেষে খরায় খা খা করে। এতদিন যে জলটুক্ অবশিষ্ট ছিল, তাও একটু একটু করিয়া শুষিতে শুষিতে একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। ঘামের গা ধুইবার আর উপায় থাকে না। গরুরা জল খাইতে ভুল করিয়া আসিয়া ভাবনায় কাতর হয়। মাঘের মাঝা-মাঝি সর্‌ষে ফুলে আর কড়াই-মটরের সবুজিমায় দুই পারে নক্‌সা করা ছিল। নদীতেও ছিল একটু জল। জেলেরা তিন-কুণা 'পেলুন' জাল ঠেলিয়া চাঁদা পুটি টেংরা কিছু-কিছু পাইত। কিন্তু চৈত্রের খরায় এ সবের কিছুই থাকে না। মনে হয় মাঘ মাসটা যেন ছিল একটা স্বপ্ন। চারিদিক ধু-ধু করা রুক্ষতায় কাতরায়। লোকেরা বিচলিত হয় না। জানে তারা, এ সময় এমন হয়।

তিতাসের তেরো মাইল দূরে এমনি একটা নদী আছে। নাম বিজয় নদী। তিতাসের পারের জেলেদের অনেক কুটুম বিজয় নদীর পারের পাড়াগুলিতে আছে। তিতাসের পারের ওরা ওই নদীর পারের কুটুম্ব বাড়ীতে অনেকবার বেড়াইতে গিয়াছে। গ্রামের নাম কসবা। নিকটেই কমলা সাগর দীঘী। তার পারে মেলা হয়, দেখিতে গিয়াছে। আরও পাঁচ মাইল দক্ষিণে নয়ানপুর গ্রাম। বিবাহের সম্বন্ধের খোঁজে সে-গাঁয়েও গিয়াছে। বিজয় নদী বাঁকিয়া সে-গাঁয়ের মালোপাড়াকেও ছুঁইয়া গিয়াছে। সে-সব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। একদিক দিয়া জল শুকায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দমবন্ধ হওয়ার আভাসে নাক জাগাইয়া হাঁফায়। মাছেদের মত জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। সাম্‌নে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা একসময় হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দেয় বিজয় নদীর আশা।

তারপর তারা কি করে? যারা বর্ষার সময় চাঁদপুরের বড় গাংএ নৌকা লইয়া প্রবাস বাহিতে গিয়াছিল, তারা সেখানে নিকারীর জিম্মায় নাও-জাল রাখিয়া রেলে চড়িয়া আসিয়া পড়ে। তাদের কোন চিন্তা থাকে না। হাতের টাকা ভাঙিয়া এই দুর্দিন পার করে। যারা বর্ষায় ঘরের মায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই তারাই পড়ে এই সময়ে বিপদে। ঠন্‌ঠনে নদী। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন-কোণা 'ঠেলা-জাল' কাঁধে ফেলিয়া আর-এক কাঁধে গলা-চিপা কাঁধা-ডোলা বাঁধিয়া এ-পাড়া সে-পাড়ায় টই-টই করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানা-পুকুর আছে, মালিকহীন ছাড়া-বাড়ীতে। চার পারে বন বাদাড়ের ঝুপড়ি। সবুজ সতেজ লালিত্য হারা। তারই ঝরাপাতা পড়িয়া, পচিয়া, ভারি হইয়া তলায় শায়িত আছে। তারই উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিয়া ছোট মাছেরা 'ফুট' ছাড়ে। গলাজল শুকাইয়া কোমর-জল, কোমর-জল শুকাইয়া হাঁটু-জল হইয়াছে। মাছেদের

ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু অধিক ভাবিতে হয় না। গোপাল-কাছা-দেওয়া দীর্ঘাকার মালো কাঁধের জাল নামাইয়া শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে এক সময় 'খেউ' মারিয়া তুলিয়া ফেলে। মাছেদের ভাবনা এখানেই শেষ হয়, কিন্তু যারা মারিল তাদের ভাবনার ত শেষ হইল না। তাদের ভাবনা আরও সুদূর-প্রসারী। তাদের ভাবনা সামনের বর্ষাকাল পর্যন্ত প্রসারিত।

বর্ষাকালের আর খুব বেশি দেরী নাই। সঙ্কটের অবসান সম্ভাবনায় অনেক মালো উদ্বেগের পাহাড় ঠেলিয়া চলিয়াছে, হাতে 'ঠেলা-জাল' লইয়া চুনোপুটী যা পায় ধরিয়া পোয়া দেড়-পোয়া চাউলের যোগাড় করিতেছে। কিন্তু গদাধর মালোর দিন আর চলিতে চায় না। একদিন অনেক খানাডোবায় 'খেউ' মারিয়াও কিছুই পাইল না, নামিলে টগ-বগ করিয়া পচা জলের ভুর-ভুরি উঠে, আর 'খেউ' মারিলে তিনচারিটা ব্যাং জাল হইতে লাফাইয়া এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়।

ওঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুকাইয়া গিয়াছে। গদাধরের বউ লাগাইয়াছিল। বৌ যৌবন থাকিতেই শুকাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তনদুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গদাধরকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গদাধরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুকাইয়া যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা এক একদিন চোখে পড়ে। কোনদিন তাকে মনে পড়ে না। আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ, বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে! থাকিলে, আজ তার একার ভাবনা শতগুণ হইয়া দেখা দিত! আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরে ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গদাধর শিহরিয়া উঠে। একপেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনাই নাই।

সত্যি নিত্যানন্দর আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বৌ ঝিমাইতেছে। ছেলেমেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া খালি তামাক টানিতেছে।

পশ্চিমের ভিটায় গদাধরের ঘর। ডালিম গাছে কাঁধের জাল ঠেকাইয়া দিয়া ডোলটা ছুঁড়িয়া ফেলিল দাওয়ার একদিকে। দক্ষিণ ও পূবদিকের ভিটা খালি। তাদের দুই কাকা থাকিত। এক কাকা মরিয়া গিয়াছে এবং তার ঘর বেচিয়া তার শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। আরেক কাকা ঘর ভাঙিয়া লইয়া আরেক গাঁয়ে 'ছাড়িয়া' গিয়াছে।

গদাধর অকারণে খেকাইয়া উঠিল : খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?

কি খামু তবে?

না: লোকটার খালি পেটই শুকায় নাই। মাথাও শুকাইয়া গিয়াছে।

লও যাই বুধাইর বাড়ী।

নয়ানপুরে বোধাই মালো সব মালোদের চেয়ে টাকায় বড়। বাড়ীতে চার পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে গণেশ ও কালীমোহন রোজগারী লোক। বোধাই হাতীর মত

মোটা ও কাল। শরীরেও হাতীর মত জোর। তার কারবার অন্য ধরণের। বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে। মাছ বাড়িতে থাকে, আর তারা তিন বাপ বেটায় লোকজন লইয়া জাল ফেলে মাছ তোলে, বেচে, চালান দেয়।

কসবাতে খুব বড় কয়েকটি দীঘি আছে। ঐতিহাসিক দীঘি। যেমন কল্যাণ সাগর, কমলা সাগর, ক্ষীর সাগর। এ-পারে দাঁড়াইলে ও-পারের মানুষ ছোট দেখায়। এমনি বড়। এত বড় দীঘির এপার-ওপার বাঁধিয়া বোধাই মালো জাল ফেলে। কোনোখানে ফাঁক না রাখিয়া বাঁশের সাহায্যে জাল হাঁটাইয়া নিয়া ও-পারে নিয়া তোলে। তুলিবার সময় শত শত মাছ কলরব করিয়া উঠে। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। তামাম দিন লাগে এই রকম একটা 'খেউ' তুলিতে। 'খেউ'-পিছে লোকজনকে সে খাওয়ায়, একটা করিয়া টাকা আর একটা করিয়া কাপড় দেয়। তার বাড়ীতে সেদিন ছোট একটা উৎসব লাগিয়া যায়।

বড়ছেলে গণেশ বাড়ীর পরবর্তী মুরুব্বি। বিবাহ করিলে তার বউ বাঁচে না। পর পর পাঁচ বিবাহ করিয়া বউ হারাইলে, ষষ্ঠ বিবাহ করিল তিতাস-পারে গোকনঘাট গ্রামে। বউ ছিল বাপের বাড়ীতে। লইতে আসিয়া গণেশ সকালবেলা তিতাসের পারে গিয়া দাঁড়াইল।

তিতাসে কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সব দিক দিয়াই তাতে অকৃপণতার প্রকাশ। তার বাপের কেনা দীঘি 'কল্যাণ সাগরে'র মতই অজস্রতা। আর তাদের বিজয় নদী! শুকাইয়া গিয়াছে। নিত্যানন্দ গদাধরদের মত কাঙাল হইয়া একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে!

এহেন বিজয়-নদীর তীরে-তীরে যে-মালোরা ঘর বাঁধিয়া আছে, তাদের কত কষ্ট। নদী শুকাইয়া গেলে তাদের নৌকাগুলি অচল হইয়া থাকে আর কাঠ-ফাটা রোদে কেবল ফাটে।

তিতাস-তীরের মালোরা যারা সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয় তাহা তারা দেখিয়া আসিয়াছে।

রিক্ত মাঠের বুকে ঘূর্ণির বুভুক্ষা দেখিতে দেখিতে ফিরতি-পথে তারা অনেকবার ভাবিয়াছে, তিতাস যদি কোনোদিন এই রকম করিয়া শুকাইয়া যায়! ভাবিয়াছে, এর আগেই হয়ত তাদের বুক শুকাইয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পাশের জনকে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে বলিয়াছে : বিজ্‌নার পারের মালোগুষ্টি বড় অভাগা রে ভাই, বড় অভাগা!

যারা বিজয় নদীর দশা দেখে নাই, খালি বছরের পর বছর তিতাসের তীরেই বাস করিয়াছে, তারা অতশত ভাবে না। তারা সর্বদা সব পেয়েছির দেশে থাকে কিনা। তিতাস তাদের খাওয়া-পরার মাছ দেয়, পান করার জল দেয়। তাদের কারো কারো ধানক্ষেতে খাল কাটিয়া তারা কম পরিশ্রমে তিতাস হইতে সেচনী দিয়া জল দিতে পারে, খরা চৈত্রের শেষেও। শীতে হুড়মুড় করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, হুড়মুড় করিয়া উঠিতে হয় না। তারা নিজেরাই জানে জলে নামিবার আগেই যত শীত, ডুব দিয়া উঠিলে আর কোনো শীত নাই। গরমের দিনে ঝাঁপাইয়া-ঝুঁপাইয়া হাসিয়া ঢঙিয়া 'লাই'-খেলিয়া গাহন করিতে পারে। তারা অতটা ভাবিবার দরকার-বোধ করে না। কিন্তু

যারা এর সাথে বিজয়-নদীর পারের দুর্দশার কথা তুলনা করে তারা মনে মনে বলে : বেঁচে থাকুক আমাদের তিতাস। তবুও তারা ভাবে। তিতাসের অনুগত বিশালতার দিকে চোখ মেলিয়া তারা ভাবে : এ জলের যৌবন অনন্তকাল ধরিয়া অশেষ থাকিয়া যাইবে।

সবচেয়ে বেশি ভাবে জেলেরা। তিন-কুণা ঠেলা-জাল আবার একটা জাল! তারে হাঁটু-জলে ঠেলিতে হয়, উঠে চিংড়ির বাচ্চা। হাততিনেক তো মোটে লম্বা এ ঠেলা-জাল। বিজয়ের বুকে তা-ই ডোবে না। তা-ই দেখিয়া এ গাঁয়ের কে যেন ব্যঙ্গ করিয়া একটা গান বাঁধিয়াছিল : চা'ল চিবাইয়া ঠেলা-জাল 'বাই', আমার মতন গরীব নাই, চা'ল চিবাইয়া ......। আর তিতাসের জলে কত বড় বড় জাল ফেলিয়া তারা কত রকমের মাছ ধরে। এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে তারা নাভীশ্বাসে হাঁপাইত, নাকের চারদিক থেকে বায়ুটুকু সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেই রকম অবস্থা হইত। ওদের মতো তাহাদিগকেও ঠেলা-জাল ঘাড়ে করিয়া গ্রামগ্রামান্তরের খানা-ডোবা খুঁজিয়া মরিতে হইত দুই আনা আর দশ পয়সার মৌরলা ধরিবার জন্য।

জেলেদের বৌ-ঝিয়েরা ভাবে অন্যরকম কথা—বড় নদীর কথা যারা শুনিয়াছে। যে-সব নদীর নাম মেঘনা আর পদ্মা। কি ভীষণ! পাড় ভাঙে। নৌকা ডোবায়। কি ঢেউ। কি গহীন জল। চোখে না দেখিয়াই বুক কাঁপে! কত কুমীর আছে সে-সব নদীতে। তাদের পুরুষদের মাছ ধরার জীবন। রাতে-বেরাতে তারা জলের উপর থাকে। এতবড় নদীতে তারা বাহির হইত কি করিয়া! তাদের নদীতে পাঠাইয়া মেয়েরা ঘরে থাকিতইবা কেমন করিয়া! তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামীপুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বৌরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে, ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছধরার জাল গুটাইতেছে।

বাংলার বুকে জটার মতো নদীর প্যাচ। শাদা, ঢেউ-তোলা জটা। কোন্ মহাস্থবীরের চুম্বন-রস-সিক্ত বাংলা। তাঁর জটাগুলি তার বুকের তারুণ্যের উপর দিয়া সাপ-খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিম্নাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এ সবই নদী।

সবগুলি নদীর রূপ এক নয়। উহাদের ব্যবহার এবং উহাদের সহিত ব্যবহার—তাও বিভিন্ন রকমের। সবগুলি নদীই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে আসে। কিন্তু এ কাজে আসার নানা ব্যতিক্রম আছে। বড় নদীতে সওদাগরের নাও আসে পাল তুলিয়া, গুন্ টানিয়া। উহার বিশাল বুকে জেলেরা সারাদিন নাও লইয়া ভাসিয়া থাকে। নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে। মাছ ধরে। পাইকারেরা সে মাছ কিনিয়া নেয়। সব বিষয়ে একটা কঠোর রূপ এখানে প্রকটিত। তীরে তীরে বালুচর, তীরে তীরে নগর, তাল নারিকেল সুপারীর বাগ। স্রোতের খরায় তীরের মাটী কাটে, ধ্বসে। ঢেউয়ের আঘাতে তীরগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে। গৃহস্থালী ভাঙে। ক্ষেতখামার ভাঙে, তাল-নারিকেল, সুপারীর গাছগুলি সারি বাঁধিয়া ভাঙিয়া পড়ে। ক্ষমা নাই। ভাঙাগড়ার এক রুদ্র দোলার দোলনায়—করাল এক চিত্তচঞ্চল ক্ষিপ্ত আনন্দ ..... সে-ই এক ধরণের শিল্প। আরেকটা শিল্পের দিক আছে। সৌম্য শান্ত করুণ স্নিগ্ধ প্রসাদগুণের মাধুর্যে রঞ্জিত এ শিল্প।

এ শিল্পের শিল্পী মহাকালের তাণ্ডবনৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ শিল্পের শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পের শিল্পী মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করিয়াছে।

সে-শিল্পী যে-ছবি আঁকে তা বড় মনোরম। তীর-ঘেসিয়া সব ছোট ছোট পল্লী। তারপর জমি। তাতে অঘ্রাণ মাসে পাকা ধানের মওসুম। আর মাঘ মাসের সর্ষেফুলের অজস্র হাসি। তারপর পল্লী। ঘাটের পর ঘাট। সে-ঘাটে সব জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস-নুদুস ছেলেকে ডুবাইয়া চুবাইয়া তুলে। বৌ-ঝিরা সব কলসী লইয়া ডুব দেয়। পরক্ষণে ভাসিয়া উঠে। অল্প দূর দিয়া নাও যায়, একের পর এক। কোনোটাতে থাকে ছই; কোনোটাতে থাকে না। কোনো কোনো সময় ছইয়ের ভিতর নয়া বউ থাকে। বাপের বাড়ী থেকে স্বামী তার বাড়িতে লইয়া যায়; তখন ছইয়ের এপারে ওপারে থাকে বউয়েরই শাড়ী-কাপড়ের বেড়া। স্বামীর বাড়ী থেকে যখন বাপের বাড়ীতে যায়, তখন কিন্তু কাপড়ের বেড়া থাকে না। থাকে না তার মাথায় ঘোমটা। ছইয়ের বাহিরে বসিয়া ঘাটগুলির দিকে চাহিয়া থাকে সে। স্বামীর বাড়ির ঘাট অদৃশ্য না হইলে কিন্তু সে ছইয়ের বাহিরে আসে না।

তারা স্বামীর বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আর বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর বাড়ী যায় অনেক হাসি-কান্নার ঢেউ বুকে লইয়া।

যে-বৌ স্বামীর বাড়ী যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল। এরা সব ভিন্ জাতের বৌ। বামুন কায়েত শুঁগী নানা জাতের। জেলেদের বৌরা জেলে-নৌকাতেই যায়। তারা অত সুন্দরীও নয়। অত তাদের আবরুরও দরকার হয় না। কিন্তু ওরা খুব সুন্দরী। জেলের ছেলেরা কপালের দোষ দেয়। অমন সুন্দর বৌ তাদের জীবনে কোনোদিন আসিবে না। ভালো করিয়া চায় তারা। ভালো করিয়া চাহিতে পারিলে প্রায়ই ছইয়ের ফাঁক দিয়া, বাতাসে শাড়ীটা একটু সরিয়া গেলে, চকিতে তারই ফাঁক দিয়া টুকটুকে একখানা মুখ আর এক জোড়া চোখ চোখে পড়িবে। বৌয়ের অভিভাবক ছইয়ের দুই মুখে গুঁজিয়া দিয়াছে শাড়ীর বেড়া; তাতে বৌকে সকলে দেখিতে পারে না, কিন্তু বৌ সকলকে দেখিতে পায়। মালোর ছেলেকেও দেখিতে পায়। তিতাসের জলে অনেক মাছ। মালোর ছেলের স্ফূর্তি রসাইয়া উঠে। জালের দিকে চোখ রাখিয়া, যেন ওদিকে মোটেই খেয়াল নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া গান গাহিয়া উঠে : 'আগে ছিলাম ব্রাহ্মণের মাইয়া করতাম শিবের পূজা, জালুয়ার সনে কইরা প্রেম কাটি শণের সূতা রে, নছিবে এই ছিল।' বৌ ঠিক শুনিতে পাইবে।

গ্রামের পর খাল। নৌকাখানা হয়ত সেখানে ঢুকিয়া পড়ে। সাপের জিহ্বার মত চকিতে সে-খাল গ্রামখানাকে ঘুরিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। হয়ত আরো দূরে গিয়েছে। আরো কয়েকখানি গ্রামের পাশ দিয়া জের টানিতে টানিতে গিয়া, তারই কোনটাতে বৌকে লইয়া যাইবে। খালের পারেই বাড়ী। ছোট্ট ছেলে-পিলেরা তৈরি হইয়া আছে, বৌকে কি করিয়া চমকাইয়া দিবে। তৈরি হইয়া আছে হয়ত আরও কেউ।

খালটা এইখানে শুকাইয়া গিয়াছে। এইখানে নৌকা হইতে উঠিয়া বৌকে খানিকটা হাঁটিয়া যাইতে হইবে। সে-শিল্পী শান্ত সবুজ সুন্দর রঙ-এ ক্ষেতগুলির বুকে বুকে যে-নক্সা আঁকিয়া রাখিয়াছে তাহারই আল দিয়া বৌকে হাঁটিতে হইবে। তিতাসের তীরে না

থাকার কি কষ্ট। যে-বৌয়ের যাওয়ার বাড়ী একেবারে তিতাসের তীরে, কর্ম-চঞ্চল ঘাটখানাতে তার নৌকা লাগে। দশ জোড়া নারীর চোখের দরদে স্নান করিয়া সে-বৌ নৌকা থেকে নামে। তারপর বাপের বাড়ী হইলে এক দৌড়ে ঘরে ঢুকিয়া ছোট ছোট ভাইবোনদের বুকে চাপিয়া ধরে। আর স্বামীর বাড়ী হইলে পিঠের কাপড় সুদ্ধ টানিয়া তুলিয়া ঘোমটা বড় করে, তারপর আগে-পিছে দুইচারি জন নারীর মাঝখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে জড়িত পায়ে বাড়ীর পথটুকু অতিক্রম করে।

পথটুকু অতিক্রম করিয়া জমিলা বাহির-বাড়ীর মসজিদ-লগ্ন মক্তবের কোণে পা দিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। তার স্বামী মাঝির সঙ্গে তখনও কেরাইয়া নিয়া দর-দস্তুর করিতেছে। লোকটা যেন কি! দুই-এক আনা ফেলিয়া দিলেই মাঝি খুশী হইয়া চলিয়া যায়। বুড়া মাঝি। যা খাটিয়াছে! সঙ্গে মাত্র দুই ননদ। তাও ননদের ছোট সংস্করণ। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভয় করে না বুঝি! লোকটা যেন কি। তাদের আসিতে বলিয়া নিজে আসিতেছে না। বাড়ীর পথে বড় বড় ঘাস। সাপ বাহির হইয়াছে হয়ত। ব্যাঙ্ মনে করিয়া এখনই জমিলার পায়ের বুড়ো আঙুলে যদি ছোবল দেয়!

ছমির মিয়া হিসাবী লোক। কাউকে এক পয়সা ঠকায় না। বেহুদা কাউকে এক পয়সা বেশীও দেয় না। সব কাজ ওজন করে করে। মাঝি হার মানিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলে, ছমিরের মনে অনাহূত একছুপ প্রসন্নতা রং গুলাইয়া দিল। আজ তার কিসের রাত! এ রাতে কেউ কোন দিন মাঝিকে ঠকায়! কেউ যেন না ঠকায়!

মাঝি দশ মিনিট ঝগড়া করিয়া যাহা পায় নাই, এক মিনিট চুপ করিয়া তাহার চারিগুণ পাইল! চক্‌চকে সিকিটা শাদা নদীর খোলসা অল্প-আলোকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া লগিতে ঠেলা দিল।

ছমির কাছে আসিলে জমিলার মনে হইল—এতক্ষণ এতগুলি সাপ তার পায়ের বুড়ো আঙুলদুটিকে ঘিরিয়া কিল্-বিল্ করিতেছিল, এখন সব কয়টা সরিয়া পড়িয়াছে। কি ভাল তার মানুষটি!

কিন্তু তার চাইতেও ভাল একজনকে সে দেখিয়া আসিয়াছে সেই মালোপাড়ার ঘাটে। বড় ভাল লাগিয়াছে তার মানুষটাকে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সেও কি তেমনি ভালবাসে নাই? কেমন অনুরাগের ভরে চাহিয়াছিল। আর, কেমন মানুষ গো! একবার দেখিয়াই মনে হইল যেন কতবার দেখিয়াছি। বেলা ফুরাইতেছে। একটু একটু বাতাস বহিতেছে। আর সেই বাতাসে আমার শাড়ীর বেড়া খুলিয়া গেল, আর তখনই কাকে আমি দেখিতে পাইলাম। যদি না খুলিত, তবেত দেখিতেই পাইতাম না। এমনি, কত লোককে যে আমরা দেখিতে পাই না। অথচ দেখিতে পাইলে এমনি করিয়া আপন হইয়া যাইত। আমরা কাকে আর দেখি? যে দেখাইবার, সে-ই দেখায়! তা না হইলে সে যখন জলে ঢেউ খেলাইয়া কলসী ডুবাইল, ঠিক সেই সময়ে আমার শাড়ীর বাঁধন খুলিল কেন? বর্ষায় আমার বাপ ওদের গাঁয়ে ভিজা নালিতার আটী-বোঝাই নৌকা লইয়া যায়, পাট তুলাইবার জন্য। আবার যখন বাপের বাড়ী যাইব, বাপকে বলিয়া রাখিব, এই রকম এই রকম মেয়েটি, দেখিতে ঠিক আমার মত। তার বাপকে বলিয়া রাখিও আমার মেয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে 'সই' পাতিতে চায়; তুমি রাজি আছ কি না।

আগে যা বলিতেছিলাম।

—এ শিল্পী মহাকালের তাণ্ডব-নৃত্য আঁকিতে পারে না। পিঙ্গল জটার বাঁধন খসিয়া পড়ার প্রচণ্ডতা এ-শিল্পীর তুলিকায় ধরা দিবে না। এ শিল্পী মেঘনা-পদ্মা-ধলেশ্বরীর তীর ছাড়িয়া তিতাসের তীরে আঙিনা রচনা করে।

সে শিল্পী যে ছবি আঁকে তা বড় মনোরম। তীর ঘেঁসিয়া সব ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামের পর জমি। অগ্রহায়ণে পাকা ধানের মওসুম। আর মাঘে সর্ষেফুলের হাসি। তারপর আবার গ্রাম। লতাপাতা গাছ গাছালির ছায়ায় ঢাকা সবুজ গ্রাম। ঘাটের পর ঘাট। সে ঘাটে সব জীবন্ত ছবি। মা তার নাদুস নদুস শিশু ছেলেমেয়েকে চুবাইয়া তুলে। আর বৌ-ঝিয়েরা কলসী লইয়া ডুব দেয়। অল্প একটু দূর দিয়া নাও যায় একের পর এক।.....

এমন যে তিতাস নদী, তাকে না হইলে কি তাদের চলে? কোনো মানুষের চলিতে পারে?

তিতাসের তীরের যারা নয়, তারা হয়ত অত অসুবিধার কথা ভাবিয়া দেখে না। কিন্তু তিতাসের তীরের যারা, তারা ভাবিয়া সারা হয় ওদের চলে কি করিয়া। আমরা হইলে পারিতাম না।

তারা জানে তিতাস একটি নদীর নাম। এ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তারা জানে না। জানিবার চেষ্টা কোনোদিন করে নাই, প্রয়োজন-বোধও করে নাই। নদীর কত ভালো নাম থাকে। মধুমতী, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, সরস্বতী, যমুনা। আর এর নাম তিতাস। সে কথার মানে কোনোদিন অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নদী এ-নামে যত প্রিয়, ভালো একটা নাম থাকিলে তত প্রিয় হইত যে, তার প্রমাণ কোথায়।

ভালো নাম আসলে কি? কয়েকটা আখরের সমষ্টি বৈত নয়। কাজললতা মেয়েটিকে বৈদূর্যমালিনী নাম দিলে আর যাই হোক, এর খেলার সাথীরা খুশী হইবে না। তিতাসের সাথে নিত্য যাদের দেখাশুনা, কোনো রাজার বিধান যদি এর নাম চম্বকবতী কি অলকানন্দা রাখিয়া দিয়া যায়, তারা ঘরোয়া আলাপে তাকে সেই নামে ডাকিবে না, ডাকিবে তিতাস নামে।

নামটি তাদের কাছে বড় মিঠা। তাকে তারা প্রাণ দিয়া ভালবাসে,তাই এর নামের মালা তাদের গলায় ঝুলানো।

শুরুতে কে এই নাম রাখিয়াছিল, তারা তা জানে না। তার নাম কেউ কোনোদিন রাখিয়াছে, তাও তারা ভাবে না। ভাবিতে বা জানিতেও চায় না। এ কোনোদিন ছিল না, এও তারা কল্পনা করিতে পারে না। কবে কোন্ দূরতম অতীতে এর পারে তাদের বাপ পিতামহেরা ঘর বাঁধিয়াছিল একথা ভাবা যায় না। এ যেন চির সত্য, চির অস্তিত্ব নিয়া এখানে বহিয়া চলিয়াছে। চির-যৌবনা উর্বসী মেনকার কথা তারা মহাভারতের কাহিনীতে শুনিয়াছে। তিতাস-তীরবাসী এমন কেউ হয়ত ভাবিতে থাকে : এ সঙ্গী তাদের চিরকালের। হয়ত ভাবে না। তারা জানে এ না হইলে তাদের চলে না। এ যদি না হইত, তাদের চলিতও না। এ না থাকিলে তাদের চলিতে পারে না। জীবনের প্রতি কাজে এ আসিয়া উঁকি মারে। নিত্যদিনের ঝামেলার সাথে এর চিরমিশ্রণ। এ আছে—এই পরম সত্য। এ সত্যের বাইরের কোনোকিছু ভাবা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

জীবনের একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে। কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই। কতকাল ধরিয়া কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়াছে। তার বুকে কত ঘটনা ঘটিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে। কত মানুষ বিশ্রী ভাবে মরিয়াছে—কত মানুষ না খাইয়া মরিয়াছে—কত মানুষ ইচ্ছা করিয়া মরিয়াছে, আর কত মানুষ মানুষের দুষ্কার্যের দরুণ মরিতে বাধ্য হইয়াছে। আবার শত মরণকে উপেক্ষা করিয়া কত মানুষ জন্মিয়াছে। তিতাসও কতকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তার চলার মধ্যে তার তীরে তীরে কত মরণের কত কান্নার রোল উঠিয়াছে। কত অশ্রু আসিয়া তার জলের স্রোতে মিশিয়া গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। কত বুকের কত আগুন কত চাপা বাতাস তার জলে নিবিয়াছে, সান্ত্বনা পাইয়াছে। কতকাল ধরিয়া এ-সব সে নীরবে দেখিয়াছে, দেখিয়াছে আর বহিয়াছে। আবার সে দেখিয়াছে কত শিশুর জন্ম। দেখিয়াছে আর ভাবিয়াছে। ভাবী নিগ্রহের নিগড়ে আবদ্ধ এই অজ্ঞ শিশুগুলি জানে না কত হাসির নামে কত বিষাদ, সুখের নামে কত ব্যথা, মধুর নামে কত বিষ তাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

ওরা কারা? ওরা মালোদের ছেলেরা। আর মালোদের মেয়েরা। ওরা তারা নয় যাদের আছে দেয়াল-ঘেরা বাড়ী, সামনে আছে পুষ্করিণী, পাশে আছে কুয়া, যাদের আঙিনার পার থেকেই শুরু হইয়াছে পথ—সে-পথ গিয়াছে শহরের দিকে, পাশের গাঁগুলিতে একএকটা শাখাপথ ঢুকাইয়া দিয়া। সে পথে ঘোড়ার গাড়ী চলে।

আর, মালোদের ঘরের আঙিনা থেকে শুরু হইয়াছে যত পথ সে-সবই গিয়া মিশিয়াছে তিতাসের জলে। সে-সব পথ ছোট ছোট পথ। পথের এ-মাথা থেকে বুকের শিশু কাঁদিয়া উঠিলে ও-ধার থেকে মা টের পায়। এধারের তরুণীর বুকের ধুক্‌ধুকানি ওধারের নাওয়ের মাচানে বসিয়া মালোদের তরুণরা শুনিতে পায়। এপথ অতি খর্ব। দীর্ঘপথ গিয়াছে মাঝ-তিতাসের বুক চিরিয়া। সে-পথে চলে কেবল নাও। মালোদের মাঝারি আকারের মাছধরার নাও।

তিতাস একটি নদীর নাম। সে সাধারণ একটা নদী মাত্র। কোনো ইতিহাসের কেতাবে, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে এ নদীর নাম কেউ খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা, তার বুকে যুযুধান দুই দলের বুকের শোণিত মিশিয়া ইহাকে কলঙ্কিত করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই?

পুথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার, জাতীয়তায় স্ফীত হইবার, বিভীষণতায় কণ্টকিত হইবার কিংবা বিদ্বেষে বিষায়িত হইবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, আর বৌ-ঝিয়েদের অনেক দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস হয়ত কেউ জানে, হয়ত কেউ জানে না। তবু সে ইতিহাস সত্য। সাল তারিখ লইয়া তর্ক করিবার অবকাশ নাই। ঐতিহাসিকতার অনৈতিহাসিকতা লইয়া সন্দেহ করিবার অবসর নাই। ঐতিহাসিক তথ্যকে মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য, আর মিথ্যা প্রমাণকে সত্যে সাব্যস্ত করিবার জন্য থিসিস লেখারও প্রয়োজণ নাই। সে-সব আয়োজন এখানে গৌণ। মুখ্য কেবল এই কথা যে, এর পারে পারে খাঁটী রক্তমাংসের মানুষের মানবিকতা আর অমানুষিকতার অনেক চিহ্ন আঁকা হইয়াছে। হয়ত সেগুলি মুছিয়া গিয়াছে। হয়ত তিতাসই সেগুলি

মুছিয়া নিয়াছে। কিন্তু মুছিয়া নিয়া সবই নিজের বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। হয়ত কোনোদিন কাহাকেও সেগুলি দেখাইবে না, জানাইবে না। কারো সেগুলি জানিবার প্রয়োজনও হইবে না। তবু সেগুলি আছে। যে-আখর কলার পাতায় বা কাগজের পিঠে লিখিয়া অভ্যাস করা যায় না, সে-আখরে সে-সব কথা লেখা হইয়া আছে। সেগুলি অঙ্গদের মতো অমর। কিন্তু সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ। কে বলে তিতাসের তীরে ইতিহাস নাই!

আর তিতাস-তীরের লোকেরা! তারা শীতের রাতে কতক কতক কাঁথার তলাতে ঘুমায়। কতক জলের উপর কাঠের নৌকায় ভাসে। মায়েরা, বোনেরা আর ভাই-বৌয়েরা তাদের কাঁথার তলা থেকে জাগাইয়া দেয়। তারা এক ছুটে আসে তিতাসের তীরে। ফরসা হইয়াছে। তবে রোদ আসিতে আরও দেরী আছে। নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলের উপর মাঘের মৃদু বাতাস ঢেউ তুলিতে পারে না। জলের উপরিভাগে বাষ্প ভাসে—দেখা যায়, বুঝি অনেক ধোঁয়া। সে ধোঁয়ার নীচে হাত ডুবায়, পা ডুবায়। অত শীতেও তার জল একটু উষ্ণ মনে হয়। কাঁথার নীচের মায়ের বুকের উষ্ণতার দোসর এই মৃদু উষ্ণতাটুকু না পাইলে তারা কি যে করিত।

শরতে আকাশের মেঘগুলিতে জল থাকে না। কিন্তু তিতাসের বুকে থাকে ভরা-জল। তার তীরের ডুবো মাঠময়দানে সাপলা সালুকের ফুল নিয়া, লম্বা লতানে ঘাস নিয়া, আর বাড়ন্ত বর্ষাল ধান নিয়া থাকে অনেক জল। ধানগাছ আর সাপলা সালুকের লতাগুলির অনেক রহস্য নিবিড় করিয়া রাখিয়া এ-জল আরও কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া থাকে। তারপর শরৎ শেষ হইয়া আসে। কে বুঝি বৃহৎ চুমুকে জল শুষিতে থাকে। বাড়তি জল শুকাইয়া গিয়া তিতাস তার স্বাভাবিক রূপ পায়। যে-মাটী একদিন অথৈ জলের নীচে থাকিয়া মাখনের মত নরম হইয়া গিয়াছিল, সে মাটী আবার কঠিন হয়। আসে হেমন্ত।

হেমন্তের মুমূর্ষু অবস্থায় কখন ধানকাটার মওসুম শুরু হইয়া গিয়াছিল। সারা পারেই গ্রাম নাই। এক গ্রাম ছাড়াইয়া আরেক গ্রামে যাইতে মাঝে পড়ে অনেক ধানজমি। জমির চাষীরা ধানকাটা শেষ করিয়া ভারে ভারে ধান এদিক ওদিকের গ্রামগুলিতে বহিয়া নিয়া চলে। তারা তিতাসের ঠিক পাড়ে থাকে না। থাকে একটু দূরে। একটু ভিতরের দিকে। সেখান হইতে মাঘের গোড়ায় আবার তারা তীরে তীরে সর্ষে বেগুণের চারা রোয়ায়। তীরের যেখানে যেখানে বালিমাটীর চর, সেখানে তারা আলুর চাষ করে।

এ মাটীতে সকরকন্দ আলু ফলায় অজস্র। জোবেদ আলীর জোয়ান ছেলেরা ওপারে আলু লাগাইয়া তিন ভাইয়ে এক-সমানে আলী আলী আলী বলিয়া তাদের লম্বা ডিঙিখানা ভাসাইয়া তাতে উঠিয়া পড়িল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হালের চারিজোড়া বলদ ও দুইজোড়া ষাঁড় পার করাইতে হইবে। সে-কাজ করিবে তাদের বাড়ীতে-রাখা মুনীস-দুজনা। এ দুজন ভূমিহীন চাষী। সারা বৎসর তারা জোবেদ আলীর বাড়ীতে জন খাটে। খায় দায়, মাহিনা পায়। সারাদিন ভোর হইতে রাত-অবধি খাটে, রাতের খানিকটা সময় গিয়া নিজেদের বাড়ীতে পরিবারের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আসে। দিনমানে আর দেখা হয় না।

পরিবারেরাও এর বাড়ী ওর বাড়ী ধান ভানিয়া পাট গোটাইয়া কিছু-কিঞ্চিৎ উপায় করে। এইভাবে দিন গুজরায় তারা। কাজেই জোবেদ আলীর ছেলেরা যখন আলী আলী আলী বলিয়া নৌকায় নদী পার হইতে থাকে, মুনীস-দুজনা তখন চারিজোড়া বলদ ও দু জোড়া ষাঁড়ের অনিচ্ছুক দেহমন শীতের জলে নামাইয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া গরুদের ল্যাজে ধরিয়া আল্লা আল্লা—মোমিন বলিয়া সাঁতার দেয়। সকালে এপার হইতে ওপার যাইবার বেলা লাঙল কাঁধে করিয়া সর্ষে ক্ষেতগুলির আলের উপর দিয়া গিয়াছে। তীর-অবধি সর্ষেফুলের হল্‌দে জৌলুষে হাসিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইয়াছিল কে বুঝি তিতাসের কাঁধে নক্সা-করা উড়ানী পরাইয়া রাখিয়াছে। অর্বাচীন গরুগুলি পাছে তাতে মুখ দেয়, তার জন্য কত না ছিল সতর্কতা।

এখন এ-পারে উঠিয়া গায়ের জল মুছিতে মুছিতে চারিদিক আঁধার হইয়া আসে। আঁধারে সব একাকার, গরু কোথায় মুখ দিবে! দিনের শ্রমে শ্রান্ত গরু। আর শ্রান্ত এ দুজন মানুষ সারাদিন অসুরের বল নিয়া ক্ষেতে খাটিয়াছে। এবার বাড়ীতে যাইবে। তাই এত ব্যস্ততা। কিন্তু কার বাড়ীতে যাইবে। তাদের প্রভু জোবেদ আলীর বাড়ীতে। নিজের বাড়ীতে নয়। পাখীরাও এ সময় নিজের বাসায় যায়। তারা যাইবে মনিবের বাড়ীতে। গিয়া, গোয়ালে গরু বাঁধিবে। ঘাস কাটিবে। যাড় দিবে খইল ভূষি দিবে। জোতদার চাষীর বাড়ীতে কত কাজ। এটা সেটা টুকিটাকি কাজ করিতে করিতে হাজার গণ্ডা কাজ হইয়া যায়। প্রকাণ্ড চওড়া উঠান। চার ভিটায় বড় বড় চারিটা ঘর। বাহিরের দিকে গোয়ালসুদ্ধ আর তিন চারিটা ঘর। দড়ি-দোকান হইতে বেড়াবাঁধা পর্যন্ত এই এতবড় বাড়ীতে কত কাজ যে এই দুইজনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। কাজ করিতে করিতে রাত বাড়িয়া চলে। এক সময় ডাক আসে, অ করমালী অ বন্দালী খাইয়া যাও।

খাওয়ার পর কাঁধের গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে পথে নামিয়া বন্দেআলী বলে : ভাই করমালী, নিজে ত খাইলাম মাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক ভাত আজ জুটিয়াছে কিনা কে জানে?

করমালী বলে : বন্দালী ভাই কইছ কথা মিছা না। তোমার ঘরের মানুষ! তোমার আমার ঘরই নাই, তার আবার মানুষ। দয়া কইরা রাইতে থাকতে দেয় থাকি; ফজরে উইঠ্যা মুনিবের বাড়ী গিয়া ঘুমের আলস ভাঙি। ঘরের সাথে এইত সমন্দ। কি খায়, কি পরে কোনোদিন খোঁজ রাখতে পারছি? তা যখন রাখতে পারছি না তখন তোমার আমার কিসের ঘর আর কিসের মানুষ। মুনিবের ঘরই আমাদের ঘর, আর মুনিবের মানুষই আমাদের মানুষ। বন্দে আলী খানিক ভাবিয়া নিয়া বলিল : সবই বুঝি করমালী ভাই। তবু মুনিবের ঘরে পঞ্চ সামগ্রী দিয়া খাইবার সময় ঘরের কথা মনে পড়ে; গলায় ভাত আটকায়। আর খাইতে পারি না। শুনিয়া করম আলী বলিল : আমার কিন্তু তাও মনে পড়ে না। আগে মাঝে মাঝে পড়ত। এখন দেখি, পড়ে না যে, তাই ভাল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বন্দেআলী বলে : সারাদিনের মেহনতে নাস্তানাবুদ হইয়া ঘরে গিয়া দেখি সে ছেঁড়া চাটাইয়ে শুইয়া আছে। ধপ করিয়া তার পাশে শুইয়া পড়ি; ধীরে ধীরে তার একখানা হাত আসিয়া আমার বুকের উপর পড়িয়া যায়। অবশ হাত। আলস্যে শিথিল। সেদিন হাতখানা হাতে করিতে গিয়া দেখি কি শক্ত! কড়া পড়িয়াছে পরের বাড়ীর ধান ভানিতে ভানিতে।

করমালীর বৌ ধান ভানে না। লোকের বাড়ী বাড়ী কাঁথা সেলাই করিয়া দেয়। ইদানিং শীত বাড়িয়াছে। কাঁথা সেলাইয়ের ধূম পড়িয়াছে। তার মোটে অবসর নাই। ডানহাতের সূঁচের ফোঁড় বাঁহাতের আঙুলের ডগায় তুলিতে তুলিতে আঙুলে হাজার কাটাকুটি দাগ পড়িয়াছে। করমালী ঘরে গিয়া দেখে বিছানা খালি। করমালী বলে : বন্দালী ভাই, আমি ছেঁড়াকাঁথায় গা এলাইয়া দিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকি; সে আসে না। সে তখন পরের বাড়ীর কাঁথা সেলাই করে, আর তারই সূঁচের ফোঁড় আমার বুকে আসিয়া বিঁধে। ওদিকে চাহিয়া দেখি চাঁদ উঠিয়াছে। বেহায়া বেলাজা চাঁদ। ভাঙা বেড়া দিয়াও দেখা যায় কেমন ফক্ ফক্ করিয়া হাসে। বন্দেআলীর বুক ছাপাইয়া আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হয়।

কোনোরকমে সেটা চাপা দিতে দিতে বলে : করমালী ভাই আছ ভাল। কাজে-কর্মে থাক, খাও দাও। তার কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে খালি শুইবার সময়। আমার হইয়াছে বিষম জ্বালা। খাইতে বসিতে শুইতে কেবলি মনে হয় তাকে আমি কেবল দুঃখই দিয়া যাইতেছি। একটুও সুখশান্তি দিতে পারিতেছি না। সে তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। অথচ তার প্রতি আমার একটা কর্তব্য ছিল। আমি কি হতভাগা! করমালী নির্বিকার : আমার ভাই অত কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস আসে না! কি ফল আসিয়া! আমি জানি আমরা এক তীর্থের যাত্রী! তুমি আমি বড় মুনিবের কাজ করি, খাই ভাল। তোমার আমার বউ ছোট ছোট মুনিবের কাজ করে ভাল খাইতে পারে না। তুমি আমি ভূমহীন চাষী। পরের জমি চাষ করিয়া দিতে দিতেই জীবন কাবার করিতেছি। আমাদের যদি জমি থাকিত তবে দেখিতে তোমার আমার বৌও আমাদিগকে ঠিক মুনিবের মত দেখিয়া আমাদের ঘরে খাটিতে একদণ্ড ফুরসুৎ পাইত না। বন্দেআলীর মন এই ধরণের চিন্তায় সায় দেয় না! সে ভাবে, করমালীর প্রেমিক মন বড় নিষ্ঠাহীন। তার মতে স্ত্রীর প্রতি প্রেম ভালবাসা এসবের বুঝি কোনো দাম নাই। হাঁ দাম নাই-ই তো। তার মতো ভূমিহীন চাষীর কাছে এসবের কোনো দাম নাই। জীবনে যদি বসন্ত আসে তবেই এসবের দাম চোখে ধরা পড়ে। তাদের জীবনে বসন্ত আসে কই!

আসে বসন্ত। এই সময় মাঠের উপর রঙ্ থাকে না। তিতাসের তীর ছুঁইয়া যাদের বাড়ীঘর, তারা জেলে, তারা মালো; তিতাসে মাছ ধরিয়া তারা বেচে, খায়। তাদের বাড়ীপিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে। বসন্ত তাদের মনে রঙের মাতন জাগায়।

বসন্ত এমনি ঋতু—এই সময় বুঝি সকলের মনেই প্রেম জাগে। জাগে রঙের নেশা। জেলেরা নিজে রঙ মাখাইয়া সাজে—তাহাতেই তৃপ্তি পায় না। যাদের তারা প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাদেরও সাজাইতে চায়। তাতেও তৃপ্তি নাই। যাদের প্রিয় বলিয়া মনে করে তারাও তাদের এমনি করিয়া রঙ মাখাইয়া সাজা'ক তা-ই তারা চায়। তখন আকাশে রঙ, ফুলে ফুলে রঙ, পাতায় পাতায় রঙ। আর রঙ মানুষের মনে মনে। তিতাস চাহিয়া দেখে তার আকাশ বড় রঙীন। তারা তাদের নৌকাগুলিকেও সাজায়। বৌ-ঝিয়েরা ছোট থালিতে আবির নেয়, আর নেয় ধান দূর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকায় যে পুরুষ থাকে সে থালার আবির নৌকার মাঝ-গুড়ায়, আগা-পাছায় নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধান দূর্বাগুলি তর্জনীর আর অনামিকার সাহায্যে

তুলিয়া ভক্তিভরে আবির-মাখানো জায়গা টুকুর উপর রাখে। এই সময় বৌ 'জোকার' দেয়। তার রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। তখন সন্ধ্যা হইবার বেশী বাকী নাই। তখনও আকাশ বড় রঙীন—সেই তিতাসের বুকের আরসীতে যে-আকাশ নিজের মুখ দেখে সেই-আকাশ।

চৈতের খরার বুকে বৈশাখের বাউল বাতাস বহে। সেই বাতাসে বৃষ্টি ডাকিয়া আনে। আকাশে কালো মেঘ গর্জায়। লাঙল-চষা মাঠ-ময়দানগুলিতে যে-ঢল হয়, ক্ষেত উপচাইয়া তার জল ধারাস্রোতে বহিয়া তিতাসের উপর আসিয়া পড়ে। মাঠের মাটী মিশিয়া সে-জলের রঙ হয় গৈরিকপ্রায়। সেই জল তিতাসের জলকে দুই একদিনের মধ্যেই গৈরিক করিয়া দেয়। সেই কাদামাখা ঠাণ্ডা জল দেখিয়া মালোদের কত আনন্দ। মালোদের ছোট ছোট ছেলেদেরও কত আনন্দ! মাছগুলি অন্ধ হইয়া জালে আসিয়া সহজে ধরা দেয়। ছেলেরা মায়ের শাসন না মানিয়া কাদাজলে দাপাদাপি করে। এই শাসন না-মানা দাপাদাপিতে কত সুখ! খরার পর শীতলতার মাঝে গা ডুবাইতে কত আরাম।

কিন্তু সেই যে বর্ষণ শুরু হয়, আর থামে না। নদীর জল সেই যে বাড়িতে শুরু করে, সে-বাড়া আর থামে না। কেবল বাড়িয়াই চলে।

হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহে। নদীর ঘোলা জলে ঢেউ তুলে। সে-ঢেউ জেলেদের নৌকাগুলিকে বড় দোলায়। তার চাইতেও বেশি দোলায় আলুওয়ালাদের নৌকাগুলিকে। সে-নৌকাগুলি ছোট। তাতে আলুর বোঝাই। আকাশের তখন বিরাম-বিশ্রাম নাই। কখন বর্ষণ শুরু হইয়া যায়! জেলেনৌকার ছই আছে। পাছার বৈঠায় যে ধরিয়া আছে তার মাথায় একটা চটের আবরণ। খালি মাথায় যারা দাঁড় টানিতেছিল, সে দুইজন ছইয়ের ভিতর আসিয়া তামাক জ্বালায়। মালসার আগুন সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখে। ভাঙা ছইয়ের কোন্ ফাঁক দিয়া জল চুয়াইয়া পড়িয়া ভিজাইয়া দিবে। তারা ভিজে না। কিন্তু ভিজে আলুর নাওয়ের লোক দুইজন। তারা ভাবে : জেলেনৌকার ওরা চেনা মানুষ; অনেকবার নদীতে দেখিয়াছে মাছ ধরিতে, আবার হাটে দেখিয়াছে মাছ বেচিতে। সেই হাটেই তারা সকরকন্দ আলু বেচিতে রওয়ানা হইয়াছিল। পথে নামিয়াছে ঢল!

ছোট বার হাতি নাও। তাতে কানায় কানায় আলু বোঝাই। বড় বড় আলু। আধসের থেকে একসের এক একটার ওজন। নাওয়ের বাতা প্রায় ডুবে-ডুবে। তার উপর বৃষ্টির জল। এখনি না সেচিতে পারিলে হয়ত কোনো এক সময় টুপ্ করিয়া ডুবিয়া যাইবে। বোঝাই নাও। সেউতি ঢুকে না। কাদির মিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়। শুক্‌নো বাঁশপাতার মাথালটা চিবুক বেড়াইয়া মাথায় আঁটা। তাতে কেবল মাথাটাই বাঁচে। সমস্ত শরীরে লাগে বৃষ্টির অবারণ ছাঁট। মাথালশুদ্ধ মাথা বাঁকাইয়া কাদির তাকায় আকাশের দিকে, আর কাদিরের ছেলে চায় বাপের মুখের দিকে। যখন চারদিক একেবারে শূন্য দেখা যায়, মাথায় কোন বুদ্ধি জোগায় না, বাপ-বেটার তখন সেই সময়ের অবস্থা।

বাপ বলিতে থাকে : অত মেহনতের সাগরগঞ্জ আলু সব বুঝি যায় রসাতলে। ছেলে বলে : বাপ, তুই সাঁতার দিয়া তীরে যা। গরীবুল্লার গাছের তলায় গিয়া জান

বাঁচা। আমার যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যখন দেখুম নাও ডুবৃতাছে, দেমু সব আলু ঢাইল্যা তিতাসের পানিতে। তারপর ডোবা নাও পারে লাগাইয়া তোরে ডাক দেমু। এমন সময় দেখা গেল পরিচিত জেলে নৌকা, সন্ধ্যায় ঘরে-ফেরা সাপের মত তিতাসের দীঘল বুকে সাঁতার দিয়াছে। দুই দাঁড় এক 'কোরা' মচ্ মচ্ ঝুপঝাপ্ করিয়া চলিয়াছে। জল কাটিয়া, ঢেউ তুলিয়া। তার ঢেউ লাগিয়াই বুঝিবা ছোট আলুর নৌকাখানা ডুবিয়া যায়। কাদির ডাকিয়া বলে : কার নাও!

পাছার 'কোরা' হইতে ধনঞ্জয় ডাকিয়া বলে : অ বনমালী, সেউতখান তাড়াতাড়ি বাইর কর্। একটা আলুর নাও খেল্‌তাছে।

চট্ পট্ দু'খানা দাঁড় উঠিয়া গেলে ধনঞ্জয় হাতের কোরা চিত করিয়া চাপিয়া ধরিল। সাপের ফণার মত নাওখানা বাঁ দিকে চির খাইয়া কাদিরের নাও-বরাবর রুদ্ধগতি হইয়া গেল।

ধনঞ্জয়ের বুদ্ধি অপরূপ। আর সে-বুদ্ধি খেলিয়া গেল একান্তই ঠিক সময়ে। একটু দেরী হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইত।

তারপর জেলে-নাওয়ের তিনজন আলু-নাওয়ের দুইজন, পাঁচ জনের হাত চলিল সেলাইকলের সূঁচের মত ফর্ ফর্ করিয়া। দেখিতে দেখিতে জেলে-নাওয়ের প্রশস্ত 'ডরা' এক বোঝাই আলুতে ভরিয়া গেল। আর আলুর নাও খালি হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

কাদিরের মাথার টোকা তখনও সাঁ সাঁ ঝম্ ঝম্ করা বৃষ্টি হইতে তার মাথা বাঁচাইয়া চলিয়াছে। বিপদমুক্তির পরের অবসন্নতা তাকে কাবু করিল। মাচানের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল : মালোর পুত, বড় বাঁচানটাই আজ বাঁচাইলা।

কিন্তু ধনঞ্জয়ের এদিকে কান নাই। সে কাদিরের ছেলের হাতে একখানা সেউত তুলিয়া দিয়া নিজে একটা মোটা দড়ি দিয়া এ নাওয়ের সাথে ও-নাওখানাকে শক্ত করিয়া বাঁধিতে লাগিল। ছেলে দেখিল তার বাপ খোলা আকাশের তলায় জেলেনাওয়ের মাচানের উপর বসিয়া থাকিতে থাকিতে বুঝিবা পড়িয়া যায়। ডাকিয়া বলিল : বাজান, তুই ছইয়ার ভিতরে যা, আমি পানি সেচি।

মালো হোক, জেলে হোক তবু হিন্দু ত। তারা ছইয়ের ভিতর ভাত ছালুনের হাঁড়ি রাখে, মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে খায়। উপকার করিয়াছে। তার উপর যদি ও-সব সে নষ্ট করিয়া দেয় তবে তাদের চিত্তসুখ থাকিবে কি?

এতক্ষণ বৃষ্টি ছিল রিমঝিমে, ছন্দমধুর। সহসা সে-বৃষ্টি ক্ষেপিয়া গেল। মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে সে-বৃষ্টি আকাশ ফাঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। সাঁ সাঁ ঝম্ ঝম্ সাঁ সাঁ ঝম্‌ঝম্ শব্দে কানে বুঝি তালি লাগিয়া যায়। তীর-ভূমি, তীরের মাঠময়দান গাঁ-গেরাম আর চোখে দেখা যায় না। ধোঁয়াটে শাদা আবছায়ায় চারিদিক ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

বনমালী মনে করিয়াছিল তারা তীরে নাও ঠেকাইয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু তীর কোথায় পাওয়া যাইবে। কাছেই তীর; তবু চোখে দেখা যায় না। ধনঞ্জয় ছইয়ের পেছনের মুখ ধাপর দিয়া ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল : বনমালী ভাই, গাঙের দীঘালে নাও চালাইয়া কোনো লাভ নাই। এখানেই পাড়া দে'।

ভারী মোটা একটা বাঁশ জলে নামাইয়া নদীর মাঝখানেই দুই জনে পাড় দিতে দিতে পুতিয়া ফেলিল। তার সাথে শক্ত দড়ি দিয়া নাওয়ের 'কান' বাঁধিয়া ধনঞ্জয় বলিল

: থাক, নাও অখন বাতাসের সাথে সাথে ঘুরুক। কই অ মিয়ার পুত, ছইয়ার তলে গিয়া বও।

কাদির মাথা ঢুকাইতে ঢুকাইতে থামিয়া গেল দেখিয়া বনমালী বলিল : ছইয়ার তলে কিছু নাই, ভাত বেজুন সব খাওন হইয়া গেছে।

পাঁচজনেরই ভিজা গা। আর, পাঁচজনেই তারা গতরওয়ালা। সঙ্গে একাধিক কাপড় নাই যে বদলায়। ছোট ছইখানার ভিতরে তারা গা ঠেকাঠেকি করিয়া বসিয়া রহিল। কাদিরের ভিজা চুল এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, আর শাদা দাড়ী হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছে বনমালীর কাঁধের উপর। কাদির এক সময় টের পাইয়া হাতের তালুতে বনমালীর কাঁধের জল-বিন্দুগুলি মুছিয়া দিল। বনমালী ফিরিয়া চাহিল কাদিরের মুখের দিকে। বড় ভাল লাগিল তাকে দেখিতে। লোকটার চেহারায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে যাত্রাবাড়ীর রামপ্রসাদের সঙ্গে। তারও মুখময় এমনি শাদা সোনালী দাড়ী। এমনি শান্ত অথচ কর্মময় মুখভাব। রামায়ণ মহাভারতে পড়া বাল্মিকী ও অন্যান্য মুনিঋষিদের যেন রামপ্রসাদ একজন উত্তরাধিকারী।

আর এই কাদির মিয়া? হাঁ তার মনে পড়িতেছে। সেবার গোকনের বাজারে মহরমের লাঠি-খেলা হয়। বনমালী দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাদেরই গাঁয়ের একজন মুসলমানের সঙ্গে পথে তার দেখা হয়। তারই মুখে কারবালার মর্মবিদারক কাহিনী শুনিতে শুনিতে বনমালী প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। এর সঙ্গে আরও শুনিল তাদের প্রিয় পয়গম্বরের কাহিনী। সেজন বীরত্বে ছিল বিশাল; কিন্তু তবু তার আপনজনকে বড় ভালবাসিত। কাদির যেন সেই বিরাটেরই একটুখানি আলোর রেখা লইয়া বনমালীর কাঁধে দাড়ী ঠেকাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বনমালীর বড় ভাল লাগিতেছে।

বাস্তবিক, যাত্রাবাড়ীর রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া—এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটাঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে; আবার দাড়ীর নীচে প্রশান্ত বুকটায় মুখ গুঁজিয়া, দই হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেও ধমক দিবে না, কেবল অসহায়ের মত পিঠে হাত বুলাইবে। বনমালীর চোখ সজল হইয়া উঠে। তার বাপও ছিল এমনি একজন। কিন্তু সে আর নেই। একদিন রাতের মাছধরা শেষে ভিজা জাল কাঁধে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। পথের মাঝে তুফানে গাছ-চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

ছইয়ের বাহিরে বাঁশের 'মাচাল'গুলিতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া ভাঙিয়া চৌচির—শতচির হইয়া পড়িতেছে। নৌকার বাহিরে যতদূর চোখ যায় সবটাই তিতাস নদী। তার জলের উপর বৃষ্টির লেখা-জোখাহীন ফোঁটাগুলি পাথরের কুচির মত তরলতায় গিয়া বিঁধিতেছে আর তারই আঘাত খাইয়া ফোঁটার চারি-পাশটুকুর জল লাফাইয়া উঠিয়া পড়িতেছে। হাওয়া নাই, জলে ঢেউ নাই। তবু নদীর বুকময় আলোড়ন। আর একটানা ঝা ঝা ঝিম্ ঝিম্ শব্দ। ছইয়ের সামনের দিক খোলা। এদিক দিয়া বাতাস ঢোকে না বলিয়া জলের ছাঁটও ঢোকে না। যে দিক দিয়া ঢুকিবার, সে পিছনের দিক। সেদিক বন্ধ আছে। কাদিরের চক্ষু ছিল নৌকার বাতার বাহিরে, যেখানে কোন সুদূর হইতে তীরের বেগে ছুটিয়া আসা ফোঁটাগুলি তীরের মতই তিতাসের বুকে

বিঁধিয়া আলোড়ন জাগাইতেছে। বনমালী তার গামছাখানা খানিক বৃষ্টির জলে ধরিয়া রাখিয়া, চিপিয়া জল নিংড়াইয়া কাদিরের হাতে দিয়া বলিল : নেও বেপারী, গতর মুছ। কাদির সস্নেহে তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল : বনমালীকে নিতান্ত ছেলেমানুষটির মত দেখাইতেছে, অথচ মালোর বেটার দেহের মাংসপিণ্ড কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বেপার আমার বংশের কেউ করি নাই বাবা। চরের জমিতে আলু করছি। হইছেও অঢেল। শনিবারে শনিবারে গোকনের হাটে গিয়া বেচি। বেপারীর কাছে বেচি না। বড় দরাদরি করে আর বাকী নিলে পয়সা দেয় না।

মাছ-বেপারীরাও এই রকম। জাল্লার সাথে মুলামুলি কইরা দর দেয় টেকার জাগায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।—বনমালীর কথা থামিয়া গেল। পূরণ করিল ধনঞ্জয় : এই জন্যই জাল্লার ছেলের লেংটি শুকায়না। বেপারী পিন্ধে লেস্ পাইরের ধুতি।

কাদিরের সামনে ধনঞ্জয়ের এই উপমা দেওয়াটা বনমালীর মনঃপুত হইল না। এই অর্থের আর একটা ভাল উপমা তার মনে পড়িল। তাহা এই : জাল্লার পেট উনা আর বেপারীর কানে সোনা। কিন্তু তখন আর ইহা বলিবার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নাই।

কাদিরের দৃষ্টি সামনের দিকে, যেখানে বৃষ্টির বেড়াজালে আর-সব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল : কি ঢল্ নামছে রে বাবা, গাঁও-গেরাম মালুম হয় না। তাহার তামাক খাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। এই সময়েই অন্তর্যামী বনমালী নামক ছেলেটা তামাকের ব্যবস্থায় হাত দিল। বাঁশের চোঙার এক দিকে টিকা, আর এক দিকে তামাক রাখার ব্যবস্থা। কাদিরের ছেলে এইবার ভাবনায় পড়িল।

সে যখন আরও ছোট ছিল, তখন বাপের সঙ্গে গ্রাম গ্রামান্তরের কত বামুন কায়েতের বাড়ীতে দুধ বেচিতে গিয়াছে। দশবারটা গাই দোয়ান হয়। অত দুধ দিয়া তারা কি করিবে। তা ছাড়া, চাষার হাতে ধান থাকে চাল থাকে, হলুদ লঙ্কা সব থাকে, থাকেনা কেবল কাঁচা টাকা। পাট বিক্রীর মওসুমে অনেক টাকা আসে। কিন্তু সেটাকা থাকে না। সারা বছরের মহাজনী ঋণ, জমিদারের খাজনা, ঘরতোলার খরচ, হালের যন্ত্রপাতি কেনা ও মেরামতির খরচ এসব ব্যাপারে ব্যয় হইয়া যায়।

সেইজন্য তার বাপ মোটা পাচনের দুই দিকের সিকায় দুধের ঘটী ঝুলাইয়া দুপুর বেলা এক পাক ঘুরিয়া আসে। সেও কতদিন তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কত বামুন কায়েত তার বাপকে চেনে। বাড়ীর ঘাটা দিয়া যাইতে দেখিলে তারা ডাক দিয়াছে : অ কাদির দুধ দিয়া যাও। তারা কাদিরের দুধ পাইলে আর কারো দুধ কিনেনা, কেননা, কাদির মাপে বেশি দেয় তবু কম দেয় না; আর জল মিশাইবার কথাত উঠেই না, বরং যে-গুলি কাঁচি গাই, সে-গুলির দুধ বাড়ীতে রাখিয়া যে-সব গাই ঘন দুধ দেয় কেবল সেগুলি দোয়াইয়াই বেচিতে আসে! কারণ, কাদিরের খরিদদার সব বামুন কায়েত। তারা কত বড়; সমাজের তারা শিরোমণি।

খালি হিন্দুসমাজেরই নয়, মুছলমানরাও তাদের কথা শুনে। তারা তার বাপকে আদর করিয়া ডাকিয়া বসায়। নিজেরা চেয়ারে বসিয়া চাকরের নয় তো ছেলেপুলের হাতে ঘরের আঁধার কোনে নয়তো উঠানের কোণে আবর্জনার সহিত ফেলিয়া রাখা একখানা ধূলিধূসর তক্তা আনাইয়া মুখে মিষ্টি ঢালিয়া দিয়া বলে : বস বস কাদির বস।

তামাক খাও। তাদের নিজেদের হাতে কারো রূপা-বাঁধানো, কারো তেলকুচ্‌কুচে কালোহীরার মত মসৃণ উজ্জ্বল 'ডাবা'। কাদিরের জন্য বাহির করিয়া দেয় মাচার তলায় হেলান দিয়া রাখা সরু খামচাখানেক আকারের খেলো হুকা।

কাদির আলাপী মানুষ। বলিতে যেমন ভালবাসে শুনিতেও তেমনি ভালবাসে। আলাপে মজিয়া গিয়া লক্ষ্যই করেনা কোথায় বসিল আর কি হাতে লইল। ফুঁ দিয়া ধূলা উড়াইয়া হুকার মুখে মুখ লাগায়। তার বাপ মাটীর মানুষ, তাই অমন পারে; সে কিন্তু পারিত না। তবু ওরা বড় লোক। যে ব্যবধান ওরা রচনা করিয়া রাখিয়াছে তার ও-পার হইতে আলাপ করিয়া আসিয়া পথের প্রান্তে আসার আগেই ভুলিয়া যাইতে হয়। তেলে আর পানিতে যেমন কোন দিন মেশে না, তাদের সঙ্গেও তেমনি কোনোদিন মেশবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এরা জেলে। চাষার জীবনের মতই এদের জীবন। জীবন থেকে এদের ঝাড়িয়া ফেলা যায় না। উঁচু বলিয়া মানের ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না এদের উপর; বরং সমান বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেই ভাল লাগে। কাটিলে কাটা যাইবে না, মুছিলে মুছা যাইবে না, এমনি যেন একটা সম্পর্ক আছে জেলেদের সঙ্গে চাষাদের। বনমালী তামাক সাজার আয়োজন করিতেছে। নিজের হুকায় সুখের টান দিয়া, সে যদি কল্‌কে-খানা খুলিয়া তার বাপের দিকে হাত বাড়ায়, সে তখন কি করিবে! বড়লোকের হাতের অপমানে চটা যায়, কিন্তু সমান লোকের হাতের অপমানে চটা যায় না, খালি ব্যথার ছুরিতে কলিজা কাটে।

এই ঘনঘোর বাদলের মাঝখানে বসিয়া মাথা বাঁচাইতে বাঁচাইতে কাদির হয়ত বনমালীর হুকা-বিচ্যুত কলিকাখানি খুশী মনেই হাতে লইত। কিন্তু বনমালী মালসায় হাত দিয়া দেখে জলে ছাঁট লাগিয়া মালসার আগুনটুকু নিবিয়া গিয়াছে।

তামাক খাওয়া আর হইল না। অসতর্ক বনমালী নিজে না খাইতে পারিয়া যত না অপ্রসন্ন হইল, তার অধিক অপ্রসন্ন হইল কাদিরকে খাওয়াইতে পারিল না বলিয়া। মালসাটা আগে থেকে সাবধানে না রাখিয়া কি বোকামিই সে করিয়াছে!

বৃষ্টি ততক্ষণে একটু ফিকা হইয়া আসিয়াছে। নদীর তীর এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; তবে নদীতীরের ঘরবাড়ী ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে গাছগুলি তারা জলকণার ধোঁয়াটে যোগাযোগের চাপ ভেদ করিয়া মাথা জাগাইয়া দিয়াছে। এইবার হাটের কথা কাদিরের একান্তভাবে মনে পড়িয়া গেল। নদীর পারে হাটের ঘাট। আগে হইতে জায়গা না রাখিলে ভাল জায়গা পাওয়া মুশ্‌কিল। ভাল রোখের জায়গায় বসিলে ভাল বিক্রী হয়। ভাল জায়গায় না বসিতে পারিলে বিক্রী হয় না; শেষে সন্ধ্যাবেলা পাইকারের নিকট জলের দরে মাল খালাস করিয়া আসিতে হয়। অবিক্রিত আলুর বোঝাই তো আর ফিরাইয়া আনা যায় না। ফিরাইয়া আনিয়া লাভও নাই; কেন না, কাল সকালে ক্ষেতে গিয়া লাঙল ঢুকাইলেই অজস্র আলু-সব মাটীর উপর মাথা জাগাইবে।

বৃষ্টি থামিলে দেখা গেল, দুইখানা নৌকাই জলে প্রায় বোঝাই হইয়া গিয়াছে। নগ্ন নৌকা। যত বৃষ্টির জল পড়িয়াছে, সবই নৌকাতে আটক হইয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিয়া দিতে হইল না। বনমালী বড় নৌকায় আর কাদিরের ছেলে ছোট নৌকায় সেউতি লইয়া কাজে লাগিয়া গেল। দুই জোয়ান মানুষের কব্জির জোরে ডুবো-নৌকা

হাল্কা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এইবার জেলে-নৌকা থেকে কাদিরের নৌকায় আলু তুলিয়া দিবার পালা। সে নেহাৎ কম হাঙামা নহে। আগেই বনমালী বলিয়া ফেলিল : আলু এ নাওয়েই থাকুক। দুই নাওই ত হাটের যাত্রী। হাটে গিয়া এ-নাও থেকে আলু হাটে বহিয়া তুলিলেই চলিবে।

দুইখানা নৌকা কাছাকাছি থাকিয়া পাশাপাশি চলিতে লাগিল মমতায় সুনিবিড় দুটি ভাইয়ের মত। জমিবার মুখে হাটে পৌঁছার জন্য উভয়েরই সমান তাড়া; অথচ কারোর কাউকে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা নাই।

মোহাম্মদী : শ্রাবণ ১৩৫২

২. রামধনু

গাঙের মোচড় ঘুরিতে বাজার দেখা গেল। একটু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখন চারিদিক ফর্সা। কিন্তু রোদ উঠে নাই। আকাশের কোনো কোনো দিক গুমোটে আচ্ছন্ন। মনে হয় কোথায় কোথায় যেন এখনও বৃষ্টি হইতেছে। এক একবার দমকা হাওয়া আসে। ঠাণ্ডা লাগে শরীরে। মেহনতের সময় এই বাতাস গায়ে বড় মিঠা লাগে। নাও একেবারে তীর ঘেঁসিয়া না চলিলেও, তীরের গাছ-গাছড়ার সবুজ ছায়া কাদিরের নাওয়েরা ধমকে জলের ভিতর কাঁপিয়া মরিতেছে। ছায়াগুলি এত কাছে থাকিয়া কাঁপিতেছে, আর কাদিরের ছেলের বৈঠার আঘাত খাইয়া ভাঙিয়া শতটুকরা হইয়া যাইতেছে।

নদীর এ বাম তীর। দক্ষিণ তীর ফাঁকা। গ্রাম নাই, ঘর বাড়ী নাই, গাছ-গাছড়া নাই। খালি একটা তীর। তীর ছাড়াইয়া খালি জমি আর জমি। অনেকদূর গিয়া ঠেকিয়াছে ধোঁয়াটে কতকগুলি পল্লীর আবছায়ায়। সেই খোলা মাঠ বাহিয়া বাতাস আসে, নদী পার হইয়া লাগে আসিয়া এপারের গাছগুলির মাথায়। কাদির পাছার বৈঠা গায়ের জোরে আড় করিয়া ধরিতে ধরিতে বলে : বাপরে বাপ, বাতাস যেন ঝেটাইয়া নাওয়েরে তীরে নিয়া ঠেকাইতে চায়! তার ছেলে তখন গলুইয়ে বসিয়া দুই হাতে বৈঠা মারিয়া চলিয়াছে।

কপালের ঘাম মুছিবার জন্য বৈঠাখানা থামাইতে গিয়া হাটের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। ফাঁকা হাট। কয়েকখানা নাও ঘাটে লাগিয়াছে। ঢালু পারের বুক-চিতানো ভিটার মত বাজার-ঘাটাতে মানুষের আনাগোনা শুরু হইয়াছে মাত্র।

দেখতে-না-দেখতে নাওয়ে-মানুষে পিপড়ার মত জাঙাল বান্ধে, না পারি নাও ভিড়াইতে, না পারি আলু উঠাইতে। ঘর আর দিনের এই অবস্থা। আর আজ দেখ্তেছি হাঁটের পরথম আমরা। মালোরা বড় ভাল মানুষ বা'জান। হাটের পথে যাইতে ত পারতামই না, আইজ এরা না থাক্‌লে জানে-মালে হয়ে পড়তাম।

কাদির কোন জওয়াব না দিয়া পাশের নাওখানাকে আর বনমালি ধনঞ্জয়দিগকে একবার দেখিয়া লইল।

ছোটবড় দুইটি নাওই একসঙ্গে গিয়া হাটের মাটিতে ধাক্কা খাইল।

পশ্চিম হইতে সোজা পূবদিকে আসিয়া এইখানটায় নদী একটা কোণ তুলিয়া দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই কোণের মাটী বাজারের 'টেক'। তারই পূব দিয়া

একটা খাল গিয়াছে সোজা উত্তর দিকে সরল রেখার মত। সেই খালের পারে বাজারটা দুই পাশে ঢেউ টিনের ঘরের লম্বা গলি হইয়া গোদারাঘাট পর্যন্ত প্রসারিত। তারপর একটা সড়কের পাশ ধরিয়া পূব-উত্তর দিক দিয়া চলার পর মাঠ-ময়দান ভাঙিয়া সে খাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে গিয়া নদীর সঙ্গে মিলিয়াছে। সে খালটাকে বলে গোকনের খাল, আর তিতাসের এই বাঁকের কাছাকাছি পর্যন্ত অংশটাকে বলে গোকনের গাঙ্। গ্রামটার নাম গোকন বলিয়া তার হাটটার নাম হইয়াছে গৌকনের বাজার।

নদীর বাঁক থেকে খালটা গিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় নদী চলিতে চলিতে এখানে দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরাইয়াছে আর উত্তরদিকে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে তার মাথার লম্বা বেণীটা।

সেই খালের পূব পারে একটা পল্লী। নাম আমিনপুর। একদিকে কয়েকটা পাটের আফিস, আরেক দিকে কতকগুলি ঘরবাড়ী গাছ-গাছালি। খালের এপারে হাট বসিতেছে, আর ওপারের গাছ-গাছালির মাথার উপর দিয়া আকাশে উঠিয়াছে একটা রামধনু। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পূবের আকাশে কণাকণা বৃষ্টির আভাসে ঝাপসা একটা ঠাণ্ডা ছায়া লাগানো। পশ্চিমের সূর্যের সাত রঙ পূবের আকাশের মেঘলার ফাঁদে ধরা পড়িয়া গিয়া উঠাইয়া দিয়াছে এই রামধনু।

মাত্র ঘণ্টা দুই আগে যে বৃষ্টি হইয়াছে তেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি হইতে খুব কমই দেখা যায়। নাওয়ে থাকিয়া ততটা বোঝা যায় না। বাড়ীতে থাকিলে দেখা যাইত ঘরের চালের ঝম্‌ঝম শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে; চাল বাহিয়া পড়া একটানা বৃষ্টির জলে ছাঁইছে লম্বা এক সারি গর্ত হইয়া গিয়াছে। কোথায় কোন নালা আটকাইয়া গিয়া উঠান জলে ভাসিয়া গিয়াছে, তুলসীতলার উঁচু মাটিটুকু বাদে ভিটার নীচের সবটুকু জায়গা ডুবিয়া গিয়াছে; উঠানের কোণে অযত্নে যে-সব দূর্বাঘাস গজাইয়াছিল, সেগুলি জলে সাঁতার কাটিতেছে। কচুবন বেতঝোপগুলির দিকে মাটী থাকে ঢালু; আর ঝুপঝাড়ের ভিতরে থাকে ডোবা। উঠানের জল সেগুলির দিকে প্রাণপণে ছুটিয়াও কিনারা করিতে পারিতেছিল না এতক্ষণ। কারণ সেদিকে যত জল সরিতেছে, আকাশ ফাটিয়া উঠানে পড়িতেছে তার চাইতেও অনেক বেশি জল। নৌকায় থাকিয়া তারা কিই বা দেখিয়াছে। জলে জলে মিতালি হইয়াছে। আকাশের জল নদীর জলে পড়িয়া এক হইয়া গিয়াছে এইত। তবু কাদির একবার বলিয়া ফেলিয়াছিল : এমন খাড়া-ঢল কোনোদিন দেখি নাইরে বাবা।

খালটা শুকনো ছিল। আজিকার ঢলে মাঠময়দান ভাসিয়াছে, হাল-দেওয়া ক্ষেতগুলির ভাঙা ভাঙা মাটী ঢলে গুলিয়া গিয়া কাদা হইয়াছে। সেই কাদা-গোলা জল আল উপছাইয়া পড়িয়াছে আসিয়া খালে। শতদিক হইতে শত বাহু যেন বাড়াইয়া দিয়া ক্ষেতেরা খালের দৈন্যদশা প্রাচুর্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খালে তখন উজানের ঠেলা। যে-খাল আগে নদীর জল টানিয়া নিয়া কোনোরকমে শুকনো গলা ভিজাইয়া রাখিত, আজ সে খাল আলোড়িত, কল্লোলিত, বিগলিত, উল্লসিত, উথলিত হইয়া, স্রোত বাঁকাইয়া ঢেউ খেলাইয়া বুক ফুলাইয়া তার ভরা বুকের উপচানো জল তিতাসের বুকে ঢালিয়া দিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সে দেওয়া এখনও থামে নাই। এখনও ধারায় ছুটিয়া আসিতেছে সেই কাদাগোলা জল। কাদিরের পিপাসা হইয়াছিল। আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দেখে অর্ধেক তার মাটী। বনমালী দেখিতে

পাইয়া দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল : থুইয়া দেও, খাইতে পারবা না। খালের জলে গাঙের জলেরে খাইছে। মালো-পাড়ায় আমার কুটুম আছে। আলু তোলার পর নিয়া যামু তোমারে।

কি কুটুম? সাদি সমন্ধ কর্‌চ না কি?

না। ভইন বিয়া দিছি!

বনমালীর সাহায্য পাইয়া কাদিরের সব আলু একদণ্ডের মধ্যে হাটে গিয়া উঠিল। চারিদিকে ছড়াইয়া না পড়ে এইজন্য কাদিরের ছেলে জলো-ঘাসের ন্যাড়া বানাইয়া আলুর গাদার চারিপাশে গোল করিয়া বাঁধ দিল। সেই বাঁধ ডিঙাইয়া দুই চারিটা ছোট ছোট আলু এ-পাশে ও-পাশে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। আর সেগুলি মালিকের অধিকারের বাইরে মনে করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পড়িয়া ধরিতেছিল কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভিখারীর ছেলে নয়; কিন্তু দেহের আকারে, বসনের অপরিচ্ছন্নতায় ও অপ্রাচুর্যে এবং অস্বাভাবিক কাঙালপনায় সেগুলিকে মনে হইল যেন ভিখারীর বাড়া। ইহারা সবখানেই আছে; সব দেশে, সব গাঁয়ে, আর সব গাঁয়ের বাজারে। কাদিরেরা যারা আলু বেচিতে আসে তারা অমন দুই চারিটা আলুর জন্য ইহাদিগকে ধমক দেয় না, কিছু বলেও না। তাদের কত আলু, নিক না দুইচারিটা এই সব দুঃখীর ছেলেপিলে। পয়সা দিয়া ত কিনিতে পারে না। কিন্তু ধমক দেয় বেপারীরা। আলুতে হাত দিলে চড়-চাপড় মারে, আলু কাড়িয়া নেয়; শুধু তাদের থেকে নেওয়া আলু নয়, অপর জায়গা থেকে সংগ্রহ করা আলুও কাড়িয়া নেয়, বেপারীরা। আর ছোট ছোট কচি গালগুলিতে মারে ঠাস করিয়া চড়। চড় খাইয়া উহারা চীৎকার করিয়া কাঁদে না, গাল-মুখ চাপিয়া ধরিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়ে আরও মার খাওয়ার ভয়ে। কেবল যখন তাদের নিজের সঞ্চয় সুদ্ধ কাড়িয়া নেয়, কাকুতি করিয়া ফল হয় না, অনুরোধ করিলে উল্টা গাল খায় মা-বাপ সম্পর্কিত অশ্রাব্য ভাষায়, তখন কেবল অনুচ্চকণ্ঠে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদে। কাদির এ হাটে অনেক আলু বেচিয়াছে আর অনেক দিন হইতে ইহাদিগকে দেখিয়া আসিতেছে। বছরের পর বছর ইহারা আলু কুড়াইয়া চলিয়াছে, কতক মরিয়াছে, কতক বড় হইয়া সংসারে ঢুকিয়াছে না হয়ত পুঁজিদার কারবারী নয় তো, জমি-মালিক মজুর-খাটানে বড় চাষীর গোলামী করিয়া জান প্রাণ খুয়াইতেছে।

কাদিরকে ইহারা আর চিনিতে পারিবেনা, কাদিরও ইহাদের কাউকে সামনে দেখিলে ঠাহর করিতে পারিবে না। কিন্তু তার বেশ মনে পড়ে, হাটের মাটিতে আলু ঢালিতে গিয়া ইচ্ছা করিয়া দশটা-বিশটা আলু এইসব কৃপা-প্রার্থীর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এখনও দিতে কৃপণতা করে না। হাটে এই প্রথম আলু উঠিয়াছে দেখিয়া এই খুদে ডাকাতের দল সবগুলি জোট পাকাইয়া আসিয়া এইখানে মিলিয়াছে। কারো হাতে ন্যাক্‌ড়া একখানা ছোট থোলে; পুরানো কাপড়ের লাল নীল পাড়ের সুতা দিয়া অপটু হাতের সূঁচের ফোঁড়ে তৈয়ারী করিয়াছে। কারো হাতে মালসা মতন একএকটা ভাঙা ছোট হাঁড়ি; কারো বা কোচড়মাত্র সার।

কি ভাবিয়া সহসা কাদির কল্পতরু হইয়া উঠিল। তাহার হয়ত ইচ্ছা হইয়াছিল ওদের হাতে হাতে অনেকগুলি আলু যেন বিলাইয়া দেয়। কিন্তু সাবালক বড় ছেলে সামনে। কি মনে করিবে। বিক্রী করিতে হাটে আসিয়াছে, খয়রাত-করিবার কোন মানে হয় না। ইচ্ছা করিয়া খুশী মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঘাসের বাঁধ উপচাইয়া

কতকগুলি আলু চারিপাশে ছড়াইয়া দিল ওদের জন্য। ছেলের দৃষ্টি এড়াইল না : না করলাম বোয়ানি না করলাম সাইত; তুমি বাপ অখনই এভাবে দিতে লাগ্‌চ। কাদির অজুহাত পাইল সঙ্গে সঙ্গেই : কাটা আলু খরিদ্দারে নেয় না, বাছাবাছি কইরা থুইয়া রাখে। দিয়া দিলাম, কাট আর পচা চাইয়া। ছেলে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল : কিন্তু সাইত কলাম না। কাদির দিল-খোলা ভাবে হাসিয়া বলিল : করলাম সাইত এই এতিম ছাইলা-মাইয়ার হাতেই পরথম। খাইয় দোয়া করব। আল্লা বড় বাচান বাচাইছে আইজ। কাদিরের এই কাজকম্ম বনমালীর খুব ভাল লাগিতেছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত সে কাদিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাদির বনমালীর দিকে চাহিয়া তার ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া বলিল : বড় আভাইগ্যা এরা। কারোর মা নাই বাপ নাই, লাথী ঝাঁটা খায়; কারোর মা আছে, কিন্তুক দানা দিতে পারে না ছাইলার মুখে! মা থাইক্যাও নাই। কারোর বাপ আছে মা নাই। লোকে কয় মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু।

তামাক জ্বালাইয়া আনিয়াছিল। টিকায় ফু দিতে দিতে বনমালী বলিল : একজনের যে মা মরছে, চোখের সামনে দেখ্‌তাছি।

কাদিরের দৃষ্টি পড়িল ছেলেটার দিকে। লম্বা, কৃশ; জিরজির করিতেছে। শিশুমুখেও মলিনতার ছাপ বেয়াড়া রকমে স্পষ্ট। দলের বাহিরে দাঁড়াইয়া বড় বড় চোখ দুইটি মেলিয়া রাখিয়াছে কাদিরের মুখের উপর। আর-আর ছেলেরা কাড়াকাড়ি করিয়া হরির লুটের বাতাসার মত আলু ধরিতেছিল,আর নীরবে দাঁড়াইয়া আশাপূর্ণ মনে কামনা করিতেছিল কাদির বুড়ার মনের একটুখানি ছোঁয়া। যেন তাকে দেখিতে পাইলে আর ছেলেদের থেকে আলাদা করিয়া শুধু তার একার জন্য বুড়া করুণার ধারা বহাইয়া দিবে। এ যেন তার দাবী। চিরদিনের নিভরতা মাখানো এই দাবী দুনিয়া যদি পূর্ণ করে তবে ভালো কাজ করা হইবে, যদি না করে তো না করিবে, সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এখান থেকে চলিয়া যাইবে।

কাদির দুই মুঠা আলু তুলিয়া তার চোখের দিকে চাহিয়া একদিকে সরিয়া আসার ইঙ্গিত করিল। তার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। স্বচ্ছ আবদেরে হাসি; কিন্তু বড় ম্লান। সর্বাঙ্গে মাতৃরিষ্টির ধ্বজা ধারণ করিয়া সে ছিল নীরবে দণ্ডায়মান। কাদিরের ডাকে সে সহসা আগাইয়া আসিল না। তা কি অযাচিত দান প্রত্যাখ্যানের ভব্যতা?—আরে নে ছোড়া, আগাইয়া ধর; তা নইলে ওরা নিয়া যাইব।

ছেলেটা আদরে গলিয়া গিয়া ঘাড় নীচু করিল, তারপর ঘাড় ঘুরাইয়া অর্থহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল, আর চাহিল মাথা তুলিয়া একবার সামনের, খাল পারের, আমিনপুর গ্রামের উপরের পূব আকাশের দিকে। কাদিরের অযাচিত দানের ধনগুলি তখন তার পায়ের কাছে মাটিতে লুটাইতেছে। আর সেই যে সে আকাশের দিকে চাহিল, একভাবে চাহিয়াই রহিল, মাথা আর নামাইতে পারিল না। কাদির তার চাওয়ার বস্তুর খোঁজে তাকাইল, কিছু বুঝিতে পারিল না। বনমালী তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল আমিনপুরের গাছ-গাছালীর মাথার উপর দিয়া আকাশে রামধনু উঠিয়াছে। ছেলেটা তারই দিকে চাহিয়া আছে অবাক বিস্ময়ে। কোনোদিন আর দেখে নাই যেন।

অ, ধেনু উঠ্ছে। তাই দেখ্তাছে। বলিল বনমালী। জেলে সে। জেলেরা আর চাষীরা জল আর মাটী চষিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশের নীচে। উদয়ের মাধুরী আর অস্ত যাওয়ার লালচে মিটমাট কোনোদিন তাদের কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু তারা কি সেসব কখনো চাহিয়া দেখিয়াছে? দেখিয়াছে কেবল দুপুরের খরাটাকে, যখন মাথার উপর আগুনের মত আসিয়া পড়িয়াছে তখন। শীতে শরতে সকালে বিকালে আকাশের গায়ে খামচা খামচা কত রঙীন মেঘ ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে সূর্য চোখ মেলিলে তার বিপরীত দিকের আকাশে জাগিয়াছে কতদিন কত রামধনু। তারা কি কোনোদিন তাহা চাহিয়া দেখিয়াছে? হয়ত দেখিয়াছে। কিন্তু নূতন কিছু লাগে নাই চোখে। উঠে, মিলাইয়া যায়। চাহিয়া থাকিয়া দেখিবার কিছু নাই রামধনুতে। শিশুরা মায়ের কোলে থাকিয়া সন্ধ্যার আকাশে, চাঁদ দেখিয়া হাসে, হাততালি দেয়। কই বনমালীরা তো কোনোদিন চাঁদের দিকে চাহিয়া হাসেও নাই হাততালিও দেয় নাই।

কাদির মিয়াদের ঈদের চাঁদ দেখিবার কত আগ্রহ কত আনন্দ আর পুণ্যের বাণী লইয়া আকাশের এক কোণে উঁকি দেয় রমজানের চাঁদ। একফালী দুর্বল, প্রভাহীন চাঁদ–চাঁদের কণা বলিলেই চলে। কিন্তু সে চাঁদ যখন বড় হইয়া আকাশে সাঁতার কাটে তখন তো কই তারা চাহিয়াও দেখে না। তেমনি রামধনু দেখিবে বালকে, দেখিবে এই বোকা অর্বাচীন ভিখারী ছেলেটা। দেখুক সে রামধনু; আর এদিকে তার পায়ের কাছে থেকে ছড়ানো আলুগুলি আর আর ছেলেরা কুড়াইয়া নিয়া যাক।

বনমালীর ইচ্ছা হইল আলুগলি কুড়াইয়া দেয়। কিন্তু নাবালকের দেখাদেখি রামধনুর দিকে চাহিয়া সেও নাবালক হইয়া গেল। সত্যইত, রামধনু দেখিতে অত সুন্দর। তার বোনটি যখন ছোট ছিল, সেও একদিন তেমনি করিয়া রামধনুর দিকে চাহিয়া ছিল। কিন্তু সে অমন বোকার মত সব ভুলিয়া চাহিয়া থাকে নাই। হাতে নূতন দুগাছা কাচের চুড়ি কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাই বাজাইয়া হাততালি দিতেছিল আর একটা ছড়া কাটিতেছিল : রামের হাতে ধনু, লক্ষণের হাতে ছিলা, যেখানের রামধনু সেখানে গিয়া মিলা।

মেয়েদের ধারণা, এই মন্ত্র পড়িলে রামধনু মিলাইয়া যাইবে। বোনটিকে কতদিন ধরিয়া দেখিতে যাওয়া হয় নাই। এই গাঁয়েই তার বিবাহ হইয়াছে। এই হাটের অল্পদূরেই তার শ্বশুরবাড়ী। কাদির মিয়া খাইবার জন্য জল তুলিয়াছিল নদী হইতে। ঘোলা বলিয়া খাইতে পারে নাই। তাকে লইয়া গেলে হয়। একটা উপলক্ষ থাকিবে যে, অতিথ মানুষকে জল খাওয়াইতে আসিয়াছি। এ ছাড়া খালি হাতে যাওয়া যায় না। বোনের বাড়ী। একটা কিছু লইয়া যাইতে হয়। একটা কিছু লইয়া যাওয়ার সুযোগ হয় না বলিয়াই না এতদিন তাকে দেখিতে আসিতে পারে নাই। শাশুড়ী আছে ননদ আছে, যদি নিন্দা করে; তাদের বউকে যদি খোঁটা দেয়। খুঁচিয়ে-কথা বোনটি সহিতে পারে না। কিন্তু কি সুন্দর রামধনুটি!

বিরাট আকাশের ধনু। আকাশের দুই কোণ ছুঁইয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে। মোটা তুলির যেন সাত রঙের সাতটি পোচ। রঙগুলি সব আলাদা আলাদা, আর কি স্পষ্ট! পিছনের আকাশ হইতে খসিয়া যেন আগাইয়া আসিয়াছে। যত অস্পষ্টতা যত আবছায়া অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, দিক উজ্জ্বল করিয়া বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে এই রামধনুটা। কি উজ্জ্বল বর্ণ! কি স্নিগ্ধ আর সামঞ্জস্যপূর্ণ তার রঙের ভাঁজ। কোন্ কারিগর না জানি এই

রঙের ভাঁজ করিয়াছে। চোখে কি ভালো লাগে; কি ঠাণ্ডা লাগে। কোথায় ছিল এতক্ষণ লুকাইয়া! কোথাও তো ছিল না। এখন কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল! চাঁদসুরুজের দেশ এটা। তারা নিত্য উঠে, নিত্য অস্ত যায়। পশ্চিমে ডুবিয়া ঘুমাইয়া থাকে, আবার সকালে পূবে উদয় হয়। কিন্তু রামধনু থাকে কোথায়। বড় একটা ত দেখা যায় না। অনেকদিন পর দেখা যায় একদিন উঠিয়াছে। কতদিন ঘুমায় এ। কুম্ভকর্ণের মত! উঠিবারও তাল-বেতাল নাই। ইচ্ছা হইলে একদিন উঠিলেই হইল!

কিন্তু, কি বড়! বোন ঠিকই বলিয়াছিল তার ছড়াতে—রামের হাতেরই ধনু এটা। যে-ধনু অমন যে রাক্ষস, দশমাথা কুড়ি হাতের রাক্ষস,—জোর করিয়া সে ধনু তুলিতে গিয়া তারও মুখে রক্ত উঠিয়াছিল। রামায়ণের বইয়ের সে কথা বনমালী শুনিয়াছে সীতার বিবাহের পালা গানে ছুটা-কীর্তনিয়ার মুখে। শেষে রাম তাকে হাতে তুলিয়া নেয়। হরধনু না কি বলিয়াছিল—তাই রামের হাতের ধনু। কিন্তু সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত! তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল। রাম তাকে নিয়া অযোধ্যাতে আসিল তারপর সীতা আর বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। নাঃ, বোনটাকে দেখিতে যাইতেই হইবে। কতদিন তাকে নেওয়া হয় নাই।

কতক্ষণ পরে রামধনু মিলাইয়া গেল আকাশে। কিন্তু রাখিয়া গেল অনন্তর মনে একটা স্থায়ী ছাপ। কোনোদিন দেখে নাই। মায়ের কাছে গল্প শুনিয়াছিল : মানুষের অগম্য এক দ্বীপ-চরে এক জাহাজ নোঙর করিয়াছিল। খাইয়া দাইয়া লোকগুলি ঘুমাইয়াছে, অমনি চারিদিক কাঁপাইয়া ধপাস ধপাস শব্দ হইতে লাগিল। আকাশ হইতে পড়িল কয়েকটা দেও-দৈত্য। এরা ছাড়াও আরও কত কিছু আছে, যারা মানুষ নয়; মানুষের মধ্যে, মানুষের বাসের এই দুনিয়ার মধ্যে যাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। দেওদৈত্য তো ভয়ের জিনিষ। কত ভালো জিনিষও আছে তাদের মধ্যে। সকলেই তারা এই আকাশেই থাকে। এই যেমন চন্দ্র, সূর্য, তারা। তাহারাও আকাশেই থাকে; নিত্য উঠে, নিত্য নামে, দেখিতে দেখিতে চোখে প্রায় পুরানো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেরই রহস্য ভেদ এখনও করা হয় নাই। অলৌকিক রহস্যভরা অনন্তর আকাশ-ভুবন। আজও তাদেরই একটা অদেখা রহস্যজনক বস্তু তার চোখের সামনে নামিয়া আসিয়াছিল পিছনের অনেক দূরের আকাশ হইতে, অদেখার কোল হইতে একেবারে নিকটে, আমিনপুরের জামগাছটার প্রায় মাথার কাছাকাছি।

বনমালীর মন হইতেও কল্পনার রামধনু মুছিয়া গেল; কেউ বুঝি নামাইয়া দিল তাকে বাস্তবের মুখে। ছেলেটার গায়ের রঙ ফর্সা। কিন্তু খড়ি জমিয়া বর্ণলালিত্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। একচিলতা সাদা মাঠা-কাপড় কটিতে জড়ানো। আর একচিলতা কাঁধে। বিঘৎ পরিমাণ একখানা কুশাসন ডানহাতের মুঠায় ধরা। নৌকা গড়িবার সময় তক্তায়-তক্তায় জোড়া দেয় যে দুইমুখ সরু, চ্যাপ্টা পাতাম-লোহা দিয়া, তারই একটা দুইমুখ এক করিয়া কাপাস সূতায় গলায় ঝুলানো। পিতামাতা মারা যাওয়ার পর মাসাবধি হবিষ্য করার সন্তানের এই সমস্ত প্রতীক।

বনমালী দরদী হইয়া বলে : তর নাম কি রে?

অনন্ত।

অনন্ত কি?

অনন্ত।

অনন্ত যুগী, না পাটনী, না নাপিত, না মালী? নামের সঙ্গে জাতের পরিচয় দিতে হয় মালোর ছেলে বনমালীর এ খেয়াল আছে।

অনন্ত এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না।

জীবনে কোনো-কিছু দেইখ্যা অভ্যাস নাই বুঝি?

অনন্ত বুঝিতে পারিল না প্রশ্নকর্তা কি বলিতে চায়।

তর মা মরছে না বাপ মরছে? গলায় ধড়া ঝুলে যে!

মা।

তর কে কে আছে আর?

মাসী।

আর্?

অনন্ত মলিন মুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল, তার এক মাসী ছাড়া আর কেহ নাই।

কোন্ পাড়ায় বাড়ী তর্?

আঙুল দিয়া অনন্ত মালোপাড়া দেখাইয়া দিল।

জাতে তুই মালো? আমাদের স্বজাতি?

অনন্ত ভালো করিয়া কথাটা বুঝিল না। আবছা ভাবে বুঝিল, তার মাসীর মত, এও তারই একটা কেউ হইবে। তার না হইরে অত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন?

তর্ বাড়ীতে যামু—নিয়া যাবি আমারে?

গলার ধড়ার সূতাটা দাঁতে কামড়াইতে কামড়াইতে ঘাড় কাৎ করিয়া অনন্ত জানাইল : হাঁ নিয়া যাইবে।

বাজার জম্ছে। চল তরে লইয়া বাজারটা একবার ঘুইরা দেখি।

বাজারের তখন পরিপূর্ণ অবস্থা। কাদিরের 'দোকানের'র চারিপাশে অনেক আলুর দোকান বসিয়া গিয়াছে। গণিয়া শেষ করা যায় না। ক্রেতাও ঘুরিতেছে অগণন। হাতে খালিবস্তা লইয়া তাহারা দরদস্তুর করিতেছে আর কিনিয়া বস্তাবন্দী আলু মাথায় তুলিয়া ভিড় ঠেলিয়া বাজারের বাহির হইতেছে। একটানা একটা কলরব শুরু হইয়া গিয়াছে। কাছের মানুষকে কথা বলিতে হইলেও জোরগলায় বলিতে হয়, আর বলিতে হয় কানের কাছে মুখ নিয়া। এমনি জীবন্ত এই কলরব। নদীর ঢেউগুলি যেমন অফুরন্ত, এই কলরবও তেমনি অফুরন্ত। যতক্ষণ হাট চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ এই কলরবও চলিতে থাকিবে।

কাদির বড় এক পাইকার পাইয়াছে। খুচরা বিক্রিতে ঝামেলা। অবশ্য দর দুই চারি পয়সা করিয়া মণেতে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু মণামণি হিসাবের বিক্রি তার চাইতে অনেক ভাল। আগেভাগে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়া যায়। এদিকে অনন্তর সঙ্গীরা অন্যান্য কৃপাপ্রার্থীর দল বয়স্কদের ভিড়ে আর ঠেলাঠেলিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া হাট ঘন হইয়া জমার মুখেই সরিয়া পড়িয়াছে। অনন্ত চাহিয়া দেখে সচল, চঞ্চল এক জনসমুদ্রের মধ্যে সে একা। চারিদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। খালি গা, হাতে কোন একটা কিছু আছেই। লাঠী না হয় ঝুড়িচুপড়ি না হয় খালি বস্তা। ব্যস্ততার শেষ নাই। এখনি কারবার চুকাইয়া ফিরিতে পারিলে যেন বাঁচে, কিন্তু অত ব্যস্ততার মাঝেও মূলামূলি করিতেছে। হয় পছন্দ হওয়ার অভাবে, নয় তো দরদস্তরে না মিলার দরুণ দোকান

হইতে দোকানে ফিরিতেছে। বিরাট কর্মচঞ্চল মানুষের এক সীমাহীন সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ আছে, গর্জন আছে, আর আছে বাহির হইতে না পারার দুর্ভেদ্যতা। বালক অনন্তর ইচ্ছা করে বনমালীর একখানা হাত ধরিতে।

কাদির শক্তহাতে দাড়িপাল্লা হাতে করিল, একদিকে চাপাইল দশসেরী বাটখেরা, আর একদিকে ডুবাইয়া তুলিল আলু। তারপর মুখে তুলিল কারবারীদের বাঁধা একটা হিসাবের গৎ; আর লাভে রে লাভে রে লাভে রে লাভে, আরে লাভে! আর দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে–আরে দুয়ে–আর তিনে রে তিনে রে তিনে রে তিনে তিনে, আরে তিনে–আর .....

বেচাবিক্রি চুকাইয়া কাদির বলিল : বাবা বনমালী, যাইও একবার বিরামপুরে, কাদির মিয়ার নাম জিজ্ঞাস করলে হালের গরুতে অবধি বাড়ী চিনাইয়া দিবে। যাইও।

যার নাম মেছুহাটা। এদিকে জলের কিনারা, আর ওদিকে মূল বাজারের কিনারা–সবটা জুড়িয়া মাছের হাট বসিয়াছে। মাঘ ফাল্গুন মাসে জল আরও দূরে ছিল। মাছের হাটও সরিয়া গিয়াছিল তখন আরও নীচে জলের কাছে। উপরের দিকে তখন জমিত ক্ষীরার হাট। কাদিরেরা ক্ষেতের ক্ষীরায় নোকা বোঝাই করিয়া আনিয়া তুলিত। আজ যেমন আলু তুলিয়াছে। তারও উপরে একদিকে একটা উঁচু ভিটা মতন খালি যায়গাতে তখন বসিত নাপিতের হাট। বনমালী সেইদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। সেখানে আজ একজন নাপিতও বসিয়া নাই। বসিয়াছে শুঁটকীর হাট। বর্ষার তাড়নায় জল বাড়ার আভাস পাইয়া নাপিতেরা এ জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছে, আগে ভাগে উঁচু জায়গা দেখিয়া ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। কোথায় তারা যায় এই সময়, তাও সকলেরই জানা। বাজারের উত্তর শিরায় একটা খালি ভিটামতন উঁচু জায়গা আছে। বর্ষার জলে কখনো ডুবায় না। বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ধনঞ্জয়কে বলিল : গাঁয়ের নাপিতে চুল ছাঁটে না যেন কচু কাটে। আর হাটের নাপিতে চুল কাটে না যেন রাঁন্দা দিয়া পালিশ করে। নাওয়ে থাইক্য, চুল কাটাইতে গেলাম।

গুণ-টানা নৌকার মতন বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছে। এই বাজারের ভিতর দিয়া অনন্ত রোজ দুই-চারিবার করিয়া হাঁটে। কিন্তু ভরা হাটের বেলা সে কোনোদিন এখানে ঢুকে নাই। আজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এক জায়গায় বসিয়াছে পানের দোকান। দোকানের পর দোকান। বড় বড় পান গোছায় গোছায় ডালার উপর সাজানো। কাছে একটা হাঁড়িতে জল, দোকানীরা বার বার হাত ডুবাইয়া জল পানের উপর ছিটাইয়া দিতেছে, আর যত বেচিতেছে পয়সা সেই হাঁড়িটার ভিতর ডুবাইয়া রাখিতেছে। বনমালী খুব বড় দেখিয়া এক বিড়া পান কিনিয়া অনন্তর হাতে দিল। হাতে লইয়া অনন্তর চোখ জলে ভরিয়া আসিতে থাকে। বনমালীকে বুক খুলিয়া শুনাইতে চায় : হাটের দিন দুপুরের আগে এই দোকানীটা নৌকা হইতে পান তুলিয়া ভাঁজ করিতে বসে। একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পানের গোছা হাতে করিয়া তার মধ্য হইতে পচা আধা-পচা পানগুলি ফেলিয়া দেয়। আমি থাকি আর থাকে আমারি মত অন্যান্য ছেলেরা। মা কোন দিন পয়সা দিয়া পান কিনিয়া খাইতে পারে নাই। তার চারিপাশ থেকে পচা পান কুড়াইয়া মাকে গিয়া দিয়াছি। মা কত খুশী হইয়াছে। একদিন আমি তিতাস হইতে তাকে এক হাঁড়ি জল তুলিয়া দিয়াছিলাম। তারপর দেখিয়াছি পচা পান তো দিলই, সামান্য একটু দাগী হইয়াছে, একটু ছিঁড়িয়া ভাল পানের সঙ্গে

মিশাইয়া দিলে কেহ ধরিতে পারিবে না, এমন পানও আমার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে, আর আমি ধরিয়াছি। কিন্তু এখন আর আমার মা নাই। এই রকম ভাল ভাল পান ফেলিয়া দিবার কিছুদিন আগে একদিন মা মরিয়া গেল। মাসী পান বড় একটা খায় না। দিলেও খুশী হয় না, না দিলেও রাগ করে না। মাসীর মা খায়–দিলে খুশী হয় না, না দিলে মারে।

কিন্তু এ সকল কথা এ লোকটাকে কি বলা যায়। মোটে একদিনের দেখা। আর দোকানিটা নিশ্চয়ই আমাকে মনে রাখিয়াছে। তার চারপাশে কত ঘুরিয়াছি। মনে কি আর রাখে নাই? সব সময়ই তো মনে ভাবিয়াছে এ ছেলেটা খালি পচা আধ পচা পানই নিবে। ফেলিয়া দেওয়া পান। কোনদিন পয়সা দিয়া কিনিতে পারিবে না। আজ সে দেখুক তার ডালার সব চাইতে দামী পানের বড় একটা গোছা তার হাতে। রীতিমত পয়সা দিয়া কেনা!

সুপারীর গলি হইতে বনামলী কিছু কাটা সুপারীও কিনিল।

আরেক জায়গায় কতকগুলি গঞ্জির দোকান। মলাটের বাক্স খুলিয়া মাটির উপর বিছানো চটে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বুকে ফুলকাটা একটা গঞ্জি কিনিল বনমালী। গলা হইতে বুক পর্যন্ত বোতামের এলাকায় লম্বা একটা সবুজ লতা, তাতে লালফুল ধরিয়াছে। এতক্ষণ খালি গা ছিল। এবার নূতন গঞ্জিতে বনমালীকে রাজপুত্রের মত মানাইয়াছে বলিয়া অনন্ত মনে মনে আন্দাজ করিল। আর লতাটা কত সুন্দর!

আরও সুন্দর বাজারের এদিকটা। মাঝ খানে পায়ে চলার জায়গা খালি রাখিয়া দুইপাশে তারা পসরা সাজাইয়াছে। চলতি কথায় ইহাদিগকে বেদে বলে, কিন্তু সাপুড়ে নয়। অত্যন্ত লোভনীয় তাদের দোকানগুলি। একধারে অনেকগুলি কোমরের তাগা। পোষমানা সাপের মত শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কতক কালো, আর কতক, হল্‌দে লালে মিশানো। মাথায় এক একটা জগজগার টোপর। একদিকে এলাইয়া রাখিয়াছে কতকগুলি আর্‌সী। একদিকে নানা রঙের ও নানা আকারের সাবান। আর এক খানে পুঁতির মালা, রেশমীর ও কাঁচের চুড়ি। আরও অনেক কিছু। এক একটা দোকানে এত সামগ্রী। বনমালী পাশে বসিয়া দুইতিনটা সাবানের গন্ধ শুঁকিয়া বলিল, জলেভাসা সাবান আছে? আছে শুনিয়া গন্ধ শুঁকিয়া দর করিয়া রাখিয়া দিল। কাঁচের চুড়ির মধ্যে তিন আঙুল ঢুকাইয়া মাপ আন্দাজ করিল, তারপর রাখিয়া দিল। কিনিল না। কিনিল খালি কয়েকটা বড়সি। এক কোণে কতকগুলি বাল্যশিক্ষা নব-ধারাপাত বই। অনন্ত ইত্যবসরে বসিয়া পাতা উল্টাইতে শুরু করিয়া দিল। দুইটা গরু নিয়া এক কৃষক চাষ করিতেছে ছবিটাতে চোখ পড়িতে না পড়িতে দোকানি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। অনন্তর আর দেখা হইল না।

নাপিতদের সেই উঁচু ভিটিখানাতে গিয়া দেখা গেল কতক নাপিতের হাতের কাঁচি চিরুণির উপর দিয়া কাচুম কাচুম করিয়া বেদম চলিয়াছে, আর কতক নাপিত ক্ষুর কাঁচি চিরুণী এবং নরুণ লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাথায় অগোছাল লম্বা চুল দেখিয়া বনমালীর উদ্দেশ্য তারা বুঝিল। বুঝিয়া নানা জনে নানা দিক হইতে তাহাকে ডাকিতে লাগিল। অনন্তর মাথার চুলও বেশ লম্বা হইয়াছে, কিন্তু তাহার গলায় ধড়া দেখিয়া কেহ তাহাকে ডাকিল না।

চুলকাটা শেষ করিয়া দেখে, বেলা ডুবিয়া গিয়াছে। নাপিত একখানা ছোট আয়না বনমালীর হাতে তুলিয়া দিল, কিন্তু তার ভিতর দিয়া তখন কিছুই দেখা যায় না। অপ্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িল বনমালী। আবার অনন্তকে হাতে ধরিয়া বাজার-সমুদ্র পার করিয়া ঘাটের কিনারায় আনিল। হাট তখন ভাঙিয়া পড়িতেছে। ধনঞ্জয় একছালা গাব, দুইটা বাঁশ, সপ্তাহের মত হলুদ লঙ্কা লবণ জিরা মরিচ কিনিয়া তৈরী হইয়া আছে। বনমালী মনে মনে বলিল, আজ আর ও-পাড়ায় যাইব না। রাত হইয়া গিয়াছে, আর একদিন আসিলে যাইব। প্রকাশ্যে বলিল : এই ছেলে তুই আমার নৌকায় যাবি? আমি নদীনালায় খালেবিলে জাল নিয়া ঘুরি, মাছ ধরি মাছ বেচি, নাওয়ে রান্ধি, নাওয়ে খাই, নাওয়ে ঘুমাই। সাতদিনে একদিন বাড়ী যাই। তুই আমার নাওয়ে যাবি?

অনন্ত ঘাড় কাত করিয়া জানাইল, হাঁ যাইব।

তবে চল।

অনন্ত নৌকায় উঠিবার জন্য জলে নামিল।

আরে না না, তোরে অখন নিমু না। তোর বাড়ীতে কে আছে, না জিগাইয়া নিলে, তারা মারামারি করতে পারে।

অনন্ত ঘাড় দুলাইয়া বলিতে চাহিল, না কেহ মারামারি করিবে না।

না না ছোড়া, তুই বাড়ী যা।

অনন্ত জোর করিয়া নাওয়ের গলুই আকড়াইয়া ধরিল।

ধনঞ্জয়ের ধমক খাইয়া বনমালী নৌকায় গিয়া উঠিল, কিন্তু ছেলেটার জন্য তার বড় মায়া লাগিল। অন্তত তাকে বাড়ীতে আগাইয়া দিয়া আসা উচিত। এতক্ষণ সঙ্গে করিয়া ঘুরাইয়াছে।

ধনঞ্জয় লগি ফেলিয়া ঠেলা মারিল, অনন্তর ছোট দুইখানা হাতের বাঁধন ছিন্ন করিয়া গলুই ডানদিকে ঘুর-পাক খাইল এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের মাঝে কোথায় চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না। বুকভরা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অনন্ত ডাঙায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চারিদিক অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু বাড়ীর পথ তার চেনা। ভয়-ডরেরও কিছু নাই। তবু সে যেন দেহে মনে নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছে। পা যেন তার বাড়ীর দিকে চলিতে চায় না। বনমালীর শেষ কথা কয়টি রহিয়া রহিয়া তার কানে বার বার বাজিয়া উঠিতে লাগিল। তুই অখন বাড়ী যা। তোদের পাড়া আমি চিনি। আমার বোন বিয়া দিয়াছি তোদের পাড়াতে। আবার আমি আসিব। কোন ভাবনা করিস না তুই। আবার আমি আসিব!

তুমি বলিয়াছিলে আবার আসিবে, কিন্তু কখন আসিবে! আমার যে আর বাড়ীতে যাইতে পা চলিতেছে না! কখন তুমি আসিবে!—ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত বাড়ীর উঠানে পা দিল।

একটা পরিচিত গলার আওয়াজের আশঙ্কা করিতেছিল, শীঘ্রই সেটি শোনা গেল : তেলে-মরা বাতির মত নিম-ঝিম করে, মরেও না পথও ছাড়ে না। আজ ত নিখোঁজ দেইখ্যা মনে করছিলাম, বুঝি পেরেতে ধরছে, অখন দেখি চান্দের ছটার মত হাজির! ইচ্ছা হয় পোড়া কাঠ মাথায় মাইরা খেদাইয়া দেই, তুইল্যা দেই ডাকিনী যোগিনীর মুখে—মুখপুড়ী মাইয়া আমার কাল করছে।

সুবলার বৌ বাসন্তী একটু আগে নদীর পাড় হইতে খুঁজিয়া আসিয়া কাজে হাত দিয়াছিল। কিন্তু হাতে কাজ উঠিতেছিল না। দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল : কি কও গো মা তুমি। মা মরা ছেইলা, হাতে আগুন মুখে হবিষ, ষাইট ষাইট, তুমি কি সব কথা কও। শত্তুর তো এমন কথা কয় না।

শত্তুর শত্তুর। ও আমার শত্তুর। ও অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম। মরুক মরুক।

সুবলার বউ এবার রণচণ্ডী হইয়া উঠিল : ও মরবে কোন দুঃখে, তার আগে আমি মরি, আমি ঘরের বাইর হই!

মা নরম হইয়া বলিল : অখন আর কিছু করলাম না। দেমু একদিন চেলাকাঠ পিঠে মাইরা খেদাইয়া।

মাসী শুইয়া শুইয়া অনন্তকে আজ কতকগুলি নূতন কথা শুনাইল : মা যদি মরিয়া যায়, তবে সে মা আর মা থাকে না, শত্তুর হইয়া যায়। মরিয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, ছেলেকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সব সময়েই তার লক্ষ্য থাকে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত একমাস তো খুব ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়। তার আত্মা তখন ছেলের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না। একা পাইলে, কিংবা আঁধারে, কি বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, কিংবা নদীর পারে পাইলে, কাছে কেউ না থাকিলে লইয়া যায়। নিয়া মারিয়া ফেলে!

সেই রাত্রিতে অনন্ত মাকে স্বপ্ন দেখিল। মা কতকগুলি ছেঁড়া কাথায় জড়াইয়া কোথা হইতে আসিয়া খালের পাড়ে হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছে। অনন্তকে যে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কই মারিয়া ফেলিবার মত জিঘাংসা, ক্রোধ কিছুইত তার মধ্যে নাই, মা চাহিয়া আছে তার মুখের পানে বড় করুণ চোখে, বেদনায় কি মলিন মার মুখখানা! হাঁ, মা নিয়া যাইতে চায়; কিন্তু মারিয়া ফেলিবার জন্য নহে, কাছে কাছে রাখিবার জন্য। মার জন্য বড় করুণা জাগিল অনন্তর মনে।

হবিষ সাজাইতে সাজাইতে অনেক বেলা হইয়া যায়। কচি ছেলে। ক্ষুধায় আরও নেতাইয়া পড়ে। সুবলার বউ সবই বুঝে। কিন্তু কিছু করিবার নাই তার। বিধবা সে। বাপের সংসারে গলগ্রহ হইয়া আছে। তার উপর রক্তমাংসের সম্পর্কের লেশ নাই এমন একটা মা-মরা হবিষ্যের ছেলেকে আনিয়া ঝঞ্ঝাট পোহাইতেছে। শুধু কি নিজে ভুগিতেছে। বাপ-মাকেও ভুগাইতেছে। তার বাপ রাতে জাল বাইস করিয়া সকালে বাড়ী আসে। এক ঝাঁকা মাছ আনে। কাটিয়া কুটিয়া কতক জালের তলায় রোদে দিতে হয়, কতক ধুইয়া হাঁড়িতে চাপাইতে হয়। মা কেবল হুকুম চালাইয়া খালাস। এত সব করিয়া বাপকে খাওয়াইলে, তবে বাপ ঠাণ্ডা হয়; তারপর তার পয়সায় তারই হাতে বাজার হইতে কিছু আলো চাল আর দুই একটা কলা আনাইতে পারা যায়। সে চাল দিয়া সুবলার বউ মালসায় জাউ রাঁধিয়া দেয়। কলার খোল কাটিয়া সাতখানা ডোঙা বানায়। তাতে জাউ আর কলা দিয়া তুলশীতলার কাছখানটাতে সারি সারি সাজায়। অনন্ত স্নান করিয়া আসিয়া তাতে জল দেয়। সরিয়া পড়িলে কাকেরা আসিয়া উহা ভক্ষণ করে। যেদিন কাক আসে না, সেদিন অনন্ত ডোঙা হাতে করিয়া আ আ করিয়া ডাকিয়া

বেড়ায়—তারা বলিয়াছে, মা নাকি কাকের রূপ ধরিয়া আসিয়া অনন্তর দেওয়া জাউ-কলা খাইয়া যায়। অনন্ত যাহা কিছু শোনে, কিছুই অবিশ্বাস করে না। যে কাকগুলি খাইতে আসে, একদৃষ্টে তাদের দিকে অনন্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখে—এর মধ্যে কোন্‌টা তার মা হইতে পারে! এখন আর মানুষ নয় বলিয়া কথা বলিতে পারে না, কিন্তু খাইতে খাইতে ঘাড় তুলিয়া চাহিতে দেখিয়াছে—বোধ হয় এইটাই আমার মা! কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিল না, খাওয়া শেষ না করিয়াই এক ফাঁকে উড়িয়া গেল!

অনন্তর কথাগুলি শুনিয়া ঘাটের নারীদের কেউ কেউ হাসিল, কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অনন্ত খোলের ডোঙাগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সেগুলি হাতে লইয়াই ডুব দিয়া স্নান করিল। তারপর মাটীর ছোট একটি ঘড়াতে জল ভরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। একজন স্ত্রীলোক তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল। বলিল : তাইলে, তোর মা কাউয়া হইয়া আসে?

হাঁ, আসে।

খাওয়া শেষ না করিয়া উড়িয়া যায়!

হাঁ, বেশীক্ষণ থাকে না—পাছে আমি তার সঙ্গে কথা বলিতে চাই। যারা মরিয়া যায়, তারা ও ত জীয়ন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলিতে পারে না। সেজন্য কথা শুনিতেও চায় না, মনে মনে বুঝিয়া চলিয়া যায়।

মা যখন বাঁচিয়া ছিল, অনন্ত সব সময়ে মার জন্য গর্ব অনুভব করিয়াছে। মার তুলনায় নিজেকে ভাবিয়াছে অকিঞ্চিৎকর। মা মরিয়া গিয়া লোকের কাছে যেন অনন্তর মাথা হেট করিয়া দিয়া গিয়াছে। এমন মার ছায়ায় ছায়ায় থাকিতে পারিলে অনন্ত যেন অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করিতে পারিত। এখন, মা নাই, তার যে আর কিছুই নাই; লোকের কাছে এখন তার দাম কানাকড়িও না। সে এখন মরিয়া গেলে কারো কিছু হইবে না। কেউ তার কথা মুখেও আনিবে না। কিন্তু মা? একমাস হইতে চলিল, মরিয়াছে, এখনও তার কথা কি কেউ ভুলিতে পারিয়াছে? ঘাটে জমিলে মেয়েরা তার মার কথা আলোচনা করে; দুঃখ করে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিশেষ করিয়া অনন্তকে দেখিলে তারা তখন তখনই তার মার কথা শুরু করিয়া দেয়। মার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অনন্তর বুক ভরিয়া উঠে!

ঘাটে আসিয়া যে-বধূটি সকলের চেয়ে বেশি দেরী করে, বেশী কথা বলে, আর কথায় কথায় ছড়া কাটে, দুনিয়ায় তার পরিচয় দিবার উপলক্ষ্য মাত্র দুইটি—এক সাদকপুরের বনমালীর বোন বলিয়া, আর দুই লবচন্দ্রের বউ বলিয়া। তবে এখানে প্রথমোক্ত নামে তার পরিচয় বেশী নাই, শেষোক্ত নামেই সে মালোপাড়ায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কথার মাঝে মাঝে সুন্দর ছড়া কাটিতে পারে বলিয়া সকল নারীরা তাকে একটু সমীহ করে; সে যেন দশজনের মাঝে একজন। শ্রাদ্ধের দিন অনেক নারী দেখিতে আসিল। সেও আসিল।

নাপিত আসিয়া অনন্তর মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসন-খানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখান সেই নারীর কথামত নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায়

পুতিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুরোহিত চাউলভরা পাঁচটি মালসাতে মন্ত্র পড়িয়া অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করতঃ একটা সিকি ট্যাকে গুজিয়া চলিয়া গেলে, সেই স্ত্রীলোকটি তাড়া দিল: ভাত বাড়ানের কি বেবস্থা! কড়া ডিগা মানুষ। ভুখে মরতেছে!

সুবলার বউর একহাতে সব কাজ করিয়া উঠিতে দেরী হইল। তবু সে পরিপাটি করিয়া পাঁচটি ব্যঞ্জন রাঁধিল। অনন্ত এক স্থানে বসিয়া পড়িয়াছিল। তার মাসীর মা খেঁকাইয়া

উঠিল : নিষ্কম্মা গৌসাই, আরে আমার নিষ্কম্মা গৌসাই, একটা কলার খোল কাইট্যা আন্‌তে পারলি না! মরণ, মরণ!

সেই নারী প্রতিবাদ করিল : চিরদিন গালি দিও মা, আইজের দিনখান সইয়া থাক। দাউ দেও, আমি খোল কাইট্যা আনি।

লম্বা একটা খোলে ভাত ব্যঞ্জণ সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল : রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোনদিন খাইতে আস্‌ব না।

খোলের এককোণে একটু পান সুপারী, একটু তামাক টিকাও বাদ গেল না।

সেই নারী সুবলার বৌকে বলিল : তোমার সঙ্গে ত কত ভাব ছিল দিদি! তুমি যাইও না। আমিই যাই তারে লইয়া।

অনন্ত ভাত ব্যঞ্জন ভরতি খোলটা হাতে করিয়া নদীর পারের দিকে চলিল, সঙ্গে চলিল সেই স্ত্রীলোকটী। সে নির্দেশ দিল : না-জল না-শোক্‌না, এমনি জায়গায় রাইখ্যা, পাছ ফিইর‍্যা চইল্যা আস্‌বি, আর পিছের দিকে তাকাইবি না।

অনন্ত জন্মের মত মাকে শেষ খাবার দিয়া স্ত্রীলোকটীর পিছু পিছু বাড়ী চলিয়া আসিল।

পরের দিন সুবলার বউয়ের বাপ হিসাব করিয়া দেখিল, অনন্তর মার শ্রাদ্ধের দরুণ তার মোট তিন টাকা তের আনা খরচ হইয়া গিয়াছে। সে রাগিয়া আগুন হইল। তার পরিবার অধিকতর আগুন ইহয়া বলিল : দিব একদিন পোড়া কাঠের বাড়ি দিয়া তাড়াইয়া—কুলার বাতাস দিয়া তাড়াইয়া।

মোহাম্মদী : ভদ্র, ১৩৫২

৩.

অত করিয়াও দেখা গেল, ছেলেটা মরেও না, পথও ছাড়ে না, লোকে তে-পথা পথে রোগীরে স্নান করায়, ফুল দিয়া যে পা দিবে সেই মরিবে। এ আপদ একদিন কেন সেই পথ দিয়া আসে না!—হবিষের সময় একবার কইরা খাইত, এখন খায় তিনবার কইরা। কই থাইক্যা আসে অত খাওন। বুড়ির এই কথাটা ভাবিবার মত। বুড়া চিন্তা করে, একা সে। তিন পেট চালায় তার উপর এই অবাঞ্ছিত পোষ্য। কি করা যায়!

একদিন বুড়ি প্রস্তাব করিল : ছরাদ্দ শান্তি হইয়া গেছে। কানে ধইরা নিয়া জাল্লার নাওয়ে তুল।

বুড়া ইন্ধন লাগাইল : কইছ কথা মিছা না। জগতারের ডহরের গহীন পানীতে কান ধইরা তুইলা দেমু ছাইড়া। আপদ যাইব।

নদীর উপর নৌকাতে ভাসিয়া মাছ ধরার আনন্দ অনন্তর মনে হাওয়ার মত একটা দোলা জাগাইয়া দিল, কিন্তু বুড়া-বুড়ির কথার ধরণ দেখিয়া উহা উবিয়া গেল।

তাহা সত্ত্বেও একদিন সন্ধ্যাবেলা জাল কাঁধে লইয়া বুড়া হুকুম করিল, এই অনন্ত হুক্কা-চোঙা হাতে নে, আজ ত'রে লইয়া জালে যামু। অনন্ত তখন বিদ্যুতের বেগে আদিষ্ট দ্রব্যগুলি হাতে লইয়া বাধিতের মত আদেশকারীর পাছে পাছে চলিল। মাসী দৌড়াইয়া আসিয়া বাধা দিল। বাপ তার অত্যন্ত রাগী মানুষ। রাগ হইয়া যখন মারিতে আরম্ভ করিবে, একা নৌকায় অনন্তকে বাচাইবে কে?

হাতের আগুন নিবতে না নিবতে তুমি তারে জালে নিওনা বাবা। ছোট মানুষ। জলে পইড়া মরে না সাপে খাইয়া মারে কে কইব। অখন তারে নিওনা, আরেকটু বড় হইলে নিও।

মাসীর কথায় অনন্ত অপ্রসন্ন মুখে নিরস্ত হইল এবং আরও অপ্রসন্ন মুখে এই বুড়া-বুড়ি ভবিষ্যতের প্রবল ঝড়ের আভাস দিয়া যার যার কাজে মন দিল।

মাঝে মাঝে ঝড় হয়। কোনো দিন দিনের বেলা, কখনো রাতে। দিনের ঝড়ে বেশী ভাবনা নাই; রাতের ঝড়ে বেশি ভাবনা। বাঁশের খুঁটীর মাথায় দাঁড়ানো ঘরখানি কাঁপিয়া উঠে। মুচড়াইয়া বুঝিবা ফেলিয়া দেয়। কিন্তু তাতেও অত ভয় করে না। কোনো রাতে ঝড় আরম্ভ হইলে সহজে কমিতে চায় না। সারা-রাত চলে তার দাপট। কোনো কোনো সময় প্রতি রাতে ঝড় হয়। সারাদিন খায় দায়, সন্ধ্যার দিকে আসন্ন ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়। ঈশান কোণের কালো মেঘ সারা আকাশে ধোঁয়ার মত ছড়াইয়া গিয়া হু হু করিয়া বাতাস আসে। তার পর আসে ঝড়। ভয় হয় ঘরটা বুঝিবা এ রাতেই পড়িয়া যাইবে। পড়ে না। কিন্তু আজই ত শেষ নয়। কালকের ঝড়ে যদি পড়িয়া যায়! পরশুর ঝড়ে! কিন্তু তাতেও অত ভয় করে না, যত ভয় করে বুড়োকে। কোন্ ঝড়ের রাতে অনন্তকে টানিয়া লইয়া নৌকা তুলিবে, মেয়ে মানুষ সে, বুড়া বাপ তার বাধা মানিবে না। কি সে করিবে। একটা নিঃসহায় নারীর শেষ গচ্ছিত ধন নষ্ট হইয়া যাইবে। ঝড়ে কোন গাঙের বাঁকে বুড়ার নাও উল্টাইয়া যাইবে। বুড়া ত মরিবেই, এটাকেও সঙ্গে লইয়া মরিবে।

দিনের ঝড় অনন্তর খুব ভাল লাগে। একদিন অকারণে পাড়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে ঝড় আসিয়া পড়িল। যার যার উঠানে ছেলেরা খেলা করিতেছিল বড়রা ডাকিয়া ঘরে নিয়া ঢুকিল। অনন্তকে কেউ ডাকিল না। কার ঘরে গিয়া উঠিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল যে স্ত্রীলোকটি তার মার শ্রাদ্ধের দিনে তার সঙ্গে নদীর পাড়ে গিয়াছিল সে তার হাত ধরিয়া টানিতেছে। এক সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টি দুই আসিল। সঙ্গে সঙ্গে শিল পড়িল। অনন্তর ন্যাড়া মাথায় কয়েকটা শিল প্রচণ্ড আঘাত করিল, আর ঝড়োহাওয়ার তোড়ে কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তার খড়িউঠা চামড়ায় তীরের মত গিয়া বিঁধিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই নারীর মাথার ঘোমটা খুলিয়া গেল, বাহির হইয়া পড়িল খোঁপাটা আর সিঁথির উপর সযত্নে আঁকা দগদগে লাল সিন্দুরের চিহ্নটা। বড় বড় কয়েকটা শিল সযত্নশোভিত খোঁপাটিকে থেতলাইয়া দিল, বড় বড় কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা তার সিন্দুরের দাগ গলাইয়া ফ্যাকাসে করিয়া দিল; তার ঘোমটার কাপড় দিয়া ইতিপূর্বেই সে অনন্তর খেলো মাথাটিকে ঢাকিয়া দিয়াছিল।

কারো ঘরে না গিয়া সে অনন্তকে নিয়া তার নিজের ঘরের বারান্দায় গিয়া থামিল। ততক্ষণে ঝড়ের প্রচণ্ড মাতামাতি শুরু হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের এতবড় আলামত অনন্ত

জীবনে কোনোদিন দেখে নাই। চারিদিকে ঘরের চালগুলি কাঁপিতেছে, গাছগুলি মুচড়াইয়া এক একবার মাটিতে ঠেকিতেছে আবার উপরে উঠিতেছে, লতাপাতা ছিঁড়িয়া মাটিতে গড়াইতেছে, আবার কোথায় কোন দিকে বাতাস তাহাদিগকে ঝাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঝড় খুব শক্তিশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নারীও কম শক্তিশালী নহে। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সমানে সে চেঁচাইয়া চলিয়াছে : দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বান রাজার; দোহাই ত্রিশ কোটী দেবতার।

কিন্তু ঝড় নির্বিকার। দাম্ভিক অঙ্গুলি হেলনে ত্রিশ কোটি দেবতাকে কাত করিয়া বহিয়াই চলিল। এবার তার গলার আওয়াজ কাঁপাইয়া অন্য অস্ত্র বাহির করিয়া দিল : এঘরে তোর ভাগ্না বউ ছুঁসনা ছুঁসনা—এঘরে তোর ভাগ্না বউ, ছুঁসনা ছুঁসনা। কিন্তু ঝড় এ বাধাও মানিল না। পাশব শক্তিতে বিক্রম দেখাইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা কাঁপাইয়া দিয়া গেল। সে নারীও দমিবার নয়। এবার সুর সপ্তমে চড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : যা বেটা যা, পাহাড়ে যা পর্বতে যা, বড় বড় বিরিক্ষের সনে যুদ্ধ কইরা যা! এ-আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়াই বুঝিবা ঝড়টা একটু মন্দা হইয়া আসিল এবং ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া এক সময় তার দম বন্ধ হইয়া গেল। অনন্ত বিস্ময়ভরা চোখে তাকাইয়া রহিল তার মুখের দিকে! কি কড়া আদেশ। এমন যে ঝড় সেও এই নারীর কথায় মাথা নত করিল!

ঝড়ে মালোপাড়ার প্রায়ই সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি করিয়া থাকে। তাদের অর্ধেক সম্পত্তি থাকে বাড়ীতে, আর অর্ধেক থাকে নদীতে। যাদের ঘর বাড়ী ঠিক থাকে, তারা হয়ত তিতাসে গিয়া দেখে নাওখানা ভাঙিয়া গিয়াছে। যারা নাওয়ে থাকিয়া সারারাত তুফানের সাথে যুঝিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, তারা হয়ত বাড়ীতে আসিয়া দেখে ঘর পড়িয়া গিয়াছে।

আজিকার এতবড় ঝড়ে কিন্তু মালোপাড়ার অধিক লোকের ক্ষতি করিতে পারে নাই। ক্ষতি করিয়াছে মাত্র দুইটি পরিবারের। কালোবরণের বড় নাওখানা ভাঙিয়া গিয়াছে। লোকজন পায়ে হাঁটিয়া পরদিন বাড়ী আসিয়া জানাইয়াছে, একখানা তক্তাও পাওয়া গেল না। একেবারে চুরমুচুর করিয়া ফেলিয়াছে।

ঘর ভাঙিয়াছে অনন্তর মাসীর বাবার। যে ঘরে অনন্তকে লইয়া মাসী শুইত সেই ঘরখানা।

ঘরখানা আবার তুলিয়া লইয়া, হিসাব করিয়া দেখা গেল, বুড়ার গাঁটের সব টাকা কড়ি খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন দিন-আনা দিন-খাওয়ার অবস্থা। যেদিন মাছ না পাইবে সেদিন উপবাস করিতে হইবে। ঘোর দুর্দিনে এমন অবস্থায় একটা উপরি পোষ্যকে কিছুতেই রাখা চলে না। একথা বুড়ার জপমালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর না বলিলেও মাসীর বুঝিতে কষ্ট হয় না। তার মার রকমসকম দেখিয়া মনে হয়, একদিন হয়ত সত্যই ছেলেটার পিঠে সে পোড়া কাঠ চাপিয়া ধরিবে।

অনেক দিন ধরিয়া সে কালোর মার কথা ভাবিতেছিল। একদিন তার কাছে গিয়া বলিল : তুমি ত তার মাকে কত ভালবাসিতে। আমার কাছে তার কষ্টের পারাপার নাই। তুমি তারে নিয়া যাও, দুই মুঠা খাইয়া বাঁচিবে।

কিন্তু কালোর মার মন খারাপ। অতবড় নৌকা ভাঙিয়া গাছের তলায় ঠাই নিয়াছে। এমন বিপদে কার না মন খারাপ হয়। এই সময়ে এসব ভাবনার কথা এড়াইয়া চলিতেই ভাল লাগে। তবে কালোর মা একেবারে নিরাশ করিল না : বর্ষার পর সুদিন আসিলে কালোবরণ উত্তর হইতে কাঠ আনিবে, নূতন নাও গড়িবে। সে নাওয়ে যখন ভাসার ক্ষেপ দিতে যাইবে, কালো তখন অনন্তকে সঙ্গে নিতে ভুলিবে না।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।

মাসীর ভয়, কোন দিন তার মা রাগিয়া উঠে; যে দিন রাগিয়া উঠিবে সেইদিনই একটা চরম কাণ্ড ঘটাইবে।

আর একদিন খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। বাদলায় পান খুব পচে। পচার আভাসে পচা-ভালো মেশানো বিড়ায় বিড়ায় পান ফেলিয়া দেয়। অনন্তর বয়সী এঘরের ওঘরের কয়েকটা ছেলেমেয়ে এমন পান হাত ভরতি করিয়া কুড়াইয়া আনিতেছে। মাসীর মা নিজে চোখে দেখিয়াছে—তারা অনেক পান আনিয়াছে। আর তাদের মা'রা ডালায় করিয়া লইয়া ধুইয়া খাইয়া মুখ লাল করিয়াছে। অনন্ত কেন, গেল না, গেলে ত আনিতে পারিত। অনন্তর খুব ভাল লাগে, হাটে বাজারে ঘুরিতে আর সঙ্গে সঙ্গে এটা ওটা সংগ্রহ করিতে। বুড়ির ইঙ্গিত পাইয়া সে খুঁশীমনে ছুটিল বাজারের দিকে।

বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে একটু আগে। বাজারের রাস্তা দিয়া তখন জলের স্রোত চলিতেছে। কোথায় কোন ডোবা উপচাইয়াছে, তারই জল। দুএকটি পানাও আসে সেই জলের সঙ্গে, মাছের প্রতীক্ হইয়া। অনন্তর বয়সী কয়েকটি ছেলে, তাদের বাপদাদারা যেমন লম্বা বাঁশের আগায় জাল বাঁধিয়া খালের দুই পাড় আগ্‌লাইয়া জাল পাতে, তারই অনুকরণে রাস্তার দুইধার বন্ধ করিয়া দুইটি কঞ্চিতে দড়ি আর সূতা বাঁধিয়া কৃত্রিম ভেসাল জাল পাতিয়া বসিয়াছে, আর পায়ের গোড়ালীর চাপে কঞ্চির আগা উঁচাইয়া, দড়ি টানিয়া, বুক চিতাইয়া, যেন কত মাছই জালে উঠিয়াছে একটি ভাব-ভঙ্গিতে না-দেখা মাছ সব ঝাড়িয়া ফেলিতেছে। অনন্তকে তারা একসাথে ডাক দিয়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দৌড়িয়া আসিয়া অনন্ত সকৌতূহলে বলি : কি মাছ উঠেরে?

এই তোর চান্দা বৈচা, তিত্‌-পুটি। জব্বর মাছ উজাইছে, আজকার ঢলে।

অনন্তও তাদের সঙ্গে মাছ-ধরার খেলায় মাতিয়া গেল।

কতকক্ষণ এই খেলা চলিল। শুধুই খেলা। মেয়েরা যেমন মাটীর ভাত রাঁধিয়া রাঁধা-রাঁধা খেলা করে, তেমনি এ মাছ-ধরা-ধরা খেলা।

সহসা তাদেরই একজন আবিষ্কার করিল একটা সত্যিকারের কই মাছের বাচ্চা কান্‌কো আচড়াইয়া উজাইবার চেষ্টা করিতেছে। সব কয়টি দস্যিছেলে একসাথে হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া গিয়া মাছটিকে লুট করিয়া আনিল। তারপর দেখা গেল—সে এক মজার কাণ্ড। একের পর এক ছোট বড় কৈ মাছ স্রোত ঠেলিয়া উজাইতেছে। অনন্তর দলের তখন মহা স্ফূর্তি। যার পরণে যা ছিল, তারই কোচড় করিয়া তারা ইচ্ছামত কৈ মাছ ধরিল। ধরিতে ধরিতে বেলা ফুরাইয়া গেল। রাস্তার জলের স্রোতটুকু একসময় বন্ধ হইয়া গেল। কৈ মাছও আজিকার মত উজাইবার পালা সাঙ্গ করিল।

পানের কথা অনন্তর একবারও মনে পড়িল না। পানের বদলে এক কোচড় ভরতি জ্যান্ত কৈ মাছ লইয়া খুশী মনে সে এক দৌড়ে ঘরে গিয়া ঢুকিল!

বাড়ীর কর্তার মন ভাল না। খালে জাল পাতিয়া পুঁটি মাছে নাও বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এক পয়সাও বেচিতে পারিল না। বাদলার দিন বলিয়া ব্যাপারী আসিল না, হাটও বসিল না। বাদলার দিন বলিয়া শুকাইতেও দেওয়া চলিবে না। এত মাছ সে করিবে কি?

আমি চাইছিলাম পান, নিয়া আইছে মাছ। মাছ দিয়া আমি কি করুম। আমার কি মাছের অভাব? বলিয়া বুড়ি গজ গজ করিতে লাগিল। আজ সময় ভাল নহে দেখিয়া মাসী অনন্তকে আড়াল করিয়া রাখিল।

পরের দিন দুপুরে বুড়ির মনে পড়িয়া গেল, অনন্তকে তো পোড়াকাঠ মারা হয় নাই। উনানের ধারে গিয়া দেখে সেখানে পোড়াকাঠ নাই। তার মেয়ে হারামজাদী খড় দিয়া রান্না করিতেছে। আর অনন্ত কাছে বসিয়া কি যেন গিলিতেছে। একমুঠা পোড়া খড় উনান হইতে তুলিয়া লইল। একদিক তখনো জ্বলিতেছে। কিন্তু এ দিয়া তো পিঠে মারা যায় না। তবে কি করা যায়, না, মুখে গুঁজিয়া দেওয়া যায়! যেই ভাবা, সেই কাজ। একহাতে অনন্তর হাত ধরিয়া আরেক হাতে জলন্ত খড় তার মুখে গুঁজিতে গেল। তার মেয়ে বাধা দিতে আসিলে, তারও মুখে গুঁজিতে গেল। মেয়ে হেঁচ্‌কা টানে খড়গুলি বুড়ির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। আচমকা খড়ের আগুন হাতে লাগিয়া বুড়ির হাতের খানিকটা পুড়িয়া গেল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে মেয়ের গলা চাপিয়া ধরিল। তারপর মায়েতে মেয়েতে শুরু হইল তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। মেয়ে শেষে কায়দা করিয়া মাকে মাটীতে ফেলিয়া বুকের উপরে বসিল। তারপর চুলের মুঠি ধরিয়া তার মাথাটা ঘন ঘন মাটীতে ঠুকিয়া শেষে ছাড়িয়া দিল। বুড়ি ছাড়া পাইয়া কোনরকমে উঠিয়া গিয়া ভাতের হাঁড়িটা বড় ঘরে টানিয়া তুলিয়া খিল আঁটিয়া দিল।

মারামারির মাঝখানে অনন্ত বাহির হইয়া গিয়াছিল। যার আদেশে ঝড় থামিয়া গিয়াছিল, সেই নারীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য। সে না হইলে, এই যুদ্ধ থামাইবে কে? কিন্তু তাকে ঘরে পায় নাই। ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া দেখে মাসী ম্লানমুখে বসিয়া আছে। তার চুলগুলি আলুথালু। পিঠের কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, রণজয়ের ক্লান্তিতে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে মাসী। ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তার দিকে চাহিয়া মাসীর চোখ দুইটি জলিয়া উঠিল। বজ্রের মত গর্জন করিয়া উঠিয়া সে বলিল : হারামজাদা শত্তুর, তুই বাইর হ।' এ-ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাতগুষ্টির মাথা খাস। তোর লাইগ্যা আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙ্গের তলা পায়ের ধূলা। যা যা, অখনই যা, যমের মুখে যা। যমদূত কালদূতের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা। কালীর মুখে যা, কালের মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। না গেলে পোড়া খড় মুখে গুইজ্যা দিমু। পোড়াকাঠ বুকে ছেঁকাইা দিমু। তোর মা গেছে যে-পথে তুইও সেই পথে যা!—

কিন্তু ওকি, অনন্তর অমন আদর-কুড়ানো ম্লান মুখখানা যে দৃঢ়তায় কঠোর হইয়া উঠিল! অমন ঢল ঢল আয়ত চোখ দুইটা যে শৈশব-সূর্যের মত লাল তেজালো হইয়া উঠিল! ওকি! সুবলার বউ কি স্বপ্ন দেখিতেছে!

কোন্ যুদ্ধজয়ী বীর যেন কি এক দাগা পাইয়া পলকে সব কিছু ফেলিয়া ছড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট পা দু'খানাতে এত জোর। মাটী কাঁপাইয়া যেন চলিয়াছে অনন্ত! ছুটিতেছে না, ধীরে ধীরে ওজন করিয়া পা ফেলিতেছে। কিন্তু কি শব্দ। এক একটা পদক্ষেপ যেন তার বুকে আসিয়া আঘাত করিতেছে। বারান্দা হইতে উঠানে নামিয়াছে। তার বুকের সীমানাটুকু ছাড়াইয়া অনন্ত যেন এখনি কোন্ এক অজানা জগতে লাফ দিবে। সুবলার বউ আর স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া হাত বাড়াইয়া স্খলিত কণ্ঠে ডাকিল, অনন্ত! অনন্ত ফিরিল না। সুবলার বউ পড়িয়া যাইতেছিল। তার মা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধরিল। মার বৃদ্ধ বুকে মাথা রাখিয়া সুবলার বউ এলাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুইটিও বুঝিয়া আসিল।

অন্তহীন আকাশের তলায়। চার পাশের দিক্-বলয়ের কেন্দ্রে অনন্তর আজ পরম মুক্তি। কারো পিছুর ডাকে সে আর সাড়া দিবে না। প্রথমেই তিতাসের পারে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লইল নদীটাকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিয়াছে, দুরন্ত স্বপ্নের মত, উদাত্ত সঙ্গীতের মত। জল বাড়িতেছে। নাওগুলি চলিয়াছে। কোথাও বাধাবন্ধ নাই। সব কিছুতেই যেন একটা সচল ব্যস্ততা! আজিকার এই সময়ে সে যদি আসিত! আসিবে বলিয়া গিয়াছে। কতদিন ত হইয়া গেল। সেত আসিল না! বাজারের ঘাটে যেখানে সে নাও ভিড়াইয়াছিল, সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। এখানে দিনে পর দিন বসিয়া থাকিবে। আর তার প্রতীক্ষা করিবে। একদিন হাটবারে সে আসিবেই।

খালের মুখে মস্তবড় একটা ভাঙ্গা নৌকা গেরাপী দিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত তার উপর গিয়া উঠিল। ভয়ানক পিছলা। বাতায় ধরিয়া ধরিয়া ছইয়ের ভিতর ঢুকিল। নৌকায় আধ বোঝাই জল। চাহিলে ভয় করে। একবার পা ফস্‌কাইয়া তলায় পড়িয়া গেলে অনন্ত সে-জলে ডুবিয়া মারা যাইবে। পাছার দিকে কয়েক-খানা পালিশ পাটাতন। রোদ বৃষ্টি কিছুই ঢুকিবে না। কেউ দেখিতে পাইবে না। ভারী সুন্দর। এখানে অনন্ত চিরদিন কাটাইয়া দিতে পারিবে। যতদিন সে না আসিবে, এখানেই কাটাইয়া দিবে।

এখান হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে নদীর গতি। চাহিলে শেষ অবধি দেখা যায়। বহু দূরদূরান্তর হইতে, দক্ষিণের রাজ্য হইতে কেউ বুঝি ঢেউ চালাইয়া দেয়, সেই ঢেউ আসিয়া লাগে অনন্তর এই নাওখানাতে। সেদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। কিন্তু সে ত ওদিক হইতে আসিবে না, সে আসিবে পশ্চিম দিক হইতে।

অনন্ত একএকবার পশ্চিম দিকে যতদূর চোখ যায়, চাহিয়া দেখে—সে আসে না। ব্যর্থতায় তার মন ভরিয়া যায়। আবার দক্ষিণ দিকে চায়—দেখে নদী কত দীর্ঘ। এই দীর্ঘতা তার মন আশায় ভরাইয়া দেয়।

বিকালে ক্ষুধা পাইলে চুপি চুপি নামিয়া আসিয়া সেই পানওয়ালাটার সামনে দাঁড়াইল। আজ হাট-বার নয়। পানওয়ালা তেমনিভাবে পান ভাঁজাইয়া চলিয়াছে। তার ইঙ্গিত পাইয়া এক হাঁড়ী জল তুলিয়া দিল। সেও প্রতিদানে এক গোছা পান তার দিকে ফেলিয়া দিল। অনন্ত পান লইল না। কি ভাবিয়া লোকটা একটি পয়সা দিল। অনন্ত এক পয়সার ছোলাভাজা খাইয়া দেখিল পেট ভরিয়া গিয়াছে।

কালো আঁধার। পাটাতনে শুইয়া খুব ভয় করিতেছিল। কিন্তু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকালে জাগিয়া দেখে সারা রাত তার মা ঠিক তার কাছটিতে শুইয়া

গিয়াছে, তার দেহের উষ্ণতা এখনও পাঠাতনে লাগিয়া রহিয়াছে। ওরা মিথ্যাকথা বলিয়াছে। মা কি কখনও তার অনিষ্ট করিতে পারে? মা দিনের বেলা দেখা দিতে পারে না মরিয়া গিয়াছে বলিয়া, কিন্তু রাতে ঠিক আসিবে। আর সে কিছুই ভয় করিবে না।

বেলা বাড়িলে ক্ষুধা পাইল এবং পানওয়ালার কাছে গিয়া তেমনিভাবে এক হাঁড়ি জল তুলিয়া দিল। কিন্তু আজ আর সে পয়সা দিল না। ফিরিয়া আসিয়া তার মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। ভাঙা নাওখানাতে কত জল আটক হইয়া পড়িয়াছে। পচা জল। তাতে শিং মাছ, লাটা মাছ আর বেলে মাছ সব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কায়দা করিয়া ধরিতে পারিলে পয়সা করা যাইবে। কিন্তু বিরাট নৌকা। ভরা ভরতি জল। পরণের কাপড় খুলিয়া অনেক ঝাপাঝুপি করিল। একটি মাছও ধরিতে পারিল না। হতাশ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে নতুন জলের সঙ্গে খালের ধারায় নাওয়ের বুক ঘেঁসিয়া খলসে মাছ উজাইতেছে। অল্প চেষ্টাতে খানিকটা ছেঁড়া জালও মিলিয়া গেল। হাঁটু জলে নামিয়া জাল পাতে আর বোকা খলসে পুটি আসিয়া ধরা দেয়। চট করিয়া এক সময় বেচিয়া আসিয়া অনন্ত তার দুর্গে গা ঢাকা দেয়।

বড় ঘটা করিয়া, বড় তেজ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে ছেলেটা। যে খানেই থাক, মরিবেনা ঠিক। একটা গোটা মানুষের মরিয়া যাওয়া কি এতই সহজ? সে যদি আর কখনো ফিরিয়া এঘরে না আসিত, কেউ যদি তাকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া নিয়া মানুষ করিত! কোন মুখে আর সে এঘরে আসিবে! ঈশ্বর করুন আর যেন সে ফিরিয়া না আসে! যার মা নাই, দুনিয়ার সব মানুষই তার কাছে সমান। আর কোনো মানুষের বাড়ীতে সে চলিয়া যাক।

চারদিন পরের এক দুপুরে নারীদের মজলিসে বসিয়া সুবলার বউ এই কথাগুলিই ভাবিতেছিল। অনন্তর প্রসঙ্গ উঠিতেই বলিল, আপদ গেছে ভাল হইয়াছে। কার দায় কে সামলাইবে গো দিদি : আমার পেটের না পিঠের না, আমার কেন এত ঝকমারি। মা খালি ঘরে পড়িয়া মরিয়াছে। কেউ নেয় নাই দেখিয়া আমি নিয়া আসিয়াছিলাম। এখন শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গিয়াছে, এখন যেখানে খুশী পড়িয়া মরুক। আমার দায় ফরিয়াদ নাই।

নিজে এতগুলি কথা বলিল সকলের অনন্ত সম্বন্ধে বলিবার সকল কথা চাপা দিবার জন্য। তবু একজন বলিয়া বসিল : আমার বিন্দাবন দেখিয়াছে, গামছায় করিয়া হাটে খলসে মাছ বেচিতেছে।

আর একজন পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল : আমার নন্দলাল দেখিয়াছে, পচাপানের দোকানের সামনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানি কত পঁচা পান তার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, সে একটীও না ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সুবলার বউ আর শুনিতে চায় না। কিন্তু তৃতীয় একজন না শুনাইয়া ছাড়িল না। তার বলার কথা সবচেয়ে আধুনিক। কাল রাতের আঁধারে লবচন্দ্রের বউয়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল কতকগুলি পানসুপারি নিয়া। লবচন্দ্রের বউ তাকে ভাত খাওয়াইয়া বিছানা করিয়া বলিল, শুইয়া থাক; কিন্তু শুইল না, বাহির হইয়া ভূতের মতন আঁধারে মিলাইয়া গেল। দিনের বেলা লবচন্দ্রের বউ তার স্বামীকে দিয়া কি খোঁজাটা না খোঁজাইয়াছে, কোথায় থাকে কেউ বলিতে পারে না। কেউ নাকি বলে জঙ্গলের মধ্যে থাকে, কেউ

বলে শিয়ালের গর্তে থাকে—কেউ বলে, যাত্রাবাড়ীর শ্মশানে যে মঠ আছে, তার ভিতরে থাকে। ছেলেটা দেওয়ানা হইয়া না গেলেই হয় দিদি।

খুব যে দরদ লবচন্দ্রর বউ-এর। স্বামীকে দিয়া খোঁজাইয়াছে। বলি কয়দিনের কুটুম? এতদিন দেখাশুনা করিয়াছে কে? মা যখন মরিল, লবচন্দ্রর বউ তখন কোথায় ছিল? আর মরিতে আসিলেই যদি, এদিকের পথে ত কাঁটা দিয়া রাখে নাই কেউ। ভাত ভিক্ষা করিয়া খাইতে আসিয়া লবচন্দ্রর ঘরে কেন—এমন ভিক্ষা আমিও দিতে পারিতাম। কথাগুলি সুবলার বউ মনে মনে ভাবিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিল না।

রাত্রিতে পেট পুরিয়া খাইয়া শুইতে গিয়াছে, এমন সময় বিন্দার মা আসিয়া বলিল অ সুবলার বউ, দেখিয়া যাও রঙ্গ।

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া দেখে অনন্ত আস্তাকুড়ের পাশে বসিয়া বসিয়া আচাইতেছে, আর লবচন্দ্রর বউ হাতে একটা কেরাসিনের কুপি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এতখানি সামনে গিয়া পড়া সুবলার বৌর অভিপ্রেত ছিল না। সে হকচকাইয়া গেল। ছেলেটা একটুও না চমকাইয়া হাতের ঘটি মাটিতে রাখিয়া গটগট করিয়া চলিয়া গেল; কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

ফেরার পথে সুবলার বউ বলিল, বিন্দার মা, একদিন ধইরা জন্মের শোধ মার দিয়া দেই, কি কও?

বিন্দার মা কিছু বলিল না।

ভিতরে ভিতরে কি ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সুবলার বৌকে কেউ কিছু জানিতে দিল না। একদিন দেখা গেল, লবচন্দ্রর বৌর ভাই আসিয়াছে। আর একদিন দেখা গেল, সে-ভাই, নাম নাকি তার বনমালী, যে-রহস্য কেউ ভেদ করিতে পারে নাই, সে-রহস্য ভেদ করিয়া ফেলিয়াছে; খালের মুখের এক গেরাপী-দোয়া ভাঙা নৌকার খোপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে। তার পরের দিন দেখা গেল তারা তিনজনে মিলিয়া নৌকায় গিয়া উঠিয়াছে।

সব কথা শুনিয়া সুবলার বউর যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। বিন্দার মা জানে তার ব্যথাটা কোথায়; বলিল, এতদিন লালন পালন করলি, খাওয়াইলি, ধোয়াইলি, আজ পরে নিয়া যাইতেছে, কোনদিন দেখ্‌বি কি দেখ্‌বি না। শেষ দেখা একবার দেখিয়া দে!

হাঁ শেষ দেখা একবার দেখিতে হইবে। সুবলার বউ উঠিয়া পড়িল।

ঘাটের কাছে অনেক নারী গিয়া জমিয়াছে। সাহা পাড়ার এক নারী কাঁকের কলসী ঝাঁকুনি মারিয়া কাঁকালের উপরে তুলিতে তুলিতে মালো পাড়ার এক নারীকে বলিল, কারে কে নিয়া যাইতেছে গো দিদি!

—লবচন্দ্রর বউ উদয়তারারে তার দাদা বনমালী নিতে আসিয়াছিল, নিতেছে। আমার বাপের বাড়ী ওর বাপের বাড়ী এক গাঁয়ে, পাশাপাশি ঘর।

বুঝলাম।

নারীদের দলে গিয়া সুবলার বউও দাঁড়াইল। দেখিল, দুই জনেই মহা খুশী। উদয়তারা মাঝে মাঝে ছড়া কাটিয়া রঙ্গ করিতেছে আর অকৃতজ্ঞ কুকুরটা খুশী মনে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে।

উদয়তারা এখন আর নবচন্দ্রর বউ নহে; এখন সে বনমালীর বোন। আর কিছুকাল পরে আরও একটু বেশি হইবে। গর্বিত দৃষ্টিতে ঘাটের নারীদের দিকে চাহিল সে। একজন বৌ ম্লান মুখে তাকাইয়াছিল উদয়তারার দিকে, তারও বাপের বাড়ী নবীনাগর গ্রামে। তাকে খুশী করিবার জন্য উদয়তারা ডাকিয়া বলিল : কি গো নবীনাগরের ছবিনা, বহুত দিন ধইরা যে দেখি না।

সে-বৌ অমনি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল : জামাই ঠকানী কি কয় রে?

উদয়তারাকে যারা হাড়ে হাড়ে জানে তারা সকলেই হাসিয়া উঠিল।

এই কয়জনার হাসি-তামাসার মধ্যে বনমালীর নৌকা তিতাসের জলে ভাসিয়া পড়িল।

আকাশটা বেজায় ভারী। মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। সারাদিন সূর্যের দেখা নাই। মাথার উপর যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বাদলার এই নুইয়া-পড়া আকাশটা। মানুষের অবাধে নিশ্বাস ফেলার অনেকখানি অধিকার আত্মসাৎ করিয়া ময়লা একখানা কাঁথা দিয়া বুঝি কেউ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে মালো পাড়াটাকে।

হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাথার কাপড়টুকু বুকে পিঠে দুই তিন পরতা জড়াইয়া সুবলার বউ একটা মেটে কলসী লইয়া নদীতে গেল।

পারের উঠানের মত ঢালা জায়গা এতদিন অব্যবহৃত ভাবে পড়িয়া থাকিত। ছেলেরা জাল ছড়াইত, জেলের ছেলেরা লম্বা করিয়া মেলিয়া সূতা পাকাইত। ছেলেরা শিশুরা বয়স্কা বিধবারা রোদের জন্য সকালে গিয়া বসিত; বিকালে ছেলেরা খেলা করিত। ছুটিয়া-আসা দুটিএকটি গরু ছাগল ঘাস খাইত। রাক্ষুসী তিতাস ধাপে ধাপে বাড়িয়া আসিতে আসিতে তার অনেকখানি জায়গা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অবাধে কেউ এখানে নড়াচড়া করিবে সে উপায় নাই। সুদিনে কোথায় কোন্ সুদূরে ছিল জল, ভরা কলসী লইয়া আসিতে পথ ফুরাইতে চাহিত না। এখন এত কাছে আসিয়াছে; বাড়ী হইতে নামিয়া পাড়ার বাহিরে পা দিলেই জল। তবু যা একটু জায়গা খালি আছে, আর দুইদিন পরে তাও জলে ভরিয়া যাইবে।—আগে যেখানে নামিয়া স্নান করিতাম সেখানে আজ গাঙের তলা। বড়জালের বড় বাঁশ ডুবাইয়াও সেখানকার মাটী ছোঁয়া যাইবে না। মাথার উপর কালো আকাশ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাড়ার বাহিরে তিতাসের কাল পানি সা সা করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দুইদিক হইতেই চাপিয়া ধরার মতলব।

দক্ষিণ দিকে চাহিলে নির্ভরসায় বুক কাঁপিয়া উঠে। আষাঢ় শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঠ ঘাট যতদিন ডাঙা ছিল, বৃষ্টির জল সে সব মাঠ ঘাট ধুইয়া মুছিয়া সাদা-গেরুয়া অনেক মাটী লইয়া গিয়া নদীতে পড়িত। এখন সে সব মাঠ ময়দান, জলের তলায় চাপা পড়িয়াছে। সে সব মাঠ ময়দানের উপর এখন বুক জল সাঁতার জল। সব পলিমাটী জলের তলে থিতাইয়া রহিয়াছে, উপরে ভাসিয়া রহিয়াছে নির্মল জল। তিতাসের জলও তাই সাদাও নয়, গৈরিকও নয়, একেবারে নির্মল; আর নির্মল বলিয়াই কালো। সেই কালো জলের উপর দিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া এখানে আছাড় খাইতেছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল কেবল আগাইয়া আসিতেছে।

জেলেদের হইয়াছে ঝকমারী। ঘন ঘন নাও-বাঁধা খুঁটী বদলাইতে হয়। একদিন হাঁটুজলে গলুই রাখিয়া খোঁটা ছিল, পাছার খোঁটা ছিল বুক জলে। তিনদিনের দিন গলুইর খোঁটায় হইয়াছে কোমর জল আর পাছার খোটায় সাঁতার-পানি। নৌকায় উঠিতে কাপড় ভিজাইতে হইতেছে। তুল আবার খুঁটি, আগাইয়া আন নাও আরও মাটীর কাছে। এইভাবে খুঁটি তুলাতুলি করিতে করিতে শেষে নাওয়ের গলুই পল্লীর গায়ে আসিয়া ঠেকিল।

নতুন জল মালোপাড়ার গায়ে ধাক্কা দিয়া তার পূর্ণতা ঘোষণা করিয়াছে। ঘরবাড়ীর কিনারায় বেতঝুপ, বনজমানী, ছিটকী গাছগাছালী ছিল—নূতন জলের তলায় এখন সেগুলির কোমর অবধি ডুবিয়া গিয়াছে। তার আশে পাশে ডেউ ঢোকে না, স্রোত চলে, সেই স্রোতে নিরিবিলিতে উজাইয়া চলে ছোট ছোট মাছ। পুঁটি চাদা খলসের ডিম ছাড়িয়াছে, বাচ্চা হইয়াছে, সাঁতার কাটিতে আর দল বাঁধিয়া স্রোত ঠেলিয়া উজাইতে শিখিয়াছে সে সব মাছেরা। থালা ধুইতে গেলে এত কাছ দিয়া চলে, যেন আঁচল পাতিয়াই ধরা যাইবে। অনন্ত এখানে একটা ছোট জাল পাতিলে বেশ ধরিতে পারিত। হাটে নিয়া বেচিতেও পারিত। এই সময় মাছের দর বাড়ে। উজানিয়া জলে অঢেল মাছ ধরা দেয় না; কমিবার মুখে মরা জলে যত মাছ মারা পড়ে, তখন মাছের দর থাকে কম। এখন দর খুব বেশি।

ঘাটে লোক নাই। নিরালা ঘাঠ পাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘাট অতিক্রম করিতেছে। এই রকম কত ঘাট ডিঙাইয়া আসিয়াছে, আরও কত ঘাট ডিঙাইতে হইবে, তার পর এত বাধা-বিঘ্নের পাহাড় ঠেসিয়া কোথায় গিয়া তাহাদের যাত্রা শেষ হইবে, কোথায় তাহাদের পথের শেষ, কে জানে! কে তার খোঁজ রাখে? কিন্তু তারা উজাইবে। থালা দিয়া ডেউ খেলাইয়া বাধা দেও, তারা আলোড়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটু পিছু হটিয়া যাইবে। কিন্তু জল স্থির হইলে আবার তারা চলিতে থাকিবে। হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাও, নিকট দিয়া যাইতেছিল, দুই হাত বার-পানি দিয়া আবার পাল্লা ধরিবে, তবু তারা যাইবেই। ঘাটে অত্যধিক মানুষের আলোড়ন থাকে যখন, তারা গাছপাছড়ার খোপেখাপে দলে দলে তিষ্ঠাইতে থাকিবে। বেশি বার-পানি দিয়া যাইতে পারে না; ছোট মাছের অগাধ জলে বিষম ভয়, ঘাটের এধারে তারা দলে ভারী হইতে থাকিবে। ঘাট ঠিক চুপ হইইে আবার যাত্রা শুরু করিবে। কেউ আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

ঘাটে কেহ নাই। সুবলার বউ আঁচল পাতিয়া কয়েকটি মাছ তুলিয়া ফেলিল। তারা পুঁটিমাছের শিশুপাল। কাপড়ের বাঁধনে পড়িয়া ফরফরাইয়া উঠিল। জলছাড়া করিবার প্রবৃত্তি হইল না, আঁচল আলগা দিয়া ছাড়িয়া দিল। খলসে বালিকারা কেমন শাড়ী পরিয়া চলিয়াছে। চাঁদার ছেলেরা কেমন স্বচ্ছ—এপিঠ ওপিঠ দেখা যায়। সারা গায়ে বিজল। ধরিলে হাতে আটা লাগে। একটা ঘন ছোটজাল পাতিয়া অনন্ত ইহাদের সবগুলিকেই ধরিতে পারিত।

আরও কিছুদিন পরে গলা-জলে জল-বন গজাইয়াছে, আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘন হইতে ঘনতর হইয়া সেগুলি মাছেদের এক একটা দুর্গে পরিণত হইয়াছে। মালোর ছেলেরা তখন বসিয়া নাই। বড়রা নৌকা লইয়া মাঝ নদীতে নানা রকমের জাল ফেলিতেছে তুলিতেছে, ছোটরা ছোট ছোট 'তিনকুনা পেলুন' জাল লইয়া সেই জলদুর্গে অবিরত

খোঁচাইয়া চলিয়াছে। কয়েকবারের খোঁচার পর জালখানা টানিয়া মাটীর উপর তুলিলে দেখা যায় অসংখ্য চিংড়ি-সন্ততি শুঁয়া উঁচাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে থাকে। দশ বারো 'খেউ' মারিলেই মাছে ডোলা ভরিয়া যায়। অনন্তকে একখানা জাল বুনিয়া তিনখানা মোটা কঞ্চিতে বাঁধিয়া দিলে অনেক চিংড়ির ছা' মারিয়া হাটে গিয়া বেচিতে পারিত। সুবলার বউ যদি নিজে সূতা কাটিত জাল বুনিত, আর অনন্ত চিংড়ি বাচ্চা ধরিয়া হাটে বাজারে বেচিত, তাতে দুই জনের একটা সংসার চলিতে পারিত! মা-বাপের গঞ্জনা হইতে সুবলার বউ বাঁচিয়া যাইত।

থমথমে আকাশ এক এক সময় পরিষ্কার হয়। সূর্য হাসিয়া উঠে, কালো কেশরের গহনারণ্য ফাঁক করিয়া। বিকালের পড়ন্ত রোদ গাছগাছালীর মাথায় হলুদ রঙ বুলাইয়া দেয়। পুরুষ মানুষেরা এই সময় অনেকেই নদীতে। যারা বাড়ীতে থাকে, তারা ঘুমায়। নারীরা সূতা পাকাইবার জন্য উঠানে বাহির হয়। চোঙার মত মুখ একটা খুঁটী স্থায়ীভাবে মাটীতে পোতা থাকে। তার উপর সূতা-ভরা চরকি বসাইয়া দেয়। টেকোয় সূতা বাঁধিয়া উঠানের এ-কিনারা থেকে ও-কিনারায় পোতা একটা বড় খুঁটী বেড়িয়া আনে। তার পর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন উরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘসা মারিয়া উরুতে টেকো ঘুরায়। একবারের ঘুরানিতে টেকো হাজার বার ঘুরে। দশবারের ঘুরানিতে একবেড়ের সূতা পাকানো হইয়া যায়। তখন বুকের খানিকটা কাপড় তুলিয়া ডান হাতের তেলোয় টেকোর ডাঁটা ঘুরাইতে থাকে। বাঁ হাত থাকে টেকোর ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলে সে নারী। এই ভাবে পাকানো সূতা টেকোতে গুটানো হইয়া যায়। নিতান্তই পুরুষের কাজ। কিন্তু মালোর মেয়েরা কোন কাজ নিতান্তই পুরুষের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারে না। রাখিলে চলেও না। নদীতে খাটিয়া আসে। সূতা পাকাইবে কখন? তাই, পুরুষের আনাগোনা না থাকিলে, এ-বাড়ী ও-বাড়ী সব বাড়ীর মেয়েরা এইরূপ চরকি-টেকো লইয়া উঠানে নামিয়া পড়ে।

তেলিপাড়ার একটা লোক একদিন এমনই সময়ে মালো পাড়ার ভিতর দিয়া কোথায় যাইতেছিল, যুবতী মালো-বৌদের এমন বে-আবরু বেভার দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল সে। তার পর থেকে রোজ এমনি সময়ে একবার করিয়া সে পাড়াটা ঘুরিয়া যাইত। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত অমুকের বাড়ী যাইবে; অমুকের বাড়ীর কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, অমুকের বাড়ী গিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম মেয়েরা তাকে গ্রাহ্য করে নাই। পরে যখন লোকটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিতে শুরু করিল, তখন মেয়েদের কান খাড়া হইল। সুবলার বউ দলের পাণ্ডা হইয়া একদিন রাত্রিতে তাকে ডাকিয়া ঘরে নিল, আর বাছা বাছা জোয়ানা মালোর ছেলেরা তাকে গলা টিপিয়া মারিয়া, নৌকায় তুলিয়া বার-গাঙে নিয়া ছাড়িয়া দিলে স্রোতের টানে সে কোথায় চলিয়া গেল, কেউ জানিল না।

সারা মালো পাড়ার মধ্যে এক মাত্র তামসীর বাপই বামুন কায়েত পাড়ার লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিত। তার বাড়ী বাজারের কাছে। বামুন কায়েতের ছেলেরা তার বাড়ীতে আসিয়া তবলা বাজাইত, আর মেয়েদের দিকে নজর দিত। তামসীর বাপকে তারা যাত্রার দলের রাজার পাঠ দিত বলিয়া সে এসব বিষয় দেখিয়াও দেখিত না। এইজন্য তার উপর সব মালোদের রাগ ছিল। আর সেও মালোদিগকে বড় একটা দেখিতে পারিত না, বামুন কায়েতদিগকে দেখিতে দেখিতে তার নজর উঁচু হইয়া গিয়াছিল।

এতবড় টাকাওয়ালা একটা মানুষ তেলিপাড়া হইতে গুম হইয়া গেল; কিন্তু সাক্ষী প্রমাণের অভাবে তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। না হইল মামলা মোকদ্দমা, না হইল আচার বিচার। কিন্তু তামসীর বাপের মারফতে তেলিরা জানিতে পারিল, এ কাজ মালোদেরই।

এমন সূত্রহীন জানার দ্বারা মামলা করা যায় না। কাজেই তেলিরা কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। শেষে বামুন, সাহা, তেলি, নাপিত, সব জাত মিশিয়া গোপনীয় এক বৈঠক করিল। কেউ প্রস্তাব করিল, মালোদের নৌকাগুলি একরাতে দড়ি কাটিয়া ভাসাইয়া নিয়া তলা ফাঁড়িয়া ডুবাইয়া দেওয়া যাক; আর টাকা দিয়া লোক লাগাও, জালগুলি সব চুরি করিয়া আনিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলুক।

কিন্তু এ প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল না; গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইবে। কাজেই দ্বিতীয় প্রস্তাব উঠিল : রাতপিছু একজন করিয়া মালোকে সাবাড় করিতে থাক; যতদিন পর্যন্ত মালোপাড়া পুরুষশূন্য না হয় ততদিন এইভাবে চলুক।

কিন্তু ঘণ্টা বাঁধিবে কে তাহা লইয়া গোলমাল লাগিবে। রোজ রোজ লোক লাগাইয়া হত্যাকাণ্ড চালানো যায় না। বিশেষতঃ এখনও মহারাণীর রাজত্ব অক্ষুণ্ন আছে।

সারা তেলিপাড়াতে রজনী পালের মাথা খুব সাফ! কূটনীতি তার বেশ খেলে। এসব ভোঁতা প্রস্তাবের অসারতা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে প্রস্তাব করিল : বিষ্ণুপুরের বিধুভূষণ পাল আমার মামা। সমবায় ঋণদান সমিতির ফিশারী শাখার ম্যানেজার। ফিসারীর টাকা নিয়া সব মালোরা গিলিয়াছে। মাছে যেমন টোপ গিলে তেমনিভাবে গিলিয়াছে, আর উগ্‌লাইয়া দিতে পারিতেছে না। সুদ কম বলিয়া, লোভে লোভে ধার করিয়াছিল। এখন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে বাড়িতেছে। জানইত সমবায় ঋণদানের টাকা কত অত্যাচার করিয়া আদায় করা হয়। মামাকে গিয়া জানাইয়া দিব, প্রত্যেক মালোকে যেন ব্যাঙ্‌নাচানী নাচাইয়া ছাড়ে।

কিন্তু এ প্রস্তাবও কারো মনঃপূত হইল না। বড় সুদূর-প্রসারী প্রস্তাব। গরম গরম কিছু করা হইল না; কখন আসিবে।

শেষ প্রস্তাব তুলিল রজনী পালের বাই : যে-মাগী তাকে ডাকিয়া ঘরে নিয়াছিল, তাকে ধরিয়া নিয়া আস, কয়েক পাইট মদ কিন, তারপর নিয়া চল ভাঙা কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে।

বৈঠকের মাতবর প্রস্তাবটি সংশোধন করিয়া দিল : একজনকে আনিলে কি একটা নরহত্যার জ্বালা জুড়াইবে? তার চাইতে এখন থেকে যে যখন সুযোগ পাও মালোপাড়ার বৌ-ঝিদের উপর অত্যাচার কর।

মালোপাড়ার কাছেই মুসলমানপাড়া। সে-পাড়ায় বারুল্লা আর শরীয়তুল্লা দুই ভাই। শরীয়তুল্লার মালোপাড়াতে সপ্তাহে দুই একবার না আসিলে চলে না। ঝাড়ফুঁক করিয়া ছেলে-পিলেদের জ্বরজারী ভালো করে। এই জন্য সে কোন মালোর চাচা কোন মালোর জ্যেঠা। তার বড় ভাই বারুল্লা দুপুরে দুধ বেচিতে আসিয়া দয়াল মালোর দাওয়ায় গিয়া বসিল। একছিলুম তামাক টানিয়া বলিল, বাবা দয়াল, কাল উত্তরপাড়ায় মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। তেলিপাড়ার পথ দিয়া আসিবার সময় দেখি, একঘরে বামুন কায়েত বারো জাতে মিলিয়া গুপ্তবৈঠক করিতেছে

আর মুখে কেবল মালোপাড়া মালোপাড়া জপিতেছে। দাঁড়াইয়া এই সমস্ত কথা শুনিলাম।

সব কথা শুনিয়া দয়াল বেপারী রাগে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল : চাচা, এই অবস্থায় তুমি কি করিতে পরামর্শ দেও।

বারুল্লা বলিল : মেয়েছেলের উপর নজর দিলে আমরা কি শাস্তি দেই তুমিত জানই।

দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া দয়াল বেপারী বলিল : তাই হইবে, চাচা তুমি মুরুব্বি মানুষ, মালোগুষ্ঠিরে আশীব্বাদ কইর।

মালোরাও সেই রাতে বৈঠক করিয়া স্থির করিল : যখনই যে-ব্যক্তি মালোপাড়ার মেয়েছেলের উপর কুনজরে চাহিবে, তখনই তাহাকে শেষ করিতে হইবে।

ব্যাপার আপাততঃ এর বেশী আর গড়াইল না। তেলিপাড়া ও মালোপাড়া উভয় পাড়ার প্রস্তাবই প্রস্তাবে পর্যবসিত হইল। তবে মালোপাড়ার সঙ্গে আর-সব পাড়ার একটা মিলিত বিরোধের যে গোড়াপত্তন সেইদিন হইয়া থাকিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না।

পথে রাত হইয়া গেল। বর্ষার প্রশস্ত নদীর উপর মেঘভরা আকাশের ছায়া দৈত্যের মত নামিয়া পড়িয়াছে। অনন্ত বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। পরে এক সময় চারিদিক গাঢ় আঁধারে ঢাকিয়া গেলে, আর-কিছু দেখা গেল না।

উদয়তারা দুইদিক খোলা ছইয়ের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিল, আয় রে অনন্ত, ভিতরে আয়।

বনমালী পাছায় থাকিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে হাল চালাইয়া চলিয়াছে। তার গায়ের দাপটে হালের বাঁধন-দড়ি ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছে। সেই দোলায়মান নৌকার বাঁশের পাতনির উপর দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অনন্ত ছইয়ের ভিতরে আসিল। উদয়তারাকে দেখা যাইতেছে না। আন্দাজ করিয়া তার কাছে গিয়া বসিল। কিছু বলিল না। ঘুম পাইতেছিল। পাটাতনের উপর ছোট শরীরখানা এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। মশার কামড়ে আর নৌকার দুলানিতে একবার তার ঘুম খুব পাতলা হইয়া আসিল। মাথাটা যেন নরম কি একটা জিনিষের উপর পড়িয়া আছে। তুলার মত নরম আর চাঁদের মত শীতল। আর রাশি রাশি ফুলঝুরি নামাইয়া-রাখা একপাট আকাশ কে বুঝি অনন্তর গায়ের উপর চাপাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এ যে আকাশের উপর দিয়া এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে কি-একটা যেন উজ্জল সাঁকো—কিছুদিন আগের দেখা সেই রামধনুটারই যেন ছিলা এটা। সাতরঙা ধনুটি গাঢাকা দিয়া আছে আর তার ছিলাটি অনন্তর জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে। উজ্জ্বল কাঁচা সোনার রঙ তার থেকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আর তার চারিপাশে ভিড় করিয়া আছে লাখ লাখ তারা। হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। আর তারই উপর ঝুলিয়া অনন্ত আকাশের এমন এক রহস্যলোকে যাত্রা করিবে যেখানে থাকিয়া সে কেবল অজানা জিনিষ দেখিবে। তাহার দেখা আর কোন কালে ফুরাইবে না।

উদয়তারা মশার কামড় হইতে বাঁচাইবার জন্য অনন্তর গাটুকু শাড়ীর আঁচলে ঢাকিয়া দিয়াছিল আর শক্ত পাটাতনে কষ্ট পাইবে বুঝিয়া মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া

নিয়াছিল। আর বুকের উপর দিয়া বাঁ হাতখানা বাড়াইয়া শাড়ীর কিনারাটা পাটাতনের সঙ্গে চালিয়া রাখিয়াছিল, যেন অনন্তর গা থেকে শাড়ীটুকু সরিয়া না যায়। সেই হাতখানা ছেলেটা নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে হাতড়াইতেছে মনে করিয়া সে শাড়ীটুকু গুটাইয়া কোল হইতে অনন্তর মাথাটা নামাইয়া দিল। ডাকিয়া বলিল : অনন্ত উঠ।

অনন্ত জাগিয়া উঠিয়া দেখে দুনিয়ায় আর এক রূপ। তারায় ভরা আকাশের তলায় অদূরে নদী অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেক দূরের আকাশের তারায় তারায় যেন সড়ক বাঁধিয়াছে।, না জানি কত সুন্দর সে পথ, আর সে পতে চলিতে না জানি কত আনন্দ : পায়ের নীচে কত তারার ফুল মাড়াইয়া চলিতে হয়, আশে পাশে, মাথার উপরে, খালি তারার ফুল আর তারার ফুল। সে পথ কত উপরে। অনন্ত কোনদিন তার নাগাল পাইবে না। কিন্তু দেবতারা প্রসন্ন। তিতাসের স্থির জলে তারা তারই একটা প্রতিরূপ ফেলিয়া রাখিয়াছে। সেটা খুব কাছে। বনমালী একটু বার গাঙ দিয়া নাও বাহিলেই সে পথে অনন্ত নৌকা হইতেই পা বাড়াইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু জলের ভিতরে সে পথ। কেবল মাছেরাই সে-পথে চলাফেরা করিতে পারে। অনন্ত তো মাছ নয়। তারার স্বল্প আলোয় নদীর বুক ঝাপসা, সাদা। তারই উপর দুই একটি মাছ 'ফুট' দিতেছে আর তারাগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। অনন্তর বিস্ময় জাগে। উপরে তো ওরা এক এক জায়গায় আটিয়া লাগিয়া আছে; জলে কি তবে তারা আল্‌গা? মাছেরা কেমন তাদের কাঁপাইতেছে, নাচাইতেছে; তাদের লইয়া ভাইবোনের মত খেলা করিতেছে। কি মজা! অনন্তর মন মাছ হইয়া জলের ভিতর ডুব দেয়।

বনমালীর নাও তখন পল্লীর কোল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। বর্ষাকালের বাড়তি জল কেবল পল্লীকে ছোঁয় নাই, চুপে চুপে ভরাইয়া দিয়াছে। পল্লীর কিনারায় প্রহরীর মত দাঁড়ানো কত বড় বড় গাছের গোড়ায় জল শুধু পৌছায় নাই, গাছের কোমর অবধি ডুবাইয়া দিয়াছে। সে গাছে ডাল-পালারা লতায় পাতায় ভর ভরন্ত হইয়া জলের উপর কাত হইয়া মেলিয়া রহিয়াছে। বনমালীর নাও এখন চলিয়াছে তাদের তলা দিয়া, তাদেরই ছায়া মাথায় করিয়া। এখন তারায় ভরা আকাশটাও দূরে, আকাশের আর্শির মত নদীর বুকখানাও তেমনি দূরে।

অনন্ত অত মনোযোগ দিয়া কি দেখিতেছে? না, আকাশের তারা দেখিতেছে। উদয়তারার একটা ছড়া মনে পড়িয়া গেল। এতক্ষণ বিশ্রী নীরবতার মধ্যে তার ভাল লাগিতেছিল না। আর এক ফোঁটা একটা ছেলের সঙ্গে কিই বা কথা বলিবে! আলাপ জমিবে কেন? পাড়া গুলজার করাই যার কাজ, নির্জন নদীতীর বুক গুলাজার করিবে সে কাকে লইয়া? শ্রোতা কই, সমজদার কই? কিন্তু অনন্ত আর সব ছেলেদের মত অত ফাঁকা নিরেট নয়। আর সব ছেলেরা যখন চোখ বুজিয়া ঘুমায় অনন্ত তখন অজানাকে জানিবার জন্য আকাশের তারার মতই চোখ দুইটি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর উদয়তারার ছড়াটিও তারারই সম্বন্ধে : সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই; সুশয্যা পইড়্যা রইছে শুইবার লোক নাই, সু-মড়া মইরা রইছে, পুড়াইবার লোক নাই। ক' দেখি অনন্ত এ-কথার মান্‌তি কি?

এ-কথার মানে অনন্ত জানে না; কিন্তু জানিবার জন্য তার চোখ দুইটি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

সুফুল ছিইট্যা রইছে—একথার মানতি আসমানের তারা। আসমানে ছিইট্যা রইছে,—তুলবার লোক নাই।

বটে! মানুষের হাত অত দূরে নাগাল পাইবে না। কিন্তু স্বর্গে যে দেবতারা থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী শিবঠাকুর, তারাও কি তুলিতে পারে না?

তারা ইচ্ছা করিলে তুলিতে পারে, কিন্তু তুলে না। তারাই ছিটাইয়া দিয়াছে, তারাই তুলিবে? রোজ রাতে ছিটাইয়া দিয়া তারা মানুষেরে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, দিলাম ছিটাইয়া, কেউ যদি পার তুলিয়া নেও। কিন্তু তুলিবার লোক নাই। অখন দেবতাদের পূজা হইবে কি দিয়া। শেষে তারা মাটীতে নকল ফুল ফুটাইয়া ছিল। সে-ফুল রোজ ফুটে, লোকে রোজ তুলিয়া নিয়া পূজা করে, যে-সব ফুল তোলা হয় না, তারা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। বাসি হইয়া থাকে না। বাসি ফুলে ত পূজা হইতে পারে না।

দেবতারা ডাকিয়া বলে, কিন্তু শুনিতে পাই না ত?

দেবতাদের ডাক সকলে বুঝে না। সাধুমহাজনেরা বুঝে। তারা তপ করে, ধেয়ান করে, পূজা করে। তারা দেবতার কথা বুঝে, দেবতারে খাওয়াইতে ধোয়াইতে পারে। তারা দেবতার কথা শুনে দেবতা তাদের কথা শুনে।

আমার মার কথাও দেবতা শুনিত। একদিন—কালীপূজার দিন দেবতার একেবারে কাছে গিয়া মা কি যেন বলিয়াছিল। আমাকে কাছে যাইতে দেয় নাই লোকে। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, কিছু শুনিতে পাই নাই।

আরে, এমন পূজাত আমরাও করি। আমি একথা বলি না। আমি বলি সাধুমহাজনদের কথা। তারা কি ভাবে দেবতার কথা বুঝে। দেবতার মূর্তি যখন চোখের সামনে থাকে, দেবতা তখন চুপ করিয়া থাকে। দেবতা যখন চোখের সামনে থাকে না, তখন দেবতার মনে আর সাধুমহাজনের মনে কথাবার্তা চলে। আমি বলি সেই কথা। চোখে দেখিয়া কথা শুনি, সেত মানুষের কথা, চোখে না দেখিয়া কথা শুনি, সেই হইল দেবতার কথা।

সে কথা যারা, যে-সব সাধুমহাজনেরা শুনিতে পায় তারা সেই সুফুল তুলে বুঝি!

তুলে। তবে এই জনমে তুলে না। মাটীর দেহ মাটীতে রাখিয়া তারা যখন দেবতাদের রাজ্যে চলিয়া যায়, তখন তুলে। স্বর্গে রোজ কাঁশীঘণ্টা বাজে, আর একটি মাত্র ফুল তুলিয়া তারা পূজা করে। সে-ফুলটি আবার আসিয়া ছিটিয়া, থাকে!

অনন্তর মনে শেষ প্রশ্ন এই জাগে : গাছ দেখি না, পাতা দেখি না, খালি ফুল ধরতে দেখি। সে-সব ফুল কি তবে বিনা-গাছের ফুল!

মোহাম্মদী : আশ্বিন, ১৩৫২

৪.

শীতল পাটীর মত স্থির, নিশ্চল তিতাসের বুকের উপর একবার চোখ বুলাইয়া উদয়তারা বলিল, আর সুশয্যা পইড়া আছে, শুইবার মানুষ নাই—এর মান্‌তি কই শুন্। সুশয্যা এই গাঙ। কেমন সু-বিছ্ না। ধূলা নাই, ময়লা নাই, উচা নাই নিচা নাই—পাটীর মত শীতল। শুইলে শরীর জুড়ায়, কিন্তু শুইবার মানুষ নাই।

আছে, আছে, একজন আছে। সে অনন্ত। জলের উপর কঠিন একটুখানি আবরণ পাইলে সে হাত পা ছড়াইয়া চিৎ হইয়া কাত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিতে পারে; নদীর স্রোত তাহাকে দেশদেশান্তরে ভাসাইয়া নিবে, ঢেউ তাহাকে দোলা দিবে। চারিদিকের আঁধারে কেউ জাগা থাকিবে না। জাগিয়া থাকিবে সে আর তার চারদিকের আঁধার আর উপরের আকাশের তারাগুলি। আর জাগিয়া থাকিবে জলের মাছগুলি। সে ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া তারাও তার চারিধারে দল বাঁধিয়া ভাসিয়া চলিবে। জাগিতে জাগিতে ক্লান্ত হইয়া এক সময় তার ঘুম আসিবে; রাত ফুরাইবে, কিন্তু ঘুম ভাঙিবে না, সকাল হইবে, সূর্য উঠিবে, এ-পার ও-পার দুই পারের ছেলেমেয়ে নারী পুরুষ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া দেখিবে আর ভাবিবে অনন্ত বুঝি জলে পড়িয়া গিয়াছে। হায় হায় কি হইবে, অনন্ত জলে পড়িয়া গিয়াছে। আমার তখন ঘুম ভাঙিবে, তাহাদের দিকে চাহিয়া চোখ কচলাইয়া মৃদু হাসিয়া আমি তখন জলের উপর উঠিয়া বসিব, তারপর আস্তে আস্তে হাঁটিয়া তাহাদের পাশ কাটাইয়া দিনের কাজে চলিয়া যাইব।

অনন্তর কল্পনার দৌড় দেখিয়া উদয়তারা হাসিয়া উঠিল : দেহে প্রাণ থাকতে কেউ নদীর উপর শোয় না রে; প্রাণপাখী যখন উইড়্যা যায়, দেহ তখন শূন্য খাঁচা। যারা পোড়াইতে পারে না, জলসই করিয়া ভাসাইয়া দেয়। এই জল-বিছনায় শুইবার মানুষ শুধু সে। তুই শুইতে যাবি কোন্ দুঃখে! তুই কি লখাই পণ্ডিত?

হ, আমি লখাই পণ্ডিত! মোটে একটা আখর শিখলাম না, আমি হইলাম পণ্ডিত।

আরে পড়া-লেখার পণ্ডিতের কথা কই না, কই সদাগরের ছেলের কথা। লখাই ছিল চান্দসদাগরের ছেলে। কালনাগের দংশনে মারা গিয়াছিল। তখন একটা কলাগাছের ভেলায় করিয়া তারে জলে ভাসাইয়া দিল, আর উজান ঠেলিয়া সেই ভেলা ভাসিয়া চলিল। তার বৌ ভেলইয়া সুন্দরী ধেনুক হাতে লইয়া নদীর তীরে থাকিয়া ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

লখাই পণ্ডিত ত মরা। একা একা ভেলইয়া সুন্দরী চলিল—কোন সদাগরের নাও তাহাকে তুলিয়া নিয়া গেল না?

ধনাগোদার ভাই মনাগোদা নিতে চাহিয়াছিল; ভেলইয়া তাকে মামাশ্বশুর ডাকাতে ছাড়িয়া দিল। মামাশ্বশুর ডাকিলে সকলেই ছাড়িয়া দেয়।

অ, বুঝিলাম। ভাসিতে ভাসিতে তারা গেল কৈ?

গেল স্বর্গে। সেখানে দেবগণের সভাতে ভেলইয়া সুন্দরী নিত্য করিল, করিয়া মহাদেব আর চণ্ডীকে খুশী করিল। তাদের আদেশে মনসা তখন লখাই পণ্ডিতেরে জিয়াইয়া দিল।

মরা মানুষেরে জিয়াইয়া দিল ত!

হ। জিয়াইতে গিয়া দেখে পায়ের গোড়ালী নাই। মাছে খাইয়া ফেলিয়াছে!

মরা ছিল বলিয়াই খাইয়াছে। জ্যান্ত থাকিলে লখাই পণ্ডিত মাছদের ধরিয়া ধরিয়া বাজারে নিয়া বেচিত! কিন্তু নদীর উজান ঠেলিতে ঠেলিতে একদম স্বর্গে যাওয়া যায়? যেখানে দেবতারা থাকে?

হাঁ। নদীর সিজ্জন হইয়াছে হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসারে মিলন হইয়াছে। দুধিষ্ঠির মহারাজা সেই দেশে গিয়া, তারপর হাঁটিয়া স্বর্গে গেল।

চাঁদের দেশে তারার দেশে রামধনুকের দেশে তাহা হইলে হাঁটিয়াও যাওয়া যায়। আর একটু বড় হইলে যখন রোজগার করিতে পারিবে তখন হাতে কিছু পয়সা হইবে। সেই সময় অনন্ত একবার নদীর তীর ধরিয়া হিমাইল রাজার দেশে একবার যাইবে, আর সে-দেশ হইতে পায়ে হাঁটিয়া স্বর্গে যাইবে।

আচ্ছা বুঝলাম। সুমরা মইরা রইছে, একথার মাস্তি কি?

এর মাস্তি মরা গরু। থাকতে কত আদর যত্ন, মরলে কেউ পোড়ায় না।

অনন্তর সব শ্রদ্ধা প্রণতি হইয়া লুটাইয়া পড়ে : তুমি অত জান! তোমারে নমস্কার।

নৌকাটা হঠাৎ কিসে ধাক্কা খাইয়া থামিয়া গেল। কোমর-জলে দাঁড়ানো মোটা মোটা গাছেরা জলের উপর দিয়া অনেক ডাল মেলিয়াছে, অজস্র পাতা মেলিয়াছে। সেই ডালপাতার গহন্যারণ্য মাথায় করিয়া নৌকা ঘাটের মাটীতে ঠেকিয়াছে। উদয়তারার তন্দ্রা আসিয়াছিল। সচকিত হইল। বনমালী পাছার খুঁটি পুতিতেছে, নৌকার একটানা ঝাঁকুনিতে টের পাইল উদয়তারা। সুদিনে তার বিবাহ হইয়াছিল, সুদিনে সে এখান হইতে বিদায় হইয়াছে। তখন এসব জায়গা ছিল ডাঙা। জল ছিল অনেক দূরে, গাঙের তলায়।

তারপর উদয়তারার কত বর্ষা কাটিয়াছে জামাইবাড়ীতে। এখানে কোন বর্ষার মুখ বিহের পর থেকে দেখে নাই। তবু পরিচিত গাছগুলি আঁধারেও তার মনে জলজল করিয়া উঠিল। তার তলার মাটী তখন শুকনো ঠন্‌টনে, সে মাটীতে বসিত চাঁদের হাট। ছেলেরা খেলিত গোল্লাছুট খেলা, আর মেয়েরা খেলিত পুতুলের ঘরকন্নার খেলা। কত ঠাণ্ডা ছিল এর তলার বাতাস। আর এখন এর তলায় ঠাণ্ডা জল থই থই করে। উদয়তারার বয়সী মেয়েরা চলিয়া গিয়োছে পরের দেশে পরের বাড়ীতে, আর ছেলেরা এখন বড় হইয়া এ জলে স্নান করে।

পান সুপারীর তিনকুণা থলিয়া, একখানা কাপড় আর টুকিটাকি জিনিষের একটা ছোট পুঁটুলি গুছাইয়া উদয়তারা অনন্তর হাত ধরিয়া মাটীতে পা দিল। অত্যন্ত পিছল।

হুঁস কইরা পাও বাড়াইস্ অনন্ত। না হইলে পইড়া যাবি। যে পিছ্লা!

পদে পদে পতনোম্মুখ অনন্ত শখ করিয়া উদয়তারার হাত-খানা ধরিয়া বলিল : আমি পইড়া যাই। তুমি ত পড় না।

আমার বাপ-ভাইয়ের দেশ। চিনা-পরিচিত সব। বর্ষায় কত লাই-খেলাইছি, সুদিনে কত পুতুলখেলা খেলাইছি।

খেলায় বুঝি খুব নিশা ছিল তোমার!

আমার আর কি ছিল! নিশা ছিল আমার বড় ভইন নয়নতারার। ছোট ভইন আসমানতারারও কম ছিল না। এই খেলার জন্যে মায়ে বাবায় কত গালি মন্দ পাড়ছে। পাড়ার লোকে কত সাত কথা শুনাইছে। তিন ভইনে একসাথে খেলাইছি বেড়াইছি। কারোরে গ্রাহ্য করি নাই। তারপর তিন দেশে তিন ভইনের বিয়া হইয়া গেল।

সেই অবধি দেখা নাই বুঝি?

না। গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু ভইনে ভইনে দেখা হয় না। বড় ভালমানুষ আমার বড় ভইন নয়নতারা আর ছোট ভইন আসমানতারা।

তারার মেলা। অনন্ত নামগুলি একবার মনে মনে আওড়াইয়া লইল।

বনমালীর একার সংসার। বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে অত রাতে ঘরের ভিতর আলো জ্বলিতেছে। আশ্চর্য হইবার কথা। সাড়াশব্দ না করিয়া উদয়তারা হাঁটুর সাহায্যে দরজায় ধাক্কা দিলে দরজা মেলিয়া গেল এবং আশ্চর্যের সহিত দেখা গেল নয়নতারা আসমানতারা দুইজনই ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে—মেঝো বোন উদয়তারারই গল্প। অতদিন পরে দুই বোনেরে একসঙ্গে পাইয়া উদয়তারা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িল।

কি কইরা আইলি তোরা এদারুণ বইস্যা কালে?

আসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বিদেশে মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনের বরের হয় দেখা। তারা ঠিক করিয়া ফেলে, অমুক মাসের অমুক তারিখে পরিবার নিয়া এখানে মিলিত হইবে। সেকথার খেলাপ করে নাই।

তারা দুই জনা কই?

পাড়া বেড়াইতে গেছে!

ত তোরা পাড়া বেড়াইতে গেলি না?

আমরা রাইতে পাড়া বেড়াই না, বেলাবেলি পাড়া বেড়ান শেষ কইরা ঘরে দুয়ারে খিলি দিয়া রাখি। তোরা গোকনগাঁওয়ের মান্ষেরা বুঝি রাইতে পাড়া বেড়াস্?

বড় বোনের দিকে চোখ নাচাইয়া উদয়তারা গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিল : জানি গো জানি নয়ানপুরের মানুষ; সবই জানি; অত ঠিসারা কইর না।

এমন সময় তারা দুইজন আসিল। ছোট বোনের জামাই সঙ্গে, কাজেই নয়নতারা ও উদয়তারা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। কেবল আসমানতারার ঘোমটা কপালের নীচে নামিল। বড় বোনদের দুর্দশা দেখিয়া সে মৃদুমৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

মালোদের দূরের মানুষের সঙ্গে দেখা হইলে আগেই উঠে মাছের কথা। কুশল মঙ্গলের কথা উঠে তার অনেক পরে। নয়নতারার বরের সামনের দিকের কয়েকটা দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। গোছায় গোছায় চুল পাকিয়া উঠিয়াছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ীগোঁফেও শাদা-কালোর মেশাল। যৌবন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে—তবু গায়ের সামর্থ্যে ভাঁটা পড়ে নাই। মেজশালীর হাত হইতে হুকাটা হাতে করিয়া, মুখে লাগাইবার আগে জিজ্ঞাসা করিল, তিতাসে আজকাল মাছ কেমন পাওয়া যায়?

ঘরের বৌয়ানি ঘরে থাকি, আমি কি জানি মাছের খবর। আমারে কেনে, পুরুষেরে যদি পাও জিগাইও।

জীবনে দেখ্‌লাম না তোমার পুরুষ কেমন জন! সঙ্গে আননা কেনে?

পুরুষ কি মাথার বোঝা যে, সঙ্গে আনা আর ফেলিয়া আসা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা!

মাথার বোঝা হইবে কেনে। হাতের কঙ্কন, গলার পাঁচ নহরী। সঙ্গে আন ত শরীরের শোভা। না আন ত খালি শরীর।

শীতলীয়া কথা কইও না সাধু; হাতের কঙ্কন হাতে থাকে, গলার হার গলায় থাকে। আর সেই মানুষ তিতাসে মাছ ধরিতে চলিয়া যায়। বাড়ি আসিলে যদি বলি যে অনেক দিন দাদারে দেখি নাই, চলনা একদিন গিয়া দেখিয়া আসি, বলে, দাদারে নিয়াই সংসার কর্ গিয়া। তোরে আমি চাই না। শুনছ কথা!

ভুল বুঝছো দিদি। মনপ্রাণ দিয়া চায় বলিয়াই চাই না বলিতে পারিয়াছে।

তার গলার মোটা তুলসীমালার দিকে চাহিয়া উদয়তারার খুবশ্রদ্ধা হইল। আরও শ্রদ্ধা হইল যখন দেখিল, তার চোখ দুইটি আবেশমাখা–মুখ ভাবময় হইয়া উঠিতেছে–সে গান ধরিয়াছে–ও চাঁদ গৌর আমার শঙ্খ শাড়ি, ও চাঁদ গৌর আমার সিঁথির সিন্দুর চুল-বান্ধা দড়ি, আমি গৌর-প্রেমের ভাও জানি না ধীরে ধীরে পাও ফেলি!–গানের তালে তালে তার মাথাটাও দুলিতে লাগিল।

পরিবেশের আধ্যাত্মিক ভাবটা একটু ফিকা হইয়া আসিলে উদয়তারা বলিল, দেখ মানুষ আমার একখান কথা! দাদার জন্য কিছু একটা করলা না। এমন অবিবাহিত কার্তিক হইয়াই দাদা দিন কাটাইবে? দাদার মাথায় কি শোলার মটুক কোন কালেই উঠিবে না?

বনমালীর কথা কও? তুমি ত জান দিদি, মা বাপ ভাই বেরাদর যার নাই ক্ষেত পাথার জাগা জমি যার নাই, টাকা কড়ি গয়নাগাটী যার নাই তারে লোকে মাইয়া দেয়? অন্ততঃ তিনশো টাকা কামাই করতে পারত ত দেখ্‌তাম–মাইয়ার আবার অভাব।

তিনশো টাকা! পর পর তিনটা বোনের বিবাহ হইয়াছে বাবা বাঁচিয়া থাকিতে। পণ লইয়াছে তিনশ টাকা করিয়া। আর এই টাকা দিয়া সমাজের লোকেরে খাওয়াইয়াছে। এখন বনমালীর নিকট হইতেও তিনশ টাকা পণ লইয়া মেয়ের বাপ তার সমাজকে খাওয়াইবে। কি ভীষণ সমস্যা! উদয়তারা চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, ভাবতেছিলাম তোমার একটা ভইনটইন থাক্‌লে দিয়া দেও।

আপন ভইন নাই, আছে মামাতো ভইন। কিন্তু আমার কোন হাত নাই!

এমন সময় বনমালী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিল। তার হাতে কাঁধে কোমরে অনেক কিছু মালপত্র। আতপ চাউল, গুড়, তেল–এসব পিঠা করার সরঞ্জামও আনিতে ভুলে নাই।

অনন্ত বিছানার একপাশে বসিয়া এতক্ষণ নীরবে তাহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। এইবার বড় বোন নয়নতারার দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িল। প্রত্যেকটি কথা যেন ছেলেটা গিলিয়া খাইতেছে, প্রত্যেকটা লোককে যেন নাড়ীর ভিতর পর্যন্ত দেখিয়া লইতেছে, এমনি কৌতূহল।

এরে তুই কই পাইলি?

এ আমার পথের পাওয়া।

এ ত মুনিষ্যি নয় ভইন।

কি কইরা বুঝলে দিদি?

চোখ দুইটা বড় বড়; কি রকম কইরা চায়। নিজে একখান কথা কয়না কিন্তুক সকল কথা বুইঝ্যা চুপ কইরা থাকে। এ কাল সাপ তুই কৈ পাইলি!

অনন্ত বড় ভাল ছেলে দিদি। ওর মা বাপ নাই। সুবলার বউ রাঁড়ি পালিয়া মানুষ করিতেছিল, পরে নি বুঝে পরের মর্ম, একদিন তাড়াইয়া দিল। বড় মায়া লাগল আমার। নিয়া নিলাম। যদি কোনোদিন কাজে লাগে।

বলিস কি বোন, পরের একটা ছেলে–মাটির পুতুল নয়, কাঠের পুতুল নয়, একটা ছেলে এমনি কইরা পাইয়া গেলি? একি দেশে মানে না দুনিয়া মানে। পেটে ধরলি না, মানুষ করলিনা, পথের পাওয়া–তাই কি তোর আপন হইয়া গেল? এমন কইয়া পরের

ছেলে যদি আপন হইয়া যাইত তা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? কিন্তু হয় না—পরের পুত কুত্তার মুত, দুইদিন কর খেলামেলা, চইল্যা যাইব দুপুইরা বেলা। বড় বেইমান ভইন। পরের ছেলে বড় বেইমান!

অনন্ত বোধ হয় তেমন বেইমান হইবে না।

না, হইবে না। এইত একটু আগে বললি, সুবলার বউ না কি, মানুষ করিতেছিল—কই তার নামও তো চান্দে মুখে আনিতেছে না!

সে যে তাড়াইয়া দিয়াছে।

হ্যাঁ তাড়াইয়া দিয়াছে। এতদিন খাওয়াইছে ধোয়াইছে, আর একদণ্ডের রাগে কি করিয়া ফেলিয়াছে, এতেই তাড়াইয়া দেওয়া হইল!

তুমি জান না দিদি, সে মাগী বড় বজ্জাত। সব পারে সে। এক বছরের মায়া মমতা এক পলকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে। নইলে এমন চাঁদের মত ছেলেকে ঘরের বাইর করিতে পারে? বড় বজ্জাত সে মাগী।

বনমালী ও পুরুষ দুইজন একটু আগেই অন্য ঘরে চলিয়া গিয়াছিল—কোন্ খালে কোন্ বিলে কোন্ সালে কত মাছ পড়িয়াছিল, তারই সম্পর্কে তর্কাতর্কি তখন উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে আর এঘর হইতে শোনা যাইতেছে। আসমানতারার বরের গলা সকলের উপরে। সরেস জেলে বলিয়া প্রতিবেশী দশ বারো গাঁয়ের মালোদের মধ্যে তার নাম ডাক আছে। সেই গর্বে আসমানতারা বলিল, আমারে দিয়া দে দিদি, আমি খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া মানুষ করিতে থাকি। পরে একদিন বেইমান পাখীর মত উড়িয়া যাইবে কিন্তু আমার কোন দুঃখ হইবে না।

তোর ত দিন যায় নাই ভইন। ঈশ্বরে তোর কোলে ছেলে দিবে—কিন্তু আমারে কোনকালে দিবে না—এরে দিলে আমি নাচতে নাচতে নিয়া যাই! হা হা হা—

নিঃসন্তান বুকের বেদনা নয়নতারা হাসিয়া হাল্কা করিল।

কি আশ্চর্য! তিন বোনের কারো কোলে ছেলে নাই! মেয়ে মানুষের আবার ছেলে থাকিবে না কেন? তবে যাদের না থাকে, তারা যে মনঃকষ্টে দিন কাটায়, তারা যে নিজেকে খুব ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করে, তা তো কথাবার্তা থেকেই বুঝা গেল। কনিষ্ঠ বোনের দিন এখনও যায় নাই সন্তান হইবার। বাকী দুজন থেকে এ আলাদা, দেখিতেও আলাদা। কানের উজ্জ্বল দুইটি সোনার মাকড়ী প্রদীপের আলোতে জ্বল জ্বল করিতেছে। দুই বাহুতে দুইটা মোটা সোনার অনন্ত, গলায় একটা হার! আমাকে নিতে চাহিতেছে। এই সুন্দরী, স্বল্পভাষী, ধনবানের স্ত্রী ছোট বোনটিও আমাকে নিতে চাহিতেছে। কেন আমি কি দোকানের গামছা না সাবান! কোন্ সাহসে আমাকে কিনিয়া নিতে চায়। এসব কথা মনে মনেই ভাবিল। প্রকাশ করিয়া বলিল না।

অনন্ত ও অন্যান্য পুরুষ মানুষদের খাওয়া হইয়া গেলে তিন বোনে এক পাতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খাইল। তারপর পাশের ঘরে তিন পুরুষের বিছানা করিয়া দিয়া, অনন্তকে এ ঘরে শুয়াইয়া, তিন বোনে পিঠা বানাইতে বসিল।

রাত অনেক হইয়াছে। প্রদীপের শিখা তিন বোনের মুখে হাতে কাপড়ে আলো দিয়াছে। পিছনের বড় বড় ছায়া দেওয়ালে গিয়া পড়িয়াছে। ভাবে বুঝা গেল তারা আজ সারা রাত না ঘুমাইয়া কাটাইবে।

ঘুম আসিলে কি করিব—ছোট বোন জিজ্ঞাসা করিল।

উদয়তারা শিলোকের রাজা। শিলোক দিবে, আর আমরা মান্‌তি করতে থাকি—ঘুম তা হইলে পলাইবে। বলিল বড় বোন।

উদয়তারা একদলা কাই হাতের তালুতে দলিতে দলিতে বলিল : হিজল গাছে বিজল ধরে সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে—কও এ কথার মান্তি কি?

এ কথার মান্তি হাট। বলিল আসমানতারা।

আচ্ছা,—পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠুকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে?

বড় বোন মানে বলিয়া দিল—কুয়াসা।

আচ্ছা—চার ভাই আমার টাকুর টুকুর, চার ভাই আমার ঘির্তমাখা, দুই ভাই আমার শুক্‌না কাঠ, এক ভাই আমার পাগ্‌লা নাট!

ছোট বোন খানিক চুপ থাকিয়া দেখিল বড় বোন বলিতে পারিতেছে না। তখন সে বলিয়া দিল—গরু!

এইভাবে অনেকক্ষণ চলিল। অনন্তর খুব আমোদ লাগিতেছিল, কিন্তু ঘুমের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া পারিল না। শুনিতে শুনিতে অনন্ত এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

নিশুতি রাতে আপনা থেকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিন বোন তখনও অক্লান্ত ভাবে হেঁয়ালী বলিতেছে আর হাত চালাইতেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুদিয়া অনন্ত তখনও কানে শুনিতেছে—আদা চাক্ চাক্ দুধের বর্ণ এ শিলোক না ভাঙাইলে বৃথা জন্ম।

এর মান্তি—টাকা, বলিয়া এক বোন পাল্টা তীর ছাড়ে—

ভোরের আঁধার ফিকা হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তর ঘুম পাতলা হইয়া আসিল। উঠান দিয়া কে গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে : রাই জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো, বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই জাগো গো!

অনন্ত উঠিয়া পড়িল। পিঠা বানাইতে বানাইতে তিন বোন কখন এক সময় শুইয়া পড়িয়াছিল। অর্ধসমাপ্ত পিঠাগুলি অগোছানো পড়িয়া আছে, আর তিন বোনে জড়াজড়ি করিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রদীপটা এখনও জ্বলিতেছে, তবে উস্কাইয়া দেওয়ার লোকের অভাবে আর জ্বলিতে পারিবে না, এ স্বাক্ষর তার শিখায় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

অনন্ত বাহিরে আসিল। ও-ঘরে তিনজন ঘুমাইয়াছিল, তারা নাই। শেষরাতে বনমালী জালে গিয়াছে, অতিথি দুজনও সঙ্গে গিয়াছে, এখানকার মাছধরা সম্বন্ধে জানিবার বুঝিবার জন্য।

পূবের আকাশ ধীরে ধীরে খুলিতেছে। স্নিগ্ধ নীলাভ মৃদু আলো ফুটিতেছে। চারিদিকে একটানা ঝিঁঝির ডাক। গাছে গাছে হাজার পাখীর কলরব। মন্দিরা বাজাইয়া লোকটা এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় চলিয়া গিয়াছে। তার গানের শেষ কলি মন্দিরার টুন্‌টুনাটুন আওয়াজের সাথে অনন্তর কানে আসিয়া বাজে : শুক বলে ওগো সারী কত নিদ্রা যাও, আপনে জাগিয়া আগে বন্ধুরে জাগাও; আমার রাই জাগো গো, আমার ধনী জাগো গো, বৃন্দাবন বিলাসিনী, রাই জাগো গো!

অনন্ত উঠানের পর উঠান পার হইয়া চলিল। যুবকরা সব নদীতে গিয়াছে। বাড়ীতে আছে বুড়ারা আর বৌ ঝি মায়েরা। বুড়ারা সকালে উঠিয়া তুলসীতলায় প্রণাম

করিতেছে। প্রত্যেক বাড়ীতে তুলসীগাছ, উঁচু একটা ছোট বেদীর উপর। দুই পাশে দুই চারিটা ফুলের গাছ। মিষ্টি গন্ধ। বৌরা উঠানগুলি ঝাড়ু দিয়াছে, এখন গোবরছড়া দিতেছে। হাঁটিতে হাঁটিতে এক উঠানে গিয়া দেখে, আর পথ নাই, মালোপাড়া এখানে শেষ হইয়া গিয়াছে।

এরপর গভীর খাদ, তারপর থেকে কেবল পাটের জমি। পুরুষপ্রমাণ পাটগাছ কোমর-জলে দাঁড়াইয়া বাতাসে মাথা দুলাইতেছে। ক্ষেতের পর ক্ষেত, তারপর ক্ষেত, শেষে আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সীমার মাঝে অসীমের এই ভোরের আলোতে ধরা দেওয়ার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে তাহার চক্ষু দুইটি আপনি আনত হইয়া আসিল। প্রকৃতির সঙ্গে তাহার এত নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাধুর্য কিন্তু একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া সে গুনগুন্ করিয়া নরোত্তম দাসের প্রার্থনা গাহিতেছিল, কাছে আসিয়া তাহার মনে হইল, অসীম অনন্ত সংসার পারাবারের ও-পারে আপনা থেকে জন্মিয়াছে যে বৃন্দাজী গাছ, প্রকৃতির একটি ছোট্ট সন্তান তাহার দিকে চোখ মেলিয়া নিজের প্রণতি পাঠাইয়া দিতেছে। কাঁধে হাত দিয়া আবেগের সহিত বলিল, নিতাই, ওরে আমার নিতাই, কাঙালেরে ফাঁকি দিয়ে এতদিন লুকিয়ে কোথায় ছিলি বাপ। আয় আমার কোলে আয়।

তার বাহুর বাঁধন দুই হাতে ঠেলিতে ঠেলিতে অনন্ত বলিল : আমি অনন্ত!

জানি বাবা জানি, তুই আমার অনন্ত। অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া; আমি দান জানি না, ধ্যান জানি না, সাধন জানি না, ভজন জানি না; কেবল তোমারেই জানি। ধরা যখন দিয়েছ, এবার আর ছাড়ব না তোমায়।

অনন্ত বিস্ময়ে অবাক! লোকটা সহসা সম্বিৎ পাইয়া বলিল : হরি হে, একি তোমার খেলা। বারবার মায়াজাল ছিঁড়তে চাই, তুমি কেন ছিঁড়তে দাও না? যশোদা তোমায় পুত্ররূপে পেয়ে কেঁদেছিল, শচীরাণী তোমায় পুত্ররূপে পেয়ে কেঁদেছিল, রাজা দশরথ তোমায় পুত্ররূপে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়েছিল। তবু তোমায় পুত্ররূপে পাওয়ার মধ্যে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ! পুত্ররূপে একবার এসেছিলে, চলে গেলে। ধরে রাখতে পারলাম না। আজ আবার কেন সে স্মৃতি মনে জাগিয়ে তুললে। ভুলতে দাও হরি, ভুলতে দাও! যা বাবা, তুই কার ছেলে জানি না, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যা। আমার এখন অনেক কাজ। গোষ্ঠের সময় হয়ে এল; যাই বাছাকে আমার গোষ্ঠে পাঠাই গিয়ে।

খেলনার মত ছোট একটা মন্দির ঘর। সে ঘরে একখানা রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, আর সালুকাপড়ে মোড়া খানদুই পুঁথি। সেখানে গিয়া সে গান ধরিল : মরি হায় রে কিবা শোভা ...

একটু পরে প্রশস্ত সূর্যালোকে পাড়াটা ঝলকিত হইয়া উঠিল। ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠিল কর্মচাঞ্চল্য। এখানে হাটবাজার নাই। এ গাঁয়ের মালোরা দূরের হাটবাজারে মাছ বেচিয়া আসে। কেউ কেউ মুসলমানের গাঁয়ে গিয়া মাছ দিয়া চাউল ডাইল লঙ্কা পাট আনে। কেউ কেউ মাছ শুকাইয়া শুটকী করে। সূতাকাটা, সূতা পাকানো, শণের দড়ি পাটের দড়ি, কাছি পাকানো, বাঁশের গাঁট কাটিয়া জাল-সই করা, জাল বোনা, ছেঁড়া জাল গড়া, জালে গাব দেওয়া, কারো বাড়ীতে অবসর নাই—সব বাড়ীতে এসব কাজ

সমারোহের মতো চলিতে থাকে। অন্তঃপুরের মেয়েদেরও অবসর নাই। নানারকম মাছের নানারকম ভাজাভুজি ঝোলঝাল রাঁধিতে রাঁধিতে তারা গলদঘর্ম হয়। দুপুর গড়াইয়া যায়।পুরুষেরা সকালে পান্তা খাইয়া কাজে মাতিয়াছিল, মায়েদের আদেশে ছেলেরা গিয়া জানায়, ভাত হইয়াছে, সিনান কর গিয়া। জলে ডুব দিয়া আসিয়া তারা খাইতে বসে। তারপর শুইয়া কতক্ষণ ঘুমায়, সন্ধ্যায় আবার জাল দড়ি কাঁধে করিয়া নৌকায় গিয়া ওঠে। বিরাম নাই।

অনন্তদের গাঁ থেকে এ গাঁ একটু আলাদা। তাদের গাঁয়ে বারো জাতির বাস। মালোরা কালো আর শ্যামলা, কখনো সখনো ফর্সা, কিন্তু সাহা বামুন, তেলি কায়েতেরা সকলেই ফরসা। তারা পরনের ধুতি পায়ের পাতায় ঠেকাইয়া, চাদর গলায় ঝুলাইয়া মাছ কিনিতে আসে, আর মালোরা গামছায় কটি জড়াইয়া, খালি গায়ে তাদের নিকট মাছ বেচে। ওদের সঙ্গে যেসব মালোর মাখামাখি বেশী, আর যে সব মালো শহরে গিয়া উকিল মোক্তারের বাসায় মাছ দেয়, তারা ধুতি পরে হাঁটুর নীচে নামাইয়া। গলাতে একটা চাদরও কেউ কেউ ঝুলায়। সে গাঁয়ের মালোরা ভিন জাতির সঙ্গে বাস করিতে করিতে কেমন যেন দোআঁসলা হইয়া গিয়াছে। কোথায় যেন তাহাদের স্বকীয়তায় ভাঁটা পড়িতেছে। তাদের কালো, আটালে আট সাট সংহতি কোথায় যেন আলগা হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ গাঁয়ে তাহা অটুট। গাঁয়ের সকলেই মালো। তারা চিরদিন মালোই থাকিবে। কায়েত বামুন হইবার ভান করিতে যাইয়া কখনও সংহতি শিথিল করিবে না তারা।

অতিথিবৃন্দ যেমন হঠাৎ একদিন আসিয়াছিল, তেমনি একদিন হঠাৎ বিদায় ইহয়া গেল। উদয়তারার ঘর হাসি গান আমোদ আহলাদে থই থই করিতেছিল, নীরব হইয়া গেল।

শ্রাবণ মাস, রোজই রাতে পদ্মাপুরাণ গান হয়। বনামলী রাতের জালে আর যায় না। দিনের জালে যায়। আর রাত্রি হইলে বাড়ী বাড়ী পদ্মাপুরাণ গান গায়। এক এক রাত্রে এক এক বাড়ীতে আসর হয়। সুর করিয়া পড়ে সেই সাধুবাবাজী। যে-জন রোজ ভোরে মন্দিরা বাজাইয়া পাড়ায় নাম বিতরণ করে, যে-জন অনন্তকে সেদিন ভোরে নিতাইর অবতার বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রধান গায়ক বনমালী। তার গলা খুব দরাজ। হাতে থাকে করতাল। আর দুইটা লোক বাজায় খোল। গায়ক আছে অনেকে। কিন্তু বনমালীর গলা সকলের উপরে। সেজন্য বাবাজী সকলের আগে তাকেই বলে : তোল।

কি? লাচারী না দিশা?

একখানা ছোট চৌকীতে সালু কাপড়ে বাঁধা পদ্মাপুরাণ পুথি। কলমী পুথি। সাধু বাবাজী ছাড়া এযুগের কোনো মানুষের পড়ার সাধ্য নাই। সামনে সরিষা-তেলের বাতি। সল্‌তে উস্কাইয়া চাহিয়া দেখেন যেখান থেকে শুরু করিতে হইবে তাহা ত্রিপদী। বলিলেন : লাচারী তোল।

বনমালী ডানহাতে ডানগাল চাপিয়া, বাঁহাত সামনে উঁচু করিয়া মেলিয়া কাক-স্বরে চিতান ধরিল : মা যে-মতি চায় সে-মতি কর, কে তোমায় দোষে, বল মা কোথা যাই দাঁড়াইবার স্থান নাই, আমারে দেখিয়া সাগর শোষে মা, আমারে দেখিয়া সাগর শোষে।

দুই একজনে দোহার ধরিয়াছিল, যুৎসই করিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিল। ছাড়িল না শুধু অনন্ত। সুরটা অনুকরণ করিয়া বেশ কায়দা করিয়াই তান ধরিয়াছিল সে। মোটা

মোটা সব গলা মাঝপথে অবশ হইয়া যাওয়াতে তার সরু শিশুগলা পায়ের তলায় মাটী-ছাড়া হইয়া বায়ুর সমুদ্রে কাঁপিতে কাঁপিতে ডুবিয়া গেল। তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবাজী বনমালীকে বলিলেন : পুরান সুর। কিন্তুক বড় জমাটি। আজকালের মানুষ শ্বাসই রাখ্‌তে পারে না, এসব সুর তারা গাইবে কি মতে! যারা গাইত তারা দরাজ গলায় টান দিলে তিতাসের ও পারের লোকের ঘুম ভাঙত। কর্ণে করত মধু বরিষণ। এখন সব হালকা সুর। হরিবংশ গান, ভাইটাল সুরের গান এখন নয়া বংশের লোকে পারে না গাইতে, গ্রামে গ্রামে যে দুইচার জন পুরাণ গাতক এখনো আছে, তারা গায়, আর গলার জোর দেইখ্যা জোয়ান মানুষে চমকায়! সোজা একটা লাচারী তোলো বনমালী।

বনমালী সহজ ভাবেই তুলিল : সোণার বরণ দুইটি শিশু ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে গো, আমি দেইখে এলাম ভরতের বাজারে।

বাবাজী বলিলেন : না এখানে এ লাচারী খাটে না। কাল প্রহলাদের বাড়ীতে লখিন্দরেরে সর্পে দংশন করছিল; এখন তারে কলার ভেলাতে তোলা হইছে, ভেলা ভাস্‌ব, যাত্রা করব উজানীনগর আর, গাঙের পারে পারে ধেনুক হাতে যাত্রা করব বেহুলা। দিশা কইরা তোলো!

ও, ঠিক অইছে : সুমন্ত্র চইলে যাওরে-এ-এ আরে যাত্রা কালে রাম নাম।

রামায়ণের ঘুষা তুল্‌ছ, তরণীসেন যুদ্ধে যাইতেছে। আচ্ছা চল্‌তে পারে।

ভেলা চলিয়াছে নদীর স্রোত ঠেলিয়া উজানের দিকে; তীরে তীরে বেহুলা, হাতে তীর ধনুক। কাক শুকুন বসিতে যায় ভেলাতে, তীর হইতে বেহুলা তীর নিক্ষেপের ভঙ্গি করিলে উড়িয়া যায়। কত গ্রাম, কত নগর, কত হাওর, কত প্রান্তর, কত বন কত জঙ্গল পার হইয়া চলিয়াছে বেহুলা, আর নদীতে চলিয়াছে লখিন্দরের ভেলা। এই খাঁনে ত্রিপদী শেষ হইয়া দিশা শুরু।

এবার চান্দসদাগরের বাড়ীতে কান্দাকাটি। খেদের দিশা তোল।

বনমালী একটু ভাবিয়া তুলিল : সাত পাঁচ পুত্র যার ভাগ্যমতী মা; আমি অতি অভাগিনী একা মাত্র নীল মণি, মথুরার মোকামে গেলা, আরত আইলা না।

এই গানে অনন্তর বুক বেদনায় টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিল।

গানের শেষে পুঁথি বাঁধিতে বাঁধিতে বাবাজী বলিলেন : অমূল্য রতনের মত ছেলে এই অনন্ত। কিষ্ণে তারে বিবেক দিছে, বুদ্ধি দিছে, তবে ভবার্ণবে পাঠাইছে। ইস্কুলে দিলে ভাল বিদ্যা পাইত। তোমরা যদি বাধা না দেও, চারদিকে বর্ষা, জল শুকাইয়া, মাঠে পথ পড়লে তারে আমি গোপালখালির মাইনর ইস্কুলে ভরতি করাইয়া দেই। বেতন মাপ আর আমি যখন দশদুয়ারে ভিক্ষা করি, কিষ্ণের জীব, তারও এতেই চলতে পারে।

কথাটি উপস্থিত মালোদের সকলেরই মনঃপুত হইল : মালোগুষ্ঠির মধ্যে বিদ্যামান লোক নাই, চিঠি লেখাইতে, তমসুকের খত লেখাইতে, মাছ বেপারের হিসাব লেখাইতে গোপালনগরের হরিদাস সার পাও ধরাধরি করি, ভাল ভাল মাছ খাওয়াই। ও যদি বিদ্যামান অইতে পারে মালোগুষ্ঠির গৈরব।

তবে আর তারে উদয়তারার সাথে গোকন গাঁওয়ে দিয়া কাম নাই, এখানেই রাখ। সামনে তিন মাস পরেই সুদিন।

বনমালী স্বীকৃত হইয়া বাড়ী আসিল।

কয়েক দিন আগে পাড়াতে একটা বিবাহ গিয়াছে। এখন জামাই আসিয়াছে দ্বিরাগমনে। যুবতীরা এবং অনুকূল সম্পর্কযুক্তা বর্ষীয়সীরা মিলিয়া ঠিক করিল জামাইকে আচ্ছা ঠকান ঠকাইতে হইবে। জামাই অনেকগুলি খারাপ কাজ করিয়াছে। প্রথমতঃ সে তাদের জন্য পান বাতাসা, পানের মসলা এ-সব আনে নাই; দুপুরে তার স্নানের আগে মেয়েরা গাহিতে লাগিল : জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র কইলো না। জামাই যদি ভদ্র হইত, বাতাসার হাঁড়ি আগে দিত, জামাই খাইতে জানে নিতে জানে ইত্যাদি! কিন্তু, উঁহুঁ, তাতেও কুলাইবে না। খুব করিয়া ঠকাইতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে জব্দ করা যায় তাকে। একজন সমাধান করিল : ভয় কি, জামাই-ঠকানী আছে, বনমালীর ভইন জামাই-ঠকানী। সকলেই যেন সাঁতারে অবলম্বন পাইল : লইয়া আস জামাইঠকানীকে।

সমাগত নারীদের অবাক করিয়া দিয়া উদয়তারা জানাইল যাইতে পারিবে না।

কি লা উদি, কত জামাইরে সাতঘাটের পানি খাওয়াইলি আর এ জামাইরে পারবি না? খুব পারবি, তুই থাকতে জামাই ছাইতানতলা থেকে নাক কান লইয়া ফিরিয়া যাইবে! উঁহু, তোর যাইতেই হইবে।

কি লাভ গো জামাইরে ঠকাইয়া?

কি লাভ? অনেক লাভ। তোর সুনাম, তোর গেরামের সুনাম। আর তোর সুনামে আমাদের সুনাম।

না, এসব আমার ভালা লাগে না। আমি যাইতে পারব না।

নারীরা স্তব্ধ হইয়া গেল : চড়কপূজার ঢাকের বাড়ি শুনিলে যেমন বেঙ্গার বাপের পিঠের চামড়া লাফালাফি করত; চড়কগাছের চড়কীর বড়সিতে সেই চামড়া ফুঁড়িয়া তাকে না ঘুরাইলে লাফানি কমিত না, তেমনি কারো বাড়ীতে জামাই আসিয়াছে শুনিলে উদির সোনারূপার হাত দুইখানা নাচানাচি করিত। তারে গিয়া না ঠকানো পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইত না। সেই উদয়তারা আজ কয় কি?

শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণও পড়া শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। আর করিয়াছে "জালা বিয়া"র আয়োজন। বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ী ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এ ইতিহাস পুরাণ রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তানীর স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে দীপদানির মত একখানা পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার "নিছিয়া-পুছিয়া" লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গীত গাহিয়া চলে।

পূজার দিন এক সমবয়সিনী ধরিল : দুই বছর আগে তুই আমারে বিয়া কইরা রাখ্ছিলি মনে আছে? এবছর তোরে আমি বিয়া করুম, কেমন লা উদি!

না ভইন্।

তবে তুই কর আমারে।

না ভইন। আমার ভালা লাগে না।

বিয়ের কথায় অনন্তর আমোদ জাগিল : কর না বিয়া, অত যখন কয়।

তুই কস্? আইচ্ছা তা অইলে করতে পারি।

কি মজা উদয়তারা নিজে মেয়ে হইয়া আরেকজন মেয়েকে বিবাহ করিতেছে। দুইজনেরই মাথায় ঘোমটা, কি মজা! কিন্তু অনন্তর কাছে তার চাইতেও মজার জিনিস মেয়েদের গান গাওয়াটা। তারা গাহিতেছে এই মর্মে এক গান : অবিবাহিত বালিকার মাথায় লখাই ছাতা ধরিয়াছে; কিন্তু বালিকা লখাইকে একটাও পয়সা কড়ি দিতেছে না; ওরে লখাই, তুমি বালিকার মাথায় ছাতা ধরা ছাড়িয়া দে, কড়ি আমি দিব। তারপর সেই দোকানে যায় গো বালা ঘট কিনিবারে! সেই ঘটে মনসার পূজা হইল, কিন্তু মনসা নদী পার হইবে কেমন করিয়া। এক জেলে নৌকা নিয়া জাল পাতিয়াছিল। মনসা তাকে ডাকিয়া বলিল : তোর না' খানা দে আমি পার হই, তোকে ধনে পুত্রে বড় করিয়া দিব।

মোহাম্মদী : কার্তিক, ১৩৫২

৫.

উদয়তারার এক ননাসের নাম ছিল মনসা। তাই মনসা-পূজা বলিতে পারে না। স্বামী যেমন মান্য, তার বড় বোনও তেমনি মান্য। বরের পিঁড়ি হইতে নামিয়া সে 'কনে-বৌ' টাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, শাওনাই পূজা ত হইয়া গেল ভইন, সাম্‌নে নাও দৌড়ানি। তারপর? তারপর আর কিছু না। বড় ভালা লাগে এইসব পূজা-পালি হুড়ুম-দুড়ুম নিয়া থাকতে।

কনে-বৌ মাথার ঘুমটা ফেলিয়া দিয়া কাঁসের থালায় ধানদূর্বা পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি তুলিতে বলিল; তারপর অনেক পূজাই ত আছে–দূর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকপূজা, ভাইফোঁটা–

কিন্তু তা যে অনেক পরের কথা। শাওন মাস, ভাদর মাস, তারপরে ত আসিবে বড় ঠাকরাইন পূজা।

তার শাশুড়ির নাম ছিল দূর্গা। তাই দূর্গাপূজাকে বলে সে বড় ঠাক্‌রাইন পূজা।

দুই মাস ত মোটে–তেমন কি বেশী। ক্ষেত পাথরের জল কমিতে লাগিবে পনর দিন। তিতাসের জল কমিয়া তার পারে পারে পথ পড়িতে লাগিবে পনর দিন। তখন বর্ষা শেষ হইয়া গেছে। তখন গাঙ-বিলের দিকে চাও, পরিষ্কার–দিনের দিকে চাও, পরিষ্কার; ঘর-বাড়ীর দিকে চাও–পরিষ্কার। দেখ কি! দেখ না। পরিষ্কার না করিলে পরিষ্কার দেখিবে কি করিয়া! চারিদিকে পূজা-পূজা ভাব। লাগিয়া যাও ঘরবাড়ী পরিষ্কার করার কাজে। কিন্তু কি ঘরবাড়ী পরিষ্কার করবা তুমি? ভাঙা ঘর বাড়ী? না পুরুষ মানুষ আছে কোন্ দিনের লাগি? বর্ষাকালে একটানা বৃষ্টির জলে ধা'র ভাঙিয়াছে, পিড়া ভাঙিয়াছে, ঘনঘন তুফানের ঠেলায় বেড়াগুলি মুচড়াইয়া দিয়াছে। পুরুষেরা ছন আনিবে মুলি আনিবে, বাঁশ আনিবে বেত আনিবে–আনিয়া ঘর দুয়ার ঠিক করিয়া দিবে, তারপর আমরা তিতাসের পারের নরম সোঁদাল মাটী আনিয়া ধা'র পিড়া ঠিক করিব, লেপিব পুছিব, আগের মত ঝক্‌ঝইক্যা তক্‌তইক্যা করিব–তাতে কোন্ না পনর দিন লাগিবে?

বাকী পনর দিনের মধ্যে সাত দিনে কাঁথা কাপড় কাচিব, চাটাই মাদুর ধুইব তারপর সাতদিন বাকী থাকিতে জল সাবান মাখিয়া দেবী হইয়া বসিয়া থাকিব—দিন আবার ফুরায় না। কি লা উদি, কথা কস্ না যে? দিন আমার ফুরায় না।

একটু আগে এই মেয়েটি তাকে সাত পাক ঘুরিয়াছে; প্রদীপ তার কপালের কাছখানে ঠেকাইয়া লইয়া তাহা আবার নিজের কপালে ঠেকাইয়াছে, কতকগুলি খই আর অতসী ফুল তার মাথার উপর ছিটাইয়া দিয়াছে—সত্যিকারের বিবাহের মতই ভাবভঙ্গি দেখাইয়াছে—অথচ অনেক অর্থহীন অনুষ্ঠানের মত ইহা একটি পূজাবিশেষের অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু কি মজার অনুষ্ঠান। সাত বছর আগের কথা মনে করাইয়া দেয়। সেদিন উদয়তারার সামনে বসিয়া ছিল, অজানা একটা নূতন পুরুষ মানুষ—চুলদাড়ী সুন্দর করিয়া ছাঁটা, মাথায় জবজবে তেল দিয়া বাঁকা টেরি কাটা—নূতন কাপড়ে তাকে সেদিন দেবতার মত দেখা গিয়াছিল। বাস্তবিক বিবাহের দিনে পুরুষ মানুষকে কত সুন্দরই না দেখায়। তাকেও কি খুব সুন্দর দেখাইয়াছিল না সেদিন! তিন চারি জনে ধরিয়া তাহাকে চুল আঁচড়ানো, তেল সিন্দুর পরানো, চন্দন-তিলক লাগানো প্রভৃতি প্রসাধন কর্ম করিয়াছিল।

একটা কলার ডিগা সে মানুষটার গালে বুলাইয়াছিল—সে তখন ছোট বালিকা মাত্র, বুকটা তার ভয়ে দুরু দুরু করিতেছিল। চাহিতে পারিতেছিল না লোকটার চোখের দিকে, অথচ চারিদিক হইতে লোকজনে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, চা চা, চাইয়া দেখ, এই সময়ে ভালা কইরা চাইয়া দেখ—চারিজনে পিড়ির চারিটা কূণা ধরিয়া তাহাকে উঁচু করিয়া তুলিয়াছিল—এই সময়ে সে একটুখানি চাহিয়া দেখিয়াছিল—মাত্র একটুখানি, আর চাহিতে পারে নাই, অমনি চোখ নত করিয়াছিল। সেদিন মোটে চাওয়া যায় নাই, তার দিকে। কিন্তু আজ! কতবার চাওয়া যায়, কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু সেইদিনের একটুখানি চাওয়ার মতো তেমন আর লাগে কি; সে চাওয়ার মধ্যে যে স্বাদ ছিল, সে-স্বাদ কোথায় গেল!

ভাবিতে ভাবিতে উদয়তারা একসময় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কনে বৌ চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, কি লা উদি, হাসলি যে?

হাসি পাইল, হাসলাম। আচ্ছা, আমি ত তোর বর হইয়াছিলাম, আমার মুখের দিকে চাইতে তোর সময় লাগে নাই?

শুন কথা। সত্যের বিয়ার বরেরেই লাজ করলাম না, তুই ত আমার জালা বিয়ার বর।

সত্যের বিয়ার বরেরে তোর লাজ করে নাই? কেনে লাজ করে নাই?

সে-কথা এক পরস্তাবের মত। বর আমার বাপের কাছে মুনী খাট্‌ত। মা বাপ কেউ ছিল না তার। সূতা পাকাইত আর জাল বুনত। তখন আমার বয়স আট বছর বরের দশ বছর। বাপ সেইনা সময়ে বিয়া দিল। এক সঙ্গে খেলাইছি বেড়াইছি মাছ ধরছি মাছ কাট্‌ছি, আমি নি ডরামু তারে। একটা মজার কথা কই। আমি ত ফুল ছিট্‌লাম তার মাথায়, তখন, সে যত ছিট্‌তে লাগল, কোন ফুলই আমার মাথায় পড়ল না; ডাইনে বাঁয়ে কাঁধে-পিঠে পড়তে লাগল, কিন্তু মাথায় পড়ল না। কারোরে আমি ছাইড়া কথা কই না, আর সে ত আমাদেরই বাড়ীর লোক। খুব রাগ হইল আমার। তেজ কইরা কইলাম, ভালা কইরা ছিট্‌তে পার না? মাথায় পড়ে না কেনে ফুল? ডাইনে বাঁয়ে পড়ে কেনে? কাজের ভাস্‌সি নাই, খাওনের গোঁস্‌সাই!

বরেরে তুই এমনি এমনি গাল দিলি? তোর ত মুখ কম খরোখরো ছিল না?

আমার কি দোষ, আমি ত খালি একবার দিয়াছি, আমার বাবা আর মা এই গাল তারে দিনে দশবার কইরা দিত! চাকর থাকত কিনা বাড়ীতে! সেইজন্য সকলেই গাল দিত, কিন্তু আমি দিতাম না, দিয়াছিলাম খালি ঐ একবার বিয়ার রাইতে—

তখন বর কি করল?

এক মুঠ ফুল রাগ কইরা আমার চোখে মুখে ছুঁইড়া মারল—

খুব আস্পর্দা ত? তুই সইয়া গেলি!

না।

কি করলি তুই?

এক ভেংচি দিলাম।

তুই আমারে তেমন কইরা এক ভেংচি দে না?

ধেৎ, তুই কি আমার সত্যের বর। তুই যে মেয়ে মানুষ!

তবে আমি তোরে দেই!

ধেৎ, আমরা কি আর এখন ছোট আছি?

কি এমন বড় হইয়া গেছি। বারো বছর বয়সে বিয়া হইয়াছিল, তারপর সাত বছর—মোট উনিশ বছর। এরই মধ্যে বড় হইয়া গেলাম?

বড় হইয়া গেলি কি গেলি না, বুঝতিস্ যদি কোলে দুই একটা ছাউ-বাচ্চা থাক্‌ত। জীবনে একটারও গু-মুত কাচলি না, তোর মন কাঁচা শরীল কাঁচা, তাই মনে হয় বড় হস নাই; যদি হইত, তবে বয়সটাও মালুম হইত।

সেই কথা ক'।

তারপর চারিদিক আঁধার হইয়া আসিল। শাদা শাদা অজস্র সাপলা ফুলে শোভিত, সর্পাসনা মনসা মূর্তিটি অনন্তর চোখের সামনে ঝাপসা হইয়া আসিল, অন্যান্য পূজাবাড়ীগুলিরও গানগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া একসময় থামিয়া গেল। এবারের মত মনসা পূজার এই খানেই ইতি।

শ্রাবণ মাসের শেষ তারিখটিতে মালোদের ঘরে ঘরে এই মনসা পূজা হয়। অন্যান্য পূজার চাইতে এই পূজায় খরচ কম, আনন্দ বেশী। মালোর ছেলেরা ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়া জলে-ভরাট বিলে লগি ঠেলিয়া গিয়া আলোড়ন তোলে। সেখানে পাতাল ফুঁড়িয়া ভাসিয়া উঠে সাপের মতো লিক্‌লিকে সাপলাগুলি। ফুল ফুটিয়া ছড়াইয়া থাকে। যতদূর চোখ যায় কেবল ফুল আর ফুল—শাদা মাণিকের মেলা যেন বসিয়াছে। ঘাড়ে ধরিয়া টান দিলে কোন এক জায়গায় সাপলাটা ছিঁড়িয়া যায়, তারপর টানিয়া তোল—খালি টানো আর টানো, শেষ হইবে না শীঘ্র। এইভাবে তারা এক বোঝাই সাপলা তুলিয়া আনে। মাছেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে,—মালোর ছেলেরা কেমন সাপলা তুলিতেছে—ফাঁকে ফাঁকে মালোর ছেলেরা চাহিয়া দেখে—জল শুকাইবে, বিলে বাঁধ পড়িবে, তখন বেঘোরে প্রাণ হারাইতে হইবে—এসব জানিয়া শুনিয়াও বোকা মাছেরা, কিসের মায়ায় যেন বিলের নিষ্কম্প জলে তিষ্ঠাইয়া আছে, তিতাসের স্রোতাল জলে নামিয়া পড়িলে, অতশীঘ্র ধরা পড়িবার ভয় থাকিবে না, ধরা যদি পড়েও, পড়িবে মালোদের জালে, যেখান থেকে লাফাইয়াও পালানো যায়। কিন্তু নমশূদ্রের বাঁধে পড়িলে হাজারবার লাফাইলেও নিস্তার নাই।

তারপর পুরোহিত আসে। মালোদের পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ। একজন পুরোহিতকে দশ বারো গাঁয়ে একা একদিনে মনসা পূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। গলায় একখানা চাদর ঝুলাইয়া ও হাতে একখানা পুরোহিত দর্পণ লইয়া আসিয়া অমনি তাড়া দেয়—শীঘ্‌গির। তারপর বারকয়েক নম নম করিয়া এক এক বাড়ীর পূজা শেষ করে, দক্ষিণা আদায় করে। এবং আধঘণ্টার মধ্যে সারা গাঁয়ের পূজা শেষ করিয়া তেমনি ব্যস্ততার সহিত কোনো মালোকে ডাকিয়া বলে, অ বিন্দাবন, তোর নাওখান্ দিয়া আমারে ভাটি-সাদকপুরে লইয়া যা।

শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত পদ্মাপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুঁথি সমাপ্ত করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে। সেদিন মালোরা সকালে জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মাপুরাণ গায় আর খোল করতাল বাজায়।

শেষ দিন বনমালীর গলাটা ভাঙিয়া গেল। একহাতে গাল চাপিয়া ধরিয়া, চোখ দুইটা বড় করিয়া, গলায় যথাসম্ভব জোর দিয়া শেষ দিশা তুলিল, বিউনি হাতে লৈয়া বিপুলায়ে বলে, কে নিবি বিউনি লক্ষটেকার মূলে। কিন্তু সুরে আর জোর বাঁধিল না; ভাঙা বাঁশের বাশীর মত বেসুরো বাজিল। অন্যান্য যারা দোহার ধরিবে তাদের গলা অনেকের আগেই ভাঙিয়া গিয়াছে। তারাও চেষ্টা করিয়া দেখিল সুর বাহির হয় না। তিতাসের জলে জেলে যেমন শেষ খেউ মারিয়া জালটা ফেলিয়া দেয় জলে, তেমনি তারা শেষবারের মত হাল-ছাড়া গোছের হইয়া পদ্মাপুরাণ পড়া শেষ করিল। বেহুলা বিজনী বেচিতে আসিয়াছে জায়েদের নিকটে গোপনে ডোমনীর বেশ ধরিয়া। শেষে পরিচয় হইল এবং চাঁদসদাগরের পরাজয় হইল: সে মনসাপূজা করিয়া ঘরে ঘরে মনসার পূজা খাওয়ার পথ করিয়া দিল।

চিরদুঃখিনী বেহুলার জন্য অনন্তের যেমন মায়া হইল, চাঁদ সদাগরের জন্য মায়া হইল তার ততোধিক। কী বিশাল এক পূজাবিদ্রোহীর মস্তক অবশেষে পুরাণ-কারের কলমের খোঁচায় পরাজয় বরণ করিল! কি নির্মম অত্যচার তাহাকে সহিতে হইয়াছিল; মনসার হাতে কি লজ্জাজনক ভাবে তাকে বারবার নাকাল হইতে হইয়াছিল। তবু সে সঙ্কল্পে অটল, কানীর পূজা সে কিছুতেই করিবে না। অবশেষে যাওবা করিল, তাও বাঁ হাতে। মনসা তাহাতেই সন্তুষ্ট। পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের স্পর্দ্ধা তাহাকে সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে শালুকাপড়ে বাঁধা লম্বা ও সরু আকারের এই পুঁথিখানার মধ্যে।

পুঁথিখানা বাঁধা হইতেছে। এক বৎসরের জন্য উহাকে রাখিয়া দেওয়া হইবে। আবার শ্রাবণ আসিলে খোলা হইবে। একটা লোক ঝুড়ি হইতে বাতাসা ও খই বিতরণ করিতেছে। লোকে এক একজন করিয়া খই বাতাসা লইয়া প্রস্থান করিতেছে। যাহাদের তামাকের পিপাসা আছে তাহারা দেরী করিতেছে। এদিকে পূজার ঘরের অবস্থা দেখিলে কান্না পায়। আগের দিন পূজা হইয়াছে। তখন দীপ জ্বলিয়াছিল, ধূপ জ্বলিয়াছিল; দশ বারোটি টিপয়ে নৈবেদ্য-সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সদ্য রং-দেওয়া মনসামূর্তি যেন জীবন্ত হইয়া হাসিতেছিল; আর তার সাপ দুইটা বুঝিবা গলা বাড়াইয়া আসিয়া অনন্তকে ছোঁবলই দিয়া বসে—এমনি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ছিল। আজ তাদের রূপ অন্যরকম। অনিপুণ কারিগরের সস্তায় তৈয়ারী একদিনের জৌলুস রংচটা হইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

কোন্ অসাবধান পূজার্থীর কাপড়ের খুঁটে লাগিয়া একটা সাপের জিব্ ও আরেকটা সাপের ল্যাজ ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের দিকে চাহিলে অনুকম্পা জাগে। রাশি রাশি সাপলা ছিল মূর্তির দুই পাশে। ছেলেরা আনিয়া এখন খোসা ছাড়াইয়া খাইতেছে আর খোসা দিয়া 'বোত্তল' বানাইতেছে। কেউ কেউ সাপলা দিয়া মালা বানাইয়া গলায় পরিতেছে।

অনন্ত এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। একটি ছোট মেয়ে তেমনি কয়েক ছড়া মালা বানাইয়া কাহার গলায় পরাইবে ভাবিতেছিল। অনন্তর দিকে চোখ পড়াতে তাহারই গলায় পরাইয়া দিল। অনন্ত চট করিয়া খুলিয়া আবার মেয়েটির খোঁপায় জড়াইয়া থুইল। চক্ষুর নিমিষে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। মেয়েটির দিকে চাহিলে প্রথমেই চোখ পড়িবে এই খোঁপার উপর। ছোট মেয়ের তুলনায় অনেক বড় সে খোঁপা। সাত মাথার চুল এক মাথায় করিয়া যেন মা বাঁধিয়া দিয়াছে।

খুশী হইয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কোনোদিন ত দেখি নাই তোমারে; তোমার নাম কি?

অনন্ত। আমার নাম অনন্ত।

দূর, তা কেমনে হয়! ঠিক কইরা কও তোমার নাম কি?

ঠিক কথাই কইছি। আমার নাম অনন্ত।

তবে আমার মত তোমার খোঁপা নাই কেনে; আমার মত তুমি এইরকম এইরকম কইরা শাড়ী পিন্ধ না কেনে? তোমার নাক বিন্ধাইছে না কেনে, কান বিন্ধাইয়া কাঠি দিছে না কেনে; গোধানি কই, হাতের চুড়ী কই তোমার?

আরে, আমি যে পুরুষ ছেলে। তুমি ত মাইয়া।

তবে তোমার নাম অনন্ত না।

না, কেনে?

অনন্ত যে আমার নাম। তোমার এ নাম ত হইতে পারে না।

পারে না? কি জন্যে পারে না?

তুমি যে পুরুষ ছেলে। আমার নাম যা, তোমারো নাম তা কি হইতে পারে?

হইতে পারে না যদি, তবে এ নাম আমার রাখল কেনে। আমার মা নিজে এ নাম রাখছে। মাসী জানে।

খালি মাসী জানে? আর কেউ না?

যে-বাড়ীতে আছি, তারা দুই ভাই-ভইনে জানে।

এই? আর কেউ না! তবে শোন। আমার নাম রাখছে গণক ঠাকুরে। আর জানে আমার মা বাবা, সাত কাকা, পাঁচ কাকী; ছয় দাদা তিন দিদি, চার মাসী দুই পিসি; তাদের ছেলেমেয়ে। আরো কত লোকে যে জানে। আর কত আদর যে করে। জান, তারা আমারে ভয়ানক আদর করে। কেউ মারে না।

আমারেও কেউ মারে না। এক বুড়ি মারিতে চাহিয়াছিল। মাসী তাকে বাধা দিল, মারিলও।

মাসী বাধা দিল, ত মা বাধা দিল না? চাইয়া চাইয়া দেখল বুঝি! কেমন কঠিন মা তোমার। আমার মা হইলে—

আমার মা নাই।

মেয়েটি এইবার বিগলিত হইয়া উঠিল ঃ নাই? হায়রে কপাল! লোকে কয় মা নাই যার ছার কপাল তার। মাসী আছে ত?

মাসী আছে–

তবে একরকম ভাল। লোকে বলে, তীর্থের মধ্যে কাশী, ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা, কুটুমের মধ্যে মামা।

অনন্ত মনে মনে ভাবিল, বাব্বা, খুব যে শিলোক ছাড়ে। উদয়তারার কাছে একবার নিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আচ্ছা, আমারে তোমার মাসীর কাছে নিয়া চল না।

কি কইরা নিয়া যাই। সে যে অনেক দূর। নাওয়ে গেলে এক দুপুরের পথ।

মানুষে কি মানুষেরে দূরের দেশে নিয়া যায় না?

যায়। কিন্তু এখন যায় না। বৈশাখ মাসে সেখানে তিতাসের পারে মেলা হয়। তখন নিয়া যায়। অনেক দূর হইতে অনেক মানুষ সেখানে অনেক মানুষেরে নিয়া যায়!

তখন আমারেও তুমি নিয়া যাইও কেমন?

আমার ত নাও নাই। তবে বনমালীরে কইয়া রাখুম। তার নাওয়ে যাইতে পারবা।

অ। পরের নাওয়ে যামু! বাবা যাইতে দিলে ত!

খালের ট্যাকের ভাঙা নাওয়ের খোড়ল হইতে খুঁজিয়া সাতদিনের অনাহারী মানুষ আমারে যে-জন বাহির করিয়া আনিল, তারে কও তুমি পর! কি যে তুমি কও।

মেয়েটির চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, খালের ট্যাকে ভাঙা নাওয়ের খোড়লে তুমি থাক্‌তা, ডর করত না তোমার? রাতে দেও-দৈত্য যদি উপস্থিত হইত। কও না গো কি কইরা তুমি সেখানে থাক্‌তা, একলা–

সে এক পরস্তাবের কথা। কইতে গেলে তিনদিন লাগব।

তোমার গাঁওয়ে আমারে নিয়া যাইবা? সেই নাওখান দেখাইবা?

আচ্ছা নিয়া যামু।

যাইবা যে, তোমার মাসী আমারে আদর করবে ত তোমার মত?

অ, তোমারে করবে আদর। আমারেই বকিয়া বাহির করিয়া দিল।

কও কি! বাহির করিয়া দিল, আর ডাকিয়া ঘরে নিল না?

না।

তবে গিয়া কাম নাই। তুমি বরং আমাদের বাড়ীতে চল। কোনোদিন কেউ তোমারে বকিয়া বাহির করিয়া দিবে না। যদি দেয়ও, আমি তোমারে ডাকিয়া ঘরে নিব।

কথাগুলি অনন্তর খুব ভাল লাগিল। একঘর ভরতি লোকের মধ্যে থাকিতে খুব ভাল লাগিবে। সেখানে দশটি লোকে দশ রকমের কথা বলিবে, বিশ হাতে কাজ করিবে, দশমুখে গল্প করিবে–একটা কলরবে মুখরিত থাকিবে ঘরখানা। তার মধ্যে এই চঞ্চল মেয়েটি তার সংগে খেলা করিবে, জালবোনা মাছধরা খেলা। অনন্ত সত্যিকারের জেলে হইয়া নাওয়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে এই খেলার মধ্য দিয়াই জাল ফেলা জাল তোলা আয়ত্ত করিতে হইবে।

একটা করুণ সুর তার মনে গুণ গুণ করিয়া উঠিল। তার জগৎ বেদনার জগৎ। এ জগতে হাসি নাই, আমোদ নাই। আপন-জন না থাকার ব্যথায় তার জগৎ পরিম্লান। আকাশে তারা আছে, কাননে ফুল আছে, মেঘে রঙ আছে। তিতাসের ঢেউয়ে সে-রঙের খেলা আছে; সব কিছু নিয়াও এই রূপোন্মত্ত বহির্বিশ্ব তার মনের ম্লানিমার সঙ্গে একাকার। একটার পর একটা সাগরের ঢেউয়ের মত কি যেন তার সারা মনটা ডুবাইয়া চুবাইয়া দেয়। তখন সে চাহিয়া দেখে, কূল নাই, সীমা নাই, খালি জল আর জল। দুই তীরের বাঁধনে বাঁধা তিতাসের সাধ্য কি সে জল আগলায়। এ যেন বার দরিয়ার নোনা জল—ছোট তটিণীর সকল নৃত্যবিলাসকে তলাইয়া দিয়া জাগিয়া থাকে শুধু একটানা হাহাকার।

অনন্ত ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চায় মনে মনে। দেখে এত বিশাল বিপুল সময়ের মহাস্রোতে সে বুঝি বা একখণ্ড দুর্বল কুটার মতই ভাসিয়া চলিয়াছে। কিছুদিন আগে একমাত্র মাকে আপন বলিয়া জানিত। তারপর মাসী। কিন্তু সে যে আসলে তার কেউ না, অনন্তর এ বোধ আছে। বনমালী উদয়তারা এরাও দুইদিনের পথের সাথী। এরা যেদিন মাসীর মতই তাকে পর করিয়া দিবে সেদিন সে কোথায় যাইবে।

কোথায় আর যাইবে। একটা পান্থশালা জুটিয়া যাইবেই। যে ছাড়িতে পারে তার জুটিতেও বিলম্ব হয় না। পান্থশালারই মত এই মেয়েটির সংসারে ঢুকিয়া পড়িলে ক্ষতি কি?

তিনটি নারী একযোগে অনন্তর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসী তার একান্তই অসহায়। তিক্তবিরক্ত বাপ মার অনাত্মীয় পরিবেশে সে নিতান্তই অসহায়। অতীতের সঙ্গে তার বর্তমানের যে যোগ-সূত্র আছে, ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াইয়া সে-সূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। একটা নগণ্য খড়কুটার মতই সেও সময়ের মহাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। তিতাসের জলে হাজারো খড়কুটা ভাসিয়া যায়; কিন্তু কোন না কোন মালোর জালে তারা আটকা পড়িবেই পড়িবে। কিন্তু মাসীর ভবিষ্যৎ, কোন অবলম্বনের গায়েই আটকা পড়িবে না।

আর উদয়তারা? অনেক বেদনা তার মনে জমা হইয়া আছে, কিন্তু বড় কঠিন এ নারী। হাস্য পরিহাসে, প্রবাদে শ্লোকে সব বেদনা ঢাকিয়া সে নারী সব সময়ে মুখের হাসি নিয়া চলে। তাহাকে জব্দ করিবে এমন দুঃখ বুঝি বিধাতাও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মাসী তার মত সকল দুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার ক্ষমতা পাইল না কেন? হায়, তাহা যদি সে পাইত, অনন্তর মন অনেক ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইত। আর এই হাস্যচঞ্চল মেয়েটি। এর জীবন সবে শুরু হইয়াছে। সে নিজে যেমন চাঁদের রোশনি, তেমনি অনেক থমথমে আকাশের তারাকে সে কাননের ফুলের মত বোঁটায় আঘাত করিয়া ফুটাইয়া ছিটাইয়া হাসাইতে মাতাইতে সক্ষম। সে যদি সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিত! তবে তার মনে ম্লানিমাটুকু একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া যাইত।

মেয়েটি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। অনন্ত চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, হাস কেনে?

মেয়েটির চোখ দুটি নাচিয়া উঠিল : তোমার গলায় যে মালা দিলাম; কারো কাছে কইও না যেন।

কইলে কি হইবে?

তোমাকে বর বলিয়া লোকে ঠাট্টা করিবে।

দূর। আমি কি শ্যামসুন্দর বেপারী, আমার কি এইরকম বড় বড় দাড়ী আছে, যে আমাকে বর বলিবে!

বরের বুঝি লম্বা দাড়ি থাকে? মিথ্যুক।

আমি নিজের চোখে দেখলাম। মা আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া দেখাইয়াছিল। আরো কত লোকে দেখিতে গিয়াছিল। তারা বলিতেছিল এতদিন পরে বরের মত বর দেখিয়া নয়ন-সার্থক করিলাম।

ও, বুঝিয়াছি। বুড়া বর। সে বুড়া, কিন্তু তুমি ত বুড়া না।

অনন্ত বুড়া কিনা ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। এমন সময় ডাক আসিল, কইলো অনন্তবালা, ও সোণার মা!

মায়ের আহ্বান। আদুরে মেয়ে। মা তাকে ডাকিতে দুইটি নামই ব্যবহার করেন। খাওয়ার সময় হইয়াছে। তার আগে নাইবার জন্য এই আহ্বান।

অন্য একটি মেয়ে সাপলা চিরিয়া বোতল বানাইয়াছে, তাতে গ্রন্থি পরাইতেছিল। সে মাথা না তুলিয়াই ছড়া কাটিল : অনন্ত বালা, সোনার মালা, যখন পিন্ধি তখনি ভালা।

দেখলে ত, আমার নাম কতজনে জানে। মা ডাক্‌ছে। আমি যাই। যে-কথা কইলাম–কারো কাছে কইও না, কেমন?

না।

আমি কিন্তু কইয়া দিমু।

কি?

তুমি আমার খোঁপায় মালা দিয়াছ সেই কথা।

কার কাছে?

মার কাছে। আরে না না। মা তোমাকে বকবে না। আদর করবে। তুমিও চল না আমাদের বাড়ী! যাবে?

অনন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিল : না।

মাসীর জন্য তার মনটা এই সময় বেদনায় টন্‌ টন্‌ করিয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় তিতাসের বুকে কিসের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ছেলের দল পূজার বাড়ী ফেলিয়া দৌড়াইয়া চলিল গাঙের দিকে। সকলেরই মুখে এক কথা–দৌড়ের নাও, দৌড়ের নাও।

নামটা অনন্তর মনে কৌতূহল জাগাইল। অনেক নাও সে দেখিয়াছে, এ নাও ত কই দেখে নাই। ঘাটে গিয়া দেখে সত্যি এ দেখিবার জিনিষই বটে। অপূর্ব, অপূর্ব।

রাঙা নাও। বর্ষার জলে চারিদিক একাকার। এদিকে ওদিকে কয়েকটি পল্লী যেন বিলের পানিতে সিনান করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিতাসের বুক শাদা, তার পারের সীমার বাহিরে সাপলাসালুকের পান, অনেক দূরে ধানক্ষেত পাটক্ষেত, তাহাও জলে ভাসিতেছে। নৌকাটি তিতাস পার হইয়া দূরের একখানা পল্লীর দিকে রোখ করিয়াছে। গলুইটা জলের সমান নীচু। সরু ও লম্বা পাছাটা পেটের পর হইতে উঁচু হইয়া গিয়া আকাশে ঠেকিয়াছে; হালের কাঠীটা তির্যকভাবে আকাশ ফুঁড়িবার মতলবে যেন উঁচাইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে ধরিয়া একটা লোক নাচিতেছে আর পাটাতনে পদাঘাত করিতেছে। লোকটাকে একটা পাখীর মত ছোট দেখাইতেছে। ডরার উপর দাঁড়াইয়া একদল লোক খোল করতাল বাজাইয়া সারি গাহিতেছে আর তাহারই তালে

তালে দুই পাশে শত শত বৈঠা উঠিতেছে নামিতেছে, জল ছিটাইয়া কুয়াসা সৃষ্টি করিতেছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পাওয়া গেল না। পল্লীর গাছপালা ঘরবাড়ীর আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ছেলেরা অনন্তকে সান্ত্বনা দিল, গাঁয়ের এপাশ দিয়া আড়ালে পড়িয়াছে, ও-পাশ দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইবে।

কিন্তু আর বাহির হইল না।

কেন বাহির হইল না জিজ্ঞাসা করিতে ছেলেরা জানাইল, হয়ত ও-গাঁয়ের ও-পাশটিতে ওদের ঘরবাড়ী। নৌকা সাজাইয়া রঙ করাইয়া লোকজন লইয়া তালিম দিতে গিয়াছিল। পাঁচদিন পরেই বড় নাও-দৌড়ানি কিনা। নাও কেমন চলে দেখিবার জন্য একপাক ঘুরিয়া আসিয়াছে। এখন ওদের ঘাটে নাও বাঁধিয়া যে-যার বাড়ী খাইতে চলিয়া গিয়াছে।

আর নয় তো ও গাঁয়ের আড়াল দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে দূরের কোন 'থলায়" দৌড়াইবার জন্য।

শেষের কথাটাই অনন্তর নিকট অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হইল। যেরকম সাপের মতো হিস্ হিস্ করিয়া চলিয়াছিল, ও-গাঁয়ে উহা থামিতেই পারে না। সারাগায়ে লতাপাতা সাপ ময়ূরের ছবি লইয়া রঙীন দেহ তার একের পর এক পল্লীর পাশ কাটাইয়া আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মত পাগল করিয়া ছুটিয়াই চলিয়াছে। সারাদিন চলিবার পর কোথায় রাত্রি হইবে কে জানে।

মোহাম্মদী : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

৬. মহাযুদ্ধের সূচনা

চৈত্র মাসের খরায় যখন মাঠঘাট তাতিয়া উঠিয়াছিল, তখন বিরামপুর গ্রামের কিনারা হইতে তিতাসের জল ছিল অনেকখানি দূর। পল্লীর বুক চিরিয়া যে-পথগুলি তিতাসের জলে আসিয়া মিশিয়াছিল, তারা এক একটা ছিল এক-দৌড়ের পথ। কাদিরের ছেলে ছাদির তার পাঁচ বছরের ছেলে রমুকে তেল মাখাইয়া রোজ দুপুরে এই পথ দিয়া তিতাসে গিয়া স্নান করিত। ছাদির তাহাকে কোলে করিয়া ঘাটে যাইত আর তার পেটের ও মুখের জবজবে তেল তার বাপের কাঁকালে ও কাঁধে লাগিত। বাঁ হাতে বাপের হাত ধরিয়া ডান হাতে সেই তেল মাখাইয়া দিতে দিতে মাঝ পথে সে জেদ ধরিত, বাপ, তুই আমারে নামাইয়া দে। কিন্তু বাপ কিছুতেই নামাইত না। বরং তার নরম তুলতুলে শরীরখানা নিয়া নিজের শক্ত পেশীবহুল শরীরে রগড়াইতে থাকিত, আর মনে মনে বলিত, কি যে ভাল লাগে!

তারপর ঘাটে গিয়া এক খামচা বালি তুলিয়া নিজের দাঁত মাজিত এবং ছেলের দাঁতও মাজিয়া দিত। গামছা দিয়া ছেলের গা নিজের গা রগড়াইয়া ছেলেকে লইয়া গলা-জলে গিয়া ডুব দিত। কখনও একটু আলগা করিয়া ধরিয়া বলিত, ছাইড়া দেই? রমু তার কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, দে ছাইড়া।

পরিষ্কার জল ফট্‌ফট করে, তাতে মৃদুমন্দ স্রোত। কাটারী-মাছ ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করে। বাপ-ব্যাটার গায়ের তেল জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তারই নীচে

থাকিয়া ছোট ছোট কটা কাটারী মাছেরা ফুট ছাড়ে; রমু হাত বাড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে, পারে না।

ধরিত্রীর সারাটি গা ভীষণ গরম। একমাত্র ঠাণ্ডা এই ভিতরের তলা। জল তার বহিরবয়বে ধরিত্রীর উত্তেজনা ঠেলিয়া নিজের বুকের ভিতরটা সুশীতল রাখিয়াছে এই দুই বাপ-বেটার জন্য। অনেকক্ষণ ঝাপাইয়া ঝুপাইয়াও তৃপ্তি হয় না, জল হতে ডাঙায় উঠিলেই আবার সেই ত গরম। ছাদির শেষে রমুকে বলিল, তুই কান্ধে উঠ্, তরে লইয়া পাতাল যামু। রমু কার কাছে যেন গল্প শুনিয়াছে, জলের তলে পাতাল-নাগিনী বাস করে। বলিল, না বাজান, পাতাল গিয়া কাম নাই, শেষে তরে সাপে খাইলে আমি কি করুম ক'।

ছেলেপিলের ভয়-ডর ভাঙাইতে হয়। তাই ধমক দিয়া তাকে সাপের গুষ্টীরে নিপাত করি, তুই কান্ধে উঠ্। বাপের দুই হাতের দুই আঙুলে শক্ত করিয়া ধরিয়া রমু তার কাঁধে পা দেয় এবং কাঁপিয়া কাঁপিয়া শরীরে ভারসাম্য রাখিতে রাখিতে অবশেষে সটান স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল। শেষে খুশীর চোটে হাত তালি দিতে দিতে বলিল বাপ তুই আমারে লইয়া এবার পাতাল যা।

ছেলের খুশীতে তারও খুশী উপ্‌চাইয়া উঠিল, সেও হাত দুইটা জলের উপর তুলিয়া তালি বাজাইতে বাজাইতে বলিল ঃ দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই, দম্ব দম্ব ...

ঘাটে নানা বয়সের স্ত্রীলোকেরা জল নিতে, বাসন ধুইতে, নাইতে আসিয়াছিল, কেউ কেউ বলিল–কি করম কুয়ারা করে চাইয়া দেখ্।

–অইব না? কম বয়সে পুলা পাইছে; পেটে থুইবনা পিঠে থুইব দিশ্ করতে পারে না।

জল হইতে উঠিয়া ছেলের গা মুছাইয়া ছোট দুই-হাতি লুঙিখানা পরাইয়া বলিল, এইবার হাঁইট্যা যা।

কয়েক পা আগাইয়া শক্ত মাটীতে পা দিয়া দেখে আগুনের মত গরম। পা ছুঁয়াইলে পুড়িয়া যাইতে চায়। করুণ চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, বাপ আমারে কোলে নে, হাঁটতে পারি না।

বাপের কোলে চড়িয়া তার বুকের লোমগুলির মধ্যে কচি গালটুকু ঘসিতে ঘসিতে রমু বলিল, বাপ, তুই আমারে খরম কিন্যা দে। এই রকম ছোট্ট ছোট্ট দুইখান খরম, তাইলে আর তর কোলে উঠ্‌তে চামু না।

–আহ্লাদ কত দেখ না। চাষার ছেলের আবার মুন্‌শীগিরি। পায়ে গরম লাগে! এইটুকুতে পায়ে গরম লাগিলে জমিনে কাজ করিবে কি করিয়া?

উঠানে পা দিবার আরেকটু বাকী আছে। তিতাস হইতে এক চিলতা খাল গ্রামখানাকে পাশ কাটাইয়া সোজা উত্তর দিকে গিয়াছে। মেটে হাঁড়ি-কলসী-ভরতি বোঝাই একটা নাও জোয়ারের সময় খালে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, ভাঁটায় আটকা পড়িয়াছে। লাল কালো হাঁড়িগুলি খালের পার ছড়াইয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে দেখা যায়, রোদে সেগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। সেদিকে আঙুল বাড়াইয়া রমু বলিল, আমি তোমার মত ক্ষেত চম্মু না, পাতিল বেপার করুম।

ঠুন্‌কা জিনিষ লইয়া তারা গাঙে গাঙে চলা ফিরা করে, নাওয়ে নাওয়ে ঠেস-টাক্কুর লাগলে, মাইট্যা জিনিষ ভাইঙ্গা চুরমুচুর হইয়া যায়। তুই যে রকম উটমুখ্যা, তুই নি পারবি পাতিলের বেপার করতে।

—তা অইলে আম-কাঁঠালের বেপার করুম।

—নাওয়ে আম কাঠাল বড় পচে। কোনো কারণে দুই একটাতে পচন লাগ্‌লে একডাকে সবগুলিতে পচন লাগে, তখন নাও ভরতি আম কাঁঠাল জলে ফেলিয়া দিতে হয়। লাভে-মূলে বিনাশ। তুই যে রকম হুঁস-দিশা-ছাড়া মানুষ। পচা লাগলে টেরই পাইবি না; শেষে আমার বাপের পুঁজি মজাইয়া বাপেরে আমার ফকির বানাইবি।

—তা অইলে বেপার কইরা কাম নাই।

—হ বাজি, বেপারীরা বড় মিছা কথা কয়। সাত-পাঁচ বার কথা কইয়া লোকেরে ঠকায়; কিনবার সময় বাকী, আর বেঁচবার সময় নগদ। আর যে পাল্লা দিয়া জিনিষ মাপে তারে, কিনবার সময় রাখে কাইত কইরা, আর বেচবার সময় ধরে চিত কইরা। এইজন্য তোমার নানাজান বেপারীরে দুই চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। তুমি যদি বড় হইয়া ময়মুরুব্বির হাল্‌গিরস্তি ছাইড়া দিয়া বেপারী হইয়া যাও তাহা হইলে তোমার নানা তোমারেও চোর ডাকিবে, আর—

—আর কি—

—শালা ডাকিবে।

রমু একটু হাসিয়া ফেলিল; অপমানাহত হইয়া বলিল, অখন আমারে নামাইয়া দে। মুখে তার কৃত্রিম ক্ষোভের চিহ্ন।

ক্ষেতে কাজের ধূম পড়িয়াছে। ছাদিরের মোটে অবসর নাই। ছেলের দিকে চাহিবার সময় নাই। ছেলের মার হাতেও এত কাজ যে, দুই হাতের দশগাছা বাঙ্‌রীর মধ্যে দুইখানা ভাঙিয়া ফেলিল। ছেলের মা হওয়ার পর হইতে সংসারে তার গৌরব বাড়িলেও শ্বশুর কাদির মিয়া তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিলেও তার বাপকে ছাড়িয়া কথা কহিবে না। কোন একবার খাইতে বসিয়া যদি দেখে বেটার বৌর হাতের অতগুলি বাঙ্‌রীর মধ্যে কয়েকটা কম দেখা যাইতেছে তবে নিশ্চয়ই শালার বেটী বলিয়া গালি দিবে, কেহ্ আট্‌কাইতে পারিবে না।

সন্ধ্যায় বেদেনী আসিলে তাহার নিকট হইতে দুই পয়সার দুইটি বাঙ্‌রী কিনিয়া পুরাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু পয়সা ছাদির দিলে ত! নিজেকে তাহার যেন বড়ই অসহায় মনে হইতে লাগিল। এই রকম মাঝে মাঝে হয়; তখন সে পুত্র রমুর দিকে তাকায়, তাকে আদর করে, কোলে নেয়, ভাবে, সে বড় হইয়া যখন সংসারের দায়িত্বের অংশ লইবে তখন কি তার মার কিছু কিছু স্বাধীনতা এ সংসারে বর্তাইবে না? এখনও রমুর দিকে চাহিবার জন্য তাহার চোখ দুইটি সতৃষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথায় রমু?

রমু ততক্ষণে খালের পারে। হাঁড়ি বোঝাই নৌকাটির জন্য সারাক্ষণ তার মন কৌতূহলী হইয়া থাকিত। বিকাল পড়িতে বাপকে অনুপস্থিত ও মাকে কাজে ব্যস্ত দেখিয়া সে একবার হাঁড়ির নাওখানা দেখিতে আসিয়াছে।

হাঁড়ির একটা পাহাড় যেন ঠেলিয়া মাথা উঁচু করিয়াছে। নৌকাখানা বড়। চারদিকে খুঁটি গাড়িয়া খোঁয়াড় বানাইয়া হাঁড়ীর কাড়ি পরতে পরতে বড় করিয়াছে। সকালে ঝুড়ি-

ঝুড়ি হাঁড়ী বিক্রয় করিতে গাঁয়ে গিয়াছিল। ধান-কড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিয়াছে খাইয়াছে,—এখন উহারা বিশ্রামে ব্যস্ত।

বিরাট একটা দৈত্যের মত নাওখানা এখানে আটকা পড়িয়াছে। জল শুক্‌নো। নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু লোকগুলির মনে সেজন্য কোনই দুশ্চিন্তা দেখা যাইতেছে না। তারা যেন দিনের পর দিন এইভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি হাঁড়ী লইয়া গাঁওয়াল করিতে যাইবে। তারপর সব হাঁড়ী কলসী বিক্রয় হইয়া গেলে একদিন জোয়ার আসিবে, তিতাসের জল ঠেলিয়া খালে আসিয়া ঢুকিবে, এবং বহুদিন পর এই বিরাট দৈত্য গা নাড়া দিয়া উঠিবে। ইহার পর আর তাহাদিগকে কোন দিন দেখা যাইবে না।

প্রতি বারে নূতন নূতন গাঁয়ে গিয়া ইহারা পাড়ী জমাইবে। তাই কি তাহাদের মনে ফূর্তি?

ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছে, একজন বারমাসী গান তুলিয়াছে—ওকি হায় হায়রে, এহি-ত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ। আন গো কটরা ভরি খাইয়া মরি বিষ॥ বিষ খাইয়া মইরা যামু কান্‌বে বাপ মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই॥

রমু তীরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল?

খালের ওপারে কাঁচি হাতে দাঁড়াইয়া আরও একজন শুনিতে ছিল সেই গান। সে ছাদির। কি একটা কাজের কথা মনে পড়ায় সকাল সকাল কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল সে।

গান চলিতে লাগিল স্তবকের পর স্তবক—পদের পর পদ। বিরহ-বেদনাচ্ছন্ন করুণ সুরের গানখানা বৈকালিক ঠাণ্ডা হাওয়াকে বিষাদে ভারী করিয়া তুলিতেছিল। এক বিচ্ছেদাকুলা নারীর এক বুক-সেঁচা ফরিয়াদ পাতিল-বেপারীর কণ্ঠস্বরে যেন ধরা দিয়াছে। সে-নারী মাসের পর মাস প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখভার গানের তানে হালকা করিয়া দিতেছে।

আসিল আষাঢ় মাস—ওকি হায় হায় রে, এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি! কত কত সাউদের নাও রে উজান আর ভাইট্টানি॥ যেহ সাধু পাছে গেছে সেহ আইল আগে। হাম নারীর প্রাণের সাধু খাইছে লঙ্কার বাঘে॥

অবশেষে আসিল পৌষ মাস—ওকি হায় হায়রে, এহি তো পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী। এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি॥ কেহ চায় রে আড়ে আড়ে কেহ চায় রে রইয়া। কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া॥

একটু পরে সন্ধ্যা নামিবে। বৌ-ঝিয়েরা ওপারের ওই পথ দিয়া নদীতে যাইতেছে, কেহ কেহ ফিরিয়া আসিতেছে। গানের কথাগুলি শুনিয়া ছাদির ব্যথিত হইল। ডাকিয়া বলিল সে, ও পাতিলের নাইয়া, এ গান তোমরা এখানে গলা ছাইড়া গাইও না, নিষেধ করলাম।

পলকে গান থামিয়া গেল। বাধা পাইয়া গায়কের মুখ বেদনায় মলিন হইয়া পড়িল। কোন উত্তর না দিয়া সে মাথা নীচু করিল।

ছাদিরের মনে বড় কষ্ঠ হইল। তাই তো, ওতো কেবল গানই গাহিয়াছে, গানের কথার ভিতর কি আছে না আছে সেদিকে তো তার লক্ষ্য ছিল না। আপন সুরে আপনি মাতোয়ারা হইয়া সেতো কেবল কোন্ বিস্মৃত যুগের কোন বিরহিণী নারীর কথাগুলি

বৈকালী-হাওয়ায় মাঠের বুকে ঢালিয়া দিয়াছে মাত্র। তার দোষ কোথায়? হাঁটুজলে খাল পার হইয়া ছাদির এপারে আসিল, তারপর ছেলের হাত ধরিয়া ফিরিতে ফিরিতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, গান থামাইলা কেনে, গুন্‌গুনাইয়া গাও, গুন্‌গুনাইয়া গাও।

উঠানের বুকটা চিতানো। জল জমিতে পারে না, সব সময় শুক্‌নো। ঠন্‌ঠন্ করে। বিকালে একপাল হাঁসমুরগী সেখানে ঝি-পুত লইয়া চরিয়া বেড়াইয়াছে এবং সারাটা উঠান নোংরা করিয়াছে। গোলায় অজস্র ধান। সারা বছর খাইয়া বিলাইয়া, হাঁড়ি-পাতিল খইয়ের-মোয়া রাখিয়াও সে-ধান কমে না, এমনি অজস্র। ঢেকিঘরে সাপের গর্ত ধরা পড়িয়াছে। মাটি খুড়িয়া নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গিয়া ধান ভানা চলে না। জ্যোৎস্না রাতের সাঁঝ। সেই উঠানেরই একদিকে ননদদের লইয়া ধান ভানিতে হইবে। অবিবাহিতা সব ছোট বড় পড়শী ননদদের লইয়া। মস্তবড় ঝাঁটাখানা দুই হাতে ধরিয়া কোমর বাঁকাইয়া অতবড় উঠানখানা ঝাড়ু দিয়া শেষ করিতে করিতে বেলাটুকু ফুরাইল; নবমী তিথির ঝাপসা চাঁদের আলোয় সেই উঠান চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। এমন সময় দেখা গেল, খালের কিনারা হইতে গো-পাটের পথ ধরিয়া একটা লোক আগাইয়া আসিতে আসিতে একেবারে উঠানের কোণে আসিয় পা দিল। চার ভিটায় চারখানা বড় ঘর। কোণা-খামৃচিতে আরো ছোট ছোট ঘর কয়েকখানা আছে। উঠানের পূর্ব-দক্ষিণ কোণ দিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দুইঘরের ছায়ায় আসিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় ডাক দিল—পেশ্‌কারের মা, অ, খুশী।

খুশী ঝাঁটা নামাইয়া আগাইয়া আসিল, বাজান তুমি?

হা, আমি।

ঘরে আস।

হা, ঘরেই যামু। এবার আর বাইরে থাকুম না। পিঠে গাতি বাইন্দা আইছি, গালাগালি করলে আমিও করুম; মারামারি করলে আমিও মারুম। আমি তৈয়ার।

খুশী অপমানে মাথা নীচু করিল।

তোর পেশ্‌কার কই?

উত্তরে ঘরে। বাপের সাথে কিচ্ছা কইতাছে।

ও, বড় পেশ্‌কার কই?

খুশী ফিক্ করিয়া একটু হাসিল। হউরের কথা কও! তাইনে বাজারে গেছে।

কাদির বাজার হইতে আসিলে তিনজনে তাহার নিকট তিন রকমের তিন প্রস্ত নালিশ জানাইবে, স্থির হইয়া রহিল। খুশীর পেটে রমুর একটা ভাই আসিতেছে। এই বিরাট সংসার হইতে সে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়া বাপের বাড়ীতে যাইতে চায়। বাপ মুহুরী। তার বাড়ীতে হাল নাই গিরস্তি নাই, সারাদিন কাজের ঝামেলা নাই। এই হাজার কাজের ঝামেলা হইতে দিন কয়েকের ছুটী নিয়া সেখানে একটু নিশ্বাস ফেলিতে চায় সে। বাপ একথাই জানাইতে আসিয়াছে কাদিরকে। কিন্তু তাহার নিজে বলার সাহস নাই। এতো আর আদালত নয় যে, ধমক দিয়া মক্কেল দাবকাইবে। এ কাদির মিয়ার সংসার, এখানে তারই একচ্ছত্র অধিকার। বাপের অসহায়তা দেখিয়া খুশী নিজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে নিজেই বলিবে শ্বশুরকে, যে-কথা বাপ বলিতে আসিয়াও বলিতে পারিতেছে না, চোরের মত এক কোণে লুকাইয়া আছে।

আর এক আবেদন ছাদিরের। গত বছরের পাট বিক্রীর চারশ টাকা তার চাই, দৌড়ের নাও গড়াইবে। শৈশব হইতে বাপের সঙ্গে খাটিতে খাটিতে সে জান কালি করিতেছে। বাপ তাকে মুনশী রাখিয়া একটা কালা-আখর চিনাইল না, কোরাণ শরীফের একখানা আয়াত পড়িবার মতো বিদ্যাও তার এমন বাপের হাতে পড়িয়া লাভ হইল না। বৎসরের পর বৎসর কেবল খাটিয়াছে। কোনদিন কোন সাধ-আহ্লাদ পূরণের জন্য বাপের কাছে নালিশ জানায় নাই। আজ সে এ নালিশটুকু জানাইবেই। তাতে বাপ রাগিয়া উঠুক্ আর যাই করুক।

তৃতীয় নালিশ রমুর। নানা তাহাকে শালা বলিবে, একথা শুনাইয়া তার বাপ প্রায়ই তাহাকে অপমান করে। আজ এর একটা হেস্তনেস্ত সে করিবে। সোজাসুজি নানাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাকে শালা বলার তাঁর কি অধিকার? যদি এ অধিকার না থাকে তবে তাঁর ছেলে তাকে একথা শুনায় কোন্ অধিকারে?

ছোট একটা ঝড়ই বুঝি-বা আসিল। কাদির মিয়া ঘরে ঢুকিলে তেমনি সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনজন নালিশকারীই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ কাহারও মুখে কোন কথাই জুয়াইল না। একটু দম নিয়া ছাদিরই কথা বলিতে আগাইয়া আসিল। নতুবা স্ত্রী ও পুত্রের নিকট তাহার মর্যাদা থাকে না।

বা'জী, তোমার হাতে কি?

হাতে খাইয়া-নাচুনী।

পরিষ্কার রাগের কথা। ছাদির নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। খুশী ঘোমটা টানিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গেল। রমু নিকটে বসিয়া প্রদীপের আলোয় নানার চক্চকে দাড়িগুলোর ফাঁকে রাগে কম্পিত ঠোঁট দুইটি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

খড়ম পায়ে দিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে কাদির মিয়া ডাকিল, অ ছাদির, অ ছাদির মিয়া!

ছাদির উঠানে স্ত্রীর নিকট এক ঝড়ি ধান নামাইয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, বা'জী আমাকে ডাক্তাছ?

হা। এক বিপদের কথা কই। ভাদুরচরের গগন সরকার এক মিথ্যা মামলা লাগাইছে।

মামলা লাগাইছে?

হা, মিথ্যা মামলা। বাপ-দাদার আমলের জমি-জিরাত। চাষ করি, খাই। দরকার হইলে ধারকর্জ করি, পাট বিক্রির পর শোধ করি। কারো ফসলের ক্ষেতে পাড়া দেই না, আমারো ফসলের ক্ষেতে কেউ পাড়া দেয় না। তার মধ্যে এমন গজব!

কি বলিয়া লাগাইল মামলা?

তৃতীয় সনের তুফানে বড় ঘর কাত হইয়া পড়ে, তখন দুই শ টাকা ধার করি। পরের বছর পাট বেচি বার টাকা মণে। কাঁচা টাকা হাতে। আমার বাড়ীর গো-পাট দিয়া মেয়ের বাড়ী যাইতেছিল, ডাক দিয়া আনিয়া সুদে আসলে দিয়া দিলাম। টাকা নিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, বাড়ী গিয়াই তমসুকের কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিব, কোন ভাবনা করিও না। এতদিন পরে সেই কাগজ লইয়া আমার নামে নালিশ করিয়াছে।

বা'জান তুমি বড় কাঁচা কাম কর।

ইহাদের নামে কেউ কোন দিন মামলা করে নাই। এরাও কোন দিন কারো নামে নালিশ করে নাই। তাই এই দুঃসংবাদে সারা পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। চিন্তান্বিত মুখে সকলে কাদির মিয়াকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একটা ঝানু মামলাবাজ অতিথি যে ঘরের কোণে আত্মগোপন করিয়া আছে সে কথা কেউ জানিল না, যাওবা খুশী জানিত, সেও ভুলিয়া গেল। কিন্তু মামলার নাম শুনিলে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার লোক সে নয়। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল সে।

কোন্ তারিখে, কার কোর্টে নালিশ লাগাইছে কও।

কাদির চমকাইয়া উঠিল : কে তুমি, তুমি কে?

আমি নিজামত, বেয়াই!

বেয়াই! আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি বউরূপী।

যা তুমি মনে কর। এ জীবনে কত বউরূপীরে নাচাইলাম। শেষে তোমার কাছে নিজে বউরূপী সাজতে হইল!

কও কি তুমি!

ঠিক কথাই কই। দুই একটা মামলাটামলা ত করলা না, কি কইরা জান্‌বা মুহুরীর কত মুরাদ। ঘুড়িরে দেই আসমানে তুইল্যা, লাটাই রাখি হাতে। যতই উড়ে যতই পড়ে, আমার হাতেই সব। জজ-ম্যাজিষ্টর ত জলিপালা। গোড়া থাকে এই মুহুরীর হাতে। কি নাম কইলা? ভাদুরচরের গগন সরকার না? কোন চিন্তা কইর না। দুই চারটা সাক্ষী সাবুদ যোগাড় কইরা রাইখ, মামলা তোমারে জিতাইয়া দেমু, কইয়া রাখলাম।

ছাদিরও সমর্থন করিল, বা'জান, তুমি ডরাইও না। হউরে যখন সাহস দেয়, তখন জিত হবেই। বা'জান!!

কাদিরের মুখের শিরাগুলি কঠিন হইয়া উঠিল।

বেয়াই, তোমার কোনো ডর নাই! দেখ আমি কি করতে পারি। একবার দেখ–মিথ্যা মামলা লাগাইছে, আমিও মিথ্যা সাক্ষী লাগামু। মামলা নষ্ট ত করুমই, তার উপর তার নামে, লোক লাগাইয়া গরুচুরী করার নয় তো খামারের ধান চুরী করার পালটা মামলা লাগামু তবে ছাড়ুম। তুমি কিছু কইর না, খালি খাড়া হইয়া দেখ–

কাদিরের মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। ছাদির শেষ চেষ্টা করিল, বা'জান–

না না, তারে আমি ডরাই না।

তুমি খালি অনুমতি দেও বেয়াই, দেখিও কালকেই তার নামে কেমন সুন্দর কেস সাজাই–

না না, মিথ্যা মামলা সে লাগাইতে পারে, আমি ত পারি না।

তবে চল আমার সাথে। দেখি কই কি করছে। মামলার গোড়া কাটা যায় কি না। চল কাল সকালে।

হাহা, কাল সকালে যাইব। কিন্তু তোমার সঙ্গে যাইব না, আর তোমার অই আদালতেও যাইব না। আমি একবার যাইব তারই কাছে। মানুষের অন্যায় কাজের জন্য বিচার চাহিব গিয়া মানুষেরই আদালতে! কি যে কও তুমি মুহুরী!

তার কাছে গিয়া কি করিবে?

তার চোখে চোখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিব–তার বিবেকের কাছে, তার ইমানের কাছে জিজ্ঞাসা করিব, আমার বাড়ীর গোপাট দিয়া যাইবার সময় তাহাকে বিনা-খতে টাকা দিয়াছি সে-কথা তার মনে আছে কি না।

যদি বলে মনে নাই?

পারিবে না। আমার এ চোখের আগুনের ভিতর দিয়া আল্লাহর গজব তাহাকে পোড়াইয়া খাক করিবে তবে। কি সাধ্য আছে তার, এ রকম দিনে-ডাকাতি, হাওরে-ডাকাতি করিবে?

ছেলে হতাশ হইয়া বলিল, বা'জান তুমি বড় কাঁচা কাম কর।

ততোধিক হতাশ হইয়া মুহুরী বলিল, পাড়াগাঁয়ে থাক, পাড়াগাঁইয়া বুঝ্ তোমার। তোমাকে খামাখা উপদেশ দিয়া লাভ নাই। তোমারে বলা যা, ধান ক্ষেতে গিয়া বলাও তা-ই। থাক গরুর সঙ্গে মাঠে, গরুর বুদ্ধিই তো হইবে তোমার। থাকতে যদি শহরে ভদ্রলোকের মাঝে, তবে ত হইত ভদ্রলোকের মত বুদ্ধি।

ভদ্রলোক মানে ত তোমার ঐ গগন সরকার। আল্লা দৃষ্টি দিয়াছে, দেখি, ভদ্রলোক বলিতে ত একজন ঐ গগন সরকার। আর একজন এই–

কে?

তুমি।

আমারে আর গগন সরকারেরে দিয়া তুমি তামাম্ ভদ্রলোক জাতের বিচার করিও না, কাদির-বেয়াই। আমাদের চাইতে বড় ভদ্রলোক হইতেছে উকিল মোক্তারেরা; তাদের চাইতে বড় ভদ্রলোক জজ-ম্যাজিষ্টরেরা। আর ওদিকে গগন সরকারের চাইতে বড় ভদ্রলোক হইতেছে রাজমোহন হরিমোহন সাহা, গোলক চাঁদ কেশব চাঁদ সাহা। লোকে বলে, তারা চিনা-জোঁকের মত টাকা কামড়াইয়া থাকে। কিন্তু অবোঝেরা জানে না, যারা টাকা কামড়াইয়া থাকিতে জানে, তারা কত বড়লোক হয়। বাড়ী করে, বাগবাগিচা করে, পুষ্করিণী করে, জমি-জিরাত বাড়ায়, একটার জায়গায় দশটা মুনী রাখে, টাকা ধার দিয়া বেবাক লোকেরে রাখে হাতের তাল্‌কায়। আর যারা টাকা কামড়াইতে জানে না, তারাই হয় এই তোমার গিয়ে কাদিরের মত মূর্খ চাষা, যার না আছে বুদ্ধির প্যাঁচ, না আছে মান সম্মান।

তোমার আর গগন সরকারের মত শয়তানী বুদ্ধির প্যাচ্ না থাকতে পারে, কিন্তু মান সম্মান নাই? কি কইলা তুমি?

ঠিক কথাই কইলাম।

এমন ঠিক কথা তুমি আর কইও না বেয়াই!

কেন, তোমারে ডরাইয়া? মেয়ের শাদীতে পুরাপুরি জেওর দিতে পারলাম না, বানের বছর একখান ঘর দিয়াছিলে তুমি, তার জন্যও তোমার কাছে ঋণী আছি। তারই জন্য তোমার সামনে আসিতে সাহস পাই না; মেয়েটারে দেখিবার জন্য লুকাইয়া আসি, লুকাইয়া যাই। এ সব-কথাই ঠিক। এসব জায়গায় তোমারে আমি অবশ্যই ডরাই; কিন্তু তোমার বুদ্ধিরে নিন্দা করতে মোটেই আমি ডরাই না।

বারবার বুদ্ধির নিন্দা করাতে পিতাপুত্র দুইজনেই চটিল।

আমার কাছে কত লোক আসে মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ লইতে। তুমি শালা কোন দিন কি গিয়াছিলে? অত জমিজমা ক্ষেতপাথর তোমার। জীবনে দুই দশটা মামলাও করিলে না, কিসের তুমি কুঠিয়াল? পুটি মাছের পরাণ তোমার। মামলার নামে কাঁপিয়া উঠে। নইলে দেখিতে, গগন সরকারেরে কি ভাবে আমি কাত করি। থাকি আমি ভদ্রলোকের গাঁয়ে, চলি আমি বাবু ভুঁইয়ার সাথে। কারো কাছে কি কই যে আমি সম্বন্ধ করিয়াছি তোমার মত চাষার সাথে? না, আমি কারো কাছে কই যে, আমি তোমার মত অল্পবুদ্ধির বাড়ীতে বছরে দুই একবার পাড়া দেই?

আরে আমার বুদ্ধির ছালা! এখানে আসিতে তোমারে কে বলে? কে তোমারে তিন বিড়া পান দিয়া দাওয়াৎ করিয়া এখানে আনিয়াছে!

অপমানাহত মুহুরী এবার বিচারপ্রার্থীর দৃষ্টিতে ছাদিরের দিকে তাকাইল।

গরীবের বাড়ীতে হাতীর পাড়া পড়ুক, এও আমরা চাই না বা'জী। বলিয়া ছাদির অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বাপ তার এভাবে বসিয়া বসিয়া অপমানিত হইতেছে, দেখিয়া খুশীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আড়াল হইতেই সে সকলকে শুনাইয়া চাপা অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, এমন বেঘোরে অসম্মান কুড়াইতে এ গাঁয়ে তুমি কেন আস বা'জী।

তোর মায়া ছাড়াইতে না পারিয়াই ত আসিরে মা!

যে-দিন হইতে পরের ঘরে দিয়াছ সেইদিন হইতে মায়া-মমতাও বিসর্জন দিয়া রাখ। যাও বা'জী, তুমি অখনই এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাও।

মুহুরী উঠিয়া গিয়া মেয়ের দুইটি হাত ধরিয়া বলিল, তুইও আমাকে তাড়াইয়া দিতেছিস, খুশী!

খুশী এবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বলিল, তাড়াইয়া দিব না? কেন তুমি বারবার আমার শ্বশুরেরে চাষা চাষা বলিয়া গালি দিতেছ। আমার শ্বশুরের অপমানে কি আমারো অপমান হয় না?

শুনিতে পাইয়া কাদির বলিল, চাষাকে চাষা বলিবে, এর দরুণ আমি মোটেই চটি না মুহুরীর-ঝি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে জমিন পাইয়াছি, চাষ করি, খাই, তাইতে আমরা চাষা। কিন্তু বুদ্ধিমান কাঁঠালেরে একবার জিগাইয়া দেখ, চোরেরে কয় চুরি কর্ আর গেরস্থেরে কয় জাগিয়া থাক—ইহারেই বুদ্ধি বলে কি না?

মুহুরী আরও চটিল, এখনই চলিয়া যাইতেছি তোমার বাড়ী হইতে। সব বাড়ীতে যাইব, কিন্তু চাষার বাড়ীতে কোনদিন যাইব না।

চলিয়া যাইবে? শালা বলে কি? রাত দুপুরে আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবে। শালার সাহস কত। যাও না যদি ক্ষেমতা থাকে?

কি? যাওয়ারও ক্ষেমতা নাই? তোমার বাড়ীতে আসার ক্ষেমতা না থাকিতে পারে, কিন্তু যাওয়ার ক্ষেমতা খুব আছে।

কি'গ মুহুরীর মাইয়া, শালারে বুঝাইয়া দেও ত, আসা আপনা ইচ্ছায় আর যাওয়া পরের ইচ্ছায়!

মুহুরীর মাইয়া ফোঁড়ন দিল, ও বা'জী, তুমি যাইবে ত যাও না, খাড়া হইয়া অপমান খাইবে?

মুহুরীর যাইতে উদ্যত হইলে তাড়াতাড়ি কাদির দুইটা লাঠি বাহির করিল। মুহুরী হতভম্ব হইয়া গেল। কাদির একটা লাঠি নিজের হাতে লইল এবং বাকী লাঠিটা নাতি রমুর হাতে দিয়া বলিল, নে শালা, তর্ দাদারে মার।

রমু লাঠিটা হাতে লইয়া গোবেচারার মত একবার কাদিরের মাথার দিকে আরবার মুহুরীর মাথার দিকে তাকাইতে লাগিল; কার মাথায় মারিবে বুঝি-বা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

সেইদিন বিকালবেলা, গগন সরকার মামলা লাগাইয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। তিতাস নদীর তীর ধরিয়া পথ। সূর্য এলাইয়া পড়িয়াছে। তিতাসের ঐ পারে মাঠ ময়দান ছাড়াইয়া অস্পষ্ট গ্রামের রেখা। তারই ওপারে সূর্য একটু পরেই অস্ত যাইবে। পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তার সেই লালিমা আবার মেঘের স্তরে স্তরে নানা রঙের পিচকারী ছুড়িয়া মারিতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়াছে। চারিদিকে শান্ত, সমাহিত ভাব। কাছেই বাড়ীঘর। গাইগরু ধীরেসুস্থে আপন মনে বাড়ীতে ফিরিতেছে। রাখালের তাড়া করার অপেক্ষা রাখিতেছে না। বামদিকে তটরেখা, ডানদিকে বেড়া। কি সব ক্ষেত লাগাইয়াছে, তারই জন্য বেড়া। গলায় ঝুলানো রেশমী চাদর হাওয়ায় উড়িয়া এক একবার বেড়ার কঞ্চিতে গিয়া লাগিতেছিল। পায়ের মসৃণ জুতায় লাগিতেছিল জমিনের ধূলা। সব কিছু বাঁচাইয়া পথ চলিতে চলিতে গগন সরকারের মন চিন্তায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। এ মাঠেও তার অনেক জমি আছে। কত জমি, সে নিজেই অনেক সময় ঠাহর রাখিতে পারে না। মাঝে মাঝে গোলাইয়া যায়, কত জমি সে করিয়াছে; কিন্তু কি করিয়া সে-সব জমি করিয়াছে, সে খবর জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই তার চোখের সামনে আজ যেন জ্বল্‌জল্ করিয়া দুই একবার জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময় পথে রশিদ মোড়লের সঙ্গে দেখা।

রশিদ মোড়লের খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া। বয়সে গগন সরকারের মতই প্রবীণ। কাঁধের উপর বছর তিনেকের একটি বালক; গলা বেড়াইয়া দুইটি ঠ্যাং তার বুকের উপর 'কাউরা' দিয়া, এক হাতে শক্ত করিয়া রশিদের মাথা জড়াইয়া রাখিয়াছে, আর এক হাতে তার সামর্থের অতিরিক্ত ভারী একজোড়া মূলা রশিদেরই মাথায় ঠেকাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। এমনি বেকায়দা অবস্থায় রশিদ মোড়ল হন্‌হন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। এমন সময় গগন সরকারের সঙ্গে তার দেখা।

গগন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকাইয়া লইল। তাকে বেশ দেখিবার মতই দেখাইতেছে বটে। তার মনে রসিকতা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মুখের ভাবে কোনো রকম পরিবর্তন না আনিয়াই বলিল, রসিক ভাই যে।

রশিদ ঘাড় ফিরাইতে না পারিয়া, সটান ঘাড়েই বলিল, আরে গগন যে, কই থেকে?

উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গগন তার ঘাড়ের দিকে, হাঁটিতে হাঁটিতেই কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুমি মূলা পাইলা কই?

উজানচর দিয়া আসিবার সময় রামচন্দ্র কৈবর্তে দিয়া দিল!

দিয়া দিল? বলিয়া গগন আবার তার ঘাড়ের দিকে তাকাইল।

ত, পুলা পাইলা কই?

নাতী। আমার মাইয়ার দিকের নাতী। বেড়াইতে গেছলাম। ছাড়ল না, একেবারে কান্ধে উঠ্‌ল।

রসিক ভাই?

কি?

দোল-গোবিন্দ সা'র খবর শুন্‌ছ ত?

তা আর শুন্‌ছি না। কলিকাতা হইতে তার ভাইপোর নামে চিঠি আসিয়াছে।

অবস্থা নাকি খারাপ!

খারাপ বলে খারাপ। একেবারে না যায় পরাণ ঘেরঘেরি-সার অবস্থা নাকি হইয়া গেছে।

হা। একেবারে হাতে বৈঠা ঘাটে নাও অবস্থা।

কি হইবে দাদা!

কি আর হইবে, মরিবে!

মরিয়া কি হইবে?

যা যা কইরা গেছে তার ফল পাইবে!

আমাদের কি হইবে ভাই গগন!

তার যা হইতেছে, আমাদেরও তাই হইবে! একই ডিঙার কাণ্ডারী ত আমরা তিন জনা!

রশিদ একটু হাসিল, কিন্তু জানিল না যে, গগনের একটী ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস তিতাসের ছোট ঢেউয়ের মত বাতাসে একটু ঢেউ খেলাইয়া দিয়া গেল!

পরের দিন সকালে কাদির মিয়া আসিয়া ডাক দিল।

তার চোখ দুইটি দেখিয়া গগন সত্যই আঁতকাইয়া উঠিল। সে দুটি চোখ জবাফুলের মত লাল। সারা রাত তার ঘুম হয় নাই। কেবল ভাবিয়াছে, আল্লা, মানুষ এত বেইমান হয় কেন? মানুষে মানুষকে এতটুকু বিশ্বাস করিবে না কেন? আর কেনই বা মানুষ বিশ্বাসের মাথায় এভাবে নিজ হাতে মুগুর মারিতে থাকিবে। মানুষ না দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব?

এদিকে গগনেরও সারারাত ঘুম নাই। কাল রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া শুনিয়াছে, দোল-গোবিন্দ সাহা আর ইহজগতে নাই। টেলি আসিয়াছে তার ভাইপোর নামে। হায় দোলগোবিন্দ! তুমি আমি রসিক ভাই একই ডিঙার কাণ্ডারী, একই চাকরীতে ঘুষ খাইয়া পয়সা করিয়াছি, একই উপায়ে লোককে ঋণের জালে জড়াইয়া ভিটামাটী ছাড়া করিয়াছি, জমিজিরাত দেনার দায়ে নিলাম করিয়াছি; ফুলিয়া উঠিয়াছি, ফাঁপিয়া উঠিয়াছি। আজ তুমি মরিয়া গিয়াছ। আমিও তো মরিয়া যাইব। মৃত্যুর পরে তোমাকে যম্‌ রাজার দরবারে নিয়া কাস্তে দিয়া জিব্‌ কাটিবে আর হাতুড়ী দিয়া মাথা ছেঁচিবে! আমারও তো কাস্তে দিয়া জিব্‌ টানিয়া ধরিবে আর হাতুড়ী দিয়া মাথার খুলি ভাঙিতে থাকিবে! হায় দোল গোবিন্দ! তুমি মরিয়া গিয়াছ!

কাদির দেখিয়া অবাক হইল, তারও চোখ দুইটি সন্ধ্যার অস্তরাগের মতই লাল।

কাদির কিছু বলিল না। চুপ করিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

গগন শিহরিয়া উঠিল, দোহাই তোমার কাদির মিয়া। শুধু একটিবারের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সর্বনাশ তো অনেকেরই করিলাম। আর কারোর সর্বনাশ আমি করিব না, শেষবারের মতো শুধু তোমার এই সর্বনাশটুকু করিতে দাও। বাধা দিও না, প্রতিবাদ করিও না, শুধু সহ্য করিয়া যাও। এই আমার শেষ কাজ। দেখিবে, তোমাকে ঠকানোর পর থেকে আমি ভালমানুষ হইয়া যাইব! আর কাউকে ঠকাইব না; এই শেষ-বারের মত শুধু তোমাকে ঠকাইতে দাও!

কাদির হতভম্ব হইয়া গেল। পরে বলিল,—তাই হোক গগন বাবু, আমি সহ্যই করিয়া যাইব। তোমার কোন ভয় নাই। নির্ভয়ে তুমি মামলা চালাও। কোনো সাক্ষী-সাবুদ আমি খাড়া করিব না। নীরবে সব স্বীকার করিয়া লইব এবং টাকা ডিক্রি হওয়ার পর নগদ না থাকে তো জমি বেচিয়া শোধ করিব। তবু তুমি ভাল হও।

পরের দিন খবর পাওয়া গেল, গগন সরকার মরিয়া গিয়াছে। বড় বীভৎস সে মৃত্যু। একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া মাটীর দিকে নাকি সে লাফ দিয়াছিল।

এই সংবাদে কাদিরের মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল।

কাজেই ছাদির যখন একদিন প্রস্তাব করিল, এবার শ্রাবণে সে নাও দৌড়াইবে, এজন্য দৌড়ের নাও একটা বানাইতে হইবে, তার জন্য টাকা চাই, কাদির তখন ঝাঁপি খুলিয়া চারশ টাকা তার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, নে, নাও বানা, ঘর বানা, পানিতে ফেলিয়া দে। যা খুশী কর্।

অত সহজে কাজ হাসিল হইয়া গেল দেখিয়া ছাদিরের খুশী আর ধরে না।

ছাদিরের কাঠ কেনার প্রসঙ্গে একদিন ঘরে আলোচনা হইল।

—সে এক পরস্তাব—ছাদির বলিল।

গল্পের আভাস পাইয়া রমু তার কোল ঘেঁসিয়া বসিল এবং প্রকান্ড একটা বিস্ময় ভরা জিজ্ঞাসা লইয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তারা নাকি দুজন মালো। গাঁয়ে নাকি তাদের হাতীর মতন জোর। নামও তাদের তেমনি জমকালো—একজনের নাম ইচ্ছারাম মালো, আরেকজনের নাম ঈশ্বর মালো—নিবাস নবীনগর গাঁয়ে।

তারা কি করিয়াছে, না, পাহাড় হইতে বহিয়া আসে যে জলের স্রোত, তারই সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কাছি বাঁধিয়া বড় বড় গাছের গুঁড়ি টানিয়া নামাইয়াছে। সে গাছের গুঁড়ি চিরিয়া তক্তা করা হইবে, তাহাতে তৈয়ারী হইবে ছাদিরের দৌড়ের নাও, সে নাও সে হাজার বৈঠা মারিয়া আরও দশবিশটা দৌড়ের নাওয়ের সাথে পাল্লা দিয়া দৌড়াইবে, আর সব নাওকে পাছে ফেলিয়া জয়লাভ করিবে করিয়া মেডেল পাইবে, পিতলের কলসী পাইবে আর পাইবে বড় একটা খাসী।

বেহুদা—একেবারে বেহুদা! এর জন্য অত হাঙামা করিয়া নাও গড়াইবি? কাদির টাকা গুণিয়া দিতে দিতে প্রশ্ন করিয়াছিল।

ছাদির জবাব দিয়াছিল, জিনিষগুলি খুব থুরা দেখলা, না? কিন্তুক, জিত্‌লে খালি তোমার আমার গৈরব নয়, সারা বিরামপুর গাঁয়ের গৈরব।

একদিন হৈ-হাঙামা করবি, জিত্‌বি, পিতলা-কলস পাইবি, মানলাম। তারপর এ-নাও দিয়া তুই করবি কি? কি কাজে লাগবে এই দেড়শ হাতি লিক্‌লিকে পাতাম নাও!

কেন, অনেক কাজে লাগিবে। বর্ষার যে-কয়মাস ক্ষেতেখামারে পানি থাকিবে, এ নাও লইয়া বিলে গিয়া বোঝাই-ভরতি ঘাস কাটিয়া আনা যাইবে গাই গরুর জন্য।

সে-কাজ তো ছোট একটা ঘাস-কাটা পাতাম দিয়াই চলে!

চলে, কিন্তু ঘাস কাটা পাতাম দিয়া তো আর নাও-দৌড়ানি চলে না। আর এই নাও দিয়া দৌড়ানিও চলে ঘাস কাটাও চলে।

বিলের পানি শুকাইয়া গেলে তো এনাও অচল, তখন তারে দিয়া কি করবি? রৈদে তখন সেত খালি ফাটিবে।

ফাটিবে কেন? গেরাপি দিয়া তারে তিতাসের পানিতে ডুবাইয়া রাখিব, তার পেটে কতগুলি ডালপালা রাখিয়া দিব, আশ্রয় পাইবে, মাছেরা আসিয়া জমিবে; তখন সময় সময় জল সেঁচিয়া সে-মাছ ডোলা ভরিয়া বাড়ীতে আনিব।

ছাদিরের বুদ্ধি দেখিয়া কাদির অবাক হইল, কিন্তু মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া পরে বলিল, মিয়া, বুদ্ধি বাৎলাইয়াছ চমৎকার। কিন্তু একটা ভাবনার কথা আছে। তোমার আমার দেখাদেখি, সব কৃষকেরাই যদি এক-একটা করিয়া নাও তিতাসের জলে ডোবাইয়া রাখে আর মাছ ধরে, আর খাইয়া-থুইয়াও সে-মাছ বিক্রী করিতে শুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলে মালোগুষ্ঠির যে ভাত মারা যাইবে, তার জন্য আল্লা বেরাজী হইবে না কি?

আল্লা গাঙ্ দিয়াছে, তার পানি খাই, তার পানিতে গোসল করি—তার পানিতে যেমন সকলের অধিকার তেমনি সে পানিতে যে সব মাছ চরিয়া বেড়ায়, সে-মাছেও তো সকলের অধিকার। সে-মাছ ধরিয়া বেচিলে আল্লা বেরাজী হইবে কেন?

খালি ধরিয়া বেচিলেই আল্লা বেরাজী হইবে না। এই ধরিয়া বেচার ফলে নিরীহ মালো জাত যদি শেষে ভাতে মারা যাওয়ার যোগাড় হয়, তখন আল্লা বেরাজী হইবে।

ভাল কথা। কিন্তু মালো জাতের জন্য আমাদের অধিকার ছাড়িব কেন?

কিসে তাঁর অধিকার আগে ভাবিয়া দেখ। চাষা আমরা, জমিতে আমাদের অধিকার। এখন, চাষা নয়, চাষ করিয়া খায় না, অন্য কাজ করে— এমন লোকেরা আসিয়া যদি আমাদের জমিতে ফসল ফলাইতে থাকে, ওদিকে জাত ব্যবসাও করে চাষও করে, দুই রকমে রুজী করিতে চায়, আর মুখে বলে আল্লার জমিনে আমাদেরও অধিকার আছে, তাহা হইলে খাঁটি সৎলোকের বিচারে এ অধিকারের দাম কতটুকু? সে-অধিকারের দাম দরদী মানুষের কাছে কানাকড়ি; কেবল জঙ্গলের জানোয়ারেরাই এই রকম অধিকার লইয়া কামড়াকামড়ি করিত পারে। খোদার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, এ রকম অধিকার প্রশ্ন লইয়া আমরা তো কামড়া-কামড়ি করিতে পারি না।

কথা ঠিক। এদিকে আলু চালানির ব্যবসা করিবে, আবার জমিনেও লাঙল চালাইবে; এমন মদ বেচিয়া দুধ খাওয়ার কাজ কিছুতেই বরদাশত করিতে পারি না। কিন্তু বাজান, গাঙে যে সকলের সমান অধিকার।

গাঙের পানিতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু পানির মাছে অধিকার কেবল জেলে মালোদের। আমরা চাষী, ওরা জেলে। আমরা ফেলি হাল, ওরা ফেলে জাল। আমরা চাষ করি জমিনে, ওরা চাষ করে পানিতে। প্রভেদ শুধু এই যে আমাদের ফসল উঠে দিনেক্ষণে, আর ওদের ফসল স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন-তখনই তুলিয়া আনে।

কিন্তু বা'জী আমাদের ফসলে কেউ হাত দিলে তার মাথা ফাটাইতে পারি, মামলা করিতে পারি। সেই মামলায় আমরাই জিতি কিন্তু বাজান, ওদের গাঙের মাছ আমরা ধরিলে ওরা মামলা করিলে ত টিক্‌বে না সে-মামলা।

সেটা আইনের দোষ বাজী। মাটীর আইনের মতো পানির আইন তো এখনও তৈয়ার হয় নাই। সে-আইন যদি কোন দিন তৈয়ার হয়, তখন দেখিবে, মাটী চষিতে যেমন চাষাদের জমিতে অধিকার বর্তায়, মাছ ধরিতে ধরিতে তেমনি পানিতে মালোদের অধিকার বর্তাইবে।

ছাদির বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রমু কয়েক রাত স্বপ্ন দেখিয়াছে সেই মালো দুজনকে--যে দুজন কোমরে কাছি বাঁধিয়া নদী নালা ভাঙিয়া তার বাপের জন্য কাঠ লইয়া আসিতেছে।

একদিন তিতাসের পারে গিয়া দেখে, দূর হইতে একখানা কাঠের 'চালি' ভাসিয়া আসিতেছে, ভেলার মত। তাহাতে ছোট একখানা ছই।

সেই দুইজনকেও দেখা গেল। তারা 'চালি'র দুই পাশ হইতে মোটা দুইটা লগি ঠেলিতেছে। সেই ঈশ্বর মালো আর ইচ্ছারাম মালো নামে রূপকথার মানুষ দুইটা। পাহাড় পর্বত ভাঙিয়া দুইজনার সংক্ষিপ্ত ঘরকরনা। পরণে দুইজনেরই এক একখানা গামছা, গা মসৃণ কালো। শুশুকের মতই যেন জল হইতে ভাসিয়া উঠিয়া কাঠের 'চালি'তে লগি ঠেলিতেছে। কাঠ বিক্রী হইয়া গেলে, আবার যখন শুশুকের মতো একডুবে জলের ভিতর তলাইয়া যাইবে, তখন আর তাহাদের কোন চিহ্নই জলের বাহিরের এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

ছাদিরের সঙ্গে সামান্য দুই একটি কথাবার্তা শেষ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার প্রকাণ্ড একটা গুঁড়ি, 'চালি'র বাঁধন হইতে খুলিয়া রাখিয়া আবার আগাইয়া চলিল। ছাদির বলিতেছিল, মালোর পুত, আজ দুপুরে এখানে পাকসাক কর, থাক, খাও, কাল ফজরে উঠিয়া 'চালি' চালাইও।

শুধু একটি মাত্র কথা তাহারা বলিল, না শেখের পুত। এখানে চালি থামাইব না, রমারম গোকনের ঘাটে গিয়া পাক বসাইব।

বলিয়াই তাহারা লগি ঠেলা দিল। মুখে কত বড় ব্যস্ততা। কিন্তু চলনে কতখানি ধীর! কোন্ আদিম যুগের যেন যান একখানা, একালের চলার দ্রুততার সঙ্গে এর যেন কোন পরিচয়ই নাই। অত ধীরে চলে, কিন্তু থামিয়া সময় নষ্ট করে না। রমু ভাবিয়াছিল, এই দুইজনের কাছে একবার সাহস করিয়া ঘেঁসিতে পারিলে অনেক কিছু জানিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। এমন ধীরে ধীরে, যেন হাঁটিয়া গিয়া অনায়াসে ইহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া রাখা যাইবে—এত ধীরে—কিন্তু কি গম্ভীর সে-চলা। দ্রুত হাঁটার মধ্যে কোথায় সেই গাম্ভীর্য্য!

রমু এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল, যারা অনেক দূরের অনেক কিছু খবরাখবর বহিয়া বেড়ায়, তারা অধিকক্ষণ থাকে না, এমনি ধীরে ও দৃঢ়তায়, এমনি ধীরে ও নিষ্ঠুরতায় তারা চলিয়া যায়।

পরের দিন সকালে প্রকাণ্ড একটা করাত কাঁধে লইয়া চারিজন করাতী আসিল। তিতাসের পারে একখণ্ড অকর্ষিত জমির উপর একটা 'আড়া' বাঁধিয়া, পাড়ায় লোকজন

ডাকিয়া প্রকাণ্ড গাছের গুড়িটাকে আড়াআড়িভাবে তাহাতে স্থাপন করিল, তারপর নিচে দুইজন উপরে দুইজন করাতী চান্ চুন্ চান্ চুন্ করিয়া করাত চালাইয়া দিল।

দুইদিনে সব কাঠ চেড়া হইয়া গেলে, তক্তাগুলি পাট করিয়া রাখিয়া পারিশ্রমিক লইয়া করাতীরা বিদায় হইল, আর রমুর বয়সের ছেলেমেয়েরা একগাদা করাতের গুঁড়ায় দাপাদাপি করিয়া খেলায় মাতিয়া গেল।

বাপ আচ্ছা এক মজার কাণ্ড শুরু করিয়া দিয়াছে। এ গাঁয়ে যা কোনদিন কেউ করে নাই, তেমনি এক কাণ্ড। রমু মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

তারপর একদিন দেখা গেল, তিতাসের পারে একখানা অস্থায়ী চালাঘর উঠিয়াছে। কয়েকদিন পরে সে-ঘরের বাসিন্দারাও ছোট ছোট কয়েকখানা কাঠের বাক্স মাথায় করিয়া হাজির হইল। তারা চারিজন ছুতার মিস্ত্রি। নাও গড়াইবার যাবতীয় হাতিয়ার লইয়া সে ঘরে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

আগাপাছার "ছেই" ঠিক করিয়া যেদিন তাহারা নাও 'টাঙ্গিল', সেদিন রমুর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। নাওয়ের মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, রমুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি তার কি পরিমাপ করিবে! কিন্তু মিস্ত্রি দুইটা অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ী পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে!

মাপজোখ লইয়া এই মেরুদন্ড ঠিক করিতে কয়েকদিন লাগিল। তারপর পূরাদমে শুরু হইল কাজ। এক একটা তক্তায় কাদা মাখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া, টানা দিয়া মোড়ন দিয়া বাঁকাইয়া, খাঁজ কাটিয়া জোড়া দেয়, আর পাতাম লোহার একদিক বসাইয়া আস্তে হাতুড়ীর টোকা দেয়, একদিক সামান্য একটু বসিলে, আরেকদিক ঘুরাইয়া খাঁজের উপর বসাইয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিতে থাকে—ডুম্ ডুম্—টাকুর টাকুর ডুম!

দেখিতে দেখিতে নাওয়ের অস্থিমাংস জোড়া লাগিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাইতে এখনও অনেক বাকী।

ছাদির বলিল, রমু, বাজী একটা কাম কর। আমি ক্ষেতে যাই, তুমি মেস্তুরেরে তামুক জ্বালাইয়া দিও কেমন!

একটা কাজ পাইয়া রমু বর্তাইয়া গেল। সেই হইতে বাড়ীতে বড় একটা সে আসেই না। কেবল ঠিক-দুপুরে মিস্ত্রিরা যখন কাজ থামাইয়া রান্না চড়ায়, তখন সে একবার নিজের ক্ষুধাটা অনুভব করিয়া বাড়ীতে আসে। কিন্তু মন পড়িয়া থাকে মিস্ত্রিদের উন্মুক্ত ছোট সংসারখানাতে। সেখানে শুধু কয়েকটী হাতুড়ী আর বাঁটালীর কারসাজিতে কেমন লম্বা লিক্‌লিকে একটা নাও গড়িয়া উঠিতেছে।

রমুর ভবিষ্যৎ লইয়া একদিন বাপ-ছেলেতে কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। ছাদির বলিল, তারে কিতাব হাতে দিয়া মক্তবে পাঠাইব। কাদির হাসিয়া বলিল, না, তারে পাচন হাতে দিয়া গরুর পিছে পিছে মাঠে পাঠাইব।

মাঠে পাঠাইলে সে আমার মত মূর্খ চাষাই থাকিয়া যাইবে। দুনিয়ার হাল আবস্থা কিছুই জানিতে পারিবে না। মানুষ হইতে পারিবে না।

আর ইশ্‌কলে পাঠাইলে গগন সরকারের মতন তঞ্চক না হোক, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ীর বিছানায় বৌকে ও বৌয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শুয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুণিতে পারিবে। কাজ নাই বাবা অমন লেখাপড়া শিখিয়া।

রমুর মার রাগ হইল ঃ যত দোষ বুঝি আমার বাপের। আমার বাপ ঘুষ খায়; আমার বাপ চুরি করে; আমার বাপ ফল্‌না করে, তস্‌কা করে—কিযে না করে!

তুই থাম, ছাদির ধমক দিল।

না থামিব না, আমার বাপ যখন অত দোষের দোষী, তখন জানিয়া শুনিয়া এমন চোরের মাইয়া ঘরে আনিলে কেন? আর আনিলেই যদি, খেদাইয়া দিলে না কেন?

খেদাইয়া দিলে আরেক খানে গিয়া খুব সুখে থাকতে পারতিস না?

আহা কত সুখেই না আছি এখানে!

মুখপুড়ি তুই থামবি না চুপ করবি?

ইস্‌ থামবে। আমি মুখপুড়ি, আমার বাপে চোর, আবার থামবে!

রাগে ছাদির উঠিয়া গিয়া মারে আর কি। কাদির তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিল।

মেয়েটার মধ্যে এক বিদ্রোহের মূর্তি দেখা গেল এই প্রথম। কাদিরের মনের কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগিল।

চোর হোক ধাওর হোক, তারইত আমি মেয়ে। বাপ হইয়া মার মতন পাল্‌ছে খাওয়াইছে ধোয়াইছে—হাজার হোক, তবু বাপ। চোর হইলেও আমারই বাপ, আর কারুর বাপ না। আমি মরলে এ বাপেরই বুক খালি হইবে। আর কোন বাপের বুক খালি হইবে না।

না হইবে না! চোরের মাইয়ার আবার টাস-টাইস্যা কথা। খালি হইবে না তোমারে কে বলিল?—কাদিরের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তার জমিলার কথা মনে পড়িয়া বেদনায় বুকটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, মুহুরী যত দোষের দোষী না, তার চাইতে অধিক দোষী করিয়া আমরা এই অসহায় মেয়েটাকে সকলে মিলিয়া জর্জরিত করিতেছি। আমি যত দোষের দোষী না, তার চাইতেও অধিক দোষের দোষী করিয়া তারাও যদি আমার জমিলাকে এমনি জর্জরিত করিতে থাকে, জমিলা কি তখন নিথর পাষাণের মত চুপ করিয়া শুনে আর চোখের জল ফেলে? জমিলা কি তার এতটুকু প্রতিবাদ করে না? করিলে তবু মেয়েটা বাঁচিয়া যাইত মন হালকা করিয়া, কিন্তু না করিলে, সে যখন নিরুপায়ের মত সহিতে হইবে মনে করিয়া তিলে তিলে ক্ষয় হইতে থাকিবে, তখন তাহাকে দুইটা সান্ত্বনার কথা শুনাইবে কে?

জমিলা। সেও মা-মরা মেয়ে। এ যেমন মুহুরীর বুক-সেচা ধন, জমিলাও তেমনি কাদিরের বুক-সেচা ধন। তবে, বাপ হিসাবে মুহুরীতে আর কাদিরেতে তফাৎ কি? তফাৎ শুধু এই যে, মুহুরী আবার একটা শাদী করিয়াছে। কাদির তার ছেলের দিকে চাহিয়া তাহা করে নাই। আরেকটা শাদী করিয়াও যখন মুহুরী মেয়েটাকে ভুলিতে পারে নাই, তখন কাদির ঘরে একটা গৃহিনী না আনিয়া, ছেলেটার ও মেয়েটার উপর হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করিয়া দিয়া, জমিলাকে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে?

কিন্তু তবু ভুলিয়া সে আছে ইহা ঠিক। যদি ভুলিয়া না থাকিত, কতদিন আগে একবার সে দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছিল—সেই গত অঘ্রাণে—দুই দিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে, শেখের পুতের নাকি বড় কাজের ঠেকা, অত বলিয়াও আর একটা দিন রাখিতে পারা যায় নাই,—অতদিন আগে সে আসিয়াছিল, ভুলিয়া না থাকিলে এতদিনের মধ্যে দুইবারও কি জমিলাকে এখানে আনা হইত না? কিন্তু কেন কাদির অত আদরের জমিলাকেও ভুলিয়া থাকিতে পারে? কেন? এই রাক্ষুসী মেয়েটারই জন্য নয় কি? সে আসিয়া এ বাড়ীতে কাদিরের বুকে জমিলার যে স্থানটুকু ছিল, সেটুকু যদি অধিকার করিয়া না বসিত, বুড়া কাদির কি তাহা হইলে পরের ঘরে মেয়ে দিয়া বাঁচিতে পারিত!

রমুর মা খুশী তখনও গজরাইতেছে, সাধে কি লোকে বলে পরের ঘর! পরের ঘরই ত। যে ঘরে আসিয়া বাপ হয় চোর আর নিজে হয় পোড়া-মুখী সে ঘর কি আপনা ঘর! সে ঘর কি পরের ঘর নয়?

হ, হ, পরের ঘর। রাত না পোহাইতে উঠিয়া বিশটা গরুর গোয়াল সাফ করা, খইলভুসী দেওয়া, ঝাঁটা হাতে বাহির হইয়া এত বড় উঠান বাড়ী পরিষ্কার করা, কলসের পর কলস পানি তোলা, রান্ধা, খাওয়ানো-লওয়ানো, ধান শুকানো, কাক তাড়ানো, উঠান ভরতি ধান রোদে হাঁটিয়া পা দিয়া উল্টানো পাল্টানো, তারপর খড় শুকাও, শোলা শুকাও, পাট ইন্দুরে কাটে, তারে দেখা, অত অত ধানভানা, ফের রান্ধা-বাড়া করা—এত হাজার রকমের কাজ—পরের ঘরে কি কেউ এত কাজ করে কোনদিন? শরীর মাটী করিয়া এত কাজ যে-ঘরের জন্য করিতেছে, তারে কয় কিনা পরের ঘর! কহিলেই হইল আর কি, মুখের ত আর কেরাইয়া নাই!

খুশীর চোখে এবার দ্বিগুণ বেগে জল আসিয়া পড়িল। এবার সে ফুফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক কাঁদিবার পর তাহার মনে হইল, এমন কাঁদন কাঁদিয়াও শান্তি।

পরিশেষে কাদির বলিল, দে, তোর পুতেরে মক্তবে দে, কিন্তু বলিয়া রাখিলাম, যদি মিছাকথা শিখে, যদি জালজুয়াচুরী শিখে, যদি পরেরে ঠকাইতে শিখে, তবে তারে আমি কিছু বলিব না, আমি শুধু তোমার মাথাটা ফাটাইব, এই আমি কইয়া রাখলাম ছাদির মিয়া।

লেখাপড়া শেখা গগন সরকার কাদিরের মনে বিদ্যার্জনের বিরুদ্ধে এমনি এক ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

মোহাম্মদী : পৌষ, ১৩৫২

৭.

সেইদিনই বিকালে ছাদির বাজারে গেল। সেই গোকনের হাট। চারিপাশের বিশ ত্রিশখানা গাঁয়ের কেন্দ্র। একখানা রঙীন টুপি, একটি রংচঙে লুঙি ও বুকে ফুল তোলা একটা গেঞ্জি কিনিয়া যখন ঘাটের দিকে গেল, তখন বেলা প্রায় শেষ। হাত পা ভাঙা একটা লোক হাটের একদিকে চিৎ হইয়া শুইয়া গান গাহিতেছে, আল্লা আল্লা বলে ডাকি শুন না, না জানি কইরাছি আমি কি গোনা॥ ছাদির ঘাটের দিকে গেল। সেখানে অগুন্তি নৌকা, তার মধ্যে একখানা নৌকা দেখা গেল তাদেরই গাঁয়ের আদালত বেপারীর। বেপারী সওদা শেষ করিয়াছে, এইবার নৌকা খুলিবে। ডাকিয়া ছাদির বলে, অ-

বেপারী, নাওয়ে আমার জায়গা হইবে ত? খুব হইবে, বলিয়া বেপারী পাশের নাওকে এক ধাক্কা মারিয়া নিজের নাওটা একটু আগাইবার চেষ্টা করিল। একটু রাখ, আমি এখনই আসিতেছি, বলিয়া ছাদির আবার বাজারের ভিড়ে মিশিয়া গেল! এক অন্ধ তখন গলায় প্রাণপণ জোর দিয়া গাহিতেছে, হাট করিতে আইছ রে ভবে, বাজার ভাইঙা যায়, ধীরে ধীরে বান্দা সব বাড়ী চইল্যা যায়॥ লোকটা অন্ধ বলিয়াই দেখিতে পায় নাই যে, বাজার এখনও ভাঙে নাই এবং ভাঙে নাই বলিয়াই ছাদির এক দোকানে ঢুকিয়া দশ সের চিড়া আর এক সের গুড় কিনিয়াছে।

নৌকায় আসিলে আদালত বেপারী জিজ্ঞাসা করিল, অত চিড়া গুড়ে কি হইবে তোমার? বাড়ীতে বেপার-সেপার আছে নাকি?

নাও গড়াইতেছি, জাননা তুমি? দৌড়ের নাও।

জানি'ত।

চারজন মেস্তুর লাগাইছি। রোজ দুপুরে তারা রান্ধে খায়। বেহুদা সময় নষ্ট। এদিকে ক্ষেতে হাল দিবার সময় আসিতেছে। দিন-মাধানও ভাল না। কখন মেঘ হয় কিছু ঠিক নাই। যে-হালে তারা কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাতে দেখিতেছি অনেক দেরী হইবে। আর দুইটা মেস্তুর আনিয়া লাগাইব, তারও উপায় নাই। শেখের বাড়ীতে হিন্দু মেস্তুর আসিতেই চায় না। এ কয়জন সমাজেরে ডরায় না; বলে, আমাদের কাজ ত শুধু এক গাঁয়ে বসিয়া করি না। ক্ষণে দেশে ক্ষণে বিদেশে কাজ করি, সমাজেরে ডরাইয়া কি করিব? দেশে কাজ করিবার সময় সমাজ যদি ডর দেখায়, সেই যে বিদেশে যাইব, আর দেশে ফিরিবার নামও করিব না!

ত, মেস্তুরেরে চিড়া খাওয়াইবা বুঝি?

হাঁ। চিড়া গুড়।

আর কিছু খাওয়াইবা না?

আর দুধ। তারা জ্বাল দিয়া নিয়া, চিড়া গুড় মাখিয়া খাইবে।

ভাত?

দূর্ বেপারী! হিন্দু মেস্তুরে আবার শেখের বাড়ীর ভাত খায় নাকি?

জোর কইরা খাওয়াইয়াতো দেও, নেক হইবে।

তুমি আমার বাপের সামনে কিন্তু এসব কথা কইও না, বেপারী। বাপ এ সমস্ত কথা পছন্দ করে না।

পরেরদিন রমু নূতন লুঙি জামা পরিয়া নূতন টুপি মাথায় দিয়া মক্তবে গেল। পড়িয়া আসিয়া মার কাছ হইতে কিছু জল খাবার খাইয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সেই চারজনকে ত নূতন লুঙি গেঞ্জি টুপি দেখানো হয় নাই। মক্তবের ছেলেরা কতবার চাহিয়া দেখিয়াছে। আর সেই চারজন দেখিবে না।

নূতন পোষাকে সজ্জিত রমুকে তাহাদের জন্য তামাক সাজিতে বসিতে দেখিয়া তাহাদের একজনের বড় মায়া হইল, বলিল, থাক থাক মুন্শীর পুত। তোমার আর টিকার কালি ঘাঁটিয়া দরকার নাই। তুমি বসিয়া বসিয়া খালি দেখ, কেম্নে আমরা নাও বানাই, আর কেম্নে আমরা লোহা লাগাই, বলিয়া একটা লোহা তক্তায় বসাইয়া হাতুড়ী দিয়া খুব জোরে এক পেটা দিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। অদূরেই ঘাটের পথ। লাল-কালো, রেখা-রেখা শাড়ী পরা গেরস্থ বৌঝিরা সেই পথ দিয়া তিতাসের ঘাটে যাইতেছে, কেউ কেউ ঘাটের কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কারো হাতে চালের ধুচনি, কারো হাতে মাছের ডোলা। কিন্তু অনেকের কাঁখেই কলসী। কারো কারো পায়ে রূপার মল।

দেখিয়া জনৈক ছুতারের গলায় গান ভাসিয়া উঠিল। ছোট লোকের খানা-পিনা রে বিহানে বৈকালে, বড় লোকের খানা-পিনা রাত্র নিশা কালেরে হায় কান্দে, কান্দে রে দেওয়ান কটু মিয়ার মায়॥

সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছুতার বাধা দিল, দেখ্ বুদ্ধিমান, এসব শেখ-পড়ার মেয়েছেলে। ইহাদিগকে শুনাইয়া গান গাহিলে মাথা লইয়া দেশে যাইতে পারিবে না।

মাথা না হয় রাখিয়াই যাইব!

একটা লোক মাথা রাখিয়া আবার যায় কি করিয়া রমু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, ভাবিল নানাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া দিতে পারে। তবে গানটা শুনিতে তার খুব ভাল লাগিল।

থামলা কেনে, গাওনা তোমার গান।

বড় মেস্তরি তার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, দুপুর বেলা আসিলে আমি গান শুনাইতে পারি, সকালে বিকালে পারি না।

কেনে পার না?

গুরুর বারণ আছে।

কিন্তু দুপুরে যে আমি মক্তবে পড়িতে যাই।

তবে গান শুনিয়া কাম নাই।

কাম নাই কেনে?

পড়িতে হইলে গান শোনা হয় না, আর গান শুনিতে হইলে পড়া হয় না, এই রকম যখন অবস্থা, তখন পড়নই ভাল, গান শুনিয়া কাম নাই।

শুক্রবারে মক্তব ছুটি থাকে। দুপুর বেলা রমু লুঙ্গী পরিল, টুপি পরিল, কিন্তু গেঞ্জি পরিতে ভুলিয়া গেল। তারপর সে মিস্ত্রিদের নিকট হাজির হইল। কিন্তু বড় মিস্ত্রি তাহাকে নিরাশ করিয়া জানাইল, হাতে বড় কাজ, গান এখন সুবিধা হইবে না। আরও বলিয়া দিল, বাড়ীতে গিয়া বল, দুধ জ্বাল দেওয়ার ঝামেলা পোহাইবার আজকাল আর সময় নাই। দুধ যেন বাড়ী হইতেই জ্বাল দিয়া চিড়াগুড়ের সঙ্গে পাঠাইয়া দেয়।

রমুর মা দুধ জ্বাল দেওয়ার কড়াখানাকে ঝামা দিয়া দুই তিনবার মাজিয়া দুধ ফুটাইল এবং বড় একটা লোটার গলায় ফাঁস পরাইয়া রমুকে দিয়া পাঠাইল। মাথায় চিড়ার বোঝা, হাতে গলায়-দড়ি-বাঁধা দুধের লোটা এই বেশে রমুকে দেখিয়া মেস্তরিরা হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না।

তারপর দেখিতে দেখিতে একদিন গোটা একটা নাও তৈয়ার হইয়া গেল। এখন শুধু বাকী রহিল, নাও কাত করিয়া তলার দিকটা পালিশ করা। সে কাজের ভার ছোট তিনজনার হাতে ছাড়িয়া দিয়া বড় মেস্তরি হুকা হাতে লইয়া, জুৎসই করিয়া বসিল এবং হুকা-টানা শেষ করিয়া আস্তে আস্তে গান জুড়িয়া দিল—হস্তেতে লইয়া লাঠী, কান্ধেতে ফেলিয়া ছাতি, যায়ে বুরুজ দীঘল পরবাসে॥

তারপর, পথশ্রমে বুরুজ ক্লান্ত হইল এবং—চৈত্রি না বৈশাখ মাসে, পিঙ্গল রৌদ্রির তাপে লাগিল দারুণ জল-পিপাস॥ তখন সে জলের জন্য এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, কিন্তু কোথাও না নদী, না পুষ্করিণী। কিন্তু সহসা তার চোখে পড়িল—ঘরখানা লেপাপুছা, দুয়ারে চন্দনের ছিটা, এটা বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ী। বুরুজ নিজে ব্রাহ্মণ কাজেই ব্রাহ্মণের বাড়ী চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। এত যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তখন্ এটা কোনও ব্রাহ্মণের বাড়ী না হইয়া যায় না। বুরুজ তখন আগাইয়া ডাক দিল—ঘরে আছ ঘরণীয়া ভাই, জল নি আছে, খাইতে চাই, পরবাসী তিয়াস লেগে মরি॥

তাহার আহ্বান ব্যর্থ হইল না—ডান হস্তে জলের ঝারি, বাম হস্তে পানের খাড়ি যায়ে কন্যা জলপান করাইতে॥ পিপাসা কাতর বুরুজ—জল খাইয়া শান্ত হইয়া, জিগাস করে তুমি কোন্ জাতের মাইয়া, (বলে) জাতে আমরা গন্ধ-ভূইমালী॥ বুরুজের জাতি গেল, হায় হায়, ব্রাহ্মণ বুরুজের জাতি গেল। আগে পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া যার হাতের জল সে গলাধঃকরণ করিল, সে ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়। সে ছোট জাতের মেয়ে—আছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, পিছাড় খাইয়া বুরুজে কান্দে, জাতি গেল ভূঁইমালিয়ার ঘরে॥

বুরুজের জাতি গিয়াছে। সে কি করিবে? না গেল প্রবাসে না গেল দেশে ফিরিয়া। যেখানে তাহার জাতি নষ্ট হইল, সেখানেই সে রহিয়া গেল, আর বলিয়া দিল—সঙ্গের যত সঙ্গীয়া ভাই, কইও খবর মা বাপের ঠাঁই, জাতি গেল ভূইমালীয়ার ঘরে॥

বেঘোরে একটা লোকের জাতি নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া রমুর খুব দুঃখ হইল। জীবনে ব্রাহ্মণ সে দেখে নাই। তবে তার সম্বন্ধে যতটুকু শুনিয়াছে, মনে মনে বিচার করিয়া রাখিয়াছে, সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাহারা মাথায় অনেক উঁচু। তারা নাকি মন্ত্র বলে। তারা নাকি অনেক মোটা মোটা কিতাব পড়িয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আর মালী! তারা তো শুনিয়াছি হিন্দু বাড়ীর বিবাহে কলাগাছ পুতিয়া দেয়। এ আর তেমন কি কাজ তারা করে। আর এইরকম এক মালীর ঘরেই অমন-একটা পণ্ডিত মানুষের জাতি নষ্ট হইয়া গেল। ব্রাহ্মণত্ব খুয়াইয়া সে মালী হইয়া মালী-বাড়ীতে রহিয়া গেল। এখন আর সে বিবাহ বাড়ীতে গিয়া মন্ত্র পড়িবে না, মোটা মোটা কিতাব মুখস্থ করিবেনা ? এখন হইতে সে কেবল বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া কয়েকটা কলাগাছ পুতিয়া দিবে। এই সামান্য কাজের দরুণ কেউ তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না। কিন্তু তার অত বড় জাতি, সেটা নষ্ট হইল কেন? এত বড় সাংঘাতিক কথা।

তিয়াস লাগিয়াছিল— এক গেলেস পানি খাইল, এতেই তার জাত গেল!

গেল ত!

গেল কেনে!

গেল কেনে জানি না। কিন্তু গেল।

গেল যে, তাই বা সে জানিতে পারিল কি করিয়া?

বড় মেস্তরি চুপ করিয়া রহিল। ছোট মেস্তরিদের একজন রাগ করিল—ভারী ত চাষার পুলা পাঁজন হাতে গরু রাখিবে, তার কথার কেমন প্যাচ দেখ না।

সে কথায় কান না দিয়া রমু বলিল, আমার হাতের পানি খাইলে তোমার জাত যাইবে?

শক্ত প্রশ্ন। বড় মেস্তরি চট করিয়া মীমাংসা করিয়া বলিল, না।

আমার মার হাতের পানি খাইলে?

না।

আমার বাপের হাতের?

না।

আমার নানার হাতের?

না।

তবে যে আমার নানা সেদিন বলিল? খাইতে বসিয়া আমি যখন বলিলাম, নানা, মেস্তরিদিগকেও ডাকিয়া আনি? করাতিরা যখন কাঠ চিরিতেছিল, তুমি তো রোজই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে আমাদিগকে বলিতে, উহাদিগকে লইয়া আমরা সকলে খাইতে বসিতাম। মেস্তরিদিগকে সেইরকম ডাকিয়া আনিতে আমাকে বল না কেন তুমি? আনিব ডাকিয়া? নানা কি বলিল জান? বলিল, করাতিরা ছিল আমাদের জাত ভাই। কিন্তু এরা হিন্দু। আমাদের ভাত ওরা খাইবে সে তো দূরের কথা, আমাদের ছোঁয়া পানি পর্যন্ত ওরা খাইবে না, খাইলে ওদের জাত যাইবে--নানা এই কথা বলিল। অখন তুমি বলিতেছ জাত যাইবে না। কার কথা ঠিক?

দুইজনের কথাই ঠিক। মুসলমানের ছোঁয়া পানি খাইলে হিন্দুর জাত যাইবে ঠিকই, তবে তোমাদের ছোঁয়া জল খাইলে জাত যাইবে না। কেন যাইবে না--তোমরা ত আপন লোকের মত হইয়া গিয়াছ। কতদিন ধরিয়া আছি। রোজ দেখি, কথা কই। তোমাদের সাথে জানা-পরিচিতি হইয়া গিয়াছে।

জানা-পরিচিতি হইলে জাত যায় না?

না।

তবে বুরুজ বাউনার যদি ঐ মালীর-ছেমরীর সাথে জানা পরিচিতি হইয়া যাইত এবং পরে পানি খাইত, তবে বোধ হয় জাত যাইত না?

বড় মেস্তরী হাঁ না কিছুই বলিল না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রমু সহসা হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

বড় মেস্তরী বিরক্ত হইয়া বলিল, হাসিলে যে।

হাসিলাম একটা কথা ভাবিয়া।

কি কথা?

বলিব না।

ছোট মেস্তরীদের একজন খেঁকাইয়া উঠিল, হাতে কাজ থুইয়া কি একটা চেঙরার সাথে তর্কাতর্কি করিতেছে।

তোর কাজ তুই কর কাশীনাথ। আমার বেগুনে তোর লবণ দেওয়ার দরকার নাই।

তারপর এদিকে ফিরিয়া বলিল, কেনে বলিবে না?

বলিতে পারি, যদি তুমি নানাকে বলিয়া না দেও। বলিবা না ত?

না, বলিব না।

কথাটা এই, আমার ছোঁয়া পানি খাইলে তোমাদের যদি জাত যাইত তবে বেশ হইত।

বড় মেস্তরীর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল, কি রকম?

বুরুজ ঠাকুরের জাত গিয়াছিল বলিয়াই না সে মালী-বাড়ীতে থাকিয়া গিয়াছিল। তোমাদের জাত গেলে তোমাদিগকেও আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া যাইতে হইত, তখন বেশ হইত। অখন আমরা চারজন আছি, আমি, মা, বাপ আর নানাজান এই চারজন আছি। তোমরা চারজনকে লইয়া আটজন হইতাম, বেশ হইত। অখন ত তোমরা নাও-গড়ানি শেষ হইলেই চারজনে চারটা হাতিয়ারের বাক্স মাথায় করিয়া খাল পার হইয়া গো-পাটের পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবে, আর আসিবে না। কোনোদিন আর তোমাদিগকে দেখিতেই পাইব না।

বড় মেস্তরী যেন ঠকিয়া গিয়াছে এমনিভাবে চুপ করিয়া, কাজে মন দিল।

যে-দিন নাও গড়ানি শেষ হইল সেদিন মিস্ত্রিদের খুশী আর ধরে না। দীর্ঘ দিনের চেষ্টা ও শ্রম আজ সফল হইল। এমন একখান্ চিজ তারা গড়িয়া দিল যে-চিজ অনেক অনেক দিন পর্যন্ত জলের উপর ভাসিবে—কত লোক তাতে চড়িবে, বসিবে, নদী পার হইবে—এক দেশ হইতে আরেক দেশে যাইবে—কত জায়গায় দৌড়াইবে, বখ্‌শীষ পাইবে—আর এই চারজনায় হাতের স্বাক্ষর স্বগর্বে বহন করিতে থাকিবে। কেউ জানিবে না, কারা গড়িয়াছিল, কাদের বিন্দুবিন্দু শ্রম ও বুদ্ধির সঞ্চয় সম্বল করিয়া ধীরে ধীরে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাও? সে কি ভুলিয়া যাইবে এই তিন জনকে? কিছুতেই না!

সেদিন তাদের খুশী উপ্‌চাইয়া উঠিল। লোকজন জড় করিয়া চারি জনে মিলিয়া তারা পায়ের পরে পা ফেলিয়া নাচিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়া গাহিল—শুনরে নগইরা লোক, নাও গড়াইতে কত সুখ।

নাও-গড়ানি শেষ করিয়া মেস্তরীরা পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া সত্যি একদিন কাঠের বাক্স মাথায় করিল, হাঁটুর কাপড় টানিয়া টানিয়া খাল পার হইল এবং গো-পাটের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল, তারপর তারা এক-একটা কাকের মত ছোট হইয়া গেল, তারপর এক সময় আর তাহাদিগকে দেখা গেল না।

তারপর একদিন কোথা হইতে তিনজন কারিগর আসিয়া দিনরাত কাজ করিয়া নৌকায় তুলি বুলাইয়া বুলাইয়া রং লাগাইয়া গেল। দুই পাশে লতা হইল, পাতা হইল, ময়ূর হইল আর একজোড়া করিয়া পালোয়ান হইল।

তারপর একদিন নৌকা জলে ভাসিল। ছাদির পাড়ার লোক ডাকিয়া আনিয়াছিল আর আনিয়াছিল এক হাঁড়ি বাতাসা। তাহারা নৌকার গোরায় গোরায় ধরিল; একজন বলিল, জোর আছে? সকলে বলিল, আছে। তারপর সকলে বলিল, যে জোর থুইয়া জোর না করে তার জোর খায় মরা কাষ্টে রে-এ-এ...। এই বলিয়া এমন জোরে টান মারিল যে, নৌকা একটানেই জলে গিয়া থামিল। কিন্তু তারা নৌকা থামিতে দিল না, সকলে মিলিয়া গায়ের জোরে ঠেলা মারিল। সকলের সমবেত শক্তিতে সেই এক ঠেলার বেগে নৌকা, মাল্লাহীন, চালকহীন সেই একলা নৌকা তিতাসের মাঝ পর্যন্ত গিয়া থামিল এবং ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল। রমুর দুই চোখ আনন্দে নাচিতে লাগিল। এমন সুন্দর রং-চং করা নাও সে জীবনে আর কোনদিন দেখে নাই। তার গর্ব হইল, এমন একটা অপূর্ব জিনিস তাহাদের নিজের!

এমন অপূর্ব জিনিষ আর দেখা যায় নাই সত্যি! এমন রং, এমন শোভা! ধনুকের মত বাঁকা, আধখানা চাঁদের মত বাঁকা। কিন্তু কত রং!

আসমানের রামধনুটা বুঝিবা উল্টাইয়া তিতাসের জলের উপর পড়িয়া গিয়াছে!

ভাদ্রের পয়লা তারিখে কাদিরের বাড়ীতে খুব ধুমধাম পড়িয়া গেল। সকাল হইতে না হইতেই শত শত জোরদার চাষী তরুণ সেদিন তার বাড়ীতে জমায়েত হইল। তারপর তারা রাঙা বৈঠা হাতে করিয়া নৌকায় উঠিয়া গোরায়-গোরায় বসিয়া গেল।

রমু এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করিতেছিল। এক সময় তার বাপকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাজান, তোমরা নাও দৌড়াইতে যাইবে, আমাকে নিবে না?

অখন কিসের নাও-দৌড়ানি? অখন ত খালি তালিম দিতে যাই। নাও-দৌড়াইতে যাইব দুপুরের পর।

তখন আমাকে নিবে ত?

হাঁ হাঁ, বলিয়া ছাদির ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গেল।

গাঙ-বিল ঘুরিয়া, গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরিয়া তালিম দিয়া আসিয়া দেখা গেল, নাও খুব ভাল হইয়াছে, চলেও খুব। সব লোকে একযোগে বৈঠা মারিলে সাপের মত হিস্‌হিস্ করিয়া চলে, শিকারীর তীরের মত ধা ধা করিয়া চলে, গাঙের স্রোতের মত কলকল করিয়া চলে।

সকলে দুপুরের খাওয়া সারিয়া আবার যখন বৈঠা হাতে করিয়া নৌকায় উঠিল, রমুও তখন সকলের দেখাদেখি, রাঙা লুঙিখানা পরিয়া, গেঞ্জিখানা গায়ে দিয়া এবং রঙীন টুপিখানা মাথায় চড়াইয়া সকলের সমারোহের মধ্যে নদীর পারে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুই পাশে দুই সারি লোক বৈঠা হাতে বসিয়া পড়িল। মাঝখানে কয়েকখানা তক্তার উপর, মাস্তুলের মত ছোট একখানা খুঁটি ঘিরিয়া কয়েকজন প্রবীণ লোক দাঁড়াইল। তারা সারি গাহিবে। একটি ঢোলক এবং কয়েক জোড়া করতালও উঠিল। আর উঠিল কিছু মারপিটের লাঠী।

সব কিছু উঠাইয়া ছাদির নিজে উঠিতে যাইবে, এমন সময় রমু তাহাকে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত আঁকড়াইয়া ধরিল, বাজান আমারে লইয়া যাও, অ বাজান আমারে লইয়া যাও।

কাজের সময় দিক্ করিস না, ভাল লাগে না। বলিয়া ছাদির তাহাকে এক ঝটকায় ছাড়াইয়া, ঠেলিয়া দিল, তারপর নৌকায় উঠিয়া হালের খুঁটীতে হাত দিল।

আলীর নাম স্মরণ করিয়া তাহারা নৌকা খুলিল, শত শত বৈঠা একসঙ্গে উঠিল, পড়িল, জলের উপর কুয়াসা সৃষ্টি করিল, তারপর তিতাসের বুক চিরিয়া যেন একখানা শিকারীর তীর হিস্ হিস্ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

ছাদির যখন হাল-কাঠী ধরিয়া সারি গানের তালে তালে তক্তার উপর পদাঘাত করিয়া নাচিতেছে, রমু তখন তিতাসের শূন্য তীরে বসিয়া ফুফাইয়া ফুফাইয়া কাঁদিতেছে। নানা সাধিল, মা সাধিল, কিন্তু কারো কথা সে শুনিল না। মুখে তখনও সে বলিতেছে, বাজান, আমারে লইয়া যাও।

তিতাসের বুকে সেদিন অনেকগুলি পালের নৌকা দেখা গেল। সব নৌকারই গতি একদিকে। যে স্থানে আজ দুপুরের পর নৌকা-দৌড় হইবে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছোট বড় নানা আকারের পালের নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে। অনেক নৌকাতেই যত পুরুষ তার বেশী স্ত্রীলোক। বনমালীর নৌকাতেও তাই। পুরুষের মধ্যে বনমালী নিজে আর

বড়বাড়ীর দুইজন। তা ছাড়া অনন্ত। কিন্তু সে দরকার মত লগি ফেলিয়া নৌকার রোখ থামাইতে পারিবে না, মাস্তুল তুলিয়া পাল গুটাইতেও পারিবে না, বা হাল ঘুরাইয়া হাজার নৌকার ভিড়ের ভিতরে নিজেদের নৌকার গতিও ঠিক রাখিতে পারিবে না, পারিবে কেবল মেয়েদের মত বসিয়া বসিয়া নৌকা-দৌড় দেখিতে। মেয়েদের মধ্যে আসিয়াছে বড়বাড়ীর সকলে আর তাদের আদরের নন্দিনী অনন্তবালা, যার শুধু পাঁচ রকম প্রশ্নের উত্তর দিতেই অনন্তর মত একটা ছেলের সারাক্ষণ তার নিকট থাকার দরকার। এরা ছাড়া, আর আসিয়াছে বনমালীর বোন উদয়তারা।

নৌকা-দৌড়ের স্থানটিতে গিয়া দেখে সে এক বিরাট কাণ্ড। তিতাসটা এইখান হইতে মাইল খানেক পর্যন্ত অনেকটা মোটা হইয়া গিয়াছে। তারই দুইপার ঘেসিয়া হাজার হাজার ছোট বড় ছইওয়ালা নৌকা খুঁটী পুতিয়াছে। কোথাও বড় বড় নৌকা গেরাপি দিয়াছে, আর তাহারই ডাইনে বাঁয়ে ও সামনের দিকে দশ বিশটা ছোট নৌকা তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই ভাবে যত দূর চোখ মেলা যায়, কেবল নৌকা আর নৌকা, আর তাতে মানুষের বোঝাই। নদীর মাঝখান দিয়া দৌড়ের নৌকার প্রতিযোগিতার পথ।

সবে বেলা পড়িতে শুরু করিয়াছে। প্রতিযোগিতা শুরু হইবে শেষবেলার দিকে। এখন দৌড়ের নৌকাগুলি ধীরে সুস্থে বৈঠা মারিয়া নানা ছন্দের নানা সুরের সারি-গান গাহিয়া গাঙময় এধার ওধার ঘুরিয়া ফিরিতেছে। হাজার হাজার দর্শকের নৌকা হইতে দর্শকেরা সে-সব নৌকার কারুকার্য দেখিতেছে, বৈঠা মারিয়া কি করিয়া উহারা জলের কুয়াসা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিতেছে আর কান ভরিয়া শুনিতেছে তাহাদের ব্যথা বেদনা আনন্দে মাধুর্যে ভরা সহজ সরল স্বতস্ফূর্ত গানগুলি। কিন্তু সকল নৌকাতেই যে লালিত্যপূর্ণ গান গাহিতেছে তাহা নয়। একটি নৌকা হইতে শোনা গেল নিতান্ত গদ্য ভাবের গান—চাঁদমিয়ারে বলি দিল কে, দারোগা জিজ্ঞাসে, আরে চাঁদ মিয়ারে বলি দিল কে॥ দর্শকদের এক নৌকা হইতে কেউ বলিয়া উঠিল, ও চিনিয়াছি; বিজেশ্বর গ্রামের নাও, চর দখল করিতে গিয়া উহারাই খুনাখুনি করিয়াছিল। গানটা বাঁধিয়াছে সেই ভাব থেকেই।

একসঙ্গে এতগুলি দৌড়ের নাও দেখিয়া অনন্তের বুক আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। একটা নাও ছাৎ করিয়া অতি নিকট দিয়াই চকিতে চলিয়া গেল, গানের কলিটাও শোনা গেল বেশ—আকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে, নাওয়ের গলুই পাইলাম না॥ সঙ্গে সঙ্গে আরও একখানা নাও এই গানটা গাহিয়া চকিতে চলিয়া গেল—ও কদম ত-অ-অ-লায় আর বাঁশী বাজাইও না—আ-আ, বাঁশীর সু-উ-রে মন উড়ে।

গানের মত গান গাহিল তার পরের একখানা নাওয়ে। ধীরে সুস্থে চলিতেছে। বৈঠা জলে ছোঁয়াইয়া একসাথে শত শত বৈঠাকে উল্টাইয়া উপরে তুলিতেছে আর বৈঠার গোড়াটাকে একই সাথে নাওয়ের বাতায় ঠেকাইয়া বৈঠাধারীরা সামনের দিকে ঝুঁকিতেছে, আবার বৈঠা তুলিয়া জলে ফেলিতেছে। মনে হয় হাজার ফলার একখান ছুরি যাইতেছে আর তার সবগুলি ফলা একসাথে উঠিতেছে পড়িতেছে, আবার খাড়া হইয়া শির উঁচাইতেছে। মাঝখানে থাকিয়া একদল লোক গাহিতেছে, আর বৈঠাধারীরা সকলে এক তালে, সে গানের পদগুলির পুনরাবৃত্তি করিতেছে। যেন বৈঠা মারা তাদের গৌণ

কর্ম, মুখ্য কাজ গান শোনানো—তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গো, অ দিদি প্রা-আ-আ-ণ্ বন্ধুরে তোরা ডাক দে। আমার বন্ধু খাইবে ভাত, কিন্যা আন্‌লাম ঝাওর মাছ গো; অ দিদি দুধের লাগি পাঠাইয়াছি, পয়সা, কি সিকি, কি টেকা গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে॥ আমার বন্ধু ঢাকা যায় গাঙ পারে রান্ধিয়া যায় গো, অ দিদি জোয়ারে ভাসাইয়া নিল হাঁড়ি, কি ঘটি, কি বাটী গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে॥ আমার বন্ধু রঙি চঙি, হাওরে বেন্ধেছে টঙ্গি গো, অ দিদি, টঙ্গির নাম রেখেছে উদয় তারা কি তারা, কি তারা গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে॥ আমার বন্ধু আসবে বলি দুয়ারে না দিলাম খিলি গো, অ দিদি, ধন থুইয়া যৈবন করল চুরি, কি চুরি, কি চুরি গো, অ দিদি প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে॥

উদয়তারা হাসিল, খুব ত গান। মাঝখানে আমার নামখানি ঢুকাইয়া থুইছে।

তারপর পরপর যে দুইখানা নাও সারি গাহিয়া গেল তাহাদের একটি হইতে শোনা গেল—জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো, যাইস্ না যমুনার জলে। যমুনার ঘাটে যাইতে দেয়ায় করল আন্ধি। পন্থ হারা হইয়া আমরা কিষ্ণ ব'লে কান্দি॥ যমুনার ঘাটে যাইতে বাইরে ঘরে জ্বালা। বসন ধরিয়া টানে নন্দের ঘরের কালা॥ পরের নাওখানা গাহিল—সুন্দর ভাইগ্‌না কানাইয়া রে, পন্থ ছাড় জল আনি রে॥ কাঙ্ক্ষের কলসী ভাঙিবে রে। তোর মামা শুনিলে মারিবে রে॥ সঙ্গের একখানা ছৈওয়ালা নৌকো হইতে বলিতে শোনা গেল—গৌসাইপুরের নিকটে রাধানগর আর কিষ্টনগর নামে পাশাপাশি যে দুই গ্রাম আছে, সে-দুই গ্রামেরই এই দুই নাও।

শুনিয়া বনমালী মন্তব্য করিল—তবে একখানাতে রাধা-উক্তি আরেক খানাতে কিষ্ণ-উক্তি করিল না কেন? দুইখানাতেই রাধা-উক্তি করিল কেন?

পূর্বোক্ত নৌকা হইতে মন্তব্য আসিল, সবখানেই রাধা রে রাধা, সবখানেই রাধা।

আরও একখানা নাও তার প্রমাণ দিতে দিতে গাহিল—রাধা চিকণ কালি-য়া রাখব তোরে হৃ-দয় মা-ঝারে গাঁথিয়া॥

আর একখানা নাও গাহিল—সন্ধ্যাবেলা সখিগণ জল ভরিতে যায়, কদম ফুল ঝইরা পড়ে গায়।

আর একখানা গাহিল—জলে ঢেউ দিও না গো সখি, জলে কালো রূপ আমি নিরখি।

আর একখানা গাহিল—রাস্তা ছাইড়া দে রে কালা, পন্থ ছাইড়া দেরে কালা॥

পরের রমণী লইয়া চাতুরালি কর কালা, রাস্তা ছাইড়া দেরে কালা॥

এসব দ্বন্দ্বের নিরসন করিয়া আর একখানা নাও একটানা ভাবে রাধার এই কথা গাহিয়া চলিয়াছে, যাইতে রাধারে চাইয়া যাইও।

কিন্তু রাধা বিপ্রলব্ধা হইল। তাহাকে দেখিতে কেউ আসিল না। তাহার প্রমাণ দিয়া গেল আর একখানা নৌকা—হাম নারী পুরানা বসন, বন্ধুরে, হাম নারী পুরানা বসন। আম গাছে আম নাই, ইটা কেনে মারো। তোমার আমার নাই দেখা আঁখি কেনে ঠারো॥ তুমি আমি করলাম পীরিত কদম তলায় রইয়া, শত্তুরবাদী পাড়া-পড়সী তারা দিল কইয়া—

তারপর দীর্ঘকালের অদর্শন এবং অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য নির্ভরসা। পরের নাওখানা গাহিল—ও প্রাণ কানাই রে, আমি ত অবলা নারী, তরুতলায় বসত করি,

আঞ্চল ভিজাই আঁখির জলে, ও প্রাণ কানাই রে॥ কলসী কাঁখে গামছা হাতে, সিনান করতে যাই যমুনাতে, কলসী ভাসাইয়া নিল সোতে, ও প্রাণ কানাই রে॥ বাড়ীর পাশে রসিক থুইয়া, বাপে-ভাইয়ের চক্ষু খাইয়া বিয়া দিল মাইজ-মরারে চাইয়া ও প্রাণ কানাই রে॥

এই করুণ গান শুনিয়া সকলেরই মন বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় বড়বাড়ীর একজন উদয়তারার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল, এদিকে শুন ভইন কি মজার গানখান হইতাছে–ও তোরে দেখিনই রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে। থানায় থানায় চকিদার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, কোন কোন নারীর শুভ বরাত, আমার বরাত পুড়ে–বরাত পুইড়া গেলরে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে॥ হবিগঞ্জে নবীগঞ্জে কোণাকুণি পথ, প্রাণবন্ধু গড়াইয়া দিছে ইল্‌শা পাট্যা নথ–সে নথ পইড়া গেল রে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি রে॥

শুনিয়া উদয়তারা একটু হাসিল। পরে খানিকক্ষণ কান খাড়া রাখিয়া বলিল–এমন গান আরও কত আছে–অই শুন না, পেটমোটা পাতাম নাওয়ে কি গানখান হইতাছে–সামনে-এ কলা-র বাগ, পূব-দুয়ারী ঘর রে, রাইতে যাইও প্রাণের বন্ধু রে॥

আরেকখানা গান অনন্তবালার প্রতি সকলকে সচেতন করিয়া তুলিল–তীরের মত লম্বা নাও, কিন্তু চলিতেছে ধীরে ধীরে; চলিতেছে আর গাহিতেছে–ঝিয়ারীর মাথায় লম্বা কেশ, খোপা বান্ধে নানান বেশ, খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা। গাঙে আইলে আঞ্জন মাঞ্জন বাড়ীতে গেলে কেশের যতন, ঝিয়ারী জানি কোন্ পীরিতের মরা।

গানটা শুনিতে শুনিতে অনন্তবালার রয়সাধিক বড় খোঁপাটা ধরিয়া উদয়তারা আস্তে একটু মোচড়াইয়া দিল।

এমন সময় একখান সরু ছিপ-সরঙ্গা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একদৌড়ের পথ লম্বা একখানা সটান সাপের মতো নাওখানা জলের উপর ভাসিয়া চলিয়াছে। বৈঠা-ধারীদের সকলেরই পরিধানে ফরসা ধুতি, গায়ে ফরসা গেঞ্জি, মাথায় জড়ানো ফরসা রুমাল। সকলেই বয়সে তরুণ। দেখিতে সুশ্রী। দেশপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতই একখানা গান তাহারা গাহিতেছে আর এলোমেলো ভাবে বৈঠা ফেলিতেছে। তাহাতে বৈঠার ছন্দ-পতন হইতেছে বটে, কিন্তু গানের সুর-তাল মোটেই বেঠিক হইতেছে না। তাহারা ছন্দহীন বৈঠা ফেলিতেছে আর স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে গাহিতেছে–ভেড়ারে করিলে রোষ, সেও ফিরে মারে ঢুস্ রে। আমরা বাঙালী জাতি খাইয়া ফিরিঙ্গির লাথি ধুলা ঝেড়ে যাই নিজ ভবন।

বনমালীদের নৌকার সঙ্গে বাঁধা ছিল আর একখানা ডিঙি। তার মাঝি দুজনের গামছা পরা, তারা বেজায় কালো; আর লগি ঠেলিতে ঠেলিতে ফিরিয়া তাহারা বিদ্রূপকুটিল মুখে গানখানা শুনিল। কিন্তু গানখানা তাদের মনঃপূত হইল না। যাত্রীবাবুদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া জনান্তিকে তাহারা বলিল, হুঁ, ঠিক কথাই কইছে। ফিরিঙ্গিরা লাথি মারেন তেনাদেরে, আর তেনারা লাথি মারেন আমাদেরে।

কথাগুলি বনমালীর মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু এদিকে সে খেয়াল করিল না, ওদিকে সাপ ময়ূর আঁকা লিক্‌লিকে পাতামখানা কেমন শুদ্ধভাষার চমৎকার একখানা সারিগান গাহিয়া চলিয়াছে–ফুটেছে মাধবী লতা রে। আরে ফুল মধুর মধুর॥ জবাফুলে

গৌরব করে সর্বঅঙ্গে লাল। আমারে ধরিতে পারে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল॥ সাপলা ফুলে গৌরব করে জলের উপর ভাসি। চন্দ্রের সঙ্গে পরিহাস সূর্যের সঙ্গে হাসি॥

বনমালী মনে মনে ভাবিল, এ নাও নিশ্চয়ই শিক্ষিতলোকের গাঁ হইতে আসিয়াছে। যেমন ঠাসা কথা, তেমনি পুরন্ত সুর।

নাও দেখিতে দেখিতে আর গান শুনিতে শুনিতে উদয়তারা সহসা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অনন্ত আর অনন্তবালার চোখ অন্যদিকে। দুইটি প্রকাণ্ড মাটীর গামলা বিচিত্র রঙে সাজাইয়া, দুইটি করিয়া হাত-বৈঠা হাতে করিয়া দুইটি লোক উহাদিগকে লইয়া ভাসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের মুখে গান নাই, হাতে ছন্দ নাই। ফেশন করিয়া চুল দাড়ী ছাঁটাই করা, মাথায় জব্‌জবে তেল, পরিষ্কার ধুতির উপর গায়ে সাদা গেঞ্জি। মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। আর জলে বৈঠা ডুবাইয়া এলোমেলো ভাবে টানিয়া আগাইতেছে। বা'র পানিতে যাইতেছে না। চলন্ত দৌড়ের-নৌকার ধাক্কা তো অনেক দূরের কথা, ঢেউ লাগিয়াই ডুবিয়া যাইবে। হাজার হাজার নাও, কখন কাহার সহিত টক্কর লাগিয়া ভাঙিয়া শতখান হইয়া তিতাসের তলায় চলিয়া যাইবে। লোক দুইটা তখন কি করিবে? অনন্ত বালার এই প্রশ্নের উত্তরে অনন্ত জানাইল, কি আর করিবে, সাঁতরাইয়া তীরে গিয়া উঠিবে, না হয় ডুবিয়া মরিবে। উঁহুঁ তা নয়, অনন্তবালা শোধরাইয়া দিল—তীরেও যাইবে না, ডুবিয়াও মরিবে না, যাত্রিকদের একটা নাওয়ে উঠিয়া পড়িবে, আর না হয় কোনো দৌড়ের-নাও দৌড় থামাইয়া উহাদিগকে জল হইতে টানিয়া তুলিবে।

দেখিতে দেখিতে তারা অনন্তদের নৌকার একান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, আর একটু অসাবধান হইলে তাহাদের নাওয়ের বাতায় ঠেকিয়াই গামলা ভাঙিবে। অনন্তবালা হাত বাড়াইয়া ছুঁইতে গেলে, লোকে দুইটা বৈঠা দেখাইল। বনমালী মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিল, সকলে দৌড়ায় নাও, তাইনে দৌড়ায় গামলা। অনন্তও বলিল, জুড়ি কেনে ধরনা তোমরা, দেখ্‌তাম কে আগে যাইতে পারে। কিন্তু লোক দুটি এসব কথায় কান দিতেছে না। তাদের দিকে গ্রাম গ্রামান্তরের মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে, ইহাতেই তাহারা খুশী। এক নাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার পর, অন্য নাওয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য আগাইয়া চলিয়াছে, পিছনের নাওটির দিকে আর ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

নাও গড়াইতে অনেক টাকা লাগে। অনন্ত কোনোকালে এত টাকা পাইবেও না, একটা সে গড়াইতেও পারিবে না। কিন্তু একটা মাটীর গামলা যে-কোন লোকে কিনিতে পারে। আর একখণ্ড কাঠ যোগাড় করিয়া দা দিয়া চাচিয়া ছোট হাত-বৈঠা—তাও তৈয়ার করা যাইতে পারে।

আমি কেনে একটা গামলা আন্‌লাম না। তা হইলে ত বৈঠা মাইরা বেশ দৌড়াইতাম। অনন্ত বলিল।

তুমি একা পারতে নাকি, জিগাই? তুমি কি ঐ লোকটার মতন চালাক, না চতুর? বৈঠা হাতে লইয়া চাইয়া থাক্‌বা দৌড়ের নাওয়ের দিকে, শুনবা কথা, আর কোন্‌খানের কোন্ যাত্রিকের নাও দিবে ধাক্কা। ঠুন্‌কা গামলা ভাঙলে তখন কি হইবে। তুমি আমি দুইজনে থাকলে কোন ভয় নাই; তুমি যখন ট্যালার মত একদিকে চাইয়া থাক্‌বা,

গামলারে আমি তখন সামলামু। আর গামলা যদি ভাইঙ্গা যায়, তখন তুমি আমারে সামলাইও কেমন?

ঠিক কথা।

তাহারা এইরূপ কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিল, এমনি সময়ে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে উদয়তারা হাসিয়া উঠিল। উদয়তারা এমনি। মনে মনে কোনোকিছু ভাবিতে থাকে। ভাবিতে ভাবিতে মন তার অনেকদূর আগাইয়া যায়। কোথাও গিয়া তার চিন্তা ঠেকিয়া যায়। তখন সে কোনদিকে না চাহিয়া, কাহারও উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া, হঠাৎ আপন মনে হাসিয়া উঠে।

স্ত্রীলোকদের একজন, অনন্তবালার কাকীমা, মুখ ফিরাইয়া বলিল, হাস্‌লা কেনে গ দিদি।

হাসলাম ভইন একখান কথা মনে কইরা!

কি কথা বেঙ্গের মাথা—কও না শুনি।

উদয়তারা মনে মনে বলিল, সে কথা কি বলা যায়? যে-কথা মনে করিয়া ক্ষণেক্ষণে হাসি, কারুরেই কইলাম না সে কথা—আর তুমি ত তুমি।

অনন্তবালার কাকী তরুণী। কৌতূহলে দুই চোখ ভরা। ছাড়িবার পাত্রী সে নয়। আবার ধরিল। কও না গ দিদি?

কি কমু গ ভইন।

কেনে হাস্‌লা!

হাসি আইল, হাসলাম।

জেতা মাইন্‌সেরে ভাড়াইতে চাও, না কইবা ত না কইবা।

তবে কই শুনো। যে-কথাখান মনে কইরা হাসলাম সে-কথাখান এই—গাঙের উপর দিয়া কত নাও যায়। তারা কত রকমের গান গাইয়া যায়, ভালা গান, বুরাগান—ঘেন্নার গান অঘেন্নার গান! গাইয়া যায় ত?

যায়।

একটু আগেইত শুন্‌লা কি বিটলা গান একখান্ গাইতাছে।

শুন্‌লাম।

তার একটু পরেই শুন্‌লা, একখানা সুন্দর গান গাইয়া গেল।

গেল।

এইজন্যই হাসলাম।

আমিও কথাখান বুঝলাম।

এমনি সময়ে, পাশেই একখানা নৌকা ভিড়িয়াছে, তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে আরেকজন স্ত্রীলোক এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছে, চিন্তা কইরা শরীর কালা কইর না দিদি। চিন্তা কইরা কি করবা। গাঙের বুক কত লোকে কত গান গাইয়া যায়, গাঙে কি তার রেখ্ থাকে?

একখানা দৌড়ের নাও তখন ধীরে ধীরে বৈঠা মারিয়া এই গান গাহিতেছিল, নিদাগাতে দাগ লাগাইলে প্রাণ-বন্ধু কালিয়ায়-- সর্পের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষে

উজান ছায়। ওঝা বৈদ্য নাই গো সাধ্য ঝাইড়া বিষ লামাইবে গায়॥ বলুক বলুক লোকে মন্দ, এড়াইছি কলঙ্কের দায়। লোকের মন্দ পুষ্পচন্দন, অলঙ্কার কইরাছি গায়।।

গানের শেষ কলিটি শুনিতে শুনিতে চিন্তাভারাক্রান্তা নারী একটি দীর্ঘশ্বাসমোচন করিল।

এমন সময় অনন্ত ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া অনন্তবালার কানের কাছে বলিল, মাসী। আমার মাসী।

অনন্তবালার চোখ কৌতূহলে বড় হইয়া উঠিল। অনন্তর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে তার ঐতিহাসিক মাসীকে দেখিল।

বিধবা নারী। এখনও তরুণীর পর্যায়েই দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু শরীরের লাবণ্য ধুইয়া গিয়াছে। মুখখানা সুন্দর, কিন্তু মলিন। দেখিলে মায়া লাগে।

এই মাসীই তোমারে তাড়াইয়া দিল!

দিল ত!

আ আমার কান্দনমুখী রাণী, নয়নে ঝরে পানি। আবার নাও-দৌড়ানী দেখিতে আসিয়াছে। ছাড়ো আমারে আমি তাইনেরে একখান কথা জিগাইয়া আসি!

সে এমনি একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে, আভাস পাইয়া অনন্ত তার একখানা হাত শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল। এক ঝটকায় ছাড়াইয়া নিয়া সে পাশের নাওয়ের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল। অনন্ত হাত বাড়াইয়া আবার তাহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু নাগাল পাইল না, কেবল খোঁপাটা তার হাতে ঠেকিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া অনন্ত মেয়েটাকে ফিরাইতে গেল। মেয়েটা তৎক্ষণে মাসী বলিয়া এক ডাক দিয়া ফেলিয়াছিল। পিছন হইতে চুলে হেচ্‌কা টান পড়ায় খোঁপা তো খুলিলই, সে নিজেও অনন্তর ঘাড়ের উপর পড়িয়া গিয়া, গড়াইয়া নাওয়ের তক্তায় লুটাইয়া পড়িল, অল্পের জন্য বাতা ডিঙাইয়া জলে পড়িল না। তার মা-খুড়ীরা হা হা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আদরের মেয়েকে পাটাতন হইতে তুলিল এবং কোথায় কোথায় লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শরীরের নানাস্থানে চোট লাগিয়াছে, অনন্তবালার ইহাতে বেশী দুঃখ হইল না, তবে হাতের চুড়িগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে, এ-দুঃখ সে রাখিবার জায়গা পাইল না।

মাসী ডাকে আকৃষ্ট হইয়া সুবলার-বৌ চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তারপর সহসা উদ্দাম হইয়া বলিয়া উঠিল, অনন্ত! অনন্ত! ওরে, আমার অনন্ত!

দুই নাওয়ের বাতা লাগানো ছিল। লাফাইয়া সে এ-নাওয়ে আসিয়া উঠিল এবং অনন্তর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। মাসী মাসী বলিয়া অনন্তও হাত বাড়াইয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিল, মাসীর দুই চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়াছে। তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া উঠিল।

এমন সময় উদয়তারা পাষাণের মূর্তির মত নিবাত-নিষ্কম্প ভাবে আগাইয়া আসিল। মাসীর বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল। উদয়তারা একেবারে কাছে আসিয়া কঠিনসুরে বলিল, শুন্‌ মাগী, যদি ভাল চাস তবে অনন্তকে ছাড়িয়া দে।

আমার অনন্তকে ছাড়িয়া দিব? কেন ছাড়িয়া দিব?

উদয়তারার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া আসিল। আমার অনন্ত! কেন ছাড়িয়া দিব! বেলাজা বেহায়া মাগী, লজ্জা করে না আমার অনন্ত বলিতে?

সেদিকে মন না দিয়া মাসী অনন্তকে আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর তার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, রুদ্ধ গলা কোন রকমে পরিষ্কার করিয়া বলিল, অনন্ত, ওরে আমার অনন্ত! এতদিন তুই কোথায় ছিলি আমার অনন্ত। কত শুকাইয়া গিয়াছিস!

উদয়তারা নির্মম হইয়া উঠিল, মাগীর ঢং দেখিয়া বাঁচি না। থাক্ থাক্ আর আদর কাড়াইতে হইবে না।

তখনও মাসীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, দুই চোখ বুজিয়া সে বলিয়া চলিয়াছে, এতদিন কোথায় ছিলি, কার কাছে ছিলি, কে তোকে খাইতে দিত, কে শুইবার সময় গল্প শুনাইত, ঘুম পাড়াইত। বল অনন্ত বল। আমার চাঁদ, আমার সোনা, আমার মাণিক।

নির্মম নিষ্ঠুর উদয়তারার সুর সপ্তমে চড়িল, হুঁ, আমার সোনা আমার মাণিক! যারে কুলার বাতাস দিয়া দূর করিয়া দেয়, সে হাজার সোণা হাজার মাণিক হইলেও, তার উপর আর কোন দাবী থাকে না, তা জানিস?

অনন্তর পূর্ব-কথা স্মরণ হইল। তার মুখের শিরাগুলি, হাতের কব্জি দুইটি কঠিন হইয়া উঠিল। মাসীকে ছাড়িয়া দিয়া ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, মাসী আমারে তুমি ছাইড়া দেও, তোমার সাথে আর আমি যামু না।

বজ্জাৎ মাগীদের হাতে পইড়া তুইও আমার পর হইয়া গেলি অনন্ত!

আপন তো কোন কালে নই মাসী। সে আমিও জানি তুমিও জান। মার সই তুমি। মা যতদিন ছিল, তোমার কাছে আমার আদরও ততদিনই ছিল। মা মরিয়া গেলে, আদর করিয়াছ লোক দেখাইবার জন্য। সে আদর একদিন হাট-বাজারের মতই ভাঙিয়া পড়িল।

ভাঙিয়া পড়িল! কি করিয়া তুই বুঝিলি যে, ভাঙিয়া পড়িল?

যাও যাও, আমি সব বুঝি। যেদিন হইতে মা গেছে, সেদিন হইতে সব গেছে। সেদিন হইতেই আমি ধরিয়া রাখিয়াছি পরবাসী বনবাসী আমি,–যে ডাকিয়া ঘরে লইবে তার ঘরই আমার ঘর, যে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিবে, তার ঘরই আমার পর।

আরে বেইমান কাউয়া, আরে ছেৎ-কুত্তা বদ-বিলাই, এ সব কথা তোরে কে শিখাইল, কোন্ বান্দিনীর ঝিয়ে শিখাইল?

উদয়তারা এবার ফাটিয়া পড়িল, আ লো বান্দিনীর ঘরের চান্দিনী। মুখ সামলাইয়া কথা ক, বুক সামলাইয়া বাড়ী যা। বেশী কথা তুলিস না, ছালার মুখ খুলিস না।

সুবলার বৌ তারেও ছাড়িল না। সুর না চড়িলেও, কথার তোড় চড়িতে লাগিল–পূর্ব-কথার খেই ধরিয়া সে অনন্তকে শাসাইতেছে–কোন্ ভাইয়ের মাগ, বাপের ঢেমনী-এ শিখাইল–কোন্–

উদয়তারা আর সহ্য করিতে পারিল না। সাংঘাতিক একটা কিছু করিবার আয়োজনে সে আরও একটু আগাইয়া আসিয়া অনন্তর একখানা হাত ধরিল। অনন্তও জোর করিয়া মাসীর হাত ছাড়াইয়া, উদয়তারার আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ করিয়া লইয়া বলিল, তুমি আমারে আর আদর জানাইও না মাসী–

মাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। অপমানে তার মাথা লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। উদয়তারা অবিশ্রাম গালি দিয়া চলিয়াছে। সবই অনন্তর জন্য। রাগে মাসীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, বলিল, আদর আমি তোমাকে জানাইবই, তবে, মুখে নয়, হাতে।

এই বলিয়া সে অনন্তর চুলের মুঠী ধরিয়া পিঠে দুম্‌দুম্ করিয়া কীল মারিতে লাগিল। অনন্ত ভয়ার্ত চোখে মাসীর ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত চোখ-দুটির দিকে চাহিয়াই চোখ নত করিল এবং তার ক্রোধের আগুনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিল। মার খাইতে খাইতে অনন্ত পাটাতনে নেতাইয়া পড়িল। সকলে থ হইয়া দেখিতেছিল। সহসা যেন সম্বিত পাইয়া উদয়তারা গর্জাইয়া উঠিল এবং সিংহিনীর থাবা হইতে হরিণ-শিশুর মত অনন্তকে মাসীর কবল হইতে মুক্ত করিল। অনন্ত তখন বলির কবুতরের মত কাঁপিতেছে।

তারপর যে কাণ্ড হইল তাহা বলিবার নয়। উদয়তারা সহ নৌকার সব কয়জন স্ত্রীলোক মিলিয়া সুবলার বৌকে চ্যাং দোলা করিয়া পাটাতনে শোয়াইল, তারপর সকলে সমবেত ভাবে হাতে পা'র কনুইয়ের সাহায্যে প্রহারের পর প্রহারের দ্বারা তাহাকে জর্জরিত করিতে লাগিল। মেয়ে-লোকের ঝগড়ায় আমরা কি করিব—বলিয়া বনমালী ও অন্যান্যেরা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অনেক মার মারিয়া জব্দ করার পর, শেষে তাহারা ছাড়িয়া দিল। অতি কষ্টে দেহটা টানিয়া তুলিয়া সুবলার-বৌ বুকের ও উরুর কাপড় ঠিক করিল এবং আলুথালু বেশে টলিতে টলিতে নিজেদের নাওয়ে গিয়া উঠিল। চারিদিকের নাওগুলি হইতে হাজার হাজার লোক তখন তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

অপমানে, লজ্জায় সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। সঙ্গিনীরা তাহাকে ধরিয়া বসাইলে সে পাটাতনের উপর শুইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উদয়তারার দল বিজয়গর্বে ফুলিতে লাগিল। কিন্তু অনন্ত তখনও কাঁপিতেছে। খুব হইয়াছে বলিয়া ও-নাওয়ের পুরুষেরা দাঁড় টানিয়া নাওখানা সরাইয়া লইতেছে। আর কোনদিন বোধ হয় দেখা হইবে না। অনন্ত ভয়ে ভয়ে ওদিকে ঘাড় ফিরাইল। মাসী পাটাতনের উপর উপুড় হইয়া ফুপাইতেছে। অনন্ত শুনিতে পাইল, ওখান হইতে একটা সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে—আর সে সুর যেন বলিতেছে, অনন্ত, তোকে ছাড়িয়া আমি কি নিয়া থাকিব, অনন্ত!

হাজার লোকের সামনে মেয়েলোকের এই বে-সরম মারামারিতে ও-নাওয়ের পুরুষেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, থাক থাক্ আর নাও-দৌড়ানি দেইখ্যা কাম নাই, লও ফিরা যাই—

তাহারা ফিরিয়া চলিল। অনেক দূর পথ। কিন্তু তাড়া নাই। অনেক বেলা আছে। কাজে ঢিলা দিয়া তাহারা নাও বাহিতে লাগিল। নৌকা-দৌড়ের এলাকা ছাড়াইয়া খোলা জায়গায় আসিয়া তাহারা হাঁপ ছাড়িল। দেখা গেল, এত দেরী করিয়াও একখানা নৌকা দৌড়ের এলাকার দিকে যাইতেছে। যাইতেছে আর সারি গাহিতেছে—সকলের সকলি আছে আমার নাই গো কেউ। আমার অন্তরে গরজি উঠে সমদ্দুরের ঢেউ॥ বটবৃক্ষের তলায় গেলাম ছাইয়া পাবার আশে, পত্র ছেইদ্যা রৌদ্রি লাগে আপন কর্ম-দোষে॥ নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে। নাও আছে কাণ্ডারী নাই শুধু-ডিঙা ভাসে॥

মোহাম্মদী : ১৯ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫২

শাদা হাওয়া

অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী ২৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

পটভূমি

১৯৪২ ইংরাজী সাল।

কলিকাতায় বিস্তর টমি এসেছে। অনেক, অজস্র, অসংখ্য। কতক এসেছে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাদবাকী সব এসেছে খাস বিলাতের মাটি থেকে আন্‌কোরা, নেমে এসেছে জাহাজ থেকে।

বাংলাদেশ বিজাতীয় বহিঃশত্রুর আক্রমণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য টমিদের এই বিরাট প্রাদুর্ভাব।

বাংলায় বাঙালীর শ্রেণি তিনটি : দাম-কমে-যাওয়া বিত্তের গৌরব-গর্বে স্ফীতবান তালুকদার জমিদার, মধ্যবিত্ত নামধেয় বিত্তহীন কেরাণীবর্গ, আর দধিচী চাষী-মজুর শ্রেণি। প্রথমোক্ত শ্রেণি নইলে প্রমোদের জীর্ণদশার জের টেনে টেনে বিলাস করবে কে, মধ্যমোক্তেরা নইলে সরকারি চাকরি বজায় রেখে এডমিনিস্ট্রেশন চালাবে কে? আর শেষোক্ত শ্রেণি নইলে এক্সপ্রপ্রয়েটেড হবে কে? দেশের আসলে যারা দেশবাসী, তাদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম নির্ধারিত রয়েছে। দেশরক্ষার কাজ এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। যারা অনেক দেশ রক্ষা এবং গ্রহণ দু-ই করেছে তারা এসব বিষয়ে ঝানু লোক।

এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে তারা এসেছে। তারা বিলাতী টমি। রাইফেল বাগিয়ে, সঙীন উঁচিয়ে, কামান দেগে আর বিমান উড়িয়ে এরা এদেশ রক্ষা করবে। এত সব কাজ এদের করতে হবে। আর, কে না জানে এসব কাজ বাঙালীর কর্ম নয়। ধুতি পাঞ্জাবী পরে, টেকুর তুলে, পান চিবুতে চিবুতে একখানা আনন্দবাজার হাতে করে ট্রামে চড়ে রাইটার্সবিল্ডিং-এ গিয়ে চাকুরি করা যায়। কিন্তু এদেশ রক্ষা করা যায় না। দেশ রক্ষা করতে হলে যুদ্ধ করতে হয়। এবং এই যুদ্ধই করতে এসেছে এই টমিরা। এদের সাম্রাজ্য রক্ষা আর আমাদের দেশটিকে রক্ষা দুই কাজই একই সঙ্গে এরা করে ফেলবে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত। কিংবা এককালীন উভয়-দণ্ড ভোগ করার মত।

এরকম অনেক দাগ দেবার মত কথা সংবাদপত্রে পাঠ করতাম। সকালে পাঠ করতাম, আর অফিস-যাবার পথে ভুলে যেতাম। ভুলতাম না কেবল ঐ দুই আখরের টমি কথাটা।

না ভুলবার কারণ পণ্ডিতীভাষায় এই বলা চলে যে, এরা সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। ছোটবড়ো রাস্তায়, যাবতীয় অলিগলিতে, দিনদুপুরে রাত-বেরাতে ঘুরে বেড়ায় সাহেব। পাড়ার সিনেমা-থিয়েটারের কোন ছবি বা নাটক বাদ দেয় না। শ্বেত তরুণীদের যোগাড় করে রেস্তোঁরায় যা-খুশি খায়।

দেখে মনে হয় এরা মানব নয়। হয় মানবাতীত নয় তো বোকার আকিঞ্চন এরা। অকিঞ্চিৎকর এদের জীবন। খালি মারা আর মরার প্রয়োজনে এদের গড়ে তোলা হয়েছে (হিটলারের দেশের হলে বলা যেত প্রজনিত করা হয়েছে)। রক্তারক্তির আর অগ্নিকাণ্ডের বাইরের সৃষ্টিধর্মী কোন-কিছু এই বিপুল জন-বাহিনীর যেন অধিকার-বহির্ভূত। ক্ষণিকের আহ্বানে বিপুল ভবিষ্যৎকে ধূলিমুষ্টির ন্যায় পথের উপর ছড়িয়ে দিতে এদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। ভালো কোন-কিছুকে, সুখের কোন কিছুকে কেড়েকুড়ে নিয়ে নিরালায় নির্ঝরিণীর তীরে কুটীর বেঁধে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখারও অধিকার থেকে বঞ্চিত ওরা! সুন্দর ভুবনে মরতে না চাওয়ার বিলাসে এদের চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়। এরা কি মানুষ? এরা মৌমাছি। কিন্তু রাজ-মৌমাছির ভোগ এদের প্রাপ্য নয়। এরা, এই দুনিয়ার ইউনিফরম পরা সৈনিকেরা খালি কর্মী মৌমাছি—মধুর অধিকার নেই। আছে কেবল কষ্টের অবসানে মরবার অধিকার, এরা পোকা। কামনা ও জিগীষার এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সামগ্রিক লোভের অভিশাপের দ্বারা এদের প্রত্যেককে দুটি করে পাখা তৈরি করে জুড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এরা মানুষ নয়। মেশিন। সেন্টিমেন্ট বলতে এদের কিছু নেই।

মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতে অনেক সময় দার্শনিক হয়ে যায়। গোয়েন্দা হয়ে যায়। গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি দেবার সময় নিজের গোয়েন্দা-মনকে ফাঁকি দিয়ে এই সব অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক কথাই ভাবছিলো।

মরতে কেন এরা যুদ্ধ করে। দুনিয়ার সব সৈন্য মিলে এক ঝাণ্ডার তলে দাঁড়িয়ে এই বলে স্ট্রাইক কেন করে না : আমরা সব সৈন্য এক—আমাদের দাবীদাওয়া আশা-কামনা সুখদুঃখ এক। আমরা সব সৈন্য ভাই ভাই। আমরা দুনিয়ার সবচাইতে সর্বহারা—সবার চেয়ে বেশি এক্সপ্লয়েটেড। যুদ্ধ করে কেবল ভাই ভাইকে মারছি আর ভাইয়ের হাতে মরছি। অন্য কেউ তো মরছে না। এবার আমাদের ভুল ভেঙেছে। যাদের স্বার্থ এক, কার্য এক এবং গতি ও পরিণাম এক তাদের মধ্যে কেন থাকবে বিভেদের সপ্তসমুদ্র, কেন থাকবে শত্রুতার বিষ-বাষ্পের উত্তাপ। দুনিয়ার চাষীমজুরেরা যদি এক হতে পারে, সাম্যবাদীরা যদি এক হতে পারে, গণতন্ত্রীরা যদি এক হতে পারে আমরা সব সৈনিকেরা কেন পারব না এক হতে?

সব সাম্রাজ্যবাদীরা যদি এক 'রা' করতে পারে, সব পুঁজিবাদীদের যদি এক জোট হওয়ার অধিকার থাকতে পারে, অধিকারের প্রশ্নে আমাদের এক না হওয়ার কি অজুহাত তবে থাকতে পারে? কাকে পর্যন্ত কাকের মাংস খায় না! আমরা সৈন্যের মাংস সৈন্যেতে খেতে যাই কোন বিবেকের নির্দেশে! কি স্বার্থ আমাদের সাধিত হয় এভাবে মেরে আর মরে? যাদের স্বার্থ, আমাদের দিয়ে তারা কাজ হাসিল করছে। আর তাই করতে গিয়ে এক বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমরা নিজেদের রক্তে নিজেরা সাগর রচনা করেছি আর তারা ইতিহাসের পাতায় বিরাট যশোমানের মণিমুক্তা গলায় পরছে আর পাচ্ছে যুগে যুগে মূর্খদের পূজা-শ্রদ্ধা। এক একটা মানুষের ডিক্টেটারী অঙ্গুলী-হেলনে রচিত হচ্ছে কেবল মৃত্যুর মহোৎসব আর কবরের ইতিহাস। বর্বর যুগে না হয় এসব চলে যেতো। কিন্তু মানুষ কি এখনো যথেষ্ট সভ্য হয় নি? তার মন কি অনেকটা

বিবেচক হয় নি? মানুষের রক্তে হাত রাঙাতে তার তৃণভোজী অন্তর কি এতদিনেও সঙ্কুচিত হবার মতো যোগ্যতা পায় নি?

গোবিন্দ শর্মা গোয়েন্দা হলেও ভারতীয়। এবং ব্রাহ্মণ। বিপুল নরমেধযজ্ঞে তার মন সায় না দিলে বা রক্তারক্তির অনুকূলে তার চিত্তে বল সঞ্চিত না হলেও তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু তার ডিউটি ওভার হয়নি। সারকুলার রোডের উপর দিয়ে কয়েকটা সাংঘাতিক টাইপের লোকের যাতায়াত করার রিপোর্ট আছে। ধর্মতলার মোড়ের ফুটপাতে কায়দা করে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ সারকুলার রোডের উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলো। লোকগুলো ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে চলবে না। ফলো করা চাই, নয়তো এ্যারেস্ট করানো দুঃসাধ্য হবে। অন্তত ভালো রিপোর্ট দেবার মতো কাজ করা তো চাই। এই বয়সে চাকরির উন্নতি না হলে বুড়ো বয়সে উন্নীত হয়ে লাভ কি?

কিন্তু এরা সাংঘাতিক টাইপের লোক হয় কেন? কেন হিজ ম্যাজিষ্টিস গভর্ণমেন্টের ক্ষতি করতে এরা গোপনে ঘুরে বেড়ায়? আর এদের ধাওয়া করার জন্য আমাদের এত দায় পড়ে? এদের যদি অভাব অভিযোগ থাকে, দাবীদাওয়া থাকে তবে কেন এরা সংঘবদ্ধ হয় না? একটা এ্যাসোসিয়েশন কি ইউনিয়ন গঠন করে দুনিয়ার সকল সাংঘাতিক টাইপের লোক কেন এক ঝাণ্ডার তলে সমবেত হয় না। কেন এরা নিখিল জাগতিক ভিত্তিতে সম্মিলিত ভাবে গভর্নমেন্ট নামক পদার্থটির সম্মুখীন হয় না। কোন গভর্ণমেন্টের? (গোবিন্দর মনে এখানে এক প্রশ্ন জাগে)—সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেন্টের, না সাম্যবাদী গভর্ণমেন্টের? যে কোন গভর্ণমেন্টের। এসবের যে কোন একটা আলাদাভাবে তাদের সম্মেলনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। তাদের সামগ্রিকতার এক একটা ফ্যাক্টার হয়ে পড়বে। তখন আর এই সাংঘাতিক টাইপের লোকদের অনুসরণ করার জন্য আমার মতো গোয়েন্দাদের রাত জেগে মাথা খারাপ করতে হতো না।

হাঁ মাথা খারাপই করি আমরা, তা নয় তো এত সব সাত রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভেসে আসে কেন?

ব্ল্যাক আউটের রাত। গোবিন্দকে বুঝি নিশায় পেয়েছে। মলিন আলোয় নিজের ছায়াকেই স্পষ্ট দেখা যায় না। একটু দূরের মানুষ আরো অস্পষ্ট। অতিথিদের টিকিও পাওয়া গেল না এখনো পর্যন্ত। চুলোয় যাক সাংঘাতিক টাইপের লোক। কথার দৌড় ফুরোলে সুরের কাজ শুরু হওয়ার মতো, চোখের দৌড় ফুরোলে মনের কাজ শুরু হলো গোবিন্দের :

আচ্ছা সৈনিকেরা এখন করছে কি! এখন, ঠিক এই রাত সাড়ে বারোটায়! ষ্ট্যালিনগ্রাডে নৈশ আক্রমণে এখন যা মরছে! বলতে পারো মারছেও। কিন্তু মারছে কাদের? সমব্যবসায়ীদের নয় কি? কি পাচ্ছে তারা মেরে আর মরে? একদল প্রতি পাদভূমি রক্ষা করছে আর একদল দখল করছে। কিন্তু গোড়াতেই যদি তারা স্বার্থবাদীদের খেলার পুতুল না হতো তা হলে এই আক্রমণের ইচ্ছা অচল হয়ে পড়ত আর আত্মরক্ষারও প্রয়োজন থাকতো না। না, সৈন্যরা বড্ড মেশিন। এদের খুব সেন্টিমেন্টাল হওয়া দরকার। এদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে না পারে, এদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাব আবেগ যাতে উপলবিহীন অবাধ ঝরণার মতো বয়ে যেতে পারে তার জন্য

এদের খুব সেন্টিমেন্টাল হওয়া দরকার। প্রচার কার্য চালিয়ে একটা নিখিল বিশ্ব সৈন্য ফেডারেশন গড়ে নেওয়া খুব ভালো হবে তাদের পক্ষে। কেন তারা এখনো একাজ করেনি!

পান বিড়ি আর খাবারের দোকানগুলি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। রাস্তায় যাও-বা-দু'একজন চলছিলো, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এতবড় রাস্তায় গোবিন্দ একা দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে খুব একাকী বোধ করছে : নিখিল বিশ্ব সৈনিক ফেডারেশন গড়া হয়ে গেলে সৈন্যের বুকে ঘা দেওয়ার জন্য কোন সৈন্যই আর যুদ্ধ করবে না। আর যুদ্ধ যদি না করলো তা হলে কোন রাষ্ট্রই বা টাকা দিয়ে তাদের পালতে যাবে কেন? সৈন্যদল তারা ভেঙে দেবে। তার ফলে সৈন্য বলে কোন কিছুই পৃথিবীতে থাকবে না। না থাকলে ক্ষতি কি? পৃথিবীর শান্তির জন্য নিজের সত্তাকে বলি দিয়ে তারা সরে যাবে। ধরবে লাঙল, ধরবে লেখনি। আর কারখানায় চালাবে হাতুড়ী। দিনের প্রয়োজনে আর কয়েক ঘণ্টা পরে রাত বিলীয়মান হয়ে যাবে। তেমনি করে সৈনিকের খাতা থেকে নামগুলি তাদের যাক না মুছে। আর এই গোয়েন্দা জাতটাও বড়ো দুর্ভাগা। বিশেষ করে এই মাঝ রাতে অনিশ্চিতের দিকে হাঁ করে ঠায় দাঁড়িয়ে একা একা রাত জাগা পরম দুর্ভাগ্যের কাজ। দুনিয়ার স্পাইরাই এক রঙের একঝাণ্ডার তলায় দাঁড়িয়ে স্পাই ইউনিয়ন করুক। জানিয়ে দিক তারাও মেশিন নয়। সেন্টিমেন্ট বলতে তাদেরও কিছু আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা তখনো স্পাইয়ের কাজ করবে কিনা।

গোবিন্দ হয়তো মনে মনে এরও যাহোক একটা মীমাংসা করতো। কিন্তু সম্মুখে স্বচক্ষে ভূত দেখে সে চমকে উঠলো। দুটো কি যেন তার কান ঘেঁষে আসছে। হাত বাড়াচ্ছে, আর তার গলা টিপে ধরবার জন্য আঙুলগুলো এগিয়ে দিচ্ছে। চোখ বুজে আবার চোখ খুলে দেখে ভূত নয়, দুটো টমি। গভীর রাতের আঁধারের গহনতায় সাদা চামড়া তার বিশেষত্ব হারিয়েছে, খাকি হারিয়েছে তার ভুয়া গৌরব।

টমি দুটোর একটি, সিনেমা-এক্টারের ভঙ্গীতে জোড় পা দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে হাত এগিয়ে বললো, সিগারেট!

*   *   *

একদিন একটি বৃটিশ টমি আর মার্কিন সৈন্যের মধ্যে আলাপ ও পরিচয় হয়ে গেল। বলা বাহুল্য যে, কলিকাতায় অনেক টমি যেমন এসেছে তেমনি এসেছে অনেক মার্কিন সৈন্য—সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের তরফ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে জাপানীদের কাবু করবার জন্য।

ঐ দুজনাতে একদিন একটি রেস্তোঁরায় খেতে গিয়ে একই টেবিলে বসেছিলো এবং একই খাবার অর্ডার দিয়েছিল।

সুযোগ সন্ধানী এংলো-ইন্ডিয়ান ঘাগীরা দাঁও মারবার আশায় শুধু সৈনিকদের জন্য এসব রেস্তোরাঁ খুলেছে। সৈন্যঘাঁটির আশেপাশে কেউ বা পোড়োবাড়ির সংস্কার করে কেউবা বিশ্রী দোকান ঘরগুলিকে কিনে নিয়ে প্রয়োজনের অধিক কুলিমিস্ত্রী লাগিয়ে এক মাসের কাজ পনেরো দিনে সেরেছে এবং ঝেড়ে মুছে চুনকাম করে তাড়াতাড়ি রেস্তোরাঁ

বসিয়ে দিয়েছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে আহার্য ও পানীয় এবং অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তদরিক্তি আরো কিছুর ব্যবস্থা করেছে।

এরই একটিতে পাশাপাশি বসে ঐ দুজনাতে আলাপ হলো।

টমি বললে, আমার নাম টম।

মার্কিন সৈন্য বললে, আমার নাম জীল।

টমি বললে, আমি করতাম স্কুল-মাষ্টারী। এমন সময় এল রাজার ডাক।

মার্কিন যুবক বললে, কলেজে পড়তাম ডিগ্রির জন্য, ফাইনাল পরীক্ষার বেশি বাকী নেই এমন সময় প্রেসিডেন্টের আহ্বান এলো। পড়া ছেড়ে দিয়ে সৈন্য হলুম আর চলে এলুম ইন্ডিয়াতে। মিস মেয়ো বর্ণিত মাদার ইন্ডিয়াতে।

টম বললে, বইটা আমিও পড়েছি। কিন্তু লেখার সঙ্গে তো কই দেশটার মিল দেখছি না।

জীল বললে, এদেশে বইটার যে-রকম জোর প্রতিবাদ হয়েছিল পড়েই মনে হয়েছিল মিস্ অনেক কথা বাড়িয়ে লিখেছে, ঠিক যা নয়, তাই লিখেছে।

বইটা তো খুব কেটেছিলো তোমাদের আমেরিকা মুল্লুকে?

কাটবে না? ইন্ডিয়া প্রাচীন সভ্যতার গর্বে বিভোর, জানোই তো। যদি তাই করে থেমে থাকতো, কোনো ক্ষতি ছিল না কারো। সংযম আর ত্যাগের গর্ব করে, তাও না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু এই দুটো ভুয়ো কথা নিয়ে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনা করতে আসে কেন? জানি এ-দুটোর দিক হতে পাশ্চাত্য অনেক পশ্চাতে। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিকতার রসে রসিয়ে এ দুটোকে অত বড়ো করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে মানুষের, এই যান্ত্রিক বিপ্লব মুখর বিজ্ঞানী বিংশ শতাব্দীতে? অথচ এই মায়াবাদ (ওকে আমি মায়াবাদ ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নই। ইন্ডিয়ান ফিলসফি পড়তে গিয়ে আমার মন না-বুঝার এক অনুভূতিময় শূন্যে ধাওয়া করেছিল) নিয়ে আমেরিকার অর্ধেক লোককে আমি মাতামাতি করতে দেখেছি। বুঝে হোক না বুঝে হোক আমেরিকা যেন ক্রমশ ইন্ডিয়ার ভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একটা দেশের পক্ষে তার বৈশিষ্ট্য হারানো কি ভালো? এর প্রতিক্রিয়া কি নেই ভাবছো? দ্যাখ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পরে আজকার টেগোর আর গান্ধী সোনার তবকে মুড়ে কি জিনিস যে দিয়েছে—আমেরিকানরা তাই দুহাত বাগিয়ে নিয়ে গিলছে আর পাগল হচ্ছে। এ বুঝছে না, পাগলামীর ওষুধটাকে মুক্তোর পাত দিয়ে মুড়ে দিলেও, তা খেয়ে পাগলামীই করতে হবে। এবার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, ইন্ডিয়ার প্রতি আমেরিকার মনোভাব। তারপর এও বুঝতে পারবে যার উপরে উঁচু ধারণা থাকে তার কুৎসার দাম কতো বেশি। তোমার দেশ নিয়ে 'মাদার বৃটানিয়া' লিখে কোন দিন আমেরিকার হাতে ধরে দিলে তারা ছুঁতোনা। আট পেনী দামের নাইট ক্লাবের কেচ্ছা যতোটুকু আগ্রহ নিয়ে পড়ে তোমার মাদার বা সিস্টার বৃটানিয়া তার বেশি মন দিয়ে পড়তো না নিশ্চয়। এবার বুঝতে পারলে বইটা কেন আমেরিকাতে এতো বিক্রি হয়েছিল?

কথাগুলো টমের কাছে মন্দ লাগছিল না। তাই অন্তঃপ্রকোষ্ঠ খালি হয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়ার পরেও টম নির্বিকার চিত্তে বসে রইল এবং জীল শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে বললো : আজ ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই জীল, কি বলো তা ছাড়া, যদিও আমার

মনে কোনো প্রেজুডিস নেই, আর আমি যে পিউরিটান না তাও দুদিনেই বেশ বুঝতে পারবে, তবু বলছি, আমি ছিলাম শিক্ষক, আর তুমি ছিলে ছাত্র। অবশ্য আমি তোমার শিক্ষক ছিলাম না, আর তুমিও আমার কিছু ছাত্র ছিলে না কিন্তু তাকে কি। তাই বলে আমাদের যার যার পজিসনের মর্যাদা রাখা উচিত নয় কি?

জীল একটু হেসে বললে, ইন্ডিয়াতে এসে দেখছি ইন্ডিয়ার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ভূত তোমার ঘাড়েও চেপেছে। জানো এটা জাদুর দেশ। বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, টেগোর, গান্ধী এরা সব জাদুকর। এদের প্রত্যেকটির কথায় জাদু। মেনে নিতে পারিনা পাশ্চাত্য বিলাসের মদালস মন নিয়ে এই মাধুকরী প্রবৃত্তিকে—মেনে নিতে পারি না—অসার বলে উড়িয়ে দিতেও পারি না। মন এ সব কথার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়ে ওঠে, কিন্তু অবচেতন মন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখায় যে এসব কথা মিছে কথা নয়। মন বলছে এমন অস্ত্র থাকতো যাতে এসব মায়াময় মধুর ছলনাকে ধ্বংসস্তূপে উড়িয়ে দিই, কিন্তু প্রাণ বলছে আরো একটু শুনি।

অত কথা তুমি শিখলে কি করে খোকা?

কলেজে আমাদের প্রফেসরের মাথাটি অনেক আগেই এই যাদুকরেরা খেয়ে নিয়েছিল। রসও আধুনিক সে এখন ঐ খাওয়া মাথা নিয়ে আরও অনেকের মাথা নিজে খাচ্ছে।

তোমাকেও খেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি দেখছি। তবু ভায়া বিষ ঢুকিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। এ বিষ-বীজে বিষবৃক্ষ একদিন গজিয়ে না উঠলেই বাঁচি। আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া-ফিন্ডিয়া নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। আমাদের আরো দশটা কলোনি আছে, এও তারই একটা। যাদুটাদু অত বুঝি না। একে শাসন করি, এর ভালোমন্দের দায় ঘাড়ে নিয়েছি, কাজেই যখন দেখছি, স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে যাচ্ছে, তখন চাপ একটু বাড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করি। এর যদি কোনো নিজস্ব প্রভাব থাকে তো তা থাকবে আমাদের পায়ের তলায়, ঘাড়ের উপরে নয়। কাজেই যা তোমাদের বিকৃত করে তুলছে, তাকে আমরা কিন্তু বিব্রত করারও যোগ্য বলে অতখানি মর্যাদা কিছুতেই দিতে পারব না। কিন্তু যাক সে কথা। আমিও তাই রাখতুম। কিন্তু ভেবে দেখেছি খোঁজখবর রাখতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা নিজস্ব অভিমত খাড়া হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই মত আর কারো মতের সঙ্গে মেলে না। নিজস্ব গতিতে আমার মত বেয়াড়া হয়ে ওঠে।

আলাপে আহারে রুচি বাড়ে। ডিস্ অনেক আগেই শূন্য হয়ে পড়েছিলো। আরো কিছু খাবার চাই বলে ইচ্ছা জানাতেই ওয়েটার এক অদ্ভুত চিজ এনে দিলো। অন্তত ইংরেজ আর মার্কিনীদের কাছে এ চীজ অদ্ভুত তো বটেই। গুড়ের সিরকাতে মুড়ি মাখিয়ে দলা দলা করে কেটে পাট পাট করেছে। এ-চিজ তৈরি করতে পয়সা লাগে খুব কম। কিন্তু সৈনিকদের মধ্যে চালাতে পারলে খরচের পঞ্চাশগুণ আদায় হয়ে আসবে। এ-রেঁস্তোরার ম্যানেজারের মগজে এ বুদ্ধিটা নতুন ঢুকেছে। তাই যাকেই দেওয়া হচ্ছে, কতখানি আগ্রহের সঙ্গে জিনিসটা সে গ্রহণ করছে ম্যানেজার তাই লক্ষ্য করছে।

অপরিচিত ও অনভ্যস্ত দ্রব্য দেখে জীল জিজ্ঞাসা করলো, হোয়াট ইজ ইট ম্যানেজার?

ম্যানেজার পরম কৃতার্থ হবার ভঙ্গী করে বললো, এ কাইন্ড অব্ ইন্ডিয়ান সুইট মিটস্ স্যার।

ইন্ডিয়া, মাই অওন বিলাভেড্ ইন্ডিয়া, তোমার নিজের পেইং গেস্টকে আজ তুমি তোমার নিজস্ব সম্পদ বলে যা দেবে তাই খুশির সঙ্গে খাবো–কথা কয়টি একটা গানের মতো করে বলতে বলতে টম ঐ জিনিসটা মুখে পুরে দিলো। কিন্তু যা শক্ত। চর্বণের শব্দে অনেকেই আকৃষ্ট হলো। জীল টেস্ট করলো শুধু, খেলো না। টম সবটাই খেলো, শুধু টেস্ট করলো না।

খেয়ে, আগের কথার জের টেনে বললো, যখন মাস্টারি করতাম, সে এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। ছাত্রদের পড়াতাম, ছাত্রেরা আমায় ভালবাসত না। প্রতি তিন মাস অন্তর ইন্সপেক্টার আসত। আমার পড়াবার যোগ্যতা সম্বন্ধে যা মন্তব্য করে যেতো তাতে গা জ্বালা করত। আমি কেবল ছাত্রদের দিকে চেয়ে সব সয়ে যেতাম। কিন্তু একদিন আর সইতে পারলাম না। আমি তখন উত্তম পড়াশোনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ছাত্রদের পড়াচ্ছিলাম। এমন সময় এক ইন্সপেক্টার এলো আগে খবর না দিয়েই। আমার পড়াবার ভঙ্গীটা বুঝি ঐ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মনঃপুত হলো না। তিনি বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিজেই পড়াতে লাগলেন এবং ছাত্রদের উপদেশ দেওয়ার ছলে বললেন, ছাত্ররা তোমরা সব মন দিয়ে পড়াশোনা কর। ভাল করে পড়াশোনা করলে চার্চিলের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে, আর ভালো করে পড়াশোনা না করলে তোমরা এই মাস্টারটির মতো মূর্খ হয়ে থাকবে। আমি সইতে না পেরেই কাজ ছেড়ে দিলাম আর ঠিক সেই দিনই রাজার ডাকে সোজা গিয়ে সৈন্য হলাম। চাকরি ছেড়ে দেবার কথা শুনে ইন্সপেক্টার আমার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছিল তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

এই রকম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে টম আর জীলের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং প্রতি দিনের পান আহার সিনেমার মধ্য দিয়ে সে বন্ধুত্ব পাকা হয়ে উঠলো।

একদিন তারা সিনেমায় গেল।

লাইট হাউসে একটা বিলাতী ছবি চলছিল। ছবিটির বিষয়বস্তু প্রত্যেক বৃটিশ নরনারীর মনে উৎসাহসঞ্চারী। মধ্য আফ্রিকার একটা অজ্ঞাত দেশ জয়ের কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত করেছে। একদল দুঃসাহসী ইংরেজ ভাগ্যান্বেষণে বন্দুক ঘাড়ে করে সেই দেশে গিয়ে হাজির। দেখলো, সে দেশের লোকগুলো প্রায় উলঙ্গ। কিন্তু সোনা, রূপো, হীরা, মুক্তোর ছড়াছড়ি তাদের দেহের প্রায় সর্বত্র। রাজার কাছে নীত হয়ে দেখলো সেখানে, রাজপুরী তো নয় যেন ইন্দ্রপুরী। চারদিকে অসভ্য অমার্জিত পরিবেশের মধ্যে রত্নের সমারোহ। আগন্তুকদের জিগীষু লোলুপ মন দিনকয়েক অ-দৃষ্ট অননুভূত এমন প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। এরা অসভ্য। এরা ইতর। বনঘেরা অজ্ঞাত এক রাজ্যেতে নোংরা জীবন যাপন করছে। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে পড়ে থাকবে, কিন্তু ঐশ্বর্যের কদর বুঝবেনা। এদের মানুষ করতে হবে। ইতরামি দূর করে এদের সভ্য, আলোকিত করতে হবে। এদের দেশ নিজ অধিকারে আনতে হবে, সভ্যতাসম্মত বিদ্যায় বসনে ভূষণে ও পাশ্চাত্য আদবকায়দায় কেতাদুরস্ত করে এদের

ঐহিকজীবন সুখময় এবং এদের মধ্যে মিশনারী পাদরী দিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে, পারত্রিক জীবন মধুময় করে তুলতে হবে।

এরা বর্বর ; তাই এসব বৃহৎ উদ্দেশ্যের কদর্থ করে বসল। শ্বেতবর্ণের দেবতা মনে করে প্রথমে যেরূপ আদর আপ্যায়ন করেছিলো তা কমে এলো এবং ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলে একজনকে নিতান্ত বর্বর প্রথায় হত্যা করলো। বাকী যারা রইলো তাদের অনেকেই প্রাণ দিল, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে প্রতিজনে প্রতি একশত জনের প্রাণ না নিয়ে নয়। দুই একজন পালিয়ে ব্রিটিশ রাণী এলিজাবেথকে খবর দিলো। এক সুসজ্জিত বাহিনী পাঠান হলো। এরা সহজেই সে-দেশ জয় করে সাম্রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করলো।

পঁচিশ বছর পরে ঘটনার পটপরিবর্তন হলে দেখা গেল, অসভ্য কালা আদমীরা বেশ সুসভ্য হয়ে উঠেছে। কাঁচা ফলমূল না খেয়ে চা-রুটি-বিস্কুট খায়। আর অগ্নিকাণ্ডের চারপাশে দলবেঁধে আদিম ভঙ্গীতে নৃত্য না করে গীর্জায় গিয়ে মেরী-নন্দনের নামে উপাসনা করে। কোট-প্যান্ট পরে অশুদ্ধ ইংরাজী জিনিস খেতে পরতে পায়—আগে পেতো না। কাঁচা মাল যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অসভ্য বলে তৈরি করতে পারত না। এখন রাজার দেশের লোকেরা দয়াপরবশ হয়ে সেগুলো নিয়ে পালিশ করা ভালো জিনিস তৈরি করে এনে দিয়ে যায়।

আরো পাঁচ বছর পর ঘটনার পটপরিবর্তন হলে দেখা গেল কি একটা বিলাতী উৎসবে মস্তবড় একটা ইউনিয়ন জ্যাকের নীচে দাঁড়িয়ে এরা সমবেত স্বরে গাইছে—গড্ সেভ্ আওয়ার গ্রেসাস্ কিঙ্, লঙ্ লিভ আওয়ার নোবেল কিঙ্।

প্রত্যেক ইংরাজ নরনারীর প্রাণে গর্ব ও উদ্দীপনা জাগাবার উপাদান ছবিটিতে যথেষ্ট ছিল। টমের মনে এ-দুটি জিনিস ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবের প্রাদুর্ভাব ঘটলো। সে অনুকম্পা। মমত্ব-মিশ্রিত যে সুপ্রিমেসির ভাব, অনুকম্পা তারই নাম।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে পথে নেমে দেখে ঘোর অন্ধকার। ভারতের বুকের উপর এই ঘন অন্ধকার টমের উদ্দীপিত মনের উৎসাহ নিবিয়ে দিতে পারেনি। বহুদিনের হাঁটা পথ। জীলের একটা হাত পরম বান্ধবের মতো টেনে নিয়ে টম বলে, দুনিয়ার উপর ইংরাজ জাতির কতোখানি দায়িত্ব, দেখলে? গোয়েবেলস অনেকবার আমাদের উপর দোষারোপ করে বলেছে আমরা নাকি এমনি করে সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছি। কিন্তু এরা বাইরের খোলসটাই দেখলে, ভেতরের আত্মিক কিছু দেখলে না।

যে আলোক আমরা দিয়েছি, কেবল যে পেয়েছে সে ছাড়া সে-আলোকের মাধুর্য আর প্রয়োজনীয়তা কেউ যদি না বোঝে তো সেটা কি আমাদের দোষ? বলো? ধৈর্য আমাদের অসীম। ওসব সমালোচনায় কান না দিয়ে কর্তব্য করে যাই। আগেই বলেছি, আমার মতের সঙ্গে অনেকের মতের মিলবে না, আর এও হয়তো অনেকে মানবে যে যীশুকে আমি মানতে রাজী নই। জাতির সঙ্গে সমাজের সঙ্গে বা ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে যাকে সংঘবদ্ধ করা চলে না তাকে মানাও যা না মানাও তাই। তবু যাঁর নাম করে আমরা বিশ্বের এতগুলো অসুখী মানুষকে এক পতাকার তলে মেলাতে পেরেছি, তাঁর কৃতিত্ব তো কম নয়। এই ধর ইন্ডিয়ার কথা, কি অবস্থায়ই না তাকে আমরা পেয়েছিলাম।

মাই ইম্পিরিয়েলিস্ট ফ্রেন্ড, একটু পা চালিয়ে চল। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। ব্যারাকে ঢুকতে হবে তো। না, রাস্তায় পড়ে থেকে রাত কাটাবে, যেমন করে কাটায় অনেক ইন্ডিয়ান এই মহানগরীর ফুটপাথে ধুলার ওপর শুয়ে শুয়ে।

টম ব্যথিত হলো : এরা আন্‌ফরচুনেট্। কিন্তু জানো, এদের জন্যও আজ আমার সিম্পাথি উথলে উঠছে। ও মেন অব ইন্ডিয়া! আন্‌হেপি সন্‌স্ অব্ মাই বিলাভেড্ ইন্ডিয়া! আজ মনে হচ্ছে আমি বড্ড অকৃতজ্ঞ। আমার কান্‌ট্রিমেন, আমার রাজা, আমার রাজার গবর্ণমেন্ট যে দেশের জন্য সারা সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কেয়ার নেয়, সেই দেশে এসে দেশের একটি লোকের সঙ্গেও এখনো পর্যন্ত বন্ধুত্ব করলাম না। আমার রাজার গভর্ণমেন্ট এদেশকে কতো ভালোবাসে! কত শক্ত হস্তে দেশের অভ্যন্তরের বিদ্রোহীদের দমন করে। আর শান্তিপ্রিয়, রাজানুগত, উন্নতি-অভিলাষী জনগণকে রক্ষা করে। আমি এদের কাউকে বন্ধু করবই, এখনই এই রাস্তার উপরেই যাকে পাব। সে যেই হোক, তারই সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। সে যত আনকালচার্ড, ব্রুট, নুইসেন্স হোক, তার সঙ্গে বন্ধুত্বকে একরাত্রির সেন্টিমেন্টের ব্যাপারমাত্র না করে স্থায়ী সম্পদে পরিণত করব। সে গরীব হলে আমার মাইনে থেকে টাকা দেব। স্টুডেন্ট হলে কিপলিঙ আর ম্যাসফিল্ডের এক সেট করে রয়াল এডিসনের গ্রন্থাবলী বিলাত থেকে আনিয়ে উপহার দেব। আর যদি সে আনফরচুনেট কংগ্রেসাইট হয় তবু তাকে পরিত্যাগ করব না। যাচিত বন্ধুত্বের দায়িত্বে তাকে ঠিক পথে আনব।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাস্তায় কোনো জনপ্রাণীকে তারা দেখতে পেলো না। এমনকি একটা ভিখারী বা পাগলকেও না।

শ্লেষের সঙ্গে জীল বললো, হে আমার সদভিপ্রায়ী বন্ধু! তোমার অভিপ্রায়ের পাত্র কিন্তু কাউকে পাচ্ছ না। খাবে দাবে, স্ফূর্তি করবে, কম্যান্ডারের ডাক এলে রাইফেল ঘাড়ে করে ফ্রন্টে নেমে পড়বে—এই তো যথেষ্ট কাজ। তার অধিক মাথা ঘামাচ্ছ, মাথা শেষে খারাপ না হলেই হয়। ইউনাইটেড নেশনস আমাদের পাঠিয়েছে জাপদস্যুদের রুখতে, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রেম করতে নয়। তবে কালচারাল সোসাইটির কোনো কোনো লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেলে সে আলাদা কথা। কিন্তু তোমার দেখছি মুচি মেথরে আপত্তি নেই।

বলো কি জীল? সুদূরের একটা গোটা দেশ, অনেক তার লোকজন, অনেক তাদের রং, ভাষা সামাজিক রীতিনীতি—অথচ সবাই মিলে বৃটিশ পতাকার তলে দাঁড়িয়ে আরাম পাচ্ছে—এর আনন্দ একটি ইংরাজ যুবকই কেবল বুঝবে, তুমি বুঝবে না। এ আনন্দ সার্বজনীন। তুমি যখন ধুলায় নেমে পথ চল, লম্বা খাটো কালো ঈষৎ কালো নানা রকম লোকের দেহের পার্থক্য বুঝতে পারবে, কিন্তু যখন এরোপ্লেনে করে অনেক উঁচু দিয়ে যাবার বেলা নীচের দিকে তাকাও, সবাইকে সমান দেখ না কি? সুপ্রিমেসি, প্রেষ্টিজ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি এমনকি অকলঙ্ক হয়ে গেছে যে, আমাদের কমনওয়েলথের সব মানুষকে আমরা সমান দেখি। কিন্তু হে নিরাশ বন্ধু! তোমার নৈরাশ্য বৃথা, ঐ একজনকে যেন দেখতে পাচ্ছি আঁধারের মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

ছুরি হাতে করে।

তবু পরখ না করে ছাড়ছি না।

তারা আরো একটু এগিয়ে এসে ভালো করে চেয়ে দেখে কাপড়ে-পাঞ্জাবীতে ভদ্রযুবকই বটে। চুল উল্টোদিকে ব্রাশ করা। মুখখানাও ভালো করে শেভ করা। আর এমন আঁধারেও চোখে চশমা। কিন্তু মনে হয় যেন চিন্তাভারাক্রান্ত।

টম একেবারে সামনে এসে সিগারেট কেস্ খুলে বাড়িয়ে দিয়ে সিগারেট অফার করলো।

গোবিন্দ স্বপ্নোত্থিতের মতো চমকে উঠে বললো, ন্যো থ্যাঙ্কস।

ন্যো, মাই ফ্রেন্ড, ইউ মাষ্ট টেক মাই অফার, আদারওয়াইজ আই স্যাল বি শক্‌ড।

গোবিন্দ ভালো করে চেয়ে দেখে সোলজার–বিলাতী টমি। হয়তো মদ টেনে এসেছে। এখন উপায়? দৌড় দেবার সুযোগ নেই, হাত ধরে ফেলেছে। নিরুপায়ের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, আঁধারেও সখ্যভাবের আমেজে চোখ-দুটি বেশ প্রশান্ত দেখা যাচ্ছে।

আমি তোমাকে আমার বন্ধু করতে চাই। শুধু আজকের নয়, অনেক দিনের। যুদ্ধে যদি বেঁচে যাই তাহলে তুমি আমি বুড়ো হবো, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব বুড়ো হবে না। বলো তুমি বন্ধু হবে?

গোবিন্দ অনেক দিনের ঘুঘু স্পাই। অনেক ঘাগী-গোয়েন্দাগুরুর ওস্তাদি লাথি খেয়ে জীবনে মানুষ হয়েছে। মানুষের বিশেষ এক ধরনের মনোবিজ্ঞান তার নখদর্পণে। এর সেন্টিমেন্ট নিশ্চয়ই কোনো আঘাতে উদ্রিক্ত হয়েছে। সে আঘাত অনুকূলেই হোক আর প্রতিকূলেই হোক। এ ব্যক্তি হয়তো বা বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

গোবিন্দ সিগারেট গ্রহণ করল। কিছুক্ষণ বন্ধুভাবে আলাপ চললো। আলাপের হৃদ্যতার মাঝে গোবিন্দ আত্মহারা হয়ে নিজের নামনিশানা ও কর্মপরিচয় সবই দিয়ে ফেললো এবং অকৃত্রিম বন্ধু হওয়ার আশ্বাস দিয়ে কাল থেকে টমের সঙ্গে রেস্তরাঁয় খেতে, সিনেমায় গিয়ে ছবি দেখতে এবং কোনো কাজ না থাকলে অকারণে দুজনাতে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল।

টম ও জীল কিছু দূর গিয়ে মোড় ঘুরল।

জীল বললো, এত এত মানুষ থাকতে শেষে বন্ধুত্ব করলে একটা গোয়েন্দার সঙ্গে!

টম বললো, হোক গোয়েন্দা, ইন্ডিয়ান তো। আমার কমনওয়েলথের লোক তো!

আমার রুচি কিন্তু অতো নীচুতে কিছুতেই নামতে পারতো না টম। তেমন লোক না পাই তো বন্ধুত্বই করব না। আর যদি করিই, তবে করবো টেগোর স্কুলের কোনো পণ্ডিতের সঙ্গে, না হয় তো শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের কোনো পণ্ডিত ভক্তের সঙ্গে। বিশেষ করে দিলীপ রায়ের সঙ্গে। বন্ধুত্ব করে লাভবান হ'তে হ'লে বন্ধুত্ব করো দুইরকম লোকের সঙ্গে : যাদের কিছু শেখাতে পারো তাদের সঙ্গে, আর যাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারো তাদের সঙ্গে। তা না হলে তা হবে নিষ্ফল মিতালী। স্পাই সর্বদা আত্মসচেতন বলে তাকে না পারবে কিছু শেখাতে আর সে স্পাই বলে তার কাছ থেকে না পারবে নিজে কিছু শিখ্‌তে!

দেখো জীল, তোমরা তোমার ইন্ডিয়া-গুরুর পায়ে কপাল ছোঁয়াতে পারো। এতে গৌরব হয় আমাদেরই। কারণ আমরা যাকে শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য করছি তার কার্য যদি

এমনি গর্ভযন্ত্রণা শুরু করিয়ে দেয় যে অপরে এসে না শিখলে তার যন্ত্রণার লাঘব হচ্ছেনা, আর তোমরা দশটা জিজ্ঞাসু এসে সে জ্ঞান লুটে নিয়ে তাকে আসান না দিলে তোমাদের দায়িত্ববোধ স্বস্তি পাচ্ছে না, তা হলে আমরা নাচার নই। ভূমি উর্বরা হতে পারে। তাই ভাল ফসল দিচ্ছে, কিন্তু যারা সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে কস্ট করে মডার্ণ ইন্ডিয়ার বীজ বুনেছে তারা বুঝি কেউ নয়। তোমরা শিখতে পারো। কিন্তু আমরা শিখব কোন দৈন্যে?

যে নিজে সদাব্রতী, অনুগৃহীতের নীবার-কণার জন্য সে উঞ্ছবৃত্তি করবে কোন দুঃখে, কোন লজ্জায়? কিন্তু যাক সে কথা। শিক্ষাদান আর গ্রহণের কথা যা বলেছ, তার সম্বন্ধে একটা অতি স্থূল কথা বলে তোমার মুখ বন্ধ করতে চাই। দেখো আমি শিক্ষক, শিক্ষার্থী নই, তুমি শিক্ষার্থী, শিক্ষক নও। শিক্ষার্থী তুমি শুধু একাই নও, তোমরা সকলেই একদিন ছিলে, আমাদের নিকট। জানি এতে তোমার সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগবে। কিন্তু তরুণ বন্ধু সেন্টিমেন্ট নিয়ে চললে সবসময় চলে না। মাষ্টারী জীবনে কতো অভিভাবকের আর স্কুল-পরিদর্শকের টীকা-টিপ্পনী যে হজম করেছি, সে তুমি কিছুতেই সইতে পারতে না। কাজেই তোমাকে রাগ না করতে অনুরোধ করছি। তোমার এখন শেখবার বয়স। আর আমাদের সে বয়সটা অনেক আগে কেটে গিয়ে শেখাবার বয়সটা অনেক আগেই এসে গিয়েছে। কথাটা জাতি হিসেবে ধরো না, সইতে পারবে না। ব্যক্তি হিসেবেই ধরো। মাষ্টারী যখন করতাম, তোমার টেগোরের কথা আমি অকাল-পক্ক আমার কুষ্মান্ড ছাত্রদের শুনিয়েছি। ঐ আশ্রমের কথা যা বললে বুঝলাম না তো, শুনিই নি তো কোনোদিন।

আমার প্রফেসর ওরিয়েন্টালিষ্ট। প্রাচ্য ভক্ত। কয়েকবার ইন্ডিয়া গিয়েছেন। গান্ধী আশ্রমে, টেগোরের শান্তিনিকেতনে আর শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে অতিথি হয়েছিলেন। আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ সাধনা করছেন। কাউকে দেখা দিচ্ছেন না। কেবল মাঝে মাঝে দিচ্ছেন। ভাই তোমাকে কি আগে বলিনি যে দেশটা যেমন অদ্ভুত, তার এক একটা এন্টারপ্রাইজও তেমনি বিরাট! শ্রীঅরবিন্দ নাকি সারা বিশ্বের মানুষের মানসিক উৎকর্ষের জন্য রাতদিন কেবল নিজের উইলফোর্স পাস করেছেন। আমার প্রফেসর বলেছেন, পাশ্চাত্যজগৎ যখন তার মারামারি কাটাকাটির পর্ব শেষ করে বিপুলহারে বর্ধিত এক অশান্তির কবলে ক্লান্ত হয়ে নুয়ে পড়বে, সেদিন নাকি বিশ্বশান্তি আনবে এই গান্ধী আর অরবিন্দ। অর্থাৎ পাশ্চাত্য যান্ত্রিক বিনষ্টি করবে ক্ষেত্র রচনা, ধ্বংসাস্ত্রের হলচালনা দ্বারা, আর তারা দু'জনাতে বাইবেলের সেই দিব্য বীজবপনের মতো দিব্য সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাবেন। এঁরা সব অদ্ভুত কথা বলেন। বুঝি না, কিন্তু মনে হয়, বুঝলে ভালো হতো।

আমার প্রফেসর এক অরবিন্দভক্তের ভবনে আশ্রয় পেয়েছিলেন। রাত্রিতে ভক্ত ছারপোকা ধরে দিচ্ছেন জ্বলন্ত হারিকেন লণ্ঠনের ওপরের গরম টিনখণ্ডটির উপর ছেড়ে, গরমে আপনি মরবার জন্য। প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন, আহা অমন করে মারছেন। ভক্ত আয়ত চোখদুটি তুলে প্রশান্ত সুরে বললেন, এই তো হলো আলোর উপরে আনন্দময় মৃত্যু! আহা কি ওরিয়েন্টালিজমরে!

কথাগুলো শুনে জীলের মনে হলো লোকটা জ্ঞান-পাগল। জেনেশুনে ভালোর দিকটা বিদ্রূপে উড়িয়ে দেওয়াই স্বভাব তার।

ঠাট্টা করছো! কিন্তু ইন্টুইশন যদি এতটুকুও তোমার থাকতো তো বুঝতে পারতে বাণিজ্যের নেশা অটুট রেখেই আমেরিকা ছাত্র হতে পারছে, আর সাম্রাজ্যবাদের পাথর গলায় বেঁধে শূন্যমার্গে এমনি তলিয়ে যাচ্ছে যে জ্যোতিষ্কপুঞ্জকে নিজের ডানায় আড়াল রেখে অসীমতার নিষ্ফল মাষ্টারী করার অসারতাটুকুও বুঝতে পারছো না।

* * *

পরের দিন গোবিন্দের ঘুম ভাঙলো অনেক বেলাতে। স্নানাহার করে অফিসে হাজিরা দিতে যাওয়ার পথে মনে পড়লো গতরাতে ডিউটি দেবার সময় সে অনেক বাজে চিন্তা করেছে। নাঃ লেবার-লীডারটার মাথায় কিচ্ছু নেই। খালি পচা গোবর। তাকে ফলো করতে গিয়ে কাজ হয়নি কিচ্ছুই, খালি অকাজের বোঝা বেড়েছে। যত সব শ্রাদ্ধ-কারখানা। কি যে আবোলতাবোল বকছিল খালি, শুনতে নেশা জাগছিলো বেশ। তবু তা কেবল ছাই ভস্ম ছাড়া আর কিছুতো নয়। কায়দা করে বলার ভঙ্গীটা আয়ত্ত করেছে, তাই মজুরদের ভাঙিয়ে খাচ্ছে। ও যেন এক বজ্জাত শিশু, আর মজুরেরা পুতুল সব। সুযোগ বুঝে ও একটু ইচ্ছা করলেই ওরা নাচছে, আরও একটু দম দিলেই ভেঙ্গে পড়ছে। বলছে বিশ্বের মজুরেরা এক হও, কিন্তু ওরা না হয় এক হলো, তখন বাবু তোমাদের পুছবে কে? তোমাদের তখন মদন-ভস্মের অনঙ্গ হয়ে ফিরতে হবে, কার্তিকের বউ 'বায়ু-ঘূর্ণি' হয়ে হাওয়ায় ভেসে ঘুরতে হবে। তার চেয়ে তোমাদের টেঁকার পক্ষে এই ভালো। সাধু সন্ন্যাসীতো নও, ঘরে সংসার আছে, বায়ু বা বিল্বপত্র ভক্ষণ করে থাকার অভ্যাসও করোনি। তোমাদের বাঁচতে হবে। দুটো পয়সাকড়ির দরকার। মজুরদের জাগিয়েছ একটা মরাল অবলিগেশনের পাকে পড়ে, তা না হয় বেশ করেছে, কিন্তু সবদিকই তো দেখতে হয়। মালিক কিছু অফার করেছে, চোখ বুজে নীচের পকেটে পুরে তোমার পুতুলগুলোকে আর নাচতে না বলে সরে পড়ো। কেউ জানবে না। তা নয়, খালি বলছো সারা দুনিয়ার মালিক এক হও। এদের কি ভদ্রলোক পেয়েছো যে এক হয়ে এরা তোমার ভাত ওঠাবে।

—এ কথাগুলি ও কিন্তু বলেছে বেশ। যদিও সে ব্যক্তি মিল-মালিকের বেতন-ভোগী ম্যানেজার। বক্তৃতা দেবার মতো দুঃসাধ্য কাজে জীবনে হাত দেয় নি যা বলতে হয়েছে তবু তা একসটেম্পর বলেছে বেশ। নোট করবার জন্য অনেকখানি নিকটে দাঁড়িয়েছিলাম বলে, না হলে হয়তো শুনতেই পেতাম না । অমন সুন্দর কথাগুলি অমনি মারা যেতো। কিন্তু কিছু কাজ হয়েছে কি? কি করে আর হবে। দুর্বুদ্ধি যার ঘাড় চিবুচ্ছে, হিতবাণী সে শুনবে কেন? ভাগ্যে ঝুলছে ডিটেনশনের অসি, ভারতরক্ষা বিধানের ফাঁস। যাই রিপোর্টটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিতে হবে। এ যাত্রা তুমি আর আইনের গবাক্ষ গলিয়ে পালাতে পারছো না লেবার লীডার।

* * *

কিন্তু লেবার-লীডার বিনয় বাগচি এ যাত্রায়ও রেহাই পেয়ে গেলো। লেবারের দেশ সোভিয়েট রাশিয়া রাজার পক্ষে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার শত্রুদের রুখছে বলে, অকৃত্রিম সোভিয়েট প্রেমিক বিনয়কে বাগে পাওয়া গেল না। বৃটিশ রাজের অকৃত্রিম সোভিয়েটদরদ কি জিন্দাবাদ বলে সে যেন পার্লামেন্টের টোরীদের একমনে অভিশাপ দিয়ে ভারতরক্ষা বিধির প্রতি অনুকম্পা জানিয়ে আবার মজুর ক্ষেপাতে চলে গেলো। গোবিন্দ এমনি ক্ষেপে গেলো যে ইতিপূর্বে তেমন ক্ষেপেনি। গোপনীয় বিভাগের ক্ষমতা থাকার বদলে কিছু প্রকাশ্য ক্ষমতা তার থাকলে দেখিয়ে দিত সে-ক্ষমতা কাকে বলে।

গোবিন্দ দিনরাতভর বিনয়ের পিছু লেগে থাকে, তার অনেক কথা নোট করে, শুনে bias না হয়ে পড়ে তাই আগে থেকেই নিজেকে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র করে তোলে। গ্যাঙসুদ্ধ ধরতে পারলে আরো ভালো।এজন্য আর-আর লেবার-লীডারদের পিছু নিতে হয়। দেখতে হয় বিনয়ের সঙ্গে তাদের যোগ কোথায়। কথাবার্তা, বক্তৃতা এসবের মধ্যেই তার সূত্র বার করতে হবে। আরো দেখতে হবে এসব রুই কাতলারা চুনো পুঁটিদের পাঠিয়েও কাজ হাসিল করে কিনা।

চুনোপুঁটিদের খোঁজ করতে গিয়ে একদিন দুজনকে সন্দেহ করে ফেললো। অবশ্য সন্দেহের কোনো ভিত্তি ছিলো না। কিন্তু গোবিন্দদের কথা আলাদা, তারা শূন্যে সৌধের ভিত গেঁথে তার চূড়াটি ঠিক মাটির বাস্তবতায় এনে লাগাবে।

উদ্দিষ্ট দুজনার পথিমধ্যে হঠাৎ মিলন হলো।

আরে সুনীল যে! কি খবর।

আরে, গৌরাঙ্গ যে। কি খবর।

গৌরাঙ্গ একটা চকমকি পাথরে লোহা ঠুকে বিড়ি ধরাল।

ও কি! এ আবার শিখলে কোথায়?

কারখানার সবাই এই রকম করেই বিড়ি খায়। যুদ্ধ-শালাও থামবে না আর ম্যাচিস শালারও দাম কমবে না।

প্রথমে এরা দুজনে ও পরে পশ্চাতে গোবিন্দ একটা রেস্তরাঁতে চা খেতে ঢুকলো।

চা আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে গৌরাঙ্গ বলে, ছিলিতো ওয়ালফোর্ডে জানতাম, এখন কোথায় আছিস্?

মেথামেটিক্স ইন্‌স্ট্রুমেন্টের কারখানায়। তুই?

মামা বলেছিলো, 'গৌরা, তুই বড়বাজারে মসলার দোকান চালা,' তিন মাসে লাল হয়ে যাবি। কিন্তু সায়েব বললো, শালা ড্যাম ব্লাডি নেটিভ, মিলিটারী কারখানায় কাজ করে যা পয়সা পাবি, মসলার বিজনেসে তা কোথায় পাবি। মাইরি শালা সব মিস্তি রিদেরই শালা বলে। বলতেও পারে এমন চমৎকার যে খাশা শোনায়। মিস্তিরিদের সঙ্গে বসে বাংলা আর হিন্দি, বাবুদের সঙ্গে বলে ইংরাজি। শালা বড় রসিক তাই অত খাটতে ভালো লাগে। একদিন মিস্তিরিদের টিফিন হয়েছে, এমনি সময়ে সাহেব একটি মোটর গাড়ি ফিট করার কাজে লেগে গেল। কিন্তু একা একা বাগাতে কিছুতেই পারছে না। শেষে শালা রেগে গিয়ে মিস্তিরিদের যাচ্ছেতাই গাল দিতে শুরু করল। মিস্তিরিরাও ঠিক তেমনি। গাল খাবে তবু সায়েবকে সাহায্য করবে না। সায়েব শেষে কেঁদে ফেলে বললো, 'থাক শালা তোরাই থাক, আমি শালাই যাই। আমার মেমের দিব্যি যদি আর

এখানে কাজ করি।' শালা মিস্তিরিদের কথাবার্তা সব এখন চমৎকার শিখে নিয়েছে। মিস্তিরিরা শেষে ছুটে গিয়ে সায়েবকে থামায় আর তার কাজ করে দেয়। বলে, 'মেমের দিব্যি কি দিতে আছে সায়েব, তোমার যা রাঙ্গা মেম।'–'না ও কে আমি আর রাখব না, তোদের বিলিয়ে দিব। নিবি?'–'হাঁ সায়েব নিব'–'না তোদের আমি নিতে দিব না।'–'কেন দিবে না সায়েব?'–'আরে শালারা, তোদের দিয়ে দিলে আমি শালা থাকব কাকে নিয়ে!' হি হি............

পুজোয় বাড়ি যাচ্ছিস তো?

সায়েব ছদিনের ছুটি দিয়েছে। ভাবছি একবার ঘুরে আসব।

আমার ফটো চেয়েছিলি। নিবি?

হাঁ দিস্। মাকে দেখাব। কিন্তু বেলা যে সিক্‌সে পড়ে রে সুনীল

তুই শালা তো মিস্তিরি হয়েই রইলি, কিছু পড়লি টড়লি না।

মিলিটারীতে কাজ করছি, আর তুই মিস্তিরি বলছিস্।

মিস্তিরি বলে আমি তো আর কিছু মনে করছি না। মিস্তিরি আমিও। কিন্তু বেলা তো আর আমি নই। তা, মাকে বেশ করে বুঝিয়ে বলব। পাচ্ছিস কত?

ডবল শিফ্‌টে কাজ করি, পঞ্চাশ টাকা হয় মাসে।

তা বেশ। আর আমার ফটোটাও তো নিবি।

নিশ্চয় নেব। ভাল কথা, তোদের ঢাকাই গেন্ডারী কেমন রে?

ভালো। তোদের ময়মনসিংহের দুধ!

ঠিক যেন অমৃত সমান।

দূর–যত সব–অপ্রকাশ্যে এইটুকু বলে গোবিন্দ বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলো।

প্রথম ক্যালকুলেশন ফেলিউর। দ্বিতীয়টা একস্‌পেরিমেন্ট করে দেখা যাক।

কোনো এক ভদ্রলোকের নাম সংগ্রহ করে তার সঙ্গে আলাপের এক সূত্র-সম্বন্ধ তৈরি করে গোবিন্দ একটি মেসে গিয়ে ঢুকে পুলকিত না হয়ে পারল না। একান্ত বাঞ্ছিত আলাপ হচ্ছে সেখানে।

বড় একটা বিলাতী জাহাজ কোম্পনীর ডজন দুই কেরাণী মেসবাড়ির বড় হলটি ভাড়া করে মিলেমিশে আছে।

লোকটার নাম শোনা গেল অচিন্ত্য। তরুণ ছোকরা। বলছে বেশ। গোবিন্দর আবির্ভাবে সবাই একটু সচকিত হয়েছিল। নিমেষে প্রকৃতিস্থ হয়ে বক্তার মনের উৎসাহ বাড়িয়ে দিলো। একজন শুধু বলেছে, কাকে চান? পুরন্দর বাবুকে চাই বলে গোবিন্দ একটা খালি তক্তপোষে বসে ওদিকে কান পাতলো। আসতে একটু দেরী হবে একথা যে আগে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে জানিয়ে দিলে। গোবিন্দ একটু বসি একটু দেখি, এর মধ্যে যদি এসে পড়ে, বলে গ্যাট হয়ে বসল।

এরা অর্বাচীন, এ ব্যাপারে একেবারে দুগ্ধপোষ্য। জানেনা, আপনি খাল কেটে এক কুমীর এসেছে, আর কুমীরকে এরা গ্রাহ্যই করছে না।

ওরা কেরাণীরা একটা ইউনিয়ন গড়েছে। মাগ্‌গিভাতা, বেতনবৃদ্ধি, প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধা ও চাকরির স্থায়িত্ব দাবি করে বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে। অর্ধেকের অধিক কেরাণী সই করে দরখাস্তটাকে নিবেচনার্থ যথাস্থানে প্রেরণ-যোগ্য বলে

মর্যাদাসম্পন্ন করেছে এবং অবিলম্বে কোন জবাব পায়নি লে অফিসের ভেতরে একদিন বড় সাহেবকে ঘেরাও করে হৈ চৈ করেছে। শোষোক্ত ব্যাপারটি মাত্র একদিন আগের ঘটনা। তাই এটাই সর্বাধুনিক। এর পর ফার্দার ডেভেলপমেন্ট এখনো কিছু হয়নি। অন্য এক অফিসের দুজন কেরাণি এসেছিল। তাদেরো অফিসে ইউনিয়ন গড়তে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অচিন্ত্য ঐসকল কথা বলে যাচ্ছিল। অচিন্ত্য অতঃপর বললো :

ছোটবাবুর এসিস্টেন্ট মতিলালবাবু আমার মস্ত একটা ভুল ভেঙে দিলে। দরখাস্ত করতে গেলে সেই দিলে আগে প্রচণ্ড বাধা। অথচ বোনাস পাওয়া দরকার তারই আর সকলের চেয়ে বেশি। ছাপোষা মানুষ, ভাত জোটে তো কাপড় জোটেনা, কাপড় জোটে তো দুমাসে একদিনো সিনেমা যাওয়ার পয়সা জোটেনা। ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করে। বড়বাবুকে নিজের বাড়ির চাল, বেড়ার লাউকুমড়ো বেগুন এনে দেয়। আসতে যেতে সেলাম দিয়ে বলে আসি বড় বাবু আর যাই বড় বাবু!

ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। একটু লেট হয়ে গেলে বড়বাবুর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে : চাকরি চলে গেলে রেলের তলায় মাথা দেব বড়বাবু। বোনাসের দরকার তারই তো সবার চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার দরখাস্ত করেছি শুনে যাত্রার দলের রাজার মতো বুক চিতিয়ে বললে, কি? দরখাস্ত করবে কেরাণীরা? কে–রাণীরা? আরে বাচ্ছা তোরা কি মুচি না মুর্দাফরাস যে ভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করচিস্। তোদের কি প্রেস্টিজ-বোধ বলে কিছু নেই? দুটো টাকার লোভ ছাড়তে পারবিনে তো ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছিস কেন? না হয় করলি দরখাস্ত। কিন্তু আমাদের ডিঙিয়ে একেবারে বড় সাহেবের কাছে? ঘোড়াকে ডিঙিয়ে গাধার জল খাওয়া? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। কোন্ শালা এ দরখাস্ত সই করে দেখে নেব। ছোঁড়াদের নিশ্চয়ই বাইরের সঙ্গে যোগ আছে। বইরের বাতাস পেয়েই এরা দপ্দপিয়ে উঠছে। দেখি দরখাস্ত সবাই করে দেয়, কোন্ শালা।

এই বলে মতিলাল অফিসময় দেখে বেড়াতে লাগলেন, কে সে সই করেছে। যারা করেনি, করবে, বলেছে, তাদের তিনি সই না করার জন্য ধমকে আদেশ দিলেন এবং যখন দেখলেন ধমকে গ্রাহ্য করে না, তখন অনুরোধ করলেন এবং শেষে কেরাণিদের প্রেস্টিজের দোহাই দিয়ে বললেন, ওসব মুটেমজুর শ্রেণির ছোটলোকদের কাজ। করব লেখাপড়া, পরব ধুতি-পাঞ্জাবী, আর মাটির ভাড়ে হাফ-চা না খেয়ে খাব গিয়ে রেস্টুরেন্টে তিন পয়সা কাপের চা, আমাদের কি এতখানি নীচুতে নেমে যাওয়া উচিত?

দু-একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল। সায়েব কত ইনাম দিয়েছে হুজর! শুনে আমি হেসেছিলুম এই মনে করে যে মতিলাল বাবুর মন-মতি বেঁধে ফেলতে সায়েবকে অর্থ দক্ষিণা দিতে হয় না। পিঠে একটু হাত বুলালেই হয়ে যায়। এখন চিনি। কিন্তু আগে এদের চিন্তাম না, তাই যখন দেখলাম যে, ওদের নিজেদের কোনো ক্ষতি তো হবেই না, বরং লাভ হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভালো কাজও হয়ে যাবে,–কিন্তু তা ওরা হতে দেবে না, বাধা দেবে, পন্ড করতে চাইবে; যখন দেখলাম যে শুধু মতিলালবাবুই নয় বড়োদের মধ্যে আরো অনেকে কেবল বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, সায়েবের কানে গিয়ে লাগাচ্ছে আর বলছে, ওসব তুমি সহ্য করো না সায়েব, বাইরের ঢেউ এসে

অফিসের শান্তি নষ্ট করবে তা হতে দেওয়া যেতে পারে না, ছোকরাদের ডিসমিস করে দাও,–তখন আর বুঝতে বাকী রইল না এরা দিনে দিনে কি হয়ে গেছে! কাজ করতে করতে এরা মেশিন হয়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না,–আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার বালাই খুবই আছে, কিন্তু তা ভ্রান্তমার্গে চালাতে এমনি রপ্ত হয়ে উঠেছে যে মেশিনের ন্যায় নিরুপদ্রব হওয়ার মাহাত্ম্যটুকু দিয়ে যে এরা অন্যের পথ খোলসা রাখবে সে সুযোগ পাওয়ার উপায় নেই। হায়রে ইনেটলিজেন্স! হতো মজুর, হতো নিরেট শ্রমজীবী, কন্‌ষ্টিটিউশনের চাপে জমাট লোহার মেশিনে পরিণত হয়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না; যারা মেশিন এখনো হয়নি তারা এদের তুলতে পারতো। কিন্তু এরা বুদ্ধিজীবী। সবকিছুর প্রতি চোখ কান সজাগ রেখেই ঘুমের ভান করে শুয়ে থেকে মার খেতে অভ্যস্ত রয়েছে।

যা হোক দরখাস্ত তো সায়েবের কাছে পেশ করা হলো। সায়েবটি ঠিক যেন হিটলার। যদি যাও আমাদের অফিসের ভেতর কোনোদিন, দেখতে পাবে, আমি অলঙ্কার লাগিয়ে বলছিনা, ঠিকই তার গোঁফ জোড়াটি হিটলারের মতো, আর ফিরিঙ্গী বণিকের বাচ্চা হলে কি হবে, মেজাজটুকু খাস ন্যাৎসী মুলুক থেকে আমদানী। সায়েব রেগে আগুন। জলদগম্ভীর স্বর বেরুলো :

নাম্বার ওয়ান কান্তগোপাল দীর্ঘাঙ্গী!

ইয়েস স্যার!

তুমি এই দরখাস্ত নিজ হাতে সই করেছ?

ইয়েস স্যার, নো স্যার,!

নাম্বার ফিফ্‌টিন ধনপতি দাস!

নিজ হাতে করেছি, কিন্তু স্বেচ্ছায় করিনি স্যার, বলে কয়ে করিয়েছে।

নাম্বার টোয়েন্টিনাইন ললিত পাকড়াসী!

আমরা স্যার নুন খেতে যেমন জানি, তেমনি গুণও গাইতে জানি। বলি যার নুন এতকাল ধরে খেয়ে এসেছি, তার গুণ গাইবো না আবার তারই রাজত্বে গোলমাল করব। আমি স্যার কংগ্রেসীদের দুচক্ষে দেখতে পারি না। বিশ্বাস না করেন তো মতিবাবু আমার হয়ে সাক্ষী দেবে। কিন্তু কংগ্রেসীদের ঠেকাতে পারি তবু ওদের পারি না। ওরা যে এক একটা দস্যু! বলে, আপোষে সই না করলে জোর করে সই করাবে, আবার রাস্তায় ধরে মারবে। তাই বলি, ওরা কি মানুষ? জানোয়ার, ওরা সুবিধাবাদী, ওরা পঞ্চম বাহিনী, ওরা, ওরা–

ওরা কারা? সায়েবের কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের মত প্রবল।

শেষ পর্যন্ত তার ফিট হলো না। সায়েব অভয় দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে কাজ করতে বললে।

সায়েবের রাগ উনপঞ্চাশে গিয়ে ঠেকল। দরখাস্তটি শতকুটি করে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য একবার তুলে নিলেন। কিন্তু ইংরাজ বণিকজাতির বুদ্ধি বড় পাকা। রাগের বশে অকস্মাৎ কোনো কিছু তারা করে বসে না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে দেখো আরো কি বেরোয়। অপেক্ষা করে, পাছে কাজে লাগতে পারে এমন আরো কিছু হঠকারিতার দরুণ চাপা পড়ে থাকে, তাই আরো দুই একজনের জবানবন্দী নেওয়া যাক! দেখা যাক কি তারা বলে, কতদূর অবধি গিয়ে ঠেকেছে জনকয় চাকরের স্পর্ধা।

নাম্বার সেভেন্টিফাইভ্ হরিদাস প্রামাণিক।

হরিদাস প্রামাণিক এগিয়ে এলো। পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। খাটুনির অমিতাচারে চোখ দুটি কোটরাগত। কিন্তু তার থেকে আগুন এখনো নেভেনি। সারামুখে ক্লেশসহনের ছাপ, কিন্তু দৃঢ়তা মুখ থেকে সরে যায় নি। বললে, ইয়েস্

তুমি সই করেছ?

হাঁ।

হোয়াই?—সায়েবের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর, মুখ থেকে বেরোচ্ছে সাংঘাতিক সংঘর্ষে আহত বৃহৎ মেঘখণ্ডের গগনভেদী হুঙ্কার।

হোয়াই নট?—চাপা, শান্ত, অথচ গভীর দৃঢ়ব্যাঞ্জক স্বর অবিচলিত, অকম্পিত হরিদাস প্রামাণিকের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, অতলস্পর্শী স্থৈর্য ও পাষাণভেদী দৃঢ়তার মধ্য থেকে যেন।

দাবী আমাদের ন্যায়সঙ্গত। দরখাস্ত আমাদের করতেই হবে, যদি না-বেঁচে মরে যাওয়ার সঙ্কল্প না করে থাকি। সে দরখাস্ত, বড় সাহেব তুমি, তোমার কাছে করবই তাতে অপরাধের কি থাকতে পারে? শুনে রাখো সায়েব, দরখাস্ত আমরা করছি, দাবি দাওয়া যদি না মেটে তো আন্দোলন করব। হাতে তোমার ক্ষমতা, জরিমানা করতে পার, ডিস্‌মিস্ করতে পার, কিন্তু কোম্পানী তোমাকে চালাতে হবে, কাজেই দাবি আমাদের পূরণ না করে পার না। করতে হবেই।

সায়েব অপ্রসন্ন মুখে গুণে দেখল অফিসে যত কেরাণি, তার অর্ধেকের বেশি হওয়ার দরখাস্ত বিবেচনার্থ 'লিগেলি বাউণ্ড' হয়ে পড়েছে। দরখাস্ত সায়েব গ্রহণ করেছে। তারপর সেদিন তাকে টেবিলের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলাতে জানালো, বিলাতে টেলি করা হয়েছে, জবাব না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাচ্ছে না। কথার টোনে মনে হলো সায়েব শ্লেষ করছে। মনে হলো বেটা খুব গোলমাল করবে। করে যদি আমরাও ছাড়ছি না। কেরাণিরা স্ট্রাইক করতে পারে কিনা দেখিয়ে দেব।

গোবিন্দ উৎসাহের প্রাবল্যে একবার নোটবুকে হাত দিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মস্থ হয়ে সংযত হয়ে বসল। মনে মনে হরিদাস প্রামাণিকের নামটা আউড়ে নিল তাকে বিশেষ প্রয়োজনের কোঠায় ফেলতে দেরী করা অনুচিত। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যে, এই অচিন্ত্যকেই বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এর কুলোপানা চক্কর এখনো গজায়নি, কিন্তু দাঁতে বিষ জমেছে প্রচুর।

আঘাত খাওয়া অচিন্ত্যের প্রাণ নূতন নূতন উপলব্ধিতে উদ্বেল। তার মনও নূতন চিন্তায় ভরপুর। আবার বলতে আরম্ভ করলো অচিন্ত্য: আগে বুঝতে পারতাম না ইংরেজদের নিকটে যারা চাকরি করছে চাকরির মায়া তাদের সবকিছু নীতিবোধকে আচ্ছন্ন করে অসাড় করে ফেলে কেমন করে। ভেবে থই পেতাম না। দেশের বড়ো স্বার্থের কাছে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা—অতদূর এগুচ্ছি না—খালি এইটুকুই বলছি—নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই খাতিরে একটুখানি মাথা চাড়া দিতে এরা ভয় পায় কেন! এখন সব ব্যাপার জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। এসব চাকরি ঠিক প্রসাদের

মতো কাঙ্ক্ষণীয় বলেই এরা মনে করে। এদের যার গায়েই এর ছোঁওয়া লেগেছে সেই অনুগৃহীতেরই মনের মধু একেবারে জমাট বেঁধে বোধাতীত হয়ে যায়। চাকরি এদের গলায় দাঁড়াশ সাপের মতো ল্যাজ পেঁচিয়ে দেয়, রসের আকারে ছেড়ে দেয় স্লো পয়জন,—যার প্রভাবে তারা মরে যায় না, পাগলও হয় না, কেবল জীর্ণ হতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক তেজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে-দিকটা জাতিকে জাগাবার জন্য, এদের নিজেদের জাগাবার জন্য প্রয়োজন, সেটা মরে যায়। আর যেদিকটা মরে যায় না, সেটা যে কি, তা তো মতিলাল বাবুদের মধ্যে হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। ধন্য সাম্রাজ্যবাদের রেশম। তোমার মনোমোহান চাকচিক্য আছে, তুমি আমার অবস্থানের স্থানটুকু অনেক খাটো করে আমার চারপাশে পাতলা বেড়া হয়ে ঘিরে রয়েছে। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। বাইরে উদার জগৎ! তুমি নরম। তোমাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা যেন একটি বালকেরই আছে। কিন্তু আমি পারি না তোমাকে ছিঁড়তে। তুমি রেশম, হালকা হলেও, তুমি তুলতুলে হলেও, আমি তোমার কাছে হার মানি। যারা হার মানতে চায় না, রেশমের পাতলা আবরণ ছেঁড়ার পর তাদের সামনে লোহার আবরণ এগিয়ে আসে এ আমি জানি। আর এও জানি, রেশমের আবরণটিতে গাল বুলিয়ে যারা আরাম পায় তুমি আফিম হয়ে তাদের চোখে ফুলও ফোটাও নিদ্রাও আনো—সে ফুল বড় বর্ণসুষমাময়। আর সে নিদ্রা বড় গাঢ় মধুর। আমি সেই নিদ্রাই চাই—মতিলাল বাবুদের এই নিদ্রাটুকুই ইহপরকালের সম্বল।

অচিন্ত্যের বলবার ভঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত হলো। গোবিন্দ নিজের মধ্যে সেই নিদ্রার আমেজ অনুভব করে বেরিয়ে পড়লো।

সেই সময়ে গড়ের মাঠে খোলা সবুজ ঘাসের উপর বসে টম ষ্টেজের এক্টারের ভঙ্গীতে বলছিলো জীলকে শুনিয়ে শুনিয়ে : ইন্ডিয়া, আঃ আমার ইন্ডিয়া! তুমি আমেরিকার চোখে আর তার এই সুযোগ্য ছাত্র জীলের চোখে কি যাদুর অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছ তা তুমিই জানো। সেই থেকে আমি তার মুখে তোমার আত্মিক সাধনার কথা শুনি আর অতিষ্ঠ হই। তোমার অর্থহীন বেদান্ত ফিলসফি তাদের চোখে মোহ লাগিয়েছে, তোমার উপোস করা ত্যাগের স্বপ্ন তাদের ধন-ভাণ্ডারে আলোড়ন তুলছে, তুমি মায়াময়ী, তোমার মায়া কাটিয়ে, যে সূর্যকে তোমার ঐ মায়া-মেঘের আবরণের অত্যাচারে সময় সময় হঠাৎ করে চোখে পড়ে না, সেই বৃটিশ সূর্য শাশ্বত ভাস্বর রূপেই বিরাজিত থাকবে। তোমার মায়ায় যাদের চোখ ধাঁধাঁয়, সেই সূর্য তাদের দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন করবে। তোমার ভয় নেই। আজ যারা তোমায় ভুল বুঝে তোমার হাত ধরে নাবতে এগিয়ে আসছে, ভুল ভাঙলে তারা সরে যাবে, তোমায় অভিশাপ দেবে, কিন্তু সূর্য তোমার উপর আলো দেবে অকৃপণ উদারতায়।

অপমানে জীলের চোখদুটি জ্বলছিলো। গোবিন্দর আগমন উপেক্ষা করে সে দুর্গের উপর দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তিম গৌরব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে রইলো।

গোবিন্দর এক্সপেরিমেন্টের কাহিনী-দুটি টমের মনে কৌতূহল জাগালো। কিন্তু সে হরিদাস আর অচিন্ত্যকে ধৃষ্টতার অপরাধে পঞ্চমুখে গাল না দেওয়ায় গোবিন্দ বিমর্ষ হলো। তার উৎসাহ মাঝখানেই নিভে গেল।

গোবিন্দ ও টমের মনোবৃত্তির এই পার্থক্যটুকু জীলের নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। গোবিন্দর প্রতি একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার টমের অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল। টমের কোলে মাথা রেখে তারকাখচিত ইন্ডিয়ান আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। টম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গোবিন্দকে একটা রেস্তরাঁয় বেশ করে খাইয়ে তারপর একটা বহুপরিচিত স্থানে নিজের হৃদ্যতা আছে এমন এক রমণীর সঙ্গে অভ্যস্থ বন্ধুকে দিয়ে দু-প্যাঁচ নাচের কসরতে গলদঘর্ম করে, অধিকন্তু সুনিপুণ বন্ধুত্বের মার্জিত, এড়ানো যায় না এমনি অনুরোধে এক টিন দামী সিগারেট পকেটস্থ করিয়ে রিক্সায় তুলে দিয়ে জীলকে নিয়ে পথে নামলো।

টম বললো : তুমি ইন্ডিয়ান দেখতে পার না, তার প্রমাণ দিলে।

জীল বললো : তোমাদের রথখানা টেনে টেনে যারা গাধা বনে গেছে তাদের আমি দেখতে পারি না ঠিকই। যারা রথ টানছে অথচ গাধা হয় নি, তাদের তো দেখতে না পারার কোন কারণ নেই। তোমার বন্ধুর মুখে শোনা অচিন্ত্যর কথাগুলি আমি ভেবেছি। তোমাদের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাধীনে অচিন্ত্য শেষ পর্যন্ত অচিন্ত্য থাকতে পারে না, মতিলাল হয়ে পড়ে। অচিন্ত্যর কথাগুলি একটু বেশি অটিষ্টিক করে বললে বোধ হয় এই দাঁড়ায়, এদেশে আলাদা দুটো জগৎ একটাকে দিয়ে তোমরা কাজ চালাচ্ছ আর একটা তোমাদের বিরোধিতা করছে। যারা তোমাদের প্রসাদ পাচ্ছে তারা ভাবছে বিরোধীরা এই প্রসাদ না পেয়ে বিরোধিতা করছে। তোমরা সবই বুঝছো, বুঝছো বিরোধীদের বাধা দেওয়া দরকার, তাই অনুগৃহীতদের তোমরা দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করছো। নিজেরাও দেখছ তারা শুধু যন্ত্রই হচ্ছে না, হচ্ছে রীতিমত অমানুষ, ব্যক্তিত্বের কণাটিও আর অবশিষ্ট থাকে না। দেশকে যারা স্বাধীন দেখতে চায় সে সব দুঃসাহসীদেরকে এরা বিদ্রূপ করে। একলা প্রান্তরে পেলে হয়তো গায়ে থুথু দিত। এরা তোমাদের কাজে আসছে, তাই পয়সার সঙ্গে মর্যাদা যোগ করে দিয়ে এদের পালছো। আচ্ছা সত্যি করে বলো দেখি, দুরতিক্রম্য সাম্রাজ্যিক স্বার্থে এদের অখণ্ড সহযোগিতার যদি প্রয়োজন না থাকতো তা হলে যে জাতির কবি বুক ফুলিয়ে বলেছে বৃটনস্ নেভার স্যাল বি স্লেভ্স, যে-জাতি কোনো দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসীদের প্রতি অবজ্ঞাশীল কোনো মানবদলের সহযোগিতা নিতে, তাদের সঙ্গে কাজকারবার চালাতে ঘৃণাবোধ করত না কি? এদের কোনো খাঁটি ইংরাজসন্তান লালসা-রোগে গলিতপুত্তলিদৃষ্টি না হলে কখনো সইতে পারে কি? আর তোমরা এটা বুঝছো না যে বিরাট অংশ তোমাদের বিরোধিতা করছে, আসল ইন্ডিয়ানকে আমরা খুঁজে পেয়েছি সেইখানেই। সেখানে মনুষ্যত্ব আছে, ব্যক্তিত্ববোধ আছে, আত্মাদর আছে, প্রতিভা আছে, আর আছে সাহস। এটাকে তোমরা নিজেরা গড়েছ, আর ওটা গড়ে উঠেছে আপনি, দেশের আসল প্রাণধারা থেকে প্রেরণা পেয়ে। সেখানে মতিলালেরও স্থান নেই, গোবিন্দের স্থান তো নেই-ই।

আনমনাভাবে টম বললো : বন্ধু পলিটিক্যাল গসিপ আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলাই উচিত। আমরা এসেছি জাপদের রুখতে, মতবাদ প্রচার করতে আসিনি।

* * *

জীলকে টম ভালোবাসতো সবচেয়ে বেশি। গোবিন্দ ইত্যাদি লোকের সঙ্গে তার ভালোবাসা ছিল কৃপামিশ্রিত। তা ছিল ঠিক অনুকম্পারই নামান্তর। সিনেমা দেখিয়ে, রেস্তরাঁয় খাইয়ে দিনের ভালোবাসা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জীলের সঙ্গে তার যে ভালোবাসা জন্মেছিল, তা একেবারে খাঁটি প্রণয়। পানভোজন আর সিনেমার পরেই তা মন্দীভূত হয়ে আসতো না। বিদায় গ্রহণের পর শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত জীলের কথা মনে থাকতো। বস্তুত জীলের কথাগুলো তার ভালই লাগতো।খুব বেশি পড়াশোনা না করলেও জানবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। উত্তম ছাত্রের যা গুণ, তাঁর সবই জীলের মধ্যে ছিল। ছিল না একটা জিনিস। টমের সাম্রাজ্যবাদী মনের অহমিকাটুকু কথায় কথায় প্রকাশ হয়ে পড়তো, জীলকে সেইটা বড়ই পীড়া দিত। ছিল না তার সেইটাকে সয়ে নেবার ক্ষমতা। ভারত সম্পর্কে টম যে সকল মন্তব্য করত, জীলের মনে হতো ভারত যদি টমদের অধীন না হয়ে জীলের অধীন হতো তা হলেও জীল এসমস্ত মন্তব্য করতে পারতো না। দুজনার মধ্যে আরো মতানৈক্য ছিল। ভারতের "বেটার হাফ্" নিয়ে।

টম মনে করত ভারতের যে অংশ বৃটিশ অনুরাগী, সরকারের নানা বিভাগে চাকরি গ্রহণ করে যারা ভারতে বৃটিশ শাসনকে চালিয়ে নিচ্ছে, শ্রেষ্ঠ তারাই। আর যারা এর বিরোধিতা করছে, তারা উচ্ছৃঙ্খল। তাদেরকে একেবারেই বাদ দিয়ে অনুরাগীদের নিয়েই বৃটেন ভাবীবিশ্বের নবব্যবস্থায় ভাবী ভারত সৃষ্টি করবে। কিন্তু জীলের ধারণা অন্যরূপ। ভারতের বৃটিশানুরাগী দিকটা পঙ্গু। তারা স্বকীয় শক্তিহীন। গভর্ণমেন্টের শক্তিতে তাদের শক্তি। গণের মাঝে তাদের কোনো স্থান নেই। কিন্তু বিরোধীরা আসল শক্তিতে শক্তিমান। গণ-সমাজ তাদের ডাকে সাড়া দেয়। তাদের বিপদ দেখলে নিজেরা বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের কারো মৃত্যু হলে কাঁদে, আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা বুকে নিয়ে। জীল তার সেই স্বনামধন্য প্রফেসারের মুখে যেমনটি শুনেছিল, টমকে অবিকল শুনিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু টম তা মানতে রাজী না হওয়ায় দুজনের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে বাড়তে সখীত্বের সেতুখানা আলগা হয়ে পড়ল।

একদিন দেখা গেল, যে টমিটা টিয়াপাখি ঘাড়ে করে হাঁটতে হাঁটতে দুতলা তেতলার সুন্দরী মেম দেখলে শিষ দিত, নাচের ঘরে অনিচ্ছুক মেমকে টেনে নিয়ে নাচাতে ব্রুটের মতো আন্‌কালচার্ড ডগের মতো চুমো খেতো, আর সব সময়ে নোংরা কথা কইত জীল, সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষিত মার্জিত তরুণ জীল তারই সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়েছে। টম ওটাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। একথা জেনে শুনেও।

আরো একদিন দেখা গেল, যে গার্লফ্রেন্ডটিকে কেন্দ্র করে টম ও জীলের পাকা বন্ধুত্ব উপভোগের মধ্য দিয়ে আরো পাকা হয়ে উঠেছিল, সে ও জীল হাত ধরে ময়দানে বেড়াতে যাচ্ছে, টমের সামনে দিয়ে। টমকে যেন তারা দেখেও দেখল না। মেয়েটির নাম জেন। জীলকে যতখানি ভালবাসা যায়, জেনকে ততখানি ভালবাসতে খারাপ লাগে না।

জেন কত সুন্দর মায়াময় তার চোখদুটি। কি উষ্ণ তার ঠোঁট দুটি! কত কোমল তার চোখের ভুরু আর তার মাথার চুল!

টমের দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এলো সেদিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেন্টিমেন্টাল টমি

টমের প্রতিভা ছিল। কিছু বুদ্ধিও ছিল! কিন্তু বিবেচনা ছিল না। কেবল প্রতিভা আর বুদ্ধির দীপ্তি থাকলেও চার্চিল আমেরি এট্‌লী বা এন্টনী ইডেন হওয়া যায় না। তার সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটা দরকার সেইটাই টমের ছিল না। ছিল না বলে, বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনেও সে কোন কিছুই হতে পারল না। সেন্টিমেন্টের ঘোরে কাজ করে যেত, কোন কিছুতেই গা করত না। পাবলিক অপিনিয়নের সঙ্গে তাল রেখে চলতে জানতো না। নিজে কোনদিন ভোট যুদ্ধে নামে নি। কারো ভোটের ক্যান্‌ভাস্‌ও করেনি। বরং এমন কতকগুলো ধারণা পোষণ করত যাতে বিষয়ীলোকেরা তাকে আমল দিত না। রাষ্ট্রপ্রধানদের চোখেও কোনোদিন সে পড়ল না। আর, কে না জানে যে, যারা পণ্ডিত ব্যক্তি তারা না পারে বিষী হতে, না পারে রাষ্ট্র-শাসন অধিকার করে বসতে। সেন্টিমেন্টাল লোকেরা কবি গোল্‌ডস্মিথের মত রাস্তার ভিখারীকে ডেকে এনে নিজের খাটে শুইয়ে রাত কাটাতে পারে। পারে অষ্টম এডোয়ার্ডের মত প্রেমের নামে পাগল হয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে। কারো ছিটানো জলটুকুও গায়ে সহে না বলে পাবলিকের মতের সঙ্গে তারা জোঁকের মতো মাটি কামড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের অধিকারীরা একটা উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে কানে তুলো গুঁজে ও পিঠে কুলো বেঁধে চারিদিকের গালবৃষ্টি গর্দভের মতো সয়ে সয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিতে পারে। টম-গোত্রীয়েরা তা পারে না। এই জন্যে উত্তম সম্ভাবনাপূর্ণ কেরিয়ারটা তার একদম ফরসা হয়ে গেলো।

জাহাজে ডাইরী করতে গিয়ে টম সূচনাতে এই কথাগুলো লিখেছিল। তারপর ডে-টু-ডে বিবরণী লেখবার আগে ছোট একটি ভূমিকা স্বরূপ তার ছাত্রজীবন ও মাষ্টারী জীবনের কিছু কিছু ঘটনা স্মৃতি থেকে লিখে রেখেছিলো। দেখেছিল, তার মতকে লোকে খালি অগ্রাহ্য করতেই চাইছে। আমল দিতে চাইছে না। লন্ডনের সবাইকে পরম বিষয়ী মনে হয়েছিলো তার। ভোটে জন্য ক্যান্‌ভাসের বহর দেখলে মনে হত প্রত্যেকে একএকটা চার্চিল আমেরি হতে ব্যস্ত; ডিউক অব্‌ উইন্‌ড্‌সরের মতো কেউ কিছু ত্যাগ করতে রাজী নয়। সেন্টিমেন্টে আঘাত লেগেও, কেউ উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাটাকে ধুলিমুষ্টির মতো ছুঁড়ে ফেলতে রাজী হয় না। যাচ্ছে ইন্ডিয়ার।

শুনেছে সেখানে অনেক রাজা কথায় কথায় রাজ্য ছেড়েছে, সুন্দরী স্ত্রী ছেড়েছে। ধর্মের জন্য ছেড়েছে একথার মানে কি? এক একবার সেন্টিমেন্টে এক একটা আঘাত লাগায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দূর ছাই বলে ছেড়েছে—এইতো ঠিক। এই শেষ নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আনন্দ ভবন ছেড়ে কংগ্রেসকে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী দেশের দৈন্য নিজে বেঁটে নিয়ে নিজের সুখের স্পৃহা ছেড়েছে। এরা খুবই সেন্টিমেন্টাল। সে-দেশের কোনো লোককে আমার সেন্টিমেন্টাল লাইফের ভূমিকাটুকু এবং আমার এ-দেশে অচলিত মতামতগুলো শুনাব।

কিন্তু ইণ্ডিয়াতে পা দিয়ে তার নিজস্ব বিচারবোধ উলটে গিয়ে আর দশটা ইংরাজের মতের অনুরূপ হয়ে যায়। এতবড় বিরাট বিশাল দেশ। এ-দেশকে যারা দখল করেছে এবং দখল করে দুশো বৎসর ধরে রাখতে পেরেছে, তারা তো কম নয়। এবং এ অসাধ্য সাধন যারা করেছে তাদেরই শোণিত তারও দেহের শিরায় শিরায় বইছে।

সেই ডাইরীখানা জীলকে পড়ে শুনাবে বলে অনেকদিনের সাধ ছিলো। তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত মনে হয়নি, এখানা তাকে দেখাবার কত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময় হারালেই সময়ের দাম বাড়ে। টম ডাইরীখানার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠল। কিন্তু কাকে দেখাবে! গোবিন্দকে দেখানো চলে না। তার কাছে এর মর্যাদা থাকবে না। কেন থাকবেনা? জীলের কথা মনে পড়ল। পরাধীন শুধু নয়, পরাধীনতার সঙ্গে আপোষকারী গোবিন্দ স্বাধীন মতামতের দাম কি দেবে! না, তাকে শুনিয়ে এ-জিনিসের অমর্যাদা কিছুতেই করা চলবেনা।

জীলের বিরুদ্ধে মনে মনে সশস্ত্র হয়ে উঠল টম। এ পর্যন্ত যত বই পড়েছে, যত চিন্তা করেছে সব কিছুকে খাড়া করত তার বিরুদ্ধে, যদি একবারটি দেখা পেত। খাড়া করে বলতো, তুমি যা বলেছ, যা ধ্যান করেছ ধারণা করেছ সব ভুল, আলেয়ার মতো ভুল। মরুর মরীচিকার মতো ভুল। আর সাগর-জলে পর্বত বসানোর মতো ভুল।

গোবিন্দকে কেন জানি না একান্ত আপন মনে হয়। ইচ্ছা হয় গলা ছেড়ে গোবিন্দকে বলে, হে মোর ইণ্ডিয়ান ফ্রেন্ড, তুমি দুর্বিনীত নও, আমাদের আর তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে গিয়ে তুমি তর্ক জুড়ে দাও না। নির্বিরোধে তোমাকে বুঝাতে পারি। আর গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে তোমার আমার মাঝে ঈর্ষার প্রাচীর খাড়া হয় না। কাজেই হে বন্ধু তুমি একমাত্র খাঁটী। তুমি ধন্য।

গান্ধীজী হরিজনে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। একটা নূতন আন্দোলন পরিচালনার কথা চিন্তা করছেন তিনি, একথা জানিয়েও দিয়েছেন। দেশময় একটা চাপা বলয়িত বহ্নির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এইরূপ সময়ে গোবিন্দদের কাজ খুব বাড়ে।

নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়লেও টম গোবিন্দকে খুঁজে বার করলো একটা অচলিত রাস্তার তে-মাথায়।

হ্যালো শর্মা।

হ্যালো টম।

শর্মা জানাল, আজ সুবার্বে একটা জায়গায় ডিউটি পড়েছে। বেশ পল্লী অঞ্চল। সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে একটা পল্লী-চিত্রগৃহে সেকেন্ড শো'তে সিনেমা দেখে ডাব আর মিষ্টি খেয়ে, বাসে করে ফিরে যাবে, কেমন টম?

টম বললো, আচ্ছা তাই চলো।

শহরতলীর পথে বাস ছুটেছে। অদূরে পল্লী তাল নারিকেল গুবাকের ছত্র মাথায় করে এগিয়ে আসছে। টম বলছে, পল্লীকে আমার ঠিক ফেয়ার সেক্সের মতো কোমল মনে হয়। শহরের পুরুষালি কাঠিন্য। সে বলতে পারে পল্লীর কোমলতাকে তার বেটার-হাফ।

গোবিন্দ দেশীয় কবির কাব্য পড়েছে। কথা সাহিত্যের উপন্যাস পড়েছে। তারা পল্লীকে পাঁচমুখে প্রশংসা করেছে। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় তো পল্লীর রূপ নিয়ে মেতে

হাজার পাতার দুখণ্ড নভেল লিখে নাম করেছে। জসীমউদ্দীন পল্লীবর্ণনা করে লম্বা লম্বা পদ্য লিখেছে। তারা কেউ এমন অদ্ভুত উপমা দিতে পারেনি। গোবিন্দর মনে হলো কয়েক ভলিউম বইয়ে যা বলা যেতো টম দুটি কথায় তা শেষ করে দিয়েছে।

গ্রাম বলছে পালাই পালাই, আর শহর বলছে এখনি গ্রাস করছি–এরই নাম শহরতলি!

তোমাদের শহরতলি বড় নোংরা হে শর্মা!–গোবিন্দর একখানা হাত টম নিজের হাতে রাখলো।

এখানে পল্লী তার স্নিগ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শহর তার বহুবিশ্বাসী রূপ এনে হাজির করবার অবকাশ পাচ্ছে না। একদিক ক্ষয়িষ্ণু আর একদিক বর্ধিষ্ণু। একদিক তার বনেদি শান্তিকে আঁকড়ে রাখতে না পেরে সভ্যতা-কুকুরের পাগলামীপূর্ণ ঘেউ ঘেউ রবে বিপর্যস্ত হয়ে শনৈঃ শনৈঃ পালাচ্ছে। আর একদিক বিষ-জিহ্বায় অজস্র লালা ঝরিয়ে ঝরিয়ে চারদিক থেকে জীর্ণ করবার আকাঙ্ক্ষায় শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। ফলে বনেদি শান্তি-ও টিকছে না, সভ্যতার চাকচিক্যও স্থান করে নিতে পারছে না।– অসভ্যকে সভ্য করবার এসমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ঠিক যেন প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব।–পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে সভ্য করার নামে ভণ্ডামীর মুখোস পরে চারদিক জীর্ণ পরিপাক করতে করতে এগিয়ে আসছে। প্রাচ্য তার শান্তি হারাচ্ছে আর পাশ্চাত্যও তার ভণ্ডামীর মুখোসটা মাঝে মাঝে আলগা করে দেখিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।–

কিন্তু শর্মা, তোমার মুখেতো এসব আশা করিনি। বলতো যদি কোনো–

হাঁ। বইটাতে আরো যেন কি সব লিখেছিল।

কোন বইটাতে?

যে বইখানা কাল আমরা প্রসক্রাইব করেছি। লিখেছে সেই অর্বাচীন লেবার লীডারটা যাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আগেই তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলাম, আমি গোবিন্দর ক্ষমতা আছে কি না আছে, তার পরিচয় একদিন পাবে।

তোমাদের অনেক বই পড়তে হয়, তাই না?

হাঁ অনেক রাবিশ ঘাঁটতে হয়। ঘেঁটে ঘেঁটে তার থেকে সবচেয়ে বেশি রাবিশ মালগুলোকে প্রসক্রাইব করতে হয়।

কি রকম বই তোমাদের চোখে দণ্ডনীয়?

–যে সকল বইয়ে হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে খারাপ কথা লেখা থাকে। আর যে সব বইতে আইনের বিধানমতে স্থাপিত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে লোককে প্ররোচনা দেওয়া হয়। জনসাধারণের নিরাপত্তার নামে সে সমস্ত বই আমরা প্রসক্রাইব করি।

তোমাদের সাহিত্যের ভালো বই কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

বঙ্কিমচন্দ্রের–আর কারো না?

আরো একজনের বই বাঙালীরা খেয়ে না খেয়ে পড়ে। কিন্তু আমার তাকে ভালো লাগে না। তার একখানা বই বড্ড বাজে হয়েছিল। আমরা বইখানাকে প্রসক্রাইব করেছি। বইখানাতে ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা ফলাও করে বলা

হয়েছে। কিন্তু লেখক শরৎ চ্যাটার্জি বুঝতে পারেননি, ইংরাজ তাড়ানোর অর্থ আত্মহত্যা ডেকে আনা। বঙ্কিমচন্দ্র একথা কোথাও সমর্থন করেননি, বরং বলেছেন, আমাদের দেশের শান্তিরক্ষার জন্য ইংরাজরা আমাদের বড় প্রয়োজনীয়।

তোমাদের আজকালের একটা সাহিত্য গড়ে উঠছেনা? যেমন গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ডে আর আমেরিকায়? যার নাম সাম্প্রতিক বা আধুনিক সাহিত্য? পুঁজি-পতিদের গ্রাস থেকে সর্বহারাদের বাঁচাবার জন্য। কিংবা ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংবদ্ধ জনমত গড়ে তুলবার জন্য?

ঠিক গড়ে উঠছে বলতে পারছিনা তবে মাঝে মাঝে চেষ্টা চলে । কিন্তু সে চেষ্টা সুষ্ঠু হয় না বলে কোনো কাজ হয় না। এরা যে মুখে বলে ফ্যাসিজম্ ধ্বংস হোক সেই মুখেই বলে কিনা, তবে সাম্রাজ্যবাদেরও বিনাশ হওয়ার প্রয়োজন আছে। এমন দু'মুখো নীতি কি বরদাস্ত করা যায়? এজন্যে তাদের বইগুলোকেও আমরা প্রসক্রাইব করি। আর উপরের ঐ ভ্রান্ত নীতি আঁকড়াতে গিয়ে, সোভিয়েট প্রীতি জানাতে গিয়েও তাই অনেক সোভিয়েট সুহৃদ গভর্ণমেন্টের অপ্রীতিভাজন হয়। আর, এরা তেমন কোনো বড়-লেখক নয়। লেখা মক্‌সো করে মাত্র। ছাপার আখরে নাম দেখবার জন্য।

ঠিক কথাই বটে। কে যেন বলেছে, মানুষের নিজের নাম ছাপার আখরে দেখা সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক লিটারেচার। অবশ্য তুমি যখন উইনস্টন চার্চিল বা চার্লি চ্যাপলিনের মতো অতখানি পাবলিক হয়ে পড়বে, তখন তোমার এ মোহ ছাড়বেই ছাড়বে।

আমাদের দেশে এ মোহ কোনোদিন কারো ঘোচে না।

আমাদের সাহিত্য কতদূর পড়েছ?

আগে পড়তাম। এখন সময় পাই না।

কিংসলির 'ওয়েষ্টওয়ার্ড হো' পড়েছ? জন মেসফিল্ডের 'অড্‌টা'? কিপ্‌লিঙের কবিতা? মধ্যের খানা বাদে দুপাশের পড়েছি।

রেড্ ইন্ডিয়ানদের শ্বেতাঙ্গ-হিংসা ও তাদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের ষড়যন্ত্র হচ্ছে 'অড্‌টা'র বিষয়-বস্তু। অবশ্য আমাদের হাতে যখন কলম, তখন আমরা এসকল ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের গাত্রস্পর্শ করার সাজা এমনি করে কৃষ্ণাঙ্গদের দিই যে, এসব বই কখনো পুরানো হয় না। না শ্বেতাঙ্গদের কাছে, না কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে।

টমের মন ইম্পিরিয়ালিষ্টিক সাহিত্যের কৃষ্ণবিজয়ী মদ-রসে যেন মাতাল।

জীল। তোমরা আত্মপ্রবঞ্চিতের জাত। ন্যায় নীতির বেড়ার ভেতর থেকেও জীবন যাত্রার প্রয়োজনে একদা যা করেছিলে, 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' লিখে তারই প্রায়শ্চিত্ত করার নামে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছ। তোমাকে আমি কৃপার চক্ষে দেখি আর তোমার মতামতকে আমি কাণা-কড়িরও মূল্য দিই না।—একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে টম মনে মনে এই কথা গুলি শেষ করে।

একটা সিনেমা-হাউজ অদূরেই দেখা যাচ্ছে। খুব বড় একটা কাঠের বোর্ডে ভারতীয় নর্তকীর বিরাটকায় মূর্তি এখান থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। গোবিন্দর ইচ্ছাই যেন টমকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত দেশগুলিতে আমাদের কাহিনী বায়স্কোপে দেখেছ তুমি গোবিন্দ? দেখনি কি তুমি, শিরস্ত্রাণে পালক গোঁজা অর্ধ উলঙ্গ, ফেরোশাস্, দুর্বৃত্ত

প্রকৃতির লোকগুলি একদল তীর-ধনু আর একদল বর্শা হাতে নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে বন্দুকের গুলীতে কাতারে কাতারে ধরাশায়ী হতে থাকে। যারা অবশিষ্ট থাকে তারা পরে কেমন সুন্দর আলোক প্রাপ্ত জীবনের অধিকারী হয়। যারা মরে যায় তারা যদি তা দেখতো তা হলে মরতে চাইত না অমন অসভ্যের মতো।

বলতো, মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে। গোবিন্দ কথাগুলো ইংরাজী করে আবেগময় ভাষায় বলাতে টম মুগ্ধ হল।

কবিতার পদও তুমি বাঁধতে পারো? বেশ ইমোসন্যাল তো!

টেগোরের কিনা।

টেগোরের কথা পরে বলো। আগে শোনো। প্যাট্রিওটিজম ভালবাস তো!

প্যাটিওজম প্যাট্রিওটিজম করে এদেশে তো অনেকে চেঁচাচ্ছে, আর মরছেও। কই ভালতো তাদের লাগেনি এরকম। সেই রটন্ লেবার লিডারটাও তো শুনি প্যাট্রিওট। খালি খালি লোকের মাথা বিগ্‌ড়ে দিচ্ছে।

তোমার লেবার লীডারকে একদিন যুক্তি দিয়ে শায়েস্তা করব।

পারবে না ঐ দুর্মুখ হনুমানটার সঙ্গে। আমিও কি কম করেছি। ক্ষীণ একটা আত্মীয়তা ছিল তার সঙ্গে আমার। সেই সূত্র ধরে তাকে শোধরাতে গিয়ে যাকে বলে অপমানিত হয়েছি। ওটাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার সোয়াস্তি নেই।

দেখো গোবিন্দ, লেবার মুভমেন্ট বিলাতেও আছে। আমি এ বিষয়ে বেশ পড়াশোনা করেছি। কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখেছি। ইলেকসনের সময়ে ব্রেইনলেস পেটি সম্পাদকেরা কাজে আসবে মনে করে সেসব ছাপিয়ে পস্তিয়েছে। টমি হয়ে পড়েছি কেবল সেন্টিমেন্টের তাড়ায়। রাজা যখন ডাক দিলো সম্রাজ্যরক্ষার জন্য, বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং নাৎসী-তাণ্ডব দুনিয়ার যে শান্তি অপহরণ করেছে সে শান্তি পুনরায় স্থাপিত করার জন্য-প্রাণ দিতে হবে, সাড়া না দিয়ে পারলাম না। নতুবা অর্গেনাইজিং কেপাসিটি আছে এমন লোককে সাথী করে পাবলিক লাইফে অনেক কিছু করতে পারতাম। আরো ভেবে দেখলাম, আমার মতামত কেউ সহ্য করতে রাজী হয় না। যেমন জি বি এসের কথাগুলো আগের জীবনে জোর করে শুনিয়ে দিলেও লোকে বলত, না না, বুঝতে আমরা চাই না এসব।

বার্ণাডশর নামে গোবিন্দ উচ্ছ্বসিত হলো। ছাত্র জীবনে ইর্‌রেসনাল নট্‌স পড়ে খুব আমোদ পেয়েছিল। আজকাল ওসব পড়ার সময় নেই। জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যে ফাইন আর্ট তা ঘরের কোনে বসে কষ্টসাধ্য বই পড়ে উপভোগ করার দরকার নেই। জীবনযাত্রার সব কিছু মসৃণ হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফাইন আর্টও সুলভ হয়ে এসেছে; সিনেমায় এসে বই পড়ার খাসমহলের আনন্দকে কেলিডোস্কোপের মত শতরূপে বাড়িয়ে তাকে হরণ করেছে। তারা সব দূরে সরে যাচ্ছে। সামনের ছবিটির নর্তকীরা চোখের মুখের হাতের বসনভূষণমণ্ডিত সব অবয়বের জোর।

আমি তো রাজার ডাকে সাড়া দিলাম। রাজা কিন্তু আমার ডাকে একদিন সাড়া দেয় নি।

তার মানে? গোবিন্দর চোখে মুখে ফুটন্ত বিস্ময়। রাজাকে তুমি আবার ডাকতে গিয়েছিলে না কি?

আমার রাজভক্তি অত কোনোকালেই ছিল না। একদিন কেন জানি না, রাজাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করতে লাগল। উইন্ডসর ক্যাসেলে এই আমার জীবনের প্রথম অভিযান। অলিন্দে তিন তিনটে ব্যান্ড বাজছে। নীচে হাজার হাজার লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা জানলায় এসে জনতাকে অভিবাদন জানালেন। ইচ্ছে হচ্ছিল উপরে ছুটে যাই, রাজাকে গিয়ে বলি, হায় বেচারা রাজা, জনতার ভিতরে থাকার যে আনন্দ যে প্রেরণা আছে, এরা তোমাকে সেই উদ্দীপনার আনন্দ উপভোগ করতে দিলে না–এরা মানে তোমার পারিষদেরা। সবরেনটির বেড়ার পশ্চাতে তুমি আটকা পড়ে আছ। এসো, নীচে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে এই বিরাট টাইপিষ্ট ক্লার্ক জার্নালিস্ট আর ইস্কুলমাস্টারদের মিছিলে মিশে যাও, ধূমপান করো, সকলের সাথে!–যখন আমি এসব কথা ভাবছিলাম তখন জনতার অন্য সকলে হয়তো ভাবছিলো, রাজা হওয়া কত সুখের।

কথাগুলি গোবিন্দর প্রাণে একাধারে ভীতি আর অনুরাগ জাগালো। তৎকালীন পাঠশালা শিক্ষকের আস্পর্ধা তো কম ছিল না। সাধে কি সে অত জেনে শুনেও রেগেড ফিলসফারের মতোই রয়ে গেছে। মানুষ হতে পারলো না। তবে ভাগ্য ভালো, মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা তার নিজের নিকট অন্তত আছে। যাই চিন্তা করোনা কেন প্রকাশ না করলেই হলো, মানুষ না জানি কত কিছুই ভাবে, সব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত, কি বিশ্রী কাণ্ডই না হত! কিন্তু টমের কথাগুলি যত উগ্র আর উন্মত্ত হোক, বেশ আন্তরিকতা আছে কথার ভেতর।

সত্যি রাজাকে এত আপন ভাবা যায়! রাখাল রাজা নামক যাত্রার বইখানার কথা মনে পড়ে। রাখালেরা জোর করে তাদের রাজাকে মথুরায় রাজঐশ্বর্য থেকে সিংহাসন থেকে ছিনিয়ে গোচারণের মাঠে নিয়ে আসতে গিয়েছিল। যখন রাজার ছিল ঐ প্রেস্টিজবর্জিত হাল, তখন তো লোকের অত সমস্যা, অত মারামারি কাটাকাটি ছিল না। জমিতে হাল দিত আর শত শত গাভীর দুধ দুইত, লোকে শ্রম করে শ্রমের উপযুক্ত দাম পেত। কাড়াকাড়ি করে ভোট নিয়ে লেবার পার্টির তরফ থেকে আইন সভায় যেতে হতো না। তখন লেবার মুভমেন্ট চালাবার প্রয়োজন হয়নি। তবে আজ কেন হয়েছে? রাজার প্রেষ্টিজবোধ তাঁর চারপাশের মাতব্বরদের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রজার কাজে বিলিয়ে দেবার জন্যে রাজা যা প্রজাদের থেকে গ্রহণ করে, ঐ মাতব্বরেরা করে তার চারগুণ। ফিরিয়ে দেয় না একটি পয়সাও। এই করে করে বুর্জোয়াক্লাশ কোন এক অন্যায়ের ভ্রূণ থেকে জন্মলাভ করেছে। কিন্তু জেনে রাখো লেবার লীডার, মরব, তবু তোমার এসব সৃষ্টিছাড়া পাগলামীপূর্ণ ছেঁদো কথায় কান দেব না। শিক্ষা তোমাকে একদিন দেবই। তোমার স্থান অর্ডিনারী জেলে নয়, জেলের অন্তঃপুরে।

তাকে কি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে দেখে টম চুপ করে ছিল। তার মুখের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা ফিরে আসাতে টম বললো, সভাসদেরা রাজাকে যে স্থানটিতে স্থাপন করে রেখেছে, রাজাকে তার থেকে নেমে যদি জনতায় এসে মিশতে হতো তাহলে জনতা বলতো, রাজা কিসের, এ ত একজন মানুষ! কাজেই রাজাই ঠিক। রাজার

জাঁকজমকের প্রয়োজন আছে। জনতা মূর্খ। মূর্খেরাই শো দেখতে গিয়ে আগে দেখে কোন আসনটা চক্ চক্ করছে বেশি।

নর্তকীর বিরাট ছবিটা এতক্ষণে নিকটে এসে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এটাকে দেখে টমের স্মরণ হলো, যা সে বলতে চেয়েছিল তার থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছে।

প্যাট্রিওটিজমের কথা বলছিলাম। ও হে, গোবিন্দ তুমি কি বলতে পার এই যে অসভ্য বর্বরেরা তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে রাইফেলের মুখে এগিয়ে এসে প্রাণ দিচ্ছে, তারা প্রাণ কিসের জন্য দিচ্ছে?

কিসের জন্য আবার। প্রাণ দেবার জন্যে।—গোবিন্দ মনে মনে বিব্রত বোধ করে। একথা যে কোন ভাবের উৎস হয়ে দেখা দেবে কে জানে।

তাদেরো একটা ন্যাশনাল স্পিরিট আছে। শুধু তাই নয়। আর আছে সেন্টিমেন্ট। যার জন্য, ভালো ভবিষ্যৎ হবে বোঝালেও শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রফা না করে নিজ হাতে বগলে পাখা বেঁধে আগুনের পানে ধেয়ে আসে।

আসে যেমন, মরেও তেমনি; উপযুক্ত কাজের উপযুক্ত ফল।

হাঁ উপযুক্ত কাজের উপযুক্ত ফল। টম গোবিন্দর দিকে কৃপার চোখে তাকায়। জীলের সঙ্গে তার কত প্রভেদ!

আর একটা সেন্টিমেন্টাল লোককে আমি দেখেছি। সে পল রবসন। নিগ্রোজাতীয় অভিনেতা। এদেশেও বোধকরি তার ছবি তোমরা দেখেছ। ভালো গায়। বীরত্ব, তেজ, উদাত্ত আর ঔদাস্য যেন তার কণ্ঠে এক দার্শনিক ওরিয়েন্টালিজম এনে দেয়। যাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু ভালো লাগে, অতিশয়।

টম তার কথাগুলি জীলের কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দেখে আত্মসংবরণ করল। বন্ধু বিরহ যে তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে! কাঁচ পোকা যেমন শুঁয়োপোকাকে আত্মসাত করে তোলে, কোন দূর ঝাউবনের পাশে জেনের সঙ্গে মুখোমুখি বসে জীল বেচারা টমকে নিয়ে আত্মস্থ করে ফেলছে। কিন্তু চেতনা হারালে চলবে না তো।

আমরাই ওদের আলো জ্বালাই। আর সে আলোয় আলোকিত হয়ে ওরা আমাদেরই শিকার করতে আসে। বলিহারি কৃতজ্ঞবোধ।

সিনেমা ঘরের বাইরের একটা দর্শকদের জন্য বসানো বেঞ্চিতে ক্লান্ত টম বসে পড়ে সিগারেট ধরায়।

গোবিন্দ ছিল অগাধ জলের মাছ। কোন নিষ্ঠুর যেন মহাকালের সেঁউতিতে সিচে সেই জলের অগাধত্ব কমিয়ে দিয়ে গোবিন্দর শ্বাসকষ্ট ঘটিয়েছিল। এইবার যেন কোন হৃদয়বান মহাপুরুষ স্বচ্ছ স্ফটিক জলের প্রাচুর্য ঢেলে গোবিন্দকে অবাধসঞ্চারী করে দিয়েছে।

ওরা মরবে। খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে বেটারা ঠিক মরবে।

হাঁ মরবে, নিশ্চয়ই মরবে। বেটাদের সঙ্গে মিতালী করে ওদের জীবনযাত্রায় মিলিয়ে নেবার অপচেষ্টায় জীলেরাও মরবে। জীল মরবে। তার সঙ্গে সঙ্গে জেন মরবে। আর মরবে সেই টিয়াপাখি ঘাড়ে করা মূর্খ টমিটা।

এক কাপ চা গলাধঃকরণ করে টম আবার শুরু করল।

সেই পল্ দেখলো প্রডিউসারেরা আফ্রিকান পিকচার তুলতে গিয়ে তাকে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্পাইএর কাজে লাগাচ্ছে; আর লাগাচ্ছে কালা আদমীদের শায়েস্তা ও শোষণ করার উদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গদের আহ্বানকারী দোভাষীর কাজে। তখনই তার সেন্টিমেন্টে ঘা পড়ল। কয়েকখানা ভাল ভাল ছবিতে নায়ক সেজে নাম করার সুযোগ পাওয়ার পর বেঁকে বসলো, শ্বেতাঙ্গদের পুতুল হয়ে সিনেমায় আর নামবো না। এখন সিনেমা-অভিনয় আর সে করছে না। দেশে দেশে গান গেয়ে নিগ্রোদের জাতীয় উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। তোমাদের পণ্ডিত জওহরলাল যখন বিলাতে ছিলো, পল তখন বন্দেমাতরম গেয়েছিলো তা জানো?

গোবিন্দ প্রসন্ন হতে পারল না। বিশেষ করে স্পাই কথার উল্লেখে সে লজ্জিত হলো। কিন্তু টমের মধ্যে এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে ব্যথিত হলো ততোধিক। সিনেমার স্বগত দ্বিমূর্তির মতো তার মন থেকে প্রতিবাদ বেরিয়ে এলো : না না এ হতে পারে না। এ নিশ্চয় টম নয়। তার মধ্য থেকে আর একজন কথা বলছে–সে জীল। সে সর্বনাশা অকালপক্ক মার্কিন সৈনিক নামের অযোগ্য ছাত্রটা। এক ভবঘুরে প্রফেসর যার মাথাটি খেয়ে দিয়েছে।

দেখো টম, সকলেই স্পাইদের না-বুঝে ঘৃণা করে। আর যে প্রতিভার অবতার টেগোর, কি এক লেখায় নাকি বলেছে সকল নকরীর নিকৃষ্টতম হচ্ছে স্পাইয়ের কাজ। এরা কবি। এরা খেয়ালী। তোমরা বাস্তববাদী। তোমরাও যদি এর প্রসঙ্গের কথা তোলো তো ব্যথিত হই। ভারত সাম্রাজ্যের গোড়াটা কিসের উপর আছে ভেবে দেখেছো কি? পুলিশ বিভাগের উপর। এই বিভাগের দুটি শাখা। একটি গঙ্গা–প্রকাশ্যে তর্ তর্ করে অপার যৌবনানন্দে তরঙ্গ তুটিয়ে বয়ে চলেছে। অপরটি ফল্গু। ভোগবতী। চুপিসারে গোপনে অভিসারিকার বেশে বয়ে যাচ্ছে–(কবি লিখেছে মাইরী–মনে মনে বলল)। হতে পারে আমাদের প্রকাশ্য বিভাগ আসামীর স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য আসামীর মাকে সুদ্ধু থানায় এনে মাতা পুত্র উভয়কে উলঙ্গ অবস্থায় বেঁধে সামনাসামনি একত্র করে ঝুলিয়ে বেত লাগায়। জজেরা অনেক সময় সহানুভূতিহীন হয়ে উগ্র মন্তব্যের শানিত ঘায়ে আমাদেরকে খান খান করেছে। কিন্তু এ তো ঠিক যে, যে-করেই হোক বিপ্লবীকে এরেষ্ট আমরা করাই; আর আমাদের প্রকাশ্য বিভাগ স্বীকারোক্তি আদায় ঠিক করেন।

করাই ও করেন কথাদুটিতে গুরুত্ব দিয়ে গোবিন্দ তার বক্তব্য শেষ করল।

টম বিস্মিত। সেন্টিমেন্টে ঘা খেয়ে এযে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বসেছে।

সেন্টিমেন্টাল টম বন্ধুর সেন্টিমেন্টালিটি দেখে ভেঙে পড়লো।

সবল শাণিত, অনমনীয় জীলকে হারিয়েছি, তুমিও যদি অমন করে নুয়ে পড়ো তা হলে আমি দাঁড়িয়ে থাকব কাকে ধরে? শোনো একটা মজার কথা। টেগোরের কথা বলছিলে না? আমি একদিন মাষ্টারী জীবনে ক্লাসে তার কথা বলছিলাম। কয়েক কথা বলার পর ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞান টেস্ট করার অভিপ্রায়ে একজনকে ডেকে কাছে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলত গীতাঞ্জলি কে লিখেছে? ছাত্র-ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমি লিখিনি স্যার। হা হা হা........টম অস্বাভাবিক হাসি হাসলো।

মোনালিসার হাসির আওয়াজ থাকলে শুনতে কেমন হতো কে জানে। এ হাসির খালি রূপ আছে। এ রূপ কাউকে করে বিস্মিত, কারো কাছে মনে হয় প্রেতায়িত। রাতে এ হাসি যে স্বপ্নে দেখে কাঁপে—ভুলতে পারে না, তার চার পাশে যেন সেই করাল হাসিরেখা গিলে ফেলবার মতলবে আছে। তার একটা শব্দ কল্পনা করা যায়। রূপবিহীন সেই শব্দটাই টমের মুখ থেকে এসে গোবিন্দর কানদুটোকে অসাড় করে দিলো।

টম পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে মনে মনে পড়ল। এ পর্যন্ত অনেকবার পড়েছে বলে চিঠিখানা অকালে জীর্ণ দশা পেয়ে গেছে।—অধুনা খুচরো পয়সার বদলে ব্যবহৃত এক পয়সায় পোষ্টাল টিকিটের মতো। ফেলে দিতে মায়া হয়, ক্ষতির ক্ষত পীড়া দেবে। রাখতেও মন বিষিয়ে ওঠে কোন সার্বভৌম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জীলের চিঠি—চিরবিদায়ের শেষ নমস্কার জানিয়ে গেছে এই চিঠিতে :

> তোমার গরিমা নিয়ে তুমি থাকো বন্ধু, আমি চললাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ছাত্র আর তুমি শিক্ষক ছিলে, এ মেনে নেওয়া চলে, কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা শিক্ষার্থী তোমাদের দরজায়, এ কলঙ্ক মেনে নিতে পারিনি আমি একদিনো।
>
> অথচ অনেকবার অনেক কথার মাঝখানে একথাটি তুমি জানিয়ে দিয়েছ। হতে পারে পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্তি পেয়েছি, সম্প্রতি। হতে পারে তোমাদের ঐতিহ্যের রশ্মি আমাদের রক্তের সংগোপনে জ্বলছে। কিন্তু তাই নিয়ে তোমরা এখনো গর্ব করবে কেন? কেন অতীতকে ভুলে বর্তমানে ফিরে আসছ না? স্বাধীনতা তোমরা অমনি অমনি দাওনি, স্বাধীনতা পেতে আমাদের বেশ মোটা দাম দিতে হয়েছে। যা দিয়ে, তারপর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, ঐতিহ্যের আর সংস্কৃতির শোধ তাতেই কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা নূতন জাতি।

নৃতাত্ত্বিক আর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজতে গিয়ে তোমাদের দিকে চেয়ে এ ভুলই করবে। কিন্তু আমি নূতন প্রত্নতত্ত্বের সৃষ্টি করতে চাই। আমাদের জাতের ঐতিহ্য শুরু হবে সেইখান থেকে যেখান থেকে আমাদের অবাঞ্ছিতা ধাত্রী সিন্দবাদের কাঁধের বুড়োর মতো আমাদের কাঁধে চেপে থেকে শেষে আমাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাস, এর অতীত আমাদের নেই। আছে উজ্জ্বল বর্তমান আর অসমাপ্য ভবিষ্যৎ। আমাদের এ ঐতিহ্যের বয়স অল্প, এখানে বৃদ্ধা ঠানদিদির চেহারা নেই, জীর্ণ কন্থা গায়ে দুনিয়াশুদ্ধ লোককে ভয় দেখিয়ে ঝোলায় পুরবার অপচেষ্টা নেই। তাই আমরা সুস্থ। তাই আমাদের রক্ত দূষিত নয়।

> আর এক স্থানে লিখেছে : তুমি আমি দুজায়গার মানুষ ছিটকে এসে একত্র হয়েছিলাম, আবার ছিটকে দুভাগ হয়ে গেলাম। যে ঢিলটি একবার হাত থেকে ছুঁড়েছ সেটি আর হাতে ফিরে আসবেনা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে, কিন্তু যা থাকবার নয় তাকে রাখা যায় না। যাবার সময় হলেই সে যায়। বন্ধুত্বের জন্য তোমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে পার না। আমিও না। খর্ব করা যায় বন্ধুত্বটাকেই। কি বলো? জল কেটে দুভাগ হয়ে যায় না। ইংরেজে ইংরেজে বন্ধুত্বও তেমনি। আর তেলে জলে মেশে না, ইংরেজ অ-ইংরেজ বন্ধুত্বও তেমনি টেকে না। বিদায়।

তার গমনের এক একটা পদধ্বনি এক রাজ্যের হাঙ্গামা হয়ে টমের কানে ঝঙ্কার তুলেছিলো। চলে গেলে বড্ড খালি মনে হয়েছিল নিজের বুক! বড্ড নিঃস্ব মনে হয়েছিল নিজেকে।

সিনেমা হলটি তৃতীয় শ্রেণির। শহরতলীর সিনেমা হল। দুই পাশে খোলার বস্তি। সামনে একখণ্ড জমি। তার ডাইনে বাঁয়ে চায়ের ঘর, খাবারের দোকান। তারই পরে একটা চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে ড্রেনে বিস্তর ময়লা জমে দুর্গন্ধ হয়েছে। তাতে ভন্ ভন্ করে মেলা জমিয়েছে এক রাজ্যের মাছি। মাঝে মাঝে তারা খাবারের দোকানগুলির দিকে পাখা মেলে।

ক্যালকাটার স্বাভাবিক মুখের উপর সায়েব পাড়াটা হচ্ছে অত্যধিক স্নো পাউডারের প্রক্ষেপ আর এই জায়গাটা হচ্ছে একটা ব্রণ—তোমার এই শহরতলীটা।

মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।

কি বললে?

বললাম একটা সংস্কৃত শ্লোকের এক টুকরো।

কথাটার অর্থ বুঝে নিয়ে টম একটু দম ধরে থেকে দেখল, শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। বড্ড পিপাসা। মাথাটাও কেমন যেন করছে।

টিকিট করে দুজনে সিনেমা হলে ঢুকলো। হলে সর্বমোট তিনটি শ্রেণি। প্রথম শ্রেণি অনাবশ্যক, তৃতীয় শ্রেণি অব্যবহার্য। দ্বিতীয় শ্রেণিই ভালো।

তৃতীয় শ্রেণির দরজা আগে থেকে খোলেনি। সময় হলে খুলে দেওয়া হলো। একদল ছেলেবুড়ো মারামারি কাটাকাটি করতে করতে কোনোরকমে ভিড় গলিয়ে ছিটকে এসে ভিতরে পড়েছিল। তারা তাড়াতাড়ি কেউ বেঞ্চির উপরে সটান শুয়ে পড়ল, কেউ দিল খানে খানে রুমাল চাপা, কেউ রাখল ছাতা। যারা রাখল তাদেরকে পরে যারা ঢুকেছে তারা অনুরোধ করছে একটুখানি জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য। তারা দিচ্ছেনা ছেড়ে, বলছে আমাদের লোক আছে আরো।

পিছনের প্রথম শ্রেণিগুলো একেবারে খালি নয়। তাতেও লোক এসেছে। তৃতীয় শ্রেণির লোকগুলো যেমন বিচিত্র ধরনের, তারাও তেমনি বিচিত্র ধরনের। এক একজন বিচিত্র রকমের সাজসজ্জা করেছে। এক একটা নারী আর একএকটা পুরুষ। পাশাপাশি। নারীগুলির গাত্রবর্ণ অসুন্দর, দেহের গঠনে আর মুখের আদলে ঈশ্বরের হাত অপটু প্রমাণিত হয়েছে। তারা নিজেরা যা প্রসাধন করেছে তাতে স্থূলরুচি ও বুদ্ধিতে স্রষ্টাকে দেওয়া সার্টিফিকট নিজেরা কেড়ে নেবার ফলে অত্যধিক মালিক প্রতিপন্ন হয়েছে। পরনে শাড়ীর চাকচিক্য, মুখে সস্তা পাউডারের বুননি, কব্জিতে অনেকগুলি কাঁচের চুড়ির ঝকমকি আর মাথায় তেলের চাকচিক্য—সবকিছু মিলে এদের সভ্যতার গোড়ার দিকে ফিরে যেতে উদ্যত করেছে। কয়েক ঘণ্টার প্রিয় প্রিয়াতে মিলে তারা রাজনর্তকী দেখতে এসেছে। ইন্টারভেলের আলো জ্বললে দেখা গেল, সামনের বেঞ্চিতে যারা বসেছে, পেছনের সিটের অনেকে পান খেয়ে তাদের পিঠে আঙুলের চুন মুছছে।

ছবিটা ইংরাজীতে। নাম কোর্ট ডান্সার। ভারতীয় নাম রাজনর্তকী। ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কতদূর উঁচুতে উঠেছে তাই দেখাবার জন্য বোধহয় এই চিত্রের একটা ইংরাজী সংস্করণ হয়েছে। ভারতের বাইরে দেখাবার উদ্দেশ্য। কয়েকখানা কীর্তন গান, কয়েকটি নৃত্য আর একটুখানি মামুলি প্রেম বিরহ ও ত্যাগের দৃশ্য।

বিদেশীর চোখে এর দাম কানাকড়ি। টমের অপরিসীম বিরক্তি ধরে গেল। তারা হল থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। তারা আগেই এসেছিল বলে দেখেছে ম্যাটিনি শো। টম একটা টিউবওয়েল থেকে জল খেলো। কয়েক বাটি চা খেলো এবং উপরন্তু অনেকগুলি ডাব খেলো। কিন্তু পিপাসা দূর হলো না। শেষে কলিকাতাগামী বাসে উঠে বসলো। যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন দৈহিক অস্থিরতায় সন্দিগ্ধ হয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলো জ্বর এসেছে কিনা।

মাঝপথে গোবিন্দ সহসাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। টমের হাত ধরে টান মেরে বললে, চলো নেমে যাই।

টম ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। টম নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করছে। তবু দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় ছিল না। গোবিন্দর মুখখানা, এক ভৌতিক আবেশে যেন শাদা, রক্তশূন্য। কেন, বলবার অবসর নেই। চাপা গলায় শুধু বললো, পরে বলছি, আগে নেমে এসো।

দুজনকেই নামিয়ে বাস ছেড়ে দিলো। গোবিন্দ টমের কৌতূহল নিবৃত্ত করল। সেই বাঁদরটা মাঝপথে বাস থামিয়ে উঠেছে। সেই মুখপোড়া ননসেন্স লেবার লীডার।

ও, দ্যাট ফেমাস লেবার লীডার?

–ফেমাস না আরো কিছু। ইনফেমাস।

–তোমার কাছে তো উভয়ত বটে। খারাপ নামের হলেও, রোজ এত অধিকবার করে তার নাম নিচ্ছ যে, খারাপ নামের হলেও সে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছে।

তার মতো অমন স্বানমধন্য হওয়াকে আমি ঘৃণা করি। বেটার চুপ করে থাকব। তবু যা তা বলে কতকগুলো লোকের মাথা চিবোবে না। এক নম্বরের ভন্ড। বাসে উঠবার সময়ে দেখনি তার ভড়ং।

সাদা ধবধবে খদ্দর পরা, মাথায় গান্ধীক্যাপ, চেহারাটি খাসা। আত্মসমাহিত ভাব। গাড়িতে উঠতে একটুখানি দেখেছি বইকি।

খদ্দেরের মনগড়া পবিত্রতা দিয়ে এরা ভেতরের সকল নোংরামি ঢেকে রাখে। এদের লীডার একজন যাদুকর। দেশের লাখ লাখ লোককে যাদুমন্ত্রে এমন এক অবস্থায় নিয়ে রাখে যাতে ওদের বলা হয় কংগ্রেসী। এই যাদুর বশে এরা জেলে যায় আর পুলিশের লাথি গুঁতো খায়। আর এরা ঐ যাদুকরের যাদুতে বশ হয় বলেই আমাদেরকেও ওদের পিছু লাগতে হয়।

আরে, লেবার লীডার কংগ্রেসী হবে কেন? কংগ্রেসী ত কেবল পুঁজিবাদী হিন্দুরা, শুনেছি। আর কংগ্রেস– এর প্রতি না আছে হিন্দুর সহানুভূতি, না আছে মুসলমানের দরদ, না আছে কৃষক শ্রমিক আন্দোলন যারা চালাচ্ছে তাদের সহযোগিতা। সহানুভূতি আছে কেবল বিত্তবান বর্ণহিন্দুদের। এরা বৃটিশকে তাড়িয়ে নিজেরা দেশের রাজা হতে চায়–ইন্ডিয়া অফিস থেকে একথা তো স্পষ্ট করেই আমরা জেনেছি।

আরে রেখে দাও। নাম রাখার বেলা সবাই চটকদার এক একটা নাম রাখে। কিন্তু কাজের বেলা সব দশরথের একই রথ। সবাই কংগ্রেসী। তা শ্রম সদস্যই বলো আর বিনাশ্রম সদস্যই বলো। কাউকে বিশ্বাস করি না আমরা। এই ধরোনা এই লেবার লিডারটা–

বলো কি, অ্যারিষ্টোক্র্যাট কংগ্রেসের সঙ্গে লেবার লীডারের যোগ সামঞ্জস্য হয় কখনো? বিলাতের পার্লামেন্টের লেবার লীডারদের তো দেখেছি। কনজারভেটিভরা মনে করে এটা ঠিক লেবার লীডার নয়, লেবারার। এরাও তা বোঝে, তাই যে কোন মূল্যে দিয়ে নিজেদেরকে সম্মানিত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে।

বিলাতের কথা ছাড়ো। সেখানে সবই সম্ভব। যোগ সামঞ্জস্য হয় কিনা জিজ্ঞাসা করছ। হয়, ঘরোয়া বিবাদের নামে যাই করুক, আমাদেরকে, মানে গভর্ণমেন্টকে বিব্রত করার বেলা সবাই এক জোট।

এম, এন, রায়ের দল আর কমিউনিস্ট পার্টি শুনছি না কি বিব্রত করে না।

না বিব্রত এরা ঠিকই করে না। এম, এন, রায় কাউন্টার রিভলিউশনিস্ট –কংগ্রেসীরা যে বিপ্লব করে মরছে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা বিপ্লব করার জন্য এম, এন, রায় একদল লোককে প্রস্তুত করে রেখেছে। তাই এদের থেকে আমরা বিব্রত হই না একেবারেই। তবে এরা রিয়াল কর্মী। কর্মী যারা, অকর্মা হয়ে থাকতে পারে না। কখন কংগ্রেসী বিপ্লব সফল হবে, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে থাকাও কম ধৈর্যের কাজ নয়। কর্মীদের অত ধৈর্য থাকে না। তাদের কাজ করতে হয়। এম, এন রায়ের দল সেইজন্য এখনই স্থানে স্থানে কাউন্টার রিভলিউশন আরম্ভ করে দিয়েছে। তাতে আমাদের অনেক সাহায্য হচ্ছে।

আর কমিউনিস্টদের কথাও উল্লেখ্য। তারা আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাদের কাজ বিশ্বভূখণ্ডের কোনো একটা সীমাবদ্ধ অংশে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের নিয়ে তাদের মহাগুষ্টি। তারা যখন কিছু করবে বিশ্বকমিউনিস্টদের সামগ্রিক প্রস্তাবক্রমেই করবে। তারা মনে করে, কংগ্রেস যদি সিংহাসন পায় তো তার সঙ্গেও বিশ্বকিমউনিস্টদের বিরোধ করতে হবে কমিউনিজম আনতে হলে। তাই ইতিমধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ করে লাভ কি তাদের? কিন্তু পাবলিক এদের চায় না। এই যা দুঃখ। পাবলিক এদের চাইলে আমরা এদের জিহ্বা সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম।

শর্মা! তুমি এতো খোঁজ খবর রাখো! এতো ধ্যানধারণা করো।–

খোঁজ খবর আর কি মশাই আমি রাখি? রাখায়। সবই ঐ ইডিয়েট লেবার লীডারটার কাছে শোনা। ফলো করি। সুযোগ পেলে আড়াল থেকে, স্যাঙাতদের সঙ্গে আলাপ করতে শুনি। রিপোর্ট রাখি জব্দ করবার জন্য। কাজেকাজেই শেখা হয়ে যায়।

নেহাত বস্তি থেকে স্পিঙ্‌ করে আসেনি। ভদ্রলোক বলে মনে হলো।

ভদ্রলোকের ছেলে বলতে পারো। ও নিজে ভদ্রলোক নয় মোটেই। আমারই কি-এক রকমের যেন রক্ত-সম্পর্ক আছে। তাই ওকে ভদ্রলোকের সন্তান বললে ভুল হবে না।

পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ অতিক্রান্ত হয়েছে।

ঐ দিকে একটু যেতে হয়, বলে টম একটা ইঙ্গিত করলো। আর শর্মাও তা চট করে বুঝে ফেললো। কিন্তু তার প্রবল অনিচ্ছা। বলল, অত যদি মেয়েমানুষের সখ তবে একটা লাল মেম বিয়ে করলে না কেন? দেশে থাকতে, যখন মাষ্টারী করতে!

টমের পূর্বস্মৃতি আলোড়িত হয়ে উঠলো।

বিয়ে আমি করিনি, কারণ বিয়ে কোনো পুরুষের মধ্যেই কোন কিছু বড় করমের পরিবর্তন আনতে পারে না। তার বুড়ি মা বা ঝি চাকরেরা সংসারের খুটিনাটি এসব কাজকর্ম করেছিলো এতক্ষণ, বউ এসে তার ভার নিয়ে নেয়, এইমাত্র পরিবর্তন। বিয়ে হচ্ছে একটা কয়েদখানা। চার-দেয়ালের ভেতর বউকে এখানে নিশ্বাস চেপে তিলে তিলে হত্যা করা হয়। তাই সহজাত প্রেজুডিস আর হিপোক্র্যাসিগুলোকে তার বুকের মঞ্জুষায় অবরুদ্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়। নারীমহলের মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে উঠে যেসব পুরুষ বলে নারীর স্থান গৃহকোণ–তারা মূর্খ! গৃহ নারীদের পক্ষে খুব ভালো স্থান নয়। তা নয় বলেই আমিও বিয়ে করলাম না।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। নির্মল নীল আকাশ, ততোধিক নির্মল চাঁদের আলো। বোধ হয় একাদশীর চাঁদ। সত্যি একটা নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে শুভ্র ছিন্ন উত্তরীয় পরা স্বাস্থ্যবান দুষ্টু ছেলের মতো, স্বচ্ছ ছেঁড়া সাদা হালকা মেঘ জড়িয়ে চাঁদটা অপূর্ব হয়ে উঠেছে। একটা দেবালয় থেকে আরতির রব আসছে। এই পবিত্র পরিবেশে কোনো কুস্থানে যেতে স্বভাবতঃই গোবিন্দর ব্রাহ্মণ মনটা সায় দিচ্ছিলো না।

টমকে অন্যমনস্ক করবার দুঃসাধ্য সঙ্কল্প নিয়ে বলল, কি সুন্দর অকলঙ্ক চাঁদ!

টম গানে পরিচিত কথার উল্লেখ পেয়ে গেয়ে উঠলো : চাঁদের সাথে ছিলো আমার অনেক বোঝাপড়া; তথায় পাপ নাই লজ্জা নাই রে।

সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে বললো, এই তো এসে গেছি।

একটা দোতালা খোলামতন দালানের কোণের দিকে দুইতলার রুমটার কপালে একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে। এক দিকের দড়ি-খুলে গেছে আর একদিকের দড়িতে আটকা পড়ে সাইন বোর্ডের কাঠখানা টিনের বাঁদরের মতো ঝুলছে। ইতিপূর্বে রুমখানাতে কয়েকজন বেকার যুবক মিলে শব্দশৃঙ্খল প্রতিযোগিতার আপিস খুলেছিল। সম্প্রতি তারা ওয়ার সার্ভিসে যোগ দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। তারই শেষ নিদর্শনের মতো বোর্ডখানা দোদুল্যমান অবস্থায় এখনো রয়ে গেছে।

সম্প্রতি দুজন, বোধ হয় ইতিপূর্বে টাইপিষ্ট ছিল, ঘরখানা ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে বসেছে। টমিদের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোতে সাহায্য করার নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে কিছু তাদের আর্থিক আকর্ষণও ছিল কিনা তারাই জানে। তবে তাদের পশার জমেছে বেশ, দেখলেই বোঝা যায়। পাশ দিয়ে লম্বমান গলিটার ভেতরে, ঢুকবার জায়গার মুখে আরদালী বসে থাকে, নাগর-টমিদের সেলাম জানিয়ে উপরে নিয়ে যাবার জন্য! রাস্তার মুখে পায়চারী করে পুলিশ, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত।

টম ও গোবিন্দ সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

জনৈক ব্যক্তি দুটি আনাড়ী টমিকে পায়ে হাঁটিয়ে এনে বাইরে থেকে মেমসাব মেমসাব বলে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে। মেমসাব গলা বাড়িয়ে ব্লাডি ননসেন্স বলে গাল দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলো! লোকটি ম্লান মুখে টমিদুটোকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, চলো সায়েব, আরো কত আছে, চলো।

একখানা ট্যাক্সি এসে থামলে, আরদালী এসে সেলাম ঠুকে আরোহী দুজনকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে চলে গেল। ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘাগী। পায়চারীরত পুলিশটির দিকে

চেয়ে গমনপর সৈন্যদুটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, লড়াই জিৎ করনেকাওয়াস্তে যাতা হায়।

দুজনেই একটু হাসলো।

টম বললো, চলো, এখানে সুবিধা হবে না।

গোবিন্দ বললো, চলো।

অপেক্ষাকৃত গরীব রূপোপজীবিনীরা যেখানে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে সেখানে গেলো তারা।

একটি নেপালী মেয়ে, ক্ষুদ্র কক্ষের বাইরে থেকে মৃদু-আলোকেও চোখে পড়ে, ভিতর দেওয়ালের সেই জায়গাটুক দেশলাই বাক্সের উপরের ছবিগুলো তুলে তুলে সাজিয়েছে। আর তারই পাশে বসে পানে মুখ রাঙিয়ে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে।

গোবিন্দ শুধু ব্যাঞ্জো বাজনা শুনলো। কিন্তু টম মেয়েটির গলায় একটা হাত জড়িয়ে নিয়ে, তার হাতটা নিজের কাঁধের উপর সাপের মতো জড়িয়ে নিয়ে, জেন আমার মোষ্ট বিলাভেড জেন, কথাগুলো বলল এবং তার মুখে চুম্বন করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে মাটিত্রে পড়ে গেল।

চলন্ত রিক্সায় গোবিন্দর হাতখানা ধরে অনুনয়ের সুরে টম বললো, আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল বন্ধু। একটু বিশ্রামের পর সুস্থ হলেই আমায় রিক্সা করে ব্যারাকে পাঠিয়ে দিও।

গোবিন্দরা বাসাড়ে নয়। নিজেদের বাড়ি। টমের শরীরে প্রবল জ্বর। কিন্তু তবু তাকে খুব চটপটে দেখাচ্ছে। গোবিন্দর বিধবা মা আর একটি বিধবা বোনকে নিয়ে তার সংসার। মা একটি ম্লেচ্ছ ইংরাজকে বাড়িতে দেখে বিব্রত হয়ে গা ঢাকা দিলো। আর বোন একজন সুদৃশ্য শ্বেতবর্ণের সৈনিক পুরুষকে দাদার অন্তরঙ্গ হয়ে বাড়িতে এসেছে দেখে, থান কাপড়টাই আর একটু মেজেঘসে পরলো ও চশমাজোড়া খাপ থেকে খুলে চোখে লাগালো।

টমের হিউমার ফিরে এলো : বেশ বাড়িখানাতে থাক তো। মালিক তো তুমিই, না বাবা আছে?

মালিক আমিই। বাবা নেই। তিনিও এই ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতেন। তবে খুব চালাক ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই পদের উন্নতি আর মাইনের টাকার বৃদ্ধি তার ঘন ঘন হয়েছিল। আমি এই লাইনে আশানুরূপ উন্নতি কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল না এ লাইনে থাকার। কেবল বাবার অনুরোধে। যাবার বেলা বাবা আমাকে একাজে রেখে যায়।

শর্মা, তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছ কিনা, তাই খালি পড়েছই, শেখনি কিছুই।

একথার মানে ভেঙে বলো।

কিছুই শেখনি বলেই নিজের চয়েজমত প্রফেসন বেছে নিতে পারনি, বাপ যা বলেছে অন্ধের মতো তাই ঘাড় পেতে নিয়েছ। সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অবস্থা। বর্তমান জীবনের সঙ্গে আর বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়েরই যোগ দেখলাম না। ওরা সব ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছে। ওরা ডিগ্রি দেয়, কিন্তু শিক্ষা দেয় না। যা-ও শিক্ষা দ্যায়, তা-ও মানুষ হবার শিক্ষা নয়।

টমের ক্লান্তি ততক্ষণে বেড়ে গিয়েছে। কি হারিয়ে ফেলেছে এমনিভাবে বারদুই এদিক ওদিক চেয়ে ইজিচেয়ারে একেবারে ভেঙে পড়লো। সম্মুখে আরেকটি ইজিচেয়ারে গোবিন্দ বসে ছিলো। ক্লান্তিতে নিজের অজান্তেই তারো চোখে একটু তন্দ্রার ভাব এসে গেলো।

তন্দ্রার ঘোরে গোবিন্দ এক লহর স্বপ্ন দেখে ফেললো। সচরাচর যা দেখা যায় না, এমনি অস্বাভাবিক এক সুদীর্ঘ স্বপ্ন। দেখছে : কলকাতায় অনেক টমি এসেছে; রাস্তায় তারা বিপুল বিক্রমে চলে, পথচারীদের ধাক্কা মারে, মেয়েদের টানাটানি করে। চৌরঙ্গীতে প্রণয়ী জুটিয়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে চলে। জনবহুল রাস্তা দিয়ে যখন চলে, তখন নাচতে নাচতে এ ওর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে লড়ায়ে পুতুলের মতো ঢলে ঢলে চলে, যাদের জোটে না, আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখে ক্ষুধার অনল জ্বলে। তারা তুচ্ছ, তারা অনিশ্চিত। ক্ষণিকের মুঠি বাড়িয়ে রক্তচক্ষে যা পাচ্ছে, খালি তুলছে। কখন চূড়ান্ত ডাক আসবে। স্বল্পতার মাধুর্যে মণ্ডিত যে-জীবনকে নির্মাল্যে বরণীয় করার অবকাশ ছিল প্রচুর, নিম্নস্তরের ভোগলালসার ভ্রূকুটিতে তা-ই হয়ে উঠেছে কত কদর্য আর অকিঞ্চিৎকর।

না, চৌরঙ্গীর দিকে আর চাওয়া যায় না। আবহাওয়া পঙ্কিল। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। একটা স্কোয়ারের নির্জন দীঘির পাড়ে স্বস্তির নিশ্বাস নেবে ভেবেছিলো। অদৃষ্ট দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে দেখে একটু আগে আলো থাকতে যে-দুজন ঘাসের উপর বসবার জন্য স্থান পরিষ্কার করছিলো, আলো সরে যাওয়ায় তারা এখন শুয়ে পড়েছে দেখে গোবিন্দর স্বাভাবিক-পশুত্বটা স্ফীত হয়ে উঠেছিল। পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কুকুরের ঈর্ষা নিয়ে একটু স্বচ্ছ ভাবে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলো তার চিরচেনা টম একটা সঙ্গিনী নিয়ে শুয়ে আছে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, টম, ইজ ইট ইউ?

গোবিন্দ ঘৃণায় সঙ্কুচিত। লোকটা অতবড় পণ্ডিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য শিল্প ধর্ম অধর্ম সম্বন্ধে এতো জানে শোনে। তার রুচি এত জঘন্য! এরা সব পারে। শেলী বায়রণের জাত এরা যত জ্ঞানবানই হোক না কেন, বিশেষ এক জায়গাতে সমান দুর্বল। সমান কৃতী।

তবু গোবিন্দর ক্ষোভ বাধা মানে না :

টম, ইজ ইট ইউ?

টম বলে উঠল, হোয়াই নট? দোষটা কি করেছি আমি? আর, ওহে গুণবান গোয়েন্দাবন্ধু, কার সঙ্গে কার তুলনা দিচ্ছ? আমরা কামুক তোমরা ধার্মিক। আমরা অসংযমী আর তোমরা সন্ন্যাসী! বলি সন্ন্যাসীত্ব করে কতদূর এগিয়েছ? বিদেশীর পায়ে মাথা লুটাচ্ছ আর মুখে গালভরা তোষামোদ বাক্য বলে সঙ্গে সঙ্গে হাত কচলাচ্ছ। আর লীডারদের ফলো করে বেড়াচ্ছ। সনাতন আর্যতন্ত্রের দোহাই পেড়ে যা করে যাচ্ছ, এই তথাকথিত আর্য না হলেও আমরা কিছুতেই তা করতে পারতাম না। আমরা অসংযমী হই, ব্রহ্মচর্যহীন হই—ইংরাজ হয়ে ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা আমাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হতো না।

কথাগুলো ঐ মূর্খ লেবার লীডারটার কথারই যেন প্রতিধ্বনি হলো : একটা ইংরেজ পরাধীন হলে কি করতো? আমরা যা করছি তার শতগুণ করত। আমরা কেন করি না! এ কেনর উত্তর শোনার ধৈর্য গোবিন্দর ছিল না, কান চেপে সরে পড়েছিল। তারপর টমকে নিয়ে এলো বাড়িতে। টম একটা ইজি চেয়ারে শুলো আর বীণা এসে চশমাটা খুলে টমের চোখে পরিয়ে দিল, আর টম বাঁ-হাতটা বীণার গলায় সাপের মতো পেঁচিয়ে দিয়ে বললো, ডিয়ার জেন, তুমি হাউ লাভলি!

স্বপ্ন এর অধিক এগুতে পারে না। এখানে স্বপ্ন ভাঙলো। অসাড় হয়ে ইজি চেয়ারে নাক ডাকাচ্ছে। গোবিন্দ রেগে গেলো। তার রাগ হলো, না দুঃখ হলো, না জিঘাংসা হলো– সে-ই জানে। মোট কথা, যা-ই হলো চূড়ান্ত অবস্থায় হলো। ইচ্ছা হলো তার দুর্বল হাত দুটিকে আলগা করে ফেলে। তাকে যেন ভৌতিক একটা কিছু এসে ভর করেছে।

যাহোক প্রকৃতিস্থ অবস্থা তার এলো না। অপ্রকৃতিস্থ অবস্তার নিষ্ক্রিয় লোকটাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। মাঝখানে একটু সম্বিত পেয়ে টম বিস্মিত স্তম্ভিত দুটি ভীরু চোখে চেয়েছিল। কিচ্ছু না বুঝতে পেরে আবার চোখ বুজে হুঁস হারিয়ে ফেলল। রাস্তার ধূলায় পড়ে কতক্ষণ ছিল জানা নেই তার। আকাশের চাঁদটা বড় পাণ্ডুর। তার দৃষ্টিশক্তি ততোধিক পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে। ঘন কুয়াসার মধ্য দিয়ে দেখছে, চাঁদটা একেবারে কাছে এসে গেছে।

কিন্তু যে-লোকটা তাকে কোলে নিয়েছে তাকে এত দূরের মনে হচ্ছে কেন? চাঁদের পিছনের অনেক দূর থেকে সে আসছে। ধরছে, তুলছে! তার স্পর্শ পাচ্ছি। কিন্তু বোধ হচ্ছে সে বহু দূরের। একশটা হাত একত্র জুড়লেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না। স্পর্শ? হ্যাঁ। বড় মধুর তার স্পর্শ। সদ্য ধৌত শুভ্র নির্মল খদ্দরবস্ত্রে তাকে যা মানিয়েছে। বড় আরামদায়ক, প্রসাদদায়ক এর স্পর্শ। রোগের জ্বালা একেবারে ভুলিয়ে দেয়।

এই শুভ্র পবিত্র বস্ত্র পরিহিত সৌম্যদর্শন মানুষটির কোলে এভাবে আরো কতক্ষণ মাথা রাখতে পারলে এমনিতেই সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যেতো। অক্লেশে পায়ে হেঁটে ব্যারাকে ফিরে যেতে পারতো। হাঁ মনে পড়েছে। মাঝপথে একেই বাসে উঠতে দেখে গোবিন্দ সচকিত হয়ে নেমে পড়েছিলো। তবে কি এ-ই সেই?–

প্রাইভেট চিকিৎসার বাক্সের কয়েকটা ঔষধ প্রয়োগেই পথে কুড়িয়ে পাওয়া রোগী টমের জিজ্ঞাসু মন অবাধ হয়ে উঠেছিলো। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেখলো কিছুই জানানো হয়নি। দুই একটা প্রশ্ন করতে ছাড়ল না। কিন্তু লেবার লীডার এই বলে তার মুখ বন্ধ করে দিলো, পলিটিকসে মিশো না। জাপানিদের রুখতে এসেছ, সেই কাজের জন্যই প্রস্তুত হতে থাক। তোমার দেশের যারা বড় বড় লীডার রয়েছে, পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তারাই।

সুস্থ মনে বিস্ময় চেপে টম যখন ব্যারাকে এলো, রাত তখনো অতিশয় অধিক হয়নি–অথচ এর মধ্যে কতো কাণ্ড ঘটেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রমিক নেতার স্বপ্ন

গোবিন্দদের বাড়ির পূর্ব দিকে–এধারে একটা বড় লোকের বাড়ি। তারই প্রাঙ্গণে হাতে করা এক ফালি বাগান আর ওধারে একখণ্ড খোলা জমি। তাতে বড় বড় কয়েকটা গাছ। জানালা দিয়ে সবটা চোখে পড়ে। ঘুম ভেঙে চাইতে দেখে বাগানে ফুলেরা বর্ণে বৈচিত্র্যে আর সুষমায় অজস্র হয়ে উঠেছে আর গাছগুলিতে পাখ-পাখালিরা কথা কয়ে উঠছে। আকাশ পরিষ্কার। তার থেকে এক ঝলক ফরসা স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সুন্দর প্রভাত শরতের বন্দনায় উদ্দীপিত। এত সুন্দর সকাল গোবিন্দ বুঝি আর দেখে নাই।

এই সুন্দর প্রভাতে তার মনে হলো, সে যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের ইচ্ছার রাগে রঞ্জিত তার মন। মহাদুষ্ট লেবার লীডারের 'ছাড়ালে না ছাড়ে' প্রভাব তার মধ্যে আর নেই। চা খেয়ে একটা সাইকলজির বইয়ের অবচেতন মন শীর্ষক অধ্যায়টা বেশ মন দিয়ে পড়ে ফেললো। পড়ে ভাবতে চেষ্টা করল অবচেতন মনটা আসলে কি–এ মনের দৌড় কতদূর।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগলো, তারও কি একটা অবচেতন মন আছে নাকি। এবং যে লেবার লীডারকে আদৌ সে সইতে পারে না, তার মন তাকেই ফাঁকি দিয়ে সেই লোকটির কথাগুলি শুনে আসে কিনা। তা ছাড়া, কাল যে-স্বপ্ন সে দেখলো সে-দেখা ঐ অবচেতন মনেরই কিনা।

কিন্তু লোকটার কি ক্লান্তি বলে কিছুই নেই? সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সে কি শুধু লেবার লীডারই হয়ে থাকবে? নুয়ে পড়বে না একদিনো তার মাথা? চিন্তাগুলি যাবে না কি গুলিয়ে? মৃত্যু এসে একদিনো দেবে না কি তার সকল কর্মচাঞ্চল্য পালিশ করে। সে যদি মরে যেত! কিন্তু কেন সে মরবে! কার কি সে করেছে? কিছুইতো করছে না। খালি কথা বলছে। পাশের বাড়িতে থাকে বলে তার সব কথা অল্প আয়াসেই শুনতে পাই।

শুনতে দেয় কেন সে? কেন সে যায় না অনেকখানি দূরে সরে?

ভাত খেয়ে আপিশ যাবার সময় হয়ে গেল। রোমান টাইপের নাকওয়ালা একটা পঞ্চাশোর্ধের লোক মুগ্ধ ভক্তের মতো তার রাবিশ কথাগুলো শুনে যাচ্ছে। আর সম্মতি দিয়ে দিয়ে ঘাড় নাড়ছে। এ-লোকটা নিশ্চয়ই অচিন্ত্যের আপিশের লোক, যে লোক সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করেছিল। তবে তো সে লোক জুটাচ্ছে! সাংঘাতিক তো!

জানালার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলে হতো কি তারা বলছে।

বলছে–তিন মাসে ত্রিশটা লেবারমিটিং করে শ্রমিকদের সঙ্গে–ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি, স্বাধীনতা সম্বন্ধে তারা সচেতন। স্বাধীনতার দাবিকে যারা আমল দিচ্ছে না তাদের প্রতি এই নিরক্ষর আত্ম-সচেতনায় অভ্যস্ত মজুরদেরো অপরিসীম ঘৃণা। কিন্তু এই ঘৃণার ভাব যাতে দ্বিতীয় শত্রুকে ডেকে আনতে সাহায্য না

করে সেইটা দেখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শাসকেরা সেইটের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই দেশ শত্রু কবলিত হলে আমাদেরই লাগবে বেশি। এইসব জেনে শুনেও আমাদের যারা Moral শিক্ষা দিতে আসে তাদের ঔদ্ধত্য দেখে হেসে বাঁচি না। পরাধীন মানুষের মন কি এমনি করে ভোঁতা দা দিয়ে কোপাতে হয়?

সাধে কি বলে শ্রমিক নেতা? ত্রিশটা মিটিং করেছে! এতো খাটতে পারে। মজুরদের নেতা সে রামধুর কিনা? শোনা যাক আরো কি বলছে। গোবিন্দ উৎকর্ণ হয়ে রইল।

রোমান টাইপের নাকওয়ালা বলছে : পরাধীন মনটা তো আমাদের। এ মনকে সুস্থাবস্থা থেকে টেনে নিয়ে অসুস্থ করার জন্য ফাঁদ যারাই পাতুক না কেন, ফাঁদে ধরা পড়ার দায়িত্ব তো আমাদের। আমাদের দেশে দেশীয় রাজ্যের রাজারা, অনুন্নত সমাজের নেতারা আর বাংলাদেশের গোয়েন্দারা যেরূপ পরাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে, তাতে, যারা ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কোপাচ্ছে তাদের তো অতটা দোষ ধরা পড়ে না। দোষ যে এই শ্রেণির মহামানবেরেই!

লেবার লীডার বলছে : কথাটা ভাববার বটে। আগেই এ নিয়ে আমরা ভেবেছি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা যে নষ্টামীর শেষ ধাপে নেমেছে, সেটা কার হাতের পুতুল হয়ে? ব্যক্তিত্ব বিকিয়েছে ওরা কাদের হাতে? ওরা কৃপার পাত্র। এদের যদি কেউ আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দিয়ে উদ্ধার করতো তাহলে শতযুগ ধরে ওরা বংশপরম্পরায় কৃতজ্ঞতা জানাতো—কৃতজ্ঞতা জানানোকে একটা চালু প্রথা করে নিত। কিন্তু এদের জাগাবে কে? শ্রমিক হলে ভাত কাপড়ের অভাব আর জীবনযাত্রার দৈন্য দেখিয়ে জাগানো যেত, কিন্তু ঐশ্বর্য ও লালসার কোলে লালিত এই নিঃস্বদের উদ্ধার করবে কে? ওদের চৈতন্য এনে দেবে কে? দশটার অধিক বিয়ে করেনি, এবং তদুপরি বিলাতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নারী রক্ষিতা করে আনেনি, সেই অনীপ্স নারী পত্নীত্বের দাবীতে রাজকোষে জমানো গরীবের বুকচেরা অর্থের প্রধান ভাগ আইনের নামে আদায় করে বিলাসিতায় ঢালছে না এমন রাজা দেশীয় রাজ্যে কে আছে?

প্রাচ্যের রাজধর্ম পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে যে বিকারপ্রাপ্ত হয়েছে তাতে অবিলম্বে এদের ধ্বংস হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্যের দুরারোগ্য সিফিলিসকে এরা অন্তঃপুরে ডেকে এনে সংক্রমিত করছে। কিন্তু প্রজা-পীড়নের বেলা এরা বৃটিশ গভর্নমেন্টেরও উপরে। এ মনোবৃত্তির মূলে কে? আর স্পাইদের কার্যকলাপ তো দেখছই। ভয় হয় এরাই আগে পঞ্চমবাহিনী হয়ে বিভীষণের মতো ঘরের কথা আবার জানিয়ে না দেয়। একথা তো দিনের মতো স্পষ্ট, যারা স্বাধীনচেতা লোক, দেশকে নূতন করে পরাধীন হতে দেখলে তারাই বাধা দেবে সবার আগে। গোলামী যাদের মনের সারভাগকে চেটে খেয়ে ফেলেছে, এ-পরাধীনতার মতো সেই পরাধীনতাকে তারা মানিয়ে নিতেও পারে, যদি চাপে পড়ে। আজ হাজার চাপেও যারা স্বাধীনতার দাবি ছাড়ছে না, নূতন বেড়ী পরাবার জবরদস্তির প্রতিবাদ তারাই করবে সবার আগে।

আর একটা কথা। দেখো, শ্রমিক নিয়ে কারবার করি। এরা নিজে কম বোঝে বলে এদের বুঝাতে পারি সহজেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা নিজেরা অনেক বেশি বোঝে বলে তাদের বোঝানো অনেক সময় অসাধ্য হয়ে পড়ে। কেরাণীদের মধ্যে একটা ইউনিয়ন

হওয়া দরকার। দেশী বা বিলাতী সকল প্রভুর অবিচারের বিরুদ্ধে তারা যেন সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে। এবং নিজেদের দাবীদাওয়া জানিয়ে তা আদায় না করে ক্ষান্ত না হওয়ার মতো দৃঢ়তা যেন তারা অবশ্যই সঞ্চয় করে। ঘরের অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারলে বাইরে থেকে যখন আরও শক্ত অবিচার আসবে তা তারা রোধ করবে কোন্ শক্তি দিয়ে। তাই তাদেরো ফায়ারপ্রুফ হয়ে আসা দরকার।

মর্মাহত গোবিন্দ নীরবে আপিশে চলে গেল। আপিশে গিয়ে কাজের ফাঁকে ভাবতে চেষ্টা করলো : ও যা বলেছে তা কি সত্যি ঠিক কথা হলো? স্পাইরা কি সত্যি তাই? গভর্ণমেন্টের সুহৃদ্যতা করে কি এরা দেশের শত্রুতা করছে? স্বাধীনতার কি শত্রু এরা? এরা কি মহৎ কাজ করছে না? এদের জীবন কি তবে গৌরবান্বিত নয়? ফল্গুর মতো এদের চিন্তা ও কার্যের স্রোতে বয়ে গিয়ে বড় বড় ষড়যন্ত্র বনস্পতির গোড়ায় ফাটল ধরিয়ে দেয় না? দেশের লোক হয়ে এদের সম্বন্ধে এমন নিরঙ্কুশ মন্তব্য করে সেরে যাবে–এরা কি এমনি ফেলনা? দেশের এরা কেউ নয়? সিনেমায় তো দেখি স্পাই কত বরেণ্য। এক একটা গোপনীয় কূট সংবাদ সংগ্রহ করে এনে, এক একটা সর্বনাশো চালাকি ধরে ফেলে এরা কত প্রশংসা পায়। আত্মপ্রসাদ পায়। অর্থ ও মান দুই-ই পায়। একটা স্পাইয়ের জীবন কি এডভাঞ্চারাস? এ-জীবন চালিয়ে নেওয়া কি ঠাট্টার কথা? একি একটা লেবার লীডারের জীবন যে শ্রমিকদের দুটো পরামর্শ দিয়ে পুলিশের দুচারটে লাঠির আঘাত মাথায় করে নিয়ে কর্তব্য ভুলিয়ে দেওয়া?

কিন্তু লোকটা এমন করে বলে যে, আপাদমস্তক জ্বালা নিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। এমন লোককে কি করা যায়।

গোবিন্দ ঠিক করতে পারে না লেবার লীডারকে সে পূজো করবে, না খুন করবে!

অফিস-দেবতা তিনটি ফিফথ কলামিস্টের সন্ধান পেয়ে গেলো। একটা জায়গায় কি সব বে-আইনী কাগজ মেরে দিয়েছে। একবার পড়ে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। দু'চারজন লোক জমে কাগজগুলি পড়ছে। গোবিন্দ বোকার ভান করে এক একজনকে জিজ্ঞাসা করছে, কি লিখেছে দাদা? লোকগুলো তার মুখের দিকে চেয়ে কিছু না বলে চলে যাচ্ছে। হাল না ছেড়ে গোবিন্দ আর একজনকে বললো, শালাদের রাজত্ব যেতে আর বাকী কত? কিন্তু সে লোকটা কিছু না বলে চুপ করে চলে গেল। সেখান থেকে চলে এসে শর্মা একটা বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল। এই বাড়িতে টেলিগ্রাফ নামে একটা ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা ছাপা হয়। ভরা বিকাল। সান্ধ্য সংস্করণের টেলিগ্রাফের প্রধান খবরগুলো হেড লাইন করে একটি বোর্ডে বাড়ির গেটে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কিছু কাজ পথের মারফৎ হয়ে যায় ভাবলো, না হয়, তা হলেও ক্ষতি নেই।

বৈকালিক ব্যস্ততার মাঝে ঘরে ফেরার মন নিয়ে যারা হেড লাইনগুলি পড়ে পড়ে যাচ্ছে গোবিন্দ তাদের একজনকে বললো, কি খবর লিখেছে বাবু? তার সুরে বানানো নির্বুদ্ধিতা, আর বলার ভঙ্গিতে বৈষ্ণবিক অকিঞ্চিৎকরতা।

লোকটা তার দিকে না চেয়েই জবাব দিলো পাঁচখানা এরোপ্লেন মেরে দিয়েছে।

জাপানীরা বৃটিশদের মেরেছে, না বৃটিশেরা জাপানীদের মেরেছে?–গোবিন্দর চোখে সন্ধানী তীক্ষ্ণতা।

বৃটিশেরা মেরেছে, জাপানীদের।

গোবিন্দর মুখে তৈরি করা অখুশির ভাব। মনে সার্পিক প্যাঁচ।–বড্ড কায়দা করে মনের ভাব গোপন রেখেছ বাবা। উত্তেজনার প্রাবল্যে উল্টো কথাটি বলে ফেলোনি–যা বলা ছিল তোমার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু রেহাই তুমি পাচ্ছনা। তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার মন সব নির্ভুলভাবে বলে দিচ্ছে তুমি ফিফথ্‌কলামিস্ট। তুমি সেই অনামুখো বজ্জাত লেবার লীডারেরই জাতভাই।

বেটাদের মরবার আর কত বাকী?

কোন বেটাদের!

কোন বেটাদের?–যে-বেটারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে সেই সাদা বেটাদের।

লোকটার মুখ খুলে গেলো : মরবে মশাই মরবে, তাদের অত্যাচার ষোলো কলায় পূর্ণ হয়েছে। সামনের শ্রাবণতক আছে, তারপর একটা দিনও আর হবেনা, চেতাবনী বলেছে। ভাবনা কিছু নেই।

সেই ভরসাতেই তো আছি। বেঁচে থাকতে থাকতে একটা পরিবর্তন–তা জাপানই হোক আর জার্মানীই হোক।

হাঁ হাঁ হবে, পরিবর্তন একটা না হয়ে যাবে না এবার।

পিছু নিয়ে দেখা গেলো লোকটা একটা দরজির দোকানে কাজ করে। গতিবিধি মার্ক করার খুব সুবিধা আছে এখানে এক জায়গাতে।

আরেকটা লোককে অতিশয় চিন্তিত দেখা গেল। মনের ভিতরে নিশ্চয় ষড়যন্ত্র ভাঁজছে। আলাপ জমাবার সুযোগ কম, মেজাজ হুঁশিয়ার। সোজাসুজি কথা বলাই ভাল।

(স্বগতঃ) 'গান্ধী মহারাজের শিষ্য কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব।' খানিকটা বোকামির ভাব খানিকটা জানবার ভণ্ডামি দেখিয়ে বললো : মহাত্মা গান্ধীকে কেমন মনে হয় আপনার।

বুড়ো মনে হয়, ভণ্ড মনে হয়।

আর এম, এন, রায় কে?

ঠিক যেন এঞ্জেল! হয়েছে?

এক লাফে সরে গিয়ে লোকটা হাঁপাতে লাগল। ভাবখানা যেন–জবর পাল্লায় পড়েছিলুম বাবা! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

আর এক কাণ্ড ঘটলো একটা 'হফ কপ' চায়ের দোকানে–যেখানে এক পয়সা কাপের চা বিক্রি হয়। খদ্দর পরা লোকটা অমৃতবাজার হাতে সেই উড়ে দোকানেই ঢুকছে।

গোবিন্দর অপার উত্তেজনা : এই খদ্দরী ভাঁওতার ঝোলায় না জানি কত কেউটে গোখরো লুকিয়ে রেখেছে। লোকটাকে উড়ে চা-ওয়ালাটার পরিচিত দেখা গেল। চা দিতে দিতে কি কথা জিজ্ঞাসা করাতে কি কথা যেন লোকটা জানিয়ে দিল। বোধ হলো আজকের কাগজের একটা খবর। গোবিন্দর মাথাটা বুঝি বিগড়ে যাচ্ছে। দু'জনার স্বল্পোচ্চারিত সংক্ষিপ্ত কথাগুলি তার কানে গেল না। ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে

পড়েছিল। লিকারবহুল চা টানতে টানতে তার তন্দ্রার ভাব আসছিল। সহসা তন্দ্রা ভাঙলো উড়েটার সশব্দ উচ্চ হাসিতে। জোরে হেসে উড়েটা চাপা গলায় বলছে–

কি বলছে বোঝা গেল না। খদ্দরী লোকটা উত্তর দিচ্ছে। কি উত্তর দিচ্ছে তাও বোঝা গেল না। ঠোঁটের কোণগুলি বেঁকিয়ে, চিবুকের দুই পাশ বিশ্রী রকমের কুচকিয়ে উত্তর দিচ্ছে। মুখে যা না বলছে, এই বিশ্রী ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে তার অনেক বেশি কিছু। গোবিন্দ সিল্কের পাঞ্জাবীর হাতায় কপালের বিমূঢ়তার স্বেদবিন্দু মুছতে গিয়ে মনে করল পকেটে তার রুমাল রয়েছে। আরো মনে পড়ল, এ সে কোথায় এসেছে, এখানে তাকে মানায় না।

এটা একটা আড্ডা। দৈন্যের সবরকম শাখা প্রশাখার কস্ নিঙড়ে এখানে ইতরতা বাসা বেঁধেছে। এখানে তাকে মানায় না। কিন্তু এটা একটা ফিফথ কলামিস্টের আড্ডা। এ আড্ডা ভাঙতে হবে, লোকটাকে জেলে পুরতে হবে। এখনি এরেস্ট করানো দরকার। লোকটার অপকর্মের ছাপ তার গায়েই খস্ খস্ করছে। তার চেয়েও বড় প্রমাণ চোখে মুখে জ্বল জ্বল করছে। এখন গোটাদুই পুলিশ হলেই বাস। গোবিন্দর চোখ আবার বুজে আসছে। লোকটা এরেস্ট হয়েছে। কেবল কতকগুলো পাপের ছাপ নিয়ে ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়েনি। কি সব কতকগুলি খারাপ করতে গিয়ে হাতে নাতে ছাপ পড়েছে। তাই তার বিচার হচ্ছে। কিন্তু লোকটা কি মিথ্যুক মাগো। জজের সামনে একধার থেকে সব মিথ্যা বলে যাচ্ছে।

জজ বলছে : সত্য গোপন করছ কেন? লোকটা বলছে : সত্য গোপন করলে কি হয়? জজ : দণ্ড হয়। লোকটা : কিন্তু আপনাদের চার্চিল-আমেরি ভারত সম্বন্ধে চোখ বুজে যা সত্য গোপন করে যাচ্ছে, কই দণ্ড তো হচ্ছে না। জজ বললে পাগল। পুলিশেরা তাকে মারতে মারতে কোর্ট থেকে নিয়ে যাচ্ছে, বোধ হয় পাগলা গারদে। লোকটার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু আর এক কাপ চা না খেলে যে মাথার ঘোর কাটছে না। বুদ্ধির অনুভূতির অস্বচ্ছতা ঘুচছে না। গোবিন্দ জবাফুলের মত লাল চোক দুটি খুললো। লোকটার চা খাওয়া হয়ে গেছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে অমৃতবাজারখানা বগলে করে বিশেষ এক ধরনে পা পেলে বাইরে জনতার মধ্যে হারিয়ে গেল।

লোকটার কিছুই করা গেলনা বলে লেবার লীডারের উপর গোবিন্দর রাগ আরো বেড়ে গেল।

গোবিন্দর যখন এই রকম বিপর্যস্ত মনের অবস্থা, তখন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাই গোবিন্দদের কাজ অনেক বাড়িয়ে দিল। ডিউটির টাইমই কেবল বাড়ালো না, মস্তিষ্ক চর্চার পরিসরও বাড়ল।

ঘটনাটা এই : গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং একদিন শেষরাত্রে টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বোম্বাইতে সমাগত গান্ধীজী সমেত সকল কংগ্রেস প্রধানগণকে গ্রেপ্তার করেছে!

তার ফলে কলকাতায় রাস্তায় ইউরোপীয় পোষাকীদের টুপি আর টাই পোড়ানো হচ্ছে।

পোড়ানো হচ্ছে, এমনিই একদিন দুপুর বেলা দেখা গেল লেবার লীডারকে। দেহে ও মাথায় খদ্দরের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে রিক্সায় চড়ে রাজপথ আলো করে বিজয় গৌরবে

যাচ্ছে। গম্ভীর কোনো রাজা মহারাজার মত—যে রাজামহারাজা দুই পাশের অভ্যর্থনা ও প্রণামের ভিতর দিয়ে রথ চালিয়ে কোথাও যায়।

গোবিন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা কিছু করা প্রয়োজন।

একদল মার্কিন সৈন্য পাইপ টেনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। এগিয়ে এসে গোবিন্দ বলল : হে সাহেবগণ, রাস্তায় পাশ্চাত্য পোষাকের অপমান আপনারা অবশ্যই দেখেছেন। এ অপমান যারা করেছে তাদেরই একটা লোক ঐ দেখুন রিক্সায় করে পালাচ্ছে—ঐ দেখুন তার পরণে খদ্দর, মাথায় খদ্দরের টুপি। আপনারা এগিয়ে গিয়ে রিক্সাখানা থামান, তারপর তার টুপিটা চেয়ে নিন, ওটাকে পায়ে মাড়ান, তারপর পাইপের আগুন দিয়ে পোড়ান। যদি এমনিতে দিতে না চায়, জোর করে ছিনিয়ে নিন, এবং তাকে মারুন।

পাইপপায়ীদের অত কথা শোনার অবসর কই। বক্তার দিকে আড়চোখে একটু চেয়ে আড়ভাবে টুপিপরা তারা পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল। ধোঁয়া শূন্যে উঠে তারপর মিলিয়ে গেল। গোবিন্দর মন ও বুদ্ধি নিংড়ানো অভী—াগুলিও বুঝি এমনিভাবে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কোথায় সার্জেন্ট, কোথায় পুলিশ! সব কিছু একসঙ্গে দেখতে গিয়ে, চোখের প্রসার বাড়াতে গিয়ে কাউকেই দেখা গেল না। লেবার লীডারকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবার ক্ষমতাও যেন সঙ্কুচিত হয়ে এল। সূর্য যেভাবে আলোর রাশগুলোকে সবলে টেনে নিয়ে অস্ত যায়, গোবিন্দর চৈতন্য তেমনি সবকয়টি অনুভূতির রাশ টেনে নিয়ে কোথায় ডুবে গেল। লাইট পোস্টের সঙ্গে একটা সংঘর্ষের ফলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গোবিন্দ—মাথায় একদিক ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে, তাও চোখে দেখতে পেলো না।

অল্পেতে সুস্থ হয়ে একদিন রাত্রে অকারণে গোবিন্দর ঘুম ভেঙে গেল। কতো রাত, তার ধারণা নেই। তবে অনেক রাত বলেই মনে হলো। দূরে খোলা জমিটুকুর শেষ প্রান্তে লেবার লীডারের খোলা জানালা দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে নিশ্চয়ই। ব্লাক আউটের জন্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আভা জানিয়ে দিচ্ছে—সেখানে বাতি জ্বলছে। বাতি যখন জ্বলছে একটা কিছু হচ্ছে নিশ্চয়। লেবার লীডারের ঘরে একটা কিছু হচ্ছে, কাজেই যা হচ্ছে তা সাধারণ একটা কিছু নয়—শুনবার মতো এবং রিপোর্ট দেবার মতো লোভনীয় সেটা, সন্দেহ নেই।

সত্যি সেখানে একটা কিছু হচ্ছিল। দেশ শত্রু-আক্রমণের সম্মুখীন। এদিকে কংগ্রেস আর গভর্ণমেন্ট দুই-ই চরম পন্থা নিয়েছে। ঘরে মহাপ্রলয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের প্রতি যারা বাম, গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাবলম্বনেরও সমর্থন করতে পারছে না, দুই ক্রমপ্রসারমুখী তীরের মধ্যে সেতু বাঁধবার দায়িত্ব আপনা থেকেই তাদের উপর পড়েছে। তাদের আজ বড়ো দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে শত্রু অভিলাষিত স্বদেশের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। স্বদেশের দুর্দিন যদি সত্যি এসে পড়ে পৈশাচিক পীড়নের মুখে দেশের যা অবস্থা হবে, ভাবা যায় না। তারা পূর্বাহ্নে একটা কিছু অবশ্যই করবে। কি করবে তাই আলোচনা করবার জন্য লেবার লীডারের ঘরে এই সময় সমবেত হয়েছে।

কংগ্রেসের প্রতি যারা একান্তই বাম তারা এসেছেন। গান্ধীর অহমিকা যারা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয় তারা এসেছে। কংগ্রেসকে যারা স্নেহ করে কিন্তু দুষ্টু ছেলেকে শাসন করার মতো কংগ্রেসকে শাসন করতে গিয়ে নাম কাটা হয়েছে তারা এসেছে। নিখিল মানবতার মুক্তি ও অধিকার লাভের উপায় স্বরূপ যারা এমন সব মতবাদ পোষণ করে যে, না নাৎসীবাদ না সাম্রাজ্যবাদ কেউ সেটা মেনে নিতে পারে না, তারাও এসেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের গণতন্ত্র নষ্ট হবার উপক্রম দেখে যারা একান্তই বিচলিত হয়েছে তারা এসেছে। মোটের উপর মার্কামারা কংগ্রেসী ছাড়া স্বদেশের ও বহির্দেশের গণ-কল্যাণ যাদের দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্ন; তারা যে যে দলভুক্ত সেই সেই দলের প্রায় সবকয়টি থেকেই এক বা একাধিক করে প্রতিনিধি এসেছে।

অধ্যাপক ল্যাস্কি বিলাতে নব্য চিন্তার যে স্কুল গড়ে তুলেছেন, তারই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে যে-দল মনপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে, এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ, এ যুদ্ধ নাৎসীবাদের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদেরও গোড়া কেটে দিচ্ছে, এ যুদ্ধ সর্বমানুষের মুক্তি এনে দেবে, সামগ্রিক মুক্তি আসার আগে বিশেষ একটা দেশের মুক্তির জন্য এমন কিছু করা উচিত হবে না যার দ্বারা বাধা সৃষ্টি হতে পারে। সেই দলের মতবাদের উপর ভিত্তি করে আলোচনার উদ্বোধন করলেন।

কাউন্টার রিভিলিউশনারী দলের প্রতিনিধি কথাটিকে আরো জোরালো করবার জন্য নিতান্ত বেসুরোভাবে বলে উঠলেন : আর ভারত কখনো স্বাধীনতা পাবে এ বিশ্বাস মনে পোষণ করারই বা কি হেতু থাকতে পারে! স্বাধীনতা দিতে কি তারা না করছে! মাইরি কি খাসা লোক শালা!

এই ভালগার উক্তিতে অসহিষ্ণু হয়ে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির প্রতিনিধি লালগোপাল একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলেন : বিশ্বমানবের মুক্তির বীজ বপন করা হয়েছে সোভিয়েটে। সে বীজ যে ফুলে ফুলে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে পড়েছিলো তাতো গোপন কথা নয়। সবাই জানে তা। পৃথিবীর এমন দেশ নেই যেখানে জনতা, একাংশ অন্তত, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে না উঠেছে।

এর উৎস তারা কোথায় পেয়েছে; কেন পেয়েছে! আর দুই এক দশকের মধ্যে দেখা যেত, ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীর ধ্বসে গেছে। কিন্তু নাৎসী বর্বরতা তা হতে না দেবার জন্য প্রবল বল-সঞ্চয় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কংগ্রেসে যদিও পুঁজিপতিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, তবু সোভিয়েটের প্রতি তার সহানুভূতি অজস্র হয়ে আছে। কাজেই তাকে আমরা নস্যাৎ করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে সেই বিশ্ব-কল্যাণের চারাগাছটিকে সর্বাগ্রে রক্ষা করবার দায়িত্ব তো আমরা ভুলতে পারি না।

তাকে করতে হবেই। নতুবা বিশ্বের বুকে যে আঁধার নেবে আসবে, সে আঁধার দূর করতে অনেক অসাধ্য সাধনের প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

কাউন্টার রিভলিউশনারীদলের প্রতিনিধি এখানে কথা কয়ে উঠলেন : নস্যাৎ করতে পারি না কি বলছেন। নস্যাৎ করতে তাকে হবেই।

কিন্তু জনসমর্থন তো তার পিছনে।

আরে রেখে দিন জনসমর্থন। কাউন্টার রিভিলিউশন ছাড়া কিচ্ছু হবে না। কংগ্রেস ক্ষমতা পাওয়ার পরে একদিন তো তার ঘাড়ে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবেই। কাজেই ক্ষমতা পাওয়ার আগেই, এখন কেন সে কাজটা সেরে ফেলি না।

একথায় কেউ কান দিল না দেখে বক্তা বেশীদূর এগুলো না।

কিয়ৎক্ষণ সব নীরব। সহসা লালগোপাল মনে মনে একটা প্রেরণা অনুভব করলেন। তারপর একটু নৈরাশ্য, একটু ভাববিভঙ্গ। এরই মধ্যে বলে উঠলেন : সারা বিশ্ব যখন আঁধারে মগন, তখন এক কোণে বসে তুমি কি আলো জ্বালছো ভিখারী! কি দাম এ আলোর! বিশ্বাবর্তের একটা ফুৎকারে তা নিভে যাবে।

এইখানে লেবার লীডারকে কিছু বলতে শোনা গেল : আগে স্বাধীনতা, পরে বিশ্বমৈত্রী। তোমাদের ল্যাস্কি গ্রীনউদের কথায় অবিশ্বাস করছি না। বুদ্ধিজীবীদের উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে, তাও মানছি। কিন্তু চার্চিল আমেরির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর তাদের আন্তরিকতার দাম কতটুকু! ক্ষমতা হাতে না নিয়ে কথা বললে, সে কথার গুরুত্ব কই? আর কোনদিন তাদের ক্ষমতা পাওয়া যদি সম্ভব হয়ও, সেদিন তাদের সুর বদলাবে কেন? যেমন অনেকেরই বদলেছে? স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর উপর নির্ভর করো। বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ো না। তারা যখন প্রফেসর, ততক্ষণই মিষ্টি কথা শুনাবে। যখন তারা মন্ত্রী হয়ে বসবে, তখন দেখবে তারা সাম্রাজ্যবাদের এক একটা শব্দস্তম্ভ! তাদের দায়িত্ব অনেক। ভাবপ্রবণের মত্তো কথা বলা বাইরে পোষালেও ভেতরে পোষাবে না। তাই কারো উপর নির্ভর না করে নিজের উপর নির্ভর কর এবং অন্যের দেশের স্বাধীনতার কথা ভাববার আগে নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবো।

রীতিমত চমকিত হবার কথা। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু সেই দিনেরই কাগজে সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর একটি বিবৃতি সকলেরই চোখে পড়েছিল। এরপর কিছু বললে তা দানা বাঁধবে না বলেই যেন একথার প্রতিবাদ হলো না।

সাম্যবাদী দলের নেতা এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলের কথা পাড়লেন : এ মিলন আগে হয়ে গেলে স্বাধীনতালাভের পক্ষে আর কোনো বাধাই থাকতো না। এ মিলনের চেষ্টাই কেন করা হলো না স্বাধীনতা চেয়ে জেলে যাবার আগে?

চেষ্টা করলেও হতো না।—লেবার লীডারের কথায় যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের জোর—কেন হতো না তা তোমরাও জান! আমরাও জানি। আগে সাম্প্রদায়িক মিলনের কাজ শেষ করে পরে স্বাধীনতা চাইবো। কথাটি খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু মিলনতো হচ্ছে না। আর স্বাধীনতার আগে এ তো হবার নয়। মিলনের মাঝখানে যে খাদ কেটে দিয়ে যায়। এ নিয়ে অনেক চিন্তার সদ্ব্যয় হয়েছে। সমগ্র দেশের সকলের জন্য সামগ্রিক যে স্বাধীনতার, তার মধ্যে পাকিস্তান আর না-পাকিস্তান বলে কিছু থাকতে পারে না। স্বাধীন ভারতের মুক্ত আলোবাতাসের প্রাচুর্যের মধ্যে বস্তুতান্ত্রিক দৈন্য যেমন থাকবে না, মনের দৈন্যও তেমনি দূর হয়ে যাবে।

লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে। দেশের সম্পদ দেশে থাকবে। আর, সব জিনিস বাইরে থেকে না এসে দেশে তৈরি হয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করবে। শিল্পে ও সাহিত্যে আসবে রেনেসাঁস নয় জোয়ার। যে যে ক্লৈবিক আবহাওয়া বার বার করে দেশের

স্বাধীনতা বিকিয়েছে, তাকেও আর ফিরিয়ে এনে রেনেসাঁস নাম দিতে পারি না। সেদিন যাতে আর কোনো দিন না আসে, তারি জন্যে হবে নবসংস্কৃতি। তার মধ্যে সম্প্রদায় নিয়ে কলহ থাকবার অবকাশই থাকবে না–মানুষ এতোখানি কর্মতৎপর হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে বলছো! হয়ই যদি একান্ত, হবে। শরীরের কোথাও বিষাক্ত ক্ষত হলে চুলকাতে হয় নখের ঘর্ষণে। কোথাও বিষ যদি জমে, বিষ তারা মানুষ। ওতে অস্ত্রোপচারের কাজ হবে। পচা মাংস হিসেবে যারা খসে পড়বে তাদের জন্য শোক করা বৃথা হবে। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বৎসর যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের সংখ্যা ঐ পচা মাংসের চেয়ে কম নয়। তার জন্য শোক করেও তেমনি লাভ নেই। চাষাতে চাষাতে, জেলেতে জেলেতে, কেরাণীতে কেরাণীতে, পাশাপাশি কাজ করে কষ্টসাধ্যের দরুণ মনের ঐক্য পাবে। স্বার্থবাদী নেতারা তাকে ব্যাহত করতে পারবে না। সুস্থ আবহাওয়া এলে নেতৃত্বের বাহুল্যও অনেক কমে যাবে।

লেবার লীডার এখানে একটা উত্তেজনা বোধ করল।

কোন কোন প্রতিনিধির আরো কিছু বলার ছিল, বলা হলো না। কেউ কেউ প্রস্তুত হয়ে এসেও বলতে পারল না। তাদের মধ্যে কলিকাতার জনৈক সম্পাদক কিছু বলবার উদ্যোগ করেছিলেন। ইনি বিরাট ধনী। গভর্ণমেন্টকে চাউল কিনে দেবার কন্ট্রাক্ট নিয়ে ইনিও ময়মনসিংহে আড়ত বসিয়ে লক্ষ মণ চাউল তুলে এনেছেন। গোড়া থেকে কাজ করে না এলে কংগ্রেসে পাত্তা পাওয়া যায় না। কাজেই সুযোগ না পেয়ে তিনি বামপন্থী হয়ে পড়েছেন। চাউলের মণ ষোলো টাকাতে পৌঁছেছে বলে লোকের অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি তার গরীব কৃষক প্রজার স্বার্থে উৎসর্গীকৃত কাগজে ফসল বাড়াবার জন্য কৃষকদের উপদেশ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদককে দিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়ে চলেছেন। এখন তিনি নিজে গরীবদের জন্য ফান্ডে কিছু দান করতে চান। লেবার লীডারের কোনো কোনো কথায় তাঁর ধারণা জন্মেছে, লোক না খেতে পেয়ে আন্দোলন করছে, খেতে পেলেই আর আন্দোলন করবে না। এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলে লেবার লীডারের সঙ্গে আলোচনার সুযোগই তিনি এতক্ষণ খুঁজছিলেন। এখন লেবার লীডারের সহসা ভাবান্তর দেখে চিন্তিত মুখে তিনি চুপ করলেন।

কিছুই বলা হলো না আরো একজনের। কালাদের উপর ধলাদের যুগব্যাপী অত্যাচারে ক্ষেপেছেন। প্রতিকার চান। বৃটিশেরা ধলা। কিন্তু জার্মানরাও তো ধলা। কাজেই তার আন্দোলনে বৃটিশের গোসা করার হেতু নেই। এই মূল কথাটাই তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারো বলা হলো না কিছুই।

লেবার লীডার অসঙ্গতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সত্যি এমন একটা বিশ্রী সমস্যা জগতের কোনো দেশের রাজনীতির স্বাস্থ্যকে আচ্ছন্ন করে রাখতে দেখা যায়নি। আর, জগতের কোনো পরপদানত দেশই স্বাধীনতা চাইতে গেলে, আগে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মেটাও (এ সমস্যার দরুণ যেন তাদের চোখে ঘুম আসে না, আহা কি হিতৈষীরে) এই বলে গলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়নি। কি জঘন্য ব্যাপার! কিন্তু হিন্দু! তোমার অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কারই এর জন্যে দায়ী। নরে নারায়ণ দেখতে তোমার গুরু উপদেশ দিয়েছে, আর তুমি মানুষকে মানুষই মনে করতে পারনি। মানুষ তোমাকে ছুঁলে

মনে করেছ তোমার জাত গিয়েছে। মনুষ্যত্ব গিয়েছে। মানুষকে ঘৃণা করে তুমি নিজে কতদূর অমানুষ হয়েছ ভাবতে পার কি? আজ স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে যেই দেখেছ এরা তোমার পথের কন্টক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই, শুধু সমস্যা মেটাবার জন্যে এদের দিকে হাত বাড়াচ্ছো। তোমার এই প্রয়োজনের সহৃদয়তায় হাতে ধরবে তারা কোন বিশ্বাসে? তোমার সেই অমানুবিক বিধানগুলিকে নিয়ে আজ তুমি কোথায় যাবে? কে তোমার ঐ বস্তা পচা মনুস্মৃতির কদর করবে? দুনিয়া পরিবর্তনশীল। শত বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে শত শত আঘাত সংঘাতের জ্বালা বুকে করেও পৃথিবীটা এমন এক দিক লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে মানুষের মানুষকে অমানুষরূপে ভাবার, অমানুষ করে রাখার জান্তব আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় লুটাচ্ছে। সেখানে তোমার মানুষ বিদ্বেষের খবর অবশ্য পৌঁছাবে যাদের অপমান করেছ, আজ শুধু অপমানে তাদের সমান হলেই চলবে না, অপমানের নথিপত্র পুড়িয়ে দিয়ে তোমাকে তাদের পায়ের তলায় দাঁড়াতে হবে, তাদের পদাঘাত ভৃগুপদচিহ্নের মত বুকে করে তাদের ওঠার সিঁড়ি করে দিতে হবে।

উত্তেজনায় লেবার লীডারের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। মনে হচ্ছিল ঘরের বাতাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। হিন্দুর যে জঘন্য মুসলিমবিদ্বেষ, তখন নরঘৃণাবৃত্তি দীর্ঘকাল দেশের সহযোগের আবহাওয়াকে পঙ্কিল করে রেখেছিল–তারই স্মরণ যেন ঘরের স্বাভাবিক আলোবাতাসকে ভারি করে তুললো। লেবার লীডারের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চোখে ভালো করে সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। সর্বদা ইতর ভাষা প্রয়োগ করেছ, যার সঙ্গে মনের মিল রয়েছে, তাকেও তামাক দিয়ে আপ্যায়ন করার পর হুকার জলটুকু ঢেলে দিয়ে তাকে অপমান করেছ। তার স্পর্শ থেকে সর্বদা সন্তর্পণে আপনাকে রক্ষা করেছ–আহাম্মক তুমি, মনে করেছ তুমি ছাড়া সবাই পাপী, তাদের ছায়া মাড়ান পাপ, এতে করে নিজের যে পাপের বোঝা বাড়িয়েছ, তারই প্রতিক্রিয়ায় আজ তুমি বিপর্যয়গ্রস্ত।

লেবার লীডার দুই হাতে কপালের দুই দিক চেপে ধরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য দরজার বাইরে পা দিল, ইচ্ছা হল বাইরের খোলা বাতাসে এক মিনিট পায়চারি করে যায়। গোবিন্দ এর প্রতীক্ষাই করছিল এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে। লীডার বাইরে পা দিয়ে বাঁ পাশে ঘুরে কয়েক পা এগিয়েছে, গোবিন্দ হাতের দা খানা দুই হাতে উঁচু করে তুলে লেবার লীডারের ঘাড় লক্ষ করে সজোরে মারলো। মাথায় না পড়ে দা খানা তার কাঁধের উপর বসে গেল।

কে? কে? গোবিন্দ? আরে ব্রুটাস তুই? এই বলে মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি বসানো দা খানা ডান হাতে জোরে টান মেরে তুলে ফেললো। যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ তার রুদ্ধ প্রায় স্বরে বলে উঠলো : গোবিন্দ! যেদিন থেকে এ পথে পা দিয়েছি সেদিন থেকেই ধরে রেখেছি, জীবন আমার বিঘ্নময়। এ জীবন একদিন এ পথে হারিয়েও যেতে পারে। কিন্তু তা যে তোর হাতে হবে, অতদূর অবধি আমার কল্পনা যায়নি। পচা শামুকে পা কাটার দুঃখ নিয়ে মরতে যে আমাদের অতিশয় ঘৃণা গোবিন্দ। তুই পালা গোবিন্দ। তোকে আমি দেখতে পারছিনা। আমার জ্বালার চেয়ে তোকে দেখার জ্বালা অধিক পীড়া দিচ্ছে। তুই পালা ওরা দেখে ফেললে এখানে আরো একটি নরহত্যা হবে, তা আরো বেশি পীড়া দেবে। তার আগে তুই এখান থেকে পালা।

এত কথাতেও গোবিন্দ পালাতো কিনা কে জানে। কিন্তু বজ্রহস্তের একটি ধাক্কা তাকে এমনি সচেতন করে দিলো যে, গোবিন্দ সত্যি পালাতে লাগলো।

পালাতে লাগলো সত্যি। কিন্তু একটু পরেই রক্তপ্লাবিত নিজের পদতলের ভূমিটুকুতে রক্তমোক্ষণে অসাড় লেবার লীডারের নাতিক্ষুদ্র দেহখানা যে লুটিয়ে পড়ে গেল, একটু আগে তা দেখতে পেলে গোবিন্দ পালাতে পারতো না ঠিক। সেই রক্তরঞ্জিত মাটির উপর সেও বিমূঢ়তায় গলে পড়ে যেত।

* * *

লেবার লীডার হাসপাতালে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগুচ্ছে। জবানবন্দীতে আগেই বলে দিয়েছে; রাত বেরাতে চলি, কখন কে কি ভেবে এসে মেরে দিয়ে গেছে, জানবো কি করে। তাছাড়া আমি হয়ত কাউকে শত্রু বলে স্মরণ করতে পারছিনা, কিন্তু সে জন্য, আমাকেও সে শত্রু মনে করতে পারবেনা তার যুক্তি নেই। সংক্ষেপে লিখে রাখো, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, যে মেরেছে সেও নয়।

* * *

যেদিন সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হলো, সেদিন সকালে তার সকল যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল। চোখে মুখে একটা প্রেরণার জ্যোতি, হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এমন উজ্জ্বলতা দেখে ডাক্তার ও নার্স সেই মামুলি প্রবাদবাক্যের দ্বারা সবটা মীমাংসা করে নিয়েছিল–এ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ ঝল্‌কানি।

কিন্তু কোনো সুবিজ্ঞ মনস্তাত্বিক পণ্ডিত কোনো খাঁটি লেবার লীডারের মনোবিশ্লেষণ করত যদি, সে কি এ আলোককে কোনো মীমাংসার, কোনো জটিল সমস্যা সমাধানের আলোক বলে মনে করতে পারত না?

তার স্বচ্ছ জ্ঞানের মুকুরে কি এই প্রশ্নের প্রতিফলন জাগেনি : পশ্চাতে আমি কি রেখে যাচ্ছি।

রেখে যাচ্ছি অনেক গোলমাল। অনেক জটিলতা, অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন, অনেক অসমাহিত সমস্যা। দেশের মধ্যে দুইটি প্রবল শক্তি। দুইটিই চরম পন্থা নিয়ে দুই বিপরীত মুখে চলেছে। এক শক্তি তার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা দাবি করে মরণপণ করেছে অপর শক্তি সে দাবীকে অগ্রাহ্য করার সদ্‌যুক্তি না পেয়ে নির্মম হয়ে উঠেছে–তাই দেখে উৎসাহিত হয়ে শত্রু দিন গুনছে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই দুই শক্তির মধ্যে সংযোগ ঘটাবে কে? যে সংযোগ প্রীতির বাঁধন দিয়ে সাধিত হতে পারত, সাম্রাজ্যবাদী কারবারের তহবিলে কিছু ঘাটতি পড়ার আশঙ্কা দেখে সে সংযোগেচ্ছাকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে। প্রেমের সঙ্গে মর্দিত হওয়ার জন্য, বাঁচবার কামনা নিয়ে যে-কর মর্দিত হওয়ার জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল, সেই সহযোগিতার হস্ত মুচড়িয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে ইলাষ্টিক হাত ভাঙতে জানে না, কাজেই ভেঙে দিয়েই তাকে অকর্মণ্য করার চেষ্টা বৃথা হয়েছে। আর যে শক্তি তা

মুচড়ে দিয়েছে তারও শিরায় এমন রক্তের স্রোত বইছে যে-রক্ত অফুরন্তভাবে সংগ্রহ করার ছাড়পত্রখানা তার কপালে আপনি একদিন অতি সহজে লেখা হয়েছিল।

শক্তিদুটির একটি নিঃশেষিত হয়ে অপরটির নিকট আত্মসমর্পণ করবে তা হবার নয়, হতে পারে না। তাদের চূড়ান্তকাল পর্যন্ত পরীক্ষা চালানোরও সময় নেই। যে আঘাত হানছে তাকে বাধা দেবার জন্য দুটি শক্তির সমন্বয় প্রয়োজন। কিন্তু এ সমন্বয় ঘটাবে কে?

যে-শক্তি দেশের আত্মার অণুপরমাণু থেকে রস সঞ্চার করে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, রাজরোষে সে-শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিক, কোনো দেশপ্রেমিক তা চায় না। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। দেশের প্রাণ-কেন্দ্র থেকে সে-শক্তি উৎসারিত হয়ে দাবি জানিয়েছে স্বাধীন হওয়া আমার জন্মগত অধিকার। আমি স্বাধীন হব। সে-শক্তি নির্মল। তার দাবী অমলিন। মানুষের অধিকার হরণের দায়ে সে-শক্তি অভিযুক্ত নয়, মানুষের মনুষ্যত্ব অস্বীকারে সে শক্তি কলঙ্কিত নয়। মানুষকে সে-শক্তি মানুষরূপে বাঁচতে দেবার দাবী ঘোষণা করছে কম্বুকণ্ঠে।

সে-শক্তি স্বাধীনতার জন্য বিপরীত শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে বহুকাল থেকে। আজ আর এক শক্তি দেশের হৃত স্বাধীনতার উপরেই আগুন জ্বালাতে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে দেশে দ্বিমুখী এক সাংঘাতিক সমস্যা। এ জটিল সমস্যার সমাধান পথ বেছে নেওয়া শক্ত। যে-শক্তি পূর্ব থেকেই দেশকে দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়ে রেখেছে, সে-শক্তি বলছে, যে-শক্তি দেশকে পরাধীন করতে আসছে তাকে ধ্বংস করব।

হে মানুষেরা, তোমরা এই স্বাধীনতা হরণকারীর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সহায়তা কর, বর্বরদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। তারা ধ্বংস হোক। তারা গণতন্ত্রের শত্রু, তারা স্বাধীনতার শত্রু, তারা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার শত্রু—। ধ্বংস হোক তাদের মন্দ অভিপ্রায় এই আহ্বান দেশে নবজীবনের প্রেরণা দিতে পারত। আশা ছিল, মানুষের পরাধীনতার বিরুদ্ধে যাদের অভিযান, তাদের সর্বানুকূল্যে সহায়তা করব, নিখিল মানব মুক্তি পাবে, কোন দেশ কোনো জাতি পরাধীন থাকবে না। সামগ্রিক মুক্তি এসে সমগ্র বিশ্বে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু হায়, কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা কেমনে ভুলে যাই! কেমনে ভুলে যাই আমার হাতে পায়ে সাম্রাজ্যবাদের ফাঁস।

যে-হনুমান আমাদের গলায় লেজ পেঁচিয়েছে—ঘুরিয়ে সাগরে ডুবাক, আকাশে তুলুক, টেনে হেচড়ে কাঁটার উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলুক—তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ সবকিছুই সইতে হবে– আমরা মুক্তি পাব না। সকল দেশ সকল জাতি স্বাধীনতা পাবে। ফাঁস শুধু থাকবে আমাদেরই গলায়। এই ফাঁস নিয়ে কেমন করে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব? সে মুক্তমন, মুক্তবুদ্ধি পাব কোথায়, কোথায় পাব যুঝবার অবাধ অধিকার?

প্রশ্ন জাগল : আগে আমাকে স্বাধীন কর। স্বাধীন হয়ে আমরা তোমাদের সর্বাঙ্গিক জয়কে সাফল্যমণ্ডিত করব। দেখতে পাবে, তখন আমাদের শক্তি কত বেড়ে যাবে, তোমাদের শক্তি কত বেড়ে যাবে। আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতার প্রয়োজনে যুদ্ধ করছি,

কেবল তোমাদের সাম্রাজ্যাংশ রক্ষার প্রয়োজনে নয়, এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে দাও, প্রাণে আমাদের আগ্নেয় আত্মবিশ্বাস জাগতে দাও। উত্তর এল সে-কথা বিবেচনা করব যুদ্ধের পরে। এখন বিব্রত করো না, যাও।

কিন্তু এ উত্তরে তারা আশ্বস্ত হতে পারল না। তোমাদের প্রতিশ্রুতির দাম যে কত তা তোমাদের অতীত কার্যকলাপে প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধের দায়িত্ব নিজেদের করতলগত না রেখে আমাদের হাতেও দাও, আবার দেশরক্ষার যুদ্ধে আত্মদানের যে মাধুর্য যে মর্যাদা তা থেকেও আমাদের বঞ্চিত করো না। দেশটা আমাদের, এর ভালোমন্দের সঙ্গে আমাদের কপাল যতোখানি জড়িত, তোমাদের কপাল ঠিক ততোখানি জড়িত নয়। তোমরা ভাড়া করা দেশরক্ষক। ঋণ করে টাকা এনে পরদেশ রক্ষার্থে ঢালছো কোন স্বার্থে? তোমাদের চেয়ে আমাদের দায়িত্ব অধিক। আমরা ফ্যাসিস্ত কবলিত হলে তাঁর বেদনাময় ফলভোগ আমাদেরই যতোখানি করতে হবে তোমাদের ঠিক ততোখানি করতে হবে না। যে শৃঙ্খল পরিয়ে আছো, তা তুলে নিয়ে আমাদের বাঁচতে দাও, দেশকে বাঁচতে দাও।

বাইরে শরতের সোনালী রোদ। ভিতরের পরিচ্ছন্নতাকে সে রোদ ম্লান করে দিয়েছে। লেবার লীডারের মন সেই রোদের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে নির্মল নীলাকাশে উধাও হয়ে গেছে যেন : কিন্তু তারা শুনলো না সে কথা। কে শোনাবে তাদের সে কথা? কে দেবে তাদের পরাধীনের প্রাণের দাবী পূরণের সদ্বুদ্ধি? কাল? মহাকাল? কিন্তু তার পথ যে অনেক দূর! উদার আকাশের ছায়াপটে সমুদয় বিশ্বজগৎ যেন একটা স্বপ্ন হয়ে রূপ ধরেছে : যে-দাবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে দাবীর কণ্ঠরোধ হবার নয়। পরকে পদানত করে রাখা যে দুর্মদতা, তার শক্তি তো অধিক দূরপ্রসারী নয়। দিন ঘুরলে কলের চাকা ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিচ্ছে—কে তুমি পরকে গ্রাস করছ, কে তুমি পরকে গ্রাস করে বসে আছ?

ফাটল ধরেছে তোমাদের অট্টালিকার ইটের জোড়ায় জোড়ায়। এটা জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধ অধিকারের বিরুদ্ধে অনধিকারের। সর্পসমূহের বিরুদ্ধে খাদ্যগণের। তারা আর তোমাদের মুখের গ্রাস হয়ে থাকবে না। তারা নড়ে উঠেছে, নড়ে উঠেছে তোমাদের দম্ভের আসন। তোমাদের মর্মান্তিক প্রেস্টিজের আসন। এ-যুদ্ধ তোমাদের অসির ঝনঝনার নয়, কামানের গুডুম গুড়ুমে নয়, বোমার ব্যোমবিদারী গর্জনে নয়, এ যুদ্ধ মানুষের মনে মনে।

ফ্যাসিস্তবাদ গলছে। সাম্রাজ্যবাদ গলছে। গলে গলে ক্ষয় হয়ে পড়ছে।—সেদিন আর দূরে নয়।

সাম্রাজ্যবাদের যে কয়জন তল্পিদার স্বকোপলকল্পিত মহিমার গাম্ভীর্যে গম্ভীর হয়ে সাগরপারে বসে বিধান দিচ্ছে, বলছে—বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেউলিয়া উৎসবে সভাপতিত্ব করতে প্রধানমন্ত্রী হইনি, কেউ বলছে, আমাদের কলোনিগুলোকে নিয়ে আমরা স্বাধীন হবো—আর নতুন কলোনি জুড়ব না। কিন্তু যা আছে তাও ছাড়বো না—কতদূর তাদের শক্তির বহর। কি ক্ষমতা আছে তাদের, মানুষের ন্যায্য দাবী পদদলিত করে অধিককাল গদী আঁকড়ে বসে থাকবার। কি অধিকার আছে তাদের, বিরাট জনতার মিছিল থেকে

সাম্রাজ্যবাদের খড়কুটাটুকু আকড়ে ঘরে রেখে দেবার?—লেবার লীডারের মনে হচ্ছে, তার আয়ু ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে : কিন্তু, কিন্তু সে যে অনেক দূরের কথা! কালের প্রতীক্ষায় কাটাতে গিয়ে ততক্ষণে আমাদের যদি সর্বনাশ হয়ে যায়।

স্বপ্ন আবার ঢেউ খেলায় : সাম্রাজ্যবাদের আপাতশক্তি কতদূর? হায়, সকল সদিচ্ছা এখানে মাথা খুড়ে মরছে। সাগর তরঙ্গকেও শাসন করার জন্য এ শক্তি রাজদণ্ড উচিয়ে রেখেছে। এই চক্রের বাইরে যারা থাকে—তাদের দৃষ্টিকে অতি সহজে কোনো কিছুতে আচ্ছন্ন করতে পারে না। তারা মুক্ত চক্ষুতে সবকিছু দেখতে পারে। কিন্তু যারা সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রে প্রবেশ করে, তারা সহসাই মহাদায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। ভাবে সর্বপ্রযত্নে এ তক্তাউস রক্ষা করতে আমরা নৈতিক বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ। তারা দুর্দান্ত হয়। তারা একে রক্ষা করার জন্যে জান কবুল করে।

এরজন্য তারা অতি সহজে মৃত্যুকেও বরণ করে (হায়, পরের দেশকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখবার জন্য তারা যত সহজে প্রাণ দেয়, নিজের দেশের দাসত্ব মোচন করতে গিয়ে আমরাও যদি অতি সহজে প্রাণ দিতে পারতাম)। এ তাদের আনন্দ। একে রক্ষা করায় তাদের সুখ। তাই এর মায়া তারা ছাড়তে পারে না। সাম্রাজ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কল্পনাতেও তারা শিউরে ওঠে। এ তাদের মনের পরমাণুতে রস দিয়ে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদ তারা ছাড়বে না কোন কালে, যতদিন ইংরাজ জাতি থাকে ততদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে।—

বাইরের রোদ জ্বালাদায়ক হয়ে উঠেছে। সূর্যটা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তার মধ্যে থেকে স্নিগ্ধতাটুকু বিদায় নিয়েছে। এই সূর্যের সঙ্গে তার আয়ুসূর্যও ডুববে। সূর্য পশ্চাতে রেখে যায় আঁধারের ব্যাপ্তি। তার পশ্চাতে শুধু জটিলতা, আর জটিলতা। এ জটিলতার সমাধান কি নেই? কতকগুলো বামপন্থীদল চলতি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরকে পরাধীনকারী শক্তির সঙ্গে যুঝছে। তারা চিরকাল সাংঘাতিক ছিল। আজ তারা সাংঘাতিক কিনা এর চুলচেরা বিচার করার ক্ষমতা, আগে তাদের যারা সাংঘাতিক বলে খাঁচায় পুরেছিল তারা করতে পারছেনা। যুদ্ধের শনৈঃ শনৈঃ মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাবু করা যেন ক্রমেই বেকায়দা হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মনে হচ্ছে তাদের যুঝবার শক্তি সহজে পর্যুদস্ত করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। এদের দিকে চেয়ে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা অসম্ভব নয়।

একদল চাইছে বিশ্বমানবতার জয়। চাইছে, বিশ্বের পুঁজি ধ্বংস হোক, বিশ্বের লোক শোষণ অনাহার ও দুঃখভোগ থেকে মুক্তিলাভ করুক। এরা বামপন্থী। কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেসের এরা সব ছোট ছোট খুটী। কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে দেশে শক্তি সঞ্চয় করেছে, আর এরা ভেতরে ভেতরে সাম্রাজ্যবাদে ফাটল ধরিয়েছে। শ্রমিকদের জাগিয়েছে, কৃষকদের জাগিয়েছে, জাগিয়েছে সর্বহারাদের। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই কেবল নয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এরা জাগিয়েছে গণচেতনা। এরা কতবার জেলে গিয়েছে, মার খেয়েছে। জীবনের সকল সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘৃণিত দারিদ্র্যের মাঝে সন্দেহসঙ্কুল অন্তরীণ জীবন যাপন করেছে। নির্বাচনে এগিয়ে আসতে, প্রকাশ্য জনসভায় পুষ্পমাল্য গ্রহণ করতে, করতালি কুড়াবার জন্য এগিয়ে আসতে এদেরকে

দেখা যায়নি। জনসাধারণ বাইরের দৃষ্টি দিয়ে এদের চেনবার সুযোগ পায়নি। সর্বহারা জনগণ যা চায় তাই এরা বুক দিয়ে করে এসেছে। এরা নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অণুপরমাণুতে শক্তি সঞ্চার করেছে, ভক্তের টানে যেমন ভগবান নেমে আসে, এদের টানে তেমনি জাতীয় কংগ্রেস ধনবাদ থেকে গণবাদে নেমে এসেছে। এদের অতীত অসহযোগের মধ্য দিয়েও গৌরবে জ্বলজ্বলায়মান।

ওরা আজ কারাগারে। ওরা কারা? অনেক নির্যাতন সয়েছে, অনির্বাণ দুঃখ বরণ করেছে। আগ্নেয়শুদ্ধির মধ্য দিয়ে অহিংসা বজায় রেখে সংগ্রাম করেছে। ওরা আজ কারাগারে। ওরা কারা? প্রত্যক্ষ গণ সমর্থনে স্বাধীনতা আনয়নের দায়িত্বে অভিষিক্ত এরা। ওদের সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করে, প্রাণের ডালায় সাজিয়ে উপহার দিতে এগিয়ে আসে ওদের আহ্বানে। কিন্তু সত্যি ওরা কারা? ওরা যে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র গঠন করে, তা হয়তো পুরোপুরি শ্রমিকরাজ হবে না। সাম্যবাদী রাষ্ট্র হবে না। এ শাসনতন্ত্রে হয়তো পুঁজিপতিদের স্থানও হয়ে যাবে। এরা ধর্মকে ভুলতে পারবে না, মানুষকে ভগবানের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারবে না। ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরাজ স্থাপিত হবে যখন, তখন হয়ত এর গণতন্ত্রের সঙ্গেও সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ তখন হয়ত বিশ্বের সঙ্গে সমন্বয় রেখে একেও নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। কিন্তু তবু, এ এনেছে পরাধীন জাতির মুক্তি। এর প্রতিভার তুলনা নেই। সম্মান দিয়ে এর ঋণ পরিশোধ করা যায় না। এর ত্যাগবরণ সর্বকালের বরণীয়।

লেবার লীডারের আয়ুসূর্য অস্তগমনের অধিক বাকী আর নেই। স্বপ্ন গাঢ়তর হয়ে আসছে : বিশ্ব চায় শান্তি। কিন্তু তবু এরা আনে দুঃখ। দেশগুলিকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে তার উপর উল্লাসের নাচন নাচবার জন্য এরা জ্বালায় আগুন। এরা অশ্রদ্ধেয়। পরের অধীন থাকবো না, পরকে অধীন রাখবো না, শুধু এই মন্ত্রের মধ্যেই বিশ্বশান্তি বিরাজিত। এর জন্য চাই অহিংসা। ঘুরে ফিরে সেই মানুষটির চোখে ভেসে উঠছে–ত্যাগের মহিমা, যার তুলনা নেই। বিশ্বের প্রত্যেক মানুষকে অকৃপণ আশীর্বাদ প্রদানে যার চিত্ত অজস্রতায় ভরে ওঠে। তার চেয়ে বড়ো সাম্যবাদী কে?

স্বপ্ন আরো গাঢ়তর হয় : ঐ ঐ শোনা যাচ্ছে প্রবল কলোচ্ছ্বাস। প্রচণ্ড সলিলোচ্ছ্বাসের মতো জনোচ্ছ্বাস প্রশস্ত রাজপথ মুখরিত করে চলেছে। মানুষের বিরাট এক শোভাযাত্রা। মাঝখানে কাকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! যাকে নিয়ে যাচ্ছে তিনি কি এত কলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও বোধাতীত হয়ে বিশ্বচৈতন্যকে বন্দনা করেছেন। মুখে তার প্রশান্ত হাসি! বিরাট ব্যাপক কর্মযোগের পরের ক্লান্তির ছায়া সে হাসিকে ম্লান করে দিচ্ছে না। শীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি, তার থেকে উচ্ছ্বসিত জনতার উপর আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে।

নিম্নে জনতা কলরোল তোলে : জনগণমন অধিনায়ক জয় হে।

লেবার লীডারের স্বপ্ন আর ভাঙে না। মহাস্বপ্নের সঙ্গে তা মিলিয়ে একাকার হয়ে যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুড্‌বাই, জীল!

অতি প্রত্যূষে টমের ঘুম ভাঙে। অনলসগতিতে খনিকক্ষণ প্রাতঃভ্রমণ করা তার অভ্যাস।

টম যখন পথে নেমেছে, পথে নামাই যাদের বিলাস নয় এমন কেউ তখনো পথে নামেনি। দিবার একটুখানি ক্ষীণ আভাস দিয়েছে, কিন্তু, রাত্রির ঘোর তখনো কাটেনি।

এমনি সময় যারা পথ অতিক্রম করে, দিনের আলোতে তাদের দেখা যায় না, দেখলেও চেনা যায় না।

কত বড় একটা নোংরামির সারা গায়ে একটা রেশমী আবরণ টেনে তাকে জীবনের সঙ্গে আমরা মানিয়ে নিয়ে চলি। রাতের অন্ধকারে তার প্রস্তুতকার্য চলে, দিনের আলোতে সে সভ্যরূপ নিয়ে দেখা দেয়।

রাত্রিতে কসাইখানায় শত শত পশুর প্রাণ-সংহার হয়। পশুগুলি মানুষদের নিকট পরাধীন। মানুষগুলির মগজে আছে বণিক বুদ্ধি, হাতে আছে ছুরি, আরেক হাতে লাঠি। পশুগুলির আছে নিজ নিজ কণ্ঠ–সেই কণ্ঠের জন্য আছে রজ্জুবন্ধন, আর আছে খড়গ। ভগবদ্দত্ত শৃঙ্গের গৌরবে যখনই সে উত্তেজিত হয়, তাকে শায়েস্তা করার জন্য, তাকে বলির জন্য প্রস্তুত হতে যে শান্তভাবের প্রয়োজন সে-ভাব আনয়নের জন্য, মানুষের হাতে যে যষ্ঠী আছে তাই যথেষ্ট। কারণ দড়ির জন্য লাঠির জোর দুর্বার হওয়াটা ন্যায়শাস্ত্রের বিধান।

একটা গরুর গাড়ি চলেছে। ক্যাঁচ্ ক্যোঁচ্ ক্যাঁচ্‌র করে একটানা শব্দ হচ্ছে। পিছনে নিচের দিকে একটা লণ্ঠন বাঁধা–তার আলোতে চলন্ত আবর্তনশীল চাকাগুলির যে ছায়া বড় হয়ে দূরে গিয়ে পড়েছে–চলন্ত গাড়ির সঙ্গে তাও আবর্তিত হয়ে চলেছে।

অনেকগুলি গরুর মাংস দুইটা গরুতে বয়ে চলেছে। গরুরা মানুষ নয়। কিন্তু গন্ধ নেবার শক্তি তাদের ঠিক মানুষেরই মতো থাকতে আপত্তি নেই। তাদেরই মাংসের বোঝা তাদের বইতে হচ্ছে–যে মাংসের গন্ধ গিয়ে লাগছে তাদের নাকে। শরীর যখন শিউরে উঠেছে, পা দুটি যখন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে–তাদেরও মাংস দুদিন পরে আর দুটো অজানা গরুতে বইবে এ সামান্য চিন্তাটুকু মনে এসে তাদের যখন নিমেষের জন্য বিমনা করেছে, তখনই গাড়োয়ানের লাঠির গুঁতো এসে সচকিত আর সচল করে দিয়েছে বোকা গরু দুটিকে।

যদি তারা থেমে যায়–যদি তারা আর এক পাও এগুতে না চায়, যদি তারা বিদ্রোহ করে, হুড়মুড় করে গলার বাঁধন ছিঁড়ে কাঁধের বাঁশটা ফেলে দিয়ে একদিকে ছুটে চলে যায়, নয়তো শিঙ উঁচিয়ে গাড়োয়ানটাকে তাড়া করে আসে!

পাগল—তা কি হয়! গাড়োয়ানের হাতে অত বড় লাঠিটা আছে কিসের জন্যে? হোক তা নিজেদের মাংস, তবু বইতে তাকে হবেই। দাঁড়াতেও পারবে না, চলতে তাকে হবেই, চালক তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেই।

ক্রস্‌ওয়ার্ডের একটা জটিল প্রব্লেম সল্‌ভ করার আনন্দে যেন টমের মন খুশি হয়ে উঠেছে এমনি সগর্বে পা চালিয়ে প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ফেলল।

একটা লাল বাড়ির আঙিনায় প্রভাত নেমেছে। ভৃত্য তার শ্বেতাঙ্গ স্বামিনীর কুকুর escortকে সকাল বেলাকার হাওয়া খাওয়াচ্ছে—কুকুর এক একবার দূরে সরে যাচ্ছে আর ভৃত্যপ্রবর ডাকছে, কুম্‌ আন্‌ টম, কুম্‌ আন্‌। ভৃত্য পশ্চিমা ইন্ডিয়ান।

টম চলার গতি এখানে শ্লথ করল। নিরক্ষর ভৃত্যের এই অক্ষম পরভাষা অনুকরণ এত ভালো লাগল তার কাছে যে, শ্বেতাঙ্গিনী রুমাল চুরি করেছে জানতে পেরে তন্মুহূর্তেই ভৃত্যকে যখন এসে শাসাতে লাগলো, টম সোসালিস্ট হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে মেমকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললো, আহা মেরো না মামী, মেরো না, রুমাল ওর ছিলনো বলেই বেচারি চুরি করেছে, ওর থাকলে কি আর চুরি করতো?

দুপুরে পথে নেমে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। সবকিছু ভুলে গিয়ে আজ গোবিন্দকে টমের ভালোবাসতে ভালোলাগতে লাগলো।

'হ্যালো গোবিন্‌ডো', 'হেলো টমে'র পরে গোবিন্দ বললো, দ্যাট লেবার লীডারের কথা মনে আছে ত? তাকে আমি খুন করেছি।

তুমি? করেছ? কিন্তু যা চমকাতে পারো তুমি গোবিন্দ! ঠিক যেন সত্যি কথা বলছো, এমনি করে তুমি সব যা তা বলতে পার।

বিশ্বাস হলো না ত? বেশ! যাও তবে কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে মাথার টুপিটা দান করে এস।

তা না হয় যাব, কিন্তু আপাতত চলো একটা রেস্তঁরাতে।

দরকার নেই।

কি দরকার নেই? চা খাবে না?

দরকার নেই।

বিয়ার খাবে না?

দরকার নেই।

অনেকদিন জেনের সঙ্গে দেখা নেই। চলো তাকে নিয়ে একটু স্ফূর্তি করি—

দরকার নেই।

দরকার নেই, নেই, নেই—তোমার কি কিছুরই দরকার নেই?

আমার কিছুরই আর দরকার নেই—সব দরকারের মাথায় দা মেরে আমি—হা হা হা....

সে চলে গেল। তাকে বাধা দেবার সাহস হলো না টমের—তার চোখ দুটি যা লাল!

তবে কি সত্যি—

টম চিন্তিত মনে ধর্মতলার দিকে পা বাড়াল। আজকের ভোর থেকে এই সকাল পর্যন্ত সময়টা খুব মূল্যবান। মাত্র সাতটি ঘণ্টা। ঘণ্টা মোটে সাতটি হলে কি হবে, এর দাম অনেক। সময়ের দৈর্ঘ্যই কেবল বড় কথা নয়—ঘটনার প্রাচুর্যই কেবল বড় কথা

নয়। অনেক দিনের সশস্ত্র আয়োজন চূড়ান্ত মীমাংসা এনে দেয় শুধু কয়েকটি ঘন্টাতেই নয়, কয়েকটি মিনিটেই। সারাদিন চলে তলোয়ারের খেলা–আঘাত আর প্রত্যাঘাত। তার দাম যাই থাক, শেষ সময়ের যে একটি কোপ সকল সন্দেহের নিরসন করে দেয় তার দাম প্রত্যক্ষ। সময়ের স্বল্পতায় কি যায় আসে, ভাবের ঘনত্বটাই বড় কথা।

সাতটি ঘণ্টা টমকে অনেক সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছে। তিনটি মাত্র ঘটনা। তারই শিখা তার মনের তলদেশে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জীল, তুমি ভ্রান্ত হও আর নাই হও, তোমার কথাগুলি শ্রদ্ধেয় নয়। তোমার কথাগুলি মোলায়েম শোনালেও, তাতে বোধহয় কোন অষ্টবর্গের ফল আপনা থেকে হাতে এসে পড়বে না।–তোমার সঙ্গে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়াই ভালো।

দুইটি মাত্র গরু। কিন্তু এরা তো তুচ্ছ নয়। চলিষ্ণু জগতে এদের ছেড়ে দিয়ে চলা তো যায় না। এই দুইটি মাত্র গরুতেই বিশ্বের অনেক বড় বড় চিন্তার রাজ্যে ওলোট পালোট এনে দিতে পারে। মাত্র দুটিকে দিয়েই সারা জাতটার বিচার করা চলে। আমাদের বাঁচার জন্য এদের মাংস প্রয়োজন। এদের আছে গলা, আমাদের আছে দড়ি; এদের আছে শিঙ, আমাদের আছে লাঠি। এদের শিঙ ভোঁতা করে দিতে পারি, ভেঙ্গে মুচড়ে, দুমড়ে দিতে পারি, প্রয়োজন হলে নাকের একটা পাতলা স্পর্শকাতর চামড়া ফুঁড়ে সরু দড়ি বেঁধে পিটাতে পিটাতে মাটিতে ফেলে দিতে পারি। শিঙ বাঁকিয়ে এলে উপযুক্ত শাস্তি, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। কি করবে ওরা? সব গরু দল বেঁধে তেড়ে আসবে?

না, তা হয় না গোবিন্দ, তা হয় না। এরা যখন বনে থাকে তখন এদেরকে বনগরু বলে গালিগালাজ করতে পারি–যেমন সিনেমায় দেখেছি, গরুগুলো সভ্য হবার আগে কি রকম বনগরু ছিল, কত আন্‌কালচারড্ ছিল, কত ক্রুট ছিল। তখন তাদের বাগাতে না পেরে গালিগালাজই করতে পারি, এর অধিক কিছু করতে সহজে পারি না। এরা তখন তেজীয়ান। কিন্তু লোহার শিকলের উপর রেশমী সুতার একটা আবরণ দিয়ে কিছু খৃষ্টচর্চিত কারবার এগিয়ে যখন বেঁধে ফেলা হয়–তখনো কি দাপাদাপি! কিন্তু তা আর কতটুকু! একবার যখন Safren gown পরেছে–জোয়াল কাঁধে নিয়েছে, তখন আর ভাবনা নেই। ওদের আছে গলা, আর আমাদের আছে দড়ি।

সৈনিক জীবন সুলভ ক্রুটালিটি পশ্চাতে টমের গত জীবনটা একটুখানি উঁকি দিয়ে গেল। তার সংস্কৃত মন, তার বিদ্বান মন, তার দার্শনিক মন একবার তার অধীত গ্রন্থগুলির দিকে তাকালো। একপাল ছাত্র। ইংরাজ জাতির ভাবী বংশধর–বৃটিশ সম্রাজ্যের ভাবী রক্ষক। সুখদুঃখ আপদ বিপদ অঘটন কুঘটন থেকে অ্যাংলোসেকশন সংস্কৃতির ভাবী ধ্বজাবাহক এরা। এদের গোলাপনন্দিত মুখগুলির দিকে পিছন ফিরে একবার তাকালো। কি শিক্ষা এদের দিয়েছি। মনুষ্যত্বের নামে হয়ত অনেক কিছু শিখিয়েছি। কিন্তু শেখাবার কালে আমি নিজেই একটা কথা ভুলে গিয়েছি যে, ইংরাজ জাতিকে মনুষ্যত্ব শেখাতে হয় না। মনুষ্যত্বের সবকিছু এরা মাতৃগর্ভেই শিখে ফেলে। এদের যখন প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়, তা হয় মনুষ্যত্ব শেখার পরের স্তর থেকে অর্থাৎ কমনওয়েলথ রক্ষা সাম্রাজ্য রক্ষা অ্যাংলোসেকশন জাতির চির অজেয়তা রক্ষা এসব থেকেই হয় তার শিক্ষার গোড়াপত্তন।

তারপর দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস পড়লাম, কিন্তু শিখলাম কি, বৃটানিয়া রুল্স দি ওয়েভস্ দ্রষ্টা কবির এ অমরবাণী কোনো ইংরাজ সন্তানকেই ত ভুলে গেলে চলবে না—বাধাবন্ধনহীন চিরমুক্ত সাগর তরঙ্গকে বৃটেন শাসন করতে পারে, তার নিকট প্রাচ্য বর্বরদের, কালা, অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য ইতরদের স্থান কোথায়? কেন এদের শাসন করবে না, কেন এদের গলায় দাসত্বের ফাঁস পরাবে না অ্যাংলোসেকশন জাতি ?

মনুষ্যত্বের বাধা? কিন্তু কেন এ বাধা? ওরাই বা কোন মনুষ্যত্বের অধিকারী। সার্‌ভাইভেল অব্ দি ফিটেষ্ট-এর জগতে দড়ি হাতে নিয়ে আমরা নিঃশঙ্ক পদচারণা করবই–কি করে এরা গলা বাড়িয়ে দেয় তা কি তুমি বিশ্লেষণ করে দেখেছ জীল? করলে দেখতে পেতে যে মনুষ্যত্বের কথা তুলে তুমি অ্যাংলোসেক্‌শন জাতিকে লজ্জা দেবে ভেবেছ, সে মনুষ্যত্ববোধ এদেরই বা কতটুকু? এ দ্রব্য যদি এদের কিছুমাত্রও থাকতো কেন এরা গলাটা এগিয়ে না দিয়ে কেটে ফেলেছে?—জায়গা রাখতে না পারে তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না কেন? নিজেরা মরে গিয়ে কেন জায়গা দিয়ে দেয়নি? নিজেরাও বাঁচবে, জায়গাটাও দেবে, তবু গলাটা খালি থাকবে, এ কোন দেশী রীতি তোমার জীল!

একবার টম নিজে একটা দর্শনশাস্ত্র লিখে ফেলতে শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনকে গুলিয়ে ফেলে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সেই সময় তাকে সেই অথই সলিল থেকে উদ্ধার করবার কেউ ছিল না। ছিল কতকগুলো ছাত্র, কয়েকটা কামনাজরজর চাকরাণী আর গুটিকয় মাসান্তিক স্কুল-পরিদর্শক। আর ছিল তার নিজের কতকগুলো মতবাদ। এসবের কেউ তাকে উদ্ধার করবার পথে যথেষ্ট ছিল না। অনন্যোপায় হয়ে টম একটা গ্রন্থ লেখা শুরু করেছিল। কি তাতে লিখেছিল যুদ্ধের তাণ্ডবে আজ আর মনে নেই। কিন্তু এই সাতটি ঘণ্টা পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে বসে বৃটিশ কমনওলয়েথের একজন ইন্ডিভিজুয়েলের মনে যে ইতিহাস রচনা করে ফেললো, তারই পশ্চাৎপটে এই বিশেষ ক্ষণটিতে সেই বিস্মৃতপ্রায় পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পৃষ্ঠা এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

টম লিখেছিল : ভগবান দুষ্টু। প্রকৃতিকে নিয়ে খালি দুষ্টুমি খেলছে—যেমন দুষ্টুমি খেলে পুরুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে। প্রকৃতির বয়স— সে কতো দিন! এতোদিনে সে অনেক বুড়ি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চিরপুরুষ ভগবান তাকে বয়সের ছাপ পড়তে দিচ্ছে না—নিত্য নতুন রং ফেরাচ্ছে—শাড়ি পরাচ্ছে, আতর মাখাচ্ছে, স্নো মাখাচ্ছে, তারপর তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে তার থেকে সৃষ্টির রস নিংড়ে নিচ্ছে। বৃদ্ধা প্রকৃতি বলছে : অতো পারবো কেন? ভগবান বলছে : পারতে হবে।

(একটা বায়োস্কোপে টম দেখেছিল কয়েদীটাকে মেরে ফেললে তো চলবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাকে তারা মারছে, আগুনের সেঁকা দিচ্ছে, পাছমোড়া দিয়ে বেঁধে কসুনি দিয়ে কসছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে আবার জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনছে--একেবারে মরে যেতে দিচ্ছেনা!)

তোমাকে মরতে আমি দেব না—তুমি মরলে আমি বেঁচে থাকবো কি নিয়ে! রমণ করবো কাকে নিয়ে? কার রসে আমার যৌবনের বৃদ্ধ দুর্বারতাকে রসিয়ে তুলবো......

কিন্তু জিনিসটা ছিল বড্ড ইমাজিনারি। একে আরো রিয়ালিস্টিক রূপ দেওয়া চাই: ভগবান আজ মরে ভূত হয়ে গেছে। কতকগুলো ন্যায় নীতির নামে, বিশ্বজনীন সঙ্গতির নামে সুপ্রিমিসি করার তার সকল ক্ষমতাই কবে অস্তাচল গুহাশায়ী হয়েছে, এখন পৃথিবীর একটা বিশিষ্ট অংশ তাঁর তাবেদারির ভার নিয়েছে; নিয়ে অনগ্রসর অংশটাকে প্রকৃতি পদবাচ্য করে তাকে খালি সুড়সুড়ি দিচ্ছে তীক্ষ্ণ সঙ্গীনের সেই মর্মান্তিক সুড়সুড়ি খেয়ে সে কালা জগৎ, ধলা-জগতের চাহিদা অনুযায়ী ডিম পেড়ে দিচ্ছে–ধলা-জগৎ তাই লুটেপুটে খাচ্ছে।

কেন খাবে না? গরুরা গরুর মাংসের গাড়ি নিজে টানে কেন? আত্মমাংসগন্ধের বীভৎসতা তাদের নিজেদের কাছে বীভৎস ঠেকে না কেন? প্রত্যেক জীব অভ্যাসের দাস। প্রথম প্রথম হয়ত ঠেকে, কিন্তু পরে জলের মত সরল হয়ে যায়। কোনো জটিলতা আর থাকে না। আর গরুকে দিয়ে গরু মাংস বহাবার কূটনৈতিক চাল গরুদের মাথায় ঢোকে কি? যে গরু আজ গরুর মাংস বয়ে নিলো, তার গন্ধ শুঁকে রপ্ত হয়ে রইল, তার রক্ত দেখে, তার হাড় পাঁজরা নাড়িভুঁড়ি তার বিকৃত জমাট রক্তমাখা মাথাটা, তূরীয় লোকে প্রয়াণকারী চোখ দুটি দেখে অভ্যস্ত হয়ে রইল, হাজার কাটা গরুর মাঝেও তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার গলায় ছোরা এগিয়ে নিয়ে এলেও সে ক্ষেপে উঠবে না, বিভ্রান্ত, বিচলিত হয়ে কোনো একদিকে ছুট দেবে না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু অশ্রুবর্ষণ করবে না–মন ও বুদ্ধি তার একদম ভোঁতা হয়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদী শুভেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণের পরবর্তী দল আজকের দেখা টমের দ্বিতীয় ঘটনা। লোকটা মেশিন হয়ে গেছে। গায়ের কালো রঙটুকু ঢাকবার উপায় নেই বললেই চলে। লোকটা এক শ্বেতাঙ্গ রমণীর অধীনে দাসত্ব করছে। তার সাহেবি কথাগুলি বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করতে শিখেছে। সাহেবি কায়দাগুলি দাসত্বের প্রয়োজনে আয়ত্ত করার চেষ্টার ফলে এখন তারই বিকৃতিটুকু পুরাদস্তুর আয়ত্ত করে ফেলেছে। কুকুরকে 'কুম্ আন্ কুম্ আন্' বলে ডাকছে, তার মেমবাবার দরকারী জিনিসগুলি সুযোগ মতো চুরি করছে। তার বন্যত্বের খাঁটি আমেজটুকু তার মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সৃষ্টির সংস্কৃতির ছোঁয়া তাকে ব্যাপ্টাইজ করেছে, তার স্বকীয়ত্বের গোড়াটুকু কেটে দিয়েছে।

তার পরবর্তী স্তরে আসুক গোবিন্দ। গরু তখন তার বন্যত্ব বিসর্জন দিয়েই ক্ষান্ত নয়। তখন প্রভুর প্রয়োজন বোধে আরেকটা গরুকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করে না।

এত সুযোগ থাকতে, হে জীল, তোমার সেই ব্যাকডেটেড মতবাদ নিয়ে ফকির হবো কোন দুঃখে?

আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু বড্ড একা বোধ হচ্ছে। এই সময়ে কাউকে কাছে পেলে হতো।

ওকে! আরে, জেন যে! সাইকেল চড়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে ত। স্কার্টটা কি লাল। আর কি খাটো!

সাইকেলওয়ালী জেন দেখতে দেখতে অনেকখানি এগিয়ে গেল। ছুটে গিয়েও তার নাগাল পাওয়া যাবে না। আর প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাজপথে একটা শ্বেতাঙ্গ একটা শ্বেতাঙ্গিনীকে হন্ত-দন্ত হয়ে ডাকাডাকি করবে, অসভ্য ছুৎমার্গবাদী ইন্ডিয়ানরা তাহলে কি বড় চোখ করেই না চাইবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে টম স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলো।

টম আরেকটু এগিয়ে এক জনতা দেখতে পেল।

রাস্তার মোড়ে আন্দোলন হচ্ছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক সামনেই। জনপ্রিয় নেতৃগণের গ্রেপ্তারে ছাত্রেরা বিক্ষুব্দ হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশ আর পিস্তলধারী সার্জেন্টরা ছাত্রদেরকে পিটোচ্ছে, আর মার খেতে খেতে পড়ে গেলে অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি তাদের বাঁচার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তখনো গুলিছোঁড়ার আদেশ দেওয়া হয়নি বা ছাত্রদের সায়েস্তা করার জন্য সৈন্যদল ডাকা হয়নি। বিকাল হয়ে পড়েছিল। ছাত্রেরা দলে দলে এসে বিক্ষোভ বাড়াচ্ছে।

দেখতে মন্দ লাগছেনা। টম এগিয়ে এসে ঘাড় বাড়ালো।

কিন্তু যা দেখলো, তাতে সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে না পেয়ে অসাড়ের মতো তাকিয়েই রইল।

জেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু মূর্খ জেনটা কি করে এই এজিটেটেড ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে পড়লো! তার কি বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছিলো! সে কি সাইকেলের বেগ থামাতে না পেরেই ওখানে ভিড়ের ভিতরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে। কিংবা সে কি এক হাত নেবার জন্যই এই অমানুষদের একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়েছে? তার কি ভয় নেই! এতগুলো বিষ্ট-এর মাঝখানে বিউটি যে পিষে যাবে!

কিন্তু ওকি! ওরা এ করছে কি! ওদের কাছ থেকে এ জিনিস তো আশা করিনি। রোষ-উদ্বেল জনতার মাঝে তাদের এ কাণ্ডজ্ঞান, এ কর্তব্যজ্ঞান, কর্তব্যবোধ এলো কি করে! জেনের একেবারে কাছাকাছি যে সব যুবক ছিল, তারা হাত ধরাধরি করে একটা গণ্ডি করেছে যে। তার মধ্যে একটু জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল। সেই ফাঁকাটুকুতে জেন হাঁপাচ্ছে। ওঃ, মূর্চ্ছা যে যায়নি এখনো, তাইতেই জেনের বীরত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যুবক ক'টি এভাবে ফাঁকা রেখে ধীরে ধীরে ঠেলে জেনকে জনতার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে! আর দুটি যুবক তার সাইকেলটা ধরে অনেক ঠেলাঠেলি করে বাইরে নিয়ে তার হাতে দিলে। আঃ জেন, একটু থ্যাঙ্কস্‌ও তুমি দিলে না তোমার রক্ষাকারী নাইটদেরকে! তা দেবেই বা কি করে, তোমার কি অতশত জ্ঞান এখন আছে!

আঃ জেন, ডিয়ার! টম এক ছুটে এগিয়ে গিয়ে বিহ্বলা নারীর বেপথু দেহবল্লরীখানা বক্ষে চেপে ধরলো এবং অর্ধনীমিলিতপ্রায় চক্ষু দুইটিতে বার কয়েক ঘন ঘন চুম্বন করলো। জেন টমের স্কন্ধদেশ আশ্রয় করে তার কম্পনবেগ প্রশমিত করলো।

জেনকে একটা রিক্সায় তুলে দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে টম ছুটে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। জেনকে বাঁচাতে গিয়ে যে যুবকটিকে সব চেয়ে বেশি হিমশিম খেতে হয়েছিল, টম তাকে মনে রেখেছে। ভিড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে এলো টম। ডান হাতখানা বাড়িয়ে করমর্দনের আশায় তার হাতে ন্যস্ত ক'রে মুখে বললো, ইন্ডিয়ান

যুবক, তোমার কর্তব্যবুদ্ধি আমাকে অবাক করেছে। সাবাস, ধন্যবাদ গ্রহণ কর–গ্রহণ কর কৃতজ্ঞতা।

যুবকের চোখে মুখে দারুণ উপেক্ষার ভাব ফুটে উঠলো। তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপের সঙ্গে যুবক বলে উঠলো, ন্যো ন্যো হোয়াইটম্যান, নো। কে চায় তোমাদের কৃতজ্ঞতা। তোমাদের ধন্যবাদের কি দাম! তুলে রাখো ওসব তাদেরই জন্যে, সাম্রাজ্যবাদ চালাবার জন্যে তোমাদের যাদেরকে প্রয়োজন আছে–যাদেরকে খুশি রাখা সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার কবচকুণ্ডল হয়ে থাকবার যোগ্য।

টম বিমূঢ়। উৎসাহী হাতখানি স্খলিত হয়ে পাশে ঝুলে পড়লো।

টম যেন অনেক অনেক দূরে সরে গেছে। অনেক দূরের অস্পষ্টতা থেমে টমের একটা দীর্ঘ ছায়া যেন কথা কয়ে উঠলো : তবে কি, তবে কি আমাদের গুণগ্রাহিতা, আন্তরিকতা, ভালোকাজের পুরস্কার দেবার অনুকম্পা–এসবের কোনো দামই তোমাদের মানে, বিদ্রোহীদের কাছে নেই!

না হোয়াইট ম্যান, না। যুবকের পুঞ্জিত বিক্ষোভ বেরিয়ে এলো : হোয়াইটম্যান, স্বয়ংকল্পিত মর্যাদাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। বিদেশী কেবল আমরা নই, সবাইকে তোমাদের বর্বরোচিত জমি-দখল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে হবে। মাটির উপর টিকে থাকতে হলে তোমাদের এ দুষ্ট নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে কারুর নিস্তার নেই। তোমাদের শুভেচ্ছার ফাটল বেরিয়ে পড়েছে। আর তোমরা ধাপ্পা দিয়ে গলায় পরানো শিকলটাকে আস্ত রাখতে পারবে না।–দুয়ার ভেঙে পাগলামি এসেছে, এ যৌবন জোয়ারে তোমাদের গর্ব তৃণের মতো ভেসে যাবে।

টমের মুখে সত্যি কোন কথা নেই।

কি ভাবছো সঙ্গীনের খোঁচায় আর বন্দুকের গুলিতে তোমরা সব ঠাণ্ডা করে দেবে। তোমাদের কর্তারা একথা যেন মোটেই মনে স্থান না দেয়। তারা যেন মনে রাখে, ভাবধারার শক্তির তুলনায় সঙ্গীন ও বন্দুকের শক্তি একান্ত দুর্বল।

টমের মুখে ক্ষীণ ধ্বনি শোনা গেল : অশান্ত বিশ্বে বৃটেনই আনে শান্তি। গত মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠায় বৃটেনের শক্তি ও আনুকূল্য কতখানি ছিল, রাজনৈতিক শাস্ত্রের বাল্যশিক্ষা পড়ে তোমরা কি করে বুঝবে ইয়ংমেন। এবারও নাৎসীদানবেরা যুদ্ধ চালাচ্ছে, ও-দানবীয় শক্তি পর্যুদস্ত করে সে যুদ্ধ বিজয় হলে শান্তি স্থাপন করবে বৃটেনই।

রাজনৈতিক শিশু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো : রাষ্ট্রসংঘ তোমরা গঠন করেছিলে, কিন্তু সে সংঘ টিকলো না কেন! নূতন এবং মনোহর নাম দিয়ে পুরাতন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করে প্রধানত তোমরা ইংরাজেরা, ফরাসিরা আর মার্কিনেরা সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলে। তাই সংঘ টেকেনি। তোমাদের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ যতদিন না কোন বিরাট প্রতিপক্ষের আঘাতে নষ্ট হয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস সে বিরাট শক্তি জন্মাবে ভারতেরই আত্মিক মনোবল নিয়ে, নাৎসীবাধা হয়ত জয় করতে পারবে তোমরা; কিন্তু এ বাধা শুধু তোমাদের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শেরই মৃত্যু আনবে না, আনবে নাৎসীবাদেরো, আনবে ফ্যাসিস্তবাদেরো, আনবে পরকে দাস করার নীতি যে

বাদের আছে সেই বাদের অপমৃত্যু। তোমাদের রাষ্ট্রসংঘ চুলোয় যাক। প্রাচ্যের ক্ষত শুকোবার জন্য সে রাষ্ট্রসংঘ কি দিয়েছে। হাইলে সেলাসীকে তোমাদের রাষ্ট্রসংঘ কি দিয়েছিল! তোমাদের রাষ্ট্রসংঘ কেবল শ্বেত জাতিদের জন্য। তোমরা শ্বেতরা যাদেরকে সর্বদা পদদলিত রাখতে চাও, সেই অশ্বেতদের জন্য নয়। তোমরা শ্বেতরা সকলে পরস্বাপহরণের বেলা এক। হতে পার বৃটিশ, হতে পার জার্মান, হতে পার ফ্রেঞ্চ, আর-সব বিষয়ে আলাদা। কিন্তু কালোদের শোষণের বেলা, দাস করে রাখার ফন্দীফিকিরের বেলা তোমরা সবাই এক। অশ্বেতদের সাধারণ শত্রু তোমরা এক। যাও বন্ধু, এখানে দাঁড়িয়ে অনুকম্পা দেখিও না, ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে সঙ্গীন শানাও গে–যা তোমাদের একমাত্র বল-ভরসা।

টম যেন লাইটহাউসে একখানা পিকচার দেখছে : তোমরা কি কিছুতেই আমাদের ভালো উদ্দেশ্যটা বুঝে নিতে পারছ না! না বুঝবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে লেগেছ! কিছুতেই ফ্রেন্ড হতে পার না–তোমাদের জন্য আমরা কত কিছু করেছি, জঙ্গল কেটে নগর বসিয়েছি, তোমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছি, আমোদ আহ্লাদের উপকরণ জুগিয়েছি, কেতাদুরস্ত করেছি; দেশ থেকে কতকিছু বয়ে এনে এখানে সাজিয়েছি– এসব কিছু নয়?

বিক্ষোভকারীদের আর এক দল পশ্চাদ্দিক থেকে এগিয়ে আসছে জোয়ারের জলের মতো। পুলিশবাহিনী লাঠি বাগিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। সামান্য একটু বিরতির মধ্যে এর অধিক কথা-কাটাকাটি সম্ভব নয় কিছুতেই।–পুলিশেরা এখনই হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

যুবকটি এক ধাক্কায় টমকে জনতার থেকে বার করে দিতে দিতে আবেগের ভরে বলতে লাগলো : হাঁ। ঢের ঢের উপকার করেছ। এখন দয়া করে তোমরা এদেশ থেকে গেলেই হয়, উপকার থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচি।

হোয়াইটম্যান! সুসভ্য সম্ভ্রান্ত জাতি তোমরা, শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানে উন্নত জাতি তোমরা। তোমাদের ভাষা মাতৃভাষা করে নিয়েছি, তোমাদের সাহিত্য আপনার সাহিত্য করে নিয়েছি। তোমাদের সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের তথ্য জানতে পেরেছি–কতো উন্নত তোমাদের কৃষ্টির দিকটা। তোমাদের শেকস্‌পিয়ারে অতল জলের মাছের মতো ডুব দিয়েছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিপূজা, কীটসের সৌন্দর্যপ্রীতি, শেলীর স্পার্শাতীত ভাবগাম্ভীর্য, সুইনবার্ণের মাধুর্য মন দিয়ে ভোগ করেছি।

গল্‌সওয়ার্দী-লরেন্স-হাক্সলি পড়ে শুধু দিবসের কাজে নয়, রাত্রির স্বপ্নের মধ্যেও মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করেছি। মানুষকে এরা কত দরদ দিয়ে চিত্রিত করেছে, মানুষের মনকে এরা কত শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তাদেরই জাতির লোক তোমরা, আর তোমরা এমন অসভ্য যে, একটা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভের সকল আটঘাটকে বেঁধে পাকাপোক্ত করে দিচ্ছ–সিন্দবাদের জানোয়ারের মতো, যক্তিবিহীন বর্বরের মতো, ন্যায় ও অধিকারের মস্তকে পদাঘাতকারী দানবের মতো ঘাড়ে চেপে বসে উল্লাস করছ। ন্যায় ও মর্যাদার দাবিতে যা চাইছে, তার উত্তর দেবার সেই আদিম বর্বর যুগের ব্যবস্থাটাকে অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে এসে এখনো চালাচ্ছ।

তোমাদের শিল্পের দিকটা এত উন্নত আর রাজনৈতিক দিকটা এত কদর্য। তোমাদের শিল্পকারদের এতো ভালোবাসি, এত আপনার বলে ভাবি, তাদের সৃষ্টিতে আমাদেরও হাসিকান্না মিশিয়ে দিই। আর তোমাদের রাজনীতিকেরা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে চিড়িয়াখানার জানোয়ারদের মতো আমাদের খুঁচিয়ে মারতে আসে। যদি বলি দেশের আগন্তুক শত্রুর সঙ্গে যুঝবার জন্য আমাদের স্বাধীন ভাবে তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করার জন্য আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও, অমনি তোমাদের মূর্তি অতিশয় রুদ্র আকার ধারণ করে। মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের অধিকার–এত উত্তম বাণী তোমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের আখরে আখরে রেখায় রেখায় প্রকাশ পেয়েছে, আর তোমরা একটা মুমূর্ষু দেশকে আরও শক্ত করে বাঁধবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছ। হোয়াইটম্যান! কি দাম আছে তোমার মৌখিক ভালবাসার, কোন মুখে আস আমাদের ন্যায় ও নীতি শেখাতে! তোমরা ভাবো নারীর মর্যাদা রক্ষা করে মনুষ্যত্ব দেখানো কেবল হোয়াইট ম্যানদের একচেটিয়া কাজ–নন-হোয়াইটদের তোমরা মানুষ বলে ভাবোনি। হোয়াইটম্যান, বি অফ্ ফ্রম হিয়ার, বি অফ্! সঙ্গীনের শক্তিতে যা পারো করো গিয়ে। কারণ ওটাই তোমাদের একমাত্র উপজীব্য।

অল্‌রাইট ইয়ংমেন! থ্যাঙ্ক ইউ।

আগের কথাগুলিতে টমের আপাদমস্তক জ্বালা ধরে গিয়েছিল। শেষ কথাগুলি তার চিন্তাজগতে নূতন আলো আর উদ্দীপনা এনে দিলো। ইন্ডিয়ানরা সভ্যতা না জানলেও তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। যাদের থেকে শিখেছে, সকল অবস্থাতেই তাদেরকে মেনে চলতে পারে। অ্যাংলোসেকশন জাতির উপরে এই দুর্দিনেও ঘোর শ্রদ্ধা। এরই সূক্ষ্ম পথ ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। একটুখানি কূটনীতি। একটুখানি চালাকি। কিন্তু দুনিয়াটা এগুচ্ছে মানুষের কূটনীতির ধারাও এগুচ্ছে। তাতে দোষের কিছু নেই তো। এরই সরু পথে আমাদের রাজরথের জয়যাত্রা। এই সূক্ষ্ম পথকেই কেটে রথ চালাবার মতো প্রশস্ততাকে চিরযুগ চালু রাখা উত্তম রীতি। প্রথম রাতে গোবিন্দ হয়ত ভেবেছিলো টমিটা গায়ে পড়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মেশে। অত মিশুক কেন? মেশা তো এদের কাজ নয়। এখন দেখছি মিশে গ্রান্ড একস্‌পিরিয়েন্স লাভ করেছি। এ অভিজ্ঞতার দাম অফুরন্ত। ব্রাভো!

বিজয়ীর হাসিতে টমের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে গেলো।

শ্রদ্ধা আনে বিনতি; বিনতি আনে আনুগত্য। নেতাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠা নিছক সেন্টিমেন্টালিটি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে শ্রদ্ধার অনল তাদের মনের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলছে, সেটাই খাঁটি জিনিস। সেই আগুন কিছুতেই ছাই চাপা থাকবে না। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সাগরের ঢেউও থেমে যায়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক হাওয়া থেমে গেলে, তাদের মনের বিপ্লবও শান্ত হয়ে যাবে–কিন্তু যে-শ্রদ্ধা তাদের মনে স্বর্ণরেখায় বসে আছে, তার ধ্বংস নেই।

আনুগত্যের কণ্ঠ তার; মানে এই সমস্ত বিদ্রোহী, যারা আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের Safren gowu পরতে সঙ্কোচ বোধ করছে, এগিয়ে দেবেই। আমাদের খালি শক্ত হতে হবে। ভাবধারায় প্লাবনের শক্তি আছে জানি, কিন্তু এ প্লাবন শুধু বিশেষ কোনো

দেশের নয়—আমাদের ভাবধারা আছে, একবার সে ভাবধারা প্লাবিয়ে দিয়েছি আমরা, তার স্রোতের আর বিরাম হবে না কোনো কালে। ব্রাভো!

টম একটা বিরোধী আইডিয়াকে জয় করেছে। শক্তিশালী ছিল সে আইডিয়া। তার কাছে জলের মত তরল হয়ে ঢলে পড়েছে। আল্পস বিজয়ের মতই এ বিজয় আনন্দস্রাবী।

এ-আনন্দে আনন্দ-সঙ্গিনীকে পাওয়া গিয়াছে অপ্রত্যাশিত ভাবেই। একটা সুন্দরী তরুণী যুবতী নারী রিক্সার উপর ওর বাম বাহু তার দক্ষিণ বাহুতে বেষ্টন করে বসে আছে। তার গায়ের উষ্ণতা এসে অতি স্পষ্ট ভাবেই গায়ে লাগছে। তাকে আজ বিকাল থেকে রাত এগারোটা অবধি আপনার করে পাওয়া গেছে। ছাড়ছি না আজ তাকে কিছুতেই। অল্পদূরেই তার বাসা। সাইকেল খানা বাসায় রেখে এসেছি। সব প্রয়োজন তার চুকেছে এবং আমার প্রয়োজনের নিকট মাথা নীচু করেছে। তাকে নিয়ে যা খুশি করব আজ।

* * *

কালো হাতী নড়ে উঠেছে। দিকবিদিকে লাখো লাখো বুভুক্ষু মানুষেরা বিক্ষুব্ধ ফেনায়িত হয়ে এলোমেলোভাবে এগিয়ে আসছে—সশস্ত্র, সুশৃঙ্খল সামরিকতার সামনে। বুভুক্ষুর এ প্রেতায়িত অভিযান বজ্রপতনের মতো আকস্মিক, সাগর-তরঙ্গের মতো দুর্বার। শ্বেতাঙ্গসন্ততিরা তাতে প্রলয়ের আভাস পেয়ে সন্ত্রস্ত, বিচলিত হয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে আমেরিকান জগতে বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছে। আর নীরব থাকা চলে না।

এমনি সময়ে এল চার্চিলের বিবৃতি। একটা জাতির আত্মসম্মানের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গে এবং ন্যায় সঙ্গত অধিকারের দাবীর প্রতি সদম্ভ ভ্রূভঙ্গীতে বিবৃতি প্রখর। কিন্তু পৃথিবীর যে প্রান্তে যে ইংরাজ সন্ততি রয়েছে, তারি প্রাণে সে-বিবৃতি অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবোধ জাগিয়ে দিল। তারা পেল প্রেরণা, পেল অপূর্ব উৎসাহ ও অফুরন্ত উন্মাদনা।

* * *

আমরা কারো পরোয়া করি না। অ্যাংলোসেকশন জাতি সকল শত্রুকে দলিত বিমথিত করে একাই বীরদর্পে দিক্‌বিদিক প্রকম্পিত করে এগিয়ে যাব। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখনো কোনো সন্দেহ মার্কিনের থাকলেও একদিন সে তার ভুল বুঝে আমাদেরই নীতিতে বিশ্বশান্তি আনতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমরা গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছি। নাৎসী তস্করেরা একটির পর একটি করে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে—শয়তানের গলা টিপে ধরে আবার তাদের স্বাধীনতা জিনে এনে দেব। যুদ্ধের পর নব ব্যবস্থায় সবাই স্বাধীন হবে,—কমনওয়েলথকে নিয়ে, আমাদের সাম্রাজ্যকে নিয়ে আমরা স্বাধীন হব।

দ্যাট এজিটেটার গ্যান্ডি, দ্যাট নেকেড ফকিরটাকে খাঁচায় পুরে রাজার হালে রেখে দিয়েছি, আর কোনো ভয় নেই।

*   *   *

হাত থেকে স্টার অব ইন্ডিয়াখানা টেবিলের উপর আলগোছে ফেলে দিয়ে যৌবনবতী জেনের রূপোন্মাদনাময় উষ্ণতাটুকুকে বাঁ হাত দিয়ে নিঙড়ে নিতে নিতে পণ্ডিত টম, বহুগ্রন্থপাঠী বহুদর্শী টমি টম ডান হাতে গ্লাসে চুমুক দিল।

বাহুবেষ্টনীতে শ্বেতবল্লরীটিকে জড়িয়ে রেস্তরাঁ থেকে টম যখন রাস্তায় পা দিল সূর্য তখন ডুবে গেছে!

মাদ্রাজের একটা স্থানে বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠেছে। টমেদের দলটাকে সেইখানেই পাঠাবার অর্ডার হয়ে গেছে। আজ রাতের ট্রেনেই টমকে দলের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে সেই অদেখা মুলুকে বিপদের পথে পা বাড়াতে হবে।

টমের পা তখন আরবী ঘোড়ার তুরন্ত পায়ের মতো নাচছে।

*   *   *

একটা বাস স্টান্ডে লোকে দাঁড়িয়েছে—বাসে যারা চড়বে তারাও দাঁড়িয়েছে, যারা চড়বে না তারাও দাঁড়িয়েছে। ব্ল্যাক আউটের ক্ষীণাতিক্ষীণ আলোতে স্থানটিকে প্রেতায়িত দেখাচ্ছে।

একটা পাগল একটানা পাগলামি করে চলেছে। কারো কারো হাসির খোরাক যোগাচ্ছে, কারো কারো যোগাচ্ছে ঘৃণা। এখানে রাত্রিকালে প্রায় রোজই এ সে পাগলামি করে। তার পাগলামি অদ্ভুত। প্রথম প্রথম তার প্রতি স্থানীয় লোকেরা খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এখন তার দিকে বড় একটা কেউ ফিরে চায় না। চায় কেবল পথচারীরা।

কোনো পথচারী কৌতূহলবশে নিকটের পান-বিড়ির দোকানে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পেতো, ও নাকি বাস্তুত্যাগীদেরই একজন। কি কারণে তার মাথাটা বিগড়ে যায়—সেই থেকে এখানে এসে পাগলামি করে—টমিদের দেখিয়ে দেখিয়ে পাগলামি করে!

তার পাগলামির রকম বড় অদ্ভুত। বৃটিশ সৈনিক পুরুষদের বীরদর্পী হাঁটার অনুকরণ করতে গিয়ে তার ঋজু, ক্ষীণ দেহটি বেতের মতো পেছনের দিকে বেঁকে যায়। বিঘৎপ্রমাণ পাঁজরাভরা বুকখানা চিতিয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে একনাগাড়ে কতকগুলো অসংলগ্ন অর্থহীন কি সব উচ্চারণ করতে থাকে—এমন ভাষায়—যে ভাষার নিদর্শন দুনিয়ার কোনো যুগের কোনো মানুষের জানা ছিল না—এ সকল কথা দুনিয়ার কোনো ভাষাতে আজো সৃষ্টি হয়নি। ভাবখানা দেখাচ্ছে যেন ইংরাজী বলছে। কোনো সৈনিক পুরুষ দেখলে, তার সামরিক হাবভাব বেশি প্রবল হয়ে ওঠে—সে একধার থেকে

অন্যধারে বুক চিতিয়ে 'মার্চ' করে, 'ইংলিশ' বলে, আকাশের দিকে বন্দুক ছোঁড়ার ভঙ্গি করে, আর দাপাদাপি করে।

ম্রিয়মাণ আলোর অত্যাচারে প্রেতায়িত জায়গাটা তার পাগলামিতে ততোধিক প্রেতায়িত পরিবেশের সৃষ্টি করে।

তার দিকে চেয়ে টম জোরে হেসে উঠল।

তারপর জেনের উষ্ণতাটুকু প্রতি রোমকূপ দিয়ে নিঙড়ে নিয়ে তাকে বুক আলগা করে দিল!

পনেরো মিনিটের ভিতর তাকে ব্যারাকে ফিরতে হবে, যাত্রার্থে প্রস্তুত হবার জন্য।

* * *

সেন্টিমেন্টাল টমের কাহিনী এখানেই শেষ হলো। টম জানেনা তার জাতীয় বিনষ্টি কতদূর এবং যে পথে তারা পা চালিয়েছে সে পথ সেই বিনাশের কত নিকটে নিয়ে যাবে। বৃটানিয়ার বুকের উপর সকল গ্রহ চেপে বসে নির্দেশ চালাচ্ছে, টম জানে তাদেরকে সেই নির্দেশ মেনেই চলতে হবে।

হয়ত তার কাহিনী এখানেই শেষ। এ কাহিনীর ভেতর আরো যারা এসে ভিড় করেছিল তাদের ফুটিয়ে তোলার অবসর এ কাহিনীতে নেই। তবে জীলের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক।

জীল আমেরিকার লাইফ, ন্যাশন, এটলান্টিক প্রভৃতি কাগজের একান্ত ভক্ত ছিল। আর সব কাগজ রেখে আগে এ কাগজগুলিই সে আগ্রহ করে পড়ত। লুই ফিসার, পার্লবাক প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও মননজীবীদের ভারতসম্পর্কিত লেখাগুলি তাকে নাকি খুব নাড়া দিত। তারপর তাকে কলকাতা থেকে অন্য স্থানে চলে যেত হয়।

শোনা যায় ভারতের কোথায় যেন মার্কিন সৈন্যদের ভেতর গান্ধীটুপি পরার জন্য রীতিমত একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাদেরকে গান্ধীটুপি পরার অনুমতিও ঠিক দিয়েছিল; তবে এক শর্তে যে গান্ধীটুপিটাকে খাকী রঙ দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

জীল এ আন্দোলনে কোন অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা জানা নেই।

জেনের কথা না বলাই ভাল। প্রথমে সে জীলেরই চিত্তরঞ্জিনী ছিল। পরে টমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। নারী-মাংস সম্পর্কে জীলের যদি টমের মতো অত বুভুক্ষা থাকতো তাহলে জেনকে মাঝে রেখে দুই বন্ধুর মধ্যে রীতিমত নাটকীয় সংঘাত জেগে উঠতে পারত। তাতে এ কাহিনী একটি চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের মর্যাদা পেত। তা যখন হয় নি, তখন পাঠকগণকে কাহিনীতে উপন্যাসের রস উপভোগে বঞ্চিতই থাকতে হল। তবে কল্পনা করা যেতে পারে, টমের অভাবে বেচারি হয়ত আর কাউকে দিয়ে কোনো নির্জন স্থানে ঘাসের উপর শোয়ার জন্য স্থান পরিষ্কার করছে।

গোবিন্দর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তার সম্বন্ধে কল্পনা করেও কিছু বলা মুশকিল। কারণ এ ধরনের লোকের চরিত্র দেবা ন জানন্তি, কুতঃ মানবাঃ।

তবে, অচিন্ত্যদের বিষয়ে একটু খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

আপনারা জানেন, অচিন্ত্য তাদের অফিসে একটা আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। সে ছিল কেরাণীদের আন্দোলন—আর কোনো অফিসেই এ ধরনের আন্দোলন এযাবৎ হতে দেখা যায় নি।

বড় সাহেব নিজে অচিন্ত্যের প্রতি, এবং আরও যারা সহকারিতা করেছে তাদের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আন্দোলন দমে যায়নি। সে-আন্দোলনের ফলও পাওয়া গিয়েছিল। কোম্পানী সকল কর্মচারীদের জন্য একমাসের মাইনের টাকা বোনাস মঞ্জুর করেছিল। বড় সাহেব থেকে গেটের দারওয়ানটি পর্যন্ত বোনাস পেয়েছিল।

বড় সায়েব পেয়েছিল হাজার টাকা বোনাস। অচিন্ত্যরা পেয়েছিল পঁচিশ টাকা করে। বড় সায়েবের বেতন হাজার টাকা আর অচিন্ত্যদের বেতন প্রত্যেকের পচিশ টাকা করে কিনা।

হাজার টাকার নোটখানা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরে বড় সায়েব তার রিপোর্টখানা পূর্ণ করতে লাগলো, লিখলো, অফিসে বরাবরই শান্তি ছিল। কয়েকটা ছোকরা কেরাণী বাইরের অবাঞ্ছিত এলিমেন্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শান্তিভঙ্গ করেছে, করেছে আন্দোলন। অচিন্ত্য নামক একটা ডেপো ছোকরা হচ্ছে এ দলের পাণ্ডা। শুধু একে তাড়ালেই চলবে মনে হয় না, দলটির শুদ্ধ ব্যবস্থা নিতে না পারলে........

এমনি সময়ে মতিলালবাবু এসে যাবার পথে সায়েবকে কপালজোড়া একটা সেলাম জানিয়ে গেল।

অচিন্ত্যদের বিরুদ্ধে লাগার জন্য বড় সায়েব তাকে বড়বাবু করেছে।

১৯-১২-৪২ইং

রাঙামাটি

এক

সেদিন মনোরমার সান্ধ্য সম্মিলনে নবকুমারও এসেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মনোরমা বসেছিলেন তাঁর পাশেই। হঠাৎ তাঁকে উঠতে দেখে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম ভ্রূ দুটি উৎক্ষিপ্ত করে বললেন, 'রাত তো এখনও বেশি হয়নি। এখনি উঠছ যে?' মনোরমার এককালের বহু প্রশংসিত চোখের দীপ্তি এখন কমে গেছে, আর তার রহস্যময় গভীরতায় শ্রান্তির ভাবের হয়েছে সমৃদ্ধি,—বার্ধক্যের ছায়া অতি নিষ্ঠুরভাবে চোখ দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কালের এই অত্যাচারকে তিনি সবলে অবহেলা করে চলেছেন। নগরের অভিজাত সমাজে তাঁর অসীম প্রতিপত্তি।

'অনেক কাজ আছে। আর আমার বসবার সময় নেই।' বলে নবকুমার একবার হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে মনোরমা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। মনোরমা হচ্ছেন সেই ধাতের মেয়ে যারা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আদৌ দেখতে পারেন না। জীবনের গুরুত্বের দিকটা তিনি বারবার উপেক্ষা করে আসছেন। বললেন, 'কাজ শুধু তোমার একারই নয়। আর সবারও আছে। আচ্ছা, যাও।'

নবকুমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উপর তাঁর হাস্য উদ্ভাসিত দৃষ্টিটা আর একবার স্থাপন করে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মনোরমার ক্ষুব্ধ অথচ গর্বপূর্ণ দৃষ্টি কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার নবকুমারের গমনশীল মূর্তির অনুসরণ করল। সান্ধ্য সম্মিলনে নবকুমারের দেখা খুব কমই মেলে। রোগাতুর নরনারীর সাহচর্য ছেড়ে স্ফূর্তির আসর জমাতে তিনি নারাজ।

মনোরমা হচ্ছেন কলকাতার কায়দাদুরস্ত সম্প্রদায়ের মুকুটমনি। তাঁর বন্ধুবান্ধবের তালিকায় যাঁদের স্থান তাঁদের সঙ্গে নবকুমারের কোন বিষয়েই মিল খায় না। তবু তাঁকে মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে মিশতে হয়। বিখ্যাত ডাক্তার নবকুমারের কদর সবাই বেশ ভাল করেই বোঝে।

নবকুমারের পিতা ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অর্থ উপার্জন অনেকেই করে থাকে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার জানে খুব কম লোকেই। ললিত অর্থের সদ্ব্যবহার জানতেন। ভাগ্যগুণে তাঁর সহধর্মিনীও জুটেছিল মনের মতো। স্বামী স্ত্রীর ধর্মে ছিল প্রগাঢ় আসক্তি। কর্তব্যে ছিলেন তাঁরা সর্বদা তৎপর, আর দরিদ্রের ছিলেন তাঁরা পরমবন্ধু। একই পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় পালিত হয়েও মনোরমা ও নবকুমারের চিত্তের ধারা বইল বিভিন্ন মুখে। মনোরমা স্কুলে পড়বার সময় পড়ার চেয়ে বেড়ানোকে, কলেজের লেকচারের চেয়ে ফ্যাসানকেই নারীশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছিল, আর বিবাহও হয়ে গেল তার তদনুরূপ পাত্রের সঙ্গে। সদ্য বিলাত প্রত্যাগত নবীন ব্যারিস্টার বিনয়েন্দ্র গাঙুলী বিদেশীয় ছাঁচে ঘর ও বাহির দুই-ই ঢালাই করে আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারই সঙ্গে হলো মনোরমার বিবাহ।

নবকুমার বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে বিলাত গিয়েছিলেন ডাক্তারী পড়তে। এত ভাল করে পাশ করে সেখান থেকে ফিরে এলেন যে দেশশুদ্ধ লোক আনন্দগর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং মৌলিক গবেষণার জন্য অদূর

ভবিষ্যতে নোবেল প্রাইজটা যে তিনি পাবেনই, এ সম্বন্ধে গোড়া থেকেই দেশে একটা জল্পনা কল্পনা চলছে।

নবকুমার একাই থাকেন। এত সম্মান এত অর্থ তবু তিনি অবিবাহিত। লোকে বলে যৌবনের প্রারম্ভেই কোন নারীর কাছে তিনি এমন একটা আঘাত পেয়েছেন যেটা তাঁকে ঘোর নারীবিদ্বেষী করে তুলেছে।

প্রথম কথাটা হয়তো সত্য হতে পারে, কিন্তু তিনি নারীবিদ্বেষী নন। নারীর প্রতি তাঁর একটা গভীর ধ্যানের দৃষ্টি আছে, চোখের নয়। তিনি চিকিৎসক, নারী সৌন্দর্যের চিরন্তন মোহের আকর্ষণ তাঁর থাকতে পারে না।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে কোন মহিলাই হয়ত তাঁর কাছ থেকে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর পায় না। কিন্তু রোগশয্যায় পড়ে আশাপূর্ণ সহানুভূতির বাণী সবাই শোনে। ডাক্তারের মুখের স্নিগ্ধ হাসি দেখে মুমূর্ষুও বুঝতে পারে না যে, তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। যাক সে কথা। মনোরমার ওখান থেকে ফিরে এসে নবকুমার যখন তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন রাত্রি সাড়ে দশটা, কিন্তু বিশ্রামের অবসর এখনও তাঁর আসেনি। তিনি আসন গ্রহণ করতেই সেক্রেটারী এসে চিঠির তাড়াটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে গেল। চিঠিগুলোর উপরে ছিল একখানা টেলিগ্রামের খাম। নবকুমার সেখানাই আগে তুলে ধরলেন। তাতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায় :–

> কাল বেলা দেড়টার ট্রেনে রাঙামাটিতে আসবেন। সেখানে গাড়ী থাকবে। বড়ো প্রয়োজন–যে কোন প্রকারে হোক আসবেন।
>
> –রেণুকা ব্যানার্জী

নামটা নবকুমারের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাঙামাটিতে তো তাঁর কোন রোগী নেই। চারবার লেখাটার উপর চোখ বুলিয়ে আপন মনে উচ্চারণ করলেন 'অসম্ভব'!

তাঁর সে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত কক্ষের দেওয়াল ছাড়া আর কেউ শুনল না। সম্মুখে প্রসারিত আগামীকালের এন্‌গেজমেন্ট লিস্টের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে পরদিন প্রাতঃকালে তার করবার জন্য একটা ফরমে কয়েকটি কথা লিখে ফেললেন।

কল্পনাপ্রবণতা তাঁর নেই। কিন্তু নির্জন কক্ষের এই নীরবতার সুযোগ পেয়ে কল্পনাদেবী তাঁর হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন নবকুমারের মাথায়। নবকুমারের মানসপটে ফুটে উঠল না দেখা সেই রেণুকা ব্যানার্জীর মনোহারিনী মূর্তিখানি। হাতে তার লেখনী, সুমুখে তারের ফরম...লিখতে লিখতে হাত কাঁপছে, চোখ মুখ মৃত্যু আশংকায় মলিন।

নবকুমার সদ্যলিখিত কাগজখানা হাতে নিলেন। 'রিগ্রেট ইম্‌পসিবল্'–ধূর্জটির ভ্রূকুটির মতো, যমরাজের মতো দুটি কথা। মৃত্যু আশংকাতুর আত্মীয়দের কাছে ঐ কথা দুটি মৃত্যুর পরোয়ানার মতোই গিয়ে হাজির হবে। কত আশা করে লোকে ডাক্তার ডাকে। ডাক্তার না পাওয়া মানে....সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে মাস্টার মশাইয়ের কাছে শোনা নেপোলিয়নের একটা গল্প নবকুমারের মনে পড়ল। নেপোলিয়ন বলতেন, মানুষের অসাধ্য কোন কাজ নেই। 'অসম্ভব' কথাটা অভিধান থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

রাঙামাটি! অতীতের তিমির সরিয়ে মেঘের বুকে বিদ্যুতের মতো নবকুমারের স্মৃতিপটে ঐ নামটা জ্বলজ্বল করে উঠে আবার নিভে গেল। নবকুমার কিছুতেই মনে করতে পারলেন না, কোথায় তিনি রাঙামাটির নাম শুনেছেন, কখনো তিনি সেখানে গিয়েছিলেন কি না। মনে করলেন কতবার চিকিৎসা ব্যপদেশে কত জায়গাতেই তাঁকে ঘুরতে হয়, হয়ত রাঙামাটিতেও কখনও গিয়ে থাকবেন। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর কোন দরকার নেই।

কিন্তু মাথা না ঘামুক, মস্তিষ্কের মধ্যে তখন কল্পনাদেবীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর মনে হল যেন তিনি আর এই কক্ষে একাকী নেই। কোন অশরীরী ছায়ামূর্তি যেন তাঁর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ছায়া কখনো শিশুর মূর্তি পরিগ্রহ করছে, কখনো নারীর রূপ ধারণ করে নির্বাক ব্যথায় তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

একি হল তাঁর? তিনি অসহিষ্ণুভাবে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন কত অনুরোধই তো তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু রাঙামাটির কোন এক রেণুকা ব্যানার্জী তাঁর চিত্তে এমন আলোড়ন তুলল কি করে?

'বড়ো প্রয়োজন–যে কোন প্রকারে হোক' কথাটা জোর করে তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে আবার তাঁকে অস্থির করে তুলল। ....হয়তো মুমূর্ষু স্বামী, যৌবনের আরাধ্যদেবতা পরপারের যাত্রী। চিকিৎসা বিজ্ঞান হয়ত তাকে এত সহজে এ জগৎ থেকে যেতে দিতে নাও পারে।

নবকুমার হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। নোট বুক বের করে পরদিনের কর্মতালিকা আর একবার দেখে নিলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে কোন অবসর নেই। কত রোগীই না কাল তাঁকে দেখতে হবে। কিন্তু রজনীর নিস্তব্ধতা ধীর মস্তিষ্ক লোককেও বিচলিত করে তুলতে পারে। নবকুমারের চোখের সুমুখে ভেসে উঠল বিচ্ছেদ আশংকাতুরা নারীর এক প্রতিমূর্তি। তিনি তাঁর লিখিত ফরমখানা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখলেন।

দেড়টার ট্রেন ধরব–নবকুমার মুখার্জী।

কথাটা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বাঁচলেন। তাঁর বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। যাক্, অসম্ভব কথাটা তিনিও জয় করেছেন।

দুই

পরদিন প্রাতে শয্যাত্যাগ করে নবকুমার সমস্ত দিনের কাজ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বারোটার পূর্বেই শেষ করে ফেলতে চাইলেন। এটা যে কতদূর অসম্ভব এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখবার সম্ভাবনা যে কত কম তা ভেবে দেখবার মতো অবসর তখন তাঁর ছিল না। টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে, কথা দিয়ে কথা না রাখবার অক্ষমতা নবকুমারের সহ্যের সীমার বাইরে।

পৌষের শেষ। শীতের কুΩটিকায় সারা পৃথিবী সমাচ্ছন্ন, সূর্য উদিত হয়নি। সেই কুহেলিকা ভেদ করে ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশন হতে ছাড়ল, তখন আবার অল্প অল্প বারিবর্ষণ শুরু হয়েছে।

নবকুমার বাইরের পথে জানালার দিকে চেয়েছিলেন। দিগন্ত ব্যাপী জনশূন্য তরল অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠ। রেলপথে ভ্রমণকে তিনি অবকাশের মধ্যেই গণ্য করেন। ট্রেনের

মধ্যে তিনি কখনো ঘুমোতে চেষ্টা করেন, কখনো খবরের কাগজ পড়েন, কখনো বা ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে মত স্থির করেন। আজ কিন্তু তার কোনটাই করলেন না। নদী নালা বিল অতিক্রম করে গাছের শ্রেণি পিছনে ফেলে ট্রেন যতই এগিয়ে চলল ততই নবকুমারের মন অকারণে উল্লসিত হয়ে উঠলে। কলকাতার প্রভাব থেকে মুক্ত করে ট্রেন তাঁকে প্রকৃতির বুকের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্তরে তিনি আজ একটা প্রগাঢ় শান্তির ভাব অনুভব করলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিন যেন একটু শীঘ্রই পৃথিবীর বুকের উপর এসে পড়ল। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে মাঝে ক্ষীণ আলোর রেখা কুটিরবাসীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাত্রীদের সচেতন করে তুলছিল। রাত প্রায় আটটার সময় নবকুমার রাঙামাটি স্টেশনে অবতরণ করলেন।

স্টেশনের বাইরে একটা ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। নবকুমার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসতেই শক্তিমান অশ্বদুটি দ্রুতপদে তাঁকে নিয়ে ছুটে চলল। গাঢ় অন্ধকারাবৃত পৃথিবী। দূরের গাচপালা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। বামপাশের পাহাড়র কেবল অন্ধকারের রাজার মত গাঢ়তম হয়ে অপর সকল হতে নিজের পার্থক্য দর্শনেচ্ছুর চক্ষুকে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

গতকল্য রাত্রিতে ঠিক এই সময়ে নবকুমার ছিলেন বিদ্যুৎ আলোক উদ্ভাসিত কক্ষে কলকাতার বিশিষ্ট নরনারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। কিন্তু তখন তাঁর মনের মধ্যে যে বিতৃষ্ণা, যে তিক্ততা ছিল, এখন তার আভাস মাত্রও নেই। পল্লীর এই নীরব সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে একটা প্রশান্তির ভাব এনে দিয়েছে।

ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেই যেন চালক ঘোড়া দুটোকে আঘাতের পর আঘাত করে তাদের গতির মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। পথিমধ্যে ডাক্তারের মুহূর্তের বিলম্বে রোগীর জীবনকে মৃত্যুর বহু নিকটে নিয়ে যেতে পারে।

গাড়ি যখন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে থামল, তখন ক্ষণিকের জন্য নবকুমার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। এই স্থান এই বাড়ি যেন তাঁর পরিচিত। কখনও যেন তিনি এখানে এসেছিলেন। অথচ কখন তা তিনি কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

দারোয়ান গেট খুলে সেলাম করে ডাক্তারবাবুকে ভিতরে নিয়ে গেল। সকলই পরিচিত। সেই ফুলের বাগান, সেই বকুল গাছ। নবকুমার যেন কখনও স্বপ্নে এইসব দেখে থাকবেন। স্বপ্নে দেখার সঙ্গে বাস্তবই হয়ত মিলছে।

নবকুমার হলে প্রবেশ করেই গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের এবং সুরুচির পরিচয় পেলেন। দেওয়াল থেকে প্রাচ্য কলার আদর্শ চিত্রগুলি হাসছে। পুরাতন আসবাবপত্রের মধ্যে একটা সেকেলে ভাব, কিন্তু বড়ো সুন্দর। নবকুমার হঠাৎ যেন বহু যুগ পিছিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল পাশ্চাত্য চিত্রশোভিত পাশ্চাত্য আসবাব সজ্জিত মনোরমার ড্রইংরুমের কথা। অতীত স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষকে দূর করে তার স্থানে আধুনিক গৃহের ভিত্তি দেখলে প্রত্নতাত্ত্বিকের মনে যেমন ভাব হয়, মনোরমার কথা মনে পড়লেই নবকুমারের মনেও হয় ঠিক তেমনি ভাব। ইংরাজীতে যাকে বলে 'কনজারভেটিব', নবকুমার হচ্ছেন কতকটা সেই ধাতের লোক। পাশ্চাত্যের ভালো

জিনিস নিতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের বলেই যে সব জিনিস ভালো হবে তা তিনি মানতে চান না।

ভৃত্য তাঁকে একটা কক্ষের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জানাল যে, গৃহস্বামী এখনই আসবেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে রোগীর অবস্থা অনুমান করে নেওয়াটা ডাক্তারদের একটা স্বভাব। নবকুমারও গৃহে প্রবেশ করে চারদিকে চেয়ে রোগীর অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বিস্মিত হলেন। ভৃত্যের মুখের মধ্যে কোন মলিনতা বা অস্থিরতা নেই। তা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে রোগী সকলের প্রিয় পাত্র নয়।

নবকুমার ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সকলই সুবিন্যস্ত যথাস্থানে সুসজ্জিত। প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই একটা কিসের আমেজ। টেবিলের উপর প্রসাধন সামগ্রী। ফুলদানীতে ফুল। দেখলেই মনে হয় এ কক্ষটা কোন মহিলার। শেলফে কয়েকটা বই, কোনটা ইংরাজী, কোনটা বাংলা। বইগুলো একবার করে খুলে দেখতে নবকুমারের ইচ্ছা হল। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে সময়োচিত গাম্ভীর্য ধারণ করে তিনি নীরবে বসে রইলেন।

কক্ষের পর্দা সরিয়ে যিনি প্রবেশ করলেন তাকে দেখে নবকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন।

রমনী তিনি অনেক দেখেছেন কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখেননি। একুশ কি বাইশ তার বয়স। মুখ দেখলে আরও কম মনে হবে। সর্বাঙ্গের যৌবনশ্রী সুগৌর তনুর উপর সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গভীর কালো কালো দুটি চোখে নির্ভীক দৃষ্টি, কুণ্ঠাহীন ভাব। এসেই সে একমুখ হেসে নবকুমারের উপর তার রহস্যময় চোখের দৃষ্টি স্থাপন করে বললে, "আপনার আসাতে আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি...খুবই ভয় ছিল যে, আপনি আসবেন না।"

তার কণ্ঠ দিয়ে যেন সুধা ঝরে পড়ল। নবকুমার এমন কণ্ঠস্বর আর কখনো শোনেন নি। কিন্তু মনের দুর্বলতাকে তিনি চাপা দিয়ে সাধারণভাবে বললেন–'বিস্তর অসুবিধা সত্ত্বেও আমি এসেছি। রোগীকে এখনই একবার দেখা উচিত নয় কি?'

কক্ষের আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর এ কণ্ঠস্বর খাপ খেল না।

সে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করে আশ্চর্যে বললে, 'রোগী?' সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের উপর দিয়ে একটা কৌতুকোজ্জ্বল হাসির রেখা ভেসে গেল। 'ও, আপনাকে বলতে ভুলে যাচ্ছি। রোগীতো এখানে কেউ নেই। আমারই জন্য আপনাকে আসতে বলেছি। জন্মের পর থেকে শারীরিক রোগ কি তা অবশ্য আমি জানি না। আমার শরীর কি খারাপ দেখাচ্ছে? কিন্তু মনে আমার শান্তি নেই। রোগ হলেই লোকে ডাক্তার ডাকে। আমারও এ একরকম রোগ। আমি মনের শান্তিতে জীবন কাটাতে চাই, তারই উপদেশ দিন আমাকে।'

কণ্ঠস্বরের মধ্যে ক্লান্তির লেশমাত্র চিহ্ন নেই, রয়েছে জীবনী শক্তির প্রাচুর্যের আভাস।

ডাক্তার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এই সুন্দরীর লীলাময়ী ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে রইলেন। বহুক্ষণ তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ তাঁর বুকের

ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। কলকাতায় তাঁর কর্তব্যের শেষ নেই। মাত্র পরিহাস করবার জন্যই সে তাঁকে এতদূর টেনে এনেছে? ভিতরের অগ্ন্যুৎপাত প্রাণপণে দমন করে তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'রোগী নেই,' যেন এ কথাটা তিনি বিশ্বাস করতেই পারেন না। 'আপনিই তো আমায় তার করেছিলেন? জীবন মৃত্যুর সমস্যার কথা কি আপনার তারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে নি? তারটাতো আপনি অন্যভাবেও করতে পারতেন।' তাঁর গম্ভীর কণ্ঠের নিনাদ শুনলে মহা সাহসী ব্যক্তিও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু রেণুকার মধ্যে কোন বৈক্লব্যই দেখা গেল না।

নবকুমার তাতে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বভাবগত সংযমের ভাব মন হতে অন্তর্হিত হতে চাইল। রুদ্ধ ক্রোধে তিনি ফুলতে লাগলেন।

রেণুকা তার বাম হাত দিয়ে একবার নিজের গন্ডদেশ স্পর্শ করল। তারপর একটা আঙুল নিয়ে গিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল। বোঝা গেল না সে হাসছে, না তার ওষ্ঠের গঠনই ঐরূপ মনোহারী।

তারপর রেণুকা অসহিষ্ণু ভাবে বললে, 'অন্য কেউ হলে হয়তো এটাকে তুচ্ছ ভাবতে পারত, কিন্তু আপনার সেরকম ভাবে নেওয়া উচিত নয়।' তার কণ্ঠস্বরের অসম্ভব রকমের মৃদুতা নবকুমারের কণ্ঠ ও কথাকে যেন ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ করে উঠল। তার সে কণ্ঠ যেন বোঝাতে চাইল যে, নবকুমারকে সে এমন মনে করে নি।

নবকুমারের বিস্মিত দৃষ্টি আবার গিয়ে রেণুকার উপর পড়ল। প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে প্রতিটি কথাতে সে নিজেকে আশ্চর্যতর করে তুলছে।

রেণুকা ধীরগতিতে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। তার সারল্যমণ্ডিত সাহস এবং তাঁর কথার প্রতি ঔদাসীন্য নবকুমারের উপরে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপত্তি বিস্তার করল। বললেন, "এমনও যে হতে পারে তা আমি তখন কল্পনাও করি নি। আপনি এমনভাবে আমাকে প্রতারিত করেছেন যে আপনাকে ক্ষমা করাই অন্যায়—।"

রেণুকা হাসল। বললে, "কিন্তু ক্ষমা তো আমি চাইনি। আপনাকে আমার প্রয়োজন বলে ডেকেছিলাম, এসেছেন। তাতে আপনার দুঃখিত হবার কিছুই নেই। লোকে বলে, টাকার অসাধ্য কিছু নেই। টাকা দিয়ে আমি আপনার মত স্বনামখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতে পারি কিনা, তারই পরীক্ষা হল। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনার মহত্ত্ব ও যশের কথা আমার অজানা নয়। তবু আপনাকে আমার প্রয়োজন। আপনি যখন এসেছেন তখন অমন মুখভার করে থাকবেন না। শুনেছি রোগীদের সঙ্গে আপনি খুব ভাল ব্যবহার করে থাকেন। আমি রোগী না হলেও আপনার কাছে খারাপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। যদি সুবিধা থাকত তা হলে হয়ত আপনি চলে যেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাল দুপুর ভিন্ন কলকাতা ফেরবার আর কোন ট্রেন নেই, আর হোটেলও পাবেন না এখানে। যেমন করে হোক, কাল দুপুর পর্যন্ত এখানে থাকতেই হবে আপনাকে, তখন কেন মিছামিছি মাথা গরম করছেন।"

তার দুঃসাহস দেখে নবকুমারের এত দুঃখেও হাসি এল। মেয়েটির চোখ দুটিতে এমন একটা শিশুসুলভ ভাব আছে, যা দেখে যে কোন লোকই মুগ্ধ হবে।

তবুও তিনি তার কাছে এত শীঘ্র নিজেকে নমিত করতে পারলেন না। সে জানুক যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব এত তুচ্ছ নয় যে, তা কোন রমনীর খেয়ালের উত্তাপে গলে যাবে। বললেন, "রোগী নেই, অতএব এখানে আমার কোন কাজ থাকতে পারে না।"

"তার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। খাওয়া দাওয়ার পর কাজের কথাই হবে, আমাদের ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এখনই আপনার ঘরে পৌঁছে দেবে।"

রেণুকা চলে যেতেই একজন ভৃত্য এসে নবকুমারকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিল। নবকুমার স্নানের ঘরে প্রবেশ করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। একটা টবে উষ্ণ জল, বাটিতে সুস্নিগ্ধ তেল, ভালো সাবান, একখানা তোয়ালে, আলনাতে গোছানো কাপড়, একটা গরদের পাঞ্জাবী, সুনিপুণ হাতে কে তাঁর সমস্ত আবশ্যক জিনিস সংগ্রহ করে দিয়েছে, মনে মনে তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। এসব জিনিস ব্যবহার করবেন কিনা সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক তাঁর মনে জাগল না।

সমস্ত দিন ট্রেন পরিভ্রমণের পর স্নানে তিনি অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে এসে তাঁর পরিতৃপ্তির মাত্রা বাড়ল বই কমল না। সুপরিসর কক্ষ, চারদিকে খোলা জানালা। সুপরিষ্কৃত সুকোমল শয্যা। মাঝখানে একটা সুসজ্জিত টেবিল। পাশে গদিআঁটা চেয়ার। নাতি উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত কক্ষ, ফুলদানীতে কয়েকটি ফুল। তার গন্ধে সমস্ত কক্ষটি সুরভিত। নবকুমার চেয়ারে বসে টেবিলের উপরের ফুলদানীর দিকে চাইতেই দেখতে পেলেন, একটা খামে মেয়েলী হাতে তাঁরই নাম লেখা। তিনি খামটা খুলে দেখলেন, তার মধ্যে একটা চেক্, তাঁর ফি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। রেণুকার সঙ্গে এরপর দেখা হলে কিভাবে আলাপ করবেন, তা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু তখনই রেণুকা এল না। তার পরিবর্তে যিনি এলেন তাঁকে দেখে সম্ভ্রমে নবকুমারের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যৌবনের সীমা পার হয়ে তিনি প্রৌঢ়ের দলে নাম লিখিয়েছেন, কিন্তু যৌবনশ্রী এখনও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে নি। শুভ্রশুচি বেশ, ততোধিক পবিত্র তাঁর মুখের হাসি। একগাল হেসে তিনি বলরেন, "তুমি আসাতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি বাবা। দাদা বেঁচে থাকলে আজ কত আনন্দ হতো তাঁর। মরবার সময় পর্যন্ত তিনি তোমার নাম করে মরেছেন।" বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার তিনি বললেন, "তোমার বাবা যখন কিছুদিনের জন্য বদলী হয়ে এ জেলায় এসেছিলেন, তখন তুমি খুবই ছোট, সেইবার বোধ হয় ম্যাট্রিক দিয়েছ। সে অনেক দিনের কথা–তোমার মনে পড়ে না বোধ হয়। আমি রেণুকার পিসিমা।"

মেঘমুক্ত হয়ে চাঁদ যেমন হেসে ওঠে, সহসা নবকুমারের স্মৃতিপটে তেমনি সবকথা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভূমিষ্ঠ হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করে বললেন, "হ্যাঁ! সব মনে পড়েছে। আমি, বাবা, মা, মনোরমাদি এসেছিলাম। কাকাবাবু আমাদের খুব যত্ন করেছিলেন।"

পিসিমা মনে মনে খুব খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "হ্যাঁ, মনোরমাও এসেছিল বটে আর তার মেয়েটি। তার মেয়েও বোধ হয় এতদিন রেণুকার মত হয়েছে।"

মনোরমার মেয়ের কথা উঠতেই নবকুমার বিমর্ষ হয়ে উঠল। ম্লান মুখে বলল, "সে অনেকদিন হল মারা গেছে।"

এই সময় রেণুকা এসে জানাল খাবার প্রস্তুত। নবকুমারেরও অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল।

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তাইতো আমি ভুলেই গেছলাম। আহা! বাবার আমার মুখটি শুকিয়ে গেছে। চল খেয়ে আসবে।"

তিন

নবকুমারের পিতা ললিত মুখুজ্জের সঙ্গে হরগোবিন্দের ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। স্কুল থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন অভিন্ন হৃদয় সহাধ্যায়ী। এম, এ পাশ করে উভয়েই স্থির করলেন বিলাত যাবার। হরগোবিন্দের বাবা ছিলেন তখনকার দিনের একজন নামকরা ব্যবসায়ী এবং জমিদার। খুব বড়ো জমিদার হয়েও যে মস্ত ব্যবসায়ী হওয়া যায় তিনি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাজেই হরগোবিন্দকে তিনি ব্যবসা সম্বন্ধেই উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরতে বললেন। ললিত চললেন আই-সি-এস হতে।

কিন্তু বিলাতে গিয়ে কিছুকাল থাকার পরেই হরগোবিন্দের মত গেল পাল্টে। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্মণ' এই প্রাচীন বচনটি যে মিথ্যা নয় তা তিনি ভালোরূপেই জানেন; কিন্তু বাণিজ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন বণিকদের ঘরে আর কৃষি দ্বারা হয় সমষ্টির উন্নতি। ব্যবসার শিক্ষা রইল পশ্চাতে পড়ে, হরগোবিন্দ কৃষিশিক্ষায় মেতে উঠলেন। বিলাতে সুবিধা না হওয়ায় ছুটলেন রাশিয়া, রাশিয়া থেকে জাপান। তারপর দেশে এসে লেগে পড়লেন চাষের কাজে। আমেরিকা হতে এল সার, নানারকম সবজি বীজ আর রাশিয়া যোগাল কৃষিপদ্ধতি। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের রুক্ষমাটি হয়ে উঠল সজীব,–কৃষকরা, প্রজারা দু'হাত তুলে নবীন জমিদারকে আশীর্বাদ করল।

এদিকে ললিত আই-সি-এস হয়ে বাঙলার নানা জেলার জল খেয়ে যখন হরগোবিন্দের জেলায় বদলী হয়ে এলেন তখন নবকুমারের বয়স তের; মনোরমার স্বামী বিনয়েন্দ্রকে হঠাৎ কি কাজের জন্য কিছুকালের জন্য বিলাত যেতে হওয়ায় মনোরমাও তার তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে এল বাবার কাছে। হরগোবিন্দের স্ত্রী সেই বৎসরেই তাঁর কন্যা রেণুকাকে রেখে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। খবর পেয়ে ললিত একদিন সপরিবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হলেন রাঙামাটিতে।

রাঙামাটি ও তার চারপাশের গ্রামের কাঁকুরে রাঙামাটির উপর দিয়ে তখন সবুজের বান বয়ে চলেছে। সবুজ, শুধু সবুজ। আখের ক্ষেতের গাঢ় সবুজের সঙ্গে ধানক্ষেতের দিগন্ত বিস্তৃত ঈষৎ হরিদ্রাভ সবুজ সমুদ্রের আনলো মিলন। কপি ক্ষেতের সাদা কালো আভা বিশিষ্ট সবুজের সঙ্গে আলু, মূলা, বেগুনের সবুজ তরঙ্গ মিলে এক হয়ে গেছে। চক্ষুকে বিশ্রাম দেবার জন্য যেন জলাশয়ের স্বচ্ছসলিল কৃষিলক্ষ্মীর কৃষ্ণ চক্ষুর মত উন্মীলিত হয়ে রয়েছে। কোন কোন স্থানে হরিদ্রাবর্ণের অসংখ্য সরিষার ফুল তার গলার সোনার হারের মত শোভা পাচ্ছে। ললিত চমৎকৃত হলেন। কোথায়ও একটুখানি অনাবাদী জমি নেই। পথঘাট ঝরঝরে, গ্রামের পুকুর সুসংস্কৃত, ডোবা বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। পল্লীর প্রত্যেকটি গৃহ পরিষ্কার, তক্‌তকে, ঝক্‌ঝকে।

ললিত বাঙলার বহুস্থানে ঘুরেছেন, কিন্তু কোথাও এমনটি দেখেননি। অথচ শুনেছিলেন যে, এ জেলার মাটি নাকি অত্যন্ত অনুর্বর, অনাবৃষ্টির জন্য প্রায় প্রত্যেক বৎসরই দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে। বললেন, "তুমি অসাধ্য সাধন করেছ হরগোবিন্দ।

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের স্বপ্নকে সত্য করেছ। পল্লীরর সমস্ত দলাদলি হিংসাদ্বেষ দূর করে তার মধ্যে এমনি সাম্য আনা, এমন শ্রী দেওয়া যেতে পারে, তা তোমার এ জমিদারী না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শুনেছি জাপানে নাকি উগানমুরা নামে এক পল্লী আছে। তারই সঙ্গে মাত্র তোমার এই জমিদারীর তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু জাপানের সেই পল্লী একটা পল্লী মাত্র, মাত্র ছ'শ ঘর লোকের বাস সেখানে। কিন্তু তোমার এই কীর্তি তোমার বিরাট জমিদারী ব্যাপ্ত করে জাপানকে তুমি ছাড়িয়ে গেছ। বুঝতে পারছি না, আমাদের দেশের এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তুমি এ সম্ভব করলে কি করে?"

হরগোবিন্দ হাস্য উদ্ভাসিত মুখে বাল্যবন্ধুর দিকে চেয়ে সবুজ সমুদ্র যেখানে দূর নীলিমায় মিশে গেছে, ততদূর পর্যন্ত স্থিরদৃষ্টি প্রসারিত করে চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললেন না।

ললিত বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ করে ধীরে ধীরে আবার বল্লেন, "আমার মনে হয় তোমার এ অসামান্য সাফল্যের একমাত্র কারণ তোমার প্রভূত অর্থ এবং অসীম প্রতিপত্তি। অর্থ এবং জনসমাজের উপর প্রভাব না থাকলে কেউ এ সমাজকে উন্নত করতে পারে না।"

হরগোবিন্দ হেসে বললেন, "অর্থের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সবচেয়ে উচ্চস্থান দেই আমি অন্তরের সদিচ্ছাকে। অন্তরের মধ্যে যদি সত্যিকারের শুভেচ্ছা জন্মে থাকে তাহলে লোকসমাজে প্রতিপত্তি বিস্তৃত হবে আপনার থেকেই এবং অর্থসংগ্রহ করাও বিশেষ সুকঠিন নাও হতে পারে। তুমি যে জাপানের উগানমুরা গ্রামের কথা উল্লেখ করলে তা আদর্শ হতে পেরেছে–নিজুনা কায়ামা, সুকেকুরো কানাওকা এবং দেনসুকো হিরুটা নামে তিনজন উন্নতমন যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাঁদের অর্থ ছিল না কিন্তু ছিল অন্তরের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা। সেই শুভেচ্ছার শুভ্রজ্যোতিতে উগানমুরার দুঃস্থ লোকেরা নতুন পথ দেখতে পেল,–হৃদয়ে দুর্দম প্রেরণা অনুভব করল। সেই দুঃস্থ ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম আজ তাই জগতের চোখে আদর্শ হতে পেরেছে। শুধু অর্থে লোকচিত্ত জয় করতে পারা যায় না।"

"কিন্তু পল্লী সমাজের রমেশের তো সদিচ্ছার অভাব থাকেনি–"

"এখানে তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। সদিচ্ছার সঙ্গে চাই সহযোগিতা। প্রভাব বিস্তার হয় ধীরে ধীরে, সকলের সঙ্গে বহুদিন একত্র মিলমিশের পর। কিন্তু রশেম হঠাৎ একদিন উল্কার মত এসে পড়ল গাঁয়ের বুকে,–এত উচ্চ হয়ে এল যে, গ্রামবাসীরা তাকে বুঝে উঠতেই পারল না। কিন্তু আমার ব্যাপার হল স্বতন্ত্র। আমি বাল্যকাল থেকে সকলের সঙ্গে মিশেছি, ছুটি পেলেই বাড়ি এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি, সকলকে নিয়ে সঙ্ঘ স্থাপন করেছি, গ্রামের যুবকদের মধ্যে আপনার মত প্রকাশের জন্য তাদের নিয়ে সভা করেছি। গোড়া থেকেই সবাই আমাকে জানে চেনে, ভালোবাসে। আমার যে সাফল্যটুকু তুমি দেখছ, তা আমার অর্ধশতাব্দীর সাধনার দান। বাবার মৃত্যুর পর আমি যখন প্রথম নিজের ইচ্ছাকে কাজে খাটাবার জন্য সকলের সম্মুখে হাজির হলাম তখন কেউ বিস্মিত হল না, আমার সে ইচ্ছার সঙ্গে সকলেই পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। অবশ্য অর্থের প্রাচুর্যের জন্যই আমি এত শীঘ্র অগ্রসর হতে পেরেছি। যাদের যা ঋণ

ছিল তা আমি শোধ করে দিয়ে তাকে তার প্রয়োজন অনুরূপ অর্থ ধার দিয়ে সাহায্য করেছি।

যাদের জমি নেই তাদের নতুন করে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। আমেরিকা থেকে ট্র্যাক্টার এনে আমার প্রথম পরীক্ষা শুরু হল। এক ট্র্যাক্টার দ্বারাই বীজ বোনা, ফসল কাটা, মাড়া এবং বস্তাবন্দী করা যায়। যে-কাজ চার পাঁচজন লোকে কতগুলো গোরু দিয়ে পাঁচ সাত দিনে শেষ করতে পারে, তাই ট্র্যাক্টারের সাহায্যে তিন চার ঘন্টাতেই হয়ে যায়। অই রকম লাঙল প্রতিগ্রামেই আমি স্বল্পভাড়ায় বিতরণ করেছি, ধারে সার দিয়েছি, ভালো চাষের জন্য সুদক্ষ পরিদর্শক নিযুক্ত করেছি।

আমার কাছ থেকে যা তারা ঋণ নিয়েছিল তা তারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই অক্লেশে পরিশোধ করে ফেলেছে। এখন আমার স্থাপিত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ওরা টাকা ধার নেয়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। ধার নিলে প্রতি ফসলের সময় কতকটা অংশ আমার কর্মচারী গিয়ে তাদের কাছ থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে ফেলে। তা থেকেই তাদের ধার শোধ এমন ভাবে হয়ে যায় যে, তা তারা জানতেই পারে না।

প্রতি গ্রামের বিবেচক লোকদের নিয়ে আমার একটা পরামর্শ সভা আছে। সেখানে গ্রামের ভালমন্দ সব আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে সেগুলো কাজে খাটাবার ভার উপযুক্ত লোকের উপর অর্পিত হয়। মোটকথা, সমস্ত কাজই বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। প্রথমটায় আমাকে যে টাকা খরচ করতে হয়েছিল তা আমি ফিরে পেয়েছি। প্রজার উন্নতির জন্য আমার জমিদারীর আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।"

ললিত এতক্ষণ সবকথা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিলেন। এইবার বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছিল তুমি বোলশেভিজম্-এর আইডিয়া নিয়ে কাজে লেগেছ। কিন্তু পরের কথাগুলো যে বোলশেভিজম্ বিরোধী বলেই মনে হচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়া জমিদারদের, ধনিকদের উচ্ছেদ করে সকলের মধ্যে সাম্যভাব আনতে চায়। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে প্রজারা তোমার প্রজাই আছে, খাজনা তাদের কাছ থেকে রীতিমত আদায় করে থাক এবং ধনও তোমার দিনের দিন বেড়ে উঠছে।

হরগোবিন্দ আবার হাসলেন। বললেন, "বোলশেভিজম-এর আইডিয়া থেকেই আমার কার্যের সূত্রপাত সত্য। কিন্তু একটা আইডিয়া সবসময় সব দেশের পক্ষে কার্যকর হয়ে ওঠে না। আমাদের দেশের অনুকূল করতে তাই তাকে অনেক ছাঁটকাট, অদলবদল করতে হয়েছে। দেশের উন্নতি করতে পারা যায় তিন রকমে। এক গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বা জনসাধারণের অধ্যবসায়ে, অথবা জমিদারদে উদার প্রচেষ্টায়। কিন্তু আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট, কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন আর কৃষকদের অধিকাংশই তো নিরক্ষর। অতএব আমাদের জমিদাররাই যা কিছু করতে পারে। কিন্তু জমিদারেরাও আবার বিলাসী এবং স্বার্থপর। আমার তাই প্রথম লক্ষ্য হল নিজের জমিদারীকে আদর্শ করে অপর জমিদারদের উদাহরণ স্বরূপ হওয়া। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, জনসাধারণের হিতের জন্য কোন কাজ করতে গেলেই সর্বপ্রথম গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যেতে হবে। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। গভর্ণমেন্টের স্বার্থের সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধ ঘটলেই

গভর্ণমেন্ট তার শাসনযন্ত্রটা বিরোধীদের বুকের উপর চালিয়ে দিয়ে সব কাজ পণ্ড করে দেয়।

তাই আমি যথাসম্ভব বিরোধভাব কাটিয়ে কাজে অগ্রসর হয়েছি। যেখানে তবুও বিরোধ ঘটেছে সেখানে বরং নিজের স্বার্থ নষ্ট করেছি। এখন আমি য়ুনিয়ান বোর্ডের প্রথম শ্রেণির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। য়ুনিয়ান কোর্টে আমার প্রজারা আমার বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে আছে, আদালতে আর বড়ো একটা কাউকে ছুটতে হয় না। জাতীয়তাবাদীরা হয়তো আমার এই গভর্ণমেন্ট প্রীতি দেখে নাক সিট্‌কাতে পারে কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার প্রজাদের, জমিদারীর উন্নতি চেয়েছি, পেয়েছি। আমার আদর্শে সমস্ত দেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক, এই আমি চাই। আমার স্কুলে–ভাল কথা, চল আমার নতুন ধরনের স্কুল দেখবে চল।" বলে হরগোবিন্দ ললিতের হাত ধরে স্কুলের পথে হেঁটে চললেন।

কয়েক বিঘা বিস্তৃত সম-চতুষ্কোণ একটা আমের বাগান তারই মধ্য দিয়ে একফালি সুদৃশ্য পথ ওপারে গিয়ে স্কুলে পৌঁছেছে। মাঝপথে একটা ঘন ছায়াবিশিষ্ট আমগাছের তলায় বসেছিল মনোরমা, রেণুকা আর নবকুমার। ওরা যেতেই তারা উঠে দাঁড়াল। হরগোবিন্দ মনোরমার পাউডার-ঘসা সুগৌর মুখ, হিল তোলা জুতো এবং মেমসাহেবী ধরনের গাউন পরা দেখে হেসে বললেন, "তোমাকে সত্যই আমি মেমসাহেব বলে ভুল করেছিলাম মা।"

ললিত বললেন, "ওর কেমন একটা স্বভাব, শাড়ি, সেমিজ আদৌ পরতে চায় না। কত নিষেধ করি শোনে না।"

নবকুমার রেণুকার হাত ধরে ললিতের দিকে চেয়ে বললে, "But she looks more beautiful in these attires. Do not she?"

ললিত রেণুকার কচি গালে দুটো টোকা মেরে হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ।"

রেণুকা কিন্তু নবকুমারের হাত ছেড়ে দিয়ে হরগোবিন্দের কাছে গিয়ে বললে, "বাবা এর পর থেকে আমি কিন্তু আর এসব পরব না। মনোদির মতো আমার পোশাক হওয়া চাই।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। নবকুমার মনে মনে ক্ষুণ্ন হল, হাসিতে যোগ দিতে পারল না।

তাঁদের হাসির ঝলক থামতে না থামতে বছর তিনের একটি মেয়ে হেলতে দুলতে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল তাঁদের কাছে। মনোরমার মেয়ে সে। আয়া তাকে নিয়ে ওদিকে খেলাচ্ছিল। সে এসে কারো দিকে না চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল মনোরমার কোলে। মনোরমা ব্যস্ত হয়ে বললে, "আমার দিকে এগিয়ো না বলছি, এখনি সব ময়লা করে দেবে।"

মেয়ের চক্ষু সজল হয়ে এল। ললিত ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "এস আমি তোমায় কোলে নেব।" বলে, তাকে কোলে নিয়ে আদর করে আয়ার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আবার দুই বন্ধুতে চলতে শুরু করলেন।

চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় হরগোবিন্দ বললেন, "তোমার ছেলে এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে না?"

"হ্যাঁ। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে। ওকে শীঘ্র বিলাতে পাঠাব ঠিক করেছি ডাক্তারী পড়তে।"

হরগোবিন্দ কথাটা যেন লুফে নিলেন। বললেন, "আমিও ঠিক তাই বলতে যাচ্ছিলাম। নবকুমার ডাক্তার হয়ে আসুক, কিন্তু ওকে ভাই আমাকে দিতে হবে। আমি এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করব স্থির করেছি। তার জন্য সত্যকার ভালো ডাক্তার এমন একজন দরকার, যে হবে আমার নিজের লোক। আমার অই একমাত্র মেয়ে, ছেলে নেই। নবকুমারকে যদি পাই তাহলে মরবার সময় আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।"

ললিত হেসে বললেন, "তুমি যে নবকুমারকে দেখেই ঘটকালি শুরু করে দিলে। তা যা হোক, নবকুমারের ভালো ডাক্তার হবারই সম্ভাবনা এবং ওকে আমি তোমাকেই দেব।"

ততক্ষণে তারা স্কুলের প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে জমিদারকে দেখে শিক্ষকগণ এসে অভিবাদন জানালেন। হরগোবিন্দ বললেন, "এঁরা সব আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমার এ বিদ্যালয়ের দুটো বিভাগ–প্রাথমিক আর নির্বাচন। প্রাথমিক বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ইচ্ছাধীন করে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক বিভাগের নির্বাচন পরীক্ষার ভার কমিটির উপর। তাঁরা ছেলেদের ভালো মত পরীক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ছেলের অভিভাবকের পরিদর্শন তালিকার উপর লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ছাত্রকে রুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী নির্বাচন বিভাগের বিশেষ বিশেষ শ্রেণিতে পাঠান হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য যে স্বল্প সংখ্যক ছাত্র অবশিষ্ট থাকে তারা প্রায় প্রত্যেকেই ভালো ফল করে। তারপর আবার তাদের অবস্থা ও রুচি অনুযায়ী কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করা হয়। যারা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য না যায় তাদের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও কিছু কিছু ব্যবসা প্রভৃতি নির্বাচন বিভাগের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রণালীতে চলে আমি আশাতীত রূপে ফল পেয়েছি।"

এই সময় ড্রাইভার এসে জানাল, যাবার সময় হয়েছে, গাড়ি রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছে। ললিত বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ললিত এসেছিলেন সে জেলায় মাস কয়েকের জন্য। তাঁর সেখানে কার্যকাল শেষ হয়ে যেতেই তিনি চলে গেলেন বাঙলার অপর প্রান্তে। চিঠিপত্র আদান প্রদান অবশ্য মাঝে মাঝে চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন খবর এল ললিতের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়েছে। নবকুমার তখন বিলাতে।

তারপর ক্রমে ক্রমে হরগোবিন্দ নবকুমারের চিকিৎসক হিসাবে অসামান্য সাফল্য সুনামের কথা শুনলেন। শুনে নিজের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন; কিন্তু যে আশার দীপ তিনি এতদিন অন্তরের মধ্যে জ্বেলে রেখেছিলেন, নবকুমারের কলকাতার ডাক্তারদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকারের সংবাদে তার দীপ্তি গেল কমে। তাঁর হাসপাতাল গৃহ তখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, রোগীদের ঘরের জন্য খাট বিছানার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। রেণুকা একদিন বললে, "বাবা, নবকুমার না হলে যে তোমার হাসপাতাল চলবে না, এ ধারণা তোমার কেমন করে হলো, তা বুঝতে পারছি না।"

হরগোবিন্দের মুখের উপর দিয়ে একটা ম্লান হাসির রেখা ভেসে গেল। কেন যে নবকুমারকে তাঁর দরকার তা তিনি মুখ ফুটে মেয়েকে বলতে পারলেন না। রেণুকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ; হরগোবিন্দ যে আদর্শে তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, রেণুকা সে রকমটি হয় নি। তিনি তাতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মেয়ের কাছে সে ভাব প্রকাশ করেন নি। ভেবেছিলেন নবকুমারের সাথে রেণুকার বিবাহ দিলেই সব কূল রক্ষা পাবে। নবকুমার ধীর স্থির কর্তব্য পরায়ণ, তিনি যে আদর্শ নিয়ে এতকাল কাজ করে এসেছেন নবকুমারের দ্বারা তার সম্মান ব্যাহত হবে না। এমনি সময় একদিন অকস্মাৎ তিনিও পরলোকের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর সব কাজ রইল পড়ে। কলেজে পড়তে পড়তে রেণুকার কলকাতার সৌখিন সম্প্রদায়ের জাঁকজমকের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছা জন্মেছিল; বাপের ভয়ে পারে নি। এবার হল সম্পূর্ণ স্বাধীন, কলকাতায় গিয়ে তার এ প্রভূত অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। ডেকে পাঠাল নবকুমারকে, ওরই সাহায্যে সে সেখানে ঠাঁই করে নেবে।

চার

আহারের মধ্যেও এত আনন্দ থাকতে পারে নবকুমার তা আজ প্রথম অনুভব করলেন। পিসিমা ব্রজরাণী কাছে বসে থেকে খাইয়েছেন। রেণুকা স্বহস্তে সব প্রস্তুত করে নিজের হাতে পরিবেশন করেছে। খাওয়াতে এত আরাম তিনি কখনও পান নি।

আহারান্তে ঘরে এসে বসতেই তিনি দেখতে পেলেন, টেবিলের উপর আরও দুটো নূতন জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে, পানের ডিস একটা, আর একটা সিগারেটের টিন। নবকুমার পান খান না, কিন্তু রেণুকার হাতের সাজা পান খাবার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। একটু ইতস্তত করে পানের ডিসে হাত দিতে যাবেন এমন সময় রেণুকা এল এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে। নবকুমার বিস্মিত হয়ে বললেন, "একি তামাক কি হবে?"

রেণুকা হেসে বলল, "কেন তামাক কি খান না?" রেণুকা কলকেতে ফুঁ দিচ্ছিল, আগুনের সোনার আভা তার সারা মুখে পড়ে সুন্দর মুখখানিকে সুন্দরতর করে তুলেছে। নবকুমার সেই দিকে চেয়ে কথার জবাব দিতে ভুলে গেলেন। রেণুকা বললে, "খুব ভাল তামাক, এখানে বসে গড়গড়া টানলে আপনার সাহেবিয়ানার অপলাপ কেউ দেখতে পাবে না।"

নবকুমার হেসে বললেন, "সাহেবিয়ানার পক্ষে আমি নই। তবে কি জানেন, সুবিধার জন্য ওদের পোশাক পরতে হয়। সাহেব বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলে বা দিদির দৌলতে দু'একদিন সাহেবী খানা না খেয়ে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনে প্রাণে স্বদেশী।"

"তবে আর কি, তামাকের সেবা হোক"–বলে রেণুকা গড়গড়ার উপর কলকে চাপিয়ে দিয়ে নলটা নবকুমারের দিকে এগিয়ে দিল।

নবকুমার ডিস থেকে দুটো পান তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে গড়গড়ার নলে একটা টান দিলেন। সুগন্ধি নরম তামাক। অনভ্যস্ততার জন্য তবু একটু অসুবিধা হল; কিন্তু দু' একবার কেশেই সব ঠিক হয়ে গেল।

নবকুমার যেন আজ স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্নে যেমন মানুষের নিজের উপর শক্তি থাকে না, নবকুমারেরও তেমনি সব শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। গত কল্য রাত্রি থেকে এই এখন পর্যন্ত তিনি যেন স্বপ্নই দেখছেন। কিন্তু শেষের দিকের স্বপ্নটা বড়ো সুন্দর। স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল কক্ষ, অদূরে রেণুকা। সে তাকে নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছে, পান সেজে দিয়েছে, তামাক এনে দিয়েছে আর এখন এই নির্জন কক্ষে অই ওখানে তারই দিকে চেয়ে বসে আছে। তামাকের নেশায় এবং কল্পনার মোহে নবকুমারের চক্ষু দুটি মুদে এল। রেণুকা লক্ষ্য করে বললে, "আপনার ঘুম পেয়েছে। ঘুমোন এখন। খুব ভোরেই উঠে দুজনে বেড়াতে যাব। ভোরে ওঠেন তো আপনি?"

নবকুমার লজ্জিত হয়ে বললেন, "ঘুম পায়নি আমার। বসুন আপনি।"

রেণুকা হেসে বললে, "বাঃ, একজন চোখ মুদে চুপচাপ গড়গড়া টানবে, আর একজন বসে বসে তাই দেখবে! বেশ বিবেচনা আপনার। এমন জানলে কে তামাক সাজত। না, সত্যিই আপনার ঘুম পেয়েছে। আমি আসি" বলে রেণুকা নবকুমারের দিকে আর একবার চেয়ে নিয়ে ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নবকুমারের সত্যিই ঘুম পেয়েছিল। কিন্তু বিছানায় এসে শুতেই চোখের ঘুম পালিয়ে গেল। তারপর ঘুম না আসা পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে এমন সব কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল, অন্য সময় হলে যা চিন্তা করা তিনি পাপ বলে মনে করতেন।

পরদিন প্রাতে দুজনে হেঁটে চলল বাঁধা সড়ক ধরে। সূর্য উদয়ের পূর্বেই তারা বেরিয়েছে। বাঁ-পাশের আমের বাগানে তখনো তরল অন্ধকার; গাছে গাছে পাখিরা এই সবে জাগতে শুরু করেছে। রেণুকা নবকুমার নীরবে পথ চলছে; কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ চলে তারা হাজির হল একটা পুকুরের কাছে। বাঁধানো ঘাট, উপরে ঠেস দেওয়া বেঞ্চের মত তৈরি দুটো আসন। রেণুকা বললে, "চলুন বসি গিয়ে ওখানে। একটু পরেই রোদ আসবে। শীত করছে না আপনার?"

নবকুমার বললেন, "না, বেশ লাগছে। চলুন বসি গিয়ে।" একই আসনে দুজনে বসল পাশাপাশি। পূর্বদিক তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই দিকে চেয়ে নবকুমার বললেন, "আজ এত ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে, যেন জীবনে এই প্রথম সূর্যোদয় দেখতে এসেছি।"

রেণুকা বললে, "তবে যে কলকাতা থেকে এসেই আমার উপর বড়ো রেগেছিলেন।"

নবকুমার কিছু না বলে একটু হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনার নিজের কথা শুনবার আগে আমারও কিছু করবার আছে।" বলে পকেট থেকে রেণুকার দেওয়া চেকখানা বের করে আবার বললেন, "আমি এটা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।"

রেণুকা তড়িৎগতিতে তার কম্পিত আঙুল দিয়ে নবকুমারের হাতখানা ধরল। মিনতি ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে বললে, "না, আপনি যদি নিজে নিতে না পারেন তাহলে কোন হাসপাতালে দান করে দেবেন। তা না করলে সত্যই আহত হব। আমার

জন্য আপনার এখানে আসায় হয়ত অনেকের ক্ষতি হয়েছে, এ টাকা তাদের ক্ষতিপূরণেও লাগতে পারে।"

এই অনুরোধে নবকুমার সন্তুষ্ট হলেন। এতে রেণুকার হৃদয়ের উদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, "কিন্তু আপনার কি আজ না গেলেই নয়?"

নবকুমার বিস্মিত হলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরে একটা অজানা পুলকের হিল্লোল বয়ে গেল। করুণাময়ী মা, স্নেহশীলা বোন, প্রেমময়ী পত্নী, বিদেশযাত্রী সন্তান, ভাই বা স্বামীর জন্য বোধ হয় এমনি কণ্ঠ সুধাই সংগ্রহ করে রাখে। কণ্ঠস্বরের মধ্যে তাদের এমনি মিনতিই বোধ হয় ঝরে পড়ে। নবকুমারের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল। কিন্তু সে আর্দ্রতা যথাসাধ্য গোপন করে মুখে খানিকটা হাসি এনে বললেন, "কেন বলুন তো?"

রেণুকা রাঙা হয়ে উঠল। ক্ষণিকের জন্য। বললে, "এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা বাবার প্রতিষ্ঠিত ইস্কুল, হাসপাতাল না দেখে যান না। দেখবেন না সে সব কিছু?"

নবকুমার বললেন, "কলকাতায় আমার এত কাজ পড়ে রয়েছে যে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। যদি কখনও সুযোগ হয় নিশ্চয় এসে দেখে যাব। বাবার সঙ্গে এসে আপনার বাবার অনেক কীর্তি আগে দেখে গেছি। এখন সে সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। 'লন্ডন ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলিতে' একটি আদর্শ ভারতীয় গ্রাম দিয়ে রাঙামাটির ছবি বেরিয়েছে, দেখেছি। তখন কিন্তু সে রাঙামাটি যে আমার দেখা তা মনে পড়েনি।"

রেণুকা মনে মনে বললে, "আবার ভুলতে কতক্ষণ?"

সূর্য তখন পূর্বদিক রঙিন করে আকাশের অনেকখানি উপরে উঠেছে। শীতের সুখস্পর্শ সোনার রোদে সারা পৃথিবী ভেসে গেছে। সেই রোদ এসে পড়েছে রেণুকা নবকুমারের সারা শরীরে। রেণুকার রোদে-ধোয়া দেহখানি আরও কমনীয় আরও মধুর দেখাচ্ছে। তার কাঁধের উপর চাপানো কাশ্মিরী সবুজ রঙের আলোয়ান খানার ধার দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। মাথার কাপড় সরে গিয়ে সমুখের চুলগুলো বের হয়ে গেছে। সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রোদ ঢুকে চুলের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

নবকুমার সমুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, মাঠে মাঠে হল্‌দে রঙের অজস্র সরিষার ফুল ফুটে রয়েছে। পাশে সাদা কাশের ফুলের মত আখ ফুলের রাশি বাতাসে দোল খাচ্ছে। সব কিছুই রৌদ্র-ধৌত, অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত। দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে নবকুমার রেণুকার দিকে চাইলেন। রেণুকাও ঠিক সেই সময় নবকুমারের দিকে চেয়েছে। রেণুকার সহিত দৃষ্টি মিলতেই আজ সর্বপ্রথম কর্তব্যপরায়ণ নীরস হৃদয় ডাক্তার একটা অজানা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন।

সেই লজ্জা সামলাতে তাঁর কয়েক মিনিট কেটে গেল। পরে বললেন, "কিন্তু আপনি তো নিজের কথা কিছু বললেন না?" নবকুমারের স্বভাবতঃ কর্কশ কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে এত কোমলতা, এত মাধুর্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা তিনি নিজেই জানতেন না।

রেণুকা আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললে, "দেখুন এখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না।"

নবকুমার সে কথার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিরেণুকার উপর স্থাপন করে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন, "মানে—?"

রেণুকা হাসল। বললে, "মানে, এত বড়ো জমিদারী–শুধু জমিদারী নয়, হাসপাতাল, স্কুল, কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ আমাকে দেখতে হয়। অবশ্য প্রতি বিভাগেই উপযুক্ত লোক আছে। কিন্তু সকলের বিশ্বাস আমি সবার চাইতে ভালো বুঝি"–বলে সে চুপ করল।

নবকুমার প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "সে তো ভালো কথা? নিজের কাজ নিজে দেখবেন, এর মতো আর ভালো জিনিস নেই।"

রেণুকা বললে, "আমি কিন্তু তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছি। "তাই –"

নবকুমারের একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞাসা করেন রেণুকা এখনও বিবাহ করে নি কেন? কিন্তু কথাটা একজন তরুণীকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে কিনা তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

রেণুকা বলে চলল, "তাই আমি ঠিক করেছি এরপর থেকে কলকাতায় গিয়ে থাকব। টাকার আমার অভাব নেই, আর টাকার অভাব না থাকলে কলকাতার বন্ধু-বান্ধবের, আমোদ-প্রমোদের অভাব হবে না।"

নবকুমার নির্বাক হয়ে গেলেন। এই একটু আগে যে রমনী তাঁর ধারণার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, মুহূর্তের মধ্যেই সে আবার ধূলিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মুখের ভাব ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসতে লাগল।

রেণুকা কিন্তু তা লক্ষ্য না করেই বলে চলল, "আমি কলকাতায় গিয়ে বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা বাড়ি নেব। কিন্তু একেবারে নির্বান্ধব হয়ে যাওয়াটা আমি ভালো মনে করি না। প্রথম আলাপটা আপনাকেই করিয়ে দিতে হবে। মনোরমা হয়ত আমাকে ভুলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আপনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন, তা হলেই হল। তা হলেই আমি সব ঠিক করে নিতে পারব।"

মনোরমার সম্বন্ধে নবকুমারের একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল। রেণুকার কথাতে সেই অজ্ঞাত ক্ষত স্থানেই যেন আঘাত পড়ল। মনোরমা বিনয়েন্দ্র–স্বামী স্ত্রী উভয়েই অমিতব্যয়ী। তাঁদের সেই অমিতচারিতার সুযোগে সবাই মিলে তাদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। আজ রেণুকা আবার ওদের মতোই দরাজ হাতে সবার সমুখে যেতে চায়। সে টাকা দিয়ে আনন্দ কিনবার ইচ্ছা করে।

যে পুরাতন কলকাতার সুষ্ঠু আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকটি সুনির্বাচিত বন্ধুর সহিত তাঁর মাতা চলাফেরা করতেন সে কলকাতা আর নেই। তার স্থানে স্টাইল সর্বস্ব মহিলারা ঘোরাফেরা করে। উচ্চশিক্ষিত পুরুষেরা বিনা দ্বিধায় তাদের স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত মেলামেশা হাসি-পরিহাস নিজের চোখে পরিদর্শন করছে। সুবিধাই হয়ে উঠেছে এখন বিবাহের চরম উদ্দেশ্য। সেই সমাজে মিশবার জন্য এক চপলমতি তরুণী তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছে।

নবকুমার অনেকক্ষণ নীরব থেকে শেষে বললেন, "আপনার এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার চেয়ে আরও ভালো এবং মহত্তর পথ আছে সেই পথই বেছে নেন্‌না কেন? অন্য কোন কাজ না থাকে, দেশ বিদেশে ঘুরে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখে বেড়ান। আপনার কাছ থেকে কি পেতে পারে তার প্রত্যাশা না করে যারা আপনার জন্যই আপনার বন্ধুত্ব চাইবে তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করুন। মনোরমাদের আমি চিনি। তাদের

সমাজ চমকপ্রদ এবং অনেকের আকাঙ্ক্ষিত তা সত্য, কিন্তু ওরা হচ্ছে সুদৃশ্য বার্ণিশ করা জাপানী জিনিসের মত। বাইরের চমৎকারিত্বে ভিতর বুঝবার জো নেই। আপনার মত সংসার অনভিজ্ঞা একজন তরুণী গিয়ে সেখানে আনন্দ না পেয়ে দুঃখই পাবেন; মানুষের উপর বিশ্বাস আপনার টুটে যাবে। যখন সব ভাগ্য অন্বেষণকারীর দল আপনার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াবে, তখন আপনি কি করবেন বলুন তো?"

নবকুমার ক্ষণিকের জন্য অন্তরের তিক্ততা বিস্মৃত হয়ে রেণুকার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন। তার জন্য যে নবকুমার বিবেচনা করে কথা বলছেন তাতে রেণুকাও অন্তরের মধ্যে একপ্রকার বিজয়ের আনন্দ অনুভব করল। বললে, "বাবার মৃত্যুর পর এতবড় জমিদারী আমাকে একাই দেখতে হয়। ভয় জিনিসটা আমার মধ্যে খুব কমই আছে। আর মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা যদি বলেন, তাও আমার যথেষ্ট আছে। বাহির থেকে মাত্র আপনি আমাকে বিচার করছেন। আর একটা কথা শুনলে বোধ হয় আপনি হাসবেন। আমারও একটা নিজস্ব দার্শনিক মত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে,যারা উপায় থাকতে ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে একটা মাত্র দিকে ফেলে রাখে, তাদের মত মুর্খ আর নেই।

আমি জীবনটাকে সবরকমভাবে আস্বাদন করতে চাই। ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সব রকম লোকের সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ হতে চাই, তার সুযোগও আমার রয়েছে। আপনি কি মনে করেন, আমি না ভেবে-চিন্তেই আপনাকে এখানে ডেকেছি? আজকার এই দিনটা বহুকাল ধরে আমার মনের মধ্যে ছিল। কতদিন থেকে আপনাকে ডাকব বলে মনে করেছি, কিন্তু লজ্জায় পারি নি। শেষে প্রয়োজন লজ্জাকে জয় করল। আমি বিশ্বাস করি না যে, এই সামান্য কাজটুকু আপনি আমার জন্য করবেন না।" বলে সে চুপ করল।

নবকুমার বললেন, "কি বিশ্রী কাজের ভার আপনি আমার উপর চাপাচ্ছেন তা বোধ হয় জানেন না। সত্যি বলছি আপনাকে, আপনি যে সমাজে মিশতে চাচ্ছেন, সে সমাজকে আমি ঘৃণা করি, অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তা যাক্, মনোরমাকে আপনার কথা বলব। সে আপনাকে পেলে নিশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু যে স্বর্ণমৃগের লোভে আপনি সেখানে যেতে চাচ্ছেন তা সত্যই স্বর্ণ নয়। উপরে পালিশ করা বুঝবার উপায় নেই। অবশ্য কিছুদিন থাকলেই বুঝবেন।"

রেণুকা বললে, "আপনার পাদ্‌রী হওয়া উচিত ছিল। গীর্জা ঘরে আপনার গলা বেশ খাপ খাবে।"

ব্রজরাণী ঠিক করে রেখেছিলেন যে, নবকুমার এলেই তাঁর সঙ্গে রেণুকার বিবাহের ঘটকালী তিনি নিজেই করবেন। কিন্তু রেণুকা এমনি যে নবকুমারকে বাইরে বাইরে নিয়েই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দিল। তিনি কথা পাড়বার সুযোগই পেলেন না। তখন ব্রজরাণী নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, রেণুকা সোমত্ত মেয়ে, নিজের ভালমন্দ সে ভালো করেই বুঝে। সে কি আর নবকুমারকে এখানে আনবার উদ্দেশ্যটা না বলবে? আর আকজালকার ছেলে-মেয়েরা নাকি নিজেদের বিবাহের কথাবার্তা নিজেরাই চালাতে

ভালবাসে। তাই, রেণুকা যখন নবকুমারকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে ফিরে এল তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর সব ঠিক হয়ে গেলো ?"

রেণুকা বুঝতে না পেরে বলল, "কিসের?"

ব্রজরাণী মনে করলেন, রেণুকা বুঝতে পেরেও ন্যাকামি করছে। হেসে বললেন, "তোর বিয়ের, আর কিসের? নবকুমার বেশ ছেলে। দাদার পছন্দের তারিফ করতে হবে।"

রেণুকা বাধা দিয়ে বললে, "কি যে বলো তুমি? তাঁকে বিয়ের কথা বলতে যাব আমি?"

ব্রজরাণী আকাশ থেকে পড়লেন। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, ভগবান নবকুমারকে তাদের কাছে জুটিয়ে দিলেন, আর রেণুকা কিনা সেই সুযোগ হেলায় হারিয়ে ফেলল। চিৎকার করে বললেন, "দাদার কি ইচ্ছা ছিল তা কি তুই জানিস না? যদি নিজে না বলতে পারবি তো আমাকে বলতে বললি না কেন?" বলে তিনি অগ্নিবর্ষী চোখে রেণুকার দিকে চাইলেন। রেণুকা মনে মনে পিসিমাকে ভয় করত। সে কিছু না বলে সেখান হতে সরে পড়ল।

পাঁচ

মাস দুই পরে রেণুকার কাছ থেকে নবকুমার একখানা চিঠি পেলেন :

> প্রীতিভাজনেষু,
>
> আশা করি আপনি আমার কথা ভুলে যাননি। আমি গতকাল কলকাতায় এসেছি। আমার কথা শীঘ্রই মনোরমাকে জানালে বাধিত হব। তিনি যদি আমাকে তাঁর বাড়িতে আহ্বান করেন তা হলে নিজেকে অনুগৃহীত মনে করব। ইতি–
>
> রেণুকা।

কলকাতার বুকের উপর দিয়ে তখন বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করেছে। পাশের বাড়ির খাঁচার কোকিলের কণ্ঠ গেছে খুলে। সযত্ন রক্ষিত শিরীষ গাছটায় রেশমের মত চুল মাথায় ফুল পরিয়ে ফাগুনের হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। মানুষের রচিত নগরের উপরেও ফাগুণ তার রঙিন হাতের পরশ বুলাতে ভুলে নি। নবকুমারের মনেও রঙ ধরেছে।

রাঙামাটি হতে আসার পর থেকেই নবকুমারের মনের আকাশে শরৎকালের রোদমাখা লঘু মেঘের মতো রেণুকার কথা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রজনীর অন্ধকারে ছাদে একলা বসলে কার দুই চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি তার সমুখ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। এমন সময় এল রেণুকার চিঠি।

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত চিঠি তাঁর ভালো লাগল না। দুঃখের বিষয়, এই কথাগুলি ছাড়া চিঠির শেষে একটুখানি 'পুনশ্চ'ও নেই।

দীর্ঘ চিঠি অবশ্য নবকুমার পছন্দ করেন না। চিঠি হবে টু দি পয়েন্ট, বাজে কথা দিয়ে চিঠির বুক পূর্ণ করার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু রেণুকার কথা হচ্ছে স্বতন্ত্র।

তাকে আর পাঁচজনের মত ভাবতে তিনি পারেন নি। তাঁর কাছে রেণুকা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। তিনি তাকে ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। তার রহস্যময় চোখের কুহেলিকা ভেদ করতে তিনি অক্ষম। তার সুকোমল তনু দেহের লাবণ্য, গর্বিত মরালোপম গ্রীবা সঞ্চালন, তার পবিত্র অন্তরের সারল্য তাঁকে মুগ্ধ করে তুলেছে।

যে পথে রেণুকা নিজেকে পরিচালিত করতে চায়, সে পথের উপর সহানুভূতি নবকুমারের নেই। দূর পথ দেখে তার সৌন্দর্যে রেণুকা আকৃষ্ট হয়েছে, দূরের মায়া মনোহারিণীই বটে। সেই পথ সম্বন্ধে যখন রেণুকা সত্যকারের অভিজ্ঞতা লাভ করবে তখন হয়ত সে আর এই পথে যেতে চাইবে না; তার সারল্য, তার ব্যক্তিত্ব কখনো তাকে ভুল পথে থাকতে দেবে না।

রেণুকার সরলতার সঙ্গে মনোরমাদের কৃত্রিমতার তুলনা করতে গিয়ে নবকুমার ব্যথিত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ আজ তাঁর মনে হল তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ।

জানালার পাশের রাস্তা দিয়ে এক বাঁশীওয়ালা এক তাড়া বাঁশী বগলে নিয়ে একটা বাঁশের বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলেছে। তার বংশীধ্বনিতে বসন্তেরই কণ্ঠ যেন ধ্বনিত হয়ে উঠল।

এই বাঁশী তাকে গ্রাম্য গোচারণ মাঠে রাখাল বালকের সরল উদাস বাঁশীর সুর মনে করিয়ে দিল। জীবন স্বভাবতঃ নিঃসঙ্গতা বিরোধী। বসন্ত হচ্ছে মিলনের প্রতীক। নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তরে এই সময় ব্যথাটা যেমন বেজে উঠে, এমন কোন সময় নয়। নবকুমারের সমস্ত অন্তর আজ হাহাকার করে উঠল।

কিন্তু রেণুকাকে তিনি যে উত্তর লিখলেন তা অতি সংক্ষিপ্ত, যেন টেলিগ্রাম–

যা বলেছেন করব।– নবকুমার।

ছয়

বাইরের মোটর অপেক্ষা করছে। মনোরমা সাজ-পোশাক করে এই একটু পরে বৈকালিক ভ্রমণে বেরোবেন। এমনি সময় হঠাৎ এসে দেখা দিলেন নবকুমার। মনোরমা বিস্মিত হলেন। নবকুমার যখন আসেন তখন অবশ্য আকস্মিকই আসেন; কিন্তু অসময়ে আসেন না।

নবকুমার এসেই আসন গ্রহণ করে বললেন, "তোমার বেড়াতে যাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখতে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার একটা কাজের কথা আছে। মনোরমার বিস্ময় বেড়ে গেল। তাঁকে কাজের কথা শুনবার উপযুক্ত নবকুমার এই প্রথম মনে করলেন। বললেন, "ব্যাপার কি?"

নবকুমার তার মুখের বিস্ময় দেখে হেসে বললেন, "এমন কিছু নয়। বাবার বন্ধু হরগোবিন্দের নাম বোধ হয় তোমার অজানা নয়। তাঁর মেয়ে রেণুকা পিতার মৃত্যুর পর বিস্তর টাকা এবং অনেক সম্পত্তি হাতে পেয়েছেন। তিনি অনেক কাল কলকাতায় থেকে কলেজে পড়লেও কলকাতার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় করে উঠতে পারেন নি। এখন সেই ভুল শুধরাবার জন্য এখানে আসতে চান। তিনি সুন্দরী তরুণী।"

মনোরমা প্রতি কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, "সুশ্রী, বয়স কম, আর স্বামী ছেলে পিলে?"

নবকুমার মাথা নেড়ে বললেন, "বিয়ে করবার তাঁর সুযোগই হয় নি।"

'অবিবাহিত' বলে মনোরমা একটুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "তা হলে আমাদের হিরণের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক। বেচারা মাইনের টাকাতে কুলিয়ে উঠতে পারে না। একজন ধনী শ্বশুরের সন্ধান করছে। রেণুকাও নিশ্চয় একজন সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে নিজেকে আবদ্ধ করতে রাজী হবে। কি বল? তার খুবই টাকা আছে তো?"

হিরণ মনোরমার দেবর। আই, সি, এস এ অকৃতকার্য হয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরে একটা বেসরকারী কলেজে প্রফেসারী করছে।

নবকুমার বিশুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করলেন, "রেণুকা নিজ মুখে বলেছেন যে, তাঁর এত অর্থ আছে যা তিনি কেমন করে খরচ করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না।"

নিজের কণ্ঠস্বরের মধ্যে নবকুমার একটা তিক্ততা অনুভব করলেন। তাঁর কণ্ঠের তিক্ততা এসে বাসা বাঁধল তাঁর হৃদয়ে। ক্ষণিকের জন্য রেণুকার সুন্দর মুখখানি তাঁর মনের মাঝে উঁকি মেরে সরে গেল। বললেন, "হিরণের মতো অবিবেচক, অপরিণামদর্শীর হাতে পড়ার চেয়ে তার অবিবাহিতা থাকাই ভালো, রেণুকার প্রকৃতি হচ্ছে বন্য হস্তিণীর মতো। তার পাত্র হবে সক্ষম ও শক্তিমান।"

মনোরমা ক্রুদ্ধ না হয়ে বিস্মিত হলেন। নবকুমারের কথার উত্তাপ লক্ষ্য করে তাঁর মনে একটা সন্দেহ উঁকি মারতে লাগল। তা হলে কি এই নীরস কর্তব্য পরায়ণ চিকিৎসকের কঠোর অন্তঃকরণ সেই তরুণীর তারুণ্যের প্রভায় বিগলিত হয়ে গেছে? তা হলে তো হিরণের নাম উল্লেখ করে তিনি অন্যায় করেছেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্নেহপ্রবণ অন্তঃকরণ কনিষ্ঠের জন্য ক্ষণতরে সজাগ হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বললেন, "অবশ্য আমি হিরণকেই বিয়ে করতে বলি না। তবে সে যদি নেহাৎই বিয়ে করতে চায়, তা হলে অন্য পাত্রের হাতে পড়ার চেয়ে হিরণই ভালো। এই বলতে চাইছিলাম। আমি কালই তার সঙ্গে দেখা করব। তার ঠিকানাটা বলে দাও তো।" বলে তিনি তাঁর নোট বুকের মধ্যে রেণুকার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন।

নবকুমার বললেন, "রেণুকা নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে খুব খুশি হবেন।" কিন্তু নবকুমার নিজে খুশি হবেন, না দুঃখিত হবেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

"আমাকে বন্ধু হিসাবে পেলে যে তাঁর লোকসান হবে না, তা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি। আমি তাঁকে সৎ পরামর্শই দেব।" বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আবার বললেন, "অন্তত একজন মেয়ের ওপরেও যে তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, তা জেনে সত্যই খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।"

নবকুমার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে আমার!"

"আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমার শ্রদ্ধা নেই, তা আমি জানি। কিন্তু আর সব বিষয়ে যাই বলো, একটা বিষয়ে আমার বুদ্ধিটাকে তুমি তুচ্ছ করতে পারবে না। তুমি বলছ যে, রেণুকা সুন্দরী, তার প্রকৃতি হচ্ছে বন্য হস্তিণীর মতো, নিশ্চয় এসব তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রোগিনী ভিন্ন অন্য কোন মহিলা নিয়ে তো তোমাকে কখনও মাথা

ঘামাতে দেখি নি। রেণুকা তোমার চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন রোগে ভুগছে?" বলে তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। নবকুমারও তাঁর হাসিতে যোগদান করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু হাসি এল না।

সেদিন রাত্রে মনোরমা বিনয়েন্দ্রকে বললেন, "এতদিনে মদনদেব আমার ভাইটিকে নিয়ে একটু রসিকতা করছেন।"

বিনয়েন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, "নবকুমার হচ্ছে একজন মানুষের মতো মানুষ। মদন দেবের শরগুলো যতই তীক্ষ্ণ হোক, ওর গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না।"

মনোরমা বিদ্রূপ করে বললেন, "তা হলে বল যত সব অমানুষেরা মদন দেবের শরে আহত হয়। তুমি উপস্থিত কোন শ্রেণিতে আছ?"

বিনয়েন্দ্র বিদ্রূপটা বেমালুম হজম করে নিয়ে বললেন, "মেয়েগুলো হচ্ছে অন্তঃসারহীন। নবকুমার সে কথা খুব ভাল করে বুঝেছে বলেই এত উঁচুতে উঠতে পেরেছে।"

মনোরমা বাধা দিয়ে বললেন, "সেই মেয়ে মানুষেই এবার ওকে পেয়ে বসেছে।"

বিনয়েন্দ্র বিস্মিত হলেন। নবকুমার যে কখনও কারো প্রেমে পড়তে পারে এ বিশ্বাস তিনি সহজে করতে চান না। তার কারণ আছে। প্রেমে পড়লেই মানুষ বিয়ে করে, এবং বিয়ে করলেই তার যা দশা হয়, তা তিনি বেশ ভালো করেই বুঝেছেন। বিশেষতঃ সে মেয়ে যদি মনোরমার মতো হয়। নবকুমারকে তিনি রীতিমতো শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর উন্নতির একমাত্র কারণ তিনি মেয়েমানুষের সঙ্গে সংস্পর্শহীনতা ধরে নিয়েছেন। মেয়েমানুষের হাতে যে একবার পড়েছে তার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। যৌবনের সীমানা ছাড়িয়ে আজ তিনি বনগমনের বয়সে এসে পৌঁছেছেন, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে তাঁর মধ্যে যে প্রেরণা, যে আশা, যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার কোনটিই কি আজ পরিপূর্ণ হয়েছে? কিছুই না। মেয়েরা পুরুষের সাধনা নষ্ট করতেই পারে। মুনিদের ধ্যান ভাঙাতেই তাদের জন্ম। বললেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তো! মেয়েদের তো ও রোগের মতোই ঘৃণা করে।"

"কিন্তু এবার ও তাকে গানের মতো ভালবেসে ফেলেছে। এবার স্টেথিসকোপ ছেড়ে বাঁশী ধরেছে।"

প্রেমে পড়লেই যে মানুষ বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে, এটা বিনয়েন্দ্রর মত নয়, বিশ্বাস। বললেন, "তোমার ভাইটি যে শেষে আমাদের দলের খাতায় নাম লেখাবে, তার জন্য তোমরা যতই আনন্দ কর, আমি কিন্তু শোকসভার আয়োজন করব। কিন্তু কে সে মোহিনী, যে ওর হৃদয় দুয়ার পঞ্চশরের জন্য উন্মুক্ত করে দিল?"

"শীগগিরই দেখতে পাবে। তাকে নিমন্ত্রণ করব। নাম রেণুকা। কলকাতায় সে টাকা ছড়িয়ে নাম করতে চায়।"

"কিন্তু টাকায় আসক্ত হবার মতো লোক তো নবকুমার নয়।" বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিনয়েন্দ্র আবার বললেন, "আর প্রেম? সেটা যে অতি ভুয়ো জিনিস তা বোধ হয় নবকুমারের অজানা নেই। তবু সে কিসের লোভে বিয়ে করতে যাচ্ছে? তাইতেই বলতে ইচ্ছে হয়, ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তা ভুল। প্রত্যহ কতশত লোক

বিয়ে করছে এবং হাতে হাতে তার ফলও পাচ্ছে, তবু যে লোকে আবার সুখের আশায় বিয়ে করে, এই আশ্চর্য। নবকুমারকে আর কোথাও যেতে হবে না; বিবাহিত জীবন যে কত সুখের, তা, সে তার বোন-ভগ্নীপতির দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে।"

পরিহাসের ভাষা হলেও বিনয়েন্দ্র যা বললেন, তা যে তাঁর অন্তরের কথা তা মনোরমা বেশ ভালো করেই বুঝলেন। বললেন, "বিবাহিত জীবনের ওপর তোমার কেন এত আক্রোশ তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, তার জন্যে দায়ী আমি একা? আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থার জন্য তোমার বিন্দুমাত্র হাত নেই? না, তা নয়। তুমিও ছিলে অন্ধ। তুমি আমাকে সাবধান করতে পারতে, আমার অজস্র বিলাস ব্যয়ের জন্য আমাকে তিরস্কার করতে পারতে। কিন্তু আমরা দুজনেই তখন জাহান্নামে যাবার পথ ধরেছিলাম।"

বিনয়েন্দ্র বাধা দিয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন, "কি বলছ তুমি? জাহান্নামে যাবার পথ ধরেছিলাম আমরা?"

ফ্যাসান আর স্টাইলে প্রভেদ আছে। কালবাচক হচ্ছে ফ্যাসান আর স্টাইল ব্যক্তিবাচক। ফ্যাসান অনুকরণ করা যায়, স্টাইল ব্যক্তিগত ব্যাপার, অননুকরণীয়। স্টাইলের মধ্যে নিজস্বতা, আন্তরিকতা ও সারল্যের ভাব আছে। বিনয়েন্দ্রের হাবভাব, চালচলন যা, তা স্টাইল, ফ্যাসান নয়। তিনি যা করছেন বা যা করেন, তিনি যে রকম ভাবে চলেছেন বা চলেন, তা ব্যর্থ অনুকরণ স্পৃহা দ্বারা উদ্ভূত হয় নি। তাঁর আচার ব্যবহার নিয়ে কেউ কোন কথা বললে তিনি অত্যন্ত আহত হন।

মনোরমার প্রকৃতি হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি চান সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে। এবং এতকাল ধরে চলেও এসেছেন তাই। আর তাঁর সেই বিলাস খেয়াল মেটাতে বিনয়েন্দ্রকে হতে হয়েছে নাজেহাল। বিয়ে করার সময় বিনয়েন্দ্রের হাতে ছিল প্রচুর অর্থ, আর মনোরমাও নেহাত খালি হাতে স্বামীর ঘরে আসেন নি। কিন্তু প্রখর বন্যার মুখে যেমন বড় বড় গাছ পাথরও টিকতে পারে না, বিনয়েন্দ্র-মনোরমার বিলাস প্রাবল্যে তাঁদের অজস্র অর্থ গেল তেমনি আশ্চর্যরূপে উড়ে। যখন বিনয়েন্দ্র সেটা বুঝতে পারলেন তখন তার বয়স চল্লিশের কোঠার শেষের দিকে এগিয়েছে। মনোরমা কিন্তু বুঝেও বোঝেন নি। ঋণ করেও ঘি খাও, এই মহাজন বাক্যটা অনুসরণ করতে গিয়ে বিনয়েন্দ্রকে তিনি ডুবোলেন আকণ্ঠ ঋণে। ডুবে যাবার সময় মানুষ যেমন ক্ষুদ্র খড়কুটোকেও অবলম্বন করতে চায় বিনয়েন্দ্র মাঝে মাঝে তেমনি ক্ষীণ স্বরে মনোরমার আচরণের প্রতিবাদ করতে চান। কিন্তু বৃথা।

শরতের স্বর্ণাভ রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল আনন ও বিলাসের চরম উৎকর্ষ দেখে বাইরের লোকের এই দম্পতির ঋণের কথা জানা সম্ভব ছিল না। চরম অর্থ সংকটের সময়েও কোন বিষয়ে ছাঁটকাট করা ছিল মনোরমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর হৃদয়ের সমস্যার কথা তিনি এমনি সুন্দরভাবে গোপন করে রাখতেন যে বাইরের লোকে তাঁর মুখের হাসিটি দেখেই তাঁর সৌভাগ্যের ঈর্ষা মেশানো প্রশংসা না করে পারত না।

বহুক্ষণ নীরবতার পর বিনয়েন্দ্রই আবার বললেন, "দেখ মনো, আগে যা হবার তা হয়েছে; কিন্তু এখনো কি আমাদের সাবধান হবার সময় আসে নি?"

কি কথার পর কি কথা এসে পড়ল। মনোরমা জানেন যে, সময় থাকতে কথার মুখ অন্যদিক না ফেরালে এমন সব কথা এসে পড়বে যেটা শ্রুতিকটু তো বটেই, উপরন্তু মনের শান্তির পরিপন্থী। নবকুমার আজ তাঁকে যার কথা বলে গেছেন, উপস্থিত তার কথাটাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু প্রীতিপ্রদ ভাবও গজিয়ে উঠছিল মস্তিষ্কে।

স্বামীর কথা শুনে মৃদু হেসে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব লঘু করে তিনি বললেন, "সময় হয়ত এসেছে এবং সেজন্য চিন্তাও যে না করি তা নয়। কিন্তু উপস্থিত ওসব কথা থাক। আমাদের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাভাব আমাদের মনে। যখন দরকার হয়, তখন কিসের অভাব আমাদের থাকে? সভ্যতার প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে এই যে, নিজের সত্যিকারের অবস্থার কথা কাউকেও জানতে দিও না। তা মেনে চলছি বলেই আজও আমাদের আগের মতোই প্রতিপত্তি রয়েছে। আর হাত পাতলেই মহাজনও টাকা দিতে পথ পায় না। কিন্তু উপস্থিত পেশাদার মহাজনের কাছে হাত পাততে হবে না, ভগবান তার উপায় করে পাঠাচ্ছেন।"

বিনয়েন্দ্র কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন। মনোরমা আরও কিছুক্ষণ থেমে বলে যেতে লাগলেন, "নবকুমারের বন্ধু রেণুকাকে আমি নেমন্তন্ন করে পাঠাবো। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবেই কি? আমার বন্ধুত্ব এত তুচ্ছ নয় যে, যে কেউ এসে সেটা দাবি করে বসবে। One must pay for it. নবকুমারকে রেণুকার প্রতি আকৃষ্ট বলে মনে হল। কিন্তু সেটা আমার অনুমান মাত্র। রেণুকাও যদি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্য আমার কিছু ক্ষতি আছে। কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে হিরণের সঙ্গে রেণুকার ভাব করিয়ে দেওয়া। হিরণ যদি ওকে বিয়ে করতে পারে, তাহলে অর্থচিন্তার হাত থেকে আমরা রেহাই পাবই। শুনেছি রেণুকার অনেক টাকা। আর হিরণের মতো গোমূর্খকে আমাদের মতে চালিয়ে নেওয়া কষ্ট নয়। কিন্তু যদি রেণুকা নবকুমারকেই বিয়ে করে, তবু বিয়ের আগে তার কাছ থেকে এমন একটা কিছু আদায় করতে হবে যাতে করে কিছুকাল অন্ততঃ আমাদের টাকা টাকা করে ছুটে বেড়াতে না হয়।"

বিনয়েন্দ্র চুপ করেই রইলেন। মনোরমার কোন কথার বা আচরণের প্রতিবাদ করে আগুনে ঘি ঢালতে তিনি নারাজ। জানেন যে, যা ঠিক করেন তিনি তা করবেনই। তা তাঁর মতের সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক। কিন্তু তিনি বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, রেণুকার কাছ থেকে মনো কি উপায়ে টাকা আদায় করবেন। কিন্তু যখন বলছেন তখন টাকা আদায় করবেন। না দেখা রেণুকার উপর দরদে তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। নিজের স্ত্রীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এমন ক্ষমতা তাঁর নেই।

সাত

মনোরমা যখন রেণুকার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন রেণুকা ছিল বাইরে। ফিরে এসে তার দুঃখের সীমা রইল না। মনোরমা চলে গেছেন। একখানা কার্ডে লিখে রেখে গেছেন–'আগামী শুক্রবার' এই কথাটুকু মাত্র। আজ মঙ্গলবার, বুধ, বৃহস্পতি দুটো দিন মাঝে।

কলকাতাতে পৌঁছানোর পর থেকে রেণুকা তার সুদৃশ্য বাড়িটাকে সুসজ্জিত এবং আধুনিক রুচিসম্পন্ন করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। তার আর একটা বড়ো কাজের মধ্যে ছিল দেশী বিদেশী নানা দোকান ঘুরে পোশাক পছন্দ করা। সাজ-পোশাকে কলকাতার যে কোন ধনী মহিলাকে দিতে হবে টেক্কা, এই হল তার মনের ইচ্ছা।

এখন পর্যন্ত নবকুমারের সঙ্গে দেখা করবার মতো ফুরসৎ সে করে তুলতে পারে নি। মনোরমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগের দিন সে তাঁকে লিখে পাঠাল—আগামীকাল সাড়ে চারটের সময় মনোরমার সঙ্গে দেখা করতে যাব। দুঃখের বিষয়, তিনি যে সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সে সময় আমি বাড়িতে থাকিনি। কাজেই কালই হবে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আপনাকে সে সময় তাঁর বাড়িতে দেখতে পেলে আমার আনন্দের অবধি থাকবে না।

চিকিৎসকের পক্ষে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের দেখা সাক্ষাতের অবসর মেলে খুব কমই। কিন্তু আর একবারের মতো এবারও নবকুমার তাঁর ছোট নোটবই বার করে লিখে নিলেন। রেণুকাকে দেখবার জন্য সময় করে ওঠা চাই-ই। রেণুকার স্বভাব-উজ্জ্বল সরল মুখের কান্তির মধ্যে একটা অনাগারিক স্নিগ্ধতা। নগরের বাইরে না গিয়েও রেণুকার মুখ দেখলে বায়ু পরিবর্তনের কাজ করবে, নবকুমারের এই হল নূতন থিওরী।

চিকিৎসক জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে নবকুমারের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে মন ও দেহ দু'এরই। আহারে রুচি গেছে কমে। রাত্রিতে হয় না সুনিদ্রা, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর তাঁর যে অসাধারণ আকর্ষণ ছিল, ধীরে ধীরে তারও যেন ঘাটতি হচ্ছে। এইসব লক্ষণ যে পরিশ্রমেরই ফল তা ডাক্তার বুঝলেন; কিন্তু এর মধ্যে যে মনসিজের কোনো কারচুপি থাকতে পারে তা তাঁর ধারণায় এল না। কিন্তু ব্যবস্থা নেহাৎ মন্দ হল না। রেণুকা-দর্শনে রোগের উপশম হলেও হতে পারে।

নবকুমারের মনে হল মনোরমার কাছে না হয়ে অন্য কোথাও অন্য কোন রকমে রেণুকাকে দেখতে পেলে বেশ হত। রেণুকার বিত্তের উপর তিনি একটা বিজাতীয় আক্রোশ অনুভব করলেন। এত অর্থ যদি তার না থাকত তাহলে সে মনোরমাদের কৃত্রিমতার মধ্যে এসে পড়ত না।

ধূমধূলিপরিপূর্ণ কদর্য কোলাহল মুখর কলকাতা। বিশ্বমানব আজ যন্ত্রদানবের হাতে হাঁপিয় উঠেছে। যন্ত্রসভ্যতার চাপে মনুষ্যত্বের নাভিশ্বাস বইছে, ভারতে তার চরম নিদর্শন কলকাতার মধ্যে। এখানে তিন শ্রেণির মানুষ। এক, যারা ভিখারী, যারা পরের উচ্ছিষ্ট আহার্য নর্দমা থেকে কুড়িয়ে খায়, অপর, যারা শ্রমিক-মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের যন্ত্রের চাকার তলায় তিলে তিলে দেহ দান করছে। আর একদল হচ্ছে অভিজাত, যারা স্বার্থ ও অর্থের জন্য মনুষ্যত্বকে ভুলেছে, মানুষকে ভোলাতে চাচ্ছে। ভারতের যে নিজস্ব কিছু আছে, তা তারা মানতে চায় না। য়ুরোপীয় সভ্যতার বাইরের আড়ম্বরে যারা নিজেদের ঢেকে রাখতে চায়। সেই অন্তঃসারহীন সমাজের মধ্যে রেণুকা এসে পড়েছে। মায়ামৃগকে সরলা সীতা সোনার হরিণ বলে ভুল করেছে।

কিন্তু ওকে বাঁচাতে হবে। নবকুমার উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, রেণুকাকে রক্ষা করা চাই-ই, যে কোন প্রকারে হোক। মনোরমাদের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে হবে, ওকে অন্য পথ দেখাতে হবে। কিন্তু উত্তেজনার প্রথম ধাক্কার জোর

কমে আসতেই নবকুমারের সাহস গেল উড়ে। মনসিজ আক্রমণ করলে মানুষের কল্পনাশক্তি যেমন প্রখর হয়ে ওঠে, ততোধিক হয়ে ওঠে সে ভীরু। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তার রেণুকার সঙ্গে। ঐ কয়ঘণ্টা আলাপের এমন কি শক্তি আছে যা দিয়ে তিনি রেণুকাকে পথ দেখাবার দুঃসাহস করতে পারেন?

কিন্তু লিখে পাঠালেন, "আমি আগামীকাল আপনার কথামত কাজ করবো।" পরদিন বেলা চারটায় মনোরমার বাড়ির মধ্যে নবকুমারকে দেখা গেল। মনোরমা বললেন, "তোমার বান্ধবীকে আজ এখানে দেখবার আশা রাখি। কিন্তু তোমার আজকাল বড়ো অবসর দেখছি।" বলে তিনি একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

নবকুমার লজ্জিত হলেন। বললেন, "রেণুকা আমাকে এখানে আসতে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন—"

মনোরমা পরিহাস করে এর উত্তর কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় জ্ঞানদাদেবী স্বেচ্ছায় ওদের কথায় যোগ দিলেন। জ্ঞানদাদেবী হচ্ছে এক ভূতপূর্ব জাস্টিসের বিধবা পত্নী। পরের আলোচনায় তাঁর অদ্ভুত উৎসাহ। তাঁর ক্ষুরধার জিহ্বাকে ভয় করে না, সমাজে এমন কেউ নেই। তিনি বললেন, "এই রেণুকাটি আবার কে?"

মনোরমা নবকুমারের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "তিনি যে কে তা ঠিক বলতে পারা যাবে না। তবে এটুকু ঠিক যে, তিনি একজন সুন্দরী, লঘু প্রকৃতির তরুণী, নবকুমারের পেশেণ্ট। নবকুমারের মতে এমন কেউ নেউ যে তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করে থাকতে পারবে।"

জ্ঞানদা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মনোরমার উপর স্থাপন করে বললেন, "বাবার নাম? বাড়ি?"

"বাপের নাম হরগোবিন্দ। তিনি একজন খুব ধনবান পল্লী জমিদার ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছে রেণুকা।"

জ্ঞানদা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললেন, "টাকা দিয়ে কতদূর কি করা যায় তারই পরীক্ষার জন্য বোধ হয় তাঁর এখানে আসা—"

মনোরমা একথার কোন জবাব দিলেন না; নবকুমার তখন দোরের দিকে চেয়েছিলেন। এই সুস্পষ্ট দিবালোকে মনোরমার সুসজ্জিত কক্ষে সুবেশা মহিলাদের মাঝে থেকেও তাঁর মনে হল যেন তিনি রাঙামাটিতে রেণুকার কক্ষে বসে তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলাপের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কতকাল পরে আজ আবার রেণুকার সঙ্গে দেখা হবে। কল্পনার চক্ষে তিনি দেখতে পেলেন, সোনালী রোদে ধোয়া একরাশ চুল মাথায়, সারল্যমাখা মুখে তিনি আসছেন। মৃদু পদক্ষেপে। বন্যপাখী আসছে খাঁচায় বন্দী হতে। রেণুকা, চপল চঞ্চল মেয়ে রেণুকা। কি জানে সে সংসারের? এর চেয়ে তার বাবা যদি তার জন্যে কিছু রেখে না যেতেন, সেই হয়তো ভাল ছিল।

হঠাৎ তাঁর চিন্তার স্রোত থমকে দাঁড়াল। তাঁর বিস্ময়ের ভাব কাটবার পূর্বেই মনোরমা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করতে লেগেছেন।

নবকুমার রেণুকার দিকে চাইলেন। চিনলেন, কিন্তু আয়াস করে। সেই রহস্যপূর্ণ চোখ থেকে একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে সত্য, কিন্তু, সেই পর্যন্ত। রাঙামাটির

রেণুকা আজ রঙ্গালয়ের রাণীর অংশ অভিনয় করবার জন্য যেন সাজঘর থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল। অদ্ভুত পরিবর্তন। স্বভাবসুন্দর গণ্ডদ্বয়ে স্নো-পাউডারের আস্তরণ, বঙ্কিম ভ্রূটির প্রত্যন্ত প্রদেশে কালিমার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আয়ত নয়নে প্রায় আকর্ণ বিস্তৃত সুর্মা। আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সেই স্বভাবলোহিত ওষ্ঠ দুটিতে কৃত্রিম লাল রঙের গভীর ছোপ।

হাজার লোকের মধ্যেও এই সাজসজ্জার জাঁকজমক, সর্বাঙ্গের চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। এমন কি কণ্ঠের সেই সঙ্গীতোপম মধুর স্বরও তিরোহিত হয়ে গেছে। তার স্থানে সে উচ্চহাস্যে সর্বদা প্রতি দুটো কথার পর একটা বিজাতীয় ভাষার সাহায্য নিয়ে এমন একরকম ভাবে কথা কইছে যাতে করে সে কথা শ্রুতি অগোচর করবার জন্য নবকুমারের কানে হাত দিতে ইচ্ছে হলো। হেসে যে দৃষ্টি নিয়ে সে নবকুমারকে অভিবাদন জানাল তা কুণ্ঠাহীন দৃষ্টি। তার চোখ দেখে মনে হলো যেন সে নবকুমারের এই বিরক্তিতে আমোদ উপভোগ করছে।

নবকুমারের অন্তরে সমস্ত আশার ঘটল অপঘাত মৃত্যু। একটা তীব্র বিতৃষ্ণার ভাব নিয়ে তিনি রেণুকার দিকে চাইলেন। কি সে ছিল আর কি সে হবে, এ দুটোর মধ্যে একটা তুলনামূলক সমালোচনাও তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠল।

রেণুকা নবকুমারের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "কতদিন পরে আবার আপনাকে দেখছি। মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যে একটা যুগ কেটে গেছে। কলকাতার বাইরে মানুষকে কেমন ভিন্ন রকম দেখায়।"

অপর মেয়েদের সম্মুখে রেণুকার এই উক্তি নবকুমারের কাছেও একটা দুঃসাহস বলে মনে হল।

মনোরমা কিন্তু সন্তুষ্ট হয়েছে। তাঁর বরাবর কেমন একটা ধারণা ছিল যে, য়ুরোপের দেশগুলো অন্ততঃ একবারও ঘুরে না এলে কারও আচার ব্যবহার বা রুচি পরিমার্জিত হতে পারে না। রেণুকাকে দেখে তাঁর সে ভুল ভাঙল। তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। রেণুকার রয়েছে একটা নিজস্ব স্টাইল, কথাবার্তায় তার কুণ্ঠাহীন কণ্ঠস্বর তাঁর দলের মেয়েদেরও চমৎকৃত করবে।

মনোরমা-রেণুকার প্রথম আলাপের নূতনত্ব এত অধিক সময় ব্যাপ্ত করে রাখল যে, নবকুমারকে বাধ্য হয়েই বিদায় চাইতে হল। রেণুকার দিকে না চেয়েই তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, রেণুকা তাঁর কাছ ঘেঁষে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, "শীগগির আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে ভুলবেন না।"

জ্ঞানদাদেবীর কিন্তু এত শীঘ্র উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এই গ্রাম্য তরুণীর হাবভাব তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মনোরমার এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আন্তরিক ইচ্ছাটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি রেণুকাকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাতেই রেণুকা এমনভাবে তা গ্রহণ করল যাতে করে জ্ঞানদার মনে হল যে রেণুকাও এর বন্ধুত্ব নিবিড় ভাবে প্রত্যাশা করছে। প্রথম পরিচয়েই এতটা বাড়াবাড়ি জ্ঞানদার কাছে বড়ই বিশ্রী ঠেকল। তিনি স্থির করে নিলেন, গোড়া থেকেই এদের বন্ধুত্বের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হবে। একটা অজ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে চায় তাদের মধ্যে আসন পাততে। মনোরমার নিশ্চয় কোন স্বার্থ আছে। সে স্বার্থে হানি তাঁকে ঘটাতেই হবে।

মনোরমা অভ্যাগতদের চা পরিবেশন করতে শুরু করেছেন। সেই সময়ে জ্ঞানদা রেণুকার দিকে চেয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "আপনার বয়স?" কোন মহিলার মুখের উপর এ প্রশ্নটা অবান্তর, অবাঞ্ছিত এবং ভদ্রতাবিরুদ্ধ। কিন্তু জ্ঞানদা যখন নিজের কার্যসিদ্ধি করতে চান তখন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করতে তাঁর বাধে না।

রেণুকা কিন্তু হেসেই জবাব দিল, "বাইশ"।

জ্ঞানদা চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "বাইশ, আমার তো আরও কম মনে হয়েছিল। এখনো বিয়ে হয় নি কেন? পাড়াগাঁয়ে তো এত বড় মেয়ে অবিবাহিতা থাকে না।" বিচারক যেন আসামীকে প্রশ্ন করছেন। অপমানজনক কণ্ঠস্বর।

রেণুকা এবারও যেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মনোরমা কথা পাল্টাবার জন্য বললেন, "তোমার রুমাল থেকে খুব সুন্দর গন্ধ বেরুচ্ছে তো! কি নাম গন্ধটার?"

রেণুকা চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "ওটা একটা ফরাসী সেন্ট। খুব মিষ্টি গন্ধ, নাম ক্যু এর দ মারি আঁস। এই সেন্টের একটা কাউকে উপহার দেওয়া মানে তার সাথে বন্ধুত্ব পাতানো। কথাটার অর্থ হচ্ছে, আজীবন তোমার বন্ধু রইলাম।"

জ্ঞানদার তাক লেগে গেল। যতই অর্থ থাক, পাড়াগাঁয়েই। এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট সমাজের কাছে সে হেয় হয়ে থাকবেই। কিন্তু চালচলনে, কেশবিন্যাসে, কণ্ঠস্বরের অপ্রগলভতায় রেণুকা যে কারো চেয়েই খাটো নয়।

"আপনি ফরাসী ভাষাও জানেন নাকি?"

রেণুকা বললে, "একটু আধটু। কিন্তু ওটা ছাড়াও য়ুরোপের আরও দু'একটা ভাষা আমাকে শিখতে হয়েছে বাবার অনুরোধে। তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের কৃষক। তাঁর লাইব্রেরীতে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধনীয় অধিকাংশ উন্নত ভাষার বই আছে। সেইসব বই যাতে আমি পড়তে পারি, বুঝতে পারি এবং বোঝাতে পারি তার শিক্ষা তিনি নিজেই আমাকে দিয়েছেন।"

জ্ঞানদাদেবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "আপনার বাবা চাষ করতেন বুঝি? ও–"

চা পানান্তে রেণুকা বিদায় চাইতেই জ্ঞানদাও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমিও যাই এবার–"

বাইরে এসে রেণুকা বলল, "যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমার মোটরেই আসুন না–"

জ্ঞানদা চেয়ে দেখলেন সুন্দর মূল্যবান গাড়ি। ঈর্ষায় তাঁর অন্তরটা পুড়ে গেল। রেণুকাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবেন, না তাকে মনোরমার সঙ্গে নিবিড়তার সুযোগ দেবেন, তা তিনি ঠিক করে উঠতে পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে তিনি মুখে খানিকটা হাসি টেনে রেণুকার উপর খুব অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন এমনি ভাব দেখিয়ে ইংরাজীতে বললেন, "আপনার অশেষ দয়া নিশ্চয়।"

মোটর দ্রুত নিঃশব্দ গতিতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর উপর দিয়ে ছুটে চলল। রেণুকা বলল, "ইডেন গার্ডেনের চারদিকটা বার কয়েক ঘুরে আসা যাক্। কি বলেন?"

জ্ঞানদা সম্মতি দিলেন।

গাড়ি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ছেড়ে চৌরঙ্গীর মোড় ঘুরে যখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর কাছাকাছি এল তখন জ্ঞানদাদেবী মুখ খুললেন। এতক্ষণ নীরবেই ফন্দী আঁটছিলেন।

বললেন, "আপনার বাবা চাষ করতেন একথা মনোরমাদের কাছে বলা আপনার উচিত হয় নি।"

হঠাৎ এ কথায় রেণুকা বিস্মিত হয়ে বলল, "কেন?"

"আপনার বাবা চাষ করতেন তা জানলে লোকে আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবে না। মাড়োয়ারীদের অনেকেই কোটিপতি কিন্তু বংশ গৌরবটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। মনোরমা বড় বিশ্বাসঘাতক।"

রেণুকা তার বিস্মিত চোখের নির্দোষ দৃষ্টি সঙ্গিনীর উপর স্থাপন করল। বলল, "আমার তো তাকে বেশ লাগে–। তিনিই আমাকে মহৎ এবং উদার হবার উপদেশ দিয়েছেন।"

"লোক চরিত্র সম্বন্ধে আপনি কিই বা জানেন? মনোরমার মহত্ত্ব তাঁর নিজের কাছে। তার হৃদয় বলে কিছু জিনিস নেই। সবাই আপনাকে একথা বলবে। অভ্যাগত-সৎকারে অবশ্য সে সিদ্ধহস্ত। গৃহকে সুসজ্জিত করে সকলের প্রশংসাভাজন হতে পারাটা সে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু তাকে আমি বাল্যকাল থেকে জানি। আপনাকে তার অতীত জীবনের এমন সব কথা বলতে পারতাম যাতে করে আপনি আহত না হয়ে পারতেন না। কিন্তু যে আমার বন্ধু তারই চরিত্র নিয়ে অপরের কাছে আলোচনা করাটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। মনোরমার বাপ মা মানুষের মতো মানুষ ছিলেন, তাঁদের জন্যেই তার দোষত্রুটি অনেক কাল লোকের কাছে গোপন করেছি। কিন্তু তাঁরাও তাঁদের মেয়ের উপর কত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তা তাঁদের উইলই প্রমাণ দেবে। অজস্র অর্থের একটি কণাও তাঁরা তাঁদের মেয়েকে দিয়ে যাননি। যারা ভেতরের ব্যাপার জানে না, তারাই মনোরমার উপর সহানুভূতিতে গলে যায়, আর তার বাপমায়ের স্নেহহীনতার জন্য নিন্দা করে। কিন্তু আমি তো সব জানি। তাই আমার মনে হয় এ তার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।"

রেণুকা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। একজন নব পরিচিতার কাছে আবাল্য বান্ধবীর কুৎসা রটনায় সে বিস্মিতও কম হয় নি, কিন্তু কৌতূহল তার বিস্ময় ও বিতৃষ্ণাকে জয় করল। বলল, "শাস্তি! কেন তিনি কী করেছিলেন?"

"কি যে করেছিলেন তা বলতে গেলে অনেক কথা। তা নিয়ে এককালে চারদিকে খুব সাড়া পড়ে গেছল। কিন্তু মনোরমার স্বামীর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ওর স্বামীই যখন ওর দোষ সম্বন্ধে নির্বিকার, তখন অপরের আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?"

রেণুকা বলল "মনোরমা নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিলেন, এখনো তাঁর সৌন্দর্য নেহাৎ কম নেই। ঝরে-পড়া গোলাপের সৌরভের মতো এখনো সৌন্দর্য তার দেহে লেগে রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি। নিজ রুচি অনুযায়ী অপরকে বিচার করতে পারা যায় না। মনোরমা হয়তো মনে করেন তিনি যা করেন তার সবই ভালো, হয়ত সত্যই তা ভালো না হতে পারে, কিন্তু তিনি জানেন না যে তা খারাপ।"

মনোরমার উপর রেণুকার আকর্ষণ দেখে জ্ঞানদা বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন, "সে আবার জানে না–সে সব জানে। সে যা করে ভেবে চিন্তেই করে। ঐশ্বর্য সৌন্দর্য কিছুতেই ওকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ওর দৃষ্টির মধ্যে সব সময় একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করেন নি কি?"

রেণুকা বলল, "আমার মনে হয়, সন্তানের স্নেহ কি তা যদি তিনি জানতেন তা হলে তার কাছে সব অন্য রকম হয়ে দাঁড়াত। সহৃদয় স্বামী না পেলে সন্তানহীনার জীবনে কোন আকর্ষণই থাকে না।"

জ্ঞানদা এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "ওই সন্তান নিয়েই তো মনোরমার বাপ মা ওর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। মনোরমার মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ আপনার মতো হ'ত। কিন্তু অযত্নেই মেয়েটা মারা গেল। মনোরমা মেয়েটাকে জীবনের অভিশাপ বলে মনে করত। কেউ কেউ বলে ও গলাটিপে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। এটা অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে রকম বিলাসিতা ছিল ওর তাতে মেয়েটাকে যে ও যত্ন করতে পারত না তা সত্য।"

রেণুকার সমস্ত অন্তর ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। যে সমাজের মনোহারিত্বের আকর্ষণে সে এতদূর ছুটে এসেছে, প্রথম দিনেই সে সমাজের যে রূপ তার চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। সভ্যতার কেন্দ্রস্থল এই কলকাতা, আধুনিক সভ্যতার আদর্শ এই মনোরমাদের সমাজ, সেই সমাজের অভ্যন্তরের ক্লেদ শীঘ্র বার হয়ে পড়ে। না জানি আরও কি আছে এতে! রেণুকার ইচ্ছে হল, ফিরে যাই যেখান থেকে এসেছি। নবকুমারকে গিয়ে বলি, তোমার কথাই ঠিক, তোমার কথাই মানলাম। জ্ঞানদা যা বলল তার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তা হলেও মনোরমার আদর্শে চলা তো তার উচিত নয়।

কিন্তু জ্ঞানদাই বা কি! সে কেমন করে তার কাছে এত শীঘ্র এত কথা বলে ফেলতে পারল? ওরা যাই হোক ফিরে যাওয়া কিন্তু তার চলবে না। এরা যে কি তা ভাল করে জানতে হবে। সে ভীরু নয়, বীরাঙ্গনার মতো সে এদের সব নীচতা, সব কদর্যতার উপরে নিজেকে তুলে রাখবে। নবকুমারকে দেখাতে হবে তিনি তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ভয় করেছেন তা অমূলক।

কিন্তু জ্ঞানদা যাই বলুক মনোরমাকে তো তার ভালই লাগল। মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ দুইই আছে। মন্দটা ছেড়ে সে তার ভাল দিকটা দেখবে না কেন? আর কখন কে কি করেছে, তার ভিতরে কি আছে, তার জানবার তা প্রয়োজনই, কি? বলল, "সন্তানের প্রতি মায়ের অনাদর করা অসম্ভব। তাঁর সন্তান যে মারা গেছে হয়ত তাঁর ভাগ্যদোষে, তাঁর অযত্নে নাও হতে পারে।"

কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই মনোরমার কথাই আবার এসে পড়ল এবং রেণুকা অসহায় ভাবে জ্ঞানদার মুখ থেকে মনোরমার অসংখ্য দোষক্রটি শুনতে লাগল। অবশেষে জ্ঞানদাকে যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এখনো বেলা অনেক আছে। আর একটু একা একা ঘুরে সে বাড়ি ফিরবে। বাড়ি ফিরে সে ভেবে দেখবে এরপর কি করা যাবে। দেশে ফিরে গেলে তার আর কোন আশা থাকবে না। সেই জমিদারীর খবরদারী করতে করতেই তার জীবন কেটে যাবে। নবকুমার হয়ত তাতে খুশি হবেন। কিন্তু তাঁর খুশিতে তার কি আসে যায়? নিজের আনন্দই সবচেয়ে বড়। এখানে থাকলে নবকুমারকে সে বন্ধু হিসেবে পাবে, কলকাতার বিশিষ্ট লোকদের সাথে হবে তার পরিচয়। মনোরমা যাই হোক তাকে হয়ত প্রীতির চক্ষেই দেখবেন—

রেণুকার আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যকতাই হল না। কিছুদিনের মধ্যে সে আবিষ্কার করল, মনোরমাদের সমাজে সে বেমালুম মিশে গেছে এবং সেই আনন্দে সে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, নিজেকে এদের সমাজ ছাড়া আর অন্য কোথাও কল্পনা করাটাই তার কাছে কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। সে এখানেই থাকবে...চিরকাল এখানে থাকবে। তার রূপ যৌবন অর্থ সব আছে–সে কেন এই সব ব্যর্থ করবে কলকাতার আনন্দ উজ্জ্বল সঙ্গ ছেড়ে?

আট

অতি অল্প সময়ে নিজের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা দেখে রেণুকা নিজেই অবাক হয়ে গেল। সকলেরই মুখে এখন তার কথা। তার অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে উঠল অনেকের দৈনন্দিন কাজ। তার রূপের সঙ্গে হয় হলিউডের শ্রেষ্ঠ স্টারদের তুলনামূলক সমালোচনা। অভিভাবকহীণা, সুরুচিসম্পন্না ঐশ্বর্যবতী তরুণীর উপর আকৃষ্ট হয় অনেকেই। কিন্তু সে যে কারও উপর আকৃষ্ট হয়েছে এমন মনে হয় না। কোনো কোনো দুঃসাহসী ইতিমধ্যে প্রস্তাবও করে ফেলেছিল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে 'দুঃখিত' ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় নি।

দুঃসাহসীদের মধ্যে হিরণও একজন। কিন্তু সে এখনও প্রস্তাব পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি। রেণুকাকে দেখেই তার ভালো লেগেছিল এবং সে দেখাশুনাটা প্রায় তাদের বাড়িতেই হ'ত। কিন্তু ভালোলাগাটা যে ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে তা সে প্রথম অনুভব করে রেণুকা যেদিন তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় তাদের বাড়িতে। সুসজ্জিত এবং সুরভিত কক্ষে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গীত লহরীই যে শুধু হিরণের হৃদয় উদ্বেলিত করে তুলেছিল তা নয়। রেণুকাকে সেদিন দেখাচ্ছিল খুবই সুন্দর। হিরণের মনে হয়েছিল স্বর্গ হতে যেন মর্ত্যে কোনো অপ্সরা আবির্ভূতা হয়েছে। প্রশংসা যার প্রাপ্য হিরণ তার প্রশংসা করবেই। কথায় মিতব্যায়িতার ধার সে ধারে না। রেণুকা তার মুখে রূপের প্রশংসা শুনে একটু হেসেছিল মাত্র। হিরণ কিন্তু দমে নি।

রেণুকার নিকট প্রস্তাব করবার পূর্বে সে মনোরমাকে বললে, "বিবাহ প্রথাটা ভালই বলতে হবে। আমার মতের পরিবর্তন হয়েছে। রেণুকাকে তোমার কেমন লাগে? বেশ মেয়ে, না?"

মনোরমা মনে মনে হাসলেন। এক মুহূর্তের জন্য তার নবকুমারের কথা মনে পড়ল। রেণুকা যেদিন তাঁর বাড়িতে প্রথম আসে সেদিন ছাড়া নবকুমার আর এদিক মাড়ান নি। সম্ভাবনাময় যে সূত্র মনোরমার মনে গাঁথা হতে যাচ্ছিল সেটা রোমান্সের কাছ না ঘেঁষেই ছিন্ন হয়ে গেল।

মনোরমার নীরবতায় হিরণ বিরক্ত হয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল দিয়ে নিম্ন ওষ্ঠের এক অদ্ভুত আকৃতি করে অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করল–"তোমার কি মনে হয়?"

মনোরমা বললেন, "রেণুকা সত্যই ভালো। তার হাত পা মুখের গঠন চমৎকার। এমন কি সময় সময় সে আমাদের কাছে তার কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতাও পরিত্যাগ করে। আমাদের বংশের সাথে তার গরমিল হবে না। কিন্তু তাকে দেখবার আগে থেকেই আমার একটা ধারণা হয়ে আছে। নবকুমার ওর খুব প্রশংসা করে–খুবই।"

"সেটা নবকুমারের পক্ষে আশ্চর্যের কিছুই নয়।"

"আশা করি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে না।"

"ঈর্ষা! কি যে বলো!"

মনোরমা আর কিছু না বলে হিরণকে জানালেন তাঁর কোন বন্ধুর সঙ্গে দরকারী কথা আছে। সে এখন যেতে পারে।

তিন দিবারাত্র এই নিয়ে হিরণের বুক ভারী হয়ে রইল। প্রতিদিনই মনোরমা চক্রান্ত করে রেণুকার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেম নিবেদনের জন্যে যে সাহস দরকার, হিরণ এখনও তা সঞ্চয় করতে পারে নি।

চতুর্থ দিনে মনোরমা কয়েকটি বন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। রেণুকার কার্ডে ভুলক্রমে ১টার পরিবর্তে ১১টা লেখা হয়ে গেল। রেণুকা নির্দিষ্ট সময়ে এসে দেখে সেই সর্বপ্রথম এসেছে আর তার অভ্যর্থনা করতে এল হিরণ।

মনোরমার তখন কেশবিন্যাস হয় নি। ঝিয়ের মুখে বলে পাঠালেন তাঁর একটু আসতে দেরী হবে বলে ক্ষমা চাইছেন। ঝি রেণুকার সম্মুখে এক তাড়া বিভিন্ন পত্রিকা দিয়ে গেল, মনোরমা না আসা পর্যন্ত সেগুলো পড়ে সময় কাটাবার জন্য।

হিরণ বুঝল এই সুসময়। সূর্য-করোজ্জ্বল কক্ষ, বাতাসে ফুলের সুবাস। আকাশে বাতাসে কক্ষে সর্বত্র বসন্তের ছোঁয়া। তারই সম্মুখে বসন্তলক্ষ্মীর মতো রেণুকা বসে, সে জানে না, কি সম্মান হিরণ আজ তাকে দিতে যাচ্ছে।

মনোরমার চক্রান্তে নিশ্চয় দেবতারাও যোগ দিয়েছেন। এই সুযোগের অবহেলা করা শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়, পাপও।

অগ্নিপরীক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে সে উদ্যত হল।

রেণুকা সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বলল, "আপনার কি কোন অসুখ করেছে? মুখটা অমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?"

"ধন্যবাদ। সত্যই আমি বিশেষ ভালো নেই।" বলে হিরণ কক্ষের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল। তার মুখ পাণ্ডুর ভাব ধারণ করেছে, স্নায়ুগুলো ভয়ে মুষড়ে পড়েছে।

হিরণের দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে রেণুকা প্রশ্ন করল, "অজীর্ণ হয়েছে? আমার এক বন্ধুও indigestion এ মাঝে মাঝে বড় কষ্ট পেতেন। তিনিও আপনার মতো করতেন–বেড়িয়ে তাঁর খেদ মিটত না, খুব ঘন এবং লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতেন।"

হিরণ তাড়াতাড়ি বললে, "বুকের রোগ–কাল রাত থেকে ধড়ফড় করছে। বাড়িতে এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানাই নি।"

"কোন ডাক্তার দেখান উচিত। নবকুমারের কাছে যান না কেন? He makes a speciality of heart troubles"

হিরণ ম্লান মুখে মাথা নাড়ল। বললে, "একটু কিছু হলে ডাক্তার দেখানো আমার মতের বাইরে। আর নবকুমারকে আমি পছন্দও করি না। এখানে তার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু he had never been nice to me."

রেণুকা জিজ্ঞাসা করল, "Is he never nice to anybody?"

তার কণ্ঠস্বর খাদে নামল, চোখ দুটো মুদিত হয়ে এল। সেই সময় তাকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছিল।

"Oh! I suppose he would be to you~Could not help himself." কিন্তু আমি তার শুষ্ক অন্তঃসারহীন আলাপকে ঘৃণা করি। By jove! তিনি যে আপনার একজন বিশিষ্ট বন্ধু তা যে ভুলে যাচ্ছি। আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার নিশ্চয় তাকে খুব ভালো লেগেছে।"

"তার জন্য দুঃখিত হবার কোনো দরকার নেই। তিনি আমার বন্ধু নন। তাঁকে একবার চিকিৎসক হিসাবে ডেকেছিলাম এই যা।"

"আপনার বুকের কি কোন গোলযোগ হয়েছিল?"

"No, I am quite sound."

"তা বেশ, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। যে কোনো সময়ে ওটা রোগ বিশেষে আক্রান্ত হতে পারে।"

"আপনি তো খুব দুঃখবাদী দেখছি। কাউকে রোগাক্রান্ত হবার ভয় দেখান আপনার মুখ থেকেই এই প্রথম শুনছি।"

রেণুকা এই সময় তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে না রাখলে হিরণ দেখতে পেত যে, সে হাসছে।

হিরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, কাউকে ভালোবাসি তা তাকে জানানো যায় কেমন করে বলুন তো?"

রেণুকা চমকিত হল। হিরণের অবস্থা সে যে না বুঝেছে তা নয়। কিন্তু হঠাৎ ঐ ধরনের কথা শুনলে কোন তরুণী চমকিত না হয়ে পারে? তা হলেও সে ভাব সে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বললে, "আপনি কি কাউকে প্রস্তাব করবেন ভেবেছেন?" যেন হিরণের কথা শুনবার তার খুবই ইচ্ছা হয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে হিরণের দিকে চাইল।

"হ্যাঁ, আমি তাই মনে করেছি। কিন্তু –"

তরুণীর লঘুচিত্ত কৌতুক করবার ইচ্ছায় পূর্ণ হয়ে উঠল। বললে, "কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার অভিজ্ঞতায় যা আছে, সেটা কাজে লাগাতে গেলে বিশেষ সুফল হবে না। কলকাতাতে আসার কিছুদিন পরেই আমার নবপরিচিত কোন বন্ধু চিঠি দ্বারা তাঁর অর্থের পরিমাণ, বংশের খ্যাতি ইত্যাদি জানিয়ে আমার পানি প্রার্থনা করেছিলেন। সে রকম যদি করতে চান মন্দ হবে না। কিন্তু তার চেয়ে আমি বলি সুযোগ মত মেয়েটির হাত ধরে যা বলবার বললেন। আর যদি নিজের উপর আস্থা না থাকে তা হলে বাধ্য হয়েই কাগজ কলমের আশ্রয় নিতে হবে"– বলে রেণুকা কিছুক্ষণ থামল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা খেয়াল জেগে উঠল। সে দুষ্টমির হাসি হেসে বললে, "আমি না হয় কি লিখতে হবে লিখে দিচ্ছি, আপনার প্রয়োজন মত পরিবর্তন করে নেবেন।"

কৌতুকোজ্জ্বল মুখে রেণুকা মনোরমার লিখবার টেবিলের ধারে গিয়ে লিখতে শুরু করে দিল।

হিরণ অস্থির ভাবে বহুক্ষণ পায়চারি করে শেষে অধৈর্য হয়ে বলল, "কতটা লেখা হয়েছে? লেখার মধ্যে যেন গভীর প্রণয়ের ভাব পরিস্ফুট হয়।"

"তা হলে আপনি তাকে খুবই ভালবাসেন" বলে রেণুকা লেখা থেকে মুখ তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে হিরণের দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসি, সে গ্রীবাভঙ্গিমা দেখে হিরণের বুকে রক্ত তোলপাড় করে উঠল। বলল, "নিশ্চয়। আমি এতো ভালবাসি বলেই ভয় হচ্ছে যে, সে হয়ত আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আচ্ছা তাকে মুখোমুখি সব কথা জানাতে ভয় করছি জানলে সে কি বিরক্ত হবে?"

"না, না। এরকম অবস্থায় এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আপনি উত্তর প্রত্যাশা করে তার দিকে চাইবেন, তখন এখন যেমন করে চাইছেন, তেমন করে চাইবেন না যেন। তাহলে সে আপনাকে আদৌ পছন্দ করবে না, ভয় পেয়ে যাবে। মুখের ভাব সব সময় উৎফুল্ল রাখতে হবে। .... আচ্ছা, দেখুন আমার লেখাটা।" বলে রেণুকা কাগজখানা হিরণের হাতে দিল।

জানলার কাছে গিয়ে রেণুকার দিকে পিছন ফিরে হিরণ কাগজখানা পড়তে লাগল। তার ভাব পর্যবেক্ষণ করবার জন্য রেণুকা সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে রইল।

পড়া হলে হিরণ বললে, "হ্যাঁ, বেশ লেখা হয়েছে। আমি যা অনুভব করছি, ঠিক তাই প্রকাশ পেয়েছে। আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।"

এই সময় মনোরমা মলয় সমীরের স্নিগ্ধতা নিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হলেন। ওষ্ঠ দুটিতে হাসির আভা, মুখে ক্ষমা চাওয়ার মৃদু বাণী আর পরিচ্ছেদে সৌরভ। বললেন, "আমার ভুলের জন্য আপনাকে কি কষ্ট না পেতে হল। ১টার জায়গায় ১১টা যে কি করে আমার কলম দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তা আমি ভেবেই পাই না। আশা করি সময়টা তত বিশ্রী ভাবে কাটে নি?"

রেণুকা বললে, "না, বেশ আমোদেই কেটেছে। হিরণবাবু বেশ লোক।"

মনোরমা বললেন, "আজ আপনার সঙ্গে আমার এমন একজন বন্ধুর আলাপ করিয়ে দেব যাকে দেখলে আপনি খুশি না হয়ে পারবেন না। খুব আমোদ আর পরিহাসপ্রিয়। তার মুখে হাসি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবেন না। জগতের সবাই হাসি ভালোবাসে না কেন? যারা সবসময় মুখ পেঁচার মতো করে থাকে তাদের আমি আদৌ দেখতে পারি না। আমার বন্ধুর নাম বিজনেশ রায়। আমি নাম দিয়েছি প্রজাপতি। প্রজাপতির মতো তিনি রৌদ্র উজ্জ্বল প্রভাতই পছন্দ করেন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয় তাঁর স্থান পরিবর্তন। তিনি একজন স্বনামধন্য পর্যটক এবং কবি—"

রেণুকা সোৎসাহে বলল, "কবি? তাঁর কোন বই আছে? আমি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসি।"

হিরণ মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মনোরমার বন্ধু-বান্ধবদের সবার সঙ্গে তার আলাপ নেই। বরাবরই সে সবাইকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। তাদের সে ভালো চোখে দেখে না। আজ হঠাৎ এই শুভক্ষণে অমঙ্গলসূচক ধূমকেতুর মতো বিজনেশের আগমন সম্ভাবনায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। মনোরমার বন্ধু হলেই যে সে প্রৌঢ় হবে তার কোন স্থিরতা নেই। তা হিরণ খুব ভালো করেই জানে। মনোরমার বন্ধু তালিকায় বিশোর্ধ থেকে পঞ্চাশনিম্ন সব রকম নরনারীই স্থান পায়। এই বিজনেশের বয়স কত কে জানে? তিনি আবার কবি! হিরণের বরাবরেরই একটা ধারণা যে, কবিরা ইচ্ছা করলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে কোন মেয়ের মাথা ঘুলিয়ে দিতে পারে। আর কবিদের নীতিজ্ঞান তো নেই বললেই হয়।

মনোরমা বললেন, "কিন্তু বেচারার এক দুঃখ তাঁর স্ত্রী চিররুগ্না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন সে সাধ্য নেই।"

হিরণ একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। যাক্, তাহলে তিনি বিবাহিত।

নিমন্ত্রিতগণ একে একে পৌঁছতে লাগলেন। সবশেষে এলেন বিজনেশ। দেরী করে আসার জন্য তিনি বেশ মনোহর ভঙ্গী করে ক্ষমা চাইলেন। মনোরমা হেসে জানালেন যে, সময় নিষ্ঠার বালাই যদি তার কোনো কালে থাকতো তাহলে না হয় ক্ষমা চাওয়ার দরকার ছিল।

বিজনেশের মধ্যে লক্ষ্য করবার জিনিস হচ্ছে তাঁর সব কথাতে হাসাবার ক্ষমতা। হাবে-ভাবে, কথায়-বার্তায় তিনি এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন যার সঙ্গে একমাত্র বসন্তের পাখিদের কলকাকলীপূর্ণ প্রভাতের তুলনা করা চলে। প্রতি কথায় তাঁর হাত তুলবার ভঙ্গিটি ঈষৎ হেসে কথা বলবার ধরণটা যখন তখন উচ্চহাসি রেণুকাকে চমৎকৃত করে তুলল।

মনোরমা পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি রেণুকার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "আপনার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা হবার সুযোগ না পেলেও আপনার নাম আমার অজ্ঞাত নয়। শুনেছিলাম কোন এক বনলতা এসেছে শহর সহকারকে ছেয়ে ফেলতে। আপনার প্রতিপত্তি দেখেই বুঝতে পারছি আপনি কৃতকার্য হয়েছেন। আমিও শহর সহকারের একটা নগন্য শাখা, সূর্যের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে মুষড়ে পড়ি। কিন্তু আপনি যদি আপনার পত্র-ছায়ায় আমায় আশ্রয় দেন তাহলে হয়ত আমার অক্ষমতা দূর হয়েও যেতে পারে।"

তাঁর কথাবার্তায় রেণুকা খুবই খুশি হল।

জ্ঞানদা বসেছিলেন বিপরীত দিকের এক চেয়ারে। বিজনেশকে তিনি খুব ভালরূপেই চেনেন। নারী শিকারের তাঁর আবার এই নবীন উদ্যম দেখে তিনি মনে মনে হাসলেন।

জ্ঞান এখনো রেণুকা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হতে পারেন নি। তিনি প্রায়ই রেণুকার গৃহে গিয়ে তাকে তার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থায় সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু তবু রেণুকা যেন তাকে পছন্দ করে না। এ রকম একটা ধারণা তাঁর মনের কোণে বাসা বেঁধে তাঁর অস্বস্তির মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল।

আহারের সময় চিরদিনের অভ্যাসমত জ্ঞানদা দেবীর রসনা খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুপস্থিত কয়েকটি বন্ধুর চাল-চলন কথাবার্তার অনুকরণ করে শ্রোতাদের মধ্যে প্রচুর হাস্যরস পরিবেশন করলেন। হাসবার সময় কেউ ভাবতে পারল না যে, আগামী বারে হয়ত তার অনুপস্থিতিতে সেও এইরূপ হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

বিজনেশ বসেছিলেন রেণুকার পাশে। তিনি রেণুকার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জানালেন, "পরের বারে হয়ত হবে আমার শ্রাদ্ধ। জ্ঞানদা আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি বলেন, আমার বান্ধবীর শেষ নেই। আমি বলেছি সেটা যদি দোষের হয়, তা হলে আমি দোষী স্বীকার করছি। সে কথা শুনে তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন; বলেছিলেন, পোশাক পরিবর্তনের মতো চলে আপনার বান্ধবী পরিবর্তন। যাঁর প্রশংসায় আজ আপনি

পঞ্চমুখ, কাল তাঁর কাছ দিয়েও আপনি ঘেঁষেন না। আমি উত্তরে বলেছিলাম, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি নূতনত্ব চাই, নূতন বন্ধু, নূতন মুখ। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু জগতে সুন্দর জিনিস অগণন। কেন আমি যতগুলো সম্ভব উপভোগ করব না? সেই থেকে জ্ঞানদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। অনেক কাল পরে আজ আবার এইখানে দেখা এবং আপনার সঙ্গে যে আমি কথা বলছি তা তিনি লক্ষ্য করছেন। বোধ হয় ভাবছেন এমন সুন্দরী আবার এই দুরাত্মার হাতে পড়ল। আমি চলে গেলে তিনি হয়ত আপনাকে সাবধান করে দেবেন যেন আপনি আর আমার সঙ্গে না মেশেন।"

রেণুকা চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিল তাদের কেউ লক্ষ্য করছে কি না। তারপর বিজনেশকে বললে, "আমি কলকাতাতে পা দিয়েই দেখছি ওঁর পরচর্চায় অদ্ভুত উৎসাহ। কতগুলো লোকের স্বভাবই এই। পরচর্চা করতে পেলে তারা আর কিছুই চায় না। বুঝতে পারি না এমন কেন হয়? শিক্ষা সভ্যতা কিছুতেই সে স্বভাব তাদের পরিবর্তন করতে পারে না। এ যেন তাদের জন্মগত অভ্যাস।"

বিজনেশ বললেন, "মানুষ মাত্রেরই কতগুলি দুর্বলতা আছে। পরচর্চা এই দুর্বলতার একটা...। যাদের আত্মসংযম নেই তারাই নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে। দুর্বলতা সবারই আছে। আপনারও আমারও। তবে আমরা চেপে রাখতে চেষ্টা করি এবং সেই চেপে রাখাটাই হচ্ছে মানুষের কাজ।"

রেণুকা বলল, "সত্যই তাই। কিন্তু যারা চেপে রাখতে পারে না তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাও যে দায়।"

বিজনেশ বললেন, "কিন্তু না রাখতে পারলেই মনের অশান্তি। আমি দুঃখকে চিরকাল ঘৃণা করি। আমি আমার জীবনকে উপভোগ করতে চাই। সুখ, সৌন্দর্য যৌবনের উৎস, এই জীবনের উপর আমার অসীম মমতা। কোনো কারণেই জীবনে অশান্তি আমি আনতে চাই না। অন্তরে আমি এখনো সবুজ। আশি বছরেও আমি এমনি থাকব। জ্ঞানদা আমার সব কিছু ঘৃণার চোখে দেখুন....... কিন্তু থাক, এবার উঠি। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে বিজনেশ রেণুকার হাতখানা ধরে মৃদু চাপ দিলেন। রেণুকার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। মুখমন্ডল লোহিতভাব ধারণ করল। সে কারও দিকে মুখ তুলে চাইতে পারল না।

হিরণ এক কোণে বসে হতাশভাবে এদের দিকে চেয়েছিল। রেণুকার কাছ থেকে বিজনেশ সরে যেতেই সে রেণুকার নিকট এসে বললে, "আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। আপনার চিঠিখানা নকল করে আমি তার কাছে পাঠিয়ে দেব। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমার অধঃপতন। গ্রহণ করলে আমার হবে স্বর্গপ্রাপ্তি। যাই হোক না কেন তার জন্য দায়ী আপনি মনে থাকে যেন।"

"চিঠি লিখে দিয়েছি বলে কি সমস্ত দায়িত্বটাও আমার। বেশ মজা তো" বলে রেণুকা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই চিঠিখানা রেণুকার কাছে আসতেই সে মৃদু হেসে সেখানা ছিঁড়ে ফেলে বেশ নম্রভাবেই লিখে পাঠাল যে, হিরণের প্রস্তাব গ্রহণে সে অক্ষম।

হিরণ উত্তর পড়ে তার প্রথম যৌবনের প্রণয় হতাশাকে ডজন খানেক সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে চাইল।

নয়

অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও রেণুকার মনের উপর একটা কালো ছায়া ভেসে বেড়াতে লাগল। কতদিন হল এখানে আসা হয়েছে কিন্তু নবকুমার একদিনের জন্যও তার কোন খোঁজ নেন না। ছাপা কার্ডের উপর নিজের হাতে লিখে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে কতবার তাঁকে নিমন্ত্রণ, চিঠি পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রতিবারই তিনি সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার পর রেণুকা তাঁকে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। হঠাৎ একদিন তার মনে হল যে, তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের পিছনে যা আছে তা কার্যব্যস্ততা বা পরিশ্রান্তি নয়। তার উপর দারুণ বিতৃষ্ণার জন্যই হয়ত নবকুমার আর এ মুখো হচ্ছেন না।

এই সত্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত অন্তর তিক্ততায় ভরে উঠল। সে তাঁকে দেখবার জন্য তার ব্যাকুল দৃষ্টি নিমন্ত্রিতদের উপর কতবার স্থাপন করেছে। তার কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য কতবার উৎকীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বৃথা–তিনি আসেন নি।

কিন্তু তিক্ততা মাত্র ক্ষণিকের জন্য রেণুকার মনে স্থান পেতে পারে, সেটা অন্ধকারের জন্য নয়। সূর্যের মতো সে সব ছায়া, সব কালিমা দূর করে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়,..... তার স্বভাবগুণে যে কোন আবহাওয়াকে সে মধুরতম করে তুলতে পারে।

বহুদিন অপেক্ষা করেও যখন নবকুমারের আসবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন সে নিজেই হঠাৎ একদিন নবকুমারের বাড়িতে হাজির হল। ডাক্তারের সঙ্গে তার দেখা করা চাই–তা তিনি যা-ই মনে করুন।

ঠিক হল ১টার সময় নবকুমার তার সঙ্গে দেখা করবেন। তার আগের সময়টা কাটাবার জন্য রেণুকাকে যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে অনেকে উদ্বেগের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছে! এইখানেই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কে কার কাছে জয়ী হবে তা বলে দেওয়া হচ্ছে। রেণুকা এ সব দেখে শুনে হাঁফিয়ে উঠল। তার মনে হল যেন সমস্ত কক্ষটা তার প্রতি ভ্রুকুটি করছে। তার নীরোগ শরীরেও যেন কি এক রোগ এসে প্রবেশ করল। দেহটা বিশ্রী লাগতে লাগল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে শুরু করল–যারা কক্ষের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাদের অনেকেই খবরের কাগজের আড়াল দিয়ে কেউ বা প্রকাশ্য ভাবেই রেণুকাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, – কারো অবাঞ্ছিত দৃষ্টি আর তার মধ্যে অস্বস্তি বৃদ্ধি করে না।

যেখানেই সে গেছে সেইখানেই সহস্র লোকের দৃষ্টি এসে পড়েছে তার উপর। তার পরিচ্ছদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই এবং পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই তো যত জাঁকজমক।

অবেশেষে ভৃত্য এসে দোরের কাছে উচ্চারণ করল, "রেণুকা দেবী"। রেণুকার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে হাজির হল নবকুমারের কনসাল্টিং রুমে। এখানের আবহাওয়া উজ্জ্বল এবং প্রীতিপ্রদ।

কক্ষে প্রবেশ করেই রেণুকা কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "বিনা কারণে আপনার সময় নষ্ট করলুম বলে প্রথমেই ক্ষমা চাইছি।" কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার গণ্ডাদেশ

একটুখানি টোল খেয়ে গেল, – কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টি অতি চতুরতার সঙ্গে ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে তার লজ্জার ভাব গোপন করে নিল। বললে, "পাহাড় আর মহম্মদ নিয়ে একটা কথা আছে, সেটা জানেন বোধ হয়। যখন দেখলাম আপনি একবারও আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না তখন বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হল। কলকাতার মধ্যে আপনিই হলেন আমার প্রথম বন্ধু–সব বিষয়েই আমি আপনার কাছে ঋণী। আপনার জন্যই আজ আমার এত সম্মান। এতো নিমন্ত্রণ-চিঠি রোজ আমার টেবিলে জড়ো হয় যে, আমি ভেবে পাই না, কি করে কি করব। কখনো কখনো মনে হয় এই সব স্বপ্ন,–স্বপ্ন ভেঙে গেলেই দেখব আমি সেই আমার নগণ্য গ্রামেই রয়েছি, কতকগুলো কৃষক মাত্র আমার সাথী।"

নবকুমার বললেন, "স্বপ্ন টুটে যাওয়াই ভালো। আপনার এ স্বপ্ন আমাকে ভালো পথে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"অনুগ্রহ করে এমন গম্ভীরভাবে কথা বলবেন না। রোগীদের আপনি যেমন হয় বলবেন। আমি তো রোগী হিসাবে আপনার কাছে আসি নি।"

নবকুমার হেসে বললেন, "আপনি যা চেয়েছিলেন তা তো পেয়েছেন। আমার কথায় কি আসে যায়? যাক্ আপনার আশাপূর্ণতার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি কি দাঁড়িয়ে থাকবেন?" বলে একটা চেয়ারের দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

"ওটা কি রোগীদের জন্য?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ওটাতে আমি বসব না। আপনি নিজে ওটাতে বসুন। আমি আপনারটাতে বসে একবার ডাক্তারী করি। আপনার চিকিৎসার দরকার।"

নবকুমার সে আদেশ অমান্য করলেন না। রেণুকার কথায় তিনি বেশ আমোদ পাচ্ছিলেন। মুখ দেখে তা অবশ্যই বুঝবার উপায় ছিল না। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দারুণ পরিশ্রমের পরে রেণুকার আগমন তাঁর উপর দখিনা হাওয়ার কাজ করল।

"বাইরের সিম্‌টম্ দেখে অন্যরকম মনে হলেও আপনার কেসটা তত হোপ্‌লেস্ নয়। লিভার হওয়া লোক যেমন শ্যাম্পেনকে মনে করে, এবং বাতরোগী যেমন করে পোর্টকে এড়িয়ে চলে, আপনি ঠিক আমোদ-প্রমোদকে তেমনি ভাবেন। কিন্তু আপনার রোগ উপশমের একমাত্র ঔষধ মাঝে মাঝে আমোদ-প্রমোদে যোগদান করা। সবাই বলে যে, আমার ঘরটা কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও আনন্দদায়ক। নিমন্ত্রণের প্রত্যাশায় থাকবার আপনার কোন দরকার নেই। আপনার উপস্থিতিতে এখনও আমি সম্মানিত হই নি। কিন্তু আমি নৈরাশ্যবাদকে ঘৃণা করি। জানি একদিন না একদিন আপনি যাবেনই। আপনি গেলে আমি যে আনন্দিত হব তার জন্য আপনাকে যেতে বলছি না। আমোদে যোগদান করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। যত লোক গিয়ে যখন আমার সুসজ্জিত কক্ষ পূর্ণ করে তখন আমার মনে হয়, আমারই আর একজন বন্ধু এতক্ষণ হয়ত কঠোর পরিশ্রম করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমার মনে হত একবার যেন আমি খুব বড় একটা রোগে আক্রান্ত হই। রোগের জন্য যেন আমাকে কম্পিত শরীরে বসা গালে পাণ্ডুর ওষ্ঠে আপনার দ্বারস্থ হতে হয়।"

নবকুমার বাধা দিয়ে বললেন, "অমন কথা বলতে নেই। ডাক্তারের দ্বারস্থ হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য আর মানুষের কিছু নেই।"

নবকুমারের কণ্ঠ হতে একটা ব্যগ্রতা, একটা তিরস্কারের ভাব বার হল, কিন্তু রেণুকা তা বুঝতে পারল না।

"আমি যখন কলকাতায় আসি তখন ভেবেছিলাম আপনাকে নিশ্চয় আমি বন্ধুভাবে পাব।"

রেণুকার কথাবার্তায় আজ তার কোন কৃত্রিমতা নেই। তার যা স্বাভাবিক কণ্ঠ তাই আজ সে প্রকাশ করছে।

নবকুমার বললেন, "বন্ধুত্বের মধ্যে রয়েছে একটা মস্ত বড় দায়িত্ব, বন্ধুত্ব উপকার করতে চায়। যথার্থ বন্ধু হওয়া মানে নিজে থেকে নিজের সময় এবং ধৈর্যের উপর টেক্সো চাপান।"

রেণুকা বললে, "আপনি আমাকে আদৌ বুঝছেন না। আমি আপনার উপর কোন ভার চাপাতে চাচ্ছি না।"

নবকুমারের কথায় রেণুকা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে উঠল। অন্য সবার মতো নবকুমার যে যেচে তার বন্ধুত্বের দাবী করবে না তা সে জানে। এবং তা জানে বলেই তার এত দুঃখ, এত আনন্দ–তাঁর উপর এত আগ্রহ। কিন্তু সে যখন স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তখন তাঁর এমন কথা বলা উচিত হয় নি। একটা অপমান, একটা অভিমানের জ্বালা এসে রেণুকার অন্তরের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অহংকারের ভাব তার বুকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার বন্ধুত্ব আজ কলকাতার সকলেরই কাম্য। মুক্তা হাঁসের কাছে ছুঁড়ে দিলে সে তা পায়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। তার মর্যাদা নবকুমার বুঝবে কি? কিন্তু পরাজিত হওয়া তার কোষ্ঠিতে লেখে নি। তাকে জয়ী হতে হবে, নবকুমারের গর্বের বর্ম ছিন্ন করতে হবে। বললে, "আপনি কি বেশ গুছিয়ে মোলায়েম করে কথা বলতে জানেন না?"

"আমি তো কারও পারিষদ নই যে, খোসামুদি অভ্যাস করব।"

রেণুকা এটাও হজম করে নিল। বললে, "তা আমি জানি। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে যা আপনার অভিমত তা অভিনব হলেও সত্য। কিন্তু হিসাব করে চলা আমার স্বভাব নয়। নিক্তি দিয়ে বন্ধুত্ব মেপে দেখা আপনারই শোভা পায়। আজ আমি বুঝলাম আমরা পরিচিত মাত্র। জনতার মধ্যেকার যে কোন একজন।"

"আপনার বন্ধু দাবী করব, অথচ বন্ধু নামের যে সার্থকতা তা সম্পাদন করতে পারব না, এরকম আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

রেণুকা যেন আপন মনেই বললে, "কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আপনার অনিচ্ছা, আপনার রুচি বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আপনি আমার বন্ধুত্ব যাচঞা করবেন। আচ্ছা, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য না মিথ্যা তা পরীক্ষা করে দেখা যাক–" বলে ব্যাপারটাকে লঘু করবার জন্য রেণুকা একটা টাকা বের করে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। বললে, "Heads. We are friends. Tails. we turn tail and flee!"

টাকাটা ডাক্তারের পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল। তিনি নিম্নে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। বললেন, "Tails" রেণুকার মনে হল যেন ওই কথাটি উচ্চারণ করে নবকুমার বেশ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন।

রেণুকা তাড়াতাড়ি বললে, "তিন বারের মধ্যে বেশিটা। এবার আপনি Toss করুন।"

নবকুমার সম্মত হলেন। বলাবাহুল্য তিনি ব্যাপারটাকে ছেলে-মানুষিই মনে করেছিলেন।

টাকাটা মেঝেতে গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রেণুকা নত হয়ে রহস্যময় চোখে সে দিকে চেয়ে রইল। বললে, "আবার Tails". বলে সে হাসল; কিন্তু দুঃখের হাসি—"আচ্ছা, তাহলে আমি চললাম।"

"না দাঁড়ান।"

রেণুকা দুয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। নবকুমারের কথা শুনে সে ফিরে দাঁড়াল। নবকুমারের গলার স্বরে অনুরোধ ছিল না, ছিল যেন আদেশ। রেণুকা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থেকে নবকুমার কি বলেন শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"যদি সময় থাকে তাহলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। খোলাখুলি ভাবেই এবার কথা বলা যাক।....কলকাতায় আপনার সাফল্যে আমার মনে যে ভাব হয়েছে তা জানাবার জন্য অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছি—"

সাফল্য কথাটার মধ্যে যেন একটা বিদ্রুপের ভাব।

রেণুকা বললে, "সুন্দর, এই বুঝি আপনার খোলাখুলি কথা হচ্ছে?"

"বড়ো আশা করেই আমি মনোরমার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করেছিলাম। মনোরমাদের সমাজের সঙ্গে রাঙামাটির মেয়েটির কেমন মেশে—তাই, তাই দেখবার জন্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আপনার মুখের পবিত্রতা আমার মনে পড়ছিল, আপনার কণ্ঠস্বর আমার ভাল লেগেছিল। প্রকৃতিদত্ত আপনার মাধুর্য, পবিত্র সৌন্দর্য, না, আমি খোসামুদি করছি না, যা সত্যি তাই বলছি।

আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি এখানে এসে আপনার মত পরিবর্তন করবেন। কৃত্রিমতার ধার দিয়ে ঘেঁষতে আপনি পারবেন না। আমার আশা কত শীঘ্র ব্যর্থ হল। মনোরমার ড্রইংরুমে যখন আবার আপনাকে দেখলাম তখন, সত্যি বলছি আপনাকে, আমি খুব আহত হয়েছিলাম। আপনার হাবভাব কথাবার্তায় কেমন একটা অসহ্য কৃত্রিমতা। যদিও আপনার পরিবর্তনে আমার কিছু আসে যায় না। তবু সেদিন মনে মনে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম।"

নবকুমার আয়নায় প্রতিফলিত রেণুকার প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে গেলেন।

রেণুকা প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। দু' একবার সে হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, "আপনি নিজের আদর্শ মতো আমাকে দেখতে চেয়েছেন। এইখানেই আপনার মস্ত ভুল। নিজের আদর্শ মতো অপরকে পরীক্ষা করতে যাওয়া মানে অপরের ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করা। রাঙামাটিতে আমার যে রূপ দেখেছিলেন, সেইটাই অপরিবর্তনীয় ভেবে নেওয়াটা আপনার অন্যায়।

সকল রকম অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চালানোই হচ্ছে মানুষের বিশেষত্ব। রাঙামাটি এবং কলকাতার পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতার জন্যই আমার এ পরিবর্তন।"

"রাঙামাটিতে আপনি ছিলেন রাণীর মতো, এখানে এসেও হয়তো সকলের সেরা সুন্দরীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন, কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই?"

"আছে। এঁদো পুকুরের সবচেয়ে ভালো পদ্ম, সেও পদ্মরাণী। কিন্তু সে যথার্থ রাণী কিনা তার পরিচয় হয় তখনি যখন তাকে সরোবরের পদ্মের সঙ্গে রেখে তুলনা করা হয়। আমি পড়েছিলাম সভ্যতা ও শিক্ষা বিবর্জিত এক পল্লীগ্রামে। কারো সঙ্গে মিশব, কথা বলব, এমন কেউ থাকে নি। জীবনের মধ্যে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল আনন্দ।এখানে এসে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি, নিজের মর্যাদা বুঝতে পেরেছি।"

নবকুমার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ তীব্র সুরার মতোই মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ মোহ টুটবার মতো শক্তি ক'জনেরই বা আছে? তাঁর মনে পড়ছিল, শ্যামল শস্য শোভিত, বৃক্ষলতা আচ্ছাদিত, রাঙামাটির আনন্দময় চিত্রখানি। বাঙলার প্রতিটি পল্লী যদি এই রাঙামাটির মতো হত! এমন আদর্শ গ্রামের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে রেণুকা মায়ামৃগের সন্ধানে এসেছে নগর মরুভূমিতে। আজ দেশে দেশে কাতর কণ্ঠের ডাক শোনা যাচ্ছে "দেশে ফের, সব দেশে ফের।" আর এই সময় রেণুকা এল কিনা নগরের জাঁকজমকের মাঝখানে। নগরে দেহ আছে, প্রাণ আছে, হৃদয় নেই। বাহির সর্বস্ব নগর। যন্ত্রদানবের করতলগত নগর।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে রেণুকা আবার বললে, "আমার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের জন্য কেউ কেউ আমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা আমার গৌরবেরই। কেউ কাউকে বড়ো বলে মনে মনে না মানলে ঈর্ষা করতে পারে না। এখানের যুবক সম্প্রদায় আমাকে বিবাহ করবার জন্য মেতে উঠেছে। আমি অবশ্য সবার প্রস্তাবই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি—"

"প্রস্তাবকারীদের মধ্যে হিরণও একজন নয় কি? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় আপনার খুবই আলাপ হয়েছে?"

রেণুকা মাথা নেড়ে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

"অনুমান, মনোরমার আত্মীয়প্রীতি খুব বেশি কিনা। আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে হিরণ অগাধ সম্পত্তি হাতে পাবে, এবং তার সদব্যবহারের ভারও হয়ত পড়বে মনোরমার উপর। সে সুযোগ কি তিনি ছাড়তে পারেন?" গম্ভীর প্রকৃতি, কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তারের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা তিক্ততা—ঈর্ষারই বহিপ্রকাশ হয়ত!

রেণুকা হাসল। মনোরমাকে লক্ষ্য করে নবকুমারের কথার ঝাঁঝটুকু সে বেশ উপভোগ করল। বললে, "আত্মীয়প্রীতিই যদি এত প্রবল হবে, তবে তার শিশুকন্যা অকালে মারা যাবে কেন?"

নবকুমার বিস্মিত হয়ে বললেন, "কে আপনাকে একথা বলল?"

"জ্ঞানদাদেবী, যিনি সবার গৃহের অন্ধকার কোণটিরও খবর রাখেন। অবশ্য স্বীকার করছি যে, তাঁর কথা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু না শুনেও তো উপায় নেই। পরচর্চায় তাঁর অসাধারণ উৎসাহ। এর মধ্যে আমাকে নিয়েও তিনি দু'চার কথা বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাতে আমি ভীত নই। এখানে যেমন একদিন অকস্মাৎ এসেছি, প্রয়োজন হলে তেমনি অকস্মাৎ চলে যেতে পারি।"

নবকুমার বললেন, "হ্যাঁ এখান থেকে আপনার শীঘ্র চলে যাওয়াই ভালো? এর মধ্যে আমি কোন ভালো দেখছি না, এই ধরনের জীবনের মধ্যে রয়েছে অধিক আকর্ষণ কিন্তু অল্প সুখ।"

রেণুকা ছেলেমানুষের মতো হো হো করে হেসে উঠল। বললে, "আপনার মতো লোক আমি দুটি দেখিনি। আচ্ছা, আমার থাকা না থাকা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন দেখি?"

নবকুমার এ হাসিতে বিরক্ত হলেন না। কিছুক্ষণ পরেই রেণুকা বিদায় চাইতেই তিনি হাসিমুখে আওড়ালেন–

"ধন্য হল গৃহ আমার
তোমার চরণ ধূলিতে"

রেণুকা সলজ্জ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললে, "আপনার মধ্যেও যে কবিতা আছে, তা এই প্রথম জানলাম।"

দশ

রেণুকার আগমনে মনোরমার চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হল। রেণুকা তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসল। রেণুকা ছাড়া তাঁর কোন কাজ হয় না, রেণুকা না থাকলে তাঁর আসর অন্ধকার হয়ে ওঠে। রেণকার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের আরম্ভে তাঁর মনের মধ্যে যে স্বার্থ এসে দেখা দিয়েছিল, তা তাঁর অজ্ঞাতসারে কখন যেন মরে গেছে। আজ রেণুকাকে তিনি ভালবাসেন রেণুকার জন্যই। হিরণ যে রেণুকাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বিফল হয়েছে তা হিরণ মুখ ফুটে না বললেও তিনি বুঝেছেন। তাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন বটে, কিন্তু রেণুকার উপর ক্রুদ্ধ হন নি। ভালবাসা সম্বন্ধে তাঁর একটা উদারতা আছে। সে উদারতা তাঁর নিজের স্বার্থের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

নবকুমারের সঙ্গে রেণুকার সাক্ষাতের কিছুদিন পরে তিনি রেণুকাকে লিখে পাঠালেন–

> তোমাকে আজ ধর্মের জন্য কিছুকাল ব্যয় করবার অনুরোধ করছি। রোগীর সেবা পরম ধর্ম। আমার শরীর বড়ো খারাপ হয়ে পড়েছে, তাই আজকার বিকালটা সব কাজ থেকে দূরে থাকতে চাই। আমি ছ'খানা ইংরাজী নভেল নিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি–কিন্তু নভেল পড়তে এখন ভাল লাগছে না। সবাইকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করেছি। শুধু তোমাকে কাছে পেতে চাই। এসো কিন্তু–
>
> ইতি মনোরমা

রেণুকা এন্‌গেজমেন্ট লিস্টখানাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল মনোরমার গৃহের দিকে।

রেণুকাকে দেখে মনোরমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। রেণুকা তাঁর কাছে একটা চেয়ারে বসে বলল, "বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। কিছুদিন আপনার বিশ্রাম নেওয়া উচিত।"

মনোরমা হেসে রেণুকার দিকে চাইলেন। তাঁর হাতে এক গুচ্ছ গোলাপ। বললেন, "এই ফুলগুলো আজ সমস্ত দিন আমার সঙ্গে আছে–ফুলগুলো তাদের জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওদের সতেজ সুবাসের কতকটা এসে আমার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এখন অনেকটা ভাল লাগছে আমার। তোমাকেও এখন বেশ দেখাচ্ছে। আজ নিশ্চয় তুমি আমাকে অনেক ভাল কথা শোনাবে।"

রেণুকা হেসে উঠল। বললে, "আজ সকালে বড়ো একটা মজার কাজ করেছি। খুব ভোরে উঠে সাদাসিদে পোষাক পরে একাই ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম, আমি আবার আমাদের গ্রামে ফিরে গেছি। শিশির ভেজা ঘাসে পা রেখে আমার পা দুটো ধোয়া গেছল। পুকুরটার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, ঐ আমাদের গ্রামের পুকুর। অন্যদিকে চাই নি পাছে আমার কল্পনা সত্যের সংস্পর্শে এসে টুটে যায়। আমার গ্রাম–জানেন কি হয়েছে?"

মনোরমা বললে "কি?"

রেণুকা কিছুকাল চুপ করে থেকে বললে, "আমাদের গ্রাম হচ্ছে আদর্শ গ্রাম। আমাদের জমিদারী হচ্ছে আদর্শ জমিদারী, বাবার বহু সাধনার ফল। সেখানে ভাঙন ধরেছে। ম্যানেজার জানিয়েছেন, আমার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। কি যে করব, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।"

মনোরমা বললেন, "প্রজারা বিদ্রোহ করেছে বোধ হয়। দেশে রাশিয়ার ভাব আমদানী করে প্রজাগুলোকে বড় বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।"

রেণুকা হাসল। বললে, "বাবা ছিলেন ধনবৈষম্যের বিপক্ষে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অধীন প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে মানুষ করতে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের জমি তাদের হাতে দিয়ে প্রজাদের সম্পূর্ণ জমির মালিক করে তুলতে। তা তিনি হয়ত করতেনও। কিন্তু নিজের আদর্শ সম্পূর্ণ না হতেই এল পরপারের ডাক। তিনি চলে গেছেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমার উপর দিয়ে।

কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না। প্রজার সুখ-সুবিধার উপর লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তাই বলে তাদের হাতে সব জমি তুলে দেওয়া মানে প্রজাদের সর্বনাশ করা। তাতে করে তারা অকর্মণ্য হয়ে উঠবে। জমিতে ভালো ফসল ফলবে না। সামান্য প্রয়োজনেই জমি হস্তান্তরিত করে নিজেকে যেই নিঃস্ব সেই নিঃস্ব করে ফেলবে। তার চেয়ে তার যদি কোন সৎ জমিদারের অধীনে থাকে তা হলে অধঃপতন না হয়ে উন্নতিই হবে।

বাবাও হয়ত তাই বুঝেছিলেন; সেইজন্য জমির স্বত্ব এতদিন নিজের হাতেই রেখেছিলেন। তিনি প্রজাদের উপযুক্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রজাদের উপযুক্ত হতে যে দেরী আছে তার প্রমাণ ম্যানেজারের এই চিঠি। ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, প্রজাদের চাষের সুবিধার জন্য একটা পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কারের এবং পরিবর্ধিত করবার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি প্রজাদের আহবান করে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন।

কিন্তু চাঁদা দিতে রাজী তো কেউই হল না, উপরন্তু যাদের জায়গা নিলে পুষ্করিণীটা বাড়াতে পারা যাবে তারাও জায়গা ছাড়তে হল অসম্মত। অথচ এই পুষ্করিণীটা হলে চাষের মস্ত সুবিধা হবে। কিন্তু যাদের পুষ্করিণীর জায়গা সেই তল্লাটে তাদের কোন জমি

নেই: এই হচ্ছে তাদের অসম্মতির কারণ। এরা বোঝে না যে সমগ্র প্রজাদের ভালো করতে গেলে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়।

যাক্, শেষে ম্যানেজার বাধ্য হয়েই জোর করে পুকুর সংস্কার এবং অপরের জায়গা কাটিয়ে পুকুরটাকে বড়ো করে তুলেছেন। তার জন্য পুকুরের এবং জায়গার মালিকরা দিয়েছে মোকর্দমা রুজু করে, এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অনেকেই। সকলে একজোট হয়ে খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে আর ম্যানেজারের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকারের জন্য প্রজারা আমার কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। ম্যানেজার লিখেছেন—শীঘ্র না গেলে জমিদারীর মধ্যে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা।"

মনোরমা নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন। শুনতে তার ভালো লাগছিল তা নয়, জমিদারীর সম্বন্ধে তিনি কিছু বোঝেন না, বুঝতে চানও না। কিন্তু রেণুকার যাওয়া সত্যিই দরকার কিনা, রেণুকার কথা শুনে তিনি তা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। বললেন, "তাহলে কি তোমার না গেলেই নয়?" সংযমের বর্ম ভেদ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়ে গেল।

রেণুকা বললে, "আপনাদের ছেড়ে যেতে যে আমার কি কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারব না। অথচ না যেয়েও যে উপায় নেই।"

মনোরমা নিজেকে আর চেপে রাখলেন না। বললেন, "রেণুকা তোমাকে পেয়ে আমার মনের মধ্যে দু'ধরনের ভাব জেগেছে। এক জেগেছে অনুশোচনা—আমার মৃত কন্যা আমার অনাদর সহ্য করতে না পেরে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমাকে দেখার আগে কোনদিনই তার কথা এমন করে ভাবিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়, সেই যেন তোমার মাঝে রূপ নিয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে মাতৃত্ব জাগাতে এসেছে। সত্যি বলছি রেণুকা, আমার মৃতা মেয়ে যদি আজ বেঁচে থাকত এবং আমার মনের ভাব এমনি থাকত তা হলে তাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসতে পারতাম না। তার কথা তুমি শুনেছ বোধ হয়?"

রেণুকা মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সব শুনেছে।

"আমি জানি সে বিষয়ে এখনো সবাই আলোচনা করে। পাপের দণ্ড আছেই। আমি মাতৃত্ব নিয়ে জন্মাই নি বলে তুমি বোধহয় আমাকে ঘৃণা কর?"

রেণুকা বাধা দিয়ে বললে, "না, না। আপনার রুচি অনুযায়ী সবাই চলবে তাতে অপরের মনে করবার কি আছে?"

মনোরমা নীরবে কি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আমার মেয়ে নিয়ে তোমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে কোনোদিন আলোচনা করিনি। যৌবনের ভোগ-লালসার মধ্যে যখন আমার মনের বেদনা ডুবিয়ে দিতে চাইছি, তখনই মহাবিঘ্নের মত এল মিনি। সে আমাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে চাইত না। আমি যতই তাকে এড়িয়ে চলতে চাই, ততই সে আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরে।

একদিন হল অসহ্য। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ছিল একটা নাচের মজলিস, আমারও সেখানে ছিল নাচবার কথা। মিনি ধরে বসল সেও সঙ্গে যাবে। একে সঙ্গে

নিয়ে যাওয়া মানে সব সময় কোলের ভিতর রাখা। অনেক করেও যখন তাকে নামাতে পারলাম না তখন খুব রেগে তার গালে দিলাম এক চড়। কানে না কোথায় গিয়ে লেগেছে। কিন্তু তা দেখবার মত অবসর আমার ছিল না। উৎসব শেষে এসে শুনলাম সে মারা গেছে, মাকে বিরক্ত করতে আর সে বেঁচে নেই।"

বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি জলে ভারী হয়ে এলো। "কিন্তু সত্যিকারের অনুশোচনা যাকে বলে তা তখনো আমার জন্মায় নি। আমোদ-প্রমোদের মাঝে মাঝে তার স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মতো আমাকে এখন-তখন বিচলিত করে তুললেও আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দমন করে রাখতাম। লোকে আমার মধ্যে কখনো দুশ্চিন্তা বা দুঃখের ছায়া দেখে নি। তোমাকে দেখে আমার সব সংযম গেল টুটে। দেখেই মনে হল, আমার মিনি যেন রেণুকা হয়ে এতদিন পরে আবার আমার কোলে ফিরে এসেছে। রেণুকা, তোমাকে ছেড়ে থাকা সত্যই আমার পক্ষে কষ্টকর।"

রেণুকা উঠে দাঁড়াল। বললে, "গতস্য শোচনা নাস্তি। আপনি এখন একটু একা থাকুন। আমি থাকলেই আপনি নিজেকে যন্ত্রণা দেবেন।"

মনোরমা রেণুকাকে আর বসতে অনুরোধ করলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে নিজের অন্তরের মধ্যে কি যেন তলিয়ে দেখতে লাগলেন।

রেণুকা ধীরে ধীরে অন্যমনস্কভাবে মোটর চালিয়ে চলেছিল। তার শীঘ্রই গৃহে ফিরবার কথা। কিন্তু গৃহাভিমুখে মোটর না চালিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছে এসে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের দিকে মোটর ঘুরিয়ে দিল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিজনেশ প্রতীক্ষা করছিল। রেণুকাকে দেখতে পেয়েই সে এসে তার গাড়ীর কাছে দাঁড়াল। রেণুকা গাড়ি থেকে নেমে হাসিমুখে তার করমর্দন করল। তারপর তারা দুজনে হাত জড়াজড়ি করে স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে বিজনেশ বললে, "আমার ভয় হয়েছিল যে, আপনি আসবেন না। কালই আপনাকে ডাকবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলিয়ে ফেলে আজকে দেখা করবার জন্য চিঠি লিখলাম। আশা পূর্ণ হয়ে যেখানে পূর্ণতম আনন্দ পাবার সম্ভাবনা থাকে সেইখানেই হতাশ হবার ভয়টা বেশি। অন্যসব আমোদ-প্রমোদ বন্ধু বান্ধব ছেড়ে যে আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার মত মধুর স্বভাব সত্যই দুর্লভ।"

রেণুকা সলজ্জ হাসি হেসে বললে, "আপনাকে দেখলে আমার আনন্দ হয়। আপনার মত সঙ্গীর সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করবার সুযোগ পাওয়াটাকেও আমি সৌভাগ্যের পরিচয় বলে মনে করি। আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের আগে থেকে জানি যে কে আসছেন, এসে কি বলবেন, কি করবেন। দ্বিতীয়বার কোনো একটা নাটকের অভিনয় দেখার মতো অভিনবত্বহীন, আগে থেকে জেনে রাখার মত বিরক্তিকর আর কিছু নেই। কিন্তু আপনাকে যখনই দেখি তখনই মনে হয় যেন যা কখনও শুনিনি তাই শুনব আপনার কাছে, যা কখনও দেখিনি তাই দেখব আপনার চোখ দিয়ে–"

"কোন বিষয়ে মৌলিক হওয়া চিন্তাসাপেক্ষ। কিন্তু আজকালকার কেউ চিন্তা করবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। চিরাচরিত প্রথা মতো কার্ড পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করে, দুয়ার খুলে রাখলেই সব কর্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে সবাই মনে করে। তারপর

অভ্যাগতদের সবাই গরুর পালের মতো সেই আসরে বসে নীরস ফর্মালিটি দেখাতে চান। কালকের দিনের আসরের থেকে আজকের আসরের কোনো পার্থক্য নেই, সবাই করে ড্রইং রুমে সেই একই আলোচনা। আমি ওসব আদৌ পছন্দ করি না। প্রকৃতির এই মুক্ত বাতাস বেশি পছন্দ করি। কল্পনা করুন দেখি এই ছায়া-ঘন বৃক্ষ-শ্রেণির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজনার মধ্যে ভাব-বিনিময় কত আনন্দের। আপনি যে আনন্দ আমাকে ধীরে ধীরে দিয়ে আসছেন, তার ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারবো না। আপনার এত বন্ধু তবু আপনি আমার জন্যে এত সময় অপেক্ষা করছেন। আর আপনার সংস্পর্শে এলে আমি জগতের সব কিছু ভুলে যাই।"

রেণুকা ধীরে ধীরে বিজনেশের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে সামনের একটা বেঞ্চে আসন দেখিয়ে বললে, "চলুন ওখানে গিয়ে বসি। আসন গ্রহণ করে বিজনেশ আবার কমলের মতো কোমল, শিশিরের মতো শীতল রেণুকার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোলের উপর রাখল।

রেণুকা পরিহাস তরল কণ্ঠে বললে, "কিন্তু মিসেস্ রয় কে তো ভোলা চলবে না। শুনেছি মিসেস্ রয় খুব সুন্দরী। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবই। তাঁর বিদ্রোহী স্বামীকে আমি কত যত্ন করছি, তা তাঁকে জানাতেই হবে।"

বিজনেশ বললে, "তিনি আমাকে চান না। দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বাধীনতাকে আমি বড়ো ভালবাসি।"

রেণুকা বললে, "তাতে করে আপনারা দু'জনেই যদি সুখী হন তো সে ভালো কথা। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব?"

বিজনেশ রেণুকার করতলে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, "আপনি যদি আমার স্ত্রী হতেন তা হলে হয়ত এ সম্ভব হতো না। আমি আপনাকে আমার চোখের আড়াল করতে পারতাম না। অমূল্য রত্নের মতো আপনাকে আমি যত্ন করে রাখতাম। আপনি কাউকে দেখতে পেতেন না, কোথাও যেতে পেতেন না। আমার–শুধু আমারই হৃদয়ের পূজো গ্রহণ করবার মাত্র আপনার অধিকার থাকত।"

রেণুকা উঠে দাঁড়াল। তার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। বিজনেশ বললে, "আগামীকাল ম্যাডানে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। যদি তার আগে আর দেখা নাও হয়, যদি সুযোগ পেতাম তা হ'লে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা সব সময় আপনার দুয়ারে আমি পড়ে থাকতাম–" বলে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে রেণুকার দিকে চাইল।

সেই সময় জ্ঞানদা দেবী সেই পথ দিয়ে চলে গেলেন। রেণুকার সঙ্গে মাত্র একবার মাথা নেড়ে ভদ্রতা রক্ষা করলেন, কিন্তু বিজনেশকে গ্রাহ্যই করলেন না।

বিজনেশ জ্ঞানদার গমন পথের দিকে চেয়ে বললে, "দেখলেন তো ওর ব্যবহারটা। কেমন শুষ্কভাবে একটু মাথা নেড়ে চলে গেল। এখনই গিয়ে আমাদের নামে হয়ত কত কি রটাবে। ওর দলের লোক সবাই অমনি ওর মতো নিন্দুক, পরশ্রীকাতর–"

রেণুকা হেসে উঠল। সে বিজনেশের উপর জ্ঞানদার অবহেলার ভাব লক্ষ্য করেছিল। বললে, "এখানে আপনার সঙ্গে যখন ইচ্ছা বেড়াবো। যতক্ষণ না আমি কোন অন্যায় করছি ততক্ষণ কাউকে ভয় করবার আমার কিছুই নেই। জ্ঞানদা যা ইচ্ছা বলে

বেড়ান। দুজন না হলে ঝগড়া হয় না। কিন্তু আমি ওঁকে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার উপযুক্ত বলে মনেই করি না।" বলে সে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো। বিজনেশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিল।

তখন সন্ধ্যা হয় নি কিন্তু রাস্তার আলো জ্বালিয়ে গেছে। গাড়ীর ভীড়ে পথে পথিকদের সন্ত্রস্তভাব। রেণুকা অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। তার মনে এখন যুগপৎ বিজনেশ এবং জ্ঞানদার চিন্তা।

জ্ঞানদার তার ওপর কেন এত আক্রোশ তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তিনি সাপের মতো বিষ উদগার করতে আরম্ভ করেছেন।

লোকের কাছে তার নামে কুৎসা রটনা করছেন। খবরের কাগজে ছদ্মনামে তাকে গালাগালি করছেন। অথচ রেণুকা তো তাঁর কাছে কোনো দোষ করে নি। সাপকে দুধ কলা খাওয়ালেও সে বিষ উদগার করবেই।

কিন্তু বিজনেশকে রেণুকার ভালো লেগেছে। বিজনেশের আচরণ বাড়াবাড়ি হলেও রেণুকা তার উপর রাগ করতে পারে না। রেণুকার কাছে বিজনেশ হচ্ছে গ্রীষ্মকালের ভ্রমণক্লান্তি-নিরাময় পথের কোনো ছায়াঘন তরুর মতো। অন্তঃসারহীন আলাপের পর বিজনেশের সঙ্গে দুটা কথা বললে মনে হয় যে প্রচণ্ড গরমের সময় মধুর হাওয়া বইল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার রেণুকার মনে পড়ল নবকুমারকে। তার কথা মনে হতেই তার সমস্ত অন্তরটা অপমান বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নবকুমার যেন তীব্র-জ্যোতি কোন প্রদীপ, আর রেণুকা যেন কোনো পতঙ্গ। যতবারই সে প্রদীপের কাছে ঘেঁষতে চায় ততবারই দেহে দহনজ্বালা জ্বলে। অথচ, সে আকর্ষণ দমাবারও শক্তি তার নেই। নবকুমার তাকে দেশে ফিরে যেতে বলেছে। কিন্তু কেন? সে কথা বলবার তাঁর অধিকার কি? আর সে গেলেই বা তাঁর এতে কি লাভ হবে? রেণুকা অবশ্য দেশে কিছুদিনের জন্য যাবে নিজের জমিদারী রক্ষার জন্য, প্রজাদের সঙ্গে গোলোযোগ মেটাবার জন্য তাকে যেতেই হবে। কিন্তু নবকুমারের কথাতে নয়।

রেণুকা ঠিক বুঝতে পারে না সে কাকে বেশি ভালবাসে। নবকুমারকে, না, বিজনেশকে? রেণুকার মতে ভালবাসা মাত্র একবারই জন্মে, ভালবাসতে মাত্র একজনকেই পারা যায়। অথচ, তার দুজনকেই ভালো লাগে। তা হলে হয়তো সে কাউকেও ভালবাসে না। ভালোলাগা ও ভালবাসা এক নয়। মনোরমার সঙ্গে একদিনের আলাপের কথা তার মনে পড়ল। মনোরমা বলেছিলেন, "প্রেম হৃদয়েরই একটা বৃত্তি। সব সময়ে কোনো এক বিশেষ বৃত্তি কোনো এক বিশেষ বিষয়ে হৃদয়ের মধ্যে বহুক্ষণ স্থায়ী হতেও পারে না। এখন আছে, আর একটু পরেই নেই।

এই এখন আমি তোমার উপর রাগলাম, কালই হয়তো সে রাগ আমার চলে গেলো। আজ তোমাকে আমি ভালবাসি, কালই হয়তো তোমাকে আমি ঘৃণা করব। প্রেমও ঠিক তেমনি। আজ যাকে ভালবাসছি, কাল যদি তাকে ভালবাসতে না পারি

তাতে দুঃখিত হবার কিছুই নেই। যুগপৎ দু'জনকে ঘৃণা করা যেমন অসম্ভব নয়, দু'জনকে একসঙ্গে ভালবাসাও তেমনি অসম্ভব নয়। প্রেমকে আমরা খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরেই যত গোলযোগ উপস্থিত করি।

রেণুকা তর্ক করেছিল, "তাহলে সতীত্ব কথাটার কোনো অর্থই নেই বলে আপনি মনে করেন?"

"না, সতীত্বটা হচ্ছে একটা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার।"

"কিন্তু আমি তা মনে করি না। হৃদয়ের বৃত্তি বলেই যে সবগুলোই পালনীয়, তা নয়। মানুষের অন্তরে নিরন্তর ভালো-মন্দ কত ভাবই না জাগছে, তার মধ্যে ভালোগুলি সংযমের বাঁধ দিয়ে সৎপথে চালনা করাই মানুষের বিশেষত্ব। যারা অসংযমী তারাই হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তিকে প্রেম বলে ভুল করে। প্রেমেও সংযম চাই। হৃদয়ের সঙ্গে চাই মস্তিষ্কের সংস্পর্শ। নদীকে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছতে হলে চাই যেমন তটের বাঁধন—প্রেমের যথার্থতা অনুভব করতে হলে চাই তেমনি সংযম। আমাদের মধ্যে সংযম-শক্তির অভাব বলেই প্রেম কি—তা বুঝতেই পারি না। সতীত্ব কথাটাকে দোষারোপ করি।"

মনোরমা রেণুকার উচ্ছ্বাস শুনে মাত্র হেসেছিলেন, কোনো কথা বলেন নি।

গাড়ি ততক্ষণ রেণুকার বাড়ির গেটে গিয়ে ঢুকেছে। রেণুকা নেমেই দেখে, কে একজন তার ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চিনল, হিরণ। তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে সে আর এদিকে কোনোদিন আসে নি। রেণুকা তাকে দেখেই যেন কোনদিন কিছু হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করে বলল, "আপনি যে?"

হিরণ বললে, "আমার খুব ভাগ্য যে আপনাকে দেখতে পেলাম। এসেই শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। আশা করি আমাকে দেখে আপনি দুঃখিত হননি। আপনাকে আমার কতগুলো কথা বলবার আছে। শুনবেন কি?"

"নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।" বলে হিরণকে সঙ্গে নিয়ে সে ড্রইংরুমে এসে বসল।

হিরণ বসে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললে, "আপনার জন্য আমি বড়ো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। জ্ঞানদা দেবীকে বোধ হয় চেনেন। সে আপনার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয় লোকে সে কথা শুনছেও। সে আপনার নামের সঙ্গে বিজনেশকে জড়িয়ে কুৎসা রটাচ্ছে। শুনে আমার দেহের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু নিরুপায়। আচ্ছা, আপনি বিজনেশের সঙ্গে বেড়ানো আর আলাপ করা বন্ধ রাখতে পারবেন না? আপনাকে উপদেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করবেন।" হিরণ বোধহয় রেণুকার ভ্রূকুটি লক্ষ্য করেছিল, তাই তৎক্ষণাৎ শেষ বাক্যটা যোগ করে দিল।

রেণুকা কিন্তু হেসেই বললে, "আমরা কিছু করি আর না করি লোকে কথা বলবেই। কিন্তু যারা অপরের অসাক্ষাতে বলা কথা তার কাছে এসে লাগায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পাজী।"

হিরণ বিস্ময়ে অপমানে অবাক হয়ে গেল। বিমর্ষমুখে কিছুক্ষণ পরে বলল, "আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করে ও কথা বললেন?"

"ঠিক তা বলি নি।"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, আমি কোনো কারণেই আপনার মনোকষ্টের কারণ হতে চাই না। আমি যে আপনাকে—"

"মিঃ গাঙুলি! দোর থেকেই আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার।"

হিরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, "ক্ষমা করবেন, নিজেকে আমি সংযত রাখতে পারি নি, কিন্তু জ্ঞানদা আপনাকে কি বলে তাও কি আপনি শুনতে চান না?"

রেণুকা মাথা নেড়ে বললে, "না। ওযে কি বলে আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারি। কিন্তু লোকের কথায় কান দেওয়া আমি দরকার বিবেচনা করি না। আপনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে পড়বার মত মেয়ে আমি নই। জ্ঞানদার দল যা পারে বলুক, আমি বিজনেশের সঙ্গে মিশবোই, খুব বেশি করেই মিশবো। তাঁর মতো মানুষ আমি দেখি নি। জীবনকে কেমন করে উপভোগ করতে হয়, তা তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। জ্ঞানদার কথায় আমার কিছু আসে যায় না। সে—"

রেণুকার মুখ দেখে মনে হয় সে রেগে উঠেছে। কিন্তু শীঘ্র সে ভাব সংযত করে চুপ করল। অর্ধসমাপ্ত কথাটাকে আর শেষ করল না।

হিরণ বললে, "নিজের চোখে যদি নিজেই ধুলো দিতে চান তো আমার কিছুই বলবার নেই। জ্ঞানদা আপনাকে খুব ভালো মনে করে বললেই বোধ হয় আপনি খুব খুশি হতেন। কিন্তু যারা কাউকে ভালবাসে তারা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আচ্ছা, তবে আসি।" বলে হিরণ রেণুকার দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে। "কিন্তু আমি আপনাকে চিরকালই ভালো চোখে দেখবো"—এই বলে ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেণুকা আজ সর্বপ্রথম এই সমাজকে নিদারুণ ঘৃণার চোখে দেখল। সে এখানে আসার পর থেকে অনেক নীচতা, অনেক সংকীর্ণতা এদের মধ্যে দেখেছে, কিন্তু এই বলে সে নিজেকে বুঝিয়েছে যে, ভালো মন্দ দুটো নিয়েই মানুষ। কিন্তু বাইরের জাঁক জমকের অন্তরালে এদের মধ্যে যে কত কালিমা তা ঠিক সে বুঝতে পারে নি। ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে আসতে লাগল।

জ্ঞানদা আজ আবার তাকে বিজনেশের সঙ্গে দেখেছে। আজ আবার সকলের কাছে সে কি বলবে, একথা মনে মনে কল্পনা করে রেণুকা একা ঘরে রোষে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠতে লাগল।

এগার

মনোরমা শুনেছিলেন যে, জ্ঞানদা পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে রেণুকার নামে নানা কথা বলে থাকেন। কিন্তু জ্ঞানদা যে তাঁর কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে রেণুকার বিষয় আলোচনা করতে পারবেন, তা তিনি জানতেন না। যেদিন সত্য সত্যই তাঁর ঘরে বসে রেণুকাকে যা তা বলতে লাগলেন, সেদিন তিনি বিস্মত না হয়ে পারলেন না।

স্থির হয়েছে রেণুকা কিছু দিনের জন্য দেশে যাবার আগে রেণুকার বাড়িতে একটা বড়ো রকম উৎসবের আয়োজন করা যাবে। উৎসবে যত সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের

নিমন্ত্রণ করা হবে। মনোরমার মতে সেই উৎসবেই রেণুকা হবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর যখন সে দেশ থেকে ফিরে আসবে তখন তার আসনটা ফিরে পেতে আর কোনই বেগ পেতে হবে না। সেদিন মনোরমা সেই উৎসবের নিমন্ত্রিতদের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এমন সময় এলেন জ্ঞানদা। তিনি কাগজখানা নিজের হাতে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি?"

মনোরমা বললেন, "রেণুকার জন্য আমি এটা প্রস্তুত করছি। রেণুকার জন্মদিনে একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে–এটা তারই নিমন্ত্রিতদের তালিকা। দেখতো, কোন বিশিষ্ট লোক বাদ পড়ে গেছেন কিনা?"

জ্ঞানদা প্রথম দৃষ্টিক্ষেপেই বুঝতে পারলেন যে, যদি সবাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তাহলে উৎসবে যত সব প্রসিদ্ধ এবং স্বনামধন্য পুরুষ এবং মহিলার সমাবেশ হবে।

তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিটি নামের উপর দিয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলো। বললেন, "উৎসবটা খুব জমকালো হবে দেখছি।"

"হ্যাঁ, রেণুকা কতকগুলো বাজে লোককে বাদ দিয়ে খুব বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে।"

জ্ঞানদা শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "একটা খামখেয়ালী মেয়ের যে বিবেচনাশক্তি থাকবে সেটা আশ্চর্যের। তুমি যে এ ধরনের একটা মেয়েকে কেন আমাদের মধ্যে টেনে আনলে আমি বুঝতে পারি না। তুমি না হলে সে সভ্য সমাজে পরিচিত হতে পারত না। সে যে কোথাকার কে, তা কেউ জানে না। আমাদের মাঝে স্থান পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিজনেশকে নিয়ে সে যে রকম মাতামাতি করছে সেটা অসহ্য। আমি ওকে আদৌ ভালো মনে করি না।"

"কিন্তু তুমিই তো আগে ওকে পছন্দ করেছিলে বেশি। বিজনেশের মধ্যে দোষের যে কিছু নেই তা আমরা সবাই জানি। যে কোন মেয়ে তাকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারে। সে রেণুকার বন্ধু এবং আমার মনে হয় তার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু রেণুকা আর দু'টি পাবে না।"

যেন কোন বদ গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করল এমনিভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, "তার অভদ্র ব্যবহারে আমি আহত হয়েছি। ভদ্রতা বলতে সে কিছু জানে না।"

মনোরমার তর্ক করবার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ভালোভাবেই বললেন, "আমি তো তার মধ্যে কোন অভদ্র আচরণ লক্ষ্য করি নি। সকলের সঙ্গেই সে সরল ভাবে হাসিমুখেই কথা বলে।"

"মোটেই না। টাকার গরম তার মধ্যে যথেষ্ট।"

"সে নিজে থেকে কারো সঙ্গে আলাপ করতে চায় না। অপরেই বরং যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে যায়। কিন্তু আলাপ করতে গিয়ে কেউ দুঃখিত হয়ে ফিরে এসেছে, এমন শোনা যায় নি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় সবাই আমাকে ধন্যবাদ দেয়–এমন সে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।"

জ্ঞানদা কিছু না বলে কেবলমাত্র একটিবার ভ্রূকুটি করলেন।

মনোরমা বলে চললেন, "তুমি যে তার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছ তা কি জানি কেমন করে তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছে। শুনে সে অত্যন্ত আহত হয়েছে। সে কাল আমাকে বললে। জ্ঞানদাদেবীকে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় স্থান দেওয়া বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি বললাম সেটা তোমার পক্ষে অশোভন হবে। কিন্তু সে শুনতে চাইল না। রেণুকা সব সময় বলে যে ,সে ঝগড়া আদৌ পছন্দ করে না।"

জ্ঞানদা তাঁর ঠোঁট দাঁত দিয়ে চাপলেন। ক্রোধের চিহ্ন তাঁর সারা মুখে প্রকট হয়ে উঠল। মনোরমার কথা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর মত একজন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাকে যে কেউ বাদ দিয়ে কোন উৎসবের আয়োজন করতে সাহসী হতে পারে তা তিনি এই প্রথম শুনলেন। বললেন, "ক্ষতিটা অবশ্য রেণুকারই। কিন্তু এর দ্বারাই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরকম মেয়ের দিকে ঝোঁকা কি রকম ভুল। তার সঙ্গে আলাপে আমার আদৌ আনন্দ নেই। প্রথম থেকেই তার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তুমিও কিছুদিন বাদে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তুমি বলছ যে, তার উৎসব বেশ আনন্দজনক হবে। কিন্তু আমার মনে হয় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই রেণুকার উৎসবে যোগ দেবেন না। জানো না তুমি তার সম্বন্ধে লোকে কি ভাবে। এর মধ্যে বিজনেশকে নিয়ে যদি রেণুকা কোন কাণ্ড করে তা হলে কেউই বিস্মিত হবে না।"

মনোরমা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি যে কি করে তার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলো তা জানি না। রেণুকা আনন্দপ্রিয়, তার মধ্যে কুটিলতা বলতে কিছু নেই। আমিও আজকার নই। তুমি যে কেন তার সম্বন্ধে এই সব বলছ তা আমার মাথায় ঢুকছে না। সে দেখতে সুন্দর, তার প্রচুর অর্থ, সে যে লোকের প্রশংসা অর্জন করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি! লোকে প্রথমে তার টাকা দেখে আসে, সৌন্দর্য দেখে বন্ধুত্ব স্থায়ী করে। তার উৎসব যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তাতে বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

জ্ঞানদা বললেন, "এ নিয়ে আমি আর বেশি আলোচনা করতে চাই না। তার উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমার ইচ্ছা। আমাকে বাদ দেওয়া হবে, একথা বলবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

মনোরমা জ্ঞানদার মুখের ভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করলেন। তাঁর এই অপমানের শোধ তুলতে জ্ঞানদা রেণুকার মাথায় কি বজ্র নিক্ষেপ করবেন তা ভেবে রেণুকার জন্য তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পরশ্রীকাতর বিবেচনাহীন জ্ঞানদা যে-কোন মেয়েকে যে কতদূর অপদস্থ করতে পারে সে ধারণা রেণুকার নেই। তাকে সে কথা জানালে সে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

নিদারুন ক্ষোভে মনোরমা ঘেমে উঠলেন। তাঁর নিজের অতীতের সঙ্গে তুলনা করে রেণুকার সব কাজ তাঁর কাছে নির্দোষ ছাড়া কিছু মনে হল না।

অতীতের কথা মনে জাগতেই তাঁর বুকের ভিতর যেন নষ্ট আবেগ একবার জেগে উঠল, স্মৃতিপটে জাগল কয়েকটি মৃত মুখের ছবি, অর্ধবিস্মৃত কয়েকটা দৃশ্য। নিদ্রিত

অতীতের কক্ষ হতে কত তুচ্ছ ঘটনাও জীবিত হয়ে তার স্মৃতিপটে একে একে আশ্রয় নিতে লাগল।

বৈচিত্র্যময় জীবন, রহস্যময় জীবন। মানবহৃদয়ের প্রণয় পিপাসা অসীম, তার নির্বাণ নেই।

তিনি জানেন রেণুকার অন্তর শিশুর মত সরল। অন্যায়কে সে প্রেতের মত ভয় করে। রেণুকার জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে মনোরমা এটুকু বুঝেছেন যে, রেণুকার হৃদয় হচ্ছে কবির হৃদয়, ভাবুকের হৃদয়,–সুন্দর নিষ্কলুষ। তার মনে নিত্য নূতন পরিকল্পনা জাগে, সরল পরিকল্পনা। হীনতা নীচতা হতে সে বহু উচ্চে। প্রণয় সম্বন্ধে তার আদর্শ তাঁদের মতের সঙ্গে খাপ খায় না। সে বলে একটিমাত্র পুরুষের মধ্যেই নারী-প্রেমের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হতে পারে। তবে, সে পুরুষকে হতে হবে সবল সংযত। যেখানে সংযম নেই, সেইখানেই প্রেম বহু অভিলাষী হয়।

জ্ঞানদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ তবে আসি। তোমাকে আজ বড় পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। যে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে যেতে পারে।" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মনোরমা জ্ঞানদার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে আয়নার কাছে দাঁড়াতেই দেখলেন তাতে রেণুকার প্রতিবিম্ব পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রেণুকার দিকে ফিরে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "সিঁড়িতে বোধ হয় তোমার জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা হল?"

"হ্যাঁ তিনি দাঁড়িয়েই একবার ভ্রূকুটি করলেন। তারপর কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিও কোন কথা বলি নি।"

মনোরমা ভীতভাবে বললেন, "তোমার উপর খুব চটে গেছে। নিমন্ত্রণ থেকে তাকে বাদ দেওয়াটা বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে তালিকাটা দেখে ফেলেছে।"

"আত্মসম্মানের চেয়ে আর কিছু বড়ো নয়। তার কথাগুলো প্রথমে আমি গ্রাহ্যই করি নি। তার বন্ধুত্বের মূল্য যে কতটুকু তা প্রথম আলাপেই আমি বুঝে নিয়েছি। সে আপনার নামে পর্যন্ত আমার কাছে কত কি বলেছে। তারপর বললে বিজনেশের নামে। তারপর আবার বিজনেশকে আমার নামে যোগ করল। এখন আবার–"

এখানে রেণুকা থামল। মনোরমার উৎসুক চোখের দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করল। সে নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

মনোরমা কোমল কণ্ঠে বললেন, "তারপর?"

"তারপর সে আমাকে নবকুমারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। তার মতে আমি ভীষণভাবে নবকুমারের প্রেমে পড়ে গেছি। কিন্তু তিনি আমার দিকে ফিরেও চাইছেন না। আমার যত সব কলাকৌশল দিয়ে তাঁকে আমার বাড়িতে আনতে চাইছি কিন্তু তিনি আমার মতো অসৎ নারীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখছেন, এমনি আরও কত কি। সত্যই এবার আমার রাগ হয়েছে। আমার অবর্তমানে যে আমার নামে যা নয় তাই বলে, তাকে আমার গৃহে কেন নিমন্ত্রণ করবো?"

মনোরমা জ্ঞানদার প্রতিশোধ-স্পৃহার উগ্রতাকে মনে করে বললেন, "সময় সময় দরকার হলে তাও করতে হয়। নিজের জন্য এবং তোমার বন্ধুদের ভালোর জন্য তার

কাছে একটা কার্ড পাঠিয়ে দাও। তার কাছে তোমার দুয়ার বন্ধ করে রেখো না। তা করলে তোমার ক্ষতির মাত্রাটা একটু বেশির দিকেই ঘেঁষবে।"

রেণুকা মাথা নেড়ে বললে, "তা হোক, ওকে আমার ভয় করবার কিছুই নেই।"

মনোরমা বললেন, "আমি আর কি বলব। আচ্ছা যাক্, তালিকাখানা একবার দেখ।"বলে তিনি তালিকা খুঁজতে টেবিলের উপর চোখ বোলালেন। আর সব জায়গাও দেখলেন, কোথাও মিললো না। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "যাক্‌গে কোথায় গেল। আর একটা কপি উপরে আছে, পরে এলে তোমাকে দেখাবখন।"

কয়েক মিনিট পরে দু'জনে ভাবী উৎসব সম্বন্ধে আলোচনায় লেগে গেলেন। কিন্তু আলোচনাটা ভালো জমল না। কিছুক্ষণ পরেই রেণুকা চলে গেল।

মনোরমার মনে কিন্তু রেণুকার চিন্তা সারাদিন জাগ্রত হয়ে রইল। বিজনেশকে নিয়ে জ্ঞানদা অনেক দিন হতেই রেণুকার নিন্দা করতে শুরু করেছে। কিন্তু রেণুকা তো তাতে রাগে নি। অথচ নবকুমারের কথায় এত তার ক্রোধ কেন? চক্রান্ত করে কাউকে আহত করতে পারা যায় না, এক সত্যই আঘাত দিতে পারে। একমাত্র উলঙ্গ সত্যই তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো অন্তর রক্তাক্ত করতে পারে। মিথ্যা অপবাদে ভীত হয় ভীরুরা। কিন্তু রেণুকা তো ভীরু নয়।

বার

শরতের রাত। আকাশে পূর্ণচাঁদ উঠেছে। ছায়াপথ বেষ্টনকারী নক্ষত্রের জ্যোতি তাতে কিছু ম্লান দেখাচ্ছে। বিজনেশ ও রেণুকা বসেছিল রেণুকার বাড়ি সংলগ্ন উদ্যানের একদিকে। সেখানে বিদ্যুৎ-আলোক চাঁদের জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে নি। জন-কোলাহল শরতের সুরুচিকে অপ্রতিভ রেখেছে।

রেণুকা বিজনেশ বসেছিল পাশাপাশি মখমলের মত নরম দুর্বার উপর। চাঁদের কিরণ তাদের স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বাতাস এসে তাদের ফুলের গন্ধ বিতরণ করছে। সুমুখে দুগোছা গোলাপ ফুল কখন দু'জনের হাত থেকে খসে ঘাসের বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

বাড়ির মধ্য থেকে তখন 'রেডিওর' একখানা গান ভেসে এসে তাদের কথা কিছুকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। সেখান থেকে গানের কথা ও সুর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। গানটা ছিল অতুলপ্রসাদের একটা বিখ্যাত কীর্তন—

"ওগো সাথী মম সাথী আমি সেই পথে
যাব সাথে,—
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ
তিলক মাথে।
আমি সেই পথে যাব সাথে ॥"

গান শেষ হলে রেণুকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "চমৎকার! এমন সুন্দর গান আমি খুব কমই শুনেছি। কি সুন্দর কথাগুলি। সত্য বলছি আপনাকে, ভালো গান আর কবিতা মানুষের চিত্ত বিনোদন যেমন করতে পারে, অমন কিছুতেই নয়।"

বিজনেশ কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপরে যখন বুঝল এতক্ষণ হয়ত রেণুকার গানের মোহ কেটেছে, তখন ধীরে ধীরে বললে "কিন্তু পুরুষের সব চেয়ে বেশি চিত্ত-বিনোদন কে করতে পারে জানেন? কালিদাস তার ঋতু সংহারে 'শরৎ' বর্ণনা এই বলে শেষ করেছেন,–

প্রস্ফুটিত পঙ্কজেরা
যাহার বরানল
যুগ্ম নীলোৎপলের দলে
যাহার দু'নয়ন
রূপের আধার সকল প্রকার
এই যে শরৎ করুক আবার
প্রেমোন্মত্তা নারীর মতো
চিত্ত বিনোদন।

"প্রেমিক নারী পুরুষের চিত্তে যেমন আনন্দের ধারা বওয়াতে পারে এমন কিছুতেই নয়।"– বলে রেণুকা কিছু বলে কিনা তা শুনবার জন্য সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু রেণুকা কিছুই বলল না। তখন বিজনেশই আবার আরম্ভ করলে, "আর সত্যই তাই। নারীরও একমাত্র কাজ পুরুষের চিত্ত বিনোদন করা। ফুল যেমন রূপে, রসে, গন্ধে ভ্রমরকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে নারীর কাজও ঠিক তেমনি। সেও হৃদয়ের প্রেমে, মনের মাধুর্যে, দেহের সৌন্দর্যে পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করবে। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মুখে বলেছেন, সৃষ্টি ধারণের ক্ষমতাই নারীর সৌন্দর্য। হুইটম্যানের নাম শুনেছেন বোধ হয়? আমেরিকান পোয়েট। বলিষ্ঠ তাঁর কল্পনা, সুষ্ঠু তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তিনি বলেছেন–

তোমার ও দেহ নারী তব যৌবন
পূর্ণভাবে ভোগ আমি চাহি করিবারে,
এ-মোর জীবন দিয়েছে মেলি আপনারে
তব ভবিষ্যৎ মাঝে। নহে অকারণ,–
বিরাট সাম্রাজ্য যারা করিবে স্থাপন
মহান সৌন্দর্য যারা চাহে সৃজিবারে
উদ্ভাসিবে মানবের বিমূঢ় চেতন
আত্মত্যাগ দীপ্তি দিয়ে যারা বারে বারে
মোদের মিলনে সখি, সে সব মহান,
ত্যাগী, কর্মী, রূপস্রষ্টা পৃথিবীর কোলে
আসিবে, সৃজিবে দোঁহে, এই চাহে প্রাণ
সেই অনাগতদের ছায়া সখি দোলে
তোমার মাঝারে রূপদেব সে ছায়ায়
তাই-তো এ মন তব দেহখানি চায়।"

তরুণ-তরুণী সাবধান! রজনীতে কখনো বন্ধু-বান্ধবীর সাথে নির্জনে থেকো না। রজনীর এমন একটা মাদকতা আছে, এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি আছে যাতে করে সে অতি বড় সংযমীকেও বিচলিত করে তুলতে পারে। তার পরে আবার যদি তোমাদের মধ্যে কাব্য আলোচনা চলে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তখন কামনাকে লালসাকে প্রেম বলে ভুল হবে, কাঁচ কাঞ্চন আখ্যা পাবে।

বিজনেশ প্রতিটি কথায় অপরূপ ভাব মিশিয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে গেল। আবৃত্তি শেষ করেই সে রেণুকার একখানি হাত নিজের হাতের উপর রাখল। রেণুকা বাধা দিল না। তার স্নায়ু উপস্নায়ু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম যৌবনের সমস্ত উত্তেজনা আজ পুঞ্জীভূত হয়ে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে চায়। বহুক্ষণ পরে বিজনেশ আবেগজড়িত কণ্ঠে বললে, "কেমন লাগল হুইটম্যানের কবিতা, ঠিক বলেছেন না?"

রেণুকার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে সে কম্পিত কণ্ঠে বললে, হুইটম্যানের কথা থাক। আপনি তো নিজের কবিতা একটাও বললেন না?

বিজনেশ রেণুকার মুখের দিকে চাইলো। তারপর একবার আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ভাব-বিভোর কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলল,.–

"আজকে প্রিয়া পূর্ণিমা রাত
পূর্ণ চাঁদের চূর্ণ-হাসি
লতায় পাতায় কীর্ণ-হয়ে
দিল সকল সমুদ্রাসি।
বর্ষার শেষ মেঘের বেদুন
ফাটল হঠাৎ নীলাম্বরে
জীর্ণ তাহার পাঁজির রাশি
উড়ছে মৃদু হাওয়ার ভরে।
তাদের ফাঁকে তারার বিভা
যেমন তব তোমার চোখে
আজকে চল মেঘের ভেলায়
যাই দুজনে স্বপন লোকে।
বুলবুলেরই গানের মাঝে
স্বরগ সুরই আসছে নামি।
মন মাতানো স্পর্শে তোমার
মর্ত্যলোকে ভুলছি আমি।

অন্তরে মোর যে কবি, সে
তোমার গানে মত্ত হোল
আজকে প্রিয়া মৌন কেন
খোল মুখের ঘোমটা খোল।

খোল মুখের ঘোমটা খোল
কও কথা কও হালকা সুরে
সুরের স্রোতে যাবই ভেসে
যাবই ভেসে অনেক দূরে।

অনেক দূরে অনেক দূরে
যেথায় কভু যায় নি কেহ
সেই অজানা স্বপন লোকে
রচব ক্ষণিক সুখের গেহ।
সেই ক্ষণিকের সুখের হ্রদে
তোমায় আমায় সন্তরিব
শ্রান্ত যদি হয়েই পড়ো
বক্ষ তব বক্ষে নিব।
দেহ আমার জড়িয়ে ধরো
ক্লান্ত তোমার কোমল করে
আজকে যদি স্বর্গ না পাই
স্বর্গ কি সই পাবোই মরে?
জীবন থাকুক মরণ থাকুক
থাকুক পড়ে আর আর সবি
এই শরীরেই স্বর্গ পাবো
মিথ্যা কথা কয় না কবি।

বিজনেশ নীরব হল। রেণুকা নির্নিমেষ চোখে তার দিকে চেয়েছিল। বিজনেশ চোখ তুলতেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। রেণুকার ঠিক মুখের উপরেই তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বিজনেশ ধীরে ধীরে তার একখানি হাত রেণুকার কাঁধের উপর রাখল। তারপর তাকে হাতে জড়িয়ে ধরে তার কোলের উপর শোয়াল। রেণুকা বাধা দিল না, বিস্রস্ত বসন, বিস্রস্ত কেশ সংযত করবার কোনো চেষ্টা করল না। বিজনেশের সাহস বেড়ে গেল। সে তারপর নিজের মুখখানা ধীরে ধীরে রেণুকার মুখের অতি নিকটে নিয়ে চলল। রেণুকার শরীর বিবশ হয়ে গেছে। সে ভয়ে, আবেশে, আবেগে চোখ মুদল। কিন্তু তক্ষুণি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিজনেশের কোল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিকটে কার পায়ের শব্দ শোনা গেছে।

ভৃত্য এসে জানাল, কে একজন মহিলা রেণুকার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রেণুকা কেশ বেশ সংযত করে নিয়ে বললে, "কে?"

ভৃত্য বললে, "তা কিছু বললেন না। শীঘ্র আপনাকে ডেকে দিতে বললেন।"

"চল যাচ্ছি" বলে রেণুকা বিজনেশকে উদ্দেশ্য করে বললে, "একা বসে থেকে কি হবে? চলুন আপনিও–"

ড্রইং রুমে রেণুকার পিসিমা ব্রজরাণী প্রতিক্ষা করছিলেন। তিনি রাত আটটায় হাওড়ায় নেমেছেন। রেণুকা তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, "পিসিমা, তুমি? কোন খবর না দিয়েই?"

ব্রজরাণী রেণুকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ধীরভাবে বললেন, "কেন, চিঠি তো দিয়েছি, পাস নি বুঝি?"

রেণুকার মনে পড়ল এক সপ্তাহ হল সে দেশের চিঠি পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। সেগুলো যেমনি আসে, তেমনি গিয়ে একটা বাক্সেটে জমা হয়। সপ্তাহ শেষে একবার করে সব পড়ে নেবে ঠিক করেছিল। এমন বিভ্রাট ঘটবে কে জানতো? সে কিছু না বলে চুপ করে রইল।

ব্রজরাণী বুঝলেন যে তাঁর চিঠি পড়বার মতো ফুরসৎও রেণুকার নেই। তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বিজনেশের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনিই বিজনেশ বুঝি?" ব্রজরাণী এসেই ভৃত্যের মুখে বিজনেশের নাম শুনেছেন।

রেণুকার পশ্চাতেই বিজনেশ ছিলেন। রেণুকা তার দিকে চেয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, ইনিই আমার বন্ধু বিজনেশ, মিঃ রয়, ইনি আমার পিসিমা–"

বিজনেশ ব্রজরাণীকে নমস্কার করল। ব্রজরাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। রেণুকার দিকে চেয়ে বললেন "নবকুমার এখানে আসেন?"

রেণুকা ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না'।

ব্রজরাণী আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "আসে না এখানে? দেখা হয় তার সঙ্গে তোর? কোথায় হয়? তুই তাঁর কাছে যাস্?"

বিজনেশের সুমুখে নবকুমারের প্রতি পিসিমার এই আগ্রহ প্রকাশে রেণুকা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বললে, "দুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; নিমন্ত্রণ করলেও তিনি আসেন না।"

পিসিমা আর রাগ চেপে রাখতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তবে এতদিন ধরে কি করছিলি তুই? আমি ভেবেছিলাম"–কি ভেবেছিলেন দয়া করে প্রকাশ না করলেও রেণুকা হাড়ে হাড়ে তা অনুভব করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার আরম্ভ করলেন, "এখানে তা হলে তুমি স্ফূর্তি ওড়াতে এসেছ? ওদিকে জমিদারী ছয় নয় হয়ে যাচ্ছে। আমি বুড়ো মানুষ, কদিক আর সামলাই? যাক্ সব জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখ। কালই যেতে হবে–কোন ওজর আমি শুনব না।"

এবার রেণুকাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বিজনেশের সুমুখে পিসিমার এই কথাবার্তায় সে নিজেকে অপমানিত বোধ করল। বললে, "আমার যাওয়া হবে না। আমার যেতে এখনো কিছু দেরী আছে।" তার কথার মধ্যে ক্রোধের ঝাঁঝ বেশ ভালো মাত্রায়ই ছিল।

ব্রজরাণী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রেণুকা তাঁকে ভয় করে, ভক্তি করে। এই এতটুকু বয়স থেকে তিনি তাকে মানুষ করেছেন, স্নেহ দিয়েছেন, শাসন করেছেন। রেণুকা কোনদিন তাঁর অবাধ্য হয় নি। মায়ের সম্মানই সে বরাবর তাঁকে দিয়ে এসেছে। তাই তাঁর মনে বড়ো বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলে রেণুকা আসবেই। তাঁর কথা অবহেলা করতে পারবে না। এখন তার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে অভিমান বেদনায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি প্রাণপণে চোখের উদ্যত অশ্রু দমন করে গলার স্বর স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ পরে বললেন, "যাবি না?"

রেণুকা ব্রজরাণীর মুখের ভাব, কণ্ঠে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল। তেমনি ঝাঁঝাল কণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

"বেশ, তবে থাক। আমি গেলাম।" বলে তিনি আর কোনদিকে না চেয়ে, কোন কথা না বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রেণুকা ব্রজরাণীকে চেনে। জানে যে, আর বাধা দিলে কোন ফল হবে না। একগুঁয়ে ব্রজরাণী একবার যা স্থির করে ফেলেন তার আর অন্যথা হয় না।

রেণুকা তাই আর তাকে ফিরাবার চেষ্টা করল না।

ব্রজরাণী বেরিয়ে যেতেই রেণুকার বহু পুরাতন ভৃত্য কেশবলাল এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে, "আমাদের কি একেবারে ভুলে গেলে দিদিমণি?"

পিসিমার কঠিন কথা শুনে রেণুকার অভিমান হয়েছিল। পিসিমাকে কঠিন কথা বলেছে বলে নিজের উপর তার রাগ হচ্ছিল। এখন পুরাতন ভৃত্যের স্নেহের সম্বোধনে উভয় ভাব রোদনের আশ্রয় নিতে চাইল। কিন্তু পাছে কোন কথা বলতে গেলেই বিজনেশের সুমুখেই চোখের জল বের হয়ে পড়ে এই ভয়ে সে মাত্র উচ্চারণ করল, "ভুলব কেন? যাও, পিসিমা হয়ত তোমার খোঁজ করছেন।"

এই সামান্য কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে কেশবলাল বেরিয়ে গেল। সে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেই পিসিমা ড্রাইভারকে নবকুমারের ঠিকানা বলে দিলেন। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল।

সৌভাগ্যের বিষয় নবকুমারের সেদিন কাজের ভীড় ছিল না। ভৃত্য গিয়ে খবর দিতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে তাকে তার বিশ্রামকক্ষে ব্রজরাণীকে নিয়ে আসতে বলে দিলেন। ব্রজরাণী আসতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বসতে বললেন। ব্রজরাণী আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন। বললেন, "আমি তোমার কাছেই আসছি।'

নবকুমার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

ব্রজরাণী কেশবলালকে হাঁক দিয়ে বললেন, "গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দে–" তারপর নবকুমারের দিকে চেয়ে "আমার বিছানা কোথায় হবে বলতো? সেই ঘরে আমার বিছানাগুলো নিয়ে যাক্।"

নবকুমার ব্যস্ত হলে বললেন, "আচ্ছা, আমি সে সব ঠিক করে নিচ্ছি। আপনি বসুন একটু–"বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ভৃত্যকে যথোপদেশ দিয়ে ফিরে এসে বললেন, "আপনাকে তো আহ্নিক করতে হবে?"

ব্রজরাণী খুশি হয়ে বললেন, "সে সব আমি গঙ্গাতে সেরে এসেছি। খাবারও কোন বন্দোবস্ত করতে হবে না। এবার একটু শুতে পেলে বাঁচি। তা যাক্। তুমি বসো এখন। তোমার সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আছে।"

নবকুমার বসলে ব্রজরাণী কিছুক্ষণ চুপ কর থেকে বললেন "তোমার বাবা রেণুকাকে বাঁচাতেই হবে।"

নবকুমারের বুকটা ধক্ করে উঠল। রেণুকার কোন অসুখ করেছে নাকি? ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, "কি হয়েছে তাঁর? কই আমি তো কিছু জানি না।"

নবকুমারের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে ব্রজরাণী খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "না, অসুখ করে নি তার। কিন্তু কলকাতায় থেকে সে ফিরিঙ্গি বনে গেছে। আমায় পর্যন্ত

খাতির করল না। এই রাত্রি বেলাতেও দেখলাম কে এক বিজনেশের সঙ্গে বাগানে বসে গল্প করছিল। সোমত্ত মেয়ের কি এত ভালো?"

বিজনেশের নাম শুনেই নবকুমার চমকিত হয়ে উঠলেন। বিজনেশের চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত নেই। সে মাতাল, চরিত্রহীন, তার স্ত্রী নবকুমারের চিকিৎসাধীনে। রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বিজনেশ আমোদ করে বেড়ায়। তার মতো লোকের সঙ্গে রেণুকা মিশেছে জেনে নবকুমারের চিত্ত রেণুকার উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

ব্রজরাণী আবার বললেন, "রেণুকা তোমাকে শ্রদ্ধা করে। তুমি ওকে বুঝিয়ে দেশে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে ওর ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।"

নবকুমার বললেন, "আমার কথা তিনি শুনতে যাবেন কেন? আর আমার তাঁকে বলবারই কি অধিকার আছে? আমি এখানে আসতেই তাঁকে নিষেধ করেছিলাম। শোনেন নি—"

ব্রজরাণী বললেন, "যদি অধিকার কারো থাকে তো তোমারই। দাদা তো ওকে তোমার হাতেই দিয়ে গেছেন—"

নবকুমারের বক্ষ আন্দোলিত হয়ে উঠল। তিনি ব্রজরাণীর কথার অর্থ বুঝলেন। সে এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আর কিছু বুঝতে পারলেন না।

ব্রজরাণী প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বললেন, "তোমার বাবারও তাতে আপত্তি ছিল না। এই দেখ"—বলে একখানা চিঠি নবকুমারের হাতে দিলেন।

নবকুমার বিলাত থেকে ফেরবার পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নবকুমার প্রথমে চিঠির তারিখ দেখলেন। মৃত্যুর একমাস আগে তাঁর পিতা রেণুকার পিতাকে এই চিঠিখানা দিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে—

"হরগোবিন্দ, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। নবকুমার বিলাত থেকে এলেই তোমার কন্যার এবং হাসপাতালের ভার তার উপরেই দেওয়া যাবে। খুব ভালো ডাক্তার হয়ে আসছে বলেই যে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও সে থাকতে পারবে না, নবকুমার সম্বন্ধে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চিত থাকো—"

নবকুমার চিঠিখানা তিন চার বার পড়লেন। চিঠি পড়ে সমস্ত তাঁর কাছে সরল হয়ে গেল। রেণুকা কেন তাঁকে রাঙামাটিতে আহ্বান করেছিল, কেনই বা তার কলকাতায় আসা, কলকাতায় এসে কেনই বা তাঁকে বার বার নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে সবই এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সারা অন্তরে তাঁর আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। রেণুকার কলকাতায় থাকার মধ্যে যে ভাবটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা আজ তিনি আবিষ্কার করেছেন।

ব্রজরাণী বললেন, "তুমি যখন রাঙামাটিতে গিয়েছিলে, তখনই আমি কথাটা পাড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ পাই নি। তুমি তাড়াতাড়ি করে চলে এলে। তা যাক্, আগামী অগ্রহায়ণে ভালো দিন আছে। ঐ মাসেই শুভকাজ সমাধা করে ফেলা ভালো। শুভস্য শীঘ্রম। আমি ভটচাজকে দেখিয়ে দিন ঠিক করে এসেছি।"

নবকুমার নীরবে চিন্তা করে বললেন, "প্রথমত কর্তব্য হচ্ছে রেণুকার মত নেওয়া। তিনি কি এ বিয়েতে রাজি হবেন?"

ব্রজরাণী বুঝলেন যে নবকুমারের বিবাহে আপত্তি নেই। আনন্দে তাঁর সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার মত পাত্র পেলে সে বর্তে যাবে—"

নবকুমার কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সমস্ত প্রেমের ক্ষেত্রেই প্রথম প্রথম একটা ভীরুতা আসেই। অনিশ্চয়তা, ভয় এবং সন্দেহ এই তিনটি প্রেমিক প্রেমিকার উপরে প্রভাব বিস্তার করবেই। তাই শয়ন ঘরে সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় নবকুমার শুধু কি করা কর্তব্য ভাবতে লাগলেন। একবার মনে করলেন, রেণুকার নিকট প্রস্তাব করে দেখাই যাক্ কি বলে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে করলেন সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সে আঘাত হয়ত তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তার চেয়ে এমনি বেশ। তাঁর পিতা তাঁকে রেণুকাকে বিবাহ করতে বলে গেছেন। তাঁকে মুখে না বললেও রেণুকার পিতাকে তো কথা দেওয়া হয়েছে। পিতার আদেশ অমান্য করা পাপ। রেণুকার কোন আচরণের পশ্চাতে হয়তো কোন কিছুই নাই। সে হয়তো নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাঁকে 'রাঙামাটিতে' ডেকেছিল, কলকাতায় এসেছে। কলকাতার উপর হয়তো তার সত্য সত্যই আকর্ষণ আছে। যদি বা আগে না ছিল, এখন তো হতে পারে।

এমনও তো হতে পারে যে, সে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই প্রথমটা কলকাতায় এসেছিল। তারপর মনোরমাদের সঙ্গে মিশে এখন তাদেরই একজন হয়ে গেছে। পিতার আদেশ অবশ্য রেণুকা অমান্য না করতে পারে। পিতা যাঁকে মনোনীত করে গেছেন তার গলাতেই মালা দিতে পারে। কিন্তু ভালোবাসা তিনি যদি না পেলেন তাহলে মাত্র মালাটা গলায় পরে তিনি কি করবেন? অনেক ভেবে নবকুমার ঠিক করলেন, রেণুকার নিকট এখন প্রস্তাব করা হবে না। তবে তিনি যদি একান্তই কখনও বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তখন যথা কর্তব্য করা যাবে।

তের

উৎসবের আর বড়ো বেশি দেরী নেই। কিন্তু উৎসবের দিন যতই নিকট হয়ে আসতে লাগল রেণুকার চিত্ত ততই বিমর্ষ হয়ে উঠতে লাগল। যে আনন্দে, যে তেজে সে এতদিন সকলের মধ্যে বিচরণ করেছে, সে আনন্দ, সে তেজ যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে; তার মনে হচ্ছে যেন তার অধঃপতন ঘটেছে। যেদিন রাতে সে বিজনেশের সঙ্গে বাগানে বসেছিল সেদিন পিসিমা গিয়ে হাজির না হলে ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াতো, তা কল্পনা করে সে নিজেকে তীব্র কশাঘাত করতে চাইল। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, সংযম হীনতার জন্য নিজেকে নিন্দা করতে লাগল। কিন্তু তবু সে রাত্রের কথা মনে হতেই সমস্ত শরীরে তার শিহরণ বয়ে যায়, সমস্ত গ্লানিকে ছাপিয়ে সেদিনের বিচিত্র অনুভূতি তার সমস্ত হৃদয় মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। ভাবটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতেই রেণুকা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এখনই মনোরমা আসবেন, বাজারের জিনিসপত্তর কিনে আনতে হবে। মনোরমা সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন।

মনোরমা আসার পূর্বেই রেণুকা বেশ পরিবর্তন করে প্রস্তুত হয়ে রইল। তিনি আসতেই সে গাড়িতে উঠে বসল। গৃহের মধ্যে একা থেকে মনের মধ্যে যে বিমর্ষতা দেখা দিয়েছিল বাইরের জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে আবার নবীন উৎসাহ অনুভব করল।

তারপর দোকানে ঘুরে জিনিসপত্র কেনার ভিড়ে মনের কিনারে যেটুকু মেঘ অবশিষ্ট ছিল তাও সরে গেল।

জিনিসপত্তর কেনা শেষ করে তারা যখন গাড়িতে এসে বসল তখন রোদের উত্তাপ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মনোরমা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পরিশ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "দোকানের ভিতরে কি বিশ্রী গরম! গরমে মারা পড়বার মত হয়েছিলাম। আশ্চর্য হচ্ছি, এমন দিনেও তুমি কি করে নিজেকে এমন প্রফুল্ল রেখেছ, এমন করে হেসে কথা বলতে পারছ। গরমের দিনে দুপুরবেলা একবার বাজার করতে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আর দুপুরে কখনো জিনিসপত্তর কিনতে বেরুব না। আজ অবশ্য প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছি, সবাই ভাঙে।"

রেণুকা উত্তর করল, "ওতেই আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, পরোপকারের ওপর আপনার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। আমার মনে হয় আমি সহজেই সন্তুষ্ট হতে পারি। সুখের জন্য আমি বাইরের দিকে চাই না। সুখ থাকে অন্ত রের মধ্যে। এটা যদি আপনার একবার বিশ্বাস হয় তা হলে সব কিছুতেই সব সময় আপনি আনন্দ পাবেন। অন্তর যার আনন্দময় তার আনন্দ কেড়ে নিতে প্রকৃতির প্রচণ্ডতাই বলুন আর মানুষের নীচতাই বলুন কিছুতেই পারবে না।"

মনোরমা বললেন, "ওটা তোমার পক্ষেই খাটে। তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যেটা তোমাকে আর সবার চাইতে উঁচুতে স্থান দিয়েছে।"

কোলাহল মুখর জনবহুল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মোটরের গতি মাঝে মাঝে প্রতিহত হচ্ছিল। একটা মোটর বিপরীত দিক থেকে সশব্দে অতিদ্রুত তাদের মোটরের পাশ দিয়ে যেতেই মনোরমা বললেন, "সেদিন তোমাকে ক'টাকা ফাইন দিতে হয়েছিল? তুমি তো আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলনি, আমিও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

রেণুকা বললে, "সেদিন ড্রাইভারটা কি কাজে বাইরে গিয়েছিল, আমারও সে সময় বাইরে কি কাজ পড়ল। তাই নিজেই ড্রাইভ করছিলাম। সকালবেলা বাইরে তখনও লোক বেশি থাকে নি। তাই স্পীডটা একটু বেশি করে ফেলেছিলাম। চৌরঙ্গীতে আসতেই পুলিশ ধরল। এই ব্যাপার–"

মনোরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, তবে যে কাগজে লিখেছে, রেণুকা ব্যানার্জী নাম্নী এক পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকারিণী তরল মস্তিষ্কা রমনী আর একটু হলেই এক নিরীহ পথিকের উপর মোটর চালিয়ে দিত। পুলিশ সময় থাকতেই তাকে পাকড়াও করে–আর একটা কথা তার চেয়েও বিশ্রীভাবে লিখেছে।

রেণুকা হেসে বললে, কাগজওয়ালাদের দস্তুরই ওই। কি ভাগ্যে লেখেনি যে, একজনকে চাপা দিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। কিন্তু এসব খবর দেওয়ার মধ্যে বন্ধুদের কারু হাত আছে। অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভাবছি, আমার বিরুদ্ধে এই যে সব মিথ্যা প্রচারের শেষ কতদিনে হবে। আমি শুনেছি–আমি এমন কতকগুলো কাজ করে চলেছি যা করা নাকি কোন ভদ্রমহিলারই সাজে না। এই

সব কথা নবকুমারের কানে গেলে না জানি তিনি কী ভাববেন। অবশ্য তিনি যে আমার উপর খুব সন্তুষ্ট তা নয়। তিনি আমার আগামী উৎসবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বার বার অপমানিত হয়েও কেন যে আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না।"

মনোরমার মুখের উপর দিয়ে একটা হাসির রেখা ভেসে গেল। আজ তিনি বলে ফেললেন, "নবকুমারকে কি তুমি সত্যই ভালবাসো?"

রেণুকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, "ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার মতেরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রেমেরও মৃত্যু হয়। নবকুমারকে যদি সত্য কোনোদিন আমি ভালোবেসে থাকি তাহলে সে ভালোবাসা আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।"

রেণুকার ছেলেমানুষিতে মনোরমা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "প্রেমেরও যে মৃত্যু হয় এটা আমি অবশ্য অস্বীকার করছি না। কিন্তু নবকুমার তোমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আসছে, এই-ই যদি তোমার প্রেমের মৃত্যুর কারণ হয়, তাহলে সেটাকে প্রেম বলো না। কিংবা সেটা এত গভীর প্রেম যে, তার গভীরতা পর্যন্ত তোমার কাছে অজ্ঞাত হয়ে আছে এবং যেটার মৃত্যু হয়েছে বলে তুমি প্রকাশ করছ তা তার জীবন প্রাচুর্যেরই প্রমাণ। একজনকে ভালোবেসে অপরকে বিয়ে করার মতো দুঃখ আর নেই।

সেইজন্য তোমাকে আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, যা করবে একেবারে বিনা চিন্তায় করো না। প্রেম এত তুচ্ছ জিনিস নয় যে, সে সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহভাবে কথা বলা যেতে পারে। প্রেম হচ্ছে নিষ্ঠুর একটা শক্তি যা 'আত্মনিবেদনে সন্তুষ্ট হতে পারে, বিচ্ছেদে সে অবিচলিত থাকতে আদেশ করে।'

তুমি দেখতে শুরু করেছ যে, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, অসম এবং বিষম আলোচনা আনুষঙ্গিক হিসাবে লাভ হয়। তুমি এখনো জান না, প্রেম তোমাকে কী দেবে। একটু বুকে বেদনা, একটু অনুশোচনা, তাকে প্রেম আখ্যা দিও না।"

মনোরমা বহুক্ষণ নীরবে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমার জীবনের এই শুরু মাত্র। আমার কথা এখন হয়ত তুমি ভালো বুঝবে না, কিন্তু যৌবনের এই প্রথম ধাপেই যদি কোনো ভুল করে বসো তা হলে সে ভুল শুধরানো আর হয়ত হয়েই উঠবে না। এ কথার উদাহরণরূপে আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হয়ত খাড়া করা যেতে পারে। প্রথম যৌবনে সর্বপ্রথম আমি যাঁকে ভালোবাসলাম তিনি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি যে কত শোক পেয়েছি তা কাউকে বলবার নয়। তবুও সকলের কাছে আমাকে হাসিমুখ দেখাতে হয়েছে। যেদিন তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে থিয়েটারে যেতে হয়েছিল। যাঁকে আমি ভালবাসি, যিনি মনে করেছিলেন যে আমি তাঁকে ভালবাসি, তাঁর মৃত্যুতে সেদিনের আমার সেই ব্যবহার বহু রাত ধরে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে–"

রেণুকা ব্যাগ্র কণ্ঠে বললে, "আপনি কি এখনো তাঁকে ভুলতে পারেন নি?"

মনোরমা বললেন "ভুলতে পারে বলেই মানুষ বাঁচে। ভুলতে পারে না বলেই সে ভালোবাসে। তাঁকে আমি এখন ভুলে গেছি, কিন্তু তাঁর স্মৃতি ভুলবার নয়। আমি যে

তাঁকে এত ভালোবাসি তা অবশ্য আমি প্রথমটায় বুঝি নি এবং বুঝলেও একজন সামান্য গৃহশিক্ষককে বিয়ের কথা কাউকে জানাবার স্পর্দ্ধা আমার ছিল না। যেদিন তিনি শুনলেন অন্য একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তার কিছুদিন পরেই তিনি আত্মহত্যা করলেন। প্রেমকে সেইদিনই আমি বড়ো করে দেখেছি। কিন্তু তখন আর ভুল শুধরাবার উপায় নেই। বাইরের আনন্দের মধ্যে অন্তরের বেদনাকে ডুবিয়ে রাখাই হল তখন আমার একমাত্র কাজ—"

রেণুকা বললে, "এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কেন আপনি আপনার মেয়েকে ভালবাসতেন না।"

মেয়ের উল্লেখে মনোরমা বিচলিত হয়ে উঠলেন। নিজের মেয়েকে অযত্ন করে মেরে ফেলেছেন এই জন্য মনোরমার প্রতি রেণুকার একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণার ভাব ছিল। সুযোগ পেলেই সে তাই শুনিয়ে মনোরমাকে খোঁচা মারতে ছাড়ত না। তার কেমন একটা ধারণা যে, এমনি করে খোঁচা মেরে মেরে সে বিগতযৌবনা মনোরমার হৃদয়ে মৃত সন্তানের জন্য অনুতাপ জাগাতে সক্ষম হবে। কিন্তু আজ তার মনে সেরকম কোন অভিপ্রায় ছিল না। মনোরমাকে নীরব দেখে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনার কি তার কথা কিছুই মনে পড়ে না! সে হয়ত কোনোদিন অন্য শিশুদের মতো তার কোমল হাত দুটি বাড়িয়ে আপনাকে ধরতে যেত। আপনার গহনার কোন উজ্জ্বল রত্ন হয়ত তাকে আকৃষ্ট করত। আপনার কি কিছুই মনে পড়ে না, একটা চুমো, কোনো শিশুসুলভ কথা?"

রেণুকা ছোট ছেলেমেয়েদের সত্যই ভালোবাসত। তার বয়সের মেয়েরা আমাদের দেশে বিয়ে হলে দুছেলের মা হয়। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্পবয়সেই জাগে, তা তারা যে-সমাজেই থাক। তাই মনোরমার মৃত সন্তানের কথা বলতে বলতে রেণুকা নিজেও একটা অস্পষ্ট চাঞ্চল্য অনুভব করল। তার মুখে চোখে কি একটা পিপাসা পরিলক্ষিত হল। এটা হয়ত সেদিনের বিজনেশের কবিতা-আবৃত্তির ফলও হতে পারে।

রেণুকার কথার উত্তর দিতে মনোরমাকে বেশ বেগ পেতে হল। মেয়ের কোন কথাই তাঁর মনে পড়ে না। অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, "মীনা সবসময় সাদা পোশাকে থাকত। আমাদের একটা পোষা হরিণ ছিল। সেটাকে সে বলত 'হমা'—ওইরকম একটা কিছু। সে তার বাবাকে কিন্তু আদৌ দেখতে পারত না। তার বাবা কাছে গেলেই সে কেঁদে উঠত। নার্সটা খুব ভালো ছিল, মা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন একজনের অনুরোধে আমি বোকামি করে ড্রইংরুমে আর সবার সুমুখে মীনাকে নিয়ে গেছলাম। সেদিন কিসের জন্য অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল যেন। মীনা কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাদের কাছে ছিল; সেই কয়েক ঘণ্টা অভ্যাগতরা শুধু তার কথা বলেই কাটিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে আমি বুঝলাম তাঁরা সব আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই মীনাকে নিয়ে এত কথা বলছেন। সে কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। তখনই আমি তাকে নিয়ে যেতে বলে দিলাম। যেতে কি চায়? অনেক করে তবে নার্স তাকে নিয়ে যেতে পেরেছিল।" রেণুকার হৃদয় মৃতা মীনার উপর সহানুভূতিতে ভরে উঠল। বলল, "তার কতদিন পরে সে মারা যায়?"

মনোরমা বিষয়টা পরিবর্তন করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি রেণুকাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন, "আগামী উৎসবের জন্য সে কেমন পোশাক অর্ডার দিয়েছে?" "সেটা কি এসে পৌঁছেছে?" "আহারদি প্রস্তুত করবে কে?" শেষে বললেন, "খুব বেশি লোক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান নিশ্চয় করেন নি? মজুমদার গ্রহণ করেছেন তো?"

মিসেস মজুমদার একজন আমেরিকান মহিলা। যৌবনের প্রারম্ভে এদেশে বেড়াতে এসে এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে বিয়ে করে এদেশেই আছেন। তাঁর স্বামী এখন হাইকোর্টের বিচারক।

রেণুকা বললে, "হ্যাঁ, তিনি গ্রহণ করেছেন।"

মনোরমা গর্বিতভাবে বললেন, "এ সবই আমার কাজ। তিনি জ্ঞানদার কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে যা তা কতকগুলো কথা শুনে আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, জ্ঞানদার সব নিন্দা ভিত্তিহীন। জ্ঞানদার সঙ্গে শত্রুতা করতে যাওয়ায় তিনি বললেন যে, সেটা তোমার সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয়নি। জ্ঞানদা অতি ভীষণ মেয়ে, তার অসাধ্য কিছু নেই।"

রেণুকা বললে, "অমন মেয়ের সংসর্গ ত্যাগ করাই তো ভালো। যাক্ ওর কথা। মীনা শুতো কোন ঘরে?"

আমার শোবার ঘরের পাশেই ছোট একটা ঘর, দেখেছ বোধ হয় তুমি? তার অসুখের সময় মা এসে তাকে আমার পাশের ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। রাত্রি বেলায় কেঁদে ঘুমের ভয়ানক ব্যাঘাত করত। কিন্তু আমার কুড়েমির জন্য সে ঘর পরিবর্তন করা আর হয়ে ওঠে নি। তুমি হয়ত এখন ভাবছ ছেলে হওয়া কতই না সুখের। তুমি রঙিন খেলনা দেখেছ আর দিনের বেলায় শিশুর মুখের হাসি দেখেছ, কিন্তু গভীর রাতে শিশুর বিশ্রী কান্না তো শোন নি। গভীর রাতে শিশুর কান্নায় অস্থির হয়ে সুখ নিদ্রা ছেড়ে যখন মাকে ফিডিং বোতল খুঁজতে হয়, মায়ের তখনকার অবস্থা কল্পনা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।"

রেণুকা কোন উত্তর দিল না। কারণ সে বিষয়ে তার নিজস্ব একটা মত আছে।

গাড়ি ততক্ষণ বাড়ির মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। গাড়ি থেকে দু'জনেই নীরবে নামল। তারপর রেণুকা বললে, "অনেকক্ষণ থেকে একটা কথা আপনাকে বলি বলি করছি কিন্তু বলতে কেমন বাধছে।"

মনোরমা হেসে জবাব দিলেন, "এই একটা কথা বলেই তুমি আমার আত্মীয়তার অমর্যাদা করে ফেললে রেণুকা। তোমার কথাতে আমি কিছু মনে করব, এমন কথা ভাবাও তোমার অন্যায়।"

রেণুকা লজ্জিত হয়ে বললে, "কথাটা এমন কিছু নয়, তবু–" বলেই একটু থেমে "আমার মনে পড়ে প্রেম নিয়ে আপনার সঙ্গে একদিন কী আলোচনা হচ্ছিল। সেদিন আপনি প্রেমকে হৃদয়েরই একটা বৃত্তি নাম দিয়ে ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি সমপর্যায়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ আপনার নিজের ভালোবাসার কথা যা বললেন তা কি সেদিনের কথার বিরুদ্ধতা করছে না? বরং এর দ্বারা এই প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রেম হৃদয়ের

অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে পড়তে পারে না। তার নিজস্ব একটা সত্তা আর সব হতে ভিন্ন স্থানে হৃদয়ের মধ্যে আছে।"

মনোরমা কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "প্রেমকে আমি হৃদয়েরই একটা বৃত্তি বলেছি এবং আজও বলছি, সেটা তাই।"

"নিজস্ব সত্তা বলে তুমি বোধ হয় এই বুঝতে চাচ্ছ যে, প্রেম এমনি একটা জিনিস যা হৃদয়ের মধ্যে স্থান পেলে সে স্থানে অটল হয়ে থাকবে। মানে, প্রেম যে একনিষ্ঠ তাই তুমি বলতে চাচ্ছ। আমি যাকে প্রথমে ভালবেসেছি তাকে ভুলতে পারি নি বলে যে আর কেউ পারবে না তা ঠিক নয় এবং যদি আজ একজনকে ভালবেসে কাল তাকে ভুলে অপর কাউকে ভালোবাসে, তার জন্য আমি তাকে নিন্দা করতে পারি না–তার সে আচরণ নেহাৎ স্বাভাবিকভাবেই আমি গ্রহণ করব। কিন্তু .সকলের মূলকথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস এবং পূর্ণবিশ্বাসে সরল অন্তঃকরণে কেউ যদি মনে করে যে, কাল যাকে ভালবেসেছি, তার প্রতি ভালবাসা আজ আমার নেই, আজ যাকে ভালবেসেছি এইটাই সত্যিকারের প্রেম, তখনই মাত্র আমি তার প্রেমকে সম্মানের চোখে দেখব–তা সেটা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক্।"

চোদ্দ

আজ রাতে উৎসব। বৈকালে আমন্ত্রিত হয়ে গৃহটি কিরূপ সাজানো হয়েছে তা দেখবার জন্যে বিনয়েন্দ্রের সহিত মনোরমা রেণুকার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বহির্সজ্জা দেখে মনোরমা চমৎকৃত হয়ে গেলেন। প্রশংসাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "তোমার বাড়িটি ইন্দ্রালয়ের মতো দেখাচ্ছে? সত্যিই খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে রেণুকা।"

রেণুকা আনন্দিত হয়ে হাসি হাসি মুখে বললে, "এর চেয়েও ভালো দেখাচ্ছে সিঁড়িগুলো" বলে সে সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে স্বামী স্ত্রী উভয়েই দেখলেন যত রাজ্যের গোলাপ ফুলে উৎসব কক্ষে উঠবার সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দু'পাশ সুসজ্জিত। নানা রঙের নানা ধরনের গোলাপ। পুষ্পশিল্পীর কলাকুশলতা নিরীক্ষণ করে মনোরমা মুগ্ধ হয়ে বললেন, "এ দেখে যে কেউ চমৎকৃত হবে। কি সুন্দর সাজিয়েছ?"

এমন কি বিনয়েন্দ্রও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, "বহুদিন এমন জিনিস আমার চোখে পড়ে নি। কেমন সুন্দর বড়ো বড়ো গোলাপ সব দিকেই।"

রেণুকা মনোরমার দিকে চেয়ে বললে, "বিজনেশ আমাকে একটা গোলাপ ফুলের জাহাজ গড়িয়ে দিয়েছেন–তার সবই তৈরি। চলুন, দেখে আসবেন।"

"না, এক্ষুণি আমাকে ফিরতে হবে। সে সব এর পর রাতে দেখব। উনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না–ওঁকে বরং দেখাও। কিন্তু দেখো, বিজনেশের সঙ্গে জাহাজে চড়ে উধাও হয়ে যেও না। আমরা তোমাকে ছাড়তে রাজী নই।" বলে হাসতে হাসতে একবার রেণুকার দিকে চেয়ে বিনয়েন্দ্রকে বললেন, "তুমি রেণুকার এইখানেই খেও। আমি চললাম।"

বিনয়েন্দ্র রেণুকার সঙ্গ খুব পছন্দ করেন। তার কাছে এলেই তাঁর কথার উৎস খুলে যায়। রেণুকারও বিনয়েন্দ্রকে খুব ভালো লাগে। তার খুব বিশ্বাস বিনয়েন্দ্র তাকে বুঝেছেন। তিনি অন্যান্য পাঁচজনের মতো সুযোগ পেলেই তার প্রশংসা করেন না। তাঁর কথাবার্তায় একটা সারল্য ফুটে ওঠে। তিনি প্রাণ খুলেই তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

রেণুকা তাঁর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন, "আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে যে সব নিন্দা প্রচারিত হয়েছে, তা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।"

রেণুকা বললে, "কে সবের মূল তার অনুসন্ধানের আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু–মোটর সম্বন্ধে অমন করে খবরের কাগজে কে রিপোর্ট দিল তা ঠিক করতে পারি নি। এতে আমার কোন মহিলা বন্ধুর হাত বলেই আমার বিশ্বাস। নিজের জাতিকে নিন্দা করা হয়ত অন্যায়। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, মেয়েরা যতই আলোক প্রাপ্ত হোক, পুরুষের কাছে তারা ঘেঁষতেও পারে না। তাদের স্বভাব যাবে কোথায়? মেয়েদের মতো হিংসুটে পরশ্রীকাতর আর কেউ নেই।"

বিনয়েন্দ্র বললেন, "পুরুষ সত্যই কিছু উচ্চ হৃদয়। সে হচ্ছে তাদের শিক্ষা এবং সকলের সঙ্গে প্রাণখুলে মেলামেশার ফল। তারা স্কুল কলেজে কত ধরনের ছেলের সঙ্গে মেশে। যাদের সঙ্গে মেশে প্রাণ খুলেই মেশে। কিন্তু মেয়েরা যেখানেই যাক তাদের মনের উপরে থাকে একটা অনাবশ্যক গর্বের আবরণ। সেজন্য তারা মেয়েদের সঙ্গেও খোলাখুলি ভাবে মিশতে পারে না। আর অধিকাংশ মেয়েই স্কুল কলেজে না গিয়ে বাড়িতে গভর্ণেসের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। তাতে তারা হয়তো লেখাপড়া শেখে। কিন্তু বাইরের পাঁচজনের সাথে মেলামেশার যে লাভ, তা থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে যায়। তারপর বড় হয়ে যখন তারা পাঁচজনের সাথে মিশতে আসে তখন সে উদার অন্তঃকরণ তাদের থাকে না। তার আগেই তাদের চরিত্র গঠিত হয়ে গেছে। চরিত্র একবার গঠিত হয়ে গেলে তার আর বড়ো একটা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়। বরং কোনো কোন ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের টেক্কা দিতে পারে। তারা অতি সহজেই পুরুষকে প্রতারিত করতে পারে। যাক্ মেয়েদের কথা। তুমি নাকি শীঘ্রই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?"

রেণুকা ঘাড় নেড়ে জানালো, "হ্যাঁ, কালই আমি দেশে ফিরছি।"

বিনয়েন্দ্র বললেন, "তুমি থাকতে বেশ ক'মাস আনন্দে কাটানো গেল। ফিরবে কখন?"

"তার ঠিক নেই। তবে শীঘ্রই ফিরবার চেষ্টা করব। আপনাদের ছেড়ে আর কোথাও থাকা আমারও পোষাবে না। জাহাজটা কেমন লাগল? আমি বিজনেশের কাছে একদিন বলেছিলাম, ফুল আমার খুব ভালো লাগে। সেই থেকে তিনি প্রায় প্রত্যহ নানা জাতের ফুল নিয়ে আসেন আমার কাছে। জাহাজের ফুলগুলো কিছু বিবর্ণ হয়ে গেছে–নয় কি? গাছের মধ্যে ফুল যত সুন্দর দেখায়; তুললে তার সৌন্দর্য শতগুণ নষ্ট হয়ে যায়।"

চায়ের কাপ নিঃশেষ করে বিনয়েন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "এখন উঠি। একটু পরেই তো আবার আসতে হচ্ছে।"

সন্ধ্যার কিছু পরেই সস্ত্রীক বিনয়েন্দ্র আবার এসে উপস্থিত হলেন। মনোরমার আজ আনন্দের সীমা নেই। রেণুকা আজ রাতে সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তার প্রতিষ্ঠা মানেই মনোরমার কীর্তি। তিনিই তাকে এতদূরে তুলতে পেরেছেন—সে কথা মনে হতেই আনন্দে গর্বে তার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছিল। রাত্রে বিদ্যুৎ-আলোক গৃহের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করেছে। আর রেণুকাও সাজে-সজ্জায় হয়ে উঠেছে অপরূপা। বিজনেশ তো রেণুকাকে দেখে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। মনোরমাকে বললেন, "দেখুন, আজ ওঁকে কেমন দেখাচ্ছে—যেন দেবী। এত সৌন্দর্য কখনও আমার চোখে পড়ে নি। উনি আজ সকলের মাথা ঘুরিয়ে দেবেন—"

বিজনেশ কথা বলবার সময় ভুলে গেলেন যে, মনোরমাও তাঁর সময়কার শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং আজও তিনি প্রশংসা প্রত্যাশা করেন। রেণুকার প্রশংসায় কিন্তু মনোরমা ক্রুদ্ধ হলেন না। রেণুকাকে আবিষ্কার করেছেন তিনি। তিনি না থাকলে তো রেণুকা প্রশংসা পেত না। বিজনেশের কথা শুনে তাই তিনি হেসেই সায় দিলেন।

বিনয়েন্দ্র তাঁর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "সবাইকার আসবার সময় হয়ে এল। আজকালকার সবাই সময়নিষ্ঠা সম্বন্ধে বেশ সাবধান হয়েছেন।"

প্রোগ্রাম হচ্ছে, অভ্যাগতরা পৌঁছুলেই সঙ্গীতের একটা বৈঠক বসবে। নামকরা কয়েকজন গায়ক গায়িকাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তারপর ভোজন।

হিরণ রেণুকার দিকে চেয়ে বললে, "সর্বপ্রথম গাইতে হবে কিন্তু আপনাকে এবং সর্বশেষেও।"

রেণুকা উৎসাহে ভুলে গেছে যে, হিরণ একদিন তার পাণি প্রার্থনা করেছিল। সে হেসে বললে, "ভুল বললেন আপনি। প্রথমে গাইবেন আপনি। শেষে মিঃ রয়। আপনাদের প্রোগ্রামের মাঝখানে কোথাও পারেন তো আমাকে বসিয়ে দেবেন। কারণ শুরু ও শেষ ভালো হলে সবই ভালো হয়েছে বলা যেতে পারবে—"

বিজনেশ হাত জোড় করে অভিনয়ের অনুকরণে বললে, "দেবী, এ দাসকে একেবারে শেষে ফেলে দেবেন না। তা করলে আমার রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠ শুনলে আপনার মাননীয় অভ্যাগতদের কেউ আর ভোজনের জন্য অবশিষ্ট থাকবেন না,—সবাই পলায়ন করতে চাইবেন। শেষকালে কি খাবার সব নষ্ট করে ফেলবেন?"

সবাই হেসে উঠল।

মনোরমা অভয় দিয়ে বললেন, "বৃথা ভীত কেন কবি? তোমার উপর ভার সঙ্গীতের নয়, আবৃত্তির। অতএব কিবা ভয়, কিবা চিন্তা কর?"

কথাবার্তার মাঝে মাঝে রেণুকা একবার দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চাইছিল। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত। কিন্তু বিনয়েন্দ্র যে বললেন, আজকালকার সবাই সময়নিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কই, এখনও কেউ এলেন? সে মুখে কিছু বললে না। কিন্তু অন্তরের মধ্যে একটা উদ্বেগ জেগে উঠল। আড় চোখে একবার মনোরমার দিকে সে চেয়ে দেখল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি বিনিময় চলছে। বিজনেশের মধ্যেও একটা অস্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হল। সে হাতের প্রোগ্রামখানা রোলারের

মতো করতে করতে ঘরের চারদিকে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে এবং উৎকর্ণ হয়ে সৌৎসুকে মাঝে মাঝে দোরের দিকে তাকাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় মিসেস মজুমদারের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমার প্রিয় মিস ব্যানার্জী, আমার মনে হচ্ছে আমি শীঘ্র এসে পড়েছি। মনে করেছিলাম, ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু আমার ঘড়িটা বোধ হয় ফার্স্ট চলছে, না নিমন্ত্রণের সময়টা ভুল দেখে ফেলেছি?"

জীবনের মধ্যে সর্বপ্রথম রেণুকাকে আয়াস করে হাসতে হল। বললে, "না, আপনার কিছুই ভুল হয় নি। অন্য সবাই হয়তো ভুল করছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না প্রত্যেকেরই কী হল? এই একটু আগে মিঃ গাঙুলী আজকালকার সবার সময়নিষ্ঠার কত প্রশংসা করছিলেন।"

মিসেস মজুমদার বললেন, "আমায় ক্ষমা করবেন মিস্ ব্যানার্জী। আমি মিসেস গাঙুলীর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি–"

কোনো কারণে মনোরমা মিসেস মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনবামাত্র একটু দূরে সরে গিয়েছিলেন। মিসেস মজুমদারের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু মিসেস মজুমদারকে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে দেখে নিজের ভীরুতা জয় করে হাসি মুখে তাঁকে অভিবাদন জানালেন।

মিসেস মজুমদার বললেন, "কেমন আছেন? জ্ঞানদার কোন কথায় কান না দিয়ে আমি আপনার উপদেশ মতো কাজ করেছি। জ্ঞানদার কাছে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবো না। কিন্তু আমি যে এত পরিবর্তন করেছি তা আর তাকে জানাবার সুযোগ পাই নি।" বলে তিনি মনোরমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। মনোরমা হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "আপনি আসাতে আমরা খুবই খুশি হয়েছি।" আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বার হল না। গৃহ এখনো শূন্য।

বিনয়েন্দ্র হিরণ এবং বিজনেশকে সঙ্গে করে রেণুকা দোরের দিকে এগিয়ে চলেছিল, সিঁড়ির উপর কারো পায়ের শব্দই পাওয়া গেল না।

"খুবই আশ্চর্য তো", মনোরমা বললেন, "এতক্ষণ আসর জমকালো হয়ে ওঠা উচিত ছিল। রেণুকা না জানি কি মনে করছে। যার ঘর প্রত্যহ বন্ধু-বান্ধবে ছেয়ে থাকে তার জন্মদিনে একি ব্যাপার। নিশ্চয় কিছু ভিতরের ব্যাপার আছে। রেণুকার বিরুদ্ধে জ্ঞানদা যে সব জঘন্য কথা প্রচার করছিল, তার জন্যই তো আপনি আসতে চাইছিলেন না, কিন্তু সে কি ওই মিথ্যা প্রচার করেই সকলের আসা বন্ধ করে দিল? অন্ততঃ পুরুষদের আসা উচিত ছিল।"

মিসেস্ মজুমদার বললেন, "তা বটে। আমি যা শুনেছি তা শুনলেও পুরুষদের আসার পক্ষে কোন বাধা নেই। সমাজ তো তাঁদের হাতেই।"

হতাশার একটা তীব্র ভাব মনোরমা অন্তরের মধ্যে অনুভব করলেন। মিসেস্ মজুমদারের কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা তাঁর বুকে খোঁচা মারতে লাগল। তিনি অস্থির ভাবে কক্ষের চারিদিকে তাঁর চঞ্চল দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল তিনি দৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যান।

রেণুকা ইত্যবসরে মনোরমার নিকটে এসে তাঁর কানের কাছে বলল, "এর মানে কি?"

রেণুকার এত অস্থির ভাব মনোরমা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি। রেণুকার সমস্ত সাহস আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার সমস্ত মুখ চোখে এক অস্বাভাবিক ভাব।

"কিছু বুঝতে পারছি না, উনি কি বলছেন।"

"মিঃ গাঙ্গুলী কিছু প্রকাশ করছেন না, কিন্তু আমি জানি তিনি কি ভাবছেন। তিনি মনে করেন যে এর মধ্যে কারো চাল আছে। এইমাত্র আমি তাঁকে সেই নিমন্ত্রিতদের তালিকাটি হারানোর কথা বললাম–আপনার মনে পড়ছে বোধ হয়? আপনি নিমন্ত্রিতদের যে তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন সেটা খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমরা ডুপ্লিকেট ব্যবহার করেছি।"

মনোরমা চমকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "হ্যাঁ আমার ঠিক মনে আছে যে, জ্ঞানদা সেখানা হাতে নিয়েছিল, তখনই বোধহয় সে সেখানা কোনো রকমে লুকিয়ে নিয়েছিল। কী পাজি মেয়ে মানুষ! সে কি সেই তালিকা দেখে সবাইকে আসতে নিষেধ করে দিল? তাই বা কী করে হয়। আজ বৈকালেও যে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সবাই তো আসব এই কথাই বলেছেন। তবে জ্ঞানদা কী কৌশলে সবার আসা বন্ধ করল?" বলে কিছুক্ষণ থেমে তিনি রেণুকার হাত দু'খানি ধরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আমায় ক্ষমা কর রেণুকা, আমারই জন্য তোমার এ অপমান ভোগ করতে হল।"

রেণুকা বাধা দিয়ে বললে, "ছিঃ ও কি বলছেন আপনি? আপনি আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা নেই। আপনার অন্তরের প্রকৃত ইচ্ছা কি তা তো আমার অজ্ঞাত নেই। আমার কপালে অপমান থাকলে আর আপনি কী করবেন? কিন্তু মিসেস মজুমদার যদি না আসতেন? আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতে পর্যন্ত পারছি না। আমার সব কিছু আয়োজন যেন আমায় ব্যঙ্গ করছে। চাকর বাকরেরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছে।"

মনোরমা অসহায় ভাবে বললেন, "কিছুই কি করা যেতে পারে না?"

"কি আর উপায় আছে বলুন–"

মিসেস মজুমদার সমস্ত কক্ষটা ধীর পদক্ষেপে পরিভ্রমণ করে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর মুখে একটা অস্বাভাবিক হাসি।

মনোরমার কাছে কক্ষের নীরবতা অসহ্য হয়ে এল। বিনয়েন্দ্র, বিজনেশ, হিরণ বুদ্ধিমান, তারা বাইরে ঘোরাফেরা করছে।

মিসেস মজুমদার নিকটে এলে মনোরমা বললেন, "আসুন, পরামর্শ করে স্থির করা যাক্ কেন এমন হল এবং এর পরও কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না।"

পরামর্শ সভার সভ্যষষ্ঠক নিমন্ত্রিতদের কারও না আসাটা যে জ্ঞানদারই দুরভিসন্ধির ফল সে সম্বন্দে একমত। কিন্তু কি উপায়ে যে এর প্রতিকার হতে পারে তা কেউ ঠিক করতে পারল না।

হিরণ বললে, "আমার হাতে তালিকাটি দিন, আমি প্রত্যেক ঘরে ধাক্কা দিয়ে সবাইকে ডেকে ওঠাব। আর জিজ্ঞাসা করব, মিস্ ব্যানার্জীকে এ অপমান করবার তাঁদের কী অধিকার–"

কিন্তু সে কথায় কেউ কান দিল না। বিজনেশ রেণুকার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, "আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। চলুন, ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন"

বলে রেণুকার একখানা হাত ধরে তুলে তার হাত ধরেই সকলের কাছ থেকে সরে গেল। রেণুকা বিনা আপত্তিতে তার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব কক্ষের দিকে হাঁটতে লাগল।

উৎসব কক্ষের যেখানটা বসলে জানালা দিয়ে বাগানটা দেখা যায়, বিজনেশ রেণুকাকে সেইখানে একখানা দু'জনের উপযুক্ত গদি আঁটা বেঞ্চে বসিয়ে টেবিলের পাখাটা খুলে দিয়ে সেই বেঞ্চে সে নিজেও বসল। কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরব, নিস্তব্ধ গৃহ বিশ্রী অসহ্য। এই একটু আগে যেন এই বাড়িতে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। নির্জীব ঘড়িটাই মাত্র টিক্ টিক্ করে কক্ষের মধ্যে একটা সজীবতা আনবার চেষ্টা করছে।

বিজনেশ হাসতে জানে, হাসতে পারে; কিন্তু সেও আজ কী বলবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। বহুক্ষণ নীরবতার পর সে বললে, "আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝেছি। কিন্তু কী বলে যে আজ আপনাকে সহানুভূতি জানাবো, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না–"

রেণুকা ম্লান হাসি হেসে বললে, "আমার দুঃখে, আমার অপমানে, আপনার যে পূর্ণ সহানুভূতি আছে তা আমার অজ্ঞাত নেই। মনে পড়ে নবকুমার একদিন বলেছিলেন, বন্ধুত্ব একটা কথার কথা নয়। বন্দুত্বের মধ্যেও কর্তব্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাঁর কথার যে কি অর্থ তা আপনাদের মতো বন্ধুকে পেয়ে আমি বুঝেছি। সুখের সময় আপনারা থেকে যেমন সুখের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছেন, আজ দুঃখের সময় আপনাদের পেয়ে দুঃখের মাত্রাও তেমনি লাঘব হয়েছে। কিন্তু আজ দুঃখের আমার যতই কারণ থাক্, সে দুঃখকে আমি আমল দেব না। আজ আমার জন্মদিন। অনুগ্রহ করে যাঁরা আমায় আশীর্বাদ জানাতে এসেছেন, তাঁদের পেয়ে আমি গৌরব বোধ করছি। আপনি সবাইকে ডাকুন--একটু গানবাজনা করে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে, রাতও অনেক হল। কাল তো আমি চলে যাচ্ছি। এই বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা–"

শেষ কথাগুলি রেণুকার মুখ দিয়ে আর্তনাদের রূপ নিয়ে বের হল। বিজনেশ ব্যথিত হয়ে রেণুকার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "কেন অমন কথা বলছেন আপনি? আপনি এমন কিছু করেন নি যার জন্যে সমাজ আপনার অপমান করতে পারে। সমাজ যে দিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে, সেদিন আপনার আসনে আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হবেনই। আজ কারো প্ররোচনায় সমাজ যা করল তার জন্য তার একদিন অনুতাপ করতেই হবে। সত্য ও সুন্দরের জয় চিরকালই হয়ে থাকে–"

রেণুকা সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে কি ভেবে হঠাৎ বিজনেশের দিকে তাকালো। বিজনেশের চোখে সে সময় সে কী দেখল সেই জানে। তার যে হাতখানা বিজনেশের কোলের উপর পড়েছিল সেই হাত দিয়ে বিজনেশের একখানা হাত নিজের কোলের উপর রাখল। বিজনেশ বিস্মিত হল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

বিজনেশের হাতখানি নিজের দু'হাতের মধ্যে গ্রহণ করে রেণুকা নিম্নকণ্ঠে বললে, "এ সমাজে স্থান আর আমি চাই না, কিন্তু আপনাকে আমি ভুলব না।–" বিজনেশের হাতখানা রেণুকা তার মুখের উপর তুলেছে।

বিজনেশ কিন্তু আজ চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। রেণুকার ইচ্ছার উপর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।

রেণুকা কিন্তু আজ আত্মবিস্মৃতা হয়েছে। কী সে করছে তা সে হয়ত বুঝছেও না, দু'গালে বিজনেশের হাতের পরশ বুলিয়ে সে-সেই হাতখানা এনে রাখল আবার তার বুকে। বিজনেশ আর আত্মসম্বরন করতে পারল না। সেও উন্মাদের মতো রেণুকাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উভয়ে শুনতে পেল, মনোরমা বলছেন : "এই যে নবকুমার–চল, চল রেণুকা তোমাকে দেখলে হয়তো অনেকটা সান্ত্বনা পাবে–"

রেণুকা তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে নবকুমার কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

নবকুমারকে দেখে এক মুহূর্ত রেণুকা স্তম্ভিত হয়ে রইল। পর মুহূর্তে সে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নবকুমারের বুকে। রেণুকাকে তদবসস্থায় দেখে নবকুমার কিয়ৎকালের জন্য বিস্ময়ে হতবাক্ রইলেন। তারপর আত্মসম্বরণ করে কোমল কণ্ঠে বললেন, "কেমন আছো রেণুকা?"

নবকুমারকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেণুকা ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। নবকুমার কিছুই বুজতে পারলেন না। তিনি সকলের প্রতি তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেণুকার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "ছি, অমন কাঁদতে নেই।" তারপর মনোরমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। কী ব্যাপার?"

মনোরমা বললেন, "যাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাঁদের কেউই এ পর্যন্ত এলেন না। তোমার তো আসবার কথা ছিল না, তুমি এলে কী করে?"

নবকুমার কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে থেকে পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে মনোরমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

টেলিগ্রাফের কাগজ। মনোরমা নিজে মনে মনে পড়ে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, "এ নিশ্চয় জ্ঞানদার কাজ। জ্ঞানদাই সবাইকে টেলিগ্রাফ করে সকলের আসা বন্ধ করে দিয়েছে।"

সবাই ঔৎসুক্যের সহিত মনোরমার দিকে চাইলে। মনোরমা জোরে পড়ল, "আজ উৎসব বন্ধ। রেণুকা সাংঘাতিক পীড়িত–"

নবকুমার বললেন, "যার জন্য আর কেউ এল না, তার জন্যই আমাকে আসতে হল। রেণুকা পীড়িত জেনে আমি স্থির থাকতে পারলাম না–"

রেণুকা আত্মস্থা হয়ে নবকুমারকে ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। তার দু' কপোলে অশ্রুরেখা এখনো চক্‌চক্ করছে।

বিনয়েন্দ্র বললেন, "এর জন্য জ্ঞানদাকে রীতিমতো বেগ পেতে হবে। আমরা সহজে ওকে ছাড়বো না। ওর নামে 'স্যুট' আনতেই হবে।"

জীবন-তৃষা

(অনুবাদ)

সূচনা পর্ব

লন্ডন

১.

'ও মশাই ভ্যান গোঘ্, ঘুম কি আপনার ভাঙলো?'

উরসুলার এই ডাকটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল ভিনসেন্ট্ ভ্যান গোঘ্, এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে এই স্বরটুকুরই প্রতীক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, 'আমি তো জেগেই ছিলাম মাদ্‌মোয়াজেল উরসুলা।'

'আজ্ঞে না, জেগে ছিলেন না, এখন জেগেছেন।' তরুণী হাসতে হাসতে বলল। ভ্যান গোঘ্ শুনতে পাচ্ছে সে সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ভিনসেন্ট পিঠের নীচে দু'হাত ঢুকিয়ে জোর একটা ঝট্‌কা মারলো, একলাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। তার কাঁধ ও বুক প্রশস্ত, বাহু দুটি মজবুত ও সবল। পোষাকটাতে আলতোভাবে গা গলিয়ে দিল। কুঁজো থেকে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে নিল, তারপর মুখখানা শানিয়ে নিল।

রোজ দাড়ি কামানো তার অভ্যাস। কামানোর ধরণটাতেও আড়ম্বর আছে। প্রশস্ত স্কন্ধের নিম্নাংশে দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে ভরাট সুডৌল মুখ-বিবরের কোণ পর্যন্ত; নাসিকারন্ধ্র হয়ে উপরের অধরোষ্ঠের দক্ষিণ অর্ধ, তারপরে বাম অর্ধ, অতঃপর চিবুকের নিম্নদেশ—সে যেন প্রকাণ্ড সুবিশাল, সুগোল উচ্চ গ্রেনাইট প্রস্তর।

'ব্রাবান্টাইন' ঘাস ও 'ওক' পাতায় বোনা তার খসখসে তোয়ালে আলনায় ঝুলছিল দাড়ি কামানো সেরে ভিনসেন্ট সেটাতে মুখ মুছে নিল। 'উনডার্টে'র নিকটে যে তৃণভূমি আছে সেখান থেকে তার ভাই থিও সেটা স্কেচ করে লন্ডনে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাতে হল্যান্ডের গন্ধটুকু যেন এখনো লেগে আছে, সেই গন্ধ রাসারন্ধ্রে নিয়েই বুঝি আজকের দিনটার উদ্বোধন।

উরসুলা আবার দরজায় অঙ্গুলি-আঘাত করে ডাকলো, 'ও মশ্যাই ভ্যান গোঘ্, হরকরা আপনার একখানা চিঠি দিয়ে গেল।'

খাম ছিঁড়ে চিঠি খুলে, মায়ের হস্তাক্ষর চিনতে পারল, পড়ে চলল, 'বাবা ভিনসেন্ট, আমি তোমাকে কাগজে দুচারটি কথা লিখে জানাতে চাই।'

ভিজে মুখ; ঠাণ্ডা লাগছে। কাজেই এখন আর পড়ল না। পত্রখানা ট্রাউজারের পকেটে রেখে দিল। 'গুপিল'দের ছবির দোকানে মাঝে মাঝে অনেক অবসর মেলে; সেই অবসরে পড়বে বলে রেখে দিল। উলটোদিকে চিরুণী চালিয়ে সে ঘন লম্বা হলুদ-লাল্‌চে চুলগুলো তার আচড়ে নিল। একটা খসখসে শাদা কামিজ পরে নিল; পরল নীচু গলাবন্ধ, আর একটা বড় গিট-দেওয়া 'ফোর-ইন-হ্যান্ড' কালো 'টাই'। তারপর প্রাতরাশ ভোগ করতে ও উরসুলার হাসি উপভোগ করতে নিচে নামল।

উরসুলা ও তার বিধবা মা বাগানের পিছনদিকের একটা ছোট বাড়িতে ছেলেদের একটা কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল চালাতো। উরসুলার বাবা ছিলেন প্রভেন্সের কোনো গির্জার

ধর্মযাজকের সহকারী। উরসুলার বয়স উনিশ। সদাহাস্যময়ী আয়তলোচনা তরুণী; সুগোল সুকোমল মুখ; নীল আভাযুক্ত উজ্জ্বল রঙ; অনতিদীর্ঘ নমনীয় দেহ। মেয়েদের অত্যধিক রঙচঙে ছাতা থেকে সূর্যালোক লেগে যে আভা ঠিক্‌রে বেরোয়, সেই রকম একটা হাসির ছটা তার দৃপ্তোজ্জ্বল মুখখানাতে মাখানো—ভিনসেন্ট্‌ ভ্যান গোঘ্‌ তারই আভাটুকু দেখতে প্রলুব্ধ হত।

উরসুলা কুশলী ক্ষিপ্রতার সহিত, মার্জিত ভঙ্গিতে তাকে খাদ্য পরিবেশন করল। ভিনসেন্ট যতক্ষণ ধরে খেলো, উরসুলা বেশ প্রাণচঞ্চল ভাষায় গল্পগুজব করল। ভিনসেন্টের বয়স একুশ বৎসর; এই প্রথম প্রেমে পড়েছে। জীবন তার কাছে পূর্ণ প্রস্ফুটিত। তার মনে হল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যদি সে উরসুলার পাশটিতে বসে প্রাতরাশ খেয়ে যেতে পারে তাহলে তো তার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নয়।

উরসুলা এক টুকরো 'বেকন', একটি ডিম ও এক কাপ কড়া কালো চা নিয়ে এল। টেবিলের সামনের একটি চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়ল। মাথার পেছনদিকে কোঁকড়ানো বাদামি চুলগুলোকে কয়েকবার থাবড়ে নিল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পরপর নুন, মরিচ, মাখন ও টোস্ট তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে তার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

'তোমার ফুলগাছটা আরো একটু বেড়েছে।' বলে উরসুলা জিভ্‌ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। আবার বলল, 'একবারটি দেখে যাবে না, গ্যালারিতে যাবার আগে?'

'হ্যাঁ, সে উত্তর দিল। বলল, 'তুমি দেখাবে? মানে, যদি দেখিয়ে দাও, তো—'

'লোকটা কি অদ্ভুত, মা গো। নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছে, কোথায় গিয়ে দেখতে হবে তাই জানে না!' উরসুলার কথা বলার এ একটা অভ্যাস; যাকে নিয়ে কথা বলছে, সে কাছে থাকা সত্ত্বেও, এমনি জনান্তিকে কথা চালাবে যেন সে ঘরে নেই।

ভিনসেন্ট মুখের গ্রাস গলাধঃকরণ করল। তার শরীর যেমন ভারি, ভাবভঙ্গীও তেমনি ভারি; উরসুলার ঠিক জবাবটি দেবার উপযুক্ত ভাষাই যেন সে খুঁজে পেল না। তারা প্রাঙ্গণে নেমে পড়ল। এপ্রিল মাসের শীতের সকালবেলা; আতাগাছগুলোতে এরই মধ্যে ফুল ধরেছে। তাদের কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল ও 'লয়ার' ভবন এ দুয়ের মাঝখানে ছোট একফালি বাগান। মাত্র দিনকতক আগে ভিনসেন্ট সেখানে 'পপি' এবং 'সুইট-পি'র বীজ লাগিয়েছিল। তারই চারা মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। সেই চারার দুপাশে দুজনে হাঁটুগেড়ে বসল। দুজনের কপাল প্রায় লাগে-লাগে।

'মাদ্‌মোয়াজেল উরসুলা!' সে ডাকল।

'বল', উরসুলা মাথা সরিয়ে আনল; কিন্তু হাসল, তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'আমি—আমি—মানে—'

'কি মুশকিল, খালি 'আমি আমি' করছ যে; কেন?' বলে সে ঝপ্‌ করে উঠে পড়ল। ভিসেন্ট তার পিছু পিছু ইস্কুলের দরজা পর্যন্ত গেল। উরসুলা বলল, 'আমার প্রিয়তম শীগ্‌গির আসছে এখানে। গ্যালারিতে যেতে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'আমার সময় আছে। আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটে 'স্ট্র্যান্ডে' হেঁটে চলে যাই।'

এর উত্তরে কি বলবে উরসুলা ভেবে পেলো না। সে খুলে-যাওয়া ক্ষুদ্র একটি কেশগুচ্ছকে ধরবার জন্য দুটি হাতই পিঠের দিকে বাড়িয়ে দিল। তার ক্ষুদ্রাবয়ব দেহের তুলনায় তনুবল্লরীর বাঁকগুলো এত স্পষ্ট আর বিশদ যে ভারি আশ্চর্য লাগে।

উরসুলা বলল, 'ব্রাবান্টের যে ছবিখানা তুমি ইস্কুলের জন্যে দেবে বলেছিলে, তার কি করলে?'

"সিজার দ্য কফে'র একখানা স্কেচের প্রতিলিপি আমি প্যারিসে পাঠিয়েছি; তিনিও কাজে হাত দিয়েছেন—তোমার নামের আখরগুলো বসাচ্ছেন, শীঘ্রই সারা হয়ে যাবে।'

'বেশ বেশ, চমৎকার!' উরসুলা করতালি দিয়ে উঠল; তনুদেহে দোল খেলিয়ে একপাক ঘুরে নিয়ে বলে উঠল, 'ও মঁসিয়ে, মাঝে মাঝে তোমাকে এতো চমৎকার লাগে, তুমি এতো খাসা হতে পারো, স্রেফ মাঝে-মাঝে!'

উরসুলা তার দিকে চেয়ে হাসল। সে-হাসিতে তার মুখ ও চোখ উদ্ভাসিত। সে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু ভিনসেন্ট তার হাত ধরে ফেলল। 'শুতে যাবার আগে তোমার জন্যে একটা নাম আমি ভেবে নিয়েছি', বলল সে, "আমি তোমাকে বলেছি 'প্রিয়তমের মনের কামনা'।'

উরসুলা পিছনদিকে মাথা ঝাঁকানি দিল, হাসল প্রাণভরে। 'প্রিয়তমের মনের কামনা!' সে জোরে বলে উঠল। 'যাই, মাকে গিয়ে কথাটা বলতেই হবে!'

সে তার হাতের মুঠা থেকে নিজেকে গলিয়ে মুক্ত করে নিল, একখানা কাঁধ উঁচু করে তার উপর দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ভিনসেন্টের দিকে একটু হাসল। তারপর বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

২.

ভিনসেন্ট তার লম্বা, রেশমি টুপিখানা মাথায় চাপিয়ে, দস্তানা জোড়াটা হাতে নিয়ে 'ক্ল্যাফামে'র রাস্তায় নেমে পড়ল। লন্ডন নগরীর মাঝখান থেকে এ জায়গাটা বেশ দূরে। বাড়িগুলো এখানে ইতস্তত ছড়ানো। প্রত্যেক বাড়ির বাগানে লিলাক ফুল হথর্ণ ফুল আর লেবারনাম ফুল ফুটে উঠেছে।

বেলা তখন আটটা বেজে পনেরো। গুপিলদের দোকানে তার ন'টার আগে যাওয়ার দরকার নেই। হাঁটতে সে খুব পারে। বিরল বাড়িগুলো পশ্চাতে থাকছে, সামনের বাড়িগুলো ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে—সেগুলোকে পশ্চাতে ফেলে চলবার সময় দেখল কারবারি লোকেরা কাজে বেরিয়েছে, তাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাদের সকলেরই সঙ্গে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা যেন সে নিজের মধ্যে অনুভব করল। প্রেমে পড়া যে কি বিচিত্র বস্তু একথা তারাও যে না জানে তা নয়।

টেমস নদীর বাঁধ ধরে সে হেঁটে চলল। ওয়েস্টমিনস্টার সেতু পার হয়ে, 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি ও পার্লমেন্ট ভবন ছাড়িয়ে গেল। তারপর, ঘুরে স্ট্র্যান্ডের ১৭নং সাদাম্পটন-এ গিয়ে ঢুকল। সেটা গুপিল অ্যান্ড কোম্পানীর লন্ডন-কোয়ার্টার : গুপিল অ্যান্ড কোং, আর্ট ডিলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অব এনগ্রেভিংস্।

খরিদদারদের বসাবার প্রধান কক্ষটি পুরো কার্পেটে মোড়া এবং মূল্যবান সুতিবস্ত্রসজ্জায় সাজানো। তারই মধ্যদিয়ে চলতে চলতে ভিনসেন্টের চোখে পড়ল

একখানি ক্যানভাস। কোনো জাতের মাছ কিংবা ড্রাগনের ছবি সেটা। প্রাণীটা ছ'গজ লম্বা। একটা ক্ষুদ্রাকৃতির মানব তাকে ধরে যেন ঝুলছে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল, 'আর্কেঞ্জেল মাইকেল কর্তৃক শয়তান হত্যা।'

'লিথোগ্রাফ টেবিলে একটা প্যাকেট আছে দেখবেন; আপনার জন্য ওটা রেখে গিয়েছে', যেতে যেতে শোনে একজন ক্লার্ক তাকে বলছে।

খরিদদারদের বসাবার ঘরটি মিলেস বাওটন এবং টার্নারের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো। সেটি অতিক্রম করেই দোকানের দ্বিতীয় কক্ষ। এই দুটি কক্ষের কোনোটাতেই দোকানদারির কোনো নিশানা নেই। ছবির বেশিরভাগ বিকিকিনি যেখানে হয়, সেটা দোকানের তৃতীয় কক্ষ। ভিনসেন্ট হাসল; আগের দিন বিকালে যে স্ত্রীলোকটি এখানে শেষ খরিদ করে গিয়েছে, তার কথা, ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলল।

স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে বলেছিল, 'এ ছবিটা আমার পছন্দ হচ্ছে না হ্যারী। তোমার হচ্ছে না কি? ব্রাইটনে গতবারের গ্রীষ্মে যে কুকুরটা আমাকে কামড়েছিল, এ ছবির কুকুরটিতো তার মতো হয়নি।'

'কুকুর বুঝি চাই-ই? ও বুড়ি, কুকুর না হলে বুঝি আমাদের চলবেই না? জানো না ছবিতে তারা কি কাণ্ড করে। তারা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।' হ্যারী বলল।

ছবিটা অত্যন্ত নিচুস্তরের ছিল, ভিনসেন্ট তা যে না জানত তা নয়। ছবি কিনতে যারা আসে তাদের বেশিরভাগই বুঝতে পারে না তারা কি পদার্থ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। নিতান্ত সস্তা জিনিসেরও তারা চড়া দাম দিয়ে যায়। যাক্ গে! তাতে তার কি? তার তো কেবল প্রিন্ট রুমের কাজ। সেটা নিষ্পন্ন হলেই তার হল।

প্যাকেটটা এসেছে প্যারিসে গুপিলদের যে ছবির দোকান আছে, সেখান থেকে। ভিনসেন্ট সেটা খুলল। সিজার দ্য কক্ পাঠিয়েছে। তাতে লেখা ছিল : 'ভিনসেন্ট এবং উরসুলা লয়ারের সমীপে–Les amis de mes amis sont mes amis– আমার বন্ধুর যারা বন্ধু তারা আমারো বন্ধু।'

ভিনসেন্ট নিজে নিজে বলতে থাকে, 'আজ রাত্রেই; উরসুলাকে ছবিটা হাতে তুলে দিতে দিতে বলব, আর কয়েকটা দিন পরেই আমার বয়স হবে বাইশ বছর। আমি এখন মাসে পাঁচ পাউন্ড করে রোজগার করি। আর আয় করার প্রয়োজন নেই।'

গুপিলদের দোকানের পশ্চাতের কক্ষ বেশ প্রশান্ত। এখানে সময় খুবই তাড়াতাড়ি কেটে গেল। মুসি গুপিল অ্যান্ড কোম্পানীর গড়পড়তা দিনে পঞ্চাশখানা ফটোগ্রাফ সে লিথো করল। তার নিজের ইচ্ছা, তৈলচিত্র আর এচিং নিয়েই থাকে, কিন্তু তবু এত টাকা বাড়ি নিয়ে যেতে পারছে–এতেও তার আনন্দ কম হল না। সহকর্মী কেরানীদের সে ভালবাসে, তারা তাকে ভালবাসে; ইউরোপীয় নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে করতে তারা একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমোদে কাটিয়ে দেয়।

তরুণ যুবা হিসাবে যতটা উৎফুল্ল হর্ষে থাকা তার পক্ষে স্বাভাবিক ততটা সে থাকত না; কতকটা যেন বিষণ্ণ হয়ে থাকত; লোকের সঙ্গ এড়িয়ে চলত। লোকে তাকে অদ্ভুত ধরনের, কতকটা খামখেয়ালী মনে করত। কিন্তু উরসুলা তার স্বভাবটা আমূল বদলে দিয়েছিল। সে তাকে লোকের সঙ্গপ্রয়াসী করে তুলেছিল এবং লোকের সঙ্গে

মানিয়ে চলতে শিখিয়েছিল। সে ছিল আত্মগত প্রকৃতির, উরসুলাই তাকে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাকে নিত্যদিনের সাধারণ জীবনের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পেতে সাহায্য করেছিল।

সন্ধ্যা ছ'টায় স্টোর বন্ধ হল। ভিনসেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছিল; মিঃ ওব্যাক্ তাকে বেরোবার পথে ডেকে থামালেন, বললেন, তাকে, তোমার কাকার একখানা পত্র পেয়েছি; পত্রখানা তোমার সম্বন্ধে। তুমি কাজকর্ম কেমন করছ তিনি জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে সানন্দে জানিয়ে দিয়েছি যে, স্টোরে যত কেরানী কাজ করছে, তুমি তাদের মধ্যে উত্তম।'

'সে আপনার অনুগ্রহ স্যার।'

'মোটেই না। তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে, আমি মনে করছি তোমাকে পিছনের রুমে আর রাখব না, সামনের দিকে, এচিং আর লিথোগ্রাফের ঘরে নিয়ে আসব।'

'সেটা তাহলে এই প্রয়োজনের সময় আমার আয়ের দিক দিয়ে যথেষ্টই হবে স্যার। আমি বিয়ে করছি যে।'

'আরে সত্যি নাকি? এতক্ষণ বলনি কেন? কবে?'

'এই গ্রীষ্মেই হয়ে যাবে।' দিনক্ষণ আগে থেকে ভেবে রাখিনি।

'আরে, সে তো উত্তম। এ বৎসরের শুরুতে তোমার তো মাইনে বাড়ানো হয়েছে, তাই না? বিয়ের পর মধুযামিনী শেষে ফিরে যখন আসবে, আবার বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পারব নিশ্চয়ই।'

৩.

স্যার খাওয়া সেরে, চেয়ারখানা পিছনে ঠেলে দিতে দিতে ভিনসেন্ট বলল, 'মাদমোয়াজেল উরসুলা, শুনছ, ছবি তোমার শেষ।'

উরসুলা একটা রংচঙে নক্সা করা পোশাক পরছিল। সেটা পরতে পরতেই বলল, 'শিল্পী ছবিটার খুব ভাল একটা নাম লিখে দিয়েছে তো?'

একটা বাতি জ্বেলে আনোতো, ছবিটা ইস্কুলঘরে টাঙিয়ে দিই।'

একটা অপূর্ব চুম্বনের ভঙ্গীতে যেন তার ওষ্ঠদ্বয় বঙ্কিম হয়ে উঠেছে। সে ভিনসেন্টের দিকে আড়চোখে তাকাল। বলল, একটা কাজে আমাকে এখুনি গিয়ে হাত দিতে হবে। আধঘন্টার মধ্যে সেটা গিয়ে ধরে ফেলব কি?'

ভিনসেন্ট তার ঘরে আলনার গায়ে একটু ভর করে আয়নার দিকে তাকাল। সে চেহারার খুঁটিনাটি সবই সে ভালো করে দেখে রেখেছে। হল্যান্ডে থাকতে এসব ভাববার কোন গুরুত্বই বোধ করত না। সে লক্ষ করেছে, ইংরেজের তুলনায় তার মাথা ও বুক অনেক প্রশস্ত। টানা ভুরুর নিচে গভীর খাদে চোখদুটি অনুপ্রবিষ্ট। কাঁধ উন্নত, চওড়া এবং সিধা। প্রসারিত কাধ থেকে মদির মুখবিবর পর্যন্ত যতখানি উঁচু, গোলাকার কপালখানাও তার ঠিক ততটাই উঁচু। চোয়াল সবল ও সুপ্রসারিত। ওষ্ঠ মোটা...। তার অতিপ্রশস্ত চিবুক ডাচ্ গির্জার যেন এক জীবন্ত স্তম্ভ।

আয়নার সামনে থেকে ঘুরে গিয়ে সে এক কোণে অলসভাবে বসে পড়ল।

যে পরিবারে মানুষ হয়েছে, তার নিতান্ত কাঠখোট্টা ধরনের। ইতিমধ্যে কোনো মেয়ের ভালবাসায় সে পড়েনি। গভীর দৃষ্টি দিয়ে আজ অবধি কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। নরনারীঘটিত, প্রেম নিয়ে একটিও রসিকতা আজ পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরোয়নি। উরসুলার প্রতি তার মনে যে প্রেম জেগেছে, তাতে কাম বা লিপ্সা কিছুই ছিল না। সে তরুণ, সে আদর্শবাদী, এই তার প্রথম প্রেমানুভূতি।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। মাত্র পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। সামনে আরো পঁচিশটি মিনিট, কতক্ষণে কাটবে ঠিক নেই। মার চিঠিখানার সঙ্গে তার ভাই থিয়ো'রও একখানা চিরকুট ছিল। ভিনসেন্ট সেটা বের করে আবার পড়ল। থিয়ো ভিনসেন্টের চার বছরের ছোট। হেগ শহরে গুপিলদের যে দোকান আছে, থিয়ো সেখানে ভিনসেন্টের জায়গাতে নিযুক্ত হচ্ছে। থিয়ো আর ভিনসেন্ট তাদের বাপ থিয়োডোরাস এবং খুড়া-ভিনসেন্টের মতোই আবাল্য ভ্রাতৃ প্রণয়াবদ্ধ।

ভিনসেন্ট একখানা বই টেনে নিয়ে তার উপর কিছু কাগজ রেখে থিয়োকে একখানা চিঠি লিখল। আলনার উপরের ড্রয়ার টেনে কতকগুলো অসমাপ্ত স্কেচ্ বার করল। টেমস নদীর বাঁধে বসে এগুলো সে এঁকেছিলো। থিয়োর নামলেখা একখানা খামে সেগুলো পুরল। সেইসঙ্গে জ্যাকুয়েটের আঁকা 'তরবারি-হস্তে তরুণী' শীর্ষক একখানা ছবির ফটোগ্রাফও খামখানাতে পুরল।

'কি সর্বনাশ! উরসুলার কথা বেমালুম ভুলেই বসে আছি!' উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল ভিন্‌সেন্ট। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল এরই মধ্যে তার পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে। একখানা চিরুণী তুলে নিল। ঢেউতোলা, লাল, জটপাকানো চুলগুলোকে সোজা করার চেষ্টা করল। তারপর সিজার দ্য কুকের ছবিখানা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলল।

সে বসবার ঘরে এসে পৌঁছুনো মাত্র উরসুলা তাকে বলল, 'আমি ভাবলাম, তুমি আমাকে ভুলেই গিছে।' সে কতকগুলো কাগজের খেলনা জোড়া লাগাচ্ছিল। বলল, 'আমার ছবি এনেছ তো? দেখতে পারি ছবিটা?'

'তোমাকে দেখাবার আগেই আমি ছবিটা টাঙিয়ে ফেলতে চাই। এখানে একটা লণ্ঠন জ্বালাতে বলেছিলাম, তার কি করলে?'

'লণ্ঠনটা মার কাছে রয়েছে যে।'

ভিনসেন্ট যখন রান্নাঘর থেকে ফিরে এল, উরসুলা তার হাতে নীল রঙের একটা স্কার্ফ তুলে দিয়ে বললে, 'নাও, ওটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে দাও।' স্কার্ফটার রেশমী স্পর্শটুকুতে তার চিত্তে দোলা লাগল। বাগানে আপেল ফুলের কুঁড়িগুলোর গন্ধে বাতাস ভরপুর। পথটুকু আঁধারে ছাওয়া। উরসুলা তার আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে ভিনসেন্টের খসখসে কালো কোটের আস্তিন আলতোভাবে ধরে চলছিলো। একসময়ে তার পা ফস্‌কে গেল; তখন সে ভিনসেন্টের হাতখানা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল, তারপর নিজের এই অসম্বৃত আচরণে খিল খিল করে হেসে উঠল। ভিনসেন্ট বুঝতে পারল না, আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আমোদ কোথায়? তবে তমসা-ঘেরা পথের উপর এই হাস্যচপল চলমান নারীমূর্তির সঙ্গ তারও মনে মাদকতা এনে দিচ্ছিল। সে আগবাড়িয়ে

উরসুলার জন্য ইস্কুলঘরের দরজা খুলে দিল। উরসুলা যখন দরজা গলিয়ে ঘরে ঢুকছে, তার ননীর মত নরম মুখখানি ভিনসেন্টের মুখে প্রায় লাগে-লাগে। উরসুলা সুগভীর দৃষ্টিতে তার চোখ দুটির দিকে নিজের চোখ মেলে ধরল। যেন, ভিনসেন্টের যে প্রশ্ন এখনো তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তারই উত্তর তার চোখদুটিতে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে।

ভিনসেন্ট লণ্ঠনটা টেবিলের উপর বসিয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, 'ছবিটা কোন্‌খানটায় টাঙালে তোমার পছন্দসই হবে বলে দাও।'

'আমার ডেস্কের উপরে টাঙালেই ঠিক হবে, তাই না?'

ঘরটা আগে ছিল একটা গ্রীষ্মাবাস। তার মধ্যে গোটা পনেরো নিচু চেয়ার টেবিল গড়াগড়ি খাচ্ছে। ঘরের এক প্রান্তে একটুখানি খালি জায়গা–সেইখানেই উরসুলার ডেস্ক। সে এবং উরসুলা দুজনাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে;–ছবির যথাস্থানে স্থাপনা সম্বন্ধে তারা নিরতিশয় ভাবনাতুর। ভিনসেন্ট বিচলিত হয়ে পড়ল। তার তর সইছে না। দেয়ালের গায়ে পেরেক লাগিয়ে মাপজোখ না দিয়েই তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিল। উরসুলা তার দিকে চেয়ে প্রশান্ত, হৃদ্যতার ভঙ্গিতে হাসল।

'এইখানে ঠুকতে হবে। তড়বড়ে কোথাকার। দেখি, আমার হাতে দাও এবার।'

উরসুলা তার যুগল বাহু মাথার উপর দিয়ে ওপরে ওঠালো। দেহতণিমায় প্রতিটি পেলব পেশীকে সঞ্চালিত করে কাজ করে চলল। কাজ করতে তার অঙ্গসঞ্চালন খুব দ্রুত হয়, তখন তাকে দেখতে বেশ কমনীয় লাগে। ভিনসেন্ট চেয়েছিল বাতির এই অনুজ্জ্বল, প্রভাহীন আলোকে তার নিজের বুকের উপরে উরসুলাকে একবার, তুলে ধরে এবং একটা সুনিশ্চিত দৃঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা এ সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারগুলোর নিষ্পত্তি করে দেয়। কিন্তু যদিও এই অন্ধকারের মধ্যে উরসুলা বার বার তাকে স্পর্শ করেছে, তবু একবারের জন্যও আলিঙ্গনের অনুকূল অবস্থায় তাকে ধরা যাচ্ছে না। সে যখন ছবির লেখাগুলো পড়তে লাগল, ভিনসেন্ট তখন বাতিটা উঁচু করে ধরল। উরসুলা খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে উঠল, গোড়ালির উপর দাঁড়িয়ে দেহ দোলাতে লাগল। তার চঞ্চল দেহসঞ্চালনের জন্যে ভিনসেন্ট তাকে কায়দা করে ধরবার সুযোগই পেল না।

উরসুলা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ছবির শিল্পী আমার একজন বন্ধুও হয়ে গেল, তাই না? একজন শিল্পীকে জানতে আমি সব সময়েই চেয়েছি।'

ভিনসেন্ট এর উত্তরে মোলায়েম করে কিছু বলতে চেষ্টা করল–এমন কিছু বলতে চেষ্টা করল, যা বললে তার বিয়ের প্রস্তাব তোলার পথ সহজ হয়ে আসবে। উরসুলা আধো-ছায়ায় তার মুখখানা ভিনসেন্টের দিকে ঘুরিয়ে আনল। বাতির আলোতে তার মুখে বিন্দু বিন্দু আলোর দাগ পড়েছে। তার মুখখানা যেন আঁধারের ফ্রেমে বাঁধা একখানি ছবির মতো ফুটে উঠেছে। মসৃণ চামড়ার অনুজ্জ্বল শুভ্রতা ভেদ করেই যেন তার রক্তবর্ণ, রসপুষ্ট ঠোঁট দুটি জেগে রয়েছে–দেখে ভিনসেন্টের মনের মধ্যে এমন একটা ভাব আন্দোলিত হয়ে উঠল যাকে ভাষায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেই যেন কত অর্থ নিহিত রয়েছে। উরসুলার সান্নিধ্য ভিনসেন্ট এমনিভাবে অনুভব করছে যেন উরসুলা তার দিকে

আপনাকে প্রসারিত করে দিয়েছে, যেন ভিনসেন্টের মুখে প্রেমের অর্থহীন প্রলাপ বাক্যগুলো উচ্চারিত হওয়ার প্রতীক্ষায় তার দিকে মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। ভিনসেন্ট জিব দিয়ে বারকয়েক তাঁর ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে নিল। উরসুলা মাথা ঘুরিয়ে নিল; কাঁধ একটুখানি উঁচু করে ভিনসেন্টের চোখ দুটির মধ্যে দৃষ্টি ডুবিয়ে কি দেখল; তারপর ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে অভিভূত হয়ে ভিনসেন্টও তার পিছু পিছু দৌড় দিল। উরসুলা আপেল গাছের তলায় গিয়ে মুহূর্তের জন্য থামল।

'উরসুলা, একটিবার কথা শোনো।'

উরসুলা ফিরল। একটু কম্পিতভাবে তার দিকে তাকাল। আকাশে তুষারাবরণে তারাগুলো অনুজ্জ্বল—যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তমসায় গভীর কালো রাত। ভিনসেন্ট বাতিটা সেইখানেই ফেলে এসেছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে একটুখানি অনুজ্জ্বল আলো যা আসছে সেইটুকুই সম্বল। উরসুলার চূর্ণ অলকের মদির গন্ধ তার নাসারন্ধ্রে অকৃপণভাবেই প্রবেশ করছে। উরসুলা রেশমী স্কার্ফটা কাঁধে শক্ত করে টেনে দিল এবং হাতদুটি বুকের উপরে 'ক্রসে'র আকারে স্থাপন করল।

ভিনসেন্ট বলল, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?'

'হ্যাঁ। এস, ভিতরে চলে যাই।'

'না। একটিবার শোনো। আমি....' সে উরসুলার পথ রোধ করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

উরসুলা তার আনত চিবুক স্কার্ফের উষ্ণতার মধ্যে ডুবিয়ে দিল। তারপর বিস্ফারিত বিস্মিত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। 'একি, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্! আমার ভয় করছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে।'

'আমি তোমার সঙ্গে মাত্র কথা বলতে চেয়েছি। শোনো—আমি....কথা মানে.....'

'দোহাই তোমার এখন কিছু বলো না। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিন্তু তোমাদের জানা দরকার। আজ থেকে আমার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছে। আমাকে লিথোগ্রাফের ঘরে দিয়েছে। এক বছরে আমার এই নিয়ে দুবার পদোন্নতি হল।'

উরসুলা এক পা পিছনে সরে গিয়ে স্কার্ফটা খুলে ফেলল এবং দৃঢ়পদে দাঁড়াল। রাত্রিকাল। ঠাণ্ডা নিবারণযোগ্য দেহাবরণ ছাড়াও তার উষ্ণতা অব্যাহত আছে।

'জিজ্ঞাসা করি মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, কি আপনি বলতে চাইছেন, তাই বলুন না।'

তার স্বরে নিষ্প্রাণ আবেগহীনতা অনুভব করে ভিনসেন্ট নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলল, 'হায় আমি এমনি অকর্মা!' তার মধ্যে এতক্ষণ যে ভাবসম্বেগ ছিল, সহসা তা মন্দীভূত হয়ে এল। সে নিজের মধ্যে স্থৈর্য ও ধৈর্যের ভাব অনুভব করল। মনে মনে সে কতকগুলো স্বর আউড়ে নিয়ে সব চাইতে মিষ্টি লাগল যেটা, সেটাকে অবলম্বন করেই বলল।

'শোন উরসুলা, আমি তোমাকে এমন একটা কিছু বলতে চাচ্ছি যা তুমি আগে থেকেই জান। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তুমি যদি আমার স্ত্রী হও, তবেই আমি সুখী হতে পারি।'

তার এই আচমকা প্রেমনিবেদনে উরসুলা কেমন চমকে উঠ্‌লো ভিনসেন্ট তা লক্ষ্য করল। তাকে বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করা উচিত হবে কি না ভিনসেন্ট তা স্থির করতে পারল না।

'আপনার স্ত্রী হব?' উরসুলার স্বর, কয়েক পরদা চড়ে গেল, 'শুনুন মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, সে হয় না—অসম্ভব।'

ভিনসেন্ট তার দিকে এমনি করে তাকিয়ে যেন পাহাড়ের খাদ থেকে সে দৃষ্টি উৎসারিত হচ্ছে। অন্ধকারেও তার চোখ দুটি উরসুলা স্পষ্ট দেখতে পেল। 'আমি বুঝতে পারিনি সে আমারি দোষ....'

'আমি এক বৎসর থেকে বাগদত্তা। আপনি যে তা জানেন না সেইটেই আশ্চর্য!'

ভিনসেন্ট কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল বুঝতেই পারল না; তার চিন্তা তার অনুভূতি সবই যেন তাকে ছেড়ে গেছে। সে শুধু জড়ের মতো উচ্চারণ করল, 'কে সে?'

'ও, আমার বাগ্‌দত্তের সঙ্গে আপনার বুঝি কখনো দেখা হয়নি? আপনি আসবার আগে আপনার ঘরটিতে সে-ই তো থাকত। আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি জানেন।'

'আমি কি করে জানব?'

উরসুলা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁকি মেরে রান্নাঘরের দিকে তাকাল। 'আমি ভেবেছিলাম কি—আমি ভেবেছিলাম কেউ না কেউ একথা আপনাকে জানিয়ে রেখেছে।'

'তুমি যখন জান আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, তখন সারা বৎসর ধরে আমার কাছে ও কথা কেন গোপন করে রেখেছিলে?' তার স্বর এখন একেবারে দ্বিধাসঙ্কোচহীন অকম্পিত।

'আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন সে দোষ কি আমার? আমি আপনার বন্ধু হতে চেয়েছি মাত্র!'

'আমি যতদিন থেকে এ বাড়িতে আছি এর মধ্যে সে কি তোমাকে দেখতে এখানে এসেছে কখনো?'

'না, আসেনি। সে এখন ওয়েলসে থাকে তবে আসবে। গ্রীষ্মের ছুটিটা এখানে আমার সঙ্গে কাটিয়ে যাবে সে।'

'এক বৎসরের ওপর হল তুমি তাকে দেখনি, তাই বললে না? তবে তো তুমি তাকে ভুলেই গিয়েছ। এখন তুমি যাকে ভালবাসো সে তো আমি।'

ভিনসেন্ট তার জ্ঞানগম্যি পাত্রাপাত্র হাওয়ায় বিসর্জন দিয়েছে। উরসুলাকে নিজের দিকে সবলে আকর্ষণ করল। উরসুলা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভিনসেন্ট তাকে জোর করে ধরে তার মুখচুম্বন করল। উরসুলার ওষ্ঠের লালিমা, মুখের রস মাধুরী তার কেশের সুবাস ভিনসেন্ট এ সমস্তের আস্বাদ পেল; তার প্রগাঢ় প্রেম আরক্ত উদ্দাম হয়ে জেগে উঠেছে।

'তুমি তাকে ভালবেসো না উরসুলা। আমি দেব না তোমায় তাকে ভালবাসতে। তুমি আমার স্ত্রী হবে। তোমাকে হারানোর ব্যথা আমি সইতেই পারব না। যতদিন পর্যন্ত তাকে ভুলে না যাবে এবং আমাকে বিয়ে করবে, ততদিন আমি যে নিরস্ত হতে পারি না উরসুলা।'

উরসুলা এবার গলা ছেড়ে বলে উঠল, 'তোমাকে বিয়ে করব? এজগতে যতজন আমাকে ভালবেসে ফেলবে তাদের প্রত্যেককেই কি বিয়ে করতে হবে আমায়? নাও, হয়েছে, এবার ছাড় আমায়। শুনছ, ছাড় বলছি, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব!'

সে সবলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অন্ধকার পথে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়োতে লাগল। সিঁড়ি অবধি পৌঁছে গিয়ে, থেমে, একবার ফিরল; তারপর মৃদু চাপা কণ্ঠে শুধু বললে, 'লাল-মাথা বেয়াকুফ!' কথাটা তীরের মতো তাকে এসে সশব্দে আঘাত করল।

৪.

পরের দিন রাত পোহাল; কিন্তু কেউ তাকে ডেকে জাগাল না। বিছানা থেকে সে একান্ত আলস্যভরে দেহ-ভার টেনে তুলল। মুখের চারপাশে ক্ষুর চালিয়ে চালিয়ে ক্ষৌরকার্য শেষ করল। প্রাতরাশ খাওয়ার সময়ে আজ আর উরসুলা কাছে এলো না। ভিনসেন্ট তারপর গুপিলদের দোকানের উদ্দেশ্যে শহরের দক্ষিণাভিমুখে রওয়ানা হল। পথ চলতে চলতে চলমান লোকজনদের দেখল। গতকাল যাদের দেখেছিল আজও তাদের দেখল। তারা যেন আগেকার লোকই নয়—তারা একেবারে বদলে গিয়েছে বলে তার বোধ হল। তারা সব যেন নিঃসঙ্গ আত্মা; নিষ্ফল খাটুনির কাজে তারা ত্রস্তপদে ছুটে চলেছে। পথের পাশে লেবারনাম ফুলের কলিগুলো পাপড়ি মেলেছে; রাস্তার দুধারে বাদাম গাছ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এসব কিছুই আজ ভিনসেন্টের চোখে পড়ল না। গতকালের চেয়ে আজ সূর্যের কিরণও অধিক উজ্জ্বলো। তাও সে জানতেই পারল না।

সারাদিনে সে কুড়িখানা ছবির কপি বিক্রি করল। সেগুলো ইনগ্রেসের অনুকরণে 'ভেনাস আনাডায়োমেনি'র রঙে আঁকা। এই ছবিগুলো বিক্রি হওয়াতে দোকানদারের প্রচুর লাভ হল। কিন্তু ছবি বেচে মুনাফা করার যে আনন্দ, তার কোনো অনুভূতিই আজ ভিনসেন্টের মনে সাড়া দিল না। ছবি যারা কিনতে আসছে তাদের সঙ্গে মেজাজ ঠিক রেখে কথা বলার ধৈর্যটুকুও তার আজ উবে গিয়েছে। তারা কিছু বোঝে না। কেবল তারা আর্টের ভালোমন্দ জ্ঞান থেকে যদি বঞ্চিত হত, তবু না হয় সহ্য করা যেত; ভালো আর্ট ফেলে যা নাকি মেকি, সস্তা আর রঙচঙে সেগুলো কিনবার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। তাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে সেগুলোই নাকি উত্তম।

সহকর্মীরা তাকে কোনোদিন হাসতে দেখেনি। কিন্তু ভিনসেন্ট তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার জন্য খোশমেজাজ দেখাতে কোনো কসুর করেনি। আজ তাকে দেখে একজন সহকর্মী অপরজনকে ডেকে বলল, 'ভ্যান গোঘ্ বংশের গুণবান ব্যক্তিটার আজ হল কি হে? তোমার কি মনে হয়?'

'আমার বোধ হচ্ছে আজ সকালে বিছানার উলটো দিক থেকে তিনি উঠে এসেছেন।'

'না না তা নয়। সুদিন এসেছে তার। তবে অনেকগুলো খোশখবর একই সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে কিনা তাই তিনি বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কাকা ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্ প্যারিসে, বার্লিনে, ব্রুসেলসে, হেগ-এ আর আমস্টারডামে গুপিলদের যত ছবির গ্যালারি আছে সবগুলোর মালিক তা জানো তো? সেই বুড়ো রোগশয্যায়

পড়েছে। তাঁর তো কোনো সন্তানাদি নেই। তাই সকলেই বলাবলি করছে কারবারের অর্ধেক তিনি একেই লিখেপড়ে দেবেন।'

'কারো কারো ভাগ্য এমনি করেই খুলে যায়।'

'শুধু তাই নয় হে, আরো আছে। তার আরেক কাকা, হেন্ডরিক ভ্যান গোঘ্, ব্রুসেলস আর আমস্টারডামের বড়ো বড়ো ছবির দোকানের মালিক। আরো এক কাকা, কর্নেলিয়াস ভ্যান গোঘ্ হল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, তারই বড়োকর্তা। আর একথা কে না জানে যে, সারা ইউরোপে ছবির সবচেয়ে বড়ো ব্যবসাদার এই ভ্যান গোঘ্ পরিবার। আজ ওইখানে আমাদেরই পাশের ঘরে, মাথায় লাল চুল যে বন্ধুটি বসে কাজ করছেন, একদিন দেখবে সারা কন্টিনেন্টাল আর্ট সত্যি সত্যি এঁরই হাতে পরিচালিত হবে।'

সেই রাত্রে ভিনসেন্ট লয়ার পরিবারের ভোজন-কক্ষে গিয়ে শুনতে পেল উরসুলা আর তার মা চাপাগলায় কি-সব বলাবলি করছে। সে এসেছে টের পেয়েই তারা থেমে গেল, তাদের আলাপ মাঝপথেই থেমে রইল।

উরসুলা দ্রুত পদে রান্নাঘরে চলে গেল। মাদাম লয়ার চোখে মুখে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল মাখিয়ে তাকে এসে 'গুড্ ইভেনিং' জানালেন।

অত বড় খাবারের টেবিলে ভিনসেন্ট আজ একা বসেই খাওয়া-দাওয়া করল। উরসুলার এই আঘাত তাকে বিচলিত করলেও পরাভূত করতে পারল না। উরসুলার 'না' উত্তর সে কিছুতেই মেনে নেবে না। সে তার মন থেকে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে অপসারিত করবেই করবে।

উরসুলার সঙ্গে তার যে দুরত্বের ব্যবধান আজ সৃষ্টি হয়েছে, এই সেদিনও—সপ্তাহখানেক আগেও তা ছিল না। সেদিনও তাকে সে নিজের কাছে আটকে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে পারত; তার সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারত। আজ এক সপ্তাহ ধরে ভিনসেন্ট আহার নিদ্রা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আহার নিদ্রার নিস্পৃহা থেকে তার স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা দিয়েছে। দোকানে তার বিক্রির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। তার চোখ দুটি থেকে সবুজ আভাটুকু অন্তর্হিত হয়েছে, রয়েছে শুধু বেদনাবিধুর একটুখানি ম্লান নীলিমা। আগেই সে কথা বলত কম। এখন এমন হয়েছে যে, কিছু বলতে গেলে, ভাষাই জোগায়না, তাই সে খেই হারিয়ে যায়।

রবিবারের দুপুরের খাওয়া বেশ জাঁকজমক করে হয়। খাওয়ার শেষে উরসুলাকে বাগানের দিকে যেতে দেখে ভিনসেন্টও তার অনুসরণ করল।

বলল, 'মাদ্‌মোয়াজেল উরসুলা, সে রাতে তোমাকে খুব চমকে দিয়েছিলাম, না?'

উরসুলা বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকালো। সে যে এখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি, তারই জন্য সে-চোখে বিস্ময় জেগেছে।

'ও, সেই কথা। তা তাতে হয়েছে কি। সে আর এমন কি গুরুতর ঘটনা। ভুলে গেলেই চলে। ভুলে যান না কেন?'

'তোমার প্রতি যে হঠকারিতা আমি দেখিয়েছি, সেটা আমি ভুলেই যেতে চাই। কিন্তু যা আমি বলেছি সে সব তো মিথ্যে নয়।'

সে উরসুলার দিকে আরো এক পা এগিয়ে এল। উরসুলা এক পা সরে দাঁড়াল। বলল, 'আবার ও সব কথা কেন বলছেন আপনি। আগাগোড়া সব ঘটনাই আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি যে।' উরসুলা তার দিকে পিছন করে রাস্তায় পা বাড়ালো। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে এল উরসুলার কাছে।

'আমার কথাটা আবার বলতেই হবে। উরসুলা, তোমাকে আমি যে কি পরিমাণ ভালবাসি, তুমি তা বুঝতে পারবে না। তুমি জান না উরসুলা এ সাতটা দিন আমি কি করে কাটিয়েছি, কত কষ্ট পেয়েছি। আমার কাছ থেকে কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ?'

'নিন ভিতরে চলুন। মা হয়তো এক্ষুণি ডেকে বসবেন।'

'এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে যে ভালবাস বলে তুমি বলছ, এ কথা সত্যি হতেই পারে না। যদি তুমি সত্যি সত্যি ভালবাসতে, আমি তা হলে তোমার চোখ দেখেই তা বুঝতে পারতাম। তোমার চোখেই তা ধরা পড়ত।'

'এখানে আর থাকতে পারছি নে। সময় নেই। এখন যেতে হয়। ছুটিতে আপনি কবে না বাড়ি যাবেন বলছিলেন?'

ভিনসেন্ট ধরা গলায় বললে, 'জুলাই মাসে।'

'কি ভাগ্যি আমার! আমার বাগদত্তাও ঠিক জুলাই মাসে আসছে এখানে। আমার সঙ্গে ছুটি কাটাবে। আপনার ঘরটাও আমাদের ফিরে পাওয়া দরকার। এই ঘরেই আগে সে থাকত কি না।'

'আমি তার হাতে তোমাকে ছেড়ে দেব না—কক্‌খনো না, এ তুমি জেনে রাখ উরসুলা।'

'এ ধরনের কথাবার্তা আপনার বন্ধ করতেই হবে। যদি না করেন, মা বলে দিয়েছেন আপনাকে অন্য কোথাও জায়গা দেখতে হবে।'

এর পরের দু'মাস সে উরসুলার মন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে কাটিয়েছিল। তার আগেকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো সবই ফিরে এসেছিল তখন। যতক্ষণ উরসুলার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকত, ততক্ষণ সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকত সে। একা একা থাকত। উরসুলার ধ্যানে নিমগ্ন মধুর মুহূর্তগুলো আর কেউ যাতে নষ্ট করে দিতে না পারে। চাকুরিস্থলের সহকর্মীদের সাথে তার প্রণয়ভাব আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ক্রেতাদের সঙ্গেও তার হৃদ্যতার ভাব অন্তর্হিত হয়েছিল। উরসুলার প্রতি প্রেমোদ্‌গমের স্পর্শ পেয়ে যে অজ্ঞাত জগৎ তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিল শীঘ্রই আবার তা অর্গলবদ্ধ হয়ে গেল। বাল্য বয়সে 'জুন্ডার্টে' যখন সে পিতামাতার নিকট থাকত, তখন থেকেই সে সারাক্ষণ চিন্তাতুর আর বিমর্ষ হয়ে থাকত। এখনও সে আবার অবিকল সেই রকমই হয়ে গেল।

জুলাই মাস এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছুটিও এগিয়ে এলো। মাত্র দু সপ্তাহের জন্য লন্ডন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার তার ইচ্ছা ছিল না। সে যতদিন এই ঘরে থাকবে, উরসুলা ততদিন অন্য কাউকে ভালবাসতে পারবে না, এই রকম একটা ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

সে উরসুলাদের বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। উরসুলা ও তার মা সে ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাকে দেখে তাঁরা দুজনে অর্থপূর্ণভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

সে বলল, 'শুনুন মাদাম লয়ার। আমি কেবল একখানা ব্যাগ মাত্র সঙ্গে নেব, আর সবই যেমন আছে তেমনি আমার ঘরে রেখে যাচ্ছি। আমি দু সপ্তাহের জন্য বাইরে যাব। এই নিন দু সপ্তাহের ঘর-ভাড়া।'

মাদাম বললেন, 'মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ, তুমি বরং তোমার সবকিছু জিনিসপত্র নিয়েই চলে যাও, সেইটেই ভাল হবে।'

'কেন? এ কথা কেন বলছেন?'

'সোমবার সকাল থেকে তোমায় ঘর খালি করে দিতে হবে। অন্য লোক আসবে এখানে। কাজেই তুমি অন্যত্র গিয়ে থাক। তাই চাইছি আমরা।'

'আমরা?'

সে উরসুলার দিকে মুখ ফেরাল; ভুরুর নিচেকার খাদে-বসা চোখ দুটি থেকে তার দিকে গভীরভাবে তাকাল। তার এই দৃষ্টিতে কোনো আবেদন ছিল না, ছিল শুধু একটা প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আমরা।' মা উত্তর দিলেন। 'আমার মেয়ের ভাবী স্বামী চিঠি লিখে জানিয়েছে তুমি এখান থেকে চলে যাও এই তার ইচ্ছা। আর শোনো মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, এখন বুঝতে পারছি, তুমি যদি এখানে আদৌ না আসতে, তা হলেই ভাল হত।'

৫.

থিয়োডোরাস ভ্যান গোঘ্ ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ব্রেডা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন পুত্রকে এগিয়ে নেবার জন্য। তাঁর গায়ে ধর্মযাজকের কোট, ভারী এবং কালো রঙের। তার উপরে প্রশস্ত, ভাঁজ-করা ওভারকোট। ঘাড় দিয়ে শক্ত করা শাদা সার্ট। ভিনসেন্ট চকিত দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকিয়ে নিল। পিতার মুখখানিতে দুটি লক্ষ করার বিষয় তার চোখে পড়ল। ডান চোখের পাতা বাম চোখের থেকে অনেকখানি নিচুতে নেমে এসেছে। তার জন্য চোখের অনেকখানি জায়গা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আর মুখের বাম দিক বসে গিয়েছে, কিন্তু ডান দিক ভরাট। চোখ দুটি অনুজ্জ্বল। সে চোখের আবেগহীন দৃষ্টি যেন এইটুকু মাত্র জানিয়ে দিচ্ছে, 'দেখ, আমি কি হয়েছি।'

জুন্ডার্টের বাসিন্দারা প্রায়ই বলত : গীর্জার ধর্মযাজক থিয়োডোরাস যদি কলেজের প্রফেসারি নিতেন, তা হলেও ভালো করে কাজ চালাতে পারতেন।

তিনি কেন যে জীবনে আরো সাফল্যলাভ করেননি, তা আজও—এই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও—বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁর ধারণা, আমস্টারডাম বা হেগ শহরে বড় ধর্মযাজকের দায়িত্বপূর্ণ কাজ নেবার জন্য বহু বৎসর পূর্বেই তাকে আহ্বান করা উচিত ছিল। ধর্মযাজক হিসাবে তিনি যে উত্তম ব্যক্তি, গীর্জার অন্যান্য পাদরিরা সকলেই তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর প্রকৃতি কমনীয়। আধ্যাত্মিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সর্বোপরি, ভগবৎ কার্যে তিনি অক্লান্ত। তবুও পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই ক্ষুদ্র পল্লী জুন্ডার্টের মধ্যেই বিবরাবদ্ধ ও বিস্মৃত হয়ে পড়ে রয়েছেন। ভ্যান গোঘ্ ভ্রাতারা সংখ্যায় ছজন। তাঁদের আর সকলেই স্ব স্ব জীবনে প্রভূত উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছেন। কেবল তিনিই কিছু করতে পারেননি।

জুণ্ডার্ট গ্রামের গীর্জা-সংলগ্ন যে গৃহে ভিনসেন্টের জন্ম হয়েছিল, সে গৃহটি কাঠের ফ্রেম দ্বারা নির্মিত। বাজার থেকে যে রাস্তা গিয়েছে, তারই উপরে সে গৃহ অবস্থিত। রন্ধনশালার পশ্চাতে একখানি বাগান। তাতে কাঁটায় জড়ানো 'আকাশ' ফুলের গাছ। গাছগুলোর ফাঁকে, ফুলগুলোর যত্ন করার উদ্দেশ্যে রচিত ছোট ছোট পা ফেলবার পথ। বাগানে ঠিক পরেই দারু-নির্মিত গীর্জা-গৃহ। গৃহটি গাছে গাছে একেবারে আবৃত হয়ে পড়েছে। গীর্জা-গৃহের দুই পাশে কারুকার্যহীন শাদা কাচের দুইটি গথিক ধরনের ছোট গবাক্ষ। কাঠের মেঝের উপর দশ-বারোটি অমসৃণ বেঞ্চি পাতা রয়েছে। মেঝের তক্তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বাঁধা রয়েছে অনেকগুলো আগুন পোহাবার লোহার কড়া। গৃহের পিছনের অংশে সিঁড়ি, সিঁড়ির পর বেদী, সেখানে বহুদিনের পুরনো একটি হাতে-চালানো অর্গান। স্থানটি একাধারে ভয়ানক গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ অনাড়ম্বর উপাসনা গৃহ। ধর্মগুরু কালভিনের আত্মা যেন এখনও এখানে অবস্থিত। তাঁর ধর্ম-সংস্কারের ছাপ যেন এখনও এখানে বিরাজমান।

ভিনসেন্টের গর্ভধারিনী অ্যানা কর্নেলিয়া সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। গাড়িখানা থামবার আগেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। ভিনসেন্টকে তিনি পরম স্নেহে বুকে টেনে নিতে নিতেও বুঝতে পারলেন, তাঁর পুত্রের কিছু একটা হয়েছে।

তাঁর স্খলিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, 'ওরে আমার মাণিক! আমার ভিনসেন্ট।'

তাঁর চোখ দুটি সর্বদাই বিস্ফারিত এবং নিষ্পলক। সে চোখ কখনও নীলাভ কখনো সবুজ। কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই সে চোখে। যার দিকেই তাকায় তাকেই মমতায় অভিসিঞ্চিত করে সেই চোখ। তাঁর নাসারন্ধ্রের দুই পাশ থেকে দুইটি ম্লান বলিরেখা মুখবিবরের দুই কোণ পর্যন্ত বিলম্বিত। বয়সাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে রেখা দুটি ক্রমেই গভীর হয়ে এসেছে। আর সেই রেখা যতই গভীরতর হয়েছে, ততই হাস্যে ঈষদুন্নত স্পষ্ট মুখখানাও যেন স্পষ্ট হয়ে আসছে।

অ্যানা কর্নেলিয়ার পিত্রালয় হেগ নগরে। সেখানে তাঁর পিতা রাজ-সরকারের বই-বাঁধাইয়ের কাজ করতেন এবং 'রাজার বুক-বাইন্ডার' এই পরিচয়লিপি ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে উঠেছিল। হল্যান্ডের প্রথম শাসনতন্ত্রের পুস্তক বাঁধাইয়ের জন্য তাঁকেই মনোনীত করা হয়েছিল। সেই থেকে তিনি দেশের সর্বত্র পরিচিত হয়ে পড়েন। তাঁরই একটি কন্যাকে আঙ্কল ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্ বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয়েছিল আমস্টারডামে সুপরিচিত ব্যক্তি রেভারেন্ড স্ট্রিকারের সঙ্গে। কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন।

অ্যানা কর্নেলিয়া ছিলেন সত্যিকারের ভালো মানুষ। সব কিছুর ভালোর দিকটাই তিনি দেখতেন। সংসারের মন্দ দিকটা তাঁর চোখে পড়তো না। জগতে খারাপ কিছু আছে বলে তিনি জানতেনও না। তিনি কেবল জানতেন দুর্বলতা, প্রলোভন, কৃচ্ছ্রতা, বেদনা—এগুলোকে। থিয়োডোরাস ভ্যান গোঘ্ও লোক হিসেবে খুবই ভালো ছিলেন। তবে পাপ তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে কখনও পারত না। যেখানেই পাপের ছাপ দেখেছেন, সেখানেই কম্বুকণ্ঠে তিনি তার নিন্দা করতে দ্বিধা করেননি।

ভ্যান গোঘ্‌দের বাড়ির মধ্যস্থলে তাঁদের ভোজনকক্ষ। সেখানে, আহার-শেষে ভোজ্যপাত্রগুলো সরিয়ে নেবার পর প্রশস্ত টেবিলখানা হয়ে পড়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। অর্থাৎ সন্ধ্যাটা কাটাবার জন্য তৈলপ্রদীপের চতুষ্পার্শ্বে তাঁরা প্রত্যেকেই সমবেত হয়ে থাকেন। ভিনসেন্টের জন্য অ্যানা কর্নেলিয়া চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভিনসেন্ট শুকিয়ে গিয়েছে। ভয়ানক একরোখা হয়ে গিয়েছে সে। কেমন যেন রগ-চটা, খিটখিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছে।

সেরাত্রে আহারের পর অ্যানা কর্নেলিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কি হয়েছে রে ভিনসেন্ট? তোকে তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।'

ভিনসেন্ট টেবিলের চারপাশে দৃষ্টিপাত করল। অ্যানা, এলিজাবেথ, উইলেমিয়েন—এই তিনটি অপরিচিতা তরুণী সেখানে উপবিষ্ট। আর এরা সবাই তার বোন।

'না, না, আমার কিছু হয়নি।' বলল সে।

থিয়োডোরাস বললেন, 'লন্ডনে তোর স্বাস্থ্য ঠিক থাকছে তো রে? সেখানে তোর ভালো না লাগলে বল, তোর কাকাকে বলি, প্যারিসের কোন একটা দোকানে তোকে বদলি করে দিক।'

ভিনসেন্ট খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, 'না না না, তা করতে হবে না। লন্ডন ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না আমি। আমি....' সে কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করল। পরে বলল, 'কাকা যদি আমাকে বদলি করতে চান, আমি বলব, তাঁর নিজের বদলিটাই যেন তিনি আগে করিয়ে নেন।'

'যা তোর ইচ্ছা তাই কর,' থিয়োডোরাস বললেন।

অ্যানা কর্নেলিয়া আপন মনে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, সব অনিষ্টের গোড়া ঐ মেয়েটা। ছেলের চিঠিপত্রের কেন গোলমাল হত, এখন বুঝতে আমি পারছি।'

জুন্ডার্ট গ্রামের কাছ ঘেঁষে খোলা প্রান্তর। সেখানে পাইন বন ও ওক-বৃক্ষের সারি। সেই মাঠে-ময়দানে একা একা বেড়িয়ে ভিনসেন্টের দিনগুলো কাটতে লাগলো। মাঠের বুকে বুকে অনেক ডোবা-পুকুর। ভিনসেন্ট সে সব খানা-ডোবার জলে দৃষ্টি ডুবিয়ে চেয়ে থাকে। এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে যেত। যখন এসব তার ভাল লাগত না, মনে নূতনত্ব আনবার জন্য সে তখন বসে বসে ড্রইং করত। বাগান, গীর্জাঘরের জানালা থেকে দেখা শনিবার বিকেলের বাজারের দৃশ্য, তাদের বাড়ির সামনের দরজা—এসবের অনেকগুলো স্কেচ সে এঁকেছিল। এগুলো যখনি সে আঁকতে বসত, তার মন কিছুক্ষণের জন্য উরসুলার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকত।

থিয়োডোরাসের মনে বরাবর একটা নৈরাশ্যের ভাব ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। তিনি যে কাজ জীবনে অবলম্বন করেছেন, সেটাকে অবলম্বন না করে সে অন্য পথে চলে গিয়েছে—এইটেই তাঁর নৈরাশ্যের কারণ। একদিন তাঁরা ব্যাধিগ্রস্ত একজন কৃষককে দেখতে গেলেন। দেখে ফিরে আসবার সময় মাঠের মধ্যে দুই পিতা-পুত্র গাড়ি থেকে নেমে কতদূর পর্যন্ত হেঁটে চললেন। পাইন গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে অস্তমান সূর্য থেকে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। ময়দানের পুকুরগুলোতে সন্ধ্যার আকাশ প্রতিফলিত হয়েছে। মাঠ মিলিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একটা রূপময় ঐকতান।

'শোন্ ভিনসেন্ট। আমার পিতা ধর্মযাজক ছিলেন। তুইও এই ধারা বজায় রাখবি, এইটেই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো আশা।'

'আর এ ধারা আমি বদলে দিতে চাচ্ছি, এ ধারণাই বা আপনার কেমন করে জন্মাল বলুন ত।'

'আমার কোন ধারণা জন্মায়নি রে। আমি কেবল কথার কথা বলছি। যদিই কোন কারণে তুই অন্যরকম হয়ে যাস্। .... তুই যদি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হোস, তাহলে আমস্টারডামে তোর ভ্যান কাকার সঙ্গে থাকতে পারবি। তোর পড়াশুনার দিকে খুব যত্ন নেবেন বলে রেভারেন্ড স্ট্রিকার নিজে থেকে আমাকে লিখে জানিয়েছেন।'

'গুপিলদের ওখানে যে কাজ করছি, সেটা ছেড়ে দিতে বলছেন কি আপনি?'

'তা আমি বলছি না রে। আমি বলছি কি, সেখানে তোর যদি ভাল না লাগে..... লোকে চাকরি কি আর বদলায় না?'

'তা আমি জানি; কিন্তু গুপিলদের কাজ ছেড়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়।'

৬.

যেদিন ভিনসেন্ট লনডন পাড়ি দেবে, সেদিন মা ও বাবা তাকে ব্রেডা স্টেশনে এগিয়ে দিতে এলেন। অ্যানা কর্নেলিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে ভিনসেন্ট, তোর চিঠিপত্র আগেকার ঠিকানাতেই পাঠাব তো?'

'না। আমি অন্য জায়গাতে উঠে যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'তুই তা হলে লয়ার দের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিস! আমি খুব খুশি হয়েছি শুনে। তারা লোক সুবিধার নয়। তাদের সম্বন্ধে নাকি অনেক বদনাম আছে।'

কথাগুলো ভিনসেন্টের মনে মোটেই কোনো পরিবর্তন আনল না। সে আনমনীয় হয়ে রইল। মা আবেগভরে তার একখানা হাত নিজের হাতে নিলেন; থিয়োডোরাস যাতে শুনতে না পান, এমনি মৃদুস্বরে বললেন, 'তুই দুঃখ পাসনে, জানলি? যাক না দিন; টাকাকড়ি রোজগার করে যখন দশজনের একজন হবি তুই তখন সুন্দরী দেখে একটি ডাচ মেয়েকেই বিয়ে করবি—তাতেই তুই সুখী হবি। উরসুলা মেয়েটা কি তোর যুগ্যি? তোর সঙ্গে ওমেয়ে মানাবে না। তুই যেমন, সে তেমন নয়।'

মা কি করে এত কথা জানলেন, ভেবে ভিনসেন্ট আশ্চর্য হয়ে গেল।

সে লন্ডনে ফিরে এসে কেনসিংটন নিউ রোডে যে ঘর ভাড়া নিল, আসবাবপত্রে তা রীতিমত সাজানো। বাড়ির কর্ত্রী দেহে খাটো একজন বৃদ্ধা মহিলা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা আটটা বাজতে না বাজতেই তিনি খেয়েদেয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। সারা বাড়ি তখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি রাত্রি ভিনসেন্টকে তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাটাতে হয়। লয়ারদের বাড়িতে ছুটে যাবার জন্য সর্বচেতনা তার উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ঘরের কবাট নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়ে সে মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করল এবার সে নিশ্চয়ই শয্যা গ্রহণ করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পনেরো মিনিট পরেই সহসা আত্মসচেতন হয়ে সে দেখতে পেল, সে রাস্তা অতিক্রম করছে, উরসুলাদের বাড়ির দিকে সে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ওদের বাড়ির একাংশে পা দিয়ে তার এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। তার মনে হল, সে যেন উরসুলার এক নিরবয়ব অপচ্ছায়ার অভ্যন্তরে প্রবিস্ট হয়েছে। তাকে এইভাবে উপলব্ধি করার জন্য তার খুব বেদনাবোধ হল। সে ধরাছোঁয়ার কত বাইরে চলে গিয়েছে, এ অনুভূতি যে আরো বেদনাদায়ক। তার উপর এই আইভি কটেজে অবস্থান করে এই অপচ্ছায়ায় আবৃত উরসুলার সত্য সত্তার সান্নিধ্য না পাওয়া তার চাইতে হাজারগুণ যন্ত্রণাদায়ক।

এই নির্যাতন তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল তা বড় অদ্ভুত। এ তাকে অন্যের দেনা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর করে তুলল। তার চার পাশের জগৎ-সংসারে যা কিছু খেলো, যা কিছু নির্গুণ পদার্থ অন্ধের মত লোকে ভালো বলে মেনে নিয়েছে সেগুলোর প্রতি সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল—সেও এই নির্যাতনেরই ফল। ফলে ছবির দোকানের গ্যালারিতে তার আর কোনো মূল্য রইল না। ক্রেতারা যখন কোনো ছবির প্রিন্ট হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করত, ছবিটা কেমন, সে তখন দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিত, ওটা মশাই ছবিই নয়। শুনে তারা ছবি রেখে দিত, কিনত না। তবে সব ছবিকেই যে সে পদার্থহীন মনে করত তা নয়। যেসব ছবিতে শিল্পীরা প্রাণ ভরে বেদনা, নির্যাতনের ভাব ফুটিয়ে তুলত, কেবলমাত্র সেইগুলোই তার কাছে ছবিপদবাচ্য; কেবল সেইগুলোতেই বাস্তবতা ও অনুপ্রেরণার গভীরতা দেখতে পেত।

অক্টোবর মাসে এক মেট্রন ছবি কিনতে এল। সে এক বিচিত্রভূষণা সবলা নারী। তার উচ্চ লেস-কলার, উন্নত বক্ষঃস্থল; গায়ে বাদামি রঙের পশুলোমের কোট, মাথায় গোলাকার ভেলভেটের হ্যাট, তার উপরে এক গুচ্ছ নীল রঙের পালক। সে শহরে নতুন বাড়ি করেছে, তারই গৃহসজ্জার উপযোগী ছবি চাই, ঢুকেই একথা জানাল এবং ছবি দেখাতে বলল ভিনসেন্টকেই।

বলল সে, 'তোমাদের দোকানে সবচেয়ে ভাল ছবি যা আছে, আমি তাই চাই। দামের জন্য তোমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘরের নক্সাগুলো এই, বুঝে নাও। বৈঠকখানা ঘরে পঞ্চাশ ফুট করে দুটে টানা দেওয়াল—তার একটি দেওয়ালে দুটো জানালা, মাঝখানে খানিকটা ফাঁক.....'

তার কাছে ছবি বেচতে গিয়ে ভিনসেন্ট প্রায় সারাটা অপরাহ্নই কাটিয়ে দিল : সে তাকে রেমব্রান্টের ছবির কিছু এচিং, টার্নারের আঁকা ভিনিসীয় জল-রঙা দৃশ্যের একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি, থাইসম্যারিসের ছবির কতকগুলো লিথোগ্রাফ এবং করোট ও ডবিগ্‌নির ছবির কিছু ফটোগ্রাফ বিক্রির জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির রুচি অন্য ধরনের। ভিনসেন্ট যতগুলো ছবি তাকে দেখায়, তার সবগুলোর মধ্যেই স্ত্রীলোকটি শিল্পীর কলাজ্ঞানের অত্যন্ত অভাব খুঁজে পায়। ছবিগুলোতে শিল্পীর ভাবব্যঞ্জনার নিদারুণ দৈন্য তার বুদ্ধিতে বিচক্ষণভাবেই ধরা পড়ে। ভিনসেন্ট যেগুলোকে প্রামাণ্য বলে জানত, সেগুলোকে সম্পূর্ণ মেকি বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বাতিল করে দেবার বিচক্ষণতাও তার মধ্যে দেখা গেল। ক্রমে স্ত্রীলোকটির স্বরূপ ভিনসেন্টের নিকট প্রতিভাত হয়ে উঠল। এই খর্বদেহ, মেদমাংসে স্থূল, নিম্নরুচি বুদ্ধিহীনা নারীটি তার কাছে মধ্যবিত্তসুলভ অবিদ্যা ও রূপ-উপজীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হল।

স্ত্রীলোকটি এক সময়ে আত্মসন্তুষ্টির ভাব দেখিয়ে বলল, 'এতক্ষণ পরে ভাল ছবি পাওয়া গেল।'

ভিনসেন্ট বলল, 'তার চেয়ে আপনি চোখ দুটো বুজে যা হাতে ঠেকে তাই যদি তুলে নিতেন সেও এর চাইতে ভাল হত।'

স্ত্রীলোকটি ভারিক্কীভাবে টান হয়ে উঠে দাঁড়াল, ভেলভেটের বিশদ স্কার্ফ-বসন সবলে আন্দোলিত করল। তার উন্নত বক্ষঃস্থল থেকে লেস-কলারের নিম্নে গলদেশ পর্যন্ত একটা উদ্ধত রক্তস্রোত প্রবহমান তরঙ্গ তুলেছে ভিনসেন্ট সেটা দেখতে পেল।

'কি? কি বললে, গেঁয়োগুয়ার!'

স্ত্রীলোকটি ঝটিকাবেগে কক্ষ ত্যাগ করল। তার ভেলভেটের টুপির উন্নত পালকগুচ্ছ একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে আন্দোলিত হয়ে গেল।

এব্যাপারে মিঃ ওব্যাক্ খুব উত্তেজিত হলেন। তিনি ভিনসেন্টকে ডেকে বললেন, 'তোমার হল কি বলতো? এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড়ো বিক্রিটাই তুমি মাটি করে দিলে। স্ত্রীলোকটিকেও অপমান করতে ছাড়লে না!'

'মিঃ ওব্যাক, আমার একটা প্রশ্ন আছে, তার উত্তর দিন আগে।'

'হ্যাঁ, বল কি বলতে চাও। আমার নিজেরও কিছু বলবার আছে তোমায়।'

স্ত্রীলোকটির পছন্দ-করা ছবিগুলোকে এক ধারে সরিয়ে দিয়ে, টেবিলের দুই কিনারায় দু হাত রেখে ভিনসেন্ট বলল, 'এবার বলুন আমায়, নিরেট নির্বোধ লোকেদের কাছে ছবি মানের অযোগ্য যা তা বিক্রি করে জীবন কাটানোর কি প্রয়োজন! জীবন তো একটি বই দুটি নেই। সেটাকে এমন অকাজে নষ্ট করার কি যুক্তি আছে বলুন।'

ওব্যাক এ-কথার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন না। তিনি বললেন, 'আবার যদি এরকম করার চেষ্টা কর তো তোমার কাকাকে জানাতে বাধ্য হব এখান থেকে তোমাকে অন্য ব্রাঞ্চে বদলি করে দিতে, বুঝলে?'

ওব্যাক রোষে ফুসছিলেন। তার নিঃশ্বাস সবেগে বেরুচ্ছিল। ভিনসেন্ট একটু পাশ ঘুরে বলল, 'আচ্ছা মিঃ ওব্যাক যা-তা ছবি বিক্রি করে এত মোটা মুনাফা করার কি হেতু থাকতে পারে বলুন তো। আর ছবি কিন্‌তে এখানে পর্যন্ত যারা আসতে পারে তারাও আবার এমন লোক যে, খাঁটি আর মেকি সম্বন্ধে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানই তাদের নেই—সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়। এর কারণ কি? অর্থবান বলেই কি তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে নিরেট? যারা গরীব, অথচ যারা আর্ট বোঝে, ভাল ছবির গুণগ্রাহী, পয়সার অভাবে ছবি কিনে ঘর সাজাতে তাদের সামর্থ্য নেই—এইটেই বা হয় কেন বলতে পারেন?'

ওব্যাক তার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি হচ্ছে, সোস্যালিজম হচ্ছে নাকি?'

বাড়িতে পৌঁছেই সে রেনাঁর গ্রন্থখানা হাতে নিল। টেবিলের উপর পড়েছিল সেখানা। একটি পৃষ্ঠাতে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল। সেখানটায় পাতা খুলে পড়তে বসল। সেখানে লেখা আছে :

'এ সংসারে ভালো কাজ করতে চাও তো নিজের মধ্যে নিজের মৃত্যুদণ্ড ভোগ করো। মানুষ কেবল সুখভোগের জন্য সংসারে আসেনি। কেবলমাত্র সৎ হয়ে চলতেও কেউ সংসারে জন্ম নেয়নি। সংসারে তাকে মানবতার খাতিরে অনেক বড়ো বড়ো জিনিস বুঝতে

হবে, তাকে মহত্ব অর্জন করতে হবে– যে কুৎসিত বর্বরতার আবর্তে জগতের সর্বাধিক লোক অস্তিত্ব টেনে চলেছে, সেটাকে অতিক্রম করতে হবে।'

খৃষ্টমাস দিবসের এক সপ্তাহ আগে লয়ার-পরিবার বাড়ির সম্মুখের জানালায় খুব মনোরম একটি 'খৃষ্টমাস বৃক্ষ' স্থাপন করেছিলেন। তার দুই রাত্রি পরে এক সময়ে পথ চলতে গিয়ে ভিনসেন্ট দেখতে পেল বাড়িটা আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আরো দেখল প্রতিবেশীরা সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকছে। ভিতরে হাস্যপরিহাস হচ্ছে, তার শব্দও সে শুনতে পেল। লয়াররা আজ বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে নৈশভোজ দিচ্ছে। ভিনসেন্ট বাড়িতে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে ধোপদুরস্ত জামা ও টাই পরে দ্রুত পা চালিয়ে ক্ল্যাফামে ফিরে এলো। নিঃশ্বাস নেবার জন্য সিঁড়ির গোড়াতে কয়েক মিনিট থেমে দাঁড়াতে হল তাকে।

খৃষ্টমাসের উৎসব এটা। দয়া ও ক্ষমার একটা জীবন্ত ভাব যেন হাওয়ার সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে আজ। ভিনসেন্ট সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। দরজায় জোরে কড়া নাড়ল। শুনতে পেল, পরিচিত পধ্বনি হল-ঘরের মধ্যদিয়ে এগিয়ে আসছে। পরিচিত কণ্ঠস্বর বসবার ঘরের কাকে যেন কি বলছে, সে স্বরও তার কানে এলো। দ্বার উন্মুক্ত হল। প্রদীপ থেকে আলো এসে তার মুখখানা উদ্ভাসিত করল। সে চোখ তুলে চেয়ে দেখল উরসুলাকে। উরসুলার পরিধানে আস্তিনবিহীন সবুজ 'পোলোনাজ'–সেটা বডিস ও স্কার্ফ একত্র জুড়ে তৈরি একটা পোষাক, তাতে রয়েছে রামধনু আকারের বড়ো বড়ো বাঁক, আর রয়েছে ঢেউ-তোলা লেসের কাজ। তাকে এত সুন্দর আর কোনোদিন দেখেনি ভিনসেন্ট।

'উরসুলা!' ডাকল সে।

উরসুলার মুখে একটা ভাব খেলে গেল। ভিনসেন্টের সে-ভাব পরিচিত। সেদিন বাগানে উরসুলা যা যা তাকে বলেছিল, সেই কথাগুলোই আবার তার মুখ-ভাবে ফুটে উঠল। তার দিকে চেয়ে সে-কথাগুলো ভিনসেন্টের মনে পড়ল।

'চলে যাও এখান থেকে।' উরসুলা তাকে বলল।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার মুখের উপর উরসুলা সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

তার পরদিন সকালেই ভিনসেন্ট লন্ডন ছেড়ে হল্যান্ডে চলে এলো।

খৃষ্টমাসের সময়ে গুপিলদের গ্যালারিতে ছবি-বিক্রির যে-রকম মরশুম পড়ে, বৎসরের অন্য ঋতুতে সে-রকম হয় না। মিঃ ওব্যাক ভিনসেন্টের কাকাকে এই বলে এক চিঠি লিখলেন যে, ভিনসেন্ট কাজে কামাই করেছে, কিন্তু ছুটি গ্রহণের ভব্যতাটুকুও দেখায়নি সে। চিঠি পেয়ে কাকা স্থির করলেন, ভাইপোকে তিনি প্যারিসের রু চ্যাপেলের প্রধান গ্যালারিতে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু ভিনসেন্ট নির্বিকারচিত্তে জানিয়ে দিল, আর্টের ব্যবসাতে সে আর থাকবে না। শুনে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, মর্মান্তিক আঘাত পেলেন মনে। তিনিও জানিয়ে দিলেন, ভিনসেন্টের যা ইচ্ছা তাই করুক, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কখনো তিনি মাথা ঘামাবেন না।

কিন্তু ছুটি শেষ হওয়ার পরেই তিনি মাথা ঘামাতে শুরু করলেন এবং অনেকদিন ধরেই ঘামালেন ডোরড্রেখের 'ব্লাসে ও ব্রামে'র বইয়ের দোকানে ভাইপোর একটি কেরানীর কাজের জন্য। খুড়ো-ভাইপো দু'জনেরই এক নাম। এই দুজনই ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের মধ্যে বোঝাপড়া এইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর আর কেউ কারো জন্য কখনো মাথা ঘামাননি।

ডোরড্রেখে সে চার মাস মাত্র ছিল। এখানে সে সুখীও হয়নি, দুঃখও পায়নি, কৃতকার্যতাও দেখায়নি, অকৃতকার্যও হয়নি। সে নিরালম্ব অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ দেহমাত্র সেখানে ছিল, মন তার সেখানে ছিলই না। একদিন শনিবারের রাত্রিতে ডোরড্রেখ থেকে শেষ ট্রেন ধরে আও ভেনবশ্ এলো এবং সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জুন্ডার্ট-এর বাড়িতে চলে এলো। বিস্তৃত প্রান্তরে রাত্রির স্তব্ধতা। শীতল নিশিথ বায়ুতে মাঠের প্রাণ-চঞ্চল গন্ধ। তার খুব ভাল লাগল এসব। রাত্রি অন্ধকার। তবু সুদূরপ্রসারিত পাইনবন ও দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর চিনতে তার ভুল হলো না। এই দৃশ্য দেখে বড়মারের ছবির প্রিন্টখানা তার মনে পড়ল। ছবিখানা তার পিতার পাঠকক্ষে টাঙানো আছে। আকাশ সে রাত্রে মেঘপূর্ণ, কিন্তু মেঘের মধ্যদিয়েও তারার জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল। জুন্ডার্টের গীর্জা-প্রাঙ্গণে এসে যখন উপস্থিত হয়েছে তখন রাতের শেষ যাম। সুদূরের নবোদ্‌গত শস্যের কালিঢালা ক্ষেতগুলো থেকে পাখির গান প্রভাতী বাতাসে ভেসে আসছে, সে তা স্পষ্ট শুনতে পেল।

পিতামাতা দুজনই বুঝতে পারলেন, ভিনসেন্টের এখন বড় খারাপ দিন যাচ্ছে। বড় কষ্টকর সময় তাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। গ্রীষ্মে তাঁরা পরিবারসুদ্ধ ইটেনে চলে গেলেন। জুন্ডার্ট থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে হাট-বাজারওয়ালা ছোট একটা শহর সেটা। থিয়োডোরাসকে এখানেই ধর্ম যাজকের কাজ দেওয়া হয়েছিল। ইটেনে এল্‌ম-এর বেড়া দেওয়া খুব বড়ো একটা পার্ক ছিল। সর্বসাধারণের জন্য বাষ্পচালিত রেলগাড়ি দ্বারা ব্রেডা শহরের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র শহরটির যোগাযোগ রক্ষা হত। থিয়োডোরাসের পক্ষে জায়গাটি একটু যেন বেশি আধুনিক।

প্রথম বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে, ভিনসেন্টকে নিয়ে কি করা যায় তার জন্য আবার একটা সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। উরসুলার বিয়ের এখনো বাকি আছে।

পিতা বললেন, 'ভিনসেন্ট, শোন, এসব দোকানদারীর কাজ তোকে দিয়ে পোষাবে না, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তোর মন কি চায় তা আমি জানি। তোর অন্তর তোকে ধর্মের দিকে, সাক্ষাৎ ভগবানের কাজের দিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে।'

'আমি তা জানি বাবা।'

'জানিস যদি, তবে আমস্টারডামে চলে যা না, পড়াশোনায় লেগে যা না সেখানে গিয়ে।'

'আমিও যেতেই চাই বাবা, কিন্তু—'

'তোর অন্তর থেকে সন্দেহ কি অন্তর্হিত হয়নি এখনো? এখনো কিন্তু রয়েছে?'

'হ্যাঁ বাবা। এখন তা আমি প্রকাশ করে বলতে পারছি না। তোমরা আমাকে আর কিছু সময় দাও।'

খুড়ো জ্যান সেদিন যাওয়ার পথে ইটেন এসেছেন, তিনি বললেন 'আমস্টারডামে আমার বাড়িতে তোর জন্যে একটা ঘর খালি রেখেছি, ভিনসেন্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে তার মা বললেন, 'রেভারেন্ড স্ট্রিকার চিঠি লিখে জানিয়েছেন তিনি তোর জন্য ভাল ভাল শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

উরসুলার কাছ থেকে বেদনার দান যেদিন সে গ্রহণ করল, সেদিন থেকে, জগতে যাদের কেউ নেই, সে তাদের জন্যই উৎসর্গীকৃত। সে জানত, আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়েই সে সর্বোত্তম শিক্ষা পেতে পারে। ভ্যান গোঘ্ ও স্ট্রিকার পরিবার সেখানে তাকে নিয়ে রাখবেন, উৎসাহিত করবেন, অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে অবিচলিত রাখবেন। কিন্তু তবু তার মন সম্পূর্ণ মেঘাপসৃত হয় না। ইংলন্ডে উরসুলা এখনো অবিবাহিত রয়েছে। এই হল্যান্ডে থেকে সে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক হারিয়ে বসেছে। পত্র লিখে সে কতকগুলো ইংরেজি খবরের কাগজ আনিয়ে নিল, তার বিজ্ঞাপনের কয়েকটা জবাব দিল,—এই করে করে শেষ পর্যন্ত র‍্যামসগেটে একটা শিক্ষকের কাজ জোগাড় হয়ে গেল। স্থানটি সমুদ্রের তীরে, লন্ডন থেকে রেলগাড়িতে সাড়ে চার ঘন্টার রাস্তা।

মিঃ স্টেকস্-এর স্কুল গৃহ একটি স্কোয়ারে অবস্থিত। স্কোয়ারটির মধ্যস্থলে লোহার রেলিং ঘেরা বিস্তৃত লন। স্কুলে দশ থেকে চৌদ্দ বছরের মোট চব্বিশটি বালক পড়ুয়া। ভিনসেন্টের কাজ হল বালকদের ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ডাচ ভাষা শেখানো, স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময়েও তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, এবং প্রতি শনিবার রাত্রিতে তাদের প্রার্থনা-উপসানায় সাহায্য করা। তার থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো; কিন্তু কোনো মাইনে দেওয়া হলো না।

র‍্যামসগেট জায়গাটি বড়ো নিরানন্দের। কিন্তু ভিনসেন্টের প্রকৃতির সঙ্গে সেটা বেশ খাপ খেয়েছে। সে দুঃখকেই করেছিল জীবনের সাথী। তার প্রকৃতির অনুকূল এই বিষাদময় স্থানটি সম্পূর্ণ নিজের অজান্তেই তার জুটে গিয়েছে। এই বিষাদের মধ্যদিয়েই উরসুলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সে সর্বক্ষণ উপলব্ধি করছে। জীবনের একমাত্র প্রেমাস্পদার সঙ্গে সে যদি মিলিত হতে না পারল, তাহলে যেখানেই সে বাস করুক না, তাতে তার কিছু এসে যায় না। তার দেহে ও মনে উরসুলা যে প্রবল প্রেমোন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যানের যে জ্বালাময় অনুভূতির আস্বাদ তাকে দিয়েছে, তাকে সে নিরূপদ্রবে বহন করতে চায়। সে চায় না যে, তার ও তার এই অনুভূতির মাঝখানে আর কেউ এসে শান্তি ভঙ্গ করে।

ভিনসেন্ট জিজ্ঞেস্ করল, 'মিঃ স্টোকস্, আমাকে সামান্য কিছু মাইনে দিতে পারেন। যাতে আমার তামাক আর কাপড়-চোপড়ের খরচ পুষিয়ে যায়, এমনি কিঞ্চিৎ অর্থ আমায় হাতখরচা হিসেবে পারেন দিতে?'

'না, পারি না। নিশ্চয় পারি না।' স্টেকস্ জবাব দিলেন। 'এই থাকা-খাওয়া দিয়েই বহু শিক্ষক পাওয়া যায় তা জান?'

প্রথম যে শনিবার এলো সেদিন সকালবেলা ভিনসেন্ট খুব ভোরে উঠে র‍্যামসগেট থেকে পায়ে হেঁটে লন্ডন অভিমুখে রওনা হল। অনেক দূরের পথ। তার উপর সেবার গরম পড়েছিল, বিকেল নাগাদ তাঁদের উত্তাপ কমলো না। শেষ পর্যন্ত সে ক্যান্টারবেরী পর্যন্ত পৌছাল। সেখানে মধ্যযুগের গীর্জাগুলো পুরোনো গাছ-গাছড়ায় পরিবেষ্টিত। সে সব গাছের ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করল। খানিক বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু

করল। খানিক বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হল। শেষে একটা পুকুরের কাছে বীচ ও এলম্‌ গাছের তলায় এসে থামল। সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ভোর চারটে পর্যন্ত সে সেখানে ঘুমালো। ঊষাকালে পাখিদের গান শুরু হল, সে গানে তার ঘুম ভাঙল। সেখান থেকে হাঁটা আরম্ভ করে যখন চ্যাথাম পৌছাল, সময় তখন অপরাহ্ন। সেখান থেকে দূরে দৃষ্টিপাত করে আংশিক জলমগ্ন নিচু ময়দানের মধ্যদিয়ে টেমস নদী দেখতে পেল। জাহাজে জাহাজে আছে ছেয়ে সে নদী। সন্ধ্যার দিকে ভিনসেন্ট লন্ডনের সুপরিচিত শহরতলীর নাগাল পেল। প্রভূত শান্তি ও ক্ষুৎপিপাসা সত্ত্বেও সে সেখান থেকে উরসুলাদের বাড়ির দিকে প্রচণ্ড বেগে চলতে লাগল।

যে জন্যে তার লন্ডন ফিরে আসা—অর্থাৎ উরসুলার সান্নিধ্য সম্ভোগ—যে মুহূর্তে তার বাসবভন দৃষ্টিগোচর হল, সেই মুহূর্তে সে ইচ্ছা তার শতগুণ বেড়ে গিয়ে তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। ইংলন্ডে এখনো উরসুলা তারই রয়েছে, আর কারো না, কেননা, উরসুলা এখনো তার উপলব্ধির সামগ্রীই।

বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তাকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। একটি গাছে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। একটা অব্যক্ত বেদনা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। মানুষের চিন্তা জগতের ভাব প্রকাশক যে ভাষা তার মধ্যে এমন শব্দ নেই যার দ্বারা এই বেদনাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। বুক ভরা এই বেদনার বোঝা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। অবশেষে উরসুলার বসবার ঘরের প্রদীপ নিভলো, তারপর নিভলো তার শোবার ঘরের প্রদীপ। সমগ্র ভবনটি তখন অন্ধকারমগ্ন। ভিনসেন্ট প্রভূত অনিচ্ছার সহিত সেখান থেকে ফিরে চলল এবং ক্লান্ত স্খলিত পদে ক্ল্যাফামের রাস্তা ধরে চলতে লাগল। বাড়িটি যখন দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গিয়েছে, তখনই তার ধারনা হল উরসুলাকে আবার বুঝি সে হারিয়ে ফেলল।

উরসুলার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার ছবিখানা মনে মনে অঙ্কিত করল সে। উরসুলাকে এখন আর ছবি-ব্যাপারীর স্ত্রী-রূপে ভাবল না ; এখন তাকে সে একজন ধর্ম যাজকের বিশ্বাসী ও সন্তোষপরায়ণা পত্নীরূপে দেখতে পেল। দেখতে পেল : বস্তির দরিদ্রদের সেবায় আত্মনিবেদিত ভিনসেন্টের পাশে থেকে সহধর্মীণী উরসুলা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

সেই থেকে প্রত্যেক শনিবার সে লন্ডন পাড়ি দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু পরে দেখল যথাসময়ে সেখান থেকে ফিরে এসে সোমবার সকালে স্কুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কোনো কোনো দিন সারা শুক্রবার এবং শনিবার রাত্রিভর সে হেঁটে লন্ডন যেতো—রবিবার সকালে উরসুলা গীর্জায় যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরুবে, সেই অবসরে তাকে দেখবে বলে। পয়সার অভাবে কিছু কিনে খাওয়া তার ভাগ্যে জুটত না; প্রয়োজন মতো কোথাও আশ্রয় নেওয়াও তার অর্থাভাবের দরুণ অসম্ভব ছিল। এইজন্য, শীত পড়লে সে ভয়ানক কাশিতে ভুগতে লাগল। একদিন সোমবার ভোরবেলা র‍্যামসগেটে ফিরে গিয়ে কম্পজ্বরে পড়লো, তাতে সে ভয়ানক কাতর হয়ে পড়লো । আরোগ্য হতে তার পুরো একটা সপ্তাহ লেগেছিল।

কয়েক মাস পর এর চেয়ে কিছু ভাল একটা কাজ জুটে গেল। আইলওয়ার্থে মিঃ জোন্সের ধর্ম-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ পেল সে। মিঃ জোন্স এক বিস্তৃত ধর্মায়তনের

যাজক ছিলেন। ভিনসেন্টকে প্রথমে তিনি শিক্ষক হিসেবেই নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাকে গ্রাম্য পাদরির সহকারী করে নিলেন।

ভিনসেন্ট যে-সব চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিল, আবার তা পরিবর্তন করতে হল। এখন আর উরসুলাকে সে মানব-মুক্তির বাণীদাতা ধর্মযাজকের পত্নী হিসেবে বস্তির গরীবদের মধ্যে সেবারতা নারীরূপে কল্পনা করতে পারছে না। এখন উরসুলা বরং নিম্ন পদের গ্রাম্য পাদরির স্ত্রী; মহল্লায় গিয়ে যাজকের কাজে স্বামীকে সাহায্য করছে—যেমন সাহায্য করছেন ভিনসেন্টের বাবাকে তার মা। উরসুলা সম্মতিসূচক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভিনসেন্ট যে তুচ্ছ ছবি-বেচা জীবন ছেড়ে দিয়ে এখন মানবতার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তা দেখে উরসুলা খুব খুশি হয়েছে; এ সমস্ত সে যেন চোখের উপর দেখতে পেল।

উরসুলার বিবাহের দিন যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ক্রমেই তার কুমারী জীবন যে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে, ভিনসেন্ট আপনাকে তা কোনোক্রমেই বুঝতে দিত না। তার ও উরসুলার মাঝখানে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি—তার বাস্তব সত্তাকে ভিনসেন্ট কখনো হৃদয়ে স্থান দিত না। সে নেই, সে থাকতে পারে না। সে মায়া মাত্র; সে সত্য নয়—এইটেই সে সত্য বলে ভাবতে চেষ্টা করত। সে আরো ভাবত, তার মধ্যে এমন একটা কিছু গলদ হয়ত দেখেছে যার জন্যে উরসুলা তাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না—সে গলদ সে যে-করেই হোক পূরণ করে নেবেই। তা ছাড়া, ঈশ্বরের সেবা করা—সেইতো সব কাজের সেরা কাজ। এর চেয়ে বড়ো কাজ আর কি হতে পারে?

মিঃ জোন্সের ছাত্রেরা গরীব। তারা লন্ডন থেকে পড়তে আসত। স্কুলের পরিচালক মশাই তাদের পিতামাতার ঠিকানা লিখে দিয়ে ভিনসেন্টকে সেখানে মাইনে আদায়ের জন্য পাঠাতেন। তাদের বসতি ছিল হোয়াইট চ্যাপেলের মাঝামাঝি জায়গাতে। সেখানে রাস্তাগুলো দুর্গন্ধময়। বড় বড় পরিবারগুলো এক সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে জায়গাতে। আসবাবহীন ঘরগুলো দৈন্যের প্রতিমূর্তি। লোকগুলো ক্ষুধায় ও রোগে কাতর—প্রত্যেকের চোখেমুখে এই কাতরতার সুস্পষ্ট ছাপ। ছাত্রের অভিভাবকরা অনেকে ব্যাধিগ্রস্ত পশুমাংসের ব্যবসা করত। গবর্ণমেন্ট আইন করে প্রকাশ্য বাজারে সে-ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভিনসেন্ট এই সব পরিবারের যার বাড়িতেই গিয়েছে সেখানেই তাদের অতি নিচু ধরনের জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়েছে। শীত নিবারণের উপযুক্ত উপকরণের অভাবে কম্বল মাত্র গায়ে জড়িয়ে তারা শীতে কাঁপছে। বাসি খাবার খাচ্ছে, আধপচা মাংস উনুনে চড়িয়ে তাই গলাধঃকরণ করছে। তাদের দুঃখদুর্গতির কাহিনী শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে বেলা ফুরিয়ে যায়, কখন যে রাত হয়ে আসে, ভিনসেন্ট তা বুঝতেই পারে না।

এইভাবে লন্ডন যাতায়াতের কাজটা সে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছিল। এতে তার বিরক্ত আসত না, কেন না, ফেরবার পথে উরসুলার বাড়ির কাছ দিয়ে আসার সুযোগ তার রোজই ঘটে যেত। কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের বস্তিজীবনের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে দেখতে, উরসুলার জন্য তার মনে যে হাহাকার ছিল সেটা কমে আসতে লাগল। উরসুলা তার মনের সবখানি স্থান জুড়ে ছিল; সেখান থেকে সে এখন অন্তর্হিত হল। এমনকি, ভিনসেন্ট বাড়ি ফেরার পথে ক্ল্যাফামের পথ ধরে আসার কথা ভুলেই গেল।

সে শূন্য হস্তে আইলওয়ার্থে ফিরে আসত; মিঃ জোন্সের হাতে একটি কপর্দকও এনে দিতে পারত না।

একদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যখন উপাসনা চলছে, ধর্মশিক্ষক জোন্স তখন শ্রান্ত পদে তাঁর সহকারীর নিকটে এগিয়ে এলেন। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছেন তিনি। বললেন, 'ভিনসেন্ট, আজ আমার শরীর ভয়ানক খারাপ। এত দুর্বল লাগছে যে, ভয় হচ্ছে হয়ত পড়ে যাব। তুমিতো ধর্মোপদেশগুলো আগাগোড়া লিখে রাখ, তাই না? তার থেকেই আজ একটা পড় তুমি, আমরা শুনব। তোমার ধর্মব্যাখ্যা কেমন—কোন্ ধরনের ধর্মশিক্ষক হবে তুমি—তাই আমি দেখতে চাই আজ।'

ভিনসেন্ট কম্পিতদেহে বেদিকায় আরোহণ করল। মুখ চোখ লাল হয়ে এলো তার। হাতদুটি দিয়ে কি করতে হবে তা সে ভুলেই গেল। তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনালো—তাও আবার থেমে থেমে বেরুচ্ছে। কেমন সুন্দর অর্থপূর্ণ বাক্যাংশগুলো সে কাগজে লিখেছিল। স্মৃতির দুয়ার বৃথাই হাতড়ালো সে। সে সব মর্মস্পর্শী বাক্যের একটিও তার মনে পড়ল না। কিন্তু অনুভব করল, ভাঙা ভাঙা শব্দ আর অস্পষ্ট অনমনীয় অঙ্গভঙ্গির মধ্যদিয়েও নিজস্ব একটা তেজের সান্নিধ্য সে পাচ্ছে।

মিঃ জোন্স বললেন, 'বেশ সুন্দর হয়েছে। সামনের সপ্তাহে তোমাকে আমি রিচ্মণ্ড পাঠাব।'

শরৎকাল। পরিষ্কার কাচ-স্বচ্ছ দিন। টেমস নদীর তীরে তীরে পথ। সে পথ আইলওয়ার্থ থেকে রিচমণ্ড যাবার। সুনীল আকাশ, হলদে পাতায় ঝাকড়া মাথায় বড়ো বড়ো বাদাম গাছ—টেমস নদীর বুকের আরসিতে প্রতিফলিত। রিচমণ্ডের অধিবাসীরা মিঃ জোন্সকে লিখে জানালেন, এই তরুণ ডাচ্ প্রচারকটিকে তাদের ভালই লেগেছে। চিঠি পড়ে মিঃ জোন্সের সহৃদয়তা জাগল। তিনি মনে করলেন ভিনসেন্টকে একটা সুযোগ দেওয়া ভাল। মিঃ জোন্সের টার্নহাম গ্রীণের গীর্জাটি খুব বড়ো। জনসমাগম খুব হয়। তারা ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভিনসেন্ট যদি সেখানে ধর্মসংখ্যায় কৃতকার্য হয়, তবে যে-কোন গীর্জার বেদীতে উঠে বক্তৃতা দিতে তার আটকাবে না। তার যোগ্যতাও সর্বত্র স্বীকৃত হবে।

ভিনসেন্ট তার বক্তব্যের বস্তু হিসাবে বাইবেলের ১১৯ : ১৯নং সংগীতটি নির্বাচিত করল : 'এ জগতে আমি নতুন এসেছি; তোমার বাণী আমার কাছে গোপন রেখো না।' সহজ স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার সঙ্গে সে বলে চলল। তার যৌবন, তার তেজ, তার দৃঢ় বাহুর বল, প্রশস্ত মস্তক এবং সুতীক্ষ্ণ সুগভীর দৃষ্টি সব কিছু মিলিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি হল।

জনতার অনেকেই তার বাণীর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে এগিয়ে এলো। সে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল, এবং বিভ্রান্ত দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করল। লোকজন বেরিয়ে যেতেই সে কালবিলম্ব না করে গীর্জার পশ্চাতের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লণ্ডনের পথে পা চালিয়ে দিল।

তখন ঝড় উঠেছে। টুপি ও ওভারকোট সঙ্গে আনতে তার ভুল হয়ে গিয়েছে। টেমস নদীর জল হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে তীরের কাছ দিয়ে। দূর চক্রবালে আলোর বিচ্ছুরণ, ওপরে কালো পিঙ্গলবর্ণের মেঘের মাতামাতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই

খরধারে বৃষ্টি নামল। শুধু তার পোষাক নয়, গায়ের চামড়া পর্যন্ত ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। তবু সে রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে চলল।'

অবশেষে কৃতকার্য হয়েছে সে। আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। সে বিজয়ী হয়েছে। আপনার এই সাফল্যকে, জয়কে, সে উরসুলার পদমূলে লুটিয়ে দেবে। তার বিজয়ের অংশভাগিনী করবে উরসুলাকে।

বৃষ্টির ধার সংকীর্ণ শুভ্র পথের ধূলাবালিকে কাদা করে ভাসিয়ে নিল; হথর্ন গাছের ঝোপগুলোকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে দিল। দূরে লণ্ডন নগরীকে দেখাচ্ছে দুরার্-এর খোদাই ছবির মতো—তার উচ্চ সৌধ-চূড়া, কলের চিমনি, স্লেট-পাথরের ছাদ আর গথিক ধাঁচে প্রস্তুত বাড়ি-ঘর নিয়ে চোখের সম্মুখে জেগে উঠেছে।

সেই লন্ডন-নগরীতে ঢুকতে তাকে সারা পথ ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় তার মাথা ও মুখ প্লাবিত হয়েছে। অবিরাম জলে তার পায়ের বুট ভিজতে ভিজতে নরম ও ভারি হয়ে উঠেছে। লয়ার-ভবনে যখন উপস্থিত হল তখন অপরাহ্ন অতিক্রান্ত। সন্ধ্যা নামল। পাংশু বর্ণের ঘন প্রদোষান্ধকার এলো ঘনিয়ে। কিছুটা দূর থেকে সংগীতের ধ্বনি ভেসে আসছে। ভায়োলিন বাজছে সেই সংগীতের তালে তালে। সে কান পেতে শুনলো। কিন্তু কিসের সংগীত সেটা, বুঝতে পারল বাড়িটির প্রত্যেক কক্ষে—প্রদীপালোকের প্রস্রবণ। বাইরে, বৃষ্টির জল যে আটকে পড়েছে, তারই এখানে-সেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়ানো। ভিনসেন্ট দেখতে পেয়েছে বৈঠকখানা ঘরে নৃত্যও চলেছে। একটা গাড়িতে এক বৃদ্ধ গাড়োয়ান বিরাট এক ছাতা মাথায় দিয়ে গুটিসুটি হয়ে বক্সের উপর বসেছিল।

ভিনসেন্ট তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হচ্ছে এ বাড়িতে?'

'বিয়ে বলেই তো মালুম হচ্ছে।'

ভিন্‌সেন্ট গাড়িখানাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তার রক্তাভ অলকদামে সঞ্চিত বৃষ্টিবারি গাল বেয়ে মুখ বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে তখনো। কিছুক্ষণ পর সম্মুখের দরজা খোলা হল। উরসুলা ও তার সঙ্গে একজন দীর্ঘায়ত ছিমছাম পুরুষের মূর্তি দ্বারপথে সহসা যেন বিকশিত হয়ে উঠল। বৈঠকখানার জনতা নৃত্য ভেঙে প্রাঙ্গণে নেমে পড়েছে। তাদের উচ্চ হাসি ও চীৎকার মুখর হয়ে উঠেছে প্রাঙ্গণ। কখনো আবার চাল ছড়ানো হচ্ছে। যেখানটায় গাড়ির ছায়া পড়েছে, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ভিন্‌সেন্ট সেইখানে সরে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়োয়ান তার ঘোড়া দুটির উপর চাবুক আস্ফালন করল, তারা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। ভিন্‌সেন্ট কয়েক পা এগিয়ে এল। গাড়ির জানালা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। তাতে মুখখানা ঠেকিয়ে নীরবে দাঁড়ালো গিয়ে। উরসুলা তখন পুরুষটির বাহুবন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ। তার মুখ পূর্ণভাবে ওরই মুখের সঙ্গে বিন্যস্ত। গাড়িখানা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভিন্‌সেন্টের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভাব চকিতে খেলে গেল। অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার সে-ভাব। সূত্র আজ পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেটা এত শীঘ্রই যে ছিন্ন হয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারে নি।

খরধার বৃষ্টির মধ্যেই সে আইলওয়ার্থে ফিরে এলো। তারপর জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে চিরদিনের জন্য লন্ডন ত্যাগ করল।

প্রথম পর্ব

বরিনেজ

১.

ভাইস-এডমিরাল জোহানস্ ভ্যান গোঘ্ ডাচ নৌবাহিনীর সবচেয়ে বড়ো কর্মচারী। ডকের পাশেই তাঁর কক্ষবহুল বাড়ি। সরকারী বাড়ি–ভাড়া লাগে না।

তিনি বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আসছে, তারই সম্মানার্থে তিনি তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী পোষাক পরেছেন। দুই স্কন্ধে কারুকার্যখচিত সুবর্ণের 'ব্যাজ' দুটি জ্বল জ্বল করছে। ভ্যান গোঘ্ বংশের সকলেরই চিবুক প্রশস্ত। তাঁর সেই প্রশস্ত চিবুকের উপরে দৃঢ় সরলোন্নত নাসিকা–তার ঊর্ধাংশ উন্নত ললাট পর্যন্ত বিন্যস্ত।

তিনি বললেন, 'তুমি এসেছ ভিনসেন্ট, আমার বড়ো আনন্দ হচ্ছে। আমার বাড়িটা বড়ো নিরিবিলি, সন্তানদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারা কেউ এ বাড়িতে নেই।'

অনেকগুলো প্রশস্ত কোনাকুনি সিঁড়ি ভেঙে আরো উপরে উঠে গেলেন। জ্যান-খুড়ো একটি দ্বার উন্মুক্ত করলেন। ভিনসেন্ট ঘরটিতে প্রবেশ করে হাত থেকে তার ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। বাইরের দিকে মুখ করে একটি বড়ো জানালা। জ্যান-খুড়ো শয্যার এক প্রান্তে বসলেন। তাঁর সোনালী অলঙ্কারগুচ্ছের মর্যাদা রক্ষা করে যতদূর সম্ভব হৃদ্যতার ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

'তুমি ধর্মযাজকের কাজ করবে বলে পড়াশুনা করতে মনস্থ করেছ, এ শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। ভ্যান গোঘ্ বংশের কেউ না কেউ ভগবানের কাজে আত্মনিয়োগ করেই থাকে–চিরকালই এরূপ হয়ে আসছে।

ভিনসেন্ট পাইপ হাতে নিয়ে, তাতে সযত্নে তামাক পুরতে লাগল। এটা তার একটা ভঙ্গীবিশেষ। কোনো কিছু ভাবতে সময় নেবার দরকার হলেই সে ধীরে সুস্থে পাইপে তামাক ভরে। বলল সে, 'আমি ধর্মপ্রচারক হতে এবং তার অধিকার পেতে চেয়েছিলাম, আপনি তা জানেন।'

'প্রচারক হয়ে তোমার কাজ নেই ভিনসেন্ট। তারা তো অশিক্ষিত লোক। ভগবান জানে কি ভুয়ো ধর্মতত্ত্বই না তারা লোককে শেখায়। না বাবা, তোমার এ কাজ নয়। ভ্যান গোঘ্ বংশের যারা যারা ধর্মশিক্ষক হয়েছে, তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। যাক এসব কথা। তুমি এখন কাপড়চোপড় বদলাও। আটটায় ডিনার।'

ভাইস এড্‌মিরালের প্রশস্ত পিঠখানা যেই দরজার পথে অদৃশ্য হয়েছে অমনি ভিনসেন্টের মধ্যে একটি মৃদু বিষাদের ভাব নেমে এলো। চারদিকে সে তাকিয়ে দেখল। শয্যাটি প্রশস্ত ও সুকোমল। লেখবার ডেক্সখানা বেশ বড়ো। খাটো, মসৃণ পড়ার টেবিলখানা তাকে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু এত সব আরামের উপকরণ দেখে সে অস্বস্তি বোধ করল। অপরিচিত লোকের সান্নিধ্যে সে যেরকম অস্বস্তিবোধ করে থাকে, সেইরূপ। টুপিটা একটানে খুলে রেখে, দ্রুত বেরিয়ে বাঁধের দিকে বেড়াতে

চলে গেলো। সেখানে এক ইহুদি পুস্তক বিক্রেতার সঙ্গে তার দেখা হল। বিক্রেতা একটা খোলা তাক থেকে কতকগুলো ছবির সুন্দর প্রিন্ট বার করে দেখালে, ভিনসেন্ট অনেক খুঁজে পেতে তার থেকে তেরোখানা প্রিন্ট বেছে নিয়ে বগলে করে ফিরে চলল। আলকাতরার কড়া গন্ধে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসে। তার মধ্যদিয়েই জলের ধার ধরে সে বাড়িতে পৌঁছল।

ছবিগুলো দেওয়ালে টাঙাতে গিয়ে, দেওয়ালের চটের কোনো ক্ষতি না হয় এজন্য খুব আস্তে পিন মারতো লাগল। এমন সময়ে দরজার কড়া নড়ে উঠল। রেভারেন্ট স্ট্রিকার ঘরে ঢুকলেন। স্ট্রিকারও সম্পর্কে ভিনসেন্টের কাকা হন। কিন্তু তিনি ভ্যান গোঘ্ বংশের লোক নন। তাঁর পত্নী ও ভিনসেন্টের মা পরস্পর সহোদরা ভগিনী। তিনি আমস্টারডামে প্রখ্যাতনামা ধর্মযাজক। তাঁর বিচক্ষণতা সকলে একবাক্যে স্বীকার করে থাকে।

পরস্পর কুশল প্রশ্নাদির পর রেভারেন্ড বললেন, 'তোমাকে ল্যাটিন ও গ্রীক শেখাবার জন্যে আমি মেন্ডিস ডা কোস্টাকে পেয়েছি। ক্ল্যাসিক্যাল ভাষায় তার মতো অত বড়ো পণ্ডিত এখানে আর নেই। ইহুদি পাড়ায় তাঁর বাড়ি। প্রথম পাঠ নেবার জন্যে তোমাকে সোমবার তিনটায় সেখানে যেতে হবে। যাক, যে-জন্যে আমি এসেছি : কালকের রবিবারের 'ডিনারে' তোমার নিমন্ত্রণ রইল। তোমার মাসি উইলহেলমিনা আর মাসতুতো বোন তোমাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব।'

'আমি নিশ্চয়ই যাব কাকা। কোন্ সময়ে আমায় যেতে হবে?'

'আমরা দুপুরে খাই সকাল বেলাকার গীর্জার কাজ সেরে।'

রেভারেন্ড স্ট্রিকার তাঁর কালো হ্যাট ও দস্তানা তুলে দাঁড়ালেন। ভিনসেন্ট তাঁকে বলল, 'বাড়ির সবাইকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন।'

খুড়ো বললেন, 'আচ্ছা, আজকের মতো চলি।'

২.

স্ট্রিকার পরিবার কাইজারগ্রাখে বাস করতেন। সমগ্র আমস্টারডামে এইটি সবচেয়ে বেশি অভিজাত স্থান। এটি চতুর্থ হর্স-সু বুলেভার্দ; পোতাশ্রয়ের দক্ষিণ পাশ থেকে শুরু হয়ে একটি খাল মাঝখানটুকু ঘুরে ভিতর দিক দিয়ে আবার পোতাশ্রয়েই গিয়ে পড়েছে; এইভাবে স্থানটি ঠিক অশ্বখুরের আকৃতি পেয়েছে। খালটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খালটি আরো উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, এটি 'ক্রুস' নামক শৈবালদামে আবৃত নয়। এই রহস্যময় সবুজ শৈবাল দরিদ্র এলাকার খালগুলোকে শত শত বৎসর ধরে পুরু গালিচার মত আবৃত করে রেখেছে।

এই কাইজার্সগ্রাখ স্ট্রিটের সারিবদ্ধ বাড়িগুলো সম্পূর্ণ ফ্লেমিশ ধরনের। অর্থাৎ ফ্লান্ডার্সের অনুকরণে তৈরি। সংকীর্ণ, সুনির্মিত, পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ—যেন এক সারি সুসজ্জিত 'পিউরিটান' সৈনিক—অ্যাটেনশন অবস্থায় দণ্ডায়মান।

পরের দিন। খুড়ো স্ট্রিকারের ধর্মসভায় যোগদানের পর ভিনসেন্ট তাঁর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। আকাশে ধূসরবর্ণের মেঘ করে ছিল। এই মেঘ হল্যান্ডের আকাশকে

অনাদিকাল থেকে আবৃত করে আসছে। আজকের তীব্র সূর্যালোকে সে-মেঘ অপসারিত হয়েছে। ভিনসেন্ট একটু সকাল সকাল এসে পড়েছে। আত্মগতভাবে, ধ্যানস্থের মতো খানিকক্ষণ পায়চারি করল। এবং খালের নৌকাগুলো স্রোত ঠেলে কেমন উজানের দিকে এগুচ্ছে—লক্ষ করে দেখল।

নৌকাগুলো অধিকাংশ বালি-বোঝাই। চৌকোনা নৌকা—কেবল দুই প্রান্ত সুঁচালো। রং কালো, কিন্তু জলে-জলে সে-রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। মাঝখানটা অত্যাধিক স্থূল; সেখানে মাল বোঝাই করা হয়। নৌকার পিছনের গলুই থেকে সামনের গলুই পর্যন্ত দুই পাশে দড়ি ঝোলানো; তাতে এই জলবিহারী পরিবার তাদের কাপড়চোপড় শুকোবার জন্য টাঙিয়ে রাখে। পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি নৌকার খুঁটি কাদায় ডুবিয়ে কাঁধ ঠেকিয়ে জোর দিয়ে বসায়। বসাতে বসাতে এক একবার খুঁটিটাকে আঁকড়ে ধরে লাফ দেয়। ঝাঁকুনি খেয়ে পায়ের তলা থেকে নৌকা আলগা হয়ে যায়। গৃহিনী স্থূলাঙ্গী, রক্তিমবর্ণা, খোশমেজাজী। পেছনের গলুইয়ে তার স্থায়ী আসন। সেখানে বসে বসে সে কাঠের বৈঠা ঠিক করছে। ছেলেপিলেরা কুকুরছানা নিয়ে খেলা করছে এবং কিছুক্ষণ পর পরই ভিতরের খুপরিতে চলে যাচ্ছে। সেটাই তাদের থাকবার জায়গা।

রেভারেন্ড স্ট্রিকারের বাসভবনটি খাঁটি ফ্লেমিশ ভাস্কর্যের নিদর্শন। সরু, ত্রিতল, শীর্ষে চতুষ্কোণ গম্বুজ; সেটি আবার গ্রীক ধরনের গবাক্ষ-সজ্জিত এবং আরবীয় ভঙ্গীতে ঢেউ তুলে তুলে তাতে কারুকার্য করা হয়েছে।

উইলহেলমিনা মাসি ভিনসেন্টকে সম্ভাষণ করে ভোজন কক্ষে নিয়ে গেলেন। আরি শেফারের অঙ্কিত একখানা কেলভিনের পোর্ট্রেট দেওয়ালে ঝোলানো। 'সাইনবোর্ডে' রক্ষিত রূপার বাসনগুলো চিক্‌চিক্ করছে। কক্ষের চারটি দেওয়াল কালো দারু-শিল্পে খচিত।

কক্ষটি রীতি অনুযায়ী অনুজ্জ্বল করা। ভিনসেন্টের চোখে এই অনুজ্জ্বলতার ঘোর কেটে যাওয়ার পূর্বেই একটি দীর্ঘাঙ্গী নমনীয়া তরুণী-মূর্তি, যেন ছায়া ভেদ করে প্রস্ফুটিত হয়ে তাকে উচ্ছ্বসিতভাবে সম্ভাষণ করল।

সুললিত মধুরকণ্ঠে বলল সে, 'তুমি অবশ্য আমাকে চেন না। আমি তোমার মাসতুতো বোন কে।'

তার বিলম্বিত হাতখানাকে ভিনসেন্ট নিজের হাতে গ্রহণ করল। একজন তরুণীর কোমল, উষ্ণ দেহমাংসের স্পর্শ বহুদিন পরে আজ প্রথম সে অনুভব করল।

সেই হৃদ্যতার কণ্ঠেই তরুণী আবার বলল, 'আমাদের এর আগে আর কখনো দেখা হয়নি। আশ্চর্যের কথা। অথচ আমি ছাব্বিশ বছরে পৌঁছুলাম, আর তুমি—তুমিও বোধ হয়—'

ভিনসেন্ট নীরবে তার দিকে তাকাল। একটা কিছু উত্তর দেওয়া যে প্রয়োজন, কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার আগে একথা তার বুদ্ধিতেই এলো না। এই নির্বুদ্ধিতার ক্ষতিপূরণ করার জন্য সে উচ্চ, কর্কশ কণ্ঠে আচম্‌কা বলে উঠল, 'আমার চব্বিশ। তোমার চেয়ে কম।'

'হ্যাঁ। তা হোক গে। এটা কোনো কৌতূহলের কথা নয়। কৌতূহলের কথা হচ্ছে, তুমিও কখনো আমস্টারডামে আসোনি, আর আমিও কখনো ব্রাবান্টে যাইনি। আরে একি, তুমি যে দাঁড়িয়েই আছ, বস। আর আমিই বা কি রকম, খেয়াল-ছাড়া মানুষ। বস তুমি।'

একটা শক্ত চেয়ারের কিনারায় বসল সে। অমার্জিত গ্রাম্য পরিবেশ থেকে সে মার্জিত ভদ্র সমাজে এসেছে। গেঁয়ো শুয়োরের মতো ব্যবহার তার সাজে না। এখানে তাকে কেতাদুরস্ত হতে হবে। এ সম্বন্ধে তার মনে নানা জল্পনা খেলছিল—তারই খেই ধরে সে বলল, 'মা তো সব সময়েই চান তুমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বেড়িয়ে আস। ব্রাবান্ট জায়গাটিও তোমার মন্দ লাগবে না, কেন না, পল্লী অঞ্চলের নিরিবিলিতে মনে বেশ শান্তি পাওয়া যায়।'

'আমি তা জানি। অ্যানা মাসি চিঠি লিখে কয়েকবার আমাকে নিমন্ত্রণও করেছেন। শীগ্‌গিরই ওখানে যাব একবার।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই যেয়ো।' ভিনসেন্ট উত্তর দিল।

তার মনের একটি ক্ষুদ্রাংশমাত্র তরুণীর সঙ্গে আলাপ-রত ছিল, বাকি দেহ-মন সমগ্রটাই ছিল তার রূপ-আস্বাদনে বিভোর। বহুদিনের পিপাসার্ত সে, উদগ্র তৃষ্ণা নিয়ে সে তার উচ্ছ্বসিত রূপমাধুরী পান করতে লাগল। পূর্বে কে'র দেহাবয়বে ডাচ্ রমণীসুলভ বলিষ্ঠতা ছিল, তার স্থলে এখন সর্ব-অঙ্গে মসৃণ কমনীয়তা ও গঠন-সামঞ্জস্য এসে গিয়েছে। তার মাথার চুলগুলো মসৃণ স্বর্ণাভ। বাদামি বর্ণও ধারণ করে নি, আবার পল্লীবাংলার ন্যায় অসমৃণ রক্তাভও নয়। চুলগুলোতে তার উভয় ভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে; অর্থাৎ পল্লীভাবের উগ্রতা যেন ভদ্রভাবের স্নিগ্ধতায় মিলিত হয়ে এক অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করেছে তার চুলে। রৌদ্র ও হাওয়া তার গাত্রবর্ণকে বিবর্ণ করে দিতে পারেনি। চিবুকের শুভ্রতা তার গণ্ডের রক্তাভার সঙ্গে মিলিত হয়ে তার মুখখানিকে ডাচ শিল্পীদের একখানা নিখুঁত শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। তার চোখদুটিতে গভীর নীলিমা; জীবনের এক আনন্দময় নৃত্যছন্দ যেন তাতে লীলায়িত। পূর্ণ ওষ্ঠশোভিত মুখবি বর কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত, যেন কিছু বলার জন্য প্রতীক্ষমান।

সে ভিনসেন্টের নীরবতা লক্ষ্য করে বলল, 'কি ভাবছ তুমি বলতো? মনে হচ্ছে, আগে থেকে কোনো চিন্তা তোমার মন অধিকার করে রেখেছে।'

'আমি ভাবছিলাম কি জানো? ভাবছিলাম শিল্পী রেমব্রান্ট তোমার ছবি আঁকতে পেলে ধন্য হয়ে যেতেন।'

কে কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মাধুর্য মাখিয়ে মৃদুভাবে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল 'রেমব্রান্ট তো কেবল কদাকার বুড়িদের ছবি এঁকেই ধন্য হয়েছেন, তাই না?'

'না। তিনি চিত্রিত করেছেন রূপবতী বর্ষীয়সী রমণীদের। যেসব রমণী দীন কিংবা কোনো দিক থেকে সুখবঞ্চিতা, আর দুঃখের মধ্যদিয়েই আত্মার সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি এঁকেছেন সেইসব নারীদের।'

এই প্রথমবার কে ভিনসেন্টের প্রতি সত্যিকারভাবে দৃষ্টিপাত করল। ভিনসেন্ট এখানে আসা অবধি তার দিকে কে শুধু মাঝে-মাঝে ভাসা-ভাসাভাবে তাকিয়েছে এবং

তার তামাটে-লাল চুল ও ভারি মুখমণ্ডলটা কেবল সে-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এখন সে দেখতে পেল ভিনসেন্টের সুপূর্ণ মুখবিবর সুগভীর আদল, প্রোজ্জ্বল চক্ষুদুটি এবং উচ্চ সুসমঞ্জস ললাট; আকৃতির এই বিশেষত্বগুলো ভ্যান্ বংশের বৈশিষ্ট্য।

কে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'কথাটা বড়ো আনাড়ির মতো বলে ফেলেছি। এর জন্য ক্ষমা চাইছি। তুমি রেমব্রান্টের সম্বন্ধে যা বলতে চেয়েছ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। বয়স যাদের মধ্যে ছাপ এনে দিয়েছে, দুঃখ যন্ত্রণায় যাদের মুখে বলিরেখা দেখা দিয়েছে এবং পরাজয় যাদের মুখে সুগভীর রেখাপাত করেছে, তাদেরই ছবি যখন তিনি আঁকতেন, তখন তিনি এদেরই মধ্যে সত্যিকারের সৌন্দর্যের সন্ধান পেতেন তাই না?'

'এত মন দিয়ে তোরা কি বিষয়ে আলোচনা করছিস রে?' বলতে বলতে রেভারেন্ড স্ট্রিকার ঘরে ঢুকলেন।

কে উত্তর দিল, 'আমরা পরিচয় করে নিচ্ছি বাবা। আমার এত সুন্দর একটি মাসতুতো ভাই রয়েছে এ কথা তো কোনোদিন তুমি আমায় বলোনি বাবা!'

আরো একজন এসে ঘরে ঢুকলো। একটি কোমলাঙ্গ যুবক। তার মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, চলনে সুমধুর লালিত্য। কে আসন ছেড়ে উঠে, আগ্রহ ভরে তাকে চুম্বন করল। বলল, 'কাজিন' ভিনসেন্ট, ইনি আমার স্বামী মিনহিয়ার ভোস।'

সে বেরিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিট পরেই দু'মাসের একটি শিশুকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শিশু হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল; মুখে স্বপ্নময় আবেশ, নীলাভ চোখ দুটি ঠিক তার মার চোখের মতো। কে নত হয়ে ছেলেটিকে তুলে ধরল। ভোস মাতাপুত্র দু'জনার মাঝখান দিয়ে বাহু বাড়িয়ে শিশুটিকে ধরল।

মাসি উইলহেল্‌মিনা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিনসেন্ট, তুমি আমার সঙ্গে টেবিলের এ দিক বস, কেমন?'

কে বসল ভোসকে সঙ্গে নিয়ে ভিনসেন্টের উল্টো দিকে। তার স্বামী মিন বাড়ি ফিরে এসেছে বলে, ভিনসেন্টকে বেমালুম ভুলেই গিয়েছে। তার গণ্ডস্থল রক্তরাগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। একসময়ে তার স্বামী নিম্নস্বরে আর-কেউ না শুনতে পায় এমনিভাবে, বেশ সূক্ষ্ম কি একটা কথা বলে ফেলেছে। তাতে কে মুহূর্তমধ্যে সচকিত হয়ে উঠল এবং মুখ বাড়িয়ে তাকে চুম্বন করল।

তাদের প্রেম-প্রণয়ের এই ঢেউগুলো ভিনসেন্টের বুকের বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে। তাকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। সেই রবিবার রাত্রির মর্মবিদারক স্মৃতি। অনেক দিন উরসুলাকে ভুলে ছিল সে। সেই থেকে আজ এই প্রথম উরসুলার জন্য গুমরানো বেদনা তার মনের কোনো রহস্যময় বেদনা থেকে শুরু হয়ে ক্রমে সে-বেদনা তার সারা দেহ মন মস্তিষ্ককে প্লাবিত করল। তার সম্মুখে উপবিষ্ট ক্ষুদ্র পরিবারটি—এর অচ্ছেদ্য ভালবাসা, এর আনন্দঘন স্নেহ-বন্ধন সব কিছু মিশিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র প্রগাঢ় উপলব্ধি জাগিয়ে দিল, সেটি এই যে, সে ক্ষুধার্ত; ভালোবাসার জন্য সে বুভুক্ষিত; এরই মধ্যদিয়ে শান্তবিলীন মাসগুলো সে কাটিয়ে এসেছে। বুভুক্ষা তার মধ্যে অহর্নিশ মাথা কুটে মরছে, যে সহজে নিবৃত্ত হবার নয়।

৩.

ভিনসেন্ট বাইবেল পড়বার জন্য প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যাত্যাগ করত। পাঁচটার সময় সূর্য দেখা দিলে সে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে অনতিদূরেই ডকের প্রাঙ্গণ। গেটের মধ্যদিয়ে দলে দলে মজুররা প্রাঙ্গণে ঢুকছে। সে দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আচ্ছাদনে আবৃত। 'জুইডার জী'–তে ছোট ছোট স্টীমার ইতস্তত যাতায়াত করছে। দূরে, পল্লীর কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে বাদামি পাল তুলে তাদের দ্রুত সঞ্চরণ।

ধীরে ধীরে সূর্য পূর্ণাবয়ব নিয়ে উদিত হল। তক্তার স্তূপগুলোতে কুয়াশা ঝরেছিল, রৌদ্রে তা অপসারিত হয়ে গেল। ভিনসেন্ট তখন জানালা থেকে ফিরে এলো; এক খণ্ড শুকনো রুটি ও এক গ্লাস বিয়ার দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করল। তারপর পুরো সাত ঘণ্টার জন্য ল্যাটিন ও গ্রীক পড়তে বসে গেল।

একটানা চার পাঁচ ঘণ্টা পাঠে মনোনিবেশ করে থাকার পর তার মাথা ভার বোধ হতে লাগল। মাঝে মাঝে রগগুলো টনটন্ করতে লাগল এবং চিন্তায় গোলমাল হতে লাগল। এত জোর চিন্তা ও উদ্বেগ-আবেগের মধ্যদিয়ে এক বৎসর কাটাবার পর নিয়মবদ্ধ পাঠের অধ্যবসায় কি করে সে চালিয়ে যাবে ভেবে পেলো না। পড়া ছেড়ে এসব চিন্তা করতেই সময় কেটে গেল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। এখন মেন্ডিস ডা কোস্টার কাছে যাবার সময় হয়েছে। তাঁর কাছে পাঠ নিতে হবে। সেখানে যাওয়ার পথ 'বুটেনকান্টের' মধ্য দিয়ে, 'ওডেজিড্স্ চ্যাপেল' এবং পুরাতন গীর্জা ও দক্ষিণ গীর্জার পাশ দিয়ে; অতঃপর কতকগুলো আঁকাবাঁকা গলি অতিক্রম করতে হয়। এ সব গলি কামারের দোকান, হাতা-বালতির দোকান আর লিথোগ্রাফ ছবির দোকানে ভরতি। ভিনসেন্ট পায়ে হেঁটে এ সমস্ত অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলো।

মেন্ডিস ছবির প্রসঙ্গে ভিনসেন্টের নিকট রুই পারেজের অঙ্কিত 'ইমিটেশান অব জেসাস ক্রাইস্ট' ছবিখানার কথা তুললেন। এই শিল্পী ছিলেন ইহুদি জাতির এক ক্লাসিক্যাল টাইপ। তাঁর চোখ দুটি ছিল সুপ্রশস্ত ও সুগভীর। মুখখানা ছিল বেশ পাতলা গাল বসা, কিন্তু সারা মুখে ঐশ্বরিক ভাব সুকোমল সুঁচালো শ্মশ্রুতে প্রাচীন ইহুদি পুরোহিতের ছাপ।

এই ইহুদি পাড়াতে দুপুরটায় ভয়ানক গরম। তার উপর লোকজনের বসতিও এত ঘন যে, দম বন্ধ হয়ে আসে। ভিনসেন্ট পুরো সাত ঘণ্টা গুরুপাক গ্রীক ও ল্যাটিন পড়ার পর আরো কয়েক ঘণ্টা ডাচ ইতিহাস ও ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে মেন্ডিসের সঙ্গে লিথোগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনা করত। মারিস-এর অঙ্কিত 'এ ব্যাপ্টিজম' বা দীক্ষা শীর্ষক ছবির থেকে ভিনসেন্ট যে স্কেচ করেছে, একদিন সেখানা নিয়ে এসে তার শিক্ষকের হাতে দিল।

মেন্ডিস তাঁর হাড়সর্বস্ব সরু আঙুলগুলোর দ্বারা 'দীক্ষা' ছবিটি গ্রহণ করলেন এবং এমনভাবে তুলে ধরলেন যাতে উঁচু জানালা-পথে কড়া, ধুলিধূসর যে রৌদ্র আসছে, তা ছবির ওপর পড়তে পারে।

তিনি গলায় জোর দিয়ে ইহুদিসুলভ ধ্বনি তুলে বললেন, 'খুব ভাল ছবি এটা। বিশ্বধর্মের এক সার্বজনীন ভাব ফুটে উঠেছে।'

ভিনসেন্টের যাবতীয় ক্লান্তিবিরক্তি সেই মুহূর্তেই কেটে গেল। সে অতি উৎসাহের সঙ্গে মারিসের আর্টের বর্ণনা দিতে প্রবৃত্ত হল। মেন্ডিস মাথা নেড়ে মৃদু আপত্তি জানালেন। ভিনসেন্টকে ল্যাটিন ও গ্রীক শেখাবার জন্য রেভারেন্ড স্ট্রিকার তাঁকে উচ্চবেতনে নিযুক্ত করেছেন।

তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, 'ভিনসেন্ট, শোনো। মারিসের আর্ট খুবই সুন্দর। কিন্তু সময় বড় অল্প। এখন এসব ছেড়ে পাঠে মন দেওয়াই ভাল। তাই দাও।'

ভিনসেন্ট তা বুঝল। দু-ঘন্টার পাঠ সেরে ফিরবার পথে, যে সব বাড়িতে করাতের কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ হয় কিংবা জাহাজ খাদ্য পানীয় সরবরাহকারীরা কার্যরত থাকে, ভিনসেন্ট সে সব বাড়ির দরজায় থেমে দাঁড়াত, যেখান থেকে ভেতরটা দেখা যায়। সেখানে দেখতে পেতো, খুব বড় মদের পিপে। তার ধারেকাছের দরজাগুলো সবই খোলা রাখা হয়েছে। ভিতরে মশাল হাতে লোকজন ছুটোছুটি করছে।

জ্যান-কাকা সাতদিনের জন্য 'হেলবুট' গিয়েছেন। ডাক-প্রাঙ্গণের পিছনের অত বড়ো বাড়ি। ভিনসেন্ট এখানে খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করছে বুঝতে পেরে একদিন বিকেলের পর কে ও ভোস তাকে 'ডিনারে' ডেকে নিতে এলো।

কে তাকে বলল, 'তোমার জ্যান-কাকা যতদিন ফিরে না আসেন তুমি প্রতি রাত্রে আমাদের কাছেই যেয়ো। মা জিজ্ঞেস করছিলেন, উপাসনার পর রবিবারের 'ডিনার' তুমি প্রতি সপ্তাহে আমাদের সঙ্গেই খাবে কি না।'

খাওয়ার পর তারা তাস খেলতে বসল। কিন্তু ভিনসেন্ট তাস খেলা জানে না বলে, ঘরের এক নিরিবিলি কোনে অগস্ট গ্রাসয়ের লেখা ক্রুসেডের ইতিহাসখানা নিয়ে পড়তে বসল। যেখানে বসেছে, সেখান থেকে কের মুখখানা, তার চকিত চঞ্চল হাসিটুকু স্পষ্ট দেখা যায়। কে তাসের টেবিল ছেড়ে তার কাছে এলো, কাছ ঘেঁসে বসল।

'তুমি কি বই পড়ছ, ভিনসেন্ট ভাই?' কে জিজ্ঞাসা করল।

ভিনসেন্ট বইটার নাম করল। তারপর বলল, 'বইটা খুবই সুন্দর। থাইস মারিস যে ভাব নিয়ে ছবি আঁকেন; এ বইটি সেই ভাব নিয়ে লেখা, এ আমি বলে দিতে পারি।'

কে একটু হাসল। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে হামেশাই ভিনসেন্ট এমন সব মজার ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কে জানতে চায়, 'আচ্ছা, এত শিল্পী থাকতে লেখক থাইস মারিসকেই অনুসরণ করবে কেন?'

'বইটা আগে পড়, তারপর মারিসের একটা ক্যানভাসের কথা মনে করিয়ে দেয় কিনা দেখ। লেখক যেখানে পাহাড়ের উপর এক পুরোনো দুর্গের বর্ণনা দিয়েছেন—প্রদোষের আধো-ছায়ায় শরৎকালের বন সেখানে মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে; নিচে কালো জমি ও একজন চাষী, শাদা ঘোড়া নিয়ে জমি চষ্‌ছে। পড়ো আগে সেই পাতাগুলো।'

কে যখন পড়তে শুরু করল, ভিনসেন্ট তাকে একখানা চেয়ার এনে দিল। কে তার দিকে তাকালো। চিন্তামণ্ডিত ভাবের ব্যঞ্জনায় তার সেই নীলিম নেত্র দুটি ঈষৎ কালো হয়ে এলো।

৪.

মেন্ডিস ডা কোস্টা জানতেন, জীবনের আরো সাধারণ খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে ভিনসেন্টের অপরিসীম আগ্রহ। সপ্তাহে কয়েকবার করে তিনি কোনো অছিলায় পড়ার শেষে শহর অবধি তার সঙ্গে চলে আসতেন।

একদিন তিনি ভিনসেন্টকে শহরের এমন এক অঞ্চলে নিয়ে এলেন যেখানে সবই নূতন এবং চিত্তাকর্ষক মনে হল। স্থানটি ডাচ রেলওয়ে স্টেশনের দিকে ভোন্ডেল পার্কের কাছে। এর একদিক 'লেডশে পুর্ট' পর্যন্ত প্রসারিত। রাশি রাশি করাত-কল চলছে সেখানে; ছোট ছোট বাগান-ঘেরা শ্রমিকদের কুটির শ্রেণি। জনবসতি অত্যন্ত নিবিড়। ছোট ছোট অনেকগুলো খাল স্থানটিকে বহু অংশে খণ্ডিত করেছে।

ভিনসেন্ট বলল, 'এরূপ একটি বস্তিতে প্রচারকের কাজ করা যেত তাহলে বেশ হত।'

মেন্ডিস পাইপে তামাক ভরে, তামাকের কৌটোটা ভিনসেন্টের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। মাঝ শহরে আমাদের যে বন্ধুরা বাস করে, তাদের চাইতে এ সমস্ত লোকেরই তো ধর্মের প্রয়োজন, ভগবানের প্রয়োজন বেশি।'

তারা একটি ছোট কাঠের পুল অতিক্রম করছিল। পুলটি জাপানী পুলের মতো ছোট। ভিনসেন্ট থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছেন আপনি, মাস্টার মশাই!'

'বলছি এ সব মজুরদের কথা।' মেন্ডিস হাতখানা আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'এরা বড়ো কষ্টে জীবন কাটায়। যখন রোগ হয়, ডাক্তার ডাকবার পয়সা জোটাতে পারে না। কালকে যা খাবে তার পয়সা আজকে জোটাতে হয়। এমনি অবস্থা তাদের। তাও আজ শক্ত খাটুনি খাটলে তবেই কালকে খাওয়ার দুটো পয়সা জোটাতে পারবে। যে সব ঘরে তারা বাস করে, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। কত ছোট আর দৈন্যভরা এই ঘরগুলো। খাবার ঘর, পায়খানার জায়গা সবই কত কাছাকাছি। জীবন কাটানো নিয়ে এরা সত্যি বড়ো বিব্রত। এই নিরতিশয় দুঃখ দৈন্যের মধ্যে একটু সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য ঈশ্বর চিন্তার প্রয়োজন তো এদেরই।'

ভিনসেন্ট পাইপ ধরিয়ে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা খালের জলে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'মাঝ-শহরের লোকদের কথা যা বলছিলেন—ওদের কি এর দরকার নেই?'

'তারা ভালো খেতে পায়, ভালো পরতে পায়। তাদের অবস্থা ভাল। স্থায়ী চাকরি ও ব্যবসা রয়েছে। ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের জন্য জমানো টাকাকড়ি রয়েছে। তারা যখন ভগবানের চিন্তা করবে, সে ভগবান্ দুঃখীর ভগবান নয়। তাদের যিনি ভগবান, তাঁকে একজন বিত্তশালী প্রবীণ ভদ্রলোক বলতে পার তুমি : তাঁর সংসারে যে পুলকের ছন্দে দিন যায় রাত্রি যায়, তিনি বরং সেই পুলকেই আপনি মশগুল হয়ে আছেন, এর বাইরে তাকাবার অবসর তাঁর নেই।'

ভিনসেন্ট বলল, 'সংক্ষেপে বলা যায়, ওরা, মানে শহরের বড় লোকেরা, নিরেট!'

'কি আশ্চর্য! তা তো আমি বলছি না!' বলে উঠলেন মেন্ডিস।

'আপনি বলছেন, না, কিন্তু আমি বলছি।'

সেই রাতে ভিনসেন্ট তার গ্রীক বইগুলো বার করে ইতস্তত ছড়িয়ে দিল। তারপর সামনের দেওয়ালের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। লন্ডনের বস্তিগুলোর কথা, সেখানকার লোকের অবর্ণনীয় দুঃখদৈন্যের কথা, সব তার মনে পড়ল। ধর্মগুরু হওয়ার জন্য এবং এসব লোককে সাহায্য করার জন্য তার মনে যে বাসনা

জেগেছিল সেসবও মনে পড়ল। তার মনে ছায়ার মতো একবার খুড়ো স্ট্রিকারের গীর্জাটি ভেসে উঠল সেখানে যারা সমবেত হয় তারা বিত্তশালী তারা সুশিক্ষিত। তাদের প্রবণতা জীবন-সুখ উপভোগের দিকে। সে সুখের সর্ব-উপকরণ আহরণে তারা সমর্থ। খুড়ো স্ট্রিকার যেসব ধর্মবাণী দিয়ে থাকেন, সেগুলো সুন্দর। সেগুলোতে সান্ত্বনার সুর অনুরণিত হয়। কিন্তু যারা সমবেত হয়, তাদের কারো কি এ সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে? তাদের নিকট এর কী মূল্য আছে?

তার প্রথম আমস্টারডামে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে ছয় মাস কেটে গিয়েছে। অবশেষে এখন সে বুঝতে আরম্ভ করলো যে, প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে কঠোর শ্রম দ্বারা পূরণ করা যায় না। সে ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থগুলো একপাশে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর তার বীজগণিতের বই খুলল। মাঝ রাত্রিতে জ্যান-কাকা ঘরে ঢুকলেন।

তিনি বললেন, 'ভিনসেন্ট, তোমার দরজার নিচ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে দেখলাম, তাই এলাম।' তা ছাড়া, প্রহরী আমায় বললে, সে নাকি তোমায় ভোর চারটেতেও ডকের প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে দেখেছে। রোজ ক'ঘন্টা করে পড় তুমি?

'ঠিক নেই। তবে আঠারো ঘন্টা থেকে কুড়ি ঘন্টার মধ্যে।'

'কুড়ি ঘন্টা?' জ্যান-কাকা মস্তক আন্দোলিত করে বললেন। তাঁর মুখে সন্দেহের ছাপ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ভ্যানগোঘ্ পরিবারের কারো জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এ চিন্তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া ভাইস এডমিরালের পক্ষে সহজ নয়। তিনি বললেন, 'তোমার অত ঘণ্টা পড়বার দরকার নেই।'

'কিন্তু কাকা, আমার কাজ তো শেষ করতে হবে।'

কাকার পুরু ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল। তিনি বললেন, 'কাজ তোমার যেভাবে হয় হতে দাও। আমি তোমার বাপ-মার কাছে ভালো করে তোমার দেখাশোনার জন্য প্রতিশ্রুত আছি। কাজেই দয়া করে তুমি এখন শুয়ে পড়, আর ভবিষ্যতে কখনো এত রাত থাকতে উঠে পড়তে বসো না।'

ভিনসেন্ট অঙ্ক কষার খাতাগুলো ঠেলে সরিয়ে রাখল। তার ঘুমোবার দরকার নেই। তার ভালোবাসা, সহানুভূতি, আনন্দ এসবের দরকার নেই। তার দরকার কেবল ল্যাটিন আর গ্রীক শেখবার, বীজগণিত আর ব্যাকরণ শেখবার—যাতে সে পরীক্ষা পাশ করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে, ধর্মগুরু হয়ে পৃথিবীতে ভগবানের সত্যিকার কাজ তার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে।

৫.

মে মাস ঘুরে এসেছে। এক বছর আগে এক মে মাসে ভিনসেন্ট আমস্টারডামে এসেছিল। নিয়মের আটঘাটে বাঁধা যে শিক্ষা, যা লাভ করার যোগ্যতা তার নেই এবং তার এই অযোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত তাকে কাবু করে গেছে এটা এই মে মাস থেকে তার কেবলই মনে হতে লাগল। এই বোধটা, সত্যি যা ঘটছে তার বিকৃতি মাত্রই নয়, সে যে পরাজিত হয়ে চলেছে তারই স্বীকারোক্তি। এ নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। তার মস্তিষ্কের একটা দিক তাকে যতবারই জোর করে বোঝাচ্ছে, সে পরাজিত, ততবারই সে বাকি মনটাকে চাবুক মেরে এই পরাজয় স্বীকৃতিটাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আবার জয়ী হওয়ার জন্য সে প্রচণ্ড পরিশ্রমকে অবলম্বন করেছে।

কিন্তু সমস্যা তো কেবল পরিশ্রম নিয়ে নয়। তা যদি হত তাহলে সে দেহে মনে এত খানি বিব্রত হয়ে পড়ত না। যে প্রশ্নটা তাকে এতদিন ঘা দিচ্ছে সেটা এই : 'সে কি চায়? সে কি তার কাকা স্ট্রিকারের মতো একজন বিচক্ষণ ভদ্রলোক ধর্মযাজক হতে চায়? তার জন্য আরো পাঁচ বছর তাকে পড়তে হবে? এই অনাগত পাঁচটি বছর যদি সে ব্যাকরণের সূত্র আর বীজগণিতের ফরমূলা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই কাটিয়ে দেয়, তা হলে, দরিদ্র পীড়িত নির্যাতিতদের সেবা করার যে আদর্শ সে নিজের মধ্যে লালন করে এসেছে তার কি উপায় হবে?

মে মাসের শেষ দিকে একদিন অপরাহ্ণে পাঠ সমাধা করার পর ভিনসেন্ট বলল, 'মঁসিয়ে ডা কোস্টা, আমার সঙ্গে একটু বেরোবার সময় হবে কি আপনার?'

ভিনসেন্টের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ত বেড়ে চলেছে, সেটা মেন্ডিসের মনে বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, এই চপলমতি যুবকের মানসিক অবস্থা এমন এক জায়গাতে গিয়ে ঠেকেছে, অনতিবিলম্বে একটা সুরাহা না করে দিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

'হ্যাঁ। একটু বেরোব বলে আমিও ঠিক করে রেখেছি। বৃষ্টি ধরে গিয়ে এখন হাওয়া খুব পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমি সানন্দচিত্তে তোমার সঙ্গে বেরোব।' একটি পশমী স্কার্ফ নিয়ে তিনি গলার চারদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে নিলেন আর উঁচু কলারওয়ালা কালো রঙের একটা কোট গায়ে দিলেন। তারপরে দুজনের পথ পরিক্রমা শুরু হল। তারা সিনাগোগ্ বা ইহুদি-ধর্মসভা ভবনের পাশ দিয়ে চললেন। এই 'সিনগোগে'ই তিনশ বছর আগে বারুচ্ ও স্পিনোজার গির্জার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। তারই পাশ দিয়ে তারা চলল।

চলতে চলতে এক সময় মেন্ডিস আবেগহীন কণ্ঠে বললেন, 'দারিদ্র্য আর অপমানের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।'

ভিনসেন্ট তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কোনো বিষয়ে রেখে ঢেকে কথা বলবার অভ্যাস মেন্ডিসের ছিল না। তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো সমস্যা উঠলে, সঙ্গের লোক সেটার উল্লেখ মাত্র না করলেও তিনি নিজেই সেটার অন্তস্থল পর্যন্ত চিরে দেখাতেন। গ্রন্থে জড়িয়ে জট পাকিয়ে কিছুই তিনি বলতেন না বা ভাবতেন না। সব কিছুর জটিলতা খুলে দিয়ে চলাই তাঁর অভ্যাস ছিল। এইজন্য যে বিষয়ে একবার তিনি কথা বলতেন, তা যেন ভাবনার সীমাহীন গভীরতায় ডুবে যেত। জ্যান কাকা ও খুড়ো স্ট্রিকার ঠিক অন্য ধরনের। তাঁরা এমনি সংক্ষেপে ও সুসংবদ্ধভাবে কথা বলেন যে, তাদের কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা 'হাঁ' কিংবা 'না' ধ্বনি করেই বক্তব্য চুকিয়ে দেন। কিন্তু মেন্ডিস কারো জবাব দেবার আগে জিজ্ঞাসু-ব্যক্তির চিন্তাকে তাঁর সুগম্য জ্ঞানের গভীরে অবগাহন করিয়ে দেন।

ভিনসেন্ট বলল, 'তা হলেও, তিনি অসুখী মন নিয়ে মরেন নি।'

মেণ্ডিস উত্তর দিলেন, 'না' আপনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে গিয়েছেন। আর যা তিনি করে গিয়েছেন তার মূল্য যে কি, তাও তাঁর অজানা ছিল না। অবশ্য তাঁর সময়ে তা আর কেউ জানত না, কেবল তিনিই জানতেন।'

'মানলাম, তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর জানাটাই কি তাঁর মূল্য সম্বন্ধে বড়ো কথা হল? তাঁর জানাটা ভুলও তো হতে পারত? তা হলে, বিশ্বের লোক তাঁকে উপেক্ষা দেখিয়ে ঠিক কাজ করেছে—এটাই কি গ্রাহ্য হয়ে যেত না?'

'বিশ্বের লোক তাঁকে কিভাবে নেবে না-নেবে, রেমব্রান্টের তাতে কিছু যেত-আসত না। তাঁর কাজ ছবি আঁকা; ছবিই তিনি এঁকেছেন। সে-ছবি ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা ভাববার অবসর তাঁর ছিল না। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা, দেহ মনের প্রতি রন্ধ্র প্রতি কোষ ব্যেপে ছিল কেবল অঙ্কনের তাগিদ। অঙ্কনই ছিল একমাত্র উপাদান যা একত্রিত করে তাঁর নশ্বর-দেহের সর্ব অবয়ব গঠিত। অঙ্কনই তাঁকে শরীরী জীবরূপে খাড়া করে রেখেছিল। শোনো ভিনসেন্ট বস্তু হিসেবে শিল্প তার শিল্পীকে কতখানি ব্যঞ্জনা দিতে পারল, সেইটে নিয়েই হবে শিল্পের মূল্য বিচার। রেমব্রান্ট যাকে জীবনের লক্ষ্য বলে জেনেছিলেন, তাকেই চরিতার্থ করে গিয়েছেন এবং সেইটেই তাঁর ঠিক হয়েছে। তাঁর শিল্প যদি ব্যর্থও হয়ে যেত, সে-ব্যর্থতাকে আমরা তাঁর কামনা-ব্যভিচারী হয়ে আমস্টারডামের মহাবিত্তশালী সওদাগর হওয়া অপেক্ষাও হাজার গুণ বেশি কৃতকার্যতা বলে মেনে নিতাম।'

'তাইতো দেখছি।'

সে-কথায় কান না দিয়ে নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই মেনডিস বলে চললেন, 'রেমব্রান্টের শিল্পসৃষ্টি সমগ্র জগতের লোককে যে আজও আনন্দ দিচ্ছে, সেটা জগতের লোকের সম্পূর্ণ উপরি পাওনা। যখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, তখনই তাঁর জীবন সাফল্য ও চরিতার্থতায় কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুন্দর সুঠাম জীবন-গ্রন্থখানা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাঁর অধ্যবসায় এবং আত্মনিষ্ঠার উৎকর্ষটাই বড়ো কথা—তাঁর কাজের উৎকর্ষটা বড়ো কথা নয়।'

তীরের কাছে লোকে ঠেলাগাড়িতে বালি বোঝাই করছে। দেখবার জন্য তারা কিছুক্ষণ থামল। তারপর আইভি ফুলে-ভরা বাগান দেখতে দেখতে অনেক সরু গলি অতিক্রম করে চলল।

'আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, মঁসিয়ে, কোনো যুবকের পক্ষে তার ঠিক পথটা বেছে নেওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে বলুন ত। যেমন ধরুন সে ভাবল এই কাজটা বিশেষ করে তার করণীয়; একেই জীবন-পণে আঁকড়ে ধরতে হবে তার। কিন্তু পরে দেখা গেল, কাজটা তার পক্ষে একেবারেই বে-মানান। ভাবুন দেখি তখন কি হবে।'

মেন্ডিসের চিবুক কোটের কলারে ঢাকা ছিল। সেটা তিনি খুলে দিলেন। তাঁর চোখের ঘন কৃষ্ণ তারা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভিনসেট, চেয়ে দেখ, অস্তমান সূর্য ধূসর মেঘের উপর কেমন আবির ছড়াচ্ছে!'

তারা কথাবার্তায় মশগুল ছিল। বুঝতে পারেনি কখন পোতাশ্রয়ের কাছে এসে পড়েছে। পশ্চিমাকাশে রঙের বিচ্ছুরণ। তাকেই সামনে করে নদীপারে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের অনেক মাস্তুল, পুরোনো বাড়ি ও গাছের সারি। জী-বার্গ অবধি প্রতিফলিত হয়েছে।..... মেন্ডিস পাইপে তামাক ভরলেন। কাগজের থলেটা ভিনসেন্টের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

'আমি আগেই পাইপ ধরিয়েছি, মঁসিয়ে।' বলল ভিনসেন্ট।

'ও, হাঁ, তাই ত বটে। চল না, তীর ধরে জী-বার্গ অবধি এগিয়ে যাই। সেখানে ইহুদি-গির্জার পাশে মুক্ত সমাধি প্রাঙ্গণ; সেখানে আমাদেরই লোকেরা সমাহিত রয়েছে। তাদের পাশে দু'দণ্ড বসবে চল।'

প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে দুজনে পথ চলেছেন। পাইপের ধোঁয়া হাওয়ায় দুজনার কাঁধের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। 'কোনো বিষয় নিয়েই তুমি সব সময়ের জন্য একটা নিশ্চিত ধারণা করে রাখতে পার না ভিনসেন্ট, বলে চললেন মেন্ডিস, 'যা ঠিক বলে জেনেছ, সাহস করে সেটা করে যাওয়াই হবে তোমার কর্তব্য, তুমিত কেবল তাই করতে পার। পরে সেটা ভুল বলেও প্রতিপন্ন হতে পারে, কিন্তু কাজ তোমার অন্তত সম্পন্ন করে রাখা চাই—আর এই করাটাই বড়ো কথা। বিবেক থেকে যে-সব নির্দেশ আমরা পেয়ে থাকি, তার মধ্যে সর্বোত্তম নির্দেশগুলোকে মেনে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কাজের ফল শেষে কি দাঁড়াবে তার বিচারের ভার ছেড়ে দাও ভগবানের হাতে। যে-কোনো ভাবে সৃষ্টিকর্তার সেবা করার কামনা যদি এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে তোমার মনে জেগে থাকে তো ঐ বিশ্বাসটাকেই আঁকড়ে ধরো,—ঐটেই হোক তোমার ভবিষ্যতের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ঐটেতে নির্ভর করতে, ঐটেতে আত্মবিশ্বাসকে ন্যস্ত করতে ভয় পেয়ো না তুমি।'

'মনে করুন, আমি যদি যোগ্যতা অর্জন করতে পারি?'

'যোগ্যতা কিসের—ভগবৎ সেবার?' মেন্ডিস তার দিকে তাকালেন, মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি।

'না। যোগ্যতা বলতে আমি বোঝাতে চাই কেতাবি বিদ্যা শিখে পাশ করে উপাধিযুক্ত ধর্মযাজক হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেমন পরীক্ষা পাশ করে ধর্মযাজক হয়ে বেরোয়।'

ভিনসেন্টের চিন্তা সমস্যার এক গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্যার একটা গণ্ডিবদ্ধ দিক নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা মেন্ডিসের ছিল না; তিনি কেবল চেয়েছেন এর আরো ব্যাপক, আরো সাধারণ স্তরটি নিয়ে আলোচনা করতে এবং যুবকটিকে এর থেকে নিজের যুক্তি খাড়া করবার জন্য সাহায্য করতে। ততক্ষণে তাঁরা ইহুদি সমাধিক্ষেত্রে এসে পড়েছেন। সমাধিক্ষেত্রটি খুবই অনাড়ম্বর। হিব্রুভাষায় উৎকীর্ণ করা পুরোনো প্রস্তরলিপি আর এল্‌ডারবেরি বৃক্ষে স্থানটি সমাচ্ছন্ন। যত্রতত্র উচ্চ, ঘন-সবুজ তৃণের আচ্ছাদন। ডা কোস্টা পরিবারের জন্য খণ্ড জমি সংরক্ষিত আছে। তার কাছে একখানি পাথরের বেঞ্চি পাতা। দুজনে এখানে বসে পড়লেন। ভিনসেন্ট পাইপ নিভিয়ে ফেলল। এখন সায়ংকাল। এই সময়ে সমাধি প্রাঙ্গণ একেবারে নির্জন ও নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ থাকে না।

মেন্ডিসের বাবা ও মা ঠিক পাশাপাশি দুটি কবরে শুয়ে আছেন। দুটি কবরের দিকে চেয়ে থেকে মেন্ডিস বললেন, 'শোনো ভিনসেন্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, একটা চরিত্রবৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে যদি সেটা পালন করে চলতে পারে তা হলে যা-ই সে করুক না কেন, সবশেষে সেটাই সবচেয়ে ভালো হয়ে দাঁড়ায়। তুমি যদি কেবল ছবি-বিক্রেতাই থেকে যেতে, যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা তোমাকে স্বকীয় ধারায় মানুষ

করে তুলেছে, সেটা তোমাকে উত্তম ছবি-বিক্রেতাই করে তুলত। তোমার শিক্ষা সম্বন্ধেও এ নীতিই খাটে। একদিন তুমি আপনাকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করবেই করবে; তা যে পথই তুমি ধরো না কেন; বিকাশের মাধ্যমটা বড়ো কথা নয়, বিকাশটাই হল বড়ো কথা।'

'বেতনভুক্ পুরোহিত হবার জন্য আমস্টারডামে যদি আমি পড়ে না থাকি? যদি আমস্টারডাম ছেড়ে চলে যাই?'

'তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। ধর্মশিক্ষক হয়ে তুমি লন্ডনে ফিরে যাবে; নয় তো কোনো দোকানে কাজ করবে; আর না হয় তো ব্রাবান্টে চাষের কাজ শুরু করে দেবে। যে-কাজই তুমি করবে, উত্তমরূপে করবে। যে-উপাদানে তুমি মানুষ, তার গুণাগুণ আমি বেশ টের পাচ্ছি। তা যে ভাল উপাদান তাও আমার বহু আগেই জানা হয়ে গিয়েছে। জীবনে বহুবার তোমার মনে হবে তুমি ভুল করছ, তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে চলেছে, কিন্তু সর্বশেষে তুমি আপনাকে প্রকাশ করে তুলবে, তখন ঐ প্রকাশটাই তোমার জীবনের মূল্য হয়ে দাঁড়াবে।'

'ধন্যবাদ মঁসিয়ে ডা কোস্টা। আপনি যা বললেন, তাতে আমার খুব সাহায্য হবে।'

মেন্ডিসের শরীরটা একটু কেঁপে উঠল। যে-বেঞ্চিতে বসেছিলেন, সেটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে; আর পশ্চাতে সমুদ্রগর্ভে সূর্য অস্ত গিয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন। বললেন, 'ভিন্‌সেন্ট, চল এবার যাওয়া যাক।'

৬.

পরের দিন। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে, ভিন্‌সেন্ট ডক-প্রাঙ্গণের দিকে দৃষ্টি মেলে জানলাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট এভিনিউতে সারি বেঁধে পপ্‌লার দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলো যেমন কৃশ, তাদের শাখাগুলোও তেমনি ক্ষীণ। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের সামনের তারা হালকাভাবে দাঁড়ালো।

ভিনসেন্ট আপনমনে বলে চলল, 'আমি নিয়মে-বাঁধা পড়াশোনায় তেমন ভালো নই; কিন্তু তার মানে কি এই যে, আমার দ্বারা সংসারের কোনো কাজই হবে না? মানুষকে ভালবাসার আমার যে সঙ্কল্প রয়েছে, তার সঙ্গে ল্যাটিন আর গ্রীকের কি সম্পর্ক?'

জ্যান-কাকা নিচে পায়চারি করছেন। দূরে ডকের মধ্যে জাহাজ ভাসছে, তাদের মাস্তুলগুলো ভিনসেন্ট এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছে। কালো, লাল ও ধূসর বর্ণের উপকূলরক্ষী মনিটর জাহাজগুলো ঘিরে রেখেছে ডকটিকে।

'সারাজীবন ধরে আমি যে কামনা করে এসেছি, তা কি কেবল এই ত্রিকোণ আর বৃত্ত এঁকে যাওয়া? তা নয়। ভগবানের সত্যিকার কাজ করে যাব, এইটেই আমি জন্মভর চেয়ে এসেছি। বড়ো গীর্জায় মার্জিত ভাষায় ধর্মবার্তা প্রচার করা–তাও আমি কখনো চাইনি। যারা পতিত ও লাঞ্ছিত, দুঃখ বেদনা যাদের নিত্যসাথী, আমিও তো তাদেরই একজন।'

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টা বেজে উঠল। মজুরদের জনতার স্রোত সবটা এক সঙ্গে দরজার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। বাতিওয়ালা এলো ডকপ্রাঙ্গণের লণ্ঠন জ্বেলে দেবার জন্য। ভিনসেন্ট জানলা থেকে সরে এলো ।

তার বাবা, তার জ্যান-কাকা ও খুড়ো স্ট্রিকার গত বছর তার জন্য অনেক অর্থ ঢেলেছেন ও অনেক সময় ব্যয় করেছেন। সে সবই সে বুঝতে পারছে। সে যদি এখন হাল ছেড়ে দেয় তবে তাঁরা ভাববেন সেগুলো জলে ঢালা হয়েছে।

যা হোক্ সে তো চেষ্টার কোনো ত্রুটিই রাখে নি। দিনে কুড়ি ঘন্টা কাজ করছে; তার বেশি আর কি করবে সে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছাত্রজীবনের পক্ষে সে এখন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পড়াশোনা সে অনেক দেরি করে শুরু করেছে। আচ্ছা, কালকেই যদি সে ধর্মপ্রচারক হয়ে বেরিয়ে পড়ে ঐ-সব হরিজনদের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়, এটা ও কি তা হলে তার পড়াশোনার মতোই বিলম্বিত ও ব্যর্থ হয়ে যাবে? যদি সে রোগীকে আরোগ্য করে, ব্যথিতকে আরামে দেয়, পাপীদের সান্ত্বনা দেয়, এবং অবিশ্বাসীদের দীক্ষাদান করে, তবে তাও কি ব্যর্থই হবে?

আত্মীয়েরা হয়ত বলবেন, হাঁ, তাও ব্যর্থই হবে। তাঁরা আরো বলবেন, তুমি যে কাজেই হাত দেবে, সে-কাজই ভণ্ডুল হবে। কখনো তুমি সফলকাম হবে না। তুমি অকর্মা তুমি অকৃতজ্ঞ; তুমি ভ্যান গোঘ-বংশের কলঙ্ক।

কিন্তু, 'যা-ই তুমি কর না কেন, উত্তরস্বরূপে করে যাবে। অবশেষে আপনাকে তুমি প্রকাশ করবে; সেই প্রকাশ করাটাই হবে তোমার জীবনের সার্থকতা।' একথা মেন্ডিস তাকে বলেছেন।

আর 'কে'। সবজান্তা সে। ভিনসেন্টের মধ্যে এক সঙ্কীর্ণমনা ধর্মযাজকদের অঙ্কুর দেখতে পেয়ে আগে থেকেই অবাক হয়ে আছে। তবে, হাঁ, আমস্টারডামে থাকলে সে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারবে না, একথা নিঃসন্দেহ। কেননা, সত্যভাষণ এখানে দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন্‌খানে তার যোগ্য স্থান হবে, তার জানা আছে। মেন্ডিস তাকে সেখানেই যাবার জন্যে সাহস ও বল যুগিয়েছেন। আত্মীয়েরা ভর্ৎসনা করবে কিন্তু সে ভর্ৎসনা বেশিদিন তার গায়ে লাগবে না। তার নিজের বলতে যা আছে, তা এত তুচ্ছ যে, ঈশ্বরের জন্য অনায়াসে ত্যাগ করা চলে।

ব্যাগে জিনিসপত্র গুটিয়ে নিয়ে, কাউকে কিছু না বলেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ল।

৭.

রেভাঃ ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক, রেভাঃ ডি জোঙ্ও ও রেভাঃ পিটারসেন এই তিনজন মিলে বেলজিয়াম ধর্মপ্রচার সমিতি নামে একটি দল গঠন করেছিলেন। এঁরা ব্রাসেলসে একটি নূতন বিদ্যালয় খুলেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা দিতেন এবং থাকা ও খাওয়া-খরচের জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে অতি সামান্য অর্থ গ্রহণ করতেন। ভিনসেন্ট সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে ছাত্র হয়ে ঢুকলো।

রেভাঃ পিটারসে তাকে বললেন, 'তিন মাস শিক্ষা দেবার পর আমরা তোমাকে বেলজিয়ামের কোনো একটা জায়গাতে একটা কাজ দিয়ে দেব।'

'তবে কাজ দেবার আগে দেখতে হবে, সে কাজের যোগ্য হয়েছ কি না।' রেভাঃ ডি জোঙ রেভাঃ পিটারসেনের দিকে ফিরে ভারিক্কিভাবে বললেন। যৌবনকালে যন্ত্রপাতির কাজ করার সময়ে রেভাঃ ডি জোঙের বুড়ো আঙুলটি গোড়া থেকে কেটে গিয়েছিল। এর পরেই তিনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে ধর্মব্রত গ্রহণ করেন।

এবার রেভাঃ ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক বললেন, 'মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, ধর্মপ্রচারের কাজে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে' বড়ো দরকারী, তোমাকে বলে রাখি। জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে হবে। সে বক্তৃতা তাদের সহজবোধ্য হওয়া চাই; তাদের ভালো লাগা চাই এবং তাতে তাদের আকৃষ্ট করা চাই। বক্তৃতা দেবার এই ক্ষমতাটাই সবচেয়ে বড়ো দরকারী।'

গীর্জা ঘরেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। রেভাঃ পিটারসেন ভিনসেন্টকে নিয়ে বাইরে এলেন। ব্রাসেলসের আকাশ আজ রৌদ্রময়। সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে পা ফেলতে ফেলতে ভিনসেন্টের হাতদুটি ধরে রেভাঃ পিটারসেন বললেন, 'তোমাকে দলে পেয়ে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে। বেলজিয়ামে আমাদের অনেক কিছু করবার মত কাজ পড়ে রয়েছে, সেগুলো সম্পন্ন করতে হবে। তোমার যা উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছি তার থেকে বলতে পারি, একাজে তুমি অসীম যোগ্যতা দেখাতে পারবে।'

তাঁর কাছ থেকে আশাতীত দাক্ষিণ্য পেয়ে ভিনসেন্ট আনন্দে নির্বাক হয়ে গেল। তাঁর কথাগুলো উজ্জ্বল রৌদ্রালোকের চেয়েও উষ্ণ ও প্রীতিপদ বোধ হল।

খাড়া ছয়তলা পাথরের বাড়িগুলো দু'-পাশে রেখে পথ চলে গিয়েছে। সে পথে চলতে চলতে ভিনসেন্ট কথাগুলোর উত্তর দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় রেভাঃ পিটারসেন থামলেন।

বললেন, 'এবার আমায় ফিরতে হবে। এই নাও আমার কার্ড। বিকেলে যেদিনই সময় পাবে আমার কাছে চলে আসবে। দুজনে মিলে বেশ আলাপ-আলোচনা করা যাবে।'

রেভারেন্ডদের এই বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া গেল ভিনসেন্টকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে মাত্র তিনজন। ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করতেন মাস্টার বোকমা। তাঁর শরীর খাটো ও কৃশ, গালদুটি গর্তে বসা। সে গর্তের দুটি পার নাকের দুপাশ দিয়ে ভুরু থেকে নিচের দিকে সটান লম্বমান।

ভিনসেন্টের সহপাঠী দুজন উনিশ বছরের গ্রাম্য তরুণ। সেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব অবিলম্বে পাকা হয়ে উঠল। হৃদ্যতা গাঢ়তর করবার জন্যেই তারা দুজনেই ভিনসেন্টের পতি বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল।

গোড়ার দিকে একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাদের একজনকে ভিনসেন্ট বলেছিল,. 'আমার লক্ষ্য হচ্ছে আপনাকে তৃণের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া-mourior a moi-meme (অন্তরে অন্তরে মরে যাচ্ছি আমি)।' যখনই তারা দেখতে পেতো সে প্রাণপণে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা মুখস্থ করছে কিংবা কোনো পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে, তারা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলত, 'কি করছ ভ্যান গোঘ্? অন্তরে অন্তরে মরে যাচ্ছো নাকি?'

এসব বিদ্রূপবাণ সহ্য করা হয়ত অসম্ভব হত না। কিন্তু মাস্টার বোকমার সঙ্গে তাল রাখা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাঁর কাছে গেলে সে মহা দুর্ভাবনায় পড়ে যেত। ছাত্রদের শিখিয়ে পড়িয়ে ভালো বক্তা করে তুলবেন– এইটেই ছিল মাস্টার বোকমার ইচ্ছে। প্রতিদিন রাত্রিতে বাড়িতে বসে তাদের একটা করে বক্তৃতা তৈরি করতে হত; পরের দিন ক্লাসে এসে সেটা বলতে হত। অপর দুজন ছাত্র বাইবেলের সহজ ও প্রাঞ্জল বাণীগুলোকে জোড়াতাড়া দিয়ে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা তৈরি করে আনত; ক্লাসে এসে সে সব অনর্গল আবৃত্তি করে যেত। ভিনসেন্ট ধীরে সুস্থে ধর্মোপদেশ প্রস্তুত করতে থাকত; প্রতিটি ছত্রে সমস্ত হৃদয়মন ঢেলে দিয়ে রচনা করতে তার বক্তৃতা। যা বলতে হবে সেটা সে নিজের মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করত; কিন্তু ক্লাসে এসে বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেই সে অন্য রকম হয়ে যেত; বলবার কথাগুলো সে হাজার চেষ্টায়ও সহজে প্রকাশ করতে পারত না।

বোকমা নির্মম হয়ে উঠতেন : 'তোমার ধর্মপ্রচারক হবার কোনো আশা নেই, ভিনসেন্ট। তুমি দেখছি কথাই কইতে পার না। কে শুনবে তোমার এমন বক্তৃতা।'

এরপর একদিন বোকমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ভিনসেন্ট সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে আগে থেকে প্রস্তুত না হয়ে সে কোনও বক্তৃতা দিতে পারবে না। একথা শুনে মাস্টার বোকমা কিছুতেই রাগ সামলাতে পারলেন না। ভিনসেন্ট সারা রাত জেগে রচনা লিখল। রচনাটিকে অর্থসমৃদ্ধ করার জন্য এর প্রতিটি শব্দ চোস্ত ফরাসী থেকে বেছে বেছে প্রয়োগ করল। পরের দিন ক্লাসে অন্য দুজন ছাত্র কাগজের দিকে দুএকবার মাত্র তাকিয়েই যীশুখৃস্ট ও মানবমুক্তি সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা দিয়ে ফেলে; বক্তৃতার মাঝে মাঝে মাস্টার বোকমাও সম্মতিসূচক মুণ্ড নাড়লেন। এর পর এলো ভিনসেন্টের পালা। সে বক্তৃতা লেখা কাগজ সামনে ধরে পড়তে শুরু করল। এতে বোকমার রাগ বেড়ে গেল। তিনি এ বক্তৃতা শুনবেন না। বললেন :

'আমস্টার্ডামে তোমার শিক্ষকেরা তোমাকে বুঝি এভাবেই শিখিয়েছে? দেখো ভ্যান গোঘ, আমার ক্লাসে যারা যারা শিখেছে, তারা দু' সেকেন্ড আগে জানালেই বক্তৃতা দিতে পারে এবং শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে। এটুকুন যোগ্যতা যার নেই, এমন কাউকেই আমি পড়াইনি।'

ভিনসেন্ট কাগজ না দেখে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু আগের রাতে যা যা লিখেছে, সেগুলো কিছুতেই ঠিক ঠিক মনে আনতে পারল না। যতবার বলতে চেষ্টা করছে, ততবার ঠেকে যাচ্ছে। সহপাঠীদের মুখে বিদ্রূপের হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাস্টার বোকমাও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

আমস্ট্রারডামে থাকার সময় থেকেই তার স্নায়ুতে জ্বালা ধরে আছে। এখন সে জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠল।

'মাস্টার বোকমা, আমার বক্তৃতা আমি যেভাবে পারব সেইভাবেই দেব। আমি জানি আমার কাজ নির্দোষ। আপনার অপমান আমি কিছুতেই মাথা পেতে নেব না।'

বোকমার রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। চীৎকার করে বললেন, 'আমার কথা মেনে তোমাকে চলতেই হবে। যদি না চল, ক্লাস থেকে তোমায় বের করে দেব।'

এই ঘটনায় দুজনের মধ্যে একটা প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হয়ে রইল। রাত্রিতে ভিনসেন্টের ঘুম আসত না; বিছানায় শোওয়া তার কাছে অর্থহীন। সে সারারাত পরিশ্রম করত এবং যতগুলো বক্তৃতা তৈরি করে আনতে তাকে বলা হত সে তার চারগুণ তৈরি করে নিয়ে আসত। অনিদ্রায় ক্রমে তার ক্ষুধা একেবারেই কমে গেল। সে কৃশ হতে লাগল এবং তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল।

নভেম্বর মাসে তাকে সমিতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ও চাকুরি নেবার জন্য গীর্জা-ঘরে ডেকে পাঠানো হল। অবশেষে সব বাধা বুঝি তার পথ থেকে অপসারিত হয়েছে। একটা শ্রান্ত আত্মতুষ্টির ভাবে তার চিত্ত আজ প্রসন্ন। এসে দেখল সহপাঠী দুজন আগে থেকেই সেখানে বসে আছে। সে ঘরে ঢুকল, রেভারেন্ড পিটারসেন তার দিকে ফিরেও তাকালেন না; কিন্তু বোকমা তাকালেন; তাঁর চোখে বিদ্রূপের দ্যুতি।

রেভারেন্ড ডি জোঙ ছাত্রদুটির কাজের খুব তারিফ করলেন, তাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন এবং নিয়োগপত্র দিলেন। 'হুগ স্ট্রাটেন' ও 'এটিহোভে' গিয়ে তাদের কাজ করত হবে। তারা দুজন হাত ধরাধরি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেভারেন্ড ডি জোঙ এবার ভিনসেন্টের দিকে ফিরে বললেন, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, তুমি লোককে ঈশ্বরের বাণী শোনাবার উপযুক্ত হয়েছ বলে সমিতি স্বীকার করে নিতে পারছেন না। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তোমাকে আমরা চাকুরি দিতে অক্ষম।'

ভিনসেন্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, 'আমি কী দোষ করেছি বলুন তো।'

'তুমি উদ্ধত। কর্তৃপক্ষের আদেশ মানতে তুমি প্রস্তুত নও। বাধ্যতা হচ্ছে আমাদের গীর্জার প্রথম নীতি। তার উপর বক্তৃতা দেয়া তুমি শিখে উঠতে পারনি। তোমার শিক্ষক মনে করেন, তুমি ধর্মপ্রচারের যোগ্য হওনি।'

রেভারেন্ড পিটারসেনের দিকে ভিনসেন্ট চোখ তুলে তাকাল। রেভারেন্ড তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ভিনসেন্ট কাউকে উদ্দেশ্য না করে আত্মগতভাবে বলল, 'তা হলে আমি এখন কি করব?'

'আবার ছয় মাসের জন্য তুমি বিদ্যালয়ে ফিরে যেতে পার। অবশ্য যদি তোমার অভিরুচি হয়,' উত্তর দিলেন ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক, বললেন, 'ঐ ছ' মাসের পর সম্ভবত তোমাকে......'

ভিনসেন্ট মাথা নিচু করে তার অমসৃণ মোটা বুটজুতার দিকে তাকাল; দেখতে পেল, জুতোর চামড়া ছিঁড়তে শুরু করেছে। তারপর, উত্তর দেবার কোনো ভাষা না পেয়ে, নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

নগরীর বড়ো বড়ো রাস্তাগুলো দ্রুতপদে অতিক্রম করল। তারপর 'লাকেনে' এসে উপস্থিত হল। অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলেছে সে। সরু পায়েচলা গলি, দু'পাশে কর্মচঞ্চল শব্দমুখরিত কারখানা-বাড়ি। সেই গলি ছাড়িয়ে একটি খোলা জমি। সেখানে একটি কৃশ, জরাজীর্ণ শাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সে জন্মভর খাটুনির পর জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থানটি নির্জন ও নিস্তব্ধ। ভূমিতলে একটি মড়ার মাথার খুলি পড়ে আছে। অল্প দূরে একটি কুটির। সেখানে যে লোকটি বাস করে, ঘোড়ার চামড়া

ছাড়ানো তার পেশা। কুটিরের পাশেই শুকনো একটি ঘোড়ার কঙ্কাল শায়িত। অসহায় বোবা জীবদের প্রতি অনুকম্পায় তার মর্মস্থল ব্যথিয়ে উঠল। সে শূন্য, ভারাক্রান্ত মনে পাইপ মুখে তুলে নিল। তামাকে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল। কিন্তু কি ভয়ানক তেতো। তামাকের ধোঁয়া আজকের মত এত বিস্বাদ আর কোনোদিন লাগেনি। সে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল। শাদা ঘোড়াটি তার কাছে এগিয়ে এসে পিঠে নাক ঘষতে লাগল। ভিনসেন্ট ফিরে প্রাণীটার বিকৃত গলদেশে হাত বুলিয়ে দিল। এভাবে কিছুক্ষণ গেলে, তার মন ভগবানের চিন্তায় ভরে উঠল। তাতে কিছুটা সান্ত্বনা পেল সে। আপনার মনে বলে উঠল, 'যীশুকে ঝড়ঝঞ্ঝাও বিচলিত করতে পারেনি। আমি একলা নই; কেননা, ভগবান আমাকে ছেড়ে যান নি। কোনো না কোনোদিন কোনো না কোনোভাবে তাঁকে সেবা করার উপায় আমার একটা জুটবেই।'

ঘরে ফিরে এসে দেখল, রেভারেন্ড পিটারসেন তারই প্রতীক্ষায় বসে আছেন। তিনি বললেন, 'ভিনসেন্ট, আজ তুমি আমার বাড়িতে খাবে। তোমায় বলতে এসেছি।'

রাস্তা জন-মুখর। শ্রমিকেরা বিকেলের খাবার খেতে ত্রস্তপদে চলেছে। তাদের ভিড় ঠেলে দু'জন পথ চলতে লাগলেন। পিটারসেন নানা গল্পগুজব করে চললেন। যেন তাঁদের মধ্যে কিছুই হয় নি, এমনি ভাব। তাঁর প্রত্যেকটি কথা গভীরভাবে ভিনসেন্টের মনের পরদায় আঘাত করছে। পিটারসেন তাকে সামনের ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের দেওয়ালে কয়েকখানি জল-রঙে ছবি টাঙানো। এক কোনে একটি 'ইজেল'। ঘরখানা রীতিমতো একটা স্টুডিও হয়ে উঠেছে।

ভিনসেন্ট আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আপনি ছবি আঁকেন? আমি তো জানতাম না।'

পিটারসেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। উত্তর দিলেন, 'আর না না, ও কিছু নয়। আমি কেবল অভ্যাস করছি। অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য একটু আধটু আঁকি মাত্র। ও আবার তোমার চোখে পড়েছে, আমি হলে তো এড়িয়েই যেতুম। বলবার মতো ও কিছু নয়।'

তাঁরা খেতে বসলেন। পিটারসেনের কন্যাটি ব্রীড়াবনতা, মুখচোরা, পঞ্চদশী মেয়ে। খাবারের থালা থেকে লজ্জায় সে একবারও মুখ তুলে চায় নি। সারাক্ষণ সে মাথা নিচু করেই খেল। পিটারসেন খেতে খেতে অনেক অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন। এদিকে ভিনসেন্ট ভদ্রতার খাতিরে কিছু কিছু গলাধঃকরণের চেষ্টা করল। হঠাৎ এক সময়ে তার মন পিটারসেনের কথাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হল। রেভারেন্ড একটা কাজের কথা বলছেন। কিন্তু ভিনসেন্ট তাঁর আগের কথাগুলোর খেই ধরতে পারে নি।

রেভারেন্ড বলছেন, ''বরিনেজ' একটা কয়লাখনি অঞ্চল। সত্যি বলতে কি, সেখানে সারা জেলায় তুমি এমন একটি প্রাণী খুঁজে পাবে না যে খনিতে নেমে কাজ না করেছে। হাজার বিপদ মাথায় করে তারা খনির ভিতরে কাজ করে। কিন্তু মাইনে যা পায়, নিতান্ত প্রাণ ধারণের পক্ষেও তা অপ্রচুর। পায়রার খোপের মতো ঘর। তাও ধ্বসে পড়া। তারই মধ্যে এই সব খনিমজুরের স্ত্রীপুত্রেরা দিন কাটায়। বছরের অধিকাংশ সময়ই তারা শীতে কাঁপে, জ্বরে ভোগে আর উপোসে কষ্ট পায়।'

ভিনসেন্ট ভেবে পেলো না এ-সব তাকে কেন শোনানো হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল : 'কোথায় সে 'বরিনেজ'?'

বেলজিয়ামের দক্ষিণে; মান্‌স্‌-এর কাছে। সম্প্রতি সেখানে আমি কিছুদিন ছিলাম। ভিনসেন্ট, সত্যিকার কাজ যদি করতে হয় তো তার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে বরিনেজ। ব্যথিতকে সান্ত্বনা দেবার যদি প্রয়োজন থাকে, তাদের বেদনাদগ্ধ চিত্তে পুণ্যের আলো জ্বালিয়ে দেবার যদি প্রয়োজন থাকে, সে-প্রয়োজন মেটাবার এমন জায়গা আর নেই। এইজন্য বরিনেজবাসীদের একজন প্রচারকের দরকার সব চেয়ে বেশি। এমন দুঃখীর জায়গা, এমন ব্যথিতের জায়গা আর পাবে না।'

শুনতে শুনতে ভিনসেন্টের গলায় খাবার আটকে গেল। কিছুতেই গিলতে পারল না। কাঁটা চামচগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল সে। পিটারসন কেন তাকে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছেন, ঘুরে ফিরে এই প্রশ্নই তার মনে জাগতে লাগল।

রেভারেন্ড বললেন, 'ভিনসেন্ট, তুমি 'বরিনেজ' যাও। সেই কয়লাখনি এলাকায় গিয়ে তোমার শক্তি দিয়ে উৎসাহ দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবে তুমি।'

'কিন্তু, কি করে আমি যাব? সমিতি ....'

'হাঁ, তা জানি। তোমার বাবাকে সেদিন আমি সব কথা বুঝিয়ে পত্র লিখেছিলাম। আজ দুপুরের ডাকে সে-পত্রের উত্তর পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, যতদিন তোমার বাঁধা চাকরি না হয়, ততদিন তুমি 'বরিনেজে' থাকতে পার; তিনি তোমায় সাহায্য করবেন।'

আনন্দে, উত্তেজনায় ভিনসেন্ট আর বসে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি তা হলে আমাকে কাজ দিয়ে সেখানেই পাঠিয়ে দিন।'

'তাই দেব। কিন্তু আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে। তুমি যখন ভালো কাজ দেখাতে পারবে, সমিতি তা দেখে নরম না হয়ে পারবে না, তোমার কাজের তারিফ করবেই। আর তা না হলেও ভাবনার কারণ নেই। ডি জোঙ ও ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক এরমধ্যে একদিন আমার কাছে আসবেন। উদ্দেশ্য, কোনো একটা বিষয়ে আমার খাতির পাওয়া। সেই খাতিরের বদলে আমিও একটা খাতির চাইব। ঐ এলাকার দীনহীনদের জন্যে তোমার মতো লোকেরই দরকার। আমার কাজের বিচারভার ভগবানের হাতে। যে-কোনো উপায়ে তোমাকে আমি তাদের কাছে পাঠাতে চাই। এতে ভগবানও নিশ্চয় সায় দেবেন।'

৮.

রেলগাড়ি দক্ষিণ মুলুকে এগিয়ে চলেছে। দিক্‌ চক্রবালে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে একসারি পাহাড়। ফ্লান্‌ডার্সের সমতল প্রদেশের বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ এতদিন ভিনসেন্টের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পাহাড়ের দৃশ্য দেখে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। মাত্র কিছুক্ষণ দেখেই বুঝতে পারল পাহাড়গুলো দেখবার মতো বটে। সচরাচর এমন পাহাড় চোখে পড়ে। প্রতিটি পাহাড় সমতল ভূমি থেকে সিধে খাড়া হয়ে উঠেছে। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার যোগ নেই। যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

এর এক একটাকে মিসরের পিরামিড বলে স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা যায়। জানলার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দেখতে দেখতে সে আত্মগতভাবে বলল, 'যেন কালো মিসর!'

পাশে বসে ছিল যে লোকটি, তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'পাহাড়গুলো কি করে অমন খাড়া দাঁড়িয়ে গেল বলতে পারেন?'

সহযাত্রী উত্তর দিল, 'পারি। মাটির নিচু থেকে কয়লার সঙ্গে যেসব খাদ ওপরে ওঠে, সেগুলো জমে স্তূপ হয়ে আছে। এগুলো সেই স্তূপ। ঐ যে দেখছ ছোটো একখানা গাড়ি পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ঠেকেছে–দেখতে পাচ্ছ তো? এক পলক চেয়ে দেখ ভাল করে।'

সহযাত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, ছোটো গাড়িখানা ঘুরে কাত হয়ে গিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো মেঘ যেন সেখান থেকে নিচের দিকে উড়ে নামতে শুরু করেছে। সহযাত্রী বলে উঠল, 'এই দেখো। এর থেকেই বুঝতে পারবে কিভাবে এরা বেড়ে উঠেছে। রোজ রোজ এক আঙুল আধ আঙুল করে এরা বেড়ে উঠছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি দেখে আসছি।'

রেলগাড়ি 'ওয়াসমেস'এ থামলে ভিনসেন্ট তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। গর্তের মতো নিচু এক খণ্ড রুক্ষ, ঊষর জমির ওপর শহরটি অবস্থিত। পাণ্ডুবর্ণ সূর্যের ঝাপসা আলো আড়াআড়িভাবে এসে স্থানটিকে কিছু আলোকিত করেছে, কিন্তু কয়লার ধোঁয়ার একটা পুরু স্তর আকাশের অনেকখানিই আড়াল করে রেখেছে। 'ওয়াসমেসে' পাহাড়ের পাশাপাশি দু সারি উঁচু ইঁটের বাড়ি তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইটগুলো আলগা হয়ে ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল। এর পর এখানে 'পেটিটি ওয়াসমেস' বা 'ছোটো ওয়াসমেস' নামক পল্লীর গোড়াপত্তন হয়।

ভিনসেন্ট লম্বা টিলার পথ ধরে হেঁটে চলল। পাড়াটা একেবারে নির্জন। দেখে তার ভারি আশ্চর্য লাগল। এর কোনোখানে একটা জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। দু-একটা বাড়ির দরজায় দেখা গেল এক একটি স্ত্রীলোক ম্লানমুখে জড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'পেটিট ওয়াসমেস' কয়লা-খনির মজুরদের গ্রাম। সারাটি গ্রামে ইটের বাড়ি মাত্র একটি। সেটা রুটিবিস্কুটওয়ালা জীন-ব্যাপ্টিস্ট ডেনিসের বাড়ি। টিলার একেবারে মাথায় দাঁড়ানো। ভিনসেন্ট সেই বাড়িতেই যাবে। রেভারেন্ড পিটারসেনকে এই বাড়িরই গৃহকর্তা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তাঁদের শহরে পরের বার যাঁকে ধর্মপ্রচারক করে পাঠানো হবে, তাঁকে তিনি নিজের বাড়িতে থাকবার জায়গা করে দেবেন।

মাদাম ডেনিস ভিনসেন্টকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর রান্নাঘর তখন রুটির গন্ধে দন্তরপুর। তারই মধ্যদিয়ে ভিনসেন্টকে নিয়ে গিয়ে তার জন্য যে ঘরখানি রঙ হয়েছে, সে ঘর দেখালেন। বাড়তি ছাদের তলাকার একটুখানি জায়গা। সেটি তার ঘর। একটি মাত্র জানলা, বিষাদমলিন 'পেটিট ওয়াসমেসে'র দিকে মুখ করে আবার বাড়তি কড়িকাঠের মুখগুলো মাদাম ডেনিসের কর্মনিপুণ হস্তে উত্তমরূপে নিকানো। দেখা মাত্রই ভিনসেন্ট জায়গাটা পছন্দ করে ফেলল। উৎসাহ চাঞ্চল্য তার এত বেড়ে গেল যে, নিজের জিনিসপত্রগুলো খুলবারও অবসর পেল না। মোটা কাঠের সিঁড়ি ক'খানা ভেঙে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে ঘরে মাদাম ডেনিসকে বলতে এলো যে একটু বেরুচ্ছে।

মাদাম ডেনিস তাকে বললেন, 'খাওয়ার সময় চলে আসতে যেন ভুল করো না। পাঁচটায় আমাদের খাওয়া হয়।

মাদাম ডেনিসকে ভিনসেন্টের খুব ভাল লাগল। তিনি সহজ মানুষ। কোনো বিষয় ভেবে ভেবে জটিল করা তাঁর ধাতে নেই। সব কিছু সহজে বুঝবার প্রবৃত্তি তাঁর প্রকৃতিগত। ভিনসেন্ট তা বুঝতে পারল। সে উত্তর দিল; আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসব মাদাম। আমি কেবল জায়গাটা একটু দেখতে বেরুচ্ছি।'

'আজ রাতে আমাদের এক বন্ধু আসবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া ভাল। 'মার্কাসি'তে তিনি ফোরম্যানের কাজ করেন। তিনি তোমাকে অনেক কিছু বলে দিতে পারবেন যা তোমার জেনে রাখা খুবই দরকার।'

বাইরে বরফ পড়তে শুরু করেছে। রাস্তায় চলতে চলতে ভিনসেন্ট লক্ষ্য করল, বাগানের ও ক্ষেতের বেড়াগুলো কয়লাখনির চিমনির ধোঁয়ায় কেমন কালো হয়ে গিয়েছে। ডেনিসদের বাড়ির পুব পাশে একটি লম্বা গভীর খাদের মতো জায়গা। বেশির ভাগ খনি মজুরের কুটির সেখানে। অপর পাশে বিস্তীর্ণ খোলা জমিতে একটু কালো পাহাড়ের ঢিবি, আর কতকগুলো চিমনি। এটাই মার্কাসি কয়লা খনি। পেটিট ওয়াসমেস গ্রামের প্রায় সব মজুরই এই খনির ভেতর কাজ করতে নেমেছে। জমির মাঝখান দিয়ে কাঁটাবনের উপর একটি পথ, নানা রকম কোঁকড়ানো গাছের শিকড়ে সে পথ মাঝে মাঝে ছিন্ন।

'কার্‌নেবজেস্ বেল্‌জিক' পরিচালিত সারিবদ্ধ সাতটি কয়লাখনির মধ্যে মার্কাসি খনি অন্যতম। সারা 'বরিনেজ' অঞ্চলে এই খনিটি সবচেয়ে পুরোনো এবং এর মধ্যে কাজ করাও সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। এর ভিতর বহু লোকক্ষয় হয়েছে বলে এর দুর্নাম আছে। এই খনিগর্ভে নামতে বা উঠতে যেমন অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, তেমনি বিষাক্ত গ্যাসে, বিস্ফোরণে, জলোচ্ছাসে কিংবা ওপরের ছাদ ধ্বসে পড়ার জন্যে বহু লোক ধ্বংস হয়েছে। খনির উপরের জমিতে দুখানি নিচু ধরনের ইটের ঘর। কয়লা তোলার কলকাঠি এর ভিতরেই চালানো হয় এবং মজুত কয়লা এখানে গাড়িতে বোঝাই করা হয়। উঁচু চিমনিগুলো এক সময়ে' হলদে রঙের ছিল, এখন কালো হয়ে গিয়েছে। সেগুলো প্রায় গায় গায় লাগানো। দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা এই চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোয় এবং চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। মার্কসি খনির চারপাশে দরিদ্র খনিমজুরদের কুটিরশ্রেণী। কুটিরের সঙ্গে দু-একটা মরা গাছ ধোঁয়ায় কালি বর্ণ। কাঁটা গাছের বেড়া, ময়লার স্তূপ, ছাইয়ের গাদা আর স্তূপাকার অব্যবহার্য কয়লা কুটিরগুলোর মলিনতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে আড়াল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো পাহাড়ের 'পিরামিড'! স্থানটি মালিন্য ও বিষাদে আচ্ছন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই এখানকার সবকিছু ভিনসেন্টের কাছে মলিন ও নিষ্প্রাণ বোধ হল। সে মনে মনে বলল, 'লোকে এটাকে কালো দেশ বলে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমন জায়গাকে তো কালো বলবেই।'

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখল, খনি মজুরের দল গেট দিয়ে বেরোতে শুরু করেছে। পরনে মোটা কাপড়ে ছেঁড়া পোষাক, মাথায় চামড়ার টুপি, পুরুষ ও স্ত্রী সকলের একই পোষাক। সকলেই কালো হয়ে গিয়েছে। চিমনির রংয়ের মতো ঘোরতর কালো। কয়লার কালিমাখা বুকের ওপর চোখের শাদা অংশটুকু যেন আলগাভাবে লাগানো রয়েছে–এ যেন এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। লোকে যে তাদের কালো

নিগ্রো প্রবাহ বলে তা অযৌক্তিক নয়। সেই কোন্ ঊষা কালে ঢুকে সারাদিন খনিগর্ভের অন্ধকারে কাজ করে, বেরিয়ে এসেছে। এই জন্য বিকেলের ম্লান রোদের আভাও তাদের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আধ-বোজা চোখে তারা খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজেদের মধ্যে দুটি একটি অশ্লীল, চুটকি কথা বলতে বলতে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসছে। লোকগুলো দেখতে খাটো, সরু, কুঁজো কাঁধ, দেহ পেশিবহুল।

সেদিন অপরাহ্ন। গ্রামটিকে নির্জন মনে হয়েছিল কেন, ভিনসেন্ট এখন তা বুঝতে পারল। খাদের ওপর ঐ যে কুটিরশ্রেণী রয়েছে, সত্যিকার পেটিট ওয়াসমেস গ্রাম সেটি নয়; আসল পেটিট ওয়াসমেস হচ্ছে সাত হাজার মিটার নিচেকার এই ভূগর্ভ নগরী। গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা তারই মধ্যে সারাদিন কাটিয়ে, ওখানে যায় কেবল রাতে ঘুমোবার জন্য।

৯.

খেতে বসে মাদাম ডেনিস ভিনসেন্টকে বললেন, 'জেকস্ ভার্নি একজন কৃতী পুরুষ; তাঁর যা কিছু উন্নতি, নিজের চেষ্টাতেই করেছেন। কিন্তু তা হলেও তিনি খনিমজুরদের সঙ্গে বন্ধুভাব বজায় রেখেছেন।'

'তার মানে, যারা পদোন্নতি করে তাদের সবাই কি মজুরদের সঙ্গে বন্ধুভাব বজায় রাখে না?'

'না মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, রাখে না। যে মুহূর্তে তারা 'পেটিট ওয়াসমেস' থেকে প্রমোশন পেয়ে 'ওয়াসমেসে' আসে, সেই মুহূর্তেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়; তারা মজুরদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম ব্যবহার করতে শুরু করে। টাকার খাতিরে তারা মালিকের হয়ে মজুরদের উৎপীড়ন করতে ছাড়ে না; তাদের হালচাল সবই তখন মালিকের মতো হয়ে পড়ে। এককালে খনির মধ্যে ক্রীতদাসের মতো খেটেছে একথা তারা ভুলে যায়। কিন্তু জেকস্ বদলান নি। তিনি সৎ এবং বিশ্বাসী। আমরা যখন ধর্মঘট করি, তিনি থাকেন পুরোভাগে। খনিমজুরদের মধ্যে তার যেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি তেমন আর কারো নেই। তাঁর কথা ছাড়া মজুররা আর কারো কথা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকবেন না।'

'কেন, তাঁর কি হয়েছে?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করে।

'যা হয়ে থাকে। ফুসফুসের ব্যাধি। খনিতে যারা কাজ করে, এ রোগ তাদের সকলেরই হয়। সামনের শীতকাল পর্যন্ত তিনি বাঁচবেন কি না সন্দেহ।'

কিছুক্ষণ পরে জেকস্ ভার্নি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর শরীর খাটো। কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে। বিষণ্ণ চোখ দুটি গর্তে ঢুকে গিয়েছে। নাকের গর্ত থেকে, ভুরুর কোণ থেকে এবং কানের পাতা থেকে শুঁয়ার মতো বড়ো বড়ো লোম বেরিয়েছে তাঁর। মাথায় পড়েছে টাক। ভিনসেন্ট ধর্মপ্রচারের ব্রত নিয়ে মজুরদের ভাগ্যোন্নতি করতে এসেছে, একথা শুনে তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'হায় মঁসিয়ে! আমাদের ভালো করার চেষ্টা অনেক লোকে করেছে, কিন্তু তবু কিছু হয় নি। আমরা আগে যা ছিলাম এখনো ঠিক তাই আছি।'

'আপনি কি মনে করেন, 'বরিনেজে' লোকের অবস্থা খুবই খারাপ?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

জেকস্ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার নিজের কথা যদি বলি তো বলব, খারাপ নয়। আমার মা আমাকে কিছু কিছু পড়তে শিখিয়েছিলেন, সেজন্যই আমি 'ফোরম্যান' হতে পেরেছি। ওয়াসমেসের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, তার উপর আমার ছোটো একখানি ইঁটের বাড়ি আছে। আমাদের খাওয়াপরারও কোনো কষ্ট নেই। কাজেই আমার দিক থেকে অবস্থা খারাপের কথা ওঠে না........'

তিনি আর বলতে পারলেন না। কাশির প্রচণ্ড ধাক্কায় থামতে বাধ্য হলেন। ভিনসেন্টের মনে হল, তাঁর প্রশস্ত বুকখানা কাশির ধাক্কায় বুঝিবা বিদীর্ণ হয়ে যায়। দরজার বাইরে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর এবং রাস্তার উপরে কয়েকবার থুথু ফেলার পর জেক্স্ আবার এসে রান্নাঘরের গরমে বসলেন। বসে বসে নাকের, ভুরুর ও কানের লোমগুলো টানতে লাগলেন।

'দেখুন মঁসিয়ে, আমি যখন 'ফোরম্যান' হই, আমার বয়স তখন ঊনত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে। সেই থেকে ফুসফুস জোড়াটাও গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন আমি একরকম ভালই কাটিয়েছি। কিন্তু মজুরেরা ......' তিনি মাদাম ডেনিসের দিকে তাকালেন, বললেন, 'আপনি কি বলেন? একে একবার হেনরি ডেকরুকের কাছে নিয়ে যাব নাকি?'

'যান। সত্যি সত্যি যা হয়েছে, তাই তিনি নিজের কানে শুনে আসবেন; এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।'

জেক্স্ ভার্নি ভিনসেন্টের দিকে ফিরে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, 'মঁসিয়ে আর যাই হোক, আমি একজন ফোরম্যান। আমি তো ওঁদের অবাধ্য হতে পারিনে। কিন্তু হেনরি—হ্যাঁ, হেনরি আপনাকে সব দেখিয়ে দিতে পারবে।'

সেই ঠাণ্ডা হিমের রাতে জেক্সের সঙ্গে ভিনসেন্ট বেরিয়ে পড়ল। শীঘ্রই দুজনে খনি মজুরদের খাদে ঢুকে পড়ল। মজুরদের ঘরগুলো এক একটা কাঠের কুঠরি বিশেষ। কোনো নক্সা অনুসারে এগুলো তৈরি নয়; পাহাড়ের নিচে ঢালু জায়গায় এলোমেলো ভাবে এগুলোকে খাড়া করে রাখা হয়েছে। মধ্যদিয়ে একটি মাত্র পথ গিয়েছে— তার থেকে বেরিয়েছে ঘরে ঢোকার আবর্জনাপূর্ণ ছোট ছোট রাস্তা। পথ এমনি আঁকাবাঁকা গোলমেলে যে, সর্বদা যারা চলাফেরা করে তারা ছাড়া অন্যের পক্ষে সে-পথ দিয়ে ঠিক জায়গাতে পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব নয়। জেক্সের পিছু পিছু যেতে যেতে ভিনসেন্ট কয়লার স্তূপ, কাঠের গুঁড়ি আর আবর্জনার গাদায় বার বার আছাড় খেতে লাগল। প্রায় অর্ধেক রাস্তা নেমে আসবার পর তারা ডেক্রুকের কুঠরি দেখতে পেল। পিছনের ছোটো জানলা দিয়ে মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছে দেখা গেল। কড়া নাড়তে, মাদাম ডেক্রুক্ এসে দরজা খুলে দিলেন।

ডেক্রুকের ঘরখানা এই খাদের আর-সব মজুরদের ঘরের চাইতে একটুও আলাদা নয়। এরও মাটির কাঁচা মেঝে, শেওলা ধরা ছাদ; মাঝে মাঝে চট আর মোটা ক্যানভাস আটকিয়ে হাওয়া বেরোবার পথ করে দেওয়া হয়েছে। ঘরের পিছনের দুই

কোণে দুটি বিছানা পাতা। এর একটিতে তিনটি শিশু জড়াজড়ি করে ঘুমুচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে একটি স্টোভ, একখানি কাঠের টেবিল, একটি চেয়ার আর দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা একটি কাঠের টেবিল, একটি চেয়ার আর দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা একটি কাঠের বাক্স–তার মধ্যে কয়েকটি থালা বাসন রাখা হয়েছে। বরিনেজের আর -সব বাসিন্দাদের মতো এই ডেক্রুক-পরিবারেও একটি ছাগল ও কয়েকটি খরগোস আছে। এতে সময় সময় তাদের মাংস খাওয়া চলে। ছাগলটি শিশুদের খাটের তলায় ঘুমুচ্ছে। আর খরগোসগুলো স্টোভের পিছনে কিছু খড়কুটা আশ্রয় করে পড়ে আছে।

কারা এসেছে দেখবার জন্য মাদাম ডেক্রুক্ প্রথমে দরজার খানিকটা মাত্র খুললেন। তারপর তিনি আগন্তুক দুজনকে ঘরের ভেতর আসতে বললেন। বিয়ের বহু বৎসর আগে থেকেই তিনি ডেকরুকের সঙ্গে খনিতে একই কৌচে কাজ করে আসছেন। খনির ভিতরে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আর কয়লা কাটতে কাটতে তাঁর জীবনের যা কিছু রস নিংড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। একেবারে ছিবড়ের মতো হয়ে গিয়েছেন তিনি। এখনো তাঁর ছাব্বিশ বছর পার হয়নি–এরই মধ্যে জরা এসে তাকে জীর্ণশীর্ণ ও মলিন করে দিয়েছে।

ডেক্রুক স্টোভের পাশে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিলেন। জেক্স্‌কে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, উচ্ছাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি যে! কতদিন পর আজ তুমি আমার ঘরে এসেছ। বড় খুশি হলাম তোমাকে পেয়ে। তোমার বন্ধুকেও সাদরে আহ্বান করছি।

সারা 'বরিনেজে' ডেক্রুককই ছিল এক মাত্র লোক, কয়লার খনি যাকে মেরে ফেলতে পারেনি। এটা তার গর্বের বিষয়। তিনি প্রায় বলতেন, 'আমি এমনিতে মরব না। যখন বুড়ো হব, বিছানায় পড়ে মরব আমি। তারা আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না; তাদের আমি দেব না আমায় মেরে ফেলতে।'

তার মাথার ডান পাশে একটি বড়ো লাল চৌকুনা 'আব'–চুলের ফাঁকে ফাঁকে জানালার মতো সেটা উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। এর উৎপত্তির সঙ্গে এক দিনের একটা করুণ স্মৃতি জড়িত আছে। সেদিন যে-'খাঁচায়' করে তারা খনির নিচে নামছিল, সেটি সহসা খুলে গিয়ে একশো মিটার নিচে পড়ে গিয়েছিল। তাতে উনত্রিশ জন মজুর মারা যায়। মরেন নি কেবল ডেক্রুক। তাঁর একখানা পা চার জায়গাতে ভেঙে গিয়েছিল। এর জন্যে তাকে পাঁচদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়। আজও তাকে হাঁটবার সময়ে সেই পাখানা টেনে টেনে চলতে হয়। তার ডান পাশের বগলের নিচে গায়ের মোটা কালো সার্টটা উঁচু হয়ে থাকে–তারও এক ইতিহাস আছে। খনির মধ্যে একদিন একটি বাষ্পাধার ফেটে গিয়েছিল আর তার ফলে ডেক্রুক্ একটি কয়লার গাড়িতে ছিটকে পড়েছিলেন। তাতে তার পাঁজরের তিন জায়গা ভেঙে যায়। সেগুলো আর জোড়া লাগেনি। কিন্তু তিনি সংগ্রামী। লড়ায়ে মোরগের মতো যোদ্ধা তিনি। তাকে কোনো কিছুতে দমাতে পারেনি। কোম্পানির বিরুদ্ধে সব সময়ে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন একারণে তাকে সবচেয়ে খারাপ 'সীমে' কাজ করতে দেওয়া হয়েছে। তাতে কয়লা বের করা যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। তেমনি তার নিয়মও অত্যন্ত ক্লেশজনক। দিনের

পর দিন তিনি যেমন ক্লেশ বহন করে চলেছেন ফলশ্রুতিতে তাঁর জিহ্বা দিনের পর দিন অনল বর্ষণ করে চলেছে–তাঁদের বিরুদ্ধে–যাঁরা জানার বাইরে, দেখার বাইরে–অথচ শত্রুরূপে যাঁদের অপচ্ছায়া খনির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডেক্রুকের উঁচু থুতনির ঠিক মাঝখানে একটা টোল–কথা বলবার সময় মুখখানা দুদিকে বেঁকে যায়।

তিনি বললেন, 'মঁসিয়ে' ভ্যান গোঘ, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন। এই বরিনেজে আমরা যারা আছি–আমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসেরও তুলনা হয় না। আমরা তাদেরও নিচে। এখানে আমরা পশু হয়ে গিয়েছি। শেষ-রাত তিন-টায় উঠে আমরা মার্কাসি খনিতে নামতে যাই। খাওয়ার জন্য আমরা মাত্র পনেরো মিনিটের বিশ্রাম পাই। তারপর অবিশ্রাম খাটুনি চলতে থাকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। যেখানে আমরা কাজ করি, সে মশাই এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে সবকিছুই ঘোরতর কালো আর গরম। আমরা সেখানে খালি গায়ে কাজ করি। বাতাস সেখানে কয়লার গুঁড়ো আর বিষাক্ত বাষ্পে ভারী হয়ে থাকে। আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি না। সীম থেকে যখন কয়লা তুলি, সেখানে দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকে না। তখন হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়। একজনের স্থানটুকুতে দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে কাজ করতে হয়। আট ন বছর বয়স হতে না হতেই আমরা কাজে যাই। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেমে সেই কালো আঁধারের মধ্যে ডুবে থাকি। আমাদের বয়স যখন হয় কুড়ি বছর তখনই জ্বর আর ফুসফুসের রোগ এসে আমাদের কাবু করে ফেলে। যদি বিষাক্ত বাষ্পে দম আটকে না যায়, কিংবা কুঠরি খসে গিয়ে আমরা মাথা ভেঙে মারা না যাই (এই সময়ে তিনি মাথার লাল আবটাতে হাত বুলিয়ে নিলেন) তা হলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে যেতে পারি। তারপরে অবশ্য না খেয়ে মরতে হয়। কি বল ভার্নি, আমার কথা ঠিক তো?'

ডেক্রুক অতিশয় উত্তেজিত হয়েছিলেন। তাঁর কথায় দেশজ শব্দ এত বেশি এসে পড়ছিল যে, ভিনসেন্ট সব কথার অর্থই বুঝতে পারছিল না। তাঁর চোখ দুটি রাগে কালো হয়ে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিবুকের টোলটির জন্য মুখখানাকে বেশ হাসি-হাসি দেখাচ্ছিল।

জেক্স্ বললেন, 'হাঁ ডেকরুক, তুমি যা বললে, সব সত্যি।'

দূরে ঘরের কোনো বিছানা। মাদাম ডেকরুক সেখানে বসেছিলেন। কেরোসিন লণ্ঠনের অস্বচ্ছ আলোয় তাকে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। স্বামীর মুখে তিনি হাজারবার এসব কথা শুনেছেন। তবু আজও তিনি কথাগুলো কান পেতে শুনলেন। বহু বৎসর ধরে তিনি কয়লার গাড়ি ঠেলেছেন, তিনটি সন্তানকে পর পর গর্ভে ধরেছেন। তার উপর ক্যানভাসের বেড়া দেওয়া ঘরে বছরের পর বছর তীব্র শীতে ভুগেছেন–আজ তার মধ্যে বিদ্রোহের লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। ডেক্রুক তার খোঁড়া পা জেকস-এর দিক থেকে টেনে ভিনসেন্টের দিকে ঘুরোলেন।

'কিন্তু এত কষ্ট করেও আমরা কি পাচ্ছি, মঁসিয়ে? মাথা গুঁজবার একটা কুঠরি আর জীবনটা চালাবার জন্য যতটুকু খাদ্যের দরকার ঠিক ততটুকুই খাদ্য–এই তো পাচ্ছি। কি খাই আমরা? রুটি, টক পনীর, আর কালো কফি। আর হয়ত সারা বছরে একবার কি দুবার মাংস খেতে পাই। তারা যদি আমাদের মাইনে থেকে রোজ পঞ্চাশ 'সেন্টাইমস' কেটে নেয় তা হলে আমরা উপোস করে মরে যাব; তা হলে আমাদের

দিয়ে তাদের কয়লা খনি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের মজুরি তারা যে আরো কমাচ্ছে না, তার কারণ এই। আমরা মশাই একেবারে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। জীবনের প্রতিটি দিন আমাদের মৃত্যুর সীমায় ঠেলে নিয়ে চলেছে। যখন একটা কিছু অসুখবিসুখ করে, একটা কানাকড়িও তখন আমাদের দেওয়া হয় না। তখন আমরা মারা পড়ি। কুকুর যেভাবে মরে তেমনিভাবে আমরা মরে যাই। আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তখন প্রতিবেশীদের দেওয়া খাদ্যে জীবনধারণ করে। আট থেকে চল্লিশ–মোট এই বত্রিশ বছর আমরা কালো আঁধার গর্তে কাল কাটাই। তারপর ঐ পাহাড়ে উঠতে যে পথ দেখছেন, তারই পাশে একটা গর্তের ভেতর গিয়ে ঢুকি। সেখানে শুয়ে আমরা সব জ্বালা জুড়াই।'

১০.

খনি মজুরদের অবস্থা বুঝতে ভিনসেন্টের বিলম্ব হয় নি। তারা অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত। তাদের প্রায় সকলেই একেবারে নিরক্ষর। কিন্তু তবু তারা নির্বোধ নয়। তাদের কাজ কষ্টসাধ্য হলেও, তারা কাজে খুব চটপটে। তারা সাহসী, প্রাণখোলা এবং অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। জ্বরে ভুগে ভুগে শীর্ণ ও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। ক্লান্তিতে একবারে ভেঙে পড়েছে তারা। কেবল রবিবার ছাড়া সপ্তাহের ছ'টা দিন সূর্যালোকের সংস্পর্শে না থাকার দরুণ তাদের চামড়াতে ধোঁয়াটে বাদামি রঙ ধরেছে–কালো কালো অজস্র দাগ বসে গিয়েছে। কোটরে-ঢোকা চোখে বিষাদের কালিমা। সে চোখের মূক চাহনিতে যেন এই ভাষা লেখা রয়েছে : দেখ, আমরা মার খাই, কিন্তু মার দিতে পারি না; আমরা অত্যাচারিত।

লোকগুলোকে ভিনসেন্টের খুব ভাল লাগল। জুন্ডার্ট ও ইটেনের ব্রাবান্টদের মতই তারা সরল ও শান্ত। জায়গাটাতে মানুষ নেই বলে তার মনে যে ধারণা শিকড় গেড়েছিল, এরপর আর তা রইল না। বুঝতে পারল, মানুষ বলতে যা বোঝায় এখানে তার কমতি নেই।

জায়গাটা কয়েকদিন দেখাশোনার পর ভিনেসেন্ট ধর্মসভার ব্যবস্থা করল। ডেনিসদের রুটি বানাবার ঘরের পেছনে উঁচুনিচু খোলা জায়গাতে প্রথম সভার আয়োজন হলো। জায়গাটা সে নিজ হাতে পরিষ্কার করল। লোকের বসবার জন্য নিজে বয়ে এনে বেঞ্চি জড়ো করল। বিকেল পাঁচটার সময়ে খনি-মজুরেরা নিজ নিজ পরিবার নিয়ে সভায় এসে জমা হল। ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্য গলায় স্কার্ফ ও মাথায় ছোট টুপি। ভিনসেন্ট এক বাড়ি থেকে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প চেয়ে এনেছিল। সভাস্থলে একমাত্র সেইটাই আলোর কাজ করল। খনি-মজুররা আঁধারে বেঞ্চির উপরে বসেছে। ভিনসেন্ট বাইবেলের ওপর কেমন ঝুঁকে পড়েছে তারা তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে আর শীত বাঁচাবার জন্য দু'হাত বগলে পুরে মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনছে।

বক্তৃতার জন্য বাইবেলের কোন বাণীটা এখানে সবচাইতে মানানসই হবে–ভিনসেন্ট বাইবেল তোলপাড় করে সেটা খুঁজতে লাগল। শেষে গ্রন্থের 'এ্যাক্টস্' অর্থাৎ 'কর্মযোগ' শীর্ষক খণ্ডের ১৬-এ পরিচ্ছেদটি নির্বাচন করল, রাত্রিতে পলের কাছে কেমন একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হল; ম্যাসিডনিয়ার একটি লোক সেখানে এসে

দাঁড়িয়েছে, অনুনয় করে বলছে : 'আপনি ম্যাসিডনিয়াতে আসুন, এসে আমাদের সাহায্য করুন।'

তারপর ভিনসেন্ট বলতে লাগল, বন্ধুগণ, এই ম্যাসিডনিয়ার এক-একটি লোককে এক এক জন মজুর বলে মনে করতে হবে। যার মুখে পড়েছে দুঃখ ও যন্ত্রণার ছাপ–এমনি ধরনের মজুর। মনে করবেন না যে, তার চিত্তে ঐশ্বর্য নেই, কেননা, তার মধ্যে অবিনশ্বর আত্মা বর্তমান রয়েছে। সে যাতে ধ্বংস হতে না পারে তার জন্য চাই তার মনের খোরাক–ভগবানের বাণী। মানুষ খ্রিস্টের অনুসরণ করুক, সহজ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করুক, বড়ো বড়ো উচ্চাশা ছেড়ে দিয়ে সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক–ভগবান এই তো চান। ভগবানের বাণী থেকে লোক যেন নম্র ও সরলমনা হতে শেখে,–তা হলেই সে ঈশ্বরনির্দিষ্ট দিনে স্বর্গরাজ্যে গিয়ে শান্তিলাভ করতে পারবে।'

গ্রামে অনেক রোগী ছিল। ভিনসেন্ট চিকিৎসকের মতো প্রতিদিন তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। যখনই সুবিধা হত, একটু দুধ, দু একটা রুটি, গরম মোজা বা বিছানার চাদর রোগীদের বাড়ি দিয়ে আসত। পল্লীতে টাইফয়েড এবং একরকম সান্নিপাতিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। খনিমজুররা এর নাম দিয়েছিল 'la sotte fievre. এই জ্বর হলে রোগী দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠত আর সারাক্ষণ প্রলাপ বকত। এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মজুররা বিছানায় পড়ে ক্রমশ দুর্বল, জীর্ণশীর্ণ ও কঙ্কালসার হয়ে যেত। রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলত।

পেটিট ওয়াস্‌মেস গ্রামের সব লোক তাকে আদর করে মঁসিয়ে ভিনসেন্ট বলে ডাকত। তাদের এই ডাকে প্রীতির ভাব যেমন ছিল, তেমিন ছিল সম্ভ্রমের ভাব। গ্রামের প্রত্যেকটি কুটিরে সে মাধ্যমত খাদ্য দান করত এবং সান্ত্বনার বাণী শুনাতো; রোগীর শুশ্রূষা করত এবং সর্বহারাদের সঙ্গে গিয়ে প্রার্থনায় বসত–তাদের বেদনাদগ্ধ প্রাণে বহিয়ে দিত ভগবৎ-আলোকের মন্দাকিনীধারা। বস্তুত সারা পল্লীতে এমন একটি কুটির ছিল না যেখানে তার সেবাযত্নের কল্যাণস্পর্শ না লেগেছিল। খৃস্টমাস উৎসবের কয়েকদিন আগে মার্কাসির কাছে একটা পরিত্যক্ত আস্তাবল পাওয়া গেল। স্থানটা বেশ প্রশস্ত–শতাধিক লোক অক্লেশে বসতে পারবে। স্থানটি এমনি অনুর্বর যে একটি দূর্বাঘাস পর্যন্ত গজায় না; উপরন্তু জায়গাটা অত্যন্ত ঠান্ডা। সেখানে মানুষের বসতি নেই। এসব সত্ত্বেও সেদিন পেটিট ওয়াসমেসের এত লোক সেখানে সমবেত হয়েছিল যে, তিল ধারণের জায়গা পর্যন্ত ছিল না। ভিনসেন্টের কাছ থেকে সেদিন তারা বেথেলহেমের গল্প শুনল–পৃথিবীতে কি করে শান্তি নেমে এসেছিল তার কাহিনী শুনল।

মাত্র দু'সপ্তাহ হল ভিনসেন্ট 'বরিনেজে' এসেছে। এরই মধ্যে সে লক্ষ্য করেছে যে, দিনের পর দিন লোকের অবস্থা এখানে কেবল খারাপের দিকেই চলেছে–লোকের দুঃখ দুর্দশা নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু তবু সাধারণ একটি আস্তাবলের ভেতর, কয়েকটা ছোট কেরোসিন ল্যাম্পের ধোঁয়াটে আলোয় এইসব দুঃখস্নাত মানবসন্ততির মাঝে ভিনসেন্ট যেন যীশু খৃস্টকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে–সে যেন লোকগুলোর অন্তরলোককে ধরাতলে স্বর্গরাজ্য নেমে আসার আশ্বাসে উদ্দীপিত করতে পেরেছে।

একটিমাত্র কাঁটা তাঁর জীবন-পথে আজও অবশিস্ট রয়েছে। সেটা তাকে অনবরতই খোঁচা দেয় : এখনও তাকে পিতাই ভরণ-পোষণ করে চলেছেন। প্রত্যেক রাত্রে প্রার্থনা করে সে, ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে জানায়, ভগবান, এমন দিন আমার কবে আসবে যেদিন আমি দুটো খাওয়া-পরার জন্য সামান্য কয়েকটা ফ্রাঙ্ক রোজগার করতে পারব। আমার প্রয়োজন অতি অল্প। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য কবে তুমি আমাকে অন্যের গলগ্রহ হওয়ার দায় থেকে মুক্ত করবে।

আবহাওয়া বড়ই খারাপ। রাশি রাশি কালো মেঘ সমস্ত আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে। জোরে জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট জলে কাদায় অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছে। মজুরদের বস্তির মেটে মেঝেগুলো একেবারে কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। বছরের নতুন দিনে জিন্‌ব্যাপটিস্ট ডেনিস ওয়াসমেসে গিয়ে ভিনসেন্টের একখানি চিঠি নিয়ে এসেছেন। খামের বাম দিকের ওপরের কোণে রেভারেন্ড পিটারসনের নাম। উত্তেজনায় ভিনসেন্টের দেহ কাঁপছে। চিঠিখানা হাতে করে প্রায় দৌড়ে গিয়ে সে ঘরে ঢুকল। বৃষ্টিতে ঘরের খানিকটা জায়গা ক্ষয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করল না। এলোমেলো আঙুল চালিয়ে খামখানা ছিঁড়ল। তারপর এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পড়ে ফেলল :

প্রিয় ভিনসেন্ট,

তোমার কাজ খুব চমৎকার হচ্ছে। ধর্মপ্রচার সমিতি তোমার কাজের কথা শুনেছেন। তাঁরা তোমাকে নতুন বৎসরের প্রথম দিন থেকে ছয় মাসের জন্য সাময়িকভাবে কাজে বহাল করছেন।

জুন মাসটা যদি ভালয় ভালয় কেটে যায় তা হলে তোমার চাকুরি স্থায়ী হয়ে যাবে। এখন থেকে তোমাকে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে মাইনে দেওয়া হবে।

মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখো। সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চলবে।

প্রীতার্থী—পিটারসেন

পত্রখানা হাতের মুঠায় চেপে সে আনন্দের আতিশয্যে বিছানায় পড়ে গড়াগাড়ি দিতে লাগল। অবশেষে তারও জীবনে সাফল্য এসেছে। জীবন দিয়ে যে-কাজ সে করতে চেয়েছিল, আজ সে-কাজ তার করতলগত হয়েছে। ওইটুকুই সে সারাক্ষণ কামনা করে এসেছিল। এতদিন তা সে সোজাসুজি চাইতে পারে নি। চাওয়ার ক্ষমতা ও সাহস হয় নি বলে। আজ থেকে সে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে মাইনে পাবে। থাকা খাওয়ার খরচ হিসেবে ওই টাকাই যথেষ্ট। এখন থেকে তাকে আর কারো গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না।

সে টেবিলে গিয়ে বসল। উল্লাসের সঙ্গে বিজয়গর্বে তার পিতাকে একটি চিঠি লিখলো। তাঁকে জানিয়ে দিল তাঁর আর তাকে সাহায্য করতে হবে না এবং তার দরুণ এতদিন যে টাকা খরচা হয়েছে সেটা বেঁচে গিয়ে পরিবারের আয় বৃদ্ধি হবে। লেখা যখন শেষ হল, বাইরে তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। দূরে, মার্কাসি খনির ওদিকটায় ঘন

ঘন বাজ পড়ছে ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে রান্নাঘর পেরিয়ে নিচে নেমে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরের বৃষ্টির মতোই তার মনের আনন্দও উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

মাদাম ডেনিস তার পিছু পিছু দৌড়ে এসে ডাকলেন, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, কোথায় যাচ্ছ তুমি। কোট না নিয়ে টুপি না নিয়ে এমনভাবে বেরুচ্ছ কোথায়?'

ভিনসেন্ট শুনলই না, কোনো উত্তরও দিল না। ছুটতে ছুটতে সে একটা টিলার ওপর উঠল। সেখান থেকে বরিনেজের অনেকটা জায়গা সে দেখতে পেল। খনির বড় বড় চিমনি, কয়লার বড় বড় স্তূপ, মজুরদের ছোট ছোট কুঁড়ে সব কিছুই তার চোখে পড়ল। আরো দেখতে পেল, কালো একটা বাসার ভেতর থেকে পিঁপড়েরা যেমন বেরোয়–কালো পাতাল থেকে তেমনিভাবে পিল পিল করে বেরোচ্ছে ওরা। এইমাত্র ওদের ছুটি হয়েছে। দূরে দেখা যাচ্ছে কালো পাইন-বন, ছোট ছোট কুটিরগুলোকে যেন তারই গায়ে এঁটে দিয়েছে। আরো দূরে একটা গীর্জার লম্বা চূড়া আর একটা পুরোনো মিল্ চোখে পড়ছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা ঝাপ্‌সা আবরণে মোড়া। মেঘের ছায়া থেকে একটি আলো-আঁধারি মায়া যেন জেগে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য তাকে মাইকেলের ও রাইসডেলের ছবির কথা মনে করিয়ে দিল। বরিনেজে আসার পর ছবির কথা আজ এই প্রথম তার মনে পড়ল।

১১.

সমিতির অনুমোদন পেয়ে ভিনসেন্টের ধর্মপ্রচারকের পদ এখন পাকা হয়েছে। এখন তার প্রতিদিন সভা করার জন্য একটা স্থায়ী জায়গা দরকার। অনেক খুঁজে পেতে খাদের একেবারে নিচের দিকে, পাইনবনের মধ্যদিয়ে যে ছোট পথ গিয়েছে তারই উপরে বেশ বড়ো একটা ঘর পাওয়া গেল। ঘরটার নাম ছিল 'সিলোন দু বেবি', এখানে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে একদিন নাচ শেখানো হত। ভিনসেন্ট দুপুরের পর পাড়ার চার থেকে আট বছরের ছেলেমেয়েদের এখানে জড়ো করত। তাদের সে বর্ণপরিচয় শেখাত আর বাইবেলের ছোট ছোট গল্প শোনাত। এসব ছেলেমেয়ের অনেকেই এর আগে কখনো লেখাপড়ার সংস্রবে আসে নি। ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশও তাদের জীবনে এই প্রথম।

ভিনসেন্ট ঘরখানা প্রধানত জেক্‌স ভার্নির সাহায্যে জোগাড় করতে পেরেছিল। একদিন জেক্‌স ভার্নিকে সে বলল, 'ঘরখানা গরমে রাখা দরকার। তার জন্য কয়লা চাই। কয়লা কোথায় পাই বলুন ত? ছেলেদের তো গরমের মধ্যে রাখতে হবে। তা ছাড়া, স্টোভ জ্বালিয়ে রাখতে পারলে রাত্রির সভাও একটু বেশিক্ষণ ধরে চালানো যেতে পারে।'

জেকস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'কাল দুপুরে এখানে আসবেন। আমি বলে দেব।'

পরের দিন 'সেলোনে' এসে ভিনসেন্ট দেখতে পেল, একদল স্ত্রীলোক সেখানে তারই অপেক্ষায় বসে আছে। তারা খনিমজুরদের স্ত্রী ও কন্যা। পরনে কালো ব্লাউজ এবং লম্বা কালো স্কার্ট; মাথায় নীল রুমাল বাঁধা। তার সকলেই এক একটা থলে নিয়ে এসেছে।

ভার্নির ছোট মেয়েটি বলল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, দেখুন আমি আপনার জন্যও একটা থলে এনেছি, এতে আপনাকেও কিন্তু কয়লা ভরতে হবে।'

মজুরদের কুঁড়েঘরের কানাচ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। সেই সব পথ দিয়ে তারা ওপরে উঠতে লাগল। টিলার উপরে ডেনিস পরিবারের রুটির কারখানা অতিক্রম করল। যে মাঠের মাঝখানে মার্কাসি খনি রয়েছে, সেই মাঠে পা দিল। তারপর কারখানা ঘরগুলোর প্রাচীর ঘেঁসে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে একেবারে পিছনের সেই কালো পিরামিড স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দল ভেঙে দিয়ে তারা পৃথক পৃথক হয়ে গেল। তারপর এক একজন এক এক দিক থেকে স্তূপ আক্রমণ করল। ছোট ছোট পোকা মড়া কাঠের গুড়িকে যেভাবে ছেয়ে ফেলে, তারাও তেমনিভাবে স্তূপটাকে দখল করে নিল। থলে হাতে করে প্রত্যেকেই চার দিক দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

মাদমোয়াজেল ভার্নি বললে, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, আপনাকে একেবারে ওপরে যেতে হবে। এর আগে আপনি কয়লা পাবেন না কেননা, বছরের পর বছর আমরা নিচে থেকে কয়লা কুঁড়িয়ে নিয়ে খালি করে দিয়েছি। চলে আসুন আপনি ওপরে। এর মধ্যে কয়লা কোনটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সে ছাগলছানার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু ভিনসেন্টকে বেশির ভাগ উঠতে হল হামাগুড়ি দিয়ে। কারণ, তার পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার দরুণ সে খাড়া থাকতে পারছিল না।

মাদমোয়াজেল ভার্নি আগে আগে চলেছে। মাঝে মাঝে হাঁটু গেড়ে বসে দলাবাঁধা কাদার মতো কি তুলছে। হাতে নিয়ে সেটা পরীক্ষা করছে। তারপর ভিনসেন্টের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বেশ চটপটে চালাক চতুর মেয়ে দেখতে বেশ সুন্দরী। ভার্নি যখন ফোরম্যান হয়, মেয়েটি তখন সাত বছরের। সে কখনো খনিতে যায় নি, কাজেই খনির ভিতরের হাল অবস্থা সে কখনো চোখে দেখেনি।

সে চিৎকার করে ডাকল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, উপরে উঠে আসুন। উপরে না এলে ভালো কয়লা পাবেন না। সবারই থলে ভরা হয়ে যাচ্ছে। আপনি পিছিয়ে পড়ছেন। উপরে উঠে আসুন।' তার কয়লা কুড়ানো একটা খেলা মাত্র প্রয়োজন নয়। কেননা ভার্নি খুব কম দামে কোম্পানি থেকে কয়লা কিনতে পায়।

একেবারে উপরে যাওয়া তাদের হয়ে উঠল না। কেননা, খনি থেকে ছোট ছোট গাড়ি ভরতি করে এনে ওপরে থেকে আবর্জনা ঢালা হচ্ছে। আগে এক পাশে ঢালা হয়ে গেলে, তারপর আর এক পাশে ঢালছে—রোজ যেমন ঢালা হয়। এই অত্যুচ্চ পিরামিড থেকে কয়লা বেছে বের করা, কাজটা বড়ো সহজ নয়। মাদমোয়াজেল ভার্নি তাকে দেখিয়ে দিল, এইভাবে এক একটা দলা হাতে নিয়ে আঙুল ফাঁক করে হাতখানা ছড়িয়ে ধরতে হবে, তাতে কাদা, পাথরের কুচি, মাটি—সব বাজে জিনিস আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবে। হাতে কেবল কয়লা থেকে যাবে। এখানে আবর্জনার সঙ্গে কোম্পানির যে কয়লা নষ্ট হয় তা অতি সামান্য। তা আবার ঠিক কয়লাও নয়। মজুরদের বউ ঝিরা এখানে যা কুড়োয়, তা একরকমের দলাবাঁধা পাথরের কুচি। কয়লার বাজারে এ জিনিস কেউ কেনে না। বৃষ্টি ও বরফ পড়ে টিলার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। ভিনসেন্টের হাত দুটি এরই মধ্যে কেটে আঁছড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। কয়লা মনে করে নানা পদার্থ দিয়ে

থলির সিকি অংশ মাত্র সে ভরতে পারল। মেয়েরা কিন্তু ততক্ষণে তাদের থলে প্রায় পুরো করে এনেছে।

মেয়েরা যার যার থলে 'সেলোনে' রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল। সংসারের কাজ করতে হবে। কিন্তু যাবার আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল রাতে লোকজন নিয়ে তারা ধর্মসভাতে অবশ্যই যোগ দেবে। মাদমোয়াজেল ভার্নি তাদের বাড়িতে খাবার জন্য ভিনসেন্টকে নিমন্ত্রণ করলে ভিনসেন্ট তা সানন্দে গ্রহণ করল। ভার্নির বাড়িতে ঘর দুখানা। একখানাতে স্টোভ, রান্নার জিনিসপত্র ইত্যাদি। অন্য ঘরখানা তাদের শোবার ঘর। ভার্নির অবস্থা ভাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঘরে একখানা সাবান নেই। এর কারণ, ভিনসেন্ট শুনেছে, বরিনেজের বাসিন্দাদের পক্ষে সাবান ব্যবহার একটা অসম্ভব বিলাসিতা। যেদিন থেকে এখানে বালকেরা কয়লার খনিতে নামে এবং বালিকারা টিলার কয়লা কুড়োতে যায় সেদিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বরিনেজবাসীদের হাতে মুখে কয়লা। এ কয়লা থেকে তারা সারা জীবনে কখনো মুক্ত হতে পারে না।

মাদমোয়াজেল ভার্নি ভিনসেন্টের জন্য এক কড়া ঠাণ্ডা জল এনে রাস্তার পাশে রেখে দিল। ভিনসেন্ট প্রাণপণে সারা দেহ রগড়াতে লাগল। তাতে কয়লার কালি কতখানি উঠেছে জানতে পারেনি। কিন্তু যখন মেয়েটির সামনে গিয়ে বসল এবং দেখল, তার মুখে এখনো কালো কালো দাগ লেগে রয়েছে–ধোঁয়ার কালিমা এখনো মুখ থেকে যায়নি, তখন সে বুঝতে পারল তার নিজের মুখখানাও নিশ্চয় ওই রকমই দেখাচ্ছে। খেতে বসে মাদমোয়াজেল ভার্নি অনেক রকম গল্প করল।

জেক্স বলল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, আপনি পেটিট ওয়াসমেসে এসেছেনে আজ দুমাস। তবু এখনো আপনি বরিনেজকে ঠিক ঠিক জানতে পারেন নি।'

ভিনসেন্ট বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মঁসিয়ে ভার্নি, একথা ঠিক। তবে আমার মনে হয়, এখানকার লোকদের সম্বন্ধে অল্পে অল্পে আমার ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে। আমি তাদের কিছু কিছু করে বুঝতে পারছি।'

জেক্স নাকের ভিতর থেকে লম্বা একটি লোম টেনে বের করে মনোযোগের সঙ্গে সেটা দেখতে দেখতে বলল, 'আমি তা বলছি না। আমি বলছি, আপনি কেবল আমাদের মাটির ওপরের যে জীবনযাত্রা সেটাই দেখেছেন। কিন্তু সেটা মোটেই আমাদের জীবন নয়। মাটির ওপরে আমরা কেবল ঘুমোতে আসি। আমাদের জীবনটা আসলে কি, তা যদি জানতে চান, আপনাকে খনিতে নামতে হবে। নেমে দেখতে হবে, ভোর থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আমরা কিভাবে সেখানে কাজ করি?।'

ভিনসেন্ট বলল, 'খনিতে নামতে আমারও খুব ইচ্ছে। কিন্তু কোম্পানি আমাকে অনুমতি দেবে কি?'

জেক্স একখামচা চিনি মুখে পুরে তার সঙ্গে সঙ্গে কালো তেতো কফি ঢেলে ঢোক গিলতে গিলতে বলল, 'আপনার জন্য আমি অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছি। খনি নিরাপদ আছে কিনা, দেখবার জন্য কাল আমি ও মার্কাসি খনিতে নামব। ভোরে আপনি ডেনিসদের বাড়ির সামনে তিনটা বাজতে পনেরো মিনিট আগে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।'

জেক্‌স পরিবারের সবাই সেদিন ভিনসেন্টের সঙ্গে 'সেলোনে' গেল। কিন্তু যে জেক্‌স্‌কে তার গৃহের উষ্ণতায় এত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাকেই রাস্তায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কাশির ধাক্কায় এলিয়ে পড়তে দেখা গেল। তাকে মাঝ রাস্তা থেকেই বাড়ি ফিরে যেতে হল। ভিনসেন্ট 'সেলোনে' এসে দেখল, হেনরি ডেকরুক খোঁড়া পা টেনে টেনে আগে থেকেই হাজির। সে তখন স্টোভ জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

ভিনসেন্টকে দেখে তার বিস্ফারিত মুখ থেকে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে বলল, 'আসুন মঁসিয়ে ভিনসেন্ট। এই স্টোভটা আমি ছাড়া সারা ওয়াসমেসে আর কেউ ধরাতে পারে না। আমি এর নাড়ী-নক্ষত্র জানি। আগেকার দিনে এখানে আমরা যখন পার্টি দিতাম, সেই থেকে এর সঙ্গে আমার পরিচয়। স্টোভটা বেয়াড়া। কিন্তু আমার হাতে এর নিস্তার নেই। এর অন্ধিসন্ধি সব আমার জানা।'

মেয়েরা থলেয় করে যা দিয়ে গিয়েছে, তা জবজবে ভিজে—তার মধ্যে কয়লার পরিমাণ অতি কম। কিন্তু ডেক্‌রুক তাই দিয়েই স্টোভটা গরম করে ফেলল। স্টৌভ ধরিয়ে সে যখন খোঁড়া পা নিয়ে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিল তার মাথার আবে তখন রক্ত জমে তার শাদা চামড়া লাল করে তুলছিল।

ভিনসেন্টের এই নতুন গীর্জার প্রথম বক্তৃতা শুনবার জন্য সে-রাতে পেটিট ওয়াসমেসে প্রতিটি মজুর পরিবার এসে 'সেলোনে' জমা হয়েছিল। বেঞ্চিগুলো ভরে গেলে পর কাছাকাছি যাদের বাড়ি, তারা বাড়ি থেকে বাক্স ও চেয়ার বয়ে নিয়ে এসে তার উপরে বসল। তিনশ'র ওপর লোক সেদিন ভিড় করেছিল। ভিনসেন্টের মন সেদিন কতকগুলো কারণে আনন্দে একেবারে কানায় কানায় ভরা ছিল। মজুরের বউ ঝিরা সেদিন আপনা থেকে সহৃদয়তা দেখিয়ে গিয়েছে; অযাচিতভাবে তাকে কয়লা কুড়িয়ে সাহায্য করেছে; তারপর সে আজ তার নিজের মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে মনের কথা বলতে পারবে; তাতে 'বরিনেজ'-বাসীদের মুখ থেকে বিষাদের মালিন্য দূর হয়ে সে মুখ আশায় আনন্দে ও আশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শ্রোতাদের সম্বোধন করে ভিনসেন্ট বলতে লাগল, 'একটা পুরোনো বিশ্বাস আমাদের মধ্যে চলে আসছে; তা এই : সংসারে আমরা অপরিচিতরূপে জন্ম নিই। তবু আমরা নিঃসঙ্গ নই। কেননা, পিতা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা তীর্থযাত্রী। আমাদের জীবন একটি সুদীর্ঘ যাত্রাপথ—সে-পথ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত।

'আনন্দের চেয়ে দুঃখ ভালো; আর পুলকের প্রাচুর্যের মধ্যেও হৃদয় থাকে বিষাদমগ্ন। উৎসবের ঘরে যাওয়ার চেয়ে শোকের ঘরে যাওয়া অনেক ভাল, কারণ বিষাদের স্পর্শে হৃদয় নির্মল ও উন্নত হয়।

'যীশুকে যারা বিশ্বাস করে, দুঃখের মধ্যেও তারা নিরাশ হয় না। তাদের সকল বেদনাকে ধন্য করে আশার আলো ফুটে ওঠে। তারা যতবার দুঃখের দহনে জ্বলবে, ততবার তারা অন্ধকার থেকে আলোকের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে।

'পিতা, আমাদের অসত্যের কাছ থেকে দূরে রাখ, তোমার কাছে এই প্রার্থনা। তোমার কাছে আমরা দারিদ্র্যও চাই না, ধনও চাই না; জীবনযাপনের উপযোগী অন্নবস্ত্র পেলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব।'

সকলের আগে মাদাম ডেক্‌রুক তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে আবেশ; মুখের একটা কোণ বার বার কাঁপছে। সে বলল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, জীবনে দুঃখের

বোঝা বইতে বইতে আমি ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিলাম। আপনার দ্বারা সেই হারানো বিশ্বাস ফিরে পেলাম। এজন্য আপনাকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানাই।'

সকলে চলে যাবার পর ভিনসেন্ট 'সেলোন' ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ডেনিসের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। আর প্রতি লোকের আজ যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাতে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে, বরিনেজবাসীরা তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে এবং ঈশ্বরের বাণীপ্রচারকরূপে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাদের এ পরিবর্তন কিসে হল? সে এখানে নতুন একটা গীর্জা করেছে বলে? তা নয়; খনিমজুরদের কাছে গীর্জা হওয়া না হওয়া সমান। সমিতি যে তাকে প্রচারকের নিয়োগপত্র দিয়েছে তা তারা জানে না, কেননা তাকে যে নিয়োগপত্র না দিয়েই পাঠানো হয়েছিল, একথা তো সে গোড়ায় তাদের কাছে বলেনি। তার আজকের বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ কয়দিন সে ভাঙা কুঁড়ো বা খারি আস্তাবলে যেসব বক্তৃতা দিয়েছে, সেগুলোও তো কম মর্মস্পর্শী হয়নি।

ডেনিসরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেকারির পাশেই তাদের শোবার ঘর। বেকারি থেকে রুটির তাজা মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। রান্নাঘরের কাছ ঘেঁষে একটি ছোট কুয়ো। ভিনসেন্ট তার থেকে এক বালতি জল তুলে ওপরে এসে সাবান ও আয়না নিয়ে বসল। আয়নাটা দেয়ালে কাত করে লাগিয়ে নিজের মুখ দেখল। তার অনুমান ঠিক। ভার্নিদের বাড়িতে ধুয়ে মুছেও মুখ থেকে কয়লার দাগ তুলতে পারেনি। তার চোখের পাতা, চোয়াল এখনো কালো হয়ে আছে। সারা মুখে কালির ছোপ নিয়েই সে আজ নতুন মন্দিরে উপাসনা করে এসেছে। একথা ভেবে তার হাসি পেল। তার বাপ ও খুড়ো স্ট্রিকার তাকে আজ এ অবস্থায় দেখলে কেমন আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

সে ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে সাবান ঘষে ফেনা বের করে মুখে মাখতে যাবে, এমন সময় তার কি একটি কথা মনে পড়ে গেল, ভিজে হাত মাঝপথে থেমে রইল তার। আবার সে আয়নার মধ্যে তাকাল। দেখল, স্তূপের সেই কালো কয়লার গুঁড়ো তার কপালের রেখায় রেখায়, চোখের পাতাগুলোতে দুটি গালের নিচে, আর গোল চিবুকের সবটাতে দাগ বসিয়ে দিয়েছে।

সে জোরে বলে উঠল, 'এতক্ষণে বুঝলাম, তারা কেন আমাকে আপন মনে করেছে। শেষকালে সত্যি আমি তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছি।'

হাত দুটি জলে চুবিয়ে মুছে ফেলল। সে হাত আর মুখে লাগাল না। এর পর থেকে যতদিন সে 'বরিনেজ' এ ছিল, প্রতিদিন মুখে কয়লার গুঁড়ো ঘষত, যাতে আর দশজনের থেকে সে আলাদা না হয়ে যায়; তাকে যেন লোকে নিজেদের সঙ্গে এক করে নিতে পারে।

১২.

পর দিন শেষরাতে ভিনসেন্ট আড়াইটার সময় ঘুম থেকে উঠে ডেনিসদের রান্নাঘরে বসে একটুকরো শুকনো রুটি খেয়ে বেরুল। তারপর দরজাতে যখন জেক্স-এর সঙ্গে তার দেখা হল, তখন পৌনে তিনটে বাজে। রাতে খুব বরফ পড়েছে। মার্কাসি যাওয়ার পথ বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দুজনে ময়দানে নেমে খনির কালো

চিমনি ও স্তূপ লক্ষ্য করে চলতে লাগল। ভিনসেন্ট দূর থেকেই দেখতে পেল খনি-মজুররা বরফের উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছে। অসংখ্য জীব। যেমনি কালো তেমনি ছোট দেখাচ্ছে। একই বাসায় ঢোকবার জন্যে চারদিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে আসছে। ভয়ানক ঠাণ্ডা : মজুররা গায়ের পাতলা কালো কোট চিবুক পর্যন্ত টেনে দিয়েছে। গরমের আশায় দুটি কাঁধ ভিতরের দিকে কুঁচকানো।

জেক্‌স তাকে প্রথমে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে তাকের উপর অনেকগুলো কেরোসিনের বাতি ঝোলানো। এক একটা নম্বরের নিচে এক একটা বাতি ঝুলছে। জেক্‌স বলল, 'এখান থেকে এক একটা বাতি নিয়ে মজুরদল নিচে নামে। নিচে যখন কোন দুর্ঘটনা হয়, এখানকার নম্বর দেখে আমরা বলতে পারি কারা বিপদে পড়েছে।'

মজুররা ক্ষিপ্র হাতে বাতি তুলে নিয়ে বরফ-ঢাকা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একটা ইঁটের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে নিচে নামতে হয়। ভিনসেন্ট ও জেক্‌স মজুরদের দলে ভিড়ে গেল। যে 'খাঁচায়' করে নিচে নামতে হয়, তাতে উপরি উপরি ছ'টা কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরিতে একটা করে কয়লার 'ট্রাক' খনি থেকে উপরে তোলা যায়। একটা কুঠরিতে হাঁটু ভেঙে বসলেও মাত্র দুজন মজুর বসতে পারে। কিন্তু সে জায়গাতে পাঁচজনে বসে এক গাদা কয়লার মতোই ঠেসাঠেসি করে তারা নিচে নামতে থাকে।

জেক্‌স একজন ফোরম্যান বলে, সে ভিনসেন্ট ও একজন সহকারী—মাত্র এই তিনজনে ওপরের কুঠরিটা দখল করল। হাঁটু ভেঙে উবু হয়ে বসল তারা। দু'পায়ের আঙুলে দুপাশ থেকে চাপ পড়ছে। উপরে তারের ঘের দেওয়া। মাথা ঠুকে আছে সেখানে।

জেকস বলল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, হাত দুটি সোজা করে সামনের দিকে রাখবেন। হাত যেন দেওয়ালে না লাগে। লাগলে তক্ষুণি সে হাত চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।'

একটি সঙ্কেত হওয়া মাত্রই খাঁচা'টা দুখানা ইস্পাতের ঠেকনায় ভর করে তীরের বেগে নিচে নামতে লাগল। যে পথ দিয়ে খাঁচা নামছে, তার পরিসর খাঁচার আয়তন থেকে আধ ইঞ্চির বেশি বড় নয়।

আধ মাইল নিচে এক পাতাল-পুরী। কালি ঢালা আঁধারে ঢাকা তার পথ। কিছু একটা যদি ঘটে যায়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চিত। এই কথা ভেবে ভিনসেন্ট ভয়ে কেঁপে উঠল। এই কালো গর্তের মধ্যদিয়ে এক অজানা, অচেনা অতল আঁধারের বুকে ছুটে চলেছে। তার মনে এক অজানা আতঙ্ক। তাতে তার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। তবে সে বুঝতে পারল ভয়ের তেমন কারণ নেই, কেননা এই নামার পথে গত দুমাস থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। তাই তেমন ভয় নেই। কিন্তু ভিতরের কেরোসিনের বাতিটা কাঁপছে। তার দিকে তাকালে মনে হয়, তেমন ভরসাও নেই।

তার ভয়ের কথা জেকস্‌কে জানালো। জেকস কেবল সহানুভূতির ভঙিতে একটু হাসল। বলল, 'এমন ভয় প্রত্যেক মজুরেরই হয়ে থাকে।

'কিন্তু তারা রোজ রোজ নিচে নামে। এ ভয় তাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে।'

'না, হয় নি। এক দুর্জয় আতঙ্কের ভাব সব সময়ে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। এই খাঁচার ভয়' তাদের মরণের দিন পর্যন্ত ছায়ার মতো অনুসরণ করে।'

'আচ্ছা মশাই, আপনার নিজের কেমন লাগছে বলুন তো?'

'আপনি যেমন ভিতরে ভিতরে কাঁপছেন, তেমনি আমিও কাঁপছি। আমি তেত্রিশ বছর ধরে খনিতে নেমে আসছি। তবু কাঁপছি।'

সাড়ে তিনশ' মিটার বা অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর খাঁচা এক মুহূর্ত থামল। তারপর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার নিচে নামতে লাগল। গর্তের চারপাশ থেকে স্রোতের মতো জল বেরুচ্ছে। দেখে ভিনসেন্ট আবার ভয়ে কেঁপে উঠল। উপরের দিকে তাকিয়ে এককণা দিনের আলো দেখতে পেল—আকাশের একটা তারা দেখতে যতটুকু, ঠিক ততটুকু। সাড়ে ছ'শ মিটার যাওয়ার পর তারা বেরুলো। কিন্তু মজুররা বেরুলো না। তারা আরো নেমে চলল। ভিনসেন্টরা যেখানে নামল সেটা একদিক খোলা একটা প্রশস্ত গহ্বর। কয়লার পাথর আর কাদামাটি কেটে কেটে পথ করা হয়েছে। ভিনসেন্ট ভেবেছিল একটা গরম নরককুণ্ডে বুঝি সে ডুবে যাবে। কিন্তু না, তার অনুমান ঠিক নয়। ঢুকবার রাস্তাটাই খুব ঠাণ্ডা।

তার খুশি উপ্‌ছে উঠল : 'ও মশাই ভার্নি, এ তো খুব ভালো জায়গা। খারাপ কিসে শুনি?'

না, খারাপ নয়। কিন্তু এই স্তরে মজুরেরা কাজ করে না তো। এই স্তরের কয়লা অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে আমরা উপর থেকে হাওয়া পাচ্ছি। মজুরেরা কাজ করে নিচে। এ হাওয়া তাদের কোন কাজে আসে না।'

গহ্বরের ভিতর দিয়ে তারা হেঁটে চলল। প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর জেকস মোড় ঘুরল। বলল, 'আমার পিছু পিছু আসুন মঁসিয়ে ভিনসেন্ট। জানেন, বিপদ এখানে হাত ধরাধরি করে চলে : আপনি যদি পা ফসকে পড়ে যান, তাতে কেবল আপনিই মারা যাবেন না, আমরাও মারা যাব।'

ভিনসেন্টের চোখের সামনেই জেকস অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিনসেন্ট পা টিপে টিপে সামনে এগুতে গিয়ে মাটিতে একটা গর্তের মতো পথ পেয়ে গেল। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে ধরবার মই পেল। গর্তটা যে রকম প্রশস্ত, তাতে একটা কৃশ লোক অনায়াসে তার মধ্যদিয়ে হেঁটে যেতে পারে। প্রথম পাঁচ মিটার যেতে তেমন কষ্ট হয় নি। কিন্তু অর্ধেক রাস্তার পর যে চিহ্ন দেওয়া আছে, তার ওপারে পা দিয়েই হঠাৎ পিছন দিকে ঘুরতে হল। এখান থেকে উল্টো দিক দিয়ে নামতে হবে। পাথর চুঁইয়ে ঝিরঝির করে জল পড়তে শুরু করেছে। মইয়ের জোড়াগুলো কাদায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ওপর থেকে চোঁয়ানো জল ভিনসেন্টের গায়ের উপরেও পড়ছে।

অবশেষে তারা একেবারে একতলায় পৌছাল। একটা লম্বা পথ যেতে হল হামাগুড়ি দিয়ে। মালপত্র রাখার একটা কুঠরি আছে। পথটা সেখান পর্যন্ত। বেরোবার রাস্তা থেকে কুঠরিটার দূরত্বই সবচেয়ে বেশি। সারি সারি অনেকগুলো 'সেল'। গম্বুজের গায়ে যেমন ভাগ করা থাকে সেইরকম। মোটা মোটা কাঠের ঠেকনা দিয়ে ঠেকানো। প্রতি 'সেলে' পাঁচজন মজুর কাজ করছে। দু'জন শাবল দিয়ে কয়লা খুঁজছে। আরেকজন তাদের পায়ের কাছ থেকে কয়লা টেনে সরাচ্ছে; চতুর্থ ব্যক্তি সেইসব কয়লা ছোটো ছোটো গাড়িতে ভরতি করছে; পঞ্চম একটা সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

যেদু'জন শাবল চালাচ্ছে, তাদের গায়ে মোটা সুতি পোষাক। ময়লা আর কালো। যারা কয়লা জড়ো করছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হয় অল্পবয়সী তরুণ। তাদের কোমরে কেবল এক চিলতে কাপড় জড়ানো। এছাড়া সারা গা একেবারে খালি। আর তিন ফুট বেরোবার পথ গাড়ি ঠেলে পার করে দেয় যে, সে মেয়ে। সব ক্ষেত্রেই একাজ মেয়েরাই করে। তারাও পুরুষের মতোই কালো। একটা মোটা কাপড়ে তার দেহের উপরাংশ ঢাকা। 'সেলে'র ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। জলের ফোঁটাগুলো ঝুলছে। দেখে মনে হয়, গুহার গায়ে রূপার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। আলো বলতে কেবল ছোট লণ্ঠনের আলো; তাও তেল বাঁচাবার জন্য সলতে কমিয়ে রাখা হয়েছে। বায়ু চলাচলের পথ নেই। কয়লার গুঁড়োতে হাওয়া ভারী হয়ে আছে। মাটির ভেতর আপনা থেকে যে তাপ জমে থাকে, তারই গরমে মজুরদের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা কালো ঘাম জমেছে। সামনের দিকে 'সেল'গুলো বেশ বড়। তাতে মজুররা সোজা দাঁড়িয়েও শাবল চালাতে পারে। কিন্তু ভিনসেন্ট যত ভেতরে এগিয়ে গেল, দেখল 'সেল' ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ক্রমে সেগুলো এত ছোট হয়ে গিয়েছে যে, মজুরদের মাটিতে শুয়ে কনুইয়ের দ্বারা শাবল চালাতে হয়। সময় যত কাটতে থাকে, মজুরদের গায়ে গরমে সেলের মধ্যে তাপও তত বাড়তে থাকে। কয়লার গুঁড়োয় বাতাসও ভারী হয়ে উঠতে থাকে। শেষে এমন হয় যে, মুখ হা করে গরম কালো গুঁড়া ভরতি হাওয়া টেনে নেওয়া ছাড়া তাদের আর উপায় থাকে না।

'এই সব লোক দৈনিক আড়াই ফ্রাঙ্ক করে মজুরি পায়। তাও পরীক্ষার ঘাঁটিতে ইন্সপেক্টর কয়লা পরীক্ষা করবে, ভাল বলে সাফাই দেবে, তবে পাবে।' জেকস বলল ভিনসেন্টকে, 'পাঁচ বছর আগে তারা দিনে পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে পেত। তারপর থেকে প্রতি বছর মজুরি কমানো হচ্ছে।'

কাঠের ঠেকোগুলোকে জেকস বেশ করে পরীক্ষা করল। এর একটা কোনো কারণে সরে গেলে মজুরদের সেখানেই সমাধিস্থ হতে হবে। পরীক্ষার পর সে কয়লা কাটিয়েদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঠেকো কিন্তু ভালো নয়। ঢিলে হয়ে পড়েছে। আর একটু ঢিলে হলেই ছাদ ধ্বসে পড়বে।' যে দুজন শাবল চালাচ্ছে, জবাব দিল তাদের একজন। সে কামিন দলটির মোড়ল। বলল, 'ঠেকনা লাগাবার মজুরি কে দেবে শুনি? কাজ ফেলে ঠেকনা নিয়ে সময় নষ্ট করলে কয়লা তুলব কখন? মরতে হয় মরব। এখানে পাথর চাপা পড়ে মরা আর বাড়িতে গিয়ে না খেয়ে মরা আমাদের কাছে দুই-ই সমান।'

সব শেষের সেলটি ছাড়িয়ে গিয়ে তারা মাটিতে আর একটি গর্ত পেল। এখানে নামবার মইটুকুও নেই। ওপর থেকে আবর্জনা পড়ে নিচের মজুরদের চাপা দিতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে তক্তা পেতে রেখেছে। ভিনসেন্টের হাত থেকে বাতিটা নিয়ে জেকস্ সেটাকে কোমরে ঝুলিয়ে দিল। বলল, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, খুব আস্তে পা ফেলবে হুঁসিয়ার। আমার মাথায় আপনার পা ঠেকে গেলে কিন্তু পড়ে যাব। একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাব।' আঁধারে পা টিপে টিপে তারা আরো পাঁচ মিটার নিচে নামল। গর্তের মাঝে আবর্জনা জমে আছে। ধরতে গেলে হাত ফসকে যায়। যে পড়ে যাবে তার আর কোনো

চিহ্ন থাকবে না। মাঝে মাঝে কাঠের ধাপ আছে। সেগুলোতে অনুমান করে ঠিক মতো পা দিতে হয়। পথটা এমনি বেয়াড়া।

নিচের স্তরে নেমে আর একটা 'কৌচ', ওপরের স্তরে যেমন 'সেল' এ ঢুকে কয়লা কাটা যায়, এখানে সেরকম নয়। এখানে দেয়ালের গায়ে সরু একটা কোণ থেকে কয়লা কেটে নামান হয়, সেজন্য হাঁটু মুড়ে উঁচু হয়ে শাবল ছুঁড়ে মারতে হয়। পাথরের গায়ে পিঠ ঠেকে লেগে থাকে। নড়বার উপায় নেই। এখানে কয়লা খুঁড়বার এই ব্যবস্থা। এখন ভিনসেন্ট বুঝতে পারল, এখানকার তুলনায় ওপরের 'সেল'গুলো অনেক ঠাণ্ডা; এর চেয়ে সেখানে অনেক আরাম। এই নিচের স্তরে জ্বলন্তচুল্লীর মতো উত্তাপ। মজুররা এখানে তীর বেঁধা জন্তুর মতো কেবল হাঁপাচ্ছে। শুকনো জিব বেরিয়ে এসেছে। কুকুরের জিবের মতো ঝুলছে। তাদের খোলা গায়ে ময়লা ও ধুলোর একটা আবরণ পড়েছে। ভিনসেন্ট কোনো কাজ করছে না, কেবল দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার মনে হচ্ছে এখানকার গরম ধুলো সে আর এক মিনিটও সইতে পারবে না। ওরা সাংঘাতিক পরিশ্রম করছে। তার চেয়ে তাদের শ্রান্তি হাজার গুণ বেশি। তবু তারা একটু থেমে বা এক মিনিট জিরিয়ে নিতে পারে না। রোজগার পঞ্চাশ সেন্ট, তার থেকেও কাটা যাবে।

মৌচাকের খোপের মতো এখানকার 'সেল'গুলো। সেখানকার ঢোকার রাস্তায় উঁচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। ভিনসেন্ট ও জেকস্ হাঁটু ও কনুইয়ে ভর দিয়ে সেই ভাবেই চলেছে। ছোট শিকের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি আসছে। পথ ছেড়ে দেবার জন্য দুজনকে প্রতিবারই দেয়ালের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়তে হচ্ছে। এই রাস্তা ওপরের রাস্তা থেকে অনেক ছোট। এই রাস্তায় যে মেয়েরা গাড়ি ঠেলে বার করছে, তারাও ছোট। তাদের কারুর বয়স দশ বছরের বেশি নয়। কয়লার গাড়িগুলো বেজায় ভারী। নিচের থেকে ওপর দিকে ঠেলে আনতে মেয়েদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।

পথের শেষ ধারে একটা সিঁড়ি কাত হয়ে লাগানো। সেটা কোনো ধাতুতে গড়া। মসৃণ গাড়িগুলোকে তারে লাগিয়ে তার ওপর দিয়ে নিচে নামানো হয়। জেসক্ বলল, 'আসুন, মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, আপনাকে আমি সবশেষের স্তরে নিয়ে যাব, একেবারে সাতশো মিটার নিচে। সেখানে এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা সংসারে আর কোথাও দেখা যায় না।'

মসৃণ সিঁড়িটাতে বসে তারা পিছলাতে পিছলাতে তেরছা পথে প্রায় ত্রিশ মিটার নিচে নেমে গেল। সেখানে একটা প্রশস্ত ও লম্বা সুড়ঙ্গ পথ। তাতে পাশাপাশি দুখানা গাড়ি চলবার মত পাত নিচে পাতা রয়েছে। সুদূর পথের পিছনের দিক ধরে তারা আধ মাইল পর্যন্ত হেঁটে গেল। এইখানে সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়েছে। এখান থেকে একটা মই বেয়ে কিছু উপরে উঠে, হামাগুড়ি দিয়ে ওপাশে গিয়ে আর একটা গর্তের মধ্যে নামল। গর্তটি নতুন খোঁড়া হয়েছে। জেকস্ বলল, 'এটা একটা নতুন 'কৌচ' এখানে কয়লা তুলতে যা কষ্ট তা পৃথিবীর কোনো খনিতে নেই।'

এই গহ্বরের বারো দিক থেকে বারোটি ছোটো গর্ত বেরিয়েছে। তারই একটি মুখে পা দিয়ে জেকস্ বলল, 'আমার পিছনে আসুন।' গর্তের মুখ এত ছোট যে, তাতে কোনমতে ভিনসেন্টের কাঁধটা মাত্র ঢুকতে পারে। ভিনসেন্ট তার ভিতরে শরীরটা গলিয়ে দিল। হাতের ও পায়ের আঙুলে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে, সাপের মতো বুকে

ভর দিয়ে এগুতে লাগল। তার ইঞ্চিতিনেক সামনেই জেক্সের পা–কিন্তু অন্ধকারে তাও দেখতে পাচ্ছে না। গুহা-পথ এখানে মোটে দেড় ফুট উঁচু, আড়াই ফুট চওড়া। যে গর্ত থেকে কয়লা খুঁড়তে যাবার পথ শুরু হয়েছে, সেখানে হাওয়া প্রায় নেই বললেই চলে। তবে গুহা-পথটির তুলনায় এখানে বেশ ঠাণ্ডা।

বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে যেতে একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। গম্বুজের ভিতরের দিকটি যেরকম ফাঁক তেমনি। জায়গাটা যেরকম উঁচু তাতে একটা লোক বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। ভিনসেন্ট প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পর তার চোখে পড়ল, একটা দেয়ালের গায়ে চারটা আলোকবিন্দু : যেন চারটে নীল চোখ মিটমিট করছে। ঘামে তার শরীর ভিজে উঠেছে। চোখে ভুরু থেকে কয়লার গুঁড়ো ঘামের সঙ্গে চোখের ভিতর ঢুকেছে। বার বার পলক ফেলেও চোখের জ্বালা জুড়ানো যাচ্ছে না। অনেকটা পথ ঢুকে হেঁটে এসেছে এলে তার নিশ্বাস নিতে ভয়নক কষ্ট হচ্ছিল। এখন ফাঁকা জায়গাতে এসে একটু আরাম পাবে বলে, একটু হাওয়া পেয়ে বাঁচবে বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হাওয়া এলে ঘামে টেনে নিল। সে যেন হাওয়া নয়, আগুন, গলানো তরল আগুন। ফুসফুসে ঢুকতেই মনে হল বুকের ভিতরটা যেন এখুনি জ্বলে যাবে, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একেবারে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। মার্কাসি খনিতে কয়লা তোলবার যতগুলো গর্ত আছে, তার মধ্যে সামন্তযুগে মানুষকে নির্যাতন করার জন্য সবচেয়ে খারাপ যে কুঠরিতে ফেলা হত, তার সঙ্গে এই গর্তের তুলনা করা চলে।

হঠাৎ কে যেন চেনা স্বরে বলে উঠল, 'আরে। মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, আপনি এসেছেন এখানে? কিভাবে আমরা দিনে পঞ্চাশ সেন্ট রোজগার করি, মঁসিয়ে বুঝি তা দেখতে এসেছেন?'

যেখানে চারটি বাতি জ্বলছে, ভিনসেন্ট তাড়াতাড়ি সেখানে এগিয়ে গেল। বাতিগুলোকে পরীক্ষা করল। বাতিগুলোর কোনটাই ঠিকভাবে জ্বলছে না। যেভাবে জ্বলছে তাতে কোন এক সময়ে নিবে যাওয়ার আশঙ্ক আছে।

ডেকরুক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'হ্যাঁ এই ভাবেই জ্বলেছে?'

'গ্রিসো* যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে তাতে একদিন এখানে বিস্ফোরণ ঘটবে। তখন আমাদের সকল যন্ত্রণা জুড়োবে।'

জেক্স্ বলল, 'গত রবিবার না এই সেগুলো থেকে পাম্প করে ও-সব বের করে দেওয়া হয়েছে।'

'তা হয়েছে, কিন্তু আবার আসে। জানলে, আবার আসে।' বলল ডেকরুক। মাথার রক্তিম আবটা আরামের সঙ্গে চুলকাতে চুলকাতে।

'তা হলে তোমরা এ সপ্তাহেরই কোনো একটা দিন ছুটি নাও, তাহলে আবার আমরা ওটা পরিষ্কার করে দিতে পারি।'

জেক্সের এই কথায় কামীনদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠল : 'নিজে খেতে পারি না, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারি না। যা তোমরা দাও, তাতেই দিন চলে না। তার উপর বলছ একটা দিন কাজ বন্ধ রাখতে। পরিষ্কার যদি করতে হয় তো

রাতে এসে করো, যখন আমরা এখানে থাকব না। আর সবাই যেমন খায়, আমাদেরও তেমনি খেতে হয়, একথা ভুলে যাও কেন?'

ডেক্রুক হেসে বলল, 'সব ঠিক আছে। খনি আমায় মারতে পারবে না, আগে ও একবার আমাকে মারতে চেয়েছে, পারে নি। আমি যখন বুড়ো হব, তখন বিছানায় শুয়ে মরব। কিন্তু খনিতে মরব না। আর, খাওয়ার কথা যা বললে–এখন কটা বেজেছে ভার্নি?'

জেস্ নীল আলোর কাছে ঘড়িটা তুলে দেখল, বলল, 'নটা বেজেছে।'

'উত্তম। এখন আমরা খেতে বসতে পারি।'

কালো, ঘামে-ভেজা এই শরীরী জীবগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিয়ে বসে গেল। যার যার খাবারের পুঁটলি খুলে খেতে শুরু করে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে একটু ঠাণ্ডা জায়গাতে বেরিয়ে গিয়ে খাবার খাবে তারও উপায় নেই, কেননা খাওয়ার জন্য তাদের মোটে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়। উবু হয়ে একটু ফাঁকা জায়গাতে যেতে আসতেই এই সময় কেটে যাবে। তাই তারা এই বদ্ধ গরমের মধ্যেই বসে পড়ল। দু'টুকরা মোটা, শক্ত রুটি বের করল। বের করল গেঁজে যাওয়া একটু পনীর। হাত থেকে কয়লার গুঁড়োমাখা ঘাম শাদা রুটির উপরে পড়ে রুটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। বোতলে করে তারা যে কফি এনেছে, তাই খানিকটা ঢেলে রুটি ধুয়ে নিল। দিনে তেরো ঘণ্টা তারা যে হাড় ভাঙা খাটুন খাটছে, তার পুরস্কার হচ্ছে কফি, রুটি, আর টক পনীর।

ভিনসেন্ট অনেকক্ষণ হয় নিচে নেমেছে। সাড়ে ছ'ঘণ্টা কেটে গিয়েছে এর মধ্যে। হাওয়ার অভাবে তার মূর্ছা খাওয়ার উপক্রম হল, ধূলোয় ও গরমে তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। তার বোধ হল, এই নির্যাতন সে আর দু'মিনিটও সহ্য করতে পারবে না। ঠিক এই সময়েই জেক্স্ জানালো এক্ষুণি তারা ওপরে যাবে। শুনে তার প্রতি ভিনসেন্টের কৃতজ্ঞতা জাগলো।

*গ্রিসো (Grisou) একরকম মারাত্মক গ্যাস।

গর্তে ডুব দেবার আগে জেক্স্ ডেকে বলল, 'শোনো ডেকরুক ঐ 'গ্রিসো'র দিকে ভালো করে নজর রেখো। যদি কিছু খারাপ দেখ, তাহলে বরং তোমার দল নিয়ে তুমি বাইরে চলে এসো।'

শুনে ডেক্রুক হেসে উঠল। বড় কর্কশ লাগলো সে হাসি। বলল, 'বেরিয়ে আসতে বলছ! কিন্তু কয়লা না তুলে বেরিয়ে গেলে পঞ্চাশ সেন্ট দিন-মজুরিটা আমাদের কে দেবে শুনি?'

এ জিজ্ঞাসার কোনো জবাব নেই। ডেক্রুকও জানে, জেক্স্ও জানে এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারবে না। জেক্স্ কাঁধ গুঁজে গর্তে ঢুকে পড়ল, বুকে হেঁটে চলতে লাগল সেটা পেরোবার জন্য। কয়লামাখা কালো ঘামে ভিনসেন্টের চোখ দুটো প্রায় কানা হয়ে গিয়েছে। তবু এই চোখ নিয়েই সেও জেক্সের পিছু পিছু বুকে ভর করে এগিয়ে চলল।

তারা আধ ঘণ্টা ধরে হেঁটে চলল। তারপর যেখানে কয়লা ও কামীনদের ওপরে তুলবার জন্য 'খাঁচা'তে পোরা হয়, সেখানে এসে পৌছালো। একটা গুহার ভেতর গিয়ে জেক্‌স্ কেশে খানিকটা কালো থুথু বের করে দিল।

খাঁচায় করে তীরের বেগে ওপরে উঠবার সময়ে ভিনসেন্ট বন্ধুর দিকে ফিরে বলল, 'মঁসিয়ে, একটা কথা আমায় ভেঙে বলুন। আপনারা খনিতে কাজ করেন কেন? এমন সর্বনাশা কাজ নাই-বা করলেন। সবাই মিলে আপনারা চলে যান না আর কোনখানে; আর কোন কাজের চেষ্টা করুন না গিয়ে?'

'হায় ভিনসেন্ট ভাই, আমরা যে আর কোনখানে চলে যাবে। সে উপায়ও নেই, কেন না, খাব যে টাকা কোথায়। সারা 'বরিনেজে' এমন একটা কুলি পরিবার পাবেন না যার হাতে দশটা ফ্রাঙ্কও জমেছে। কিন্তু যাওয়ার সংস্থানও যদি থাকতো তবু আমরা যেতাম না। জাহাজে কতরকম বিপদ ঘটে, নাবিক তা জানে, তবু সে যখন ডাঙায় থাকে, সাগরে ফিরে যাবার জন্য সে চঞ্চল হয়ে পড়ে; যতক্ষণ না যেতে পারে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। মঁসিয়ে আমাদেরও হয়েছে সেই দশা। খনিকে আমরা ভালবাসি। উপরে থেকে আমরা সোয়াস্তি পাই না; ভিতরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। কিন্তু তার জন্য আমরা বেশি কিছু তো চাই নে, চাই কেবল দুটি খাওয়া পরার মত মজুরি; আর চাই, আমরা যে মানুষ, সেইটে মনে করে আমাদের কাজের সময় বেঁধে দিক; আর বিপদ আপদ যাতে কম ঘটে তার ব্যবস্থা করুক। আমাদের দাবি তো কেবল এইটুকু।'

'খাঁচা' ওপরে এসে থামল। প্রাঙ্গণে বরফ জমেছে। মৃদু রোদ পড়েছে তার উপর। ভিনসেন্ট তার উপর দিয়ে ওয়াশিং রুমে এলো। এ-ঘরে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য দেরি না করে সোজা ময়দানে নেমে পা চালিয়ে দিল। এতক্ষণ চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। মুক্ত হাওয়াতে নিঃশ্বাস টেনে, মাত্র অর্ধেক চেতনা ফিরে পেয়েছে। তার ভয় হল, তার আবার সান্নিপাতিক জ্বর না হয়ে পড়ে; দুঃস্বপ্ন দেখে ঘন ঘন তাকে চীৎকার করতে না হয়। কিন্তু ভগবান কি তাঁর সন্তানদের এই নারকীয় দাসত্ব করতেই সংসারে পাঠিয়েছেন? তাই কি ঠিক? তা যদি না হয়, তবে এতক্ষণ ধরে কি সে যা দেখে এসেছে তার সব কিছুই কি একটা স্বপ্ন মাত্র?'

পথে ডেনিসদের বাড়ি পড়ে। টাকাওয়ালা লোকের বাড়ি বলতে সারা পল্লীতে কেবল এই একটি বাড়ি। বাড়িটিকে পাশে রেখে ভিনসেন্ট ডেকরুকের কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চলল। আনমনাভাবে পা ফেলতে খাদের আঁকাবাঁকা রাস্তায় পা বেঁধে তাকে কয়েকবার হোঁচট খেতে হল। ডেক্‌রুকের ঘরের কড়া নেড়ে প্রথমে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর একটি ছ'বছরের ছেলে বেরিয়ে এল। তার রঙ পাণ্ডুর, শরীরে রক্ত নেই, বয়স বেড়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে শরীর বাড়ে নি। তবু তাকে দেখলে মনে হয়, ডেক্‌রুকের তেজ ও সাহস তার মধ্যেও খানিকটা রয়েছে, আর দুবছর পরেই সেও মার্কাসিতে নামবে। রোজ ভোরে তিনটেয় নামবে, তার কাজ হবে কোদাল দিয়ে কয়লা তুলে গাড়ি বোঝাই করা।

ছেলেটি সরু গলায় জোর দিয়ে বলল, 'মা টিলাতে কয়লা কুড়াতে গেছে। আপনাকে একটু দেরি করতে হবে মঁসিয়ে ভিনসেন্ট। আমি ভাইবোনদের নিয়ে খেলায় ব্যস্ত, আপনি বসুন।'

কয়েকটা কাঠের টুকরো আর খানিকটা লোহার তার নিয়ে ডেক্‌রুকের দুটি শিশু ঘরের মেঝেতে খেলা জমিয়েছে। শীতে এদের শরীর নীল হয়ে উঠেছে। যে ছেলেটি বয়সে সকলের বড়ো, সে উনুনে টিলা থেকে কুড়োনো কয়লা গুঁজে দিচ্ছে। কিন্তু তাতে মোটে তাপ বেরুচ্ছে না। শিশুদের এই অবস্থায় দেখে ভিনসেন্ট ভয়ে কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি শিশুদের বিছানায় শুইয়ে তাদের গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। কি মনে করে যে এখানে এসেছে, শোচনীয় অবস্থার এই খুপরির মধ্যে মাথা গলিয়েছে, তা সে নিজেই জানে না। বারবার একথাটিই তার মনে তোলপাড় করছে যে, তাকে কিছু একটা করতেই হবে। ডেকরুকদের মতো যাদের দুঃখ কষ্ট কল্পনার বাইরে চলে গিয়েছে, তাদের জ্বালাযন্ত্রণা কেবল দর্শকের মতো দেখে গেলেই চলবে না। যে কোনো উপায়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। তাকে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের দুঃখ কষ্ট সে অন্তত হৃদয় দিয়ে পুরোপুরি অনুভব করেছে।

মাদাম ডেকরুক বাড়ি এলো। তার হাত মুখ সব কালিময়। ভিনসেন্টেরও কালিমাখা বেশ। এজন্য মাদাম ডেক্‌রুক প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি। একটি ছোট বাক্সে তাদের খাওয়ার জিনিস রাখা হয়। সে তাড়াতাড়ি তার থেকে কিছু কফি বের করে উনুনে চড়িয়ে দিল। তারপর তা নামিয়ে ভিনসেন্টকে খেতে দিল। কফি মোটেই গরম হয় নি। তার ওপর কালো, আর তেতো; ওপরে কাঠের গুঁড়োর মতো ভাসছে। সেবাপরায়ণা নারীটিকে খুশি করার জন্যই ভিনসেন্ট কফি টুকু খেয়ে ফেলল।

মাদাম ডেকরুক বলল, 'আজকাল টিলাতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত খারাপ। কোম্পানি কিছুই এখন আর ফেলে না, কয়লার গুঁড়ো পর্যন্ত না। শিশুদের কি দিয়ে গরম রাখব বলুন। কাপড়চোপড় কিছু নেই। কেবল ওই ছোট শার্টখানা আর খানিকটা চট। এই তো সম্বল। চট গায়ে দিলে তার ঘষা লেগে ওদের চামড়া উঠে যায়; যন্ত্রণা হয়; ওরা সইতে পারে না। ওদের সারা দিনরাত বিছানায় শুইয়েও তো রাখতে পারিনে; দিনরাত শুইয়ে রাখলে ওরা বাড়বে কি করে।'

চাপা কান্নায় ভিনসেন্টের গলা বুজে আসছিল। সে কিছুই বলতে পারল না। মানুষের এত শোচনীয় দুঃখ কষ্ট কোনো দিন সে দেখেনি। আজ প্রথম তার চিত্তে এই সন্দেহ দোলা দিল যে, কাপড়ের অভাবে যে নারীর কোলের শিশু পর্যন্ত শীতে মরে যায়, তার কাছে প্রার্থনার কি দাম? বাইবেলের ধর্মবাণী তার কী উপকারে আসবে? এইসব দেখেও ভগবান কেন চুপ করে আছেন? তার পকেটে যা কিছু ছিল মাদাম ডেকরুকের হাতে তুলে দিল। বলল, 'এই দিয়ে শিশুদের পশমী গেঞ্জি পাবে।'

কিন্তু এ দানের মূল্য কতটুকু? দেশজোড়া দুঃখদৈন্যর মাঝে তার এই সামান্য দান কী কাজ লাগবে? বরিনেজে আরো তো শত শিশু এমনিভাবে শীতে কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই পশমী গেঞ্জি যখন ছিঁড়ে যাবে, ডেকরুকের ছেলেরা তখন আবার শীতে কষ্ট পাবে।'

সেখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা ডেনিসদের বাড়িতে চলে এল। রুটির উনুনটা তখনো বেশ গরম আছে মুখ হাত ধোওয়ার জন্য মাদাম ডেনিস তাকে

খানিকাটা জল গরম করে দিলেন। গত রাত্রে খানিকটা মাংস রেখে দিয়েছিলেন। বেশ পরিপাটি করে 'স্টু' রেঁধে তাকে খেতে দিলেন। আজকের অভিজ্ঞতায় সে খুব ক্লান্ত ও বিচলিত হয়েছে দেখে তিনি তার রুটিতে একটু বেশি করে মাখন মাখিয়ে দিলেন।

ভিনসেন্ট উপরে উঠে তার ঘরে গেল। সুখাদ্যে তার পেট ভরেছে এবং শরীর গরম হয়ে উঠেছে। তার বিছানাটাও বেশ বড়ো আর নরম। বিছানার চাদর পরিষ্কার; বালিসের ওয়াড়টা ধবধবে শাদা। দেয়ালে টাঙানো বিশ্বের সেরা শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রিন্ট। বাক্স খুলে নিজের কাপড়চোপড়গুলো একবার দেখল। সারি সারি শার্ট, আন্ডারওয়ার, মোজা, ওয়েস্টকোট। বাক্সে সাজানো রয়েছে। আলনার কাছে গেল। সেখানে দেখতে পেল অতিরিক্ত দুজোড়া জুতো রয়েছে, আলনাতে ঝুলছে তার একাধিক স্যুট আর গরম ওভারকোর্ট। এসব দেখে তার এই জ্ঞান হল, সে ভীরু সে কাপুরুষ। খনিমজুরদের কাছে সে দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়ায় আর সে নিজে আরাম ও প্রাচুর্যের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছে। সে ভণ্ড ছাড়া, অসাধু কথার ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তার ধর্ম অলস অকর্মা বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। মজুরদের উচিত ছিল তাকে অবজ্ঞা করা, তাকে 'বরিনেজ' থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। সে তাদের সমব্যথী বলে ভান করে; তাদের দুঃখের সাথী, দরদী বন্ধু বলে ভান করে। কিন্তু এখানে রয়েছে তার সুন্দর সুন্দর গরম কাপড়, শোবার পরিপাটি বিছানা। খনিমজুরেরা সাতদিনে যা খেতে পায়, সে একবেলাতেই তার চেয়েও বেশি খাদ্য উদরসাৎ করে। এই আরাম ও বিলাসের জন্য তাকে কি করতে হয়? কিছুই না। একরকম বিনা শ্রমেই সে এসব ভোগ করছে। সে ভালো মানুষের ভান করে কতকগুলো ডাহা মিথ্যে কথা তাদের শোনাতে গিয়েছিল। তার একটি কথাও তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। তার বাণী শুনতে আসা তাকে নেতা বলে মেনে নেওয়া তাদের মোটেই উচিত হয়নি। তার সমস্ত আরামের জীবনটাই জানিয়ে দিচ্ছে, সে যা বলে সব মিথ্যে, সব ঝুটো। সে আবার ব্যর্থ হয়েছে, নিদারুণভাবে এসেছে তার ব্যর্থতা। এমন শোচনীয় ব্যর্থতা তার এর আগে আর কখনো আসেনি!

এখন সে কি করবে? তার সামনে দুটি পথ খোলা আছে; তার এই মিথ্যার বেশাতি তাদের কাছে ধরা পড়ার আগেই সে রাত্রির আঁধারে বরিনেজ থেকে পালিয়ে যেতে পারে, তা যদি না যায় তো, নিজের চোখে সে যা দেখে এসেছে তার থেকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়ে সে সত্যিকারের ঈশ্বর-সেবক হতে পারে।

বাক্স থেকে সব কাপড় চোপড় বের করে তাড়াতাড়ি সেগুলো ব্যাগে পুরল। তার স্যুট, জুতো, বইপত্র আর ছবির প্রিন্টগুলোও ব্যাগে পুরে ব্যাগ বন্ধ করে দিল। আপাতত কিছুক্ষণের জন্য ব্যাগটা চেয়ারের উপর রেখে, ছুটতে ছুটতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

খাদের একেবারে নিচের দিকে একখণ্ড সমতল জমি আছে। তার ঠিক পরেই চড়াই শুরু হয়েছে–সেখান থেকে পাইন গাছের বন ক্রমে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এই পাইন বনে মজুরদের খানকয়েক কোঠা ঘর ইতস্তত ছড়ানো। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে ভিনসেন্ট জানতে পারল একখানা ঘর সেখানে খালি পড়ে আছে। ঘরটা খাড়া ঢালু জমিতে তৈরি একটি কুঠুরি বিশেষ। জানালা নেই, একটি মাত্র ঢুকবার পথ

আছে। মাটির মেঝে অনেকদিনের অব্যবহারে থেবড়ে গিয়েছে। ঘরের যে-দিকটা নিচু জমিতে দাঁড়ানো সেদিকে ঘেঁষে গলিত বরফ হু হু করে ঘরে এসে ঢোকে। সারা শীতকাল কেউ এঘরে বাস করেনি বলে পেরেকের ছেঁদা আর দেয়ালের ফাটলগুলো ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় বড়ো হয়ে গিয়েছে, ওগুলো বুজানো হয়নি।

একটি স্ত্রীলোক তাকে ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিল। ভিনসেন্ট তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ জায়গার মালিক কে?'

'মালিক ওয়াসমেসের একজন ব্যবসায়ী।'

'ঘরের ভাড়া কত জানো?'

'মাসে পাঁচ ফ্রাঙ্ক।'

'বহুত আচ্ছা। ঘরটা আমি নেব।'

'কিন্তু আপনি এখানে বাস করতে পারবেন না মঁসিয়ে ভিনসেন্ট।'

'কেন পারব না?'

'অত্যন্ত খারাপ। অত্যন্ত খারাপ এ জায়গাটা। এমন কি আমি যেখানে থাকি, তার চাইতেও খারাপ। পেটিট ওয়াসমেসে এমন খারাপ কোঠা আর একটাও পাবেন না। এটা সবচেয়ে খারাপ।'

'ঠিক এই জন্যই আমার এ ঘরটা দরকার।'

সে আবার টিলার পথ ধরে ডেনিসদের বাড়িতে চলে এল। একটা নতুন তৃপ্তির আমেজে আজ তার চিত্ত প্রসন্ন। সে যখন ঘরে ছিল না সেই সময়ে মাদাম ডেনিস কোনো একটা কাজে তার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা অবস্থায় দেখে এসেছিলেন।

ভিনসেন্ট আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মঁসিয়ে ভিনসেন্ট? হঠাৎ আপনি হল্যান্ড ফিরে যাচ্ছেন কেন?'

'আমি হল্যান্ড যাচ্ছি না তো? 'বরিনেজে'ই থাকব।'

'তবে....।' তাঁর চোখে মুখে বিভ্রান্তির ছায়া।

ভিনসেন্ট তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। শুনে তিনি সুর নরম করে বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, ওখানে গিয়ে থাকা আপনার পোষাবে না। কেননা ওভাবে থাকা আপনার অভ্যেস নেই। যীশু খৃষ্টের দিন আর আজকের দিনের মধ্যে অনেক তফাৎ। আজকের দিনে আমরা সবাই যে যত ভালভাবে থাকতে পারি সেই চেষ্টাই করব। আপনি যে সজ্জন, লোকে তা জানবে আপনার কাজ দেখে; আপনার জীবন যাপন দেখে নয়।'

কিন্তু কিছুতেই ভিনসেন্টের মত ফেরানো গেল না।

সে ওয়াসমেসের বণিকের সঙ্গে দেখা করে ঘরটা ভাড়া করল এবং সে ঘরে বাস করতে চলে গেল। কয়েক দিন পর তার প্রথম মাইনের টাকা এলো। পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একখানি চেক। তা দিয়ে সে ছোট একটা কাঠের খাট ও একটা পুরোনো 'স্টোভ' কিনল। এসব কেনাকাটার পর হাতে যা রইল তা দিয়ে অনায়াসে মাসের বাকি ক'টা দিনের রুটি, টক পনীর আর কফি কেনা যেতে পারে। ঘরে যাতে জল না ঢুকতে পারে

সে জন্য ঘরের সব আবর্জনাগুলো পিছনের দেওয়ালের গায়ে জড়ো করে রাখল আর ছেঁড়া চট দিয়ে পেরেকের ছেঁদা আর ফাটলগুলোকে বন্ধ করে দিল। সে এখন জীবনযাত্রার দিক দিয়ে খনিমজুরদের সমান। তারা যেরকম ঘরে বাস করে, সেও আজ সেইরকম ঘরের বাসিন্দা, যে খাদ্য তারা খায়, যে বিছানায় তারা শোয়, আজ থেকে সেও সেই খাদ্য খাবে সেই বিছানায় শোবে। আজ থেকে সে তাদেরই একজন। তাদের ঈশ্বরের বাণী শোনাবার পুরো অধিকার আজ সে অর্জন করেছে।

১৩.

'কারবনেজেস বেলজিক' নামে প্রতিষ্ঠানটি 'ওয়াসমেসে'র এলাকার মধ্যে চারটি কয়লাখনি পরিচালনা করেন। এর ম্যানেজারটিকে ভিনসেন্ট একটা সর্বগ্রাসী জন্তু মনে করেছিল। আসলে তিনি তা নন। তিনি একটু মোটাসোটা একথা ঠিক; কিন্তু তাঁর চোখদুটিতে সহানুভূতির ছাপ; প্রথমে জীবনে তিনি কিছু কিছু দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ করেছেন, সেটা তাঁর চালচলনে ধরা পড়ে।

ভিনসেন্ট তাঁর কাছে যখন মজুরদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করল, তিনি তা মন দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, 'সবই আমি জানি মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্। সবই পুরোনো কাহিনী। লোকে মনে করে বেশি মুনাফার লোভে আমরা তাদের ইচ্ছে করে না খাইয়ে মারি। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে, লোকের এ ধারণা একেবারে ভুল। প্যারিসে খনিসমূহের যে আন্তর্জাতিক ব্যুরো আছে, তাদের 'চার্ট' আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তার থেকে আপনি আসল ব্যাপার বুঝতে পারবেন।'

তিনি একটি বড়ো 'চার্ট টেবিলের ওপর মেলে দিলেন। চার্টের নিচের দিকে একটা নীল জায়গাতে আঙুল রেখে বললেন–

'এই দেখুন মঁসিয়ে। পৃথিবীতে যত খনি আছে তার মধ্যে বেলজিয়ামের খনি থেকে সব চেয়ে কম পয়সা আসে। এখানে কয়লা এত বেশি নিচু থেকে তুলতে হয় যে, সে-কয়লা খোলা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখানে কয়লা তোলার যা খরচ পড়ে, ইউরোপের আর কোনো দেশের খনিতে তত খরচ পড়ে না। অথচ লাভ হয় সব চাইতে কম। অন্যান্য খনিওয়ালারা কম খরচায় কয়লা তুলে যে দরে বিক্রি করে, আমাদেরও সেই দরেই বিক্রি করতে হয়। এভাবে দিন দিন আমরা দেউলিয়া হয়ে পড়ছি। কথাগুলো আপনি শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ শুনছি?'

মজুরদের যদি আমরা রোজ এক ফ্যাঙ্ক করে বেশি মজুরি দিই তা হলে কয়লার বাজার দর থেকে উৎপাদনের দর অনেক বেশি পড়ে যাবে। তা হলে আমাদের কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। তখন ওরা সত্যি না খেয়ে মারা যাবে।'

'মালিকরা কি লাভের অঙ্কটা একটু কমাতে পারেন না? তাঁরা একটু কম লাভ করলে মজুররা কিছু বেশি পেতে পারে।'

ম্যানেজার মাথা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'না মঁসিয়ে, তা হয় না। কয়লাখনি কিসের জোরে চলে জানেন তো? পুঁজির জোরে। আর-সব শিল্পের মতো এটাও চলে

পুঁজির জোরে। পুঁজি থেকে মুনাফা আসতেই হবে। তা না হলে সে পুঁজি তুলে নিয়ে আরেক কাজে লাগিয়ে দেবে। 'কারবনেজেস্ বেলজিকে'র স্টক থেকে এখন মাত্র শতকরা তিন টাকা হারে ডিভিডেন্ড দেওয়া হচ্ছে। এই ডিভিডেন্ড যদি আর আধ পারসেন্ট কম হয়ে যায়, মালিকরা তা হলে সব টাকা তুলে নেবে। তা যদি নেয়, আমাদের খনিগুলো সব বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ মূলধন ছাড়া তো আর ব্যবসা চলবে না। মজুরদের তাহলে উপোস করে মরতে হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন মঁসিয়ে, মালিকরা কিম্বা ম্যানেজাররা বরিনেজের এই সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেন নি। এর জন্য দায়ী এখানকার খনির ভিতরের অবস্থা। আর এই অবস্থার জন্য মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে দোষ ভগবানের।'

কেউ ভগবানকে দোষ দিলে ভিনসেন্ট অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সে ক্ষুণ্ন হল না। ম্যানেজারের কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে তুললো। বলল–

'আপনারা আর কিছু না পারেন, মজুরদের কাজের ঘণ্টা তো কমিয়ে দিতে পারেন? খনিতে ঢুকে রোজ তেরো ঘণ্টা কাজ করছে : মরে যাবে যে। গ্রাম একেবারে ছারখার হয়ে যাবে।'

'না মঁসিয়ে। আমরা কাজের ঘণ্টা কমাতে পারি না। তা যদি পারতাম তো মাইনেই বাড়িয়ে দিতাম। কারণ তাদের মাইনে বাড়ালে আমাদের যেমন ক্ষতি হয়, কাজের ঘণ্টা কমালেও তেমনি ক্ষতি হবে। রোজ পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে যে কয়লা পাই, কাজের ঘণ্টা কমালে কয়লা পাব তার চেয়ে অনেক কম। এর ফলে টন-পিছু উৎপাদনের খরচা বেড়ে যাবে।'

'আর একটা বিষয় আছে–সেটাকে আপনারা অবিশ্যি ভালো করতে পারেন–'

'খনির বিপজ্জনক অবস্থার কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ। আর কিছু নাই পারেন, দয়া করে অন্তত খনির দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারেন'

ম্যানেজার শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না মঁসিয়ে, আমরা তাও পারি না। কেন পারি না তাও বলছি। আমাদের ডিভিডেন্ড অত্যন্ত কম বলে, নতুন নতুন 'স্টক' বাজারে ছাড়তে পারি না। সত্যি বলতে কি, খনির কিছু কিছু উন্নতির কাজে লাগাব এমন বাড়তি আয় আমাদের একদম নেই। এমন এক হতচ্ছাড়া কাজ নিয়ে পড়ে আছি যে, কি বলব। এই আপদে যে কেউ মাথা গলিয়েছে সেই মরেছে। আমি কম করেও হাজার বার এর ভেতর গিয়েছি। গিয়ে যা দেখে এসেছি তাতে আমার বিশ্বাসের মূলে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। খাঁটি, নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক ছিলাম আমি। এখন হয়ে গিয়েছি নির্মম নিরীশ্বরবাদী। একটা কথা আমি বুঝি না। লোকে বলে ঈশ্বর মানুষকে দুঃখের আগুণে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করেন। কিন্তু তিনি এই রকম অবস্থার সৃষ্টি কেন করবেন? এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? ইচ্ছা করে মানুষকে দুঃখ দিয়ে তাঁর লাভ কি? যুগ যুগ ধরে বাঁধা পশুর মতো দুঃখের আগুনে তিনি তাদের দগ্ধাবেন কেন? এক ঘণ্টার জন্যেও তাঁর স্বর্গীয় অনুকম্পা তাদের ওপর বর্ষিত হবে না কেন? তিনি যে আছেন, এই কি তাঁর পরিচয়?'

ভিনসেন্ট বলবার মতো কিছুই ভেবে পেলো না। সে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। সে নীরবে বাড়ি চলে এলো।

১৪.

ফেব্রুয়ারি মাসটা বছরের সবচেয়ে কষ্টের মাস। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে। অবাধ অবিচ্ছিন্ন দুরন্ত হাওয়া। তার ঝাপটায় পথে বেরুনো দায়। ঘরে থেকেও কষ্টের পার নেই। মজুরদের কুঁড়েগুলোতে তখন শীতের সাম্রাজ্য। ঘর গরম রাখার জন্য কালো টিলা থেকে কয়লার গুঁড়ো কুড়িয়ে আনার দরকার তখন অত্যন্ত বেশি হয়ে.পড়ে। কিন্তু হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা। তার ওপর প্রচণ্ড তার বেগ। মেয়েরা কালো টিলায় উঠে কয়লার গুঁড়ো খুঁজবে তার উপায় নেই। এই প্রাণঘাতী শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য দু'একখানা স্কার্ট, ব্লাউজ আর সুতি মোজা ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই।

শিশুরা শীতে কুঁক্‌ড়ে যাবে, জমে যাবে। এজন্য তাদের দিনরাত বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়। কয়লা নেই। স্টোভ জ্বলে না বলে গরম খাবার তৈরি করাও প্রায় সম্ভব হয় না। পুরুষেরা খনির ভেতরে আগুনের মতো উত্তাপের মধ্যে কাজ করে ওপরে ওঠে : ওপরে তাপ তখন শূন্য ডিগ্রিরও নিচে এই মর্মান্তিক ঠাণ্ডার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার তাদের সংস্থান কই? বরফ ঢাকা মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়া ঠেলতে ঠেলতে যে যার বাড়িতে আসে। শীতে জমে গিয়ে কিংবা নিউমোনিয়া হয়ে সপ্তাহের সাতটা দিনই কারো না কারো ঘরে একটি দুটি লোক মারা যায়। সে মাসে ভিনসেন্ট অনেকগুলো মৃতের শেষ কৃত্য করেছে।

ছেলেমেয়েদের পড়ানো সে ছেড়ে দিল। শীতে তাদের মুখ নীল হয়ে আসে। তাদের পড়ানোর চেষ্টা করা বৃথা। সে সারাদিন মার্কাসি পাহাড়ে কাটিয়ে দিতে লাগল। সবচেয়ে যারা দুরবস্থায় পড়েছে তাদের ঘরে ঘরে বিতরণ করবে বলে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে ঘুরে ঘুরে কয়লার গুঁড়ো কুড়োতে লাগল। সারা মুখে কালি জমে উঠেছে। ধোওয়ার তার অবসর নেই; দরকারও নেই। তার মুখের এ কালো দাগ খনির মজুরদের মুখেরই দাগের মত। এ তো তার কাম্যই। একে ঘষে তুলে ফেলার তার প্রয়োজন কি? পেটিট ওয়াসমেসে নতুন কেউ এলে এখন তাকে ধর্মপ্রচারক বলে চিনতেই পারবে না। তাকে খনি-মজুর বলেই ধরে নেবে।

কালো টিলার ওপর-নীচ ঘুরে ঘুরে সে সারাদিনে আধ বস্তা কয়লার গুঁড়ো কুড়িয়েছে। বরফ ঢাকা পাথরের গায়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তার হাতের নীল চামড়া ছড়ে গিয়েছে। চারটে বাজবার একটু আগেই কুড়োনো বন্ধ করে ফিরে আসবে বলে স্থির করল। একটু পরেই খনি-মজুররা ঘরে ফিরে আসবে। গ্রামে গিয়ে তার কয়লাগুলো সেই সময়ে বিতরণ করলে অন্তত কয়েকটি কুটিরে বৌ-ঝিরা তাদের স্বামী-পুত্রদের কফি গরম করে দিতে পারবে। সে মার্কাসির গেটে যখন পৌছাল, মজুরদের জনস্রোত তখন ঠেলে বেরুতে শুরু করেছে। তাদের কেউ কেউ তাকে চিনতে পেরে অস্পষ্ট স্বরে অভিবাদন জানাল। বাকি সবাই দু'হাত পকেটে পুরে ঘাড় নীচু করে হন্‌হন্‌ করে চলে গেল।

সবার শেষে যে লোকটি গেট থেকে বেরুলো, সে এক বুড়ো। কাশিতে তার শরীর কুঁক্‌ড়ে আস্‌ছে। খাড়া হয়ে হেঁটে চলাই তার পক্ষে অসম্ভব। তার হাঁটু দুটি কাঁপছে। বরফ ঢাকা মাঠে পা দিতে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন তাকে ঝাপটা মারল, তখন তার প্রায় পড়ে যাওয়ার যোগাড়। যেন কেউ তাকে প্রাণান্তক এক ঘুঁসি মেরে থামিয়ে দিয়েছে। বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ময়দানটি পাড়ি দিতে শুরু করল। ওয়াসমেসের একটি দোকান থেকে খানিকটা চট যোগাড় করেছিল। সেটা এখন কাঁধে জড়ালো। ভিনসেন্টের চোখে পড়ল চটের ওপর কি যেন লেখা রয়েছে, বিস্ফোরিত চোখে সে অক্ষরগুলো পড়তে চেষ্টা করলো। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে একটা শব্দ যার অর্থ 'সহজেই ভেঙে যেতে পারে।'

মজুরদের বাড়ি বাড়ি কয়লার গুঁড়ো দেবার পর ভিনসেন্ট নিজের ঘরে ফিরে এলো। তারপর তার যত কাপড়-চোপড় ছিল সব বের করে বিছানায় জড়ো করল। তার পাঁচটা, শার্ট, ভিতরে পরবার তিনটে সুট, চার জোড়া মোজা, দু'জোড়া জুতো, ওপরে পরবার দুটি সুট, তার ওপর অতিরিক্ত একটা সৈনিকদের কোট। সে একখানি শার্ট, একজোড়া মোজা ও একটিমাত্র সুট বিছানায় রেখে বাকি কাপড়-চোপড়গুলো সুটকেসে ভরল।

সেইগুলো নিয়ে গিয়ে ভিনসেন্ট সেই বুড়োটাকে দিয়ে এলো। ভিতরে পরার সুট ও সার্টগুলো সে কেটেকুটে তার থেকে শিশুদের ছোট ছোট জামা করে দেবার জন্য বিলিয়ে দিল। মোজাগুলো দিল মার্কাসি খনির মজুরদের। তার গরম কোটটা দিল এক গর্ভবর্তী নারীকে। তার স্বামী কিছুদিন আগে খনিতে কাজ করতে করতে মারা পড়েছে। দুটি শিশু আছে। তাদের খাওয়াবার জন্য স্ত্রীলোকটিকে এখন খনিতে কাজ নিতে হয়েছে।

আগেই বলেছি 'সেলোন দু বেবি' নামে একটি পরিত্যক্ত নাটমন্দিরকে ভিনসেন্ট ধর্মসভার ঘর করেছিল। সে ঘর এখন বন্ধ থাকে। মেয়েদের কুড়োনো এত কষ্টের কয়লার গুঁড়ো এনে এখানে উনুন ধরিয়ে ধর্মসভা করার প্রবৃত্তি এখন আর তার হয় না। তা ছাড়া, লোকেও আসতে চায় না; বরফ ভেঙে ভিজে পায়ে এখানে আসতে তারা ভয় পায়। ভিনসেন্ট তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দু'চার কথায় প্রচারের কাজ শেষ করে দেয় আর সারাদিন তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। শীঘ্রই সে বুঝতে পারল, কেবল ঘুরে বেড়ালেই চলবে না, হাতে-কলমে কিছু কাজও করতে হবে। সেই থেকে তাদের রোগ সারানো, সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেওয়া, তাদের গরম পানীয় ও ওষুধ তৈরি করে দেওয়া—এসব কাজে লেগে গেল। শেষে তাদের বাইবেল পড়ানো ছেড়ে দিল। বাইবেল সে বাড়িতে রেখে যেত, কারণ তাদের কাছে বাইবেল খোলারও অবসর পেত না। ভগবানের বাণী শোনা একটা বিলাসিতা। খনি-মজুরেরা গরীব। তাদের এ বিলাসিতা ভোগ করার সঙ্গতি কই?

মার্চ মাসে শীত কিছু কমে এলো। কিন্তু তার জায়গায় দেখা দিল জ্বর। ভিনসেন্ট নিজে প্রায় উপোস থেকে রোগীদের ওষুধ-পথ্যের জন্য তার ফেব্রুয়ারি মাসের মাইনে থেকে চল্লিশ ফ্রাঙ্ক খরচ করে ফেলল। কম খেয়ে খেয়ে ক্রমেই সে শুকিয়ে যেতে লাগলো। তার জন্যে স্নায়ুপীড়া হয়ে তার মেজাজ দিন দিন রুক্ষ হয়ে উঠল। শীতে

তার জীবনীশক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। জ্বর গায়েই সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। গর্তে-বসা চোখ দুটি জবাফুলের মতো টক্‌টকে লাল। যে প্রশস্ত-মস্তক ভ্যান গোঘবংশের বৈশিষ্ট্য, গাল-মুখ শুকিয়ে তা যেন এখন অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। গালে আর চোখের নিচে গর্ত হয়ে গেল; কিন্তু চিবুকটা তার তেমনি মজবুত মনে হতে লাগল।

ডেক্‌রুকের বড়ো ছেলেটার সেদিন টাইফয়েড হল। তারা মুস্কিলে পড়ল ছেলের বিছানা নিয়ে। ঘরে বিছানা মোটে দুটি। একটিতে স্বামীস্ত্রীতে শোয়, বাকিটাতে মেয়ে-ছেলেরা। রোগীর বিছানায় যদি ভালো দুটি ছেলেকেও শুতে দেওয়া হয়, তা হলে তাদেরও রোগ হয়ে যেতে পারে। তাদের যদি মেঝেতে শুতে দেওয়া হয়, তাতে তাদের ঠাণ্ডা লাগতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জন মেঝেতে শুয়ে রাত কাটায়, তাহলে কাল তারা কাজেই বেরুতে পারবে না। এখন কি করা যায়! ভিনসেন্ট চট্‌ করে বুঝে ফেললো, এখন কি করা যায়!

ডেক্‌রুক্‌ খনি থেকে ফিরে এলো, ভিনসেন্ট তাকে বলল, 'ডেক্‌রুক্‌, খেতে যাবার আগে আমাকে এক মিনিট সাহায্য করতে হবে, করবেন তো?'

ডেক্‌রুক্‌ খুবই ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তার ওপর শরীরটাও তেমন ভাল নেই। তা সত্ত্বেও খোঁড়া পা টেনে টেনে নীরবে ভিনসেন্টের পিছু পিছু এগিয়ে চলল। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসাও করল না। ভিনসেন্ট তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। বিছানায় দু'খানা কম্বল ছিল, একখানা সরিয়ে রেখে বলল, 'ওদিকটায় ধরুন তো। দু'জনে ধরাধরি করে খাটটা আপনার বাড়িতে নিয়ে যাই। বড় ছেলেটা এতে শোবে।'

ডেক্‌রুকের দাঁতে দাঁত লেগে একটা শব্দ হল। সামনে গিয়ে সে বলল, 'আমাদের তিনটি ছেলে। ভগবান যদি চান, একটিকে আমরা দিতে পারি। কিন্তু সারা গাঁয়ের রোগীর সেবা করার জন্য মঁসিয়ে ভিনসেন্ট আমাদের একজন বই দুজন নেই। তাকে আমরা হারাতে পারি না। সে যে নিজেকে নিজে মেরে ফেলবে, আমি তা হতে দেব না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে চলে যেতে লাগল। ভিনসেন্ট একাই বিছানাটা কাঁধে তুলে ডেক্‌রুকের বাড়ি নিয়ে এল। ডেক্‌রুক্‌ আর তার স্ত্রী তখন শুকনো রুটি ও কফি খেতে খেতে দেখলে : ভিনসেন্ট বিছানা পেতে অসুস্থ ছেলেটিকে তাতে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে আদরের সঙ্গে সেবাযত্ন করছে।

সন্ধ্যার একটু আগে সে ডেনিসদের বাড়ি কিছু খড় চেয়ে আনতে গেল, বাড়ি এনে পেতে শোবার জন্য। মাদাম ডেনিস সব কথা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন—'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট আপনার আগের ঘর এখনো খালি পড়ে আছে। আপনি আমার কথা রাখুন। চলে আসুন এখানে।'

'মাদাম ডেনিস, আপনার দয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু আমি তো এখানে আসতে পারি না।'

'আমি জানি আপনি টাকাকড়ির চিন্তায় বিব্রত হচ্ছেন। কিন্তু আমি বলছি, চিন্তার কোন কারণ নেই। জিন ব্যাপ্টিস্ট আর আমি দু'জনে তো বেশ উপায় করি। আপনি

ভাইয়ের মতো আমাদের সঙ্গে থাকবেন, কোনো খরচা দেবার দরকার নেই। আপনি নিজেই তো সব সময়ে বলে থাকেন, ঈশ্বরের সন্তান সবাই আমরা ভাই ভাই?

ভিনসেন্টের ঠাণ্ডা লেগেছিল। তার শীতে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। তার উপর সে ভয়ানক ক্ষুধার্ত। সাত দিন থেকে জ্বরে ভুগছে সে, মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে। কত দিন, থেকে এক মুঠো ভালো খাবার পেটে পড়েনি, একটা রাত আরাম করে ঘুমোতে পারেনি। এ সব কারণে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। তার মানসিক দুশ্চিন্তা। গ্রামের লোকের দুর্নিবার দুঃখ-কষ্ট তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছে সে। উপর তলায় যে বিছানা আছে, তা গরম, নরম, আর পরিষ্কার। ক্ষুধার তাড়নায় তার পেটে কামড়াচ্ছে, মাদাম ডেনিস তাকে যা খেতে দেবেন, তার ধারণা, তাতেই সে সেরে যাবে। তার জ্বরে তিনি তার সেবা করবেন; শরীর থেকে শীতের কাঁপুনি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত গরম কড়া পানীয় দিয়ে চাঙ্গা করতে থাকবেন। সে কাঁপতে কাঁপতে অসাড় হয়ে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ তার চৈতন্য এলো।

এটা ভগবানের অন্তিম পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতে যদি সে ঠিক থাকতে না পারে, তাহলে এ পর্যন্ত যা কিছু কাজ সে করেছে, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। গ্রামে এখন দুঃখকষ্ট চরমে উঠেছে। অবস্থা এখন সবচেয়ে ভয়াবহ। দুর্বল বলে সে কি তা এড়িয়ে যাবে? কাপুরুষের মতো সে সরে দাঁড়াবে? হাতের কাছে আরামের উপকরণ পেয়েই কি সে তা কাঙালের মতো আঁকড়ে ধরবে?

সে বলল, 'মাদাম ডেনিস, ঈশ্বর সবারই মনের কথা জানেন। আপনার মনে যে দয়া, যে মহত্ত্ব, তাও তিনি অবশ্যই জানতে পারছেন। এর জন্য আপনাকে তিনি নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবেন। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে কর্তব্যের পথ থেকে সরে আসতে প্রলুব্ধ করবেন না। আমি কেবল কিছু খড় নিতে এসেছি। যদি না দেন, আমাকে তাহলে হয়তো মাটিতেই শুতে হবে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে আর কিছু দেবেন না। আর কিছু আমি নিতে পারব না।'

ঘরের এক কোণে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর খড় পেতে, পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। সারা রাত তার ঘুম হল না। সকাল বেলা কাশতে কাশতে দম আটকে আসতে লাগল। আর মনে হ'ল চোখদুটি যেন মাথার অনেক ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। জ্বর বেড়ে চলেছে। শেষে তার চেতনা কমে এলো। সে অর্ধ-অচেতনের মতো উঠে বসল। স্টোভ ধরাবার জন্য ঘরে এক টুকরোও কয়লা নেই। কালো টিলা থেকে যা সে কুড়িয়ে এনেছিল তা মজুরদের প্রাপ্য তার থেকে এক মুঠো সে নিজের কাজে লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না। কোনো রকমের উঠে কয়েক কামড় শুকনো রুটি খেয়ে তার দিনের কাজে বেরিয়ে পড়ল।

১৫.

মার্চ গিয়ে এপ্রিল এলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থা একটু ভালো হয়ে উঠল। হাওয়া থেমে গিয়েছে। সূর্য অনেকটা উপরে চলে এসেছে। এভাবে গরমের দিন এলো। গরমে বরফ গলতে শুরু করেছে। কালো মাঠ ময়দান এতোদিন বরফে ঢাকা ছিল। বরফ গলে গিয়ে সে সব এখন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এ সময় লার্কপাখির

ডাক শোনা যায়। বনের নানা জাতের গাছে নানা রঙের মুকুল ধরতে থাকে। গ্রামে এখন আর কারো জ্বর নেই। গরম পড়াতে গ্রামের মেয়েরা এখন মার্কাসির কালো টিলাতে কয়লা-কুড়োনোয় বেরুতে পারছে। শীঘ্রই ঘরে ঘরে আবার উনুন জ্বলে উঠেছে। আবার তারা আরামে আগুন পোহাতে শুরু করেছে। শিশুদের এখন আর দিনের বেলাতে বিছানায় ঢেকে রাখা হয় না। তারা এখন বিছানা ছেড়ে দিব্যি খেলা করে বেড়াচ্ছে।

ভিনসেন্ট আবার 'সেলোন' খুলে সভার আয়োজন করল। প্রথম দিনের সভাতে ভিনসেন্টের বক্তৃতা শুনতে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হল, খনিমজুরদের চোখে এখন তৃপ্তির হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। তারা এখন একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে।

ভিনসেন্ট বেদীর উপরে উঠে এলো। আজ আনন্দে তার মনে বান ডেকেছে। গলা ছেড়ে বলল সে, 'আসছে রে, সুদিন আসছে। ভগবান তোমাদের দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সেই দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে তোমরা আজ কাঞ্চন হয়ে বেরিয়েছ। আজ আমাদের চরম কষ্টের অবসান হয়েছে। মাঠে মাঠে ফসল পেকে ওঠবে। দিনের কাজ সেরে তোমরা যখন দাওয়ায় বসে জিড়োবে, রোদ তোমাদের সব কষ্ট দূর করে দেবে। লার্কপাখীর ডাক শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের পিছু পিছু ছুটবে। বনে গিয়ে তারা জাম কুড়োবে। দুঃখের কথা আর বলো না। দুঃখ কি আর থাকবে? সুদিন আসছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে একবার চোখ তুলে চাও, জীবনের সুখ-সম্পদ সব তাঁরই কাছে জমা রয়েছে। ঈশ্বর ক্ষমার আধার, দয়ার সমুদ্র। সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখেন। যারা বিশ্বাসী, যারা সহিষ্ণু, তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন। হৃদয় নিঙড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাও। তাঁরই দয়াতে সুদিন আসছে—সুসময় আসছে।'

খনি-মজুরেরা আবেগের সঙ্গে ধন্যবাদ জানালো। খুশির কলোচ্ছ্বাসে ঘর ভরে গেল। প্রতি জনে প্রতি জনকে ডেকে বলছে 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। সত্যি আমাদের কষ্টের অবসান হয়েছে। শীত কেটে গিয়েছে। সুদিন সুসময় আসছে।'

এর কয়েকদিন পর। ভিনসেন্ট ছেলেদের নিয়ে মার্কাসির ওপাশে কালো টিলায় কয়লা কুড়োতে গিয়েছিল। কুড়োতে কুড়োতে হঠাৎ দেখতে পেল যে-দালানটির মধ্যদিয়ে খনিতে নামবার পথ, তার ভেতর থেকে কালিমাখা অসংখ্য লোক পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে আর মাঠে নেমে এদিকে ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

ভিনসেন্ট বলে উঠল, 'ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এখনো তো তিনটে বাজেনি। সূর্য এখনো মধ্য-আকাশে। এরই মধ্যে ওরা বেরুচ্ছে কেন?

একটি বালক উত্তর দিল, 'খনিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি আগেও একবার ওদের এমনিভাবে দৌড়োতে দেখেছি। নিচে কিছু-একটা ভেঙে গিয়ে থাকবে।'

টিলা থেকে তারা হন্তদন্ত হয়ে নামতে লাগল। নামতে গিয়ে পাথরের কুচিতে লেগে হাতের চামড়া ছড়ে গেল; পরনের কাপড়ও ছিঁড়ে গেল। মার্কাসির চারপাশের ময়দান লোকে লোকারণ্য—কালো পিঁপড়ের মতো কালিমাখা মানুষে ছেয়ে গিয়েছে। ওদিকে গ্রাম থেকে নারী ও ছেলেরা ছুটে আসছে। চারদিক থেকে তারা আতঙ্কে অস্থির হয়ে খনির দিকে ছুটে আসছে।

গেটের কাছে এসে ভিনসেন্ট শুনতে পেলো সবাই মিলে উত্তেজিতভাবে চীৎকার করছে, 'গ্রিসো'। 'গ্রিসো'! 'নতুন 'সিমে' ওরা আটকা পড়েছে। ওরা সবাই আটকা পড়েছে।'

জেক্স ভার্নি সারা শীতকাল অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিল। খবর পেয়ে সে উর্ধশ্বাসে ছুটে এলো। এতদিনে সে অনেক শুকিয়েছে। তার বুক অনেক বসে গিয়েছে। ভিনসেন্ট তাকে থামিয়ে বলল, 'কি হয়েছে! একটিবার বলুন আমায়। কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

'ডেক্রুকদের 'সিমে'ই ঘটেছে। নীল বাতিগুলোর কথা মনে পড়ে? আমি তখুনি জানতাম, ওইগুলোই ওদের খাবে!'

'ক'জন ছিল? সেখানে ক'জন ছিল তারা? তাদের কি বাঁচানো যায় না?'

'বারোটি 'সেল' প্রতি 'সেলে' পাঁচজন করে লোক। আপনি তো ওদের দেখেই এসেছেন।'

'তাদের বাঁচানো যায় না?'

'জানি না যায় কি না। একটা সাহায্যকারী দল নিয়ে এখুনি নিচে নামছি।'

'আমাকেও নিন। আমিও ওদের সাহায্যে করব।'

'না। আপনাকে নিতে পারি না। অভিজ্ঞ লোক ছাড়া আর কাউকে নেবার দরকার নেই আমার।' জেক্স্ এক দৌড়ে প্রাঙ্গণের মধ্যদিয়ে খনিতে নামবার ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলো।

একটি শাদা ঘোড়ায় টানা একখানি ছোট্ট গাড়ি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো। গাড়িখানা অনেক দিনের। এর করুণ ইতিহাস কারো ভুলবার নয়। কতদিন কত মৃতদেহ এই খনির মুখ থেকে মজুর-বস্তিতে বয়ে নিয়েছে এই গাড়িখানা। যারা মরেছে তাদের তো নিয়েছেই, যারা জখম হয়েছে, জীবনের তরে অকেজো হয়ে গিয়েছে, এই গাড়ি তাদেরও সাদরে বহন করে নিয়ে বাড়ি পৌছে দিয়েছে। গাড়িটি এ পর্যন্ত কত মড়া যে পার করেছে তার লেখাজোখা নেই। মজুরদের যারা মাঠ পেরিয়ে ছুটে এসেছিল, নিজ নিজ পরিবার নিয়ে তারা ফিরে যেতে শুরু করেছে। স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ গলা ছেড়ে বিলাপ করছে। অন্যেরা কি এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখবে বলে বড় বড় চোখ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। শিশুদের সোরগোলে আর ফোরম্যানদের চীৎকারে জায়গাটা আর্ত মুখরতায় যেন ভেঙে পড়ছে। তারা রক্ষীদল গড়বে বলে চেঁচিয়ে স্বেচ্ছাসেবী জড়ো করছে।

হঠাৎ সব গোলমাল থেমে গেল। খনিমুখের দালান থেকে একদল লোক বেরিয়ে আসছে। কম্বলে জড়ানো কি একটা ধরাধরি করে আনছে তারা। ধীরে ধীরে সিঁড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সকলে আবার একসঙ্গে চীৎকার ও বিলাপ জুড়ে দিল।

'তোমরা কাকে নিয়ে এসেছ? ওরা কি সব মারা পড়েছে? বেঁচে আছে নাকি তারা? দোহাই তোমাদের, চুপ করে থেকো না, ওদের নাম বলো, আমরা শুনে যাই। ওদের একটিবার দেখতে দাও আমার স্বামী ওখানে কাজ করতে নেমেছিল! আমার ছেলে! আমার দুটি দুধের শিশুকে যে ওই 'সিমে' কাজ করতে পাঠিয়েছিলাম!'

দলটি শাদা-ঘোড়ার গাড়িখানার কাছে এসে থামলো। তাদের একজন বলল, 'সেলের বাইরে তিনজন গাড়িতে কয়লা ভরছিল। এ তিনজনই বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু যা পুড়েছে! ওদের দিকে তাকানো যায় না।'

'ওরা কে? কে এই তিনজন? যীশুর দোহাই দিচ্ছি, বলো বলো ওরা কে? দেখাও আমাদের খুলে দেখাও! আমার ছেলে ওখানে নেমেছিল! আমার ছেলে।'

লোটি কম্বল সরিয়ে দেখাল। দুটি বালিকার মুখ। বয়স প্রায় ন'বছর। পুড়ে ঝলসে গিয়েছে। আর একটি দশ বছরের বালক। তিনজনই সংজ্ঞাহীন, তিনজনেরই আত্মীয়েরা মিলে তাদের উপর ঝুঁকে পড়ে একসঙ্গে বিলাপ জুড়ে দিল। শোকে আনন্দে মিশ্রিত সে গগনভেদী বিলাপ যে না শুনেছে তাকে বোঝানো শক্ত। গাড়িতে তিনখানি কম্বল পেতে তাদের শুইয়ে দেবার পর মেঠো পথে গাড়ি চলতে শুরু করল। পিছনে তাদের আত্মীয়েরা। সঙ্গে ভিনসেন্ট। তারা জন্তুর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির পিছু পিছু ছুটে চলেছে। পিছু থেকে কান্নার রোল শুনতে পেলো ভিনসেন্ট। সে কান্না যারা খনিতে মারা গিয়েছে তাদের আত্মীয়দের। সে কান্না উঁচু থেকে উঁচু হয়ে উঠল। বুক-ফাটা সে কান্নায় বুঝিবা আকাশও ফেটে যায়। ছুটতে ছুটতে একবার সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনদিকটা দেখল। দিক্‌বলয়ে কালো টিলাগুলো গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জমিতে পা রেখে, আকাশে মাথা উঁচিয়ে।

অন্তরের রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করে সে চীৎকার করে উঠল, 'কালো পিরামিডের দেশ! ওরে কালো পিরামিডের দেশ! আবার কতগুলো লোককে মেরে ফেললি তুই! হা ভগবান, তুমি এত নির্মম হতে পারলে! কি করে পারলে তুমি!'

ছেলেমেয়ে তিনটি এত বেশি পুড়ে গিয়েছে যে, বাঁচবার আশা প্রায় নেই। বিকৃতদেহে কেবল প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে। শরীরের যে-সব জায়গা খালি ছিল সেখানকার চামড়াও একেবারে ঝলসে গেছে! ভিনসেন্ট প্রথম ঘরখানাতে ঢুকে দেখল, মা চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়ে তখনো কাঁদছে। সে শিশুর কাপড় খুলে ফেলল। বলল, 'তেল চাই। শীগগীর তেল আনুন।' ঘরে একটু তেল ছিল, স্ত্রীলোকটি এনে দিল। ভিনসেন্ট পোড়া জায়গাগুলোতে তেল লাগিয়ে দিল। বলল, 'এখন ব্যান্ডেজ করতে হবে। ব্যান্ডেজ চাই।'

স্ত্রীলোকটি তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বোবা চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠেছে। ভিনসেন্ট রেগে গেল। চেঁচিয়ে উঠল এবার, 'ব্যান্ডেজ দাও একে মেরে ফেলতে চাও নাকি তুমি?'

স্ত্রীলোকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'ব্যান্ডেজ করার মতো আমাদের কিছুই তো নেই। ঘরে একটুকরো ধোয়া কাপড় নেই। সারা শীত কেটেছে এমনি, কাপড় ছাড়া!'

শিশুটি নড়ে উঠল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল একবার। ভিনসেন্ট গা থেকে কোট ও শার্ট খুলে ফেলল। নিচের শার্টখানাও গা থেকে খুলে দিল। তারপর কোটটা গায়ে দিয়ে বাকি সবগুলো জামা ছিঁড়ে শিশুটির গা থেকে মাথা পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করল। তারপর তেলের পাত্র হাতে ছুটে গেল দ্বিতীয় শিশুটির কাছে। তাকেও এমনিভাবে ব্যান্ডেজ করে তৃতীয় শিশুটির কাছে যখন গেল, তখন কাপড় ফুরিয়ে গিয়েছে। পা-জামার নিচে থেকে পশমি 'ড্রয়ার' বের করে তাই দিয়ে তাকে ব্যান্ডেজ করল। তারপর

খোলা-বুকের উপর কোটটা দুহাতে চেপে ধরে মাঠে নেমে মার্কাসির দিকে চলল। দূর থেকেই সে বিলাপ শুনতে পেলো। ওদের মায়েরা বোনেরা স্ত্রীরা একযোগে বিলাপ জুড়েছে। এ বিলাপের যেন শেষ নেই। খনিমজুরেরা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। একবারে মাত্র একটি একটি দল নিচে গিয়ে উদ্ধার কার্য চালাতে পারে। খনিতে ঢোকার মুখ সংকীর্ণ। উপরের দল প্রতীক্ষা করছে কখন তাদের নামবার পালা আসবে। সহকারী ফোরম্যানদের একজনকে ভিন্‌সেন্ট জিজ্ঞাসা করল :

'কোনো আশা আছে কি?'

'না। এতক্ষণে সব ক'জনই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'তাদের কাছে আমরা যেতে পারি কি?'

'তারা পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে।'

'পাথর সরাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কয়েক সপ্তাহ তো লাগবেই, এমন কি কয়েক মাসও লাগতে পারে।'

'কেন? এত সময় লাগবে কেন?'

'তা লাগে। আগেও এইরকম সময় লেগেছে।'

'তবে কি ওরা ওভাবেই শেষ হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ। পুরুষে ও বালিকাতে মিলে সাতান্নজন–তারা এভাবেই শেষ হয়ে যাবে।'

'তাদের একজনকেও কি আর দেখতে পাব না?'

'না। এ সংসারে আর ওদের কাউকেই দেখা যাবে না।'

ছত্রিশ ঘণ্টা পর পর একটি করে রক্ষীদল নিচে নামচে আর নিচের দল উপরে উঠে আসছে। যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীপুত্রেরা নিচে চাপা পড়ে আছে, খনির কাছে তারা মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। কিছুতেই তাদের সরানো যাচ্ছে না। লোকে তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, ওদের নিশ্চয়ই উদ্ধার করে আনা হবে, ভয় কি! কিন্তু এসব স্তোকবাক্যে তাদের ভুলানো যাচ্ছে না। যে-সব স্ত্রীলোকদের কেউ মারা যায়নি, তারা বাড়ি থেকে তাদের জন্য রুটি আর গরম কফি নিয়ে এলো। তারা তা স্পর্শও করলো না। মাঝরাত্রে জেক্‌স ভার্নিকে কম্বলে মুড়ে তুলে আনা হল। খনির ভিতরে তার রক্তমোক্ষণ হয়েছিল। পরের দিন সে মারা গেল।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে ভিনসেন্ট মাদাম ডেকরুককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। উদ্ধারকারী দল একনাগাড়ে বারোদিন পর্যন্ত কাজ করে চলল। খনির কাজও বন্ধ হয়ে রইল। খনি থেকে এ কয়দিন কয়লা উঠল না বলে, ওদের মজুরিও বন্ধ হয়ে গেল। মজুরদের হাতে যে কয় ফ্রাঙ্ক উদ্বৃত্ত ছিল, শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে গেল। মাদাম ডেনিস রুটি তৈরি করে তা ধারে বিতরণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মূলধন শীঘ্রই ফুরিয়ে এলো। তাঁকে কারখানা বন্ধ করতে হল। কোম্পানি মজুরদের একটি কানাকড়িও দিলো না। বারোদিন পর তারা উদ্ধার কার্য বন্ধ করে দিলো। মজুরদের আবার কাজে লাগতে আদেশ দেওয়া হল। পেটিট ওয়াসমেসের কারো হাতে তখন একটি পাই পয়সাও নেই। সামনে উপুসে মরার বিভীষিকা।

তবু তারা রুখে দাঁড়ালো। তারা ধর্মঘট করল।

ভিনসেন্টের এপ্রিল মাসের মাইনের টাকা এলে ওয়াসমেসে গিয়ে সে তার থেকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের খাবার কিনে বাড়ি বাড়ি বিতরণ করল। সারা গাঁয়ের লোক সেই খাবার খেয়ে দুদিন কাটালো। খাবার ফুরোলে তারা জঙ্গলে গিয়ে জাম কুড়িয়ে গাছের পাতা আর ঘাস কেটে আনতে লাগল। পুরুষরা বেরুলো শিকারের সন্ধানে। ইঁদুর, শামুক, ব্যাঙ, টিকটিকি, বেড়াল, কুকুর কিছুই বাদ দিল না। খিদের জ্বালা মেটাবার জন্যে সব কিছুই পেটে পোরা যায়। শেষে এ সবও ফুরিয়ে এলো। ভিনসেন্ট তখন সাহায্য চেয়ে ব্রাসেলসে চিঠি লিখলো। কোনো সাহায্য এলো না। বৌ ঝি ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে ধুঁকছে, খনি মজুরদের বসে বসে দেখতে হল এ করুণ দৃশ্য।

তারা ভিনসেন্টকে বলল, তাদের আগেই যে সাতান্নজন লোক খনির ভিতরে প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য একটি প্রার্থনা সভা করতে হবে। স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে মিলে শতাধিক লোক এসে ভিনসেন্টের ছোট কুঠরিখানাতে ভিড় করল। ভিনসেন্টের ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। কিছুদিন সে কেবল কফি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। খনির ঘটনার পর থেকে খাদ্য বলতে কিছুই তার পেটে পড়েনি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এমনি দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তার উপর আবার সান্নিপাতিক জ্বরটা ফিরে এসেছে। একটা হতাশার ভাব এসে তাকে আঁকড়ে ধরেছে। তার চোখ দুটি আরো গর্তে ঢুকেছে, গাল বসে গিয়েছে, চোখের নিচে হাড় বেরিয়ে গেছে। সারা মুখে গজিয়েছে কদাকার, লাল দাড়ি। একটা মোটা চট দিয়ে তার শরীর জড়ানো। ঘরে একটি মাত্র লণ্ঠন টিমটিম করে আলো দিচ্ছে। এক কোণে ভিনসেন্ট খড়ের উপর শুয়ে আছে, কনুইয়ে মাথা রেখে। লণ্ঠনের কম্পিত শিখা দেয়ালে, কড়িকাঠে আর দুঃখহীন বেদনাতুর লোকগুলোর উপর ছায়া ফেলেছে। সে ছায়া কাঁপছে–এক অপার্থিব ভঙ্গিতে।

বলতে শুরু করল সে। জ্বরাতুর গলায় সে বলছে। প্রতিটি কথা ঘরের নীরবতাকে নিবিড়তর করে তুলছে। ক্ষুধাতুর ও পরাজয়ে বিধ্বস্ত, শীর্ণ, অস্থিসার খনিমজুরের দল তার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছে, যেন ঈশ্বরকে দেখলেও এমনিভাবে চেয়ে থাকবে। ঈশ্বর অনেক দূরে। আর সে একান্ত কাছের।'

বাইরে অপরিচিত গলার চড়া আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে দেওয়া হলে একটি ছেলে জোরে বলে উঠল, 'ও মশাইরা, মঁসিয়ে ভিনসেন্ট কি এই ঘরে আছেন।'

ভিনসেন্টের ভাষণ থেমে গেল। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় দরজার দিকে। সাজগোজ করা দুজন লোক এসে ঢুকলেন। বাতিটা পলকের জন্য দপ্ করে উঠে কাঁপতে লাগলো। ভিনসেন্ট দেখল আগন্তুকদের মুখে ভয় ও আতঙ্কের ছাপ।

শুয়ে থেকেই সে বলল, 'আসুন, রেভারেন্ড ডি জোঙ, আসুন রেভারেন্ড ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক। মার্কাসিতে সাতান্নজন মজুরের জীবন্ত সমাধি হয়েছিল। আমরা তাদেরই আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করছি। আপনারাও আশা করি এদের সান্ত্বনা দেবার জন্য দু'চার কথা বলবেন।

রেভারেন্ড দু'জন একথার কোনো জবাবই দিলেন না। অনেক পরে রেভারেন্ড ডি জোঙ মুখ খুললেন। ভুঁড়ি দুলিয়ে, চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'অসহ্য! একেবারে অসহ্য!'

ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক ফোড়ন দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনার ভাবা উচিত কোথায় আপনি এসেছেন। আপনি এসেছেন আফ্রিকার জঙ্গলে।'

'ভিনসেন্ট যে এখানে কী ক্ষতি করেছে, কী সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।'

'তার এসব লোককে আবার খাঁটি খৃষ্টান করে তুলতে কত বছর লেগে যাবে ভাবুন দেখি!'

ডি জোঙ হাত দিয়ে বুকের উপর ক্রশ এঁকে বলতে লাগলেন, 'ওকে এখানে চাকরি দিতে আপনাকে আমি পই পই করে বারণ করেছিলাম তখনি।'

'তা জানি। কিন্তু পিটারসন সব মাটি করে দিলে। আর ব্যাপার যে এতখানি গড়াবে, তা কি ছাই স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? ছোকরা একটা আস্ত পাগল।'

'তা ওর যে মাথার ঠিক নেই, তা আমি গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। সেই জন্যই ওকে আমি প্রথম থেকে বিশ্বাস করিনি।'

রেভারেন্ড ফরাসী ভাষায় খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিলেন বলে খনি-মজুররা এর এক বর্ণও বুঝতে পারছিলো না। ভিনসেন্ট রোগে ও দুর্বলতায় কাতর—মনস্থির করে সব কথা শুনছিলো না বলে ওঁদের সব কথা বুঝতেই পারল না।

ডি জোঙ ভুঁড়ি বাগিয়ে লোকদের ঠেলে এগিয়ে এলেন, ভিনসেন্টকে বললেন, 'এই জঘন্য কুকুরদের বাড়ি চলে যেতে বল।'

'কিন্তু আমাদের প্রার্থনা বাকি রয়ে গিয়েছে।'

'থাক। আগে এদের বাড়ি পাঠাও।'

মজুররা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। এবার রেভারেন্ড দুজন ভিনসেন্টকে ছেঁকে ধরলেন। 'তুমি এ কি করছো বল দেখি? এরকম একটা কুঠরিতে লোক ডেকে এনে তুমি ধর্মসভা করছ? তুমি পেয়েছ কি? এই বর্বর ধর্মনীতির আমদানি তুমি কোথা থেকে করলে বলতো? তোমার কি রুচি বলতে, শালীনতা বলতে কিছুই নেই? খৃষ্টান প্রচারকের যোগ্য আচরণ কি এই? তুমি কি একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছ, না, ইচ্ছে করে খৃষ্টান ধর্মে কালি মাখাতে শুরু করেছে!'

রেভারেন্ড ডি জোঙ এক মুহূর্তে থামলেন। কুঠরির সব জায়গায় ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিলেন। ভিনসেন্টের খড়ের বিছানা, গায়ের চট, আর গর্তে-ঢোকা জ্বরাতুর চোখ দুটি দেখে নিলেন। তারপর বললেন—

'মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ, তোমাকে যে আমরা স্থায়ী চাকরি দিইনি, সে আমাদের সাত-পুরুষের ভাগ্যি—শুধু আমাদের নয়, খৃষ্টান ধর্মের ভাগ্যি সেটা। আজ থেকে তোমার চাকরি গেল। তুমি আর কখনো আমাদের কাজ করতে পাবে না। যে লজ্জাকর আচরণ তুমি দেখালে, তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তোমার জায়গাতে একজন নতুন লোক পাঠাচ্ছি আমরা। এখান থেকে তুমি চলে যেতে পার। তোমাকে পাগল বললেও প্রশংসা করা হয়। তুমি খৃষ্টান ধর্মের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু।'

অনেকক্ষণ ধরে সবাই নীরব রইলেন। তারপর রেভারেন্ড বললেন, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট, কিছু একটা কথা বলো। নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য যদি কিছু বলার থাকে তো বলো।'

একটি দিনের কথা ভিনসেন্টের মনে পড়ল, যেদিন ব্রাসেলসে ওঁরা তাকে চাকরি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এখন তার বোধশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছে। কিছু বলা তো দূরের কথা।

খানিক পর রেভারেন্ড ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক বললেন, 'ব্রাদার ডি জোঙ, চলুন, যাই এখান থেকে। আমাদের কিছুই করবার নেই। ও আর কি বলবে, বলবার থাকলে তো। চলুন। ওয়াসমেসে যদি ভালো হোটেল না পাওয়া যায়, আজ রাত্রেই তাহলে গাড়ি করে মন্‌স-এ ফিরে যেতে হবে।'

১৬.

পরদিন সকালে একদল খনি-মজুর এলো ভিনসেন্টের কাছে। বয়সে তারা সবাই প্রবীণ। বলল, 'মঁসিয়ে জেকস্ ভার্নি তো চলে গেল। এখন আপনিই আমাদের ভরসা। যার উপরে আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি এমন লোক আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। আমরা এখন কি করবো আপনাকেই তা বলে দিতে হবে। একান্ত অবিনার্য না হলে আমরা না খেয়ে মারা পড়তে চাই না। আপনি হয়ত ওঁদের বলে কয়ে আমাদের দাবি কিছুটা পূরণ করাতে পারবেন। ওঁদের সঙ্গে দেখা করুন। দেখা করার পর আমাদের যদি কাজে লাগতে বলেন তো কাজেই লাগবো, উপোস করতে বলেন তো তাই করবো। আমরা কেবল আপনার কথাই শুনবো, আর কারো কথা শুনবো না।'

'কারবনেজেস্ বেলজিক'-এর অফিসঘরগুলো শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে! ম্যানেজার ভিনসেন্টকে পেয়ে খুশি হলো। দরদ দিয়ে তার কথাগুলো শুনলেন। শুনে বললেন, 'মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্, খনির মড়াগুলোকে উপরে তুলিনি বলে মজুররা ক্ষেপে আছে তা আমি জানি। তুললে কি ফল হতো বলুন তো ? কোম্পানি স্থির করেছে ঐ 'সিমটা' তাঁরা আর খুলবেন না। এর খরচা পোষায় না বলে তাঁরা এটাকে একেবারে বন্ধ করে দেবেন! এক মাস খোঁড়াখুঁড়ি করলে হয়তো মড়াগুলোকে ওঠানো যেতো, কিন্তু তাতে কি লাভ হতো বলুন? এক কবর থেকে তুলে আর এক কবরে রাখা ছাড়া আর কোনা ফল হতো?'

'যারা মরে গেছে তাদের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। যারা বেঁচে আছে তাদের এখন কি উপায় হবে? খনির ভিতরের অবস্থা ভালো করতে আপনারা কোনো চেষ্টাই কি করবেন না? নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েই কি এদের রোজ রোজ সেখানে কাজ করতে হবে?'

'হাঁ, মঁসিয়ে, ওদের তাই করতে হবে। কোম্পানির তহবিলে ঘাটতি টাকা তাঁরা দেবেন কোথা থেকে? মালিকদের সঙ্গে এই বিবাদে মজুরদের জয়লাভের কোনো আশাই নেই; কেন না, তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিধির বজ্রমুষ্ঠি উদ্যত রয়েছে। তার চেয়েও খারাপ কথা, তারা যদি এক সপ্তাহের ভিতর কাজে যোগ না দেয়, মার্কাসি খনি তাহলে বেশ কিছুকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন মজুরদের যে কী দুর্দশা হবে তা ভগবানই জানেন।'

ভিনসেন্ট পরাজিত। পেটিট ওয়াসমেসের বাঁকা রাস্তা ধরে সে হেঁটে চললো। নিরতিশয় দুঃখে এক সময় নিজে নিজেই বলে উঠলো : 'ভগবান জানেন বটে! তবে সব জেনেও তিনি কিছুই জানেন না!'

এখন স্পষ্ট বোঝা গেল, খনি-মজুরদের আর কোনো কাজ তার দ্বারা হবে না। কেন না, বন্ধ গুহায় ঢুকে তেরো ঘণ্টা করে খাটো, পেট পুরে খেতে না পাও তবু খাটো,

অর্ধেক সেখানে চাপা পড়ে মরো, বাকি অর্ধেক নিরুপায়ের মতো চেয়ে চেয়ে তাই দেখ, আর অসুখ-বিসুখে ভুগে স্বর্গে যাও, খনি-মজুরদের গিয়ে একথাই বলতে হবে। আর কোনো উপায় নেই। কোনো রকমেই তাদের সাহায্য করা তার দ্বারা হয়ে উঠলো না। এমন যে ভগবান তিনিও একবার তাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন না। ঈশ্বরের বাণীতে তাদের চিত্ত ভরে দেবে মনে করেই সে বরিনেজে এসেছিল। কিন্তু এর পর সে তাদের গিয়ে কী বলবে? খনি-মজুরদের চিরকালের শত্রুকে সে চিনে ফেলেছে। এ শত্রু খনির মালিক নয়, এ শত্রু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তা জেনে শুনে তাঁর বাণী এই সর্বহারাদের কাছে সে কি আর প্রচার করতে পারে?

যে মুহূর্তে সে তাদের কাজে যেতে বলবে, মাথা পেতে দাসত্ব নিতে বলবে, সে মুহূর্তে তার প্রয়োজনও ফুরোবে–এর পর তাদের কাছে তার কানাকড়ির দামও থাকবে না। ঈশ্বরের একটি বাণীও লোককে সে আর শোনাতে পারবে না। সমিতি যদি তাকে আবার কাজে বহাল করেন, তবু না। কেন না, ঈশ্বরের হাজার বাণীও এখন আর তাদের উপকারে আসবে না। খনিমজুরদের কান্নায় ভগবান কান দেননি, বধির হয়ে গিয়েছেন, নিরেট পাষাণ হয়ে গিয়েছেন তিনি। সে পাষাণকে গলাতে গিয়ে ভিনসেন্টের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

একটা বিষয় তার কাছে সহসা স্পষ্ট হয়ে গেল। বিষয়টা অনেক দিন থেকে তার জানা। আজ সেটা একেবারে খোলসা হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বরকে নিয়ে এত যে ছেলেমানুষী কল্পনার জাল বোনা হয়েছে, সে কেবল ভয়ের তাড়নায়। ঈশ্বরের কথা সে তো আঁধার রাতে নিঃসঙ্গ, মৃত্যুপথযাত্রীর ভীত, যন্ত্রণাবিকৃত প্রলাপবাক্য। আসলে ঈশ্বর নেই। একথা জলের মতো সহজ আর আগুনের মতো সত্য যে, ঈশ্বর নেই। আছে কেবল একটা স্মৃতিমান আদিম অনিয়ম। দুঃখ, যাতনা, নিষ্ঠুরতায় ভরা একটা সীমাহীন অন্ধ অনিয়ম।

১৭.

খনি-মজুররা আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

ভিনসেন্টের ভাই থিওডোরাস্ ভ্যানগোঘ্ ধর্মসমিতির কাছ থেকে ভিনসেন্টের সব কথা শুনে কিছু টাকা পাঠিয়ে ভিনসেন্টকে পত্র লিখলো, 'ইটেনে' চলে আসার জন্যে। পত্র পেয়ে ভিনসেন্ট ফিরে এলো না। আবার ডেনিসদের বাড়ি গিয়ে জায়গা নিল। যে 'সেলোনে' ধর্মসভা হতো, বিদায় নেবার জন্য একবার সেখানে গেল। আর এখানে সভা হবে না। ছবির প্রিন্টগুলোকে দেওয়াল থেকে তুলে এনে ডেনিসদের বাড়ির যে ঘরটিতে থাকতো সেখানে টাঙিয়ে দিল।

আবার সে দেউলিয়া-অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। দেহে মনে সে নিঃস্ব একেবারে দীনাতিদীন হয়ে গিয়েছে। চাকরি নেই, হাতে টাকা নেই; স্বাস্থ্য খুইয়েছে; গায়ে এতটুকু বল নেই। উৎসাহ, উদ্দীপনা, কামনা বাসনা সব কিছু তাকে ছেড়ে গিয়েছে। আকাঙ্ক্ষা আদর্শ সব হারিয়ে বসেছে। সব চেয়ে মর্মান্তিক কথা, জীবনটাকে বয়ে বেড়াবার অবলম্বনটুকুও ভেঙে পড়েছে। বয়স হয়েছে ছাব্বিশ। এরই মধ্যে জীবনে একবার দু'বার নয় পাঁচবার ব্যর্থতা এসেছে। আবার নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াবে এ সাহস তার আর নেই।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লালচে দাড়িতে সারা মুখে ঢেকে গিয়েছে। মাথার চুল উঠে পাতলা হয়েছে। আগে যে মুখ ছিল গোল আর ভরাট, এখন তা শুকিয়ে লম্বা হয়ে গিয়েছে। চোখদুটি গর্তে ঢুকে কোথায় তলিয়ে গেছে দেখাই যায় না। তাকে চেনাই দায়। সে যেন ভিনসেন্ট ভ্যানগোঘের আর একটা শুকনো, জীর্ণ, বিকৃত মূর্তি।

মাদাম ডেনিসের কাছ থেকে এক টুকরো সাবান চেয়ে নিয়ে আপাতমস্তক ধুয়ে ফেলল সে। এক সময় যে শরীর ছিল মাংসে ভরাট, ছিল অফুরন্ত শক্তি, আজ তা জীর্ণ, দুর্বল, শোলার মতো পাতলা। যত্ন করে দাড়ি কামালো সে। ভেবে অবাক হলো–এত অল্প সময়ে মুখের নানা জায়গায় নানা রকম হাড় বেরিয়েছে–এতদিন এরা সব ছিল কোথায়? অনেক দিন মাথায় চিরুনী পড়েনি। এতকাল পরে আজ সে আগের মতো করে চুল আঁচড়ালো। মাদাম ডেনিস তাকে স্বামীর একখানি শার্ট ও স্যুট এনে পরতে দিলেন। এসব পরে আজ প্রথম সে ভালো খাবার মুখে তুললো। কিন্তু মুখে তা রুচলো না। পোড়া কাঠের মতো অভক্ষ্য মনে হলো খাবারগুলোকে।

তার যে ধর্মসভা নিষিদ্ধ হয়েছে, মজুরদের সে তা এখনও জানায়নি। তবু তারা সভা করতে তাকে বলছে না। ধর্মতত্ত্ব শোনার আগ্রহও যেন তাদের আর নেই। ভিনসেন্টও তাদের সঙ্গে কথা বলা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। কারো সঙ্গেই সে আর বড় একটা কথা বলে না। আসতে যেতে দেখা হয়ে গেলে সংক্ষেপে কেবল 'সুপ্রভাত' বলেই সেরে নেয়। ওদের ঘরে কখনো যায় না বা ওদের রোজকার কাজেকর্মে নিজেকে আর আগের মতো জড়ায় না। মালিকদের সঙ্গে ওদের যে চুক্তি হয়েছে তার কোনো কোনো গোপন শর্ত মানতে গিয়ে ওরা ভিনসেন্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে। তার এই পর-পর ভাব দেখে ওরাও কিছু মনে করে না বা তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তার জন্য তাকে দোষও দেয় না। ওরা নিরবে সব বুঝে নিয়েছে। জীবন এগিয়েছে।

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে–কে ভোসের স্বামী হঠাৎ মারা গেছে। ভিনসেন্টের অনুভূতিও বুঝি বা মরে গিয়েছে। কেবল স্মৃতি কোন্ সুদূর পরদায় একটা দাগ–ক্ষীণ দাগ রেখে যায় মাত্র।

দিনের পর দিন কেটে যায়। ভিনসেন্ট কেবল খায়, ঘুমোয় আর চুপ করে বসে থাকে। এ ছাড়া আর কিছুই করে না। জ্বর-জ্বর ভাব ধীরে ধীরে সেরে যেতে লাগল। শরীরে বল ও ওজন একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। কিন্তু চোখদুটি আর ভেসে উঠল না। তারা গভীরেই তলিয়ে রইলো। গ্রীষ্মকাল এলো। কালো মাঠ-ময়দান, চিমনি আর কয়লা কুড়োবার টিলা রোদে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠলো। ভিনসেন্ট এখন গাঁয়ের পথে বেড়াতে বেরোয়। ব্যায়ামের জন্য বা মনের খুশিতে যে বেড়াতে বেরোয় তা নয়। বেড়াতে বেড়াতে সে কোথায় যাচ্ছে, কোন্ কোন্ জায়গা পাশ কাটাচ্ছে, সে জানতেই পারে না। শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে তার আর সময় কাটে না, তাই সে বেড়াতে বেরোয়। বেড়াতে বেড়াতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর ভাল লাগে না, তখন বসে পড়ে, শোয় বা দাঁড়িয়ে থাকে।

হাতের টাকা ফুরোবার কিছু পরেই প্যারিস থেকে তার ভাই থিওর এক চিঠি এলো। লিখেছে, বরিনেজে পড়ে থেকে জীবনটা আর নষ্ট করো না। কিছু টাকা পাঠালুম। মন স্থির করে, লক্ষ্য ঠিক রেখে একটা কাজে লেগে যাও। ভিনসেন্ট টাকাগুলো নিয়ে মাদাম ডেনিসের হাতে দিল। জায়গাটা তার খুব ভাল লাগে বলেই যে এখানে সে পড়ে আছে তা নয়। আর কোনখানে যাবার জায়গা নেই বলে সে যায় না। আর কোথাও যেতে হলেও যতখানি চেষ্টা উদ্যমের দরকার তাও তার নেই।

ভগবানকে সে হারিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও হারিয়েছে। এখন আবার হারিয়ে বসল জগতের সবচেয়ে সেরা বস্তুকে : এ সংসারে কেউ তাকে বোঝেনি; বুঝেছিল একমাত্র থিও। সকল দুঃখে একমাত্র সেই ছিল সান্ত্বনা। ভাইয়ের প্রতি তার ছিল সীমাহীন দরদ। বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, অন্তর দিয়ে কেবল সেই তাকে বুঝেছিল। সেই থিও-ও তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। সারা শীতকাল ধরে সপ্তাহে দুবার করে সে চিঠি লিখত; প্রীতি ও মমতায় উচ্ছ্বসিত সে-সব বড় বড় চিঠি অত দুঃখের মাঝেও আনন্দের খোরাক দিত। এখন সে-সব চিঠি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। থিও-ও শেষে বিশ্বাস হারিয়ে বসল, আশা ছেড়ে দিল। ভিনসেন্ট তাই আজ একা, একেবারে নিঃসঙ্গ। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাকে একা ফেলে সরে পড়েছে, এক ঘনঘোর দুর্যোগের রাতে সে একা মরণ-পথযাত্রী; পরিত্যক্ত জনশূন্য জগতে সে-যেন এক মৃতের পদচারণা! তার অস্তিত্ব এখনো যে রয়েছে সেইটেই আশ্চর্য।

১৮.

গ্রীষ্মের অবসান হল। এলো নববর্ষা। ঝরাপাতা উড়ে গিয়েছে, মরা ঘাস নিশ্চিহ্ন। নির্জীব সব কিছুর আজ অবসান। এরই সঙ্গে ভিনসেন্টের মৃতকল্প সত্তায় একটু একটু করে যেন নতুন প্রাণের ডাক এলো। বাইরের প্রকৃতি তার মনে আজ জাগিয়েছে নবোগত জীবনের তৃষ্ণা। তার নিজের জীবন আজ বিধ্বস্ত। তাকে নিয়ে উৎসব করা চলে না। তাই সে পরের জীবন নিয়ে মেতে উঠল। বই পড়ায় মন দিল আবার। পড়ায় তার সব সময়েই অসীম অনুরাগ। এত আনন্দ সে আর কিছুতে পায় না। এবং সে অপর লোকের জয়-পরাজয়, হাসি অশ্রুর মাঝে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে চিরদিনের মানসিক যাতনার উপশম করতে লাগল।

আবহাওয়া ভালো থাকলে মাঠে বেরিয়ে সারাদিন বই পড়তো সেখানে বসে। বৃষ্টির দিনে হয় শুয়ে নয় তো চেয়ারে কাত হয়ে বই নিয়ে এক অজ্ঞাত জগতে ডুবে যেতো। দিনের পর দিন যায়; এভাবে পড়ে পড়ে তারই মতো শত শত সাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হতে থাকে। এসব লোক তারই মতো জীবন নিয়ে সংসারে এসেছিল। তারই মতো তারা সংগ্রাম করেছে, কখনো এক আধটু সাফল্যও এসেছে তাদের জীবনে; কিন্তু ব্যর্থতাই এসেছে বেশি। তাদের জীবনের ছাঁচে নিজের জীবনটাকে ছকে নিল সে। বার বার এই কথাগুলো তার মগজে তোলপাড় করতে লাগল : 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। এতটুকু সাফল্য আমার জীবনে আসেনি; এতটুকু জয় আমার জীবনে লাভ হয়নি। এখন আমি কী করি? কোন্ কাজে হাত দিই? কোন্ বিষয়ে চেষ্টা করি? কোন্ কাজের আমি যোগ্য? এ জগতে কোন্খানে আমার যথাযোগ্য স্থান

হতে পারে?' যখন যে বইটি হাতে নেয় তাতেই সে খোঁজে জীবনের উদ্দেশ্য। কোন্ পথে চললে জীবনটাকে আবার সার্থক করা যায় বইয়ের পাতায় পাতায় সে খোঁজে তারই সন্ধান।

বাড়ি থেকে যেসব চিঠি আসে তাতে তাকে বার বার জানিয়ে দেওয়া হয় তার এভাবে দিন কাটাবার কোন মানে হয় না। তার বাবা জানিয়েছেন, এরকম অলস জীবন যাপন করে সে সামাজিক শালীনতা ভঙ্গ করছে। নিজেকে প্রতিপালন করতে হলে, সমাজে দশজনের একজন হয়ে চলতে হলে এবং জগতের প্রতি তার যে দায়িত্ব আছে তা পালন করতে হলে গোড়াতেই তাকে কাজ পেতে হবে। কাজ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে সে কখন?

এ প্রশ্ন তাকে করা বৃথা। এ প্রশ্নের জবাব সে অন্যকে দেবে কি, এর জবাব খুঁজতে গিয়ে সে থই হারিয়ে ফেলেছে।

পড়তে পড়তে শেষকালে সে এমন একটা অবস্থায় পৌছালো যার নাম দেওয়া যায় মগ্নচৈতন্যের দশা। বাহ্যজ্ঞান থাকতো না, হাত থেকে বই পড়ে যেতো। যখন তার জীবনে প্রথম ভাঙন শুরু হয়, সেই থেকে তার অনুভূতি লোপ পেয়েছিল, আবেগ বা প্রেরণা দিয়ে কোনো কিছু অনুভব করতে পারত না। সে ভাব কাটিয়ে ওঠার জন্যই সে সাহিত্য নিয়ে পড়েছিল; তার সাহিত্য পাঠ ব্যর্থ হয় নি। এখন সে প্রায় সেরে উঠেছে। তার ভোঁতা অনুভূতি আবার ধারালো হয়ে উঠেছে। যে বেদনা ছিল তার নিত্যসঙ্গী তারই উপলব্ধি আবার সে ফিরে পেয়েছে। যাতনার ঐক রুদ্ধ আবেগপ্রবাহ ফল্গুর মতো এ কয়মাস তার মধ্যে সুপ্তিমগ্ন ছিল, উপলভাঙা খরস্রোতা নদীর মতো তা আবার তার শুষ্ক চিত্তকে প্লাবিত করল, সঙ্কুচিত অন্তরে ডেকে আনল বেদনা ও নৈরাশ্যের কূলপ্লাবী জোয়ার। জীবনের একেবারে শেষ ধাপে নেমে গিয়েছিল সে। স্বজ্ঞানে।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, সে একেবারে অপদার্থ নয়। তার মধ্যে ভাল জিনিস কিছু কিছু আছে; সে জগতের কোনো কাজে লেগে যেতেও পারে। তবে, কাজকারবারের বাঁধাবাঁধি নিয়ম তার সইবে না। কিন্তু এ ছাড়া আর সব কিছুকেই তো পরখ করে দেখল, কোনোটাই তো মনের মতন হল না। তবে কি ব্যর্থ হওয়া আর যাতনা ভোগ করাই তার বিধিলিপি? জীবনের সব কিছুই কি তার এখানেই শেষ?

প্রশ্নগুলো আপনা থেকে জাগল; কিন্তু তার জবাব খুঁজে পাওয়া গেল না। এভাবে চিন্তাহত হয়ে ঝড়ের বেগে তার সময় কেটে যেতে লাগল। বর্ষা-শরতের দিনগুলো তার হু হু করে কেটে গেল। এলো শীত। বাবা হয়ত বিরক্ত হয়ে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেবেন। ডেনিসের বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে তাকে হয়ত আর কোথাও গিয়ে নামমাত্র খাবার খেয়ে দিন গুজরান করতে হবে। তাই শুনে থিওর মনে কিঞ্চিৎ দয়া জাগবে, বিবেকের তাড়নায় কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে সে। কিন্তু তারও যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। কত আর দেবে সে। তবে বাবা চুপ করে থাকতে পারবেন না। ছেলের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ জাগবেই। এসব চিন্তার টানাপোড়েনে ভিনসেন্ট অনেকটা সময় কাটিয়ে দিতে লাগলো। সময় কাটানোর ভাবনা তার অনেকটা কমে এলো।

নভেম্বর মাসে একদিন সে হাঁটতে হাঁটতে মার্কাসি খনির কাছে গেল। দিনটা বেশ পরিষ্কার। শূন্য হাতে, শূন্য মনে চলতে চলতে পাঁচিলের বাইরে একটা জং ধরা লোহার

চাকার উপর গিয়ে বসল। একটি বুড়ো খনিমজুর গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো। তার কালো টুপি সামনের দিকে টেনে দিয়েছে, তাতে চোখ অবধি ঢাকা পড়েছে। কাঁধ কুঁচকে কুঁজোর মতো হয়ে গিয়েছে। হাত দুটো জামার পকেটে। হাড়সর্বস্ব হাঁটু দুটির কাঁপুনিতে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। লোকটার মধ্যে কি যে সে দেখতে পেলো ঠিক জানে না। তবু সেই অজানা ভাবটাই তার অন্তরকে লোকটার প্রতি আকর্ষণ করল। কোনো বিশেষ কৌতূহলের বশে যে তা নয়, নিতান্ত হেলাফেলার ভাব নিয়েই সে পকেটে হাত দিল। বের করলো এক টুকরো পেন্সিল। বাড়ি থেকে একটা চিঠি এসেছিল। পকেট থেকে সেটাও বের করল। খামের উলটো পিঠে তাড়াতাড়ি একটা স্কেচ করে ফেলল–কালো ময়দানের মাঝ দিয়ে যে লোকটা জীর্ণ তরীর সাগর পাড়ি দেওয়ার মতো টলতে টলতে পাড়ি দিচ্ছে–তারই একটা স্কেচ করে ফেলল।

ভিনসেন্ট বাবার চিঠিখানা খুলে দেখল, তার একপিঠে লেখা আর একপিঠ সাদা। দু এক মিনিট পরে আর একজন মজুর গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো। সতেরো বছরের তরুণ। লম্বা গড়ন। শরীর এখনো সোজা আছে, বেঁকে যায়নি। কাঁধ নুয়ে যায়নি; বরং মার্কাসির পাথুরে পাঁচিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাঁধ দুটি তার প্রাণের প্রাচুর্যে উঁচু হয়ে উঠছে। সে দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার আগেই ভিনসেন্ট কয়েক মিনিটের চেষ্টায় তারও একটা স্কেচ করে ফেলল।

১৯.

ডেনিসদের বাড়ি গিয়ে ভিনসেন্ট কয়েকখানা পরিষ্কার সাদা কাগজ আর একটা মোটা পেন্সিল জোগাড় করল। তার রাফ স্কেচ দুটোকে ডেস্কের উপরে রেখে সে কপি করতে বসে গেল। ছবি আঁকার হাত এখনো কিছুই ঠিক হয়নি। তার উপরে মনের শাসনও এতটুকু নেই। তাই মন ছেড়ে রেখাগুলোকে কাগজে রূপ দিতে গিয়ে অথৈ সাগরে পড়ল। যতবার পেন্সিল চলল, ইরেজার চলল তার চাইতে অনেক বেশি। তবু সে এক মনে আঁকতে লাগল কোনো দিকে না তাকিয়ে। ছবি আঁকায় সে তন্ময় হয়ে গেল। তাই কখন সন্ধ্যা হয়েছে, ঘর আঁধার হয়ে গিয়েছে সে খেয়াল নেই তার। মাদাম ডেনিস দরজার কড়া নাড়তে তার হুঁশ হল।

মাদাম ডেকে বললেন, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট টেবিলে আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।'

'খাবার দেওয়া হয়েছে। এখনি কি খাওয়ার সময় হয়ে গেল। এত শীগ্‌গীর।'

খেতে বসে ডেনিস দম্পতির সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলল ভিনসেন্ট। চোখেও তার কেমন একটা উজ্জ্বলতা। ডেনিস-দম্পতি পরস্পর চোখ টিপলেন। সামান্য কিছু খেয়েই ভিনসেন্ট খাওয়ার টেবিল থেকে বিদায় নিল। ঘরে এসে বাতি জ্বেলে ছবি দুটো দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখল। দেখে নিজে নিজেই বলে উঠল–

'দূর! এ কিছুই হয়নি। একেবারেই কিছু হয়নি। দেখা যাক, কাল যদি আর একটু ভাল করতে পারি।

কেরোসিনের বাতিটা মেঝেয় রেখে শুয়ে পড়ে তাকালো স্কেচ দুটোর দিকে উদাসভাবে। দেয়ালে আরো অনেক স্কেচ টাঙানো। অলক্ষ্যে সেগুলোর দিকেও তার

চোখ পড়ল। সাত মাস আগে 'সেলোন' থেকে খুলে আনবার সময় সেই যে স্কেচগুলো দেখেছিল, তারপর থেকে এগুলোর উপর আর চোখই পড়েনি সত্যিকারভাবে। এতদিন পরে আজকে সে দেখার মতো দেখল। আচমকা একটা অনুভূতি জাগল তার। ছবির জগৎ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শ্রান্ত পথযাত্রীকে প্রদোষের স্তিমিত আঁধারে তার ঘরের মায়া যেভাবে আকর্ষণ করে, ছবির এক মায়ারাজ্য থেকে তেমনিভাবে ডাক এসেছে তার। মাতিয়ে তুলেছে, চঞ্চল করে দিয়েছে তাকে। এক সময়ে বড়ো বড়ো শিল্পীদের সম্বন্ধে তার কিছু জানা শোনা ছিল। রেমব্রান্ট কে ছিলেন, মিলে, জুল, দুপ্রে, দেলাক্রোয়, মারিস, এঁরাই বা কেমন ধারা ছবি আঁকতেন জানতো সে। এক সময়ে এঁদের আঁকা অনেক প্রিন্ট সে যোগাড় করেছিল; কত লিথোগ্রাফ আর এচিং তার ভাই থিওকে পাঠিয়েছে, মা ও বাবাকে উপহার দিয়েছে সেসব কথা এখন তার মনে পড়তে লাগল। লন্ডন ও আমস্টারডামের মিউজিয়ামে কত সুন্দর সুন্দর ক্যানভাস দেখেছে, তাও মনে পড়ল। ছবির সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের সেই মধুময় স্মৃতি ভাবতে ভাবতে তার চিত্তদৈন্য কমে আসতে লাগল; দুঃখের অনুভূতি ফিকে হয়ে এলো; ডুবে গেল সে গভীর প্রশান্ত নিদ্রায়। কেরোসিনের বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে তেল ফুরিয়ে গিয়ে এক সময়ে নিভে গেল।

পরদিন ভোর আড়াইটায় তার ঘুম ভাঙলো। গত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নতুন প্রাণ নিয়ে নতুন মানুষ হয়ে যেন জেগে উঠেছে সে। বিছানা ছেড়ে কাপড় চোপড় বদলে সে কাগজ পেন্সিল আর পাতলা একখানা বোর্ড হাতে নিয়ে মার্কাসির পথে বেরিয়ে পড়ল। তখনো আঁধার রয়েছে। আগের দিনের সেই জং ধরা লোহার চাকার উপরে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল মজুররা কখন খনিতে আসতে শুরু করবে।

তারা আসতে আরম্ভ করল। সেও তাড়াতাড়ি স্কেচ করতে লাগল। এখন কেবল খসড়া করে যাবে। ছবি শেষ করবে বাড়ি গিয়ে। এক ঘন্টায় সবার খনিতে নামা হয়ে গেল। এর মধ্যে সে মুখ বাদ দিয়ে পাঁচখানা আকৃতির খসড়া করে ফেলল। তারপর মেঠো পথ ধরে খুশি মনে বাড়ি চলল। রোদ উঠলে খসড়াগুলো কপি করতে বসল। 'বরেন'দের মুখে ক্ষণে ক্ষণে টোল খায়। মুখ আঁকতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ফোটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার মডেলগুলো যখন তার পাশ দিয়ে চলেছিল তখন ফর্সা হয়নি বলে মুখের ঐ কারুকর্ম সে টুকে আনতে পারেনি।

যা সে এঁকেছে তার 'অ্যানাটমি' আগাগোড়া ভুল। আকৃতিগুলোতে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য একদম নেই। রেখাগুলো বেঢপ। হাসির উদ্রেক করে। তবু আকৃতিগুলো মূলত বরেনদের স্বরূপ নিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। দেখে এদের 'বরেন' বলেই চেনা যায়, আর কিছু বলে ভুল হয় না।

নিজের, অক্ষমতায় তার হাসি পেল। স্কেচগুলোকে ছিড়ে ফেলল। খাটের কোণে গিয়ে বসল দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবি সামনে রেখে। ছবিটিতে একটি মেয়ে এক শীতের রাস্তায় কয়লা আর গরম জল নিয়ে চলেছে। ভিনসেন্ট ছবিটার কপি করতে বসল। কোনো রকমে স্ত্রীলোকটিকে ফুটিয়ে তুলল। কিন্তু রাস্তার বা পশ্চাৎপটের

ঘরবাড়িগুলোর সঙ্গে তাকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারল না। কাগজটা মুড়ে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর 'বসবুম' এর আঁকা একখানা 'স্টাডি' চিত্র সামনে করে চেয়ারে গিয়ে বসল। চিত্রে একটা লম্বা গাছ একা দাঁড়িয়ে। পশ্চাৎ পটে মেঘলা আকাশ। দেখে মনে হল খুবই সহজ। মাত্র একটা গাছ, একটু কাদাটে রঙ, আর উপরে মেঘের কয়েকটা পুঞ্জ। কিন্তু সহজ বস্তুকে রীতি ও রূপ অবিকৃত রেখে নির্ভুল আঙিকে প্রকাশ করাতেই 'বসবুমে'র শিল্পের সার্থকতা। ভিনসেন্ট বুঝতে পারল, সহজ চিত্র আঁকা কঠিন; নকল করা আরো কঠিন।

সারা সকাল কোথা দিয়ে কেটে গেল। কাগজগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভিনসেন্ট তার জিনিসপত্রগুলো ভালো করে খুঁজে পেতে দেখল পয়সা কড়ি কি আছে না আছে। খুঁজে পেতে পেলো মোটে দুই ফ্রাঙ্ক। তাই দিয়ে ভাল কাগজ আর চারকোলের স্টিক কিনবে মনে করে সে মন্‌স-এর দিকে হেঁটে চলল। বারো কিলোমিটার পথ। ওয়াসমেস আর পেটিট ওয়াসমেসর মাঝ দিয়ে নিচে নামতে নামতে দেখা গেল কতকগুলো স্ত্রীলোক, খনিমজুরদের বৌ-ঝি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ তাদের মামুলি অভিবাদন মাত্র না করে হৃদ্যতার সঙ্গে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে 'পোটুরেজ' শহর। সেখানে একটা রুটির দোকানের জানালায় চমৎকার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে মাত্র দেখবার জন্য ভিনসেন্ট দোকানে ঢুকে পাঁচ 'সেন্টাইম'-এর একটা কেক কিনে ফেলল। পটুরেজ আর কোয়েসমেসের মাঠগুলোতে ঘনবর্ষণের ফলে উজ্জ্বল সবুজ ছায়া পড়েছে। তার কাছে যে পয়সা আছে তাতে যদি একটা সবুজ পেন্সিলও হয়ে যায় তা হলে ফিরে এসে এগুলোর স্কেচ করা যাবে।

মন্‌স-এ এসে একটা মসৃণ হলদে কাগজের প্যাড, কিছু চারকোল আর একটা মোটা লেড পেন্সিল কিনল। দোকানের সামনে ছবির কতকগুলো পুরানো প্রিন্ট একটা খোলা বাক্সে রাখা। ভিনসেন্ট ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো দেখল, কিন্তু পয়সা না থাকায় কিনতে পারল না। তার আগ্রহ দেখে দোকানদারও এসে ছবির বাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ল। দুজনার মধ্যে চলল ছবি সম্বন্ধে আলোচনা। দেখে মনে হবে যেন দুজন পুরনো বন্ধু মিউজিয়ামে এসেছে।

দুজনে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখার পর ভিনসেন্ট বলল, 'হাতে পয়সা নেই বলে একটা ছবিও কিনতে পারলুম না। এ জন্য ক্ষমা করবেন।'

দোকানদার বলল, 'তাতে কি হয়েছে। আপনি আরেকদিন আসবেন। হাতে পয়সা না থাকলেও আসবেন।'

বারো কিলোমিটার পথ অলসভাব হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়ি এলো।

পিরামিডের মতো টিলার পর টিলা দিকচক্রবালে মিশে গেছে; সূর্য ডুবছে তার উপর দিয়ে। মেঘ ভাসছে। অস্তমান সূর্যরশ্মি তাদের উপর রং ফেলেছে। মেঘের বাইরের অংশগুলোতে নানা বর্ণের চমকে যে বিভ্রম ছড়াচ্ছে, তার তুলনা নেই। কয়েসমেসের ছোট ছোট পাথরের বাড়িগুলো যেন স্বাভবিক এটিং ডিজাইনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। নিচে সবুজ উপত্যকাগুলো খুশিতে উপ্‌চে পড়ছে। ভিনসেন্ট নিজের মধ্যেও একটা খুশির আমেজ পেল। এ কিসের খুশি ভেবে কূল কিনারা পেল না।

পরদিন সে মার্কাসির পাশে কয়লা কুড়োবার টিলায় গেল। মেয়েরা সেখানে আবর্জনার মাঝে উবু হয়ে কয়লার গুঁড়ো কুড়োচ্ছে। যেন স্বর্ণরেণু কুড়োচ্ছে এমনি ধৈর্য আর আগ্রহ নিয়ে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে ভিনসেন্ট বলল, 'মঁসিয়ে ও মাদাম ডেনিস, আমার একটা কথা আছে। দয়া করে এক মুহূর্ত বসুন, টেবিল ছেড়ে উঠবেন না। আমি একটা কাজ করব।'

ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ড্রাই প্যাড ও চারকোল নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি আঁকতে শুরু করে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনের আলেখ্য কাগজে আঁকা হয়ে গেল। মাদাম ডেনিস এগিয়ে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালেন। বলে উঠলেন, 'মঁসিয়ে ভিনসেন্ট আপনি আর্টিস্ট?'

ভিনসেন্ট বিব্রত হয়ে বলল, 'না না, আমি কেবল নিজের খেয়াল খুশিমত আঁকতে শুরু করেছি মাত্র।

মাদাম ডেনিস বললেন, কিন্তু এতো বেশ সুন্দর হয়েছে। প্রায় আমারই মতো দেখাচ্ছে তো।'

'প্রায় আপনার মতো দেখাচ্ছে, পুরোপুরি আপনার মতো দেখাচ্ছে না তো।' ভিনসেন্ট হাসতে হাসতে বলল।

ভিনসেন্ট যে ছবি আঁকায় হাত দিয়েছে বাড়ি সে তা লিখে জানায়নি, কেননা, জানালে তাঁরা বলবেন, 'এই রে, আবার তাকে পাগলামিতে ধরেছে। সে মানুষ হবে কবে। কাজের মতো কাজ তার দ্বারা কিছুই হবে না দেখছি।'

তা ছাড়া সে আজ এক নতুন জগতে ঢুকেছে। এ জগৎ সম্পূর্ণ তার নিজের। অন্য কারো সেখানে পা ফেলবার জো নেই। তার ছবি আঁকার কথা আর কারো কাছে সে মুখ ফুটে বলতেই পারে না, লিখে জানানো তো দূরে কথা। এ জগৎ তার কল্পলোকের রাজপুরীর মতো। নিজের কাছে হাজার ঐশ্বর্য নিয়ে ছড়িয়ে আছে, আর কারো পদধ্বনি শুনলেই স্বপ্নসৌধের মতো কোথায় লুকিয়ে যাবে কে জানে। ভিনসেন্ট তার স্কেচগুলোর প্রতি একটা অপত্যস্নেহ বোধ করে। নিজের ছবির প্রতি আজকের মতো এমন মমতা আর কোনো দিন জাগেনি। অপরের চোখের সামনে এগুলোকে তুলে ধরা মর্মান্তিক। নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার মতো। ওগুলো ভালো হয়নি একথা সত্যি। ওগুলোতে নিতান্তই কাঁচা হাতের ছাপ, তাও সত্যি। তবু তার সব অসম্পূর্ণতাকে আড়াল করে একটা সুপবিত্র ভাব ফুটে উঠেছে—তার কাছে—কেবল তারই কাছে। সে নিজের মধ্যেই সেটা লালন করবে। অন্যে তার মর্ম কি বুঝবে?

আবার সে খনিমজুরদের ঘরে ঘরে যেতে শুরু করল। এবার আর বাইবেল নিয়ে নয়, ড্রইং-এর কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে। তাকে পেয়ে ওরা আগের মতোই খুশি হল। আঙিনায় শিশুরা খেলা করছে, বৌঝিরা ঝুঁকে পড়ে স্টোভ ধরাচ্ছে, দিনের কাজ সেরে খনিমজুর বাড়ি এসে ছেলেদের নিয়ে খেতে বসেছে—এই রকমের অনেক ছবি তার আঁকা হয়ে গেল। সারি সারি লম্বা চিমনি নিয়ে কালান্তকের মতো দাঁড়িয়ে আছে যে মার্কাসি কয়লাখনি, ভিনসেন্ট তাকেও রেহাই দিল না। কালো ময়দান, খাদের পথে দেবদারু গাছের সারি, 'পাটুরেজে' পল্লীর জমিতে লাঙল হাতে চাষী, একে একে সবাই

তার ড্রইংএ ধরা দিতে লাগল। যেদিন বৃষ্টি থাকে, ঘরে বসে দেয়ালে টাঙানো প্রিন্টগুলোর কপি করে, আগের দিনের আঁকা খসড়াগুলোকে ঘসেমেজে কেতাদুরস্ত করে। রাত্রিতে যখন শুতে যায়, মনে মনে বিচার করতে থাকে, আজকের দিনে যত ছবি আঁকা হলো তার দু-একটা মনে হয় তেমন খারাপ হয়নি। হয়তো ভালই হয়েছে। কিন্তু পরদিন জেগে উঠে বুঝতে পারে কাল যাকে ঘুমের নেশায় ভালো মনে হয়েছে, আসলে সে খারাপ, ভুলে একেবারে ভরা। উঠে গিয়ে ছবিগুলো ও ফেলে দেয়।

আত্মনির্যাতনের যে দুঃসহ যন্ত্রণা এতদিন তাকে খাবলে খাবলে খাচ্ছিল, আজ তাকে সে কাবু করে এনেছে। এখন সে সুখী, কারণ দুঃখের ভাবনা সে আর ভাবে না। এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি, বাবা আর ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে আছে একটা চিন্তার বিষয় বটে। এতে তার লজ্জা পাওয়া উচিত। সবই সে বোঝে। তবু সবকিছু সে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বসে কেবল ছবি আঁকতে।

দেয়ালে যত প্রিন্ট টাঙানো ছিল কয়েক সপ্তাহে সবগুলোর কপি করা হয়ে গেল। তাতে কিছুই হল না। আরো হাত পাকাতে হবে। এবার থেকে স্থির করল বড়ো শিল্পীদের ছবি নিয়ে বসবে। থিও তাকে এক বছর হয় চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও ভিনসেন্ট এক তাড়া ছবি পাঠানোর জন্যে আত্মমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে ভাইকে চিঠি লিখতে বসল :

প্রিয় থিয়ো,

আমার যতদূর মনে হয় মিলেটের আঁকা 'লা ট্রাভু ডাস ক্যাম্পস' সিরিজের ছবিগুলো এখনো তোমার কাছে রয়েছে। কিছুদিনের জন্য ছবিগুলো আমাকে ধার দেবে? দাও ওগুলো আমার ডাকে পাঠিয়ে।

আমি বসবুম আর অ্যালেটির বড়ো বড়ো ড্রইং-এর কপি করছি। কেমন হচ্ছে বলছ? দেখলে বোধ হয় একেবারে নিরাশ হবে না তুমি।

যা পার আমায় পাঠিয়ে দাও। আমার জন্য ভাবনা করো না। আমি যদি কেবল কাজ করে যেতে পারি তো ভাবনা নেই। কাজ নিয়েই আমি ভালো থাকি।

ড্রইং করতে করতে এক ফাঁকে তোমার চিঠি লিখতে বসেছি। এক্ষুণি আবার ড্রইং নিয়ে বসতে হবে। তাই আজকের মতো এখানেই বিদায়। যত তাড়াতাড়ি পার প্রিন্টগুলো পাঠাও।

গভীর প্রীতিমুগ্ধ ভিনসেন্ট

নতুন একটা বাসনা ধীরে ধীরে তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। তার ছবি নিয়ে কোনো আর্টিস্টের সঙ্গে আলোচনা করতে একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। কোনটা তার ঠিক হচ্ছে, কোনখানে সে ভুল করছে, একজন শিল্পীর মুখ থেকে সেসব শোনার আগ্রহ তার দুর্বার হয়ে উঠল। তার ড্রইং ভালো নয় সে জানে। তবু এত কাছাকাছি থেকে তার দোষগুণ বিচার করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া নিজের জিনিসের উপর একটা অপত্যস্নেহ রয়েছে; তার চোখ দুটো অন্ধ। এখন দরকার বাইরের একজন শিল্পীর, যার নির্মম দৃষ্টিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে ছবিগুলোর ভালোমন্দ বিচার হয়ে যাবে।

কার কাছে সে যেতে পারে? এ আকাঙ্ক্ষা যে অসহ্য! গত শীতে কত দিন সে না খেয়ে কাটিয়েছে। সে-ক্ষুধাও তো এমন ছিল না। সে শুধু এইটে জানতে ও বুঝতে চায়; সংসারে আরো শিল্পী আছে, তারই মতো লোক তারা; তারই মতো নানা অসুবিধার সামনে তারাও পড়ছে; সে যে ধারাতে চিন্তা করছে, তাদের চিন্তাধারাও ঠিক সেই রকম। ক্ষণেকের জন্য হলেও এমন লোকের সঙ্গ সে চায় যাদের প্রাণপাত শিল্প-সাধনার মধ্যে সে তার আপন প্রচেষ্টার একটা সমর্থন খুঁজে পাবে। কয়েকজন বরেণ্য শিল্পীর নাম তার মনে পড়ল। মরিসের মতো, মড়্‌-এর মতো লোকও পৃথিবীতে জন্মেছেন যাঁরা সারাটা জীবন শিল্প-সাধনাতেই উৎসর্গ করে গিয়েছেন। এটা এই বরিনেজে বসে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

এক বৃষ্টির দিন বিকেলে ঘরে বসে কপি করছিল। এমন সময় সহসা তার মনে ভেসে উঠল রেভারেন্ড পিটারসেনের ছবিখানা; ব্রাসেলস শহরে তিনি তাঁর স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে যেন বলছেন, 'দেখো, আমি যে ছবি আঁকি, আমার সহকর্মীদের যেন একথা বলে দিও না।' ভিনসেন্ট এতক্ষণে যোগ্য লোকের সন্ধান পেয়েছে। সে তার মূল স্কেচগুলো থেকে একজন খনিমজুর, রন্ধনরত মজুরনী এবং কয়লা কুড়োনোয় রত এক বুড়ি—এই তিনখানা ছবি বেছে নিয়ে ব্রাসেলস রওয়ানা হল।

তার পকেটে মোটে তিন ফ্রাঙ্ক কয়েক সেন্ট। তা দিয়ে রেল গাড়িতে করে ব্রাসেলস যাওয়া যাবে না। পায়ে হেঁটে গেলে প্রায় আশি কিলোমিটারের রাস্তা। ভিনসেন্ট সারা অপরাহ্ন, সমস্ত রাত এবং পরের দিন দুপর নাগাদ হেঁটে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করল। আর ত্রিশ কিলোমিটার গেলেই ব্রাসেলস। এ পথও সে এক নাগাড়ে চলে যেতে পারত।' কিন্তু তার পাতলা জুতো কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। দু'একটা আঙুলও বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের কোটটারও সেই দশা। এই একটি মাত্র কোট দিয়ে গত সারা বছরটা কাটিয়েছে। তাতে অসম্ভব রকমে ধুলো জমেছে। বদলে পরতে পারে এমন একখানা সার্ট নেই তার। একখানা চিরুনি পর্যন্ত সঙ্গে নেই। পরদিন সকালে কেবল ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে তাকে রওয়ানা হতে হল।

জুতোর ভিতরে মলাটের টুকরো পুরে তাই কোনো মতে পায়ে দিয়ে, খুব সকাল সকাল রওয়ানা হয়ে পড়ল সে। জুতোর সামনের দিকে পায়ের আঙুলগুলোয় খুব চাপ পড়েছে। চামড়ার ঘসা লেগে কয়েক জায়গাতে কেটে গেছে পা। শীঘ্রই পা দু'খানা রক্তাক্ত হয়ে গেল। মলাটের টুকরো বেরিয়ে আসছে। ঘসায় ঘসায় পায়ের চামড়া থেকে প্রথমে জল ও পরে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। সে ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় আকুল; সে শ্রান্ত, ক্লান্ত। তবু সে সুখী। মানুষ যতদূর সুখী হতে পারে ততদূর সুখী সে।

সত্যি সত্যি আর একজন শিল্পীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে। কথাবর্তা হবে। এ কল্পনা নয়। সত্যি।

সেইদিন অপরাহ্নে ভিনসেন্ট ব্রাসেলস নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছলো। তার পকেট তখন কপর্দকশূন্য। পিটারসেন কোথায় থাকেন তার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিল। তাকে দেখে রাস্তার লোক তাড়াতাড়ি সরে যেতে থাকে। আবার ফিরে তাকে দেখে নেয়; দেখে কি এক সন্দেহভরে মাথা নাড়ে। ভিনসেন্টের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে সে কেবল এগিয়ে চলে।

কড়া নাড়তে রেভারেন্ডের ছোট্ট মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল। সভয়ে তাকালো সে ভিনসেন্টের ধুলোমাখা ঘর্মাক্ত মুখ, এলো চুল, ময়লা কোট, কাদা মাখা ট্রাওজার আর কালো রক্তাক্ত পায়ের দিকে। তারপর একটা অব্যক্ত চীৎকার করে এক দৌড়ে হল-ঘরে চলে গেল। রেভারেন্ড পিটারসেন এলেন দরজায়। ভিনসেন্টকে চিনতে না পেরে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর চিনতে পেরে প্রাণ খুলে হঠাৎ হেসে উঠলেন।

বললেন, 'আরে, তুমি ভিনসেন্ট। আবার তোমাকে পেলাম। কী আনন্দ! চলে এসো, চলে এসো ভিতরে।'

ভিনসেন্টকে তিনি স্টাডি-ঘরে নিয়ে একটা আরাম-কেদারা বের করে বসতে দিলেন। যতক্ষণ সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছয়নি, একটা অদম্য ইচ্ছার জোর তাকে খাড়া রেখেছিল। এখন প্রার্থিত স্থানে এসে সে ভেঙে পড়ল। দুদিন কয়েক টুকরো রুটি আর একটু পনির খেয়ে আশি কিলোমিটার পথ হেঁটেছে—তারই শ্রান্তি ক্লান্তি তাকে কাবু করে ফেলল। পিঠের মাংসপেশী শিথিল এবং কাঁধ দুটি অবশ হয়ে এসেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

পিটারসেন বললেন, 'আমার এক বন্ধুর একখানা ঘর খালি আছে। পথশ্রমে তুমি কাতর হয়েছ, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করবে চলো সেখানে।

'সেই ভাল। এতটা কাতর হয়ে পড়ব আগে বুঝতে পারিনি।'

টুপি তুলে ভিনসেন্টকে নিয়ে রেভারেন্ড পথে নামলেন। প্রতিবেশীদের কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা চলতে লাগলেন।

পিটারসেন বললেন, 'আজ রাতে তোমার হয়ত খুব ঘুম পাবে। ঘুমিয়ে নাও। কাল বারোটায় আমাদের বাড়ি ডিনারে তুমি অবিশ্যি আসবে। অনেক কথা আছে।'

লোহার একটা জলাধারে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট বেশ করে শরীরখানা রগড়ে পরিষ্কার করে নিল। তখন মোটে ছটা বাজে। এরই মধ্যে সে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল। পরদিন দশটায় তার ঘুম ভাঙলো। খিদেটা বার বার চাড়া দিয়ে উঠছে। তা না হলে হয়ত আরো ঘুমোত। রেভারেন্ড পিটারসেন যার কাছ থেকে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন সে এসে ভিনসেন্টকে ক্ষুর, চিরুণি ও পোষাকের ধুলো ঝাড়বার ব্রাস দিয়ে গেল। ভিনসেন্ট এ দিয়ে জুতোজোড়াটা ছাড়া আর সবই পরিষ্কার করে নিল।

ভিনসেন্টের রাক্ষুসে খিদে পেয়েছে। এদিকে পিটারসেন ব্রাসেলসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে গল্প করছেন। সেদিকে কান না দিয়ে ভিনসেন্ট খেয়েই চলেছে। খাওয়ার পর দুজনে স্টডি-ঘরে গিয়ে বসলেন।

ভিনসেন্ট বলল, 'আপনি দেখছি অনেক কিছু করেছেন, দেয়ালে টাঙানো স্কেচ্গুলো সবই তো নতুন।'

পিটারসেন জবাব দিলেন, 'হাঁ। আমি এখন ছবি আঁকাতেই মন দিয়েছি। এতে যত আনন্দ পাই, ধর্মপ্রচারের কাজে আর ততটা পাইনে।'

ভিনসেন্ট স্মিতমুখে বলল, 'আচ্ছা আপনি যে আপনার আসল কাজের থেকে এতটা সময় টেনে এনে ছবি আঁকার কাজে ব্যয় করেন, এতে সময় সময় আপনার বিবেকে বাধে না?'

পিটারসেন হাসতে হাসতে বললেন, রুবেন্‌স্‌ সম্বন্ধে সেই গল্পটা জানো তুমি? তিনি স্পেনে হল্যান্ডের রাজদূত হিসেবে কাজ করতেন। সারা অপরাহ্ন কাটাতেন তিনি সরকারী বাগানে তাঁর ইজেলের সামনে বসে। একদিন স্পেনিশ্‌ কোর্টের একজন হামবড়া মেম্বার সেখান দিয়ে চলে যেতে যেতে মন্তব্য করলেন, 'আমি দেখছি কূটনীতিবিদ মাঝে মাঝে শিল্পচর্চা করে নিজের মনোরঞ্জন করেন।' রুবেন্‌স্‌ উত্তর দিলেন, 'তা নয়, শিল্পী মাঝে মাঝে কূটনীতির চর্চা করে নিজের মনোরঞ্জন করেন।'

পিটারসেন ও ভিনসেন্ট দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল। ভিনসেন্ট তার প্যাকেটটা খুলল, বলল, 'আমি এক-আধটু স্কেচ করতে আরম্ভ করেছি। তিনখানা স্কেচ এনেছি আপনাকে দেখাব বলে। যদি কিছু মনে না করেন, ওগুলোর সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি আমাকে বলতে হবে।'

পিটারসেন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি জানেন, ছবি আঁকায় যে নতুন ব্রতী হয়েছে সে সমালোচনা সইতে পারে না; তার কাছে সমালোচনা বড় অপ্রীতিকর। তবু তিনি তিনখানা স্কেচ ইজেলে চড়িয়ে অনেকটা দূরে বসে–ভালো করে দেখলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'প্রথম ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমার মনে হচ্ছে, তোমার মডেলের আরো কাছাকাছি থেকে তোমাকে কাজ করতে হবে, তাই না?

'হ্যাঁ। আমার বেশির ভাগ স্কেচ নিয়েছি খনিমজুরদের কুটিরে ঝামেলার মধ্যে।'

'তাই দেখছি। এতে তোমার পরিপ্রেক্ষিতের অভাব বোঝাচ্ছে। এমন একটা জায়গা ঠিক করে নিতে পারো না, যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার বিষয়বস্তুর থেকে দূরত্ব ঠিক রেখে এঁকে যেতে পারবে? তা হলে তুমি তাকে আরো পরিষ্কার দেখতে পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

'খনিমজুরদের কয়েকটা বড় বড় কেবিন সেখানে আছে। আমি বেশ সস্তায় এর একটা ভাড়া নিয়ে স্টুডিওর মতো সাজিয়ে নিতে পারি।'

'তা হলে বেশ সুন্দর হয়।'

বলে তিনি আবার চুপ করে রইলেন। তারপর বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কখনো ড্রইং অনুশীলন করেছ? চারকোণা করে লাইন টানা কাগজে তুমি মানুষের মুখের ছবি ছকে নিয়েছ কোনোদিন? মাপ-জোখ নাও তো?'

ভিনসেন্ট লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ সব জিনিস কিছুই তো আমি জানি না। দেখতেই পাচ্ছেন, কারো কাছ থেকে আমি এ সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো পাঠ নিইনি। আমি জানি কেবল এঁকে যেতে হয় তাতেই হয়ে যায়।'

পিটারসেন বিষণ্নভাবে বললেন, 'না হে না। প্রাথমিক নিয়ম কানুনগুলো আগে শিখতেই হয়। প্রথমে টেক্‌নিক শিখে নিলে, পরে ধীরে ধীরে ড্রইং আপনা থেকে ভাল হয়ে উঠবে। তোমার এই ছবিটা দেখ। স্ত্রীলোকটির কোথায় কোথায় খুঁত আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিনি একখানা রুল হাতে নিয়ে স্ত্রীলোকটির মাথায় ও শরীরে চারকোণা ঘর করে করে লাইন টানলেন, টেনে দেখালেন ভিনসেন্টের পরিমাণ-জ্ঞান কত কম। তিনি মাথাটা আবার এঁকে চললেন, সঙ্গে সঙ্গে ভিনসেন্টকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। প্রায়

এক ঘণ্টা ধরে আঁকার পর তিনি একটু পিছনে সরে গিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখলেন স্কেচটিকে। দেখে বললেন, 'এতক্ষণে ছবিটা ঠিক হয়েছে।'

ভিনসেন্টও তার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখল। ছবি যে নির্ভুল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন ছবিটা একেবারে নিখুঁত পরিমাণ নিয়ে আঁকা হয়েছে; কিন্তু এখন আর তার মধ্যে খনিমজুরণিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; কালো টিলার ঢালুতে কোমর বেঁকিয়ে কয়লা কুড়োচ্ছে যে 'বরেন' রমণী, তারও কোন স্বরূপ ছবিতে আর অবশিষ্ট নেই। ছবির নারীমূর্তিটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে আঁকা একটি কোমর বাঁকানো স্ত্রীলোক মাত্র। পৃথিবীর যে কোন একটি স্ত্রীলোক সে হতে পারে।

ভিনসেন্ট কোন কথা না বলে ইজেলের কাছে গেল। তার নিজের আঁকা স্টোভের উপর ঝুঁকে পড়া স্ত্রীলোকটিকে পিটারসেনের আঁকা পরিমার্জিত স্ত্রীলোকটির পাশে রেখে সরে এলো পিটারসেনের কাছে।

পিটারসেন একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হু, তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ, আমি তা বুঝেছি। স্ত্রীলোকটিকে আমি পরিমাণ দিয়েছি, কিন্তু তার জাতটুকু খুইয়ে নিয়েছি?'

অনেকক্ষণ ইজেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুজনে।

পিটারসেন অসংলগ্নভাবে বলে উঠলেন, 'জানো ভিনসেন্ট, তুমি স্টোভের উপরে ঝুঁকে পড়া যে স্ত্রীলোকটিকে এঁকেছো সে মোটেই খারাপ হয়নি। ড্রয়িং হয়েছে মারাত্মক। তার এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের কোনো মিল নেই। এর মুখটাতো কিছুই হয় নি। আদপে ওর কোন মুখই নেই। তবু মনে হচ্ছে, স্কেচটাতে একটা কিছু আছে। তুমি এমন একটা কিছু ওতে ধরে দিয়েছ যা আমি ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছিনে। সেটা কী আমায় বলে দেবে ভিনসেন্ট?'

'আমি জানি না। আমি কেবল তাকে যেমনটি দেখেছি, ঠিক তেমনটি এঁকে নিয়েছি।'

এইবার পিটারসেন ক্ষিপ্রবেগে ইজেলের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর নিজের আঁকা স্কেচখানাকে বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিলেন। বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না, আমি ওটা রাখতে চাই না।' এখন কেবল ভিনসেন্টের আঁকা স্কেচটাই সেখানে শোভা পেতে লাগলো। রেভারেণ্ড এসে ভিনসেন্টের কাছে বসলেন। কয়েকবার কথা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাষা খুঁজে পেলেন না। শেষে বললেন, 'ভিনসেন্ট, কথাটা স্বীকার করে নিতে আমার ঘৃণাবোধ হচ্ছে তবু স্বীকার করছি এই স্ত্রীলোকটির ছবি আমার ভালই লাগছে। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে কিম্ভূত-কিমাকার মনে হয়েছিল। এখন দেখছি, মধ্যে কি যেন কি একটা আছে–'

'সেটা স্বীকার করতে ঘৃণাবোধ করছেন কেন?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'তার কারণ, ও ছবি কারো পছন্দ হওয়া উচিত নয়। ছবিটা আগাগোড়া ভুল সাংঘাতিক ভুল। আর্ট স্কুলের যে কোন প্রাথমিক শ্রেণিতে ওরকম ছবি আঁকলে ওটাকে ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে আঁকতে হতো। তবু ওর মধ্যে কি একটা আছে, যা আমাকে বার বার নাড়া দিচ্ছে, আমি প্রায় নিশ্চিত বলতে পারি, 'স্ত্রীলোকটিকে আমি আগে কোথাও দেখেছি।'

'সম্ভবত আপনি তাকে বরিনেজে দেখেছেন।' ভিনসেন্ট অত্যন্ত সরলভাবে জবাব দিল।

পিটারসেন তাড়াতাড়ি তার মুখের দিকে তাকালেন, সে সতর্ক হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য। বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তার মুখ নেই, তাকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বলেও বোঝা যাবে না। বরিনেজের সব খনি-মজুরনিদের এক করলে যা দাঁড়াবে সে তাই। ছবিটাতে যে বস্তু ধরা দিয়েছে, তাকে বলতে পারি খনি-মজুরনির অন্তর-সত্তা। শোনো ভিনেসেন্ট, নির্ভুল ড্রইং-এর চাইতে এর দাম হাজার গুণ বেশি। হাঁ, তোমার স্ত্রীলোকটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। মনে হচ্ছে কি যেন সে আমায় বলছে, স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীনভাবে।'

ভিনসেন্ট কেঁপে উঠল। ভয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। পিটারসেন পাকা শিল্পী। তিনি এ রকম করে বলছেন।

পিটারসেন আবার বলে উঠলেন, 'ওটা আমায় দেবে ভিনসেন্ট? দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব—ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাকা করে নেবো।'

২০.

ভিনসেন্ট যেদিন পেটিট ওয়াসমেসে ফিরে যাবার ইচ্ছা জানালো, সেদিন রেভারেন্ড পিটারসেন তাকে তাঁর পুরোনো একজোড়া জুতো এনে দিলেন ওর ছেঁড়া জুতো জোড়াটা বদলে নেবার জন্য। তাকে বরিনেজ পর্যন্ত রেল্ ভাড়া দিলেন। ভিনসেন্ট পুরোপুরি, বন্ধত্বের মনোভাব নিয়েই সেসব গ্রহণ করল। বন্ধুত্ব যখন পাকা হয় তখন দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

রেলগাড়িতে বসে অনেক কিছু ভাবল সে। তার মধ্যে দুটো বিষয় সবচেয়ে মনে লেগেছে তার। ধর্মপ্রচারে তার ব্যর্থতার উল্লেখমাত্র করেননি পিটারসেন। আর তিনি তাকে একজন শিল্পী-বন্ধু হিসেবে অকপটে গ্রহণ করেছেন। তার একখানা স্কেচ সত্যি সত্যি তাঁর ভালো লেগেছে, তিনি তা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন; তার ছবির এর চেয়ে বড় সমাদর আর কি হতে পারে।

ভিনসেন্ট মনে মনে বলল, 'তাঁর কাছে আজ যে প্রেরণা পেলুম, তাতে আমি নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে লাগতে পারি। আমার ছবি তাঁর যদি ভালো লেগে থাকে, তা হলে অন্যেরও ভালো লাগবে।'

ডেনিসদের বাড়ি এসে দেখে, থিওর কাছ থেকে Les Travaux des Champs সিরিজের ছবিগুলো এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো চিঠি আসেনি। পিটারসেনের সঙ্গ তাকে সুগভীর প্রেরণা দিয়েছে। তাই নিয়ে সে ফাদার মিলেটের এই ছবিগুলোর মাঝে ডুবে গেলো। ছবির সঙ্গে থিও কতকগুলো বড় আকারের স্কেচ করার কাগজও পাঠিয়েছে। ভিনসেন্ট কয়েকদিনের মধ্যে Lec Travaux সিরিজের দশখানা ছবির কপি করে ফেলল। তাতে ঐ সিরিজের প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হল। এরপর মনে হল তার কিছু নগ্ন চিত্র আঁকা প্রয়োজন। কিন্তু 'পোজ' দেবার লোক বরিনেজে শত চেষ্টায়ও পাওয়া যাবে না। হেগ শহরে গুপীল গ্যালারির ম্যানেজার টারস্টিগ তার পুরোনো বন্ধু। তাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখল বার্গ-এর আঁকা Exercises au Fusain সিরিজের ছবিগুলো ধার দেবার জন্য।

এদিকে পিটারসেনের পরামর্শও সে ভোলে নি। পেটিট ওয়াসমেসে উপরের দিকে খনিমজুরদের একখানা কুটির সে ভাড়া করল। ভাড়া মাসে নয় ফ্রাঙ্ক। এবার সে গতবারের মতো খারাপ ঘর নিলো না। দেখেশুনে সব চেয়ে ভালো ঘরই নিলো। মেঝে কাঠ দিয়ে মোড়া। আলো আসার জন্য বড় বড় দুটি জানালা, একটা খাট, টেবিল, চেয়ার, স্টোভ সবই আছে। ঘরটি বেশ বড়; এক প্রান্তে 'মডেল' রেখে অন্য প্রান্ত থেকে তার পরিপ্রেক্ষিত নেবার বেশ সুবিধা হবে। পেটিট ওয়াসমেসে খনিমজুরদের বউ ঝি ছেলেপুলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে গত শীতের সময়ে ভিনসেন্টের দ্বারা উপকৃত না হয়েছে। এখন তাদের যখন ঘরে এসে পোজ দিতে বলা হল, তারা কেউ অস্বীকার করতে পারল না। বিশেষত রবিবারে তারা ভিনসেন্টের ঘরে এসে ভিড় করে দাঁড়ত। ভিনসেন্টও খুব তাড়াতাড়ি তাদের স্কেচ করতে লাগল। ওরাও এতে বেশ আমোদ পেতে লাগল। তারা সব সময়েই এ ঘরে ভিড় করে থাকত আর ভিনসেন্টের কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে অবাক হয়ে তার ছবি আঁকা দেখত।

হেগ থেকে Exercises au Fusain যথাকালে এসে পৌঁছোলো। দু'সপ্তাহ ধরে ভিনসেন্ট ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটানা খেটে খেটে ওর ষাটখানা স্টাডির নকল করল। বন্ধু টারস্টিগ, বার্গ-এর আঁকা Cours de Dessin নামের ছবিখানাও পাঠিয়েছে। ভিনসেন্ট তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই দুঃসাধ্য ছবিখানার কাজ সমাধা করল।

জীবনে পাঁচবার তার ব্যর্থতা এসেছিল। সেই সবকিছুই এখন তার মন থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সৃষ্টিশীল চিত্রকলা আজ তাকে যা দিচ্ছে, এমন উচ্চ আনন্দ, এমন স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি ভগবৎসেবাও তাকে দিতে পারেনি। এগারো দিন ধরে তার পকেটে যখন একটি পাই পয়সাও ছিল না এবং তাকে মাদাম ডেনিসের কাছ থেকে কয়েকটি রুটি ধার করে এনে জীবন বাঁচাতে হয়েছে, তখনো সে মনে মনে কারো কাছে না খাওয়ার জন্য অভিযোগ জানায়নি। মন যার এমন ভাব-সামগ্রীতে ভরে রয়েছে, দেহের ক্ষুধা তাকে কী করবে।

প্রতিদিন ভোর আড়াইটায় সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মার্কাসি খনির গেটে গিয়ে বসত। এভাবে সাত দিনের চেষ্টায় খনি মজুরদের বড় একখানা ড্রইং তৈরি হল। তাতে দেখানো হয়েছে, এক কাঁটা-ঝোপের পাশ দিয়ে মজুর-মজুরনিরা তুষার ভেঙে চলেছে খনির দিকে। প্রদোষের আলো-আঁধারিতে তাদের ঝাপসা ছায়াগুলো এগিয়ে চলেছে। পশ্চাৎপটে খনির কলকারখানা, দালান আর আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় চিমনি। স্কেচটার একখানা কপি করে চিঠির ভিতর পুরে থিওকে পাঠিয়ে দিল।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছবি এঁকে আর রাত্রে বাতির আলোয় তার কপি করে ভিনসেন্টের দিনগুলো কাটতে থাকে। এভাবে পুরো দুটি মাস কেটে গেল। আবার তার মনে দুর্বার বাসনা জাগে; এবার আরেকজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করার আকাঙ্ক্ষা, ছবি কেমন হচ্ছে সেই শিল্পীর মুখ থেকে জানবার ইচ্ছা। তার ধারণা সে খানিকটা উন্নতি করেছে। তার হাত অনেকটা নমনীয় ও বিচারবুদ্ধি উন্নত হয়েছে। তবু সে কেবল নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে পারছে না। তাই এবার সেএকজন প্রখ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে দেখা করবে। যিনি তাকে নিজের পক্ষছায়ায় রেখে ধীরে ধীরে যত্নের সঙ্গে তাকে এই সুমহৎ চিত্রকলার গোড়ার বিষয়গুলো শিখিয়ে দেবেন, এমন কাউকে তার

চাই। এর জন্য তাঁকে যা দিতে হয় সে দেবে; এই শেখানোর বদলে উপযুক্ত দক্ষিণা সে যেভাবে পারে দেবে; এর জন্য সে লোকের জুতো পরিষ্কার করে দেবে; তাঁর স্টুডিও-ঘর দিনে দশবার পরিষ্কার করবার ভার নেবে।

জুলে ব্রেত'-এর আঁকা ছবির প্রশংসা করে এসেছে ভিনসেন্ট ছেলেবেলা থেকেই। তিনি কুরিয়ার্সে বাস করতেন। জায়গাটা এখান থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার দূরে। পকেটে যতক্ষণ পয়সা ছিল ভিনসেন্ট রেল গাড়িতেই গেল। পয়সা ফুরিয়ে এলে সে হাঁটতে শুরু করল। এক নাগাড়ে পাঁচ দিন হাঁটল। লোকের খড়ের গাদায় শুয়ে রাত কাটাত। খিদে অসহ্য হয়ে উঠলে দু একখানা ছবির বদলে এক আধখানা রুটি চেয়ে নিত লোকের কাছ থেকে। শেষকালে কুরিয়ার্সের গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে সে ব্রেত'র লাল ইটের চমৎকার নতুন স্টুডিও দেখতে পেল। কেমন সুন্দর সুসমঞ্জস স্টুডিও। দেখে তার সাহস বল সব কর্পূরের মতো উবে গেল। দুদিন সে শহরে ঘুরে বেড়াল। শেষে স্টুডিওর রুক্ষ চেহারা ও আত্মীয় পরিবেশ তাকে এমনি দমিয়ে দিল যে, সে পায়ে হেঁটেই ফিরে চলল সেখান থেকে। অপরিসীম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে সে। তার উপর খিদের জ্বালায় অস্থির। পকেটে একটি কানা কড়িও নেই। পিটারসেনের দেওয়া জুতো জোড়াটাও একদম পাতলা হয়ে গিয়েছে, কখন ছিঁড়ে পা থেকে খুলে পড়ে যায়। এইভাবেই সে একশো সত্তর কিলোমিটার হেঁটে যাবার জন্যে বরিনেজের দিকে পা বাড়ালো।

খনি মজুরদের পাড়ায় যখন এসে পৌঁছাল, তখন সে রোগে কাতর এবং নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ডাকে তার জন্য টাকাকড়ি কিছুই আসেনি। একখানা চিঠিও না। ভিনসেন্ট কোনো মতে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। খনি-মজুরনিরা তার শুশ্রূষা করল এবং তাদের স্বামী ও ছেলেপিলেদের গ্রাস থেকে যতটুকু খাদ্য বাঁচানো সম্ভব হল তাই বাঁচিয়ে তাকে খেতে দিল।

এ-যাত্রা তার ওজন অনেক কমে গিয়েছে। গালদুটো আবার বসে গিয়েছে। জ্বরের ঘোরে তার সবচে কালো চোখের কোণে লাল হয়ে উঠেছে। অসুখে ভুগলেও মনে তার জড়তা আসেনি। সে বেশ বুঝতে পারে এখন যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু স্থির করে ফেলতেই হবে। আর দেরি করা চলবে না।

কিন্তু তার এ জীবন নিয়ে সে করবে কী? কোন্ কাজে লাগাবে? বিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে? বই বিক্রি বা ছবির ব্যবসা এর কোনো একটা সে আঁকড়ে ধরবে? না কি সদাগরি অপিসে কেরাণীর চাকরির জন্য উমেদারি করবে? আর, কোথায় সে থাকবে তাও ঠিক করে ফেলা দরকার। ইটেনে পিতামাতার সঙ্গে গিয়ে থাকবে? না, প্যারিসে থিওর সঙ্গে থাকবে? আমস্টারডামে কাকারা থাকেন, তাঁদের সঙ্গে গিয়ে বাস করবে? কিংবা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে অনিশ্চিতের কোলে ঝাঁপ দেবে?

শরীরে একটু বল পেয়ে একদিন সে থিওডোর রুশোর আঁকা 'Le Four Dans les Landes' নিয়ে বিছানায় বসে ছবি করছিল, আর ভাবছিল ছবি আঁকার খেলায় আর কত দিন সে মেতে থাকবে। এমন সময় কে একজন সাড়া না দিয়েই দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলো।

সে তার ভাই থিও।

২১.

গত ক'বছরে থিও নিজের অবস্থায় বেশ উন্নতি করেছে। তার বয়স মোটে তেইশ। এরই মধ্যে প্যারিসের একজন কৃতবিদ্য ছবি বিক্রেতা হয়ে উঠেছে। পরিবারে আর বন্ধু মহলে তার সম্মান অসম্ভব রকমে বেড়ে গেছে। বসন-ভূষণ চাল-চলন ও কথাবার্তায় কি করে সমাজে মর্যাদা রেখে চলতে হয়, সবাই তার জানা। গায়ে সুন্দর কালো কোট, শক্ত কলার, শাদা টাই, তাতে বড় একটা গেরো।

তার কপালটা সুবিশাল, ভ্যান গোঘ্ বংশের যা চিরদিনের বৈশিষ্ট্য। চুল গাঢ় বাদামী। দেহ সুকোমল, মেয়েদের শরীরের মতো। চোখ দুটি কোমল ও জিজ্ঞাসু। মুখখানা ওভ্যাল আকারের দেখতে ভারি সুন্দর।

থিও দরজায় হেলান দিয়ে ভিনসেন্টের দিকে সভয়ে তাকালো। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সে প্যারিস ছেড়ে এসেছে। যে ঘরে সে থাকে, লুই ফিলিপের সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার দিয়ে সেই ঘরখানা সাজানো। ঘরে হাত-মুখ ধোওয়ার জলপাত্র, তোয়ালে, সাবান সবকিছুই আছে। জানলাগুলোতে পর্দা ঝোলানো, মেঝে রাগ্ দিয়ে মোড়া, ঘরে আছে লেখবার ডেস্ক, কয়েকটা বুক-কেস, ঠাণ্ডা ল্যাম্প ও মনোরম ওয়াল পেপার। আর এখানে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর পুরোনো একটা কম্বল পাতা। তার উপরে শুয়ে আছে ভিনসেন্ট। ঘরের মেঝে আর দেয়াল উঁচু-নিচু তক্তা দিয়ে তৈরি। ফার্নিচার বলতে একটা নড়বড়ে টেবিল ও চেয়ার। কতদিন তার গা-ধোওয়া হয়নি। খসখসে লাল দাড়িতে গাল চিবুক গলা ঢেকে ফেলেছে।

'থিও, খবর ভালো তো?' ভিনসেন্ট বলল।

থিও এক ছুটে বিছানায় উঠে এলো। বললো, 'ভিনসেন্ট, তোমার কি হয়েছে বল দেখি। দোহাই তোমার, চুপ করে থেকো না। বল। দেখতো শরীরটাকে কি করে ফেলেছো!'

'আমার কিছুই হয়নি। অসুখ করেছিল। এখন ভাল হয়ে গিয়েছি।'

'কিন্তু এই ঘরটা.....কুঠরির মতো ছোট। নিশ্চয় তুমি এখানে থাকো না, তোমার ঘর নিশ্চয়ই এটা নয়।'

'কেন ঘরটা খারাপ কিসে। আমি তো এটাকে স্টুডিও বানিয়েছি।'

'ভিনসেন্ট, ও ভিনসেন্ট!' আর বলতে পারল না। আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সে কেবল ভাইয়ের মাথার চুলগুলোতে আঙুল চালাতে লাগল।

'তুমি এসেছ, বড়ো ভালো লাগছে থিও।'

'ভিনসেন্ট, তুমি আমাকে সত্যি করে বল তোমার কি হয়েছে! কেন তোমার অসুখ করেছিল? কী অসুখ?'

ভিনসেন্ট, কুরিয়ার্স যাওয়ার কাহিনী তাকে খুলে বলল।

'আসল কথা তুমি নিজেকে নিজে শেষ করে এনেছ। ফিরে আসার পর থেকে উপযুক্ত মতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে তো তোমার? শরীরের যত্ন নাওতো?'

'খনি-মজুরদের মেয়েরা আমার শুশ্রূষা করছেন।'

'তা বেশ। কিন্তু তুমি খাচ্ছ কী?' বলে থিও চারপাশে তাকিয়ে দেখল। 'খাওয়ার জিনিসগুলো কোথায় রাখ তুমি! ঘরে তো আমি কিছুই দেখছিনে।'

'মেয়েরা রোজ আমাকে কিছু কিছু খাবার দিয়ে যায়। যা তারা বাঁচাতে পারে—লুচি, কফি, একটু পনির।

'কিন্তু ভিনসেন্ট, তোমার শরীরের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে কেবল রুটি আর কফি খেয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে এ তুমি মনেও ভেবো না। তোমার এখন ডিম-সব্জী আর মাংস খাওয়া দরকার। তুমি এসব কেন যে কিনে এনে খাচ্ছ না, আশ্চর্য!'

'ওসব জিনিস অন্য জায়গায় যেমন পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তেমনি এখানে এই বরিনেজেও ওগুলো কিনতে পয়সা লাগে থিও।'

থিও বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'ভিনসেন্ট, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি জানতে পারিনি, আমি বুঝতে পারিনি।'

'তুমি কিছু ভেবো না ভাই। তুমিত আমার জন্য যথাসাধ্য করেছো। আমারত দিন ভালোই কাটছে।'

থিও চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমার একদম খেয়াল হয়নি। আমার ধারণা ছিল তুমি.....আমি বুঝতে পারিনি, ভিনসেন্ট আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'আরে, সেজন্যে? তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন? ও যাক্। আচ্ছা বল দেখি প্যারিসের খবর কী। এখান থেকে তুমি যাবে কোথায়? এর মধ্যে ইটেন গিয়েছিলে কি?'

সেদিক থিওর কান নেই। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই ছন্নছাড়া শহরে দোকানপাট কিছু আছে? জিনিসপত্র কিছু কেনা যাবে এখানে?'

'দোকান আছে। পাহাড়তলির ওদিকে গেলে দোকান পাওয়া যাবে। তার আগে তুমি ওই চেয়ারটা টেনে বসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে। দুবছর পর আজ এই প্রথম দেখা।'

থিও ভ্রাতার মুখখানাতে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'এখন কথা নয়। আগে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা, পরে অন্য কথা। বেলজিয়ামের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী তোমাকে আমি প্রচুর পরিমাণে কিনে দিয়ে যেতে চাই। তুমিত উপোস করে করে এই রকম হয়েছে। তারপর তোমার জ্বরটার জন্য দু'এক দাগ ওষুধ আমি যোগাড় করে আনছি। নরম বালিশে মাথা নেড়ে তোমাকে আরামে ঘুমোতে দেখে তবে আমার নিষ্কৃতি। এসে যখন পড়েছি এখানে, তোমার ওই বাউণ্ডুলে ভাব না ভুলিয়ে আমি ছাড়ছিনে। আগে যদি একটুও জানতে পারতুম...এ তো আমার ধারণাতেই আসেনি। যাক। ঠায় বসে থাক এখানে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ো না।'

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ভিনসেন্ট পেন্সিল তুলে নিলো 'Le Four Dans Le Landes' ছবিখানার দিকে তাকিয়ে তার কপি করতে লাগল। থিও ফিরে এলো আধ ঘণ্টার মধ্যে। তার পিছনে দুটি ছেলে। সে যা নিয়ে এসেছে ভিনসেন্টের পক্ষে তা একটা রাজসূয় যজ্ঞের সামিল। দুটো চাদর, একটা বালিশ, থালা, বাসন ও অন্যান্য তৈজসপত্রের কয়েকটা বাণ্ডিল আর খাওয়ার জিনিসের কতকগুলো প্যাকেট। ধবধবে শাদা চাদর বিছিয়ে ভিনসেন্টকে সে তার উপরে শুইয়ে দিল।

গায়ের কোট আর হাতের দস্তানাগুলো খুলতে খুলতে বলল, 'তোমার এই স্টোভ কী করে ধরাও বলো তো?'

'কিছু কাগজ আর কাঠের টুকরো আছে। আগে ওগুলোতে আগুন ধরিয়ে নাও, তারপর তাতে কয়লা দিও?

কালো টিলা থেকে কুড়িয়ে আনা অপরূপ বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে থিও বললো, 'কয়লা! একেই তোমরা কয়লা বল না কি?'

'এ দিয়েই আমরা উনুন ধরাই। দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

সে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করছে কি অমনি থিও লাফিয়ে গিয়ে তার উপর পড়ল। চীৎকার করে বলল—

'শুয়ে পড়, শুয়ে পড় বলছি। একটুও নড়তে পাবে না। নড়েছ কি অমনি তোমার সঙ্গে একটা ভীষণ মারামারি হয়ে যাবে।'

ভিনসেন্ট মুখ খুলে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে তার দাঁতগুলোও যেন শুভ্র হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমন প্রাণময় হাসি বহুদিন তার মুখে প্রকাশ পায়নি।

থিও নতুন একটা পাত্রে দুটো ডিম রাখল, কিছু বীন কুচি করে কেটে রাখল আর একটা পাত্রে। অন্য একটা পাত্রে খানিকটা টাটকা দুধ গরম করে নিল। তারপর একটা চ্যাপ্টা কড়া আগুনের উপর তুলে দিয়ে তার উপর রুটি রাখল। ভিনসেন্ট চেয়ে চেয়ে দেখছে, থিও স্টোভের উপর কেমন ঝুঁকে পড়ে তার জন্য খাবার তৈরি করছে। ভাইকে আবার এতখানি কাছে পেয়ে তার যতখানি তৃপ্তি এসেছে, দুনিয়ার কোনো সুখাদ্যই কাউকে এতটা তৃপ্তি দিতে পারবে না।

খাবার তৈরি হলে সে টেবিলটা টেনে খাটের সঙ্গে জুড়ে দিলো। ব্যাগ থেকে পরিষ্কার তোয়ালে বের করে বিছিয়ে দিলো সেটা। তারপর বীনগুলোতে বেশ করে মাখন মাখালো, সিদ্ধ ডিম দুটো ভেঙে থালায় রেখে একটা চামচে তুলে নিল।

বলল, 'এইবার হাঁ কর দেখি। কতদিন পেট ভরে খাওনি কে জানে। হাঁ কর।'

'ও থিও, তুমি বস এখানে। আমি নিজ হাতেই খেতে পারব।'

থিও চামচে একটা ডিম তুলে ভিনসেন্টের মুখের কাছে এনে বললে, 'হাঁ কর বলছি, ভালো ছেলের মতো। না হলে তোমার চোখের ভিতরে ঢেলে দেব।'

খাওয়া সেরে ভিনসেন্ট আরামের নিশ্বাস ছেড়ে আবার বালিশে মাথা রাখল। বলল, 'ভালো খাবারের স্বাদ এত ভালো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আর তোমাকে শীগ্‌গির ভুলে যেতে দিচ্ছিনে।'

'এবারে আমাকে সব বলতো থিও, যা কিছু হয়েছে সব বল। গুপীলদের দোকান কেমন চলছে। এক কোণে পড়ে আছি। বাইরের জগতের খবর জানবার জন্য আমার মন একেবারে উপুসী হয়ে আছে।'

'তা হলে তোমার মনকে আরো একটু উপোস করে থাকতে বলি। তোমার ঘুমের ওষুধ এনেছি। একটু শান্ত হয়ে থাক। যা খেয়েছ তাকে কাজ করতে সুযোগ দাও।'

'না না থিও, আমি ঘুমোতে চাই না। আমি কথা কইতে চাই। ঘুমোতে আমি যে-কোনো সময়েই পারি। এখন আমি কেবল কথা কইতে চাই।'

অভ্যাগতদের সবাই গরুর পালের মতো সেই আসরে বসে নীরস ফর্মালিটি দেখাতে চান। কালকের দিনের আসরের থেকে আজকের আসরের কোনো পার্থক্য নেই, সবাই করে ড্রইং রুমে সেই একই আলোচনা। আমি ওসব আদৌ পছন্দ করি না। প্রকৃতির এই মুক্ত বাতাস বেশি পছন্দ করি। কল্পনা করুন দেখি এই ছায়া-ঘন বৃক্ষ-শ্রেণির মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজনার মধ্যে ভাব-বিনিময় কত আনন্দের। আপনি যে আনন্দ আমাকে ধীরে ধীরে দিয়ে আসছেন, তার ঋণ আমি কোনো কালে শোধ করতে পারবো না। আপনার এত বন্ধু তবু আপনি আমার জন্যে এত সময় অপেক্ষা করছেন। আর আপনার সংস্পর্শে এলে আমি জগতের সব কিছু ভুলে যাই।"

রেণুকা ধীরে ধীরে বিজনেশের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে সামনের একটা বেঞ্চে আসন দেখিয়ে বললে, "চলুন ওখানে গিয়ে বসি। আসন গ্রহণ করে বিজনেশ আবার কমলের মতো কোমল, শিশিরের মতো শীতল রেণুকার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোলের উপর রাখল।

রেণুকা পরিহাস তরল কণ্ঠে বললে, "কিন্তু মিসেস্ রয় কে তো ভোলা চলবে না। শুনেছি মিসেস্ রয় খুব সুন্দরী। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবই। তাঁর বিদ্রোহী স্বামীকে আমি কত যত্ন করছি, তা তাঁকে জানাতেই হবে।"

বিজনেশ বললে, "তিনি আমাকে চান না। দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। স্বাধীনতাকে আমি বড়ো ভালবাসি।"

রেণুকা বললে, "তাতে করে আপনারা দু'জনেই যদি সুখী হন তো সে ভালো কথা। কিন্তু তা কি কখনো সম্ভব?"

বিজনেশ রেণুকার করতলে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, "আপনি যদি আমার স্ত্রী হতেন তা হলে হয়ত এ সম্ভব হতো না। আমি আপনাকে আমার চোখের আড়াল করতে পারতাম না। অমূল্য রত্নের মতো আপনাকে আমি যত্ন করে রাখতাম। আপনি কাউকে দেখতে পেতেন না, কোথাও যেতে পেতেন না। আমার–শুধু আমারই হৃদয়ের পূজো গ্রহণ করবার মাত্র আপনার অধিকার থাকত।"

রেণুকা উঠে দাঁড়াল। তার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। বিজনেশ বললে, "আগামীকাল ম্যাডানে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। যদি তার আগে আর দেখা নাও হয়, যদি সুযোগ পেতাম তা হ'লে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা সব সময় আপনার দুয়ারে আমি পড়ে থাকতাম–" বলে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে রেণুকার দিকে চাইল।

সেই সময় জ্ঞানদা দেবী সেই পথ দিয়ে চলে গেলেন। রেণুকার সঙ্গে মাত্র একবার মাথা নেড়ে ভদ্রতা রক্ষা করলেন, কিন্তু বিজনেশকে গ্রাহ্যই করলেন না।

বিজনেশ জ্ঞানদার গমন পথের দিকে চেয়ে বললে, "দেখলেন তো ওর ব্যবহারটা। কেমন শুষ্কভাবে একটু মাথা নেড়ে চলে গেল। এখনই গিয়ে আমাদের নামে হয়ত কত কি রটাবে। ওর দলের লোক সবাই অমনি ওর মতো নিন্দুক, পরশ্রীকাতর–"

রেণুকা হেসে উঠল। সে বিজনেশের উপর জ্ঞানদার অবহেলার ভাব লক্ষ্য করেছিল। বললে, "এখানে আপনার সঙ্গে যখন ইচ্ছা বেড়াবো। যতক্ষণ না আমি কোন অন্যায় করছি ততক্ষণ কাউকে ভয় করবার আমার কিছুই নেই। জ্ঞানদা যা ইচ্ছা বলে

বেড়ান। দুজন না হলে ঝগড়া হয় না। কিন্তু আমি ওঁকে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার উপযুক্ত বলে মনেই করি না।" বলে সে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো। বিজনেশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিল।

তখন সন্ধ্যা হয় নি কিন্তু রাস্তার আলো জ্বালিয়ে গেছে। গাড়ীর ভীড়ে পথে পথিকদের সন্ত্রস্তভাব। রেণুকা অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। তার মনে এখন যুগপৎ বিজনেশ এবং জ্ঞানদার চিন্তা।

জ্ঞানদার তার ওপর কেন এত আক্রোশ তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তিনি সাপের মতো বিষ উদগার করতে আরম্ভ করেছেন।

লোকের কাছে তার নামে কুৎসা রটনা করছেন। খবরের কাগজে ছদ্মনামে তাকে গালাগালি করছেন। অথচ রেণুকা তো তাঁর কাছে কোনো দোষ করে নি। সাপকে দুধ কলা খাওয়ালেও সে বিষ উদগার করবেই।

কিন্তু বিজনেশকে রেণুকার ভালো লেগেছে। বিজনেশের আচরণ বাড়াবাড়ি হলেও রেণুকা তার উপর রাগ করতে পারে না। রেণুকার কাছে বিজনেশ হচ্ছে গ্রীষ্মকালের ভ্রমণক্লান্তি-নিরাময় পথের কোনো ছায়াঘন তরুর মতো। অন্তঃসারহীন আলাপের পর বিজনেশের সঙ্গে দুটা কথা বললে মনে হয় যে প্রচণ্ড গরমের সময় মধুর হাওয়া বইল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার রেণুকার মনে পড়ল নবকুমারকে। তার কথা মনে হতেই তার সমস্ত অন্তরটা অপমান বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। নবকুমার যেন তীব্র-জ্যোতি কোন প্রদীপ, আর রেণুকা যেন কোনো পতঙ্গ। যতবারই সে প্রদীপের কাছে ঘেঁষতে চায় ততবারই দেহে দহনজ্বালা জ্বলে। অথচ, সে আকর্ষণ দমাবারও শক্তি তার নেই। নবকুমার তাকে দেশে ফিরে যেতে বলেছে। কিন্তু কেন? সে কথা বলবার তাঁর অধিকার কি? আর সে গেলেই বা তাঁর এতে কি লাভ হবে? রেণুকা অবশ্য দেশে কিছুদিনের জন্য যাবে নিজের জমিদারী রক্ষার জন্য, প্রজাদের সঙ্গে গোলোযোগ মেটাবার জন্য তাকে যেতেই হবে। কিন্তু নবকুমারের কথাতে নয়।

রেণুকা ঠিক বুঝতে পারে না সে কাকে বেশি ভালবাসে। নবকুমারকে, না, বিজনেশকে? রেণুকার মতে ভালবাসা মাত্র একবারই জন্মে, ভালবাসতে মাত্র একজনকেই পারা যায়। অথচ, তার দুজনকেই ভালো লাগে। তা হলে হয়তো সে কাউকেও ভালবাসে না। ভালোলাগা ও ভালবাসা এক নয়। মনোরমার সঙ্গে একদিনের আলাপের কথা তার মনে পড়ল। মনোরমা বলেছিলেন, "প্রেম হৃদয়েরই একটা বৃত্তি। সব সময়ে কোনো এক বিশেষ বৃত্তি কোনো এক বিশেষ বিষয়ে হৃদয়ের মধ্যে বহুক্ষণ স্থায়ী হতেও পারে না। এখন আছে, আর একটু পরেই নেই।

এই এখন আমি তোমার উপর রাগলাম, কালই হয়তো সে রাগ আমার চলে গেলো। আজ তোমাকে আমি ভালবাসি, কালই হয়তো তোমাকে আমি ঘৃণা করব। প্রেমও ঠিক তেমনি। আজ যাকে ভালবাসছি, কাল যদি তাকে ভালবাসতে না পারি

তাতে দুঃখিত হবার কিছুই নেই। যুগপৎ দু'জনকে ঘৃণা করা যেমন অসম্ভব নয়, দু'জনকে একসঙ্গে ভালবাসাও তেমনি অসম্ভব নয়। প্রেমকে আমরা খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরেই যত গোলযোগ উপস্থিত করি।

রেণুকা তর্ক করেছিল, "তাহলে সতীত্ব কথাটার কোনো অর্থই নেই বলে আপনি মনে করেন?"

"না, সতীত্বটা হচ্ছে একটা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার।"

"কিন্তু আমি তা মনে করি না। হৃদয়ের বৃত্তি বলেই যে সবগুলোই পালনীয়, তা নয়। মানুষের অন্তরে নিরন্তর ভালো-মন্দ কত ভাবই না জাগছে, তার মধ্যে ভালোগুলি সংযমের বাঁধ দিয়ে সৎপথে চালনা করাই মানুষের বিশেষত্ব। যারা অসংযমী তারাই হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তিকে প্রেম বলে ভুল করে। প্রেমেও সংযম চাই। হৃদয়ের সঙ্গে চাই মস্তিষ্কের সংস্পর্শ। নদীকে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছতে হলে চাই যেমন তটের বাঁধন—প্রেমের যথার্থতা অনুভব করতে হলে চাই তেমনি সংযম। আমাদের মধ্যে সংযম-শক্তির অভাব বলেই প্রেম কি—তা বুঝতেই পারি না। সতীত্ব কথাটাকে দোষারোপ করি।"

মনোরমা রেণুকার উচ্ছ্বাস শুনে মাত্র হেসেছিলেন, কোনো কথা বলেন নি।

গাড়ি ততক্ষণ রেণুকার বাড়ির গেটে গিয়ে ঢুকেছে। রেণুকা নেমেই দেখে, কে একজন তার ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চিনল, হিরণ। তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে সে আর এদিকে কোনোদিন আসে নি। রেণুকা তাকে দেখেই যেন কোনদিন কিছু হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করে বলল, "আপনি যে?"

হিরণ বললে, "আমার খুব ভাগ্য যে আপনাকে দেখতে পেলাম। এসেই শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। আশা করি আমাকে দেখে আপনি দুঃখিত হননি। আপনাকে আমার কতগুলো কথা বলবার আছে। শুনবেন কি?"

"নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।" বলে হিরণকে সঙ্গে নিয়ে সে ড্রইংরুমে এসে বসল।

হিরণ বসে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললে, "আপনার জন্য আমি বড়ো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। জ্ঞানদা দেবীকে বোধ হয় চেনেন। সে আপনার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয় লোকে সে কথা শুনছেও। সে আপনার নামের সঙ্গে বিজনেশকে জড়িয়ে কুৎসা রটাচ্ছে। শুনে আমার দেহের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু নিরুপায়। আচ্ছা, আপনি বিজনেশের সঙ্গে বেড়ানো আর আলাপ করা বন্ধ রাখতে পারবেন না? আপনাকে উপদেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করবেন।" হিরণ বোধহয় রেণুকার ভ্রূকুটি লক্ষ্য করেছিল, তাই তৎক্ষণাৎ শেষ বাক্যটা যোগ করে দিল।

রেণুকা কিন্তু হেসেই বললে, "আমরা কিছু করি আর না করি লোকে কথা বলবেই। কিন্তু যারা অপরের অসাক্ষাতে বলা কথা তার কাছে এসে লাগায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পাজী।"

হিরণ বিস্ময়ে অপমানে অবাক হয়ে গেল। বিমর্যমুখে কিছুক্ষণ পরে বলল, "আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করে ও কথা বললেন?"

"ঠিক তা বলি নি।"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, আমি কোনো কারণেই আপনার মনোকষ্টের কারণ হতে চাই না। আমি যে আপনাকে—"

"মিঃ গাঙুলি! দোর থেকেই আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার।"

হিরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, "ক্ষমা করবেন, নিজেকে আমি সংযত রাখতে পারি নি, কিন্তু জ্ঞানদা আপনাকে কি বলে তাও কি আপনি শুনতে চান না?"

রেণুকা মাথা নেড়ে বললে, "না। ওযে কি বলে আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারি। কিন্তু লোকের কথায় কান দেওয়া আমি দরকার বিবেচনা করি না। আপনি আমাকে সাবধান করতে এসেছেন, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে পড়বার মত মেয়ে আমি নই। জ্ঞানদার দল যা পারে বলুক, আমি বিজনেশের সঙ্গে মিশবোই, খুব বেশি করেই মিশবো। তাঁর মতো মানুষ আমি দেখি নি। জীবনকে কেমন করে উপভোগ করতে হয়, তা তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। জ্ঞানদার কথায় আমার কিছু আসে যায় না। সে—"

রেণুকার মুখ দেখে মনে হয় সে রেগে উঠেছে। কিন্তু শীঘ্র সে ভাব সংযত করে চুপ করল। অর্ধসমাপ্ত কথাটাকে আর শেষ করল না।

হিরণ বললে, "নিজের চোখে যদি নিজেই ধুলো দিতে চান তো আমার কিছুই বলবার নেই। জ্ঞানদা আপনাকে খুব ভালো মনে করে বললেই বোধ হয় আপনি খুব খুশি হতেন। কিন্তু যারা কাউকে ভালবাসে তারা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আচ্ছা, তবে আসি।" বলে হিরণ রেণুকার দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে। "কিন্তু আমি আপনাকে চিরকালই ভালো চোখে দেখবো"—এই বলে ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেণুকা আজ সর্বপ্রথম এই সমাজকে নিদারুণ ঘৃণার চোখে দেখল। সে এখানে আসার পর থেকে অনেক নীচতা, অনেক সংকীর্ণতা এদের মধ্যে দেখেছে, কিন্তু এই বলে সে নিজেকে বুঝিয়েছে যে, ভালো মন্দ দুটো নিয়েই মানুষ। কিন্তু বাইরের জাঁক জমকের অন্তরালে এদের মধ্যে যে কত কালিমা তা ঠিক সে বুঝতে পারে নি। ধীরে ধীরে তার চোখ খুলে আসতে লাগল।

জ্ঞানদা আজ আবার তাকে বিজনেশের সঙ্গে দেখেছে। আজ আবার সকলের কাছে সে কি বলবে, একথা মনে মনে কল্পনা করে রেণুকা একা ঘরে রোষে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠতে লাগল।

এগার

মনোরমা শুনেছিলেন যে, জ্ঞানদা পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে রেণুকার নামে নানা কথা বলে থাকেন। কিন্তু জ্ঞানদা যে তাঁর কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে রেণুকার বিষয় আলোচনা করতে পারবেন, তা তিনি জানতেন না। যেদিন সত্য সত্যই তাঁর ঘরে বসে রেণুকাকে যা তা বলতে লাগলেন, সেদিন তিনি বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

স্থির হয়েছে রেণুকা কিছু দিনের জন্য দেশে যাবার আগে রেণুকার বাড়িতে একটা বড়ো রকম উৎসবের আয়োজন করা যাবে। উৎসবে যত সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের

নিমন্ত্রণ করা হবে। মনোরমার মতে সেই উৎসবেই রেণুকা হবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর যখন সে দেশ থেকে ফিরে আসবে তখন তার আসনটা ফিরে পেতে আর কোনই বেগ পেতে হবে না। সেদিন মনোরমা সেই উৎসবের নিমন্ত্রিতদের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এমন সময় এলেন জ্ঞানদা। তিনি কাগজখানা নিজের হাতে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি?"

মনোরমা বললেন, "রেণুকার জন্য আমি এটা প্রস্তুত করছি। রেণুকার জন্মদিনে একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে–এটা তারই নিমন্ত্রিতদের তালিকা। দেখতো, কোন বিশিষ্ট লোক বাদ পড়ে গেছেন কিনা?"

জ্ঞানদা প্রথম দৃষ্টিক্ষেপেই বুঝতে পারলেন যে, যদি সবাই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তাহলে উৎসবে যত সব প্রসিদ্ধ এবং স্বনামধন্য পুরুষ এবং মহিলার সমাবেশ হবে।

তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিটি নামের উপর দিয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলো। বললেন, "উৎসবটা খুব জমকালো হবে দেখছি।"

"হ্যাঁ, রেণুকা কতকগুলো বাজে লোককে বাদ দিয়ে খুব বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে।"

জ্ঞানদা শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "একটা খামখেয়ালী মেয়ের যে বিবেচনাশক্তি থাকবে সেটা আশ্চর্যের। তুমি যে এ ধরনের একটা মেয়েকে কেন আমাদের মধ্যে টেনে আনলে আমি বুঝতে পারি না। তুমি না হলে সে সভ্য সমাজে পরিচিত হতে পারত না। সে যে কোথাকার কে, তা কেউ জানে না। আমাদের মাঝে স্থান পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিজনেশকে নিয়ে সে যে রকম মাতামাতি করছে সেটা অসহ্য। আমি ওকে আদৌ ভালো মনে করি না।"

"কিন্তু তুমিই তো আগে ওকে পছন্দ করেছিলে বেশি। বিজনেশের মধ্যে দোষের যে কিছু নেই তা আমরা সবাই জানি। যে কোন মেয়ে তাকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারে। সে রেণুকার বন্ধু এবং আমার মনে হয় তার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু রেণুকা আর দু'টি পাবে না।"

যেন কোন বদ গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করল এমনিভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, "তার অভদ্র ব্যবহারে আমি আহত হয়েছি। ভদ্রতা বলতে সে কিছু জানে না।"

মনোরমার তর্ক করবার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি ভালোভাবেই বললেন, "আমি তো তার মধ্যে কোন অভদ্র আচরণ লক্ষ্য করি নি। সকলের সঙ্গেই সে সরল ভাবে হাসিমুখেই কথা বলে।"

"মোটেই না। টাকার গরম তার মধ্যে যথেষ্ট।"

"সে নিজে থেকে কারো সঙ্গে আলাপ করতে চায় না। অপরেই বরং যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে যায়। কিন্তু আলাপ করতে গিয়ে কেউ দুঃখিত হয়ে ফিরে এসেছে, এমন শোনা যায় নি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় সবাই আমাকে ধন্যবাদ দেয়–এমন সে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।"

জ্ঞানদা কিছু না বলে কেবলমাত্র একটিবার ভ্রূকুটি করলেন।

মনোরমা বলে চললেন, "তুমি যে তার নামে যা তা বলে বেড়াচ্ছ তা কি জানি কেমন করে তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছে। শুনে সে অত্যন্ত আহত হয়েছে। সে কাল আমাকে বললে। জ্ঞানদাদেবীকে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় স্থান দেওয়া বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি বললাম সেটা তোমার পক্ষে অশোভন হবে। কিন্তু সে শুনতে চাইল না। রেণুকা সব সময় বলে যে ,সে ঝগড়া আদৌ পছন্দ করে না।"

জ্ঞানদা তাঁর ঠোঁট দাঁত দিয়ে চাপলেন। ক্রোধের চিহ্ন তাঁর সারা মুখে প্রকট হয়ে উঠল। মনোরমার কথা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর মত একজন সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাকে যে কেউ বাদ দিয়ে কোন উৎসবের আয়োজন করতে সাহসী হতে পারে তা তিনি এই প্রথম শুনলেন। বললেন, "ক্ষতিটা অবশ্য রেণুকারই। কিন্তু এর দ্বারাই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরকম মেয়ের দিকে ঝোঁকা কি রকম ভুল। তার সঙ্গে আলাপে আমার আদৌ আনন্দ নেই। প্রথম থেকেই তার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তুমিও কিছুদিন বাদে নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তুমি বলছ যে, তার উৎসব বেশ আনন্দজনক হবে। কিন্তু আমার মনে হয় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই রেণুকার উৎসবে যোগ দেবেন না। জানো না তুমি তার সম্বন্ধে লোকে কি ভাবে। এর মধ্যে বিজনেশকে নিয়ে যদি রেণুকা কোন কাণ্ড করে তা হলে কেউই বিস্মিত হবে না।"

মনোরমা এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি যে কি করে তার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলো তা জানি না। রেণুকা আনন্দপ্রিয়, তার মধ্যে কূটিলতা বলতে কিছু নেই। আমিও আজকার নই। তুমি যে কেন তার সম্বন্ধে এই সব বলছ তা আমার মাথায় ঢুকছে না। সে দেখতে সুন্দর, তার প্রচুর অর্থ, সে যে লোকের প্রশংসা অর্জন করবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি! লোকে প্রথমে তার টাকা দেখে আসে, সৌন্দর্য দেখে বন্ধুত্ব স্থায়ী করে। তার উৎসব যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তাতে বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

জ্ঞানদা বললেন, "এ নিয়ে আমি আর বেশি আলোচনা করতে চাই না। তার উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই আমার ইচ্ছা। আমাকে বাদ দেওয়া হবে, একথা বলবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

মনোরমা জ্ঞানদার মুখের ভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করলেন। তাঁর এই অপমানের শোধ তুলতে জ্ঞানদা রেণুকার মাথায় কি বজ্র নিক্ষেপ করবেন তা ভেবে রেণুকার জন্য তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পরশ্রীকাতর বিবেচনাহীন জ্ঞানদা যে-কোন মেয়েকে যে কতদূর অপদস্থ করতে পারে সে ধারণা রেণুকার নেই। তাকে সে কথা জানালে সে বিশ্বাস করতে চাইবে না।

নিদারুন ক্ষোভে মনোরমা ঘেমে উঠলেন। তাঁর নিজের অতীতের সঙ্গে তুলনা করে রেণুকার সব কাজ তাঁর কাছে নির্দোষ ছাড়া কিছু মনে হল না।

অতীতের কথা মনে জাগতেই তাঁর বুকের ভিতর যেন নষ্ট আবেগ একবার জেগে উঠল, স্মৃতিপটে জাগল কয়েকটি মৃত মুখের ছবি, অর্ধবিস্মৃত কয়েকটা দৃশ্য। নিদ্রিত

অতীতের কক্ষ হতে কত তুচ্ছ ঘটনাও জীবিত হয়ে তার স্মৃতিপটে একে একে আশ্রয় নিতে লাগল।

বৈচিত্র্যময় জীবন, রহস্যময় জীবন। মানবহৃদয়ের প্রণয় পিপাসা অসীম, তার নির্বাণ নেই।

তিনি জানেন রেণুকার অন্তর শিশুর মত সরল। অন্যায়কে সে প্রেতের মত ভয় করে। রেণুকার জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে মনোরমা এটুকু বুঝেছেন যে, রেণুকার হৃদয় হচ্ছে কবির হৃদয়, ভাবুকের হৃদয়,–সুন্দর নিষ্কলুষ। তার মনে নিত্য নূতন পরিকল্পনা জাগে, সরল পরিকল্পনা। হীনতা নীচতা হতে সে বহু উচ্চে। প্রণয় সম্বন্ধে তার আদর্শ তাঁদের মতের সঙ্গে খাপ খায় না। সে বলে একটিমাত্র পুরুষের মধ্যেই নারী-প্রেমের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হতে পারে। তবে, সে পুরুষকে হতে হবে সবল সংযত। যেখানে সংযম নেই, সেইখানেই প্রেম বহু অভিলাষী হয়।

জ্ঞানদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ তবে আসি। তোমাকে আজ বড় পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। যে কেউ দেখলে ভয় পেয়ে যেতে পারে।" বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মনোরমা জ্ঞানদার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে আয়নার কাছে দাঁড়াতেই দেখলেন তাতে রেণুকার প্রতিবিম্ব পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রেণুকার দিকে ফিরে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "সিঁড়িতে বোধ হয় তোমার জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা হল?"

"হ্যাঁ তিনি দাঁড়িয়েই একবার ভ্রূকুটি করলেন। তারপর কিছু না বলে চলে গেলেন। আমিও কোন কথা বলি নি।"

মনোরমা ভীতভাবে বললেন, "তোমার উপর খুব চটে গেছে। নিমন্ত্রণ থেকে তাকে বাদ দেওয়াটা বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে তালিকাটা দেখে ফেলেছে।"

"আত্মসম্মানের চেয়ে আর কিছু বড়ো নয়। তার কথাগুলো প্রথমে আমি গ্রাহ্যই করি নি। তার বন্ধুত্বের মূল্য যে কতটুকু তা প্রথম আলাপেই আমি বুঝে নিয়েছি। সে আপনার নামে পর্যন্ত আমার কাছে কত কি বলেছে। তারপর বললে বিজনেশের নামে। তারপর আবার বিজনেশকে আমার নামে যোগ করল। এখন আবার–"

এখানে রেণুকা থামল। মনোরমার উৎসুক চোখের দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করল। সে নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

মনোরমা কোমল কণ্ঠে বললেন, "তারপর?"

"তারপর সে আমাকে নবকুমারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। তার মতে আমি ভীষণভাবে নবকুমারের প্রেমে পড়ে গেছি। কিন্তু তিনি আমার দিকে ফিরেও চাইছেন না। আমার যত সব কলাকৌশল দিয়ে তাঁকে আমার বাড়িতে আনতে চাইছি কিন্তু তিনি আমার মতো অসৎ নারীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে দূরে রাখছেন, এমনি আরও কত কি। সত্যই এবার আমার রাগ হয়েছে। আমার অবর্তমানে যে আমার নামে যা নয় তাই বলে, তাকে আমার গৃহে কেন নিমন্ত্রণ করবো?"

মনোরমা জ্ঞানদার প্রতিশোধ-স্পৃহার উগ্রতাকে মনে করে বললেন, "সময় সময় দরকার হলে তাও করতে হয়। নিজের জন্য এবং তোমার বন্ধুদের ভালোর জন্য তার

কাছে একটা কার্ড পাঠিয়ে দাও। তার কাছে তোমার দুয়ার বন্ধ করে রেখো না। তা করলে তোমার ক্ষতির মাত্রাটা একটু বেশির দিকেই ঘেঁষবে।"

রেণুকা মাথা নেড়ে বললে, "তা হোক, ওকে আমার ভয় করবার কিছুই নেই।"

মনোরমা বললেন, "আমি আর কি বলব। আচ্ছা যাক্, তালিকাখানা একবার দেখ।"বলে তিনি তালিকা খুঁজতে টেবিলের উপর চোখ বোলালেন। আর সব জায়গাও দেখলেন, কোথাও মিললো না। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "যাক্‌গে কোথায় গেল। আর একটা কপি উপরে আছে, পরে এলে তোমাকে দেখাবখন।"

কয়েক মিনিট পরে দু'জনে ভাবী উৎসব সম্বন্ধে আলোচনায় লেগে গেলেন। কিন্তু আলোচনাটা ভালো জমল না। কিছুক্ষণ পরেই রেণুকা চলে গেল।

মনোরমার মনে কিন্তু রেণুকার চিন্তা সারাদিন জাগ্রত হয়ে রইল। বিজনেশকে নিয়ে জ্ঞানদা অনেক দিন হতেই রেণুকার নিন্দা করতে শুরু করেছে। কিন্তু রেণুকা তো তাতে রাগে নি। অথচ নবকুমারের কথায় এত তার ক্রোধ কেন? চক্রান্ত করে কাউকে আহত করতে পারা যায় না, এক সত্যই আঘাত দিতে পারে। একমাত্র উলঙ্গ সত্যই তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো অন্তর রক্তাক্ত করতে পারে। মিথ্যা অপবাদে ভীত হয় ভীরুরা। কিন্তু রেণুকা তো ভীরু নয়।

বার

শরতের রাত। আকাশে পূর্ণচাঁদ উঠেছে। ছায়াপথ বেষ্টনকারী নক্ষত্রের জ্যোতি তাতে কিছু ম্লান দেখাচ্ছে। বিজনেশ ও রেণুকা বসেছিল রেণুকার বাড়ি সংলগ্ন উদ্যানের একদিকে। সেখানে বিদ্যুৎ-আলোক চাঁদের জ্যোৎস্নাকে ম্লান করে নি। জন-কোলাহল শরতের সুরুচিকে অপ্রতিভ রেখেছে।

রেণুকা বিজনেশ বসেছিল পাশাপাশি মখমলের মত নরম দূর্বার উপর। চাঁদের কিরণ তাদের স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বাতাস এসে তাদের ফুলের গন্ধ বিতরণ করছে। সুমুখে দুগোছা গোলাপ ফুল কখন দু'জনের হাত থেকে খসে ঘাসের বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

বাড়ির মধ্য থেকে তখন 'রেডিওর' একখানা গান ভেসে এসে তাদের কথা কিছুকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। সেখান থেকে গানের কথা ও সুর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। গানটা ছিল অতুলপ্রসাদের একটা বিখ্যাত কীর্তন–

"ওগো সাথী মম সাথী আমি সেই পথে
যাব সাথে,–
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ
তিলক মাথে।
আমি সেই পথে যাব সাথে।"

গান শেষ হলে রেণুকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "চমৎকার! এমন সুন্দর গান আমি খুব কমই শুনেছি। কি সুন্দর কথাগুলি। সত্য বলছি আপনাকে, ভালো গান আর কবিতা মানুষের চিত্ত বিনোদন যেমন করতে পারে, অমন কিছুতেই নয়।"

বিজনেশ কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপরে যখন বুঝল এতক্ষণ হয়ত রেণুকার গানের মোহ কেটেছে, তখন ধীরে ধীরে বললে "কিন্তু পুরুষের সব চেয়ে বেশি চিত্ত-বিনোদন কে করতে পারে জানেন? কালিদাস তার ঋতু সংহারে 'শরৎ' বর্ণনা এই বলে শেষ করেছেন,—

প্রস্ফুটিত পঙ্কজেরা
যাহার বরানল
যুগ্ম নীলোৎপলের দলে
যাহার দু'নয়ন
রূপের আধার সকল প্রকার
এই যে শরৎ করুক আবার
প্রেমোন্মত্তা নারীর মতো
চিত্ত বিনোদন।

"প্রেমিক নারী পুরুষের চিত্তে যেমন আনন্দের ধারা বওয়াতে পারে এমন কিছুতেই নয়।"— বলে রেণুকা কিছু বলে কিনা তা শুনবার জন্য সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু রেণুকা কিছুই বলল না। তখন বিজনেশই আবার আরম্ভ করলে, "আর সত্যই তাই। নারীরও একমাত্র কাজ পুরুষের চিত্ত বিনোদন করা। ফুল যেমন রূপে, রসে, গন্ধে ভ্রমরকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে নারীর কাজও ঠিক তেমনি। সেও হৃদয়ের প্রেমে, মনের মাধুর্যে, দেহের সৌন্দর্যে পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করবে। শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর মুখে বলেছেন, সৃষ্টি ধারণের ক্ষমতাই নারীর সৌন্দর্য। হুইটম্যানের নাম শুনেছেন বোধ হয়? আমেরিকান পোয়েট। বলিষ্ঠ তাঁর কল্পনা, সুষ্ঠু তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তিনি বলেছেন—

তোমার ও দেহ নারী তব যৌবন
পূর্ণভাবে ভোগ আমি চাহি করিবারে,
এ-মোর জীবন দিয়েছে মেলি আপনারে
তব ভবিষ্যৎ মাঝে। নহে অকারণ,—
বিরাট সাম্রাজ্য যারা করিবে স্থাপন
মহান সৌন্দর্য যারা চাহে সৃজিবারে
উদ্ভাসিবে মানবের বিমূঢ় চেতন
আত্মত্যাগ দীপ্তি দিয়ে যারা বারে বারে
মোদের মিলনে সখি, সে সব মহান,
ত্যাগী, কর্মী, রূপস্রষ্টা পৃথিবীর কোলে
আসিবে, সৃজিবে দোঁহে, এই চাহে প্রাণ
সেই অনাগতদের ছায়া সখি দোলে
তোমার মাঝারে রূপদেব সে ছায়ায়
তাই-তো এ মন তব দেহখানি চায়।"

তরুণ-তরুণী সাবধান! রজনীতে কখনো বন্ধু-বান্ধবীর সাথে নির্জনে থেকো না। রজনীর এমন একটা মাদকতা আছে, এমন একটা সম্মোহিনী শক্তি আছে যাতে করে সে অতি বড় সংযমীকেও বিচলিত করে তুলতে পারে। তার পরে আবার যদি তোমাদের মধ্যে কাব্য আলোচনা চলে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তখন কামনাকে লালসাকে প্রেম বলে ভুল হবে, কাঁচ কাঞ্চন আখ্যা পাবে।

বিজনেশ প্রতিটি কথায় অপরূপ ভাব মিশিয়ে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে গেল। আবৃত্তি শেষ করেই সে রেণুকার একখানি হাত নিজের হাতের উপর রাখল। রেণুকা বাধা দিল না। তার স্নায়ু উপস্নায়ু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম যৌবনের সমস্ত উত্তেজনা আজ পুঞ্জীভূত হয়ে যেন শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে চায়। বহুক্ষণ পরে বিজনেশ আবেগজড়িত কণ্ঠে বললে, "কেমন লাগল হুইটম্যানের কবিতা, ঠিক বলেছেন না?"

রেণুকার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে সে কম্পিত কণ্ঠে বললে, হুইটম্যানের কথা থাক। আপনি তো নিজের কবিতা একটাও বললেন না?

বিজনেশ রেণুকার মুখের দিকে চাইলো। তারপর একবার আকাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে ভাব-বিভোর কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলল,—

"আজকে প্রিয়া পূর্ণিমা রাত
পূর্ণ চাঁদের চূর্ণ-হাসি
লতায় পাতায় কীর্ণ-হয়ে
দিল সকল সমুদ্ভাসি।
বর্ষার শেষ মেঘের বেদুন
ফাটল হঠাৎ নীলাম্বরে
জীর্ণ তাহার পাঁজর রাশি
উড়ছে মৃদু হাওয়ার ভরে।
তাদের ফাঁকে তারার বিভা
যেমন তব তোমার চোখে
আজকে চল মেঘের ভেলায়
যাই দুজনে স্বপন লোকে।
বুলবুলেরই গানের মাঝে
স্বরগ সুরই আসছে নামি।
মন মাতানো স্পর্শে তোমার
মর্ত্যলোকে ভুলছি আমি।

অন্তরে মোর যে কবি, সে
তোমার গানে মত্ত হোল
আজকে প্রিয়া মৌন কেন
খোল মুখের ঘোমটা খোল।

খোল মুখের ঘোমটা খোল
কও কথা কও হালকা সুরে
সুরের স্রোতে যাবই ভেসে
যাবই ভেসে অনেক দূরে।

অনেক দূরে অনেক দূরে
যেথায় কভু যায় নি কেহ
সেই অজানা স্বপন লোকে
রচব ক্ষণিক সুখের গেহ।
সেই ক্ষণিকের সুখের হ্রদে
তোমায় আমায় সন্তরিব
শ্রান্ত যদি হয়েই পড়ো
বক্ষ তব বক্ষে নিব।
দেহ আমার জড়িয়ে ধরো
ক্লান্ত তোমার কোমল করে
আজকে যদি স্বর্গ না পাই
স্বর্গ কি সই পাবোই মরে?
জীবন থাকুক মরণ থাকুক
থাকুক পড়ে আর আর সবি
এই শরীরেই স্বর্গ পাবো
মিথ্যা কথা কয় না কবি।

বিজনেশ নীরব হল। রেণুকা নির্নিমেষ চোখে তার দিকে চেয়েছিল। বিজনেশ চোখ তুলতেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। রেণুকার ঠিক মুখের উপরেই তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বিজনেশ ধীরে ধীরে তার একখানি হাত রেণুকার কাঁধের উপর রাখল। তারপর তাকে হাতে জড়িয়ে ধরে তার কোলের উপর শোয়াল। রেণুকা বাধা দিল না, বিস্রস্ত বসন, বিস্রস্ত কেশ সংযত করবার কোনো চেষ্টা করল না। বিজনেশের সাহস বেড়ে গেল। সে তারপর নিজের মুখখানা ধীরে ধীরে রেণুকার মুখের অতি নিকটে নিয়ে চলল। রেণুকার শরীর বিবশ হয়ে গেছে। সে ভয়ে, আবেশে, আবেগে চোখ মুদল। কিন্তু তক্ষুণি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিজনেশের কোল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিকটে কার পায়ের শব্দ শোনা গেছে।

ভৃত্য এসে জানাল, কে একজন মহিলা রেণুকার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রেণুকা কেশ বেশ সংযত করে নিয়ে বললে, "কে?"

ভৃত্য বললে, "তা কিছু বললেন না। শীঘ্র আপনাকে ডেকে দিতে বললেন।"

"চল যাচ্ছি" বলে রেণুকা বিজনেশকে উদ্দেশ্য করে বললে, "একা বসে থেকে কি হবে? চলুন আপনিও—"

ড্রইং রুমে রেণুকার পিসিমা ব্রজরাণী প্রতিক্ষা করছিলেন। তিনি রাত আটটায় হাওড়ায় নেমেছেন। রেণুকা তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললে, "পিসিমা, তুমি? কোন খবর না দিয়েই?"

ব্রজরাণী রেণুকার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ধীরভাবে বললেন, "কেন, চিঠি তো দিয়েছি, পাস নি বুঝি?"

রেণুকার মনে পড়ল এক সপ্তাহ হল সে দেশের চিঠি পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। সেগুলো যেমনি আসে, তেমনি গিয়ে একটা বাস্কেটে জমা হয়। সপ্তাহ শেষে একবার করে সব পড়ে নেবে ঠিক করেছিল। এমন বিভ্রাট ঘটবে কে জানতো? সে কিছু না বলে চুপ করে রইল।

ব্রজরাণী বুঝলেন যে তাঁর চিঠি পড়বার মতো ফুরসৎও রেণুকার নেই। তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বিজনেশের দিকে চেয়ে বললেন, "ইনিই বিজনেশ বুঝি?" ব্রজরাণী এসেই ভৃত্যের মুখে বিজনেশের নাম শুনেছেন।

রেণুকার পশ্চাতেই বিজনেশ ছিলেন। রেণুকা তার দিকে চেয়ে অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, ইনিই আমার বন্ধু বিজনেশ, মিঃ রয়, ইনি আমার পিসিমা–"

বিজনেশ ব্রজরাণীকে নমস্কার করল। ব্রজরাণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। রেণুকার দিকে চেয়ে বললেন "নবকুমার এখানে আসেন?"

রেণুকা ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না'।

ব্রজরাণী আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "আসে না এখানে? দেখা হয় তার সঙ্গে তোর? কোথায় হয়? তুই তাঁর কাছে যাস্?"

বিজনেশের সুমুখে নবকুমারের প্রতি পিসিমার এই আগ্রহ প্রকাশে রেণুকা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বললে, "দুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; নিমন্ত্রণ করলেও তিনি আসেন না।"

পিসিমা আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "তবে এতদিন ধরে কি করছিলি তুই? আমি ভেবেছিলাম"–কি ভেবেছিলেন দয়া করে প্রকাশ না করলেও রেণুকা হাড়ে হাড়ে তা অনুভব করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার আরম্ভ করলেন, "এখানে তা হলে তুমি স্ফূর্তি ওড়াতে এসেছ? ওদিকে জমিদারী ছয় নয় হয়ে যাচ্ছে। আমি বুড়ো মানুষ, কদিক আর সামলাই? যাক্ সব জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখ। কালই যেতে হবে–কোন ওজর আমি শুনব না।"

এবার রেণুকাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বিজনেশের সুমুখে পিসিমার এই কথাবার্তায় সে নিজেকে অপমানিত বোধ করল। বললে, "আমার যাওয়া হবে না। আমার যেতে এখনো কিছু দেরী আছে।" তার কথার মধ্যে ক্রোধের ঝাঁঝ বেশ ভালো মাত্রায়ই ছিল।

ব্রজরাণী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রেণুকা তাঁকে ভয় করে, ভক্তি করে। এই এতটুকু বয়স থেকে তিনি তাকে মানুষ করেছেন, স্নেহ দিয়েছেন, শাসন করেছেন। রেণুকা কোনদিন তাঁর অবাধ্য হয় নি। মায়ের সম্মানই সে বরাবর তাঁকে দিয়ে এসেছে। তাই তাঁর মনে বড়ো বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলে রেণুকা আসবেই। তাঁর কথা অবহেলা করতে পারবে না। এখন তার মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে অভিমান বেদনায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তিনি প্রাণপণে চোখের উদ্যত অশ্রু দমন করে গলার স্বর স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে অনেকক্ষণ পরে বললেন, "যাবি না?"

রেণুকা ব্রজরাণীর মুখের ভাব, কণ্ঠে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করল। তেমনি ঝাঁঝাল কণ্ঠে উত্তর দিল, "না।"

"বেশ, তবে থাক। আমি গেলাম।" বলে তিনি আর কোনদিকে না চেয়ে, কোন কথা না বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রেণুকা ব্রজরাণীকে চেনে। জানে যে, আর বাধা দিলে কোন ফল হবে না। একগুঁয়ে ব্রজরাণী একবার যা স্থির করে ফেলেন তার আর অন্যথা হয় না।

রেণুকা তাই আর তাকে ফিরাবার চেষ্টা করল না।

ব্রজরাণী বেরিয়ে যেতেই রেণুকার বহু পুরাতন ভৃত্য কেশবলাল এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে, "আমাদের কি একেবারে ভুলে গেলে দিদিমণি?"

পিসিমার কঠিন কথা শুনে রেণুকার অভিমান হয়েছিল। পিসিমাকে কঠিন কথা বলেছে বলে নিজের উপর তার রাগ হচ্ছিল। এখন পুরাতন ভৃত্যের স্নেহের সম্বোধনে উভয় ভাব রোদনের আশ্রয় নিতে চাইল। কিন্তু পাছে কোন কথা বলতে গেলেই বিজনেশের সুমুখেই চোখের জল বের হয়ে পড়ে এই ভয়ে সে মাত্র উচ্চারণ করল, "ভুলব কেন? যাও, পিসিমা হয়ত তোমার খোঁজ করছেন।"

এই সামান্য কথায় ক্ষুণ্ণ হয়ে কেশবলাল বেরিয়ে গেল। সে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেই পিসিমা ড্রাইভারকে নবকুমারের ঠিকানা বলে দিলেন। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিল।

সৌভাগ্যের বিষয় নবকুমারের সেদিন কাজের ভীড় ছিল না। ভৃত্য গিয়ে খবর দিতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে তাকে তার বিশ্রামকক্ষে ব্রজরাণীকে নিয়ে আসতে বলে দিলেন। ব্রজরাণী আসতেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বসতে বললেন। ব্রজরাণী আশীর্বাদ করে আসন গ্রহণ করলেন। বললেন, "আমি তোমার কাছেই আসছি।'

নবকুমার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

ব্রজরাণী কেশবলালকে হাঁক দিয়ে বললেন, "গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দে-" তারপর নবকুমারের দিকে চেয়ে "আমার বিছানা কোথায় হবে বলতো? সেই ঘরে আমার বিছানাগুলো নিয়ে যাক্।"

নবকুমার ব্যস্ত হলে বললেন, "আচ্ছা, আমি সে সব ঠিক করে নিচ্ছি। আপনি বসুন একটু-"বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ভৃত্যকে যথোপদেশ দিয়ে ফিরে এসে বললেন, "আপনাকে তো আহ্নিক করতে হবে?"

ব্রজরাণী খুশি হয়ে বললেন, "সে সব আমি গঙ্গাতে সেরে এসেছি। খাবারও কোন বন্দোবস্ত করতে হবে না। এবার একটু শুতে পেলে বাঁচি। তা যাক্। তুমি বসো এখন। তোমার সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আছে।"

নবকুমার বসলে ব্রজরাণী কিছুক্ষণ চুপ কর থেকে বললেন "তোমার বাবা রেণুকাকে বাঁচাতেই হবে।"

নবকুমারের বুকটা ধক্ করে উঠল। রেণুকার কোন অসুখ করেছে নাকি? ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, "কি হয়েছে তাঁর? কই আমি তো কিছু জানি না।"

নবকুমারের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে ব্রজরাণী খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "না, অসুখ করে নি তার। কিন্তু কলকাতায় থেকে সে ফিরিঙ্গি বনে গেছে। আমায় পর্যন্ত

খাতির করল না। এই রাত্রি বেলাতেও দেখলাম কে এক বিজনেশের সঙ্গে বাগানে বসে গল্প করছিল। সোমত্ত মেয়ের কি এত ভালো?"

বিজনেশের নাম শুনেই নবকুমার চমকিত হয়ে উঠলেন। বিজনেশের চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত নেই। সে মাতাল, চরিত্রহীন, তার স্ত্রী নবকুমারের চিকিৎসাধীনে। রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বিজনেশ আমোদ করে বেড়ায়। তার মতো লোকের সঙ্গে রেণুকা মিশেছে জেনে নবকুমারের চিত্ত রেণুকার উপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল।

ব্রজরাণী আবার বললেন, "রেণুকা তোমাকে শ্রদ্ধা করে। তুমি ওকে বুঝিয়ে দেশে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে ওর ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না।"

নবকুমার বললেন, "আমার কথা তিনি শুনতে যাবেন কেন? আর আমার তাঁকে বলবারই কি অধিকার আছে? আমি এখানে আসতেই তাঁকে নিষেধ করেছিলাম। শোনেন নি–"

ব্রজরাণী বললেন, "যদি অধিকার কারো থাকে তো তোমারই। দাদা তো ওকে তোমার হাতেই দিয়ে গেছেন–"

নবকুমারের বক্ষ আন্দোলিত হয়ে উঠল। তিনি ব্রজরাণীর কথার অর্থ বুঝলেন। সে এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু আর কিছু বুঝতে পারলেন না।

ব্রজরাণী প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। বললেন, "তোমার বাবারও তাতে আপত্তি ছিল না। এই দেখ"–বলে একখানা চিঠি নবকুমারের হাতে দিলেন।

নবকুমার বিলাত থেকে ফেরবার পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। নবকুমার প্রথমে চিঠির তারিখ দেখলেন। মৃত্যুর একমাস আগে তাঁর পিতা রেণুকার পিতাকে এই চিঠিখানা দিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে–

"হরগোবিন্দ, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। নবকুমার বিলাত থেকে এলেই তোমার কন্যার এবং হাসপাতালের ভার তার উপরেই দেওয়া যাবে। খুব ভালো ডাক্তার হয়ে আসছে বলেই যে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও সে থাকতে পারবে না, নবকুমার সম্বন্ধে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চিত থাকো–"

নবকুমার চিঠিখানা তিন চার বার পড়লেন। চিঠি পড়ে সমস্ত তাঁর কাছে সরল হয়ে গেল। রেণুকা কেন তাঁকে রাঙামাটিতে আহ্বান করেছিল, কেনই বা তার কলকাতায় আসা, কলকাতায় এসে কেনই বা তাঁকে বার বার নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে সবই এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সারা অন্তরে তাঁর আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। রেণুকার কলকাতায় থাকার মধ্যে যে ভাবটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা আজ তিনি আবিষ্কার করেছেন।

ব্রজরাণী বললেন, "তুমি যখন রাঙামাটিতে গিয়েছিলে, তখনই আমি কথাটা পাড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ পাই নি। তুমি তাড়াতাড়ি করে চলে এলে। তা যাক্, আগামী অগ্রহায়ণে ভালো দিন আছে। ঐ মাসেই শুভকাজ সমাধা করে ফেলা ভালো। শুভস্য শীঘ্রম। আমি ভটচাজকে দেখিয়ে দিন ঠিক করে এসেছি।"

নবকুমার নীরবে চিন্তা করে বললেন, "প্রথমত কর্তব্য হচ্ছে রেণুকার মত নেওয়া। তিনি কি এ বিয়েতে রাজি হবেন?"

ব্রজরাণী বুঝলেন যে নবকুমারের বিবাহে আপত্তি নেই। আনন্দে তাঁর সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "তার জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার মত পাত্র পেলে সে বর্তে যাবে–"

নবকুমার কিন্তু সে কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সমস্ত প্রেমের ক্ষেত্রেই প্রথম প্রথম একটা ভীরুতা আসেই। অনিশ্চয়তা, ভয় এবং সন্দেহ এই তিনটি প্রেমিক প্রেমিকার উপরে প্রভাব বিস্তার করবেই। তাই শয়ন ঘরে সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় নবকুমার শুধু কি করা কর্তব্য ভাবতে লাগলেন। একবার মনে করলেন, রেণুকার নিকট প্রস্তাব করে দেখাই যাক্ কি বলে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে করলেন সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সে আঘাত হয়ত তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তার চেয়ে এমনি বেশ। তাঁর পিতা তাঁকে রেণুকাকে বিবাহ করতে বলে গেছেন। তাঁকে মুখে না বললেও রেণুকার পিতাকে তো কথা দেওয়া হয়েছে। পিতার আদেশ অমান্য করা পাপ। রেণুকার কোন আচরণের পশ্চাতে হয়তো কোন কিছুই নাই। সে হয়তো নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তাঁকে 'রাঙামাটিতে' ডেকেছিল, কলকাতায় এসেছে। কলকাতার উপর হয়তো তার সত্য সত্যই আকর্ষণ আছে। যদি বা আগে না ছিল, এখন তো হতে পারে।

এমনও তো হতে পারে যে, সে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই প্রথমটা কলকাতায় এসেছিল। তারপর মনোরমাদের সঙ্গে মিশে এখন তাদেরই একজন হয়ে গেছে। পিতার আদেশ অবশ্য রেণুকা অমান্য না করতে পারে। পিতা যাঁকে মনোনীত করে গেছেন তার গলাতেই মালা দিতে পারে। কিন্তু ভালোবাসা তিনি যদি না পেলেন তাহলে মাত্র মালাটা গলায় পরে তিনি কি করবেন? অনেক ভেবে নবকুমার ঠিক করলেন, রেণুকার নিকট এখন প্রস্তাব করা হবে না। তবে তিনি যদি একান্তই কখনও বুঝতে পারেন যে, সে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তখন যথা কর্তব্য করা যাবে।

তের

উৎসবের আর বড়ো বেশি দেরী নেই। কিন্তু উৎসবের দিন যতই নিকট হয়ে আসতে লাগল রেণুকার চিত্ত ততই বিমর্ষ হয়ে উঠতে লাগল। যে আনন্দে, যে তেজে সে এতদিন সকলের মধ্যে বিচরণ করেছে, সে আনন্দ, সে তেজ যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে; তার মনে হচ্ছে যেন তার অধঃপতন ঘটেছে। যেদিন রাতে সে বিজনেশের সঙ্গে বাগানে বসেছিল সেদিন পিসিমা গিয়ে হাজির না হলে ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াতো, তা কল্পনা করে সে নিজেকে তীব্র কশাঘাত করতে চাইল। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য, সংযম হীনতার জন্য নিজেকে নিন্দা করতে লাগল। কিন্তু তবু সে রাত্রের কথা মনে হতেই সমস্ত শরীরে তার শিহরণ বয়ে যায়, সমস্ত গ্লানিকে ছাপিয়ে সেদিনের বিচিত্র অনুভূতি তার সমস্ত হৃদয় মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। ভাবটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজতেই রেণুকা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এখনই মনোরমা আসবেন, বাজারের জিনিসপত্তর কিনে আনতে হবে। মনোরমা সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন।

মনোরমা আসার পূর্বেই রেণুকা বেশ পরিবর্তন করে প্রস্তুত হয়ে রইল। তিনি আসতেই সে গাড়িতে উঠে বসল। গৃহের মধ্যে একা থেকে মনের মধ্যে যে বিমর্ষতা দেখা দিয়েছিল বাইরের জন-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে আবার নবীন উৎসাহ অনুভব করল।

তারপর দোকানে ঘুরে জিনিসপত্র কেনার ভিড়ে মনের কিনারে যেটুকু মেঘ অবশিষ্ট ছিল তাও সরে গেল।

জিনিসপত্তর কেনা শেষ করে তারা যখন গাড়িতে এসে বসল তখন রোদের উত্তাপ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মনোরমা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পরিশ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "দোকানের ভিতরে কি বিশ্রী গরম! গরমে মারা পড়বার মত হয়েছিলাম। আশ্চর্য হচ্ছি, এমন দিনেও তুমি কি করে নিজেকে এমন প্রফুল্ল রেখেছ, এমন করে হেসে কথা বলতে পারছ। গরমের দিনে দুপুরবেলা একবার বাজার করতে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আর দুপুরে কখনো জিনিসপত্তর কিনতে বেরুব না। আজ অবশ্য প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি, সবাই ভাঙে।"

রেণুকা উত্তর করল, "ওতেই আপনার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, পরোপকারের ওপর আপনার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। আমার মনে হয় আমি সহজেই সন্তুষ্ট হতে পারি। সুখের জন্য আমি বাইরের দিকে চাই না। সুখ থাকে অন্তরের মধ্যে। এটা যদি আপনার একবার বিশ্বাস হয় তা হলে সব কিছুতেই সব সময় আপনি আনন্দ পাবেন। অন্তর যার আনন্দময় তার আনন্দ কেড়ে নিতে প্রকৃতির প্রচণ্ডতাই বলুন আর মানুষের নীচতাই বলুন কিছুতেই পারবে না।"

মনোরমা বললেন, "ওটা তোমার পক্ষেই খাটে। তোমার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যেটা তোমাকে আর সবার চাইতে উঁচুতে স্থান দিয়েছে।"

কোলাহল মুখর জনবহুল রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মোটরের গতি মাঝে মাঝে প্রতিহত হচ্ছিল। একটা মোটর বিপরীত দিক থেকে সশব্দে অতিদ্রুত তাদের মোটরের পাশ দিয়ে যেতেই মনোরমা বললেন, "সেদিন তোমাকে ক'টাকা ফাইন দিতে হয়েছিল? তুমি তো আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলনি, আমিও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

রেণুকা বললে, "সেদিন ড্রাইভারটা কি কাজে বাইরে গিয়েছিল, আমারও সে সময় বাইরে কি কাজ পড়ল। তাই নিজেই ড্রাইভ করছিলাম। সকালবেলা বাইরে তখনও লোক বেশি থাকে নি। তাই স্পীডটা একটু বেশি করে ফেলেছিলাম। চৌরঙ্গীতে আসতেই পুলিশ ধরল। এই ব্যাপার–"

মনোরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, তবে যে কাগজে লিখেছে, রেণুকা ব্যানার্জী নাম্নী এক পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুকারিণী তরল মস্তিষ্কা রমনী আর একটু হলেই এক নিরীহ পথিকের উপর মোটর চালিয়ে দিত। পুলিশ সময় থাকতেই তাকে পাকড়াও করে–আর একটা কথা তার চেয়েও বিশ্রীভাবে লিখেছে।

রেণুকা হেসে বললে, কাগজওয়ালাদের দস্তুরই ওই। কি ভাগ্যে লেখেনি যে, একজনকে চাপা দিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। কিন্তু এসব খবর দেওয়ার মধ্যে বন্ধুদের কারু হাত আছে। অবশ্য তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ভাবছি, আমার বিরুদ্ধে এই যে সব মিথ্যা প্রচারের শেষ কতদিনে হবে। আমি শুনেছি–আমি এমন কতকগুলো কাজ করে চলেছি যা করা নাকি কোন ভদ্রমহিলারই সাজে না। এই

ভিনসেন্ট যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়ে সাড়ম্বর ও সুদীর্ঘ কান্নায় নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল, সেদিন তাঁর মনে খুশির পারাপার ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সেদিন তাঁর চিত্ততল পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর পুত্রস্নেহের সঙ্গে এই দুঃখটি সর্বদা মিশে থাকত যে, তাঁর প্রথম সন্তান মাটিতে পড়ে দিনের আলো দেখতে পায়নি। তবু ভগবান ভিনসেন্টকে দিয়েছেন, এজন্য তাঁর মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব সবসময়ে জেগে থাকত।

তিনি বললেন, 'তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে। তুই নিজের ভাবে কাজ করে যা। কিসের ভালো হবে তা তুই-ই সবচেয়ে ভালো বুঝিস। আমি তোকে শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

ভিনসেন্ট সেইদিন ময়দানে গেল না। বাগানের মালী পিয়েট কাফ্ম্যানকে ধরে পড়ল 'পোজ' দেবার জন্য। কয়েকবার বলতেই সে 'পোজ' দিতে রাজি হল। বলল, ডিনারের পর বাগানে গিয়ে 'পোজ' দেব।

যথাসময়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে ভিনসেন্ট দেখল, সে হাতে মুখে সাবান ঘসে ধোপদুরস্ত হয়ে এসেছে; রবিবারে গির্জায় যাবার ইস্তিরি করা পোষাক সযত্নে সুমার্জিতভাবে পরে এসেছে। সে উত্তেজিতভাবে বলল, 'এক মিনিট দেরি করুন মশাই, বসবার একটা কিছু নিয়ে আসি।'

একটা টুল এনে তার উপর খুঁটির মতো শক্ত হয়ে বসল। কাঠের মতো অনমনীয় তার হাত পা সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। হাসি তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও দেখে ভিনসেন্টকে হাসতেই হল।

বলল, 'পিয়েট এ পোষাকে তো তোমাকে আমি আঁকতে পারিনে।'

পিয়েট অবাক হয়ে তার পোষাকের দিকে তাকালো, বলল, 'কেন পোষাকের কি হয়েছে! এ তো বেশ নতুন পোষাক। দু'দিন রোববারের বেশি তো পরি নি তাও গীর্জা থেকে ফিরে গিয়েই খুলে রেখেছি। এ তো নতুনই আছে।'

ভিনসেন্ট বলল, 'তা জানি। নতুন বলেই এ পোষাকে চলবে না। যে পুরোনো কাপড় পরে তুমি বাগানে মাটি কোপাও, চারা গাছে জল দাও, সেই কাপড়েই তোমার স্কেচ আঁকব আমি। ওই কাপড় পরে এলেই তোমার হুবহু রূপ রেখায় ফুটে উঠবে ছবিতে। তোমার কনুই, হাঁটু, কাঁধ এসব খোলা থাকা দরকার। আমি তো এখন কেবল পোষাকটা ছাড়া শরীরের আর কিছুই দেখতে পাই নে।'

কাঁধ খোলা রাখার কথায় পিয়েট মনক্ষুন্ন হল। বলল, 'আমার পুরোনো পোষাক বড় ময়লা আর ছেঁড়া। আমার ছবি আঁকতে চান তো এই বেশেই আঁকতে হবে। বেশ আমি বদলাতে পারবো না।'

কাজেই ভিনসেন্ট ময়দানেই গেল, মাটি কোপাচ্ছে যারা সামনে ঝুঁকে পড়ে, তাদেরই ছবি আঁকল। গ্রীষ্ম কেটে গেল। ভিনসেন্টের ধারণা হল, এখন আর নিজের ভাবে ছবি না এঁকে কোনো শিল্পীর সংস্পর্শে যাওয়াই তার দরকার। নিজের সম্বল যেন তার ফুরিয়ে এসেছে। কোনো শিল্পীর স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছা তার একান্ত বলবতী হয়ে উঠল। সেখানে গেলে তার দোষত্রুটিগুলো যেমন তাঁরা দেখিয়ে দেবেন, তেমনি, কাজ ভালো করার কায়দা কানুনও তার শেখা হয়ে যাবে।

থিও তাকে প্যারিসে আসবার জন্য চিঠি লিখেছে। কিন্তু ভিনসেন্ট জানে, সে এখনো কাঁচা, প্যারিসে যাওয়া তার পক্ষে অসম সাহসিক কাজ হবে। হেগ শহর এখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ, সেখানে গেলে যে গুপীল কোম্পানির ম্যনেজার, তার বন্ধু, মিজ্‌নিয়ার টারস্টিগের সাহায্য পেতে পারে। তার আত্মীয় অ্যান্টন মভও তাকে সাহায্য করতে পিছপা হবে না। তার এই ধীর গতি শিক্ষানবিশীর সামনের স্তরে সম্ভবত হেগ শহরে গিয়ে বসলেই সব দিক দিয়ে ভালো হবে। থিওর পরামর্শ চেয়ে সে চিঠি লিখল। থিও ফেরৎ ডাকে তার সম্মতি জানালো রেলভাড়াও সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিল।

স্থায়ীভাবে জায়গা বদলাবার আগে জেনে নেওয়া দরকার তার প্রতি টার্‌স্টিগ আর মভের মনোভাব কেমন, তাঁরা তাকে সাহায্য করতে রাজি হবেন কিনা। তা যদি না হন, তাকে তা হলে অন্য কোথাও যেতে হবে। তার স্কেচগুলোকে এবার কাপড় জড়িয়ে বেশ করে বাঁধল। রওনা হল। তরুণ প্রাদেশিক শিল্পীদের ঐতিহ্য নগরী, তার দেশের গৌরবময় রাজধানীর দিকে।

৪.

মিজনিয়ার হারম্যান গিরবার্ট টারস্টিগ হলেন হেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। হল্যান্ডের ছবির ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাঁর স্থান সকলের উপরে। দেশের নানা জায়গা থেকে ছবির ক্রেতারা আসত তাঁরই কাছে। তাঁরই পরামর্শ নিয়ে তারা ছবি কিনত। যে ছবিকে তিনি ভালো বলতেন সে ছবিকে তারা চোখ বুজে কিনে নিয়ে যেত। মোটকথা ছবির ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাঁরই মতামত তখন সকলে গ্রাহ্য করত।

'আঙ্কল ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের' জায়গাতে মিজনিয়ার টারস্টিগ যখন গুপীল অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজার হন, উদীয়মান উচ শিল্পীরা তখন দেশের নানা জায়গাতে ছড়িয়ে ছিল। অ্যান্টন মভ্ ও যোসেফ ছিলেন আমস্টারডামে, জেকব আর উইলিয়াম মারিস থাকতেন পাড়াগাঁয়ে, যোসেফ ইস্রায়েল, হোহানস্ বস্‌বুন এবং ব্লমারম্ কোথাও স্থায়ী হেড কোয়ার্টার করতে না পেরে এক টাউন থেকে আরেক টাউনে ঘুরে বেড়াতেন। টারস্টিগ পরপর তাঁদের প্রত্যেককেই চিঠি লিখে জানালেন।

'আসুন আমরা এই হেগ শহরে সকলে মিলিত হই, রাজধানীকে আমরা ডাচ্ শিল্পের কেন্দ্রভূমি করে তুলি। সকল শিল্পীর মিলিত শক্তি এখানে ডাচ্ শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুক। সকলে একত্র মিলিত হলে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করতে পারব, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ শিখতে পারব। ফ্রনজ্ হল্‌স্ ও রেমব্রান্টের যুগে ডাচ্ শিল্প যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, আমাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা আমরা আবার তাকে সেই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।'

কিন্তু শিল্পীদের কাছ থেকে তেমন সাড়া এলো না। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, টারস্টিগ যে-সব তরুণ শিল্পীর মধ্যে ক্ষমতা আছে বলে মনে করতেন তারা প্রত্যেকেই হেগ শহরে স্টুডিও খুলেছে। ঐ সময়ে তাদের ছবির কিছুমাত্র চাহিদা ছিল না। তাদের ছবি বিক্রির জন্য টারস্টিগ তাদের হেগ শহরে এনে বসাননি। তাদের ছবিতে ভবিষ্যৎ প্রতিভার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েই তাদের ডেকে এনেছিলেন। তিনি তাদের কাছ থেকে ক্যানভাস্ কিনতে লাগলেন। ইস্‌রায়েলস্-এর কাছ থেকে কিনলেন, আর কিনলেন জেকব মারিসের কাছ থেকে।

বছরের পর বছর তিনি বস্‌বুন, মারিস আর ন্যুহাইস-এর ছবিগুলো ধৈর্যের সঙ্গে কিনে চললেন। তাদের ক্যানভাসগুলোকে দোকানের পেছন দিকের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিলেন। তিনি মনে করতেন এঁরা যখন কাজে সিদ্ধহস্ত হবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছেন, তখন এঁদের অবিশ্যি সাহায্য করা উচিত, তাদের কাজের তারিফ করা উচিত। ডাচ্ জনসাধারণ নিজের দেশের এই প্রতিভাবানদের চিনতে না পারলে, ছবির সমালোচক ও ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁকে অবিশ্যি দেখতে হবে এই যুবকদলটি দারিদ্র্য তাচ্ছিল্য আর অবহেলায় পৃথিবী থেকে যাতে লুপ্ত হয়ে না যেতে পারে। তিনি তাদের ক্যানভাস কিনতেন, তাদের চিত্রকলার সমালোচনা করতেন, তাদেরকে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং সবসময় তাদের উৎসাহ দিতেন। ডাচ্ জনসধারণকে দেশের শিল্পীদের সমাদর করতে শেখাবার জন্য তিনি দিনের পর দিন সংগ্রাম করতেন।

এমনি সময়ে ভিনসেন্ট হেগ শহরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তখন মভ্, ন্যুহাইস, ইসরাইলস জেকব এবং উইলিয়াম মারিস, বসবুন ও ব্লুমারস্ যা-কিছু আঁকতেন গুপীল অ্যান্ড কোম্পানিতে তাই চড়াদামে বিক্রি হয়ে যেতো। শুধু তাই নয়, এই শিল্পী গোষ্ঠী যে-সব ছবি আঁকতেন অগৌণেই তা ক্লাসিকের মর্যাদা পাবে তার সুস্পষ্ট সম্ভাবনাও তখনই দেখা গিয়েছিল।

মিজনিয়ার টারস্টিগ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর সবল সুগঠিত দেহ, উঁচু কপাল, ব্যাক ব্রাশ করা বাদামি চুল, সুগোল মুখমণ্ডলে গালভরা দাড়ি, আর ডাচ আসমানি আভাযুক্ত দুটি চোখ। যুবরাজ আলবার্টের ফ্যাসানে তিনি কালো জ্যাকেট পরতেন, আর পরতেন পায়ের জুতো পর্যন্ত ঝোলানো ঢিলে, স্ট্রাইপ দেওয়া ট্রাউজার। উঁচু কলার তাঁর রেডিমেড কালো বাঁকা টাই প্রতিদিন সকালে বেরোবার সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিয়ে দিতেন।

টারস্টিগ আগে থেকেই ভিনসেন্টকে ভালোবাসতেন। ভিনসেন্ট যখন গুপীল অ্যান্ড কোম্পানির লন্ডন ব্রাঞ্চে কাজ করত তখনই তিনি ঐ ব্রাঞ্চের ইংরেজ ম্যানেজারকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে ভিনসেন্ট সম্বন্ধে তিনি অনেক সুপারিশ করেছিলেন। তারপর ভিনসেন্ট যখন বরিনেজে ছিল, তিনি তাকে ছবির বই পাঠিয়েছিলেন তার সাহায্য হবে বলে। হেগ শহরে গুপীল অ্যান্ড কোম্পানির মালিক হচ্ছেন আঙ্কল ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ। কাজেই টারস্টিগ যে তাঁর নিজের খাতিরেই ভিনসেন্ট স্নেহ করবেন, ভিনসেন্টের এ ধারণা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

গুপীল অ্যান্ড কোম্পানি তখন ২০ নং প্লাৎস-এ অবস্থিত ছিল। সমগ্র হেগ শহরে এই জায়গাতে ছিল সবচেয়ে বেশি অভিজাত লোকের বাস। এখানে বাস করতে খরচও পড়ত খুব। সেখান থেকে অল্প দূরেই এস গ্রাভেল হ্যামি ক্যাস্‌ল্–শহরের গোড়াপত্তনকালে এইটি সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছিল। এর প্রাঙ্গণ মধ্যযুগীয়। এর যে পরিখা ছিল তাকে কেটে সুন্দর হ্রদ করা হয়েছে। তারই দূরবর্তী প্রান্তে 'মেরিটশুইস'–সেখানে রুবেন্‌স, হ্যালস্, রেমব্রান্ট ও অন্যান্য সকল ডাচ্ শিল্পীর ছবি টাঙানো।

ভিনসেন্ট স্টেশন থেকে হেঁটে ওয়াগেন স্ট্রীটের সরু আঁকাবাঁকা গলি পেরিয়ে ক্যাসলের পাশ দিয়ে প্লাৎস-এ উপস্থিত হল। ভিনসেন্ট গুপীলদের দোকন ছেড়ে যখন

বেরিয়ে আসে, সে আজ আট বছর। এরই মধ্যে কত দুঃখ যন্ত্রণা তাকে ভুগতে হয়েছে! তাতে তার দেহে মনে গভীর ছাপ পড়ে গিয়েছে।

আট বছর আগের কথা। তাঁকে তখন সবাই ভালবাসতো, তাকে নিয়ে গর্ব করতো। আঙ্কল ভিনসেন্টের সে ছিল আদরের ভাই-পো। সবাই জানতো, একদিন সে যে কেবল খুড়োর গদীতেই হেসে বসবে তাই নয়, খুড়োর উত্তরাধিকারীও হবে সে-ই। এতদিনে সে কী না হতে পারত। ক্ষমতাবান, ধনবান হয়ে উঠতে পারত; যারই সঙ্গে দেখা হত সেই তাকে সম্মান দেখাত, প্রশংসা করত, তারপর কালক্রমে সে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট গ্যালারির মালিক হয়ে বসতে পারত।

আর এখন সে কি হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বৃথা। সে প্লাৎস স্কোয়ার অতিক্রম করে গুপীল অ্যান্ড কোম্পানিতে গিয়ে ঢুকল। ভিতরটা উত্তম কারুকার্যখচিত; এত যে সুন্দর, তা ভিনসেন্টের মনেই ছিল না। তার পরনে শ্রমিকদের গায়ের কালো ভেলভেটের খসখসে স্যুট। এত সস্তা পোশাকে তাকে এখানে বেমানান দেখাচ্ছে বুঝতে পেরে মনে মনে সে লজ্জিত হয়ে উঠল। প্রথমে ঢুকেই লম্বা ধরনের একটি সুসজ্জিত ঘর; পশম বস্ত্রে সুদৃশ্যভাবে সাজানো। এই ঘর ছাড়িয়ে তিন পা গেলেই আর একখানি ছোট ঘর, এর ছাদ কাঁচের। এ ঘরের পিছনে কয়েক পা উপরে একখানি ছোট, একজিবিশন রুম। এই ঘরেই খরিদ্দারদের ছবি দেখানো হয়। এখান থেকে দোতলায় যাবার প্রশস্ত সিঁড়ি। সেখানে টারস্টিগের অপিস এবং কোয়ার্টার। উপরে যাবার পথের দু'পাশে দেয়াল ঘেঁষে ছবির স্তূপ, পিরামিডের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে।

সমগ্র গ্যালারিটাই সম্পদ ও সংস্কৃতিতে সমুজ্জ্বল। ক্লার্কের সবাই উত্তম পোষাক পরা, তাদের ব্যবহার একান্ত মার্জিত। দেয়ালে ক্যানভাসগুলো মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো।

ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। পায়ের নিচে পুরু কোমল গালিচা। কোণে কোণে চেয়ার পাতা। জাঁকজমকের পরাকাষ্ঠা। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্ট নিজের আঁকা ছবিগুলোর কথা মনে করল।

দারিদ্র্যদীর্ণ খনি মজুর কুটির থেকে কাজে বেরুচ্ছে, তাদের মেয়েরা টিলায় উবু হয়ে কয়লা কুড়োচ্ছে, ব্রাবান্টে চাষীরা মাটি কোপাচ্ছে, জমিতে ফসল বুনছে—এই তো তার ছবির বিষয়। এই গরিব দীনহীন চাষীমজুরের এ সব সাদাসিধা ছবি এখানে—আর্টের এই বিপুল প্রাসাদে কী দামে বিকোবে—আদৌ বিকোবে কি না তাই বা কে জানে।

না, জায়গাটি তার ছবির সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়।

মভ-এর আঁকা একটা ভেড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে রইল সে। এচিং-এর টেবিলের পিছনে বসে ক্লার্করা গল্প করছিল। তারা তার জামাকাপড় ও হাবভাব দেখে সে কিছু কিনতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন বোধ করল না। টারস্টিগ একটা একজিবিশনে সাজানোর তদারক করে বড় ঘরে নেমে আসছিলেন। ভিনসেন্ট তাঁকে দেখতে পায় নি।

সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমেই টারস্টিগ থেমে গেলেন, তাঁর পুরোনো ক্লার্ককে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। ছোটো করে ছাঁটা চুল, মুখের খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি, পায়ে চাষাদের বুট, গায়ে মজুরদের গলা বন্ধ কোট। বগলে একটা বান্ডিল এবড়ো খেবড়ো করে বাঁধা। সব কিছু মিলিয়ে ভিনসেন্টকে একটা মূর্তিমান বিশৃঙ্খলার মত দেখাচ্ছে। এই সুন্দর সুঠাম গ্যালারিতে সে যেন সৌন্দর্যের প্রতি একটা নিষ্ঠুর পরিহাস রূপে এসে দাঁড়িয়েছে।

টারস্টিগ এগিয়ে এলেন। নরম গালিচার উপর তার কোন পদশব্দ হয়নি বলে ভিনসেন্ট তার আগমন টের পায় নি। বললেন, 'এই যে, ভিনসেন্ট। আমাদের ক্যানভাসগুলো দেখছি তোমার খুব ভালো লেগেছে।'

ভিনসেন্ট ঘুরে দাঁড়াল, 'হাঁ, বেশ সুন্দর হয়েছে ছবিগুলো। আপনি কেমন আছেন মিজনিয়ার টারস্টিগ? আমার মা ও বাবা আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

'আপনাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে মিজনিয়ার। শেষ যেদিন আপনাকে দেখি, তার চেয়েও ভালো দেখাচ্ছে।'

'হাঁ স্বাস্থ্য আমার ভালই যাচ্ছে। চল আমার অফিস ঘরে যাই।'

ভিনসেন্ট তাঁর পিছনে চলল, মোটা মোটা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে, কিন্তু দেয়ালের ছবিগুলোর থেকে এক মুহূর্তও চোখ নামাতে পারছে না। তাই বারবার সিঁড়িতে হোঁচট খাচ্ছে সে। থিওর সঙ্গে ব্রাসেলসে সে অল্পক্ষণের জন্য ভালো ভালো ছবি দেখেছিল। তারপর এই প্রথম সে ছবির রাজ্যে এসে পড়েছে। বাহ্যজগৎ ভুলে গিয়ে সে কেবল ছবিই দেখছে–আর কিছু তার উপলব্ধিতে আসছে না।

টারস্টিগ অফিসঘরের দরজা খুলে ভিনসেন্টকে ভিতরে ডেকে নিলেন।

'বোসো ভিনসেন্ট', বললেন টারস্টিগ।

শিল্পী ওয়াইসেনব্রাখের একখানি ক্যানভাসের দিকে সপ্রশংস নিরেট ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল। এই শিল্পীর কোনো ছবি এর আগে সে আর কখনো দেখে নি। সে বসে পড়ল। বগল থেকে বান্ডিলটা নামিয়ে টেবিলে রাখতে গিয়ে আবার তুলে নিলো। টারস্টিগের চকচকে দামী টেবিলে ওটা রাখতে তার সঙ্কোচ বোধ হল।

'মিজনিয়ার টারস্টিগ, আপনি যে বইগুলো আমাকে দিয়েছিলেন, সেগুলো এনেছি।'

সে বান্ডিলটা খুলল। একটা শার্ট ও একজোড়া মোজা এক ধারে সরিয়ে রেখে "Exercise on Fusain" সিরিজের ছবির বইগুলো আলাদা করে টেবিলের উপর রাখল।

'আপ্রাণ খেটে আমি ড্রইংগুলো কপি করেছি। বইগুলো দিয়ে আপনি আমার কত উপকার করেছেন তা আমি বলতে পারি নে।'

শুনে টারস্টিগ বললেন, 'দেখি তো একবার তোমার কপিগুলো।'

ভিনসেন্ট বারিনেজে থাকতে প্রথম সিরিজের যে কপিগুলো করেছিল, কাগজের তাড়া খুলে বের করল সেগুলো। টারস্টিগ দেখলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। ভিনসেন্ট ইটেনে এসে যে কপিগুলো করেছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো বের করে দেখালো। ভিনসেন্ট তৃতীয় কপিগুলো বের করল। এগুলো এখানে আসবার মাত্র দিন কয়েক আগে শেষ করেছে। দেখে টারস্টিগ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

একবার তিনি বললেন, 'এই লাইনটা বেশ হয়েছে।' আরেকবার বললেন, 'এই শেডিং আমার খুব ভালো লাগে, এই ছায়ার বিক্রম তোমার হাতে প্রায় ধরা পড়েছে দেখছি।'

ভিনসেন্ট বলল, 'আঁকতে গিয়ে যখন ও জিনিসটা এলো দেখলাম মন্দ লাগছে না। আমার নিজের কাছে অন্তত ভালই লেগেছে।

ছবি দেখানো শেষ করে সে মতামতের জন্য টারস্টিগের দিকে তাকালো।

টারস্টিগ তার লম্বা পাতলা হাত দুখানা ডেস্কের উপর ছড়িয়ে দিয়ে একটু ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, 'হাঁ ভিনসেন্ট, তুমি কিছুটা উন্নতি করেছো। বেশি নয়, সামান্য। তোমার প্রথম কপিগুলো দেখে আমি নিরাশ হয়েছিলুম। তুমি যে খুব চেষ্টা করছ, তোমার ছবিতে অন্তত সেটুকু প্রকাশ পেয়েছে।'

'শুধু কি চেষ্টাটাই প্রকাশ পেয়েছে, আর কিছু না? কোনো ক্ষমতার পরিচয়?'

এরকম প্রশ্ন করা তার উচিত নয়, তা সে জানে তবু চুপ থাকতে পারল না।

'তোমার কি মনে হয় ভিনসেন্ট, এখনি ও কথা বলার সময় হয়েছে?'

'হয়তো হয় নি, আমার নিজের আঁকা কতকগুলো স্কেচ এনেছি। আপনি দেখবেন?'

'দেখব বই কি?'

ভিনসেন্ট খনি-মজুর আর চাষীদের নিয়ে যেসব স্কেচ করেছিল তার কতকগুলো বের করে দেখাল। টারস্টিগ আবার নীরব হলেন। এই কঠোর নির্মম নীরবতা ইতিপূর্বেও শত শত তরুণ শিল্পীদের জানিয়ে দিয়েছে, তোমাদের ছবি ভালো হয় নি। ভিনসেন্টের কাছেও এই নীরবতার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। টারস্টিগ সবগুলো ছবিই দেখলেন। কিন্তু মুখে 'হুঁ' শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। ভিনসেন্টের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। টারস্টিগ পিছনে সরে গিয়ে তাঁর আসনে বসলেন, জানালা দিয়ে বাইরের তাকালেন, প্লাংস-এর উপর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল তাঁর ক্যাসলের দিকে, সেখানে হ্রদের জলে রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে। আজকের অভিজ্ঞতা থেকে ভিনসেন্ট বুঝতে পেরেছে। সে যদি কথা না বলে তাহলে এই নীরবতা অনাদিকাল চলবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'মিজনিয়ার টারস্টিগ, আমার ছবিগুলোতে আপনি কি আদৌ কোন উন্নতির চিহ্ন দেখতে পেলেন না? ব্রাবান্টে এসে যেসব স্কেচ করেছি, সেগুলো 'বরিনেজের' স্কেচগুলোর চাইতে অনেকটা ভালো হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয়?'

টারস্টিগ জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'হাঁ, ওগুলোর চাইতে এগুলো অনেক ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আসলে কোনটাই ভাল হয় নি। ছবিতে মূলেই ভুল থেকে গিয়েছে। কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে এখুনি আমি দেখিয়ে দিতে পারব না। আমার মনে হয়, আগে কিছুকাল কপি করা তোমার দরকার। মূল ছবি আঁকবার হাত তোমার এখনো হয় নি। জীবনকে চিত্রে রূপ দেবার আগে তার উপাদানগুলো সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান হওয়া দরকার।

'আমি এসব বিষয়ে অনুশীলন করার জন্য হেগ শহরে চলে যেতে চাই, আপনি কি বলেন মিজনিয়ার টারস্টিগ?'

টারস্টিগ তার প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা দেখাতে চান না; সমগ্র পরিস্থিতিটাই তার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকছে।

তিনি বললেন, 'হেগ শহরটা খুবই সুন্দর। এখানে ভালো ভালো গ্যালারি রয়েছে। অনেক তরুণ শিল্পী থাকে এখানে। কিন্তু তবু জায়গাটা এন্টোয়ার্প প্যারিস বা ব্রাসেলসের চাইতে ভালো কিনা, আমার পক্ষে তা বলা মুশকিল।'

যাহোক, এঁর কাছে ভিনসেন্ট একেবারে নিরুৎসাহ হয় নি। সারা হেগ শহরে তিনি সবচেয়ে কড়া সমালোচক। তিনি যখন ছবিগুলোতে কিঞ্চিৎ–তা যতসামান্যই হোক, উন্নতির কিছু দেখেছেন, তখন আশাভঙ্গের কারণ নেই। স্কেচগুলো যেরকম হওয়া উচিত, তা যে হয় নি, সে তো তার নিজেরই জানা। তবু প্রাণপণে খাটলে শেষকালে ছবি ভালো হবেই, এ আত্মবিশ্বাস তার আছে।

সারা ইউরোপে হেগ শহর বোধহয় সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও ভদ্র নগরী। খাঁটি হল্যান্ডীয় ধরনে সাদাসিধে, কৃত্রিমতাহীন অথচ বেশ সুন্দর এই নগরী। পরিষ্কার রাস্তাগুলোর দুপাশে পাতাভরা গাছের সারি। বাড়িগুলো সুঠাম, পরিচ্ছন্ন ইঁটে তৈরি বাড়ির সামনে এক ফালি করে গোলাপ ফুলের বাগান। এ শহরে কোন বস্তি নেই, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা নেই, চক্ষুপীড়া জন্মায় এমন কিছুই নেই। ভাব-সুরুচির আঁট বাঁধুনিতে সবকিছুই এখানে সুসংবাদ।

অনেক বছর আগে হেগ শহরে সারস পাখীর ছবি সরকারী প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শহরের লোকসংখ্যা ধাপে ধাপে বেড়ে আসছিল। এখনো বাড়ছে।

শিল্পী মভের বাড়ির ঠিকানা উইলেবুর্স্ট ১৯৮। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভিনসেন্ট শহরে একটা দিন দেরি করল। মভের শাশুড়ী সম্পর্কে অ্যানা কর্নেলিয়ার বোন হন। এই কুটুম্বিতাসূত্রে ভিনসেন্টকে তিনি খুব খাতির যত্ন করলেন।

মভের সুগঠিত দেহ, চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বুক। চোখদুটি উজ্জ্বল ও ভাবময়। নাক টিকলো। চওড়া কপাল। চুল ডান দিক থেকে বাঁদিকে আঁচড়ানো।

অসামান্য তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা। ছবি আঁকতে আঁকতে যখন শ্রান্ত বোধ হয়, তিনি আরো বেশি করে আঁকেন; একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েন যখন, আরো কিছু আঁকেন। ততক্ষণে তাঁর শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, আবার নতুন উদ্যমে আঁকতে বসেন।

'আমার গিন্নি এখন ঘরে নেই ভিনসেন্ট। চল,. তোমাকে আমার স্টুডিওটা দেখিয়ে আনি। সেখানে সময়টাও ভাল কাটবে।'

'তাই চলুন।' স্টুডিও দেখতে সে একান্ত উদগ্রীব।

বাগানে তার কাঠের তৈরি স্টুডিও ঘর। ঘরটা বেশ বড়। ভিনসেন্টকে নিয়ে তিনি তাঁর স্টুডিও-ঘরে ঢুকলেন। বাগানের চারপাশে কাঁটা গাছের পুরু বেড়া। মভ্ সম্পূর্ণ নিরিবিলিতে বসে ছবি আঁকেন।

ঘরের দোর গোড়ায় পা দিতেই ভার্নিস, রঙ, পুরেনো পাইপ আর তামাকের মিঠে গন্ধ ভিনসেন্টকে উন্মনা করে তুলল। ছবি আঁকার ঘরটি খুবই বড়। অসমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত নানা ছবি লাগানো ইজেলগুলো ঘরের এখানে ওখানে ছড়ানো। দেয়ালগুলো নানারকম স্টাডি-চিত্রে বুঝিবা প্রাণময় হয়ে উঠেছে। একটা সেকেলে চেয়ার, তার সামনে একটা পার্শিয়ান কম্বল। উত্তর দিকের দেয়ালের উপর আধখানা খোলা। ঘরে ইতস্তত বই

ছড়ানো। শিল্পীদের ছবি আঁকার সরঞ্জামে মেঝেটা ভরা; এক তিল খালি জায়গা নেই। স্টুডিওর এরকম পূর্ণতা ও প্রাণময়তার মধ্যেও ভিনসেন্ট দেখতে পেলো, এর সবখানেই মভের স্বভাবসুলভ শৃঙ্খলাবোধ প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর স্টুডিওর সর্বত্র।

পারিবারিক কুশল প্রশ্নাদি কয়েক সেকেন্ডেই করা হয়ে গেল। তারপর, দুজনের পক্ষেই দুনিয়ার একমাত্র যে আলোচ্য বিষয়, তারই আলোচনায় একেবারে তলিয়ে গেল। মভ্ আলোচনা থেকে অন্যান্য শিল্পীদের চেষ্টা করেই দূরে রাখলেন (তাঁর মতে, একজনের পক্ষে হয় ছবি আঁকা সম্ভব, না হয় ছবি আঁকা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াই সম্ভব; দুই কাজ একজনের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়)। তিনি সম্প্রতি একটা নতুন ছবি আঁকছেন; একটা আবছা ল্যান্ডস্কেপ, তাতে প্রদোষের আলোছায়া দেখিয়েছে। ছবিটার আদি অন্ত তিনি ভিনসেন্টকে শোনালেন।

মাদাম মভ বাড়ি এলেন, বললেন, ভিনসেন্ট এখানে না খেয়ে যেতে পারবে না। খেয়ে দেয়ে ভিনসেন্ট আগুনের কাছে বসে ছেলেদের নিয়ে অনেক গল্প করল। মাঝে মাঝে একটা চিন্তা এসে উন্মনা করে দিচ্ছিল, ভাবছিলো সে, তার যদি নিজস্ব একটি ছোট বাড়ি থাকত, এমন একটি স্ত্রী থাকত যে তাকে ভালবাসবে, বিশ্বাস করবে; ছেলেপিলে থাকত, তাকে ঘিরে তারা খেলা করবে, আধো আধো ভাষায় ডাকবে তাকে! এমন সুখের দিন তার কি কখনো আসবে?

দুজনে পাইপ টানতে টানতে আবার স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকলেন। ভিনসেন্ট তার কপিগুলো বের করে দেখাল। মভ সেগুলোর উপর কতকটা নির্লিপ্তভাবে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দিলেন।

বললেন, 'কপি খারাপ হয় নি, কিন্তু এসব কী কাজে আসবে?'

'কাজ আমি ত জানি না........'

'তুমি কেবল ইস্কুলের পড়ুয়াদের মত নকল করে চলেছো; আসল সৃষ্টি কার্য হয়ে আছে অন্য লোকের দ্বারা।'

'আমার ধারণা কপি করতে করতে বস্তুর সম্বন্ধে আমার অনুভব শক্তি জন্মাবে।'

'ভুল ধারণা তোমার। যদি সৃষ্টি করতে চাও তো জীবনের রূপ দিতে চেষ্টা কর। অন্যের অনুকরণ করে করো না। তোমার নিজের আঁকা কোনো স্কেচ আছে? এনেছ সঙ্গে করে?'

তার নিজের আঁকা ছবির সম্বন্ধে, টারস্টিগের মন্তব্য ভিনসেন্টের মনে পড়ল। মভকে ওগুলো দেখাবে কিনা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। সে এখানে এসেছে মভের ছাত্র হয়ে কিছু শিখবে বলে। সে যা কিছু দেখাবে সবই যদি মভ নিতান্ত তুচ্ছ মনে করেন......

সে উত্তর দিল, 'হাঁ আমি কপি করার সঙ্গে সঙ্গে স্টাডিচিত্রও অনেক করে আসছি।'

'উত্তম।'

'বোরেনেজ খনিমজুরের আর ব্রাবান্টের চাষীমজুরদের কতকগুলো স্কেচ আমি এনেছি। তেমন ভালো হয় নি, তবে........'

'কুছ পরোয়া নেই, 'বললেন মভ, 'দেখাও আমাকে ওখানকার জীবনের সত্যিকার ছবি। কিছুটা অন্তত ফোটাতে পেরেছো কিনা আমি সেইটেই দেখতে চাই।'

ভিনসেন্ট স্কেচগুলো খুলে দেখাল, উত্তেজনায় তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে, মভ বসলেন। বাঁ হাত দিয়ে চুলের গোছা একবার ডানদিকে একবার বাঁ দিকে নাড়লেন, দাড়ির আড়ালে কি রকমের একটা হাসি খেলে গেল ভালো বোঝা গেল না। এক সময়ে তিনি চুলগুলোকে মুঠো করে ধরে তালুর মাঝখানে এলোমেলো জঙ্গলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে ভিনসেন্টের দিকে তাকালেন–তার অর্থ 'ও কিছু হয় নি'। এক মুহূর্ত পরে তিনি এক শ্রমিকের স্টাডিচিত্র তুলে নিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নতুন ক্যানভাসে একটা খসড়া করা ছবির পাশাপাশি সেটা সেঁটে দিলেন।

বলে উঠলেন তিনি, 'এখন দেখতে পাচ্ছি কোথায় আমার ভুল হয়েছিল।'

পেন্সিল হাতে নিয়ে তিনি ভিনসেন্টের স্কেচটার উপর চোখ রেখে নিজের ছবিটাতে দ্রুত কয়েকটা আঁচড় বসিয়ে দিলেন। কয়েক পা পিছু গিয়ে বললেন, 'এইবার ছবিটা উৎরেছে। ভিখিরিটাকে এইবার ঠিক মাটির মানুষের মতই দেখাচ্ছে।'

ভিনসেন্টের কাছ পর্যন্ত গিয়ে তিনি তাঁর কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন, 'উত্তম। তুমি অনেকটা এগিয়েছ। তোমার স্কেচগুলো অস্পষ্ট। কিন্তু আসলে খাঁটি। ওতে এমন একটা জীবন–শক্তি ও ছন্দলীলা প্রকাশ পেয়েছে যা আমি খুব বেশি দেখি নি। কপি-বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দাও ভিনসেন্ট। একটা রঙের বাক্স কেনো। যত তাড়াতাড়ি রঙের কাজ শুরু করবে ততই তোমার ভালো হবে। তোমার ড্রইংগুলো খুব বেশি খারাপ নয়, দোষ যা আছে আঁকতে আঁকতে শুধরে যাবে।'

ভিনসেন্ট ভাবল, দেখাটা তাহলে মাহেন্দ্র ক্ষণেই হয়েছে।

ভিনসেন্ট বলল, ''কাজিন' মভ, শিগগিরই আমি এখানে চলে আসছি, শহরকেই কর্মক্ষেত্র করতে চাই। দয়া করে আপনি মাঝে মাঝে আমায় সাহায্য করবেন। আপনার মতো লোকের সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। সামান্য সামান্য বিষয়ে একটু আধটু সাহায্য করলেই চলবে। যেমন আজ দুপুরবেলা আপনার একখানা স্টাডি-চিত্র সম্বন্ধে যা বলছিলেন। এরকম করে মাঝে মাঝে জানার সুযোগ দিলেই আমার ঢের উপকার হবে। 'কাজিন' মভ সব নতুন শিল্পীরই গুরুর দরকার হয়। আপনার অধীনে আমায় কাজ করতে দিন। চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।'

মভ তার স্টুডিওর সবগুলো অসমাপ্ত ক্যানভাসের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকালেন। স্টুডিওতে কাটাবার পর যে অল্প সময়টুকু পান তিনি, সেটুকু স্ত্রীপুত্রাদির সাহচর্যে কাটিয়েই আমোদ পান। তাঁর প্রশংসা পেয়ে ভিনসেন্ট এতখানি উৎসাহিত হয়ে উঠবে ভাবেন নি। এখন তিনি তাকে ক্ষান্ত করতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু ভিনসেন্টের মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, মানুষের ভাবভঙ্গির সূক্ষ্ম পরিবর্তনটুকুও তার চোখ এড়াতে পারে না। মভের মনের ভাব সে তখুনি বুঝে নিলো।

মভ বললেন, 'দেখো ভিনসেন্ট, আমি ব্যস্ত মানুষ, সব সময়ে কাজ নিয়ে পড়ে আছি, অনেক সাহায্য করার সুযোগ আমার এতটুকু নেই। শিল্পীর একটু স্বার্থপর না হলে চলে না। কাজের সময় একটি মুহূর্ত তার নষ্ট করার উপায় নেই।'

ভিনসেন্ট বলল, 'সাহায্য তো খুব বেশি চাই নি। মাঝে মাঝে এখানে এসে আপনার সঙ্গে কাজ করব, আপনার ছবি আঁকা দেখব, আজ দুপুরে যেমন আপনার আঁকার পদ্ধতি সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন, তেমনি করে আমায় বুঝিয়ে দেবেন, তাতেই ছবির শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত যাকিছু জানবার, আমার জানা হয়ে যাবে। আপনার বিশ্রামের সময়ে আমার ছবিগুলো দেখবেন, ভুলত্রুটিগুলো আমায় দেখিয়ে দেবেন। এইটুকুই চাই।'

'তুমি মনে করছ তোমার চাওয়াটা খুবই কম। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, অ্যাপ্রেন্টিস রাখা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ওতে বড় ঝামেলা।'

'আমি আপনার গলগ্রহ হব না তো। সত্যি বলছি, আপনার বোঝা বাড়াব না আমি।'

মভ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। কোনদিনই তিনি অ্যাপ্রেনটিস রাখার পক্ষপতি নন। কাজের সময় কাছে কোনো লোক থাকলে তিনি তাকে মোটেই সইতে পারেন না। তাঁর নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যের কাছে ব্যক্ত করারও তিনি পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, এ পর্যন্ত তিনি নতুন শিক্ষার্থীদের যাকিছু পমার্মর্শ দিয়েছেন তার বিনিময়ে দুর্বাক্য ছাড়া কিছুই পান নি। তবু ভিনসেন্ট তার 'কাজিন', আঙ্কল ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ' আর গুপীলরা তাঁর ছবি কেনেন। এছাড়া, ছেলেটার গাঢ় আবেগপ্রবণতার মধ্যে একটা গভীর ঐকান্তিকতা দেখা যাচ্ছে–তিনি নিজে যখন কোনো ছবি দেখে মুগ্ধ হন, নিজের মধ্যে এমনি একটা গাঢ় আবেগ বোধ করে থাকেন।

তিনি বললেন, 'বেশ, চল একবার পরীক্ষা করা যাক।'

'ওঃ কাজিন মভ্।'

'আমি কিন্তু তোমাকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিনে। কথাটা মনে রেখো। এখানে তোমার কোনো উপকার নাও হতে পারে। কিন্তু তুমি যখন হেগ শহরে এসে স্টুডিও খুলে বসবে, আমার স্টুডিওতে এসো, তখন দেখব আমরা দুজন দুজনকে কতদূর সাহায্য করতে পারি। আমি তুষারপাতের সময়টাতে 'ড্রেনথ'–এ যাচ্ছি। তুমি শীতের শুরুতে আসতে পারো।'

'ঠিক সময়েই আসতে বলেছেন আপনি। আমিও তাই মনে করেছিলাম। ব্রাবান্টে আমার আরো কয়েক মাসের কাজ বাকি।'

'তাহলে এই কথা রইল।'

'ট্রেনে করে বাড়ি আসতে সারা পথে, কেবল এই কথাটা তার মনে তোলপাড় করতে লাগল, 'আমি একজন মাস্টার পেয়েছি। একজন মাস্টার হয়েছে আমার। আর ক'মাস গেলেই আমি একজন বড় শিল্পীর কাছে স্টাডি করব, কত কিছু শিখব। সামনের ক'টা মাস কী করে কাজ করব সেইটেই ভাবনার কথা। এ ক'মাসে কতটা উন্নতি করেছি তাঁকে তো দেখাত হবে।

ইটেনের বাড়িতে পা দিয়েই প্রথমেই দেখতে পেল সে কে ভোস'কে। কে এখানে বেড়াতে এসেছে।

৫.

কে ভোস যে শোক পেয়েছিল তাতে তাকে কতকটা আধ্যাত্মিক করে তুলেছে। স্বামীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। স্বামীর মৃত্যু তার নিজের মধ্যে থেকেও কিছু একটা যেন হত্যা করে গিয়েছে। তার প্রবল জীবনীশক্তি, তেজ বল ও উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মাথার চিকচিকে চুলগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। মুখখানা তপঃক্লিষ্টা সন্ন্যাসিনীর মতো মলিন? উজ্জ্বল নীল চোখে কালি পড়েছে। গায়ের রঙ ছিল দুধে-আলতায় মেশানো, চামড়া এখন অনুজ্জ্বল।

ভিনসেন্ট তাকে আমস্টারডামে দেখেছিল। তখনকার চেয়ে এখন সে অনেক মলিন, অনেক কৃশ হয়েছে। তাতে তার মধ্যে একটা মৃদু চিক্কন রূপ দেখা দিয়েছে। অনেক দিনের বিষণ্ণতায় সে আজ সবরকম লঘুতার উপরে উঠে গিয়েছে।

ভিনসেন্ট বলল, 'কে, তুমি এখানে এসেছ, বেশ হয়েছে।'

এই প্রথম তারা মামুলি 'কাজিন' বাদ দিয়ে নাম ধরে ডাকলো, কী করে দেখামাত্রই এত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল দুজনার কেউই বুঝতে পারল না। আগে থেকে কেউ কাউকে ভাবেও নি।

'জেনকে সঙ্গে এনেছে। নিশ্চয়।'

'তুমি ব্রাবান্ট এই প্রথম দেখলে, তাই না? তোমাকে এখানকার অনেক কিছু দেখাবার আছে। আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি বলে যা আনন্দ হচ্ছে। ঢালা ময়দান পড়ে আছে, বেড়াতে গিয়ে আমাদের কত দূর দূরান্তে চলে যেতে হবে।'

'আমি রাজি, হাঁটতে আমার ভালো লাগে ভিনসেন্ট।'

কে যখন কথা বলছিল, সুরে একটা মমতার আবেগ ছিল, কিন্তু কণ্ঠ নিস্তেজ। ভিনসেন্ট লক্ষ্য করেছে, তার সুর গভীর হয়েছে, আরো বেশি কম্পন জেগেছে। কাইজার গ্রাখের বাড়িতে ভিনসেন্টকে কত সহানুভূতি, কত দরদ দেখিয়েছে, ভিনসেন্ট ভাবল, তার স্বামীর মৃত্যুর কথা তোলা কি ঠিক হবে? শোকে তার সহানুভূতি জানাবে? কিছু বলা তার কর্তব্য, কিন্তু আবার ভাবল তার মুখে বিষাদের মলিন ছায়াটুকু টেনে না আনাই কি ভালো নয়।

ভিনসেন্ট তার স্বামীর কথা না তোলায় কে মনে মনে তাকে তারিফ করলো। স্বামীর স্মৃতি তার কাছে অতি পবিত্র। কেউ তার কথা তুলুক সে তা চায় না।

কাইজার গ্রাখের বাড়ির কথা কে'রও মনে পড়ল। স্বামীকে নিয়ে সে মা বাবার সঙ্গে তাস খেলতে বসতো, আগুনের পাশে। ভিনসেন্ট কোণে প্রদীপের ধারে বসতো বই নিয়ে। তার নিঃসঙ্গতায় কের মনে অব্যক্ত বেদনা জাগত। তার এখনকার এই কালো চোখ দুটিতেও সকরুণ মমতা জেগে উঠল সেদিনের কথা মনে করে। ভিনসেন্ট তার হাতের উপর আস্তে একখানা হাত রাখল। কে' মুখ তুলে তাকালো তার দিকে; দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল সুগভীর মমতা। দুঃখ সইতে সইতে আজ সে কত নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখন সে এমন একটি নারী, বুক দিয়ে আবেগ দিয়ে দুঃখ সয়ে বেদনায় মহান হয়ে উঠেছে, বেদনা মানুষকে যত ঐশ্বর্যবান করতে পারে তাকে তাই করেছে। ভিনসেন্টের মনে আগের কোনো একদিনের মতো পুরোনো ঋষিবাক্যটি জেগে উঠল :

'বেদনা ছানিয়া যেন ও-রূপ গড়িল গো।' দুঃখের মধ্য থেকে সুন্দরের প্রকাশ।

ধীরে ধীরে বলল সে, 'আমি সারাদিন মাঠে গিয়ে বসে থাকি আর ছবি আঁকি। ওখানে বসে থাকতে তোমারও খুব ভালো লাগবে কে। তুমি অবিশ্যি যাবে, জেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

'আমি গিয়ে তোমার কাজে বিঘ্ন ঘটাবো না তো?'

'না না। কী যে বল, আমি সঙ্গী ভালোবাসি। বেড়াতে বেড়াতে দেখবে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখাব তোমায়।'

'তা হলে আমি খুশী হয়েই যাবো।'

'জেনেরও যাওয়া ভালো। খোলা হাওয়া তাকে শক্ত করে তুলবে।

'কে তার হাতে অতি মৃদু চাপ দিল।

'আমরা বন্ধু, তাই না ভিনসেন্ট?'

'হাঁ কে।'

কে তার হাতখানা ছেড়ে দিল। বাইরে প্রটেস্টান্ট গির্জা। তার দিকে না চেয়ে সে সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভিনসেন্ট বেরিয়ে বাগানে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে কে'র জন্য একখানা বেঞ্চি পেতে দিল। আর জেনকে বালি দিয়ে একখানা ঘর তৈরি করে দিল। হেগ থেকে সে যে বড় খবর নিয়ে এসেছে তা সে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল।

সেই রাতেই ভিনসেন্ট পরিবারের লোকজনকে জানাল, মভ তাঁকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। মভ বা টারস্টিগ তাকে যেসব কথা বলে প্রশংসা করেছে, অন্য সময় হলে বাড়িতে সে-সব কথা বলার তার মোটেই গরজ হতো না। কিন্তু আজ কে এখানে এসেছে। খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে কে বসেছে। এই জন্য সব কথা সে প্রাণ খুলে বলল। শুনে তার মা খুব খুশি হলেন।

তিনি বললেন, 'মভ তোমাকে যা কিছু করতে বলবে, তুমি সব করো কিন্তু। মভ বড়ো করিৎকর্মা লোক।'

পরদিন খুব ভোরে কে, জেন আর ভিনসেন্ট রওনা হল লাইবশ-এর দিকে। ছবি আঁকার পক্ষে জায়গাটা ভিনসেন্টের খুব পছন্দসই। সে কোথাও গেলে সঙ্গে খাবার নেয় না। আজ কিন্তু মা ছাড়লেন না। তিনজনের মতো এক পুঁটুলি খাবার দিলেন দুপরে খাওয়ার জন্য। দিব্যি বনভোজন করতে পারবে ওরা, মা ভাবলেন, যেতে যেতে গির্জার উঠোনে একটা এ্যাকেশিয়া গাছে ম্যাগেপাই পাখির বাসা দেখা গেল। জেন আনন্দে নেচে উঠল। ভিনসেন্ট তাকে কথা দিল একটা ডিম সে যে-করেই হোক জোগাড় করে দেবে। তারা দেবদারু বন পার হয়ে প্রান্তরের হলদে মাটি, শাদা মাটি, গেরুয়া মাটির পথও ছাড়িয়ে গেল। ভিনসেন্ট এক জায়গায় একটা লাঙল আর একটা ঠেলাগাড়ি পড়ে আছে দেখতে পেল! সে তার ছোট্ট ইজেল খানা ঠিক করে বসালো, জেনকে বসাল গাড়িটার ভিতরে। তারপর তাড়াতাড়ি একটা স্কেচ করে ফেলল। কে' একটু দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, আর জেনকে দেখছিল। জেন ভারি মজা পেয়েছে, আহ্লাদে আটখানা। কে দাঁড়িয়েছিল নীরবে। তার মৌন শান্তি ভাঙার ইচ্ছা হল না ভিনসেন্টের। তার সঙ্গ পেয়েছে এইটেই তার বড় আনন্দ। কাজ করার সময়ে একজন স্ত্রীলোকের পাশে থাকার যে কী সুখ, কী আনন্দ, এর আগে তা সে কোনদিন জানতে পারে নি।

কতকগুলো খড়ের ঘর ছাড়িয়ে তারা রুজেলডালে'র পথে পা দিল। এই সময়ে কে মুখ খুলল।

বলল, 'জানো ভিনসেন্ট আমস্টারডামে আমি তোমার সম্বন্ধে যা ভাবতুম, আজ তোমাকে ইজেলের সামনে দেখে সেই কথাই মনে পড়ল।'

'কি ভাবতে তুমি।'

'বললে তুমি মনে আঘাত পাবে না তো?'

'না, একটুও না।'

'তবে বলি, আমি তখন ভাবতুম, ধর্মযাজক হওয়ার জন্য তোমার জন্ম হয় নি, অথচ তারই জন্য তুমি পণ্ডশ্রম করছ, অযথা সময় নষ্ট করছ।'

'আমাকে ওকথা তখন বল নি কেন?'

'ভিনসেন্ট তখন তো আমার ওকথা বলার অধিকার ছিল না।' সোনালী চুলের কয়েকটি গুচ্ছ বেরিয়ে পড়েছিল, কালো বনাতের নিচে সেগুলো সে ঠেলে দিল। এমন সময় পথের একটা গর্তে পা ঠেকে সে এলিয়ে পড়ল, পড়ল ভিনসেন্টের কাঁধের উপর! ভিনসেন্ট তাকে জড়িয়ে ধরে পতন রোধ করল; কিন্তু হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গেল।

বলল কে, 'আমি জানতাম, যে কাজের জন্য তুমি সংসারে এসেছ, সে কাজ তুমি নিজেই একদিন বেছে নেবে। অন্যের মতামতের দরকার কিছু হবে না।'

ভিনসেন্ট বলল, 'এখন আমার মনে পড়ছে তুমি আমাকে সতর্ক করেছিলে, সঙ্কীর্ণমনা পাদরী যেন না হই। ধর্মগুরুর কন্যার মুখে একথা তখন আমার কেমন অদ্ভুত লেগেছিল।'

সে কে'র দিকে চেয়ে অমায়িক ভাবে হাসল। কিন্তু কে'র চোখ দুটি তখন বিষাদে ভারী হয়ে উঠেছে।

'অদ্ভুত লাগবে তা জানি। কিন্তু দেখো, ভোস আমাকে অনেক বিষয় শিখিয়েছিল যা আর কোনোভাবে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হতো না।'

ভিনসেন্ট কে'র কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। ভোসের নাম ওঠাতে দুজনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হল।

একঘন্টা পরে তারা 'লিয়েসবশ'এ পৌছালো। ভিনসেন্ট আবার তার ইজেল ঠিক করে বসাল। সামনে একখণ্ড নিচু জলাভূমি। তারই স্কেচ করত বসল সে। জেন বালির উপর খেলা করছে, কে তার পিছনে ছোট একখানি টুলে বসেছে। এই হাল্কা টুলখানা সারা পথ জেন হাতে করে এনেছে। কে হাতে একখানা বই নিয়ে পাতা খুলল, কিন্তু পড়তে পারল না একবর্ণও। ভিনসেন্ট দ্রুত হাত চালাচ্ছে, মনে তার অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। ছবিটা তার হাতে এত সজীব হয়ে উঠল যে, এর আগে আর কোনো ছবি এমন হয় নি। মভের প্রশংসা, না কে'র সান্নিধ্য, কিসের জন্য ছবিটা এত উৎরে গেল তা সে ভেবেই পেলো না। পর পর সে আরো কখানা স্কেচ করল। সারাক্ষণ সে কে'র দিকে ফিরে তাকায় নি, কে'ও কথা বলে তাকে বাধা দেয় নি। তবে তার সান্নিধ্য ভিনসেন্টকে সারাক্ষণ একটা ঝলকানি দিয়ে রেখেছে, আজকের ছবি বিশেষভাবে যাতে ভালো হয়, দেখে কে' যাতে প্রশংসা করে সেইদিকেই ছিল তার চেষ্টা।

খাওয়ার সময় তারা খানিক দূর হেঁটে একটা ওক গাছের নিচে গিয়ে বসল। গাছের শীতল ছায়াতলে কে' বাস্কেট খুলে খাবার সাজালো। কোনোদিক এতটুকু হাওয়া নেই। কাছের জলা থেকে জলপথের গন্ধ আর উপর থেকে ওকের মৃদু গন্ধ মিশে এসে নাকে লাগছে। কে' আর জেন বাস্কেটের একপাশে ভিনসেন্ট আর এক পাশে বসল। কে' তাকে খাবার পরিবেশন করল। ভিনসেন্টের মনে চকিতে জেগে উঠল মভ ও তাঁর পরিবারের ছবি।

কে'র দিকে সে চাখে তুলে তাকালো। তার মনে হল এর মত সুন্দর আর কাউকে সে দেখে নি। পুরু, হলদে পনিরটা খেতে বেশ লাগছে। যার হাতের রুটিগুলোতে আলাদা এক রকমের স্বাদ পাওয়া যায়, যা অন্য রুটিতে নেই। কিন্তু সে খেতে পারল না। একটা নতুন রকমের বিরাট ক্ষুধা তার মধ্যে জেগে উঠছে। কে'র সুমসৃণ কোমল দেহ; সেদিক থেকে একবারও চোখ নামাতে পারছে না ভিনসেন্ট। তার হরিণীর মতো চোখে, মাধুরী মাখা মুখে ভিনসেন্টের আঁখিতারা ডুবে গেলো।

খাওয়ার পর জেন মা'র কোলে মাথা রেখে শুতে গেলো। ভিনসেন্ট চেয়ে দেখল, মা ছেলের হাল্কা চুলগুলোতে হাত বুলাচ্ছে। তার নিষ্পাপ মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে কী যেন খুঁজছে। ভিনসেন্ট বুঝল, ছেলের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তার স্বামীর মুখখানারই প্রতিফলন দেখছে। আর সে এখন কাইজার গ্রাখের বাড়িতে, যে পুরুষকে সে ভালোবাসে তাকে নিয়েই সময় কাটাচ্ছে। এই ব্রাবান্টের প্রান্তরে তার 'কাজিন' ভিনসেন্টের সঙ্গে সে এখন নেই।

ভিনসেন্ট বিকেল নাগাদ বসে বসে ছবি আঁকল। জেনতিকে কোলে নিয়েও কয়েকটা ছবি আঁকল। ছেলেটি এরই মধ্যে তার অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। ভিনসেন্টের কাছ থেকে কাগজ আর রঙ চেয়ে নিয়ে সেও নিজের খেয়ালে অনেক কিছু আঁকল। তারপর হেসে, হাততালি দিয়ে, চীৎকার করে জায়গাটাকে মাতিয়ে রাখল। কাছেই হলদে বালির স্তূপ, তার উপর দিয়ে দাপাদাপি শুরু করল। মাঝে মাঝে কোন একটা প্রশ্ন মনে জাগলে দৌড়ে এসে ভিনসেন্টকে তা জিজ্ঞেস করে, ভিনসেন্টও অক্লান্তভাবে সেসব ছেলেমানুষী প্রশ্নের জবাব দিয়ে চলে। এমন একটি প্রাণচঞ্চল ছোটোপ্রাণী তার কোলে পিঠে কাঁধে চড়ে, তার নরম তুলতুলে দেহের স্পর্শ সারা দেহে ভিনসেন্টের বাৎসল্যরসে অনুভূতি এনে দিল, তাই তার উপদ্রবগুলো ভিনসেন্টের ভালো লাগতে থাকে।

শরৎকালের সূর্য, খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যেতে লাগল। তারা বাড়ি ফিরে চলল। পথে এক একটা ডোবা দেখলেই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নানারকম বর্ণালী নিয়ে অস্তমান সূর্য তার ছায়া ফেলেছে ডোবার জলে। ঝুঁকে পড়ে তারা দেখে, প্রজাপতির পাখার মতো সে বর্ণালী ধীরে ধীরে কালো হয়ে ডোবার কালো জলে কেমন তলিয়ে যায়। ভিনসেন্ট কে'কে তার ড্রইংগুলো দেখাল। কে' কেবল চোখ বুলিয়ে যায়। কে'র চোখে ওগুলো অস্পষ্ট ও অর্থহীন। তবু, ভিনসেন্ট জেনকে আদর দেখিয়েছে, কে'র মাতৃহৃদয়ে তার মূল্য যথেষ্ট। সে বলল,

'তোমার ড্রইংগুলো আমার ভালো লেগেছে ভিনসেন্ট।'

'সত্যি বলছো কে, তোমার ভালো লেগেছে?'

কে'র প্রশংসায় তার মনে বন্যার বাঁধের মতো একটা বাঁধ যেন ভেঙে গেল। আমস্টারডামে যখন পড়াশোনা করত, কে তখনো তাকে নানাভাবে দরদ জানিয়েছে। তার চেষ্টা, তার কাজ, তার সাফল্য সব কিছু একমাত্র কে'ই বুঝতে পারবে, আর কেউ পারবে না। তার পরিকল্পনা পরিবারের কাউকে জানতে দেয় নি। তারা ওসব বুঝবেন না কিছুই। এক একটা কথার মানে পর্যন্ত অনেক বকে তাদের বোঝাতে হয়েছে। মভ আর টারস্টিগের সঙ্গে তার গুরু আর ছাত্র সম্পর্ক। কিন্তু এ সম্পর্ক দূরের, মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দেয়। মাঝে মাঝে দেয় না।

মনের আগল একবার খুলে দিয়ে তার আনাচে-কানাচে যা কিছু লুকিয়েছিল সব কিছুই সে কে'র কাছে ঢেলে দিল, বাঁধভাঙা কথার স্রোতে। উদ্দীপনা যত বেড়ে যাচ্ছে পা দুটিও তত দ্রুত চলছে তার। কে'তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, পিছনে পড়ছিল বার বার। কোনো কিছু যখন গভীরভাবে তার মনকে নাড়া দেয় ভিনসেন্ট তখন পরিমাণ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সুষ্ঠু শালীনতার জায়গাতে বেরিয়ে পড়ে অসুরের মতো চলার ও বলার তার সেই পুরোনো ধরন। বিকেল নাগাদ তার মধ্যে সে মার্জিত ভদ্রলোকী ভাব ছিল, এখন উবে গিয়ে গেঁয়ো অভব্যতা আর জান্তব উত্তেজনার ভাবে রীতিমত সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। কে'ভয় পেয়ে গেল। তার এই জান্তব প্রকাশটা কে'র কাছে বড় অসাময়িক বড় ইতরজনোচিত। কিন্তু একজন পুরুষ যেমন একজন স্ত্রীলোককে পৃথিবীর দুর্লভতম সম্পদ দিতে উদ্যত হয়, ভিনসেন্ট যে তাকে তাই দিতে উদ্যত হয়েছে, কে'তা জানতে পারল না।

থিও প্যারিস চলে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যত কথা সে মনের মধ্যে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছিল তাও সে প্রাণ খুলে জানাল তাকে। তার উদ্দেশ্য, তার আকাঙ্ক্ষা, তার কাজের ভাবী ছক খুলে বসল। সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠছে কেন কে' বুঝল না কিছুই। বিস্মিত হল কে, তাকে বাধাও দিল না, মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনলোও না। সব সময় অতীতের রাজ্যে বাস করে সে, অতীতকে নিয়ে চিন্তায় ডুবে যাওয়াতেই তার আনন্দ। ভিনসেন্টকে সহ্য করা ক্রমেই তার অসম্ভব হয়ে উঠল। এত উচ্ছ্বাস আর উদ্দীপনার এমন নগ্ন প্রকাশ যার মধ্যে, এমন লোককে কে' আজ কেন ভবিষ্যতেও সইতে পারবে না। ভিনসেন্ট নিজের উত্তেজনায় মশগুল থাকায় কে'র বিরক্তিভাব কিছু বুঝল না। অঙ্গভঙ্গি করে সে নিজের কথাই বলে চলল।

এক সময়ে কে'র কানে একটা পরিচিত শব্দ পৌঁছুতেই সে সচকিত হয়ে উঠল—

বলল সে, 'নিউহাইসের কথা বলছো? কোন নিউহাইস? যে-শিল্পী আমস্টারডামে বাস করতেন তিনিই কি? তাঁর কথা বলছো না?

'হাঁ। তিনি আমস্টারডামেই বাস করতেন। এখন হেগ শহরে আছেন।'

'ঠিক বলেছ। ভোসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। ভোস তাঁকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত।'

ভিনসেন্ট তাকে থামিয়ে দিল।

কেবল ভোস আর ভোস। কানে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। কেন, তার নাম ওঠে কেন? সে তো আর নেই। এক বছরের উপর হল সে মরে গেছে। কতো আগেই তাকে ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। সবাই ভোলে। কিন্তু কে'র দেখছি অতীতকে আঁকড়ে নিয়ে

বিলাস করাই পছন্দ। ঠিক উরসুলার মতো। সে সব কথায়ই জের টেনে নেয় ঐ ভোসের কথায়। কেন? আমস্টারডামে যতদিন ছিল ভিনসেন্টের মোটেই কে'র স্বামীকে ভালো লাগে নি।

বরফ পড়তে শুরু করেছে। বনে দেবদারু গাছের সুঁচোলো পাতাগুলো জং-ধরা ছুঁচের মতো বাদামি হয়ে গিয়েছে। কে'ও জেন রোজই ভিনসেন্টের সঙ্গে ময়দানে যায়। মাঠে ঘাটে বেড়াতে বেড়াতে কে'র বিবর্ণ গালদুটোতে রক্তিম আভা এসেছে। পা দুটোতে সে বল পেয়েছে, তার হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। এখন সে সেলাইয়ের বাক্স নিয়ে যায়, ভিনসেন্ট যেমন ছবি আঁকতে ব্যস্ত থাকে, সেও তেমনি সেলাই নিয়ে মগ্ন থাকে। এখন সে তার শৈশবকাল সম্বন্ধে, ছেলেবেলায় যেসব বই পড়েছে তার সম্বন্ধে এবং আমস্টারডামে যত সব মজার লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো তাদের সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে বেশ সপ্রতিভভাবে আলাপ করতে লাগলো।

তাদের এই বেড়ানোতে পরিবারের লোকেদের সম্মতি ছিল। ভিনসেন্টের সঙ্গ কে'র মনে জীবনের উপর মায়া জাগিয়ে তুলল। আর কে, এই বাড়িতে থাকার ফলে ভিনসেন্টের বিমর্ষভাব কেটে গিয়েছে। দুজনার এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ দেখে অ্যানা কর্নেলিয়া ও থিওডোরাস দুজনেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই দুটি তরুণ তরুণীর মধ্যে যাতে মনের ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য তাদের চেষ্টার কার্পণ্য ছিল না।

কে'র সবকিছুই ভিনসেন্টের ভাল লাগত। তার পাতলা কমনীয় দেহ লম্বা কালো পোষাকে আঁট করে জড়ানো। সে দেহের সর্ব অবয়ব তার কাছে অপূর্ব। সে যখন কালো বনাত পরে তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে যায়, সেও অপূর্ব। যখন কোন কারণে তার উপর ঝুঁকে পড়ে, তার দেহ সুরভি নাসারন্ধ্রে ঢোকে, সেও মধুর। তার বলার ভঙ্গি, গভীর নীল চোখের মায়াময় দৃষ্টি, হাতের কোমল কম্পিত স্পর্শ, তার মনোমুগ্ধকর কণ্ঠ, শোবার সময়ে শোনা তার মুখের ঘুমপাড়ানি গান–সবই মধুর। তার প্রাণময় দেহ বর্ণালীতে উপবাসী ঠোঁট দুটোকে ডুবিয়ে দেবার বুভুক্ষায় সে পলে পলে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।

কত বছর ধরে সে জীবনের কেবল এতটুকু অংশ ভোগ করে আসছে। পুরো জীবনের স্বাদ কোনদিন পায় নি। তার মধ্যে সরলতা কোমলতা দরদ মমতার যে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল, শুকিয়ে গিয়েছে। তার দগ্ধ জীবনপাত্রে একবিন্দু স্বচ্ছ শীতল জল কেউ দেয় নি। আজ কে তার কাছে এসেছে। আজ সে সুখী। কে'র সঙ্গ প্রতিদিন তাকে আবেশে আলিঙ্গন জানায়। ময়দানে কে'যতক্ষণ কাছে থাকে, তার তুলি তীরের গতিতে এগিয়ে চলে। কোনদিন সে সঙ্গে না থাকলে একটি রেখাও মনের মতো করে আঁকতে পারে না। সন্ধ্যা হলে বসবার ঘরের বড় টেবিলের পাশে যখন সবাই বসে, সে বসে কে'র ঠিক সামনে। বসে বসে সে তার স্কেচগুলোর কপি করতো বটে, কিন্তু কাগজের উপর আর কিছু সে দেখতে পেত না কে'র নমনীয় মুখখান ছাড়া। উপরে একান্ত ল্যাম্প। তার মৃদু আলোয় চোখ তুলে যদি সে কখনো কে'র মুখের দিকে তাকাতো, কে একটুখানি হাসত, সে হাসি বেদনায় মধুর। কখনো তার মনে হতো কে'র সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে গিয়ে সে এক মুহূর্তও থাকতে পারবে না। কখনো এমনি জান্ত

ব হয়ে উঠতো সে, তার ইচ্ছা করতো সকলের সামনে তাকে সবলে আকর্ষণ করে তার ঠাণ্ডা বিষণ্ণ মুখখানার স্থানে স্থানে তার উষ্ণ শুষ্ক ঠোঁট দুটো ডুবিয়ে দেয়।

সে কেবল তার সৌন্দর্যটাই ভালবাসে তা নয়, তার সর্ব অবয়ব, সমগ্র সত্তা, সকল গতিভঙ্গি–সবকিছুকেই সে ভালোবেসে ফেলেছে। তার শান্ত চলন, অমায়িক ব্যবহার, মার্জিত রুচি, প্রতি অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ পায় যে সূক্ষ্ম শালীনতা, ভিনসেন্টের কাছে সবকিছুই স্বর্গীয়।

উরসুলাকে হারিয়ে আজ সাত বছর ধরে কতবড় দুঃসহ সঙ্গীহীন জীবন সে কাটিয়ে এসেছে ভাবতেই পারে নি। সারা জীবন তার এমনি শুকনো কেটেছে যে, কোন নারী তাকে দুটো মধুর কথা শোনায় নি, সপ্রেম চোখে কোন রমণী তার দিকে কখনো তাকায়ও নি। নরম আঙুলে তার মুখখানাতে কেউ হাত বুলোয় নি, কেউ তাকে একটাও চুম্বন করে নি।

কোন নারী তাকে কখনো ভালবাসেনি। এমন নীরস জীবনকে কি জীবন বলা যায়? সে তো মৃত্যু? উরসুলাকে যখন ভালবাসতো, জীবনটা তখন এত ব্যর্থ বোধ হয় নি। কেননা, সে ছিল তার প্রথম প্রেম; সে তখন ভালবাসা কেবল দিতেই চেয়েছিল। কেউ তা গ্রহণ করলো না। আজ তার প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে। এখন সে যেমন ভালবাসতে চায় তেমনি ভালবাসা পেতেও চায়। এখন অনুকূল সাড়া দিয়ে কে যদি তার এই নতুন বুভুক্ষার তৃপ্তি না করে, তাহলে জীবনধারণ অসম্ভব, ভিনসেন্টের তা নিশ্চিত বিশ্বাস।

একদিন রাতে সে 'মাইকেল' পড়ছিল। তাতে একটা উক্তি ছিল 'যদি একক থাকো তবে তুমি পুরোপুরি মানুষ নও, যখন তুমি সস্ত্রীক, তখনি তুমি পুরোপুরি মানুষ।' মাইকেল সবখানেই এমনি ধরনের কথা বলেছেন। সে এখনো মানুষ হয় নি, যদিও তার আটাশ বছর বয়স, তবু মানুষ হিসেবে তার জন্মই হয় নি। কে'র রূপ ও প্রেমের সুষমা ফুলের মতো তার চোখে মুখে শ্বাস বুলিয়েছে, তবেই না সে শেষকালে মানুষ হয়ে উঠেছে।

মানুষ হিসেবে কে'কে তার চাই। আজ সে বেপরোয়া ভাবে, উদ্দাম ভাবে তাকে চাইছে। জেনকেও সে ভালবাসে। কেননা ছেলেটি এই নারীরই তো একটি অংশ, যে নারী তার সবকিছু। কিন্তু ভোসকে সে ঘৃণা করে, সর্বশক্তি দিয়ে ঘৃণা করে। তার কারণ, এই মৃতের স্মৃতি কিছুতেই কে'র মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। এখনো কে'র মনের মাঝখানটিতে তারই আসন। উরসুলার প্রত্যাখ্যান অনেক বছর তাকে কষ্ট দিয়েছে। সেইজন্য কে'র প্রথম ভালবাসা ও বিয়ে তার মনে এখনো কোনো দুঃখ জাগায় না। দুজনেই তারা দুঃখের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে, এজন্য তাদের প্রেম অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।

সে জানে যে-লোকটা এখন অতীতের বশ হয়ে আছে, কে'র মন থেকে তাকে সে নিশ্চয় সরাতে পারবে। সে তাকে এতো বেশি ভালবাসে যে, অতীত তার চোখের সামনে থেকে মুছে যাবে। শীগ্‌গীরই সে হেগ শহরে যাচ্ছে, মভের কছে শিখতে। কে'ও তার সঙ্গে যাবে, দুজনে সেখানে সংসার পাতবে। কে তার স্ত্রী হবে, ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, এইতো সে চেয়ে এসেছে। সে একটি গৃহ চায়, সেখানে ছেলেমেয়েরা মুখে অবিকল তারই ছাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এখন সে একজন মানুষ।

যাযাবর বৃত্তি ছাড়বার এখনি তার সময়। জীবনে তার প্রেম চাই। প্রেম তাকে সে প্রাণ দেবে। তাতে তার ছবি আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে উঠবে। তাতে বাস্তবতা দেবে ধরা। প্রেমের অভাবে তার দেহমনের কতখানি যে অর্ধমৃত হয়ে আছে, এর আগে তা কখনো জানতে পারে নি। যদি জানতে পারতো, প্রথম যে স্ত্রীলোক চোখে পড়তো, অধীর আবেগে তাকেই ভালোবাসতো। প্রেমই জীবনের সার, পৃথিবীকে মধুর করে তুলতে হলে এই প্রেমেরই দরকার সবার আগে।

উরসুলা তাকে ভালবাসে নি, এতে সে এখন খুশি। তখন তার প্রেমে কত চাপল্য ছিল! আর এখন কতো গভীর, কত সমৃদ্ধ হয়েছে। উরসুলার সঙ্গে বিয়ে হলে সে কখনো খাঁটি প্রেম কাকে বলে জানতেই পারতো না। কে'র প্রতি তার আজকের ভালবাসাও সম্ভব হতো না। উরসুলা ছিল একটি শিশুবিশেষ, তার মধ্যে কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি যেমন ছিল না, তেমনি সর্বগুণ থেকে সে ছিল বঞ্চিত–ভিনসেন্টের এখন তা স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছে। একটি শয্যাসঙ্গিনীকে নিয়ে বছরের পর বছর কী নির্যাতনই না ভোগ করতে হতো। উরসুলার সঙ্গে পুরো জীবন কাটানোর চেয়ে কে'র সঙ্গে এক ঘণ্টা সময় কাটানো বেশি কাম্য। পথ ছিল বন্ধুর, কিন্তু সে পথই তাকে কে'র কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জীবন এখন থেকে ভালো ভাবে চলবে। সে ছবি আঁকবে, সে ভালোবাসবে, সে তার ড্রইংগুলো বিক্রি করে সংসারের অভাব মেটাবে। দুজনে মিলে তারা সুখে দিন কাটাবে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের নিজস্ব ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচে চলতে চলতে ধীরে ধীরে সে তার চূড়ান্ত রূপ পায়।

তার অত্যধিক ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ও মনের উদ্দামতা সত্ত্বেও সে বেশ আত্মসংবরণ করে থাকল। ময়দানে এটা সেটা কথা বলার সময় হাজারবার তার ইচ্ছে হয়েছে সে বলে, 'শোনো মনের সব ছদ্মভাব ঝেড়ে ফেলে দাও। আমি তোমাকে বাহুপাশে বাঁধতে চাই, বার বার তোমাকে চুমো খেতে চাই। তুমি আমার স্ত্রী হও, আমার সঙ্গে যাবজ্জীবন বাস কর তাই আমি চাই। তুমি আমার , আমি তোমার। আমাদের দুজনার নিঃসঙ্গ জীবনে দুজনাকেই কতো দরকার তা কি তুমি জানো না।'

আশ্চর্যভাবে সে নিজেকে মানিয়ে রাখতো, প্রকাশ পেতে দিত না। পরিষ্কার দিনে দুপুরে ভালবাসার কথা তো আর হঠাৎ করে তোলা যায় না। তুললে সেটা বড় অরসিকের কাজ হয়। অথচ কে' একবিন্দু সুযোগ দিচ্ছে না। প্রেম আর বিয়ের প্রসঙ্গ সে সব সময় এড়িয়ে চলেছে। সে কখন কীভাবে কথাটা তোলে? যত তাড়াতাড়ি তোলা যায় ততই ভালো হবে, কেননা শীত আসছে, তার হেগে যাওয়ার দিনও ঘনিয়ে আসছে।

শেষে একদিন সে আর থাকতে পারল না। তার ইচ্ছার বাঁধ ভাঙলো। আজ তারা ব্রেডার পথ ধরে চলছিলো। ভিনসেন্ট সারাটা সকাল মাটি কোপানোরত চাষাদের ছবি এঁকেছে। কতকগুলো এল্‌ম গাছের ছায়াতে একটা ঝরনার পাশে বসে তারা দুপুরের খাবার খেয়েছে। জেন এখন ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। সেলাইয়ের বাক্স কাছে নিয়ে কে'চুপ করে বসে আছে। কতকগুলো ড্রইং দেখাবার জন্য ভিনসেন্ট তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। সে তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। কিন্তু কী বলছিল তার মানে নিজের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। কে'র উষ্ণ কাঁধ থেকে অনলের জ্বালা এসে লাগছে তার দেহে। নারীর

এত ঘন সান্নিধ্য তার দেহের রক্তে রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল। সেগুলো হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। কে' কে সে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে সবেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো আবেগভরা অসলগ্ন অমার্জিত কথা ঢেউয়ের মতো ধাঁ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো–

'কে' তোমাকে না বলে আমি আর এক মুহূর্ত থাকতে পারলাম না। আমি তোমায় কতখানি ভালোবাসি আমার চাইতে তুমিই তা বেশি বোঝো। আমস্টারডাম প্রথম যেদিন দেখেছি, সেই তখন থেকে সব সময় তোমায় ভালোবেসে আসছি। তোমাকে সবসময়ের জন্য কাছে পেতে চাই। কে' বলো তুমি আমায় এতটুকু ভালোবাসো। আমরা দুজন হেগে চলে যাব। সেখানে গিয়ে থাকব আমরা। তুমি আমায় ভালোবাসো, তাই না? বলো, তুমি আমায় বিয়ে করবে।'

কে' মুক্ত হওয়ার কোনো চেষ্টাই করল না। ভয়ে তার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। তার কথাগুলো শোনে নি, কিন্তু কি সে বলতে চায় বুঝেছে। তার মনের মধ্যে একটা মহা আতঙ্ক জেগে উঠেছে। তার চোখ দুটি নিষ্ঠুরের মতো ভিনসেন্টের দিকে তাকানো। চীৎকার করে কিছু বলবার জন্য একখানা হাত তুলল সে।

বললো, 'না, না, কক্‌খনো না, কক্‌খনো না।' সে অত্যন্ত দ্রুত হাঁপাচ্ছে।

সে তার বাহুবন্ধন থেকে সবেগে নিজেকে মুক্ত করল। ঘুমন্ত শিশুটিকে টেনে তুলল। তারপর তাকে নিয়ে ময়দানের উপর দিয়ে পাগলের মতো দৌড়াতে লাগল। ভিনসেন্ট তার পিছু পিছু ছুটে চলল। ভয়ের জন্য তার চলার গতি এতো বেড়ে গেলো যে, ভিনসেন্ট তার কাছে এগুবার আগেই সে কোথায় লুকিয়ে পড়ল, তাকে আর দেখা গেল না।

সে ডাকতে লাগল, 'কে', কে' দৌড়িও না, থামো।'

ডাক শুনে কে আরো দ্রুত দৌড়াতে লাগল। ভিনসেন্ট পাগলের মতো হাত ঘুরিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটতে লাগল। মাঠের এক জায়গাতে একটা গর্তে পা ঢুকে কে' একবার পড়ে গেল। জেনও পড়ে গেল ভিনসেন্ট তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ফেলল।

'কে' তোমায় আমি ভালোবাসি, আর তুমি আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছ! তোমাকে যে আমার চাই-ই। তুমিও আমায় ভালোবাস কে'। ভয় পেয়ো না, আমি তো তোমায় কেবল প্রেম নিবেদন করছি। অতীত ভুলে গিয়ে আমরা নতুন জীবন শুরু করব।'

কে'র চোখ থেকে ভীতির ভাব এবার ঘৃণায় রূপান্তরিত হলো। সে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। জেনের ঘুম এতক্ষণে পুরোপুরি ভেঙেছে। ভিনসেন্টের চোখমুখের অস্বাভাবিক ভাব দেখে সেও ভয় পেলো। তার মুখের অজানা অনর্গল কথাগুলোতে সে ভীষণ ভয় পেলো। সে দুহাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

ভিনসেন্ট বলছে, 'কে' তুমি আমায় একটুখানি ভালোবাসো, একথা তোমার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। তুমি বলবে না?'

'না না, কক্‌খনো না, কক্‌খনো না।'

আবার সে রাস্তার দিকে লক্ষ্য করে মাঠের মধ্যদিয়ে ছুটতে লাগল। ভিনসেন্ট সেখানে নরম বালির ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কে' ততক্ষণে রাস্তাটা ধরে ফেলেছে। সে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ভিনসেন্ট উঠে তার পিছু পিছু আবার দৌড় দিল। যত জোরে পারল নাম ধরে ডাকলো তাকে। রাস্তায় উঠে দেখল, অনেক দূরে তাকে দেখা যাচ্ছে, তখনো দৌড়াচ্ছে সে। ছেলেটা তার বুক আঁকড়ে ধরে আছে। ভিনসেন্ট থামল। দেখল একটা মোড় ঘুরে তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সে অনেকক্ষণ সেখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাঠ পেরিয়ে চলে এল আগের জায়গাতে। সেখান থেকে তার স্কেচগুলো তুললো। সেগুলো অল্প ময়লা হয়ে গিয়েছে। খাবারের পাত্রগুলো সে বাস্কেটের মধ্যে পুরল। ইজেলটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর ক্লান্ত পদে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

বাড়িতে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। ভিনসেন্ট দরজায় পা দিয়েই তা বুঝতে পারল। কে জেনকে নিয়ে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে বসেছিল। বসার ঘরে মা আর বাবা ছাড়া কেউ ছিল না। তাঁরা নিজেরা কী আলোচনা করছিলেন, ভিনসেন্টকে ঢুকতে দেখেই চুপ করে গেলেন। ওদের শেষ কথাটা তার কানে এসেছিল। ভিনসেন্ট ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল। বাবা যে ভয়ানকভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন কে তা বুঝতে পারল কারণ তাঁর ডান চোখের পাতাটা প্রায় বুজে ছিল।

'একি ব্যবহার তোমার ভিনসেন্ট?' ওর মা কাতর কণ্ঠে বললেন।

'কি ব্যবহার করেছি আমি?' ভিনসেন্ট দ্বিধাভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'কে' কে এমনভাবে অপমান করেছ কেন?'

ভিনসেন্ট এর কোন জবাব খুঁজে পেল না। পিঠ থেকে ইজেলটা খুলে তা কোণে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর বাবার দিকে তাকাল।

'কে কি সবকিছু তোমাদের খুলে বলেছে?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

ওর বাবা জামার উঁচু কলারের বাঁধনটা একটু ঢিলা করে দিলেন। ডান হাত দিয়ে টেবিলের কোণটা ধরলেন।

'ও বলেছে যে ওকে তুমি জড়িয়ে ধরে পাগলের মত যা তা বলেছ।'

'আমি যে ওকে ভালোবাসি তাই বলেছি', শান্তভাবে ভিনসেন্ট বলল। 'এতে যে অপমানের কি থাকতে পারে আমি তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেবলমাত্র একথাই বলেছিলে?' শান্তভাবে ভিনসেন্ট বলল। 'এতে যে অপমানের কি থাকতে পারে আমি তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেবলমাত্র একথাই বলেছিলে?' বরফের মত শীতল ওর পিতার কণ্ঠস্বর।

'না। ওকে আমি বিয়ে করবও বলেছিলাম।'

'বিয়ে করবে!'

'হ্যাঁ, তাতে এত বিস্মিত হবার কি আছে?'

'ছিঃ ছিঃ ভিনসেন্ট, এ চিন্তাও তোমার মনে কি করে এলো।' ওর মা বললেন।

'নিশ্চয় আপনারাও ভাবছিলেন যে......'

'তুমি ওর সঙ্গে প্রেমে পড়বে এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।'

'ভিনসেন্ট, কে' যে তোমার সাক্ষাৎ মাসতুতো বোন তা বোধহয় তোমার জানা আছে।' বাবা বললেন।

'তা আছে। কিন্তু তাতে কি?'

'তুমি আপন মাসতুতো বোনকে বিয়ে করতে পার না। তাহলে.....তাহলে.....'

কথাটা শেষ করতেও তিনি ঘৃণা বোধ করলেন। ভিনসেন্ট জানালার কাছে গিয়ে দূর পথে আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'তা হলে কি হবে?'

'অবৈধ যৌন-সংসর্গ।'

ভিনসেন্ট অতি কষ্টে আপনাকে সংযত রাখল। তার প্রেমকে এমন ভাবে বিশেষিত করতে দেখে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল।

'এই ধরনের কথা আপনার মুখে শোভা পায় না বাবা।'

'আমি আবার বলব যে এ হচ্ছে অবৈধ যৌন-সংসর্গ,' থিয়োডোরাস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ভ্যান গোঘ্ পরিবারে এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হতে আমি কিছুতেই দেব না।'

'আপনি কি বাইবেল থেকে নজির দেখাচ্ছেন বাবা? সম্পর্কিত বোনের বিয়ে নিষিদ্ধ নয়।'

'কে' কে সত্যি ভালবাসলে তোমার আরও কয়েকটা দিন সবুর করা উচিত ছিল। সবেমাত্র এক বছর ওর স্বামী মারা গেছে। মৃত স্বামীকে সে এখনও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তারপর স্ত্রীকে প্রতিপালন করার মতো সঙ্গতিও তোমার নেই।' ভিনসেন্টের মা বললেন।

'তুমি যা করেছ তা একান্তভাবে অসময়োচিত এবং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ,' তার বাবা বললেন।

ভিনসেন্ট একটু পিছনে সরে দাঁড়াল। খুঁজে পাইপটা হাতে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল, তারপর রেখে দিল।

'এ ধরনের উক্তি না করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বাবা। কে'র প্রতি প্রেম আমার জীবনের সুন্দরতম কীর্তি। তাকে আপনি যে অকালপক্ক ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলে ধিকৃত করবেন তা কিছুতেই আমি সহ্য করব না।'

ইজেলটা তুলে নিয়ে ভিনসেন্ট নিজের ঘরে চলে গেল। বিছানার উপর বসে পড়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে? আমি কি করেছি? কে'কে বলেছিলাম আমি তাকে ভালোবাসি, তারপরেই সে ছুটতে শুরু করেছিল। কেন ছুটে পালাল? ও কি আমায় চায় না?'

'না, না, কখনও না!' কে'র কণ্ঠস্বর যেন প্রতিধ্বনিত হল।

সারারাত্রি তার অস্বস্তির ভিতর দিয়ে কাটল। বারবার সমস্ত ঘটনা তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে লাগল, আর সমস্ত চিত্রই এক জায়গায় গিয়ে সমাপ্ত হতে লাগল। কে'র শেষ কথাগুলো তার কানে মৃত্যুর আদেশের মত শোনাতে লাগল।

পরদিন বেশ বেলাতে ভিনসেন্টের ঘুম-ভাঙল। সে নিচে নেমে এল। বাড়ির থমথমে ভাবটা কেটে গিয়েছিল। মা তখন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। ভিনসেন্ট আসতেই তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং আদর করে গালে মৃদু আঘাত করলেন।

'ভাল ঘুম হয়েছিল তো,' পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কে কোথায়?'

'তোমার বাবা ওকে নিয়ে ব্রেডা গেছেন।'

'কেন?'

'ট্রেন ধরতে। কে বাড়ি চলে যাবে।'

'আমস্টারডাম ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'হুম।'

'এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল মনে করেছে কে।'

'আমাকে কিছু বলে গেছে?'

'না তো। প্রাতরাশ খাবে না এখন?'

'কিছুই বলে যায় নি? গতকালের ব্যাপারে কোন কথাই বলে নি? ও কি আমার উপর খুব রাগ করেছে?'

'না। বাপমার কাছে ফিরে যাওয়া দরকার মনে করে ও চলে গেছে।'

কে যা বলে গেছে তা পুনরুক্তি করা উচিত হবে না মনে করে আনা কর্নেলিয়া চুপ করে গেলেন। তিনি স্টোভে একটা ডিম সিদ্ধ চড়িয়ে দিলেন।

'ব্রেডা থেকে কটায় ট্রেন ছাড়ে?'

'দশটা কুড়িতে।'

ভিনসেন্ট রান্নাঘরের নীল ঘড়িটার দিকে তাকাল।

'দশটা কুড়িই বাজে দেখছি,' ভিনসেন্ট বলল।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো কিছুই করা যাবে না।'

'এসো খেতে বসো এসে ভিনসেন্ট। আজ ভোরে কতকগুলো সুন্দর তাজা তরকারি রেঁধেছি।' বলে তিনি খাবার টেবিল পরিষ্কার করে ফেললেন। তারপর একটা তোয়ালে ছড়িয়ে তার উপর ওর প্রাতরাশ সাজিয়ে দিলেন। ভিনসেন্ট খেতে আরম্ভ করলে বারবার করে নানা জিনিস খেতে বলতে লাগলেন কারণ তার মনে হচ্ছিল ভিনসেন্টের পেটটা ভরলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

খেলে মা খুশি হচ্ছেন দেখে ভিনসেন্ট সব কিছুই খেয়ে ফেলল। কিন্তু কে'র শেষ উক্তির তিক্ত স্বাদ তখনও যেন তার মুখে লেগেছিল, তাই সবকিছু আহার্যই তার কাছে তিক্ত লাগছিল।

৬.

কে'র চেয়ে নিজের কাজ যে বেশি আপনার সে বিষয়ে ভিনসেন্টর কোন সন্দেহ ছিল না। ও দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার কথা উঠলে কোনটি যে বেছে নেবে সে সম্বন্ধেও কোন সংশয় ছিল না। কাজের প্রতি এত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তার কাজ আর এগুচ্ছিল না। কেমন যেন একটা নিরুৎসাহের ভাব দেখা গেল। দেওয়ালে টাঙানো ব্রাবান্ট ধরনের স্কেচগুলোর দিকে সে তাকাল, মনে হল কে'কে ভালবাসার পর এদিক

দিয়ে তার কিছু উন্নতি হয়েছে। তার অঙ্কনে এখনও কিছুটা রুক্ষতা ও কাঠিন্য যে রয়েছে তা সে জানত কিন্তু সে অনুভব করছিল যে কে'র ভালবাসা তার চিত্রাঙ্কনে কোমলতা আনতে পারবে। তার প্রেম প্রাণহীন ভাসাভাসা নয়, সুতরাং কে'র অস্বীকৃতি তাকে দমাতে পারবে না। তার এই অস্বীকৃতি যেন এক চাপ বরফ, বুকে চেপে তাকে দ্রবীভূত করতে হবে।

কিন্তু তার মনের কোণে যে সন্দেহ লুকানো ছিল তাই তার কাছে নিরুৎসাহের সৃষ্টি করছিল। কে যদি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে? সম্ভাব্য নূতন প্রেমের প্রতি তার কেমন একটা ভয় ছিল। অতীতের প্রতি কে'র একান্ত নিষ্ঠার পরিবর্তন সাধনের জন্য ভিনসেন্ট মনস্থ করল। তার ইচ্ছা কে'র সুকোমল বাহু আর তার হাত–এ দুয়ে মিলে সংস্থান করবে তাদের দৈনন্দিন আহার আর আনন্দের।

যার বশে কে'কে অনুরাগভরা চিঠি লিখতে লাগল, তাতে সে নানা অনুরোধও জানাল ওকে। কিন্তু ও যে চিঠিগুলো পড়ে নি তা অল্প কয়দিন পরেই সে জানতে পারল। সে থিওকেও প্রায় প্রতিদিনই পত্র দিত। তাতে নিজের হৃদয়ের সন্দেহ নিরসনের জন্য নানা যুক্তি প্রকাশ করত। নিজের বিশ্বাসের কথা লিখত এবং বাবা মা ও রেভারেন্ড স্ট্রিকার তার উপর সম্মিলিতভাবে যে আক্রমণ চালিয়েছে তা উল্লেখ করত। জীবনে সে বহু পেয়েছে, চেষ্টা করেও সে তা চেপে রাখতে পারত না। তার মা তাকে কাছে টেনে নানা সান্ত্বনা দিতেন।

তিনি বলতেন, 'ভিনসেন্ট তুমি শুধু শুধু পাথরে মাথা খুঁড়ে মরছ। তোমার মেসো স্ট্রিকারের 'না'র কোন পরিবর্তন হবে না।'

'কিন্তু আমি তার কথাই শেষ কথা বলে মনেকরি।'

'কে'ও ঐ কথাই বলছে।'

'কি বলেছে? আমাকে ভালবাসে না?'

'হ্যাঁ, তার এই মতেরও কোনদিন পরিবর্তন হবে না।'

'বেশ দেখা যাবে।'

'বৃথা চেষ্টা ভিনসেন্ট। স্ট্রিকার বলেছেন, কে যদি তোমাকে ভালওবাসতো তবু বছরে তুমি অন্তত হাজার ফ্রাঙ্ক উপার্জন না করা পর্যন্ত তিনি বিয়েতে অনুমতি দিতেন না। হাজার ফ্রাঙ্ক উপার্জন করতে তোমার অনেক বাকি।'

'জানো মা, যে ভালবাসতে জানে সেই বেঁচে থাকে, যে বেঁচে থাকে সেই কাজ করে এবং যে কাজ করতে পারে রুটির জোগাড় তার হয়ই।'

'ভাল কথা বলেছ ভিনসেন্ট। কিন্তু কে'র চিরটাকাল কেটেছে বিলাসে, সুন্দর জিনিস ছাড়া তার চলে না।'

'কিন্তু সুন্দর জিনিস পেয়েও তো সে আজ সুখী নয়।'

'তোমরা যদি এখন ভাবাবেগে পড়ে বিয়ে কর তবে তোমাদের ভয়ানক দুঃখ পেতে হবে। দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও ব্যাধিতে তোমাদের কষ্ট পেতে হবে। কারণ সংসার থেকে তোমরা এক পয়সা দিয়েও সাহায্য পাবে না।

'সব কিছুই আমি চিন্তা করেছি, মা এতে আমি ভয় পাই না। এই দুঃখ পেতে হবে দেখেই আমাদের মিলন বিশেষ করে প্রয়োজন।'

'কিন্তু কে' যদি তোমাকে ভাল না বাসে?'

'আমস্টারডাম যেতে পারলে ঐ 'না'কে আমি 'হাঁ' করাতে পারতাম।'

যে নারীকে ভালবাসে তার কাছে যেতে না পারার দুঃখে, রেলভাড়া যোগাড় না করতে পারার দুঃখ ভিনসেন্টকে খুবই ব্যথিত করে তুলল, নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজের উপর রাগও হল খুব। আজ তার বয়স ২৮ বৎসর। গত বারো বছর সে অক্লান্ত ভাবে খাটছে, সাধারণভাবে জীবনযাপন ছাড়া কোন ব্যসনই তার নাই। কিন্তু আজকে আমস্টারডামে যাবার মত রেলভাড়া যে যোগাড় করবে সারা বিশ্বে এমন কেউই তার নেই।

হেঁটে আমস্টারডামে যাবার কথা একবার সে ভাবল, কিন্তু সেখানে পৌঁছে ক্ষুধায় ও পথশ্রমে তাকে কদর্য দেখাবে। পথশ্রমের জন্যে সে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায় না, কিন্তু রেভারেন্ড পিটারসেনের বাড়ির মত রেভারেন্ড স্ট্রিকারের বাড়িতে ঠিক সে যদি তেমনিভাবে পৌঁছায়....ভোরেই সে থিওকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছে, তবু সন্ধ্যায় আবার তাকে আর একখানা চিঠি লিখতে বসল।

প্রিয় থিও :

একবার আমস্টারডামে যাবার জন্য আমার কিছু অর্থের ভয়ানক প্রয়োজন। কিছু টাকা পেলেই আমি সেখানে যাবো।

এই সঙ্গে আমার কিছু চিত্রাঙ্কন পাঠালাম। এগুলো বাজারে কেন চলছে না এবং কি করেই বা তা বাজারে চালাবার উপযুক্ত করতে পারি তা জানিও। কারণ রেলের ভাড়া সংগ্রহ করে গিয়ে আমাকে কে'র অস্বীকৃতির গুরুত্ব পরিমাপ করতেই হবে।'

যত দিন যেতে লাগল ভিনসেন্টের উৎসাহ উদ্দীপনা যেন ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে। প্রেম তার মনকে করে তুলেছে দৃঢ়। মনের সংশয় তার দূর হয়ে গেছে। সে এখন বুঝতে পেরেছে যে, কে'র সঙ্গে দেখা করে তার সামনে যদি নিজের অন্তরটা খুলে ধরতে পারত তবে কে'র আপত্তিকে সে অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারবে। নব উৎসাহে সে কাজে লেগে গেল। হাত তার এখনও পাকে নি, কিন্তু এ বিষয়ে সে সুনিশ্চিত যে সময়ে তার হাতের এই জড়তা কেটে যাবে, যেমন দূর হয়ে যাবে কে'র অসম্মতি।

সমস্ত ঘটনা পরিষ্কারভাবে বিবৃত করে পরের দিন ভিনসেন্ট রেভারেন্ড স্ট্রিকারকে একখানা চিঠি লিখল। কোন কিছুই সে লুকোলো না। চিঠি পড়ে মেসো যেসব কথা বলবেন তা ভেবে সে মনে মনে হাসলো। তার বাবা অবশ্য ওঁকে কোন পত্র দিতে মানা করেছিলেন, কারণ এতে আত্মীয়-বিরোধ বেধে উঠবে। থিয়োডোরাস জীবনটাকে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলা ও কঠোর রীতিনীতির আজ্ঞাবহ বলে মনে করতেন, মানবিক প্রকৃতির গতি-প্রগতি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তার এই ধারণার সঙ্গে ছেলের মিল না হলে, ছেলেরই ত্রুটি বলে তিনি মনে করতেন, নিজের ধারণা তার কাছে ছিল অভ্রান্ত।

'ফরাসি উপন্যাসগুলোই তোমার মাথাটা খেয়েছে' সান্ধ্য টেবিলে বসে থিয়োডোরাস বললেন। 'চোর আর খুনীর সঙ্গে মিশলে কি করে তুমি কর্তব্যপরায়ণ আর ভদ্র হবে?'

ভিনসেন্ট মিচেলটের একখানা বই পড়ছিল। চোখ তুলে সে সবিস্ময়ে বাপের দিকে তাকালো।

'চোর আর খুনী? ভিক্টর হুগো আর মিচলেটকে আপনি চোর বলছেন?'

'না, কিন্তু ওদের লেখাই ঐ ধরনের। ওদের বইয়ে খারাপ ছাড়া কিছু নেই।'

'কি যা তা বলছেন, বাবা? মিচেলেট বাইবেলের মতই পবিত্র।'

'তোমার মুখে দেবনিন্দা শোনার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই,' থিয়োডোরাস গর্জে উঠলেন, 'ঐ বইগুলো একদম অশ্লীল। ফরাসী ভাবই তোমার মাথাটা খেয়েছে।'

ভিনসেন্ট উঠে দাঁড়াল। টেবিলটা অতিক্রম করে করে থিয়োডোরাসের সম্মুখে 'L'-Amour et la Femme' বইখানা রাখল।

'বই না পড়িয়ে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করাতে পারব না। তাই বলছি বইয়ের কয়েকটা পাতা পড়ুন। আপনি মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। আমাদের সমস্যা ও ছোট ছোট দুঃখ-দুর্দশা দূর করার উপায় বাতলেছেন মিচেলেট।

থিয়োডোরাস 'L' Amour et la Femme' বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মনে হোল তিনি যেন কোন পাপকে দূরে হটিয়ে দিলেন।

'আমার পড়ার কোন প্রয়োজন নেই!' থিয়োডোরাস চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ভ্যান গোঘ্ পরিবারের একজন যে ফরাসী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মদ ধরেছিল একথা আমাদের স্মরণ থাকবে।'

'আমায় ক্ষমা কর, ফাদার মিচেলেট,' ভিনসেন্ট আপন মনে বলল।

'ফাদার মিচেলেট বলছ কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি?' থিয়োডোরাস নিরুত্তেজ কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে অপমান করতে চাও নাকি?'

'অমন কথাও আমি ভাবিনি। তবে একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, উপদেশ নিতে হলে আপনার চেয়ে মিচেলেটকেই আমি পছন্দ করব।'

'ছিঃ ভিনসেন্ট, এসব কথা বলা তোমার উচিত নয়। কেন শুধু শুধু গৃহবিচ্ছেদ ডেকে আনছ?' মা সকাতরে বললেন।

'বুঝতে পেরেছি আমি। পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করাই তোমার ইচ্ছা। তোমার ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। তুমি বরঞ্চ বাড়ি ছেড়ে গিয়ে অন্য কোথাও থাক।'

ভিনসেন্ট নিজের স্টুডিওতে গিয়ে বিছানার উপর বসে পড়ল। কোন আঘাত পেলে চেয়ারে না বসে কেন যে বিছানার উপর বসে পড়ে তাই সে ভাবতে লাগল। ঘরের দেওয়ালের উপর একবার সে চোখ বুলিয়ে নিল—চোখে পড়ল তার ও হাইকের (Hike) আঁকা কতকগুলো ছবি। হ্যাঁ কিছু উন্নতি তার হয়েছে, হাত আসছে ক্রমশ। কিন্তু এখনও তার কাজ শেষ হয় নি। মভ ড্রেন্থ্-এ (Drenthe) চলে গেছে, এক মাসের মধ্যে সেখান থেকে ফিরবে না। ইটেন ত্যাগ করার ইচ্ছা ভিনসেন্টের নেই। এখানেই সে বেশ আছে। অন্যত্র থাকতে গেলেই খরচ লাগবে বেশি। তাছাড়া, এখানে থাকতে থাকতেই নিজের খাপছাড়া অভ্যাসটা বদলে ব্রাবান্ট বংশের সত্যিকারের স্বভাবটা নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য সিদ্ধান্ত করল সে। পিতা তাকে এখান থেকে চলে যেতে বলেছেন, তাকে গালিমন্দ করেছেন। অবশ্য সবই বলেছেন তিনি রাগের ঝোঁকে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি ও'কে চলে যেতে বলেন তারা......সে কি এতই মন্দ যে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে?

পরদিন ভোরের ডাকে ভিনসেন্টের দু'টো চিঠি এল। প্রথমটি লিখেছেন রেভারেন্ড স্ট্রিকার। ভিনসেন্ট রেজিস্ট্রিযোগে সে চিঠি দিয়েছিল এটা তারই জবাব। এর সঙ্গে রেভারেন্ডের স্ত্রীও দু'ছত্র লিখে দিয়েছেন। তাতে তারা লিখেছেন যে, ভিনসেন্টের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল বলে তার সম্বন্ধে কিছুই করতে পারেন না। তাছাড়া আরও জানিয়েছেন যে কে অন্য এক ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং সে প্রভূত বিত্তশালী। কে'র উপর আর অসভ্য আচরণ না করবার জন্যেও তাঁরা জানিয়েছেন।

'এ জগতে ধর্মযাজকের মত নাস্তিক নিষ্ঠুর এবং বিষয়াসক্ত লোক হয় না'– ভিনসেন্ট নিজের মনে বলল। রেভারেন্ডের চিঠিখানা নির্দয়ভাবে পিষ্ট করতে করতে এমন একটা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করছিল সে যেন রেভারেন্ডকেই পিষ্ট করছে।

অপর চিঠিটা এসেছে থি'ওর কাছ থেকে।

'চিত্রাঙ্কনগুলো বেশ ভাবদ্যোতকই হয়েছে। ওগুলো বিক্রয়ের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমস্টারডামে যাবার জন্য ২৫ ফ্রাঙ্ক পাঠালাম। তোমার শুভ কামনা করি।'

৭.

ভিনসেন্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে যখন পথে নামলো তখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ড্যামরেক ধরে সে বাঁধের দিকে এগুতে লাগল। রাজপ্রাসাদ, ডাকঘর প্রভৃতি অতিক্রম করে সে কাইজারগ্রাফের দিকে চলতে লাগল। তখন দোকান থেকে কেরানীরা এবং সেলসম্যানেরা ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছিল।

সিনগেল অতিক্রম করে হীরেনগ্রাক্ট নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর সে একটু দাঁড়াল। উদ্দেশ্য হচ্ছে ফুলের নৌকায় মাঝিরা যেভাবে খোলা টেবিলে বসে রুটি আর হেরিং মাছ দিয়ে ডিনার খাচ্ছে তাই দেখা। একটু থেমে তারপর বাঁদিকে ঘুরল। একটা লম্বা ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যদিয়ে কিছুটা এগিয়ে রেভারেন্ড স্ট্রিকারের ছোট ছোট পাথরের সিঁড়িওয়ালা ও কালো রেলিং দেওয়া বাড়ির সম্মুখে আসল। প্রথমবার এখানে এসে যখন সে দাঁড়িয়েছিল সে কথা তার মনে পড়ল। তার আমস্টারডামের ঘটনাবহুল জীবনের শুরু হয়েছিল সেদিন। সে বুঝল যে এমনি কতকগুলো শহর আছে যেখানে মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই।

সারাটা পথ সে একপ্রকার ছুটতে ছুটতে এসেছে একটা উৎসাহ, উত্তেজনা নিয়ে কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে তার মনে কেমন যেন ভয় আর সঙ্কোচের ভাব দেখা দিল। উপরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল চিলে ঘরের লোহার হুকটি। দেখে তার মনে হল যে ফাঁসি দেবার পক্ষে এটা সত্যি সুন্দর ব্যবস্থা।

ইটের লাল চওড়া পেভ্‌মেন্টটি ঘুরে এসে রেলিং ধরে সে ক্যানালের হলের দিকে তাকাল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার ভাগ্যচক্র যে নির্ধারিত হবে তা সে জানত। কিন্তু তার আগে কে'র সঙ্গে একবার যদি সাক্ষাৎ করে সব বিষয়ে আলাপ করতে পারত তবে হয়ত সমস্ত ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু সম্মুখের ঘরের দরজার চাবি রয়েছে মেয়েটির বাবার হাতে। তিনি যদি ওকে বাড়িতে ঢুকতে না দেন।

ভিনসেন্ট সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ঘণ্টাধ্বনি করল। ক্ষণপরে পরিচারিকা এসে দোর খুলে দিল। অন্ধকারে দণ্ডায়মান ভিনসেন্টকে চিনতে পেরে দরজা জুড়ে ও দাঁড়াল।

'রেভারেন্ড স্ট্রিকার বাড়ি আছেন?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'না। তিনি বাইরে গেছেন।' নির্দেশ মতই সে বলল ভিনসেন্টকে।

ভিতর থেকে স্ট্রিকারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। ভিনসেন্ট জোর করে পরিচারিকাটিকে সরিয়ে দিল।

'পথ ছেড়ে দাও।' সে বলল।

পরিচারিকাটি পেছন পেছন গিয়ে তার পথ আটকাতে চেষ্টা করল।

'সবাই এখন খেতে বসেছেন,' সে প্রতিবাদ জানাল, 'এ সময় আপনি ভিতরে যেতে পারবেন না।'

কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে ভিনসেন্ট হল অতিক্রম করে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত হল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অতি পরিচিত একটি কালো পোষাকের অংশ অন্য দ্বার পথে অন্তর্হিত হল। টেবিলে তখন ভিনসেন্টের মেসো স্ট্রিকার, মাসী উইলহেলমিনা, দুইটি ছোট ছেলেমেয়ে বসে ছিল, কিন্তু আসন করা ছিল পাঁচজনের। খালি চেয়ারটার সম্মুখে টেবিলটাতে তখনও সাজান ছিল মাংস, আলু সেদ্ধ ও বিন সেদ্ধ।

'আমি ওকে কিছুতেই রুখতে পারলাম না স্যার, ও আমাকে ঠেলে চলে এসেছে।' পরিচারিকা বলল।

টেবিলের উপর দুটো শাদা মোমবাতি জ্বলছিল। দেওয়ালে ঝোলান কেলভিনের মূর্তি হলদে আলোতে কেমন ভীতির সৃষ্টি করছিল। তাকের উপর রাখা রূপোর বাসনগুলো অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করছিল। যে উঁচু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম কে'র সঙ্গে কথা বলেছিল ভিনসেন্টের তা নজরে পড়ল।

'ভিনসেন্ট তোমার ভব্যতা জ্ঞান যেন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে', ভিনসেন্টের মেসো বললেন।

'আমি কে'র সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'সে এখানে নেই, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে।'

'আমি যখন ঘন্টা বাজাই তখন ও এই জায়গায় বসেছিল। সে ডিনার খেতেও শুরু করেছিল।

'ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে যাও।' স্ট্রিকার স্ত্রীকে বললেন।

ওরা বেরিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'দেখ ভিনসেন্ট, তুমি ভয়ানক উৎপাত শুরু করেছ। শুধু আমিই নই, সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে তোমার ব্যবহারে। তুমি একটি ভবঘুরে, অলস, অসভ্য। তুমি অকৃতজ্ঞ এবং হীনচরিত্র। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার দুঃসাহস তোমার কি করে হয় বলত? এ আমাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'কে'র সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিন মেসো। আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। এমনকি তোমাকে সে দেখতে চায় না।'

'এ কি কে'র কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না।'

জবাব শুনে স্ট্রিকার হতবাক হয়ে গেলেন। জীবনে এইবার সর্বপ্রথম তাকে মিথ্যাবাদী অপবাদ দেওয়া হল।

'আমি সত্য বলছি না একথা বলার দুঃসাহস তোমার কি করে হল?'

'আমি ওর মুখ থেকে নিজের কানে না শোনা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করবো না। অবশ্য শুনলেও তা বিশ্বাস করব না।'

'তোমাকে মানুষ করার জন্যে আমি অযথাই অর্থ আর সময় নষ্ট করেছি।'

ভিনসেন্ট কে'র পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ল এবং হাত দুটো টেবিলের উপর রাখল।

'এক মিনিট চুপ করে আমার কথাটা শোন এবং যাজকের অন্তরেও যে স্নেহ-দয়ামায়া আছে একবার তুমি তা প্রমাণিত কর। শোন, আমি তোমার মেয়েকে ভালোবাসি, ভয়ানকভাবে ভালোবাসি। আমার দিবানিশির ধ্যান ও জ্ঞান হচ্ছে কে। তুমি ভগবানের পূজা কর। এই ভগবানের নামে বলছি আমাকে দয়া কর। আমার উপর নির্দয় হয়ো না। আমি এখনও যে উন্নতি করতে পারি নি, সেকথা আমার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তুমি যদি আমাকে কিছু সময় দাও, আমি বলছি নিশ্চয় আমি উন্নতি করব। ওকে যে আমি ভালোবাসি তা দেখাবার সুযোগ আমাকে দাও। আমাকেই সে কেন ভালবাসবে তা ওকে বুঝিয়ে দিতে আমাকে সাহায্য কর। তুমিও একদিন নিশ্চয় কাউকে ভালোবেসেছিলে, কাকা, তুমি আমার মর্মান্তিক অবস্থা বুঝবে নিশ্চয়। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছি, আমাকে একবার সুখের স্বাদ পেতে দেও। ওর প্রেম জয় করবার একটু সুযোগ দও। আমি এই নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে আর কষ্ট যে সইতে পারছি না, কাকা।'

রেভারেন্ড স্ট্রিকার একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি এতই দুর্বল আর ভীরু যে সাধারণ বেদনাটুকুও সহ্য করতে পারছ না? চিরকাল কি তুমি এমন ঘ্যান ঘ্যান করে কাটাবে?'

ভিনসেন্ট সক্রোধে আসন ত্যাগ করে উঠে পড়ল। সমস্ত নম্রতা কেটে গিয়ে একটা রুক্ষতা তাকে অধিকার করল। টেবিলের দুপাশে দু'জন দাঁড়িয়েছিল এবং একটি মোমবাতি ছাড়া টেবিলের উপর আর কিছুই ছিল না– তাই ভিনসেন্ট রেভারেন্ডকে আঘাত করতে পারল না। পরস্পরের চোখে প্রতিফলিত আলোরেখার দিকে তাকিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল। সারা কক্ষে মর্মান্তিক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল।

ভিনসেন্টের অজান্তে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। সে মোমবাতির কাছে হাত রাখল।

'এই জ্বলন্ত শিখায় যতক্ষণ আমি হাত রাখতে পারব ঠিক ততটুকু সময় আমাকে কে'র সঙ্গে কথা বলতে দিন।' ভিনসেন্ট বলল।

বলেই সে করতলের উল্টো পিঠটা মোমবাতির শিখায় ধরল। ঘরের আলো ম্লান হয়ে গেল। আলোর শিখায় তার চামড়া কালো হয়ে উঠল। তারপর কয়েক সেকেন্ডের

মধ্যেই পুড়ে ফুলে উঠল। ভিনসেন্ট বিন্দুমাত্র বেদান-প্রকাশ না করে মেসোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। পাঁচ সেকেন্ড চলে গেল। তারপর দশ। ফোলা ক্রমেই বাড়তে লাগল। আতঙ্কে রেভারেন্ড স্ট্রিকারের চোখ দুটি যেন ছুটে বেরিয়ে আসছিল। তাঁর সমস্ত অঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গেছে। কয়েকবার সে নড়েচড়ে কথা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ভিনসেন্টের নিষ্ঠুর, মর্মভেদী দৃষ্টি যেন তাকে নিশ্চল করে রেখেছিল। দেখতে দেখতে পনের সেকেন্ড পার হয়ে গেল। ফোলা জায়গা ফেটে ফেটে ঘা বেরিয়ে পড়ল কিন্তু ভিনসেন্টের হাত নড়ল না। রেভারেন্ড স্ট্রিকার অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন।

'কি করছ, কি করছ তুমি,' তিনি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ।'

বলেই ছুটে গিয়ে ভিনসেন্টের হাতের তল থেকে মোমবাতিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অন্যটিকেও জোর করে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন।

সারা ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। টেবিলের দু'পাশে দুজনে হাতের উপর ভর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারে পরস্পরকে দেখতে না পেলেও দু'জনেই দু'জনকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল।

'তুমি একটা আস্ত পাগল।' রেভারেন্ড চিৎকার করে বললেন, 'তাই কে তোমাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর কখনও এ মুখো হবার দুঃসাহস যেন তোমার না হয়।'

ভিনসেন্ট অন্ধকারে কোন প্রকারে হেঁটে শহরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। ক্যানেলের নিস্তরঙ্গ জলের ধারে যখন সে দাঁড়াল তখন তার নাকে ভেসে আসল একটা অতি পরিচিত সুমধুর গন্ধ। কোণের গ্যাসবাতির আলো এসে তার বাঁ হাতে পড়ল, সে দেখল সেখানে কেমন একটা গর্ত হয়ে গেছে। কিছুটা হেঁটে সে মেন্ডেস দা কোস্টার গৃহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হল। সে একটা ক্যানেলের তীরে বসে পড়ল। তারপর হলে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল। টুপ করে ঢিলটা ডুবে গেল।

তার জীবন থেকে কে চিরকালের জন্য মুছে গেল। অন্তরের অন্তস্থল থেকে সে বলেছিল, 'না, কখনো না, কখনো না।' তার এই শেষ কথাই ভিনসেন্টের সম্বল, এই তার একমাত্র সম্পত্তি। ঘুরে ঘুরেই ভিনসেন্টের স্মরণ হতে লাগল, 'না না, আর তুমি তার দেখা পাবে না, তার নীল চোখের মধুর হাসি দেখতে পাবে না, ওর উষ্ণ জ্যোতির্ময় ত্বকের স্পর্শ আর গ্রহণ করতে পাবে না। তোমার প্রেমের মৃত্যু হয়েছে। প্রেমের জন্যে আর তোমার বেঁচে থাকা চলবে না, এমন কি যতটুকু সময় তুমি দুঃসহ বেদনা অনুভব করেছ ততটুকু সময়ের জন্যও সে আর তোমাকে ভালবাসবে না।'

একটা অসহ্য বেদনায় তার গলা বুজে আসল। ক্রন্দনাবেগ রোধ করার জন্যে সে মুখে হাত চাপা দিল যাতে আমস্টারডাম এবং সমস্ত জগতের লোক জানতে না পারে যে শেষ বিচারে সে প্রেমের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ওষ্ঠে তার অজানা আকাঙ্ক্ষার তিক্ত স্বাদ।

তৃতীয় পর্ব

হেগ

১.

মভ তখনও ড্রেন্থ্ শহরেই ছিলেন। উইলিবুনেমের আশেপাশে একখানা ঘরের জন্য ভিনসেন্ট চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টার পর রিন্ স্টেশনের পেছনে একটা ঘর মাসিক ১৪ ফ্রাঙ্ক ভাড়ায় জোগাড় করল। তার স্টুডিয়োটি–ভিনসেন্ট ছাড়া নেবার আগে অবশ্য এটাকে ঘরই বলা হত–বেশ বড়ই। ঘরের এক কোণে রান্নার বন্দোবস্ত ছিল এবং দক্ষিণমুখী একটি জানালা ছিল। ঘরের অন্য কোণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দেওয়াল-আচ্ছাদনী-কাগজ বেশ ঝক্ঝকে তক্তকে ছিল, ওর রঙটা একটু ঢিমে। ভিনসেন্ট জানালা দিয়ে বাড়ির মালিকের পড়ে-থাকা মাঠটাকে বেশ দেখতে পেত। জানালা দিয়ে তাকালে তার চোখে পড়ত কিছুটা সবুজ মাঠ–তারপরেই বালুর পাহাড়। হেগ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকের গোচারণ ভূমি মধ্যবর্তী শেষ রাজপথের উপর এই বাড়িটি অবস্থিত। রিন্ স্টেশনে যেসব ইঞ্জিন আসত তার কালিতে বাড়িটা ঢেকে গিয়েছিল।

ভিন্সেন্ট রান্নাঘরের জন্যে একটি টেবিল, দুটো চেয়ার এবং মাটিতে শুয়ে গায় দেবার জন্যে একটা কম্বল কিনে আনল। এতে তার স্বল্প খুঁজি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মাস শেষ হতে আর বেশি দেরি ছিল না। ১লা তারিখেই থিওর প্রতিশ্রুত তার মাসিক ভাতা একশত ফ্রাঙ্ক পেয়ে যাবে। জানুয়ারির শীতে তার পক্ষে বাইরে কাজ করা সম্ভব নয়। তার এমন পয়সাও নেই যে, মডেল ভাড়া করে। সুতরাং মভ ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে চুপ করে বসে থাকতেই হবে।

মভ কিছুদিন পরে উইলিবুমেনে ফিরে এলেন। সংবাদ পেয়েই ভিনসেন্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করতে স্টুডিয়োতে গেল। মভ উত্তেজিত ভাবে একটি বড় ক্যানভাস আঁটছিলেন, তাঁর চুলগুলো কপালের উপর দিয়ে চোখের উপর এসে পড়েছিল। বৎসরের সুবৃহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই পরিকল্পনা হচ্ছে অভ্যর্থনা কক্ষের জন্যে ছবি আঁকা। ছবির বিষয়বস্তু হবে স্কেভেনিনগেন উপকূলে ঘোড়া দ্বারা টেনে ধরা একটি মাছধরা স্ম্যাকের চিত্র। ভিনসেন্ট কখনও যে হেগ শহরে আসবে এ বিষয়ে মভ ও তাঁর স্ত্রী জেট-এর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁরা জানতেন যে, প্রায় সবারই জীবনে তাড়াতাড়ি আর্টিস্ট বনে যাবার একটা ইচ্ছা হয়।

'তাহলে সত্যি তুমি হেগ-এ এলে। বেশ, এসেছ যখন আমরা তোমাকে চিত্রকর করে ছেড়ে দেব, ভিনসেন্ট। ভাল কথা, থাকার জায়গা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, আমি ১৩৮ স্কেনবেগ-এ উঠেছি। বাড়িটা রিন্ স্টেশনের ঠিক পেছনে।

'তাহলে তো কাছেই আছ। খরচপত্রের কি ব্যবস্থা করেছ?'

'টাকা পয়সা আমার কাছে বিশেষ নেই। তবে একটা টেবিল আর গোটা দুই চেয়ার কিনেছি।'

'শোয়ার বন্দোবস্ত?' জেট জিজ্ঞাসা করলেন।

'মাটিতেই শুই।'

মভ নিম্নকণ্ঠে জেটকে কি বললেন। জেট বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি একটি ওয়ালেট নিয়ে ফিরে এলেন। মভ তা থেকে একটি একশত গিল্ডার নোট বের করলেন। 'এটা তুমি ঋণস্বরূপ নাও, ভিনসেন্ট,' তিনি বললেন, 'এ দিয়ে নিজের জন্য একটা বিছানা কিনে ফেলো। রাতে তোমাকে ভাল করে ঘুমোতে হবে। হ্যাঁ, বাড়ি ভাড়া দিয়েছ?'

'না এখনও দিইনি।'

'তবে এখনই দিয়ে ফেল। ঘরে আলো আসে কেমন?'

'প্রচুর, কিন্তু জানালা দক্ষিণ-মুখী।'

'উঁহু এতে চলবে না। তুমি ওটা ঠিক করে নাও। নইলে প্রত্যেক দশ মিনিটে তোমার মডেলের উপর যে আলো পড়বে তার পরিবর্তন হবে। কতকগুলো ঝালর কিনে নাও।'

'আপনার কাছ থেকে আর টাকা কর্জ নিতে চাই নে, কাজিন মভ। আপনি যে আমাকে শেখাতে রাজি হয়েছেন এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কি বাজে বকছ ভিনসেন্ট, সবারই প্রথম ঘর বাঁধতে খরচ হয় বেশি, তারপর অবশ্য তা কমে যাবে।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি। যাক্, শীঘ্রই হয়ত আমার আঁকা কিছু ছবি বিক্রয় করতে পারব। তা থেকে আপনার টাকাটা শোধ করে দেওয়া যাবে।'

'টারস্টিগ তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। প্রথম জীবনে আমি যখন প্রথম আঁকতে আরম্ভ করি তখনই সে আমার ছবি কিনেছে। ছবি বিক্রি করতে হলে তোমাকে ওয়াটার কালার এবং তৈল চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করতে হবে। সাধারণ পেন্সিল স্কেচ বড় একটা বিক্রয় হয় না।'

মভ মোটা হলেও নড়াচড়া করতেন তড়িৎগতিতে, আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দেখতে পেলেই প্রথমে তিনি একটা কাঁধ বাড়িয়ে সেদিকে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যেতেন।

'এই যে ভিনসেন্ট, এই দেখ একটা পেন্টিং বক্স। এতে ওয়াটার কালার, প্যালিট, প্যালিট নাইফ, তেল ও তার্পিন রয়েছে। প্যালিট হাতে নিয়ে ইজেলের সামনে কি করে দাঁড়াতে হয় এসো তা দেখিয়ে দি।'

তিনি ভিনসেন্টকে ছবি আঁকার কতকগুলো সাধারণ টেকনিক দেখিয়ে দিলেন। ভিনসেন্ট সবটাই বেশ তাড়াতাড়ি শিখে নিল।

'চমৎকার!' মভ বললেন, 'আমি তোমাকে বোকা বলে মনে করতাম, এখন দেখছি তা নয়। তুমি ভোরবেলা এখানে এসে ওয়াটার কালারে কাজ করতে পার। তুমি Pulchri তে যাতে বিশেষ সদস্য হতে পার সেজন্য আমি তোমার নাম উত্থাপন করব। সেখানকার মডেল থেকে তুমি সপ্তাহের কয়েক সন্ধ্যা ছবি আঁকতে পারবে। তারপর তোমার ছবি বিক্রি আরম্ভ হলে তুমি নিয়মিত সদস্যই হতে পারবে।'

'হ্যাঁ, আমি মডেল সামনে রেখে কাজ করতেই চাই। প্রত্যেক দিনের জন্যে একজন মডেল নিযুক্ত করব ভাবছি। কোনরকমে একবার মনুষ্যমূর্তি আঁকার হাত এলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে।'

'ঠিকই বলেছ।' মভ স্বীকার করলেন। 'মানুষের ছবি আঁকা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার, তবে ওতে একবার হাত এসে গেলে গাছ, গরু আর সূর্যাস্তের ছবি সহজ হয়ে যাবে। মনুষ্যমূর্তি যারা আঁকে না, তারা পারে না বলেই আঁকে না।'

ভিনসেন্ট সেদিনই বিছানা কিনল, জানালার জন্য ঝালর আনল, বাড়িভাড়া শোধ করে দিল এবং ব্রাবান্টের স্কেচগুলো দেওয়ালে টাঙিয়ে দিল। ওগুলো যে বিক্রি হবে না সে তা জানত এবং ওগুলোর দোষত্রুটিও সহজেই চোখে পড়ল। তবু ওগুলোর মধ্যে প্রকৃতির কিছুটা ছাপ ছিল। একটা ভাবাবেগ এ পরিচালিত হয়েই ওগুলো তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ আবেগটা কোথায় ফুটে উঠেছে বা কি করেই বা তা এসেছে একথা সে বলতে পারবে না। ডি বকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পূর্বে এর পূর্ণমূল্য উপলব্ধি করার মত ক্ষমতাও তার ছিল না।

চমৎকার লোক ডি বক। ছাত্র হিসাবেও তিনি ভাল। তাঁর ব্যবহার সুন্দর। স্থায়ী উপার্জনও ছিল তাঁর। ইংলন্ডে তিনি শিক্ষালাভ করেন। গুপিলে ভিনসেন্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সব দিক দিয়েই ডি বক ছিলেন ভিনসেন্টের উল্টো। তিনি জীবনটাকে আকস্মিক বলে মনে করতেন। কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত বা উত্তেজিত করতে পারত না। তাঁর গঠন ছিল সুন্দর। তাঁর মুখবিবর ঠিক নাসারন্ধ্রের মতই ছিল প্রশস্ত।

'চল না আমার সঙ্গে চা খাবে।' সে ভিনসেন্টকে বলল। 'সম্প্রতি আমি যে সব ছবি এঁকেছি তা তোমাকে দেখাতে চাই। টারস্টিগ আমার ছবি বিক্রি করতে আরম্ভ করার পর তাতে একটা নতুন ছাপ পড়েছে বলে আমার মনে হয়।'

হেগের অভিজাতপল্লী উইলেমস্পার্কে ডি বকের স্টুডিয়োটি অবস্থিত। সে ঘরের দেওয়ালকে অনুজ্জ্বল রঙের কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়েছে। ঘরের প্রত্যেকটি কোণে সুদৃশ্য কুশন-চেয়ার সুসজ্জিত ছিল। ধূমপানের টেবিল, বইয়ে-ঠাসা বুক-কেস এবং প্রাচ্যদেশীয় কম্বলে ঘরটা পরিপূর্ণ ছিল। নিজের স্টুডিয়োর কথা মনে পড়তেই ভিনসেন্টের নিজেকে কেমন ছন্নছাড়া মনে হলো।

ডি বক গ্যাস জ্বেলে স্যামোভার বসাল এবং গৃহরক্ষিকাকে কিছু পিষ্টক আনতে বলল। তারপর নির্জন কক্ষ থেকে একটা ক্যানভাস বের করে তা ইজেলে আঁটল।

'ঐ হচ্ছে আমার সর্বশেষ ছবি,' সে বলল। 'ছবিটা দেখতে দেখতে একটা সিগার টানবে নাকি? চাই কি তাতে ছবিটা খুলেও যেতে পারে।'

ডি বক পরিহাস তরল কণ্ঠে কথা বলছিল। টারস্টিগ ওর ছবি বিক্রি করতে আরম্ভ করার পর থেকে ওর আত্মবিশ্বাস সীমাহীন হয়ে উঠেছে। ছবিটা যে ভিনসেন্টের ভাল লাগবে, তা ও জানত। একটা লম্বা রাশিয়ান সিগারেট বের করে সে টানতে লাগল এবং ভিনসেন্টের মন্তব্যের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ডি বকের দামী সিগারেটের নীল রঙের ধোঁয়ার মধ্যদিয়ে ভিনসেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছবিটি দেখতে লাগল। কোন আর্টিস্ট যখন তার প্রথম সৃষ্টি কোন নবাগতের কাছে সর্বপ্রথম খুলে ধরে, তখন তার মধ্যে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়, ডি বকের ব্যবহারেও তা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, ভিনসেন্ট তা বুঝতে পারছিল। কি মন্তব্য করবে ও? ল্যান্ডস্কেপটা খারাপ হয় নি, তবে ভালও হয় নি। এটার সঙ্গে ডি

বকের চরিত্রের যেন সৌসাদৃশ্য রয়েছে, সে হচ্ছে ওর আকস্মিকতা। ছবিটাকে এক পলকে দেখে নেয়া গেলেও সে ভাল করে দেখতে লাগল।

ল্যান্ডস্কেপের প্রতি তোমার একটা মমত্ববোধ আছে দেখছি ডি বক। ওকে মনোরম করবার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করে নিয়েছ নিশ্চয়।'

'ধন্যবাদ,' ভিনসেন্টের মন্তব্যকে প্রশংসা মনে করে খুশি হয়ে ডি বক বলল, 'এক কাপ চা খাবে নাকি?'

ভিনসেন্ট দু'হাত দিয়ে চায়ের কাপটা ধরল, ভয় পাচ্ছে চা পড়ে দামী কম্বল নষ্ট হয়ে যায়। ডি বক নিজের জন্যও এক কাপ চা নিয়ে এল। ডি বকের অঙ্কনের বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করবে না বলেই ভিনসেন্ট ঠিক করেছিল, কারণ তাকে ওর ভাল লাগত। তাছাড়া ওর বন্ধুত্ব কাম্য ছিল ভিনসেন্টের। কিন্তু ওর ভিতরের শিল্পীটি জেগে উঠতেই সে আর সমালোচনা না করে পারল না।

'এই ছবিটার একটা জিনিস আমি পছন্দ করতে পারছি না।'

ডি বক বাড়িওয়ালীর হাত থেকে ট্রে-টা নিয়ে বলল, 'একটা কেক নাও।'

ভিনসেন্ট অসম্মত হলো। দু'হাতে কাপ সামলাবার সঙ্গে সঙ্গে কি করে যে কেক খাবে ভিনসেন্ট তা বুঝে উঠতে পারছিল না।

'হুঁম, কি পছন্দ করতে পারছ না বল হে,' ডি বক লঘুভাবে বলল।

'মানুষের চেহারা। ওগুলো ঠিক হয় নি বোধ হয়।'

একটা আরামপ্রদ কুশনে গা এলিয়ে দিয়ে ডি বক বলতে লাগল, 'তুমি তো জানই যে, সর্বদাই আমি মানুষের চেহারা আঁকতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারি নি। হয়ত কোন মডেল ধরে আঁকতে শুরু করলাম। কিন্তু দু'একদিন না যেতেই ওটা ছেড়ে কোন ল্যান্ডস্কেপ বা অন্য কিছু আঁকতে শুরু করে দিতাম। যা হোক, ল্যান্ডস্কেপই যে আমার হাতে আসে ভাল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সুতরাং মানুষের চেহারা সম্পর্কে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। কোন ত্রুটি আছে বলে কি তোমার মনে হয়?'

'আমি ল্যান্ডস্কেপ আঁকলেও তাতে দু'একটি মানুষের চেহারা দিতে চেষ্ট করি,' ভিনসেন্ট বলতে লাগল। 'আমার চিত্রাঙ্কনের চেয়ে তোমার কাজ অনেক ভাল, তারপর তুমি চিত্রশিল্পী হিসাবে স্বীকৃতিও লাভ করেছ। তবু বন্ধুভাবে কিছু সমালোচনা করতে নিশ্চয় অনুমতি দেবে।'

'খুব খুশি মনে।'

'তাহলে বলব তোমার অঙ্কনে প্যাশনের অভাব রয়েছে।'

'প্যাশন!' চোখ ঘুরিয়ে ডি বক জিজ্ঞাসা করল। প্যাশন তো অনেক কম, কোনটার কথা বলছ তুমি?

'তা বুঝিয়ে বলা অবশ্য দুষ্কর। কিন্তু তোমার অনুভূতি কেমন যেন অস্পষ্ট। আমার মতে ঐ অনুভূতি আরও একটু গভীর হওয়া উচিত।'

'ভালই বলেছ,' ডি বক উঠে একটি চিত্রাঙ্কনের কাছে দাঁড়িয়ে বলল। 'লোকে বললেই আর আমি এই ছবিটায় কোন অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে পারি না। পারি নাকি হে? আমি যা দেখি আর অনুভব করি তাই আঁকি। আমি যদি কোন প্যাশন অনুভব না করি,

তাহলে কি করে তা তুলির মুখে আনব। প্যাশন তো আর পয়সা দিয়ে মুদির দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। যায় নাকি যে ইচ্ছামত ব্যবহার করব?'

ডি বকের স্টুডিয়ো দেখার পর ভিনসেন্টের স্টুডিয়ো তার নিজের কাছে কেমন নিকৃষ্ট মনে হতে লাগল, কিন্তু সে জানত যে, কঠোর-ব্রতীত্বে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। সে ঘরে এসে বিছানাটা এক কোণে সরিয়ে রাখল। রান্নার সরঞ্জাম ঢেকে রাখল। ঘরটাকে সে চিত্রশিল্পীর স্টুডিয়ো করে তুলতে চায়, থাকার আস্তানা নয়। মাসের খরচ বাবদ থিওর টাকা তখনও এসে পৌঁছায় নি। মভের কাছে যে ঋণ নিয়েছিল, তার এখনও অবশিষ্ট ছিল। ও টাকাটা দিয়ে সে কয়েকজন মডেল ভাড়া করল। কয়েকদিন পর মভ তার স্টুডিয়ো দেখতে এলেন।

'দশ মিনিটেই তোমার এখানে পৌঁছে গেছি,' চারিদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'বেশ সাজিয়েছ; হ্যাঁ এতেই চলবে। উত্তর দিকের আলোরও দরকার ছিল। তবে আপাতত এতেই চলে যাবে। যাঁরা তোমাকে অলস আর সৌখিন শিল্পী বলে সন্দেহ করত, এবার তাদের ভুল ভাঙবে। আজ দেখছি মডেল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলে।'

'হ্যাঁ প্রত্যেকদিনই মডেল নিয়ে কাজ করি। তবে এতে বড় খরচ।'

'তবে ভবিষ্যতে অল্প খরচ হবে। তা তোমার কি পয়সাকড়ি হাতে নেই নাকি ভিনসেন্ট?'

'ধন্যবাদ কাজিন মভ। এখন আমার চলে যাবে।'

'মভের উপর টাকাপয়সার দিক দিয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ান ভিনসেন্টের যুক্তিযুক্ত মনে হল না। তার পকেটে তখনও এক ফ্র্যাঙ্ক ছিল, এতে একদিন খাওয়া চলে যাবে। টাকাটা এমন জরুরি কিছু নয়। মভ তাকে নিয়মিতভাবে উপদেশ দিয়ে যায়, তাই সে চায়।

মভ ঘন্টাখানেক থেকে কি করে মোটামুটি চিত্র আঁকা যায় এবং কি করেই বা তা ধুয়ে ফেলা যায়, তা দেখিয়ে দিতে লাগলেন। ভিনসেন্ট অবশ্য অনেক কিছু গুলিয়ে ফেলল।

'এতে ঘাবড়িওনা,' হেসে মভ বললেন। 'তুমি ভাল করে ধরতে হলে অন্তত দশটা ছবি তোমাকে নষ্ট করতে হবে। তোমার সর্বশেষ ব্রাবান্ট স্কেচের কয়েকটা দেখাও দেখি।

ভিনসেন্ট ওগুলো বের করল।

ছবির টেকনিক সম্পর্কে মভের এত ভাল জ্ঞান ছিল যে, যে কোন ছবির দুর্বলতা কি, তা তিনি অল্প কয়েকটি কথাতেই প্রকাশ করে বলতে পারতেন। তিনি কখনও বলতেন না, 'এটা ভুল হয়েছে।' তিনি বরঞ্চ বলতেন 'এভাবে আঁক তবেই হবে।' ভিনসেন্ট গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল, কারণ সে জানত যে, নিজের ভুলের জন্য মভ যেভাবে সমালোচনা করতেন, ঠিক তেমনভাবেই ভিনসেন্টের সমালোচনা করবেন।

'তুমি আঁকতে আরম্ভ করতে পার,' মভ বললেন। পেন্সিলের কাজগুলো তোমার হাত পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে খুবই। খুব শীঘ্র যদি টারস্টিগ তোমার ওয়াটার কালার ছবি কেনে, তাহলেও আমি আশ্চর্যান্বিত হব না।'

দু'দিন পরে ভিনসেন্টের পকেটে যখন একটি সেন্টও ছিল না, তখন মভের ঐ আশ্বাসবাণী তার কাছে পরম উদ্দীপনার কাজ করল। মাসের কয়েকটা দিন কেটে গেছে, কিন্তু তখনও থিওর কাছ থেকে টাকা এসে পৌঁছায় নি। ব্যাপার কি? থিও কি আমার উপর রাগ করেছে? সে যখন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে কি থিও হাত গুটিয়ে নেবে? পকেটে একটা স্ট্যাম্প ছিল, তাই দিয়েই সে ভাইকে একটা চিঠি লিখে দিল। সে যাতে খেতে পারে এবং মডেল ভাড়া করতে পারে, সেজন্য অন্তত অর্ধেক টাকা পাঠাবার জন্য ভাইকে অনুরোধ জানাল।

তিনদিন ভিনসেন্টের অনাহারে কাটল। এই তিনদিন ধরে সে ভোরে মভের বাড়িতে জলরঙ নিয়ে রান্নাঘর স্কেচ করে, দুপুরে তৃতীয় শ্রেণির বিশ্রামাগার এঁকে এবং রাতে হয় Pulchri তে অথবা মভের বাড়িতে কাজ করে কাটাল। মভ তার অবস্থা জেনে ফেলে অসন্তুষ্ট হবে এই ভয় ভিনসেন্টকে পেয়ে বসল। এ'ও সে বুঝতে পারল যে, যদিও মভ তাকে ভালবাসছেন কিন্তু যদি ভিনসেন্টের কোন বিপত্তি তার পেন্টিং-এর পথে কিছু বিঘ্ন ঘটায় তবে তিনি তাকে দূরে ঠেলে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবেন না। এসব ভেবে তাই ভিনসেন্ট জেটের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল।

পাকস্থলীর সেই ব্যথাটা উঠতেই তার মনটা ফিরে গেল বোরিনেজ-এ। বুভুক্ষা কি তার চিরজীবন সাথী হবে? সে কি কোথাও বিন্দুমাত্র শান্তি বা আরাম পাবে না?

পরের দিন স্বীয় গর্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভিনসেন্ট টারস্টিগের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হেগের প্রায় অর্ধেক পেইন্টারকে যিনি সাহায্য করেছেন তার কাছ থেকে সে নিশ্চয় দশ ফ্রাঙ্ক ধার আনতে পারবে।

টারস্টিগ কোন কাজে তখন প্যারিস চলে গিয়েছিলেন।

ভিনসেন্টের জ্বর হল। তার পক্ষে পেন্সিল ধরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে সে শয্যা নিল। পরের দিন কোনভাবে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে সে প্লাৎসে গিয়ে উপস্থিত হল। মালিক ভিতরেই ছিলেন। টারস্টিগ থিওকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভিনসেন্টের প্রতি তিনি নজর দেবেন। তিনি তাকে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক ধার দিলেন।

'আমি অনেকদিন ধরেই তোমার স্টুডিয়ো দেখতে যাব ভাবছিলাম ভিনসেন্ট' তিনি বললেন, 'শীঘ্রই একদিন যাব আমি।'

'খুব বিনীতভাবে মাথা নাড়া ছাড়া কিছু করার শক্তি ভিনসেন্টের ছিল না। এখন তার তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়ার দরকার গুপিলদের কাছে যাবার পথে সে ভাবছিল, 'কয়েকটা টাকা পেলেই আমি সম্পূর্ণ সেরে উঠতাম।' কিন্তু এখন টাকা পেয়ে সে ভয়ানক অসহায় অনুভব করতে লাগল। তার নিজেকে একান্তভাবে নিঃসহায় নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

'খেলেই সব সেরে যাবে,' সে নিজে নিজে বলল।

খাওয়ার পর পেটের ব্যথা অবশ্য সেরে গেল কিন্তু, অন্তরে যে নিঃসঙ্গতার ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছিল তা দূর হল না। সস্তা দরের কিছু তামাক খরিদ করে সে বাড়ি ফিরে এল এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাইপ টানতে লাগল। কে' কে পাবার আকাঙ্ক্ষা আবার তীব্র হয়ে দেখা দিল। এমন খারাপ লাগতে লাগল যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে। সে লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে পড়ল এবং জানলা গলিয়ে মাথাটা বের করে দিল বরফ

আচ্ছাদিত রাত্রির অন্ধকারে। রেভারেন্ড স্ট্রিকারের কথা তার মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তার শিউরে উঠল–মনে হল চার্চের ঠাণ্ডা দেওয়াল থেকে যেন সে ভয়ানকভাবে ঝুঁকে পড়ছে সম্মুখপানে। সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর কোট আর টুপি নিয়ে রিম স্টেশনের কাছে যে মদের কাফেটা দেখে এসেছে তার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

২.

পানাগারের প্রবেশ পথে এবং মদ্যপানকক্ষে একটি করে তেলের বাতি ঝোলানো ছিল। ফলে দোকানের মধ্যটা প্রায় অন্ধকার। দেয়ালের গায়ে লাগান কতকগুলো বেঞ্চ পাতা ছিল। বেঞ্চগুলোর উপর নানা ধরনের ছবি আঁকা এবং বেঞ্চের সামনে পাথরের টেবিল সাজান। দোকানটা ছিল দিনমজুরদের পানশালা। একে আনন্দের স্থানের পরিবর্তে বলা যায় আত্মগোপনের জায়গা।

ভিনসেন্ট এসে একটি টেবিলে বসে পড়ল। বসেই ক্লান্তভাবে দেয়ালে পিঠ এলিয়ে দিল। কাজ যখন করে তখন তার খুব খারাপ লাগে না আর খাদ্য কেনার মত এবং মডেল ভাড়া করার মত পয়সা থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু একটু বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ, একটু গল্পসল্প করার জন্য এখন সে কার সাহচর্য পেতে পারে? মভ তার গুরু, টারস্টিগ হচ্ছেন ব্যস্ত লোক আর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ডি বক সমাজের ধনী ব্যক্তি। এঁদের সাহচর্য তো সে পাবে না। এক গ্লাস মদ খেলে হয়ত আজকের জড়তা কেটে যাবে। আবার কাল সে কাজ করতে পারবে, অবস্থার পরিবর্তন হবে।

সে ধীরে ধীরে রক্তিমবর্ণ তিক্ত মদে চুমুক দিতে লাগল। পানশালায় তখন আরও কয়েকজন লোক ছিল। ঠিক তার উল্টো দিকে শ্রমিক শ্রেণির একটি লোক বসেছিল। পানশালার এক প্রান্তে এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ বসেছিল। স্ত্রী লোকটির পোষাক ছিল জাঁকালো। তার পাশের টেবিলে একাকী একটি নারী বসেছিল। ভিনসেন্ট ওর দিকে না তাকিয়েই মদ পান করতে লাগল।

বয় এসে রুক্ষ কণ্ঠে স্ত্রী লোকটিকে বলল, 'আরও মদ চাই?'

'কিন্তু একটি সূ'র বেশী যে কিছু নেই আমার কাছে', স্ত্রীলোকটি জবাব দিল।

শুনে ভিনসেন্ট ফিরে তাকাল। 'আমার সঙ্গে বসে মদ পান করতে আপনার আপত্তি আছে?' সে জিজ্ঞাসা করল।

স্ত্রীলোকটি ক্ষণিকের জন্যে তার দিকে তাকাল। 'কোন আপত্তি নেই।'

ওয়েটার মদের গ্লাস এনে কুড়ি সেন্ট নিয়ে চলে গেল। ওদের টেবিল দুটো লাগালাগিই ছিল।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' স্ত্রী লোকটি বলল।

ভিনসেন্ট ভাল করে ওকে দেখতে লাগল। মেয়েটির তারুণ্য ঝরে গেছে, দেখতেও তেমন সুন্দর নয়। একহারা চেহারা হলেও গঠন ভাল। হাত দিয়ে গ্লাস তুলে ধরলে ভিনসেন্ট নজর দিয়ে ওর হাত দেখতে লাগল। কে'র হাতের মত তা মোটেই সুন্দর নয় বরঞ্চ শ্রমিকের হাতের মত রুক্ষ। এই আধা আলোতে ওর চেহারা দেখে ভিনসেন্টের মনে পড়ে গেল চারডিন বা জ্যান স্টীনের আঁকা অদ্ভুত মূর্তিগুলোর কথা। নাকটা ওর

বাঁকানো, মাঝখানটা উঁচু। ওপরের ওষ্ঠে গোঁফের রেখা দেখা যায়। চোখদুটি বিষাদ জড়ানো হলেও ওতে যে জীবনের ছাপ ছিল না তা নয়।

'তোমার সাহচার্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, সুতরাং আমাকে অযথাই ধন্যবাদ দিচ্ছ' ।ভিনসেন্ট বলল।

'আমার নাম হচ্ছে ক্রিস্টিন', স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আপনি কি হেগেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি করেন?'

'আমি চিত্রকর।'

'ও, বড়ই শোচনীয় জীবন এটা, তাই না?'

'কখনও কখনও।'

'আমি লন্ড্রিতে কাজ করি। যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি থাকে ততক্ষণ এই কাজই করি। কিন্তু সবসময় করি না।'

'তবে কি কর?'

'গণিকাবৃত্তি। এ পেশা আমার অনেকদিনের, কাজ করবার অনুপযুক্ত হলেই ঐ বৃত্তিতে ফিরে যাই।'

'লন্ড্রির কাজ কি খুব পরিশ্রমসাধ্য?'

'হ্যাঁ, ওরা আমাদের প্রায় বারো ঘণ্টা খাটায়। অথচ দেয় না প্রায় কিছুই। কখনও কখনও সারাদিন কাজ করার পরও ছেলেমেয়েদের খাবার কিনবার জন্যে কোন লোকের সঙ্গে যেতে হয়।'

'তোমার ছেলেমেয়ে কটি, ক্রিস্টিনা?'

'পাঁচটি। আরও একজন হবে।'

'তোমার স্বামী কি মৃত?'

'সব কয়টি ছেলেমেয়েই আমি পরপুরুষকে সেবা করে পেয়েছি।'

'তাতেই এত অসুবিধা, না?'

স্ত্রীলোকটি কাঁধটা তুলে একটু ঝাঁকুনি দিল। 'মৃত্যু ভয় আছে বলে খনির শ্রমিকেরা নিচে নামতে অস্বীকার করতে পারে নাকি?'

'তা পারে না। আচ্ছা, ছেলেমেয়েদের একজনও কার ঔরসজাত তা বলতে পার না?'

'না, অনেকের নামই আমি জানি না।'

'পেটে যেটি আছে সে কার ছেলে?'

'ঠিক করে বলতে পারি না। তখন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম তাই অনেকবারই রাস্তায় বেরুতে হয়েছে। যাকগে ও ব্যাপার।'

'আর এক গ্লাস মদ খাবে?'

'খাব।' বলে সে তার পার্স থেকে একটি চুরুটের শেষাংশ বের করে ধরাল। 'তোমার অবস্থাও তো বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। তোমার ছবি কি বিক্রি হচ্ছে?'

'না। আমি সবেমাত্র আঁকতে শুরু করেছি।'

'কিন্তু তোমার বয়স তো বেশ হয়েছে মনে হয়।'

'আমি ত্রিশে পড়েছি।'

'কিন্তু দেখতে চল্লিশের মতন দেখায়। এখন তোমার চলে কি করে?'

'আমার ভাই আমাকে কিছু টাকা পাঠায়।'

'এও দেখছি লন্ড্রির কাজের মতই অবস্থা।'

'তুমি কার সঙ্গে থাক ক্রিস্টিনা?'

'সবাই মার সঙ্গে থাকি।'

'তুমি যে গণিকাবৃত্তি কর তোমার মা কি তা জানেন?'

এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি উচ্চকন্ঠে হেসে উঠল কিন্তু এ হাসিতে কোন প্রাণ ছিল না।

'নিশ্চয় জানেন। মা-ই তো আমাকে এ কাজে পাঠান। তিনি নিজেও জীবনভোর এ কাজ করেছেন এবং এ ভাবেই আমাকে ও আমার ভাইকে পেয়েছেন।'

'তোমার ভাই কি করে?'

'বাড়িতে তার একটি মেয়ে লোক আছে, সে তারই ভেড়ুয়াগিরি করে।'

'তোমার ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ দৃষ্টান্ত ভাল নয়।'

'খারাপই বা কি? তারাও তো একদিন এ কাজই করবে।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!'

'এর বিরুদ্ধে কিছু বলেও লাভ নেই। যাক আর এক গ্লাস মদ পান করতে পারি? আরে তোমার হাতে এই কালো দাগটা কিসের? কি হয়েছিল?

'পুড়িয়েছিলাম।'

'নিশ্চয় খুব জ্বালা করেছিল।' বলে ও ভিনসেন্টের হাতটা আলতোভাবে তুলে নিল।

'না, ক্রিস্টিনা। আমি নিজে ইচ্ছা করেই পুড়িয়েছিলাম।'

ক্রিস্টিনা তার হাত নামিয়ে রাখল। 'তুমি একা এখানে আস কেন। তোমার কি কোন বন্ধু নাই?'

'না। আমার এক ভাই আছে, সে এখন প্যারিসে থাকে।'

'তোমার তো নিশ্চয় খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়, না?'

'হ্যাঁ মারাত্মক রকম।'

'আমারও হয়, বাড়িতে মা, ভাই আর ছেলেমেয়েরা থাকে। আর এদিকে বাইরে বাইরে আমি মানুষের সেবা করে বেড়াই। যাকগে, বাড়িতে ত তুমি একাই থাক, না? অবশ্য যে কোন লোক থাকলেই চলে না। যাকে তুমি সত্যি ভালবাস তাকেই তোমার চাই নিশ্চয়।'

'জীবনে কারো কি তোমার ভাল লাগেনি ক্রিস্টিনা?'

'আমার জীবনে প্রথম যে পুরুষ এসেছিল তাকে আমার ভাল লেগেছিল। তখন আমার বয়স ষোল। ধনীর সন্তান ছিল সে তাই আমাকে বিয়ে করতে পারে নি। কিন্তু তার ঔরসজাত সন্তানের জন্য টাকা দিয়েছে নিয়মিত। একদিন হঠাৎ তার মৃত্যুতে আমি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ি।'

'তোমার বয়স কত?'

'বত্রিশ, ছেলেমেয়ে হবার বয়স পেরিয়ে গেছে। ফ্রি ওয়ার্ডের ডাক্তার বলেছেন যে, আবার সন্তান হতেই আমার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।'

'উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা হলে তা হবার সম্ভাবনা নেই।'

'টাকা পাব কোথায়? আমার তো এক পয়সাও সঞ্চয় নেই। পয়সা না থাকলে ফ্রি ওয়ার্ডের ডাক্তাররাও গ্রাহ্য করে না। অনেক পীড়িত মেয়েমানুষকে তাঁদের দেখতে হয়।'

'অল্প কিছু টাকাও সংগ্রহ করতে পার না?'

'তা পারি। কয়েক মাস যদি সারারাত রাস্তায় থাকি তবে অবশ্য কিছু রোজগার হবে। কিন্তু তাতে মৃত্যু শুধু ত্বরান্বিতই হবে।'

কয়েক মিনিট তারা স্তব্ধ হয়ে রইল।

'এখান থেকে কোথায় যাবে তুমি?'

'সারাদিন আমি কাপড় কেচে মরতে বসেছিলাম; তাই এসেছি এক গ্লাস মদ পান করতে। আমাকে সপ্তাহে দেড় ফ্রাঙ্ক করে দেবার কথা; কিন্তু শনিবারের আগে তো পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমাকে খাওয়াদাওয়ার জন্য দুই ফ্রাঙ্ক করে ব্যয় করতে হয়। আবার কারও কাছে দেহ বিক্রয়ের আগে একটু বিশ্রাম নেব ভেবেছিলাম।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে ক্রিস্টিনা? আমি একান্তভাবে সঙ্গীহীন। আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।'

'চল তুমি থাকলে আমার অনেক বিপদ কমে যাবে। তাছাড়া চমৎকার লোক তুমি।'

'তোমাকেও আমার ভাল লেগেছে ক্রিস্টিনা। তুমি আমার পোড়া হাতটা তুলে যখন সস্নেহে কথা বললে তখন মনে হল এমন মিষ্টি করে কোন মেয়ে আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি।'

'সত্যি! কিন্তু তুমি দেখতে তো মন্দ নও। তোমার ব্যবহারও ভাল।'

'কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে আমি নিতান্তই মন্দভাগ্য।'

'ও তার জন্যই হাত পুড়িয়েছ বুঝি? আর এক গ্লাস মদ পান করব?'

'দেখ, পরস্পরের জন্য অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে আর আমাদের মদ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ বাড়তি যা পয়সা আছে, দিচ্ছি নিয়ে যাও। অবশ্য বিশেষ কিছু দিতে পারব না বলে আমি দুঃখিত।'

'দেখে মনে হচ্ছে আমার চেয়েও তোমার পয়সার প্রয়োজন বেশি। ও পয়সা থাক। তুমি চলে গেলে আমি কাউকে পাকড়ে দুটো ফ্রাঙ্ক যোগাড় করতে পারব।'

'তার দরকার নেই। এ আমি তোমাকে দিতে পারব। নিয়ে যাও টাকাটা। আমি আজ এক বন্ধুর কাছ থেকে ২৫ ফ্রাঙ্ক কর্জ করেছি।

'বেশ। চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

অতি পরিচিত বন্ধুর মত স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে বলতে অন্ধকার পথ ধরে তারা বাড়ির দিকে রওনা হল। কোন কিছু গোপন না করে, কোন কিছু অভিযোগ না জানিয়ে ক্রিস্টিনা আপন জীবনকাহিনী বলতে লাগল।

'তুমি কি কখনো মডেল হিসাবে দাঁড়িয়েছ?'

'হ্যাঁ যৌবনে দাঁড়িয়েছি।'

'তবে আমার ওখানে চল না কেন? আমি অবশ্য বেশি পয়সা দিতে পারব না। এখন দৈনিক এক ফ্রাঙ্ক দেওয়াও আমার পক্ষে কষ্টকর। তবে আমার ছবি বিক্রি হতে আরম্ভ করলে দৈনিক দু ফ্রাঙ্ক করে দেব। কাপড় কাচার চেয়ে এ কাজ ভালই হবে।'

'হ্যাঁ তা ভালই হবে। তুমি বললে আমার ছেলেকেও নিয়ে আসতে পারি। ওকে দেখেও তুমি ছবি আঁকতে পার অবশ্য সেজন্য পয়সা দিতে হবে না। তারপর আমার বদলে আমার মাকেও মডেল করতে পার। মাঝে মাঝে উপরি উপার্জন হলে সে খুশিই হবে। সে এখন ঠিকা ঝি-গিরি করে।'

অবশেষে তারা ক্রিস্টিনার বাড়ি এসে পৌছল। বাড়িটা একতলা ওর সামনে একটা চত্বর রয়েছে।

'আমার ঘরটা সম্মুখে, সুতরাং কারুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।' ক্রিস্টিনা বলল।

ক্রিস্টিনার কক্ষটি বাহুল্য বর্জিত অতি সাধারণ। দেওয়ালে লাগানো অচিত্রিত কাগজের ফলে কক্ষটি যেমন ধূসরাভ দেখাচ্ছিল—তাতে এটাকে চার্ডিনের আঁকা ছবি বলে ভিনসেন্টের মনে হচ্ছিল। কাঠের মেঝেতে একটি মাদুর পাতা এবং দোরগোড়ায় একটুকরো নীলাভ লাল রঙের কার্পেট পাতা ছিল। কোণে রান্নার জন্যে অতি সাধারণ একটি চুল্লি, অপর কোণে একটি দেরাজ এবং ঘরের মাঝখানে একটি বড় বিছানা ছিল। শ্রমিক নারীদের ঘরের ভিতরটা যেমন থাকে এটাও ঠিক তাই।

প্রাতে ঘুম ভাঙতেই ভিনসেন্ট বুঝল যে সে আর একাকী নয়, তার পাশেই রয়েছে অপর একটি প্রাণী। দেখে জগৎকে যেন তার অতি আপনার মনে হল। তার সমস্ত বেদনা, সমস্ত নিঃসঙ্গতা ঝরে পড়ে সেখানে একটা পরম শান্তি বিরাজ করতে লাগল।

ভিনসেন্ট ভোরের ডাকে থিওর প্রেরিত একখানা চিঠি ও একশত ফ্রাঙ্কের একখানা নোট পেয়ে গেল। পয়লা তারিখের কয়েকদিন পরে থিও টাকাটা পাঠিয়েছে। টাকা পেয়েই ভিনসেন্ট ছুটে বাইরে গেল। কিছু দূরে একটি বৃদ্ধা তার বাড়ির সম্মুখে বাগানে মাটি কোপাচ্ছিল। পঞ্চাশ সেন্ট পেলে সে 'পোজ' দিতে রাজি আছে কিনা ভিনসেন্ট তা জানতে চাইল। বৃদ্ধা সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

ভিনসেন্ট বৃদ্ধাকে স্টুডিয়োতে এনে চুল্লির পাশে বসিয়ে দিল। ওর আর এক পাশে রইল স্টোভের উপর বসান ছোট্ট একটা কেট্‌লি। পশ্চাদভূমি কেমন যেন ঝিমানো হলো। তবু ভিনসেন্ট বর্ণ-সামঞ্জস্য করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। সে তিন-চতুর্থাংশ জলরঙ গ্রীন সোপ পদ্ধতিতে তৈরি করল। যে কোণে বৃদ্ধা বসেছিল, তাকে সে বেশ কোমল ও নরম ভাবে আর অনুভূতি দিয়ে আঁকতে লাগল। প্রথম দিকে তার কাজ কেমন যেন কঠিন, শুষ্ক ও ভঙ্গুর বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমেই তা স্বচ্ছন্দ গতি পেল। বারে বারে চেষ্টা করে সে ছবিতে পরিষ্কারভাবেই আপন বক্তব্য ফুটিয়ে তুলল। ক্রিস্টিনা তাকে যা দিয়েছে, তার জন্য সে কৃতজ্ঞ। জীবনে ভালবাসতে না পারলে হয়ত তাকে

অফুরন্ত বেদনায় কষ্ট পেতে হত, কিন্তু তা তার জীবনের ক্ষতি করতে পারত না, অপর দিকে যৌনানুভূতি না থাকলে তার শিল্প প্রেরণার উৎস বন্ধ হয়ে তাকে হত্যা করত।

'যৌনানুভূতি জীবনের পথকে মসৃণ করে তোলে'....বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দ গতিতে কাজ করতে করতে ভিনসেন্ট আপন মনে বলল 'পাপা মিচেলেট একথাটা কেন যে উল্লেখ করেননি, তা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি।'

দোরে কে ধাক্কা দিল। ভিনসেন্ট দোর খুলতেই মিন্‌জের টারস্টিগ এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ডোরা কাটা ট্রাউজার খুব কড়া করে ভাঁজ করা হয়েছিল। গোলাকৃতি ব্রাউন জুতো জোড়া আয়নার মত চক্‌চক্ করছিল। তাঁর দাড়ি বেশ যত্ন নিয়ে কাটা হয়েছিল, চুলগুলো পরিপাটি করে একপাশে আঁচড়ান এবং কলার ছিল দুধের মত শাদা।

ভিনসেন্টের সত্যিকারের একটি স্টুডিয়ো আছে এবং সে সেখানে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেখে টারস্টিগ সত্যি আনন্দিত হলেন। নবীন আর্টিস্টরা সাফল্যলাভ করে তিনি তাই চান—এটা হচ্ছে তাঁর সখ এবং পেশা। তবে ঐ সাফল্য একটা নিয়মানুগ এবং পূর্ব নির্ধারিত পথে আসুক তাই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা। প্রচলিত আইন-বিরুদ্ধভাবে চলে সাফল্যলাভ করার চেয়ে আইন নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে বিফল হওয়াকেও তিনি কাম্যতর মনে করতেন। তাঁর কাছে জয়ের চেয়ে খেলার নিয়মকানুন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। টারস্টিগ খুবই ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি, সবাই তেমনি হোক তাই তিনি চাইতেন। ভাল মন্দ হতে পারে বা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, এমন কোন অবস্থার কথাই তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে না উঠতে পারলে যে গুপিলদের কাছে ছবি বিক্রয় করা যাবে না, পেইন্টাররা তা জানতেন। ভদ্রতাসম্মত রীতিনীতি লঙ্ঘন করলে টারস্টিগ কোন ছবিই নিতে চাইতেন না—তা সে তার সর্বোৎকৃষ্ট ছবি হলেও না।

'তোমাকে কাজ করতে দেখে আমি সত্যি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি, ভিনসেন্ট', তিনি বললেন, 'আমার আর্টিস্টদের আমি এমনিই দেখতে চাই।'

'এতদূর থেকে যে আমাকে দেখতে এসেছেন, এ আপনার অসীম দয়া মিন্‌জের টারস্টিগ।'

'মোটেই না। তুমি এখানে চলে আসার পর থেকেই তোমার স্টুডিয়ো দেখার কথা আমি ভাবছিলাম।'

বিছানা টেবিল চেয়ার, স্টোভ এবং ইজেলের উপর ভিনসেন্ট একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

'এখানে দেখার বিশেষ কিছুই নেই।'

'তাতে কি। কাজে লেগে থাকলে দেখাবার মত জিনিস আসতে বিলম্ব হবে না। মভ বলছিলেন, তুমি নাকি জল-রঙ দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছ। তা ভালোই। ওসব স্কেচের বেশ চাহিদা আছে। আমি তোমার কয়েকটা ছবি বিক্রয় করে দিতে পারব, তাছাড়া তোমার ভাইয়েরও পারা উচিত।

'ওদিক দিয়েই আমি চেষ্টা করছি।'

'কাল থেকে আজ যেন তোমাকে একটু বেশি তাজা মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কাল আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু রাতেই আমি ভাল হয়ে গেছি।'

ভিনসেন্টের মনে পড়ে গেল পানশালা, মদ আর ক্রিস্টিনার কথা। ওসব কথা যদি টারস্টিগ জানতে পারেন, তবে যে কি অবস্থা হবে, ভাবতে সে শিউরে উঠল।

'আমার কয়েকটা স্কেচ দেখবেন, মিজ্‌নিয়ার। আপনার সমালোচনা আমার খুব কাজে লাগবে।'

শাদা এপ্রন পরিহিত বৃদ্ধার সম্মুখে এসে টারস্টিগ দাঁড়ালেন। ক্ষণপরে তাঁর বেড়াবার ছড়িটা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন।

'তোমার হাত আসছে বেশ,' তিনি বলতে লাগছেন, 'মভ তোমাকে যে জল-রঙ অঙ্কনে নিপুণ করে ছেড়ে দেবেন, এ আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য কিছু সময় লাগবে, কিন্তু তুমি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে নিশ্চয়। নিজহাতে উপার্জন করতে পার, সেজন্য তোমাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, ভিনসেন্ট। তোমাকে মাসে একশত ফ্রাঙ্ক করে পাঠাতে থিওর যে কষ্ট হচ্ছে আমি প্যারিসে থাকতে তা দেখে এসেছি। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। আমি ছোট ছোট কতকগুলো স্কেচ শীঘ্রই কিনতে পারব।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, মিজনিয়ার। আমার প্রতি এই কৃপা আপনার সহৃদয়তারই পরিচায়ক।'

'তোমাকে কৃতকার্য হতে আমি সাহায্য করতে চাই, ভিনসেন্ট। কারণ তাতে গুপিলদের ব্যবসাই বাড়বে। আমি তোমার ছবি বিক্রয় আরম্ভ করলেই তুমি আরও ভাল স্টুডিয়ো নিতে পারবে, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ কিনতে পারবে এবং সমাজে পরিচিত হতে পারবে। পরবর্তীকালে তৈলরঙের ছবি বিক্রয় করতে হলে সমাজে পরিচিত হওয়া দরকার। আমার এবার মভের ওখানে যেতে হবে। সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করার কতদূর কি করল আমার তা দেখতে হচ্ছে'।

'আপনি কি আবার আসবেন, মিজনিয়ার?'

'নিশ্চয় আসব। দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই আসব। খুব মন দিয়ে কাজে লেগে যাও। তোমার যে উন্নতি হয়েছে পরের বার তা দেখান চাই। আমার আসা-যাওয়া যেন ব্যর্থ হয়ে না যায় বুঝলে?'

তিনি করমর্দন করে চলে গেলেন। ভিনসেন্ট তার নিজের কাজে গেল। সে যদি নিজের খরচ–তা সে খুব সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকার খরচও হয়–উপার্জন করতে পারত তা হলেই সে আর কিছু চাইত না। সে আর অন্যের বোঝা হয়ে না থেকে স্বাধীন ভাবেই জীবন যাপন করতে পারত। এমন ভাবে তাকে তাড়াতাড়ি করতে হত না, ভেবে চিন্তে ধীরেসুস্থে সে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হতে পারত, নিজের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে পারত।

দুপুরের ডাকে ডি বকের কাছ থেকে সে একখানা গোলাপী বর্ণের খাম পেল।

'প্রিয় ভ্যান গোঘ্,

যাতে দুজনে একসঙ্গে ছবি আঁকতে পারি সেজন্য আগামী কাল প্রাতে Artz-এর মডেলকে নিয়ে তোমার স্টুডিয়োতে আসব।

ডি বি।'

Artz-এর মডেল দেখতে চমৎকার সুন্দরী। 'পোজিং' এর জন্য তার চার্জ এক ফ্র্যাঙ্ক পঞ্চাশ সেন্ট। ভিনসেন্ট জানত যে ওকে ভাড়া করা সাধ্যাতীত। তাই ওকে পেয়ে খুব আনন্দিত হল। ছোট স্টোভটায় গন্‌গন্ করে আগুন জ্বলছিল। শরীরটা গরম রাখবার জন্য মেয়েটি স্টোভের পাশে এসে পোষাক ছেড়ে ফেলল। হেগ শহরে একমাত্র পেশাদার মডেলরাই নগ্ন হয়ে 'পোজ' দেয়। এতে ভিনসেন্ট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। সে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার দেহাবয়বই আঁকতে চায়, কারণ তাতেই আছে চিত্রের বর্ণ সামঞ্জস্য এবং বিশিষ্ট গুণ।

'আমি আমার তামাকের থলি এবং কিছু লাঞ্চ নিয়ে এসেছি,' ডি বক বলল। আশা করি, বাইরে যাবার ঝামেলা আর উঠবে না।'

'তোমার কাছ থেকে নিয়েই আমি এখন ধূমপান করব, কারণ আমার কাছে যে তামাক আছে তা ভোরবেলার পক্ষে একটু কড়া।'

'আমি প্রস্তুত'– মডেল বলল।

'কি ধরনের ছবি আঁকবে ডি বক? দাঁড়ান না বসা?'

'প্রথমত দাঁড়ান ছবিই আঁকা যাক। আমার নতুন ল্যান্ডস্কেপে কয়েকটা দাড়ান মূর্তি রয়েছে।'

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তারা ছবি আঁকল। তারপর মডেল পরিশ্রান্ত অনুভব করায় বন্ধ করে দিল।

'এস এবার ছবি আঁকি, তাতে ওর একটু আরাম লাগবে,' ভিনসেন্ট বলল।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত স্ব স্ব ড্রয়িং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে ওরা কাজ করে গেল। আলো অথবা তামাক সম্পর্কে মাঝে মাঝে তারা দুই একটা কথা বলছিল মাত্র। পরে ডি বক লাঞ্চের জিনিসপত্র খুলে তিনজন মিলে স্টোভের পাশে খেতে বসে গেল। পাতলা রুটি, ঠাণ্ডা মাংস আর পনির খেতে খেতে তারা ভোরে আঁকা ছবি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

'তুমি কি এঁকেছ, তা দেখতে পারি?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'স্বচ্ছন্দে।'

ডি বক নিখুঁত ভাবেই তরুণীর মুখাবয়ব অঙ্কিত করেছে, কিন্তু তাতে তার দেহের ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও ছিল না। ছবিটি একটি নির্ভুল প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কিছু নয়।

'ওর মুখে একি তুমি ফুটিয়ে তুলেছ?' ভিনসেন্টের ছবি দেখে ডি বক বলে উঠল। 'একি তোমার সেই প্যাশন নাকি?'

'আমরা তো পোরট্রেট আঁকছি না,' ভিনসেন্ট জবাব দিল। 'আমরা মানুষের চেহারা আঁকছি।'

'মুখ যে মনুষ্য মূর্তির অঙ্গ নয়, তা আমি এই নতুন শুনলাম কিন্তু।'

'তোমার পেটের দিকে একবার তাকাও।' ভিনসেন্ট বলল।

'কেন, ওর আবার কি হোল।'

'দেখে মনে হয় ওটা গরম হাওয়ায় ঠেসা। এক ইঞ্চি নাড়িভুঁড়িও তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তুমি কেন দেখবে? আমি ত মেয়েটির একটি অন্ত্রও দেখতে পাইনি।'

মডেল বিন্দুমাত্র না হেসে একমনে খেয়ে যাচ্ছিল। সে ভাবল আর্টিস্টদের কিছু না কিছু মাথার ছিট্ থাকে। ভিনসেন্ট ডি বকের পাশে নিজের ছবিটা বসিয়ে দিল।

'একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে, আমার পেট ভর্তি নাড়িভুঁড়ি', সে বলল, 'আর এই পথেই বহু টন খাদ্যদ্রব্য গজেন্দ্রগমনে অনন্তের পথে যাত্রা করেছে।'

'তার সঙ্গে পেন্টিং-এর কি যোগ আছে? ডি বক জানতে চাইল। 'তাছাড়া আমরা অন্ত্রাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই, ঠিক কিনা? লোকজন আমার ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি এবং মেঘান্তরালে অস্তমান রক্তবর্ণ সূর্যকেই দেখুক আমি তাই চাই। আমি তাদের দেহাভ্যন্তরস্থ অন্ত্রাদি দেখাতে চাই না।'

ভিনসেন্ট প্রত্যেকদিন খুশিমনে বেরিয়ে যেত এবং একজন করে মডেল নিয়ে আসত। তার মডেলের মধ্যে কখনও কামারের ছেলে, কখনও পাগলা গারদের কোন বুড়ি, কখনও বাজারের লোক থাকত। একবার সে প্যাডিমোসের আর একবার ইহুদীদের আস্তানা থেকে একজন দিদিমা ও তার নাতনীকে নিয়ে এসেছিল। মডেলের জন্যে তার অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যেতে লাগল। অথচ সে জানত মাসের শেষে খাওয়ার জন্যে ঐ টাকা জমিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে যদি পূর্ণ গতিতে কাজ করে যেতে না পারে, তবে হেগ শহরে থেকে মভের অধীনে কাজ শেখার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। খাওয়া ফুরিয়ে যাচ্ছে না, প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে পরবর্তী জীবনে সে যথেষ্ট খেতে পারবে।

মভ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কর্মচঞ্চল, উষ্ণ স্টুডিয়োতে কাজ করার জন্যে ভিনসেন্ট প্রতিদিন সন্ধ্যায় উইলির্বুমেন যেতে লাগল। মাঝে মাঝে তার জল-রঙ কেমন ভারী, থক্‌থকে এবং ম্যাড়মেড়ে দেখাত বলে সে হতাশ হয়ে পড়ত। দেখে মভ শুধু হাসতেন।

'ওগুলো অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি', তিনি বলতেন। 'তোমার কাজ এখন স্বচ্ছ দেখা গেলেও এটা বাহ্যিক ছাড়া আর কিছু নয়। ভবিষ্যতে তা বোধ হয়, ভারী হয়ে যাবে। এখন তুমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে যাচ্ছ, তাই ওটা ভারী হয়ে উঠছে। কিন্তু পরে যখন ধীরে-সুস্থে কাজ করবে, তখন সবটাই বেশ পাতলা হবে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, কাজিন মভ; কিন্তু নিজের ছবি বিক্রয় করে বেঁচে থাকবার অর্থ যদি উপার্জন করতে হয়, তবে কি করব?'

'আমি বলছি ভিনসেন্ট, তুমি যদি খুব তাড়াতাড়ি কিছু শেষ করতে চাও, তবে আর্টিস্ট হিসাবে নিজেকেই মেরে ফেলবে। আজকের মানুষ সাধারণত এক দিনেরই মানুষ। আর্টের ব্যাপারে 'সাধুতাই উন্নতির সোপান' প্রবাদটি পুরাতন হলেও সত্য।

মানুষের মনকে ভোলাবার জন্যে চাকচিক্যের সাহায্য না নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টাডির ব্যাপারে একটু বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া অনেক ভাল।'

'আমি নিজেকে ঠকাতে চাই না, কাজিন মভ এবং অসংস্কৃত ধারাতেও কঠোর ও সত্য জিনিসকে প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু বেঁচে থাকবার মত টাকা উপার্জনের কথা যখন ওঠে, তখন....আমি কতকগুলো ছবি এঁকেছি, মনে হয় টারস্টিগ তা.....অবশ্য আমি বুঝতে পারছি.....'

'আচ্ছা, দেখি ওগুলো'– মভ বললেন।

তিনি জল-রঙের কাজগুলো একবার দেখেই শত টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। 'তোমার সেই অসংস্কৃত পদ্ধতিতেই লেগে থাক, ভিনসেন্ট,' তিনি বললেন, 'শৌখিনদের আর বিক্রেতাদের পেছনে তুমি ছুটো না। দরকার হলে তারাই তোমার কাছে আসবে। একদিন তোমার উন্নতি হবেই।'

ভিনসেন্ট একবার শতচ্ছিন্ন ছবির টুকরোগুলোর দিকে তাকাল। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কাজিন মভ। আমার ঐ ধরনের আঘাত পাওয়া একান্ত দরকার ছিল।'

মভ সেদিন বাড়িতে ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বেশ কয়েকজন আর্টিস্ট তাতে যোগদান করলেন। সেখানে ভাইসেনব্রুক, ইনি অপরের কার্যের তীব্র সমালোচনা করতেন বলে 'দয়াহীন তরবারি' বলে পরিচিত ছিলেন; ব্রেইট্নার, ডি বক, জুল্স্ বাখুইজেন, এবং ভোসদের বন্ধু ন্যাহাইসরা উপস্থিত হলেন।

ভাইসেনব্রুক দেখতে খাটো হলেও এর প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। কিছুই তাঁকে হটাতে পারত না। তিনি যা অপছন্দ করতেন, তার প্রায় সব জিনিসই, তাকে বাক্যাঘাতে খান্ খান্ করে দিতেন। তিনি যা খুশি এবং যেমন খুশি এঁকে যেতেন এবং সাধারণকে তা অনুমোদন করতে বাধ্য করতেন। এবার টারস্টিগ তাঁর কোন একটা ছবির কোন বিষয়ে আপত্তি জানাতে তিনি গুপিল কোম্পানির মারফৎ ছবি বিক্রয় বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবু তাঁর জিহ্বার মত মুখের আদলটাও ছিল ধারালো; তাঁর মাথা, নাক এবং চিবুকও ছিল ছুঁচলো। সকলেই তাঁকে ভয় করত এবং তার প্রশংসো পেতে চাইত। সব কিছুকে ঘৃণা করতে করতে তিনি যেন একটা জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন। ভিনসেন্টকে নিয়ে আগুনের পাশে এক কোণে গিয়ে তিনি বসলেন এবং মাঝে মাঝেই আগুনে থুথু নিক্ষেপ করতে লাগলেন। থুথু ফেলায় যে হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছিল তা শুনতে তার ভাল লাগছিল।

'শুনলাম, তুমি নাকি ভ্যান গোঘ্ বংশের ছেলে', তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমর খুড়ো-জ্যেঠার মতই সুন্দর ছবি আঁকতে পার?'

'না, বিক্রি করার মত ছবি আমি এখনও আঁকতে পারি না।'

'তা, এ তোমার পক্ষে ভালই। ষট বছরের আগে পর্যন্ত সমস্ত আর্টিস্টেরই অন্নাভাবে কষ্ট পাওয়া উচিত। এ হলেই হয়ত তার পক্ষে ভাল ছবি আঁকা সম্ভবপর হবে।'

'আপনার বয়েস তো চল্লিশের উপরে যায় নি, কিন্তু আপনি তো বেশ ছবি আঁকেন?'

ওঁর কথার প্রতিবাদ কোন দিন কেউ করেনি। তবু ভিনসেন্টের প্রতিবাদে তিনি বিরক্ত হলেন না।

'আমার পেন্টিং যদি তোমার কাছে ভাল বলে মনে হয়, তবে তোমার ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে তোমার পোর্টার হওয়া উচিত। বোকা লোকগুলোর কাছে আমি আমার ছবি বিক্রয় করি কেন জান? কারণ ওগুলো হচ্ছে বাতিল, ওগুলো যদি বিন্দুমাত্র ভাল হত তবে আমি তা নিজের কাছেই রেখে দিতাম। তুমি যা ভাবছ, তা নয় ভাই, আমি এখনও শিখছি। ষাট বছর যখন হবে, তখন সত্যি ছবি আঁকতে আরম্ভ করব। ওসময়ের পরে আমি যা আঁকব তার সব আমার পাশে রেখে দেব, মরার। সময় ওগুলোকে আমার সঙ্গেই কবর দিতে বলব। নিজের উৎকৃষ্ট ছবিকে কোন আর্টিস্টই বিক্রয় করে না, ভ্যান গোঘ্। যত বাজে ছবি লোকের নিকট বিক্রয় করে।'

ঘরের অন্য কোণ থেকে ভিনসেন্টকে লক্ষ্য করে ডি বক চোখ টিপতেই ভিনসেন্ট বলল 'ছবি আঁকা আপনার পেশা হওয়া উচিত হয়নি ভাইসেনব্রুক, আপনার আর্ট ক্রিটিক হওয়া উচিত ছিল।'

ভাইসেনব্রুক হেসে মভ্‌কে ডেকে বললেন 'তোমার এই কাজিনকে যত বোকা দেখায়, তত বোকা নয় মভ। বেশ কথা বলতে পারে দেখছি।' বলে ভিনসেন্টের দিকে ঘুরে কঠোরভাবে বললেন, 'এই নোংরা জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াও কেন? ভাল জামা কাপড় কিনতে পার না?'

ভিনসেন্ট থিওর একটা পুরনো পোষাক পরেছিল। ওটা কেটেছেটে ওর মাপে করা হয়েছিল। কাটছাটটা ভাল হয়নি, তাছাড়া এটা পরেই সে জল রঙ নিয়ে কাজ করত।

'সমস্ত হল্যান্ডের লোকজনের কাপড় কিনে দেবার মত সামর্থ আছে তোমার কাকা-জ্যাঠাদের। তাঁরা কি তোমাকে কিছুই সাহায্য করেনা?'

'কেন সাহায্য করবেন তাঁরা? তাঁরাও আপনার মতই বিশ্বাস করেন যে, আর্টিস্টরা না খেয়ে থাকবে।'

'যদি তোমাকে তাঁরা বিশ্বাস না করে থাকেন, তবে ভালই করেছেন। শোনা যায় ভ্যান গোঘেরা একশ' কিলোমিটার দূর থেকেই পেইন্টারের গন্ধ পান। তুমি বোধ হয় পচে গেছ।

'আপনি জাহান্নামে যান!'

ভিনসেন্ট রেগে ঘুরে দাঁড়াতেই ভাইসেনব্রুক তার হাত ধরে ফেলল। তাঁর মুখে ছিল প্রশান্ত হাসি।

'এই ত চাই!' তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন। 'তুমি গালাগালি কতদূর সহ্য করতে পার তাই আমি দেখছিলাম। তোমার এই ব্রেনকে কিছুতেই নষ্ট হতে দিও না। তোমার ভিতরে শক্তি আছে।'

অতিথিদের জন্যে নানা বিষয় নকল করতে মভের বেশ ভাল লাগছিল। তিনি পাদ্‌রির সন্তান হলেও তাঁর জীবনের ধর্ম ছিল মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে পেন্টিং। জেট যখন চা বিস্কিটস ও পনির নিয়ে অথিতিদের মধ্যে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন তিনি পিটারের মাছ ধরার জাহাজ সম্পর্কে বক্তৃতা করে যাচ্ছিলেন। পিটার কি ওটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, নাকি কেউ উপঢৌকন দিয়েছিলেন? মাসিক কিস্তিতে

পরিশোধ করার কড়ারে তিনি ওটা এনেছিলেন কি? তিনি ওটা, ভাবতেও অবশ্য ভয়ানক মনে হয়, চুরি করেছিলেন কি? অতিথিরা চা এবং পনির খেতে খেতে সিগারেটের ধোঁয়ায় এবং হাসিতে ঘর ভরে দিয়েছিলেন।

'মভের অনেক পরিবর্তন হয়েছে,' ভিনসেন্ট নিজের মনে ভাবল।

কিন্তু সে জানত না যে, সৃজনক্ষম আর্টিস্টের মত তাঁর ভিতরেও হচ্ছে রূপান্তর। ভালভাবে সে একটা ছবি আরম্ভ করে বিশেষ সুযোগ না দিয়েই তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু নানা ভাব তাঁর মনের মধ্যথেকে যখন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে তাঁর উদ্দীপনাও বেড়ে যায়। তিনি একেক দিন একটু বেশি সময় পরিশ্রম করে থাকেন। ক্যানভাসে তাঁর কল্পনা যতই এঁকে যেতে থাকে, ততই তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। পরিবার, বন্ধু বা অন্য কিছু কারণেই তার কোন ভাবনা থাকত না ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁর দূর হয়ে যেত। রাতের পর রাত তাঁর অনিদ্রায় কাটত। শক্তি তাঁর যত কমে আসত, উদ্দীপনা তাঁর তত বৃদ্ধি পেত। তারপর এক দিন কেবলমাত্র মানসিক শক্তিতেই তিনি বেঁচে থাকতেন। শরীর শুকিয়ে যেত, ভাবোদ্দীপিত দৃষ্টি কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকত। যতই তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন, ততই উন্মত্তের মত তিনি কাজ করে যেতেন। তাঁর স্নায়বিক অনুভূতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকত। কাজ শেষ করতে কতদিন লাগবে, তিনি তা আগেই জানতেন, সেদিন পর্যন্ত তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তিকে সজাগ রাখতেন। তখন তাঁকে ভূতে পাওয়া লোকের মত মনে হত। কোন কোন ছবি শেষ করতে হয়ত বছরের পর বছর লেগে যেত, এসময় চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটি ঘণ্টা তাঁর ভিতরের কি যেন তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। শেষদিকে তার আবেগানুভূতি ও স্নায়বিক উত্তেজনা এত বৃদ্ধি পেত যে, কেউ যদি কোন বাঁধা সৃষ্টি করত, তবে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হত। তিনি শেষ শক্তি দিয়ে কাজ করে যেতেন। ছবি শেষ করতে যত সময়ই লাগুক, শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার মত যথেষ্ট ইচ্ছা শক্তি তাঁর ছিল। ছবি শেষ না করা পর্যন্ত কিছুই তাঁকে আটকাতে পারত না।

কাজ শেষ হয়ে গেলেই তিনি জবুথবু হয়ে যেতেন। তিনি দুর্বল, অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে জেটের বহুদিন লাগত। তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে, রঙ দেখলে বা তার গন্ধ পেলেও তাঁর বমনোদ্রেক হ'ত। ধীরে, অতি ধীরে তাঁর শক্তি ফিরে আসতে থাকত। ছবি সম্পর্কে তিনি আবার সচেতন হয়ে উঠতেন। স্টুডিয়োকে পরিস্কার করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতেন। প্রথমত যখন মাঠে ঘুরে বেড়াতেন, কোন কিছুই তাঁর চোখে পড়ত না। ধীরে ধীরে কোন কোন দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করত। এইভাবেই তাঁর চলত।

ভিনসেন্ট যখন প্রথম হেগ শহরে আসে, তখন মভ সবেমাত্র স্কেভেনিগেন ছবিটি আঁকতে শুরু করেন, এখন ক্রমে তাঁর উত্তেজনা বাড়ছে। তারপরেই আরম্ভ হবে, তার শিল্পীসুলভ সৃজনক্ষম উত্তেজনার চরমতম প্রকাশ।

৪.

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে ক্রিস্টিনা ভিনসেন্টের বাসায় এসে উপস্থিত হল। তার পরিধানে ছিল এক কালো পেটিকোট, গাঢ় নীল জ্যাকেট এবং মাথায় ছিল একটি

কালো টুপি। সারাদিন সে লন্ড্রিতে কাজ করে এসেছে। তাই তাকে একটু বেশি পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল। পরিশ্রান্ত হলে তার মুখটা হাঁ করে থাকে। ক্ষতবিক্ষতচিহ্নগুলো যেন একটু বড় ও গভীর হয়ে ওঠে।

'হ্যাল্লো ভিনসেন্ট,' সে বলল, 'তোমার বাসায় এসে দেখা করব ভাবতে পেরেছিলে কি?'

'আমার গৃহে তুমিই প্রথম নারী প্রবেশ করলে, ক্রিস্টিনা। আমি তোমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তোমার শালটা খুলে ফেলতে পারি কি?'

আগুনের পাশে বসে ক্রিস্টিনা নিজেকে উত্তপ্ত করে নিল। ক্ষণপরে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

'ঘরটা মন্দ নয়, তবে বড্ড খালি,' সে বলল।

'তা জানি, কিন্তু আসবাবপত্র কেনার মত পয়সা আমার নেই।'

হুঁ ওটাই তোমার প্রথম দরকার।'

'আমি খাওয়া নিয়ে বসতে যাচ্ছিলাম। তুমি বসবে আমার সঙ্গে, ক্রিস্টিনা?'

'সবাই আমাকে সিয়েন বলে ডাকে, তুমিও তা-ই ডেকো।'

'বেশ ত, সিয়েন বলেই ডাকব।'

'কি দিয়ে নৈশ ভোজ করবে?'

'আলু আর চা।'

'আমি আজ দু ফ্রাঙ্ক উপার্জন করেছি। দাঁড়াও আমি কিছু বীফ্ কিনে আনি।'

'তার দরকার হবে না। আমার ভাই টাকা পাঠিয়েছে তাই আমার কাছে আছে। কত লাগবে বাজার করতে।'

'পঞ্চাশ সেন্ট হলেই হয়ে যাবে মনে হয়।'

কিছুক্ষণ পরেই সে মাংস নিয়ে ফিরে এল। ভিনসেন্ট মাংস নিয়ে খাওয়া তৈরি করতে আরম্ভ করল।

'ও তুমি পারবে না, ভিনসেন্ট, তুমি বস এখানে। আমি মেয়েমানুষ, রান্নার সব কিছু আমি জানি।'

স্টোভের উপর ঝুঁকে পড়ে ও যখন রাঁধতে আরম্ভ করলো আগুনের উত্তাপে তার গাল দুটো লাল হয়ে উঠল। তাকে বেশ সুন্দরী মনে হল। আলু কেটে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করতে ক্রিস্টিনার খুবই ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন নিজের বাড়িতে বসে আছে। ভিনসেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কর্মরত সিয়েনকে লক্ষ্য করতে লাগল। অন্তরে সে একটা পরম তৃপ্তি অনুভব করল। এ যে তার আপন গৃহ আর সেই গৃহেই স্নেহময়ী নারী তার জন্যে ডিনার প্রস্তুত করছে। কে' কে আপন সঙ্গিনী কল্পনা করে এমনি স্বপ্ন সে কতদিন দেখেছে। সিয়েন একবার অপাঙ্গে তাকে দেখে নিল। সে তখন বিপদজনক ভঙ্গিতে চেয়ার নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল।

'এই বোকা ছেলে, সোজা হয়ে বস'– ক্রিস্টিনা বলে উঠল। 'ঘাড়টা ভাঙতে চাও নাকি?'

ভিনসেন্ট দাঁত বের করে হাসল। মা, বোন, খুড়ি, জেঠি মাসতুত বোন প্রভৃতি যত মেয়েলোকের সঙ্গেই সে একগৃহে বাস করেছে তাঁরাই তাকে এই বলে সতর্ক করেছে, 'ভিনসেন্ট, চেয়ারে সোজা হয়ে বস, নইলে তোমার ঘাড় ভেঙে যাবে।'

'ঠিকই বলেছ সিয়েন, আমি ভাল হয়ে বসছি'—সে জবাব দিল।

'কিন্তু ক্রিস্টিনা মুখ ফেরাতেই সে দেয়ালে চেয়ার ঠেকিয়ে আনন্দের সঙ্গে ধূমপান করতে লাগল। সিয়েন টেবিলে ডিনার সাজিয়ে রাখল। আলু দিয়ে বীফ্ খেয়ে, ওরা রুটি দিয়ে মাংসের ঝোল খেয়ে নিল।

'এ রকম রান্না করার সাধ্য তোমার নেই, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি'—সিয়েন বলল।

'তা ঠিক।' আমার রান্না খেয়ে আমি নিজেই বুঝি না যে আমি মাছ খাচ্ছি, না মুরগির মাংস খাচ্ছি, না ডেভিল খাচ্ছি।'

চা পান করতে করতে সিয়েন তার একটি কালো সিগারের ধূমপান করল। তারপর বেশ প্রফুল্ল মনে গল্প করতে লাগল। মভ অথবা ডি বকের চেয়ে ওর সঙ্গে বেশ প্রাণ খুলে ভিনসেন্ট আলাপ করতে পারছিল। তাদের ভিতর যে কিছুটা ভ্রাতৃত্ব ছিল তা সে কোন দিন বোঝার ভান করেনি, কোন প্রকার প্রতিযোগিতা বা অতিশোয়ক্তি না করে তারা সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ভিনসেন্ট কথা বলতে আরম্ভ করলে সিয়েন মন দিয়ে শুনছিল। তার সম্পর্কে ভিনসেন্ট উৎসুক হয়ে উঠুক সিয়েন তা চাইছিল না। তার এমন কোন গুণও ছিলনা যার বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা যায়। পরস্পরকে কথা দ্বারা প্রভাবান্বিত করার ইচ্ছাও তাদের ছিল না। সিয়েন যখন তার দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবন কাহিনী বলে যাচ্ছিল ভিনসেন্ট তার মাঝে দু'একটি শব্দ যোগ করেই নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করে যাচ্ছিল। এ কথাবার্তার যেমন কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না তেমনি নীরব সহানুভূতি প্রকাশেরও কোন ভঙিমা ছিল না। এ যেন বাধাবন্ধহীন উদার উন্মুক্ত দুটি আত্মার অবাধ মিলন।

ক্ষণপরে ভিনসেন্ট উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছ?' সিয়েন জিজ্ঞাসা করল।

'ডিসগুলো ধুয়ে ফেলি।'

'ডিস ধোয়ার কি জান বলত? ও মেয়েমানুষের কাজ। তুমি বসে থাক।'

ভিনসেন্ট স্টোভের পাসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাইপ ভরে আরামে ধূমপান করতে লাগল। ওদিকে সিয়েন জলের পাত্রের উপর ঝুঁকে ডিস্‌গুলো ধুতে লাগল। সিয়েনের সাবান মাখান হাত দু'টোকে সে নজর দিয়ে দেখতে লাগল। হাতের শিরাগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে, চামড়া ভয়ানক ভাবে কুঁকড়িয়ে গেছে। ভিনসেন্ট উঠে কাগজ ও পেন্‌সিল নিয়ে ওকে আঁকতে লাগল।

'কিছুটা মদ যদি আমাদের থাকত তবেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত,' কাজ শেষ করে সিয়েন বলল।

সন্ধ্যায় তারা মদ্যপান করল, পরে ভিনসেন্ট সিয়েনের ছবি আঁকল। কোলের উপর হাত রেখে উত্তপ্ত স্টোভের পাশে বসে নীরবে বিশ্রাম করতে সিয়েনের ভাল লাগছিল।

স্টোভের উত্তাপ এবং আপনজনের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ তাকে সজীব ও চঞ্চল করে তুলেছিল।

'লন্ড্রির কাজ শেষ হবে কবে?'– ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'আগামীকাল। আর পারছি না, এবার শেষ হলেই বাঁচি।'

'খুব খারাপ লাগছে কি?'

'না, কিন্তু সময় ত হয়ে এল।'

'তা হলে আগামী সপ্তাহ থেকে তুমি 'পোজ' দেবে?'

'আজকে যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে থাকতে হবে ত?'

'হ্যাঁ। তবে তোমাকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বা নগ্ন হয়ে 'পোজ' দিতে হবে।'

'সে খুব খারাপ না। তুমি কাজ করবে আর আমি পয়সা নেব।'

সে বাতায়ন পথে তাকাল। বাইরে তখন বরফ পড়ছিল।

'এখন বাড়ি থাকলেই ভাল হত। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কিন্তু। কেবলমাত্র শাল ছাড়া গায়ে দেওয়ার কিছু নেই। অনেকটা পথ আবার যেতে হবে।'

'কাল ভোরে এদিকে আসবে নাকি?'

'হ্যাঁ ছ'টায় আসব। তখনও বেশ আঁধার থাকবে।'

'ইচ্ছে করলে তুমি এখানে থাকতে পার, সিয়েন। তুমি থাকলে আমি খুশিই হব।'

'শোয়ার অসুবিধা হবে না?'

'কিছুমাত্র না। বিছানাটায় বেশ জায়গা আছে।'

'দুজনে ঘুমান যাবে?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'বেশ।'

'তুমি থাকতে বলায় আমি খুব খুশি হয়েছি, ভিনসেন্ট।'

'তুমি থাকতে রাজি হওয়ায় আমি আগে খুশি হয়েছি।'

পরের দিন ভোরে সিয়েন কফি তৈরি করল, বিছানা তুলে স্টুডিয়ো ঝাড় পোঁছ করে ফেলল। তারপর লন্ড্রিতে কাজ করবার জন্য বেরিয়ে গেল। ভিনসেন্টের মনে হল জায়গাটা যেন হঠাৎ খালি হয়ে গেল।

৫.

সেদিন দুপুরেই টারস্টিগ আবার এলেন। দুরন্ত শীতে হেঁটে আসার জন্যে তাঁর চোখ দুটো চকচক্ করছিল আর রাঙা গণ্ডদেশ হয়ে উঠেছিল আরও রাঙা।

'কেমন চলছে ভিনসেন্ট?'

'বেশ ভাল, মিজ্নের টারস্টিগ। আপনি দয়া করে যে আবার এসেছেন।'

'নিশ্চয় তোমার ভাল ছবি তৈরি হচ্ছে তাই ত দেখতে এলাম।'

'হ্যাঁ, নতুন কয়েকটা ছবি হয়েছে তা আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনি বসুন।'

টারস্টিগ চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে ধুলো ঝেড়ে নেবার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে থেমে গেলেন, ভাবলেন সেটা অভদ্রতা হবে। চেয়ার না ঝেড়েই বসে পড়লেন। ভিনসেন্ট তিন চারটি ছোট জল রঙের ছবি এনে দেখাল। সুদীর্ঘ একটা

চোখে পড়ার মত তিনি ছবিগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিটা খুলে বেশ করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

'তোমার হাত আসছে' ক্ষণপরে ফিরে বললেন। 'অবশ্য এগুলো এখনও ঠিক হয় নি। এখনও কিছুটা কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে। তবে তোমার উন্নতি হয়েছে অনেক। তোমার কাছ থেকে কিনতে পারি এমনি ছবি কিছু শিগ্‌গির এঁকে দাও, ভিনসেন্ট।

'দেব, মিজনের।'

'উপার্জন করে নিজের ভরণপোষণের কথা তোমাকে এখন ভাবতে হবে। অন্যের উপার্জনের উপর বেঁচে থাকা ঠিক নয়।'

ভিনসেন্ট জল-রঙে আঁকা ছবিগুলো হাতে নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। ওগুলোতে এখনও কাঁচা হাতের ছাপ যে রয়েছে তা সে ধরে নিল। কিন্তু কোথায় যে খুঁত রয়েছে তা সে বুঝে উঠতে পারল না।

'নিজের আয়েই আমি বেঁচে থাকতে চাই মিজ্‌নের।'

'তাহলে তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, তাড়াতাড়ি যাতে হাত পাকাতে পার তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি কিনতে পারি এমন বহু ছবি তুমি আঁক আমি তাই চাই।'

'বেশ, মিজ্‌নের।'

'যাক, তোমাকে সুখী এবং কাজ করতে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্যে থিও আমাকে বলেছিল। থাক, ভাল কিছু আঁক, আমি তাই চাই ভিনসেন্ট। আমি তোমাকে প্লাৎসে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই।'

'আমি ত ভাল জিনিসই আঁকতে চাই, কিন্তু হাত তো সব সময় আমার নির্দেশ মেনে চলে না। মভ এটা দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।'

'কি বলেছিলেন তিনি?'

'তিনি বলেছিলেন যে, এটা অনেকটা তেল রঙে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে।'

টারস্টিগ হেসে উঠলেন। উলের স্কার্ফটা একটু তুলে নিয়ে বললেন, 'একটার পর একটা ছবি এঁকে যাও ভিনসেন্ট। এমনি করেই বহু দামী ছবির সৃষ্টি হয়েছে।' বলে তিনি উঠে গেলেন।

ভিনসেন্ট যে হেগ শহরে আস্তানা নিয়েছে সেকথা সে চিঠি দিয়ে খুড়ো কার-কে জানিয়েছিল আর তাঁকে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমস্টারডামে তাঁর একটা ছবির দোকান আছে। সেই দোকানের জন্য জিনিসপত্র ও ছবি কিনতে তিনি প্রায়ই হেগ শহরে আসতেন। যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভিনসেন্টের পরিচয় হয়েছে, এক রবিবার দুপুরে সে তাদের পার্টি দিল। ছবি আঁকবার সময় তাদের খুশি করা প্রয়োজন। এক ঝুড়ি মিষ্টি এনে সে তাদের বিলিয়ে দিল। পরে তাদের সঙ্গে গল্প বলতে বলতে ছবি আঁকতে লাগল। এমন সময় দোরে কে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গম্ভীরভাবে ডাক দিলেন। ভিনসেন্ট বুঝতে পারল তার কাকা এসেছেন।

কর্নেলিয়াস ম্যারিনাস ভ্যান গোঘ্ বেশ সংস্কৃতিসম্পন্ন, প্রতিষ্ঠাবান ও ধনী ব্যক্তি। এজন্যেই বোধ হয় তাঁর বড় বড় কালো চোখ দুটোতে ছিল একটু বিষাদের আভাস। ভ্যান গোঘ্ পরিবারের অন্যান্যদের চেয়ে ওঁর মুখটা যেন একটু বেশি ভাঙা। মাথার

গড়নটা পরিবারের অন্যদের মতই প্রায়–কপালটা চওড়া, ভুরুজোড়া বেশ উঁচু, চৌকো চোয়াল, চিবুক গোলাকৃতি ও বড় আর নাকটি বেশ তীক্ষ্ণ।

স্টুডিয়োর কিছুই যেন দেখছেন না এমনি একটা ভাব দেখিয়ে তিনি স্টুডিয়োটির খুঁটিনাটি দেখে নিলেন। হল্যান্ডের যে কোন লোকের মধ্যে তিনিই বোধ হয় আর্টিস্টদের স্টুডিয়ো সবচেয়ে বেশি দেখেছেন।

ভিনসেন্ট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাকি মিষ্টিগুলো বিলি করে দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। এক কাপ চা খাবেন?'

'ধন্যবাদ।'

ভিনসেন্ট চা করে এনে কাকাকে দিল। হাল্কাভাবে আলাপ করতে করতে তার কাকা যেভাবে চায়ের কাপটা হাঁটুর উপর বসিয়ে রাখল দেখে সে একটু অবাক হল।

'তাহলে তুমি একজন আর্টিস্ট হচ্ছ, ভিনসেন্ট'– তিনি বললেন। 'ভ্যান গোঘ্ পরিবারে একজন আর্টিস্ট থাকা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ত্রিশ বছর ধরে আমি, হেইন আর ভিনসেন্ট নানা লোকের কাছ থেকে ক্যানভাস ক্রয় করে চলেছি। এর কিছুটা এখন অন্তত পরিবারের মধ্যেই থেকে যাবে।'

ভিনসেন্ট হাসল।

'আমাদের পরিবারের তিনচারজন চিত্রব্যবসায়ী, তাদের কাছ থেকে আমি সাহায্য পাব। হ্যাঁ, আপনাকে কিছু পনির আর রুটি দেব কাকা? আপনার নিশ্চয় ক্ষুধা পেয়েছে?'

কর্নেলিয়াস ম্যারিনাস জানতেন যে গরিব আর্টিস্টকে অপমান করার সহজ পথ তার দেওয়া খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ। তাই তিনি বললেন, 'তা দিতে পার। আমি তো সেই ভোরে খেয়ে বেরিয়েছি।'

ভিনসেন্ট কয়েক শ্লাইস কালো মোটা রুটি এবং কাগজ থেকে বের করে কিছু পনির একটা ভাঙা প্লেটে করে কাকাকে দিল। কর্নেলিয়াস তার থেকে কিছু খাওয়ার চেষ্টা করলেন।

'টারস্টিগ বলছিলেন, থিও নাকি তোমাকে মাসে একশ' ফ্যাঙ্ক করে পাঠায়?'

'হ্যাঁ।'

'থিওর এখন বয়স কম। এ সময়েই তার কিছু টাকা কড়ি জমান দরকার। ওর উপর নির্ভর না করে তোমার নিজের ব্যয় নির্বাহের মত উপার্জন করা উচিত।'

আগের দিন এ সম্বন্ধে টারস্টিগ যা বলেছিলেন, তাতেই ভিনসেন্টের মেজাজটা চড়েছিল। কাকার কথা শুনেই কিছু চিন্তা না করেই সে জবাব দিল, 'নিজের আয়ের সংস্থানের কথা বলছেন কাকা? আয়ের সংস্থান বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? আয়ের সংস্থান করা, না সংস্থানের চেষ্টা করা? আয়ের সংস্থানের চেষ্টা না করা অবশ্য অযোগ্যতার লক্ষণ, তা অপরাধও, কারণ প্রত্যেক সৎলোকের উচিত, স্বীয় আয়ের সংস্থানের চেষ্টা করা। কিন্তু চেষ্টা করেও যদি আয় করতে না পারে তবে তাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবেন?'

সে একটুকরো রুটি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল।

'আপনি যদি বলেন যে, আমি নিজের আয়ের সংস্থান করবার উপযুক্ত নই, তাহলে আমাকে অপমানই করবেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, এখনও কিছু আমি উপার্জন করতে পারিনি তবে আপনার মন্তব্য আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু মন্তব্য করার প্রয়োজনটাই বা কি? এতে তো আমার কোন উপকার হচ্ছে না।'

কর্নেলিয়াস এ সম্পর্কে আর কোন কথা তুললেন না। এর পর কিছুক্ষণ বেশ ভালভাবেই আলাপ-আলোচনা চলল। পরে মুখাবয়বের কথা বলতে গিয়ে ভিনসেন্ট দা গ্রু'র কথা উল্লেখ করল।

'কিন্তু জান, ভিনসেন্ট,' কর্নেলিয়াস ম্যারিনাস বললেন, 'ওঁর ব্যক্তিগত জীবন খুবই নিন্দনীয় ছিল।'

দাগ্রু সম্বন্ধে এমন উক্তি বসে শোনার মত ইচ্ছা ভিনসেন্টের ছিল না। কিন্তু এখানে প্রতিবাদ করার চেয়ে 'হ্যাঁ' বলাই যে যুক্তিসম্মত, তা-ও সে জানত, তবু তার কেমন যেন একটা স্বভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, পরিবারের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলতে সে যেন 'হ্যাঁ' বলতে পারত না।

'শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পীকে বহু বিচিত্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধার ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তার ব্যক্তিগত জীবনে তা লোককে না জানানোর অধিকার শিল্পীর থাকা উচিত বলে আমার সব সময় মনে হয়েছে কাকা। নিজের শিল্প-সৃষ্টিকে লোকলোচনের সম্মুখে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলোও যে তাদের কাছে বের করে দিতে হবে, তার কোন মানে নেই।'

'কিন্তু তা বলে'– চিনিহীন চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে তার কাকা বললেন, 'লোকটি লাঙল অথবা হিসাবের খাতার পরিবর্তে তুলি আর রঙ নিয়ে কাজ করে বলেই সে ব্যভিচারী হবার অধিকার পায় না। যারা সদ্‌ভাবে চলে না, তাদের ছবি না কেনাই আমি উচিত বলে মনে করি।'

'শিল্পীর সৃষ্টি যদি চমৎকারিত্বে প্রধান স্থান অধিকার করে, তবে কোন শিল্পসমালোচকের পক্ষে ওঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা আমি আরও দোষাবহ মনে করি। শিল্পীর সৃষ্টি এবং তার ব্যক্তিগত জীবন হচ্ছে প্রসবকালীন নারী ও তাঁর শিশুর মত। আপনারা শিশুকে দেখতে পারেন, কিন্তু সেমিজ উঠিয়ে দেখতে পারেন না, তা রক্তাক্ত কিনা। এটা খুবই অভদ্রোচিত হবে।'

কর্নেলিয়াস মেরিনাস তখন সবেমাত্র একটুকরো রুটি ও পনির মুখে দিয়েছিলেন। ভিনসেন্টের কথা শুনেই তিনি থু থু করে তা হাতের কাপের মধ্যে ফেললেন, তারপর উঠে পড়লেন।

'হয়েছে, হয়েছে, খুব হয়েছে'– তিনি মন্তব্য করলেন।

কাকাকে এমন ভাব করতে দেখে ভিনসেন্ট ভয় পেয়ে গেল। ভাবল যে তিনি বোধ হয় রাগ করলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ক্রোধের কোন বহিঃপ্রকাশ হল না। ভিনসেন্ট তার আঁকা ছোট ছোট স্কেচ ও স্টাডির এ্যালবামটা নিয়ে এল এবং আলোর নিচে কাকার জন্যে একখানা চেয়ার পেতে দিল। কর্নেলিয়াস ম্যারিনাস কয়েকখানা ছবি কোন প্রকার মন্তব্য না করেই দেখে গেলেন। তারপর বাজার থেকে 'প্যাডিমসের দৃশ্য'

ছবিটা চোখে পড়তেই একটু থামলেন। একদিন মধ্যরাত্রে ব্রেইটনারে হাঁটতে হাঁটতে ভিনসেন্ট ছবিটা এঁকেছিল।

'ঐ ছবিটা মন্দ নয়,' তিনি মন্তব্য করলেন, 'শহরের এমনি দৃশ্যের আরও কতকগুলো ছবি এঁকে দিতে পার?'

'পারি। মডেল নিয়ে কাজ করতে করতে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন মুড বদলাবার জন্যে এ ধরনের ছবি আঁকি। এ রকম আরও কয়েকটা ছবি আছে আমার। দেখবেন আপনি?'

ভিনসেন্ট কাকার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে খসখসে কাগজের মধ্যে ছবিগুলো খুঁজতে লাগল। 'এটা হচ্ছে ভিরস্টিগ....এটা গিস্ট আর এটা হচ্ছে মেছো-হাটার ছবি।'

'ঐ রকম গোটা বারো ছবি আমাকে এঁকে দেবে?'

'বেশ দেব। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপার যখন দামটা আগেই ঠিক করে নেয়া ভাল।'

'বেশ ত, কত চাও তুমি?'

'পেন্সিল অথবা কালি, যা দিয়েই আঁকা হোক না কেন, এই সাইজের ছবির দাম আমি ঠিক করেছি ১৫০ ফ্রাঙ্ক। দামটা কি আপনার অযৌক্তিক মনে হচ্ছে?'

কর্নেলিয়াস ম্যরিনাস মনে মনে হাসলেন। দামটা যে আদৌ বেশি নয়।

'না, ছবি ভাল হলে এ দাম বিশেষ বেশি নয়। আমস্টারডামের বারোটি ছবি ডানদিকে এঁকে দেও। ছবি দেখে আমি দাম ঠিক করে দেব, যাতে তুমি আরও দুটো পয়সা পেতে পার।'

'আপনিই সর্বপ্রথম আমার ছবির অর্ডার দিলেন আঙ্কল কর! আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

'আমারা সবাই তোমাকে সাহায্য করতে চাই, ভিনসেন্ট। ভাল ছবি আঁকতে আরম্ভ কর, দেখবে তোমার সব ছবি আমরা কিনে নেব।' বলে তিনি তাঁর টুপি ও দস্তানা তুলে নিলেন। 'থিওকে চিঠি লিখলে তাকে আমার অভিনন্দন জানিও।'

আপন সাফল্য-গর্বে উদ্বেলিত হয়ে ভিনসেন্ট কিছু জল রঙে আঁকা ছবি নিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে উইলিবুমেন-এ গিয়ে হাজির হল। জেট এসে দোর খুলে দিলেন। তাঁকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল।

'আমি হলে এখন কিন্তু স্টুডিয়োতে যেতে চাইতাম না ভিনসেন্ট, কারণ এ্যান্টন এখন সেই অস্বাভাবিক অবস্থায় আছেন।'

'কেন, কি হয়েছে? ওঁর কি কোন অসুখ করেছে?'

জেট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'না, সচরাচর যা হয়ে থাকে, তাই হয়েছে।'

'মনে হয় তিনি এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না।'

'তোমাকে কয়েকদিনের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে, ভিনসেন্ট। অবশ্য তুমি যে এসেছিলে, আমি ওঁকে তা বলব। একটু সুস্থ হলেই তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।'

'বেশ। তবে আমার কথা ওঁকে বলতে কিন্তু ভুলবেন না।'

'নিশ্চয় ভুলব না।'

ভিনসেন্ট অনেকদিন অপেক্ষা করল, কিন্তু মভ্ এলেন না। এলেন টারস্টিগ—একদিন নয় দুদিন। দুবারই একই ধরনের কথা বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, তোমার কিছুটা উন্নতি হয়েছে মনে হয়, তবে এখনও ঠিক হয়নি। প্লাৎসে এখনও এগুলো বিক্রি করতে পারবে না। মনে হয় তুমি এখনও তেমন কঠিন পরিশ্রম করছ না অথবা তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারছ না।'

'দেখুন মিজ্‌নিয়ার আমি প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে রাত এগারোটা বারোটা অবধি কাজ করি। এর মধ্যে খাওয়ার সময় ছাড়া কোন সময়ও আমি নষ্ট করি না।'

টারস্টিগ একবার মাথা নাড়ল, তারপর আবার জল-রঙে আঁকা ছবিগুলো দেখে বলল 'প্লাৎসে যখন তুমি প্রথম আস, তখন তোমার কাজে যে অমার্জিত ও অমসৃণ ভাব দেখেছিলাম আজও তা রয়ে গেছে। এর কারণটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এতদিনে ওই গুলো দূর হওয়া উচিত ছিল। কিছু খুঁত থাকলে পর কঠিন পরিশ্রম করলেই তো ওগুলো দূর হয়ে যায়।

'কঠিন পরিশ্রম!' ভিনসেন্ট বলল।

'সত্যি বলছি, আমি তোমার ছবি কিনতে চাই, ভিনসেন্ট। তুমি নিজেরটা উপার্জন করো এও আমি দেখতে চাই। থিও তোমাকে দেখাশোনা করুক, এটা আমি ভাল বলে মনে করি না, কিন্তু কি করব বল? ছবি ভাল না হলে তা কেনা যায় না। যায় নাকি? তুমি আমার দান গ্রহণ করতে চাও না তো?'

'না।'

'তাহলে তোমাকে কাজের গতিবৃদ্ধি করতে হবে। ছবি বিক্রয় করে তোমার আয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে।'

টারস্টিগ চতুর্থবার ওই কথা উল্লেখ করলেন। ভিনসেন্ট বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল তাঁর উদ্দেশ্যের কথা। ওঁর কোন মতলব আছে নাকি? 'তোমার জীবিকা নির্বাহার্থ তোমাকে উপার্জন করতেই হবে.... কিন্তু আমি এখন কিনতে পারব না।' বাবাহ্! কেউ যদি কিছু না কেনে সে উপায় করবে কি করে?

অনেকদিন আপনাকে দেখিনি,' কাজিন মভ্ বললেন।

'হ্যাঁ, আমি জানি। নতুন কানভাস নিয়ে আপনি ত ব্যস্ত। কেমন হচ্ছে ছবিটা?

'ওহ্....' তিনি এক অব্যক্ত ভঙ্গি করলেন।

'কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনার স্টুডিয়োতে যাব আমি? জল-রঙের ছবিগুলোতে যে উন্নতি হচ্ছে না বলে মনে হয়।'

'আমি ভয়ানক ব্যস্ত, এখন তুমি এসো না। কোনভাবেই এখন আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না।'

'বেড়াতে যখন বের হন, তখন একবার এসে দেখে যাবেন? আপনি দু'একটা মতামত দিলেই আমি আবার ঠিকমত কাজ করতে পারব।'

'হয়ত পারবে, কিন্তু আমি যে ভয়ানক ব্যস্ত। আমি এখন যাই!' বলেই তিনি যেন খানিক এগিয়ে গেলেন। ভিনসেন্ট নিশ্চল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

জগতে কি ঘটেছে? কাজিনকে সে কি অপমান করেছে? সে কি কোনভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছে?

কয়েকদিন পর ভাইসেনব্রুককে তাঁর স্টুডিয়োতে ঢুকতে দেখে ভিনসেন্ট ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ সে জানত ভাইসেনব্রুক কোনও নতুন চিত্রশিল্পীদের সম্পর্কে মাথা ঘামাতেন না, মাঝে মাঝে গাল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বলতেন না। তাই তাঁকে আসতে দেখে অবাক হবারই কথা তার।

'বাঃ!' চারদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন 'আরে, এযে রাজপ্রাসাদ দেখছি! এখানেই তুমি বসে রাজা আর রাণীর ছবি আঁকবে মনে হচ্ছে।'

'আপনার যদি ভালো না লাগে, আপনি চলে যেতে পারেন'– ভিনসেন্ট গর্জন করে বললেন।

'ছবি আঁকা ছেড়ে দেও না কেন ভ্যান গোঘ্। ও তো কুকুরের জীবন।'

'কিন্তু সে জীবনেই আপনি উন্নতি করেছেন।'

'আমি করেছি, কিন্তু তুমি কোনদিনই করবে না।'

'বোধ হয় পারব না, কিন্তু আপনার চেয়ে বহুগুণে ভাল ছবি আমি আঁকব।'

'ভাইসেনব্রুক হেসে উঠলেন। 'না, তা পারবে না, তবে হেগ শহরের অন্য শিল্পীদের থেকে তুমি হয়ত ভাল পারবে। তোমার আঁকা ছবিতে যদি তোমার ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে, তবে......'

'সে কথা বলেন না কেন?' বলে ভিনসেন্ট তার পোর্টফলিওটা নিয়ে এল। 'বসবেন?'

'বসে বসে আমি ভাল দেখতে পাই না।'

জল রঙে আঁকা ছবিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন তিনি, 'জল-রঙের মাধ্যম তোমার নয়। তুমি যা বলতে চাও তা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে জল-রঙ একান্ত দীপ্তিহীন।' এর পরে জন বোরেন, ব্রাক্সটাইন এবং হেগ শহরে আঁকা বৃদ্ধদের পেন্সিল স্কেচগুলো দেখতে লাগলেন। একটার পর একটা ছবি দেখে তার মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ভিনসেন্ট তিরস্কার শোনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

'তুমি সত্যি ভাল আঁক, ভিনসেন্ট'– ভাইসেন ব্রুক বললেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন চক্চক্ করছিল। 'আমি নিজেও এ ছবি দেখে আঁকতে পারি।'

ভিনসেন্ট কঠিন আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ভাইসেন ব্রুকের কথা শুনে সে কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

'শুনেছিলাম আপনাকে লোকে 'দয়াহীন তরবারি' বলে ডাকে।'

'হ্যাঁ, তাই ডাকে। কারণ কারু ছবি খারাপ হলে আমি খারাপই বলি।'

'কিন্তু ওগুলো দেখে টারস্টিগ আমাকে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ওগুলো একান্ত অমার্জিত ও অচিক্কণ হয়েছে।'

'মূর্খ! ওখানেই তো ওদের সৌন্দর্য!'

'আমি এ ধরনের পেন স্কেচই আঁকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু টারস্টিগ আমাকে জল-রঙে ছবি আঁকতে বললেন।'

'তাহলে তাঁদের বেচার সুবিধা হয়, না? কিন্তু ও কাজ তুমি করো না। যেটা তোমার কাছে পেন স্কেচ ভাল বলে মনে হবে তুমি তাই এঁকো। তা ছাড়া আর কারুর কথা শুনো না–এমন কি আমারও না। নিজের মত কাজ করে যাও।'

'তাই যেতে হবে মনে হয়।'

'তুমি জন্ম-শিল্পী বলে মভ্‌ মন্তব্য করায় টারস্টিগ আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু তাতে মভ্‌ তোমার পক্ষ নিয়ে তাঁর কথার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আমি সেখানে থাকলেও চুপ করেছিলাম। যাক এখন আমি তোমার কাজ দেখেছি, ভবিষ্যতে এমন ধারার কথা উঠলে আমিও তোমার পক্ষ নেব।'

'আমি জন্ম-শিল্পী বলে মভ্‌ মন্তব্য করেছিলেন?'

'করেছিলেন, কিন্তু তাতে যেন তোমার মাথা ঘুলিয়ে না যায়। জন্ম-শিল্পী হিসাবে যদি মরতে পার, তবেই তুমি সার্থক হবে।'

'কিন্তু সেদিন তিনি আমার সঙ্গে এমনভাব দেখালেন কেন?'

'কোন ছবি শেষ করার সময় তিনি সবার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করেন, ভিনসেন্ট। এতে তুমি কিছু মনে করো না, তাঁর কাজ শেষ হয়ে এলেই তিনি আবার ঠিক হয়ে যাবেন। এর মধ্যে তোমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আমার স্টুডিয়োতে যেতে পার।'

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ভাইসেনব্রুক।'

'কি কথা?'

'মভ্‌ কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন পাঠিয়েছেন?'

'কারণ তোমার কাজ সম্পর্কে তিনি আমার মতামত জানতে চান।'

'কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, আমি একজন জন্ম-শিল্পী তবে কেন তিনি তা জানতে চাইবেন?'

'বলতে পারি না। বোধ হয় টারস্টিগ তোমার সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

৬.

টারস্টিগ তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকলেও এবং তার প্রতি মভের ব্যবহার কেমন প্রাণহীন হয়ে উঠলেও ক্রিস্টিনা ধীরে ধীরে সে স্থান গ্রহণ করছিল। যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা সে এতদিন করে এসেছে, সেই অতিসাধারণ বন্ধুত্ব দিয়ে তার জীবনকে পূর্ণ করে তুলছিল সে। প্রত্যেকদিন ভোরে সে স্টুডিয়োতে আসত, সঙ্গে থাকত তার একটা সেলাইয়ের বাক্স, যাতে ভিনসেন্টের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওর হাতও কাজ করে যেতে পারে। ক্রিস্টিনার কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ এবং ভাষা কেমন অমার্জিত, তবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে কথা বলত। তাই কাজে যখন মনোনিবেশ করতে চাইত ভিনসেন্ট তখন ওর কথায় কান না দিয়েও পারত। বেশি সময়ই ক্রিস্টিনা স্টোভের পাশে চুপ করে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত অথবা নবজাতকের জন্য কিছু সেলাই করতে ভালবাসত। মডেল হিসাবে সে আদৌ আদর্শ ছিল না প্রথমে, কিন্তু পরে সে সব শিখে নিয়েছিল, তবে মডেল হওয়ার চেয়ে ভিনসেন্টকে খুশি করাই ছিল তার অভিলাষ। বাড়ি চলে যাওয়ার আগে ভিনসেন্টের ডিনার সে বানিয়ে রেখে যেত।

'আমার খাবার জন্য তুমি কিছু ভেবো না সিয়েন' সে ক্রিস্টিনাকে বলল।

'এতে ভাববার কি আছে? তোমার চেয়ে রান্না তো আমি ভালই করি।'

'তা হলে আমার সঙ্গে তোমাকে খেতেও হবে।'

'আপত্তি নাই কিছু। মা ছেলেমেয়ে গুলোকে দেখাশুনো করবেন। আমি এখানে থেকে যাব।'

ভিনসেন্ট ক্রিস্টিনাকে প্রতিদিন এক ফ্রাঙ্ক করে দিত। সাধ্যাতীত ব্যয় যে করছ, তা সে জানত; কিন্তু ওর সঙ্গ ভাল লাগত বলেই দিত। তাছাড়া ওতে লন্ড্রির কাজের চাপ থেকে রেহাই দিতে পেরেছে ভেবে আনন্দ পেত। কখনও যদি দুপুরবেলা তাকে বাইরে যেতে হত, তবে মাঝ রাত পর্যন্ত সে ক্রিস্টিনার ছবি আঁকত। ক্রিস্টিনাও সেদিন আর বাড়ি যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করত না। স্টোভের পাশে কর্মরত ক্রিস্টিনাকে দেখে তার বড় ভাল লাগত। জীবনে সে এইবার সর্বপ্রথম গৃহকর্ত্রী পেয়েছে–এ যে বড় আরামের। কোন কোন দিন বিনা কারণেও ক্রিস্টিনা থেকে যেত। 'আমার বোধ হয় আজ রাতে এখানেই থেকে যেতে হবে, ভিনসেন্ট'– সে হয়ত বলত– 'থাকতে পারবো তো?'

'কেন পারবে না, সিয়েন। যতদিন খুশি থেকে যাও। তুমি থাকলে আমি আনন্দিতই হব।'

ভিনসেন্ট কিছু না বললেও সিয়েন তার জামা সেলাই করে দিত, কাপড় ধুয়ে দিত, ছোটখাট জিনিস কিনে আনত।

'নিজেদের যত্ন কি করে নিতে হয়, তোমরা পুরুষরা আদৌ তা জান না'–সে বলত। 'তোমাদের কাছে কাছে একজন মেয়েমানুষ থাকা দরকার। তোমাকে যে বাজারে ঠকিয়ে দেয় তাতে কোনই ভুল নেই।'

সিয়েনকে নিপুণা গৃহকর্ত্রী বলা যায় না। বাড়িতে কোন কাজ কর্ম না করায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার অভ্যাসটা তার ছিলই না। সুশৃঙ্খলভাবে কিছুই সে করতে পারত না। হঠাৎ এটা ওটা নিয়ে লাগত। মনের মতন মানুষের ঘরে এইবার সে সর্বপ্রথম কাজ করছে। তাই কাজ করতে তার আনন্দই হত। সিয়েনের কাজ করবার ইচ্ছা আছে দেখেই ভিনেসন্ট উৎফুল্ল হয়ে উঠত। ঢিলেমির জন্যে তাকে মন্দ বলার কথা সে ভাবতেও পারত না। কিছুদিন সিয়েনকে রাতদিন গাধার মতন খাটতে না হওয়ায় তার কণ্ঠস্বরের কর্কশতা অনেক হ্রাস পেয়েছিল, কুৎসিত কথা বলার অভ্যাসটা অনেক কমে গিয়েছিল। অবশ্য আপন চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা তার না থাকায় কোন কিছুর জন্য অসন্তুষ্ট হলে সে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ত। সে সময় তার কণ্ঠে দেখা দিত সেই কর্কশ স্বর, আর মুখে অশ্লীলতম ভাষা, যে ভাষা ভিনসেন্ট জীবনে কোনদিন শোনেনি।

সে সময় সিয়েনকে নিজের ব্যঙ্গ চিত্র বলে মনে হত ভিনসেন্টের। ঝড় না থামা পর্যন্ত সে চুপ করে বসে থাকত। অবশ্য ক্রিস্টিনাও কম সহনশীলা ছিল না। ছবি যখন ভুল হয়ে যেত অথবা তার শেখানমত না বসে ভুলভাবে 'পোজ' দিতে বসত, তখন ভিনসেন্ট ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠত। ক্রিস্টিনা কোনপ্রকার বাধা না দিয়ে চুপ করে

থাকত। অল্পক্ষণের ভিতরই অবশ্য ভিনসেন্ট শান্ত হয়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে দুজনই একসময় রাগত না।

ক্রিস্টিনার অনেকগুলো ছবি আঁকার পর ওর শরীরের রেখা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত হবার পর ভিনসেন্ট সত্যিকারের একটা স্টাডি তৈরি করবার সিদ্ধান্ত করল। মাইকেলেটের একটা লাইন পড়ে তার এই ইচ্ছা জেগেছিল; লাইনটি হচ্ছে : 'এ জগতে সঙ্গীহীন, পরিত্যক্ত নারী কি করে থাকতে পারে?'

স্টোভের কাছে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর সে ক্রিস্টিনাকে নগ্ন অবস্থায় বসাল। সে ছবিতে এই কাঠের গুঁড়িটাকে বৃক্ষমূল পরিণত করে ওর আশেপাশে কিছু লতাগুল্ম এঁকে দিল; তাতে উদ্যানের একটা ভাব এসে গেল। তারপর সে ক্রিস্টিনাকে আঁকতে আরম্ভ করল। ক্রিস্টিনা যেন হাঁটুতে তার গ্রন্থিল হাত রেখে বসে আছে; শীর্ণ হাত দুটিতে মুখ ঢাকা, কেশগুচ্ছ পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে, কন্দাকৃতি স্তনদ্বয় শুকনো জঙঘার স্পর্শলাভের জন্য ঝুলে পড়েছে, পা'দুটি যেন বিপজ্জনক অবস্থায় মাটির উপর পড়ে আছে। ভিনসেন্ট ছবিটির নাম দিয়েছে 'দুঃখ'। যে মেয়ের সমস্ত জীবনের রস নিঃশেষে শুষে নেয়া হয়েছে এ যেন তারই প্রতিচ্ছবি। ভিনসেন্ট ছবিটির নিচে মাইকেলেটের ঐ লাইনটি লিখে দিল।

স্টাডিটা শেষ করতে সপ্তাহ খানেক লাগল, এর মধ্যে তার সমস্ত পয়সাই ফুরিয়ে গেল। অথচ মাস শেষ হতে এখনও দশদিন বাকি। ঘরে যে কালো রুটি ছিল তাতে অবশ্য আরও দুই তিনদিন চলবে। মডেল নিয়ে কাজ করার ব্যবস্থা তার একদম বন্ধ করে দিলে তাতেও তার কিছু বাঁচবে।

'আসছে মাসের পয়লা তারিখের আগে আমি তোমাকে আর খাটাতে পারব না, সিয়েন।' ভিনসেন্ট বলল।

'কেন, কি হয়েছে?'

'আমার সব পয়সা ফুরিয়ে গেছে।'

'আমার কথা ভাবছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কিছু করার নেই, তবু আমি আসব।'

'কিন্তু তোমার ত' টাকা দরকার, সিয়েন।'

'সে আমি উপায় করব।'

'সারাদিন এখানে থাকলে লন্ড্রিতে কাজ করবে কি 'করে?'

'...তা ...সেজন্য ভেবো না, ঠিক জোগাড় করে নেব।'

রুটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই তিনদিন তাকে আসতে দিল। মাস শেষ হতে তখনও সাতদিন বাকি। একদিন সে গিয়ে জানাল যে, কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সে আমস্টারডাম যাচ্ছে, ফিরে এসে তখন আবার দেখা করবে। জল খেয়েই সে গিয়ে স্টুডিয়োতে বসে কিছু কাজ করল। এক দিন দুপুরে ডি বকের ওখানে গেল, কিছু জলযোগ হবে।

'আরে, এসো' ইজেলের সম্মুখে বসে ডি বক বলল, 'একটু আরাম করে বসো। নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এঁকে যাব একটানা। টেবিলে কতকগুলো সাহিত্য পত্রিকা আছে দেখ ওগুলো বসে বসে।'

চায়ের কথা সে কিছুই বলল না।

মভ যে তাকে দেখতে আসবে না ভিনসেন্ট তা জানত। কিন্তু জেট্এর কাছ থেকে টাকা ধার করতেও তার লজ্জা হচ্ছিল। টারস্টিগ তার বিরুদ্ধে মভ্কে বলেছে। সুতরাং তার কাছে ধার চাওয়ার চেয়ে না-খেয়ে-মরা সে শ্রেয় বলে মনে করে। সে নানাভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু নিজের ছবি ছাড়া অন্যভাবে কিছু উপার্জন করা তার পক্ষে অসাধ্য মনে হয়। পুরানো শক্ত জ্বরের প্রকোপে আবার সে পড়ল। হাঁটু দুটি শুকিয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে শয্যা নিতে হল। অসম্ভব হলেও সে মনে করত যে, হয়ত এমন কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটবে যার ফলে মাস শেষ হবার আগেই থিওর টাকাটা এসে যাবে। তখনও সে জানতো না যে, পয়লা তারিখের পূর্বে থিও বেতন পায় না।

পঞ্চম দ্বিপ্রহরে কোন শব্দ না করেই ক্রিস্টিনা ঘরে ঢুকে পড়ল। ভিনসেন্ট তখন ঘুমোচ্ছিল। ক্রিস্টিনা শয্যা পাশে এসে দাঁড়িয়ে ভিনসেন্টের ললাটের কুঞ্চিত রেখা, লাল দাড়ির নিচে চর্মের বিবর্ণতাও তার ওষ্ঠদ্বয়ের শুষ্কতা লক্ষ্য করতে লাগল। ডান হাতটা আলতোভাবে তার কপালে স্পর্শ করে বুঝল তার জ্বর এসেছে। যেখানে খাওয়ার জিনিসপত্র রাখে সেই সেলফ্‌টা একবার খুঁজল। কিন্তু এক টুকরো কালো রুটি বা এক বিন্দু কফিও পেল না। ক্রিস্টিনা বেরিয়ে গেল।

ঘন্টাখানেক পরে ভিনসেন্ট শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল তাদের ইটেনের রান্নাঘরের–মা যেন তার জন্যে শিম পাকাচ্ছেন। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল–দেখল ক্রিস্টিনা স্টোভের উপর কি যেন তৈরি করছে।

'সিয়েন'– সে ডাকল।

সিয়েন শয্যাপাশে এসে তার ঠাণ্ডা হাতটা ওর গালে রাখল। 'অহঙ্কারে ফুলে আমাকে আর মিছে কথা বলো না'– সিয়েন বলল, 'গরিব আমরা কিন্তু সে তো আমাদের দোষ নয়। পরস্পরকে সাহায্য করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। যেদিন পানশালায় তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিন তো তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে–না?'

'সিয়েন' সে আবার ডাকল।

'তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বাড়ি থেকে কিছু আলু আর শিম এনেছি। রান্নাও হয়ে গেছে।'

প্লেটে কিছু আলু চটকিয়ে তার পাশে শিম নিয়ে ক্রিস্টিনা শয্যা পাশে বসে ওকে খাইয়ে দিতে লাগল। 'তোমার ত বেশি টাকা ছিল না, তবু প্রত্যেকদিন আমাকে টাকা কেন দিতে বলত? পরকে দিয়ে না খেয়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়।'

কয়েক সপ্তাহ দেরি হলেও থিও প্রেরিত অর্থ না আসা পর্যন্ত ক্লেশ সহ্য করার শক্তি ভিনসেন্টের ছিল; কিন্তু অপ্রত্যাশিত দয়া যদি কেউ দেখাতো তবেই তার মেরুদণ্ড ভেঙে যেত। যাহোক, টারস্টিগের সহিত সাক্ষাৎ করবে বলে ঠিক করল। ক্রিস্টিনা শার্টটা

ধুয়ে দিল কিন্তু ইস্ত্র না থাকায় তা পাট করা সম্ভব হল না। পরের দিন ভোরে সিয়েন কিছু রুটি ও কফি দিয়ে প্রাতঃরাশ সাজিয়ে দিল। খেয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে প্লাৎস রওনা হল। জুতোটা তার ছেঁড়া, ট্রাউজার কাদা আর মাটি ভরা। থিওর কোটটা অত্যন্ত ছোট বলে বেমানান দেখাচ্ছিল। পুরোনো নেকটাইটা বাঁদিকে সরে গিয়েছিল। মাথার টুপিটাও ছিল বেমানান ধরনের দেখতে।

যানবাহন মুখরিত বনসীমা পথ এবং স্টেশনের পথ পরিত্যাগ করে ভিনসেন্ট রেলপথ ধরে হাঁটতে লাগল। ক্ষীণ সূর্যালোকে তার শরীরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। প্লীন এর কোন দোকানে ঝোলান একটি আয়নার প্রতি হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল। অকস্মাৎ চোখের সম্মুখে যেন ফুটে উঠল হেগ শহরের কেউ কেউ তাকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার সেই চেহারা : ধূলিধূসরিত, লক্ষ্যহীন যাত্রী, অনাদৃত, অনাহূত, পীড়িত, দুর্বল, কুশ্রী আর গোত্রহীন।

প্লাৎসের দোকানগুলো এমন জায়গায় ছিল যে, সেখানে সাধারণ দোকান করা একপ্রকার অসম্ভব। ওখানে যেতেই ভিনসেন্টের ভয় করত।

গুপীলদের দোকানের কর্মচারীরা সব ঝাড়পোছ করছিল। তাকে দেখে কেমন কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল। এ লোকটারই পরিজন ইউরোপের আর্টের জগৎ নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এ এমন নোংরাভাবে চলাফেরা করে কেন?

টারস্টিগ্ দোতলার অপিস ঘরে বসে একটা কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে ডাকের চিঠিপত্র খুলছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল ভিনসেন্টের ভুরুর নিচে নামান গোলাকার কানদুটি, ডিম্বাকৃতি মুখমন্ডল যা চোয়াল পর্যন্ত ছুঁচলো হয়ে গিয়ে আবার থুতনির কাছে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, বাঁ দিকে চুল-উঠে-যাওয়া মাথাটি, নীলাভ-সবুজ চোখ দুটি, দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ কিন্তু ভাবহীন, আর লাল রঙের দাড়ি আর গোঁফে ভরা মুখটি। ভিনসেন্টের মুখ সুন্দর কি কুৎসিত এ সম্বন্ধে কোনদিন তিনি মনস্থির করতে পারেননি।

'আজ প্রাতে তুমিই এ দোকানের প্রথম ক্রেতা, ভিনসেন্ট' তিনি বললেন, 'বলত তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'

ভিনসেন্ট তার অবস্থার কথা খুলে বলল।

'ভাতার টাকা দিয়ে কি করেছ?'

'খরচ করেছি?'

'বেহিসাবীকে আমি উৎসাহ দেব এই কি তুমি আশা করো? প্রত্যেকদিন হিসাব করে নিয়ে তোমার খরচ করা উচিত।'

'আমি বেহিসাবী হইনি। মডেলের টাকা যোগাতেই আমার সব টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

'তাহলে এখন মডেল ভাড়া করা তোমার উচিত হবে না। নিজে নিজেই যা হয় কাজ কর।'

'ফিগার যে আঁকতে চায় তার পক্ষে মডেল না হলে কাজ করা সর্বনাশেরই সমতুল।'

'ফিগার আঁকার কোন প্রয়োজন নেই। গরু ঘোড়ার ছবি আঁক গিয়ে। এজন্য কোন পয়সা খরচ করতে হবে না।'

'ওগুলো আঁকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিজ্‌নের।'

'থাকগে, মানুষের ছবি আঁকা কোনক্রমেই তোমার উচিত হবে না। ওগুলো তুমি বিক্রিও করতে পারবে না। জল-রঙের ছবি ছাড়া আর কিছু আঁকার দরকার নেই?'

'কিন্তু জল-রঙ আমার মাধ্যম নয়।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল।

'ডি বকের পয়সার অভাব নেই, কিন্তু তবু সে মডেল নিয়ে কাজ করে না। তা বলে তাঁর ছবি যে খারাপ হয় না একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে। ওঁর ছবির দামও বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর ছবির সৌন্দর্য কিছুটা করায়ত্ত কর আমি তাই চাচ্ছিলাম। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা হল না। সত্যি আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, ভিনসেন্ট। তোমার ছবির কোন উন্নতিই হয়নি। তুমি যে আর্টিস্ট নও এবিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।'

গত পাঁচদিনের অনাহার অকস্মাৎ যেন ভিসেন্টের পদদ্বয়ের সমস্ত শক্তি হরণ করল। হাত-বাঁকানো একটা ইতালিয়ান চেয়ারে সে দুর্বল ভাবে বসে পড়ল। তার কণ্ঠস্বর যেন কোন অতল গহ্বরে হারিয়ে গেল।

'একথা আমাকে কেন বলছেন, মিজ্‌নের' কিছুক্ষণ পরে সে বলল।

টার্‌স্টিগ একখানা ধব্‌ধবে রুমাল নিয়ে তাঁর নাক, মুখের কোণ এবং চিবুকের দাঁড়ি মুছে বললেন, 'তোমাদের পরিবার ও তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয় তার জোরেই বলছি, সত্যটা তোমার জানা উচিত। যদি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো তবে নিজেকে বাঁচাবার সময় এখনও আছে, ভিনসেন্ট। আর্টিস্ট হওয়া তোমার বরাতে নেই। জীবনের সঠিক পথ তোমার খুঁজে নিতে হবে। আর্টিস্টদের ব্যাপারে আমি কোনদিন ভুল করি না।'

'আমি জানি' ভিনসেন্ট বলল।

'তুমি তুলি ধরেছ অনেক দেরিতে, তাই আমার প্রধান আপত্তি। ছোটকাল থেকেই যদি কাজ আরম্ভ করতে তবে এতদিনে হয়ত কিছু উন্নতি তোমার হত। এখন তোমার বয়স ত্রিশ বছর, এতদিনে তোমার সাফল্য পাওয়া উচিত ছিল, ভিনসেন্ট। কিন্তু পারনি। প্রতিভা না থাকলে উন্নতি করবার আশাই বা কি করে করবে? থিওর কাছ থেকে হাত পেতে দয়া নেওয়াও কেমন বিসদৃশ মনে হচ্ছে।'

'মভ্‌ আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ভিনসেন্ট ঠিক শিল্পীর মতই তুলি টানতে পার।'

'মভ্‌ তোমার কাজিন, বোধহয় দয়াপরবশ হয়ে তিনি ওকথা বলেছেন। কিন্তু আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে যে দয়া দেখাই সেটা উন্নততর। সময় থাকতে এ-পথ তুমি ছেড়ে দাও, নয়ত পরে আফসোস করতে হবে। আমার কথা শুনলে হয়ত একদিন নিজের পথ খুঁজে পাবে এবং আমাকে তার জন্যে ধন্যবাদ জানাবে।'

'চার পাঁচদিন ধরে একটুকরো রুটি কেনার মতো একটা পয়সাও আমার পকেটে নাই, মিজনের টারস্টিগ। তবু আমার জন্যে হলে আমি নিশ্চয় আপনার কাছে পয়সার জন্য অনুরোধ করতাম না। কিন্তু একটি দুর্বল ও রোগগ্রস্ত মডেলকে আমার দেখতে হয়। তার প্রাপ্ত টাকাও আমি পরিশোধ করতে পারিনি। ঐ টাকার তার ভয়ানক

প্রয়োজন। আমাকে দশ-গিল্‌ডার ধার দেবার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। থিওর টাকা এলেই আমি এটা দিয়ে দেব।'

টারস্টিগ্‌ উঠে বাতায়ন পথে পুকুরের হাঁসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমস্টারডাম, ব্রুসেলস্‌ ও প্যারিস প্রভৃতি শহরে ভিনসেন্টের কাকা-জ্যাঠাদের বড় বড় ছবির দোকান থাকতে সে যে কেন হেগ শহরে থাকে তিনি তা ভেবে আশ্চর্য হলেন।

'দশ গিল্‌ডার ধার দিলে তোমার উপকার হবে তুমি মনে করছ'– ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন। 'কিন্তু টাকা ধার দিলে তোমার উপকার হবে তুমি মনে করছ'– ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন। 'কিন্তু টাকা ধার করতে রাজি না হলেই তোমার বেশি উপকার হবে কিনা আমি তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।'

আলু আর শিম কেনার পয়সা যে সিয়েন যোগাড় করেছে ভিনসেন্ট তা জানে। ওভাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া যেতে পারে না।

'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, মিজ্‌নের টারস্টিগ আমি আর্টিস্ট নই, আমার কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং পয়সা দিয়ে সাহায্য করে আমাকে উৎসাহিত করা আপনার পক্ষে নির্বোধের কাজ হবে। আমাকে এক্ষুণি কাজ করতে হবে এবং জীবনের পথ খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু তবু পুরাতন বন্ধুত্বের জন্য আমাকে দশ গিল্‌ডার ধার দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

টারস্টিগ্‌ স্বীয় প্রিন্স এলবার্ট কোটের ভিতরে ঢুকিয়ে ওয়ালেট থেকে একটা দশ গিল্‌ডারের নোট বের করলেন এবং কোন কথা না বলে তা ভিনসেন্টের হাতে দিলেন।

'ধন্যবাদ'– ভিনসেন্ট বলল, 'আপনি সত্যি দয়ালু।'

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাজপথ ধরে সে বাসায় ফিরতে লাগল। দু'পাশে তার সুসজ্জিত অট্টালিকা। ওরা যেন উচ্ছ্বসিতভাবে ওকে জানিয়ে দিচ্ছিল তাদের নিরাপত্তা, আরাম আর শান্তির কথা। শুনে সে আপন মনে গুঞ্জন করে উঠল– 'সর্বদাই একজন বন্ধু থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে তাকে বিবাদও করতে হয়। আমাকেও তাই করতে হবে। ছ'মাসের মধ্যে আমি টারস্টিগের সঙ্গে আর দেখা করব না, কথা বলব না অথবা আমার কোন কাজও তাঁকে দেখাব না।'

ডি বকের ছবির বিশেষ চার্ম–যার জন্যে তার ছবির এত বিক্রি; তা দেখার জন্যে সে ওর ওখানে নামল। কিন্তু সে তখন ছবি না এঁকে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে একখানা ইংরেজী নভেল পড়ছিল।

'আরে, তুমি যে!' সে বলল, 'আমি বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি। একটি লাইনও আঁকতে পারছি না। চেয়ার টেনে বসে আমাকে একটু জাগিয়ে তোল ত। এখন সিগারের ধূমপান করা কি বেখাপ্পা হবে? কোন গালগল্প আছে নাকি নতুন?'

'তোমার কতকগুলো ক্যানভাস আমি দেখতে চাই। দেখাবে ডি বক? আমি বুঝতে চাই কেন তোমার ছবি বিক্রয় হয় আর আমারটা হয় না।'

'প্রতিভা, বুঝলে বুড়ো ছেলে, প্রতিভা।' অলসভাবে উঠতে উঠতে ডি বক বলল। এটা ভগবৎ দত্ত। হয় এটা তোমার থাকবে অথবা থাকবে না। আমার ভিতর কি আছে আমি তা তোমাকে বলতে পারব না। আমি অভিশপ্ত জিনিস আঁকি।'

ডি বক ফ্রেমে আটকান গোটা ছ'য়েক ছবি এনে উপস্থিত করল এবং ওগুলো নিয়ে হাল্‌কাভাবে আলোচনা করতে লাগল। ভিনসেন্ট বসে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ছবিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত হয়েছিল তা দেখতে লাগল।

'আমার ছবি অনেক ভাল'– সে আপন মনে বলল, 'কারণ ওগুলো জীবন্ত ও আন্তরিক। সে সমগ্র পেইন্ট বক্সের সাহায্যে যা ফুটিয়ে তুলত পারে, আমি ছুতোর মিস্ত্রীর সাধারণ একটা পেন্সিলের সাহায্যে তার চেয়ে বেশি পারি। তার বিষয়বস্তুতে কোন নতুনত্ব নেই। অনেক কিছু বলে সে, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না স্পষ্ট করে। কিন্তু লোকে তাকেই প্রশংসা দেয়, দেয় অর্থ আর আমার বেলায় কালো রুটি; আর কফির দাম দিতেও অস্বীকৃত হয়?'

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে ভিনসেন্ট আপন মনে বলল– 'ও বাড়িটাতে কেমন যেন একটা সর্বনাশী আবহাওয়া রয়েছে। ডি বকের মধ্যে রয়েছে যে কৃত্রিমতা ও রহস্যময়তা তা আমাকে পীড়ন করে। ডি বক তার সৌন্দর্য আর অর্থ নিয়ে থাকুক। আমি বাস্তবের সংঘাতময় কঠিন জীবন-ব্রতই বেছে নিলাম। এ পথে কারো ধ্বংস হয় না।'

ভিনসেন্ট বাড়ি এসে দেখল ক্রিস্টিনা একটা ভিজে নেকড়া দিয়ে স্টুডিয়োর কাঠের মেঝে মুছে দিচ্ছে। চুলগুলো তার একটা কালো রুমাল দিয়ে বাধা ছিল এবং মুখে স্বেদকণা চক্‌চক্‌ করছিল।

'টাকা পেয়েছো?' মুখ তুলে সে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, দশ ফ্রাঙ্ক পেয়েছি।'

'বড়লোক বন্ধু থাকা বেশ ভাল, না?'

'হ্যাঁ। এই নাও তোমার পাওনা ছয় ফ্রাঙ্ক।'

সিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে কালো এ্যাপ্রনে মুখটা মুছে ফেলল।

'তোমার ভাইয়ের টাকা না আসা পর্যন্ত এখন আমাকে কিছুই দেওয়া তোমার উচিত নয়'– সিয়েন বলল, 'চার ফ্রাঙ্কে তোমার আদৌ চলবে না।'

'আমি কোন রকমে চালিয়ে নেব, সিয়েন। কিন্তু তোমার টাকার দরকার রয়েছে।'

'তোমারও রয়েছে। শোন, আমাদের এখন কি করা উচিত। তোমার ভাইয়ের চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। এই দশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে আমরা দুজনে ভাগ করে চালাব। এই টাকায় আমি তোমার চেয়ে বেশি দিন চালাতে পারব।

'কিন্তু 'পোজ' দেবার কি হবে? ও জন্যে ত তোমাকে আর পৃথক টাকা দিতে পারব না।'

'তুমি আমাকে খেতে ও থাকতে দিচ্ছ। এই ত যথেষ্ট–তাই না? এই উষ্ণতার মধ্যেই আমি থাকতে চাই, লন্ড্রির কাজে গিয়ে আবার অসুস্থ হবার ইচ্ছা আমার নেই।'

ভিনসেন্ট ওকে আপন বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর কপাল থেকে চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিল।

'মাঝে মাঝে সত্যি তুমি অলৌকিক কিছু করে ফেল সিয়েন। আমাকে তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তোল!'

৭.

সপ্তাহখানেক পর ভিনসেন্ট মভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মভ্ ওকে তাঁর স্টুডিয়োতে ডেকে নিলেন সত্য কিন্তু ভিনসেন্ট দেখার আগেই একটা কাপড় দিয়ে ক্যানভাসটা ঢেকে দিলেন।

'কি চাই তোমার?' কিছু যেন জানেন না এমনভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'সঙ্গে করে কতকগুলো ওয়াটার কালার এনেছি। আশা করেছিলাম এগুলো আপনি দেখে দিতে পারবেন।'

মভ্ কেমন অন্যমনস্ক ভাবে কতকগুলো তুলি আর ব্রাস পরিষ্কার করছিলেন। তিন রাত তিনি শয্যা স্পর্শ করেননি। স্টুডিয়োতে যে সব কোচ্ ছিল তাতে যেটুকু ঘুমুতে পেরেছিলেন তাতে আরাম পাচ্ছিলেন না।

'সব সময় তোমার ছবি দেখার মত 'মুড' আমার থাকবে এমন কোন কথা নেই, ভিনসেন্ট। আজ আমি ভয়ানক পরিশ্রান্ত। দয়া করে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কাজিন মভ্,' দোরের দিকে যেতে যেতে ভিনসেন্ট বলল। 'আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না এখন। তবে, কাল সন্ধ্যায় আসব কি?'

মভ্ তখন ইজেল থেকে ঢাকনাটা তুলে নিয়েছিলেন। ভিনসেন্টের কথা তাঁর কানেও পৌঁছায়নি।

পরের দিন সন্ধ্যায় এসে ভিনসেন্ট সেখানে ভাইসেনব্রুককে দেখতে পেল। মভ্ তখন চূড়ান্তভাবে পরিশ্রান্ত। নিজেকে ও বন্ধুকে একটু উৎফুল্ল করে তোমার জন্য মভ্ ভিনসেন্টকে নিয়ে পড়লেন।

'এই দেখ ওর চেহারা, ভাইসেনব্রুক' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

তিনি মুখের ভঙ্গিটা অনেকটা ভিনসেন্টের মত করলেন। তারপর ভাইসেনব্রুকের কাছে গিয়ে চোখদুটো আধাবুজো করলেন, 'এই এমনিভাবে ও কথা বলে'– বলে ভিনসেন্টের মত ভারী গলায় কথা বলতে লাগলেন। শুনে ভাইসেনব্রুক অট্টহাসি করে উঠল।

'অবিকল, অবিকল,' তিনি বলে উঠলেন। 'এমনি দৃষ্টিতে অন্যরা তোমাকে দেখে ভ্যান গোঘ্। তুমি যে এত সুন্দর একটা জানোয়ার আগে কি তা জানতে? মভ্ তোমার থুতনিটা আবার বাড়িয়ে দিয়ে দাড়িটা চুলকাও। বাবাঃ, দেখে আমার পেট ফাটার জোগাড়।'

ব্যাপার দেখে ভিনসেন্ট বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। জড়োসড়ো হয়ে সে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের কণ্ঠস্বর সে নিজেই চিনতে পারছিল না।

'বৃষ্টির মধ্যে লন্ডনের রাস্তায় অথবা শীতের মধ্যে বোরিনেজের খোলা রাস্তায় অভুক্ত, গৃহহীন এবং জ্বর নিয়ে যদি আপনাদের রাত কাটাতে হত তবে আপনাদের মুখেও অমনি কুৎসিত দাগ পড়ত আর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠত এমনি কর্কশ।'

কিছুক্ষণ পরে ভাইসেনব্রুক চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই মভ্ কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। এইটুকু রঙ্গরসেই তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ভিনসেন্ট নিস্পন্দ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলঃ এক সময় মভ্ ওকে দেখতে পেলেন।

'তুমি এখনও রয়েছো?' তিনি বললেন।

এইমাত্র মভ্ যেভাবে ভিনসেন্টের মুখের ভঙি করে ঠাট্টা করছিল ঠিক তেমনিভাবে মুখভঙ্গি করে তীব্র কণ্ঠে সে বলল– 'আমাদের দু'জনের মধ্যে কি হয়েছে বলতে পারেন, কাজিন মভ্? আমি আপনার কি করেছি তা-ই বলুন? কেন আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন?'

মভ্ অত্যন্ত অবসন্নভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাম্‌নে এসে পড়া চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিলেন।

'আমি তোমার কাজ সমর্থন করি না, ভিনসেন্ট। তোমাকে এখন উপার্জন করতে হবে। সবার কাছে হাত পেতে ভ্যান গোঘ্ পরিবারের সুনাম নষ্ট কর এ আমি চাই না।'

ভিনসেন্ট এক মিনিট কি চিন্তা করল। তারপর বলল, 'টারস্টিগ আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল কি?'

'না।'

'তাহলে, আপনি আর আমাকে শেখাবেন না?'

'না।'

'বেশ। কোনপ্রকার তিক্ততার বা ঘৃণা মনে না রেখে আসুন আমরা করমর্দন করি। আপনার প্রতি আমার যে কৃতজ্ঞতা আছে তা কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হবে না।'

মভ্ অনেকক্ষণ কোন জবাব দিলেন না, তারপর বললেন, 'আজকের কথা মনে রেখো না, ভিনসেন্ট। আজ আমি ভয়ানক ক্লান্ত এবং পীড়িত। আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব। সঙ্গে করে কোন ছবি এনেছ কি?'

'এনেছি। কিন্তু এখন....'

'দেখি।'

তিনি ছবিগুলো দেখে বললেন, 'ছবিগুলো ড্রয়িং হয়নি, একদম হয়নি। এ সব ছবি আগে আমার চোখেও পড়েনি।'

'কিন্তু আপনিই আমাকে একদিন শিল্পী বলে অভিহিত করেছিলেন।'

'তোমার এই অশোধিত ভাবকে আমি প্রতিভা বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু ভুল। আমার সত্যি যদি কিছু শিখতে চাও তবে তোমাকে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। ঐ কোণে কতকগুলো প্লাস্টার ছাঁচ আছে। ইচ্ছে করলে ওগুলো নিয়ে তুমি এখন কাজ করতে পার।'

ভিনসেন্ট স্বপ্নাবিস্টের মত কোণে প্লাস্‌টারের সম্মুখে বসে পড়ল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে কিছু চিন্তা করতে বা নড়তে চড়তে পারল না। পরে পকেট থেকে ছবি আর কাগজ হয়ত বের করল কিন্তু একটি আঁকও কাটতে পারল না। তাই পেছন ফিরে ইজেলের সম্মুখে দণ্ডায়মান মভের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'ছবিটা কেমন হচ্ছে, কাজিন মভ্?'

মভ্ ছোট চেয়ারটায় বসে পড়তেই তার রক্তিম বর্ণের চক্ষু দুইটি বুজে এল। 'টারস্টিগ আজ বলছিল যে, আমি যা এঁকেছি তার মধ্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।'

কয়েক মুহূর্ত পরে ভিনসেন্ট জোরে মন্তব্য করল,–'তাহলে ওটা টারস্টিগের কীর্তি।'

মভের নাক ডাকছিল, তিনি এসব কথা শুনতে পেলেন না।

কিছু পরে আপনিই তার ব্যথা কমে গেল। আপন মনে আঁকতে শুরু করল। কয়েক ঘন্টার পর ভিনসেন্টের কাজিনের ঘুম ভাঙল, ততক্ষণ সাতটি ছবি এঁকে ফেলেছে। একদম ঘুমান নাই, এমনভাবে লাফ দিয়ে তিনি ভিনসেন্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'দেখি দেখি,' তিনি বললেন।

ছবি সাতটি দেখতে দেখতে তিনি বরাবর বলতে লাগলেন, 'না! না! না!'

সবগুলো ছবি ছিঁড়ে মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। সেই পূর্বের মত অসংস্কৃত ভাব শৌখিন শিল্পীর ছাপ রয়ে গেছে। ঐ সব যেমনভাবে রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আঁকতে পারো না? একটি রেখারও কি তুমি সঠিক টান দিতে পার না? জীবনে অন্তত একবার তুমি একটি জিনিসের প্রতিলিপি আঁকতে পার না?'

তোমার কথাগুলো ড্রয়িং একাডেমির শিক্ষকের মত শোনাচ্ছে, কাজিন মভ্।

'একাডেমিতে যদি যেতে, তবে এতদিনে আঁকতে শিখতে। যাকগে, দেখ এই পা-টা আবার আঁকতে পার কিনা। ভাল করে দেখে নেবে।'

খাওয়ার জন্যে তিনি বাগানের ভিতর রান্নাঘরে চলে গেলেন। আঁধার ঘনিয়ে এলে আলো জ্বেলে আবার কাজে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগল। ভিনসেন্টও আপনমনে ছবি আঁকতে লাগল। যতই সে আঁকছিল ততই তার সামনে বসান প্লাস্টারের ছাঁচের উপর সে রেগে রেগে উঠছিল। উত্তর দিকের জানালা দিয়ে যখন ভোরের আলো উঁকি দিল, তখন তাঁর অনেকগুলো পা আঁকা হয়ে গেছে। সে উঠে দাঁড়াল। মভ ছবিগুলো নিয়ে দেখলেন সঙ্গে সঙ্গেই দুমড়িয়ে নষ্ট করে দিলেন।

'কিছুই হয়নি ওগুলো,' তিনি বললেন। 'আঁকার প্রাথমিক নিয়মও তুমি মাননি। তুমি এখন বাড়ি যাও। এই প্লাস্টারের পা সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ঠিক এটার মত এঁকে দিতে না পারা পর্যন্ত আর তুমি এসো না।'

'এভাবে আঁকলে আমার সর্বনাশ হবে' ভিনসেন্ট চেঁচিয়ে বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ে ওটা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। প্লাস্টারের কথা আর আমাকে বলবেন না, ওর নাম আমি শুনতে পারি না। আঁকার মত জীবন্ত হাত আর পা যখন আর না থাকবে, কেবলমাত্র আমি ঐ ছাঁচ দেখে আঁকব।'

'তাই যদি তোমার মনোভাব হয়–' বরফের শীতল কণ্ঠে মভ্ বললেন।

'যে পদ্ধতি প্রাণহীন, তা আমাকে নিয়ন্ত্রিত করুক সে আমি চাই না কাজিন মভ্, ঐ পদ্ধতি আপনার যারই হোক না কেন। আমার নিজের স্বভাব ও চরিত্র অনুসারেই ছবিকে প্রকাশ করতে হবে। আমি যেভাবেই দেখি, সেভাবেই ছবি আঁকব, আপনি যেভাবেই দেখেন সেভাবে নয়।'

'তাহলে তোমার সম্পর্কে আমার আর কিছুই করণীয়ই রইল না,' ডাক্তার যেন শবের সঙ্গে কথা বলছেন, এমনি কণ্ঠস্বরে মভ্ জবাব দিলেন।

দুপুরে ভিনসেন্টের যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখল, ক্রিস্টিনা তার বড়ছেলে হেরম্যানকে নিয়ে আসছে। বালকটির বয়স হচ্ছে দশ বছর, মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, চোখ দুটি হরিতাভ, দৃষ্টি ভীতত্রস্ত, চিবুকের অস্তিত্ব প্রায় নাই। ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ক্রিস্টিনা তাকে একখণ্ড কাগজ ও পেন্সিল দিয়েছে। লেখাপড়া তাকে শেখান হয়নি। ভিনসেন্ট ডাকতে

ও খুব জড়োসড়ো হয়ে কাছে এলো, কারণ নতুন লোক দেখলে সে খুব সাবধান হয়ে যেতো। কি করে পেন্সিল ধরতে হয় এবং কি করেই বা গরু আঁকতে হয়, ভিনসেন্ট তাকে তা দেখিয়ে দিল। এ দেখে ছেলেটি খুব মজা পেয়ে গেল। এবং দুজনে বন্ধু হয়ে উঠল। ক্রিস্টিনা সামান্য রুটিতে কিছু পনির মাখালো। পরে তিনজনে টেবিলে লাঞ্চ খেতে বসল।

ভিনসেন্টের মনে পড়ল কে এবং ছোট্ট জেনের কথা। তার গলাটা যেন আটকে এল।

'আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, তুমি আমার বদলে হেরম্যানের ছবি আঁকতে পার।'

'কি হয়েছে, সিয়েন?'

'জানি না। মনে হচ্ছে ভিতরটা একদম ওলটপালট হয়ে গেছে।'

'তোমার লেডেনের স্টেট হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

'অন্য ছেলেমেয়ে হবার সময়ও কি তোমার এমনি লেগেছে?'

'শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু এমন লাগেনি। অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছি।'

'তোমার ডাক্তার দেখান উচিত।'

'ফ্রি-ওয়ার্ডের ডাক্তার দেখিয়ে লাভ নেই। তিনি কেবলমাত্র ঔষধ দিয়েই বিদায় দেন। ঔষধ খেয়ে কিছু হবে না।'

'....মনে হয়, উচিত।'

ক্রিস্টিনা সারাদিন বিছানায় শুয়ে কাটাল আর ভিনসেন্ট ছেলেটির ছবি আঁকল। ডিনারের সময় সে হেরম্যানকে ক্রিস্টিনার মায়ের কাছে দিয়ে এল। পরের দিন খুব ভোরে ক্রিস্টিনাকে নিয়ে ট্রেনে লেডেনে যাত্রা করল।

ডাক্তার ক্রিস্টিনাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে বললেন, 'হ্যাঁ, ওর শরীর খারাপ হবার কারণ রয়েছে। ছেলেটি মনে হচ্ছে নড়েচড়ে গেছে।'

'কিছু কি করা যাবে, ডাক্তারবাবু?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক কিছু করা যায়। অপারেশন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'অপারেশন কি মারাত্মক হবে?

'না, এখন তেমন হবে না। এখন ফর্‌সেপ দিয়ে কেবলমাত্র পেটের সন্তানটিকে ঠিক করে দিতে হবে। তবে কিছু টাকা-পয়সা লাগবে। অবশ্য অপারেশন করার জন্যে নয়, হাসপাতলের খরচের জন্যে।' বলে ক্রিস্টিনার দিকে ঘুরে বললেন, 'কিছু সঞ্চয় আছে?'

'এক ফ্রাঙ্কও না।'

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। 'এই ত হচ্ছে অবস্থা।' তিনি বললেন।

'কত লাগবে ডাক্তার?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের বেশি লাগবে না।'

'কিন্তু ও যদি অপারেশন না করে?'

'তবে ওর বাঁচার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই।'

ভিনসেন্ট ক্ষণকাল ভাবল। আঙ্কল কর জলরঙে যে বারোটি ছবি আঁকতে দিয়েছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ও থেকে ত্রিশ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যাবে। আর কুড়ি ফ্যাঙ্ক সে থিওর প্রেরিত ভাতা থেকে নিয়ে নেবে।

'আমি টাকার বন্দোবস্তো করে দেব ডাক্তার।' সে বলল।

'ভাল কথা। শনিবার দিন ভোরে নিয়ে আসবেন আমি নিজেই অপারেশন করে দেব। হ্যাঁ, শুনুন একটা কথা। আপনাদের কি সম্পর্ক আমি তা জানি না, অবশ্য জানতেও চাই না। কারণ তা ডাক্তারের কাজের অঙ্গ নয়। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, এর পরেও উনি যদি রাস্তায় বেরোন তবে ছ'মাসের মধ্যে ওর মৃত্যু অবধারিত।'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ও আর ঐ জীবনে ফিরে যাবে না।'

'বেশ। শনিবার প্রাতে আবার দেখা হবে।'

কয়েকদিন পরে টার্স্টিগ এসে উপস্থিত হলেন।

'আরে এখনও দেখি তুমি লেগে আছ!' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, আমি কাজ করছি।'

'ডাকে যে দশ ফ্রাঙ্ক ফেরত পাঠিয়েছ তা পেয়েছি। টাকাটা ডাকে না পাঠিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানান উচিত ছিল।

'অনেক দূরের পথ মিজ্নের তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল ছিল না।'

'কিন্তু টাকার যখন দরকার ছিল তখন তো পথ এত দূর মনে হয়নি।'

ভিনসেন্ট কোন জবাব দিল না।

'এই অভব্যতাই আমাকে তোমার বিরুদ্ধাচারী করে তোলে, ভিনসেন্ট। এ জন্যেই তোমার উপর আমার কোন বিশ্বাস নাই এবং তোমার ছবিও কিনতে পারি না।'

ভিনসেন্ট টেবিলের ধারে বসে আবার সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

'আপনার ছবি কেনার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবাদ ও মতানৈক্যের কোন সম্পর্ক নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমার চেয়ে কাজের উপর নির্ভর করেই আপনি আমার ছবি কিনবেন বলে বিশ্বাস করতে পারি। ব্যক্তিগত ঝগড়া আপনার বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবান্বিত করবে এটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।' ভিনসেন্ট বলল।

'নিশ্চয়ই নয়। তুমি যদি বিক্রয় করবার মত সুন্দর ছবি আঁকতে পার তবে আমি সানন্দে তা প্লাৎস থেকে বিক্রয় করব।'

'মিজ্নের টারস্টিগ, যে শিল্পী বহু কষ্টে একটি ছবি এঁকেছে এবং তাতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্বেগ ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে তা কোনভাবেই কুশ্রী বা বিক্রয় অযোগ্য হতে পারে না। মনে হয় প্রথমে সবাইকে খুশি করবার মনোভাব নিয়ে আমার ছবি না আঁকাই ভাল।'

টারস্টিগ্ উপরের কোর্টের বোতাম না খুলে এবং দস্তানা পরেই বসেছিলেন। হাত দুটো তাঁর ছড়ির মাথার উপর ন্যস্ত ছিল।

'জান, ভিনসেন্ট, আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তুমি ছবি বিক্রয় না করতেই চাও।'

'ছবি বিক্রয় হলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আপনি যে ছবি বিক্রয় অযোগ্য বলে বলেন, সেই ছবি সম্পর্কে সত্যিকারের শিল্পী ভাইসেনব্রুক যা বলেন তা শুনে আমি আরও খুশি হই। তিনি বলেন, 'এটা প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি যেন, ওকে আমিও মডেল করতে পারি। যদিও টাকার আমার একান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে এখন, তবু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যিকারের কিছু আঁকা।

'ও কথা ডি বকের মত বড়লোকের বেলায় খাটতে পারে, কিন্তু তোমার বেলায় নয়।'

'ছবি আঁকার মৌলিক বিষয়গুলোর সঙ্গে মানুষের আয়ের সম্পর্ক খুবই কম, জানলেন মিজ্‌নের?'

টার্‌স্টিগ দু'হাঁটুর ফাঁকে ছড়িটা রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। 'তোমার বাবা-মা আমাকে চিঠি লিখেছেন, ভিনসেন্ট। তাঁরা তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছেন। ভালই করেছেন তাঁরা। আমি তোমার ছবি কিনতে না পারলেও কিছু কার্যকরী উপদেশ দিতে পারি। ঐ ছেঁড়া কাপড়জামা পরে তুমি নিজের ভবিষ্যৎটাই নষ্ট করছ। কিছু নতুন কাপড়-চোপড় পরে নিজের চেহারাটা ভদ্রস্থ করা উচিত। তুমি ভ্যান গোঘ্‌ পরিবারের লোক তা ভুলে যাচ্ছ। শ্রমিক-শ্রেণির বা নিম্ন শ্রেণির লোকজনের সঙ্গে না মিশে হেগ শহরের ভদ্র লোকদের সঙ্গে তোমার মেলামেশার চেষ্টা করা উচিত। মনে হয় হীন ও কুৎসিত প্রকৃতির লোকের প্রতি তোমার কেমন একটা টান আছে। কখনো কখনো তোমাকে এমন সব লোকের সঙ্গে এমন সব জায়গায় দেখা গেছে যা খুবই নিন্দনীয়। এ ভাবে চললে জীবনে উন্নতি করার আশা কর কি করে?'

ভিনসেন্ট টেবিল থেকে নেমে টারস্টিগের সামনে এসে দাঁড়াল। এই লোকটির বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র সময় ও স্থান। তাই সে নিজের কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব সরস সহানুভূতি-আকর্ষণীয় করে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে চান, এ আপনার মহানুভবতা মিজ্‌নের। আমি বিনীতভাবে আপনার কথার জবাব দিচ্ছি। যার এক পয়সাও আর নেই সে কি করে ভাল কাপড়-চোপড় কেনবার জন্য পয়সা ব্যয় করবে বলতে পারেন?'

টারস্টিগ ভিনসেন্টের কথা শুনে দুঃখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্ষণপরে ভিনসেন্ট আবার বলতে লাগল, 'উদ্দেশ্যহীন ভাবে অলিগলিতে অথবা বাজারে ঘুরে বেড়ান, ঘরে–এমন কি সেলুনে অপেক্ষা করে বসে থাকা এমন আনন্দের কিছু নয়, একমাত্র আর্টিস্টের নিকট ছাড়া। সুন্দরী নারীর সঙ্গে চা পার্টিতে যাওয়ার চেয়ে আঁকবার মত কিছু থাকলে যে কোন ন্যাক্কারজনক স্থানেও আমি যাব। বিষয়বস্তুর সন্ধান করা শ্রমজীবীদের মধ্যে বসবাস করা, যে কোন স্থান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত করা হয়ত কঠিন কাজ, এমন কি মাঝে মাঝে তা কুৎসিতও। সেলসম্যানের ভব্যতা এবং পোষাক আমার উপযোগী নয়, শুধু আমার কেন, যাদের সুরূপা নারী এবং ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে বহুমূল্য জিনিস বিক্রয় করে পয়সা করতে হবে না, তাদেরও নাই।

'গীস্টএর পথে যারা কাজ করে বেড়ায়, তাদের ছবি আঁকাই আমার কাজ এবং এ কাজই আমি সারাদিন করে এসেছি। ঐ পরিবেশের সঙ্গে আমার কুৎসিত মুখ আর এই জীর্ণশীর্ণ কোট বেশ মিল খেয়ে যায়। আমি সানন্দে তাদের মধ্যে থেকে কাজ করতে পারি। আমি সুদৃশ্য কোট পরলে ঐসব শ্রমজীবী, যাদের চেহারা আমি আঁকতে চাই, তারা আমাকে দেখে ভয় পায়, সন্দেহ করে। আমার চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে দেখবার মত জিনিস দেওয়া যা সচরাচর লোকে জানে না। আমার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আমি যদি মাঝে মাঝে সামাজিক ভব্যতা বিসর্জন দেই, তবে কি আমার পক্ষে অন্যায়? যাদের ছবি আঁকছি, তাদের সঙ্গে থেকে কি নিজেকে ছোট করে ফেলছি? দরিদ্র ও শ্রমিকদের বাড়ি গিয়ে অথবা তাদের আমার স্টুডিয়োতে এনে আমি কি নিজেকে খাটো করে ফেলছি? আমার মনে হয়, আমার যা বৃত্তি তাতে এটা দরকার। একেই কি আপনি বলছেন যে, আমি নিজের সর্বনাশ করছি?'

'তোমার মাথা গরম, ভিনসেন্ট, সুতরাং যাঁরা তোমাকে সাহায্য করতে পারেন, তুমি তাঁদের কথা শুনতে রাজি নও। তুমি আগেও যেমন ব্যর্থ হয়েছ, ভবিষ্যতেও তেমনি ব্যর্থ হবে। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে।'

'আমার হাত হচ্ছে চিত্রকরের হাত, মিজ্নের টারস্টিগ, সুতরাং আপনি যতই উপদেশ দেন না কেন, আমি আঁকা বন্ধ করতে পারি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আমি ছবি আঁকা শুরু করবার পর থেকে আমি কি কখনও ইতস্তত করেছি, অথবা কাজের নড়চড় করেছি? আমি জানি, আপনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, আমি এগিয়েই এবং এই যুদ্ধে আমি দিনের পর দিন আস্তে আস্তে শক্তিশালীই হচ্ছি।'

'হতে পারে। কিন্তু তুমি মিথ্যা জিনিসের জন্য সংগ্রাম করছ।'

বলে তিনি উঠে পড়লেন। কব্জির কাছে দস্তানাটার বোতামা এঁটে দিয়ে উঁচু সিল্কের টুপিটা মাথায় চড়ালেন। 'থিওর কাছ থেকে তুমি আর যাতে টাকা আনতে না পার, সেজন্য আমি আর মভ্ চেষ্টা করব। এছাড়া তোমার চৈতন্যোদয় করার কোন্ উপায় নেই।'

ভিনসেন্ট হৃদ্‌পিণ্ডে যেন কিসের আঘাত অনুভব করল। এভাবে ওঁরা যদি ওকে আক্রমণ করে, তবে তো তাকে হারতেই হবে।

'হায় ভগবান!' সে চীৎকার করে বলল, 'কেন আপনারা একাজ করবেন? আমি আপনাদের কি করেছি যে, আপনারা আমাকে এমন করে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন? আপনার মত মেনে নিতে পারে নি বলে কোন লোককে বিনষ্ট করা কি সাধুতার লক্ষণ? আপনারা কি আমাকে নিজের মত চলতে দিতে পারেন না? আপনাদের আর কোনভাবে বিরক্ত করব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি। এ জগতে ভাই-ই আমার একমাত্র সম্বল। তাকেও আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চান কেন?

'সে তোমার নিজের উপকারের জন্য ভিনসেন্ট,' বলে টারস্টিগ বেরিয়ে গেলেন।

একটা প্লাস্টিকের পা কেনার জন্য ভিনসেন্ট টাকার থলিটা নিয়ে এরপর শহরে রওনা হল। জেট এসে উলেবুমেনে ভিনসেন্টকে দেখে খুবই বিস্মিত হল।

'এ্যান্টন বাড়ি নেই'– জেট বলল, 'তিনি তোমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন। তিনি তোমার মুখ দর্শনও করবেন না বলেছেন। এ রকমটা হওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত, ভিনসেন্ট।'

ভিনসেন্ট প্লাস্টারের পা-টা তার হাতে দিল।

'এটা ও'কে দেবেন এবং বলবেন আমি সত্যি আন্তরিক ভাবে দুঃখ অনুভব করছি।' ভিনসেন্ট বলল। বলে সে চলে আসার জন্য পা বাড়াতেই জেট ওঁর হাতটা ভিনসেন্টের কাঁধের উপর রাখল।

'ওঁর ছবিটা আঁকা শেষ হয়েছে, তুমি কি ওটা দেখতে চাও?'

ভিনসেন্ট নীরবে মভের আঁকা ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন কিছু মাস্টারপিস ছবি দেখছে, তা সে খুব বিরাট ছবি এটা–একটা মাছ-ধরার নৌকায় কতকগুলো ঘোড়া টেনে পাড়ে তুলছে। ঘোড়াগুলো ছিল টাট্টুঘোড়া, জীর্ণরুগ্ণ ও বুড়ো : রঙ তাদের কালো, শাদা আর বাদামী। দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াগুলো ছিল বাধ্য, শান্ত এবং শিষ্ট। ভারী নৌকাটার আর খানিকটা অংশ তাদেরকে টেনে তুলতে হবে, তাহলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ঘামে ভিজে গিয়েছিল তাদের দেহ, তারা খুব হাঁপাচ্ছিল, কিন্তু তার জন্যে কোন প্রতিবাদ নেই। অনেক যুগ, অনেক বছর প্রতিবাদ করে এসেছে, কিন্তু এখন কোনরকমে টেনে চলতে হবে তাদের। আর তার আগেই যদি ডাক আসে কসাই খানায় যাবার, তাতেও কোন আপত্তি নেই, তাও প্রস্তুত হয়েই আছে।

ভিনসেন্ট এই ছবিতে একটি গভীর কার্যকরী দার্শনিক তত্ত্ব খুঁজে পেল।

সে বেশ প্রফুল্ল মন নিয়েই ওখান থেকে চলে এল। তার মনে হল, যে তাকে আরও কঠিনভাবে আঘাত করবে, সেই শিখিয়ে দেবে তাকে কি করে হাসিমুখে তা সহ্য করতে হয়।

৮.

ক্রিস্টিনার অস্ত্রোপাচার বেশ ভালোভাবে হয়ে গেল, কিন্তু সেজন্য টাকা দিতে হয়েছে। ভিনসেন্ট তার কাকার কাছে বারোটা জল রঙের ছবি পাঠিয়ে দিয়ে দাম পাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এ টাকার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করতে হল। আঙ্কল কোর সুযোগ মত টাকা পাঠালেন। বাধ্য হয়ে ভিনসেন্ট তার শেষ সম্বল কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিল। মাস শেষ হবার তখনও অনেক বাকি। সেই টাকা খরচ করে ফেলায় সেই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। কালো কফি আর কালো রুটি জুটল–তার। কেবলমাত্র কালো রুটি, তারপর জল, জ্বর, দুর্বলতা এবং প্রলাপ বকা। ক্রিস্টিনা বাড়ির খাওয়া পাচ্ছিল, কিন্তু ভিনসেন্টকে দেবার মত কিছু উদ্বৃত্ত থাকত না। দুর্ভোগের পর শেষ সীমায় গিয়ে সে কোনক্রমে বিছানা থেকে নেমে হামাগুড়ি দিতে দিতে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যদিয়ে ভাইসেনব্রুকের স্টুডিয়োতে এসে উপস্থিত হল।

ভাইসেনব্রুকের অর্থের অভাব ছিল না মোটেই। কিন্তু সবার সংযমী হওয়া উচিত বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। যদিও আকর্ষণ করতে পারে, এমন কোন জিনিসই তাঁর স্টুডিয়োতে ছিল না। না ছিল বই, না পত্রিকা, না জার্নাল, না আরাম কেদারা, দেয়ালে

কোন ছবি না বাইরে তাকাবার মত কোন দৃশ্য ছিল না। জিনের কাজের যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছুই ছিল না ঘরে। বাইরের লোকদের বসবার মত কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তেমন মানুষ সাধারণত এ ঘরে আসত না।

'তুমি? তুমি এসেছ?' হাতের ব্রাস না নামিয়ে তিনি বললেন। কারো স্টুডিয়োতে কারো কাজে বাধা দেওয়া সে অন্যায় কিছু মনে করত না, কিন্তু কেউ যদি তাঁর কাছে দেখা করতে আসত, তবে তিনি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন ঠিক যেন খাঁচায় বন্ধ-করা সিংহের মতো।

ভিনসেন্ট নিজের আসার কারণটা বুঝিয়ে বলল।

'না ভাই সে হবে না'–ভাইসেনব্রুক বলে উঠলেন, 'তুমি ঠিক লোকের কাছে আস নি। টাকা পয়সা দিয়েও আমি সাহায্য করতে পারব না।'

'টাকা খরচ করবার মত সামর্থ্য কি তোমার আছে।'

আছে! তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার মতই একজন এ্যামেচার আর্টিস্ট, যার কোনো ছবিও বিক্রি হয় না? এখনও আমার ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, আমি তা তিন পুরুষে খরচ করতে পারব না।'

'তাহলে কেন আমাকে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক ধার দিচ্ছ না? আমার অবস্থা আজ শোচনীয়। একটুকরো শুক্‌নো রুটিও আজ আমার ঘরে নেই।

ভাইসেনব্রুক আনন্দে হাত ঘর্ষণ করলেন। 'চমৎকার। চমৎকার! এই তো তোমার চাই। এর ফল হবে তোমার পক্ষে বিস্ময়কর। তোমার পেইন্টার হবার আশা এখনও রয়েছে?'

কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার মত অবস্থা আর ভিনসেন্টের ছিল না, সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'অভুক্ত থাকার ফলে বিস্ময়কর কিছু ঘটার সম্ভাবনা কোথায়?'

'এ জগতে এটাই হচ্ছে তোমার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস ভ্যান গোঘ্। এতেই তুমি বেদনা পাবে?'

'আমার কষ্ট পাওয়ার সঙ্গে আপনার কি স্বার্থ জড়িত?'

ভাইসেনব্রুক নিজের টুলটির উপর বসে পা দু'টি আড়াআড়িভাবে রাখল এবং লাল রঙ মাখানো একটি তুলি ভিনসেন্টের চোয়ালের দিকে তুলে ধরল।

'কারণ তাই তোমাকে সত্যিকারের আর্টিস্ট করে তুলবে। যত তুমি কষ্ট পাবে, তত কৃতজ্ঞ তোমার হওয়া উচিত। এমনিভাবেই প্রথম শ্রেণির পেইন্টার সৃষ্টি হয়। ভরা পেটের চেয়ে অভুক্ত থাকা এবং আনন্দময় পরিবেশের চেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় অনেক ভাল, ভ্যান গোঘ। একথা কখনও ভুলে যেও না।'

'এ যে সব বাজে কথা আপনি তা বেশ জানেন, ভাইসেনব্রুক।'

ভাইসেনব্রুক তুলিটা দুই-তিনবার ভিনসেন্টের দিকে চালনা করলেন। 'জীবনে যে দুঃখ পায় নি, তার আঁকারও কিছু নেই ভ্যান গোঘ্। সুখ হচ্ছে কেমন প্রাণহীন ওটা গরু আর ব্যবসায়ীদের পক্ষেই কেবলমাত্র ভাল। বেদনার মধ্যদিয়েই শিল্পীর নবজন্ম হয়। বুভুক্ষা, নৈরাশ্য এবং দুর্ভাগ্য যদি তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করে থাকে, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ভগবান তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন।'

'কিন্তু দারিদ্র্য যে সব ধ্বংস করে।'

'হ্যাঁ, দুর্বলকে ধ্বংস করে, কিন্তু সবলকে নয়। দারিদ্র্য যদি তোমাকে ধ্বংস করে, তবে তোমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে, সে স্থলে তোমার ধ্বংসই শ্রেয়ঃ।'

'যাক, আপনি আমাকে কিছুতেই সাহায্য করবেন না?'

'তোমাকে যদি চিরকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলে মনে করতাম, তবু তোমাকে সাহায্য করতাম না। বুভুক্ষা ও বেদনায় যদি কোন মানুষের মৃত্যু হয়, তবে সে মানুষের মরে যাওয়াই ভাল। এ জগতের চিত্র শিল্পী তাঁরাই, যাঁরা নিজেদের কথা পরিষ্কারভাবে বলতে না পারা পর্যন্ত ভগবান কিংবা শয়তান তাঁদেরকে মেরে ফেলতে পারে নি।'

'কিন্তু আমি ত বহুদিন অনাহারে কাটিয়েছি ভাইসেনক্রুক। বহুদিন মাথা রাখবার ঠাই পাইনি– ঝড়ে- জলে আর বরফে রাস্তায় ঘুরে কাটিয়েছি--দেহে প্রায় কোন আবরণ আমার ছিল না। আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত জ্বরগ্রস্ত ও অসুস্থ অবস্থায় আমার দিন কেটেছে। ও অবস্থায় পড়েও আমি নতুন কিছু শিখতে পারি নি।'

'ব্যথার প্রথম স্তরও তুমি উত্তীর্ণ হও নি। এই সবেমাত্র শুরু। আমি বলছি যে, এ জগতে বেদনাই হচ্ছে একমাত্র অসীম বস্তু। যাও, বাড়ি গিয়ে পেন্সিল তুলে নাও। ক্ষুধা তোমার যত বাড়বে, নিজেকে যত হতভাগ্য মনে হবে, ততই ভাল কাজ করতে পারবে।'

'এবং তত তাড়াতাড়িই তা বাতিল হয়ে যেতে পারবে।'

ভাইসেনক্রুক প্রাণ ভরে হাসলেন। 'হ্যাঁ, তা নাকচ হয়ে যাবে বই কি! নাকচ হওয়া উচিতও। সে-ও তোমার পক্ষে কল্যাণকর। এতে তুমি আরও কষ্ট পাবে। এর পরের ছবি হবে তোমার আগের ছবিটি থেকে কিছু ভাল। এভাবে তুমি যদি অভুক্ত থেকে কষ্ট সইতে পার এবং বেশ কয়েক বছর তোমার কিছু ছবি এঁকে এঁকে নষ্ট করে ফেলতে পার, তবে শেষ পর্যন্ত তুমি হয়ত—হবেই যে তা আমি বলছি না, কিন্তু এমন ছবি আঁকতে পারবে, যা ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারবে, জ্যাজ স্টীজ বা......'

'ভাইসেনক্রুকের ছবির পাশে, না?'

'ঠিক ঠিক, ভাইসেনব্রুকেরই। সুতরাং এখন যদি আমি তোমাকে টাকা দি তবে তোমার ঐ স্মরণীয় হবার সুযোগকেই আমি নষ্ট করব।'

'চুলোয় যাক চিরস্মরণীয় হওয়া। আমি এখনই এখানে বসে ছবি আঁকতে চাই। কিন্তু শূন্য উদরে তা সম্ভবপর নয়।'

'বাজে কথা। মূল্যবান যা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, তা শূন্যোদরেই হয়েছে। পেটভরা থাকলে তুমি উল্টোটাই এঁকে বসবে।'

'আপনি এত কষ্ট সহ্য করেছেন, একথা কিন্তু আমি কোনদিন শুনি নি।'

'আমার সৃষ্টি করার মত কল্পনাশক্তি ছিল। বেদনা না পেয়েও তাকে উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা আমার আছে।'

'বুড়ো জোচ্চোর কোথাকার!'

'মোটেই না। আমি যদি দেখতাম যে, ডি বকের মত আমার আঁকা ছবিও নীরস হচ্ছে, তবে আমার সব অর্থ ফেলে দিয়ে ভবঘুরে হয়ে যেতাম। ব্যথা না পেয়েও ব্যথার সব চিহ্ন ফুটিয়ে তোলার মত ক্ষমতা রয়েছে আমার, তাইত আমি বড় শিল্পী।'

'তাই আপনি একটা বড় দমবাজ। যাক গে। এবার ভালো লোকের মত আমাকে ২৫টি ফ্রাঙ্ক ধার দিন দেখি।'

'২৫টি সেন্টও ধার পাবে না। দেখো আমি খাঁটি কথা বলছি। তোমার সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা রয়েছে, সুতরাং টাকা ধার দিয়ে তোমার ক্ষতি করতে চাই না। একদিন তুমি চমৎকার ছবি আঁকতে পারবে, ভিনসেন্ট। নিজের ভাগ্যকে নিজেই গঠন করতে পারবে। মভের ডাস্টবিনে ঐ প্লাস্টারের পা টা দেখে আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। বিনে পয়সায় ঐ যে সূপ দিচ্ছে, পথের দোকান থেকে তা সংগ্রহ করে খেয়ে নেও গে।'

ভাইসেনব্রুক ক্ষণকালের জন্য ভিনসেন্টের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে দরজা খুলে ফেলল।

'এক মিনিট দাঁড়াও।'

'আমি ভীরু আর দুর্বল হয়ে পড়েছি, তা নিশ্চয় আপনি বলবেন না'– ভিনসেন্ট কর্কশস্বরে বলল।

'শোন, ভ্যান গোঘ্, আমি কৃপণ নই। আমি আদর্শ মেনে চলি। আমি যদি বুঝতাম যে, তুমি একটা মূর্খ, তবে তোমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তোমাকে ২৫ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিতাম। কিন্তু সম-শিল্পী বলে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমি তোমাকে যা দিচ্ছি, তা জগতের সমস্ত অর্থ দিয়েও ক্রয় করতে পারবে না। একমাত্র মভ্ ছাড়া হেগ শহরের আর কাউকেই আমি এটা দিতাম না। এস, এখানে বস। ঐ স্কাই-লাইটের ঝালরটা একটু ঠিক করে দাও। হয়েছে। এবার ঐ স্টাডিটার দিকে দৃষ্টিপাত কর।'

এক ঘণ্টা পরে ভিনসেন্ট উল্লসিত মনে ঐ স্থান ত্যাগ করল। আর্ট স্কুলে এক বছরে সে যা শিখতে পারত, এইটুকু সময়ে সে তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছে। সে যে পীড়িত এবং জ্বরগ্রস্ত এবং তার যে একটি আধলাও নেই, তা যেন ভুলে গিয়েছিল। বহু পথ অতিক্রম করতে হবে সে কথা মনে পড়ল।

৯.

কয়েকদিন পরে বালিয়াড়ির ধারে মভের সঙ্গে ভিনসেন্টের সাক্ষাৎ হল। নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ দূর করার যে আশাটুকু তার মনে ছিল তা-ও মুছে গেল এ সাক্ষাৎকারের পর।

'আপনার স্টুডিওতে আমি যা করেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি, কাজিন মভ্। আমার পক্ষে ওরকম কাজ করা ভয়ানক অন্যায় হয়েছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। একদিন আমার ওখানে এসে কাজগুলো দেখে যান না?'

মভ সোজাসুজি অস্বীকার করলেন। 'আমি আর কখনও তোমার ওখানে যাবো না। ও সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।'

'আমার উপর বিশ্বাস কি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ। তোমার চরিত্র অত্যন্ত খারাপ।'

'আমি কি কাজ খারাপ করেছি তা যদি দেখিয়ে দেন তবে চরিত্র সংশোধন করবার চেষ্টা করব।'

'তুমি কি কর না কর তাতে আমার আর কোন ঔৎসুক্য নাই।'

'আমি খাওয়াদাওয়া, ঘুম এবং আর্টিস্টের মত ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই করিনি। ওগুলোই কি তবে খারাপ?'

'তুমি কি নিজেকে আর্টিস্ট বল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'একদম বাজে কথা। তুমি জীবনে একখানা ছবিও বিক্রয় করনি।'

'ছবি বিক্রয় হওয়াই আর্টিস্টের মানদণ্ড নাকি? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আর্টিস্ট হচ্ছে সে-ই যাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিপূরণ হয়নি। 'আমি জানি, আমি পেয়েছি' যে এখনও বলতে পারে না, তাকেই আমি আর্টিস্ট ভেবেছিলাম। নিজেকে আর্টিস্ট বলে আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, 'আমি খুঁজছি, আমি চেষ্টা করছি, আমি ওকে আমার সত্তায় অনুভব করছি।'

'তাহলেও তোমার চরিত্র অত্যন্ত জঘন্য।'

'আপনি আমাকে কোন বিষয়ে সন্দেহ করছেন দেখছি। মনে করেছেন আমি কোন বিষয় লুকিয়ে রেখেছি। 'ভিনসেন্ট এমন কিছু গোপন করছে যা দিনের আলোর সম্মুখে আনা যায় না।' কি তা, মভ্? সব আমাকে খুলে বলুন।'

মভ ইজেলের কাছে গিয়ে ক্যানভাসে রঙ লাগাতে লাগলেন। ভিনসেন্ট ঘুরে বালির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

ঠিকই বলেছেন মভ। চারিদিকে একটা গুজব রটেছে। ক্রিস্টিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা হেগের লোকেরা জানতে পেরেছে। ডি বকই এ-খবর তাকে দিল। মুখটা ছুঁচলো করে একটু দুষ্টু হাসি টেনে এনে সে খবরটা ভিনসেন্টকে দিল। ক্রিস্টিনা 'পোজ' দিচ্ছিল তাই–ইংরেজীতেই ও কথা বলতে লাগল।

'বেশ, বেশ হে ভ্যান গোঘ্'– নিজের ভারী কালো ওভার কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা লম্বা সিগারেট জ্বালিয়ে ও বলল। 'তুমি যে একজন মিস্ট্রেস রেখেছ সারা হেগের লোক তা জেনে ফেলেছে। আমি এ খবর শুনলাম ভাইসেনব্রুক, মভ এবং টারস্টিগের কাছ থেকে। খবর শুনে তারা খগড়হস্ত হয়ে উঠেছে।'

'ওঃ, এর জন্যেই এত সব!' ভিনসেন্ট বলল।

'তোমার এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। মেয়েটি কি আর কোথাও মডেল হয়? আমি ত প্রায় সব মডেলদেরই চিনি।'

ভিনসেন্ট আগুনের পার্শ্বে সীবনরতা ক্রিস্টিনার দিকে একবার তাকাল। আগুনের ধারে মেরিনো পশমের কাপড় ও এ্যাপ্রন সীবনরতা এবং স্বীয় কার্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধা ক্রিস্টিনার চারিধারে সুন্দর এক গৃহজ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ডি বক সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

'হে ভগবান! ও-ই তোমার মিস্ট্রেস নাকি?' সে সবিস্ময়ে বলল।

'আমার কোন মিস্ট্রেস নেই ডি বক। তবে লোকে বোধ হয় ওকে জড়িয়েই কুৎসা ছড়ায়।'

ডি বক কপাল থেকে অদৃশ্য স্বেদকণা ঝেড়ে ফেলার ভান করল। পরে ক্রিস্টিনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাল। 'আচ্ছা, তুমি ওর সঙ্গে একত্র শয়ন কর কি করে বল দেখি?'

'ও কথা–বলছ কেন শুনি?'

'আরে বুড়ো ছেলে–ওতো একটা নিছক অতি সাধারণ একটা বুড়ী! তুমি কি ভাবছ বল দেখি? ওকে দেখে চমকে ওঠা টারস্টিগের পক্ষে খুব অস্বাভাবিক হয়নি। আরে মিস্ট্রেস যদি রাখতে চাও তবে তরুণী আর পরিষ্কার দেখে শহরের কোন মডেলকেই পেতে পার। ওদের তো আর কোন অভাব নেই।

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি ডি বক যে, ও আমার মিস্ট্রেস নয়।'

'তা হলে কি.....?'

'ও আমার স্ত্রী!'

ডি বক অদ্ভুত ভঙ্গি করে তবে দাঁত কামড়ে ছোট ঠোঁট দুটো বন্ধ করল।

'তোমার স্ত্রী!'

'হ্যাঁ, আমি ওকে বিয়ে করার ইচ্ছে করি।'

'হা ভগবান!'

ডি বক একবার ক্রিস্টিনার প্রতি বিরক্তি আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোট না নিয়েই বেরিয়ে পড়ল।

'আমার সম্বন্ধে কি আলোচনা করছ তোমরা?' ক্রিস্টিনা জিজ্ঞাসা করল।

ভিনসেন্ট 'ক্রুশ' করল। পরে ক্ষণিকে ওর দিকে তাকাল। 'তুমি আমার ভাবী-স্ত্রী তা-ই ডি বককে বলছিলাম।'

ক্রিস্টিনা অনেকক্ষণ নীরবে সেলাই করে গেল। তার মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে ছিল এবং বার বার সে সাপের মতো জিহ্বা বের করে শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিচ্ছিল।

'তুমি আমাকে সত্যি বিয়ে করবে ভিনসেন্ট? কিন্তু কেন?'

'বিয়ে না করলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়াই আমার উচিত। যাতে আমি নিজ স্ত্রীর দেহ থেকে ছবি আঁকতে পারি, তাই পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে আমি থাকতে চাই। আমি একটি নারীকে ভালবেসেছিলাম ক্রিস্টিনা। কিন্তু আমি যখন তার বাড়ি গেলাম শুনলাম আমি নাকি তাকে অযথা বিরক্ত করছি। আমার প্রেম ছিল খাঁটি নিষ্পাপ এবং পাথরের মত শক্ত। কিন্তু ও বাড়িতে এসে জানতে পারলাম আমার প্রেমকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরও মৃতোত্থান হয়–তুমি আমার সেই মৃতোত্থান।'

তুমি আমাকে বিয়ে করবে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কি হবে? তারপর বিয়ে করলে তোমার ভাই হয়ত টাকা পাঠনো বন্ধ করে দেবে।'

যে নারী মা হয়েছেন, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি ক্রিস্টিনা। হেরম্যান ও নবজাতককে আমাদের সঙ্গে রাখব, অন্যেরা তোমার মার কাছে থাকতে পারবে। আর থিওর কথা....সে আমায় শেষ করে ফেলতে পারে হয়ত; তবে তাকে সব কথা খুলে বললে সে আমায় পরিত্যাগ করবে তা মনে হয় না।'

ভিনসেন্ট মেঝেতে ক্রিস্টিনার পায়ের নিচে ছিল। প্রথম দিন থেকে আজ ওকে আরও ভাল দেখাচ্ছে। তার ঐ বিষণ্ণ পিঙ্গলবর্ণের চোখটিতে আজ যেন কিছু সুখের স্পর্শ লেগেছে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্বে আজ যেন নতুন শক্তি জেগেছে। 'পোজ' দেওয়া তার পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সে ধীরভাবে কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে। প্রথম দিনে ভিনসেন্টের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হল তখন ক্রিস্টিনা ছিল রুক্ষস্বভাবা, অসুস্থ আর হতভাগিনী। আজ তার সমস্ত স্বভাবে এসেছে একটা প্রশান্তি। নতুন স্বাস্থ্য ও জীবনের অধিকারিণী আজ সে। ক্রিস্টিনার তার কাছে বসে সামান্য মাধুর্যমণ্ডিত ওর রুক্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভিনসেন্টের মনে পড়ে গেল মাইকেলের কথাগুলো।

'সিয়েন, আমাদের এখন থেকেই সঞ্চয়ী হয়ে কিছু কিছু জমিয়ে রাখা ভাল, কি বল? একটা আশঙ্কা হচ্ছে, এমন দিন আসবে যখন তার কোন আয়ই থাকবে না। তুমি লেডেন না যাওয়া পর্যন্ত হয়তো আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব, কিন্তু ওখান থেকে ফিরে আসবে যখন তখন, আমাকে কি অবস্থায় দেখবে কে জানে? তবে আমার যাই থাকুক না কেন আমি তা তোমার ও তোমার ছেলের সঙ্গে ভাগ করে খাব।'

ক্রিস্টিনা চেয়ার থেকে নেমে ভিসেন্টের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর বাহু দিয়ে ভিনসেন্টের গলা জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা দিল।

তোমার সঙ্গে আমাকে কেবল থাকতে দিও ভিনসেন্ট, আমি আর কিছুই চাই না। রুটি আর কফি ছাড়া যদি আর কিছুও না দাও তবু আমি আপত্তি জানাব না। আমি তেমাকে ভালবাসি, ভিনসেন্ট। পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র তুমিই আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছ। তোমার যদি ইচ্ছা না থাকে, তো আমাকে বিয়ে করার কোন দরকার নেই। আমি পোজ দেব, কঠিন পরিশ্রম করব, তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি শুধু আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দিও। জীবনে এই আমি প্রথম সুখের স্বাদ পেয়েছি, ভিনসেন্ট। আমি তো আর কিছু চাই না। তোমার যা থাকবে তা-ই ভাগ করে নিয়ে আমার চলবে.....ওতেই আমি খুশি হব।'

গর্ভস্থ শিশুর জীবন্ত দেহোত্তাপ ভিনসেন্টের গায়ে লাগল। সে ধীরে ধীরে ওর মুখের উপর আঙুলগুলো বুলিয়ে নিল, তারপর প্রত্যেকটি দাগের উপর চুম্বন-রেখা এঁকে দিতে লাগল। সিয়েনের চুলগুলো খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর, অত্যন্ত কোমলভাবে সেই চুলে হাত বুলোতে লাগলো। সিয়েন তার রক্তাভ গণ্ড ভিনসেন্টের দাড়ির ওপর আস্তে আস্তে ঘষতে লাগল।

'তুমি কি আমাকে সত্যি ভালবাস, সিয়েন?'

'হ্যাঁ, ভালবাসি, ভিনসেন্ট।'

'ভালবাসা পাওয়া খুবই আনন্দের। জগত এজন্য বদনাম দিতে চায়, দিক।'

'জগতটা রসাতলে যাক।' ক্রিস্টিনা শুধু বলল।

'আমি শ্রমিক হব। ওটাই আমাকে মানায় ভাল। আমরা পরস্পরকে বুঝতে পেরেছি। এখন অন্যে কি বলে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সামাজিক সম্পর্কের ভাল সৃষ্টি করা আমাদের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাকে আমার সমাজ অনেকদিন আগেই সমাজচ্যুত করেছে। আমি নিজের ঘরে, তা সে যতই জীর্ণ

হোক না কেন, শুক্‌নো রুটি চিবিয়ে বেঁচে থাকব তবু তোমাকে বিয়ে না করে বাঁচতে পারব না।'

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় তারা চুল্লীর ধারে মাটিতে বসে রইল। ডাক পিয়নের ডাকে তাদের স্বপ্ন যেন ভাঙল। পিয়ন আমস্টারডাম থেকে প্রেরিত একখানা চিঠি ভিনসেন্টের হাতে দিল। ওতে লেখা ছিল :

'ভিনসেন্ট :

তোমার লজ্জাজনক চরিত্রের কথা এইমাত্র জানতে পারলাম। ছয়টি ছবি সম্পর্কে যে অর্ডার দিয়েছিলাম দয়া করে তা বাতিল করে দিও। তোমার কাজ সম্পর্কে আমি আর কোন ব্যবস্থা। —সি এম ভ্যান গোঘ্‌।'

এবার সব কিছুই থিওর উপর নির্ভর করতে লাগল। ক্রিস্টিনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা যদি থিওকে ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে না পারে, তবে সেও ভাতার টাকা পাঠান বন্ধ করে দিতে পারে। যে পর্যন্ত তার কাজ ও ক্রিস্টিনা আছে সে পর্যন্ত তার শিক্ষক মভ্‌কে ছাড়া, ছবির ডিলার টারস্টিগ্‌কে ছাড়া তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, এমন কি সহযোগীদের ছাড়াও চলতে পারে। কিন্তু মাসে ঐ একশত ফ্রাঙ্ক না পেলে ত তার কিছুতেই চলবে না।

ভিনসেন্ট ভাইয়ের কাছে আবেগপূর্ণ দীর্ঘ চিঠি লিখতে লাগল। তাতে সব কিছু খুলে জানিয়ে তাকে পরিত্যাগ না করবার জন্যে অনুরোধ জানাল। আসন্ন বিপর্যয়ের মৃত্যু-শীতল আতঙ্কে তার দিনগুলো কাটতে লাগল। ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জামের জন্য আর সে অর্ডার দিতে পারছিল না, কোন জল-রঙের ছবিও আরম্ভ করতে পারছিল না।

থিও বহু আপত্তি তুলল কিন্তু তাকে কোন দণ্ডবিধান করল না। সে তাকে অনেক উপদেশও দিল কিন্তু তাতে একবারও বলল না যে, তার উপদেশ না রাখলে সে টাকা পাঠান বন্ধ করে দেবে। সর্বশেষ ভিনসেন্টকে সে জানাল যে, যদিও তার কাজ সে সমর্থন করে না—তবুও সে তার ভাতা বন্ধ করে দেবে না।

তখন মে মাসের প্রথম দিক। লেডেনের ডাক্তার ক্রিস্টিনাকে বলেছিল যে, জুন মাস পর্যন্ত তার প্রসব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রসব সময় পর্যন্ত ক্রিস্টিনাকে অন্যত্র না সরানই ভিনসেন্ট ঠিক করল। ইতিমধ্যে স্কেনবেগের পাশের খালি ঘরটা সে ভাড়া করে ফেলতে পারবে বলে আশা করতে লাগল। ক্রিস্টিনা বেশির ভাগ সময়ই স্টুডিয়োতে কাটাতে লাগল কিন্তু জিনিসপত্র তখনও তার মায়ের কাছে পড়েছিল। আঁতুড় শেষ হলে পর ওরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে করবে বলে ঠিক হল।

ভিনসেন্ট ক্রিস্টিনাকে নিয়ে প্রসবের জন্য লেডেন গেল। বহুক্ষণ ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকায় ডাক্তারকে ফরসেপ দিয়ে সন্তানটা বের করতে হল। কিন্তু তাতে সন্তানের কোন ক্ষতি হল না। ভিনসেন্টকে দেখতে পেয়ে ক্রিস্টিনার সমস্ত ব্যথাবেদনার যেন উপশম হয়ে গেল।

'আমরা শিগ্‌গিরই আবার ছবি আঁকার কাজে লেগে যেতে পারব।' ক্রিস্টিনা বলল।

ভিনসেন্ট অশ্রুসজল চক্ষে তাকে দেখতে লাগল। শিশুটি যে অন্যের ঔরসজাত তাতে তার কিছু এসে যায় না। সম্মুখে তারই স্ত্রী এবং সন্তান। বুকে তার তীব্র বেদনা কিন্তু তবু সে খুশি।

স্কেনবেগ-এ ফিরে এসে সে তার ঘরের সম্মুখে বাড়িওয়ালা এবং অপ্রয়োজনীয় ইয়ার্ডের মালিককে দেখতে পেল।

'ঐ বাড়িটা আবার নিচ্ছেন কেন, মিজানের ভ্যান গোঘ্? এটার ভাড়া তো বেশি না, সপ্তাহে মাত্র আট ফ্রাঙ্ক। আমি এটাকে বেশ করে রঙ করে আর প্লাস্টার করে দেব। আপনি যে রকম ওয়াল পেপার লাগাতে চান তা দেখিয়ে দেবেন, এনে আপনার জন্যে লাগিয়ে দেব।'

'না, তাতে হবে না, মশায়। আমার স্ত্রী এলে ঐ বাড়িটা আমার লাগবেই। তবে এ সম্পর্কে আমার ভাইকে আগে চিঠি লিখতে হবে।'

'ভাল কথা। তবে আমি ওয়াল-পেপার আগেই লাগিয়ে রাখি। আপনার কোনটা পছন্দ হয় বলে দিন দেখি। ওয়াল-পেপার লাগাবার পর আপনার পছন্দ না হলে না-নেবেন।

পাশের বাড়িটি সম্পর্কে থিও কয়েক মাস ধরেই খবর শুনে আসছিল। বাড়িটা বেশ বড়, স্টুডিও আছে, থাকার ঘর, রান্নার ঘর, নিভৃত ঘর এবং চিলেঘর আছে। পুরোনো বাড়িটা থেকে এর ভাড়া সপ্তাহে চার ফ্রাঙ্ক বেশি। কিন্তু এখন ক্রিস্টিনা, নবজাত শিশু, হেরম্যান–সবাই যখন আসছে তখন বেশি জায়গারও দরকার। জবাবে থিও জানালো যে তার নিকট থেকে আবারও ভিনসেন্ট মাসে দেড়শো ফ্রাঙ্ক করে পাবে বলে ধরে নিতে পারে। ভিনসেন্ট অবিলম্বে বাড়িটা ভাড়া নিল। ক্রিস্টিনা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছে। ঘরে ফিরে সে যেন উষ্ণ নীড়ে প্রবেশ করতে পারে সে তারই ব্যবস্থা করতে লাগল। জিনিসপত্র সরিয়ে দেবার জন্যে বাড়ির মালিক তাঁর দুজন লোককে ধার দিলেন। সব ঠিকঠাক করে দেবার জন্যে ক্রিস্টিনার মা এলেন।

সাদাসিধে ধূসর বর্ণের ওয়াল-পেপারে ঢাকা দেয়াল, ঝকঝকে কাঠের মেঝে, দেয়ালে টাঙানো নানা স্টাডি, প্রত্যেক কোণে একটি করে ইজেল ও কাজ করার জন্যে টেবিল ইত্যাদি সব মিলিয়ে নতুন স্টুডিয়োটি খুবই জীবন্ত মনে হচ্ছিল। ক্রিস্টিনার মা জানালায় মসলিনের শাদা পর্দা টাঙিয়ে দিলেন। স্টুডিয়োর সঙ্গেই একটি নিভৃত কক্ষ ছিল। সেই ঘরে ভিনসেন্ট তার ছবি আঁকবার বোর্ড, পোর্টফোলিও এবং উডকাট ইত্যাদি রেখে দিয়েছিল। অন্য কোনায় কোনায় বোতল, রঙের পাত্র ও বই রাখার জন্যে একটি খুপরি ছিল, তাছাড়া, জানালার ধারে ক্রিস্টিনার জন্য ছিল একটি বড় বেতের চেয়ার। চেয়ারটার পাশে ভিনসেন্ট সবুজ রঙের ঢাকনি দেওয়া একটি ছোট শিশুশয্যা রাখল, এবং তার ওপরে রেমব্রান্টের একটি এচিং রাখল। ওই এচিং-এ একটি দোলনার সামনে দুজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে একজন মোমবাতির আলোতে বাইবেল থেকে কিছু পড়ছিলেন।

রান্নাঘরের জন্য যা যা দরকার ভিনসেন্ট প্রায় তা সবই জোগাড় করে ফেলল। যাতে ক্রিস্টিনা বাড়ি ফিরে দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া তৈরি করে ফেলতে পারে। সে একটা অতিরিক্ত ছুরি কাঁটাচামচ, চামচ ও প্লেট এনে রাখল যাতে থিও বেড়াতে এলে

তার কোন অসুবিধা না হয়। ভাল ঘরটিতে সে নিজের ও স্ত্রীর জন্য একটি বড় শোয়ার জায়গা করল এবং পুরাতন ঘরটিতে বাকি সব বিছানা দিয়ে হেরম্যানের শোয়ার স্থান করল। সে ক্রিস্টিনার মায়ের সঙ্গে মিলে খড়, সমুদ্রজ উদ্ভিদ ইত্যাদি জোগাড় করে গদিটা ভরে ফেলল।

ক্রিস্টিনা হাসপাতাল ত্যাগ করর সময় ডাক্তার, ওয়ার্ডের নার্স এবং প্রধানা নার্স তাকে বিদায় জানাতে এলেন। ভিনসেন্টের মনে হল ক্রিস্টিনা কেউকেটা নয় বটে তবে তার জন্যও পদস্থ লোকের রয়েছে সহানুভূতি এবং স্নেহ। 'ক্রিস্টিনা তো সৎসঙ্গ পায় নি।' ভিনসেন্ট আপন মনে বলল, 'সুতরাং সে কি করে সৎ হবে?'

ক্রিস্টিনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তার মা ও হেরম্যান স্কেনবেক-এ ছিল। গৃহে ফিরে এসে ক্রিস্টিনা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করল কারণ এমনভাবে সব কিছু যে সাজান হয়েছে তা সে আদৌ জানতে পারে নি। দোলনা, আরাম কেদারা, তার জানলার কাছে রাখা পুষ্পাধার প্রভৃতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে বেড়াতে লাগল। আজ তার আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

'প্রোফেসারটি বেজায় রসিক লোক'– সে বলতে লাগল, 'আমাকে একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'জিন ও বিটার্স ভালবাসেন নাকি? ধূমপান করতে ভালবাসেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। 'ও সব ছাড়ার প্রয়োজন নেই'– তিনি বললেন, 'তবে ভিনিগার, মরিচ বা সরিষা খাওয়া আপনার পক্ষে উচিত হবে না, আর সপ্তাহে অন্তত একবার মাংস খাবেন।'

শোবার ঘরটিকে অনেকটা জাহাজের খোলের মতন মনে হচ্ছিল, কারণ ঘরের ভেতর দেওয়ালে তক্তা লাগান ছিল। ভিনসেন্টকে প্রতিদিন রাতে লোহার দোলনাটাকে উপরে টেনে আনতে হত, আবার ভোরে নিচে বসার ঘরে নিয়ে যেতে হত। ঘরের যে সব ভারী কাজ করার মত সামর্থ্য ক্রিস্টিনের ছিল না, সে সব কাজই তাকে করতে হত। যেমন, বিছানা করা, চুল্লিতে আঁচ দেওয়া, জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়া, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা। এ কাজ করতে করতে তার মনে হচ্ছিল, বহুদিন ধরে যেন সে ছেলেমেয়েসহ ক্রিস্টিনার সঙ্গে বাস করছে। অপারেশনের জের এখনও ক্রিস্টিনা সম্পূর্ণ সেরে উঠতে পারে নি সত্য, কিন্তু ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্য ফিরে আসছিল।

মনের একটা নতুন প্রশান্তি নিয়ে ভিনসেন্ট ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। নিজের ঘরে থাকা এবং সেই ঘরে নিজের সংসারের স্পন্দন অনুভব করা খুবই আনন্দের। ক্রিস্টিনার সঙ্গ তাকে জোগালো সাহস এবং কাজের নতুন উৎসাহ। থিও যদি তাকে পরিত্যাগ না করে, তবে একদিন সে যে নামকরা চিত্রকর হতে পারবে তাতে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

বোরিনেজে ভগবানের জন্য সে দাসত্ব করেছে, কিন্তু এখানে পেয়েছে নতুন আর সত্যিকারের ভগবানকে। তার নতুন ধর্মকে একটিমাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যেতে পারে : চাষীর মূর্তি, কর্ষিত ভূমির খাত, বালুতট, সাগর ও আকাশের অংশমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, আঁকাও তাই দুরূহ, কিন্তু তবু তারা সুন্দর, ওদের মধ্যে যে কবিতা রয়েছে তা প্রকাশ করার জন্যে সারাজীবন চেষ্টা করাও তার পক্ষে আনন্দের।

একদিন বিকেলে বেলাভূমি থেকে ফেরার পথে স্কেনবেকের বাড়ির সম্মুখে তার সঙ্গে টারস্টিগের দেখা হল।

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম ভিনসেন্ট,' টারস্টিগ বললেন, 'অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম কেমন চলছে তোমার তা এসে জেনে যাব।'

টারস্টিগ উপরে গেলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে তা মনে করতেই ভিনসেন্ট আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ওর সঙ্গে কথা বলে নিল। টারস্টিগ বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালভাবেই আলাপ করলেন তবু ভিনসেন্ট বারবার শিউরে উঠতে লাগল।

দু'জনে যখন ঘরে প্রবেশ করল তখন ক্রিস্টিনা আরাম কেদারায় বসে শিশুকে মাই দিচ্ছিল। হেরম্যান স্টোভের পাশে খেলা করছিল। টারস্টিগ বহুক্ষণ ওদের দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ইংরেজীতে বলতে লাগলেন।

'ওরা এখানে কেন?'

'ক্রিস্টিনা হচ্ছে আমার স্ত্রী আর ও দুটি আমাদের সন্তান।'

'তোমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে?'

'বিবাহ অনুষ্ঠান অবশ্য এখনও হয় নি।'

'এমনি একটা মেয়েলোকের সঙ্গে বাস করার প্রবৃত্তি যে তোমার কি করে হয়,...আর ছেলেগুলো কার....'

'মানুষ তো সাধারণত বিয়েই করে, তাই না?'

'কিন্তু তোমার ত টাকা পয়সা নেই। ভাইয়ের খেয়ে বেঁচে আছ তুমি।'

'না, তা ঠিক নয়। থিও আমাকে বেতন দেয়। আমি যা আঁকি সবই তার। সে কোনদিন তার টাকা ফেরৎ পাবে।'

'তুমি কি সত্যি পাগল হয়েছ ভিনসেন্ট? ও ধরনের কথা পাগল ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।'

ড্রয়িং-এর মত মানুষের স্বভাবও, বৈচিত্র্যময় মিজ্নের। দৃষ্টির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিপ্রেক্ষণই বদলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষণ পরিবর্তন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, করে দ্রষ্টার উপর।'

'আমি তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখব, ভিনসেন্ট। সব কিছু খুলে তাঁকে জানিয়ে দেব।'

'আপনি রাগের মাথায় অনেক কিছু লিখে দিতে পারেন, কিন্তু তার পরেই আমি যখন তাদের এখানে এসে সব কিছু নিজের চোখে দেখে যাবার জন্যে পত্র দেব তখন ব্যাপারটা কেমন বলুন দেখি?'

'তুমি নিজে চিঠি লিখবে?'

'কেন লিখব না? তবে এখনই চিঠি লেখাটা যে উচিত হবে না তা ত আপনি বুঝতেই পারছেন। আমার স্ত্রীর যা অবস্থা তাতে কোনপ্রকার মনস্তাপ বা উদ্বেগ তার পক্ষে মৃত্যু তুল্য হবে।'

'বেশ, তাহলে লিখব না। কিন্তু নিজের সর্বনাশ করতে যে উদ্যত তুমি ঠিক তারই মত ব্যবহার করছ। আমি তোমাকে এ ব্যবস্থা থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'আপনার সৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই, মিজ্‌নের টারস্টিগ, এজন্যেই আপনার গালমন্দ শুনেও আমি রাগ করি না। কিন্তু ও ধরনের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।'

কেমন একটা ব্যর্থতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টারস্টিগ চলে গেলেন। ভাইসেন ব্রুকই বহির্জগতে প্রথম সংবাদটি ছড়িয়ে ছিলেন। ভিনসেন্ট সত্যি বেঁচে আছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি উদাসীনভাবে একদিন এসে উপস্থিত হলেন।

'কি হে, সেদিন পঁচিশ ফ্রাঙ্ক না পেয়েও তুমি চালিয়ে নিয়েছ দেখছি।'

'হ্যাঁ।'

'সেদিন তোমার কথা রাখিনি বলে নিশ্চয় আজ খুশি হয়েছ।'

'নিপাত যান বলে সেদিন রাতে মভের বাড়িতে আপনাকে যেভাবে সম্বোধন করেছিলাম, আজও আপনাকে তাই বলছি।'

'তোমার এই মনোভাবটা যদি থাকে তবে তুমি একদিন দ্বিতীয় ভাইসেনব্রুক হতে পারবে। তোমার ভিতরের সত্যিকারের মানুষটিকে এবার তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার মিস্‌ট্রেসের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দাও। এ সম্মানলাভ ত আমার এখনো হয় নি।'

'আমায় যত খুশি আক্রমণ করুন, কিন্তু ওকে দয়া করে রেহাই দিন।' ক্রিস্টিনা সবুজ ঢাকনি দেওয়া লোহার দোলনাটায় দোল দিচ্ছিল। তাকে নিয়ে যে ঠাট্টা হচ্ছিল তা বুঝতে তার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। সে তার ব্যথা করুণ দৃষ্টি তুলে ভিনসেন্টের দিকে তাকাল। ভিনসেন্ট মা ও ছেলের দিকে ফিরে 'ক্রশ' করলেন। তারপর তাদের রক্ষা করার ভঙ্গিতে পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভাইসেনব্রুক একবার তাদের দিকে তাকালেন। তারপর দোলনার উপরে রাখা রেমব্রান্টের আঁকা ছবিখানার দিকে তাকালেন।

'বেশ বেশ?' ভাইসেনব্রুক বললেন, 'সুন্দর সমাবেশ হয়েছে তোমাদের , যেন আর একটি পবিত্র পরিবার।'

ভিনসেন্ট গালি দেবার জন্য এগিয়ে এল কিন্তু তার আগেই ভাইসেন ব্রুক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভিনসেন্ট আবার তার পরিবারের লোকজনের কাছে ফিরে এল। রেমব্রান্টের ছবির পাশে দেওয়ালে ছোট্ট একটি আয়না ঝুলান ছিল। ওদিকে তাকাতেই ভিনসেন্টের চোখে পড়ল তাদের তিনজনের প্রতিফলিত চেহারা। অকস্মাৎ একটা ভয়াবহ মারাত্মক মুহূর্তে সে ভাইসেন ব্রুকের দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পেল....একজন জারজ, একজন বেশ্যা, আর একজন দয়াভিক্ষাজীবীকে।

'ও আমাদের কি বলে গেল?' ক্রিস্টিনা জিজ্ঞাসা করল।

'পবিত্র পরিবার।'

'তার মানে?'

'মেরী, যীশু আর যোশেফের ছবি।'

ক্রিস্টিনার চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল। সে তাড়াতাড়ি শিশুটির কাপড় চোপড় মাথা গুঁজে ফেলল। ভিনসেন্ট দোলনার পার্শ্বে বসে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বাইরে তখন ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছিল এবং তারই স্নিগ্ধতা বাতায়ন-পথে ঘরে এসে পড়ছিল।

ওদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিনসেন্ট আর একবার ওদের দিকে তাকাল নিজের অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে।

'কেঁদো না, সিয়েন কেঁদো না। মুখ তুলে চোখ মুছে ফেল। ভাইসেন ব্রুক ঠিকই বলেছেন!'

১১.

ভিনসেন্ট একই সময় স্কেভিনজেন গ্রামটি ও ওয়েল পেন্টিবুটি আবিষ্কার করল। এটি ছোট্ট একটি মাছ ধরার গ্রাম–উত্তরের সাগরের তীরে সারি সারি মাছ ধরার নৌকো পড়েছিল। নৌকোগুলোর একটি করে মাস্তুল, রংটি গাঢ় এবং রোদবৃষ্টিতে নৌকোর পালটি ছেঁড়া। নৌকোর পেছন দিকে রয়েছে পুরনো চৌকো হাল, মাছ ধরার জালটা ছড়ানো, যেন এখনই মাছ ধরা আরম্ভ হবে, তাছাড়া, আছে উড্ডীয়মান নীল ত্রিকোণাকৃতি ক্ষুদ্র পতাকা। মাছগুলো শহরে পৌঁছে দেবার জন্যে লাল চাকাওয়ালা নীল রঙের ওয়াগন ছিল সেখানে। জেলের স্ত্রীরা মাথায় এক ধরনের শাদা টুপি পরত, টুপিগুলো দুটো গোলাকৃতি সোনার পিন দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হত।

ভিনসেন্ট জলরঙ দিয়ে রাস্তার দৃশ্যাবলীর অনেকগুলো ছবি এঁকে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি মনে ছাপ রাখার পক্ষে এই মাধ্যমই ভাল বলে তার মনে হল। কিন্তু সে যা বলতে চায়, তা প্রকাশ করার মত গভীরতা, মমতা এবং বিশিষ্ট গুণ যেন ওতে নেই। অয়েল পেন্টিং করার কথা একবার তার মনে হল, কিন্তু পরক্ষণেই ও নিয়ে কাজ করতে তার ভয় করতে লাগল। কারণ সে শুনেছে, ছবি আঁকা ভাল করে শেখার আগেই অয়েল পেন্টিং-এ হাত দিতে গিয়ে অনেকে কি করে নিজের সর্বনাশ করেছে। এর মধ্যে একদিন থিও হেগ শহরে এসে উপস্থিত হল।

থিওর বয়স বর্তমানে ২৬ বছর। সে এখন একজন ছবির উপযুক্ত ব্যবসায়ী। নিজের ফার্মের পক্ষ থেকে সে হরদম নানা স্থান ঘুরে বেড়াত এবং এ ব্যবসায়ে যুবকদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে সমাদৃত হত। প্যারিসস্থিত গুপীল এন্ড কোং বুসোদ, ভেলাডন-এর (Les Messieurs নামে পরিচিত) নিকট বিক্রীত হয়েছিল তাঁরা যদিও থিওকে পূর্বের পদে বহাল রেখেছিলেন, কিন্তু গুপীল এবং আঙ্কল ভিনসেন্টের আমলে আর্ট ব্যবসায় যা ছিল, তখন আর তা ছিল না। গুণের তারতম্য না করেই সর্বোচ্চ মূল্যে আজকাল ছবি বিক্রয় করে দেওয়া হত এবং যাদের ছবি বিক্রয় হত তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। নতুন ও তরুণ আর্টিস্টদের আবিষ্কার করে তাদের উৎসাহ দেওয়া আর্ট ডিলারের প্রাথমিক কর্তব্য বলে আঙ্কল ভিনসেন্ট, টারস্টিগ ও গুপীল মনে করতেন। কিন্তু এখন কেবলমাত্র পুরনো ও পরিচিত আর্টিস্টদের ছবিই নেওয়া হত। আর্টের ক্ষেত্রে নবাগত ম্যানেট, মোনেট, পিসারো, সিসলে, রেনয়ার, বার্থ-মোরিসট, সিজানা, ডেগাস, গুইলমিন প্রভৃতি আর্টিস্ট এমন কি এদের চেয়েও তরুণ শিল্পী টুলুস লট্রেক, লগুই সিউরাত, মিগনাগ প্রভৃতি শিল্পীরা বোগুরো ও অন্যান্য এ্যাকাডেমিশিয়ান শিল্পীরা যা পুনরাবৃত্তি করে চলেছিলেন, তার চেয়ে সম্পূর্ণ নতুন কিছু বলতে চাইলেও কেউই তাঁদের কথা শুনতে চাইল না। এইসব পরিবর্তনপন্থী শিল্পীদের কোন ছবিই প্রদর্শন অথবা বিক্রয়ের জন্য Les Messieurs-এ স্থান পেল না। বোগুরো এবং ঐ

ধরনের শিল্পীদের সম্বন্ধে থিওর একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তার সমস্ত সহানুভূতি ছিল নতুন শিল্পীদের জন্য। ওদের ছবি যাতে les Messieurs-এ রাখা হয় তার জন্য সে যথাসাধ্য করত, কিন্তু Les Messieurs ওঁদের ছবিকে পাগলামি, বালসুলভ চাপল্য, টেকনিকশূন্য বলে মনে করত। কিন্তু থিও ওঁদেরকে ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে ভাবত।

স্টুডিওতে বসে ভিনসেন্ট ও থিও আলাপ-সালাপ করতে লাগল, কিন্তু ক্রিস্টিনা নিচে নেমে এলো না। সে তবে শয়নকক্ষেই বসে রইল। প্রাথমিক কুশলাদি প্রশ্ন শেষ করে থিও বলল, 'ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যদিও আমার এখানে আসা, কিন্তু মুখ্য কারণ হচ্ছে ঐ মহিলার সঙ্গে তুমি পাকাপাকি কোন সম্পর্ক স্থাপন যাতে না কর, তা থেকে তোমাকে বিরত করা। বল ত, মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'জুন্ডার্টে লিন ডেরম্যান বলে আমাদের যে একজন পুরানো নার্স ছিল, তার কথা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সিয়েন ঠিক ওদের মতই। সে হচ্ছে একান্তভাবে বিশেষত্বহীন, কিন্তু তবু আমার কাছে সে অসাধারণ। কেউ যদি কোন সাধারণ, নগণ্য নারীকেও ভালবাসে এবং সেই নারীও যদি তাকে ভালবেসে থাকে, তবে ত তারা সুখী—এর মধ্যে জীনের দুঃখময় দিক যতই থাকুক না কেন। ঐ ভালবাসাই আমার জীবনে নতুনত্বের সঞ্চার করেছিল, আমাকে উদ্দীপিত করেছিল। আমি ওকে চাইনি, কিন্তু ও-ই আমাকে খুঁজে বের করেছিল। সিয়েন চিত্রশিল্পীর জীবনের সমস্ত ক্লেশ ও বিপদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া 'পোজ' দিতে তার ঔৎসুক্য দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, কে'র সঙ্গে বিয়ে হলে যা হতে পারতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল আর্টিস্ট হতে পারব আমি ওর সঙ্গ পেয়ে।'

থিও কিছুক্ষণ স্টুডিওতে ঘুরে বেড়াল। তারপর একটা ওয়াটার কালারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, 'কে'কে এমনভাবে ভালবাসার পর কি করে যে এই মহিলাটিকে ভালবাসতে পারলে, তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কে'র কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েই আমি ওকে ভালবাসিনি থিও। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই কি আমার মানবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি এসে আমাকে তো উৎসাহহীন, বিষণ্ণ অবস্থায় দেখতে পাওনি, বরঞ্চ তুমি প্রবেশ করেছো একটা নতুন স্টুডিওতে প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ একটি সংসারে। যে -স্টুডিওতে তুমি এসেছ, তা রহস্যময় নয়, কিন্তু তার উৎপত্তি সত্যিকারের জীবন থেকে—যেখানে কোন স্রোতহীনতা নেই, আছে কেবল এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা, আছে প্রাণ ও কর্মচাঞ্চল্য। এ আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার মনে হয় যে, যা আমরা অনুভব করি, তাই আমাদের আঁকা উচিত; সাংসারিক জীবনের সম্পূর্ণ রূপ যদি পটে প্রতিফলিত করতে হয়, তবে তাকে সত্যিকারের সাংসারিক জীবনযাপন করতে হবে।'

'তুমি তো জান ভিনসেন্ট যে আমি আর্টিস্টদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ করি না; কিন্তু তুমি কি এটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে কর যে....'

'নিজের সম্মান হানি করেছি বা নিজেকে খাটো করেছি বলে আমি বিশ্বাস করি না' বাধা দিয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, আমার কাজের উৎস হচ্ছে জনগণের চিত্তে। তাছাড়া, আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমাকে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে, জীবনের অর্থ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে হবে এবং বাধাবিঘ্নের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

'সে বিষয়ে আমিও দ্বিমত নই'– থিও তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভাইয়ের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। 'কিন্তু তার জন্যে ওকে বিয়ে করতে হবে কেন?'

'কারণ, বিয়ে করব বলে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওকে তুমি আমার মিসট্রেস অথবা ওর সঙ্গে আমার অবৈধ প্রণয় আছে, এ তুমি ভাব আমি তা চাই না। বিয়ে সম্পর্কে দুটি শর্ত রয়েছে আমাদের মধ্যে। অবস্থা অনুকূল হলেই সিভিল ম্যারেজের প্রতিশ্রুতি; তাছাড়া অপর প্রতিশ্রুতি তাতে পরস্পরকে সাহায্য করা ও দম্পতির মত জীবনযাপন করা এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার কথা।'

'তবে, শীঘ্রই তোমাদের সিভিল ম্যারেজ হচ্ছে না বোধ হয়?'

'তুমি যদি বল, তাই হবে থিও। যে পর্যন্ত নিজের ছবি বেচে দেড়শো ফ্রাঙ্ক উপার্জন করতে না পারি এবং তোমার কাছ থেকে সাহায্য নেবার আর প্রয়োজন না হয়, ততদিন বিয়ে বন্ধ রাখব। স্বাবলম্বী হবার মত ছবি আঁকা না আসা পর্যন্ত আমি বিয়ে করব না বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ধীরে ধীরে আমার উপার্জন যত বাড়বে, ততই প্রতি মাসে কম টাকা পাঠাতে পারবে : তারপর এমন সময় আসবে, যখন তোমার সাহায্য আর দরকার হবে না। সেই সময় বরঞ্চ সিভিল ম্যারেজের কথা ভাবা যাবে।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল।'

'ওই যে ও আসছে থিও। দোহাই তোমার ওকে অন্তত বিবাহিত ও সন্তানের জননী বলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ।'

স্টুডিওর পেছনের দিকের সিঁড়ি দিয়ে ক্রিস্টিনা নেমে এল। পরনে কালো রঙের নিখুঁত পোষাক, কেশগুচ্ছ সযত্নে পিছন দিকে আঁচড়ানো, আর তার মুখের লালিমা ব্রণচিহ্নকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। গৃহে শান্তি তাকে দান করেছে সৌন্দর্য। ভিনসেন্টের ভালোবাসা তাকে বিশ্বাস আর কল্যাণ স্পর্শ দান করেছে। সে এগিয়ে এসে থিওর সঙ্গে নীরবে করমর্দন করল, চা পান করবে কিনা তা জানতে চাইল এবং নৈশভোজ পর্যন্ত থাকবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। জানালার ইজিচেয়ারে বসে সে সেলাই করতে, আর মাঝে মাঝে দোলনায় দোলা দিতে লাগল। ভিনসেন্ট অস্থিরভাবে স্টুডিওর মধ্যে ছুটাছুটি করে 'চারকোলে' আঁকা প্রতিকৃতি, জলরঙে রাস্তার দৃশ্যাবলী, ছুতার মিস্ত্রীর পেনসিল দিয়ে আঁকা গ্রুপ স্টাডিসমূহ দেখাতে থাকল। কাজের কতখানি উন্নতি করেছে তাই থিওকে দেখাতে চাচ্ছিল।

থিওর বিশ্বাস ছিল যে, ভিনসেন্ট এক বড় চিত্রশিল্পী হবে, কিন্তু ওর ছবিগুলো ভাল লাগছে কিনা, ঠিক সে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। দক্ষ চিত্রশিল্প-ব্যবসায়ীর চোখ দিয়ে সে ছবিগুলো দেখল এবং বেশ করে গুণ-বিচার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না। কারণ তার ধারনা ছিল যে, ভিনসেন্টের প্রতিভা বিকাশের স্তরে ছিল কিন্তু কোথাও তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি।

'তেলরঙ নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা যদি অনুভব করো–ভিনসেন্টের সমস্ত ছবি দেখার পর থিও বলল, 'তবে তা নিয়েই কর না কেন? অপেক্ষা করে আছ কেন?'

আমার ছবি ভাল হচ্ছে, তা নিশ্চিতরূপে জানতে পারিনি বলে। টারস্টিগ আর মভ বলে আমি জানিই না কি করে.....'

কিন্তু ভাইসেনব্রুক বলেন তুমি জান। তোমার ছবির তুমিই শেষ বিচারক। তোমার যদি মনে হয় নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে তোমার গাঢ় তেল রঙ দরকার, তবে আর দেরি করো না, তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দাও।'

'কিন্তু ভাই, খরচের কি হবে? ঐ সব টিউব আমার কাছে প্রায় স্বর্ণমূল্য।'

'আগামীকাল বেলা দশটায় আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করো। যত তাড়াতাড়ি তুমি অয়েল ক্যানভাস পাঠাতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি আমি টাকা তুলতে পারব।'

নৈশ ভোজের সময় থিও এবং ক্রিস্টিনা বেশ আলাপ-আলোচনা করল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মুখ নামিয়ে ভিনসেন্টকে বলল, 'বেশ মেয়েটি, এমনটি যে হবে, আমি তা আশাই করতে পারিনি।'

পর দিন প্রাতে দুই ভাই যখন পাশাপাশি হাঁটছিল তখন দুজনকে বেশ দেখাচ্ছিল। ছোটভাই ফিটফাট, ছিমছাম আর আরেকজনের ছন্নছাড়া ভাব। নিজেদের এই বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে তারা অবশ্য বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না।

গুপীলদের দোকান থেকে রঙের টিউব, ক্যানভাস ক্রয় করার জন্য থিও দাদাকে নিয়ে গেলেন। টারস্টিগ থিওকে শ্রদ্ধা করতেন, প্রশংসার চক্ষে দেখতেন। তিনি ভিনসেন্টকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। ওদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি নিজেই বিভিন্ন রঙের টিউব নিয়ে এসে প্রত্যেকটির গুণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

থিও ভিনসেন্ট ছয় কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে স্কেভিনগেনে এসেও হাজির হল। ঠিক সেই সময় একটি মাছ-ধরার নৌকো তীরের দিকে আসছিল। কাছে কাঠের ঘরটিতে একটি লোক মেছো জাহাজটি আসতে দেখেই সে একটি পতাকা নিয়ে বেরিয়ে এল। তার পেছন পেছন কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে হাজির হল। কিছুক্ষণ পরে সে তার পতাকাটি আন্দোলিত করতেই ঘোড়ায়-চড়া একটি লোক এসে নোঙরটি আনবার জন্যে এগিয়ে গেল। নৌকোর মাঝিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আশপাশ গ্রাম থেকে বহু নরনারী এসে এই দলের সঙ্গে মিশতে লাগল। নৌকো আরও কাছে আসতেই ঘোড়ায়-চড়া লোকটি জলে নেমে নোঙরটি নিয়ে এল। তারপর জেলেদের একে একে তীরে নামান হল–সবাই তাদের চীৎকার করে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। সকলে তীরে অবতরণ করার পর ঘোড়া দিয়ে টেনে নৌকোটা পাড়ে তুলে রাখা হল পরে সকলে মিলে সারিবেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হল। তাদের চালক হল সেই ঘোড়ায়-চড়া লোকটি।

'এই রঙ দিয়ে অমনি সব ছবিই আমি ফুটিয়ে তুলতে চাই'–ভিনসেন্ট বলল।

'যেগুলো এঁকে নিজে তৃপ্তি পাও, তেমনি কতকগুলো ছবি আমাকে শিগগির পাঠিয়ে দিও। প্যারিসে এগুলো হয়ত বিক্রি করতে পারব।'

'দোহাই তোমার, আমার ছবি তুমি বিক্রি করতে আরম্ভ কর ভাই।'

১২.

থিও চলে যাবার পর ভিনসেন্ট রঙ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করল। সে তিনটি অয়েল স্টাডি সম্পূর্ণ করল। স্টাডি তিনটির একটি হচ্ছে গিস্ট ব্রিজের পেছনের এক সারি নেড়া উইলো গাছ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে একটি কাঁচা রাস্তা আর তৃতীয়টি হচ্ছে মিরডারডুর্টের একটি তরকারি বাগানে, একটা নীল কুর্তা পরে একটা লোক বাগান থেকে আলু তুলছিল। বাগানটি ছিল শাদা বালুর, ওর কিছুটা কোপান হয়েছিল, কিন্তু তবু অনেক শিকড় পড়েছিল এখানে-ওখানে। দূরে আবছা সবুজ গাছ বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছিল। স্টুডিওতে বসে নিজের কাজ দেখে নিজেই উল্লসিত হল। এগুলো যে তার প্রথম অঙ্কন, তা কেউ বলতে পারবে না। সব কিছু মিলে ছবি ক'টিকে খুবই জীবন্ত দেখাচ্ছিল। সে ভেবেছিল, তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ যাবে, তাই সে একটু অবাক হল।

কোন বনের এক ঢালু জায়গা আঁকতে সে ব্যস্ত ছিল। জমিটাকে গাঢ় লালচে-পিঙ্গল বর্ণের দেখাচ্ছিল, গাছের ছায়া পড়াতেই এমন দেখাচ্ছিল। রঙের গাঢ়ত্ব এবং ভূমির ঘনত্ব ফুটিয়ে তোলা নিয়েই সমস্যা দেখা দিল। ছবি আঁকতে আঁকতে প্রথম তার দৃষ্টি পড়ল ঐ অন্ধকারে তখনও রয়েছে কতখানি আলো। ঐ আলোটুকু তাকে যেমন ফুটিয়ে তুলতে হবে, ঠিক তেমনি তাকে রক্ষা করতে হবে রঙের গাঢ়ত্ব।

গাছের ফাঁক দিয়ে এসে-পড়া শরৎকালের সান্ধ্য-রবির আলোর ঝিলিমিলিতে মাটিকে গাঢ় লালচে পিঙ্গল বর্ণের দেখাচ্ছিল। নতুন নতুন বেড়ে-ওঠা বার্চ গাছের ডালে প্রতিফলিত আলো সবুজ আভায় ঝলমল করেছিল। ওর ছায়াচ্ছন্ন দিকটাতে কেমন একটা উষ্ণ গাঢ় কালচে সবুজ আভা ধারণ করেছিল। ঐসব চারা গাছের পেছনে, পিঙ্গলাভ লাল জমির পেছনে আকাশকে দেখাচ্ছিল নীলাভ ধূসর, উষ্ণ আর চকচকে। তারও পেছনে দেখা যায়, আরও ছোট্ট চারা গাছ এবং তাদের হলদে রঙের পাতাগুলো। কতকগুলো কাঠ-সংগ্রহকারী রহস্যময়ভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ছবি আঁকতে আঁকতে আপন মনেই সে বলল, 'শরৎ-সন্ধ্যার অনুভূতি যতক্ষণ এর মধ্যে ফুটে না উঠছে, যতক্ষণ রহস্যময় কিছু গাম্ভীর্যময় কিছু এর মধ্যে ফুটে না উঠছে, ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাব না।' কিন্তু আলো ক্রমেই কমে আসছিল। তাড়াতাড়ি তাকে কাজ করতে হল। অল্প কয়েকটি কঠিন রেখায় তাকে কতকগুলো মনুষ্য-মূর্তি আঁকতে হল। গাছের প্রতিটি শাখাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে সে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; কারণ জমির রঙ তখনও কাঁচা থাকায় কোন রেখাই পড়ছিল না। সে বার বার চেষ্টা করল–কিন্তু কিছুতেই পারল না। আঁধার আরও ঘনিয়ে এল। তার হার যে হয়েছে সে তা বুঝতে পারল। পরে তুলি পাল্টিয়ে আরও গাঢ় রঙ নিয়ে গাছের শাখা এবং শিকড় আঁকল।

'হ্যাঁ, এবার হয়েছে। যা আঁকতে চেয়েছিলাম, তাই আঁকতে পেরেছি।' সে আপন মনে বলল।

ভাইসেনব্রুক সেদিন সন্ধ্যায় এলেন। 'চল Pulchri-তে যাই। আজ সেখানে মূক অভিনয় এবং শ্যারাড হবে।'

ভিনসেন্ট শেষ দিনের কথা ভুলে যায়নি। 'ধন্যবাদ, আমি স্ত্রীকে ফেলে এখন কোথাও যেতে চাই না।'

ভাইসেনব্রুক ক্রিস্টিনার কাছে গিয়ে ওর হস্তচুম্বন করে স্বাস্থ্য কেমন আছে জানতে চাইল এবং খুশিমনে শিশুটির সঙ্গে খেলা করল। বোঝা গেল, ওদের সম্পর্কে সে যা বলেছিল তার কিছুই ওর মনে নেই।

'তোমার নতুন কয়েকটা ছবি আমায় দেখাও দেখি ভিনসেন্ট।'

ভিনসেন্ট সানন্দেই ছবি বের করে আনল। ভাইসেনব্রুক তা থেকে সোমবারের বাজারের একটি স্টাডি কোন সুপ কিচেনের সম্মুখের লাইন,-কোন পাগলা গারদের তিন বৃদ্ধ, সেভেনিনগেনের মাছ ধরার নৌকা ও অপর একটি ছবি বের করে আনল।'

'এগুলো কি বিক্রি করবে? আমি ওগুলো কিনতে পারি।'

'এও কি আমাকে ঠাট্টা করবার আরেকটি ধরণ, ভাইসেনব্রুক?'

'পেন্টিং নিয়ে আমি কখনও ঠাট্টা করি না। এই স্টাডিগুলো অপূর্ব হয়েছে। কত দাম চাও তুমি?'

'আপনিই বলুন না,' ভয়ে ভয়ে ভিনসেন্ট বলল। তাকে পরিহাস করা হবে, এ আশঙ্কা তার সব সময়ই ছিল।

'বেশ প্রত্যেকটার জন্যে যদি পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে দি, তবে তোমার কি মনে হয়? সবগুলোর জন্যে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক?

ভিনসেন্টের আঁখি দুটি একটু বিস্তৃত হল। 'এ-যে অনেক। আমার খুড়ো তো আড়াই ফ্রাঙ্ক করে দিয়েছিল।'

'তিনি তোমাকে ঠকিয়েছেন বৎস। সমস্ত ডীলাররাই তোমাকে ঠকায়। একদিন এই ছবিই তাঁরা পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে বিক্রি করবে। কি বল, একি ব্যবসা?'

'আপনাকে কখনও মনে হয় দেবদূত, আবার কখনও শয়তান।'

'বৈচিত্র্য থাকা ভাল। বন্ধুদের কাছে পুরাতন হব ন।'

তিনি টাকার থলি বের করে ভিনসেন্টকে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক দিয়ে দিলেন। চল এবার Pulchri যাই। তোমার কিছু আমোদ-আহ্লাদ করা দরকার। টনি ওফারম্যানের একটি কৌতুকাভিনয় হবে আজ। প্রাণ খুলে হাসলে তোমার ভালই লাগবে।'

ভিনসেন্ট তাই গেল। সমস্ত হলঘর লোকে ভর্তি। সবাই সস্তা দামের কড়া চুরুট খাচ্ছিল। মূকাভিনয় দুটি দেখার পরেই ভিনসেন্টের মাথা ধরে গেল। কৌতুকাভিনয় আরম্ভ হবার আগেই সে বাড়ির দিকে রওনা হল–মনে মনে সে একটি চিঠির খসড়া তৈরি করে ফেলল।

যতদূর সম্ভব পিতাকে সে বলল এবং ভাইসেনব্রুকের নিকট থেকে পাওয়া ছবির দাম পঁচিশ ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে তার অতিথি হিসাবে থিয়োডোরাকে শহরে আসবার আমন্ত্রণ জানাল।

এক সপ্তাহ পরে ভিনসেন্টের বাবা এলেন। তাঁর নীল চোখ দুটোর দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল, চলার ভঙ্গিমা শ্লথ হয়ে উঠেছিল। ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই প্রথম পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ। অবশ্য ইতিমধ্যে এরা কুশল সংবাদ জানিয়ে পত্রাদি

আদান প্রদান করেছে। থিওডোরাস এবং অ্যানা কর্নেলিয়া তাকে অনেক বার আন্ডারওয়ার, কাপড়চোপড়, সিগার, তৈরি কেক এবং মাঝে মাঝে দশ ফ্রাঙ্ক করে পাঠিয়েছে। ক্রিস্টিনাকে কি ভাবে তার বাবা নেবেন ভিনসেন্ট তা জানত না। একটি মানুষ কোন সময় হয় বিচক্ষণ আর উদার, আবার কখনও অজ্ঞ আর অনুদার।

ঐ শিশুর দোলনার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা যে নিস্পৃহ হয়ে থাকতে পারেন, বা কোন আপত্তি করতে পারেন তা সে মনে করতে পারল না। দোলনা তো খাঁটি জিনিস--তাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। ক্রিস্টিনার অতীত জীবন যতই মসীলিপ্ত থাক না কেন বাবাকে তা মার্জনা করতেই হবে।

থিওডোরাসের হাতে ছিল বিরাট একটা পুটুলি। ভিনসেন্ট ওটা খুলে ফেলল। ও থেকে বেরুল ক্রিস্টিনার জন্য আনা একটা গরম কোট। দেখে ভিনসেন্টের মনটা নিশ্চিন্ত হল। ক্রিস্টিনা ওপরের শোবার ঘরে চলে যাবার পর পিতা ও পুত্রের স্টুডিয়োতে বসে কথা চলতে লাগল।

'ভিনসেন্ট', বাবা বলতে লাগলেন, 'চিঠিতে তার একটা কথা উল্লেখ করনি। ঐ শিশুটি কি তোমার?'

'না। ওর সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখনই সন্তানসম্ভবা ছিল।'

'ছেলেটির বাবা কোথায়?'

'পালিয়ে গেছে।' এর বেশি কিছু বলা সঙ্গত মনে করল না।

'কিন্তু তুমি তো ওকে বিয়ে করবে, ভিনসেন্ট, তাই না? তবে এ রকমভাবে বাস করা উচিত নয়।'

'কথাটা ঠিকই বলেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ নিষ্পন্ন করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু থিও এবং আমার–উভয়েরই অভিমত এই যে আমার ছবি বেচে যে পর্যন্ত দেড়শো ফ্রাঙ্ক উপার্জন করতে না পারি সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

থিওডোরাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন। 'হ্যাঁ, তাই বোধ হয় ঠিক হবে। তুমি একবার বাড়ি আসো তোমার মায়ের তাই ইচ্ছা। অবশ্য আমার ইচ্ছাও তাই। ন্যুয়েনে তোমার ভাল লাগবে। সারা ব্রাবান্টের মধ্যে এটা সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। ওখানকার চার্চটা এতো ছোট যে ওকে এস্কিমোদের কুটিরের মত দেখায়। ভেবে দেখ ওতে শখানেক লোকের বেশি বসতে পারে না। পুরোহিতের বাসস্থানের চারদিকে হথর্নের ঝোপ আর চার্চের আঙিনায় রয়েছে অজস্র ফুলের গাছ এবং বহু ঢিবি এবং পুরানো কাঠের ক্রশ।'

'কাঠের ক্রশ!' ভিনসেন্ট শুধালো, 'শাদা নাকি?'

'হ্যাঁ। নামগুলো কালো অক্ষরে লেখা ছিল কিন্তু বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে গেছে।'

'চার্চে কি লম্বা সুন্দর চূড়া আছে বাবা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বড় সূক্ষ্ম আর ভঙ্গুর। এতো উঁচে উঠে গেছে তা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওটা বোধ হয় প্রায় ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছে, ভিনসেন্ট।'

'আর ও থেকে কবরের উপর পড়েছে প্রসন্ন ছায়া, তাই না?' ভিনসেন্টের আঁখি দুটি চকচক করে উঠল। 'আমি ওর ছবি আঁকব।'

'কাছেই রয়েছে চারাগাছ আর পাইনের বিস্তীর্ণ বন। পাশের ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছে আপন মনে। তোমার একবার শিগ্গিরই বাড়ি আসা উচিত।'

'হ্যাঁ, ন্যুয়েন আমায় দেখতেই হবে। ছোট ক্রুশ, গির্জার চূড়া আর কর্ষণরত চাষী। চমৎকার। মনে হচ্ছে, ব্রাবান্ট আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

থিওডোরাস ফিরে এসে স্ত্রীকে জানালেন যে পুত্রদের সম্পর্কে যা কিছু তারা কল্পনা করেছিলেন তা ঠিক নয়। অন্যদিকে ভিনসেন্ট নতুন উৎসাহে কাজে লেগে গেল। থিও তাকে অবিশ্বাস করে না, বাপ মা ক্রিস্টিনাকে অপছন্দ করে না। হেগ শহরের আর কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। বিনা বাধায় সে আপন মনে এগিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

লাম্বার ইয়ার্ডে যারা কাজ করতে এসে কোন কাজ পেত না, ইয়ার্ডের মালিক তাদেরকে পাঠিয়ে দিত ভিনসেন্টের কাছে মডেল হবার জন্য। এর ফলে তার পকেটবুক যেমন খালি হতে লাগল তেমনি পূর্ণ হতে লাগল তার পোর্টফোলিও। স্টোভের পাশে দোলনায় শায়িত শিশুটির ছবি সে বারবার আঁকল। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবার পর সে বাইরে বসে তেল রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে লাগল। আলোর প্রতিফলন সে যেভাবে চাচ্ছিল তা শীঘ্রই ধরে ফেলল। সে বুঝতে পারল যে, আসল চিত্রকর সে-ই, যে প্রকৃতির রঙের আলপনা দেখে অবিলম্বে তা বিশ্লেষণ করতে এবং বলতে পারে 'ধূসরাভ-সবুজ হচ্ছে হলদে আর কালোর সংমিশ্রণ। ওখানে নীল রঙ বলে বিশেষ কিছু নেই।'

সে জানত যে পৃথিবী তাকে অকর্মণ্য, মাথা খারাপ এবং বিরক্তিকর বলে মনে করে, জীবনে যার কোন উন্নতি হবে না বলে মনে করে। এমনি পাগলা আর অপদার্থের ভিতরও যে শক্তি রয়েছে সে তা আপন কাজ দিয়ে দেখাবার আশা পোষণ করছিল। দরিদ্রতম কুটিরে, সবচেয়ে মলিন কোণেও সে রূপায়িত করার মত চিত্র খুঁজে পেত। অঙ্কনে যত সে আত্মবিভোর হয়ে পড়ত ততই অন্য সব কাজকর্ম কেমন ফিকা হয়ে দাঁড়াল। এমনি ভাবে সে যত বাহ্যিক ব্যাপার থেকে মুক্তিলাভ করছিল ততই সে জীবনের সৌন্দর্যময় ছবি উপলব্ধি করতে লাগল। চিত্রশিল্পীর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে বিরতিহীন কাজ আর তীক্ষ্ণ, বিচ্ছেদহীন পর্যবেক্ষণ।

সে ভারী রঙ নিয়ে ছবি আঁকা শুরু করেছিল তাই রঙ-ও বেশি লাগছিল, কিন্তু রঙের দাম ছিল তার কাছে অসম্ভব কিছু। টিউব থেকে সে যখন ভারী রঙ টিপে বের করত তখন তার মনে হত যেন জুড়ার জী-তে সে টাকা ঢেলে দিচ্ছে। এত দ্রুত সে আঁকতে লাগল যে তার ক্যানভাসের বিলই অনেক হয়ে গেল। যে তেলের ছবি করতে মভের দু'মাস লাগত তা সে এক বৈঠকেই শেষ করে ফেলছিল। সে পাতলা রঙ দিয়ে যেমন ছবি আঁকতে পারতো না তেমনি ধীরে ধীরেও কাজ করতে পারত না। ফলে তার অর্থ যেমন উবে যেতে লাগল তেমনি স্টুডিয়ো ছবিতে ভর্তি হয়ে উঠল। থিও এখন মাসের পয়লা, দশ ও কুড়ি তারিখ ৫০ ফ্রাঙ্ক করে খরচের টাকা পাঠায়—টাকা আসা মাত্রই সে ছুটে যায় রঙের ব্যবসায়ীর কাছে। তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে বিভিন্ন রঙের বড় বড় টিউব। রঙ আর টাকা না ফুরানো পর্যন্ত সে খুশি মনে কাজ করে যায়। পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত এ খুশি থাকে তার পরই আরম্ভ হয় হাঙামা।

নবজাত শিশুটির জন্যে এত রকমের জিনিস কিনতে হচ্ছে দেখে ভিনসেন্ট অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া, ক্রিস্টিনার জন্যে আনতে হচ্ছিল ঔষধ, নতুন পোষাক পরিচ্ছদ, বিশেষ খাওয়ার বস্তু, হেরম্যানের জন্য কিনতে হচ্ছিল বইপত্র ও অন্যান্য জিনিস–এও তাকে কম আশ্চর্য করছিল না। তার বাড়িটা যেন একটা অন্তহীন গহ্বর–এই গহ্বরে সে ঢেলে চলেছিল অফুরন্ত ল্যাম্প, পাত্র, কম্বল, কয়লা আর কাঠ পর্দা, রাগ, মোমবাতি, বিছানার চাদর, রূপার বাসন, প্লেট, আসবাব এবং বহু ধরনের খাদ্যবস্তু। পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ককে কি করে যে তার পেন্টিং এবং তার উপর নির্ভরশীল তিনটি প্রাণীর মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে তা সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না।

'বেতন পেলেই মজুর যেমন ছুটে যায় মদের দোকানে, তোমাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে', একদিন থিওর কাছ থেকে আসা টাকা পেয়েই ভিনসেন্ট যে ভাবে রঙের খালি টিউবগুলো জড়ো করছিল, তা দেখে ক্রিস্টিনা একদিন মন্তব্য করল।

সে একটি নতুন পরিপ্রেক্ষণ যন্ত্র তৈরি করল। এই যন্ত্রটি এবং তার ভারী ইজেল নিয়ে সে প্রত্যেকদিন বালিয়াড়ির উপর দিয়ে সমুদ্রের ধারে যেত আকাশের ও সমুদ্রের রঙের খেলা দেখবার জন্যে। সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসত এবং অন্যান্য আর্টিস্টরা স্ব স্ব স্টুডিয়োতে চুল্লীতে আগুন জ্বালাতে আরম্ভ করতো সে তখন বাইরে বেরিয়ে পড়ত, ঝড়জল আর কুয়াশাকে চিত্রে রূপায়িত করতে। জল-ঝড়ে প্রায়ই তার কাঁচা রঙ বালুতে আর লবণাক্ত জলে ভিজে যেত। বৃষ্টি তাকে ভিজিয়ে দিত, কুয়াশা আর হাওয়া তাকে কাঁপিয়ে তুলত। চোখে-কানে বালু ঢুকে যেত....তবু তারি মাঝে শেষ পর্যন্ত কাজ করতে সে ভালবাসত। এ-কাজ থেকে মৃত্যু ছাড়া কেউ তাকে আটকাতে পারত না।

একদিন রাতে সে ক্রিস্টিনাকে একটি নতুন ছবি দেখাল। 'এত জীবন্ত চিত্র তুমি কি করে আঁকলে?' বিস্মিত ক্রিস্টিনা বলল।

একজন অশিক্ষিত নারীর সঙ্গে যে কথা বলছে ভিনসেন্ট তা ভুলে গেল। তার মনে হল সে যেন ভাইসনক্রক অথবা মভের সঙ্গে কথা বলছে।

'তা আমি ঠিক বলতে পারব না'– সে বলতে লাগল, 'যে দৃশ্য আমার চোখে লাগে তাকে সম্মুখে রেখে একটা শাদা বোর্ড নিয়ে আমি বসি, এবং মনে মনে বলি, 'এই শাদা বোর্ড অসামান্য হয়ে উঠবে।' দীর্ঘকাল ধরে আমি কাজ করি, তারপর একটা অসন্তোষ নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি, তারপর ছবিটা বন্ধ করে রাখি ঐ ঘরে। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে শঙ্কিত মনে আবার ওটা দেখতে যাই। ছবি দেখে তৃপ্তি পাই না, খুঁতখুঁত থাকে মনে, কারণ আমার চোখের সম্মুখে তখনও রয়েছে সেই নয়নমনোহর ছবিটি যাকে আমি রূপায়িত করতে পারিনি। আমার মনে যে ছবি পড়েছিল তার প্রতিপলন যেন দেখতে পাই। আমি যেন দেখতে পাই, প্রকৃতি আমাকে যেন কিছু বলেছে এবং আমি তা সর্টহ্যান্ডে রূপায়িত করেছি। আমার হ্রস্ব-লিখনে হয়ত এমন শব্দ থাকতে পারে যা ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাতে হয়ত ত্রুটি অথবা ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু অরণ্যের গাছপালা অথবা নদীর তীর বা প্রতিমূর্তি আমাকে যা শুনিয়েছিল, তার প্রতিলিপি রয়েছে ওখানে। বুঝতে পারলে তো?'

'না।'

১৩.

ভিনসেন্টের কাজের ধারাটা ক্রিস্টিনা খুব কমই বুঝত। তার মনে হত ভিনসেন্টের ছবি আঁকার স্পৃহাটা একটা বিশেষ ভাব। সে জানত যে, এই ভিত্তির উপরই তার জীবন গড়ে উঠেছে, তাই কোন ভাবে তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করত না। ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, অতি ধীর উন্নতি এবং ছবিগুলোর ব্যথাময় ব্যঞ্জনা তার মনে কোন প্রভাবই বিস্তার করত না। সাধারণ সাংসারিক জীবনের পক্ষে ক্রিস্টিনা ছিল অতি সুন্দর সঙ্গী। কিন্তু ভিনসেন্টের জীবনের অত্যন্ত স্বল্প অংশই ছিল সাংসরারিক। নিজকে ব্যক্ত করতে হলে ভিনসেন্টকে বাধ্য হয়ে চিটি লিখতে হত থিওকে। প্রতি রাতেই সে প্রায় লিখত তাকে আবেগপূর্ণ পত্র। পত্রে বর্ণনা থাকত সারা দিন কি সে দেখেছে, এঁকেছে এবং ভেবেছে তারই প্রতিচ্ছবি। অন্যদের ভাব গ্রহণ করার ইচ্ছে হলেই সে ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী, জার্মান ও ডাচ উপন্যাস নিয়ে বসত। ক্রিস্টিনাকে ভিনসেন্টের জীবনের অতি অল্পই ভাগ পেত। ভিনসেন্টের কোন অভিযোগ ছিল না। ক্রিস্টিনাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করেছে বলে সে কখনও অনুতাপ করেনি, অথবা তাকে ইনটেলেকচুয়াল করে তুলতে চেষ্টা করেনি। গ্রীষ্ম ও শরতের দীর্ঘ মাসগুলো তার ভালভাবেই কাটল। এই সময় ভোর পাঁচটা কি ছয়টায় সে গৃহত্যাগ করে চলে যেত এবং সন্ধ্যার আঁধার বেশ ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আর বাড়ি ফিরত না। সন্ধ্যার শীতল হাওয়ার মধ্যদিয়ে সে বালিয়ড়ি অতিক্রম করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত।

সে একান্তভাবে ছবি আঁকা আরম্ভ করল এবং যতটা সম্ভব রঙের খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মডেলের দরুণই তার প্রচুর টাকা ব্যয় হয়ে যেতে লাগল। যেসব লোক এক প্রকার বিনি পয়সাতেই যে কোন খাটুনির কাজে সানন্দে করতে রাজি হত, তারাই 'পোজ' দিতে এসে প্রচুর টাকা দাবি করতে লাগল! পাগলা গারদ থেকে স্কেচ করার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করল, কিন্তু তার দরখাস্ত নানা কারণে গ্রাহ্য করা হল না।

তার একমাত্র আশা ক্রিস্টিনাতেই নিবন্ধ ছিল। সে আশা করেছিল যে, ক্রিস্টিনা শক্ত ও সমর্থ হলেই আগের মত 'পোজ' দিতে পারবে হয়ত। কিন্তু ক্রিস্টিনা মনে মনে অন্য কিছু ভেবে রেখেছিল। প্রথমত সে বলল 'আমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, সুতরাং আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি আঁকা তোমার উচিত হবে না।' সুস্থ হবার পর অন্যভাবে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'আগের মত তো আমি আর নেই, ভিনসেন্ট' সে বলত, 'ছেলেটাকে দেখাশোনা করতে হবে। সারা বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। চারজনের জন্যে রান্না করতে হবে।'

ঘরের কাজ করে রাখার জন্যে ভিনসেন্ট ভোর পাঁচটায় উঠতে লাগল। যাতে ক্রিস্টিনা সারাদিন 'পোজ' দেওয়ার মত অবসর পায়। 'কিন্তু আমি ত আর মডেল হতেই পারি না।' সে বাধা দিয়ে বলল, 'আমি যে তামার স্ত্রী।'

'সিয়েন, তোমাকে মডেল হতেই হবে। প্রত্যেক দিন মডেল ভাড়া করার সামর্থ্য আমার নেই। তাছাড়া এজন্যেও তোমার এখানে ঠাঁই হয়েছে।'

ক্রিস্টিনা অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। ভিনসেন্টের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন এমন রাগ ছিল ক্রিস্টিনার। 'ওজন্যেই তুমি আমাকে রেখেছ! আমাকে খাটিয়ে তুমি টাকা বাঁচাতে চাও! আমি তোমার ভাড়া করা চাকর? পোজ না দিলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে তো।'

ভিনসেন্ট এক মিনিট কি ভাবল বলল, 'তুমি ঐসব তোমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছ বুঝি? নিজে ভেবে বের করনি নিশ্চয়।'

'নিজেই যদি ভেবে ঠিক করে থাকি তবেই বা কি? যা বলেছি, তা সত্য তো?'

'মার ওখানে যাওয়া তোমায় বন্ধ করতে হবে, সিয়েন।'

'কেন? মাকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গে দেখা করব না কেন?'

'কারণ তারা আমাদের ভিতরকার সম্পর্ককে তিক্ত করে ফেলছে। তুমি তো জান তাঁরা তোমাকে আবার পুরোনো পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। তাহলে কি করে আমাদের বিয়ে হবে?'

'বাড়িতে খাওয়ার কিছু না থাকলে তুমিই তো আমাকে ও বাড়িতে পাঠিয়েছ। আরও কিছু পয়সা উপার্জন কর, তাহলেই তো আমার আর ও বাড়ি যেতে হবে না।'

অনেক যুক্তি তর্কের পর ওকে 'পোজ' যখন দেওয়ার জন্যে দাঁড় করান হল, তখন দেখা গেল ও কাজের বাইরে চলে গেছে। বহু চেষ্টায় যেসব ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছিল, আবার সব ক্রিস্টিনার মধ্যে দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে ভিনসেন্টের সন্দেহ হয়েছে যে, ইচ্ছে করেই ক্রিস্টিনা এমন ভাব করছে, যাতে বিরক্ত হয়ে সে বাদ দিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাকে বাদই দিতে হল। বাইরে থেকে মডেল ভাড়া করার খরচ তার বেড়ে গেল এবং তার সঙ্গে বাড়ল তাদের অনাহারে কাটাবার দিনগুলো, ফলে ক্রিস্টিনা এরাও বেশি দিন মায়ের কাছে কাটাতে লাগল। প্রত্যেকবার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টিনার ব্যবহার ও চরিত্রে কিছু পরিবর্তন ভিনসেন্টের চোখে পড়তে লাগল।

ভিনসেন্ট একটি সঙ্কটে পড়ল। সে যদি সব টাকা বাড়ির খরচের জন্য ব্যয় করে, তবে হয়ত ক্রিস্টিনা মায়ের কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারে এবং তাদের সম্পর্কও মধুর থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত টাকা এমনভাবে খরচ করে ফেললে তার কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। ক্রিস্টিনার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে সে কি নিজেকে হত্যা করবে? ক্রিস্টিনা যদি মাসের মধ্যে কয়েকবার মায়ের ওখানে না যায়, তবে সে এবং তার ছেলেরা না খেয়ে থাকবে, কিন্তু যদি যায় তবে ভিনসেন্টের সংসারে নিশ্চিতভাবে আসবে বিপদ। এ অবস্থায় ভিনসেন্ট কি করবে?

নূতন বৎসরের প্রথম দিকে ভিনসেন্ট একখানা অদ্ভুত চিঠি পেল থিওর। একটি নিঃসঙ্গ, অসুস্থ এবং আশাহীনা নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তার ভ্রাতার প্যারিসের কর্মক্ষেত্রেই তার সঙ্গে আলাপ। পায়ের কি একটু অসুখ হওয়ায় সে পথ করতে পারছিল না। আত্মহত্যার জন্য এ মেয়েটি স্থির সঙ্কল্প করেছিল। এ অবস্থায় থিও দাদার পথা অনুসরণ করল। একজনের বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে ডাক্তার এনে তাকে পরীক্ষা করা হল। তারপর তার সমস্ত খরচপত্র বহন করতে লাগল। মেয়েটিকে সে রুগী বলে চিঠিতে উল্লেখ করতো।

'আমার রুগীকে কি আমি বিয়ে করব, ভিনসেন্ট? ওকে রক্ষা করবার আমার পক্ষে এই কি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা? আনুষ্ঠানিকভাবে আমার বিয়ে করা উচিত? জীবনে সে কিছুই পায় নি। অনেক দুঃখ ভোগ করেছে ও। যাকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, সেই ওকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এই অবস্থায় ওর জীবন রক্ষার জন্যে আমি কি করব বলত?'

সমস্ত বিষয়টা ভিনসেন্টের অন্তর স্পর্শ করল। সে ভাইকে সহানুভূতিপূর্ণ পত্র দিল। আর এদিকে ক্রিস্টিনা ক্রমেই অসহ্য হয়ে পড়ল। যেদিন বাড়িতে কেবলমাত্র রুটি আর পনির থাকত, সেদিনই সে গন্ গন্ করত। ভিনসেন্ট যাতে মডেলের পিছে অর্থব্যয় না করে বাসার জন্যে টাকা-পয়সা খরচ করে, সেজন্য ক্রিস্টিনা চাপ দিতে লাগল। নতুন পোষাক না পেলেই সে পুরাতন পোষাকগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ফেলত, যাতে তা নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। ভিনসেন্টের জামা সেলাই করাও সে বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে সে আবার মায়ের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। সে ক্রিস্টিনাকে বুদ্ধি দিল ভিনসেন্টের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে আসার জন্য। একটা স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি যখন অসম্ভব, তখন এমন ভাবে থাকার কোন মানে হয় না।

রুগীকে বিয়ে করবার উপদেশ কি সে থিওকে দেবে? আইনসঙ্গত বিয়েই কি এই সব নারীকে রক্ষা করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়? অথবা তাদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য প্রয়োজন শুধু বাস করার গৃহ, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে ভাল খাওয়া আর সহৃদয় ব্যবহার?

'বিয়ে এখনই করো না'—সে ভাইকে সাবধান করে দিল। 'তবে মানুষের উপকার করা মহৎ কার্য। সুতরাং ওর জন্যে যা পার করো। বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। ওকে রক্ষা করতে পার কিনা, তাই আগে দেখো।'

পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে থিও মাসে তিনবার টাকা পাঠাত। ক্রিস্টিনার অমিতব্যায়িতার জন্যে ব্যয়বাহুল্য এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ও টাকায় আগের মত আর কিছুই চলত না। মডেলের জন্যে ভিনসেন্ট অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ সত্যিকারের ছবি আরম্ভ করার আগে সে যথেষ্ট পরিমাণ স্টাডি সম্পূর্ণ করতে চাইছিল। অঙ্কনের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, তার থেকে পয়সা নিয়ে সংসার ব্যয় নির্বাহ করতে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করত। বাসা খরচ থেকে যে কয়টি টাকা সে ড্রয়িং-এ ব্যয় করতে পারত, তাতেই সে খুশি হত। এ যেন তাদের জীবন সংগ্রাম। মাসে সে যে দেড়শো ফ্রাঙ্ক পেত, তাতে অতি সামান্যভাবে খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। অথচ তা দিয়ে চারজনকে পোষণ করার চেষ্টা অসমসাহসিক ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু তা অসম্ভব। ফলে ধীরে ধীরে সে দেনাদার হয়ে পড়ল। বাড়িওয়ালা, মুচি, দোকানদার, রুটিওয়ালা, রংয়ের ব্যবসায়ী সবার কাছে তার ধার হল। অবস্থা চরম হল তখনই, যখন থিওর পুঁজিও কমে এল।

ভিনসেন্ট অনুনয় করে পত্র দিতে লাগল। 'যদি পার তবে কুড়ি তারিখের আগেই টাকাটা পাঠিও—অন্তত কুড়ি তারিখের ওদিকে যেন না যায় দেখো। আমার ঘরে এখন মাত্র দুই তা' কাগজ এবং একটা রঙিন পেন্সিল রয়েছে। মডেলের জন্য বা খাওয়ার মত একটি ফ্রাঙ্কও আমার কাছে নেই।' মাসে তিনবার করে তাকে এমনি ধরনের চিঠি

লিখতে হত। তারপর পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পৌঁছোনোর পূর্বেই তার ধার হয়ে পড়ত। ফলে পরের দশদিন চালাবার মত তার হাতে কিছুই থাকত না।

থিওর 'রুগীর' পায়ে টিউমার হয়েছিল। তাই অপারেশন করাতে হলো। ওকে একটা ভাল হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো থিওকে। অপর দিকে ন্যুনেনেও টাকা পাঠাতে হতো থিওকে। কারণ থিয়োডোরাসের যা আয় হত, তাতে সংসার চলত না। নিজেকে নিজের রুগীকে, ক্রিস্টিনাকে, হেরম্যানকে, এ্যান্টুনকে এবং ন্যুনেনস্থ সংসারটিকে ভরণপোষণ করতে হত থিও'র। ঐভাবে তার বেতনের শেষ কপর্দকও ব্যয় হয়ে যেত। ভিনসেন্টকে যে কিছু উপরি অর্থ পাঠাবে, তার কোন উপায় ছিল না।

মার্চের প্রথমে চরম মুহূর্ত দেখা দিল। ভিনসেন্টের হাতে তখন একটি এক ফ্রাঙ্কের নোট তাও আবার ছেঁড়া। একজন দোকানদার ইতিমধ্যেই তা একবার ফিরিয়ে দিয়েছে। খাবার মত কোন বস্তু ঘরে ছিল না। নয়দিনের আগে থিওর কাছ থেকে পয়সা পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ কয়টা দিন ক্রিস্টিনাকে তার মায়ের কাছে রাখবার জন্যে সে ভয়ানকভাবে চেষ্টা করল।

'সিয়েন,' একদিন সে বলে ফেলল, 'বাচ্চাদের আমরা না খাইয়ে রাখতে পারি না। থিওর চিঠি না আসা পর্যন্ত তুমি বরঞ্চ ওদের নিয়ে তোমার মার ওখানে চলে যাও।'

ক্ষণকাল উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। উভয়ের মনেই জেগে উঠেছিল একই প্রশ্ন, কিন্তু সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সাহস যেন কারুর ছিল না।

'সে আমি আগেই জানতুম,' সিয়েন শুধু বলল।

সেই ছেঁড়া নোটটার পরিবর্তে ভিনসেন্ট মুদির কাছ থেকে একটা কালো রুটি আর কিছু কপি জোগাড় করল। সে মডেল নিয়ে এসে কাজ করতে লাগল। তাদের পাওনা বাকি থাকতে লাগল। ক্রমেই সে নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগল। সমস্ত কাজ কেমন নীরস আর কঠোর হয়ে দাঁড়াল। ক্ষুধা মিটাবার শক্তি তার ছিল না। আর্থিক অনটনে তার দেহমন ভেঙে পড়তে লাগল। কাজ ছাড়া সে একমুহূর্তও থাকতে পারছিল না, কিন্তু প্রতিদিনই সে উপলব্ধি করছিল যে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।

ন'দিন পরে ঠিক তিরিশ তারিখে থিওর চিঠি আর টাকা এলো। অপারেশনের পর তার 'রুগী' এখন ভাল হয়ে গেছে, সে তার জন্যে ভিন্ন বাসা করেছে। আর্থিক অনটনের ফলে তার শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সে কেমন নিরাশ হয়ে পড়ছিল। সে লিখেছে, 'ভবিষ্যতে তোমাকে আর সাহায্য করতে পারব কিনা, তা আর নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

এই পংক্তিটা পড়ে ভিনসেন্টের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে ও আর টাকা পাঠাতে পারবে না–এই কি ঐ পংক্তির অর্থ? অথবা ভিনসেন্ট যে সব স্টাডি পাঠাত তা দেখে থিওর ধারণা হয়েছে যে, তার কোন প্রতিভা নেই সুতরাং সে কোন অর্থ পেতে পারে না? তা অবশ্য মন্দ নয়।

নানা চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটতে লাগল তার। টাকা বন্ধ করার সম্বন্ধে বিস্ত ারিতভাবে জানার জন্যে সে অনবরত চিঠি লিখতে লাগল। অর্থোপার্জন করার জন্যে সে হতাশভাবে নানা চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না।

১৪.

ক্রিস্টিনার সঙ্গে সে দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখে সে তার মা, ভাই, ভাইয়ের মিস্ট্রেস হবার একজন নতুন লোকের সঙ্গে বসে আছে। ক্রিস্টিনা কালো সিগার থেকে ধূম আর মদ পান করছিল। স্কেনবেগে ফিরে যাবার চিন্তায় সে একটুও উৎফুল্ল বোধ করল না।

নয়দিনেই পুরাতন জীবনের ধারায় আবার সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

'আমার ইচ্ছা হলে আমি সিগার খাব'–সে চিৎকার করে বলল, 'আমি সিগার নিজে যোগাড় করেছি সুতরাং তা খাওয়া বন্ধ করার কোন অধিকার তোমার নেই। আমি জিন ও বিয়ার খেতে পারি বলে হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, ঔষধ হিসাবে....তোমার ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্যে।'

ক্রিস্টিনা কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল। 'ঔষধ, তুমি একটা....!' এমনি ধরনের ইতর সম্ভাষণ প্রথম দিনের পরিচয়ের পরে আর ক্রিস্টিনা করেনি।

ভিনসেন্টের মনটা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ছিল। ক্রিস্টিনার কথা শুনে সে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল। ক্রিস্টিনাও সমানে সমানে চালাল। 'তুমি ত আমার আর কোন যত্নই করো না!' সে চিৎকার করে বলল, 'কিছু খেতেও দিতে পার না। কেন আরও টাকা উপার্জন করো না তুমি? কি হতছাড়া মানুষ তুমি?'

রুক্ষ শীতের পরে মনোরম বসন্তকাল আসল। ভিনসেন্টের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। তার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। পাকস্থলীতে উপযুক্ত খাবার দিতে না পারায় সেও বেঁকে দাঁড়াল। খাওয়ার মত এক বিন্দু জিনিসও তার বাড়িতে ছিল না। পেটের রোগ দাঁতে এসে ঠেকল। দাঁতের ব্যথায় বিনিদ্র রজনী কাটতে লাগল। দাঁত থেকে ব্যথা গেল দক্ষিণ কর্ণে। সারাদিন সে কানে অসহ্য ব্যথা অনুভব করল।

ক্রিস্টিনার মা প্রায়ই তার বাড়ি আসত; মেয়ের সঙ্গে বসে ধূমপান করত, মদ খেত। বিয়ে হলে যে ক্রিস্টিনার ভাগ্য ভাল হবে সে এখন আর তা মনে করত না। একদিন ক্রিস্টিনার ভাইকেও সে তার গৃহে দেখতে পেল–অবশ্য ভিনসেন্ট বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেল।

'ও এখানে আসে কেন?' ভিনসেন্ট জানতে চাইল, 'ও কি চায়?'

'সবাই বলছে তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

'তুমি জানো, সিয়েন, সে আমি কখনও করব না। অন্তত যে পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে সে পর্যন্ত তো নয়ই।'

'এখান থেকে চলে যাই মা'র তাই ইচ্ছে। না-খেয়ে এখানে পড়ে থাকায় কোন লাভ নেই বলে তিনি বলছেন।'

'কোথায় যাবে তুমি?'

'বাড়িতেই অবশ্য।'

'ছেলেপেলেগুলোকেও ঐ বাড়িতেই নিয়ে যাবে তো?'

'এখানে উপবাস করে থাকার চেয়ে তা অনেক ভাল। আমি নিজে খেটে অর্থ উপার্জন করতে পারব।'

'কি কাজ করবে তুমি?'

'এই....যা হয় কিছু।'

'ঠিকা ঝি-গিরি? না ধোপার পাটে?'

'...হ্যাঁ।'

'ভিনসেন্ট বুঝল যে ও মিথ্যা কথা বলছে।'

'তাহলে ও কাজ করার জন্যেই ওরা চেষ্টা করছে।'

'তা...কাজ তো খারাপ নয় ....কিছু অর্থ তো উপার্জন হবে।'

'শোন, সিয়েন, তুমি যদি আবার ও বাড়ি যাও তবে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তুমি জান তোমার মা তোমাকে আবার বেশ্যাবৃত্তি ধরাবে। কিন্তু তার আগে লেডেনের ডাক্তার যা বলেছিলেন, সে কথাগুলো স্মরণ করো। তুমি যদি ও জীবন আরম্ভ করো তবে নিজেকেই হত্যা করবে।'

'আমার আর কোন ক্ষতি হবে না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।'

'সাবধানে আছ বলেই শরীর তোমার সুস্থ লাগছে। কিন্তু আবার যদি জীবন বদলাও...!'

'হা ভগবান, তুমি তাড়িয়ে না দিলে কে ফিরে যাবে ও জীবন পথে।'

ভিনসেন্ট ক্রিস্টিনার চেয়ারের হাতলের উপর বসে ওর কাঁধের উপর হাত রাখল। ক্রিস্টিনার চুলগুলো তখনও ছিল অযত্নরক্ষিতা। 'আমাকে বিশ্বাস করো সিয়েন, আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করব না। আমার যা আছে তাই ভাগ করে যদি তুমি থাকতে চাও, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখব, কিন্তু তোমাকে তোমার মা আর ভাইয়ের থেকে দূরে থাকতে হবে। তারা তোমার সর্বনাশ করবেন! প্রতিজ্ঞা করো তুমি আর ওদের সঙ্গে দেখা করবে না।'

'বেশ, প্রতিজ্ঞা করছি।'

দু'দিন পরে সে বাইরে থেকে স্কেচ করে এসে দেখে, তার স্টুডিও শূন্য। নৈশ ভোজের কোন আয়োজনই নেই। ক্রিস্টিনাকে তার মার বাড়িতে মদ্যপানরত অবস্থায় দেখতে পেল।

'মাকে যে আমি ভালবাসি, আমি তো তোমাকে বলেছি,' বাড়ি ফিরে ক্রিস্টিনা প্রতিবাদের সুরে বলল। 'তাঁর সঙ্গে দেখা করার অধিকার আমার রয়েছে। তাতে বাধা দেবার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। আমার ইচ্ছামত চলার স্বাধীনতাও আমার আছে।'

ধীরে ধীরে ক্রিস্টিনার জীবনে পুরাতন বদ অভ্যাসগুলো ফিরে আসতে লাগল। ভিনসেন্ট তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে লাগল। এমনভাবে চললে তাদের যে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদই সৃষ্টি হবে–বলতে গেলে ক্রিস্টিনা জবাবে বলত, 'হ্যাঁ, তা আমি জানি। আমি তোমার সঙ্গে থাকি সেটা আর তুমি চাও না।' বাড়িঘর সংস্কারের অভাবে কত নোংরা হয়েছে, ভিনসেন্ট তা ওকে দেখালে জবাবে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটা কুঁড়ে আর অকেজো মানুষ। কিন্তু কি করব বল। কাজ যখন করতে পারি না তখন এরকম থাকতেই হবে। তার এই আলসেমি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে বুঝিয়ে দিতে গেলে সে বলত, 'আমি যে এক সমাজচ্যুত ব্যক্তি এতে কোন ভুল নেই। মদে ডুবেই নিজের জীবনটা শেষ করে দেব।'

ক্রিস্টিনার মা এখন প্রতিদিনই প্রায় স্টুডিওতে এসে ওকে তার সঙ্গ থেকে' বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চলে যেত। সারা গৃহে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। খাওয়া দাওয়া যেন বিষবৎ হতে লাগল। হেরম্যান স্কুল পালিয়ে খুশিমতন ঘুরে বেড়াতে লাগল। কাজ বাদ দিয়ে ক্রিস্টিনা মদে আর চুরুটে মনোনিবেশ করল। কি করে যে এসব কেনার পয়সা পায় সে তা কখনও ভিনসেন্টকে বলত না।

গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল। ভিনসেন্ট ঘরের বাইরে বসে পেন্টিং শুরু করল। ফলে রঙ, ব্রাস, ক্যানভাস, ফ্রেম, বড় সাইজের ইজেল ইত্যাদির জন্যে নতুন করে পয়সা খরচ হতে লাগল। থিওর কাছ থেকে তার 'রুগী'র সুস্থতার সংবাদ পাওয়া গেল এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা-ও জানা গেল। মেয়েটি তো এখন সুস্থ হয়েছে, এখন ওকে কিভাবে রাখা যায়?

ভিনসেন্ট ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ সম্পর্কে একেবারে চোখ বন্ধ করে রইল। সে বুঝতে পারছিল যে, চোখের সামনেই ওর সাধের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। ক্রিস্টিনার আলস্য তাকেও চির অকর্মণ্যতার পথে আকর্ষণ করছে। কাজে মগ্ন থেকে আপন নৈরাশ্যকে সে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাইত। প্রত্যেকদিন প্রাতে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে ছবি আঁকতে যাওয়ার সময় সে ভাবত তার ছবি হবে অনিন্দ্যসুন্দর। এ শুধু অবিলম্বে বিকিয়ে যাবে না, তাকেও প্রতিষ্ঠিত করবে যশোরাজ্যে। কিন্তু প্রতিদিন রাতে সে এই দুঃখানুভূতি নিয়েই ফিরত যে, দক্ষ চিত্রকর হতে তার আরও অনেক সময় লাগবে।

তার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল শিশু আন্তুন। সে যেন একটা শক্তির আশ্চর্য উৎস। যা পেত সে তাই খেয়ে ফেলত হাসতে হাসতে। ভিনসেন্টের সঙ্গে স্টুডিয়োর এককোণে সে প্রায়ই এসে বসত। সে প্রথমত ভিনসেন্টের চিত্রগুলো দেখে কলকণ্ঠে কি বলত তারপর দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকত। দিনে দিনে সে বেশ সুন্দর আর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছিল। ক্রিস্টিনার স্নেহ যত কমে যেতে লাগল শিশুটির জন্যে ভিনসেন্টের স্নেহ ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। আন্তুনের মধ্যেই যেন সে আপনার পরিশ্রমের সার্থকতা খুঁজে পেল।

এর মধ্যে ভাইসেনব্রুক একবার মাত্র এসেছিলেন। ভিনসেন্ট তাকে এক বছরের আগের আঁকা কতকগুলো ছবি দেখাল। এগুলো দেখে সে ভয়ানকভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

'আরে এমন ভাবছ কেন?' ভাইসেন ব্রুক বললেন, 'আরও বেশ কয়েকবছর পর যখন এই ছবিগুলো দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে, এগুলো কেমন খাঁটি আর সূক্ষ্ম হয়েছে। শুধু কাজে লেগে থাক বৎস, কোন কিছুই যেন তোমাকে থামাতে না পারে।'

কিন্তু একদিন তাকে থামতেই হল।

বসন্তকালে সে তার ল্যাম্পটা সারাবার জন্যে দোকানে নিয়ে যায়। কিছু নতুন ডিস্ কেনার জন্যে দোকানদার ভিনসেন্টকে অনুরোধ জানাতে থাকে।

'কিন্তু ওর দাম দেবার মত পয়সা তো আমার কাছে নেই।'

'তাতে কি। পয়সার জন্যে কোন তাড়া নেই। নিয়ে যান, যখন পারবেন তখনই দাম দেবেন।'

দুমাস পর লোকটা এসে তার স্টুডিয়োর দোরে হাজির।

'এ কি রকম ব্যবহার মশায় আপনার? দুমাসে আমার দামটা দিতে পারলেন না। এর মধ্যে টাকা আসেনি আপনার? দিয়ে দিন আমার টাকা।'

'আজ আমি কিছুই দিতে পারব না। টাকা পেলেই আমি তোমার টাকা দিয়ে দেব।'

'মিছে কথা বলছেন কেন? সেদিনও তো আমার পাশের দোকানের মুচিকে টাকা দিয়েছেন।'

'আমি এখন কাজ করছি,' ভিনসেন্ট জবাব দিল। 'আমি চাই না যে, আমায় কেউ এখন বিরক্ত করে। টাকা পেলেই আমি তোমার পাওনা শোধ করে দেব। এখন দয়া করে চলে যাও।'

'আমি টাকা না পেলে কিছুতেই যাব না।'

ভিনসেন্ট অবিবেচকের মত দোরের দিকে ঠেলে দিল। 'যাও আমার বাড়ি থেকে', লোকটাকে সে আদেশের সুরে বলল।

ওই লোকটা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। তার দেহ স্পর্শ করা মাত্র সে ভিনসেন্টের মুখে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগিয়ে দিল। ভিনসেন্ট দেয়ালের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আবার ভিনসেন্টকে আক্রমণ করল, মেঝেতে ফেলেও মারল। তারপর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

ক্রিস্টিনা তখন মায়ের ওখানে ছিল। আন্তন হামাগুড়ি দিয়ে এসে ভিনসেন্টের গালে আদর বুলাতে বুলাতে কাঁদতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে ভিনসেন্টের জ্ঞান ফিরে এল। সে কোন রকমে নিজের দেহে টেনে উপরের শোবার ঘরে নিয়ে শয্যায় এলিয়ে পড়ল।

ঘুসিতে মুখে তার বিশেষ ব্যথা লাগেনি বেদনাও করছে না। মেঝেতে পড়ে গিয়েও খুব কিছু চোট লাগেনি। কিন্তু ঐ দুইটি ঘুষি তার অন্তরের কি যেন ভেঙে দিয়েছে, তাকে পরাজিত করেছে তা ওর অজানা নয়।

ক্রিস্টিনা ফিরে এলো। দোতলার ঘরে এসে উপস্থিত হল। খাওয়ার মত কিছু বা টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। কি করে যে ভিনসেন্ট বেঁচে আছে ভাবতেই ক্রিস্টিনার আশ্চর্য মনে হত। একদিকে মাথাটা ও হাতদুটো এবং অন্য দিকে পা-দুটো ঝুলে পড়েছে তার।

'ব্যাপার কি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

অনেকক্ষণ পরে ঘুরে বালিসে মাথা দিয়ে শোবার শক্তি যেন সে পেল। 'সিয়েন, আমাকে হেগ শহর ত্যাগ করতেই হবে।'

'....হুঁ....এ আমি জানি।'

'আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে পল্লীগ্রামে বা আর কোথাও। হয়ত ড্রেন্থ্ যেতে হবে। যেখানে আমরা অল্প খরচে থাকতে পারি, সেখানেই যেতে হবে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো নাকি? বাবাঃ, ড্রেন্থ্ যে জায়গা–যেন একটা গুহা বিশেষ। তোমার যখন পয়সাকড়ি নেই, খাওয়ার মত কিছু আমাদের নেই, তখন গিয়ে কি হবে?'

'তা তো জানি না, সিয়েন। মনে হয় তোমারও খাওয়া জুটবে না?'

'দেড়শো ফ্রাঙ্ক মডেল আর পেন্টিংয়ের পিছনে খরচ না করে তা বাসার খরচে দান করবে বলে কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে?

ক্রিস্টিনা ভিনসেন্টের দেহে হাত রাখল। 'ঠিকই আছে। এজন্য মন খারাপ করার কোন কারণ নাই। আমার জন্যে যা করার তা তুমি করেছ। একদিনে আমরা আমাদের আশান্বিত পথেই আমরা চলতে পেরেছি.....বাস, আর চাই কি?'

'তুমি যদি বল তবে তোমাকে বিয়ে করে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ।'

'না, সে হয় না। আমি মায়েরই মেয়ে। মায়ের পথেই আমাকে চলতে হবে। ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ভাই তার মেয়ে-মানুষ এবং আমার জন্যে শীঘ্রই একটা নূতন বাড়ি নেবে।'

ভিনসেন্ট নিঃশেষে তিক্ত জ্বালাকর মদটুকু পান করল। 'সিয়েন, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার জন্য যা সম্ভব তাই করেছি। পরিবর্তে তোমার কাছ থেকে আমি মাত্র একটি জিনিসই চাই।'

'কি?' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল।

'আর তুমি পথে দাঁড়িও না। এতে তোমার মৃত্যু হবে। আত্মনের জীবনের খাতিরে আর ঐ জীবন গ্রহণ করো না।'

'আর এক গ্লাস করে মদ পান করার মত কিছু আছে?'

'আছে।'

এক নিঃশ্বাসে অর্ধেকটা মদ পান করে ক্রিস্টিনা বলতে লাগল, 'আমি যে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারব না তা আমি জানি। তাই পথে যদি আমাকে দাঁড়াতে হয় উপার্জনের জন্য, তার কারণ হচ্ছে এছাড়া আমার কাছে অন্য উপায় খোলা নেই বলে।'

'অন্যভাবে যদি যথেষ্ট উপার্জন করতে পার, তবে তুমি আর মায়ের পথ অনুসরণ করবে না, এ প্রতিশ্রুতি আমাকে দাও।'

'সে বিষয়ে আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি।'

'আমি তোমাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাব, সিয়েন। এই বাচ্চাটার জন্যে আমি সর্বদাই খরচ দেব। ওকে মানুষ হবার একটা সুযোগ আমি দিতে চাই।'

'পারবেনা; সিয়েন। ওগুলোই আমার কাম্য।'

'উহুঁ, তোমার কাছে প্রধান–কাজ।'

'কিন্তু তোমার কাছে নয়। তা কেনই বা হবে?'

'আমায় বাঁচতে হবে, ভিনসেন্ট। না খেয়ে বাঁচতে পারবো না।'

'কিন্তু ছবি না আঁকলে আমিও বাঁচতে পারব না।'

'বুঝলাম, তোমার টাকা.....তোমার কাজই....বুঝতে পেরেছি.....অন্তত কয়েকটা ফ্রাঙ্কও আছে কি? চল, রিন্ স্টেশানের সেই পানশালায় যাই।'

সেই স্থানটা মদের গন্ধে ভরপুর। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন পর্যন্তও আলো জ্বালান হয়নি। প্রথমদিনে তারা যে আসন দুটোতে বসেছিল তা খালি ছিল। ক্রিস্টিনা আগে আগে ঘরে ঢুকল। তারা দুজনেই এক গ্লাস করে মদের অর্ডার

দিল। ক্রিস্টিনা মদের গ্লাসের ওপর আঙুলগুলো বুলাতে লাগল। দু বছর আগে এমন করে একটি গ্লাসে ক্রিস্টিনার আঙুলগুলো বুলাতে দেখে ভিনসেন্ট যে প্রশংসা করেছিল, তা তার মনে আছে।

'ওরা বলছিল যে, তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে'– ক্রিস্টিনা নিম্নকণ্ঠে বলল, 'আমিও একথা জানতাম।'

'আমি তোমাকে ফেলে যেতে চাই না, সিয়েন।'

'এ ফেলে যাওয়া নয়, ভিনসেন্ট। তুমি আমার অপকার কখনও করনি।'

'তুমি আমার জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে রাজি হলে আমি ড্রেন্থ্-এ তোমাকে নিয়ে যাব।'

ক্রিস্টিনা নিষ্প্রাণভাবে মাথা নাড়ল। 'না, দুজনে একসঙ্গে থাকবার মত অর্থের অভাব আছে তোমার।'

'তুমিতো সব কিছু বুঝতেই পারছ, সিয়েন। আমার যদি আরও থাকত, তবে তোমাকে অনেক কিছু দিতে পারতাম। কিন্তু আমার কাজ এবং তোমাকে পোষণ করার প্রশ্ন যখন আসে তখন......'

'সেও অন্যদের মতই হবে।'

ক্রিস্টিনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে গাঁয়ে চলে যাবার সঙ্কল্পের কথা ভিনসেন্ট চিঠি লিখে থিওকে জানাল। পরবর্তী ডাকেই একশত ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দিয়ে তার সমস্ত দেনা পরিশোধ করার জন্যে জানাল এবং তার কার্যকে পরিপূর্ণ ভাষায় সমর্থন করল। 'আমার 'রুগীও' কাল রাতে উধাও হয়ে গেছে, সে লিখেছিল, 'সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমাদের উভয়ের উপযোগী সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা আমরা খুঁজে পাইনি। সে সব কিছু তার সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, কোন ঠিকানা রেখে যায় নি। ভালই হয়েছে। এখন তুমি আর আমি একেবারে মুক্ত–ভারহীন।'

ভিনসেন্ট সমস্ত আসবাব শোবার ঘুরে জড়ো করল। আবার একদিন হেগ শহরে ফিরে আসার আশা সে ছাড়তে পারল না। ড্রেন্থ্-এ যাত্রা করবার আগের দিন সে ন্যুনেনের একটি চিঠি ও একটি প্যাকেট পেল। প্যাকেটে কিছু তামাক ও কাগজে জড়ান মায়ের হাতে তৈরি পিঠা ছিল।

'চার্চের প্রাঙ্গণের ঐ শাদা ক্রশগুলো অঙ্কিত করবার জন্যে কখন তুমি বাড়ি আসবে?' পত্রে বাবা জানতে চেয়েছেন।

'বাড়ি যাবার আকাঙ্ক্ষাটা তার তীব্র হয়ে উঠল। সে পীড়িত, অভুক্ত, ভয়ানকভাবে নার্ভাস, বিপদাচ্ছন্ন ও হতাশ হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন মায়ের কাছে থেকে আপনার স্বাস্থ্যোন্নতির ইচ্ছা হল তার। ব্রাবান্টের কথা মনে পড়তেই তার মনে একটা প্রশান্তি দেখা দিল। এমনটি সে অনেকদিন অনুভব করেনি।

ক্রিস্টিনা ও তার শিশু দুইটি তাকে বিদায় দেবার জন্যে স্টেশন অবধি এল। নীরবে তারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল। কথা বলার ক্ষমতা যেন তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ধীরে ধীরে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল। ভিনসেন্ট গিয়ে ট্রেনে উঠল। ছোট্ট ছেলেটিকে বুকে চেপে হেরম্যানের হাত ধরে ক্রিস্টিনা দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। তীব্রোজ্জ্বল সূর্যালোকের মাঝে ভিনসেন্ট তাকিয়ে রইল তাদের

দিকে। তারপর দূরে.....অনেক দূরে সরে গেল তারা....মিলিয়ে গেল স্টেশনের সঙ্গে সঙ্গে।

'তুমি যে আমাদের বন্ধু তা ওকে জানিয়ে দিয়েছি।'

'তিনি আশে পাশের সব বাড়িতেই গিয়েছিলেন'– স্টিয়েন বলল, 'কিন্তু তারা সবাই ওকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ওঁর দান নেওয়ার চেয়ে একটা টাকা পেলেই তারা পোজ দিতে রাজি হবে।'

প্রতি রাত্রেই সে, ডি গ্রুটের ওখানে যেতে লাগল এবং ঘুমে ঢলে না পড়া পর্যন্ত ছবি আঁকতে লাগল। কিন্তু কোন ছবিই সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না। নানাভাবে চেষ্টা করেও সে ত্রুটিহীন ছবি আঁকতে পারল না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল।

মাসের শেষ দিন এসে পড়ল। ভিনসেন্ট উন্মত্তের মত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। আহারও নিদ্রা তার ঘুচে গিয়েছিল । একটা অস্বাভাবিক শক্তির উপর যেন সে বেঁচে ছিল। প্রতিবারে ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেদিন ইজেল ইত্যাদি নিয়ে সে প্রস্তুত হয়েছিল। ডি গ্রুটরা ক্ষেত থেকে ফিরতেই সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। এই তার শেষ সুযোগ। প্রাতেই সে চিরকালের জন্য ব্রাবান্ট পরিত্যাগ করছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কাজ করে যেতে লাগল। ডি গ্রুট পরিবারের লোকেরা অবস্থাটা বুঝতে পারল। নৈশাহার শেষ করেও তারা টেবিলে বসে আলাপ করতে লাগল। কি যে আঁকছে ভিনসেন্ট তা জানে না, তবু সে এঁকে যাচ্ছে। কোন কিছু চিন্তা করবার বা কল্পনা করবার সময়ও যেন তার নেই। দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল। ডি গ্রুট পরিবারের লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল। পরিশ্রান্ত ভিনসেন্ট ইজেল নিয়ে স্টিয়েনকে চুম্বন করে সবার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

স্টুডিয়োতে এসে পাইপ জ্বেলে ক্যানভাসের দিকে তাকাল। নাঃ, সবটাই ভুল হয়েছে। সে আসল জিনিসটি ধরতে পারে নি। ব্যর্থ হয়েছে সে। ব্রাবান্টে দু বছর ধরে সে যে চেষ্টা করেছে সবই বিফলে গেল।

কিছুক্ষণ পাইপ টানল। তারপর ব্যাগে সব ভরল। দেয়াল থেকে ছবিগুলো নামিয়ে একটা বড় বাক্সে ভরল। তারপর কোণে শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ যে শুয়েছিল তা সে জানে না। উঠে রঙ মিশিয়ে আবার সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠল। জানালা পথে একটুকরো আলো এসে পড়ল স্টোর রুমে। ভিনসেন্ট টুল থেকে উঠে পড়ল। একটা প্রশান্তি সে অনুভব করছিল। বারো দিনের উত্তেজনা তখন আর ছিল না। সে নিজের কাজের দিকে তাকাল। আজ তার প্রার্থিত বস্তু সে পেয়ে গেছে। ব্রাবান্টের চাষীরা শাশ্বত হয়ে রইল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

একটি ডিমের শ্বেত অংশ দিয়ে সে ছবিটা ধুয়ে ফেলল। সে ছবি আঁকার সরঞ্জাম মায়ের কাছে রেখে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করল। স্টুডিয়োতে ফিরে এসে ছবির নিচে লিখল 'দি পটেটো ইটার্স।' এর সঙ্গে আরও ভালো কয়েকটা স্টাডি নিয়ে সে প্যারিস যাত্রা করল।

চতুর্থ পর্ব

ন্যুনেন

১.

ন্যুনেন পল্লীর পুরোহিতের আবাসটি ছিল প্রস্তর নির্মিত দ্বিতল দালান। বাড়িটা শাদা রঙ করা। এর পেছনে ছিল একটা বাগান। সে বাগানে এলম্ গাছ, বেড়া, ফুলের কেয়ারী, একটি পুকুর আর শাখাপত্রহীন তিনটি ওক্ গাছ ছিল। ন্যুনেন-এর জনসংখ্যা ছাব্বিশ শত হলেও প্রোটেস্টান্টের সংখ্যা ছিল মাত্র একশত। থিয়োডোরাস যে চার্চের পুরোহিত তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্র বাজার-শহর ইটেন থেকে ন্যুনেন-এর ব্যবধান ছিল সামান্য।

জেলার রাজধানী থেকে যে পথটি বেরিয়ে গেছে, সে-পথের দু'পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব ঘর রয়েছে, তারই সমষ্টি নিয়ে ন্যুনেন পল্লী। অধিবাসীদের অধিকাংশই তাঁতি অথবা চাষী। তারা ধর্মভীরু, পরিশ্রমী। পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি এবং সংস্কার মেনে চলতেই ওরা ভালবাসে।

বাড়িটির সম্মুখের দরজায় কালো অক্ষরে এ ১৭৬৪-এই নম্বরটি খোদাই করা ছিল। প্রবেশ দ্বার থেকে একটি রাস্তা সোজাসুজি গিয়ে ঢুকেছে বড় হল ঘরটিতে। হল ঘরটিই বাড়িটাকে দুভাগ করে রেখেছে। ওর বাঁ দিকে পড়েছে রান্নাঘর আর খাবার ঘর এবং ডান দিকে একটা পুরনো ধরনের সিঁড়ি যা দিয়ে উপরের শোবার ঘরে ওঠা যায়। ভিনসেন্ট একটি শোবার ঘরে ছোট ভাই কারের সঙ্গে শয়ন করল। প্রাতে ঘুম যখন তার ভাঙল, তখন চোখে পড়ল চার্চের চূড়ার পেছনে উদীয়মান সূর্যকে, আর পুকুরের জলে পড়া চূড়ার ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে যাওয়া ছায়াকে। প্রভাতের চেয়ে সূর্যাস্তের সময় রঙের 'টোন' ছিল আরও গভীর। ভিনসেন্ট জানালার ধারে বসে বসে দেখতে লাগল পুকুরের জলের উপর কেমন রঙের আস্তরণ পড়েছে তেলের পুরু আস্তরণের মত এবং কি করেই বা তা ধীরে ধীরে যাচ্ছে মিলিয়ে।

পিতামাতাকে ভিনসেন্ট ভালবাসত। ওঁরাও তাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, যাতে তাদের সম্বন্ধ থাকে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মনোরম। ভিনসেন্ট প্রচুর খাওয়া দাওয়া করত, ঘুমত প্রচুর এবং ঘুরে বেড়াত এদিক সেদিকে। কথা বলা, ছবি আঁকা আর পড়াশুনা করা সে একদম বন্ধ করে দিয়েছিল। বাড়ির সবাই তার সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করত। তার ব্যবহারও ছিল খুবই ভদ্র। এ সম্পর্ক যেন আত্মসচেতনায় পরিপূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কেউ কিছু বলার আগে নিজের মনে মনে ভাবত, 'খুব সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলতে হবে যাতে আমাদের ঐক্যসূত্র ছিন্ন না হয়ে যায়।'

ভিনসেন্টের শারীরিক অসুস্থতা পর্যন্ত এই ঐক্য বজায় রইল। কিন্তু তারপরেই ওঁর বন্ধন হ্রাস পেতে লাগল। তার ধারায় যারা চিন্তা না করে তাদের সঙ্গে একই কক্ষে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একদিন তার বাবা মন্তব্য করলেন, 'আমি এখন গ্যাটের 'ফাউস্ট' পড়ব। রেভারেন্ড টেন কেটি বইটি যখন অনুবাদ করেছেন, তখন ওটা নিশ্চয় অশ্লীল হতে পারে না।' শুনে ভিনসেন্ট উপলব্ধি করল যে, তাদের মধ্যেকার ফাঁকটা আবার দেখা দিচ্ছে।

যদিও মাত্র দু'সপ্তাহ বিশ্রাম নেবে বলে সে ব্রাবান্ট এসেছিল, কিন্তু এ-জায়গাটা তার ভাল লাগত বলে আরও কিছুদিন থেকে যাবার মতলব করল। সে অত্যন্ত সাধারণভাবে ও নীরবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যানভাসের গায়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল। এই ছবিতে তার নিজের মনের প্রতিধ্বনি থাকবে না, থাকবে শুধু প্রকৃতির প্রতিফলন। পল্লীজীবনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে গিয়ে তাকে রঙে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া তার আর কোন অভিলাষ ছিল না। ফাদার মিলেটের মত সে-ও চেয়েছিল কৃষকদের মধ্যে বাঁচতে। তাদের উপলব্ধি করতে এবং তাদের ছবি আঁকতে। তার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কতক লোককে পল্লীজীবন থেকে ছিনিয়ে এনে নাগরিক জীবনরথে বেঁধে দিলেও তাদের দেহে মনে পল্লীর ছাপ থেকে যায় অম্লান এবং জমি আর চাষী-জনের জন্য তৃষ্ণা থাকে প্রবল।

একথা সে নিশ্চিতভাবে জানত যে, একদিন সে ব্রাবান্টে ফিরে আসবে এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু বাবা মা যদি ওকে না চায়, তবে তার ন্যুনেন থাকা সম্ভবপর নয়।

'হয় আমাকে বাড়িতে থাকতে দিতে হবে নয়ত চিরকালের মত বিদায় দিতে হবে' সে তার বাবাকে বলল, 'আমাদের একটা বোঝাপড়া করা উচিত হবে।'

'আমিও তা খুবই চাই, ভিনসেন্ট। তোমার ছবির বেশ উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। দেখে আমি খুশিই হয়েছি।'

'ভাল কথা। বেশ, তবে খোলাখুলি বলুন, আমরা সবাই মিলে শান্তিতে এখানে বসবাস করতে পারি বলে আপনি মনে করেন কিনা। আমি এখানে থাকি আপনি কি তা চান?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'কতদিন পর্যন্ত?'

'যতদিন পর্যন্ত তুমি থাকতে চাও। এ-বাড়ি তোমার। তোমার স্থানও রয়েছে আমাদেরই সঙ্গে।'

'কিন্তু আমাদের যদি মতান্তর হয়?'

'তাতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা সঙ্গত হবে না। একসাথে মিলে শান্তভাবেই বাস করতে চেষ্টা করব আমরা।'

'কিন্তু আমার স্টুডিয়োর কি হবে? বাড়ি বসে কাজ করি, এতো আপনার ইচ্ছে নয়।'

'এবিষয়ে আমি কদিন ধরে ভাবছি। আচ্ছা, বাগানের ঐ ঘরটা তুমি নাওনা কেন? ওখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না, আপন মনে কাজ করতে পারবে।'

আলোচ্য ঘরটি ছিল রান্নাঘরের ঠিক পাশে, কিন্তু দুটোর মধ্যে আসা-যাওয়ার জন্যে কোন দরজা ছিল না। ঘরটিতে বাগানের দিকে বেশ উঁচুতে একটি ছোট্ট জানলা ছিল। মেঝেটা মাটির। শীতকালে সর্বদাই স্যাঁৎসেঁতে থাকত।

'আগুন জ্বেলে এজায়গাটা শুকিয়ে দেব, ভিনসেন্ট। তারপর কাঠের মেঝে করে দেব যাতে, তোমার কোন অসুবিধা না হয়। কেমন? কি বল তুমি?

ভিনসেন্ট চারদিকে তাকাল। ঘরটি অত্যন্ত ছোট, চাষীর ঘরের মত দেখতে। সে এটাকে সত্যিকারের গ্রাম্য স্টুডিয়োতে পরিণত করতে পারে।'

'জানলাটা যদি তোমার কাছে খুব ছোট মনে হয়'– থিয়োডোরাস বললেন, 'তবে আমার কাছে যে কিছু বাড়তি পয়সা আছে, তা খরচ করে ওটা বড় করে দেয়া যাবে।'

'না, না, তার দরকার নেই। যা আছে, ঠিকই আছে। একটি চাষীকে মডেল করে ছবি আঁকতে যেটুকু আলোর দরকার তা আমি বেশ পাব।'

আগুন জ্বেলে ঘরটাকে শুকিয়ে বেশ টনটনে করা হল। তারপর মেঝেতে কাঠের পাটাতন পেতে দেওয়া হল। ভিনসেন্ট তার ছোট্ট বিছানা, একটি টেবিল, একটি চেয়ার ও তার ইজেলটা নিয়ে এল। তারপর দেওয়ালে তার স্কেচগুলো পেরেক দিয়ে আঁটকাল। রান্নাঘরের পাশের শাদা দেওয়ালে রঙ দিয়ে বড় বড় করে গোঘ্ লিখল। অদূর ভবিষ্যতে একজন ডাচ মিলেট হবার সাধনায় সে মগ্ন হল।

২.

ন্যুনেন-এর তাঁতিরা ছিল অদ্ভুত ধরনের। তারা খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কুড়েতে বাস করত। কুড়েগুলোতে সাধারণত দুটো করে কোঠা থাকত। একটা ঘরে বাড়ির সবাই থাকত। এই ঘরটিতে খুব ছোট একটা জানালা থাকত, তা দিয়ে আলোর অতি সামান্য রশ্মি এসে পড়ত ঘরে। মাটির তিন ফুট উঁচুতে দেওয়ালে চৌকোণা কুলঙ্গি থাকত বিছানাপত্র রাখবার জন্যে। ঘরে একটি টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটি মাটির চুল্লি এবং বাসনপত্র রাখার জন্যে একটা জায়গা থাকত। মেঝেটি কাদা দিয়ে নিকানো, দেওয়ালও মাটির। পাশের ঘরটি শোবার ঘরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ঘরের অর্ধেক স্থান জুড়ে তাঁত বসান।

ঠিকভাবে কাজ করলে একজন তাঁতি সপ্তাহে ৬০ গজ পর্যন্ত বুনতে পারত। তাঁতি তাঁতে বসলে মেয়েরা নলিতে সূতা ভরে দিত। সপ্তাহে যেটুকু কাপড় বুনত, তা বিক্রি করে একজন তাঁতি সপ্তাহে নিট লাভ করত সাড়ে চার ফ্রাঙ্ক। বোরিনেজের খনি-শ্রমিকদের চেয়ে এদের ধরন যে সম্পূর্ণ আলাদা, ভিনসেন্ট তা উপলব্ধি করল। এরা অনেক শান্ত, এদের কখনও বিদ্রোহসূচক আলোচনা করতে শোনা যায়নি। কিন্তু অতি পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মতই প্রফুল্ল দেখাত এদেরকে।

ভিনসেন্ট ঝটপট এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলল। এদের সরলতার বহু পরিচয় পেল ভিনসেন্ট। বেঁচে থাকবার মত আলু, কপি এবং সামান্য শূকরের মাংস কিনতে পারে এমন পয়সা উপার্জনের মত কাজ পেলেই এরা খুশি। ওরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকত, তখন ভিনসেন্টের পেন্টিং-এর উপর বিশেষ নজর দিত না। সে যখন ওদের ওখানে যেত, তখন হয় ছেলেমেয়েদের জন্যে মিষ্টি অথবা ঠাকুর্দাদের জন্যে নিয়ে যেত তামাক।

একদিন তার চোখে পড়ল একটি তাঁত, তাতে ১৭৩০ সাল খোদাই করা ছিল। তাঁতটার সম্মুখে ছোট্ট জানালার সামনে একটি শিশুর চেয়ার ছিল। শিশুটি চলন্ত মাকুটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। ঘরটির অবস্থা শোচনীয়, কিন্তু ভিনসেন্ট এখানকার অপূর্ব শান্ত সৌন্দর্যের স্বরূপ ধরতে চেষ্টা করল ক্যানভাসে।

অতি প্রত্যুষে উঠে সে সারাদিন মাঠ-ঘাট অথবা চাষী এবং তাঁতিদের সঙ্গে কাটাতে লাগল। এদের সঙ্গে সে বেশ সহজ ভাবেই মিশতে পারছিল। বহু সন্ধ্যা খনি-

শ্রমিক, চাষী প্রভৃতির সঙ্গে বৃথাই সে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটায়নি, কিকরে চাষীরা দিনযাপন করে, তা সে দেখেছে, দেখে তাতে বিভোর হয়ে গেছে।

মানুষের প্রতিকৃতি আঁকবার আকাঙ্ক্ষা আবার তার জাগ্রত হল, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা দিল এবার রঙ-প্রীতি। আধ-পাকা ধানের ক্ষেতের গাঢ় সোনালী রঙের ঔজ্জ্বল্য অদ্ভুত হয়ে উঠত আকাশের গাঢ় নীলিমার আভায়। ঐ ক্ষেতের পশ্চাৎভূমিতে থাকত কর্মরতা নারীর মূর্তি। রুক্ষ তাদের চেহারা, রোদেপোড়া মুখ আর হাত, ধূলিমলিন নীল রঙের পরিচ্ছদ আর খাটো করে ছাঁটা চুলের গুচ্ছ।

ইজেল কাঁধে ফেলে, ভিজে ক্যানভাস বগলের নিচে নিয়ে বড় রাস্তা ধরে দুলতে দুলতে সে যখন ফিরত, তখন অনেক বাড়িরই খড়খড়ি সামান্য উন্মুক্ত হত আর তার ফাঁকে উঁকি মারত নারীর দুটি চঞ্চল আঁখি।

বাড়ির লোকজন যদিও তাকে বিরক্ত করত না, কিন্তু কেমন যেন এড়িয়ে চলত তাকে। তার বোন এলিজাবেথ তো তাকে ঘৃণাই করত। ভিনসেন্টের পাগলামি ওর বিয়ের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেবে বলে সে ভয় পেত। উইলিসন তাকে পছন্দ করত, কিন্তু তার সঙ্গ যদিও বিরক্তকর বলে মনে করত। ভিনসেন্ট কেবল মাত্র তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গেই ভাবটা বজায় রাখতে পারল।

ভিনসেন্ট সবার সঙ্গে বসে ডিনার খেত না। এক কোণে বসে খাবার প্লেটটা নিয়ে খেতে খেতে সে নিজের আঁকা ছবিগুলো দেখত, আর তার সমালোচনা করত। বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও সে বিশেষ কথা বলত না। তারাও ওর সঙ্গে বিশেষ আলাপ করত না। শুকনো রুটি সে খেত কারণ, খাওয়ার প্রাচুর্য বাড়াতে সে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না।

৩.

প্রায় মাসখানেক মাঠে বসে ছবি আঁকার পর তার হঠাৎ মনে হল কে যেন তার প্রতি দূর থেকে লক্ষ্য রাখছে। সে জানত যে, ন্যুনেন এর লোকেরা তাকে লক্ষ্য করত, মাঠে কাজ করতে করতে চাষীরা কাজ রেখে তার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু-এর সঙ্গে ওর আকাশপাতাল তফাৎ। সে এও বুঝতে পারল ওর প্রতি কেবলমাত্র নজর রাখা হচ্ছে না, তাকে অনুসরণও করা হচ্ছে। প্রথম প্রথম সে এটাকে তাচ্ছিল্য করতে চেষ্টা করল, কিন্তু দূর থেকে এক জোড়া চোখ যে তার পিঠকে বিদ্ধ করছে, এই অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল। অনেকবার সে মুখ ঘুরিয়ে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে অনুসরণকারীকে কিন্তু সফলকাম হয়নি। একবার অকস্মাৎ পিছন ফিরে তাকাতে তার মনে হল কোন মেয়ের শাদা স্কার্ট যেন চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল পশ্চাতে। আর একবার সে যখন তাঁতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, তখনি একটি নারী মূর্তি দ্রুত অদৃশ্য গেল। তৃতীয়বার বনের মধ্যে বসে আঁকতে আঁকতে সে উঠে জল পান করার জন্যে কাছের একটি পুকুরে গেল। ফিরে এসে কাঁচা রঙে পরিষ্কার আঙুলের ছাপ দেখতে পেল। এই রহস্যময়ী নারীকে ধরতে তার প্রায় দু সপ্তাহ লাগল। একদিন সে কোন ক্ষেতমজুরের ছবি আঁকছিল। একটু দূরে একটা পরিত্যক্ত ওয়াগন পড়েছিল। সে যখন কাজ করছিল, তখন মেয়েটি ওটার পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে হঠাৎ এক সময় তার ক্যানভাস ও ইজেল গুটিয়ে নিল এবং বাড়ি চলে যাবার ভান করল। গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে মেয়েটি ছুটতে

শুরু করল, কিন্তু ভিনসেন্ট কোন সন্দেহের সৃষ্টি না করে ওর পেছন পেছন যেতে গেল। মেয়েটি পল্লী পুরোহিতের ঠিক পাশের বাড়িটাতে গিয়ে ঢুকল।

'বাঁ দিকের বাড়িতে কে থাকে, মা?' সে রাত্রেই ডিনারের সময় মাকে ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'বেগম্যানের পরিবার।'

'কে তাঁরা?'

'ওঁদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি মা তাঁর পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে বাস করেন। বাপ ক'দিন আগে নাকি মারা গেছেন।'

'কি রকম লোক ওরা?'

'সে কথা বলা কঠিন। তবে একটু গোপন ভাবের।'

'ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী নাকি?'

'না, প্রোটেস্টান্ট। ওদের বাবা ছিলেন একজন শিক্ষক।'

'মেয়েদের মধ্যে কেউ অবিবাহিতা আছে নাকি?'

'কারুরই বিয়ে হয়নি। কেন বলত?'

'আশ্চর্য। খরচ চলে কি করে?'

'কে জানে। বোধ হয় টাকা পয়সা আছে।'

'মেয়েদের কারু নাম নিশ্চয় জান না?'

মা সন্দিগ্ধভাবে পুত্রের দিকে তাকালেন! 'না।'

পরের দিন ভিনসেন্ট মাঠের সেই স্থানটিতেই গেল। কিছুক্ষণ ছবি আঁকার পর মেয়েটির আগমন ভিনসেন্ট অনুভব করল। দৃষ্টিকে একটু ঘুরিয়ে সে মেয়েটির পোষাক একবার দেখে নিল।

'যদি ছবি আঁকা আজ বন্ধ রাখতে হয়, তবু ওকে আজ আমার ধরতেই হবে,' ভিনসেন্ট মনে মনে বলল।

বিভিন্ন রংয়ের সংমিশ্রণে যে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা রূপায়িত করতে করতে সে মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পর সে যখন মাথা তুলল, মেয়েটি তখন গাছের পেছন থেকে ওয়াগনের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ইচ্ছা হল, উঠে এক লাফে গিয়ে মেয়েটিকে ধরে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কেন সে তাকে অনুসরণ করছে, কিন্তু কাজ ছেড়ে সে উঠতে পারছিল না। ক্ষণপরে সে মুখ তুলে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। মেয়েটি ওয়াগানের সম্মুখে এসে এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইবার প্রথম সে তার দৃষ্টিপথে পরিপূর্ণভাবে এসে দাঁড়াল।

ভিনসেন্ট একটা আবেগ নিয়ে কাজ করে চলল। তার কাজ যত কঠিন হতে লাগল, মেয়েটি ততই যেন তার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্যানভাসের গায়ে সে যত আবেগ ঢেলে দিচ্ছিল, মেয়েটির দৃষ্টিও যেন তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। আলো পাবার জন্যে সে তার ইজেলটা একটু সরাল—সরাতেই দেখে মেয়েট তার ও ওয়াগনের মাঝামাঝি পথে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে যেন সম্মোহিত করা হয়েছে, যেন সে স্বপ্নের ঘোরে এগুচ্ছিল। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসছিল ভিনসেন্টের দিকে। প্রতি পদক্ষেপই সে ইতস্তত করছিল, চলে যাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি

যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল ভিনসেন্টের দিকে যা প্রতিরোধ করার শক্তি তার ছিল না। অবশেষে ভিনসেন্ট অনুভব করল মেয়েটির উষ্ণ সান্নিধ্য। সে চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবতীর চোখে চোখে তাকাল। তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছিল একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব, একটা অব্যক্ত আবেগকে চাপতে গিয়ে সে যেন ধরা পড়ে গেছে। মেয়েটি ভিনসেন্টের দৃষ্টি এড়িয়ে ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইল। ভিনসেন্ট ফিরে আকস্মিক একটা উত্তেজনায় ছবিটা শেষ করে ফেলল। মেয়েটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর পোষাকের প্রান্ত যে ওর পিছনকে স্পর্শ করছে, ভিনসেন্ট তা অনুভব করতে পারছিল।

দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরেই মাঠে দাঁড়িয়েছিল। ভিনসেন্ট অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সৃষ্টির অদম্য উৎসাহে সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করেছে। আর যেন সে পারছিল না। উঠে সে মেয়েটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

মেয়েটির মুখ-বিবর শুকিয়ে উঠেছিল। জিহ্বা বের করে সে ওপরের ঠোঁটটা ভিজাল, তারপর উপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজাল। কিন্তু মুহূর্তে সেই আর্দ্রতা শুকিয়ে গেল। আবার তার ঠোঁট দুটি শুকিয়ে উঠল। গলার উপর সে নিজের হাত রেখেছিল, মনে হচ্ছিল শ্বাস নিতে তার যেন কষ্ট হচ্ছে। সে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

'আমি তোমাদের প্রতিবেশী, আমার নাম ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ,' ভিনসেন্ট বলল, 'বোধ হয়, আমার পরিচয় তোমার জানা আছে।'

'হ্যাঁ।' অস্ফুটে মেয়েটি বলল। এত ক্ষীণ কণ্ঠে শব্দটি উচ্চারিত হয় যে, ভিনসেন্ট ভাল করে কিছু বুঝতেই পারল না।

'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি কেমন যেন একটু টলে উঠল। তাড়াতাড়ি ভিনসেন্টের আস্তিন ধরে টাল সামলাল। আবার নিজের ঠোঁট দুটিকে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে এবং অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কথা বলতে সমর্থ হল।

'মারগট।'

'কিন্তু তুমি আমাকে অনুসরণ করে ফিরছ কেন, মারগট?'

তার কণ্ঠস্বরে একটা চাপা আর্তনাদ ফুটে বেরুল যেন। তাল সামলাবার চেষ্টায় ভিনসেন্ট শক্তভাবে ধরল, কিন্তু সঙ্গে সে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ভিনসেন্ট ঝটিতি হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথার নিচে একটি হাত রাখল এবং অন্য হাতে মেয়েটির চোখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। অস্তাচলগামী সূর্যের লাল আভা সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। চাষীরা সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত চরণে বাড়ির দিকে ফিরছিল। ভিনসেন্ট আর মারগট ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। ভিনসেন্ট তীক্ষ্ণভাবে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। নাঃ, সুন্দরী সে নয়। বয়স তার ত্রিশের সীমানা নিশ্চয় অতিক্রম করেছে। গাত্রচর্ম প্রায় কুঞ্চনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভিনসেন্টের জলপাত্রে কিছু জল ছিল। রঙ-মোছার একটি ন্যাকড়া দিয়ে সে মারগটের মুখটা ভিজিয়ে দিল। হঠাৎ ও চোখ মেলে তাকাল। চোখ দুটি সত্যি সুন্দর–গাঢ় বাদামী রঙ, কোমল এবং রহস্যময়। সে আঙুলে করে জল নিয়ে মারগটের মুখে বুলিয়ে দিল। মেয়েটি শিউরে উঠল যেন!

'এখন কি একটু ভাল লাগছে, মারগট?'

ভিনসেন্টের অমন সহানুভূতিপূর্ণ, তীক্ষ্ম এবং অনুভূতিশীল নীলাভ সবুজ চোখ দুটির দিকে সে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল। তারপর একটা অদম্য ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে সে ভিনসেন্টের গলা জড়িয়ে ধরে ওর ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ চেপে ধরল।

পরদিন গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে উভয়ে মিলিত হল। মারগটের পরিধানে ছিল শাদা কেমব্রিক কাপড়ের চমৎকার পোষাক, হাতে ছিল পাতলা টুপি, ভিনসেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসে মারগট কিছুটা নার্ভাস অনুভব করলেও সে পূর্বদিনের চেয়ে অনেক আত্মস্থ হয়েছিল। সে আসতেই ভিনসেন্ট রঙদানি নামিয়ে রাখল। যদিও কে'র অপূর্ব সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্রও ওর ছিল না কিন্তু ক্রিস্টিনার সঙ্গে তুলনায় ও ছিল আকর্ষণীয়।

ভিনসেন্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যারা মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পরত তাদের সম্পর্কে তার কেমন একটা কুসংস্কার ছিল, যারা সাধারণত পেটিকোট বা জ্যাকেট পরত তাদেরকেই যেন সে বেশি চিনত। তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির ওলন্দাজ নারীর চেহারায় বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। সে সাধারণত চাকরানী শ্রেণির মেয়েদেরই পছন্দ করত।

মারগট ঝুঁকে পড়ে অতি সহজভাবে ভিনসেন্টকে চুম্বন করল, যেন বহুদিনের পরিচিত প্রেমিককে চুম্বন করছে। তারপর ক্ষণিকের জন্য ওকে জড়িয়ে ধরে রইল কম্পিত দেহে। মারগটের বসার জন্য ভিনসেন্ট নিজের কোটটা বিছিয়ে দিল মাটিতে। নিজে টুলে বসে পড়ল। ভিনসেন্টের হাঁটুতে হেলান দিয়ে মারগট এমনভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে যে-দৃষ্টি ভিনসেন্ট আর কোনদিন দেখেনি কোন নারীর চোখে।

'ভিনসেন্ট' মারগট ডাকল। কেবলমাত্র নামটা উচ্চারণ করার আনন্দেই ও ডাকল।

'বল, মারগট'। কি যে করবে বা বলবে সে যেন তা জানতই না।

'আমার সম্বন্ধে তোমার খারাপ ধারণা হয়েছে নাকি?'

'খারাপ ধারণা? কই না তো। খারাপ ধারণা কেন হবে বল ত?'

'তোমার হয়ত বিশ্বাস হবে না ভিনসেন্ট, কিন্তু কাল তোমাকে চুম্বন করার আগে আমি আর কোনদিন কোন পুরুষ মানুষকে চুম্বন করি নি।'

'কেন চুম্বন কর নি? তুমি কি কখনও প্রেমে পড়ে নি?'

'না।'

'অদ্ভুত ত।'

'তাই না?' মারগট ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। 'তুমি তো নিশ্চয় অন্য মেয়েকে ভালবেসেছ না?'

'হ্যাঁ।'

অনেক না......তিনজন।'

ওরাও তোমাকে ভালবাসত?

'না মারগট, তারা ভালবাসে নি।'

'কিন্তু তাদের ভালবাসা উচিত ছিল।'

'প্রেমে আমি সর্বদাই মন্দভাগ্য।'

মারগট ওর দিকে আরও সরে আসল এবং ওর কোলে নিজের একটি হাত রাখল। এবং অপর হাতে আঙুলগুলো ধীরে ধীরে ওর মুখে চোখে, নাকে, গলায়, থুতনিতে বুলাতে লাগল। একটা অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল তার দেহে, সে হাত সরিয়ে নিল।

'কি সমর্থ তুমি', সে অস্ফুটে বলল, 'তোমার হাত, থুতনি, দাঁড়ি সবই কেমন শক্ত। তোমার মত এমন পুরুষ আমি আগে আর দেখিনি।'

মারগটের মুখটি ভিনসেন্ট স্বীয় রুক্ষ করতল দিয়ে চেপে ধরল। প্রেম ও উত্তেজনার উষ্ণতা যেন বিদ্যুতের মত চমকে উঠল।

'আমাকে কি তোমার ভাল লাগবে?' মারগট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধাল।

'হ্যাঁ।'

'তবে আমায় চুম্বন কর।'

ভিনসেন্ট ওকে চুম্বন করল।

'আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবে বসো না, ভিনসেন্ট। আমি নিজেকে আর সংবরণ করতে পারছি না। আমি তোমাকে....ভালবেসেছি.....নিজেকে তাই আর চেপে রাখতে পারছি না।....তুমি তো দেখছই।'

'তুমি আমাকে ভালবেসেছ? সত্যি ভালবেসেছ? কিন্তু কেন আমাকে ভালবাসলে?' মারগট ঝুঁকে ওর ঠোঁটের কোণে গভীর আবেগে চুম্বন করল।

'এরি জন্যে।' সে বলল।

নীরবতার মধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল

'তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ, ভিনসেন্ট?' মৃদুকণ্ঠে মারগট জিজ্ঞাসা করল।

'বিশেষ কিছু না।'

ওরা...থামে...'কারুর কাছে....আমার বয়সের কথা শুনেছ?'

'না।'

'আমার ৩৯ বৎসর চলছে। কয়েক মাসের মধ্যেই আমি চল্লিশে পড়ব। গত পাঁচ বৎসর ধরে ভাবছিলাম যে, ত্রিশের কোটা পেরুবার আগে কাউকে যদি ভালো না বাসতে পারি তবে আমার আত্মহত্যা করা উচিত।'

'কিন্তু প্রেমে পড়া তো কঠিন কিছু নয়, মারগট।'

'তুমি তাই মনে কর?'

'হ্যাঁ, বরং ভালোবাসা পাওয়াটাই কঠিন।'

'তা ঠিক নয়। এখানে কাউকে ভালোবাসাই দুরূহ। গত বিশ বছর ধরে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কাউকে ভালোবাসার জন্যে, কিন্তু পারি নি।'

'কখনও সফল হও নি?'

মারগট দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। 'অনেক দিন আগে.....তখন আমি বালিকা মাত্র....ভালবেসেছিলাম একটি ছেলেকে।'

'তারপর।'

'ছেলেটি ছিল ক্যাথলিক, তাই ওরা ওঁকে তাড়িয়ে দিল।'

'ওঁরা কে?'

'আমার মা আর বোনেরা।'

মারগট কাঁচা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। কাদা লেগে ওর শাদা সুন্দর পোষাকটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে হাতের তালুতে চিবুক ন্যস্ত করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসল। ভিনসেন্টের হাঁটু স্পর্শ করল ওঁর পাশটা।

'কোন নারী যদি প্রেম না পায় তবে তার জীবনটাই থাকে অপূর্ণ, ভিনসেন্ট। আমি জানি।'

'প্রতিদিন প্রাতে ঘুম ভাঙতেই আমি নিজেকে বলতাম, 'আজকে নিশ্চয়ই এমন লোক পাব যার প্রেমে পড়ব আমি।' কিন্তু দিন কেটে রাত্রি আসত ঘনিয়ে —সঙ্গীহীনত্ব আমার ঘুচতনা, দূর হত না আমার দুর্ভাগ্য। ভিনসেন্ট, কি নিদারুণ শূন্যতায় পরিপূর্ণ ছিল দিনগুলো আমার! বাড়িতে চাকর রয়েছে—তাই কিছুই করবার ছিল না সেখানে—প্রতি মুহূর্তে প্রাণে জাগত ভালবাসা পাবার আকাঙক্ষা। প্রতিদিন রাতে নিজেকে বলতাম, যেভাবে বেঁচে আছি এর সঙ্গে বেঁচে না থাকার কোন পার্থক্য নেই।' এই নৈরাশ্যের মাঝেও নিজেকে উৎসাহ দিতাম এই বলে যে, একদিন যে করেই হোক কোন পুরুষ উদয় হবে আমার জীবনে, আমি ভালবাসতে পারব। কিন্তু সে এলো না—বয়স আমার গড়িয়ে চলল— সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ। প্রেমের স্বাদ না পেয়ে চল্লিশে পড়া—না, না, সে কিছুতেই হত না। এই সঙ্কট মুহূর্তে তুমি এলে, ভিনসেন্ট। আমিও ভালবাসতে পেরে বেঁচে গেলাম।'

এ যেন এক জয়োল্লাস—সব পাওয়ার আনন্দ উচ্ছ্বাস। ভিনসেন্টের উষ্ণ ওষ্ঠের আকর্ষণে সে আপনার মুখটা বাড়িয়ে ধরল। ভিনসেন্ট ধীরে ধীরে ওর কানে মুখমণ্ডলে অজস্র চুম্বন রেখা এঁকে দিল। মারগটের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, চুম্বন শিহরণে পুলকিত ভিনসেন্ট জীবনে এই সর্বপ্রথম নারীর উচ্ছ্বসিত প্রেমের শান্তিবারির মধুর স্পর্শ পেল। তাঁর অত্যন্ত কাছে ছিল সমাধি ক্ষেত্র। কথাটা মনে পড়তেই সে একটু কেঁপে উঠল।

ভিনসেন্টের দু পায়ের মাঝখানে মাটিতে বসে ওঁর হাঁটুতে মাথা রাখল। তার কপালে দেখা দিয়েছিল লালিমা এবং চোখে দীপ্তি। একটু চেষ্টা করেই যেন সে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার এই প্রেম বিহ্বলতায় তাকে ত্রিশের বেশি মনে হচ্ছিল না। ভিনসেন্ট কি করবে ঠিক করতে না পেরে ওর পেলব আননে নিজের হাত বুলাতে লাগল। একসময় মারগট ওর হাতটা চেপে ধরে ফেলে তাতে চুম্বন করল। তারপর নিজের লাল হয়ে ওঠা গালে চেপে ধরল। কিছুক্ষণ পরে মারগট কথা বলল।

'তুমি যে আমায় ভালবাস না আমি তা জানি।' সে শান্ত কণ্ঠে বলল।'তা আশা করাও আমার কাছে কল্পনাতীত।' কাউকে যেন ভালবাসতে পারি এ শক্তি দেবার জন্যেই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। কেউ আমাকে ভালবাসবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। ভালবাসতে পারাই হচ্ছে কঠিন, তাই না ভিনসেন্ট। ভালবাসা পাওয়া নয়?'

ভিনসেন্টের মনে পড়ল উরসুলা ও কে'র কথা

'হ্যা', সে জবাব দিল।

ভিনসেন্টের হাঁটুতে মারগট নিজের মাথার পেছনটা ঘষল।

'তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে তো? কথা যদি বলতে না চাও না-ই বললে। আমি চুপ করে তোমার পাশে বসে থাকব, একটা কথাও বলব না। তুমি বাধা

দিও না। কেবল তোমার পাশে আমাকে বসে থাকতে দিও, দেখো আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করব না বা তোমার কাজে বাধা জন্মাব না।'

'বেশ ত তুমি এসো। কিন্তু ন্যুনেন এ ভালবাসার মত যখন কোন লোক পেলে না, তখন অন্যত্র চলে গেলে না কেন বল দেখি? অন্তত কিছুদিনের জন্য বেড়াতে? অর্থের অভাব রয়েছে নাকি?'

'টাকাপয়সা? প্রচুর রয়েছে আমার। ঠাকুর্দা প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন আমার জন্যে।'

'তবে আমস্টারডাম বা হেগ শহরে গেলে না কেন? জায়গায় হয়ত তোমার মনের মতো লোক মিলত।'

'তারা আমাকে কোথাও যেতে দিতে রাজি নয়।'

'তোমার কোন বোনেরই বিয়ে হয় নি?'

'না গো প্রিয়, না। আমাদের কারুর জীবনসঙ্গী মেলে নি।'

ব্যথানুভূতির অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল ভিনসেন্টের দেহে। নারীর মুখে প্রিয় সম্বোধন এইবারই সে প্রথম শুনল। কাউকে ভালবাসা এবং পরিবর্তে তার ভালবাসা না পাওয়া কত মর্মান্তিক সে তা জানে। কিন্তু প্রেম বিহ্বলা নারীর প্রাণ উজাড় করা ভালবাসার স্বাদ যে কি তা তো সে জানে না। মারগট যে প্রেমের ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে তারই উদ্দেশে এটা সম্পূর্ণ দৈব-দুর্ঘটনা বলে মনে হয়েছিল তার;মনে হয়েছিল এখানে সে নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু মারগটের একটা কথা তার মনে অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি করল। সে গভীর আবেগে মারগটের কম্পিত দেহ আপন বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

'তোমায় আমি ভালবাসি ভিনসেন্ট, কত ভালবাসি,' অস্ফুটে মারগট বলল।

'তোমার কথাগুলো কি অদ্ভুতই না শোনাচ্ছে।'

'এ পর্যন্ত আমি প্রেমের স্বাদ পাই নি সে জন্যে আর আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। ওগো আমার প্রিয়তম, ওগো আমার আরাধনার ধন, তোমার জন্য যুগযুগান্ত অপেক্ষা করে থাকা চলে। এমন মানুষ যে পাব তা তো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।'

'আমিও তোমায় ভালবাসি, মারগট,' ভিনসেন্ট বলল।

মারগট একটু সরে দাঁড়াল।'তোমার ও কথা বলার দরকার নেই ভিনসেন্ট। হয়ত কিছু পরে আমাকে তোমার আরও একটু ভাল লাগবে, কিন্তু এখন আমাকেই কেবল ভালবাসতে দাও।'

ভিনসেন্টের আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে মারগট ওর কোটটা এক পাশে সরিয়ে রেখে মাটিতে বসে পড়ল।

'এবার তোমার কাজ আরম্ভ কর প্রিয়তম'– সে বলল, 'আমি তোমার কাজের ক্ষতি করতে ত চাই না,বরঞ্চ দূর থেকে তোমাকে আঁকতে দেখতে ভালবাসি।'

৫.

ভিনসেন্ট ছবি আঁকতে বেরুলেই মারগট প্রায় প্রতিদিনই তার সঙ্গে যেত। কোন কোন দিন হয়ত উভয়ে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে যেত। রৌদ্র তাপে উভয়েই শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ত কিন্তু মারগট কোনদিনই অভিযোগ করত না। সারাদেহে তার

বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তার কেশগুচ্ছ ছিল কেমন তামাটে, নিষ্প্রভ; এখন তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গিয়েছিল, গাল ভেঙ্গে গিয়েছিল--এখন তা শুধু ভরা নয়, তা রক্তিমাভও। গাত্রচর্ম তার শুষ্ক আর বিশীর্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন তা হয়েছে মসৃণ পেলব আর উষ্ণ। আঁখি দুটি তার হয়েছে বৃহত্তর, ঝুলে পড়া স্তনদ্বয় হয়েছে সুপুষ্ট, কণ্ঠস্বরে নতুন সুর, আর চলার ভঙিমায় দৃঢ়তা আর শক্তির দ্যুতি। প্রেম যেন তার অন্তরে অব্যক্ত এক ঝরণাধারার মুখ দিয়েছে খুলে আর তাতে, সেই প্রেম সঞ্জীবনীতে সে করেছে অবগাহন স্নান। তাকে খুশি করবার জন্যে মারগট মাঝে মাঝে লাঞ্চ নিয়ে আসত, যে সব ছবির সে প্রশংসা করত তার জন্যে প্যারিসে অর্ডার দিত। কিন্তু কখনও তার কাজে বাধার সৃষ্টি করত না। সে যখন ছবি আঁকত তখন মারগট নিশ্চল হয়ে বসে থাকত তার পাশে, কিন্তু তার মত মারগাটেরও সারা অন্তরে বয়ে যেত একটা স্নিগ্ধ আবেগ শিহরণ।

ছবি আঁকা সম্পর্কে মারগটা কিছুই জানত না। কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণধার ও অনুভূতিশীল। উপর্যুক্ত মুহূর্তে উপর্যুক্ত কথা বলার ক্ষমতাও ছিল তার। ভিনসেন্ট বুঝতে পারল অনেক কিছু না জেনেও অনেক কিছু সে উপলব্ধি করতে পারে।

'আঃ। দশ বছর আগেও যদি ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হত।' ভিনসেন্ট নিজের মনে বলল।

একদিন ভিনসেন্ট নতুন ক্যানভাসে ছবি আঁকার উপক্রম করছিল। মারগট তাকে শুধালো, 'আচ্ছা, তুমি যা আঁকতে চাও তা যে ঠিক ঠিক ক্যানভাসে ফুটবে তা তুমি কি করে বোঝ?'

ভিনসেন্ট এক মিনিট কি ভাবল, তারপর জবাব দিল, ''শাদা ক্যানভাসটাকে বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলে আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না, ঝড়ের মত আমার তুলি চালিয়ে যাই ওর বুকে।'

'সত্যি ঝড়ের মত তুলি চালাও তুমি। এমনটি আমি আর দেখিনি।'

'আমাকে চালাতেই হয়। আমার মনে হয়, ক্যানভাসটা যেন আমাকে ব্যঙ্গ করে বলছে, তুমি কিছুই জান না!'

'তার মাঝে ও একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ?'

'ঠিক বলেছ। শাদা ক্যানভাসটা আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যে তার ঐ বোকার মত চেহারাকে, তার ঐ চ্যালেঞ্জকে অগ্রাহ্য করে তুলি চালাতে পারে আবেগভরে, ও তাকে ভয় পায়। মারগট, জীবনও ঐ শাদা ক্যানভাসের মত তার অসীম শূন্যতায় ভরা নৈরাশ্যময় দিকটা খুলে ধরে মানুষের দিকে।'

'হ্যা সে কথা ঠিক।'

'কিন্তু বিশ্বাস আর উদ্যম যার আছে সে ঐ শূন্যতা দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সে এগিয়ে আসে, কাজ করে, গড়ে তোলে, সৃষ্টি করে, ফলে ক্যানভাস আর শূন্য থাকে না, ভরে ওঠে পরিপূর্ণ জীবন সম্পদে।'

প্রেমমুগ্ধ মারগটের কাছে ভিনসেন্টের সমস্ত কুশ্রীতা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাকে আর সে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখত না। তার গেঁয়ো স্বভাব, রুক্ষ কণ্ঠস্বর, মুখের কঠোর দাগ কিছুই আর চোখে পড়ত না। ভিনসেন্টের কাজের কোন ত্রুটি সে

খুঁজে পেত না। সে অর্থ উপার্জন করতে পারে না বলে মারগট তাকে কোনদিন কটু কথা বলে নি বা কোন উপদেশ দেয় নি। গোধূলির ছায়া ঘেরা শান্ত পরিবেশে মারগটের কোমর বেষ্টন করে ভিনসেন্ট যখন বাড়ি ফিরত, তখন সে আপন কাজের ফিরিস্তি দিত। মারগট কোন প্রশ্ন না করে সব কিছু নির্বিবাদে গ্রহণ করত। ভিনসেন্ট যা, তাকেই সে একান্তভাবে ভালবেসেছিল।

কিন্তু এ অবস্থায় ভিনসেন্ট যেন খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিল না। প্রত্যেক দিন সে ভাবত, মারগট তার উপর নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার করবে, তার ব্যর্থতার জন্যে তিরস্কার করবে, ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হবে। কিন্তু গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে মারগটের প্রেম আরও বৃদ্ধি পেল, সে প্রাণের সমস্ত প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে ভিনসেন্টকে যেন আপ্লুত করে দিল। মারগট নিজে থেকে বিচ্ছেদের বীজ বপন করছে না দেখে ভিনসেন্ট নিজেই নিজের সম্বন্ধে নানা বিরূপ সমালোচনা করতে লাগল। কিন্তু এর মধ্যেও মারগট কোনো ত্রুটি খুঁজে পেল না।

আমস্টারডাম ও বোরিনেজের ব্যর্থতার কাহিনী ভিনসেন্ট সবিস্তারে বলে গেল। 'সেদিন আমি যা করেছি খুবই ভুল, অবশ্য আজও আমার কাজ ত্রুটিহীন হয় নি।' সে মন্তব্য করল।

মারগট তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। 'রাজা কোনদিন ভুল করতে পারেন না।'

ভিনসেন্ট ওকে চুম্বন করল।

আর একদিন মারগট ভিনসেন্টকে বলল, 'মা বলছিলেন তুমি নাকি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তিনি নাকি জানতে পেরেছেন যে, তুমি হেগ শহরে অসৎ প্রকৃতির মেয়েমানুষ নিয়ে থাকতে। এসব যে মিথ্যা রটনা, আমি তা ওদের বলে দিয়েছি।

ভিনসেন্ট ক্রিস্টিনার কাহিনী বিবৃত করল।

'জানো ভিনসেন্ট, তোমার মধ্যে খৃষ্টের অনুরূপ কিছু একটা রয়েছে। আমার বাবা যদি থাকতেন তিনিও ঠিক একথাই বলতেন।

'দু বছর বেশ্যার সঙ্গে ঘর করেছি, এ-কাহিনী শোনার পর বুঝি তোমার ও কথা মনে হল?'

'না না ও তো বেশ্যা ছিল না, ও যে তোমার স্ত্রী। ওকে যে রক্ষা করতে পার নি, সে তো তোমার দোষ নয়। একটা লোকের পক্ষে সমগ্র সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভবপর নয়।'

'ক্রিস্টিনা যে আমার স্ত্রী, তাতে কোন ভুল নেই। ছোট যখন ছিলাম, তখন একবার আমার ছোটভাই থিয়োকে বলেছিলাম, 'আমি যদি কোন সৎ স্ত্রী না পাই, তবে অসৎকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করব। স্ত্রী না থাকার চেয়ে অসৎ স্ত্রী থাকাও ভাল।'

একটু সময় অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটল। ইতিপূর্বে বিয়ে সম্পর্কে কোন আলোচনা দুজনের মধ্যে হয় নি।

'ক্রিস্টিনার ব্যাপারে একটা কথা ভাবলেই আমার দুঃখ হয়, সে হচ্ছে ওর দুটো বছরের ভালোবাসা আমিও পেতে পারতাম।'

মারগটকে নিবৃত্ত করার আশা ভিনসেন্ট ছেড়ে দিয়ে ওর ভালোবাসাকে মেনে নিল। 'যখন ছোট ছিলাম মারগট'– সে বলতে লাগল, 'তখন ভাবতাম যে, সবকিছুই দৈবাৎ ঘটে যায়। কিন্তু যতই বড় হতে লাগলাম, ও ধারণা আমার বদলে গেল। সবকিছুর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে দেখতে পেলাম। আলোর জন্য ভবিতব্যতার উপর দীর্ঘকাল নির্ভর করে থাকা অনেকেরই বিধিলিপি।'

'যেমন আমার বেলায়।'

ইতিমধ্যে তারা কোন তাঁতির গৃহের নিচু দুয়ারের কাছে উপস্থিতি হয়েছিল। ভিনসেন্ট মারগটের হাতে চুম্বন করল। মারগটের হাসিতে এমন একটা আত্মসমর্পণের নির্ভর ভাব ফুটে উঠল, যা দেখে ভিনসেন্ট নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে অবাক হয়ে গেল। তারা ঐ কুঁড়ে ঘরটায় ঢুকে পড়ল। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। তাঁতের পাশে একটা বাতি ঝোলানো ছিল। একটুকরো লাল কাপড় বোনা হচ্ছিল। তাঁতি এবং তার স্ত্রী সূতো ঠিক করছিল। মারগট ও ভিনসেন্ট পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। কুৎসিত স্থানেও যে সৌন্দর্য লুক্কায়িত থাকে তা উপলব্ধি করার শিক্ষা দিয়েছিল ভিনসেন্ট মারগটকে।

নবেম্বরের কাছাকাছি ন্যুনেনবাসীদের মধ্যে মারগট ও ভিনসেন্টকে নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। গ্রামবাসীরা মারগটকে পছন্দ করত, কিন্তু ভিনসেন্টকে সন্দেহ ও ভয় করত। মারগটের মা ও চার বোনই চেষ্টা করত যাতে ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু এটা নিছক বন্ধুত্ব বলে ও তাদের বাধা দিত। বেগিম্যান পরিবার জানতেন যে, ভিনসেন্ট এখানে থাকতে পারবে না, যে কোনদিন সে চলে যাবে বলে তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁরা বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করেন নি। কিন্তু গ্রামে ওদের নিয়ে খুবই আলোচনা চলত, সবাই বলত যে পাগলাটে ভ্যান গোঘ জীবনে কিছুই করতে পারবে না, তাই বেগিম্যান পরিবার যদি এখনই তাঁদের মেয়েকে ওর হাত থেকে সরিয়ে নিতে না পারে, তবে তাদের বহু দুঃখ পেতে হবে।

গাঁয়ের লোক তাকে কেন যে এত অপছন্দ করত ভিনসেন্ট তা বুঝে উঠতে পারত না। সে কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না, কাউকে কোনভাবে আহত করত না। যে গাঁয়ে শত বৎসরেও জীবনধারার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি, সেখানে সে এমন কি করল যাতে গাঁয়ে এতটা উত্তাপের সৃষ্টি হতে পারে, তা সে ভেবে পেত না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে, লোকে তাকে অলস মনে করে, তখনই সে তাদের নিজের মতে আনার আশা ছেড়ে দিল। ডিয়েন ভ্যানতেন বীক নামে কোন দোকানদার একদিন পথ থেকে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল,'বেশ সুন্দর আবহাওয়া ছিল, শীত পড়ায় তা নষ্ট হয়ে গেল, না?'

'হ্যাঁ।' ভিনসেন্ট জবাব দিল।

'আপনি তো নিশ্চয় এখন কাজ আরম্ভ করবেন?'

ভিনসেন্ট কাঁধের ইজেলটা ভাল করে রাখল।'হ্যাঁ, এই তো কাজে যাচ্ছি।'

'না, না, এ-কাজ নয়।' ডিয়েন বলল, 'আপনি সত্যিকারের যে কাজ করেন?'

'ছবি আঁকাই আমার কাজ'–ভিনসেন্ট শান্তভাবে জবাব দিল।

'কাজ মানে চাকুরি যাতে অর্থোপার্জন করা যায়।'

'জিনিসপত্র বিক্রয় করা যেমন আপনার পেশা, তেমনি মাঠে গিয়ে ছবি আঁকাও আমার পেশা, ডিয়েন ভ্যান ডেন বীক।'

'ঠিকই বলেছেন। আমি তো জিনিসপত্র বিক্রয় করি, আপনি যা তৈরি করেন, তা কি বিক্রি হয়।'

গ্রামের প্রায় সবাই তাকে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন করেছে। এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে তার মনটা বিষিয়ে উঠছিল।

'কখনও কখনও বিক্রয় হয়। আমার ভাই ছবি-ব্যবসায়ী সে কিনে নেয়।'

'আপনার এবার কাজ আরম্ভ করা উচিত। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। বয়েস তো বাড়ছে, কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে যে একদিন।'

'আপনি আমাকে কুঁড়ে বলছেন। আপনি দোকান খোলার সময় যে কাজ করেন, সে সময় আমি দ্বিগুণ কাজ করি।'

'একে আপনি কাজ বলেন? এই বসে বসে রঙ মাখানোকে? আরে এ যে ছেলেমেয়েদের খেলা। দোকান করুন, নয়, জমি চাষ করুন–তাই তো হচ্ছে মানুষের সত্যিকারের কাজ। নষ্ট করার মত বয়েস আপনার আর নেই।'

ভিনসেন্ট জানত, ডিয়েন ভ্যান ডেন বীক গ্রামবাসীর অভিমতের প্রতিধ্বনি করছে এবং এও জানত যে, এদের কাছে আর্টিস্ট এবং জীবিকা সংস্থানকারী ভিন্নার্থবাচক। লোকে কি ভাবে নেবে, তা চিন্তা করা সে ছেড়ে দিল। রাস্তায় বেরুলে সে কারুর সঙ্গে আর আলাপ করত না। তার প্রতি গ্রামবাসীদের অবিশ্বাস যখন চরমে এসে উপনীত হয়েছিল, তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার ফলে সে আবার সবার আদরণীয় হয়ে উঠল।

হেলমণ্ড-এ ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে অ্যানা কার্নেলিয়া পা ভেঙে ফেললেন। তাঁকে ঝটিতি গৃহে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার ওঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। অবশ্য একথা তিনি ওঁর পরিবারের কাউকে বলেন নি। ভিনসেন্ট আপনার কাজকর্ম সব সরিয়ে রেখে মায়ের সেবায় লেগে গেল। বোরিনেজের অভিজ্ঞতা থেকে সে পরিচর্যা করার পদ্ধতিটা বেশ আয়ত্ত করেছিল। সেই অভিজ্ঞতাই সে কাজে লাগাল। ডাক্তার আধ ঘণ্টা ধরে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মেয়েদের চেয়েও সেবায় নিপুণ দেখছি আপনি। যাক, আপনার মার পরিচর্যা ভালই হবে।'

ন্যুনেনবাসীরা ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির, তারা সঙ্কটকালে যেমন দয়ালু হত, তেমনি আবার অন্য সময় হত চরম নিষ্ঠুর। গ্রাম্য পুরোহিতের বিপদে তারা বই, ফলমূল নিয়ে আসতে লাগল, তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগল। সেবারত ভিনসেন্টের দিকে তারা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত। পীড়িতা মাকে একটুও না সরিয়ে তাঁর বিছানা বদলে দিত, স্নান করিয়ে খাইয়ে দিত। দু সপ্তাহ পরে ওর সম্পর্কে গ্রামবাসীদের যে ধারণা ছিল, তা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ওরা এলে ভিনসেন্ট তাদের ভাষাতেই কথা বলত। তারা এসে শয্যাক্ষত এড়াবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, রোগীর পথ্য, রোগীর ঘরের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করত। ওর সঙ্গে কথা বলে এবং ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে সবারই ধারণার পরিবর্তন হল। কয়েকদিন পর মা একটু ভাল হয়ে উঠলে সে কিছুক্ষণের জন্য

ছবি আঁকতে বাইরে যেত। তখন গ্রামের লোকেরা হেসে হেসেই তার সঙ্গে আলাপ - সালাপ-করত। ফলে তার মনে যে ক্ষেভের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেকাংশে কমে গেল।

এই কয়দিন মারগট সর্বক্ষণই তার পাশে পাশে ছিল। ভিনসেন্টের এই নিপুণতা দেখে সে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয় নি। একদিন তারা রুগীর ঘরে বসে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট মন্তব্য করল, 'মানবদেহের গঠন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সাফল্যের সঙ্গে ওঁর সেবা করা সম্ভবপর নয়। ঐ জ্ঞান অর্জনের জন্য অর্থব্যয় করতে হয়। মার্শালের লেখা 'এনাটমি ফর আর্টিস্ট' বলে একটা বই আছে, বইটির দাম অনেক।'

'বইটি কেনার মত বেশি পয়সা নেই বুঝি তোমার কাছে?'

'না,ছবি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উদ্বৃত্ত পয়সা আমার হাতে হবেও না।'–'তুমি কিছু টাকা যদি আমার কাছ থেকে ধার নাও, তবে আমি অত্যন্ত খুশি হব ভিনসেন্ট। পয়সার আমার অভাব হয় না। যে মাসোহারা পাই, আমি তাই খরচ করতে পারি না।'

'তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ মারগট, কিন্তু আমি ত নিতে পারব না।'

সে আর এ বিষয়ে জোর করল না, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হেগ থেকে আনা একটা প্যাকেট ওর হাতে দিল। 'কি এটা?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'খুলেই দেখ না।'

মার্শালের বইটি পার্সেলে এসেছিল। এক টুকরো সূতো দিয়ে বইটির সঙ্গে একটি চিঠি জড়ান ছিল, তাতে লেখা ছিল, 'জন্মদিনের প্রীতি উপহার।'

'কিন্তু আজ তো আমার জন্মদিন নয়।' ভিনসেন্ট জবাব দিল।

'তোমার নয়, আমার'–হেসে মারগট জবাব দিল।'আমি চল্লিশে পা দিলাম, ভিনসেন্ট। তুমি আমাকে উপহার দিয়েছ জীবন, আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটুকু গ্রহণ কর প্রিয়তম। আজ আমার ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে, তুমিও এই আনন্দের ভাগ গ্রহণ করো।'

বাগানের স্টুডিয়োতে ওরা দুজন বসেছিল। আশেপাশে তখন আর কেউ ছিল না। বেলা পড়ে আসছিল এবং পড়ন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিকণার এক ঝলক আলো এসে পড়েছিল চুনকামকরা দেওয়ালে। ভিনসেন্ট আলতোভাবে বইটির উপর হাত বুলাতে লাগল। থিও ছাড়া আর একজনও তাকে উপহার দিয়ে আনন্দ পেল–এ এক নতুন অনুভূতি। ভিনসেন্ট বিছানার উপর বইটি রেখে দিয়ে মারগটকে নিজ বাহুপাশে আবদ্ধ করল। ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠছিল ভাবালুতা। গত কয়েক মাসে পরস্পরকে তারা আদর করতে পারে নি, কারণ মাঠে তাদের মিলন হয়েছে। সেখানে পরস্পরের অতি সান্নিধ্য অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা ছিল। মারগট সব সময়েই একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করত ভিনসেন্টের কাছে। পাঁচ মাস হয় সে ক্রিস্টিনাকে পরিত্যাগ করে এসেছে–তাই নিজেকে সে একান্তভাবে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। মারগট আহত হতে পারে অথবা তার জন্যে ওর প্রেমে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এমন কোন কাজ করতে সে চায় না।

চুম্বন করার সময় ভিনসেন্ট তাকাল মারগটের কোমল আঁখি দুটির দিকে। মারগট স্মিত হেসে চোখ দুটি বন্ধ করল, তারপর ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করল। পরস্পরের সঙ্গে

ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা, মুখ থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত যেন মিশে ছিল এক হয়ে। এমনি আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ওরা গিয়ে বিছানার উপর বসল। ভুলে গেল তারা তাদের প্রেমহীন ঊষর জীবনের দিনগুলোর কথা।

বাইরে সূর্য ডুবে গেল। দেওয়ালে এসে পড়া রোদটুকুও মুছে গেল। সারা ঘরটা একটা আবছা আলোতে ঢেকে গেল। ভিনসেন্টের মুখের ওপর মারগট তার হাতটা বুলাতে লাগল। তার কণ্ঠ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুতে লাগল। ভিনসেন্টের মনে হল,সে যেন ক্রমেই এক অতলগর্ভে ডুবে যাচ্ছে। অকস্মাৎ সে মারগটের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ছুটে গেল ইজেলের কাছে। ইলেজ-এ আটকান অসমাপ্ত ছবিটি টেনে এসে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল। একাশিয়া গাছে মাগপাইয়ের কলধ্বনি ও ঘরে ফিরে আসা গাভীকুলের গলার ঘণ্টাধ্বনি ভিন্ন আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। ক্ষণিক স্তব্ধতার পর মারগট শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি যদি চাও, আমার কোন আপত্তি নেই।'

'আপত্তি নেই?' না ঘুরেই ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'না, কারণ আমি তোমায় ভালবাসি।'

'কিন্তু তা তো ঠিক হবে না।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি ভিনসেন্ট যে রাজা কোনদিন অন্যায় করতে পারেন না।' ভিনসেন্ট এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। মারগট বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল। ভিনসেন্ট আবেগ ভরে তার মুখে, চোখে, নাকে চুম্বন করতে লাগল।

'আমিও তোমায় বালবাসি মারগট' সে বলল,'এ সত্য এইমাত্র আমার কাছে উদঘাটিত হল।'

'তোমার কথা শুনতে কি আরামই না লাগছে।' মারগটের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠছিল একটা শান্ত ও স্বপ্নালু ভাব। 'তুমি আমায় যে একটু ভালবাস, তা আমি জানি। তোমায় আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। এতেই আমার আনন্দ।'

উরসুলা বা কে'কে যেমন ভালবেসেছিল, তেমন ভাল সে ওকে বাসতে পারে নি। ক্রিস্টেনাকে যত ভালবাসত, তত ভালও ওকে বাসতে পারে নি সে। কিন্তু তার বাহুবেষ্টনে শায়িত নারীর জন্যে সে কেমন যেন একটা কোমল ভাব অনুভব করত। সে জানত যে, মানুষের প্রত্যেকটি বন্ধনের মধ্যে প্রেমের স্থানও রয়েছে। বিশ্বের একমাত্র যে-নারী তার প্রাণঢালা ভালবাসা উজাড় করে দিল ওর পায়ে, তাকে সে একান্তভাবে ভালবাসতে পারছে না ভেবে তার প্রাণটা কেঁদে উঠল। উরসুলা এবং কে--তার প্রেমের প্রতিদান না দেওয়ায় সে যে পীড়া অনুভব করেছিল, তা তার মনে পড়ল। তার জন্য মারগটের এই প্রেম-বন্যাকে সে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে সেই প্রেমই তার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করল। প্রায় অন্ধকার ঘরে হাঁটু গেড়ে বসে, মারগটের মাথাটা নিজের হাতের ওপর রেখে সে যেন বুঝতে পারল, কেন উরসুলা ও কে পালিয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে।

'মারগট' সে বলল, 'আমি অত্যন্ত হতভাগ্য, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের বোঝার অর্ধেক ভার নিতে যদি তুমি রাজি হও, তবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব।'

'আমি যে ভার নিতেই চাই, প্রিয়তম।'

'আমরা বিয়ের পর এখানে থাকতে পারি। অথবা তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে চাও?'

মারগট সপ্রেমে ওর মাথা ভিনসেন্টের বাহুতে ঘষল। 'রুথ কি বলেছিল মনে নেই? 'তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাব।'

৬.

পরের দিন প্রাতে স্ব স্ব পরিবারের কাছে উভয়ে যখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করল, তখন যে ঝড়ের সৃষ্টি হল, সেজন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। ভ্যান গোঘদের দিক থেকে অবশ্য কেবল অর্থের প্রশ্ন ছাড়া আর কোন বাধাই ছিল না। থিওর অর্থে ও এখন নিজেকে ভরণপোষণ করছে, এমন সময় কি ওর বিয়ে করা উচিত হবে?

'প্রথমত অর্থ উপার্জন করে তোমার জীবনের পথ সরল করে নিয়ে তারপর তুমি বিয়ে করতে পার।' ওর বাবা জানালেন।

'আমার পেশার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে আমি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি তবে অর্থ উপার্জন যথা সময়েই করতে পারব'– ভিনসেন্ট জবাব দিল।

'তবে তোমার সেই যথাসময়েই বিয়ে করা উচিত, এখন নয়।'

মারগটের বাড়িতে যা হচ্ছিল তার তুলনায় ভিনসেন্টের বাড়ির হাঙামাকে শুধু একটু হল্লা বলা চলে। মারগট আর সেদিন ভিনসেন্টের সঙ্গে তাঁতিদের ওখানে গেল না। বিকেলের দিকে সে স্টুডিয়োতে এলো। ওর চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। তাকে অনেক বয়স্কা দেখা যাচ্ছে। এসেই সে ক্ষণেকের জন্য ভিনসেন্টকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল।

'ওরা সারাদিন ধরে তোমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে'– মারগট বলল।

'এ তোমার আগেই আশা করা উচিত ছিল।'

'আশা আমি করেছিলাম, কিন্তু এমন হীনভাবে ওরা তোমাকে আক্রমণ করবে এমনটি আমি ভাবতেও পারিনি।'

ভিনসেন্ট আলতোভাবে ওকে ধরে চুম্বন করল।

'ওদের বোঝাবার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দাও তুমি। আমি আজ সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়ি যাব। আশা করি ওদের বোঝাতে পারব যে, ওরা আমাকে যত খারাপ মনে করে তত খারাপ আমি নই।'

মারগটের বাড়িতে পা দিয়েই ভিনসেন্টের মনে হল সে যেন একটা অপরিচিত শত্রুপুরীতে পা দিল।

মারগটের বোনেরা ওকে নিয়ে বসার ঘরে গেল। ঘরটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে। এ ঘরে বহুদিন কোন লোক প্রবেশ করে নি। ভিনসেন্ট চার বোনেরই নাম জানত, কিন্তু কার নাম কি তা জানত না, তাদের সবাইকে মারগটের ব্যঙ্গচিত্র বলে মনে হল। বড় বোন হলেন বাড়ির কর্ত্রী–তিনি এগিয়ে এলেন আলাপ আলোচনায়।

'মারগট বলছিল তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও। হেগ-এ তোমার যে স্ত্রী ছিল তার কি হয়েছে তা আমরা জানতে পারি কি?'

'ভিনসেন্ট ক্রিস্টিনা সম্পর্কিত সব ব্যাপার খুলে বলল। ঘরের তাপমান যন্ত্র যেন আরও কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল।

'আপনার বয়স কত মিজনের ভ্যান গোঘ?'

'একত্রিশ।'

'মারগট কি বলেছে যে তার বয়েস হচ্ছে'

'আমি ওর বয়েস জানি।'

'কত টাকা উপার্জন করেন তা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'দেড়শো ফ্রাঙ্ক।'

'কি করে উপার্জন করেন?'

'আমার ভাই দেয়।'

'তার মানে ভাইয়ের উপর আপনার দিন চলে?'

'না। সে আমাকে একটা মাসোহারা দেয়, পরিবর্তে আমি যা আঁকি সে সব নেয়।'

'ওর কতগুলো বিক্রয় হয়?'

'তা সত্যি করে আমি বলতে পারব না।'

'কিন্তু আমি পারি। আপনার বাবা বলেছেন যে, একটা ছবিও বিক্রয় হয় নি।'

'পরে বিক্রি করবে। ভবিষ্যতে সে এ থেকে অনেক গুণ বেশি টাকা পাবে।'

'সেটা অনিশ্চিত। তাছাড়া আমরা বর্তমান সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করছি।'

ভিনসেন্ট জ্যেষ্ঠ্যা ভগ্নীর কঠিন, কুশ্রী মুখখানাকে একবার নিরীক্ষণ করল। ওখান থেকে সে একবিন্দু সহানুভূতি আশা করতে পারে না।

'আপনার কোন উপার্জন যদি না থাকে'– তিনি বলতে লাগলেন, 'তবে কি করে আপনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন তা জানতে পারি কি?'

'আমার ভাই আমাকে দেড়শো টাকা দিয়ে যাচ্ছে, এটা তারই ব্যাপার। আপনাদের নয়। আমার কাছে এটা বেতনেরই সমান। ঐ টাকা উপার্জন করতে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। হিসেবে করে চললে মারগট আর আমিও দিয়েই সংসার চালিয়ে নিতে পারব।'

'আমার জন্য তোমার এক পয়সাও লাগবে না'– মারগট চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার নিজেরই অনেক টাকা আছে।'

'চুপ কর মারগট!' জ্যেষ্ঠা আদেশ করলেন।

'পরিবারের সুনাম যদি কোনভাবে ক্ষুণ্ণ কর, তবে তোমার মাসোহারা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে একথা স্মরণে রেখো, মারগট।' মা বললেন।

ভিনসেন্ট হাসল। 'বিয়ে করা কি পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ করা'–সে জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা আপনার সম্পর্কে খুব অল্পই জানি, মিজনের ভ্যান গোঘ, এবং যা জানি তাও খারাপ কিছু। কদিন ধরে আপনি ছবি আঁকছেন?'

'তিন বছর।'

'কিন্তু এখনও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। সাফল্য অর্জন করতে আর কত বছর লাগবে?'

'জানি না।'

'ছবি আঁকা আরম্ভ করার আগে কি করতেন?'

'ছবির ব্যবসায়, শিক্ষক, পুস্তক ব্যবসায়, ধর্মবিষয়ক ছাত্র ও ধর্মপ্রচারক।'

'সবটাতেই আপনি অকৃতকার্য হয়েছেন?'

'না, সবটাই ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'কারণ ওগুলো আমার উপযোগী নয়।'

'ছবি আঁকা ছেড়ে দেওয়ার আর কতদিন বাকি?'

'ও তা কখনই ছাড়বে না!' মারগট বলে উঠল।

'আমার মনে হচ্ছে, মিজনের ভ্যান গোঘ্' জ্যেষ্ঠা বলতে লাগলেন, 'যে আপনি মারগটকে বিবাহ করার অনুপযুক্ত। সমাজে আপনার কোন স্থান নেই,আধা পয়সার মুরোদ নেই, পয়সা উপার্জনের কোন পথ জানা নেই, কোন কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতা নেই। আপনি কেবল পারেন অকর্মণ্যের মত দিন কাটাতে। এ অবস্থায় আমদের বোনকে বিয়ে করার সাহস আপনার কি করে হয়?'

ভিনসেন্ট পাইপটা মুখের কাছে নিয়ে আবার নামিয়ে রাখল।

'মারগট আমাকে ভালবাসে এবং আমিও ওকে ভালবাসি। আমরা এখানে থাকব তারপর বাইরে চলে যাব। আমি ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব।'

'আপনি ওকে ত্যাগ করে চলে যাবেন', কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল আর একটি বোন।'একদিন ওর সঙ্গ আর আপনার ভাল লাগবে না, তখন ওকে ত্যাগ করে আবার আপনি বদ মেয়েলোকের সঙ্গ নেবেন, যেমন নিয়েছিলেন হেগ শহরে।'

'তুমি ওকে ওর টাকার জন্যেই বিয়ে করতে চাচ্ছ।' মা বললেন।

'কিন্তু যে আপনি পাচ্ছেন না।' তৃতীয়া বলে উঠল। 'মা ওর মাসোহারা স্টেটে জমা করে দেবেন।'

মারগটের আঁখি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। এই রণচণ্ডীদের সঙ্গে অযথা বিতণ্ডা করে লাভ নেই। আইনহোভেন এ গিয়ে মারগটকে বিয়ে করে তৎক্ষণাৎই তাকে প্যারিস যাত্রা করতে হবে। ব্রাবান্ট ত্যাগ করে যাবার ইচ্ছা তার ছিল না। কারণ কাজ তার তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু ঐ বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগুলোর সাথে মারগটকে রেখে গেলে তার যা অবস্থা হবে ভাবতেই সে শিউরে উঠল।

বেদনা ভারাক্রান্ত অন্তরে তার দিন কাটতে লাগল। তুষারপাত আরম্ভ হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে স্টুডিয়োতে বসে কাজ আরম্ভ করতে হল। মারগটের আসাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রাতে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমিয়ে পড়ার ভান না করা পর্যন্ত তাকে শুনতে হত ভিনসেন্টের অজস্র অপবাদ কাহিনী। চল্লিশ বছর সে এই পরিবারের মধ্যে আছে। ভিনসেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় কয়েক মাসের। বোনেরা তার জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে– তা সে জানত; তাই ওদের সে আন্তরিক ঘৃণা করত। কিন্তু ঘৃণা হচ্ছে প্রেমেরই বিভিন্ন দুর্বোধ্য রূপের একটি, এ থেকেই মাঝে মাঝে জন্মায় তীব্র কর্তব্য জ্ঞান।

'আমার সঙ্গে চলে যেতে অথবা এখানেই আমাকে বিয়ে করতে যে কেন তুমি সম্মত হচ্ছ না, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না'– ভিনসেন্ট একদিন ওকে বলল।

'কিন্তু ওরা তো আমাকে যেতে দেবে না।'

'কে দেবে না? মা?'

'না; বোনেরা।'

'ওদের কথায় এমন কি এসে যাবে?'

'আমি যৌবনে যে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিলাম, সে কথা তোমাকে বলেছি। মনে আছে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু আমার সেই প্রেম নষ্ট করে দিয়েছিল ওরাই। এর কারণ আমি জানি না। আমি যা চেয়েছি ওরা তা নষ্ট করে দিয়েছে। এই আমার জীবনের ইতিহাস। শহরে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত করেছি, কিন্তু ওরা আমাকে যেতে দেয় নি। আমি পড়তে চেয়েছি, কিন্তু ভাল বই বাড়িতে আনতে দেয় নি। কোন ভদ্রলোককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে, তাঁর সম্বন্ধে ওরা অজস্র অপবাদ ছড়িয়েছে। আমি জীবনটাকে সফল করতে চেয়েলিাম, কিন্তু কোনটাই পারি নি। ওদের বাইরে আমি যেতে পারব না। ওরা যা ভাবে বা যেভাবে চলে আমাকেও তা-ই ভাবতে হবে, সে ভাবেই চলতে হবে।'

'আর এখন?'

'তোমাকে ওরা কিছুতেই বিয়ে করতে দেবে না'।

মারগটের দেহ ও মনে যে জীবনের ঢেউ লেগেছিল তার অনেকটাই উবে গিয়েছিল।

'ওদের সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না মারগট। আমাদের বিয়ে হলেই সব কিছু পরিসমাপ্তি হবে। আমার ভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা যে, আমি প্যারিসে এসে বাস করি। তার ইচ্ছাই পূর্ণ করা যাবে, আমরা প্যারিসে গিয়ে বাস করতে পারব।'

মারগট কোন জবাব দিল না। বিছানার ধারে বসে সে একদৃষ্টে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। মারগট ওর পাশে বসে হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল।

'ওদের সম্মতি ছাড়া আমাকে বিয়ে করতে কি ভয় পাচ্ছ মারগট?'

'না' কিন্তু কণ্ঠস্বরে তেমন যেন জোর বা শক্তি ছিল না, 'ওরা যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করব, ভিনসেন্ট। এ বিচ্ছেদ আমি সইতে পারব না। ভালবাসার পর তোমাকে যদি নাই পেলাম তবে বেঁচে থেকে লাভ কি আমার।'

'বিয়ের ব্যাপারে তাদের সম্মতিরই বা কি প্রয়োজন? বিয়ের পরে বললেও তো চলবে।'

'আমি ওদের বিরুদ্ধে যেতে পারব না। তা ছাড়া ওরা যে অনেক, একা সবার সঙ্গে কি করে লড়াই করব।'

'লড়াইয়ের প্রয়োজন কি। আমাকে বিয়ে কর– তাহলেই সব চুকে যাবে।'

'নানা তা হবে না, বিবাদ আরম্ভ হবে মাত্র। তুমি তো আমার বোনদের চেননা।'

'চিনতেও চাইনা। থাক, আমি আজ রাতে আর একবার চেষ্টা করব। বসার ঘরে প্রবেশ করতেই তার মনে হল বৃথাই সে এসেছে।

'আমরা ওসব আগেই শুনেছি, মিজনের ভ্যান গোঘ্ ও সব আমাদের সংশয় দূর করতে পারবে না'– জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলল, 'এ বিষয়ে আমরা মন স্থির করে ফেলেছি। আমরা মারগটকে সুখী দেখতে চাই, তা বলে ওকে জলে ফেলে দিতে পারি না। আমরা ঠিক করেছি যে, দু বছর পরেও যদি তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও তবে আমাদের আপত্তি তুলে নেব।'

'দু'বছর!' ভিনসেন্ট বলল।

'দু'বছর আমি থাকব না,' মারগট শান্ত কণ্ঠে বলল।

'কোথায় যাবে?'

'আমি মরে যাব। ওকে যদি বিয়ে করতে না দাও আমি আত্মহত্যা করব।'

সব কয়টি ভগ্নী উত্তেজিতভাবে নানা উক্তি করতে লাগল। ভিনসেন্ট তার মধ্যে স্থান ত্যাগ করল। তার আর করার মত কিছুই ছিল না।

পাঁচ বোনের সমবেত আক্রমণে মারগটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। তার স্বাস্থ্য, শক্তি ও উৎসাহ একান্তভাবে হ্রাস পেল। যে বয়স তার হয়েছে এখন আর বিংশতি বর্ষীয়া তরুণীর মত ঐ সমবেত আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি তার নেই। ফলে তার মুখের রেখা গাঢ় হয়ে দেখা দিল, চোখে নিষ্প্রভ ভাব ফুটে উঠল, গাত্রচর্ম কেমন ফ্যাকাশে আর খসখসে হয়ে উঠল। মুখের ডানদিকের রেখাটাও কেমন গভীর হয়ে উঠল।

ওর সৌন্দর্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে ভিনসেন্টের প্রীতিও যেন উবে গেল। সে কিন্তু সত্যি মারগটকে ভালবাসেনি বা বিয়ে করতে চায় নি– আর এখন তো চায়ই না। নিজের এই নিস্পৃহতার জন্য নিজেরই লজ্জা হল।

'তুমি কি আমার চেয়ে ওদের বেশি ভালবাস মারগট?' একদিন কয়েক মিনিটের জন্যে মারগট পালিয়ে তার স্টুডিয়োতে এলে ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

মারগট ব্যথা ও ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

'একি বলছ তুমি, ভিনসেন্ট।'

'তবে কেন আমাকে ত্যাগ করতে চাচ্ছ?'

মারগট ক্লান্ত শিশুর মত ভিনসেন্টের বাহুতে ঢলে পড়ল। স্বর তার নির্জীব। 'আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও ঠিক তেমনি আমাকে ভালবাস–এ যদি আমি বুঝতে পারতাম তবে জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও আমি দ্বিধা করতাম না। কিন্তু... কিন্তু'

'তুমি ভুল করেছ মারগট, আমি তোমাকে ভালবাসি'

সে তার মুখের উপর আঙুল চাপা দিল। 'না গো প্রিয়, তুমি ভালবাসতে চাও কিন্তু বাস না। যাক এর জন্যে দুঃখ করো না। আমি একান্ত ভালবাসাই পেতে চাই।'

'ওদের সম্বন্ধ ছিন্ন করে কেন নিজে দাঁড়াও না?'

'তোমার পক্ষে একথা বলা সহজ। তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি যে কারুর সঙ্গে লড়াই করতে পার। কিন্তু আমার চল্লিশ বৎসর বয়স হয়েছে। ন্যুনেনে আমার জন্ম আইনহোভেনের বাইরে আমি যাই নি। দেখেছো না জীবনে কারুর সঙ্গে আমি বিবাদ করি নি। কারুকে ছেড়ে যাই নি।'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'তুমি যদি কিছু চাইতে, ভিনসেন্ট, তবে আমি সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতাম। থাকগে... এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে... জীবন আমার নিঃশেষে হয়ে এসেছে' মারগটের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে। ভিনসেন্ট আঙুল দিয়ে ওর থুতনি উঁচু করে ধরে রইল।

'মারগট, প্রিয়তম,' ভিনসেন্ট বলতে লাগল'–তুমি অধীন হয়ো না। আমরা একসঙ্গে এখনও অনেক দিন বাঁচতে পারি। এজন্য প্রয়োজন শুধু তোমার মুখের একটা কথা। পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে আমার কাছে ফেলে দিও। পরে আমরা হেঁটে আইনহোভেন চলে যাব। তারপর সেখান থেকে ভোরের ট্রেনে প্যারিস যাত্রা করব।'

'তা হবার নয়, প্রিয়তম। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাকে নিজের পথই অনুসরণ করতে হবে।'

'এমনভাবে তুমি কষ্ট পাবে এ যে আমি সহ্য করতে পারব না, মারগট।'

মারগট মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। চোখে তখন অশ্রু ছিল না। মুখে ছিল হাসি। 'না, ভিনসেন্ট, আমি অখুশি নই। আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। তোমাকে ভালভাসতে পারা সত্যি বিস্ময়কর।'

ভিনসেন্ট ওকে চুম্বন করল। তার ওষ্ঠে লাগল ওর অশ্রুজলের লবণাক্ত স্বাদ।

'বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।' ক্ষণপরে মারগট বলল, 'কাল কি মাঠে ছবি আঁকতে যাবে?'

'হ্যাঁ, যাবো বোধ হয়।'

'কোথায় যাবে? আমিও বিকেলে সেখানে যাবো।'

পরের দিন অনেকক্ষণ বসে সে কাজ করল। সন্ধ্যাকালে ধীরে ধীরে সোনালী আলো দেখা দিল। মারগট দ্রুত মাঠ অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হল। প্রথম দিন যে শাদা পোষাক পরেছিল আজও ঠিক তাই পরে এসেছে, কাঁধে একটা স্কার্ফ জড়ানো রয়েছে। ওর গালের ক্ষীণ রক্তিমাভা ভিনসেন্টের চোখে জড়ল। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রেমস্পর্শে ফুঠে ওঠা নারীর মত ওকে দেখাচ্ছিল। তার হাতে ছিল একটা সেলাইয়ের ঝাঁপ।

সে এসেই ভিনসেন্টের গলা জড়িয়ে ধরল। ওর হৃদপিণ্ডের দ্রুত গতি ভিনসেন্ট বেশ উপলব্ধি করতে পারছিল। ওর মাথাটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে আঁখি দুটির দিকে তাকিয়ে রইল ভিনসেন্ট। ওতে বিপদের কোন চিহ্ন ছিল না।

'কি ব্যাপার বলত? কিছু হয়েছে নিশ্চয়?' ভিনসেন্ট শুধাল।

'না না, কিছুই হয় নি'– মারগট চেঁচিয়ে উঠল 'তোমার কাছে এসেছি তোমাকে পেয়েছি এই আমার সুখ'

'কিন্তু এই হাল্কা পোষাকে বেরিয়েছ কেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মারগট বলল, 'ভিনসেন্ট যতো দূরই তুমি যাওনা কেন, আমার সম্বন্ধে শুধু একটা কথা তুমি মনে রেখো'

'কি কথা মারগট?'

'আমি তোমাকে ভালবাসতাম। তোমাকে যত মেয়ে ভালবেসেছে তাদের সবার চেয়ে আমি ভালবেসেছি।'

'এ কি, এতো কাঁপছ কেন?'

'ও কিছু না। ওরা আটকে রেখেছিল তাই দেরি হয়ে গেছে। তোমার কাজ কি শেষ হয়ে গেছে?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

'আগে যেমন থাকতাম আজ তেমনি তোমার পাশে বসে থাকতে দাও। তুমি তো জান প্রিয়তম, আমি তোমার কাজে বাধা হইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমাকে ভালবাসবার অধিকার।'

'হ্যাঁ, মারগট।' আর কোন জবাব দিতে পারল না ভিনসেন্ট।

'তাহলে তোমার কাজ আরম্ভ কর প্রিয়তম; তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো, যাতে দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে পারি।' মারগট একটু কেঁপে উঠল। স্কার্ফটা ভাল করে জড়িয়ে নিল তারপর আবার বলল,

'হ্যাঁ কাজ আরম্ভ করার আগে, আমাকে আরে একবার চুম্বন করো ভিনসেন্ট। সেই যে তোমার স্টুডিয়োতে করেছিলে... ঠিক সেইরকম করে... আর পরস্পরের বাহুতে বন্দী হয়ে কি আনন্দই না পেয়েছিলাম সেদিন।'

ভিনসেন্ট মৃদুভাবে ওকে চুম্বন করল। মারগট উঠে ওর পিছনে গিয়ে বসল। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল বিস্তীর্ণ মাঠের 'পরে। পল্লীর সন্ধ্যার শান্ত নীরবতা তাদের যেন আহত করে ফেলল। একটা বোতলের ঠুনঠুন শব্দ হল। মারগট একবার চেঁচিয়ে উঠেই মাটিতে পড়ে ভয়ানক ভাবে হাত পা নাড়তে লাগল। ভিনসেন্ট মাটিতে ওর পাশে বসে পড়ল। মারগটের আঁখি দুটি নিমীলিত, মুখে একটা কাষ্ঠ হাসির রেখা। কয়েকবার দ্রুত খিঁচুনির পর তার দেহ ধনুকের মত বেঁকে শক্ত হয়ে রইল। বরফের উপর পড়ে থাকা বোতলটাকে ভিনসেন্ট একবার নিরীক্ষণ করল, বোতলের মুখে বিষের শাদা অংশ লেগেছিল, কোন ঘ্রাণ পাওয়া গেল না ওর।

মারগটকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ভিনসেন্ট মাঠের উপর দিয়ে পাগলের মত দৌড়াতে লাগল। ন্যুনোন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে বসে সে কাজ করছিল। ছুটতে ছুটতে তার মনে হল গ্রামে পৌঁছবার পূর্বেই হয়ত মারগট মারা যাবে। নৈশভোজের তখনও এক ঘণ্টা বাকি ছিল। লোকজন তাদের বাড়ির সম্মুখের আঙিনায় বসেছিল। তাদের কাছ দিয়ে ছুটতে ছুটতে ভিনসেন্ট বেগিম্যান পরিবারের গৃহে এসে উপনীতি হল। লাথি দিয়ে দরজাটা ভেঙে বসার ঘরে ঢুকে মারগটকে একটা সোফাতে শুইয়ে দিল। শীগগির আসুন, মারগট বিষ খেয়েছে'– সে চীৎকার করে উঠল, 'আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি।' সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল এবং তাঁকে খাওয়ার

টেবিল থেকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এল। 'ওটা যে স্ট্রিকনিন্ বিষ সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমরা তো তাই মনে হয়।'

'ওকে বাড়ি যখন নিয়ে এলেন তখনও বেঁচেছিল?'

'হ্যাঁ।'

ওরা যখন বাড়ি পৌঁছল মারগট তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। ডাক্তার নিচু হয়ে তাকে নিরীক্ষণ করল।

'স্ট্রিকনিন্ই সে খেয়েছে'– ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'কিন্তু বেদনা বন্ধ করার জন্য সে এর সঙ্গে অন্য কিছুও খেয়েছিল। গন্ধে মনে হচ্ছে এটা আফিমের আরক। এটা যে বিষঘ্ন ঔষধ হয়ে দাঁড়াবে তা বোধ হয় ওর ধারণা ছিল না।'

'তাহলে ও কি বাঁচবে ডাক্তার?' মা জানতে চাইলেন।

'সম্ভাবনা আছে। তবে এক্ষুণি ওকে উট্রেক্ট-এ স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। ওকে অবজারভেশনে রাখা দরকার।'

'উট্রেক্ট-এর কোন হাসপাতালে ওকে ভর্তি করা সঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না, বরঞ্চ কোন নার্সিং হোম-এ ভর্তি করা ভাল। আমার জানা একটি নার্সিং হোমও আছে। গাড়িটা প্রস্তুত করতে বলুন। আইনহোভেন থেকে যে শেষ গাড়িটা ছাড়ে তা আমাদের ধরতেই হবে।'

ভিনসেন্ট নীরবে এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি ঠিক করে বাড়ির পিছন দরজায় আনা হল। ডাক্তার মারগটকে কম্বলে পেঁচিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। মা ও পাঁচবোন পিছন পিছন বেরিয়ে এল। ভিনসেন্ট সবার শেষে বেরুল। ভিনসেন্টের পরিবারের লোকেরা তাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। গ্রামের প্রায় সবাই এসে উপস্থিত হয়েছিল বোগিম্যান পরিবারের বাড়িতে। মারগটকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ডাক্তার যখন বেরিয়ে এলেন তখন একটা মৃত্যু নিশ্চলতা দেখা দিল। ডাক্তার ওকে গাড়িতে শুইয়ে দিলেন। মহিলারা গাড়িতে উঠলেন। ভিনসেন্ট পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার রাশ তুলে নিলেন। মারগটের মা ঘুরে ভিনসেন্টকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন, 'তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ, আমার মেয়েকে মেরে ফেলেছ।'

জনতা ভিনসেন্টের দিকে তাকাল। ডাক্তার ঘোড়াকে চাবুক মারলেন। গাড়িটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৭.

ভিনসেন্টের মা পায়ে ব্যথা পাবার পূর্বে গাঁয়ের লোকেরা ভিনসেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারে নি। কারণ তারা তাকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং তার জীবনের ধারা বুঝে উঠতে পারত না। তবে কোনদিন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নি। কিন্তু মারগট বিষ খাওয়ার পর তারা যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। প্রতি মুহূর্তে সে তাদের ঘৃণা রোষ উপলব্ধি করতে পারছিল। তাকে দেখে সবাই পেছন ফিরে থাকত। কেউ তার

সঙ্গে কথা বলত না। তাকে দেখলেই পথ থেকে সরে যেত। সে একটা অচ্ছুৎ হয়ে দাঁড়াল।

নিজের জন্য সে বিশেষ ভাবত না। কুঁড়ে ঘরের তাঁতি আর চাষাভূষার দল তাকে বন্ধু বলেই গ্রহণ করত। কিন্তু লোকজন যখন তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসা বন্ধ করে দিল তখন সে বুঝল এ স্থান তার ত্যাগ করতেই হবে।

চিরকালের জন্য ব্রাবান্ট পরিত্যাগ করে গিয়ে বাপমাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়াই যে তার পক্ষে শ্রেয় ভিনসেন্ট তা বুঝতে পারল। কিন্তু কোথায় যাবে সে? ব্রাবান্ট তার জন্মস্থান। সে তো চিরজীবন এখানেই বাস করতে চায়? সে চায় চাষীদের আর তাঁতির জীবন রঙে ফুটিয়ে তুলতে। এখানেই তো তার কাজের চরম সার্থকতা।

যাক, অতি সহজভাবে সে আপন সমস্যার সমাধান করল। অদূরে অবস্থিত ক্যাথলিক চার্চের পাশেই ছিল চার্চ রক্ষকের গৃহ। জোননা স্কফ্রুথ্ ওর নাম। চার্চ দেখাশোনা করতে না হলে সে দরজির কাজ করত। তার স্ত্রী এড্রিয়ানার প্রকৃত ছিল অত্যন্ত মধুর। সে ভিনসেন্টকে দুখানা ঘর ভাড়া দিল। সারা গাঁয়ের লোক যার বিরুদ্ধে লেগেছে তাকে সাহায্য করতে পেরে সে যেন কিছুটা খুশি হল।

স্কফ্রুথের বাড়িটার মাঝামাঝি দিয়ে একটি প্রশস্ত বারান্দা থাকায় বাড়িটা দুভাগে ভাগ হয়ে পড়েছিল। বাড়ির ডান দিকের অংশে স্কফ্রুথ পরিবার থাকত। বাঁ দিকে ছিল বড় একটা ঘর আর তার পেছনে ছোট আর একটা ঘর। এই বড় বসার ঘরটাই হল ভিনসেন্টের স্টুডিয়ো আর পেছনের ঘরটা হল তার স্টোর রুম। ভিনসেন্ট ঘুমতো উপরের তলার চিলে ঘরে।

জিনিসপত্র ও রঙচঙ গুছিয়ে নিয়ে সে আঁকতে আরম্ভ করে দিল।

মার্চ মাসে একদিন তার বাবা বহুদূরে গিয়েছিলেন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে। সেখান থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অকস্মাৎ পড়ে যান। অ্যানা কর্নেলিয়া যখন সেখানে এসে পৌঁছান তার আগেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে। ওঁকে পুরাতন চার্চের নিকটবর্তী বাগানে সমাধিস্থ করা হল। ঐ উপলক্ষে থিও বাড়িতে এসেছিল। সেদিন তারা ভিনসেন্টের স্টুডিয়োতে বসে আলাপ করছিল। প্রথমত পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল কিন্তু পরে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল।

'গুপিলদের ছেড়ে অন্য আর একটা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে মাসিক হাজার ফ্রাঙ্ক পেতে পারি।' থিও বলল।

'যোগ দেবে নাকি?'

'মনে হয় না। ওরা পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে লিখেছিলে যে গুপিলরা....'

'হ্যাঁ বারো বছর ধরে ওদের সঙ্গে আছি, সুতরাং কয়েকটা ফ্রাঙ্ক বেশি পেলেই ওদের ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে কি? একদিন ওঁরা আমাকে একটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার করে দেবে। যদি দেয় তবে আমি 'ইম্প্রেসনিস্টদের' ছবি বিক্রয় করতে আরম্ভ করে দেব।'

'ইম্প্রেসনিস্ট? এ শব্দটা কোথায় যেন ছাপার হরফে দেখেছি? কে তারা?'

'ওঃ! ওরা হচ্ছে প্যারিসেরই তরুণ চিত্রকরের দল, যেমন, এডওয়ার্ড ম্যানেট, দেগাস, বেনয়র, ক্লড মোনেট, সিসলি, কুরবেট, গগ্যাঁ, সিজানা, সুরাট।'

'এ নাম তারা কবে থেকে পেল?'

'১৮৭৪ সালে নাদারে যে প্রদর্শনী হয় তাতে। সে প্রদর্শনীতে ক্লড মোনেট একটা ছবি দেয়। ছবিটার নাম দিয়েছিল Impression : Soliel Levant. লুই লেরয় নামে জনৈক চিত্র সমালোচক এই প্রদর্শনীকে ইম্প্রেসনিস্টদের প্রদর্শনী বলে অভিহিত করেন। সেই থেকে এই নাম চালু হয়ে গেছে।'

'ওরা গাঢ় না হালকা রঙ নিয়ে কাজ করে?

'হালকা। গাঢ় রঙে কাজ করতে তারা অপছন্দ করে।'

'তবে তো ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। আমিও অবশ্য আমার রঙের ধারাটা পাল্টাতে চাই তবে আরও গাঢ় রঙ নিয়েই আমি কাজ করব।'

'প্যারিসে এলে তোমার ধারণার পরিবর্তন হবে।'

'হতে পারে। ওদের ছবি কি বিক্রি হচ্ছে?'

'ম্যানেটের ছবি কদাচিৎ বিক্রি হয়।'

'তাহলে ওদের চলে কি করে?'

'ভগবান জানেন। রুশো শুনেছি ছেলেমেয়েদেরকে ভায়োলিন শেখায়, গগ্যাঁ তার পুরোনো বন্ধুদের কাছে ধার নিয়ে চালায়। সুরাটকে তার মা এবং সিজানাকে তার বাবা পোষণ করেন। অন্যরা কোথা থেকে টাকা পায় তা আমি বলতে পারব না।'

'তুমি কি সবাইকে চেনো, থিও।'

'হ্যাঁ, ধীরে ধীরে সবার সঙ্গেই পরিচয় হচ্ছে। গুপিলদের দোকানের এককোণে ওদের ছবি রাখবার জন্যে বলেছিলাম, কিন্তু ওঁরা কাঠি দিয়েও ওদের ছবি ছুঁতে রাজি নন।'

'আমার মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার।'

'তবে প্যারিসে এসে আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকো'– সে বলল, 'নিশ্চয় সেখানে তোমার উন্নতি হবে।'

'কিন্তু এখনই যে যেতে পারছি না। এখানে যে আমার আরও কিছু কাজ করতে হবে।'

'এখানে পড়ে থাকলে তুমি নিজের সমাজের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাবে না।'

'সে কথা ঠিকই। কিন্তু, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমার একটা ছবিও তো তুমি বিক্রয় কর নি, কার্যত তুমি চেষ্টাও কর নি। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন চেষ্টা কর নি?'

'আমি তোমার ছবি অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পীদের দেখিয়েছি। ওঁরা বলেন .....'

'অভিজ্ঞ চিত্রশিল্পী' ভিনসেন্ট কাঁধ তুলে ঝাঁকুনি দিল। 'আমি ওদের জানি। ছবির সত্যিকারের গুণের সঙ্গে ওদের মতের যে পার্থক্য তা তোমার জানা উচিত, থিও।'

'থাক ও কথা। তোমার ছবি বিক্রী করা চলে কিন্তু ....'

'থিও, থিও, ইটেন থেকে তোমাকে আমার প্রথম আঁকা ছবিগুলো পাঠাবার পরও তুমি ঠিক এই কথাগুলোই আমাকে বলেছিলে।'

'কথাগুলো খুবই খাঁটি, ভিনসেন্ট। হাত পাকার আর যেন বাকি নেই তোমার। তাই প্রত্যেকটি নতুন ছবি আমি সাগ্রহে দেখি আর ভাবি এইবার বোধ হয় তুমি যশগৌরবের রাজ্যে পদার্পণ করলে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ....'

'ছবি বিক্রী হওয়া না হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না,' বাধা দিয়ে ভিনসেন্ট বলল—

'তোমার এখানে কাজ আছে বলেছিলে, তাড়াতাড়ি ওটা শেষ করে ফেল। কারণ যত তাড়াতাড়ি প্যারিস যেতে পারবে ততই তোমার পক্ষে ভাল। তবে এর মধ্যে তোমার ছবি বিক্রি হোক তা যদি চাও তবে স্টাডির পরিবর্তে পিকচার পাঠিও। স্টাডি আর লোকে চায় না।'

'স্টাডি আর পিকচারের মধ্যে সীমা টানা খুবই দুরূহ ব্যাপার। যাহোক, এসো আমরা যতটা ছবি আঁকি। 'আমরা' বলছি কারণ তুমি তোমার বহুকষ্টের উপার্জনের টাকা আমাকে দিচ্ছ সুতরাং আমার ছবি সৃষ্টির দায়িত্ব অর্ধেকটা তোমারও।'

'ওহ্, সে কথা!' থিও শুধু বলল।

৮.

পিতার মৃত্যুর পূর্বে ভিনসেন্ট মাঝে মাঝে খেতে বা গল্প করতে নিজেদের বাসায় আসত কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে মা ও বোনের ব্যবহারে সে বুঝতে পারল যে সেখানে যাওয়া ওরা পছন্দ করে না।

সে একেবারে নির্বান্ধব হয়ে পড়ল। একাকীত্ব যখন দুর্বহ হয়ে উঠত সে তখন ভাইসেনবুকের স্টুডিয়োর দৃশ্য এবং তীক্ষ্ণ রসনা চিত্রশিল্পী কর্তৃক বেদনা-স্বীকৃতির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করত। মিলেটেরে উক্তির মধ্যেই যেন সে ভাইসেনব্রুকের দর্শনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেত।

ডি গ্রুট নামক এক চাষী পরিবারের সঙ্গে তার ভাব হল। সে পরিবারে মা, বাবা, ভাই, দুই বোন ছিল এবং সকলেই মাঠে কাজ করত। তারা এক কোঠার একখানা কুড়েতে বাস করত। ঘরের মাঝে একটি টেবিল, দুটো চেয়ার, কয়েকটা বাক্স ছিল। ছাদ থেকে একটা বাতি ঝুলছিল।

ডি গ্রুট পরিবার ছিল আলুভোজী, মধ্যাহ্নভোজের সময় তারা এক কাপ করে কালো কফি খেত আর সপ্তাহে একদিন করে বোধ হয় শূকরের মাংস খেতো। তারা আলুর চাষ করত, আলু তুলত, আর আলু খেত, এই ছিল তাদের জীবন।

ঐ পরিবারের সতের বৎসর বয়স্কা স্টিয়েন ডি গ্রুট ভারি চমৎকার মেয়ে। হাসি তার মুখে লেগেই ছিল। ভিনসেন্ট আর ও প্রায়ই হাসত।

'চেয়ে দেখ', সে চেঁচিয়ে বলত, 'কেমন চমৎকার ভদ্রমহিলা হয়ে গেছি। এবার নতুন মস্তকাবরণটা পরব নাকি তোমার জন্যে, মিজনের?'

'না, না, এমনিতেই তোমাকে সুন্দর দেখা যাচ্ছে।'

'আমি সুন্দর!'

স্টিয়েন হো হো করে হাসতে লাগল। তার চোখ দুটো ছিল বড় বড় আর খুশির আমেজ লাগান। ভঙ্গিটাও তার সুন্দর। তার আননে ছিল প্রাণোচ্ছলতার ছাপ। সে যখন ঝুঁকে পড়ে মাঠ থেকে আলু তুলত তখন তার দেহের রেখায় যে সৌন্দর্য ফুটে উঠত ভিনসেন্টের মনে হয় কে'র দেহেও তা ছিল না। কোন কোন রবিবার পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে স্টিয়েন বেড়াতে বের হতো ভিনসেন্টের সঙ্গে।

'মারগট বেগিম্যান কি তোমাকে পছন্দ করত?' সে একদিন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।'

'তবে কেন সে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিল?'

'কারণ, পরিবারের লোকেরা আমাদের বিয়েতে সম্মতি দেবে না বলে।'

'মেয়েটি নিছক বোকা। ও অবস্থায় আমি কি করতাম জান? আমি তোমাকে আরও ভালবাসতাম।'

বলে হাসতে হাসতে সে পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে যেত। সারাদিন ধরে পাইন বনে চলত তাদের হাসি আর খেলা। ভ্রমণরত অন্য সব দম্পতির চোখেও তাদের চপলতা ধরা পড়ত। স্টিয়েন যেন একটা হাসির তুবড়ি— ভিনসেন্টের সামান্য কথা বা কাজেও সে হেসে গড়াগড়ি যেত। মাঝে মাঝে সে তার সঙ্গে হুটোপুটি খেলত, তাকে মাটিতে ফেলে দিতে চেষ্টা করত। ওর বাসায় বসে ভিনসেন্ট যে সব ছবি আঁকত তা যদি স্টিয়েনের ভাল না লাগত তবে সে তাতে কফি ঢেলে দিত বা আগুনে ফেলে দিত। প্রায়ই সে 'পোজ' দেবার জন্য ওর স্টুডিয়োতে আসত কিন্তু যখন সে সেখান থেকে চলে যেত মনে হত ঘরে যেন ঝড় বয়ে গেছে।

এদিকে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আবার শীতকাল এলো। তুষারের জন্য ভিনসেন্ট স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতে বাধ্য হল। কিন্তু পোজ দেওয়ার জন্য লোক পাওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কেউ আসতে চাইত না এ-কাজে। নিতান্ত পয়সার লোভ না দেখিয়ে কাউকে সংগ্রহ করা যেত না।

চার্চ রক্ষকের গৃহ যে কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়, ক্যাথলিক ধর্মযাজক তা পছন্দ করেন না, তবে ভিনসেন্ট বেশ শান্ত ও শিষ্ট বলে তিনি বিশেষ আপত্তি করেন নি। এর মধ্যে একদিন এড্রিয়ানা স্কক্রুথ উত্তেজিতভাবে ভিনসেন্টের স্টুডিয়োতে এসে ঢুকল। 'ফাদার পাওয়েলস এক্ষুণি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।'

ফাদার পাওয়েল ঘরে ঢুকে স্টুডিয়োতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'আপনার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি, ফাদার?' সে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

'তুমি আমার জন্যে কিছু করতে পার না, কিন্তু আমি পারি। তুমি যদি কথামত চল তবে আমি সব ব্যাপারটা ঠিক করে দিতে পারি।'

'কি ব্যাপারের কথা বলছেন, ফাদার?'

'মেয়েটি হচ্ছে ক্যাথলিক আর তুমি প্রোটেস্টান্ট, বাধা ওখানেই। যাক্ আমি বিশপের কাছ থেকে একটা বিশেষ সম্মতি আনিয়ে নেব। কয়েকদিনের মধ্যেই বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত হও।'

ফাদার পাওয়েলস-এর মুখটা ভালো করে দেখবার জন্যে ভিনসেন্ট আলোর ধারে এগিয়ে এল।

'আমি তে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না, ফাদার' সে বলল।

'বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছ, ভান করে কোন লাভ নেই । স্টিয়েন ডি গ্রুট সন্তান সম্ভবা! পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

'কি শয়তান মেয়ে।'

'তা বলতে পার। এ তো শয়তানেরই কীর্তি!'

'ও যে সন্তানসম্ভবা সে বিষয়ে আপনাদের কোন ভুল হয় নি, ফাদার?'

'পাকা প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি কাউকে দোষী করি না।'

'স্টিয়েন কি আপনাকে বলেছে–বলেছে যে– আমার দ্বারাই এ কাজ হয়েছে?'

'না, সে নাম বলতে রাজি হয় নি।'

'তবে ও সম্মান কেন আমার উপর আরোপ করছেন?'

'তোমাদের বহুবার একত্রে দেখা গেছে। বলত, ও কি প্রায়ই এখানে আসে না?'

'আসে।'

'রবিবার ওকে নিয়ে কি তুমি বেড়াতে যাও না?'

'যাই।'

'আর কি প্রমাণ চাও?'

ভিনেসেন্ট এক মুহূর্তে নীরব রইল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'এ সংবাদ শুনে বিশেষ করে আমার বন্ধু স্টিয়েনের সম্মুখ বিপদের কথা শুনে আমি সত্যি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, আমাদের সম্পর্ক ছিল নিন্দার উর্ধে।

'এটা আমি বিশ্বাস করব তাই কি তুমি মনে কর?'

'না, তা করি না,' ভিনসেন্ট জবাব দিল।

সেদিন সন্ধ্যায় ভিনসেন্ট গিয়ে দেখা করল স্টিয়েনের সঙ্গে।

'শীঘ্রই আর একজনকে উপহার দেব তোমাকে আঁকার জন্যে,' স্টিয়েন বলল।

'তাহলে সব সত্য, স্টিয়েন?'

'সত্যি। দেখতে চাও?'

ভিনসেন্টের হাত নিয়ে স্টিয়েন নিজের তলপেটে স্পর্শ করাল।

'ফাদার পাওয়েলস বলছিলেন আমিই নাকি অনাগত শিশুর পিতা।'

স্টিয়েন হাসল। 'তুমি হলে ভালই হত। কিন্তু তুমি তো কখনও চাওনি, চেয়েছিলে কি?'

'তাহলে মন্দ হত না, স্টিয়েন।'

'তা ফাদার পাওয়েলস তোমার উপর দোষ চাপিয়েছে,, ভারি মজার কিন্তু।'

'মজাটা কিসের?'

'কথাটা গোপন রাখবে?'

'রাখব।'

'দায়ী হচ্ছে চার্চের kirkmeester.'

ভিনসেন্ট শিস দিল।'এ কথা কি তোমার পরিবারের লোকেরা জানেন?'

'নিশ্চয় না এবং বলবও না। কিন্তু ওরা জানে যে, এর জন্যে দায়ী তুমি নও।'

ভিনসেন্ট ঘরের ভিতর ঢুকল। সবাই তাকে পূর্বের মতই গ্রহণ করল কারণ তার নির্দোষিতায় ওরা বিশ্বাস করত কিন্তু গ্রামবাসী করল না। এড্রিয়ানা স্কফ্রথের মারফৎ সকলে জেনে ফেলল ওদের কাহিনী। গ্রামবাসী আরও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠল। এবার তাকে চলে যেতে হবে। ন্যুনেন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে।

এর মধ্যে এড্রিয়ানা এসে জানিয়ে গেল যে, অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করবার জন্যে ফাদার পাওয়েলস বলেছেন। সে শুনল তারপর গম্ভীরভাবে স্টুডিয়োতে ঘুরে বেড়াল। মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ঘুরতে ঘুরতে এবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাল। মাস শেষ হতে এখনও বারো দিন বাকি। সে এড্রিয়ানাকে ডাকল।

'শুনুন, ফাদার পাওয়েলসকে বলবেন যে, আমি পয়লা তারিখ পর্যন্ত ভাড়া দিয়েছি, সুতরাং তার আগে বাড়ি ছাড়ব না।'

সে ইজেল, রঙ, ক্যানভাস, তুলি ইত্যাদি নিয়ে ডি গ্রুটের বাসার দিকে রওনা হল। তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। সে সেখানে বসে আঁকতে শুরু করল। তারপর স্টুডিয়োতে ফিরে এসে সারা রাত ধরে কাজ করল, পরে সারাদিন ঘুমাল। জেগে উঠে পরম বিরক্তিতে ছবিটা পুড়িয়ে ফেলল। পরে আবার ডি গ্রুটের বাড়ির দিকে রওনা হল।

'ফাদার পাওয়েলস আজ এখানে এসেছিলেন'– স্টিয়েনের মা বললেন।

'কেন এসেছিলেন?' ভিনসেন্ট জানতে চাইল।

'আমরা তোমার ওখানে 'পোজ' না দিতে রাজি হলে তিনি টাকা দেবেন বলেছেন।'

'আপনারা কি বললেন?'

'তুমি যে আমাদের বন্ধু তা ওকে জানিয়ে দিয়েছি।'

'তিনি আশে পাশের সব বাড়িতেই গিয়েছিলেন'– স্টিয়েন বলল, 'কিন্তু তারা সবাই ওকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ওঁর দান নেওয়ার চেয়ে একটা টাকা পেলেই তারা পোজ দিতে রাজি হবে।'

প্রতি রাত্রেই সে, ডি গ্রুটের ওখানে যেতে লাগল এবং ঘুমে ঢলে না পড়া পর্যন্ত ছবি আঁকতে লাগল। কিন্তু কোন ছবিই সম্পূর্ণ হয়ে উঠল না। নানাভাবে চেষ্টা করেও সে ত্রুটিহীন ছবি আঁকতে পারল না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল।

মাসের শেষ দিন এসে পড়ল। ভিনসেন্ট উন্মত্তের মত ছবি এঁকে যাচ্ছিল। আহারও নিদ্রা তার ঘুচে গিয়েছিল । একটা অস্বাভাবিক শক্তির উপর যেন সে বেঁচে ছিল। প্রতিবারে ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেদিন ইজেল ইত্যাদি নিয়ে সে প্রস্তুত হয়েছিল। ডি গ্রুটরা ক্ষেত থেকে ফিরতেই সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। এই তার শেষ সুযোগ। প্রাতেই সে চিরকালের জন্য ব্রাবান্ট পরিত্যাগ করছে।

ঘন্টার পর ঘন্টা সে কাজ করে যেতে লাগল। ডি গ্রুট পরিবারের লোকেরা অবস্থাটা বুঝতে পারল। নৈশাহার শেষ করেও তারা টেবিলে বসে আলাপ করতে লাগল। কি যে আঁকছে ভিনসেন্ট তা জানে না, তবু সে এঁকে যাচ্ছে। কোন কিছু চিন্তা করবার বা কল্পনা করবার সময়ও যেন তার নেই। দেখতে দেখতে দশটা বেজে গেল। ডি গ্রুট পরিবারের লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল। পরিশ্রান্ত ভিনসেন্ট ইজেল নিয়ে স্টিয়েনকে চুম্বন করে সবার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

স্টুডিয়োতে এসে পাইপ জ্বেলে ক্যানভাসের দিকে তাকাল। নাঃ, সবটাই ভুল হয়েছে। সে আসল জিনিসটি ধরতে পারে নি। ব্যর্থ হয়েছে সে। ব্রাবান্টে দু বছর ধরে সে যে চেষ্টা করেছে সবই বিফলে গেল।

কিছুক্ষণ পাইপ টানল। তারপর ব্যাগে সব ভরল। দেয়াল থেকে ছবিগুলো নামিয়ে একটা বড় বাক্সে ভরল। তারপর কোণে শুয়ে পড়ল। কতক্ষণ যে শুয়েছিল তা সে জানে না। উঠে রঙ মিশিয়ে আবার সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল।

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠল। জানালা পথে একটুকরো আলো এসে পড়ল স্টোর রুমে। ভিনসেন্ট টুল থেকে উঠে পড়ল। একটা প্রশান্তি সে অনুভব করছিল। বারো দিনের উত্তেজনা তখন আর ছিল না। সে নিজের কাজের দিকে তাকাল। আজ তার প্রার্থিত বস্তু সে পেয়ে গেছে। ব্রাবান্টের চাষীরা শাশ্বত হয়ে রইল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

একটি ডিমের শ্বেত অংশ দিয়ে সে ছবিটা ধুয়ে ফেলল। সে ছবি আঁকার সরঞ্জাম মায়ের কাছে রেখে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করল। স্টুডিয়োতে ফিরে এসে ছবির নিচে লিখল 'দি পটেটো ইটার্স।' এর সঙ্গে আরও ভালো কয়েকটা স্টাডি নিয়ে সে প্যারিস যাত্রা করল।

প্যারিস

১.

'তাহলে তুমি আমার শেষ চিঠি পাও নি?' পরের দিন প্রাতে কফি ও রুটি খেতে খেতে থিও তার দাদাকে জিজ্ঞাসা করল।

'না তো; কি ছিলো চিঠিতে?' ভিনসেন্ট বলল।

'গুপীলদের ওখানে আমার যে পদোন্নতি হয়েছে, সে সংবাদ ছিলো চিঠিতে।'

'কই কাল তো এ সম্বন্ধে কিছুই বললে না।'

'শোনার মত মনের অবস্থা কাল তোমার ছিলনা। বুলোভার মণ্টমার্টি গ্যালারির চার্জ আমি পেয়েছি।'

'চমৎকার হয়েছে, থিও। একটা আর্ট গ্যালারির মালিক হলে তুমি, বা।'

'আরে ও তো সত্যিকারের আমার নয়, ভিনসেন্ট। গুপীলদের ব্যবসায় নীতি আমাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। তবে ইম্প্রেসনিস্টদের ছবি প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছে তারা, তাই.....'

'কার কার ছবি রাখবে?'

'মোনেট, দেগা, পিসারো, ম্যানেট প্রভৃতির।'

'ওদের নাম তো শুনিনি কখনও।'

'বেশ ত চলো না, ওদের ছবিগুলো ভাল করে দেখে আসবে গ্যালারি থেকে।'

'তোমার ঠোঁটের ঐ বাঁকা হাসিটির অর্থ কি থিও?'

'আরে, ও কিছু না। আর কফি লাগবে? আমাদের কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরুতে হবে। আমি ভোরবেলা হেঁটেই অফিস যাই।'

'এক কাপ চাই না, আধ কাপ হলেই চলবে। তোমার সঙ্গে বসে প্রাতরাশ খেতে বেশ লাগছে।'

'আমি অনেকদিন থেকেই তোমর প্যারিসে আসার অপেক্ষা করছিলাম। এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে। তবে জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হত। কারণ সে সময় আমি রু্য লেপিক যাব। সেখানে আমাকে বেশ বড় তিনখানা ঘর দেওয়া হবে। এখানে ঘরের যা অবস্থা, তোমার কাজের অসুবিধা হবে।'

ভিনসেন্ট চেয়ারে বসেই চারদিকে তাকাতে লাগল। একটা ঘর, ছোট একটা রান্নাঘর, এবং আরও ক্ষুদ্র কক্ষ—এই হল থিও'র থাকার জায়গা। সুন্দর আসবাব দিয়ে ঘরটা সাজান সত্য, কিন্তু তাতে নড়াচড়া করার জায়গা আর নেই।

'ঠিকই বলেছ,' ভিনসেন্ট বলল, 'ইজেলটা দাঁড় করালে তোমার সুন্দর আসবাবের কতকগুলোকে বাইরে সরিয়ে রাখতে হবে।'

'ঘরে জায়গা হবে না জেনেও আমি এগুলো কিনেছি। সস্তা পাওয়ায় আসবাবগুলো হাতছাড়া করতে আমি রাজি ছিলাম না। তাছাড়া নতুন বাড়িতে এগুলো খুব মানাবে। চল বাইরে থেকে বেরিয়ে আসি।' থিও সাজ পোষাক করে বেরিয়ে এল।

'হয়েছে তোমার ভিনসেন্ট? ওমা, একি দেখাচ্ছে তোমাকে? এ পোষাক পরে যদি তুমি প্যারিসের পথে বেরোও তবে নিশ্চয় তুমি গ্রেপ্তার হবে।'

'কি দোষ হয়েছে আমার পোষাকে?' বলে ভিনসেন্ট নিজের দিকে তাকাল।'আমি দু'বছর ধরে এ পোষাকই পরছি, কই কখনও তো কেউ কিছু বলে নি।'

থিও হাসল। 'যাকগে তোমার মত লোক দেখে প্যারিসবাসীরা অভ্যস্ত। আজ রাতে দোকান বন্ধের পর তোমাকে নিয়ে নতুন কাপড়চোপড় কিনে দেওয়া যাবে।'

তারা হাঁটতে হাঁটতে রুা লাভালে এসে পৌঁছল।

'বাড়িটার চতুর্থ তলার সুন্দর মেয়ে তিনটিকে দেখছ', থিও বলল।

ভিনসেন্ট উপর দিকে এগিয়ে প্যারিস প্লাস্টারে তৈরি তিনটি বাস্ট দেখতে পেল। প্রথমটির নিচে লেখা ছিল ভাস্কর্য, দ্বিতীয়টির নিচে স্থাপত্য এবং তৃতীয়টির নিচে লেখা ছিল চিত্রশিল্প।

'ওই মেয়েটিকে চিত্রশিল্পের রূপক বলে ঠিক করা হল কেন?'

'সে আমি জানি না। চল, আমরা ঠিক বাড়ির কাছে এসে গেছি।'

তারা বাড়িটা ঘুরে রাস্তায় নেমে এল। প্রভাতের সূর্যালোকে সারা পথ ঝলমল করছে। কর্মব্যস্ত জনতা চলেছে পথ দিয়ে। ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ হয়ে গেছে দিনের আগমনে।

ভিনসেন্ট গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল।

'এই -ই হচ্ছে প্যারিস।' সে বলল।

'হ্যা, এই প্যারিস। ইউরোপের রাজধানী, বিশেষ করে আর্টিস্টের কছে।'

সারা পথে কর্মব্যস্ততা। ভিনসেন্ট যেন জীবনস্রোতের মদিরা পান করল। আশেপাশের দোকান, কাফে প্রভৃতি দেখতে দেখতে তারা হাঁটতে লাগল। প্রত্যেকটি দরজায় যা লেখা ছিল ভিনসেন্ট নজর দিয়ে তা দেখতে লাগল।

'এই কি প্যারিসের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা নাকি, থিও?'

'বোধহয়। তৃতীয় রিপাবলিক হয়ত স্থায়ী হবে। রাজতন্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়েছে, সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতায় আসছে। এমিল জোলা সেদিন রাতে আমাকে বলছিল যে পরবর্তী বিপ্লব রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হবে।'

'জোলা! ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, থিও?'

'পল সিজানা আমাকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সপ্তাহে একবার করে আমরা কাফে বাটিজোলাতে মিলিত হই। পরের দিন যখন ওখানে যাব, তখন তোমাকে নিয়ে যাব।'

প্লেস চ্যাটুর্ডু ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগুতেই পথের চাকচিক্য হ্রাস পেল। মনে হল সর্বসাধারণের চলার পথে যেন তারা এসে দাঁড়িয়েছে।

'বাড়িতে বসে যখন তোমার কাজ করার সুবিধা নেই, তখন আমার মনে হয় তুমি কোরম্যানের স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করতে পার। 'থিও বলল।

'কেমন জায়গা ওটা?'

'অন্য সব শিক্ষকের মত কোরম্যানও একাডেমিক; তবে তুমি তার সমালোচনা যদি পছন্দ না কর, সে কিছুই বলবে না।'

'খরচ লাগবে নাকি বেশি?'

থিও তার হাতের ছড়িটা ভিনসেন্টের উরুতে স্পর্শ করল।

'আমার যে পদোন্নতি হয়েছে, সেকথা বুঝি তোমার মনে নেই। জোলা তার পরবর্তী বিপ্লবে যেসব প্লুটোক্র্যাটদের উচ্ছেদ করতে চায়, আমি তা তাদেরই একজন হতে যাচ্ছি।'

অবশেষে তারা বুলভার মন্টমার্টিতে না এসে, বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোতে সেলসম্যানরা তাদের দোকান সাজাতে ব্যস্ত ছিল।

থিও যে ব্রাঞ্চের মালিক, গুপীলদের সে গ্যালারিটা ছিল ১৯ নং ব্লকে। ভিনসেন্ট ও থিও প্রশস্ত পথ অতিক্রম করে গ্যালারিতে প্রবেশ করল।

থিওকে দেখে কেরানীরা শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করল। ভিনসেন্টের মনে পড়ল, সে যখন কেরানী ছিল, তখন টারগিস্টও বার্ককে দেখলে কেমন করে মস্তক অবনত করত। স্যালং-এর দেওয়ালে বোগেরা, হেনার, দেলাক্রো প্রভৃতির পেন্টিং টাঙান ছিল। প্রধান স্যালং-এর উপরে একটা ছোট ব্যালকনি ছিল।

'যেসব তুমি দেখতে চেয়েছিলে তা ঐখানে টাঙান রয়েছে,' থিও বলল।

'দেখে আসি।'

'দেখে তোমার কেমন লাগে আমাকে বলো।'

২.

'আমি কি পাগলা গারদে এলাম?'

ভিনসেন্ট একটা চেয়ারে বসে পড়ে নিজের চোখ দুটো রগড়াল। বারো বৎসর বয়স থেকে সে কালো ও ভাবগম্ভীর পেন্টিং দেখতেই অভ্যস্ত। তার দেখা সব পেন্টিং-এর ব্রাসের কাজ ছিল অদৃশ্য, ক্যানভাসের প্রতিটি কাজ হত নিখুঁত আর সম্পূর্ণ, বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ ছিল চমৎকার।

কিন্তু দেওয়ালের যে সমস্ত ছবিগুলো তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে হাসছিল, সেরকম ছবি সে কোনদিন দেখে নি অথবা কল্পনা করে নি। মসৃণ পাতলা পৃষ্ঠদেশের কোন চিহ্ন নাই। অনুভূতিশীল গাম্ভীর্যেরও কোন স্ফুরণ নাই। বহু শতাব্দী ধরে সে রসধারা ইউরোপের চিত্রশিল্পকে সিক্ত করেছিল, ওখানে তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। প্রতিটি ছবিতে রয়েছে যেন দ্বিপ্রহরের সূর্যের প্রখরতা;আলো, হাওয়া আর প্রাণ চাঞ্চল্যের উচ্ছলতা। লাল, সবুজ আর নীল রঙের সংমিশ্রণে আঁকা ব্যালে গার্ল ছবিটার দিকে সে তাকাল। স্বাক্ষর দেখল 'দেগাস' নামক কোন চিত্রকরের। অপর আর একটি চিত্রের নিচে চিত্রকরের নাম লেখা রয়েছে মোনেট বলে। ভিনসেন্ট এর আগে হাজারো ছবি দেখেছে, তাতে এই উজ্জ্বল ছবিগুলোর মত ঔজ্জ্বল্য, সৌরভ আর সৌগন্ধ্য ছিল না। মোনেট যে গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছিল, তা অনেক ছবির হালকা রঙ থেকে বহু গুণে হালকা।

ভিনসেন্ট আর একটা ছবির সম্মুখে এসে দাঁড়াল, ভিনসেন্ট চিত্রকরের নামটা দেখল।

'আরে এ-ও যে মোনেট-এর আঁকা ছবি দেখছি?' সে উচ্চকণ্ঠে বলল, ভারি মজার ছবি তো। এ ছবিটার সঙ্গে আগের ছবিটার তো কোন সাদৃশ্যই নেই।'
সে নামটার দিকে আবার তাকাল। না, সে ভুল করেছে। নামটা হচ্ছে ম্যানেট, মোনেট নয়। ম্যানেটের ছবি 'Picnic on the Grass' ও 'Olympia' নিয়ে যে হাঙামা হয়েছিল, ভিনসেন্টের তা মনে পড়ল।

ম্যানেটের ছবি দেখে কেন জানি না ভিনসেন্টের মনে পড়ল এমিল জোলার বইয়ের কথা। সে তীক্ষ্ণভাবে ছবির টেকনিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। দেখল ম্যানেট মূল রঙগুলোই কোন স্তরবিন্যাস না করে ব্যবহার করেছে। কতকগুলো বিন্যাসের কেবলমাত্র আভাস দিয়েছে আর রঙ, রেখা, আলো এবং ছায়া সূক্ষ্ম বিভাগে সমাপ্ত না হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

মভের কথাগুলো তার মনে পড়ল।'রেখা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা তোমার পক্ষে কি অসম্ভব ভিনসেন্ট?'

ভিনসেন্ট চেয়ারটিতে আবার বসে পড়ল। কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা করার পর সে বুঝতে পারল, কি করে অঙ্কন ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। কারণটা ধরতে পেরে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে যে কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে এল, থিও তখন প্রধান অভ্যর্থনা কক্ষে বসেছিল। ভাইকে নেমে আসতে দেখে সে হাসিমুখে পেছন ফিরল, কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ভিনসেন্টে।'

'ওঃ থিও।' ভিনসেন্টে নিঃশ্বাস নিল।

সে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। উপরের ছবিগুলোর দিকে সে একবার তাকাল তারপর ছুটে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে চলতে চলতে সে একটা অপেরার সম্মুখে এসে থেমে পড়ল। বাড়িটার পাশ দিয়ে তাকাতেই তার চোখে পড়ল একটা সেতু। দেখে সে নদীর দিকে এগুতে লাগল সম্মুখ দিকে। সে যে একটা সমাধিক্ষেত্র অতিক্রম করে এসেছে তা ভুলে গিয়ে একজন পুলিশ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করল র‍্যু লাভালে যাবার পথ।

'র‍্যু লাভাল যাবেন?' পুলিশ প্রহরী বলতে লাগল, 'আপনি ভুল পথে এসেছেন মঁশিয়ে। এটা মন্টপারসে। আপনাকে সেই নদী পার হয়ে মন্টমার্টির পথ ধরতে হবে।'

কয়েক ঘণ্টা ধরে সে অনিশ্চিতভাবে প্যারিসের পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দোকানপাট সজ্জিত প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, অপরিচ্ছন্ন গলি-ঘুঁজি আর অসংখ্য সরাবের দোকান ভর্তি বুর্জোয়া রাস্তা সে অতিক্রম করে চলল। চলতে চলতে একবার সে একটা ছোট পাহাড়ের শিখরে এসে উপনীত হল। নিচের দিকে তাকাতে তার চোখে পড়ল এক প্রশস্ত রাজপথ আর বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী।

র‍্যু লাভাল খুঁজে পেতে তার প্রায় দিন শেষ হয়ে এল। শ্রান্তিতে তার দেহ যেন ভেঙে পড়ছিল। কক্ষে প্রবেশ করেই সে নিজের আঁকা ছবিগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে রাখল।

নিজের আঁকা ছবিগুলোর দিকে সে তাকাল। হা ভগবান। এগুলো যেন চেতনাহীন, মৃত। সে যেন বহু শতাব্দী পুরাতন ধারা ধরে চলেছে, অথচ সে তা জানে না।

সাঁঝবেলায় বাড়ি ফিরে এসে থিও দেখল ভিনসেন্ট কেমন অবসন্নভাবে মেঝেতে বসে আছে। সে তার ভাইয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ঘরের শেষ দিনের আলোটুকু মুছে গিয়েছিল। থিও কিছুক্ষণ নীরব রইল।

'তোমার কি রকম লাগছে, আমি তা বুঝতে পারছি ভিনসেন্ট,' সে বলল,'বিহ্বল হয়ে পড়েছ বুঝি। সত্যি এগুলো আশ্চর্যজনক, তাই না? অঙ্কন পদ্ধতিতে যা ছিল পবিত্র, আমরা তার সবটুকু সরিয়ে দিয়েছি, তাই না?'

ভিনসেন্ট থিওর চোখে তাকিয়ে রইল।

'কেন তুমি একথা আগে বল নি? কেন আগে আমি জানতে পারি নি? কেন তুমি আমাকে আগে এখানে নিয়ে আস নি? ছয়টা ব'সর আমার অযথা নষ্ট হয়ে গেছে।'

নষ্ট হয়ে গেছে! বাজে কথা, তুমি নিজের ধারাকে আবিষ্কার করেছ। তুমি কারু অনুকরণ কর নি,এঁকেছ ঠিক ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের মত। নিজের ধারাকে আবিষ্কার করার পূর্বে যদি তুমি এখানে আসতে, তাবে প্যারিসের রীতিই তোমাকে পেয়ে বসত।

'কিন্তু আমার কি হবে? দেখনা এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে? বলে সে পা দিয়ে একটা বড় কালো ক্যানভাস এগিয়ে দিল। সবগুলো প্রাণহীন হয়েছে থিও, একেবারে পদার্থহীন।'

'কি করবে তাই আমাকে জিজ্ঞেস করছ না? বেশ, শোন তবে। ইমেপ্রসনিস্টদের কাছ থেকে আলো আর রঙের ব্যবহারটা শিখে নাও, ভেসে যেও না। প্যারিস যেন তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।'

'কেবলমাত্র আলো আর রঙ ছাড়া.....তুমি যা কর সবই শুদ্ধ। বোরিনেজে প্রথম যেদিন পেন্সিল ধরেছিলে সেদিন থেকেই তুমি ইম্প্রেসনিস্ট হয়েছ। তোমার ড্রয়িং-এর দিকে তাকাও। তাকাও তোমার তুলির কাজের দিকে। ম্যানেটের পূর্বে অমনটি কেউ আঁকতে পারে নি। তোমার রেখাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো কেমন যেন অব্যক্ত, অস্ফুট। তোমার আঁকা মানুষের মুখ, গাছ এবং মাঠের মধ্যকার মানুষের মূর্তিগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলোই হচ্ছে তোমার ইম্প্রেশন। ওগুলো অসংস্কৃত, অসম্পূর্ণ, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বে শোধিত। এই হচ্ছে ইম্প্রেসনিস্টদের সংজ্ঞা কারুর অনুকরণ করবে না, নিয়মকানুনের দাম হবে না। ভিনসেন্ট, তুমি তোমার যুগের মানুষ, তুমিও একজন ইম্প্রেসনিস্ট–চাই তুমি পছন্দ কর আর নাই কর।'

'আমার চাওয়া না চাওয়া আর কি?'

'প্যারিসের তরুণ চিত্রকর মহলে তোমার ছবি পরিচিতি লাভ করেছে। না, না, যাঁদের ছবি বিক্রয় হয়, তাঁদের কথা আমি বলছি না। যারা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিযুক্ত আছে, তাঁদের কথাই বলছি। তাঁরা তোমাকে জানতে চায়। তুমিও তাঁদের কাছ থেকে অনেক বিস্ময়কর জিনিস জানতে পারবে।'

'তাঁরা আমার, ছবি দেখেছে?ঐ তরুণ ইম্প্রেসনিস্টরা আমার কাজ দেখেছে?'

থিওকে যাতে ভাল করে দেখতে পারে,সেজন্য ভিনসেন্ট হাঁটু গেড়ে বসল। জুন্ডার্টে যখন দুই ভাই একসঙ্গে লেখা পড়া করত থিওর মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলোর কথা।

'নিশ্চয়, তা নইলে এতদিন প্যারিসে বসে আমি কি করলাম? তাঁদের ধারণা তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর হাত তোমার শিল্পীর। এখন তোমার কাজ হচ্ছে সজীব সুন্দর ছবি কি করে আঁকা যায় তা আয়ত্ত করা। জগতে যখন বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটছে তখন বেঁচে থাকা কি আশ্চর্যজনক নয়, ভিনসেন্ট?'

'থিও।'

'এবার ওঠো দেখি চল কাপড় ছেড়ে খেয়ে আসি। আমি তোমাকে নিয়ে ব্রেসারি ইউনিভারস্যাল এ যাব। চমৎকার খানা মেলে সেখানে। চল যাই।'

৩.

পরের দিন ভিনসেন্ট আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে কোরম্যানের ওখানে চলে গেল। চারতলায় বিরাট একটা ঘরে স্টুডিয়োটা অবস্থিত ছিল। উত্তর দিক থেকে প্রচুর আলো কক্ষে এসে পড়ছিল। ঘরের এক কোণে একটি নগ্ন পুরুষ মডেল ছিল। ছাত্রদের জন্য প্রায় ৩০টি চেয়ার ও ইজেল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। ভিনসেন্ট কোরম্যানের সঙ্গে আলোচনা করার পর একটা ইজেল পেল।

প্রায় এক ঘণ্টা ছবি আঁকার পর হলের দোর ঠেলে একটি মহিলা প্রবেশ করলেন। তাঁর মাথায় একটি ব্যান্ডেজ বাঁধা। এক হাত দিয়ে তিনি চোয়াল ধরেছিলেন। বস্ত্রহীন মডেলের দিকে তাকিয়ে তিনি ভীত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান!' তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভিনসেন্ট পাশের লোকটির দিকে ফিরল।

'মেয়েটির কি ব্যাপার বলুন তো?

'অমনি প্রত্যেক দিনই হয়। সে পাশের কামরার দাঁতের ডাক্তারের খোঁজে এসেছিল। নগ্ন মানুষ দেখে ভয়েই তার দাঁতের ব্যথা সেরে গেছে। বেচারী ডেসিন্ট যদি এ-বাড়ি থেকে সরে না পড়ে তবে আর তার ব্যবসা করে খেতে হবে না। আপনি তো এখানে নতুন এসেছেন দেখছি?

'হ্যাঁ। তিনদিন হয় আমি প্যারিস এসেছি।'

'কি নাম আপনার?'

'ভ্যান গোঘ্ ।আপনার নাম?'

'হেনরি টুলো-লুট্রেক। থিয়ো ভ্যান গোঘ্ কি আপনার আত্মীয়?'

'আমার ভাই।'

'তাহলে আপনিই ভিনসেন্ট! আপনার সঙ্গে পরিচয়ে খুশি হলাম। আপনার ভাই তো প্যারিসে সর্বোৎকৃষ্ট ছবি ব্যবসায়ী। একমাত্র তিনিই তরুণ চিত্রকরদের সাহায্য করছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের হয়ে লড়াই করছেন। প্যারিসের জনগণ যদি আপনাকে গ্রহণ করে তবে তা একমাত্র আপনার ভাইয়ের দ্বারাই সম্ভব হবে। আমরা তাকে শক্তিশালী বলেই মনে করি।'

'আমিও।' বলে ভিনসেন্ট বক্তাকে একবার ভাল করে দেখে নিল।

'এমন জঘন্য জায়গায় আপনি এলেন কেন? লট্রেক জিজ্ঞাসা করল।

'ছবি আঁকার জন্যে একটা জায়গা তো আমার চাই। কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

'আমি গতমাসে একটা বেশ্যাবাড়িতে ছিলাম। সেখানে মেয়েদের পোর্ট্রেট এঁকেছি। বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে। স্টুডিয়োতে বসে আঁকা ছেলেখেলার সামিল।'

'আমি আপনার স্টুডিয়োটা দেখতে চাই।'

'সত্যি যাবেন?'

'কেন যাবো না?'

'সবাই আমাকে পাগল মনে করে, কারণ আমি ছবি আঁকি নাচুনে মেয়ের, ভাঁড়ের আর বেশ্যার। কিন্তু ওখানেই সত্যিকারের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাই না?'

'সে আমি জানি। আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করেছিলাম।'

'সাবাস! ওদের যে সব ছবি এঁকেছেন আমাকে একবার দেখাবেন কি?'

'চারখানা এঁকেছি। এই নিন।'

লট্রেক ছবিগুলো দেখে নিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আমরা দুজন একসঙ্গে চলতে পারব। কারণ একই ধারায় আমরা চিন্তা করি। এগুলো কি কোরম্যান দেখেছে ?

'না।'

'দেখলেই কিন্তু আপনার দফা শেষ। মানে এমন সমালোচনা করবে যা বলার নয়। সেদিন ও আমাকে বলেছিল, 'লট্রেক তুমি কেবলই বাড়িয়ে বল। তোমার স্টাডির প্রত্যেক রেখাই একটা ক্যারিকেচার।'

'জবাবে আপনি নিশ্চয়ই বলেছেন, প্রিয় কোরম্যান ওটা ক্যারিকেচার নয়, ওটাই জীবন।' লট্রেকের ছুঁচলো চোখে একটা অদ্ভুত আলো ফুটে উঠল।

'এখানে কি আমার আঁকা ছবিগুলো দেখার আকাঙ্ক্ষা আপনার আছে?'

'নিশ্চয়।'

'চলুন তবে। এটা যেন মর্গ, আর ভাল লাগে না।'

তারা ক্লিচির পথ ধরে চলতে লাগল। লট্রেক তার লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল । মাঝে মাঝেই তাকে থামতে হচ্ছিল।

আমার পায়ে কি হয়েছে, নিশ্চয় আপনি তা ভাবছেন ভ্যান্ গোঘ্ । সবাই তা ভাবে। শুনুন বলছি আপনাকে।

থাকগে ও কথা।

'না, না, জেনে রাখ তুমি।' লাঠির উপরে আরও ভর দিয়ে সে বলল,'বারো বছর বয়সে পড়ে গিয়ে ডান উরুর হাড় ভেঙে ফেলি। পরের বছর একটা গর্তে পড়ে গিয়ে বাঁ পায়ের হাড় ভেঙে যায়। এর পরে আমার পায়ের হাড় আর এক ইঞ্চিও বাড়ে নি।'

'ভারি দুঃখ তোমার, না?'

'উঁহুঃ এনা হলে আমি তো চিত্রকর হতে পারতাম না। আমার বাবা হচ্ছেন টুলোর একজন কাউন্ট।এর পরে আমার কাউন্ট হবার কথা।.... কিন্তু চিত্রকর হতে পারলে কে কাউন্ট হতে চায় বলত?'

'ঠিক, কাউন্টদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।'

'এই যে এসে গেছি। বুঝতেই পারছ নিচের তলাতেই আমি থাকি।'

সে দরজা খুলে ভিনসেন্টকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত করল।

'আমার এখানে আর কেউ নেই।' সে বলল।

ভিনসেন্ট চারদিকে তাকাল। ছবি আঁকার নানা জিনিসে সমস্ত ঘরটা ভর্তি। ঘর জোড়া দুটো টেবিলের উপরও মদের বোতল, মেয়েদের কাপড়চোপড়, জুতা, ফটো ইত্যাদি রয়েছে। এর মধ্যেই ছোট্ট একটি জায়গায় বসে লট্রেক ছবি আঁকত।

'ব্যাপার কি ভ্যান গোঘ?' সে জিজ্ঞেস করল,'বসার কোন জায়গা পাচ্ছ না? চেয়ারের উপর থেকে ওসব ফেলে দিয়ে ওটা জানালার ধারে টেনে নিয়ে এসো। এ বাড়িতে ২৭ জন মেয়ে থাকে। আমি সবার সঙ্গেই ঘুমুই। কোন মেয়েকে ভাল করে বুঝবার আগে তার সঙ্গে ঘুমান যে প্রয়োজন তা কি তুমি স্বীকার কর?'

'হ্যাঁ, করি।'

'এই দেখ স্কেচ। আমি ওগুলো একজন ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, 'লট্রেক এইসব দুষ্ট প্রকৃতির অসৎ চরিত্র মেয়েলোকদের ছবিই আপনি কেন আঁকেন বলুন তো? নিকৃষ্ট জীব এই মেয়েগুলো। সবার মুখে এদের কুশ্রী জীবনের কাহিনী আঁকা। কুৎসিত জিনিস আঁকাই কি আধুনিক আর্ট? আপনারা চিত্রকরেরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কি এতই অন্ধ হয়ে গেছেন যে হীন জিনিস ছাড়া আর কিছুই আপনাদের চোখে পড়ে না? আমি বললাম, 'ক্ষমা করবেন আপনার ঐ সুন্দর কার্পেটে আমন রূপ আমি ফুটিয়ে তুলতে পারব না, আলো কি ঠিক আছে ভ্যান গোঘ, কিছু পান করবেন? কোন পানীয় চাই। সবই আমার আছে।' বলে সে তাকে পানীয় এনে দিল। ভিনসেন্ট গ্লাসে চুমক দিতে দিতে ওগুলো দেখতে লাগল।

'কৃষকদের ছবি তোমার কেমন লাগে লট্রেক?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'মন্দ নয়, তাবে তাতে ভাবালুতা থাকতে পারবে না'

'দেখ, আমি কৃষকের ছবিই আঁকি। এই ছবিগুলো দেখে মন হচ্ছে ওরা কৃষকদেরই অনুকৃতি যেন। ওদেরকে বলতে পার মাংসের মালী। মাটি আর মাংস একই জিনিসের দুইটি রূপ– তাই না? আর এই মেয়েগুলো নরমাংস কর্ষণ করে, কারণ জীবন সৃষ্টির জন্যে এমনিভাবে চাষ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ অতি মহৎ কাজ লট্রেক । তুমি বলার মতই কথা বলেছ।'

'তুমি তাহলে তাদের কুৎসিত মনে কর না?'

'ওরা জীবনের মূর্ত প্রতীক। চরম সৌন্দর্যের রূপ ওটা। তুমি যদি ওদের দেবী করে তুলতে বা আবেগে রস সিঞ্চিত করে রূপ দিতে তবে তুমি ওদের কুৎসিত করে ফেলতে। কারণ তাতে তোমার ছবি হত ভীরুজনোচিত এবং মিথ্যা । তা না করে তুমি যা দেখেছ তাই এঁকেছ– সৌন্দর্যের সংজ্ঞা তো তাই । ঠিক না?'

'আঃ। তোমার মত আরও লোক যদি জগতে থাকত। নেও, আর একবার পান কর।'

ভিনসেন্ট আর একটি ক্যানভাস আলোর সম্মুখে এনে নিরীক্ষণ করল। এক মুহূর্ত কি ভেবে বলল, 'ঠিক। 'ডোমের'-এর কথাই আমার মনে পড়ছে।'

লট্রেকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ঠিক বলেছ। একমাত্র ওঁর কাছ থেকেই আমি পাঠ নিয়েছি। কি নির্মম ভাবেই না ও ঘৃণা করত।'

'যা তুমি ঘৃণা করো তা আঁক কেন? আমি যা ভালবাসি তাই আঁকি।'

'কিন্তু বিদ্বেষ থেকেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ আর্টের সৃষ্টি হয়েছে, ভ্যান গোঘ্।'

'কার ছবির কথা বলছ তুমি?'

'পল গগ্যাঁ। চেনো ওকে?'

'না।'

'ওর সম্বন্ধে জানা দরকার। চিত্রশিল্পী হিসাবে ওর খ্যাতি অনন্য। স্ত্রী, তিনটি ছেলেমেয়ে ছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জে কিছু শেয়ার ছিল। ও থেকে বৎসরে পেত প্রায় ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। পিসারো, ম্যানেট আর সিস্‌লির কাছ থেকে বৎসরে সে প্রায় পনের হাজার টাকার ছবি ক্রয় করত। ওদের বিয়ের তারিখ উপলক্ষে সে ওর স্ত্রীর ছবি আঁকে। ওর স্ত্রী এটাকেই সুন্দর উপহার মনে করত। গগ্যাঁ সাধারণত রোববার দিন ছবি আঁকত। স্টক এক্সচেঞ্জ ক্লাব জান? একবার ওর একখানা চমৎকার ছবি দেখে ম্যানেট বলেছিল যে, চমৎকার হয়েছে। তাতে গগ্যাঁ জবাব দিয়েছিল, 'আরে কি যে বল! আমি তো একজন অবৈতনিক মাত্র।' 'দূর' ম্যানেট বলেছিল, 'অবৈতনিক বলে কেউ নেই, বরঞ্চ বলতে পার তাদের ছবি ভাল হয় না।' কথাটা যেন গগ্যাঁর মর্মে বিঁধে গিয়েছিল। সে স্টক এক্সচেঞ্জে যাওয়া ছেড়ে দিল, যে টাকা জমিয়েছিল তা দিয়েই একটা বছর চালাল। পরে ছেলেমেয়েসহ স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর থেকে একান্ত ভাবে কাজ করে চলেছে।'

'ভারি অদ্ভুত তো।'

'সে কিন্তু বন্ধুদের রাগাতে ভালোবাসে। সুতরাং ওর সঙ্গে একটু সাবধান হয়ে কথা বলো। বেশ, চলো এবার যাই।'

৪.

বিষয়টা আদৌ কঠিন কিছু নয়। পুরোনো প্যালেটটা পাল্টিয়ে পাতলা রঙ দিয়ে ইম্প্রেসনিস্টদের মত এঁকে গেলেই হল। প্রথম দিনের চেষ্টায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল। বিহ্বলতার সঙ্গে এল বিরক্তি, ক্রোধ এবং ভয়। সপ্তাহঅন্তে রাগে যেন সে ফেটে পড়ছিল। রঙ নিয়ে এতদিন পরীক্ষা চালাবার পরেও সে যেন শিক্ষানবিশ রয়ে গেছে। প্রত্যেকটি ছবিই যেন কেমন কালো প্রাণহীন চটচটে দেখাত। কোরম্যানের ওখানে ভিনসেন্টের পাশে বসে লট্রেক ওকে আঁকতে এবং নিজের মনে অভিশাপ বর্ষণ করতে দেখত। কিন্তু কোন উপদেশ দিত না।

ভিনসেন্টের চেয়ে থিও যেন আরও মুস্কিলে পড়েছিল। সে স্বভাবতই ছিল খুঁতখুঁতে প্রকৃতির মানুষ। যদিও ব্যবহারে ও কার্যে ছিল খুবই ভদ্র। ভিনসেন্টের প্রাণশক্তি ও ক্ষমতার এক কণাও তার ছিল না।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ভিনসেন্ট সুন্দরভাবে সাজান থিওর ঘরখানাকে যেন রঙের দোকান বানিয়ে ফেলল। সে ঘরের চারদিকে পায়চারি করে ফিরত, লাথি দিয়ে পথ থেকে আসবাবপত্র সরিয়ে দিত, তুলি ক্যানভাস, রঙের টিউব ইতস্তত ছুঁড়ে ফেলে দিত। টেবিল, ডিভান প্রভৃতিতে রঙ- মোছা ন্যাকড়া রেখে অপরিষ্কার করে রাখত।

'ভিনসেন্ট, ভিনসেন্ট,' মাঝে মাঝে থিও চীৎকার করে উঠত, 'অমন বন্য বরাহ হয়ো না।'

ভিনসেন্ট ক্ষুদ্র কক্ষে পায়চারি করে ফিরছিল এবং আপন মনে কি বলছিল। অকস্মাৎ সে একখানা চেয়ারে সশব্দে বসে পড়ল।

'নাঃ কোন লাভ নেই,' সে গুমরিয়ে উঠল। 'অনেক দেরিতে আরম্ভ করেছি, আর চেষ্টা করে লাভ নেই। বয়সও আমার চলে গেছে। থিও, চেষ্টা করেও কিছু হল না! এ সপ্তাহে কুড়িটি ক্যানভাস আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু আমার পুরোনো টেকনিক পাল্টালো না। নতুন করে আরম্ভ করতেই পারলাম না। আমার হয়ে গেছে। কোন আশাই আমার নেই। কি যে করব।'

বলেই সে উঠে এক দৌড়ে দরজার কাছে এলো, তারপর সজোরে ওটা বন্ধ করে একটা জানালা খুলে দিল। জানালা পথে রেস্তোরাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জানলার পাট এত জোরে বন্ধ করল যে মনে হল জানালার কাঁচই বুঝি ভেঙে যাবে। সেখান থেকে রান্না ঘরে গিয়ে এক গ্লাশ জল ভরল—অর্ধেক জলই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। কিছুটা জল খেয়ে নিল। দু কষ বেয়ে তার জল পড়তে লাগল।

'তুমি কি বল থিও? চেষ্টা করা ছেড়ে দেব? আমার কিছুই হবে না, না?'

'ভিনসেন্ট তুমি ছেলেমানুষের মত করছ কেন? একটু শান্ত হয়ে বসে আমার কথা শোন। না, না, হাঁটাহাঁটি করো না। অমন করলে কথা বলতে পারব না। দয়া করে তোমার ঐ ভারী বুট জোড়া খুলে ফেল দেখি—ওটা দিয়ে বারবার যে চেয়ারটা ঠোক্কর দিচ্ছ এ আর আমি দেখতে পারছি না।'

'ছ' বছর তুমি আমাকে পোষণ করেছ থিও। কিন্তু পরিবর্তে কি পেয়েছ? কতগুলো অপদার্থ ছবি ছাড়া আর কিছুই না।'

'একটা কথা শোন। চাষীদের ছবি যখন তুমি আঁকতে আরম্ভ করেছিলে তা কি সাতদিনেই রপ্ত করতে পেরেছিলে, না পাঁচ বছর লেগেছিল?'

'কিন্তু তখন তো আমার সবে মাত্র হাতেখড়ি।'

'রঙ সম্পর্কে এখনও তোমার সবেমাত্র হাতেখড়ি। এবং এবারও তোমার সম্ভবত পাঁচ বছর লাগবে।'

'এর কি কোন শেষ নেই থিও? সারা জীবনই কি স্কুলে কাটাব? বত্রিশ বৎসর বয়স হল আমার, সাবালক আর কবে হব বলত?'

'এইবার তোমার শেষ সুযোগ ভিনসেন্ট। ইউরোপের সমস্ত চিত্রকরের ছবিই আমি দেখেছি। উপরে যাদের ছবি দেখে এলে তারাই সর্বাধুনিক। একবার যদি তুমি হালকা রঙ নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পার....'

'আমি পারব বলে সত্যি কি তুমি বিশ্বাস করো থিও? আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি বলেই কি তোমার ধারণা?'

'তোমাকে আমার একটা নিরেট মূর্খ বলে মনে হয়। আর্টের ইতিহাসে যা বিপ্লব আনল, তাই তুমি সাতদিনে রপ্ত করতে চাও! চল, বাইরে বেরিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে আসি। তোমার সঙ্গে আর পাঁচমিনিট যদি আমি এ ঘরে থাকি তবে একটা অনর্থ ঘটে যাবে।'

পরের দিন বিকেলে ভিনসেন্ট কোরম্যানের ওকানে অনেকক্ষণ বসে ছিল আঁকল। তারপর থিওর সঙ্গে দেখা করার জন্য গুপীলদের ওখানে গেল। গোধূলির ম্লান অন্ধকারে বৃহৎ অট্টালিকাগুলো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। পথপার্শ্বের কাফেগুলোতে বহু লোক এসে ভিড় জমিয়েছিল। কাফেগুলো থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। গ্যাসবাতিগুলো জ্বালানো হয়েছিল।

থিও ও ভিনসেন্ট অলসভাবে পথ চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে তারা একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে থিও পানীয় আনবার জন্য হুকুম করল।

'প্যারিস কেন যে এত সুন্দর....আমি তাই ভাবছি?' কিছুক্ষণ পরে ভিনসেন্ট বলল।

'সে আমি ঠিক জানি না। এটা সত্যি রহস্যাবৃত। এর সঙ্গে ফরাসীদের চরিত্রের কিছুটা যোগ আছে বোধহয়। এখানকার স্বাধীনতা ও সহনশীলতার একটা বিশিষ্ট ধারা রয়েছে, জীবনটাকে সহজভাবে নেবার একটা রুচি রয়েছে তাই.... আরে, আমার একজন বন্ধু আসছে। ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া ভাল। শুভ সন্ধ্যা, পল; কেমন আছ?'

'ভালই আছি, থিও।'

'আমার ভাই ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, পল। ভিনসেন্ট ইনি হচ্ছেন পল গগ্যাঁ। বোসো পল, কিছু পান করো।'

এক চুমুক মদ পান করে সে ভিনসেন্টের দিকে ফিরল।

'প্যারিস আপনার কেমন লাগছে মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ?'

'বেশ লাগছে।'

'আমার মনে হয় প্যারিস হচ্ছে সভ্যতারূপ আবর্জনার একটা পাত্র বিশেষ।'

'তোমাকে যেন আজ একটু খুশি খুশি মনে হচ্ছে পল? ছবিটবি বিক্রি হয়েছে নাকি?'

'উঁহু, তবে আজ ভোরে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'বল, বল পল। হ্যাঁ, আর এক পাত্র পানীয় আনতে বলব নাকি?'

নতুন গ্লাস থেকে এক চুমুক মদ পান করে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

'আজ ভোর ৫টার সময় গাড়োয়ানের স্ত্রী ফোরেল অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'রক্ষা কর। আমার স্বামী ফাঁসি দিয়েছে, তাকে রক্ষা কর।' চীৎকার শুনেই ছুটে গিয়ে আমি দড়িটা কেটে দিলাম। লোকটা মরে গিয়েছিল কিন্তু তখনও শরীরটা গরম ছিল। আমি

তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে চাইলাম। 'থাম।' গাড়োয়ানের স্ত্রী বলে উঠল, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত অমনি থাক।'

'আমার ঘরের কিছু দূরেই মালীর ঘর। আমি তাকে ডাক দিয়ে ব্যাপারটা বললাম। এমন সময় আমাকে প্রাতরাশে যোগদানের জন্য ডাকল। আমি নির্বিবাদে খেয়ে নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর ফাঁসি যাবার গল্পটা বলে গেলাম।'

ভিনসেন্ট তীক্ষ্ণভাবে পল গর্গ্যাক দেখতে লাগল। মাথাটা ওর বেশ বড়, নাকটা বাঁকা এবং বড়। বাদামের মত বড়ো চোখদুটির দৃষ্টি কেমন তীক্ষ্ণ কিন্তু বিষাদাচ্ছন্ন। বিশাল তার দেহ এবং শক্তিও অফুরন্ত।

থিও স্মিত হাসল।

'আমি এবার যাব, পল, আমার একটা ডিনারের নেমন্তন্ন আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ভিনসেন্ট?'

'ও এখানে থাকুক, থিও, গর্গ্যা বলল, 'আমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'বেশ। তবে ওকে বেশি মদ খাইয়ো না। ও আবার তাতে অভ্যস্ত নয়। বেশ চলি।'

'তোমার ভাইটি বেশ, ভিনসেন্ট।' গর্গ্যা বলল,'তবে তরুণ চিত্রকরদের ছবি দেখাতে ও এখনও ভয় পায়।'

'কেন! ব্যালকনিতে তো মোনেট, সিসলে, পিসারো এবং ম্যানেটের ছবি রেখেছে দেখেছি।'

'সত্য কথা। কিন্তু গর্গ্যা, সিজান, তুলো লেট্রেক–এদের ছবি কই? অন্যরা তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, কালও তাদের চুকে যাচ্ছে।'

'আপনি তাহলে তুলো লেট্রেককে জানেন?'

'হেনরিকে নিশ্চয় জানি। কে না জানে ওকে? চমৎকার শিল্পী সে, কিন্তু কিছুটা পাগলাটে। তার পাগলামি না থাকলে সে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন হতে পারত।

বেরিয়ে তারা গর্গ্যার স্টুডিয়োতে ঢুকল। গর্গ্যা বাতি জ্বালাতেই অনেক জিনিসের সঙ্গে চোখে পড়ল কতগুলো অশ্লীল ছবি।

'ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে প্রেম সম্বন্ধে আপনার কোন উচ্চ ধারণা নেই'

'নারীকে আমি পছন্দ করি কিন্তু তাদের হতে হবে স্থূলাঙ্গী আর পাপাসক্ত। ওদের বুদ্ধি আমার অসহ্য লাগে। স্থূলাঙ্গী মিসট্রেস খুঁজেও আমি পাইনি। মোপাসাঁ নামে যে ছেলেটির একটা ছোট্টগল্প গত মাসে বেরিয়েছে তা পড়েছেন? ও হচ্ছে জোলার ছাত্র।'

'সত্যিকারের প্রেমের সঙ্গে ওর তো কোন্ সম্পর্ক নেই, গর্গ্যা।'

গর্গ্যা বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়ল।

'সুন্দর জিনিস আমার ভাল লাগে' কিন্তু প্রেম কি জিনিস আমি তা জানি না। 'তোমাকে ভালবাসি' বলতে আমার সব দাঁত পড়ে যাবে, তবে কোন অভিযোগও আমার নেই। খৃষ্টের মত আমিও বলি 'মাংস মাংসই আর আত্মা আত্মাই।' কথাটা খাঁটি। অল্প কয়েকটা পয়সা দিলেই নরম মাংস পাওয়া যায়, অথচ আত্মার শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।'

'বিষয়টি আপনি হালকাভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'মোটেই না। নারী সম্ভোগের বস্তু, বাইরের জিনিস। আমার অনুভূতিকে আমি তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে নারাজ। সে জিনিস সঞ্চিত থাকবে ছবি আঁকার জন্যে।

'আমিও অধুনা একথাটা উপলব্ধি করছিলাম। যাক, আপনার ছবি সম্পর্কে আমার ভাই থিওর উচ্চ ধারণা রয়েছে। আপনার কয়েকটা স্টাডি দেখতে পারি?'

গগ্যাঁ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

'উঁহু, আমার স্টাডি তোমাকে দেখাতে পারব না। ওগুলো আমার চিঠির মতই ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়। কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি। কিন্তু এ আলোতে কি ভালো দেখাবে?' বলে গগ্যাঁ কতগুলো ছবি এনে হাজির করল। ভিনসেন্ট একটার পর একটা ছবি দেখে যেতে লাগল। সে বিস্ময়কর কিছু দেখবে আশা করেছিল। কিন্তু অস্বাভাবিকত্ব ছাড়া তাতে আর কিছুই ছিল না।

'আপনিও দেখছি লট্রেকের মত'-- ভিনসেন্ট বলল।'জুগুপ্সাই যেন আপনার একমাত্র ধর্ম।'

গগ্যাঁ হেসে উঠল। 'আমার ছবি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি শুনি?'

'এখনই বলতে পারব না। আরেকদিন এসে দেখে পরে বলব।'

'বেশ এসো। আজকে প্যারিসে আমার মত আর একজন তরুণও ভাল চিত্রকর আছে ; সে হচ্ছে জর্জ স্যুরাট।'

'এ নাম তো শুনেছি বলে মনে হয় না।'

'কি করে শুনবে। কেউ তো আর ওর ছবি রাখবে না। অথচ সে একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।'

'আমি ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই গগ্যাঁ।'

'বেশ পরে নিয়ে যাব।'

'চল বাইরে গিয়ে ডিনার খেয়ে আসি।'

৫.

একদিন প্রায় রাত দু'টার সময় দু'জনে গিয়ে স্যুরাটের বাড়ি উপস্থিত হল। 'এত রাতে তাকে জাগানো কি উচিত হবে?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'জাগাব কি হে! সে তো সারা রাতই কাজ করে। দিনের বেলাতেও অবশ্য সে বসে থাকে না। সে যে কখনও ঘুমায় আমার তা মনেই হয় না। এই যে বাড়ি। বাড়ির মালিক হচ্ছে জর্জের মা। তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন, 'আমার ছেলে জর্জ চিত্রকর হতে চায়। বেশ তাকে ছবি আঁকতে দিও। টাকা পয়সার আমার অভাব নাই তো' ছেলে তাঁর কাছে আদর্শ পুরুষ। সে মদ খায় না, ধূমপান করে না, কোন প্রতিজ্ঞা করে না, রাতে বেরোয় না, মেয়েদের পেছনে ছোটে না এবং আঁকার জিনিসপত্র ছাড়া আর কোন প্রকারে পয়সা ব্যয় করে না । তার একটিমাত্র দোষ আছে সে হচ্ছে ছবি আঁকা। শুনেছি তার একটি রক্ষিতা ও ছেলে আছে। ওরা নাকি কাছে ধারেই কোথাও থাকে। কিন্তু কখনো ওদের কথা সে কাউকে বলে না।'

'বাড়িটা অন্ধকার মনে হচ্ছে, 'ভিনসেন্ট বলল, 'ভিতরে ঢুকতে হলে তো বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে যাবে।'

'না,ওধার দিয়ে ওকে ডাকা যাবে।'

জর্জ স্যুরাট দরজা খুলে দেবার জন্য নিচে নেমে এল এবং কোনো শব্দ না করার জন্যে ইঙ্গিত করে ওদের নিয়ে নিজের চিলেঘরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জর্জ, গগ্যাঁ বলল, 'থিওর ভাই ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আনন্দিত হলাম মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ। কিন্তু আমাকে অল্পক্ষণের জন্য ক্ষমা করতে হবে। রঙটা শুকিয়ে যাবার আগেই আমার কাজটা সেরে নি কেমন? তোমরা একটু বসো।'

স্যুরাট একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে আপন মনে ছবি এঁকে চলল। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত। ভিনসেন্ট বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে তাকাল।

'তোমার ছবিটা ওকে দেখিয়ে দাও না স্যুরাট,' গগ্যাঁ বলল। 'আধুনিক চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে ওর কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। সপ্তাহখানেক হল মাত্র ও তা জানতে পেরেছে।'

'এই টুলটার উপর উঠুন, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ।'

ভিনসেন্ট টুলে উঠে ছবিটার দিকে তাকাল। সে বাস্তবে বা আর্টে যা দেখেছে তার সঙ্গে যেন এর তুলনা হয় না।

'কেমন লাগল তোমার, ভিনসেন্ট?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'গত কয়েকদিন এমন সব ঘটেছে আমার সামনে যে মনের সাম্য কিছুতেই রক্ষা করতে পারছি না। দেখুন, আমি ওলন্দাজ ধারা অনুসারে শিক্ষাগ্রহণ করেছি। ইম্প্রেশনিস্টদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। এখন দেখছি আমি যা জেনেছি তা সবই বাতিল হয়ে গেছে।'

'বুঝতে পেরেছি' শান্তভাবে স্যুরাট বলল। 'আমার পদ্ধতি অঙ্কনের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে । সুতরাং একবার দেখেই যে তুমি সবটা বুঝে নিতে পারবে তা আশা করি না। এ পর্যন্ত অঙ্কন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু অঙ্কনকে আমি ভাবাত্মক বিজ্ঞানে পরিবর্তিত করতে চাই। আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে ঘণীভূত করার পদ্ধতিটি আমাদের শিক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক মানবিক অনুভূতিকে রঙ, রেখা ও বর্ণবিন্যাসের রূপকে রূপান্তরিত করতে হবে। টেবিলের উপরকার রঙের ঐ ঐ ক্ষুদ্র পাত্রগুলো দেখছ?'

'হ্যা।'

'প্রত্যেকটি পাত্রে এক একটি মানবিক অনুভূতি ধরা রয়েছে। আমার ফর্মুলা অনুসারে এগুলো কারখানায় তৈরি করে কেমিস্টএর দোকানে বিক্রয় করা যেতে পারে। এখন আর প্যালেটে এলোমেলোভাবে রঙ মিলাতে হবে না। মানুষের অনুভূতি প্রকাশের জন্য যে রঙ দরকার তা পাওয়া যাবে দোকানেই। এটা বিজ্ঞানের যুগ। অঙ্কন বিদ্যাকে

আমি বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করতে চাই। ব্যক্তিত্বের অবসান করতেই হবে। চিত্রবিদ্যাকে স্থপতিবিদ্যার মত নিখুঁত করতে হবে। বুঝলেন মঁসিয়ে?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' ভিনসেন্ট বলল।

গগ্যাঁ ভিনসেন্টকে আস্তে ধাক্কা মারল।

'এটা তোমার পদ্ধতি বলছ কেন জর্জ। তোমার জন্মের আগেই পিসারো তো এ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল।

'মিথ্যা কথা।'

স্যুরাটের মুখে রক্তিমাভা দেখা গেল। সে ঝটিতি উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে এসে বসল।

'আমার আগে পিসারো এটা আবিষ্কার করেছিল তা কে বলেছে শুনি। এটা আমারই পদ্ধতি। আমিই প্রথম এটা বের করেছি। পিসারো আমার কাছে থেকেই সব শিখেছে। আমি আর্টের ইতিহাস পড়ে দেখেছি। আমার আগে কেউ এ বিষয়ে চিন্তা করেনি। অথচ তুমি বলছ কিন....।' বলে সে ঠোঁট কামড়াল।

ভিনসেন্ট বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভিনসেন্টকে ইঙ্গিত করে গগ্যাঁ বলল, 'না, না, এটা তোমারই পদ্ধতি। তোমার ছাড়া এটা সম্ভব হত না।'

শুনে তার রাগ যেন কিছু পড়ল।

'দেখুন মঁসিয়ে স্যুরাট, চিত্র হচ্ছে ব্যক্তিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং তাকে আমরা কেমন করে নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করব?' ভিনসেন্ট বলল।

স্যুরাট এক বাক্স রঙীন খড়ির পেন্সিল তুলে নিয়ে খালি মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ল। তাদের মাথার উপর স্লান গ্যাস লাইট জ্বলছিল। চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ভিনসেন্ট ও গগ্যাঁ তার দুপাশে বসে পড়ল। স্যুরাট উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল 'আমার মতে চিত্রের সমস্ত ধারাকেই আমরা ফর্মুলায় রূপান্তরিত করতে পারি। ধর আমি একটা সার্কাসের দৃশ্য আঁকতে চাই। এখানে থাকবে ঘোড়সওয়ার, এখানে ট্রেইনার, এখানে গ্যালারি আর দর্শক। এর মধ্যে আমি প্রফুল্লতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাই। চিত্রে তিনটি বস্তু রয়েছে। ও গুলো হচ্ছে, রেখা, বর্ণসামঞ্জস্য আর রঙ। প্রফুল্ল ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমি সবগুলো রেখা সমতলের উর্ধে টেনে দিলাম। আর উজ্জ্বল রঙ আর বর্ণ সামঞ্জস্যকে প্রাধান্য দিলাম। এটা কি উৎফুল্লতার আকর্ষণ বলে ইঙ্গিত করে না?'

'ইঙ্গিত হয়ত করে,' ভিনসেন্ট বলতে লাগল, 'তবু উৎফুল্ল ভাবটা ফুঠে ওঠে না।'

স্যুরাট মুখ তুলে তাকাল।

'আনন্দের চেয়ে আনন্দের সারাংশই আমি পছন্দ করি। প্লেটোর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি, বন্ধু?'

'হ্যাঁ'

'বেশ, চিত্রকর কোন জিনিসকে নয় তার মূল বস্তুকে রূপ দিতে চেষ্টা করবে। কোন আর্টিস্ট যখন ঘোড়ার ছবি আঁকে তখন সে পথে দেখা বিশেষ কোন ঘোড়ার ছবি

আঁকে না। ক্যামেরা দিয়ে ফটোগ্রাফ তোলা যায়– কিন্তু ছবিতে অনুকরণ ছাড়া আরও কিছু ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঘোড়ার ছবি আঁকতে হলে আমাদের যা ফুটয়ে তুলতে হবে তা হচ্ছে প্লেটোর 'ঘোড়া ভাব'– ঘোড়ার বাইরের রূপ। মানুষের ছবি আঁকতে হলেও সকল মানুষের সবটুকু ফুটিয়ে তুলতে হবে। বুঝতে পারলেন আমার কথাটা, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্ ?'

'বুঝলাম, কিন্তু একমত হতে পারলাম না।' ভিনসেন্ট বলল।

'সে পরে দেখা যাবে।'

'ধরুন, আমি যেন কোন দ্বীপের ছবি আঁকছি', সে বলতে লাগল,'এবং তাতে যেন একটা শান্তভাব ফুটিয়ে তুলতে চাই। রেখাগুলো সবই আমি সমান্তরাল করছি। বর্ণসামঞ্জস্যের জন্য আমি উষ্ণ ও শৈত্য এ দু'য়ের মাঝামাঝি ব্যবস্থা নিচ্ছি আর রঙের জন্য অন্ধকার আর আলো–এ দুয়ের সমতা রক্ষা করছি। দেখতে পাচ্ছেন?'

'বাজে প্রশ্ন না করে বলে যাও জর্জ'-- গগ্যাঁ বলল।

'এবার এলো বিষণ্ণতায়। রেখাগুলো হবে নিম্নমুখী। এখানে বর্ণসামঞ্জস্য হবে প্রধানত ঢিমে আর রঙও হবে অনুজ্জ্বল। ব্যস আমরা বিষণ্ণতার উপাদান পেয়ে গেলাম। এ দেখে একটি শিশুও ছবি আঁকতে পারবে। ক্যানভাসের উপর স্থান ত্যাগ করার গাণিতিক ফর্মুলা সম্পর্কে শীঘ্রই একটা ছোট বই লিখছি। বইটা অল্পদিনের মধ্যেই বেরুবে। তখন যে কেউ ছবি আঁকতে চায় সে বইটা পড়বে, তারপর কেমিস্টের দোকান থেকে রঙের পাত্র কিনে নিয়ম অনুসারে ছবি আঁকতে থাকবে।'

ভিনসেন্ট কটাক্ষ করল। গগ্যাঁ হেসে উঠল।

'ও তোমাকে পাগল মনে করে জর্জ।'

'তাই নাকি মঁসিয়ে, ভ্যান গোঘ্?' সে বলল।

'না, না,' ভিনসেন্ট প্রতিবাদ করল, 'আমাকেও লোকে পাগল বলত। কিন্তু বলতে কি আপনার পরিকল্পনা অদ্ভুত।'

'ও তোমায় স্বীকার করে নিচ্ছে জর্জ,' গগ্যাঁ বলল।

এমন সময় কে দরজা ধাক্কা দিল।

'হা ভগবান,' গগ্যাঁ বলল, তোমার মার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি।'

স্যুরাটের মা ঘরে প্রবেশ করলেন।

'জর্জ, সারারাত কাজ করবে না বলে তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ওঃ তুমি, তুমি পল? তুমি ভাড়া দাও নি কেন? তাহলে তো রাতে ঘুমুবার জায়গা পেতে।'

'এখানে যদি আমাকে থাকতে দেন, তবে তো আমার আর ভাড়াই দিতে হয় না।'

'দরকার নেই বাবা, একজন আর্টিস্টই যথেষ্ট। এই নাও তোমার কফি আর খাবার এনেছি। রাত জেগে যদি কাজ করতে চাও তবে তোমাকে খেতেও হবে। তোমার জন্য কিছু মদ আনবো নাকি পল?'

'আচ্ছা,' বলে সে স্যুরাটের মায়ের সঙ্গে ভিনসেন্টের পরিচয় করিয়ে দিল।

'মা এ আমাদের নতুন বন্ধু ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ।' স্যুরাট মাকে বলল।

মা ওর হাতটা তুলে নিলেন।

'আমার ছেলের বন্ধু সর্বদাই আমার বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা পাবে তা সে রাত চারটায় আসুক না কেন। তোমাকে কি পানীয় দেব মঁসিয়ে?'

তিন বন্ধু ও স্যুরাটের মা বসে কফি খেতে খেতে গল্প করতে লাগল। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল।

'এবার উঠি আমি,' স্যুরাটের মা বললেন, 'একদিন সন্ধ্যায় আমাদের ডিনারে এসে যোগ দিলে আনন্দিত হব মঁসিয়ে ভ্যান গোখ্।'

সদর দরজার ধারে স্যুরাট ভিনসেন্টকে বলল, 'আমার পদ্ধতিটা ঠিকমত আপনাকে বোঝাতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে আসবেন আমরা একসঙ্গে বসে কাজ করব। আমার পদ্ধতিটা ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পারলে দেখবেন অঙ্কনে পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। যাই, এবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করি। আপনার ভাইকে আমার প্রীতি জানাবেন।'

ভিনসেন্ট ও গগ্যাঁ নির্জন পথ ধরে হাঁটতে লাগল। প্যারিসের লোকেরা তখনো ওঠে নি।

'চল ঐ পাহাড়ের চূড়ো থেকে সূর্যোদয় দেখি,' গগ্যাঁ বলল।

'বেশ ত।'

দুজনে বিভিন্ন রাস্তা ধরে এগুতে লাগল।

'আচ্ছা স্যুরাট সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণাটা বলুন না, গগ্যাঁ।' ভিনসেন্ট বলল।

'জর্জ? দেলাক্রোর পরে রঙ সম্পর্কে এতবেশি আর কেউ জানতে পারে নি। আর্ট সম্পর্কে তার একটা থিয়োরি আছে। অবশ্য তা ভুল। কি করছে সে সম্পর্কে সচেতন হলে চলবে না। যাক তার থিয়োরি সম্পর্কে সমালোচকরাই ব্যবস্থা করবেন। রঙ সম্পর্কে তাঁর দান হবে অবিস্মরণীয়। তবে সে পাগল। একদম তলায়। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখলে।'

পাহাড়ের চূড়াটা ছিল বেশ খাড়া। উঠতে তাদের কষ্টই হল। কিন্তু চূড়োয় যখন উঠল, তখন সমস্ত প্যারিস শহর তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ধীরে ধীরে সূর্য উঠতে লাগল। অন্ধকারাচ্ছন্ন শহর ক্রমেই সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হল।

৬.

র‍্যালাভারের ক্ষুদ্র কক্ষটিতে একটা শান্তি যেন দেখা দিল। থিও সেজন্য আপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই প্রশান্তি বেশিদিন রইল না। ভিনসেন্ট ধীরে সুস্থে নিজের ধারা অনুসরণ করে চলার চেয়ে তার বন্ধুদের পদ্ধতি অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। ইম্প্রেসনিস্ট হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সে যা কিছু শিখেছিল তার সবকিছু ভুলে গেল। তার আঁকা ছবিগুলোকে স্যুরাট, টুলো-লট্রেক ও গগ্যাঁদের ছবির পাশবিক প্রতিলিপি বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু তার ধারণা যে সে বেশ এগুচ্ছে।

'তোমার নামটা কি তা মনে আছে?' থিও একদিন রাতে জিজ্ঞাসা করল।

'কেন? আমি হচ্ছি ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্।'

'ঠিক তো! তুমি জর্জ স্যুরাট, অথবা পল গগ্যাঁ নও তো?'

'কি ব্যাপার বলত, থিও?'

'জর্জ স্যুরাট হতে পারবে বলে তুমি সত্যি বিশ্বাস কর? এটা কি তুমি বুঝতে পার না যে জগতে মাত্র একজন লট্রেকই হয়? গগ্যাঁর কোন নকল চলতে পারে না? অথচ তুমি তাদের নকল করে চলেছ।

'উহু আমি তাদের অনুকরণ করি নি, অনুসরণ করছি।'

'না তুমি নকল করছ। তোমার নতুন ক্যানভাসের একটা দেখাও। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি গতরাতে তুমি কে ছিলে।'

'কিন্তু আমার তো উন্নতি হচ্ছে, থিও। দেখ না এই ছবির রঙগলো কেমন হাল্কা হয়েছে।'

'দিনকে দিন তোমার অবনতি হচ্ছে। প্রতিদিন তোমার স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমার জন্য কোন বাঁধান রাজপথ নেই। এভাবে চললে তোমার বহুবছর লাগবে। তাছাড়া অন্যের নকলই বা করবে কেন? অন্যে যা বলতে চায় তা কি তুমি নিজের করে নিতে পার না?'

'এ ছবিগুলো তো ভালই হয়েছে, থিও।'

'ওগুলো যাচ্ছে তাই হয়েছে!'

এমন ভাবে বাকযুদ্ধ চলত তাদের।

প্রত্যেক রাতে গ্যালারি থেকে বাসায় ফিরে এসে থিও দেখত ভিনসেন্ট একখানা নতুন ছবি নিয়ে বসে আছে। সে কাপড় চোপড় ছাড়বার আগেই ভিনসেন্ট ছবিটা সম্পর্কে মতামত জানার জন্য জোর করতে থাকত।

'কেমন এটা ভাল হয়েছে তো। কি, আমার প্যালেটের উন্নতি হয়েছে কি না। সূর্যালোকের এই অতিক্রিয়াটি কেমন হয়েছে? এদিকে তাকাও ....।'

এমনি অবস্থায় থিও'র সম্মুখে একটা সমস্যা দেখা দিত। হয় তাকে মিথ্যা বলতে হত, তাতে সন্ধ্যাটা তার ভালই কাটত, আর সত্য কথা বললে ভোর অবধি ভিনসেন্ট তাকে জ্বালিয়ে খেত। ভাইয়ের এই ব্যবহারে থিও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সত্য কথা বলার ইচ্ছা তার আদৌ থাকত না, তবু সত্য কথাই সে বলত।

'ডুরান্ত রুয়েল-এ সর্বশেষ কখন গিয়েছিলে?' সে ক্লান্তভাবে জানতে চাইল।

'কেন বলত?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'কাল বিকেলে।'

'জান ভিনসেন্ট, প্যারিসে অন্তত পাঁচ হাজার চিত্রকর এডওয়ার্ড ম্যানেটকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করছে এবং প্রত্যেকের চেষ্টা তোমার চেয়ে সুন্দর হচ্ছে?'

এর জবাব দেওয়া যায় না।

ভিনসেন্ট একটা নতুন পন্থা গ্রহণ করল। সমস্ত ইম্প্রেসনিস্টদের পদ্ধতি সে একই ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল।

'বেশ হয়েছে। এর নাম দাও তুমি 'পুনরুক্তি'। ছবিতে আমরা সব আর্টিস্টের নাম বসিয়ে দেব।'

এ নিয়ে দু'ভায়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক চলল। ভিনসেন্ট সারা রাত প্রায় ভাইকে ঘুমাতে দিত না। নানা কথা ভেবে থিও সবটাই সহ্য করত। নিজের ছবি আঁকা সম্বন্ধে আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর ভিনসেন্ট ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক আরম্ভ করল আর্ট, আর্টের ব্যবসায়, চিত্রকর হবার দুর্ভাগ্য নিয়ে।

'আচ্ছা থিও, তুমি এত বড় একটা ছবির দোকানের ম্যানেজার, অথচ কখনও তুমি তোমার ভাইয়ের ছবি সেখানে টাঙাও না। ব্যাপারটা কি বল দেখি?'

'ভ্যালাডন আপত্তি করেন।'

'চেষ্টা করেছিলে তুমি?'

'হাজারবার চেষ্টা করেছি?'

'বেশ, আমার ছবিগুলো নয় সুন্দর নয়। কিন্তু স্যুরাট, গগ্যাঁ আর লট্রেকের ছবি? সেগুলো কি অসুন্দর?'

'ওদের ছবি নিয়ে আসলে আমি প্রত্যেকবারেই ভ্যালাডনের অনুমতি চেয়েছি?'

'আচ্ছা, গ্যালারির মালিক তুমি, না অন্য কেউ?'

'তাহলে তোমার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। এটা সত্যি অবমাননাকর। এমন হলে আমি কখনও আঁকড়ে থাকতাম না।'

'কাল ভোরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ আমি বড় ক্লান্ত। আমি এখন শুতে যেতে চাই।'

'উহু, কাল ভোর পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না। এখনই-এ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ম্যানেট আর দেগা এখনও যথেষ্ট পরিচিত। তাদের ছবি বেশষ বিক্রি হচ্ছে। এখন তাদের ছবি গ্যালারিতে সাজিয়ে রাখার সার্থকতা কি বলত? তরুণ চিত্রকরদের ছবিই এখন টাঙান উচিত তোমাদের দোকানে।'

'আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আশা করি, তিন বছরের মধ্যে ......'

'না, না, তিন বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। এখনই ব্যবস্থা করতে হবে। এই চাকরির চেয়ে তুমি নিজেই কেন একটা আর্ট গ্যালারি খুলছ না থিও? সেখানে তো কর্তৃত্ব করার কেউ থাকবে না।'

'সেজন্য টাকা পয়সার তো দরকার। আমার তো কিছুই সঞ্চয় নেই।'

'তা ছাড়া এ ব্যবসায় তো তাড়াতাড়ি লাভের কোন উপায় নেই।'

'তা হোক। রাতদিন আমরা খাটব তাতেই ওটা দাঁড়িয়ে যাবে।'

'কিন্তু এখন চলবে কি করে? খেতে হবে তো?'

'নিজের খাওয়ার সংস্থান করতে পারছি না বলে কি তুমি আমাকে তিরস্কার করছ, থিও!'

'ভগবানের দোহাই, ভিনসেন্ট, তুমি এবার শুতে যাও, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।'

'না, না আমি শুতে যাবো না। আমাকে সত্য কথা জানতেই হবে। আচ্ছা, এইজন্যই কি তুমি গুপীলদের ছেড়ে যাচ্ছ না? বল, বল, সত্য কথা বল। আমি তোমার

গলার ফাঁসি। আমি তোমাকে বেঁধে রাখছি। তোমাকে চাকরি করতে বাধ্য করছি। আমি না থাকলে তুমি স্বাধীনভাবে চলতে পারবে।'

'আমি যদি আর একটু বড় হতাম অথবা একটু সমর্থ হতাম তবে তোমাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে দিতাম। যাক, এ কাজটা গর্গ্যাকে দিয়ে করিয়ে নেব। হ্যাঁ শোন ভিনসেন্ট, আমি গুপীলদের কাজ যেমন আজ করছি তেমন চিরদিনই করব। তোমার কাজ হচ্ছে ছবি আঁকা– আজ এবং ভবিষ্যতের জন্য। গুপীলদের এখানে মেহনত করে যা পাই তার অর্ধেক তোমার আর তুমি যা আঁক তার অর্ধেক আমার। এবার আমার বিছানা থেকে নেমে পড় দেখি। আমি ঘুমাব। না যদি নামো তবে আমি পুলিশ ডাকব।'

পরদিন সন্ধ্যায় ভিনসেন্টের হাতে একখানা এনভেলাপ দিয়ে থিও বলল, 'তুমি যদি আজ রাতে কোন কাজ না কর তবে আমরা এই পার্টিতে, যেতে পারি।'

'কে দিচ্ছে পার্টি?'

'হেনরি রুশো, দেখ না চিঠিটা।'

কার্ডটাতে দুটো সহজ কবিতা এবং হাতে আঁকা ফুলের গুচ্ছ ছিল।

'উনি কে?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা ওকে বলি কাস্টম হাউস অফিসার। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ও কাস্টম হাউসের কালেক্টর ছিল। গর্গ্যার মত রবিবার ছবি আঁকত। কয়েক বছর আগে প্যারিস বসে বাস্টিলের পাশে শ্রমিকদের মাঝে ডেরা বাঁধে। জীবনে সে কোনদিন লেখাপড়া শেখে নি অথচ সে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, গান বানায়, মজুরদের ছেলেমেয়েকে ভায়োলিন শেখায়, পিয়ানো বাজায় এবং বুড়ো কয়েকজন বৃদ্ধকে ছবি আঁকা শেখায়।'

'কিসের ছবি আঁকে ও?'

'এইসব অদ্ভুত জীবজন্তুর।'

'ওর ছবি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা থিও?'

'কিছুই না, তবে অন্য সবাই ওকে পাগল বলে।'

'সত্যি কি ও পাগল?'

'ওর মধ্যে একটা আদিম শিশু রয়েছে। চল পার্টিতে যাই, তাহলে তুমি নিজেই ওকে জানতে পারবে।'

'পার্টি যখন দিচ্ছে তখন নিশ্চয় ওর অর্থ সঙ্গতি আছে?'

'আজকের প্যারিসে ওই বোধহয় সবচেয়ে দরিদ্র চিত্রকর। একটা বেহালা কেনার মতও ওর সঙ্গতি নেই। তবে এই পার্টি দেবার পেছনে ওর একটা উদ্দেশ্য আছে। গেলেই বুঝতে পারবে।

যে বাড়িটাতে রুশো থাকত সেটা ছিল দিনমজুরদের আবাস। পাঁচতলায় একটা ঘর নিয়ে ও থাকত। থিও দোরে ধাক্কা দিলে রুশো এসে খুলে দিল। 'আসুন মান্যবর মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ,' সে মিঠে স্বরে বলল।

থিও ভিনসেন্টকে পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁদের বসার জন্য রুশো চেয়ার এগিয়ে দিল। ঘরটা যেন আনন্দে ঝলমল করছিল। এক পাশে একটা পুরোনো পিয়ানোর ধারে চারটি তরুণ দাঁড়িয়েছিল।

'আপনারাই প্রথম এলেন, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ,' রুশো বলল।

রাস্তায় একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। রুশো দরজা খুলে দিল। দশ বারোজন লোক এসে ঘরে ঢুকল।

পুরুষেরা সবাই সান্ধ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত, আর মেয়েরা পরেছেন জাঁকাল গাউন, ঝক্‌মকে স্লিপার আব লম্বা শাদা দস্তানা। ঘরে ঢুকতেই দামী সেন্ট আর পাউডারের গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল।

'শোন হেনরি,' জাঁকালো এবং ভারী গলায় গিয়োম পিল্লে বললেন, 'আমরা যদিও এসেছি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। আমরা এখান থেকে একটা বল নাচে যাব। এর মধ্যে তোমাকে অতিথি সৎকার করতে হবে।'

'আপনাকে দেখার জন্যই আমি এসেছি,' একজন লম্বা ধরনের তরুণী এগিয়ে এসে বলতে লাগল। 'আজ আপনার কথাই সারা প্যারিস আলোচনা করছে, আমার করচুম্বন করবেন কি মঁসিয়ে রুশো?'

'সাবধান ব্লাঙ্গ,' কে একজন বলে উঠল, 'জান ত এইসব আর্টিস্টরা ....'

রুশো হেসে ওর করচুম্বন করল। ভিনসেন্ট কোন কোণে সরে গেল। পিল্লে ও থিও কিছুক্ষণ আলাপ করল। অন্যরা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং রুশোর ছবি দেখে নানা মন্তব্য করে হাসিঠাট্টা করল।

'ভদ্রমহোদয়া ও মহোদয়গণ আপনারা যদি উপবেশন করেন, তবে এবার অর্কেস্ট্রা আরম্ভ হতে পারে'– রুশো বলল।

সবাই বসে পড়ল, রুশোর নির্দেশে বাজানা আরম্ভ হল। সাধারণ, গ্রাম্য সুর। ভিনসেন্ট মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। থামতেই ব্লাঙ্গ এগিয়ে গিয়ে রুশোর কাঁধ চাপড়িয়ে বলল, 'চমৎকার মশায়, চমৎকার। এমনি আমি আর শুনি নি।'

'আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন, মাদাম'

ব্লাঙ্গ খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

'এবার আরেকটা বাজনা শোনাচ্ছি।' রুশো বলল।

'তোমার একটা কবিতা পড়ে শোনাও হেনরি।' পিল্লে বলল।

রুশো ছোট ছেলের মত হেসে উঠল।

'বেশ আপনি যদি তাই বলেন তাই পড়ছি।' বলে উঠে নিজের কবিতার খাতাটা এনে পড়তে লাগল। ভিনসেন্টের বেশ লাগল লেখাটা, কিন্তু অভ্যাগতদের চীৎকারো সব ডুবে গেল।

কবিতা পড়া শেষ করে রান্না ঘরে চলে গেল এবং এক কাপ করে কফি এনে সবাইকে দিল। ভিনসেন্ট কোণে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে লাগল।

'সর্বশেষ যে ছবি এঁকেছ তা-ই আমাদের দেখাও দেখি হেনরি। লুভার চিত্রশালায় যাবার আগে আমরা ওটা দেখতে চাই।'

'শেষ চিত্রগুলো আমার ভারি চমৎকার হয়েছে,' রুশো বলল, 'দাঁড়ান দেওয়াল থেকে ওগুলো খুলে নিয়ে আসছি।'

সবাই এসে টেবিলে ভিড় করে দাঁড়াল।

'চমৎকার, চমৎকার হয়েছে এই ছবিটা,' ব্লান্স বলতে লাগল,'এটা না নিলে আমার ঘরটাই অন্ধকার হয়ে থাকবে। আমাকে এটা নিতেই হবে। কত দাম চান ছবিটার?'

'মাত্র পঁচিশ ফ্রাঙ্ক।' আর্টের একটা চরম নিদর্শনের মূল্য মাত্র পঁচিশ ফ্রাঙ্ক। এটা আমার নামে উৎসর্গ করবেন?'

'তাতে আমি সম্মানিত বোধ করব।'

'আমার প্রেমিকাকে একটা ছবি দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এটা বোধ হয় ওকে দিতে পারি, তাইনা? নিশ্চয় এটা তোমার শ্রেষ্ঠতম ছবি?'

'আমি আপনার জন্য একটা ছবি রেখেছি, মঁসিয়ে পিল্লে।'

সে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির জীবের ছবি বার করল। সবাই চীৎকার করে উঠল।

'এটা কি?'

'সিংহ।'

'না, না, ব্যাঘ্র।'

'দূর ও যে আমাদের ধোপানী। আমি ওকে ঠিক চিনতে পেরেছি।'

'মঁসিয়ে এ ছবিটা একটু বড়, এর দাম পড়বে ত্রিশ ফ্রাঙ্ক।' রুশো মিষ্টি করে বলল।

'আমি একটা নেব, আমি একটা নেব' বলে অন্যেরা চেঁচাতে লাগল।

'চল এবার সবাই,' পিল্লে চেঁচিয়ে বলল,'না হলে বল নাচে যে দেরি হয়ে যাবে। ছবিগুলো থাক। এগুলো নিয়ে গেলে সেখানে একটা হল্লা বেঁধে যাবে। বিদায় হেনরি। চমৎকার কাটল সময়। আরেকটা পার্টির বন্দোবস্ত কর শিগ্‌গির।'

'বিদায় বন্ধু, বিদায়,' গন্ধযুক্ত রুমালটা নাকের সম্মুখে আন্দোলিত করে ব্লান্স বলল।'আপনার কথা আমি কোনদিন ভুলব না। চিরকাল আপনার কথা আমর স্মরণে থাকবে।'

'আঃ, কি আরম্ভ করেছ, ব্লান্স,' কে একজন বলল, 'ওর রাতের ঘুমটা নষ্ট করছ কেন?'

হল্লা করতে করতে দলটি বেরিয়ে গেল– পড়ে রইল শুধু দামী সুগন্ধীর মিষ্টি হাওয়া।

থিও ও ভিনসেন্ট দরজার দিকে এগুলো। রুশো টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্তূপীকৃত টাকাপয়সাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল।

'তুমি একাই বাড়ি চলে যাও, থিও'– ভিনসেন্ট ধীরভাবে বলল, 'আমি এখানে থেকে ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

থিও চলে গেল। ভিনসেন্ট দরজা বন্ধ করে যে রুশোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে তা লক্ষ্যই করে নি। সে একান্তভাবে পয়সা গুনে চলেছিল।

'আশি ফ্রাঙ্ক, নব্বই ফ্রাঙ্ক, একশ' ফ্রাঙ্ক, একশ পাঁচ ফ্রাঙ্ক।'

হঠাৎ সে মুখ তুলে ভিনসেন্টকে দেখতে গেল। তার চোখে তাকাল। মুখে দেখা দিল বোকার মত হাসি।'

'তোমার এই মুখোস খুলে ফেল, রুশো'– ভিনসেন্ট বলল,'আমিও তোমার মত একজন চাষা ও চিত্রশিল্পী।'

রুশো টেবিল থেকে সরে এসে ভিনসেন্টের হাত চেপে ধরল।

'আপনার আঁকা ওলন্দাজ কৃষকদের ছবিগুলো আপনার ভাই আমাকে দেখিয়েছিল। ওগুলো মিলেটের চেয়ে ভালো। আমি ওগুলো বারবার দেখেছি, আমি আপনার প্রশংসা করি মঁসিয়ে।'

'আমি আপনার আঁকা ছবি দেখেছি, রুশো। আমিও আপনার প্রশংসা করি।'

ধন্যবাদ। বসবেন কি? আমার এখানকার তামাক আপনার পাইপে ভরবেন? আমি আজ একশ ফ্রাঙ্ক উপার্জন করেছি মঁসিয়ে। এ থেকে আমি তামাক, আহার্য এবং ছবি আঁকার জন্য ক্যানভাস কিনতে পারব।'

'ওরা যে আপনাকে মাথা খারাপ ভাবে তা বোধহয় আপনি জানেন, রুশো?

'জানি। হেগ শহরে সবাই যে আপনাকে মাথা খারাপ মনে করে তাও শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'ওদের খুশি মত ওরা ভাবুক। একদিন আমার ছবি লুক্সেমবার্গের সমস্ত গৃহে শোভা পাবে।'

'আর আমার ছবি শোভা পাবে লুভারে।'

পরস্পরের দৃষ্টিতে তারা পড়তে পেল যেন নিজের মনের কথা। আত্মতৃপ্তিতে হেসে উঠল প্রাণ খুলে।

'ওরা ঠিকই বলেছে হেনরি, আমরা পাগলই বটে।' ভিনসেন্ট বলল।

৭.

পরের মঙ্গলবার ডিনারের সময় গর্গ্যা এসে উপস্থিত হল ভিনসেন্টর ওখানে।

'আজ সন্ধ্যায় তোমাকে ব্যাটিনোলা কাফেতে নিয়ে যাবার জন্য তোমার ভাই আমাকে অনুরোধ করেছে। কারণ তার কাজ সারতে দেরি হবে। ছবিগুলো তো বেশ ইন্টারেস্টিং, দেখব?'

'নিশ্চয়, এর কতকগুলো আমি এঁকেছিলাম ব্রাবান্টে আর কতকগুলো হেগ শহরে।'

গর্গ্যা কতক্ষণ নজর দিয়ে ছবিগুলো দেখল। মাঝে মাঝে এমন অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল যেন কিছু বলবে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, সে যেন তার ভাবকে ভাষা দিতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি কি মৃগী রুগী? কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম বলে আমাকে ক্ষমা করো।'

ভিনসেন্ট তখন একটা কোট গায়ে দিচ্ছিল। গর্গ্যার কথা শুনে তার দিকে ফিরে তাকাল।

'আমি কি?'

'তুমি একটা মৃগী-রুগী। অর্থাৎ যাদের খিঁচুনি রোগ হয়।'

'জানি না। কিন্তু ও কথা জিজ্ঞেস করছ কেন গর্গ্যা?'

'মানে....তোমার এই ছবিগুলো.....ওগুলো যেন ক্যানভাস থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তোমার আঁকা ছবি যখন দেখি...মানে এইবারই সর্বপ্রথম নয়....আমি কেমন যেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করি। যা আমি কিছুতেই চেপে রাখতে পারি না। আমার মনে হয়, হয় ঐ ছবিগুলোর, নয় আমার বিস্ফোরণ হবে! জান, তোমার ছবিগুলো আমাকে সবচেয়ে বেশি কোথায় স্পর্শ করে?'

'না, । কোথায়?'

'পেটে। পেটের ভেতর যেন কম্পন শুরু হয়ে যায়। এমন উত্তেজিত আর বিচলিত মনে হয় যে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারি না'

'তবে তো ওগুলো বিরেচক হিসাবে বিক্রি করা চলে। একটা ছবি কিনে শৌচাগারে টাঙিয়ে রাখলেই হল, তাই না?'

'সত্যি বলছি ভিনসেন্ট, তোমার আঁকা ছবি থাকলে আমি সেখানে থাকতেই পারবো না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পাগল হয়ে আমাকে ঘর ত্যাগ করতে হবে?'

তারা হাঁটতে হাঁটতে বুলোভার ক্লিচির দিকে রওনা হল।

'তোমার ডিনার হয়েছে।' গগ্যাঁ জিজ্ঞাসা করল।

'না। তোমার?'

'না। তবে কি কাফেতে যাবে?'

'বেশ তো। পয়সা কড়ি আছে তো?'

'এক আধলাও নেই। তোমার কাছে আছে কিছু?'

'উঁহু, আমি তো থিওর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'দূর ছাই। খাওয়া আমাদের হবে না।'

তারা পথে পথে কিছু ঘুরে একটা ছোট ত্রিকোণাকার পার্কে এসে উপস্থিত হল।

'আরে,' গগ্যাঁ বলল, 'সাজান দেখি ঘুমাচ্ছে বেঞ্চের উপর। বোকাটা কেন যে নিজের জুতোটাকে বালিশ বানায় তা আমি বুঝতেই পারি না। চল, ওকে ডেকে তুলি।'

কোমর থেকে বেল্টটা খুলে সে সাঁ করে একটা বাড়ি লাগিয়ে দিল ওর পায়ে। সাজান্ একটা আর্ত চীৎকার করে উঠে পড়ল।

'এটা কোন দেশী রসিকতা শুনি?' সে বলল,'একদিন দেব যখন মাথাটা ভেঙ্গে তখন বুঝবে।'

'পা খালি করে শুয়েছিলে কেন? ওই ছেঁড়া জুতো জোড়া মাথার নিচে বালিশের মত করে দিয়েছ কেন বলতে পার? ওর চেয়ে যে খালি মাথায় শোয়া ভাল।'

সাজান গজ গজ করতে করতে জুতো জোড়া পরতে লাগল।

'চুরি যাবার ভয়ে ওটা মাথার নিচে নিয়ে শুই, বালিস তো করি না।' গগ্যাঁ ভিনসেন্টের দিকে ফিরল।'কথা শুনে বোধ হয় ভাবছ ও বেচারিও ভুখা-চিত্রশিল্পী? উঁহু, ওর বাপ হচ্ছে একটা ব্যাঙ্কের মালিক। পল, এ হচ্ছে ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ্, থিও'র ভাই।'

সাজান ও ভিনসেন্ট করমর্দন করল।

'আঃ, আধ ঘন্টা আগে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হত, তবে আমাদের সঙ্গে তোফা ডিনার খেতে পারতে, সাজান্' গর্গ্যা বলল, 'কাফেতে কি চমৎকার খানা হল।'

'সত্যি?' সাজান সুধাল।

'একেবারে তুলনাহীন! তাই না, ভিনসেন্ট?'

'নিশ্চয়।'

'তবে আমারও তো খেতে হচ্ছে। চল যাবে নাকি?'

'আর খেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, তুমি পারবে ভিনসেন্ট?'

'মনে হয় না। তবে উনি যদি জোর করেন....'

'ছেলেমানুষী কোর না। জানো তো আমি একা খেতে ভালবাসি না, চল, তোমরা নয় অন্য কিছু খাবে।'

'আচ্ছা চল। চল হে ভিনসেন্ট।'

তারা কাফেতে গিয়ে বসল।

'জান পল, জোলার 'L' oeuvre ' বইখানা খুব বিক্রি হচ্ছে।' গঁগ্যা বলল।

সাজান্-এর চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা বিরক্তি। ভিনসেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি ঐ বইটা পড়েছেন মঁসিয়ে?'

'না, আমি সবেমাত্র Germinal' বইটা শেষ করলাম।'

L'oeuvre' বইটা ভাল নয়, তাছাড়া এটা অসত্যে পরিপূর্ণ, সাজান্ বলল। বন্ধুত্বের নামে যে কত হীন প্ররোচনা চলে এটা তারই নিদর্শন। বইটা হচ্ছে একজন চিত্রকর সম্পর্কে, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্। আমারই সম্পর্কে। এমিল জোলা আমারই পুরাতন বন্ধু। এইক্স-এ আমরা এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, এক সঙ্গে স্কুলে গেছি। সে প্যারিসে আছে বলেই আমি প্যারিসে এসেছি। ভাইয়ের চেয়েও আমাদের বন্ধন ঘনিষ্ঠতর। যৌবনে পাশাপাশি বসে কল্পনা করেছি কি করে দুজনে বড় আর্টিস্ট হব। আর আজ? সে এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

'কি করেছে সে আপনার?' ভিনসেন্ট শুধালো।

'আমাকে উপহাস করেছে, ঠাট্টা করেছে, আমাকে সমগ্র প্যারিসে হাসির বস্তু বানিয়েছে। দিনের পর দিন আমি তাকে আমার জানা থিয়োরি বলেছি, সে শুনেছে, উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু এখন বুঝছি, আমার বোকামি প্রকাশ করবার জন্যই সে তার বইয়ের খোরাক সংগ্রহ করেছে।

থেমে মদের গ্লাসটি নিঃশেষে শেষ করে সে আবার ভিনসেন্টকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল,'জোলা আমাদের তিনজনের চরিত্র, ঐ বইয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্–এই তিন হচ্ছে আমি, ব্যাজিল আর একটি হতভাগ্য যুবক। বালকটির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল; ব্যর্থতার ফলে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জোলা আমাকে বলেছে কল্পনাবিলাসী। তার মতে কোন শক্তি নেই আমার, আমি বিপথচারী অথচ নিজেকে যুগান্তকারী বলে কল্পনা করি। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পেতে আমি আত্মহত্যা করেছি-- এই হচ্ছে তার অভিমত। আমার বিরুদ্ধে সে একজন সেন্টিমেন্টাল ভাস্করকে

দাঁড় করিয়েছে, যে প্রচলিত পদ্ধতিতে জঘণ্য সব ছবি এঁকে যাচ্ছে আর নিজেকে মনে করছে একজন উঁচু দরের আর্টিস্ট।

'ভারি মজার তো' গগ্যাঁ বলল,'জোলাইতো সর্বপ্রথম এডোয়ার্ড ম্যানেটের বৈপ্লবিক পদ্ধতি সমর্থন করে? সে তো ইম্প্রেশনিস্টদের জন্যই ওকালতি করছে।'

'হ্যাঁ, সে ম্যানেটকে পূজা করত কারণ এডোয়ার্ড একাডেমিসিয়ানদের পদ্ধতি বাতিল করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু আমি যখন ইম্প্রেশনিস্টদেরও অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম তখন সে আমাকে অভিহিত করল বোকা আর বুদ্ধিহীন বলে। এমিল হচ্ছে একটা জঘণ্য লোক। অনেকদিন তার ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে তো তোমার ছবির একটা পরিচয় পুস্তিকা লিখেছিল শুনেছিলাম, তার কি হল?'

ছাপতে দেয়ার আগে এমিল এটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, গগ্যাঁ।

'কেন?' ভিনসেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

'সে ভয় পাচ্ছিল যে, সমালোচকেরা মনে করবে, আমি ওর পুরোনো বন্ধু বলে সে আমার পক্ষে প্রচারকার্যে লেগেছে। সে ঐ পুস্তিকা প্রকাশ করলে আমি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে সে L' Oeuvre' প্রকাশ করেছে। এই হচ্ছে বন্ধুত্বের পুরস্কার।'

'বোতলে কিছু মদ আছে নাকি?' গগ্যাঁ শুধালো।

'যাকগে, প্যারিসে আর আমি থাকছি না। বাকি জীবনটা এইক্স-এ কাটাব বলে ঠিক করেছি। কি চমৎকার জায়গা! ওখানেই একটা স্টুডিয়ো করব আর আপেলের বাগান করব। বাড়ির চারদিকে উঁচু করে দেওয়াল দেব এবং দেওয়ালের উপরে কাঁচের টুকরো। পৃথিবীকে সরিয়ে রাখবো আমার জগৎ থেকে। আর আমি কখনও প্রোভেন্স ছাড়ব না–কখনও না'

'সন্ন্যাসী হবে অ্যাঁ?' গগ্যাঁ বলল।

'হ্যাঁ সন্ন্যাসী হব।'

'এইক্স-এর সন্ন্যাসী। কি সুন্দর নাম। চল এবার কাফে বেটিনোলাতে যাই। নিশ্চয় সবাই এতক্ষণে সেখানে জড়ো হয়েছে।'

৮.

প্রায় সমস্ত নবীন আর্টিস্টই সেখানে সমবেত হয়েছিল। লট্রেক-এর সম্মুখে এক রাশ প্লেট পড়েছিল। জর্জ স্যুরাট খুব ধীরে ধীরে এ্যাকটেন নামক একজন কৃশ আকৃতির চিত্রকরের সঙ্গে কথা বলছিল। এ ভদ্রলোক ইম্প্রেশনিস্টদের পদ্ধতির সঙ্গে জাপানী ধারার সংযোগ সাধনের চেষ্টা করছিল। হেনরি রুশো এবং থিও কোন বিষয়ে উত্তেজিতভাবে আলাচনা করছিল।

ঘরে ঢুকেই সাজান এমিল জোলাকে দেখতে পেল। সে একটু দূরের একটা টেবিলে বসে এক কাপ কফি অর্ডার দিল। গগ্যাঁ ভিনসেন্টকে জোলার সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিল তারপর তুলো লত্রেক-এর পাশে বসে পড়ল। জোলা এবং ভিনসেন্টের টেবিলে আর কেউ রইল না।

'পল সাজান-এর সঙ্গে আপনি এলেন দেখলাম, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্। সে নিশ্চয় আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলেছে?'

'আপনার বইটি পড়ে সে খুবই আহত হয়েছে?'

জোলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'পল সাজান সম্পর্কে ঐ বইটা লিখতে হয়েছে বলে আমি সত্যি মর্মাহত, কিন্তু ওর প্রত্যেকটি কথা সত্য। আপনি নিজে তো চিত্রকর। কোন বন্ধু আপনার জীবনকে অসুখী করেছে বলেই কি আপনি তার বিকৃত ছবি আঁকবেন? নিশ্চয় নয়। পল চমৎকার ছেলে। বহুদিন সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কিন্তু তার ছবিগুলো নেহাৎ বাজে। জানেন বোধহয়, আমার বাড়িতে সবাই সমাদর পায়, তাই কেউ এলেই আমরা পলের ছবিগুলো লুকিয়ে ফেলি পাছে তা দেখে তারা হাসাহাসি করে।'

'কিন্তু তার ছবি এত খারাপ নয়।'

অখাদ্য, প্রিয় ভ্যান গোঘ্, একেবারে অখাদ্য। দেখছেন ওর আঁকা ছবি? ওঃ তাই একথা বলছেন। পাঁচ বছরের ছেলের মত ও ছবি আঁকে। সত্যি বলছি, ও একেবারে পাগল হয়ে গেছে।'

'গগ্যাঁ ওকে শ্রদ্ধা করেন।'

'সাজান এমনভাবে তার জীবনটা নষ্ট করছে দেখে আমার প্রাণটা ফেটে যাচ্ছে,' জোলা বলতে লাগল, 'তার উচিত দেশে ফিরে গিয়ে পিতার সঙ্গে কাজ করা। তাতে জীবনে সে উন্নতি করতে পারবে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে...তাতে হয়ত একদিন আত্মহত্যা করবে সে... যেভাবে আমি 'L' Oeuvre'-এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। আপনি কি বইটা পড়েছেন মঁসিয়ে?'

'না। আমি সবেমাত্র 'Germinal' শেষ করলাম।'

'কেমন লাগল।'

'বালজাকের লেখার পরে এমন বই আর হয় নি।'

'হ্যাঁ, ওটা আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। বইটা লিখে কিছু টাকা পয়সা পেয়েছি। ৬০ হাজার কপির মত এই বই বিক্রি হয়েছে। যাক ..... আপনি কি বিষয়ে ছবি আঁকেন মঁসিয়ে .... কি নাম বলে আপনার পরিচয় যেন দিলেন?'

'ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘ। থিও ভ্যান গোঘ হচ্ছে আমার ভাই।'

'জোলা ভাল করে ভিনসেন্টের দিকে তাকাল।

'ভারি অদ্ভুত তো।' সে বলল।

'কি?'

'আপনার নাম, কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছে।'

'থিও বলে থাকবে।'

'থিও হয়ত বলেছে... কিন্তু... দাঁড়ান... বোধ হয়... জার্মিনাল।' আচ্ছা, আপনি কি কোনদিন কয়লাখনি অঞ্চলে গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি দু'বছর বোরিনেজ-এ ছিলাম।'

'বোরিনেজ! ঠিক হয়েছে।'

জোলার চোখ দুটোতে এক অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য দেখা গেল।

'তা হলে আপনিই তো যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় অবতার।'

ভিনসেন্টের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'কি বলতে চান আপনি?'

'জার্মিনাল বইটির মালমসলা সংগ্রহের জন্যে আমি সপ্তাহ পাঁচক বোরিনেজে ছিলাম। সেখানকার লোকেরা একজন খৃষ্টের অবতারের কথা বলছিল, তিনি নাকি তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন।'

'দয়া করে আস্তে বলুন।'

'আরে এতে লজ্জা পাবার কি আছে, ভিনসেন্ট,' সে বলল।

'ভাল কাজই তো করছিলেন তবে মাধ্যমটা ভুল ছিল। ধর্ম মানুষের কোন উপকার করতে পারবে না। এ জগতে দুঃখ ভোগের ফলে পর জগতে সুখ লাভ অবাস্তব।'

'সেটা আমি অনেক পরে উপলব্ধি করেছি।'

'আপনি দু'বছর বোরিনেজে ছিলেন, ভিনসেন্ট। আপনি আপনার মুখের গ্রাস, পরণের বস্ত্র এবং অর্থাদি ওদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছেন। কাজ করতে করতে আপনি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু এর পরিবর্তে আপনি কি পেয়েছেন? কিছুই না। তারা আপনাকে পাগল অপবাদ দিয়ে চার্চ থেকে বিতাড়িত করেছে। যখন প্রথম যান তখনকার অবস্থার চেয়ে আপনি চলে আসার পর তাদের অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয় নি।'

'অবস্থা তাদের আরও খারাপ হয়েছে।'

'কিন্তু আমার পন্থা তাদের অবস্থা ফেরাবে। আমার লিখিত বাণী বিপ্লব সৃষ্টি করবে। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের প্রত্যেকটি শিক্ষিত খনির শ্রমিক আমার বই পড়েছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমার বই নেই। যারা পড়তে পারে না, তারাও বারবার করে ওটা পড়িয়ে নিচ্ছে। ফলে এরই মধ্যে চারটি ধর্মঘট হয়ে গেছে। ডজন খানেক শীঘ্রই হবে। সমগ্র দেশ জাগছে। 'জার্মিনাল' নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে যা আপনার ধর্ম পারে নি। পরিবর্তে আমি কি পুরস্কার পেয়েছি জানেন।

'কি?'

'অর্থ। হাজার হাজার টাকা। মদ পান করবেন?'

আস্কটিন জোলার দিকে ফিরে বলল, 'সান্ধ্য কাগজে তোমার 'জার্মিনালে'র যে বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছে দেখেছো?'

'না, কি লিখেছে?'

'সমালোচকরা তোমাকে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যভিচারী লেখক বলে অভিহিত করেছেন।'

'এ তো পুরোনো কথা? আমাকে নতুন কিছু বলতে পারল না?'

'ঠিকই বলেছে ওরা। তোমার বই অশ্লীল এবং যৌন বিষয়ে পরিপূর্ণ।' লট্রেক বলল।

ওর কথার জবাব না দিয়ে এমিল ওয়েটারকে মদ আনবার আদেশ করল। সবাইকে পানীয় পরিবেশন করা হলে সে বলতে আরম্ভ করল, 'যে কারণে তোমার ছবিকে এরা অশ্লীল বলেছিল হেনরি ঠিক সেই কারণেই আমার বইকেও অশ্লীল বলছে। আর্টে যে নৈতিক বিচারের ঠাঁই নেই একথাটা জনসাধারণ বুঝতে পারে না। আর্ট হচ্ছে নীতিশূন্য, জীবনও তাই। আমি কোন ছবি বা বইকে অশ্লীল মনে করি না। আমি মনে করি, লেখকের বা শিল্পীর কল্পনার অভাব। টুলো-লট্রেকের আঁকা বেশ্যার ছবি আমার কাছে শ্লীল, কারণ তার ভিতরে সৌন্দর্যকে সে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। কিন্তু বাগ্রোর আঁকা পল্লীবালা আমার কাছে অশ্লীল, কারণ এমনভাবে তাকে রূপ দেওয়া হয়েছে, যা দেখলেই বমনোদ্রেক হয়।

'ঠিকই বলেছ' থিও বলল।

'সাধারণ মানুষ দ্বৈতভাবে চিন্তা করে; আলো এবং ছায়া, মিষ্ট এবং তিক্ত, সৎ এবং অসৎ। কিন্তু প্রকৃতিতে এই দ্বৈতভাব নেই। এ পৃথিবীতেও ভাল বা মন্দ বলে কিছু নেই, আছে শুধু থাকা আর করা। আমরা যখন কোন কাজ বর্ণনা করি, তখন জীবনকেই বর্ণনা করি। ঐ কাজে যখন বিশ্লেষণ সংযোগ করি, যেমন দুশ্চরিতার বা অশ্লীলতা তখন আমরা ভাবতান্ত্রিক কুসংস্কারের রাজ্যেই প্রবেশ করি।'

এরপরে আলোচনা চলতে লাগল নৈতিকত্ব সম্পর্কে। কার লেখা বা ছবির নৈতিক মান সম্পর্কে কোন সমালোচক কি বলেছেন, সকলে তা উল্লেখ করতে লাগল। কতক্ষণ আলোচনা চলার পর জোলা বলল, 'ভিক্টর হুগো গত বছর মারা গেছেন। তার সঙ্গে একটা সভ্যতাই মরে গেছে। আমার বই নতুন সভ্যতার প্রতীক– বিংশ শতাব্দীর অশ্লীল সভ্যতা। আপনাদের ছবিও তারই প্রতীক। ম্যানেট চলে গেছে .... কিন্তু ঐ ধারা রক্ষা করবে দেগা, লট্রেক আর গগাঁ।'

'ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘের নামও ঐ তালিকাভুক্ত কর'– লট্রেক বলল।

'বেশ কথা, ভিনসেন্ট'– জোলা বলল, 'কুশ্রীতার প্রতিবাহক বলে তোমাকে মনোনীত করা হল। রাজি ত?'

'নিশ্চয়। কুশ্রীতার মধ্যেই যে আমার জন্ম।'

'আসুন ভদ্রোমহোদয়গণ, আমাদের মেনিফেস্টো তৈরি করে ফেলি'– জোলা বলল, 'প্রথমত, আমরা মনে করি, সমস্তই সুন্দর তা যে যতই অর্থহীন হোক না কেন। আমরা প্রকৃতিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করি। আমরা বিশ্বাস করি, মিষ্ট মিথ্যার চেয়ে নগ্ন সত্যের মধ্যে অধিক সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। আমরা বেদনাকে ভাল মনে করি, কারণ তা মানুষের সমস্ত অনুভূতির একান্ত প্রকাশ। যৌনতা আমাদের কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক। আমরা চরিত্রকে সুশ্রীতার উপরে, বেদনাকে সুশ্রীতার উপরে এবং কঠোর ও নগ্ন বাস্ত বকে ফ্রান্সে সমস্ত সম্পদের উপরে স্থান দি। আমরা জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করি। আমরা বারবণিতাকে কাউন্টসের মতই নিষ্পাপ মনে করি concierge কে জেনারেলের,

চাষীকে রাণীর সমকক্ষ মনে করি, কারণ তারা আমাদের কল্পিত সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে খাপ খায়।'

আর কিছুক্ষণ মদ্যপানের পর তাদের আসর ভাঙল।

৯.

জুনের প্রথমদিকে থিও এবং ভিনসেন্ট তাদের নতুন বাসায় গেল। বাসাটায় তিনখানা ঘর, একটা মন্ত্রণা-কক্ষ এবং একটা রান্নাঘর ছিল।

'আর তোমার কোরম্যানের ওখানে যাওয়ার দরকার নেই, ভিনসেন্ট,' আসবাবপত্র সাজাতে সাজাতে থিও বলল।

'হ্যাঁ, আমার যে কয়েকজন নগ্ন মেয়ে মডেল দরকার।'

'বসার ঘরে সোফাটা রেখে থিও একবার নজর দিয়ে দেখল'– তারপর বলল, 'এ পর্যন্ত তো একটা ক্যানভাসও শেষ করতে পার নি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন পার নি?'

'রঙই ভাল করে মেলাতে শিখলাম না, ছবি আঁকব কি? ...... হ্যাঁ এই আরামকেদারাটা কোথায় রাখবে, থিও? এই বাতির নিচে না ঐ জানালার পাশে? হুঁ, এতদিনে তবু নিজের একটা স্টুডিও হল।'

'পরের দিন ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই ভিনসেন্ট ওঠে ছবি আঁকার নতুন সরঞ্জামগুলো ঠিক করে ফেলল। তারপর থিও উঠলে চা খাবার জন্য নিচে গেল।

ভিনসেন্টের ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে, থিও তা বুঝতে পারল।

'দেখ ভিনসেন্ট, তুমি তো তিন মাস স্কুল করেছো, না .... না কোরম্যানের স্কুল নয়, প্যারিসের স্কুল। গত তিন শত বৎসরে ইউরোপে যেসব শ্রেষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা তো তুমি দেখেছ। এখন তো তুমি .....

ভিনসেন্ট লাফিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয় এবার আমি .....'

'আরে বসো, বসে খাও। উত্তেজিত হয়ো না, যথেষ্ট সময় আছে। আমি পাইকারিভাবে ক্যানভাস রঙ ইত্যাদি এনে দেব। কোন অসুবিধা হবে না তোমার। হ্যাঁ, ভাল কথা দাঁতের গোড়াটায় অস্ত্রোপচার করিয়ে নাও। স্বাস্থ্যটা ভাল করতেই হবে, একথাটা মনে রেখ। তারপর ধীরে সুস্থে ও সাবধানে কাজ আরম্ভ কর।'

'কি বাজে বকছ, ধীরে সুস্থে কাজ আমি কবে করতে পেরেছি।'

সত্যি তাই। একটা উদ্দাম গতি যেন তাকে পেয়ে বসল। ভিনসেন্টকে ঠাণ্ডা করতে থিও হিমসিম খেয়ে যেত। তর্ক তুলে ভিনসেন্ট তাকে অস্থির করে তুলত। মাঝে মাঝে সে মদ পান করত প্রচুর। থিও বাধা দিতে চেষ্টা করত।

প্যারিসের প্রাণান্তকর গ্রীষ্ম এসে পড়ল। এই সময়ও প্রত্যেক দিন ভোরে ইজেলটা কাঁধে নিয়ে ছবির উদ্দেশ্যে ভিনসেন্ট বেরিয়ে পড়ত। হল্যান্ডে সে এমন কখনও দেখে নি। এমন রঙ বেরঙের পুষ্প সমাবেশও দেখেনি। প্রায় প্রত্যেকদিনই সে গুপীলদের ওখানে যেত আলোচনায় যোগদান করতে।

একদিন গগ্যাঁ তাকে রঙ মেশাবার কাজে সাহায্য করার জন্য এলো।

'এসব রঙ কোথা থেকে কিনেছ?' সে শুধালো।

'পাইকারিভাবে থিও এনেছে।'

'Pere TANGUY-র দোকান থেকে তোমার রঙ কেনা উচিত। ওর দোকানের জিনিসপত্রের দাম সবচেয়ে কম।

'কে এই Pere TANGUY-র, ওর কথা তো আগে বলতে শুনি নি।'

পথে চলতে চলতে গগ্যাঁ Pere TANGUY-র গল্প করতে লাগল। সে বলল, 'প্যারিসে এসে TANGUY এডওয়ার্ডদের ফার্মে রং গুড়া করত। তারপর নিজেই ছোট্ট একটা দোকান করল। আমরা সবাই ওর ওখান থেকে রঙ কিনতাম। হঠাৎ ও কম্যুনিস্ট দলে যোগ দিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ওর দু'বছর জেল হয়। অবশ্য আমরা তাকে ছাড়িয়ে আনি। তারপর আবার সে রু ক্লনেলে এসে ছোট্ট একটি দোকান খোলে। সে-ই সর্বপ্রথম সিজানার ছবি দোকানে টাঙিয়ে রাখে। তারপর থেকে আমাদের ছবিগুলোও সেখানে স্থান পায়। কিনে রাখবার মত অর্থ তার নাই। যেসব ছবি সে রাখে তাও বিক্রয় করে না।'

'তার মানে ভাল দাম পেলেও বিক্রি করে না?'

'না।'

'তাহলে ছবিগুলো রাখার সার্থকতা কি?'

'অদ্ভুত প্রকৃতি ওর, তবে আর্টের কদর বোঝে। তোমার ছবি যদি চায়, তবে দিয়ে দিও। এতে প্যারিসে তো পরিচয় লাভ করবে।'

তারা Pere-র দোকানে এসে হাজির হল।

'Pere আমার বন্ধু ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক একজন পাকা কম্যুনিস্ট।'

'আসুন।' মেয়েলি কণ্ঠে Pere বলল। 'আপনি কি সত্যি কম্যুনিস্ট, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ?'

'কম্যুনিজম বলতে আপনারা কি বোঝেন আমি তা জানি না মঁসিয়ে। আমি বুঝি প্রত্যেক লোককে তার সামর্থ্য মত কাজ করতে হবে একটু এবং পরিবর্তে তার প্রয়োজনীয় অর্থ তাকে দিতে হবে।'

এ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। আলোচনা করতে করতে এক সময় গগ্যাঁ আরও কিছু রঙ তাকে ধার দেবার জন্য Pere কে অনুরোধ জানাল।

পূর্বের অর্থ পরিশোধ না হলে Pere রং দিতে অস্বীকৃত হল।

ঠিক এই সময় Pere-এর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকল।

'খয়রাত করার জন্য এই দোকান খুলেছি বলেই কি তোমার ধারণা নাকি গগ্যাঁ? আমাদের চলবে কি করে? কম্যুনিজম খেয়ে তো বাঁচতে পারব না। ভাল চাও তো টাকা পয়সা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দাও, নইলে আমি পুলিশ লেলিয়ে দেব বলছি।'

গগ্যাঁ তার বিশ্বমোহিনী হাসি হেসে TANGUY-র স্ত্রীর করে চুম্বন করল।

'আঃ আজ ভোরে তোমাকে কি দেখাচ্ছে, জান্তিপি।'

'ওকথা বলে আমাকে ঠকাতে পারবে না ছুঁচো। কষ্ট করে যে রঙ তৈরি করি, তা নিয়ে আর পালিয়ে থেকে পার পাবে না হুঁ।

'ওগো, আমার মানিক এত নির্দয় হয়ো না আমার উপর। তোমার প্রাণটা তো আর্টিস্টের প্রাণ, তোমার সুন্দর মুখেই তো তার ছাপ রয়েছে।

মাদ্যম TANGUY মুখটা মুছে ফেলল।

সংসারে একজন আর্টিস্টের ঠ্যালাই সামলান দায়, আবারও আরেকজন! দরকার নেই।'

'সারা প্যারিস তোমার সৌন্দর্য আর সামর্থ্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ, মাদাম।' বলে গগ্যাঁ আবার ওর হাতে চুম্বন করল। Pere-র স্ত্রী এতে যেন কিছু নরম হল।

'ইস কি পাকা বদমায়েস আর চাটুকার তুমি। নাও, এবার কিছুটা রঙ নিয়ে যাও, কিন্তু টাকা পয়সা শিগগির শোধ করে দিও।'

'তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ, সুন্দরী জান্তিপি। আমি শীঘ্রই তোমার ছবি আঁকব। আর ঐ ছবি একদিন শোভা পাবে ল্যুভার চিত্রশালায়। আমার ও তোমার নাম হয়ে থাকবে চিরস্মরণীয়।'

এমন সময় একজন নবাগত এসে ঘরে ঢুকল।

'জানলার ধারে যে ছবি রয়েছে,' আগন্তুক শুধালো, 'কে এঁকেছে ওটা।'

'পল সিজান।'

'সিজান? কই ওর নাম শুনিনি তো? বিক্রি করবে ওটা?'

'ওটা, না, মানে অনেক আগেই .....'

মাদাম Tanguy আগন্তুকের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ নিশ্চয় বিক্রি হবে।'

'কত দাম?'

'কত দাম চাইব Tanguy?' কঠিন স্বরে মাদাম বললেন।

'তিন বা ....'

'Tanguy!'

'দুই বা .....'

'Tanguy!' এবার মাদামের কণ্ঠস্বর যেন বজ্রকঠিন।

'বেশ, একশ ফ্রাঙ্ক।'

'অপরিচিত একজন চিত্রকরের ছবির দাম একশ ফ্রাঙ্ক?' বেশি মনে হচ্ছে। আমি পঁচিশ ফ্রাঙ্কের বেশি দিতে পারব না।'

মাদাম Tanguy জানালা থেকে ছবিটা নামিয়ে আনলে।

'দেখুন মঁসিয়ে কত বড় ছবি। আর এর দাম আপনি মাত্র পঁচিশ ফ্রাঙ্ক দিতে চান?'

'হ্যাঁ, এর বেশি আমি দিতে পারব না।'

কিছু আলাপ-আলোচনার পর ঐ দামেই ছবিটা বিক্রি করে দিল। তারপর মাদাম চলে যাবার পর Pere Tanguy ভিনসেন্টকে বলল, 'আপনি একজন আর্টিস্ট মঁসিয়ে?

আশা করি, আমার এখান থেকেই আপনি রঙ কিনবেন। আপনার আঁকা কয়েকটি ছবি দেখলে খুশি হব।'

'বেশ দেখাবো। এ ছবিগুলো তো বেশ। বিক্রির জন্য নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এ দুটো আমি নিতে চাই। কত দাম পড়বে?'

'প্রত্যেকটির দাম তিন ফ্রাঙ্ক করে।'

'হোকগে আমি এ দুটো নেব। ওমা পকেট দেখি খালি। গগ্যাঁ তোমার কাছে ৬টা ফ্রাঙ্ক আছে?'

'ঠাট্টা কর কেন?'

'থাক তবে নেওয়া আর হল না।' বলে ছবি দুটো নামিয়ে রাখল। Pere-ছবি দুটো ভিনসেন্টের হাতে দিয়ে বলল, 'আপনার কাজের জন্যে ছবি দুটো দরকার নিয়ে যান। পয়াস একদিন শোধ করে দেবেন।'

১০.

থিও একদিন ভিনসেন্টের বন্ধুদের এক পার্টি দিল। গগ্যাঁ, লট্রেক, রুশো, স্যুরাট, সিজান প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু এই পার্টিতে যোগ দিল। একটানা আলাপ আলোচনা খাওয়া দাওয়া চলল। যে উৎসাহ উত্তেজনা ও উদ্দীপনা প্রকাশ পেল এদের কথাবার্তা ও চলাফেরায় তা সত্যি অভূতপূর্ব।

গগ্যাঁ সিজানের সঙ্গে তর্ক করছিল।

'তোমার ছবিগুলো একেবারে ঠাণ্ডা সিজান.' সে চীৎকার করে বলল, 'একেবারে বরফের মত চিন্তা। ওর দিকে তাকালেই আমার শরীর হিম হয়ে আসে। তোমার ছবিতে এক ফোঁটাও ভাবাবেগ নেই।'

'আমি ভাবাবেগকে অঙ্কিত করতে চেষ্টা করি না'– সিজান জবাব দিল,'ওটা ঔপন্যাসিকদের জন্য রেখে দিয়েছি। আমি ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি আঁকি।'

'তুমি ভাবাবেগের ছবি আঁক না, কারণ পার না। তুমি চোখ দিয়ে যা দেখ তাই আঁক, তাই এমন হয়।'

'অন্যে কি দিয়ে আঁকে শুনি?

'নানা জিনিস দিয়ে।' বলে গগ্যাঁ সবার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে দিল। 'লট্রেক তার প্লিহা দিয়ে আঁকে। ভিনসেন্ট আঁকে তার অন্তর দিয়ে। স্যুরাট আঁকে তার মন দিয়ে, সেও তোমার মত খারাপ। আর রুশো আঁকে তার কল্পনা দিয়ে।'

'আর তুমি কি দিয়ে আঁক গগ্যাঁ?'

'জানি না, জানার চেষ্টাও করি নি।'

'আমি বলছি'– লট্রেক বলল,'তুমি আঁক তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে।' গগ্যাঁর উচ্চহাসি থামলে পরে স্যুরাট হেঁকে বলল,'মন দিয়ে আঁকি নি বলে ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু এর জন্যই আমি জানতে পেরেছি কি করে আমি আমার ছবিকে দু দিক দিয়ে উপযোগী করতে পারি।'

'আবার কি নতুন করে বাজে কথা শুনতে হবে নাকি?' সিজান বলে উঠল।

'চুপ কর, সিজান, গগ্যাঁ কোনখানে বসে পড় দেখি। রুশো তোমার আত্মপ্রশংসা বন্ধ কর। লত্রেক আমাকে একটা ডিম ছুঁড়ে দাও। ভিনসেন্ট আমাকে এক গ্লাস মদ দাও দেখি। হ্যাঁ এইবার সবাই শোনো!'

'কি হচ্ছে স্যুরাট? তোমাকে তো এত উত্তেজিত আমি কোনদিন দেখি নি।'

'শোন। আজকের পেন্টিং-এর রূপ কী? হালকা। কী ধরনের হাল্কা? অনুক্রম পরম্পরা। রঙের সীমারেখা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে..'

'এটা পেন্টিং নয়—এটা হচ্ছে Pointillism!'

ভাগবানের দোহাই জর্জ, আমাদের উপর আর বুদ্ধির কারচুপি দেখিও না।'

'চুপ। আমরা ছবি আঁকি। সে ছবি নিয়ে কয়েকটা বোকা একটা ভয়ানক স্বর্ণফ্রেমে এঁটে দেয়। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, ছবিকে ফ্রেমে না আঁটা পর্যন্ত এবং সে ফ্রেমটিকে ছবির উপযুক্ত করে না অঙ্কিত করা পর্যন্ত ছবি আমরা হাতছাড়া করব না।'

'তাহলে ঘরটাও রঙ করতে হয়। কারণ যে ঘরে ছবিটা টাঙানো হবে, তার রঙ যদি বেমানান হয়, তবে ছবি যে অসুন্দর দেখাবে।'

'তাহলে তো ঘরটাও রঙ করতে হয়।'

'চমৎকার আইডিয়া' স্যুরাট বলল।

'সে বাড়ির সেই ঘর তার কি হবে?'

'আর যে শহরে সেই বাড়িটা অবস্থিত, তারই বা কি হবে?'

'আঃ জর্জ, কি বাজে বকছ?'

'এই জন্যই তো বলি তুমিই মস্তিষ্ক দিয়ে আঁক।'

'আচ্ছা, সর্বদা তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো কেন?' ভিনেসেন্ট জানতে চাইল।'মিলে মিশে কাজ করতে পার না কেন?'

'একসাথে মিলে মিশে কাজ করলে কি লাভ হবে বলতে পার?' গগ্যাঁ বলল।

'বলছি শোনো,' একটা ডিম খেতে খেতে ভিনসেন্ট বলল।'আমি একটা পরিকল্পনা রচনা করেছি। আমাদের কোনো পরিচয় নেই। ম্যানেট, দেগা, মিসলি এবং পিস্যারো আমাদের পথ প্রস্তুত করে গেছে। তাদের কাজ সমাদৃত হয়েছে এবং বড় বড় গ্যালারিতে রাখা হয়েছে। তারা আজ রাজপথের চিত্রশিল্পী, কিন্তু আমরা পচা গলির। পাশের রাস্তার রেস্তোরাঁয়, শ্রমিকের বেস্তোরাঁয়ও তো আমরা ছবি রাখতে পারি। প্রত্যেকদিন আমরা ছবিগুলোকে নতুন জায়গায় রাখবো। শ্রমিকেরা যা দাম দিতে পারে, তাতেই আমরা ছবি বেচে দেব। লোকজনের চোখের সম্মুখে আমাদের ছবি রাখা ছাড়াও প্যারিসের দরিদ্র জনসাধারণকে ভাল চিত্রশিল্প প্রদর্শনের সুযোগ আমরা দিতে পারব, প্রায় নামমাত্র মূল্যে সুন্দর ছবি কেনার সুযোগ দিতে পারব।'

'চমৎকার।' রুশো বলল।

'আমার একটা ছবি শেষ করতে এক বছর লাগে। সেটা আমি পাঁচ টাকায় একটা নোংরা মজুরের কাছে বিক্রি করব তা তুমি কেমন করে ভাবলে?'

'তোমার ছোটো ছোটো স্টাডিগুলো তো দিতে পার।'

'তা পারি। কিন্তু যদি রেস্তোরাঁগুলো তোমাদের ছবি রাখতে রাজি না হয়।'

'নিশ্চয় রাজি হবে।'

'কেনই বা রাজি হবে না। বিনি পয়সায় তাদের ঘরটা তো সাজান হয়ে যাবে।'

'বেশ, কিন্তু বন্দোবস্ত করবে কে?

'সেও ঠিক করেছি।' ভিনসেন্ট বলল– 'Pere Tanguy হবে আমাদের ম্যানেজার। সেই রেস্তোরাঁ ঠিক করবে, ছবি টাঙাবে, টাকা তুলবে।'

'ঠিক বলেছ।'

'রুশো একবার গিয়ে pere কে ডেকে নিয়ে আসো না।'

'আমাকে তোমরা বাদ দিতে পার।' সিজান বলল।

'কেন?' গগ্যাঁ জিজ্ঞাসা করল। 'তোমার সুন্দর ছবিগুলো মজুরদের দৃষ্টিপাতে নষ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছ?'

'না না, তা নয়, আমি এ মাসের শেষে দেশে চলে যাচ্ছি।'

'এদিক দিয়ে একবার চেষ্টা করো'– ভিনসেন্ট বলল, 'এতেও যদি কিছু না হয়, তবে নয় চলে যেও।'

'বেশ।'

এরমধ্যে pere হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। রুশোর নিকট নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে সে যা শুনেছিল, তাতেই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল।

সবটা শুনে সে বলল, 'আমার বন্ধুর একটা রেস্তোরাঁ আছে। সেখানেই প্রথমত ছবি রাখা যাবে। বন্ধুও খুব খুশি হবে। তাছাড়া এখানে রেস্তোরাঁর অভাব কি?'

'কবে আরম্ভ করা যাবে?' ভিনসেন্ট বলল।

'কবে কেন? কালই আরম্ভ করো।' ভিনসেন্ট বলল।

Tanguy টুপিটা খুলে একপায়ে একবার ঘুরে নিল।

হ্যাঁ,হ্যাঁ, কালই। ভোরে তোমাদের ছবি নিয়ে এস, আমি দুপুরে সেগুলো রেস্তোরাঁ নোভিন-এ টাঙিয়ে দেব। লোকজন খেতে এসে অবাক হয়ে যাবে। আমাদের প্রথম প্রদর্শনী সার্থক হোক।

১১.

পরের দিন দ্বিপ্রহরে পেরি ভিনসেন্টের বাসায় এসে হাজির হল।

'নেভিনদের ওখানে যদি আমরা সবাই ডিনার খাই তবেই ওরা ছবিগুলো ওখানে টাঙাতে দিতে সম্মত হয়েছে'– সে বলল।

'বেশ তা।'

'অন্যেরাও রাজি হয়ে গেছে। সাড়ে চারটার আগে ছবি টাঙান চলবে না। চারটার সময় আমার বাসায় আসতে পারবেন। সেখানে থেকে সবাই মিলে একসঙ্গে যাব।'

'যাব।'

নির্দিষ্ট সময়ে সে পেরির ওখানে গিয়ে হাজির হল। একটা ঠ্যালা গাড়িতে ছবিগুলো তুলে নেওয়া হল। পেরি গাড়িটা টেনে নিয়ে চলল। গাড়ির পেছন পেছন জোড়ায় জোড়ায় চলল ওরা সবাই। নানা গল্প গুজব করতে করতে ওরা হাঁটছিল।

'আজ বিকেলে যে চিঠিটা পেয়েছি তার কথা তোমাকে বলেছি ভিনসেন্ট? ওই যে সুগন্ধ মাখা চিঠিটা। আগে যে লিখেছিল সে-ই চিঠিটা লিখেছে।' রুশো এগিয়ে এসে ভিনসেন্টকে বলল।

'রুশোর এই মেয়েটি কে জান?' লট্রেক ভিনসেন্টকে বলল।

'না, আমি কি করে জানব?'

'এটা গর্গ্যার কীর্তি। রুশো কোনদিন প্রেমে পড়ার সুযোগ পায় নি। এই গর্গ্যা তাকে গন্ধ মাখান চিঠি পাঠিয়ে চলেছে একটি মেয়ের নামে। তারপর একদিন সে মেয়ে সেজে ওর সঙ্গে দেখা করবে। আমরাও সেখানে থাকব। চমৎকার হবে ব্যাপারটা।'

'গর্গ্যা তুমি একটা বর্বর।'

'কি চমৎকার হবে বল তো, ভিনসেন্ট?' গর্গ্যা বলল।

নেভিন রেস্তোরাঁয় এসে ছবি টাঙাতে আরম্ভ করলেই শিল্পীদের মধ্যে একটা মতবিভেদ প্রচণ্ড হয়ে উঠল। কোন ছবি কোথায় টাঙান হবে এবং কিভাবে টাঙান হবে তা নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ হল। খাওয়া দাওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে বলে রেস্তোরাঁর মালিক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে পেরি ভিনসেন্টকে দু ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলল– 'ওদের নিয়ে পানশালায় চলে যাও। আমি নির্বিবাদে কাজ করে নি।' ওরা সবাই চলে গেলে পেরি নির্বিবাদে ছবিগুলো টাঙিয়ে ফেলল এবং বড় একটা কাগজে লিখল বিক্রয়ের জন্য। সস্তা দাম। মালিকের সহিত আলাপ করুন।

তখন সাড়ে পাঁচটা বেজেছিল। ছটার আগে কেউ বড়ো রেস্তোরাঁয় থাকে না। তবু প্রধান প্রবেশ দ্বার খোলার শব্দ হলেই শিল্পীরা অধীর আগ্রহে সামনের দিকে তাকাচ্ছিল।

'মনে রেখো, ছবি বিক্রয়ের সমস্ত দায়িত্ব পেরির। সুতরাং তোমারা কেউ যেন দরদস্তর করতে যেও না।' ভিনসেন্ট বলল।

'এখনও লোকজন আসছে না কেন? দেরি হয়ে যাচ্ছে না?' রুশো জিজ্ঞাসা করল।

ঘড়ির কাঁটা যতই ছয়টার নিকটবর্তী হতে লাগল এদের উদ্বেগও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল।

'দেখ দেখ ওই লোকটা বোধহয় এখানে আসবে, ছবি কিনতেই আসবে বোধহয়।' রুশো চুপি চুপি বলল।

লোকটা নোভিনের পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজল। শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেওয়া হল। একজন শ্রমিক ঘরে ঢুকল।

লোকটা টেবিলে বসে খাবার হুকুম দিল এবং খাবার আসতেই মাথা নিচু করে খেতে লাগল। পরে আরও দুজন শ্রমিক ঘরে ঢুকল। বসে পড়েই তারা কি বিষয় নিয়ে দারুণ বিতর্ক শুরু করল। ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁ ভরে উঠল, পুরুষের সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রীলোকও এল। ঘরে ঢুকেই যেন তারা যার যার নির্দিষ্ট টেবিলে বসে পড়ল। একবার খাদ্য তালিকাটা দেখে নিয়ে কোন কোন জিনিসের অর্ডার দিয়ে একান্তভাবে খাওয়াতে

মনোনিবেশ করল। তারপর খাওয়া শেষে পাইপ জ্বালিয়ে তাদের কেনা সান্ধ্য দৈনিক পড়তে শুরু করল। এরমধ্যে একবারও তারা দেয়ালের দিকে তাকাল না।

প্রায় সাতটার সময় একজন 'ওয়েটার' এসে জিজ্ঞেস করল,'আপনাদের ডিনার কখন দেব?'

'কেউ কোনো জবাব দিল না।'ওয়েটার'চলে গেল। একজন পুরুষ ও একজন নারী ঘরে ঢুকল।

র‍্যাকে টুপিটা রাখতে গিয়ে তার চোখে পড়ল রুশোর আঁকা ছবিটা–কে তার সঙ্গীকে ছবিটা দেখাল। চিত্রশিল্পীদের সবাই কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। রুশো প্রায় উঠে দাঁড়াল। মহিলাটি নিম্নকণ্ঠে কি বলে হাসল। তারপর বসে পড়ে এক মনে খানা খেতে লাগল।

পৌনে আটটায় ওয়েটার তাদের খানা দিয়ে গেল।কেউ তা স্পর্শ করল না। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ওয়েটার তা নিয়ে গেল।

'দুঃখিত ভদ্রলোকগণ, এবার আমরা দোর বন্ধ করব। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।'

লোকজন সব চলে গিয়েছিল। পেরি ছবিগুলো নামিয়ে ঠেলা গাড়িতে এনে তুলল। তারপর গাড়িটা নিয়ে বাড়ি চলে এল।

১২.

গুপীলদের দোকানে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আর্টের প্রতি একটা নিষ্ঠার পরিবর্তে যে কোন পণ্যের মত ছবি বিক্রয় করাই যেন তাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিক্রির দিকে বিশেষভাবে মন দেবার জন্য থিওর উপর ক্রমান্বয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল।

'আচ্ছাথিও' ভিনসেন্ট একদিন বলল,'তুমি গুপীলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছ না কেন?'

'অন্যরাও এমনি খারাপ'– ক্লান্তভাবে থিও জবাব দিল।'তাছাড়া ওদের সঙ্গে এতদিন ধরে জড়িত আছি। ওদের ছাড়া ঠিক হবে না।'

'কিন্তু তোমাকে ছাড়তেই হবে, হ্যাঁ ছাড়তেই হবে। দিনকে দিন তুমি অসুখী হয়ে পড়ছ। আমার কথা ধরো না, আমি যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি। প্যারিসের তরুণ আর্ট ডিলারদের মধ্যে তুমি বিশেষভাবে পরিচিত। তুমি কেন নিজের দোকান খোল না?'

'এ নিয়ে তো একবার আলোচনা হয়ে গেছে।'

'শোন থিও, আমার একটা চমৎকার আইডিয়া আছে। আমরা সাম্যবাদী পন্থায় আর্টের দোকান খুলব। দোকানে যা বিক্রি হবে আমরা তা ভাগ করে নেব। শহরের বাইরে থাকবে আমাদের গৃহ। সাধাসিধাভাবে চললে অল্প খরচেই আমরা চালিয়ে নিতে পারব।'

'ভিনসেন্ট আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে। আমাকে এবার ঘুমাতে যেতে দাও।'

'রোববার দিন তুমি বেশ ঘুমাতে পারবে। বেশ...বেশ,কাপড় চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়। আমি তোমার শিয়রে বসে কথা বলব। হ্যাঁ, গুপীলদের ওখানে যদি তোমার ভাল

না লাগে তবে চলে এস। প্যারিসের তরুণ চিত্রকররা তোমাকে সাহায্য করবে। আমরা কিছু টাকাও জোগাড় করতে পারব...'

পরের দিন রাতে ভিনসেন্টের সঙ্গে পেরি ও লট্রেক এলো।

'চমৎকার, চমৎকার আইডিয়া আপনার, মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ। আপনাকে এটা করতেই হবে। আমার দোকান ছেড়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে পল্লীতে চলে যাব। আমি রঙ গুঁড়ো করব। ক্যানভাস লাগাবো, ফ্রেম তৈরি করব। আমাকে শুধু খেতে ও থাকার জায়গা দিলেই হবে।

থিও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বই বন্ধ করল।

'কাজ আরম্ভ করার মত টাকা তোমরা কোথায় পাবে?'

'এই যে আমি এনেছি দু'শ কুড়ি ফ্রাঙ্ক, 'Pere Tanguy বলল।' এটুকু আমার সঞ্চয়। এটা আপনি নিন মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ। আমাদের উপনিবেশ সৃষ্টিতে এরা সাহায্য করবে কিছু।'

'লট্রেক তুমি তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এ প্রস্তাবে তোমার মত কী?'

'আইডিয়াটা ভালই মনে হয়। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা কেবল যে সমগ্র প্যারিসবাসীর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছি তা নয়, নিজেদের মধ্যেও বিরোধ করছি। আমরা যদি যুক্তভাবে...'

'বেশ ত তুমি ধনী ব্যক্তি। তুমি আমাদের সাহায্য করবে?'

'উঁহু তাতে কালোনি স্থাপনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমিও পেরির মত দু'শ কুড়ি ফ্রাঙ্ক দেব।'

'আইডিয়া তোমাদের পাগলামি ছাড়া কিছু নয়, ব্যবসা জগৎ সম্বন্ধে তোমাদের যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকত...'

পেরি ছুটে এসে থিওর হাত ধরে বলল, 'দোহাই আপনার, একে আপনি পাগলামি বলবেন না, চমৎকার আইডিয়া এটি। আপনি কেবলমাত্র ...

'এখন আর হামাগুড়ি দেওয়া যাবে না থিও' ভিনসেন্ট বলল। আমরা কিছু টাকা তুলে তোমাকেই আমাদের কর্তা করব। তুমি গুপীলদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছ। এখন থেকে তুমি কম্যুনিস্ট আর্ট কলোনির ম্যানেজার।'

থিও একবার চোখ মুছল।

'তোমাদের মত গুচ্ছের বন্য জন্তুকে পালন করার অবস্থাটা যেন আমি দিব্য দেখতে পাচ্ছি।'

পরের দিন রাতে বাড়ি ফিরে থিও দেখল যে, তার ঘরে আর্টিস্টরা জমে আছে। সবাই কিছু উত্তেজিত। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। ভিনসেন্ট মাঝখানে বসে। সেই এই জমায়েতের কর্তা যেন।

'না, না,' সে চীৎকার করে বলল,'কোন বেতন দেওয়া হবে না। এক মাসের মধ্যে আমরা কোন পয়সাই পাবো না। থিও আমাদের ছবি বেচবে আর শুধু পাবো খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি।'

'যাদের কোন ছবি বিক্রয় হয় না, তাদের কি হবে?' স্যুরাট জানতে চাইল। 'আমরা কতদিন তাদের ভরণপোষণ করব।'

যে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে ও কাজ করবে।'

'চমৎকার'–গগ্যাঁ বলল।'ইউরোপের সমস্ত অবৈতনিক পেন্টারকে আমরা আমাদের দ্বারে পাবো।'

'এই যে মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ।' থিওকে দেখতে পেয়ে পেরি চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই থিওর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল।

তারপর সবাই নিজ নিজ খেয়ালখুশিমত নানা দাবি জানাতে লাগল। গগ্যাঁ বলল যে, সবাইকে মাসে অন্তত দুটো করে ছবি এঁকে দিতে হবে।

'তাহলে আমার আসা হবে না!' স্যুরাট চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বছরে মাত্র একটা বড় ছবি শেষ করি।'

'জিনিসপত্রের কি হবে? পেরি জানতে চাইল, আমি কি সবাইকে সমান পরিমাণ রঙ আর ক্যানভাস দেব?'

'নিশ্চয় না,' ভিনসেন্ট বলল,'যেটুকু দরকার সেটুকু নেব–বেশিও নয়, কমও নয়।

'আচ্ছা আমাদের ছবি বিক্রি আরম্ভ হলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে তার কি হবে? মুনাফা পাবে কে?

'মুনাফা কেউ পাবে না'– ভিনসেন্ট বলল, 'কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হলেও আমরা ব্রিটানিতে দোকান খুলব। তারপর প্রভেন্সে–এমনি করে সারা দেশ জুড়ে। তারপর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।'

'রেলের ভাড়া পাব কোথায়। ঐ লভ্যাংশ থেকে দেওয়া হবে না?'

'কতদূর ভ্রমণ করব তা ঠিক করে দেবে কে?'

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে ওদের এই সভা ভাঙল। থিও প্রায় চারটায় শুতে গেল। কিন্তু ভিনসেন্ট এবং আরও কয়েকজন ওর বিছানার পাশে বসে পড়ল এবং পয়লা তারিখেই গুপীলদের ওখান থেকে পদত্যাগ করবার জন্য জিদ করতে লাগল।

ওদের এই প্রস্তাব ও হাবভাব প্যারিসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ভিনসেন্ট এই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করার কার্যে আপ্রাণ খাটতে লাগল। থিও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওতে জড়িয়ে পড়ল। তার বাড়ি সর্বদাই নানা লোকের সমাগমে গম্‌গম্ করত। সাংবাদিকরা আসত। আর্টের সমালোচকরা আসত নতুন আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে। ফ্রান্সের নানা স্থান থেকে চিত্রকরেরা প্যারিসে আসতে লাগল এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য।

প্রায় তিনহাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় হল। ইউরোপের নানা স্থান থেকেও কিছু কিছু টাকা পয়সা আসতে লাগল। ভিনসেন্ট প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ হল। থিও বারবার বলছিল যে, পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের কমে কাজ আরম্ভ করা যাবে না। দোকান ঘর ও থাকার জায়গাও তারা দেখে রেখেছিল। নতুন চিত্রকরদের এত ছবি আসতে লাগল যে, তা রাখার মত স্থানাভাব দেখা দিল। হাজার হাজার লোক ওই ছোট্ট বাসাটায় আসা যাওয়া করতে লাগল।

ভিনসেন্টের মরারও সময় ছিল না। চিঠিপত্র লেখা, লোকের সঙ্গে দেখা করা, তাদের উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতি করতে করতেই দিন চলে যেত। খাওয়ার সময় সে পেত না, ঘুম তো চোখ থেকে চলেই গিয়েছিল।

বসন্তের প্রথম দিক দিয়ে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক জোগাড় হয়ে গেল। মাসের প্রথম তারিখ থিও গুপীলদের সেখান থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করল। তারপর ব্ল্যু ট্রিনকেট-এ দোকান খোলার ব্যবস্থা করল। সেন্ট জার্মেইন-এর বাড়িটার জন্যে ভিনসেন্ট সামান্য টাকা জমা দিল। যাদের নিয়ে কলোনি খোলা হবে থিও, ভিনসেন্ট, পেরি, গগ্যাঁ ও লট্রেক মিলে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করল। যাদের ছবি প্রথম প্রদর্শিত হবে থিও সেগুলো বেছে ফেলল। দোকানের ভিতরটা ও বাহিরটা কে সাজাবে তা নিয়ে রুশো ও Anquetin- এর ঝগড়া হল। ভিনসেন্টের মত থিও-ও উৎসাহিত হয়ে উঠল। গ্রীষ্মকালেই যাতে কলোনি উদ্বোধন করা যায়, সেজন্য সে চেষ্টা করতে লাগল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর ভিনসেন্ট একদিন ভোর চারটায় ঘুমাতে গেল। থিও আর তাকে ডাকল না। দুপুরের পর তার ঘুম ভাঙল। বেশ হাল্কা লাগছিল তার। স্টুডিওতে ঘুরে বেড়াল। ইজেল-এ একটা অত্যন্ত পুরোনো ক্যানভাস আটকান ছিল। প্যালেটে রঙ শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে রয়েছে। তুমি অনাদৃতভাবে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছ। দেখে ভিতর থেকে কে যেন তাকে মৃদুভাবে বলল,'ভিনসেন্ট। তুমি চিত্রকর? না একজন কম্যুনিস্ট পাণ্ডা?'

সেখান থেকে নিজের আঁকা ছবি ছাড়া সবগুলো ছবি থিওর ঘরে রেখে আসল। তারপর নিজের ছবিগুলো একের পর এক ইজেলের উপরে সাজাল। নাঃ সত্যি তার উন্নতি হচ্ছে। এখন আর এগুলোকে অনুসরণ বলে মনে হয় না। নিজস্ব টেকনিক ফুটে উঠেছে তার ছবিতে।

সর্বশেষ ছবিটি সে ইজেলের উপর রাখল। উত্তেজনায় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিল। সে প্রায় যেন কিছুর কম্পন পেয়ে গেছে। তার ছবিতে ফুটে উঠেছে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ায় নিজের কাজ সঠিকভাবে সমালোচনা করার ক্ষমতা যেন সে পেয়ে গেছে। সে বুঝতে পারল যে, সে ইম্প্রেসনিস্টদের টেকনিকের একটা নিজস্ব রূপ দিতে সমর্থ হয়েছে।

ক্ষণপরে সে গুপীলদের ওখানে গিয়ে হাজির হল এবং থিওকে ডেকে নিয়ে একটা কাফেতে ঢুকে পড়ল। একমাসের মধ্যে আজই তোমাকে নিরিবিলি পেলাম, ভিনসেন্ট'– থিও বলল।

'জানি থিও, মনে হচ্ছে আমি বোকা বনেছি।'

'কি করে?'

'থিও, সত্যি বলত আমি কি চিত্রশিল্পী, না একজন কম্যুনিস্ট সংগঠক?'

'কি ব্যাপার?'

'আমি কলোনি গড়ার ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, আর আঁকারও সময় পাই নি। এরপর কাজ আরম্ভ হলে তো আরও সময় পাব না।'

'হুঁ।'

'থিও, আমি সব ছবি আঁকতে চাই। অন্যের ছবির ম্যানেজার হবার জন্যে আমি এই দীর্ঘ সাত বছর পরিশ্রম করিনি। ছবি আঁকার আকাঙক্ষা আমার তীব্র হয়ে উঠেছে, ইচ্ছে হচ্ছে এখুনি ছুটে এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কিন্তু ভিনসেন্ট.... এতখানি এগুবার পর...'

'বলেছিই তো যে, আমি বোকা বনেছি। থিও একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

'অন্য চিত্রকরদের চেহারা দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাদের কথাবার্তা, থিয়োরী, তাদের অসহ্য ঝগড়া আমাকে পাগল করে দিয়েছে। না, না, হেসো না। আমি আমার কাজ করছি। মভ্‌ বলতেন, 'একটা লোক ছবি আঁকতে পারে অথবা ছবি আঁকা সম্বন্ধে কথা বলতে পারে, কিন্তু এদুটো কাজ একবারে করতে পারে না।'

'তুমি তো কলোনির জন্য খুব ভাল একটা কাজ করেছ ভিনসেন্ট।'

'কিন্তু এখন যাওয়ার সময়, অথচ যাওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। আমার অবস্থা বুঝেছ। ব্রাবান্টে এবং হেগ শহরে যখন একা ছিলাম, সাহসিকতার সঙ্গে একাকী সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়েছি। নিজের ক্ষমতাকে প্রকাশ করেছি নিজের ভাষায়।'

'আর আজ?'

'আর আজ আমি অনেকের মধ্যে একজন। হয়ত তাই, হয়ত নয়। কিন্তু নিজস্বতাকে আমি বিসর্জন দেব কেন? প্যারিসে আসার আগে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু আজ জানতে পেরেছি। তাই দুঃখ হয়।'

এ নিয়ে দু ভাইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। পরে ঠিক হল সবার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, থিও গুপীলদের ওখান থেকে পদত্যাগ করবে না এবং ভিনসেন্ট দক্ষিণাঞ্চলে চলে যাবে।

'এমনভাবে সব ভেঙে দেওয়ার আমাকে ঘৃণা করো না, থিও।'

'ঘৃণা তোমাকে?' থিও ম্লান হাসল। পরে ওরা ওখান থেকে চলে গেল।

১৩.

স্বীয় অঙ্কনের মানকে বন্ধুদের পর্যায়ে তুলবার জন্যে ভিনসেন্ট আরও একমাস ধরে চেষ্টা করল।

রঙের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করলেও ভাব প্রকাশের ধরনটা মনঃপুত হল না। এদিক দিয়ে উন্নতি সাধনের জন্য সে নানাভাবে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন লাভই হল না।

'কেন যে আমার রেখাঙ্কন নির্ভুল হচ্ছে না, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমি পারি'– ভাইয়ের হাত থেকে ক্যানভাসটা নিয়ে থিও বলল।

'পার? বলত কি?'

'বাধা হচ্ছে প্যারিস।'

'প্যারিস?'

'হ্যাঁ। প্যারিস তোমার শিক্ষাকেন্দ্র যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন তুমি ছাত্রই থেকে যাবে। হল্যাণ্ডের স্কুলের কথা মনে আছে তোমার, ভিনসেন্ট? কি করে কাজ করতে হয় তা আমরা শিখেছি, লোকে কি করে কাজ করে, তাও জেনেছি, কিন্তু নিজেরা হাতে কলমে কিছুই করতে পারি নি।'

'তুমি কি মনে করো যে, বিষয়বস্তুগুলো সমবেদনাশূন্য?'

'না, কিন্তু তোমার শিক্ষকদের ধারাকে তুমি পরিত্যাগ করতে পারোনি। তোমাকে তা ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব লাগবে, কিন্তু তবু তোমাকে যেতে হবে। কোথায় যাবে, তা তুমিই ঠিক করো।'

আফ্রিকা যাবে বলে ভিনসেন্ট ঠিক করল।

এরপর পল সিজানা একদিন বন্ধুদের নিয়ে একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করল। সেখানে কে কোথায় যাবে, সে নিয়ে আলোচনা চলল। ভিনসেন্ট বলল যে, সে আফ্রিকা যাচ্ছে। অন্যেরা তাকে অন্যত্র যাবার কথা বলল, সে রাজি হল না।

'আচ্ছা, তুমি আর্লসের কথা ভেবেছ।' লট্রেক জিজ্ঞাসা করল।

'সেখানকার সূর্যালোক কি তীব্র?'

'তীব্র মানে তোমাকে পাগল করে ছাড়বে। আর আর্লসের মেয়েরা চমৎকার। যেমনি গড়ন, তেমনি বরণ। এমনটি দেখা যায় না। আর্লসবাসীদের মধ্যথেকেই ভেনাসের মডেল পাওয়া গিয়েছিল।'

'আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে,' ভিনসেন্ট বলল।

'সত্যি তাই।'

'জিনিসপত্রের দাম কেমন? সস্তা?'

'হ্যাঁ।'

'আর্লস' ভিনসেন্ট আপন মনে বলল, 'আর্লস আর আর্লসবাসী। আমি একটা মেয়ের ছবিও আমাকে আঁকতেই হবে।'

'তুমি নাকি আর্লস যাচ্ছ?' পরের দিন তুলো লট্রেক বলল,'ভালই। চমৎকার জায়গা–চিত্রশিল্পীর স্বর্গ।'

সেদিন সন্ধ্যায় থিও ও ভিনসেন্ট একটা কনসার্টে যোগদান করল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে নিজেদের বাল্যকালের কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। পরের দিন ভিনসেন্ট ভাইয়ের জন্য কফি বানালো। তারপর সে দোকানে চলে যাওয়ার পর ঘরটাকে ভাল করে সাজালো এবং দেওয়ালে কতকগুলো ভাল ভাল ছবি টাঙালো।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে থিও টেবিলের উপর নিচের চিঠিখানা পেল।

প্রিয় থিও, আমি আর্লস চললাম। ওখানে পৌঁছে তোমাকে চিঠি দেব।

তুমি যাতে আমাকে ভুলে না যাও, সেজন্য আমার কয়েকটা ছবি দেওয়ালে টাঙিয়েছি।

ষষ্ঠপর্ব

আর্লস

১.

মনে মনে করমর্দন করছি। ভিনসেন্ট।

তীক্ষ্ণ ও তীব্র সূর্যালোক চোখের উপর পড়তেই ভিনসেন্টের ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেন তখন আর্লস-এ এসে পৌঁছেছে। সে একটা তৃতীয় শ্রেণির কামরা থেকে নামল এবং স্টেশন থেকে লামার্টিন প্লেস পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে, তা ধরে হাঁটতে থাকল। লামার্টিন প্লেসের একধারে রোন নদীর বাঁধ, অপরদিকে বিভিন্ন কাফে ও বাজে কতগুলো হোটেল। হোটেল ডি লা গেরির একখানা ঘর সে ভাড়া নিল। ঘরে একটা নড়বড়ে খাট, ফাটল ধরা কলস, একটা অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার ছিল, হোটেল -এর মালিক তাকে একটা সাদামাটা টেবিল এনে দিল। ইজেল বসাবার মত জায়গা ঘরে ছিল না।

জিনিসগুলো রেখে দিয়ে সে শহর দেখতে বের হল। দুদিক দিয়ে শহরের মধ্যস্থলে পৌঁছান যেত। ভিনসেন্ট সোজা রাস্তা ধরে চলতে লাগল। পথটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে, ভিনসেন্ট হাত ছড়ালেই দুই পাশের বাড়িগুলো দুহাতে স্পর্শ করতে পারত। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে বসে রাস্তাগুলো দশ গজের বেশিও একটানা সোজা হয় নি। পথে আবর্জনা পড়েছিল ইতস্তত, বাড়ির দোরে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়েছিল, সর্বোপরি একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছিল চারিধারে। রাস্তা পেরিয়ে এবং আরও কিছু পথ এগিয়ে অবশেষে সে একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল এবং ঐ পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পাইপ ধরাল এবং চারদিকের শোভা দেখতে লাগল। রঙের এমন পরিস্ফুটন আর সে দেখে নি। বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে গেল। এর রূপ ও রঙকে চিত্রপটে ফুটিয়ে তোলার আকাঙক্ষায় সে হোটেলে গেল ইজেল, রঙ আর ক্যানভাস নিয়ে আসার জন্য। ইজেল নিয়ে এসে একটা টানা সাঁকোর পাশে ছবি আঁকতে বসে গেল। রঙ ও রেখা সম্পর্কে স্যুরাট, গগ্যাঁ, সিজানা ও লট্রেক যা বলেছিল, তা সে ভুলে গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে রঙের সৌন্দর্যরস পান করতে লাগল। চোখ খুলে এমন রঙের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা দুষ্কর ব্যাপার।

প্রায় ডিনারের সময় সে হোটেলে ফিরল। পানাগারের একটা ছোট্ট টেবিলে বসে সে মদের অর্ডার দিল। ভিনসেন্টের হাতে মুখে জামায় কাপড়ে রঙ মাখা দেখে পাশের এক সাংবাদিক ভদ্রলোক তার সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

'অল্পদিন এখানে এসেছেন বুঝি?' ভিনসেন্টকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ।'

'বেশিদিন থাকবেন?'

'হ্যাঁ।'

'উঁহু এখানে বেশিদিন থাকবেন না, এটা একটা আস্ত পাগলা গারদ।

'কি করে মনে হল আপনার?'

'মনে হবার ব্যাপার নয়, এ আমি জানি।' বলে তিনি আর্লসের একটা ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করলেন। এখানকার রৌদ্রের ফলে মানুষ কি করে দগ্ধ হয়, দুরন্ত বায়ুপ্রবাহের ফলে কি করে জীবজন্তু, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামারের ক্ষতি সাধিত হয়। বর্ণনা শেষ করে তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমি কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি।'

তারপর আরও কতক্ষণ ধরে তাদের আলাপ আলোচনা চলল। সাংবাদিক ভদ্রলোক এটাই বিশেষ জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, আর্লস শহরটা হচ্ছে মৃগী রুগীর মত। অবস্থা তার সঙ্গীন। যে কোন সময় হাত পা ছুঁড়তে শুরু করতে পারে। তার এত ভয় প্রদর্শনও কোন কাজে এল না। এক্ষুণি আর্লস পরিত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত ভিনসেন্ট ভদ্রলোককে জানিয়ে দিল।

২.

প্রত্যেকদিন ভোরে ভিনসেন্ট বেরিয়ে যেত এবং নতুন নতুন জায়গায় বসে একখানা করে ছবি শেষ করত। তারপর হোটেলে ফিরেই সান্ধ্যভোজের পরই ঘুমিয়ে পড়ত।

কি আঁকছে, তার আঁকা ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সেদিকে ভিনসেন্টের কোন নজর ছিল না। সে এক মনে একটির পর আর একটি ছবি শেষ করে যাচ্ছিল। কোন কোন দিন দপুরের মধ্যেই একখানা ছবি শেষ করে ফেলত। এক কাপ কফি খেয়ে আবার নতুন একখানা ক্যানভাস ধরত। আট বছর ধরে সে যা শিখেছে, রঙের নেশায় তা যেন নতুন উদ্দীপনায় প্রকাশ পাচ্ছে।

একদিন বাইরে থেকে ছবি এঁকে ফিরে এসে সে একখানা চিঠি পেল। তাতে সে জানতে পারল যে, আন্তন মভ হেগ শহরে মারা গিয়েছেন।

ভিনসেন্ট তবু আপনমনে কাজ করে চলল। যে হারে সে পরিশ্রম করছিল, সেই অনুপাতে খাওয়া-দাওয়া তার হচ্ছিল না। হোটেলের লোকজন সাধারণত খাওয়া দাওয়া করত না। তাই তার খুবই অসুবিধা হতে লাগল। উদরের পরিবর্তে তীব্র সূর্যালোক তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ভাল খাদ্যের পরিবর্তে সে মদ ও তামাক খেতে লাগল। ফলে তার উত্তেজনাই কেবলমাত্র বৃদ্ধি পেতে লাগল।

যতই সে ছবি আঁকতে লাগল, ততই তার মনে হল যে, মণি অথবা মুক্তা খুঁজে পাওয়ার চেয়ে ভালো ছবি আঁকা সহজ নয়। নিজের কাজ সম্পর্কে সে কখনও সন্তুষ্ট হতে পারে নি, তবে তার ছবিতে যে বিন্দুমাত্র আশার আলো ছিল না, তাও নয়। কিন্তু তা অত্যন্ত ম্লান, ক্ষীণপ্রভ। তবু সে ছবি এঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন? বিক্রয়ের জন্য? নিশ্চয় না। সে জানত কেন তার ছবি কিনতে চায় না। তবে এত ব্যস্ততার সঙ্গে সে ছবি এঁকে চলেছে কেন?

জয়ী হবার আকাঙক্ষা ভিনসেন্টের আর ছিল না। সে কাজ করত কারণ, কাজ না করে সে পারত না। স্ত্রী পুত্র এবং গৃহ ছাড়া তার চলতে পারে, প্রেম বন্ধুত্ব এবং স্বাস্থ্য ছাড়া সে বাঁচতে পারে, নিরাপত্তা, আয়াস ও আহার্য ছাড়াও তার চলতে পারে, কিন্তু যা তার নিজের চেয়েও বড়, জীবনের চেয়েও বড়, সেই সৃষ্টি করার শক্তির অভিব্যক্তি ছাড়া সে বাঁচতে পারে না।

৩.

ছবি আঁকতে গিয়ে ভিনসেন্ট এ সত্যটা আবিষ্কার করল যে, রঙের চূর্ণ যত মিহি হবে, ততই তা ভালভাবে তেলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং তেলের সঙ্গে রঙ ভাল করে না মিশলে ছবিতে একটা কর্কশ ভাব ফুটে উঠতে বাধ্য। নিজের ছবির মসৃণতার কারণও সেটাই মনে করে রঙ নিজেই চূর্ণ করে নেবার অভিলাষে ভিনসেন্ট প্যারিসে কয়েকটি রঙ পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাল। এভাবে রঙ চূর্ণ করে দেখল, তাতে খরচও কম পড়ে।

বাজার থেকে কেনা যেসব ক্যানভাসের উপর সে আঁকত, সেগুলোও তার অপছন্দ হতে লাগল। তার অনুরোধে থিও তাকে সাদা ক্যানভাস পাঠাল, সে রাতে বসে তাতে প্লাস্টার লাগিয়ে পরের দিন ছবি আঁকার উপযুক্ত করে নিত।

সে শুনেছিল যে, ছবি উপযুক্ত ফ্রেমে না বাঁধালে ছবির সৌন্দর্য ব্যাহত হয় । তাই সে কাঠ এনে ফ্রেম বানিয়ে তাতে নানা কারুকার্য করতে লাগল। এমনভাবে নিজের রঙ বানালো, ক্যানভাসে প্লাস্টার লাগাল, ছবি আঁকলো, কাঠ এনে ফ্রেম বানালো এবং তাতে চিত্র আঁকলো।

পাগলা হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে তার কাজ ব্যাহত হতে লাগলো। সে হাওয়া যখন দারুণভাবে বইত, তখন তাকে চুপ করে বসে থাকতে হত। তারপর নানা স্থান ও কালের ছবি দেখে বেড়াত। যা দেখত, তাই সে রূপ দিতে চাইত না। সে খুশিমত রঙ ব্যবহার করে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করত। সে বুঝতে পারল যে, পিসারো, যা বলেছিল, তা সত্যি। সে বলেছিল, ঐক্য ও অনৈক্য যাই হোক না কেন, জোরালো রঙ ব্যবহার করে যা রূপায়িত করতে চাও, তাকে অতিরঞ্জিত করা চাই।' মোপাসাঁর একটা বইয়ের ভূমিকাতেও সে এই ধরনের কথা পড়েছে 'লেখক তার সৃষ্ট উপন্যাসের স্মৃতিকে আরও সুন্দর, আরও সহজ এবং আরও দুঃখ মোচন করার জন্য বা অতি রঞ্জিত করার অধিকার আর্টিস্টের রয়েছে।

একদিন প্রচণ্ড সূর্যাতপে বসে সে একটি শস্যক্ষেত্রের ছবি আঁকল। শেষে দ্রুত পদক্ষেপে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। কিছু দূরে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ও একটি বালক যাচ্ছিল। সে শীঘ্রই তাদের ধরে ফেলল। ভদ্রলোককে ভিনসেন্ট চিনত, কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ভদ্রলোকের নাম রুলিন। ওর কাছে এসে সে বলল, 'সুদিন, মঁসিয়ে রুলিন।'

'সুদিন। আপনিই সে চিত্রকর তো?'

'হ্যাঁ।'

'আজও ছবি এঁকে আনলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন আমি একটা মুর্খ মানুষ। আর্ট সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যদি আপনার ছবিটা দেখাতেন, তবে কৃতার্থ হতাম।'

ভিনসেন্ট ছবিটা ওকে দেখাল। খানিকটা দেখে ও বলল, 'দেখুন, মঁসিয়ে, আপনার আঁকা এই শস্যক্ষেত্রটা, আমাদের পাশের শস্যক্ষেত্রের মতই জীবন্ত মনে হচ্ছে।'

'তাহলে এটা আপনার পছন্দ হয়েছে।'

'তা বলতে পারি না, তবে ওটা দেখে আমি হৃদয়ে একটা কিছু অনুভব করি।'

এ বিষয় নিয়ে আরও কথাবার্তা বলতে বলতে তারা হাঁটতে লাগল।কথা প্রসঙ্গে ভগবানের কথা উঠল। ভগবান সম্পর্কে তার কি ধারণা রুলিন তা বলল।

ভিনসেন্ট বলল, 'দেখ ভগবান আছে, কি নেই, সে নিয়ে এখন আর আমি মাথা ঘামাই না। আমি আমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত।' তারপর আবার বলল, 'দেখ আর্লসের লোকেরা তাদের ছবি আমাকে আঁকতে দেবে।'

'তাতে যে আমি সম্মানিত বোধ করব, কিন্তু আপনি আমার প্রতিকৃতি আঁকতে চান কেন? আমি তো কুৎসিত।'

'দেখ রুলিন ভগবান বলে যদি কিছু থাকেন, তবে তারও তোমার মত দাড়ি ও চোখ রয়েছে।'

'আপনি আমাকে নিয়ে পরিহাস করছেন মঁসিয়ে?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'আগামীকাল রাতে আপনি কি আমাদের সান্ধ্যভোজে যোগ দেবেন?'

রাজি হয়ে সে চলে গেল।

৪.

পরের দিন থেকে সে অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে চার পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা চলে যেত ছবি আঁকার জন্যে এবং সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত ছবি আঁকত। তারপর একা একা ফিরে আসত। এমনিভাবে সাত দিনে সে সাতটি বড় ছবি শেষ করল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে হাওয়া আরম্ভ হওয়ায় আবহাওয়ার অবস্থা পরিবর্তন হল। সুতরাং তার পক্ষে ছবি আঁকা বন্ধ রাখতে হল বাধ্য হয়ে।

ছবি আঁকার ব্যাপারে বেহিসাবীভাবে খরচ করার পর হাতের পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার অথচ সোমবারের আগে থিওর টাকা আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই দেরির জন্য থিও কিছুমাত্র দায়ী নয়। সে পূর্বের মত টাকা ও রঙ পাঠিয়ে চলেছিল, কিন্তু ভিনসেন্ট ছবি আঁকার জন্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করায় টাকা পয়সা অসময়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল। সপ্তাহের বাকি চারদিন তাই তাকে তেইশ কাপ কফি ও রুটি খেয়ে কাটাতে হল। রুটিওয়ালা বিশ্বাস করে ধারে ওগুলো তাকে দিয়েছিল।

সোমবার দিন থিও প্রেরিত অর্থ পেয়ে সে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল, যেখানে এক ফ্রাঙ্ক দিলে ভালো খাওয়া পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁটা ছিল অদ্ভুত ধরনের। সেখান থেকেই সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল এবং রাত্রিকালে এই রেস্তোরাঁটির ছবি আঁকল, রাতে ছবি আঁকতে এবং দিনে পড়ে পড়ে ঘুমাতে দেখে আর্লসবাসীরা মজা অনুভব করতে লাগল।

মাসের প্রথম দিকে হোটেলের মালিক যে কেবলমাত্র ঘরের ভাড়া তা নয়, তার আঁকা ছবিগুলো বারান্দায় রাখার জন্য তারও ভাড়া দাবি করল। মালিকের এই অসৎ ব্যবহারে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল, কিন্তু পয়সা কম, অন্যত্র যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও

এখানকার খাওয়া তার পেটের যথেষ্ট ক্ষতি করছিল, এ দিকে শীতও এসে পড়েছে। তাকে একটা স্থায়ী আবাসন ও স্টুডিয়ো এর মধ্যে খুঁজে বের করতেই হবে।

একদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধ রুলিনের সঙ্গে লা মার্টিন প্লেসে হাঁটতে হাঁটতে ভিনসেন্টের দৃষ্টি একটি বাড়ির উপর পড়ল। ঐ বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল দেখে সে রুলিনকে বলল, 'বাড়িটা বড্ড বড়, নইলে এটাই ভাড়া নিতাম।'

'সব বাড়িটা ভাড়া নেওয়ার দরকার নেই মঁসিয়ে, আপনি ইচ্ছা করলে কেবলমাত্র ডানদিকের অংশটাই ভাড়া নিতে পারেন।'

'সত্যি, কয়টি ঘর আছে? ভাড়া কি খুব বেশি?'

'তিন চারটি ঘর আছে। হোটেলে যে খরচ লাগত তার অর্ধেকের বেশি লাগবে না। আগামীকাল ডিনারের সময় এসে বাড়িটা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া যাবে।'

পরের দিন রুলিন ভিনসেন্টকে নিয়ে বাড়িটা দেখতে গেল। সংবাদ দেওয়ায় বাড়িওয়ালাও উপস্থিত ছিল। বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইল পনের ফ্রাঙ্ক।

মাত্র পনের ফ্রাঙ্ক! হোটেলে যা চার্জ দিত তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ। সে তক্ষুণি টাকা বের করে বাড়িওয়ালাকে দিল।

'কবে আসবেন বাড়িতে?'

'আজই।'

'কি করে আসবেন? আপনার তো আসবাবপত্র নেই।'

'আমি আজই কিনে নেব। হোটেলে যে নরককুণ্ডে আছি এখানে তা থেকে ভালই থাকব।'

থিওর টাকা সে আগের দিনই পেয়েছিল। তা দিয়ে সস্তায় কিছু জিনিসপত্র কিনল। তারপর নতুন বাড়িতে উঠল। নিচের তলায় ঘরটাকে স্টুডিয়ো করার সিদ্ধান্ত করল। তারপর নানা হাঙ্গামা করে নিজের আঁকার সব সরঞ্জাম নিয়ে এল। অল্প কিছু রান্না করে খেয়ে সে রাতের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন পল গগ্যাঁর কাছ থেকে একখানা পত্র পেল। তাতে সে লিখেছে যে হোটেলের পাওনা না মিটাতে পারায় হোটেলওয়ালা তাকে এবং তার সব ছবি আটকিয়ে রেখেছে। সে আজ অভুক্ত, অসুস্থ ও দারিদ্র্যপীড়িত।

এই পৃথিবীর দরিদ্র উপহসিত ও নিপীড়িত চিত্রশিল্পীদের কথা ভিনসেন্ট ভাবতে লাগল। কেন তাদের এই দুরবস্থা? কি পাপ করেছে তারা? এমনকি অপরাধ করেছে যার জন্যে তারা জাতিচ্যুত ও 'পারিয়া' বলে গণ্য হয়েছে? এমন নিপীড়িত আত্মা কি করে ভাল করতে পারবে? গগ্যাঁর মত এমন শিল্পীর অপমৃত্যু হবে? হায় শিল্প জগতের আজ কি দুর্দৈব।

গগ্যাঁর চিঠিখানা পকেটে পুরে সে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে বেড়াল নানা জায়গায়। মস্তিষ্কে তার একমাত্র চিন্তা গগ্যাঁকে কি করে রক্ষা করা যায়।....হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হয়েছে.... দুজনে বেশ থাকা যাবে...গগ্যাঁকে রক্ষা করা যাবে।

ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরে এল।

৫.

ভিনসেন্ট যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল তার রঙ ছিল হলদে। এই হলদে বাড়িটার প্রেমে যেন সে পড়ে গেল। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যত কম সম্ভব খরচ করে টাকা বাঁচিয়ে তা দিয়ে ঘর দুটো সাজাতে লাগল।

গগ্যাঁকে নিয়ে আসা যত সোজা ভেবেছিল কার্যত তত সোজা ছিল না। থিও অবশ্য গগ্যাঁর ছবির বিনিময়ে মাসে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক করে ভাতা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে যে আসবে তেমন ট্রেন ভাড়াও তার ছিল না। তার উপর সে অসুস্থ। দেনা শোধ করার প্রশ্ন তো রয়েছেই। এ বিষয়ে ওদের তিনজনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলতে লাগল।

ভিনসেন্ট নতুন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করল। একদিন প্রাতে সে ইজেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে তার ইজেল স্থাপন করল। তারপর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর প্যালেটে রঙ গুলে তুলিতে রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুত হল।

'এত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করবে ভিনসেন্ট?' পেছন থেকে কে বলল।

ভিনসেন্ট ঝটিতি পেছন ফিরল। 'এত তাড়াতাড়ি কেন, সারাদিন তো পড়েই রয়েছে।'

অসামান্যা এক সুন্দরী ভিনসেন্টকে নজর দিয়ে দেখছিল ।

'কে তুমি? কি নাম তোমার?'

'আমি মায়া, তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।'

'তুমি আমার নাম জানলে কি করে? আমি কি তোমাকে আগে দেখেছি?'

'না, কিন্তু আমি তোমাকে বহুবার দেখেছি।'

'তুমি বোধহয় ভুল করেছ।'

'জগতে কেবলমাত্র একজন ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘই থাকতে পারে। আমার কোন ভুল হয় নি।'

তারপর আরও অনেকক্ষণ ধরে মায়ার সঙ্গে ভিনসেন্টের আলাপ হোল। আলাপ প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট জানতে পারল যে, ৮ বৎসর আগে সে যখন বোরিনেজে ছিল, তখনই সে তাকে প্রথম দেখে এবং তার প্রেমে পড়ে যায়। এরপর থেকে মায়া তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। মারগটের সঙ্গে তার প্রেমও সে দেখেছে। এর পরেও মায়া তাকে ভালবাসে কিনা ভিনসেন্ট জানতে চাইলে মায়া জোর দিয়ে বলল যে, সে তাকে এখনও ভালবাসে। তাতে ভিনসেন্ট বলল, 'দেখ আমি আজ অসুস্থ, আমার মাড়িতে ঘা হয়েছে। দাঁত বাঁধানো। চুলগুলো রোদে পুড়ে গেছে। সিফিলিজ রোগীর মত আমার চোখ দুটি লাল। মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। আমি অত্যন্ত কুৎসিত। আমার স্নায়ু শিথিল হয়ে পড়েছে, সৃজন করার ক্ষমতাহীন আমি। আমার সারা দেহে বিষ। তুমি কেমন করে এমনি একটি মানুষকে ভালবাসবে?'

'তুমি কুৎসিত নও, ভিনসেন্ট। তুমি সুন্দর। তোমার দেহের উপর তুমি নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়েছ, কিন্তু আত্মার কোন অনিষ্ট করতে পারো নি। ওই আত্মাকেই আমি

ভালবাসি, বেহিসাবীভাবে তুমি হয়ত তোমার দেহের ক্ষতিসাধন করবে, কিন্তু তবু তোমার আত্মা বেঁচে থাকবে, সেইসঙ্গে আমার প্রেমও।

'তুমি কি অনেকদিন থেকে আর্লস-এ আছ?'

'না আমি তোমার সঙ্গে প্যারিস থেকে এসেছি।'

ভিনসেন্ট লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

'তুমি প্রতারক, তুমি আমাকে উপহাস করতে এসেছ। কেউ আমার অতীত তোমাকে বলেছে, তাই শুনিয়ে তুমি আমাকে বোকা বানাতে এসেছ। যাও..চলে যাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'আমি প্রতারক নই প্রিয়তম। আমি তোমার জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। তুমি আমার প্রেমকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না।'

'মিথ্যা কথা। তুমি আমাকে ভালবাস না। আমার সঙ্গে তুমি খেলতে এসেছে।'

মায়া গভীরভাবে ভিনসেন্টকে চুম্বন করল। 'এবার বিশ্বাস হয়েছে?'

একটু থেমে ভিনসেন্ট বলল, 'র‍্যাচেলের ওখানে রাত্রিবাসের পরও কি তুমি আমায় ভালবাস?'

'তুমি পুরুষ, ভিনসেন্ট; পুরুষের মেয়েমানুষ না হলে চলে না। কিন্তু এখন আর ভয় নেই। এখন তুমি একান্তভাবে আমার।'

'মেয়েরা আমাকে কোনদিন ভালবাসে নি।'

'প্রেম করাই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তোমার অন্য কাজও আছে।'

'কাজ? ছবি আঁকা? ও কেউ চায় না। কেউ আমাকে একবারও বলে না প্রশংসার বাণী।'

'একদিন সারা বিশ্ব বলবে ভিনসেন্ট।'

'একদিন। সে স্বপ্ন। যেমন স্বপ্ন, আমার স্বাস্থ্য ভাল হবে, হবে ঘর, অর্থ আর সংসার। আমি আট বছর ধরে ছবি এঁকেছি, কিন্তু কেউ একটা ছবিও কেনে নি। আমি বোকা বনেছি।

'কিন্তু এর পিছনে রয়েছে যে গৌরব, তা আমি জানি। যখন তুমি থাকবে না, তখন বিশ্ব তোমাকে জানবে। যে ছবি আজ একশ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হচ্ছে না বিক্রি হবে একলক্ষ ফ্রাঙ্কে। তুমি হাসছ, কিন্তু আমি সত্য কথাই বলছি। তোমার ছবি স্থান পাবে আমস্টারডাম, হেগ, প্যারিস, ড্রেসডেন, মিউনিক, বার্লিন, মস্কো ও নিউইয়র্কের চিত্রশালায়। তোমার ছবি হবে অমূল্য কারণ তার দাম দেবার মত কেউ থাকবে না। তোমার আর্ট সম্বন্ধে বই লেখা হবে। তোমার জীবন নিয়ে রচিত হবে নাটক ও নভেল, চিত্রশিল্পরসিক দুজন একত্র হলেই তোমার কথা তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।'

'এইমাত্র যদি তোমার ওষ্ঠের আস্বাদন আমি না পেতাম, তবে আমি ভাবতাম যে, হয় আমি স্বপ্নে দেখেছি নয় পাগল হয়ে গেছি।'

'আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড় প্রিয়তম।' মায়া বলল।

ভিনসেন্ট শুয়ে শুয়ে বলে চলল, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রেম ও পীড়নের কথা। বলতে বলতে উত্তেজনা ও অবসাদে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে ভিনসেন্ট দেখল সেখানে আর কেউ নেই। সূর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েছিল। সে ইজেলটা কাঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

'মায়া!' সে আপন মনে বলল, 'মায়া। নামটা কি আগে কোথাও শুনেছি? তবে কি....তবে কি...কি জানি এর অর্থ?'

৬.

দেখতে দেখতে শীতকাল এসে পড়ল। ভিনসেন্ট আপন উষ্ণ স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতে লাগল। আর গগ্যাঁকে নিয়ে আসবার যোগাড়যন্ত্র করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটাও সাজাতে লাগল।

ইতিমধ্যে ভ্যান গোঘ পরিবারের একজন বৃদ্ধ মারা গেল। তাঁর কিছু অর্থ থিও পেল। গগ্যাঁকে নিয়ে আসার জন্য ভিনসেন্টর উৎসাহ দেখে থিও ঐ টাকা থেকে অর্ধেক টাকা দিয়ে গগ্যাঁর শয়নকক্ষ ভাল ভাবে সজ্জিত করে তাকে আর্লস পাঠাবার সিদ্ধান্ত করল। সংবাদ শুনে ভিনসেন্ট খুশি হল। কিন্তু বিনা পয়সায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনেও গগ্যাঁ কেমন উৎসাহ বোধ করল না। এর কারণটা ভিনসেন্ট ঠিক বুঝতে পারল না। তবু ঘরটাকে নানা ফুলে ও অঙ্কনে সজ্জিত করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি আঁকাও চলল। মডেল হোল বারবণিতা র‍্যাচেল, মাদাম রুলিন, যেখানে সে মদ্যপান করতো সেই পানশালার মালিকের স্ত্রী মাদাম জিলো প্রভৃতি।

তারপর বসন্তকাল এলো। গাছে গাছে পুষ্পসম্ভার ঝলমল করতে লাগল। সবুজ শোভায় চারদিক শোভিত হল। ভিনসেন্ট আবার ইজেল কাঁধে নিয়ে গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়ল। গগ্যাঁর ঘরের ছয়টি দেওয়ালে সূর্যমুখী ছয়টি ছবি রাখতে হবে। নানা স্থান থেকে সে ছবি আঁকতে লাগল। এরই ফাঁকে নিজের ঘরটাকে আবার হলদে রঙ করে নিল। এসব করতে করতে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এল সেই মারাত্মক হাওয়া।

এবং তারও সঙ্গে এল পল গগ্যাঁ।

তখনও ভিনসেন্টের ঘুম ভাঙে নি। পল এসে তার ঘুম ভাঙাল, তাকে দেখে ভিনসেন্ট আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে তাকে নিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিল। তার জিনিসপত্র খুলতে সাহায্য করল এবং প্যারিসের সংবাদ জানতে চাইল। কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা গভীর আবেগের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'আজ তুমি কাজ করবে, গগ্যাঁ?'

'আমি কি একটা দানব যে, সারা রাত জেগে এসে এক্ষুণি রঙ তুলি নিয়ে বসে ছবি আঁকতে আরম্ভ করতে পারব?'

'আমি জানতে চাইছিলাম।'

'তাহলে বোকার মত প্রশ্ন কোর না।'

'তবে আমারও ছুটি। চল শহর দেখে আসি।'

কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ি চলে এল খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে।

'তুমি তো ভাল রান্না করতে পার, তাই না গগ্যাঁ?'

'চমৎকার রান্না জানি। নাবিক ছিলাম কিনা।'

'বেশ, ভবিষ্যতে তুমিই হবে রাঁধুনি। তবে তোমার সম্মানার্থ আজ রাতের রান্না আমিই করছি।'

সে রাতের স্যুপ কিন্তু গগ্যাঁ খেতে পারল না।

'কি যে রেঁধেছ ভিনসেন্ট, অখাদ্য, ঠিক তোমার প্যালেটের মত।'

'কেন? আমার ছবির রঙের কি হয়েছে?'

'তোমার ছবির সঙ্গে তোমার প্রকৃতির কোন যোগ নেই। তুমি এই পদ্ধতি ছেড়ে দাও।'

ভিনসেন্ট তার স্যুপের বাটি সরিয়ে রাখল।

'একবার দেখেই সমালোচনা করো না।'

'তুমি তো অন্ধ নও, বেশ তুমিই দেখ। ঐ হলদে রঙটা ভয়ানকভাবে খাপছাড়া হয়েছে।'

ভিনসেন্ট সূর্যমুখী ফুল আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকালো।

'কেবলমাত্র ঐ কি ত্রুটি?'

'না। সমালোচনা করার অনেক কিছু রয়েছে।'

'যেমন।'

'যেমন সামঞ্জস্য। তাছাড়া ওগুলো একঘেয়ে আর অসম্পূর্ণ।'

'মিথ্যা কথা'

'আরে উত্তেজিত হয়ো না, ভিনসেন্ট। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, অভিজ্ঞ, আমার কথা শোন।'

'দুঃখিত পল। আমাকে তুমি সাহায্য করবে তাই আমি চাই।'

'তাহলে আমার কথা শোন। মন থেকে সব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেল। তুমি অযথাই Meissonier ও Monticelli কে অনুকরণ করে চলেছ। ওঁরা অপদার্থ। ওঁদের প্রশংসা করলে ভাল ছবি তুমি কোনদিন আঁকতে পারবে না।'

Monticelli তো একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। রঙ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

'ও একটা বোকা মাতাল।'

ক্রুদ্ধভাবে ভিনসেন্ট উঠে দাঁড়াল।

'সাবধান ও কথা বলো না। ওঁকে আমি ভাইয়ের মত ভালবাসি। আবার যদি বল...'

ভিনসেন্ট শেষ করতে পারল না। উঠে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

৭.

পরের দিন দুজনেই ঝড়গার কথা ভুলে একসঙ্গে বসে কফি খেল, স্ব স্ব নির্বাচিত স্থানে ছবি আঁকবার জন্য চলে গেল। রাতে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ভিনসেন্ট দেখতে পেল গগ্যাঁ ইতিমধ্যেই সান্ধ্য ভোজ প্রস্তুত করছে। সে মৃদুকণ্ঠেই কথা বলতে আরম্ভ

করল, কিন্তু কথা প্রসঙ্গে এসে পড়ল চিত্রশিল্প ও শিল্পীদের কথা। তারপরেই ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল।

চিত্রশিল্পীদের মধ্যে গর্গ্যা যাকে প্রশংসা করত, ভিনসেন্ট করত তাকে ঘৃণা। ফলে ঠোকাঠুকি বেধেই যেত। যে বিষয়ে তারা একমত ছিল, তা নিয়েই যখন আলোচনা হত, তখনও যুক্তি-তর্কের ঝড় বয়ে যেত। তর্ক করতে গিয়ে গর্গ্যা বলত, 'প্রকৃতিতে দেখে নিয়ে স্টুডিয়োতে ফিরে এসে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে যদি ছবি আঁকতে না শেখ, তবে কোনদিন শিল্পী হতে পারবে না।'

'ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে আমি ছবি আঁকতে চাই না। চাই না বলেই আমি আর্লসে এসেছি।'

'যে সব ছবি তুমি এঁকেছ, তা প্রকৃতিরই প্রতিলিপি। নিজের মন থেকে তোমাকে ছবি আঁকা শিখতে হবে।'

'নিজের মন থেকে ছবি আঁকা! হা ভগবান!'

'আর একটা কথা, স্যুরাট বলেছে পেন্টিং হচ্ছে ভাবাত্মক, তা তুমি মনে রেখো। সেখানে তোমার ঐ গল্প বলার বা উপদেশ দেওয়ার কোন স্থান নেই।'

'কি বলছ সব পাগলের মত!'

'উপদেশ যদি দিতেই চাও, তবে তুমি আবার ধর্মযাজক হও গিয়ে। চিত্রাঙ্কন হচ্ছে রঙ, রেখা আর রূপ নিয়ে। সেখানে অন্য কিছু নেই। শিল্পী প্রকৃতিতে কেবলমাত্র অলঙ্কার পরাতে পারে, ব্যস আর কিছু নয়।'

'মণ্ডনশিল্প' ভিনসেন্ট গর্জে উঠল। 'প্রকৃতির থেকে যদি তুমি এই মাত্র পাও, তবে তুমি আমার স্টক এক্সচেঞ্জে ফিরে যাও।'

'তা তুমি কি আবিষ্কার কর শুনি?'

'আমি পাই গতি, পাই জীবনের ছন্দ।'

'তাহলে আমাদের দূরত্ব অনেক।'

'আমি যখন সূর্যকে আঁকি, তখন মানুষকে আমি অনুভব করাতে চাই তার তীব্র গতি। যখন শস্যক্ষেত্রের ছবি আঁকি, তখন চাই যে মানুষ উপলব্ধি করুক শস্যকণিকার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে যে প্রাণশক্তি তাকে।'

'ভিনসেন্ট তোমাকে তো আমি কতবার বলেছি যে, চিত্রশিল্পীর কোন মতবাদ থাকা উচিত নয়।'

'ঐ যে অদূরের দৃশ্যাঙ্কনটির কথাই ধর না কেন, গর্গ্যা। চেয়ে দেখ, মনে হবে ওগুলো যেন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। আমি যখন মানুষের পোর্ট্রেট আঁকি, আমি দেখাতে চাই তার জীবনের গতিকে–সুখ-দুঃখের ছন্দকে।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'শুনবে গর্গ্যা, শোন তবে। ক্ষেতের শস্য, গিরি-নদীর জল, আঙুরের রস এবং মানুষের জীবন–সবকিছু এক ও অভিন্ন। জীবনের একমাত্র ঐক্য হচ্ছে ছন্দের ঐক্য। যে ছন্দে আমরা– মানুষ, গিরিপথ, কর্ষিত ক্ষেত্র, গৃহ, ঘোড়া আর সূর্য–সবাই নৃত্য করি। তোমার মধ্যে যা আছে তা ঐ আঙুরেও বর্তমান–কারণ তোমরা অভিন্ন। যে জাগতিক ছন্দের ফলে আমরা সবাই চলি, সেই ছন্দকে যখন তুমি অনুভব কর, তখন কেবলমাত্র তুমি জীবনকে বুঝতে পার। তা-ই একমাত্র ভগবান!' কথা বলতে বলতে

ভিনসেন্ট উত্তেজনায় কাঁপছিল। ক্ষণপরে দুজনে মদ্য পান করবার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং র‍্যাচেলদের ওখানে যেয়ে উপস্থিত হল।

এমনিভাবে তাদের দিন কাটিতে লাগল–কখনও বিবাদ করে, কখনও ভাব করে। এর মধ্যে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল। বনভূমি পত্রে-পুষ্পে শোভিত হয়ে উঠল। দুজনেই একান্তভাবে ছবি আঁকতে লাগল। মিস্ট্রলের ফলে বাইরে বসে ছবি আঁকার ব্যাঘাত হতে লাগল। সুতরাং ঘরেই তাদের বসে থাকতে হত। সেই সময় মাঝে মাঝে গগ্যাঁ ভিনসেন্টকে রাগাত। ক্রমে মিস্ট্রল কমে এল। সবাই আবার বাইরে বেরুতে লাগল। গগ্যাঁ ও ভিনসেন্টও আবার ছবি আঁকার জন্য বাইরে বেরুতে লাগল।

সারাদিন ছবি এঁকে, সারা রাত ঝগড়া করে, না খেয়ে ওদের মেজাজ ক্রমেই চড়তি হতে লাগল। গগ্যাঁ ভিনসেন্টের একটা পোট্রেট আঁকল, আর ভিনসেন্ট আঁকল লাঙলের ছবি। ভিনসেন্ট ভাল করে পোর্টেটটি দেখল। গগ্যাঁ তাকে কি চোখে দেখে সে যেন তা বুঝতে পারল। 'নিশ্চয় এটা আমার প্রতিকৃতি', সে বলল, 'কিন্তু এটা পাগল আমির ছবি!'

সেদিন সন্ধ্যায় দুজনে মিলে কাফেতে গেল। ভিনসেন্ট মদ দেবার জন্য আদেশ করল। ভিনসেন্ট অকস্মাৎ মদ–শুদ্ধ গ্লাসটা গগ্যাঁর কপাল বরাবর ছুঁড়ে মারল। গগ্যাঁ মাথা সরিয়ে নেওয়ায় আঘাত থেকে বেঁচে গেল। সে ঝটিতি উঠে পড়ে ভিনসেন্টকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

ভিনসেন্ট ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন প্রাতে ভিনসেন্ট শান্তভাবে বলল, 'গতকাল রাতে তোমাকে অপমান করেছিলাম বলে আমার যেন কেমন মনে পড়ছে।'

'আমি খুশি মনে ও সর্বান্তকরণে তোমাকে ক্ষমা করেছি ভিনসেন্ট'– গগ্যাঁ বলল, 'কিন্তু গতকালকার ব্যাপার তো আবারও ঘটতে পারে। আমাকে আঘাত করলে আমিও হয়তো জ্ঞান হারিয়ে প্রত্যাঘাত করতে পারি। সুতরাং তোমার ভাইকে চিঠি লিখেছি যে, আমি এখান থেকে চলে যাব।'

'না না পল, তা হবে না। তোমার জন্য আমি এই হলদে বাড়ি তৈরি করলাম আর তা তুমি ছেড়ে চলে যাবে। সে হতেপারে না।'

সারাদিন ধরে তুমুল তর্ক চলল। গগ্যাঁকে ধরে রাখবার জন্য ভিনসেন্ট বহু যুক্তি দেখাল। গগ্যাঁ তা খণ্ডন করতে লাগল। ভিনসেন্ট অনুরোধ করল, নানা মিষ্ট কথা বলল, অভিসম্পাত দিল, ভয় দেখাল, এমনকি অশ্রু বিসর্জন করল। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেবার শক্তিও যেন গগ্যাঁর হ্রাস পেল। প্রত্যেকটি ঘর যেন উত্তেজনায় পূর্ণ হয়েছিল। গগ্যাঁ ঘুমাতে পারল না। ভোরের দিকে তার কেমন তন্দ্রা এল। অকস্মাৎ একটা অস্বাভাবিক অনুভূতিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। ভিনসেন্ট অন্ধকারে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'ব্যাপার কি?' কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল।

ভিনসেন্ট সেখান থেকে চলে গেল। পরের দিনও তেমনিভাবে গগ্যাঁর ঘুম ভেঙে গেল। দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। পরে অবশ্য

কয়েকদিন ভিনসেন্ট শান্ত হয়ে রইল। এর মধ্যে একদিন গগ্যাঁকে নিয়ে পার্কে গেল। পরে গগ্যাঁ তাকে নিয়ে র‍্যাচেলের ওখানে গেল।গগ্যাঁ সেই বারবণিতা গৃহের একটি মেয়েকে নিয়ে উপরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে ভিনসেন্টকে তার সঙ্গে যাবার আহ্বান জানাল :

'তবে তোমার কানটা আমাকে দাও।'

'বেশ দেব।'

কতক্ষণ পরে গগ্যাঁ নেমে এল। দুজনে হলদে বাড়িতে ফিরে এল। গগ্যাঁ রাতের খাওয়া শেষ করে পথে নেমে পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই সে শুনতে পেল অতি পরিচিত পদশব্দ-হ্রস্ব, দ্রুত, অস্বাভাবিক। গগ্যাঁ ঘুরে দাঁড়াল, দেখল ভিনসেন্ট একটা খোলা ক্ষুর নিয়ে এগিয়ে আসছে। গগ্যাঁ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গগ্যাঁ একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে দরজায় খিল এঁটে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভিনসেন্ট বাড়ি ফিরে ক্ষুর দিয়ে ডান কানটা কেটে ফেলল। তারপর ক্ষুরটা ফেলে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে কাটা জায়গাটা বাঁধল। মাটি থেকে কানটা তুলে ধুয়ে নিয়ে সেটা কাগজ দিয়ে মুড়ে র‍্যাচেলের ওখানে গিয়ে হাজির হল।

'তোমার জন্য উপহার এনেছি র‍্যাচেল।'

'চমৎকার! কি এনেছ, দেখি।'

'এই নাও।'

প্যাকটা খুলেই র‍্যাচেল ভয়ে চীৎকার করে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। সেখান থেকে বেরিয়ে ভিনসেন্ট বাড়ি ফিরে এলো। তারপর ঘরের দোর বন্ধ করে দিল।

পরের দিন প্রাতে গগ্যাঁ যখন হলদে বাড়ির দোরগোড়ায় এলো, দেখে সেখানে ছোটোখাটে একটা ভিড় হয়েছে। রুলিন হতাশায় পাত-পা নাড়ছে।

'বন্ধুকে কি করেছেন মঁসিয়ে?' কঠিন স্বরে একজন বন্ধু বলল।

'জানি না।'

'জানি না...নিশ্চয় জানেন...ও মারা গেছে।'

যারা সেখানে সমবেত হয়েছিল, তাদের দৃষ্টিবাণে গগ্যাঁ অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগল।

'চলুন, উপরে যাই। সেখানে সব বুঝিয়ে বলব।' গগ্যাঁ বলল।

ঘরে ঢুকে গগ্যাঁ ধীরে ধীরে ভিনসেন্টের নিশ্চল দেহে হাত রাখল। উষ্ণতা অনুভব করল দেহের। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহেও এলো যেন একটা নতুন উদ্দীপনার স্রোত।

'দয়া করে একে বাঁচিয়ে তুলুন মঁসিয়ে,' নিম্নকণ্ঠে সে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলল, 'ও যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে, বলবেন প্যারিস চলে গেছি। আমাকে দেখলে ওর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।'

পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাক্তার ও একটা গাড়ি ডাকতে পাঠালেন। তাঁরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চললেন। রুলিন হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়ির সাথে সাথে চলল।

৮.

আর্লসের হাসপাতালের ডাক্তার ফেলিক্স রে ভিনসেন্টের ক্ষতের চিকিৎসা শুরু করলেন।

বিকেলের দিকে ডাক্তার যখন ভিনসেন্টের নাড়ি দেখছিলেন, তখন তার ঘুম ভেঙে গেল। সে চারদিকে তাকিয়ে পরে ডাক্তারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কতক্ষণ পরে জানতে চাইল সে, সে কোথায় আছে।

'হাসপাতালে'– ডাক্তার বলল, 'কানের ক্ষত চিকিৎসার জন্যে আপনাকে এখানে আনা হয়েছে।'

'হুঁ, মনে পড়েছে। আমার বন্ধু কোথায়?'

'সে প্যারিসে চলে গেছে।'

'ওহ্।'

পরের দিন ভোরে যখন ভিনসেন্টের ঘুম ভাঙল, তখন দেখে থিও তার বিছানার পাশে বসে আছে। ভিনসেন্ট জাগতেই থিও ওর হাতটা তুলে নিল। দু'চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল ঝরে পড়ছিল।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর থিও বলল যে, সে ডাক্তারের কাছে জানতে পেরেছিল খোলা মাথায় দুরন্ত রৌদ্রে কাজ করার জন্য তার সর্দিগর্মি হয়েছে। এরপর তাদের আরও কতক্ষণ কথাবার্তা চলল। ইতিমধ্যে একবার ডাক্তার এসে রুগীকে দেখে গেলেন। কথাবার্তায় থিও ভাইকে জানাল যে, যোহানাবুলজের নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, সে তাকে ভালবেসেছে।

দু'দিন পরে থিও চলে গেল।

ক্রমে সে সুস্থ হয়ে উঠল। প্রথমত সে হাসপাতালেই একটু চলত ফিরত। সেখানেই সে ছবি আঁকা শুরু করল। ডাক্তারের একখানা ছবিও আঁকল। কিছুদিন পর হলদে বাড়িতে চলে এল। একদিন র‍্যাচেলের সঙ্গেও দেখা করে এল। বাইরে বেরুতে লাগল ছবি আঁকার জন্য। মোটামুটি তার দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। কিন্তু একদিন খেতে বসে তার মনে হল পূর্বের মত কে যেন কানের কাছে কি বলছে। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। খাওয়া ছুঁড়ে ফেলে দিল। পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে রেখে আসল। তিন সপ্তাহ পরে সে আবার সুস্থবোধ করল। কিন্তু এখন আর তার পক্ষে শহরে বেরুনো সম্ভবপর নয়। কোনো রেস্তোরাঁয় তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ছোট ছেলেরা দেখলে পেছনে ছুটে টিটকারি দিতে থাকে। তারা চীৎকার করে বলে, 'তোমার আরেকটা কান আমাদের দিয়ে দাও।'

একদিন তাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে ভিনসেন্ট অসহ্য ক্রোধে ঘর থেকে ইজেল চেয়ার, টেবিল, ছবি, আয়না প্রভৃতি ছুঁড়ে মারতে লাগল। তারপর উত্তেজিত অবস্থায় জানালার ধারে আসতেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেল।

৯.

সেদিনই প্রায় নব্বই জন স্ত্রী পুরুষ পাগল ভিনসেন্ট ভ্যান গোঘকে আটক করার জন্যে আবেদন জানাল। মেয়রের আদেশ অনুসারে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় নিয়ে আটক রাখা হল। জ্ঞান হবার পর ডাঃ রে কে খবর দেবার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু তা রক্ষিত হল না। থিওকে পত্র লেখার জন্য কাগজ পেন্সিল চাইল, কিন্তু তাও দেওয়া হল না।

ক্ষণপরে অবশ্য ডাঃ এলেন। তাকে দু তিনদিন দেখার পর ডাঃ রে বললেন, 'দেখুন এমনিভাবে অকস্মাৎ উত্তেজিত হওয়া আপনার পক্ষে খারাপ। কোন শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে আপনার থাকা দরকার। তাই আমি বলছি কি, আপনি বরং কতদিন গিয়ে....'

'..... শান্তি আবাসে থাকব?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি কি .....?'

'না, না, ভিনসেন্ট আপনি আমার মতই প্রকৃতিস্থ। কিন্তু আপনার ঐ মৃগী রোগটা খারাপ। সুতরাং ওখানে কিছুদিন থাকা ভাল।'

আরও কিছুক্ষণ তাদের কথাবার্তা হল। প্রথমত অন্য কোথাও যেতে ভিনসেন্ট আপত্তি করল, কিন্তু ডাক্তার নানাভাবে তাকে বোঝালেন; পরে সে রাজি হল। ডাক্তার আগেই থিওকে সমস্ত অবস্থা লিখেছিলেন এবং টাকা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অন্য কোন পথ নেই জেনে থিওকে রাজি হতে হল। সে টাকা পাঠিয়ে দিল। টাকা পেয়ে ডাক্তার ভিনসেন্টকে নিয়ে সেন্ট রেমির উদ্দেশ্য যাত্রা করল।

যথাসময়ে তারা সেন্ট পল ডি মুসোল- এ এসে পৌছল। দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করতেই ডাঃ পেরোঁ এলেন। ডাঃ রে তাঁর সঙ্গে ভিনসেন্টের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেল।

'ভিতরে আসবেন কি, ভিনসেন্ট?' একপাশে সরে ডাঃ পিরোঁ বললেন।

ভিনসেন্ট ডাক্তারকে এড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

সশব্দে বাতুলাশ্রমের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

সপ্তম পর্ব

সেন্ট রেমি

১.

একটা খালি বিছানা ভিনসেন্টকে দেখিয়ে দিয়ে বাতুলাশ্রমের সিস্টার বললেন, আপনি এখানেই শোবেন, মঁসিয়ে। রাতে দরকার হলে ঐ পর্দাটা টেনে দেবেন। ডাক্তার পিরোঁ পরে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

সিস্টার চলে গেলেন। ঘরে যে এগারো জন লোক ছিল তার দিকে দৃক্‌পাতই করল না। ভিনসেন্ট বোঁচকাটা নামিয়ে রেখে চারদিকে তাকাল। ওয়ার্ডের দু'পাশে সারি সারি গাছের পাতা, দেওয়ালটা চুনকাম করা, একটা মাত্র বাতি ঝুলছে ছাদে।

ঘরের লোকগুলোকে কোন কথা না বলে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেখে ভিনসেন্টের অবাক লাগল। মাথার কাছে যে একটা বাক্স ছিল তাতে জিনিসপত্র রেখে বাগানে গেল। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে ডাক্তারের বাড়ির দরজায় নাড়া দিল।

ডাক্তারের সঙ্গে নানা কথার মাঝে সে বলল, 'দেখুন ডাক্তার, আপনি তো স্নায়ুরোগে বিশেষজ্ঞ। আমি আমার কান কেন কাটলাম তার কারণটা বলতে পারেন?'

'মৃগী রুগীদের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ভিনসেন্ট। শ্রবণ সম্বন্ধীয় স্নায়ু প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। রুগী তখন মনে করে যে, কর্ণের বহির্ভাগ কেটে ফেললেই মনের ভ্রান্তি দূর হবে।'

'..... ওঃ .... এই ব্যাপার .....। আচ্ছা, ডাঃ কি চিকিৎসা হবে? ......'

'চিকিৎসা? মানে ..... এই ..... সপ্তাহে তোমাকে অন্তত দু'বার করে 'হট্-বাথ' নিতেই হবে। এতে তোমার স্নায়ু শান্ত থাকবে।'

'আর কি করতে হবে ডাক্তার?'

'তোমাকে সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হবে। উত্তেজিত হলে চলবে না। কাজ করবে না, পড়বে না, কোনপ্রকার তর্ক করবে না।'

'কাজ করবার মত শক্তিও আমার নাই।'

'কোন কিছুর দরকার হলে আমার কাছে চলে এসো।'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

'পাঁচটায় নৈশ ভোজ হয়। সেজন্যে ঘন্টা দেওয়া হবে। হাসপাতালের নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করো—তাতে তাড়াতাড়ি সারতে পারবে।'

সেখান থেকে বেরিয়ে সে আবার নিজের ওয়ার্ডে চলে এল। কতক্ষণ পরে একটা আওয়াজ শুনতে পেয়ে অন্যদের সঙ্গে সেও খেতে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তখন সবে মাত্র সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। ভিনসেন্ট জানালায় দাঁড়িয়ে সবুজ উপত্যকার দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশের আশ্চর্য রঙের খেলা দেখেও তার ছবি আঁকার কোন ইচ্ছে হল না। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল কিন্তু ঘরের বাতি জ্বালাবার জন্যে কেউ এল না। ভিনসেন্ট শুয়ে পড়ল, দেলাক্রোর বইটি সে সঙ্গে এনেছিল। অন্ধকারে সেটাই

বুকে জড়িয়ে ধরল। অনুভব করল যেন পরম নিশ্চিন্ত ভাব। কতক্ষণ পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তার ঘুম ভেঙে গেল একটা চাপা আর্তনাদ শুনে। পাশের শয্যার রুগীটি গোঙাচ্ছিল। ক্রমেই তার স্বর বৃদ্ধি পেল। সে বলতে লাগল, 'চলে যাও। আমাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হও। কেন আমাকে অনুসরণ করছ। আমি ওকে হত্যা করিনি! তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। তুমি কে তা আমার অজানা নয়। তুমি গোয়েন্দা পুলিশ! বেশ, তল্লাসী করো। আমি টাকা চুরি করিনি। সে আত্মহত্যা করেছে। চলে যাও। ভগবানের দোহাই, আমাকে ত্যাগ কর!'

ভিনসেন্ট শয্যা ত্যাগ করে ছেলেটির পাশে গিয়ে দেখে সে তার গাউন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে। ভিনসেন্ট বাধা দিতে চেষ্টা করল।

রুগী বছর তেইশের একজন তরুণ। তার সঙ্গে এঁটে ওঠা ভিনসেন্টের পক্ষে সম্ভব হল না। সে পাশের শয্যায় যে শুয়েছিল তার কাছে গেল, কিন্তু লোকটি নির্বিকারভাবে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে অন্য আর একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওরা দু'জনে ছেলেটির পাশে গেল। সে তখন আপন মনে চীৎকার করে তোষকটা ছিঁড়ছিল। ওরা জোর করে ওকে শুইয়ে দিল। কতক্ষণ পরে তরুণটি শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকও তার শয্যায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু ভিনসেন্ট ঘুমোতে পারল না। সে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আকাশের শুকতারাকে।

২.

পরদিন প্রাতে প্রাতরাশের পর ঘরের সকলে বাগানে গেল। কিন্তু সেখানেও কোন কথাবার্তা না বলে চুপচাপ বসে রইল। তারপর একঘণ্টা পরে নিজেদের ওয়ার্ডে ফিরে চলল। সেখানে গিয়েও কেউ কোন কথা বলল না। এদের এই কুড়েমির কারণ ভিনসেন্ট বুঝে উঠতে পারল না। সে বাগানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কতক্ষণ পরে একটা পাথরের বেদিতে বসে সে আপন অবস্থার কথা ভাবতে লাগল। একটি নিদারুণ হতাশায় তার অন্তঃকরণটা ভরে উঠল।

দেখতে দেখতে পনের দিন কেটে গেল। এর মধ্যে সে তার এগারজন সহ-রুগীর বিশেষ বিশেষ পাগলামিটা জেনে নিয়েছে। এর মধ্যে কেউ জামা ছিঁড়ত আর যা দেখতে পেত তাই ভাঙত। আবার কেউ পশুর মত চীৎকার করত, দু'জন ছিল সিফিলিসগ্রস্ত, একজনের ছিল আত্মহত্যা করার বাতিক, একজন রুগীর ছিল অত্যধিক ক্রোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ স্ব স্ব বিকার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

এই স্থানে আসতে পেরেছে বলে ভিনসেন্ট খুশি হয়েছিল। কারণ, পাগলের জীবনের সত্য পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়ায় পাগলামি সম্বন্ধে তার যে ভয় ছিল তা দূর হয়ে গেল। সে সহজভাবেই তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল।

সে প্রায়ই বোকা প্রকৃতির লোকটির সঙ্গে বসে গল্প করত। যদিও লোকটি পরিষ্কার করে কোন জবাব দিতে পারত না। ভিনসেন্ট পাঁচ মিনিট ধরে ডাঃ পিরোঁর সঙ্গেও কথাবার্তা বলত।

'আচ্ছা ডাক্তার, আমার ঘরের লোকগুলো পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে না কেন? অথচ, তাদের তো বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়?'

'কথাবার্তা তারা বেশ বলতে পারে। কিন্তু কয়েক মিনিট কথাবার্তা বললেই তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দেয়। তাই তারা বুঝতে পেরেছে যে, চুপ করে থাকাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা।'

'সে তো প্রায় মরণের সমান, তাই না?'

'সেটা বিতর্কের বিষয়'– ডাক্তার বললেন।

'তারা তো অন্তত পড়াশুনা করতে পারে?'

'উঁহু, তাতে মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তার চেয়ে নিজের মন নিয়ে থাকাই ভাল। ওদের জন্যে দুঃখ অনুভব করার কোন কারণ নেই। ড্রাইডেন কি বলেছিলেন জান তো? 'পাগল হওয়ার যে আনন্দ তা একমাত্র পাগলেরাই জানে।'

এমনিভাবে এক মাস কেটে গেল। এখান থেকে চলে যাবার বাসনা তার আদৌ হচ্ছিল না। অন্যদেরও যে হয়, তা তার মনে হয় নি। মনে হত, সবাই যেন এ জীবনটাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এ অবস্থার মাঝেও নিজেকে ঠিক রাখবার জন্যে চেষ্টা করল। দুঃখ যাতে তার অন্তঃকরণকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে সেদিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। থিও তাকে কিছু বই পাঠিয়েছিল, তাই দিয়ে সে পড়াশুনা করতে লাগল।

থিও ইতিমধ্যেই বিয়ে করেছিল। সেও তার স্ত্রী যোহানা প্রায়ই ভিনসেন্টকে পত্র দিত। থিওর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবার জন্যে ভিনসেন্ট যোহানকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখত।

ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষে ডাঃ পিরোঁ ছবি আঁকার জন্যে ভিনসেন্টকে ছোট্ট একখানা ঘর দিল। ভিনসেন্ট ও ঘরে বসে ছবি আঁকতে শুরু করল। পাগলা গারদ তাকে হত্যা করতে পারেনি। সে ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। কয়েকদিন পরেই সে মুক্তি পাবে। সে আবার প্যারিসে যেতে পারবে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে। থিওকে সে একখানা দীর্ঘ পত্র দিল এবং অনুরোধ জানাল রঙ, ক্যানভাস, ব্রাশ এবং চমকপ্রদ বই পাঠাবার জন্যে।

পরের দিন দুপুরে সে ডাক্তার পিরোঁর কাছে গেল, 'আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি, ডাক্তার, বাইরে ছবি আঁকতে যাবো?'

'তোমাকে সত্যি ভালো দেখাচ্ছে ভিনসেন্ট। চিকিৎসার ফলে তোমার বেশ উন্নতিও হয়েছে। তবে এক্ষুণি বাইরে যাওয়া কি বিপজ্জনক মনে হয় না তোমার?'

'বিপজ্জনক? কই না তো! কেন তেমন মনে হবে?'

'ধর ..... মাঠে যখন গেলে ...... তোমার অমনি অসুস্থতা দেখা গেল ..... তবে?'

ভিনসেন্ট হাসল। 'অমনি আর হবে না ডাক্তার। আমি এখন সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি।'

'না, ভিনসেন্ট, আমার ভয় হচ্ছে ......'

'আমার খুশিমত জায়গায় গিয়ে যদি ছবি আঁকতে পাই, তবে আমি যে কত আনন্দিত হব, তা কি তুমি বোঝ না ডাক্তার?'

ভিনসেন্টের জন্যে দরজা খুলে দেওয়া হল।

এর মধ্যে একদিন সে পুরানো বাড়িওয়ালার কাছ থেকে তার ছবিগুলো আনবার জন্যে গেল। লা মার্টিন প্লেসের অধিবাসীরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। কিন্তু হলদে বাড়িটা দেখেই সে কেমন অস্বস্তি বোধ করল। তার মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

প্রতিজ্ঞামত সে রাতে সে আর বাতুলাশ্রমে ফিরল না। পরের দিন তাকে রাস্তার মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেল।

৩.

ভিনসেন্ট তিন সপ্তাহ জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে সে যখন অল্প অল্প হাঁটতে লাগল, এমন দিনে তাদের ওয়ার্ডে একজন নতুন রোগী এল। সিস্টাররা তাকে তার শয্যা দেখিয়ে দিল। নতুন রোগী অত্যন্ত নম্রভাবে আপন শয্যায় বসে পড়ল, কিন্তু সিস্টাররা চলে যাওয়ার পরেই সে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল, আর কাপড়-জামা বিছানা-পত্র ছিঁড়তে লাগল। দুজন লোক এসে তাকে নিয়ে গিয়ে একটা সেলে আটকিয়ে রাখল। দু'সপ্তাহ ধরে সে বন্য পশুর মত চেঁচাতে লাগল। তারপর একদিন সে চীৎকার থেমে গেল। গির্জার পিছনে তাকে কবর দিতে ভিনসেন্ট দেখে ফেলল।

একটা মরণান্তক হতাশা যেন ভিনসেন্টের সারা অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন দিনে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করা তার কাছে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হল। কিন্তু কাজ না করলেও যে সে বাঁচবে না!

ডাঃ পিরোঁ নিজের খাবার থেকে তাকে কিছু মদ ও মাংস দিলেন, কিন্তু তাকে স্টুডিওতে যেতে দিতে রাজি হলেন না। ভিনসেন্ট প্রথমত কিছু বলল না, কিন্তু শরীর সুস্থ হলে ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

'ডাঃ পিরোঁ,' সে বলল, 'শরীরের উন্নতির জন্যেই আমার কাজ করা দারকার। ওদের মত আমাকেও যদি তুমি অলস করে রাখ, তবে আমিও পাগল হয়ে যাব।'

'তা জানি। কিন্তু কাজের ফলে যদি তোমার নতুন করে আক্রমণ হয়। উত্তেজনা থেকে হতাশাকে দূরে সরিয়ে রাখতেই হবে।'

কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার জানালেন যে, ওরা অনুমতি দিলে ছবি আঁকতে দিতে তার কোন আপত্তি নেই।

ভিনসেন্টকে ছবি আঁকবার অনুমতি দেওয়ার জন্য থিও ডাক্তারকে অনুরোধ জানাল এবং সেই সঙ্গে ভিনসেন্টকে জানাল যে, সে শীঘ্রই সন্তানের পিতা হবে। খবর শুনে ভিনসেন্ট আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। সে তার ভাইকে আবেগপূর্ণ একখানা পত্র লিখে ফেলল।

ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে সে আবার আঁকতে আরম্ভ করল। তার কিছুদিন পর বাইরে বেরুতেও লাগল ছবি আঁকার জন্যে। ক্রমে দিন যেতে লাগল। বসন্ত কালের শেষের দিকে সে সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করল। সে রেমির সৌন্দর্য ও ছবি আঁকার প্রতি একান্ত মনোযোগী তাতে সে ভুলে গেল সে পাগলা গারদে আছে। আর্লসে তার দুর্ঘটনা

হয়েছিল, তা সে ভুলে গেল। থিওর আনন্দদায়ক চিঠিগুলো তার আনন্দবর্ধন করতে লাগল।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে সে যখন শান্তভাবে মাঠে বসে কাজ করছিল, তখন সে কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করল। সে রাতে তাকে ইজেল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পাওয়া গেল।

৪.

পঞ্চম দিনে সে জ্ঞান ফিরে পেল।

অন্যেরা তাকে কি ভাবছে, এই চিন্তা তাকে পেয়ে বসল।

শীতকাল এলো। বিছানা ছেড়ে কোথাও যাবার ইচ্ছা তার আদৌ হত না। দিন যেতে লাগল। মনটা তার যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। সিস্টাররা তার কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করল। তারা অবাক হয়ে ভাবত, পাগল বলেই সে ছবি আঁকে, না ছবি আঁকে বলেই পাগল।

'ওরা ভাবে, কাজ করতে গিয়েই আমি পাগল হয়েছি'– সে একদিন বলে ফেলল তখন ঐ সিস্টার দুজন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। 'আমি জানি না, এর গোড়ায় কিছুটা গলদ আছে। কিন্তু তা বলে সে কি এ-জগতে মানুষ হতে পারবে না?'

যাহোক, শেষ পর্যন্ত দেলাক্রোর একটি বাণী যেন তাকে সমস্ত শক্তি ফিরিয়ে দিল। 'আমার যখন শেষ দিন, তখনই আমি চিত্র শিল্প আবিষ্কার করি।' দেলাক্রো বলেছিলেন।

ডাক্তার কিন্তু তাকে বাইরে গিয়ে ছবি আঁকার অনুমতি দিতে সম্মত হলেন না। স্টুডিওতে যাবার অনুমতি সে পেল, কিন্তু ছবি আঁকার মত ধৈর্য তার ছিল না। এর মধ্যে তার নামে একখানা রেজিস্টার্ড চিঠি এল। চিঠিতে ছিল চারশ' ফ্রাঙ্কের একটা চেক আর থিওর একটি চিঠি। থিও লিখেছে,।

প্রিয় ভিনসেন্ট,

অবশেষে তোমার একছানা ছবি বিক্রি হল– চারশ ফ্রাঙ্কে ভিনসেন্ট। গত বসন্তকালে 'রক্তিম দ্রাক্ষাক্ষেত্র' নামক যে ছবিটা সে এঁকেছিলে, ডাচ পেইন্টারের ভগ্নী বোক্ ওটা কিনে নিয়েছেন।

সহস্র অভিনন্দন। শীঘ্রই সারা ইউরোপে আমার ছবি বিক্রি আরম্ভ করতে পারব। ডাঃ পিরোঁ অনুমতি দিলে প্যারিসে আসার ব্যয় হিসাবে এ-টাকাটা খরচ করো।

সম্প্রতি ডাঃ গ্যাচেট নামে চমৎকার একজন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি বলছেন যে, তোমার অবস্থাটা তিনি বেশ জানতে পেরেছেন। অভ্যাস এলে তিনি তোমার চিকিৎসা করতে পারেন।

আগামীকাল আবার তোমাকে লিখব।

থিও।

ভিনসেন্ট ডাঃ পিরোঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে চিঠিটা দেখালো। পিরোঁ খুব মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ল, চেকটা একবার নাড়লো, ভিনসেন্টকে অভিনন্দন জানাল।

সান্ধ্য ভোজের সময় সে থিওর একখানা তার পেলো। তাতে সে জানিয়েছে যে, ভিনসেন্টের নামানুসারেই নবজাত পুত্রের নামকরণ হয়েছে।

ছবি বিক্রির সংবাদ ও ঐ টেলিগ্রাম পেয়ে ভিনসেন্ট যেন রাতারাতি নতুন মানুষ হয়ে খুব ভোরেই সে স্টুডিওতে গিয়ে ছবির সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করতে লাগল। একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা নিয়ে ছবি আঁকতে লাগল।

টাকা পাওয়ার ঠিক দু সপ্তাহ পরে ভিনসেন্ট 'মারকারি দ্য ফ্রান্স' নামক মাসিক পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যাখানা পেল। থিও এটা পাঠিয়েছিল। তাতে ভিনসেন্টের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। লেখক হচ্ছেন জি আলবার্ট অরিয়ের। ডাঃ পিরোঁকে সে লেখাটা দেখালো না। ওর জীবন-তৃষা যেন আবার বৃদ্ধি পেল। এরজন্য উৎসাহে ছবি এঁকে চলল।

নিজের অসুখ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে অনুভব করল যে, ঠিক তিন মাস পর পর তার অসুখ দেখা দেয়। তাই সে সিদ্ধান্ত করল যে, প্রতি তিন মাসের কিছুদিন পূর্বেই সে বিশ্রাম নেবে। তাহলে রোগাক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে এবং এই তিন মাস পূর্ণ হবার আগেই 'বিরক্ত করো না' টাঙিয়ে দিয়ে আপন'বেড' এ শুয়ে থাকবেন। না নির্দিষ্ট তারিখের প্রথম দিন কিছুই হল না। দ্বিতীয় দিনও চলে গেল অথচ কোন পরিবর্তন হল না দেহের। সে আশ্চর্য হল। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে সে আপন মনেই খুশি হয়ে উঠল।

ডাক্তার আমাকে বোকা বানিয়েছে, আর আমার কোন ভয় নেই। শুধু সময় নষ্ট করলাম। কাল থেকে আবার লাগতে হবে।

তাঁর দ্বিপ্রহরে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন ছিল, সে চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। যেখানে কয়লা থাকতো, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর মুঠি মুঠি কয়লার গুঁড়ো তুলে মুখে মাখল।

দেখলেন, মাদাম জোনস! এবার ওরা আমাকে কাছে টেনে নেবে। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু এবারে করবে। ওদের ভগবানের আমাকে সন্ধান দেবে।

বাতুলাশ্রমের কর্মীরা প্রাতঃকালের কিছু পরেই তাকে আবিষ্কার করল। সে আপন মনে বিড় বিড় করে ধর্মপুস্তক থেকে নানা কথা আওড়াচ্ছিল, কয়েকদিন ধরে এ অবস্থা চলল। তারপর সেটা কমে গেলে সে ডাঃ পিরোঁকে সংবাদ দিতে বলল। ডাক্তার এলে তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। তারপর সে আবার ছবি আঁকা আরম্ভ করল।

শীত গিয়ে বসন্ত এলো, কিন্তু তার মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। ওয়ার্ডের অন্যদের সাহচর্য তার পক্ষে অসহ্য মনে হল। সে থিওকে লিখলে য, এখানে যেসব ধর্মাচর্চা হয়, তার মধ্যে থাকলে সে কিছুতেই বাঁচবে না। চিঠির জবাবে থিও জানাল যে ডাঃ গ্যাচেট একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, তিনি ওর ভার নিতে রাজি আছেন এবং এও লিখল যে, কবে আসবে, সে যেন লেখে। সে গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু ওর সাহায্য ছাড়াই ভিনসেন্ট যাবে ঠিক করল এবং সেই অনুসারেই থিওকে পত্র দিল।

অষ্টম পর্ব

অভের্

১.

উৎকণ্ঠায় সে রাত্রে ঘুমাতে পারল না। ভিনসেন্টের ট্রেন পৌঁছুবার দু'ঘণ্টা পূর্বেই সে গারে ডি লিয়ঁ যাত্রা করল। শিশুকে নিয়ে যোহানাকে বাড়ি থাকতে হল। কিন্তু সে-ও নিশ্চিন্তে থাকতে পারল না। বারবার করে গেটের দিকে তাকাতে লাগল। তার মনে হল যে, যেন অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করে রয়েছে। এক সময় তার মনে হল বোধ হয় ট্রেনে ভিনসেন্টের কোন বিপদ ঘটেছে। এমন সময় একটি গাড়ি এসে ঢুকল বাড়িটায় এবং দু'টি হাসিমুখ তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল এবং হস্ত আন্দোলিত করতে লাগল। ভিনসেন্টকে ভাল করে দেখার জন্যে সে নজর দিয়ে তাকাল।

যোহানা ভিনসেন্টকে যেমন দেখবে ভেবেছিল দেখল কিন্তু ঠিক উল্টো। সুস্থ, হাস্যমুখ এবং দৃঢ়চেতা একজন মানুষ। তাকে প্রথম দেখেই সে মনে মনে বলল, 'ওতো সম্পূর্ণ সুস্থ। থিওর থেকেও ওকে সমর্থ দেখাচ্ছে।'

কিন্তু যোহানা ওর কানের দিকে তাকাতে পারল না।

যোহানার হাত দুটি ধরে এবং তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'চমৎকার স্ত্রী যোগাড় করেছ তুমি থিও।'

'সত্যি, ভিনসেন্ট'– হাসিমুখে থিও বলল।

অতঃপর ভিনসেন্টকে নিয়ে থিও শোবার ঘরে গেল। নবজাত শিশু সেখানে দোলনায় শুয়েছিল। দু'জন নীরবে শিশুটির দিকে তাকাল। দুজনের চোখেই জল গড়াচ্ছিল। যোহানা বুঝতে পারল, ওদের কিছুক্ষণ একা থাকা প্রয়োজন। তাই চুপিচুপি কক্ষ পরিত্যাগ করার উদ্যোগ করল। কিন্তু দরজার কাছে যেতেই ভিনসেন্টে বলে উঠল, 'ছেলেটাকে এমন করে ঢেকে রেখো না।'

যোহানা শান্তভাবে দোর বন্ধ করে চলে গেল। ভিনসেন্ট শিশুটির দিকে একবার তাকাল। তার হৃদয়ে জেগে উঠল একটা অসহ্য বেদনা– যে বেদনা অনুভব করে তারা যারা জগতে রেখে যেতে পারে না আপন দেহের পরিচয়।

থিও ওর এই ভাবনা বুঝতে পারল।

'এখনও তোমার সময় যায়নি, ভিনসেন্ট। একদিন পাবে তুমি সেই নারীকে যে তোমাকে ভালবাসবে, অংশ নেবে তোমার দুঃখময় জীবনের।'

'আর তা হয়না থিও। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'এই সেদিন একটি মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তোমার সঙ্গে তার নিশ্চয় খাপ খাবে।'

'কে সে?'

'দেখবে একবার তাকে। বেশ কাজের মেয়ে। তোমার সঙ্গে মিলবে।'

'এক কাজওয়ালী মানুষ নিয়ে সে কি করবে?'

'ঠিক এমন সময় শিশুটি জেগে উঠল এবং তাদের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। থিও দোলনা থেকে শিশুটিকে তুলে ভিনসেন্টের কোলে দিল।

'আঃ কুকুর ছানার মত নরম আর উষ্ণ'– শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে ভিনসেন্ট বলল।

'অমন করে বুঝি বাচ্চাদের নিতে হয়' থিও বলল, 'দাও আমার কাছে দাও।' বলে শিশুটিকে কোলে তুলে নিল।

'সবাই অন্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে' ভিনসেন্ট বলল, 'তুমি রক্তমাংসের শরীরে নিজেকে প্রকাশ করলে থিও..আমি করব চিত্রের মধ্য দিয়ে।'

'ঠিক বলছ, ভিনসেন্ট ঠিক বলেছ।'

ভিনসেন্টকে স্বাগত জানাবার জন্য তার অনেক বন্ধুবান্ধব এলো। প্রথম মঁসিয়ে অরিয়ের। তারপর এলো তুলোজ-লট্রেক, তারপর রুশো ও পেরি। ওদের মধ্যে নানা কথাবার্তা হলো। লট্রেক-এর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ভিনসেন্ট জানতে পারল যে, জর্জ স্যুরাটের যক্ষা হয়েছে। সে আর বেশি দিন বাঁচবে না।

পরের দিন প্রাতে যোহানাকে সরিয়ে দিয়ে পেরাম্বুলেটারটা ভিনসেন্ট নিজেই ঠেলে নিয়ে চলল। তারপর ঘরে ফিরে এলো। সে ঘরের দেওয়াল ভর্তি ছিল তারই আঁকা ছবি। তাছাড়াও নানাখানে ছড়িয়ে ছিল অনেকগুলো। তার সবগুলো চিঠিও থিও যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। কেন রেখেছিল তা সে নিজেই জানে। সে নিজের সবগুলো ছবি একত্র করল, তারপর শ্রেণিবিভাগ করতে লাগল। পরে বাড়ির প্রত্যেকটি ঘরে শ্রেণি অনুসারে ছবিগুলো টাঙাল। কোনটা হোল জলরঙ, আর কোনটা তেলরঙ-এর ঘর। এমনিভাবে ছবিগুলো টাঙিয়ে সে মেঝেটা পরিষ্কার করে চলল। তারপর টুপি ও কোট পরে শিশুটিকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল– যোহানা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলল।

পথে থিওর সঙ্গে দেখা। তিনজন বাড়ি ফিরতে লাগল। ঘরে ঢোকার মুখেই সবাইকে থামিয়ে দিয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'এবার তোমাদের একটা ভাল আর্ট একজিবিশন দেখাব।' বলেই সে দোর খুলে দিল। ঘরের অবস্থা দেখে থিও ও যোহানা বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

'আমি যখন ইটেন-এ ছিলাম, ভিনসেন্ট বলতে লাগল, 'বাবা একদিন মন্তব্য করছিলেন যে, অসৎ থেকে সৎ-এর সৃষ্টি হতে পারে না। আমি জবাবে বলেছিলাম, তা হতে পারে এবং আর্টে তা হতেই পারে। তোমরা যদি একটু চেষ্টা করো তবে কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে। দেশে দশ বছর আগে যার অঙ্কিত চিত্র ছিল কুখ্যাত তা ক্রমে ক্রমে কেমন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে...কি তা তোমরা নিজের চোখে দেখবে।'

তারপর সে তাদের ক্রম অনুসারে ছবিগুলো পরপর দেখাতে লাগল। নবাগত দর্শকের মত ছবিগুলো দেখল।

খাওয়া-দাওয়ার পর দু'ভাই আলাপ করতে বসল।

'ডাঃ গ্যাচেট যা বলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে কিন্তু ভিনসেন্ট।'

'হ্যাঁ, তা করব থিও।'

'উনি একজন নার্ভ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ। ওর উপদেশ মেনে চললে তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওর উপদেশ মত চলবো।'

'গ্যাচেট ছবিও আঁকে।'

'কেমন ছবি আঁকে থিও?'

'ভাল বলা যায় না। তবে তোমার সম্পর্কে খুব প্রশংসা করেন। বলেন মঁসিয়ে ভ্যান গোঘ্ আপনার ভাই একজন মহৎ আর্টিস্ট। ঐ সূর্যমুখী ফুলের হলদে রঙের তুলনা আর্টের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এই ক্যানভাসগুলোই তোমার ভাইকে স্মরণীয় করে রাখবে।

ভিনসেন্ট তার মাথা চুলকাতে লাগল।

২.

ভিনসেন্ট ও থিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে ডাঃ গ্যাচেট স্টেশনে এসেছিলেন। ভিনসেন্ট ট্রেন থেকে নামলে পর তার সঙ্গে আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন এবং কথা বলে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ও একটু সরে যেতেই থিও নিচু গলায় গ্যাচেটকে বলল, 'দয়া করে আমার ভাইয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন, ডাক্তারবাবু। নানা প্রকার খারাপ লক্ষণ দেখলেই আমাকে ফোন করে খবর দেবেন। কারণ ওই সময়টা ওর সঙ্গে থাকতে চাই...অন্য কেউ থাকবে নাকি...'

'চুপ !চুপ!' বাধা দিয়ে ডাঃ বললেন। 'মাথা ওর খারাপ ঠিকই, কিন্তু তুমিই বা কি? সব আর্টিস্টই মাথা-খারাপ ওটাই ওদের বিশেষত্ব এবং আমিও তা ভালবাসি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমারও মাথা খারাপ হত। 'প্রত্যেক ভাল মানুষেরই মাথায় একটু ছিট্ থাকে।' জান কে এই কথা বলেছিলেন? এরিস্টটল।'

'জানি ডাক্তার.' থিও বলল, 'কিন্তু ওর এই মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর। সমগ্র জীবনই ওর সম্মুখে পড়ে রয়েছে।'

'ওর সম্বন্ধে তুমি ভেবো না। চিত্রশিল্পীকে কি করে নাড়াচাড়া করতে হয় আমি জানি। এক মাসের মধ্যে আপনার ভাইকে আমি নতুন মানুষ করে দেব।' আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ভিনসেন্টকে পত্র দিতে বলে থিও বিদায় নিল।

বাড়িতে স্থানাভাবের জন্য ডাঃ গ্যাচেট ভিনসেন্টকে থাকার জন্য সরাইখানার একটা ঘর ভাড়া করে দিল । ঘরের ভাড়া ঠিক হল ছয় ফ্রাঙ্ক।

'আপাতত এখানে থাক,' গ্যাচেট বলল, 'তবে একটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজে যাবার কথা ভুলে যেওনা কিন্তু। তোমার ইজেলটাও নিয়ে যেও। আমার ছবি আঁকতে হবে।' বলে বিদায় নিতেই ভিনসেন্টও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরুবার উদ্যোগে করল।

'কোথায় যাচ্ছেন?' সরাইখানার মালিক জিজ্ঞেস করল।

'আমি পুঁজিপতি নই সামান্য একজন দৈনিক। ছ'ফ্রাঙ্ক করে ঘর ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।'

'কিছুদূরে একটি ছোট্ট কাফেতে খাওয়া ও সাড়ে তিন ফ্রাঙ্ক ভাড়ার একটা ঘরে গেল। কাফেটার নাম হচ্ছে র্যাভো। চাষী আর মজুরদের মিলন-ক্ষেত্র।ভিনসেন্ট স্বীয় ইজেল,রঙ, তুলি ও ছবি নিয়ে গ্যাচেটের বাড়ি এসে উপস্থিত হল। মুরগী, হাঁস, ময়ূর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু পরিপূর্ণ কক্ষ অতিক্রম করে গ্যাচেট তাকে নিয়ে বসার ঘরে উপস্থিত হল। ঘরে বিশেষ জানালা না থাকায় এবং আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ থাকায় কেমন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারই মধ্যে গ্যাচেট ঘুরে ঘুরে ভিনসেন্টকে নানা জিনিস দেখাতে লাগল।

খাওয়ার টেবিলে গ্যাচেটের পনের বৎসর বয়স্ক সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভিনসেন্টের পরিচয় হল। হরেক রকমের খাওয়া পরিবেশিত হল। কিন্তু ভিনসেন্ট এমন খাওয়ায় অনভ্যস্ত বলে তার খুব অসুবিধা হতে লাগল।

'এবার চল আমার ছবি আঁকবে,' ডাঃ গ্যাচেট বললেন।

'আপনাকে আরও ভাল করে না জানতে পারলে আপনার ছবি ঠিক হবে না,' ভিনসেন্ট জবাব দিল।

'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু কিছু তোমাকে আঁকতেই হবে। কি করে তুমি কাজ করো আমার তা দেখা দরকার।'

'বাগানে একটা দৃশ্য দেখে এসেছি, তারই ছবি আঁকতে চাই।'

'ভাল, ভাল ! আমি তোমার ইজেল ঠিক করে দেব। পল, মঁসিয়ে ভিনসেন্টর ইজেলটা বাগানে নিয়ে যাও। কোনখানে বসতে চাও বলে দিলে আমরা বলে দেব ঠিক ওখানে বসে আর কেউ ছবি এঁকেছে কিনা।'

ভিনসেন্ট ছবি আঁকতে শুরু করলে ডাক্তার পাগলা ঘোড়ার মত একবার এপাশ, একবার ওপাশ করতে লাগল আর নানা উপদেশ দিতে লাগল। একসময় বিরক্ত হয়ে সে ডাক্তারকে বলল, 'অসুস্থ শরীরে এমন ছফফট করা আপনার পক্ষে অন্যায় হচ্ছে ডাক্তার। আপনার একটু শান্ত হওয়া উচিত।'

কিন্তু কেউ আঁকতে শুরু করলে ডাক্তার চুপ করে থাকতে পারত না।

যাহোক ছবি আঁকা শেষ করে ভিনসেন্ট। ডাক্তারের সঙ্গে কক্ষে ফিরে এল। তারপর তার আঁকা জনৈকা আর্লসবাসিনীর ছবি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে ভিনসেন্ট পলকে নিয়ে ডাক্তারের সংগৃহীত ছবি দেখতে লাগল। এমন সময় ডাক্তার ছুটে এল। উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, 'আলোচ্য ছবিটাতে তুমি গগ্যাঁকে অনুসরণ করেছ বলেছিলে না...কিন্তু তা আমি স্বীকার করি না....রঙের ঐ ভিড়....মেয়েটির কোমলত্বকে হত্যা করেছে...না, না হত্যা করেনি..না, না, ঠিক হল না... ও যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে।'

যতই রাত বাড়তে লাগল আর্লসবাসিনীর ছবিটা যেন ডাক্তারকে পেয়ে বসল। সে নানা ভঙ্গিতে ছবিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল এবং যতই দেখতে লাগল ততই মুগ্ধ হতে লাগল।

'সহজ হওয়া কত কঠিন'—অবশেষে সে বলল।

'কী!'

'মেয়েটি অপরূপ রূপসী। এমন গভীরতা আর আমি দেখিনি।'

'ওকে যদি তোমার ভাল লেগে থাকে তবে ও আপনার, ডাক্তার,' ভিনসেন্ট বলল, 'এবং আজ দুপুরে যে দৃশ্যটা এঁকেছি তাও আপনার।'

'কিন্তু এসব ছবি আমাকে কেন দিয়ে দিচ্ছ, ভিনসেন্ট। এগুলো যে মহামূল্যবান।'

'অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে আমার ভার নিতে হবে। দেবার মত অর্থ আমার নেই। পরিবর্তে এই সব ছবিই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তো তোমার ভার আমি নেইনি, ভিনসেন্ট। বন্ধুত্বের খাতিরেই যা করবার করব।'

'বেশ, বন্ধুত্বের খাতিরেই আমি আপনাকে এগুলো দিচ্ছি।'

৩.

ভিনসেন্ট আবার শিল্পীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। র‍্যাভো কাফেতে সমবেত শ্রমিকের বিলিয়ার্ড খেলা কিছুক্ষণ পরিদর্শন করবার পর রাত নটার সময় সে শুতে যেত। ভোর পাঁচটায় তার ঘুম ভাঙত। প্রভাতিক আলো ও হাওয়া তার মনে আনন্দ জাগাত। কিন্তু কাজের প্রতি তার যে একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে দীর্ঘ রোগভোগ এবং অলসতা।

প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাকে আর তেমন আকর্ষণ করত না। সে যখন ছবি আঁকতে বসত তখন একটা অদ্ভুত স্থৈর্য, যেন অনেকটা ঔদাস্য, সে অনুভব করত। ছবি আঁকার জন্য যে একটা তীব্র অনুভূতি ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছিল। সে এখন অনেকটা অবসর সময় যাপনের মত কাজ করে যেত। কোন ছবি যদি অসম্পূর্ণ থেকে যেত তাতে সে কোন তাড়া অনুভব করত না।

অভার্-এ ডাঃ গ্যাচেট ছিলেন তার একমাত্র বন্ধু। গ্যাচেট প্রায় বেশি সময়ই প্যারিসে তার রোগী পরিদর্শনাগারে থাকতেন। তবে মাঝে মাঝে রাতে ভিনসেন্টের আঁকা ছবি দেখার জন্যে র‍্যাভোতে আসতেন। ডাক্তারের মুখেচোখে একটা হতাশার ভাব দেখে ভিনসেন্ট বিস্ময় বোধ করত।

'আপনি অসুখী কেন, ডাঃ গ্যাচেট?' সে জিজ্ঞাসা করত।

'এতদিন পরিশ্রম করলাম...কিন্তু মহৎ কিছুই করতে পারলাম না। বেদনা, বেদনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আপনার সঙ্গে বৃত্তি বিনিময়ে আমি কিন্তু রাজি আছি' ভিনসেন্ট বলল।

গ্যাচেটের ম্লান আঁখিতে ঔৎসুক্যের একটা ঝিলিক খেলে গেল।

'না, তা কেন হবে? শিল্পী হওয়া বিশ্বের সুন্দরতম কাজ।'

'আর্টিস্ট হব এই-ই ছিল আমার প্রার্থনা...কিন্তু সে জন্যে এক ঘণ্টাও সাধনা করতে পারিনি..রুগীর সেবাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হল।'

ডাঃ গ্যাচেট হাঁটু গেড়ে বসে ভিনসেন্টের বিছানার নিচ থেকে একরাশ ছবি টেনে বের করল। তারপর হলদে রঙের চকচকে একটা সূর্যমুখী ফুলের ছবি সম্মুখে ধরে

বলতে লাগল এমনি একটা ছবিও যদি আমি আঁকতে পারতাম, ভিনসেন্ট, তবুও নিজেকে সার্থক মনে করতাম। লোকের ব্যথা বেদনা সারালাম কিন্তু...তাদেরও শেষ হল মৃত্যুতে...অথচ লাভ হল কি? তোমার এই সূর্যমুখী ফুলগুলো... মানুষের অন্তরের বেদনা তারা দূর করবে...মানুষকে আনন্দ দেবে... যুগ, যুগ ধরে...তাইতো তোমার জীবন সার্থক... তাইতো তুমি সুখী হবে।'

ক'দিন পরে ভিনসেন্ট শাদা টুপি মাথায়, নীল ফ্রককোট গায় এবং নীল রঙের পটভূমিকায় ডাক্তারের একখানা ছবি আঁকল। অত্যন্ত হালকা রঙ সে ব্যবহার করল একটা ফুলোর তোড়া ছিল। ছবিটি আঁকা শেষ হবার পর ওটা দেখে নিজেই অবাক হল। গগ্যাঁ আসার আগে সে নিজের যে ছবি এঁকেছিল এই ছবিখানা অনেকটা তার মত।

ছবিটা দেখে ডাক্তার খুশিতে পাগল হয়ে উঠলেন। এমনি ধরনের প্রশংসা আর স্তুতিবাদ ভিনসেন্ট কোনদিন পায় নি। এই ছবিটার একটা কপি দেবার জন্য ডাক্তার অনুরোধ করলেন। ভিনসেন্ট রাজি হলে ডাক্তার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

'চিলেঘরে আমার যে ছাপার মেশিনারি আছে ওটা তোমার ব্যবহার করা উচিত ভিনসেন্ট' ডাক্তার চীৎকার করে বললেন। 'প্যারিসে গিয়ে তোমার সবগুলো ক্যানভাস নিয়ে এসে তা 'লিথো' করে নেব। এতে এক সেন্টও তোমার খরচ হবে না। চল, আমি আমার কারখানা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ওঘর দেখে নিচে নামবার সময় একটা ছবি দেখিয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'ডাঃ গ্যাচেট এই ছবিটা এমন করে ফেলে রেখেছেন কেন? ভাল করে বাঁধিয়ে রাখুন। আপনি তো একটা 'মস্টারপিস' নষ্ট করে ফেলছেন।'

'হ্যাঁ, ওটা বাঁধিয়ে রাখব! আর তুমি কবে প্যারিসে যাচ্ছ ছবিগুলো আনার জন্যে। যতগুলো সম্ভব ছিল লিথো করে রাখ, আমি সব জিনিসপত্র দেব।'

মে মাস শেষ হয়ে জুন মাস এস পড়ল। ভিনসেন্ট পাহাড়ের উপরিস্থিত ক্যাথলিক চার্চটি আঁকতে আরম্ভ করল। কিন্তু দুপুরের দিকে এত শ্রান্ত মনে হল যে, ছবি অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। অনেক চেষ্টার পর একটা শস্যক্ষেত্রের ছবি আঁকল। ম্যাসন দুবিজি'র বাড়ি এবং অন্য একটা বাড়ির দৃশ্য সে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলল। ছবি আঁকল ঠিকই, কিন্তু তাতে যেন কোন রস ছিল না। অভ্যাসবশেই সে যেন কাজ করে গেল। এত বৎসরের শিক্ষার গতি তাকে কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতির যে সব দৃশ্য তার মনে শিহরণ ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা আর ছিল না।

'বহু ছবি এঁকেছি,' ইজেল কাঁধে নিয়ে পথে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে আপন মনে বলত। 'এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই। পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি?'

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ যে তার পিছু নিয়েছে তা নয়, তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে রঙে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তার যে একটা অদম্য আকর্ষণ ছিল, তা হ্রাস পেয়েছে। এখন অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। সমস্ত জুন মাসে সে মাত্র পাঁচখানা ছবি আঁকল। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অনুভব করছিল। নিজেকে তার নিঃস্ব, নিঃশেষিত ও পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল।

থিও তার জন্যে যে অর্থব্যয় করছে, তার প্রতিদানে ছবি আঁকা দরকার, এই বোধ মনে জাগল, তখন আবার সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করল। কিন্তু ছবি আঁকতে আঁকতে যখন মনে পড়ল যে, তার আঁকা ছবি দিয়ে থিওর ঘর ভর্তি করে ফেলেছে, যার মূল্য কাণা কড়িও নয়, সে কেমন একটা বমনেচ্ছা অনুভব করল। বিরক্তিতে সে ইজেলটা সরিয়ে দিল।

সে জানত, তিন মাস পর জুলাইতে আবার রোগাক্রমণ হবে। সেই সময় সে অন্যায় করে ফেলতে পারে–দুর্ভাবনায় গ্রামের মধ্যে স্বীয় গতি সীমাবদ্ধ করল। টাকা সম্পর্কে সে কোন পাকা বন্দোবস্ত করে নিল ভাইয়ের সঙ্গে, তাই একটা দুশ্চিন্তায় পড়ল, তার উপর ডাঃ গ্যাচেটের চোখে যে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল, তাও তাকে প্রকৃতিস্থ করে তুলছিল।

এই সময় থিওর সন্তানটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাতে অবস্থা আরও সঙ্গীণ হয়ে গেল।

অসুখের সংবাদে ভিনসেন্ট আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। অকস্মাৎ সে আবার প্যারিসে গিয়ে উপস্থিত হল। তার আগমনে বাড়িতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। থিওকে অত্যন্ত বিবর্ণ ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাকে সান্ত্বনা দিতে ভিনসেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করল।

কেবলমাত্র ছেলেটার কথা ভেবেই যে আমি চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তা নয় ভিনসেন্ট'– থিও স্বীকার করল।

'তাহলে কি হয়েছে, থিও?'

ভালাডন আমাকে পদত্যাগ করার জন্যে বলেছে।

'তা তো হতে পারে না, থিও। তুমি ষোল বছর ধরে গুপীলদের ওখানে রয়েছ,'

'তা জানি। কিন্তু ওর অভিযোগ যে, ইমপ্রেশনিস্টদের জন্যে আমি নাকি ব্যবসায়ের কাজে মন কম দিয়েছি। আমার দোকান নাকি লোকসানে চলছে।

'কিন্তু সত্যি কি তোমাকে তাড়াতে পারে?'

'কেন পারবে না? ভ্যান গোঘদের অংশ তো সম্পূর্ণ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।'

'কি করবে তবে? নিজস্ব দোকান খুলবে?'

'কি করে খুলব। যা অল্প কিছু অর্থ জমিয়েছিলাম, তাও বিয়েতে আর ছেলেটার জন্যে ব্যয় হয়ে গেছে।'

'আমার জন্যে অযথা যদি তোমার হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করতে না হত...'

'ও-নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তুমি তো জান যে, আমি...'

'কিন্তু তুমি কি করবে থিও। যো রয়েছে, ছেলেটা রয়েছে... তাদের কথাও তো ভাবতে হবে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু...জানি না কি হবে...ছেলেটাই এখন একমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয়।'

ভিনসেন্ট কয়েকদিন প্যারিসে রইল। তারপর ছেলেটা একটু ভাল হতেই আবার অভার্-এ ফিরে এল।

এখানে এসে নানা দুশ্চিন্তায় তাকে পেয়ে বসল। থিওর চাকুরি, যো আর শিশু, থিওর স্বাস্থ্য আর সাংসারিক দুরবস্থা সম্পর্কে সে ভাবতে লাগল। চিন্তা করতে করতে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল। ছবি আঁকতে আরম্ভ করল, কিন্তু পারল না। দিন কেটে যেতে লাগল।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম পড়েছে। থিও অনেক কষ্টে তাকে যে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পাঠিয়েছিল, তা সে কাফের মালিককে দিয়ে দিয়েছে। এতে সে হয়ত জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত কাফেতে থাকতে পারবে। কিন্তু..তারপর কি হবে? থিওর কাছ থেকে সে আর টাকা পাওয়ার আশা করতে পারে না।

অন্তহীন চিন্তা তার মনকে আরও বিষাদাচ্ছন্ন, আরও অপ্রকৃতিস্থ করে তুলল।

সে ডাঃ গ্যাচেটকে তার আরও দুটো ছবি দিয়ে তার আন্তরিক প্রশংসা লাভ করল।

'না, তোমার আর কোন ভয় নেই,' একদিন ডাঃ গ্যাচেট তাকে বললেন, 'শীঘ্রই তোমার শরীর আরও ভাল হবে। অবশ্য মৃগী রোগীরা সচরাচর এমন ভাল হয় না।'

'পরিণামে তাদের কি হয় ডাক্তার?'

'বেশি আক্রমণ হলে তারা পাগল হয়ে যায়।'

'ও থেকে কোন উপায় নেই।'

'না ওইখানেই তাদের জীবনের সমাধি। বেঁচে থাকতে হয়ত তারা পারে, কিন্তু সুস্থ মানুষ হতে পারবে না কোনদিন।'

'আচ্ছা, ডাক্তার পরবর্তী আক্রমণের শক তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে কি পারবে না, এটা কি বুঝতে পারে?'

'না, তা পারে না। কিন্তু তুমি এসব বাজে কথা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছ কেন? চল কিছু এচিং করিগে।'

এর পর চারদিন ভিনসেন্ট তার ঘর ছাড়ল না।

'আজ আমি ভাল এবং প্রকৃতিস্থ আছি' সে নিজের মন-মনে বলতে লাগল, 'নিজের ভাগ্যের কর্তাও আজ আমি। কিন্তু আবার যখন রোগাক্রমণ হবে... তখন যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে.... আত্মহত্যা করার মতও বুদ্ধি যে তখন থাকবে না... তখন... ওহো... থিও, থিও... আমি কি করব?'

চতুর্থ দিন বৈকালে সে ডাঃ গ্যাচেটের ওখানে গেল। ডাক্তার তখন বসার ঘরে ছিলেন। যে-ছবিটা ফ্রেম বাঁধাবার জন্যে সে বলেছিল, তা তখনও পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে ভিনসেন্ট বলল, 'এটার ফ্রেম বাঁধাবার জন্যে বলেছিলাম না?'

ডাঃ গ্যাচেট বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, আগামী সপ্তাহে বাঁধাব।

'না, এক্ষুণি ফ্রেম বাঁধাতে হবে। আজই! এই মুহূর্তে।'

'কি বাজে বকছ, ভিনসেন্ট।'

ভিনসেন্ট ডাক্তারের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়াল এবং হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দিল। ডাঃ গ্যাচেটের মনে হল, ভিনসেন্ট তারদিকে রিভলবার তাক করেছে।

'ভিনসেন্ট।' সে চীৎকার করে উঠল।

ভিনসেন্ট কেঁপে উঠল। দৃষ্টি নত করে পকেট থেকে হাত তুলে ফেলল, তারপর ছুটে বাড়ির দিকে চলে গেল।

পরের দিন সে তার ইজেল ও ক্যানভাস নিয়ে স্টেশন ছাড়িয়ে ক্যাথলিক চার্চের ওদিকে যে পাহাড়টা ছিল, তাতে উঠে একটা সবুজ শস্য ক্ষেত্রের পাশে বসে পড়ল।

দুপুরের দিকে মস্ত এক ঝাঁক কাক এসে আকাশে উড়তে লাগল। সে ওদের দেখে রঙ তুলি নিয়ে একখানা ছবি এঁকে ফেলল। ছবিটার নাম দিল 'শস্য ক্ষেত্রের উপরে কাকের ঝাঁক'। ছবি আঁকা শেষ করে কাফেতে ফিরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরেও সে বেরুল। কতক্ষণ পরে জনৈক কৃষক দেখল, সে একটা গাছের উপর বসে আছে। সে তাকে বলতে লাগল, 'অসম্ভব' 'অসম্ভব'।'

ক্ষণপরে সে গাছ থেকে নেমে এল, তারপর ক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। জীবনের যবনিকা টানার জন্যে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল।

বিদায় জানাবার আগ্রহ জাগল তার। নানা বাধা থাকলেও এ-বিশ্বটা মন্দ নয়। গগ্যাঁর কথাই ঠিক, 'বিষ যেমন আছে, তেমনি প্রতিষেধকও রয়েছে।' কিন্তু আজ সে বিদায় নিতে চায়ঃ বিদায় নিতে চায় সেই সব বন্ধুর কাছ থেকে, যাঁরা তার জীবনকে গড়েছে, বিদায় নিতে চায় উরসুলার কাছ থেকে, যাঁর ঘৃণা তার জীবনকে করেছে ভিন্নধর্মী, তাকে করেছে সমাজচ্যুতঃ বিদায় নিতে চায় মেন্ডেস ডি কস্টার কাছ থেকে যে তাকে বিশ্বাস করিয়েছে পরিণামে সে আপনাকে প্রকাশ করতে পারবে। বিদায় নিতে চায় কে ভোসের কাছ থেকে, যার 'না, কখনও না। কখনও না!'বাক্যজ্বালা তার অন্তরে গেঁথে রয়েছে; বিদায় নিতে চায় মাদাম ডেনিস, প্যাক ভার্নি, হেনরি চেক বা এর কাছ থেকে যাঁরা তাকে শিখিয়েছে কি করে ভালবাসতে হয় অধঃপতিতদের; বিদায় নিতে ইচ্ছে করে রেভারেন্ড পিটার্সেন-এর কাছ থেকে, যাঁর দয়ার কথা কখনও ভোলা যাবে না;বিদায় নিতে ইচ্ছে করে পিতা ও মাতার কাছ থেকে, যাঁরা তাকে ভালবাসত অন্তর থেকে; বিদায় নিতে চায়, ক্রিশ্চিনের কাছ থেকে, যে ছিল তার একমাত্র স্ত্রী এবং যার ভাগ্যের সঙ্গে তার ভাগ্য মিলে গিয়েছিল; বিদায় নিতে চায় মভ, ভাইসেনব্রুক, ডি বোক, খুড়ো ভিনসেন্ট, জ্যান, কর্নেলিয়াস ম্যারিনাস, স্টিকার, লট্রেক, জর্জ স্যুরার্ট, পল গগ্যাঁ, রুশো, সিজানা, পেরি ট্যানগি, রুলিন এবং মারগটের কাছ থেকে যে নারী একমাত্র তাকে ভালবেসেছিল; বিদায় নিতে চায় র‍্যাচেল আর ডাঃ রে'র কাছ থেকে যাঁদের কাছে সে পেয়েছে সহৃদয়তা এবং অরিয়র ও ডাঃ গ্যাচেটের কাছ থেকে একমাত্র যে দুজন তাকে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বলে মনে করত, আর সর্বশেষ তার ভাই, স্নেহপরায়ণ, প্রিয়তম, দয়ালু ভাইয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তার নিজেকে প্রকাশের মাধ্যম ভাষা নয়। তাকে বিদায় এঁকে তুলতে হবে রঙে ও তুলিতে।

কিন্তু বিদায় তো রঙ আর তুলিতে ফুটিয়ে তোলা যায় না।

সে সূর্যের দিকে তাকাল। পিস্তলটা পার্শ্বে চেপে ধরল। ট্রিগারটা টেনে দিল। তারপরেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সেই মাটি, যে মাটি ছিল তার পরম আশ্রয়।

৪.

চার ঘণ্টা পর ভিনসেন্ট টলতে টলতে কাফেতে ফিরল। তার কাপড় চোপড়ে রক্ত দেখে মাদাম র‍্যাভো ডাক্তারকে সংবাদ দিতে ছুটল।

'ভিনসেন্ট, ভিনসেন্ট, একি করেছ তুমি।' ডাঃ গ্যাচেট কক্ষে প্রবেশ করে আর্তনাদ করে উঠলেন।

'এই আমার বিধিলিপি।'

ডাক্তার ক্ষত পরীক্ষা করলেন।

'আমাকে পাইপ টানতে দেবেন, ডাক্তার'—ভিনসেন্ট বলল।

'নিশ্চয়ই।'

ভিনসেন্ট নিশ্চিন্ত মনে পাইপ টানতে লাগল।

'আজ রোববার, নিশ্চয়ই তোমার ভাই দোকানে নাই। তার বাড়ির ঠিকানাটা কি বল?'

'তা আমি বলব না।'

'তোমাকে বলতেই হবে। খবর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।'

'তার ছুটির দিনটা মাটি করতে আমি রাজি নই। বিশ্রাম করা তার প্রয়োজন।'

ডাঃ গ্যাচেট অনেক অনুরোধ করেও থিওর ঠিকানা আদায় করতে পারলো না। অনুপায় হয়ে তিনি ছেলেকে সেখানে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বাড়ি চলে গেলো।

ভিনসেন্ট পাইপ টেনে সারারাত সময় কাটাল।

ভোরে অফিসে এসে থিও ডাঃ গ্যাচেটের টেলিগ্রাফ পেল এবং তক্ষুণি রওনা হয়ে পড়ল।

'এসেছ, থিও'— ভিনসেন্ট শুধু বলল।

থিও ওর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং শিশুর মত ওর হাতদুটো চেপে ধরল। সে কোন কথা বলতে পারছিল না।

ডাক্তার এলে থিও ওঁকে নিয়ে বাইরে গেলে ডাক্তার হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন।

'কোন আশা নাই, বন্ধু। ও এত দুর্বল যে বুলেট বের করে ফেলবার জন্যে অপারেশন করা চলবে না। লোহার গুলি দেখেই এতক্ষণ বেঁচে আছে নইলে মাঠেই মারা যেত।'

সারাদিন সে ভিনসেন্টের হাত ধরে শয্যাপার্শে বসে রইল। রাত্রি হলে দু'একটা শান্তভাবে নিজেদের শৈশবের ঘটনাবলী আলোচনা আরম্ভ করল।

'বিজুইকের সেই মিলটার কথা তোমার মনে আছে, ভিনসেন্ট।'

'হ্যাঁ। ভারি সুন্দর মিলটা, থিও?'

'ওর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের জীবন সম্পর্কে কত স্বপ্নই না দেখেছি।'

'মাঠে মাঠে আমরা যখন খেলা করে বেড়াতাম, তখনও তুমি আমার হাত ধরে থাকতে, ঠিক এখন যেমন আছ, তেমনি ভাবে। মনে পড়ে থিও?'

'মনে পড়ে, ভিনসেন্ট।'

'আর্লস-এ হাসপাতালে যখন প্রায়ই জুন্ডার্টের কথা মনে পড়ত। তখন কি সুন্দর শৈশবই না কাটিয়েছি আমরা। ঘরের পিছনে, একাশিয়া বনের ছায়ায় ছুটা ছুটি করে খেলাধুলা করেছি আর মা আমার জন্য পিষ্টক বানিয়ে দিয়েছেন।

'ওঃ সে কত দিনের কথা, ভিনসেন্ট।'

'হ্যাঁ....মানে....জীবনই দীর্ঘ। থিও, দোহাই আমার। তুমি শরীরের একটু যত্ন নেও। স্বাস্থ্যটাকে ভাল কর। তোমাকে মনে রাখতে হবে শিশুটির কথা আর স্ত্রীর কথা। ওদের নিয়ে কোন গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়ে সেখানে ওদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন করাও আর, গুপীলদের সঙ্গে তুমি থেক না, ওরা তোমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করেছে....অথচ পরিবর্তে কিছুই দেয়নি।'

'আমি নিজের একটা গ্যালারি খুলব, ভিনসেন্ট এবং সে গ্যালারিতে হবে শুধু একটি শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী। শিল্পী ভিনসেন্ট গোঘের সম্পূর্ণ চিত্র-প্রদর্শনী...যেমন ছবিগুলো সাজিয়ে রেখেছ...ঠিক তেমন ভাবেই আমি প্রদর্শনী করব।'

ভোরের শান্ত রাত্রির নীরবতা কক্ষে। প্রায় একটার পর ভিনসেন্ট একটু ঘোমালো এবং অস্ফুটে বলল,'যদি মরতে পারতাম, থিও।'

এক মিনিট পরেই সে চোখ বুজল। থিও বুঝতে পারল ভাই তার চিরকালের জন্য তাকে ত্যাগ করে চলে গেল।

৫.

শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য রুশো, আরিয়র ও এমিল বার্নার্ড প্যারিস থেকে এল। তারা ভিনসেন্টের কফিন ধরাধরি করে টেবিলে রাখল।

থিও, ডাঃ গ্যাচেট, রুশো, প্রেরি, অরিয়র ও র‍্যাভো সেখানে সমবেত হয়েছিল। নির্বাক, নিঃস্পন্দ। পরস্পরের দিকে তারা তাকাতে পারছিল না।

কফিন নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি ওয়ালা এসেছিল। সে ডাকাডাকি করতে লাগল। 'ভগবানের দোহাই,ওকে তো আমরা এমন যেতে দিতে পারি না'– ডাঃ গ্যাচেট বলল।

ভিনসেন্টের ঘর থেকে সবগুলো ছবি আনলেন এবং বাড়ি থেকে ওর বাকি ক্যানভাস নিয়ে আসার জন্যে ছেলেকে বললেন।

দু'জন মিলে ছবিগুলো দেওয়ালে টাঙাল।

কেবলমাত্র থিওই কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ভিনসেন্টের ছবিগুলো এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কাফেটিকে যেন প্রধান গির্জায় রূপান্তরিত করল।

আবার এসে বিলিয়ার্ড টেবিলের কাছে ওরা দাঁড়াল। গ্যাচেট বলতে লাগলেন, 'আমরা যাঁরা ভিনসেন্টের বন্ধু, তাঁরা যেন দুঃখ না করি। ভিনসেন্ট মরেনি, সে মরতে পারে না। তার ভালবাসা, তার প্রতিভা, যে সৌন্দর্য সে সৃষ্টি করে গেছে– তা চিরভাস্বর হয়ে থাকবে, পৃথিবীকে উজ্জ্বল করে তুলবে। প্রত্যেকবার যখন আমি ওর আঁকা ছবির দিকে তাকাই প্রতিবারই আমি সাক্ষাৎ পাই নতুন বিশ্বাসের, উপলব্ধি করি জীবনের

নতুন উদ্দেশ্য । সে ছিল বিশাল প্রতিমূর্তি... মহান শিল্পী...বিরাট দার্শনিক। স্বীয় আদর্শ পালন করতে গিয়ে সে শহীদ হয়েছে।'

'... আমি.....আমি...' থিও তাকে ধন্যবাদ জানাতে চেষ্টা করল, কিন্তু অশ্রুতে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। কোন কথাই সে বলতে পারল না।

কফিনটা ঢেকে দেওয়া হল। ছ' বন্ধুতে কফিন তুলে ধরল। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে স্থাপন করল। গাড়ি চলতে শুরু করল। ওরা ধীরে ধীরে গাড়ির পশ্চাৎ হাঁটতে লাগল। গাড়ি এসে কবরখানার দ্বারে থামল।

কফিনটা কবরের কাছে নিয়ে আসা হল। থিও সবার পিছন পিছন এলো।

প্রথম দিন সেখানে দুজনে দাঁড়িয়ে ওয়েস উপত্যকার অপরূপ সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করছিল। সেই স্থানেই ভিনসেন্টকে সমাধিস্থ করার জন্য ডাঃ গ্যাচেট স্থির করেছিলেন।

এখানে এসে থিও আবার কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

নীরস কালো মাটি খুঁড়ে ভিনসেন্টকে সমাধিস্থ করা হল।

সাতজনেই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করল।

কদিন পরে ঐ কবরের পাশে সূর্যমুখীর চারা লাগাবার জন্যে ডাঃ গ্যাচেট এসেছিলেন।

থিও নিজের গৃহে ফিরে গেল। ভাইয়ের মৃত্যুতে তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

মনও ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল।

ছ'মাস পরে ভিনসেন্টের মৃত্যু-তারিখেই থিও-ও এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করল। ইতিপূর্বে তাকে নিয়ে যোহানা উট্রেক্‌টে এসেছিল। সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হল।

কদিন পরে মনের শান্তির জন্যে বাইবেল পড়তে পড়তে স্যামুয়েলের কথাগুলো যোহানা দেখতে পেল : মত্যুর পরেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়নি।'

যোহানা থিওর মৃতদেহ অভারে নিয়ে এসে ভাইয়ের কবরের পাশে কবর দিল।

অভারের দারুণ রৌদ্রতাপ যখন শস্যক্ষেত্রের পাশের ক্ষুদ্র কবরখানাটি তপ্ত করে তুলত, তখন ভিনসেন্টের সূর্যমুখী গাছের ছায়ার নিচে থিও আরামে বিশ্রাম করত।

বন্দী বিহঙ্গ

বারো মাসের ছটা ঋতু আবু মিয়ার মনে ছত্রিশ রকমের চিন্তা বয়ে আনে। ফাল্গুন যখন বনে বনে রঙ চড়ায়, সে রঙে তারো মনে জাগে নেশা। এর পর জ্যৈষ্ঠের বাউল বাতাস আমের তলায় শুকনো পাতাগুলো ওড়ায়, তারো বুকটা শূন্যতায় খা খা করে ওঠে। কলকাতায় বসে কিছুই দেখছে না সে, কিন্তু যখনি ভাবতে বসেছে, মনে হয়েছে তখনি, তাদের গাঁয়ের পাশে পুকুর পাড়ে আপনি-ফোটা ফুলের বনের অন্তরাগ আর উদাস দুপুরের ঝরাপাতার মড়মড় খসখস শব্দ সবই দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে। বড় বড় দু তলা তিন তলা বাড়িগুলোর উপর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে যখন মেঘ করে আসে, আর আসে একটা হাল্কা হাওয়া, তখন আবু মিয়ার বিশেষ করে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। তাদের আকাশ কত বড়ো। তাতে যখন ঈশান কোন আঁধার করে মেঘ জমে, পুকুরের জলে নেমে আসে তার কালো ছায়া, অতটুকু ছোট পুকুরের বুকে এত বড় কালো ছায়া ধরে না বুঝি হায়, সে কি তখন খড়ো-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় না, তারো কি মনে এমন একটি বড় ছায়া ধরি ধরি করেও উপচে ওঠে না—সে কি অনেক কথা—অনেক দিনের রাতের টুকরো টুকরো অনেক কথা—ভাবে না!

বর্ষার দিনগুলি খুব বড়। বেলা পড়ি পড়ি করেও শেষ হতে চায় না। হাতের কাজ শেষ করে হক-নাহক অনেকগুলো কথা ভাবা যায়। কাজের থেকে মন দুষ্ট ছেলের মতো কাজের অদেখা মাস্টারটিকে পালিয়ে ছুটে যেতে পারে, এবং ঘুরে ফিরে ঝড়ো হাওয়ায় অনেক আম কুড়িয়ে মেঘের কালো ছায়ায় অনেকখানি লুটোপুটি খেয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে এলেও তার বেতের ভয় থাকে। তারপর আসে রমজান মাস—পবিত্র উপবাসের মাস। একটি ভাবি আনন্দের অনির্বচনীয়তার মাঝে উপবাসের ক্লিষ্ট দিনগুলি পূর্ণতায় ভরে ওঠে—একটু পবিত্রতার আমেজে হাতের কাজগুলো জলদি জলদি ফুরিয়ে যায়—দিনগুলি দীর্ঘ মনে হয় না—কাজও ফুরোয় দিনও ফুরোয়, ফুরোয় না কেবল আনন্দের একটা আবেশময় মাধুরিমা। এটা ফুরায় না; একটা বিপুল আনন্দ-সঙ্গমের দিকে এটা ক্রমপ্রসারিত হয়ে ছুটে চলে। মুসলিম জগতে ঈদের উৎসব আসে আনন্দের পসরা নিয়ে—তারা আমোদ করে, খায়-দায়, পুণ্য কাজ করে, কিন্তু আবু মিয়ার জীবনে যে ঈদ আসে তার আনন্দের তুলনা হয় না—ঈদ এলে আবু মিয়া পনেরো দিনের ছুটি পায়। সারা বছরে তার এই একটি মাত্র ছুটি।

এবার তার ঈদের ছুটিটাই মাটি হয়ে গেছে। ছুটিতে দেশে যেতে পারেনি। শরীর খারাপ ছিল—হাতের টাকাগুলি ঔষধ আর পথ্যের দাম দিতে দিতেই খরচ হয়ে গেছে; কোথায় পাবে সে গাড়ি ভাড়ার টাকা। আর শুধু-হাতে যাবেই বা কেমন করে!

কিন্তু মানুষের মন বড় ঘাতসহ। একবার আশা-ভঙ্গ হলে আবার সে কোমর বাঁধে। বছরে কেবল একবারই ঈদ আসে। কিন্তু এক বছরেই তো নিঃশেষ হয়ে যায় না। বছরের পিছনে বছর যেমন, তেমনই ছুটির পিছনে ছুটি, সে তো আছেই।

আবু মিয়ার বিস্রস্ত মন গুটিয়ে এনে কাজে বসাতে দেরি হয় না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে হেমন্ত-শেষের দিনগুলিকে নিয়ে। বেলা চড়তে না-চড়তেই শেষ হয়ে যায়। শেষ কেবল বেলাটুকুই হয়, হাতের কাজ ফুরোতে চায় না। এই স্বল্পজীবী সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলা আবু মিয়ার মনে হয় রেস-খেলার মতো ক্লান্তিকর। পরাজিত বিপর্যস্ত আবু বিদ্যুতের কড়া আলোতে অনেক রাত অবধি কাজ করে চোখ কচলাতে কচলাতে মেসে গিয়ে ঢুকে। যেন তার মাথা ঘুরছে, কান দুটো কনকন করছে, আর চোখ দুটোতে রীতিমতো ঝাপসা দেখছে।

আবু মিয়ার চিঠিপত্র এই মেসের ঠিকানাতেই আসে। সেদিনও তেমনই একটা চিঠি এসেছে। ঘরের ভেতরে মাথা গলাতে না গলাতেই জনৈক রুম-মেট খবরটা দিলেন। নিশ্চয়ই জমিলার চিঠি। আবু মিয়ার ব্যগ্রতা দুর্বার হয়ে ওঠে।

চিঠিখানা খুব লম্বা। জমিলার চিঠি যত লম্বা হয় ততই ভালো লাগে। তার লেখবার শক্তি অসাধারণ। পুকুর পাড়ে আলো-ছায়ার খেলা, উঠানে পড়ন্ত রোদের যাই-যাই ভাব, বন-বাদাড়ে পাখ-পাখালির কলরব এসব তো আবু মিয়া জমিলার চোখ দিয়েই অনেকদিন ধরে দেখে আসছে। জমিলা যা সুন্দর করে চিঠি লেখে। বিশেষ করে ছেলে দুটির নানা অকীর্তি-কুকীর্তি দুষ্টামি-নষ্টামির কথা কি লোভনীয় করেই না সে জানাতে পারে। চিঠি পড়ছি, না নিজের চোখে দেখছি, ভুল হয়ে যায় অনেক সময়।

কিন্তু আলোটার দিকে চেয়ে তার মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই মাত্র কড়া আলোতে আপিসের কাজ করে এসেছে। আর এই কেরোসিনের আলো—

আবু মিয়া একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সহকারী সম্পাদক। সারা সপ্তাহের খবরগুলো ছোট করে রচনা করা থেকে প্রুফ পড়া ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত অনেক কাজ তাকেই করতে হয়। শুধু কাগজে তার নাম নেই। জমিলা তার চিঠিতে বেশ খোঁচাটা দিয়েছে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। সম্পাদক কে? না, কাগজটার মালিক। সব কিছু তুমিই করছো—আর তোমার নামটাই কাগজের এক কোনে ওরা ছাপাতে পারছে না। কলকাতায় তুমি এডিটরি করছো—সত্যের অনুরোধে শুধু ভাবিসাবদেরই নয়, এপাড়া ওপাড়ার ছোটবড়ো বউগিন্নিদেরও একথাটা বলতে হয়েছে। আমার কথা এরা সবাই শুনেছে, শুনতে একটুও উসখুস করেনি—খালি বিশ্বাস করেনি এই যা!

খোদার দোয়ায় দুটো খেয়ে বাঁচছি। পাড়া জুড়ে কত অভাব। কত লোকের দুবেলা হাড়ি চড়ে না। তবু আমরা কচিগুড়োকটিকে নিয়ে খেতে পাচ্ছি। কিন্তু ওগো, শুধু কি খেতে পাওয়াটাই সব! তুমি সাংবাদিক। তুমি সারা দুনিয়ার খবর রাখ, শুধু একটা মানুষের মনের খবর রাখার বেলাতেই বুঝি তোমার ভুল হয়!

বড্ড হাসির কথা। ভারি ছেলে মানুষ জমিলা। কলকাতায় একা থাকি। কে দেখে কে শোনে। নিকটে এসে থাকতে চায়! আমার উপর তার এ মমতাটুকু পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে তাই কথাটা অন্যভাবে বলেছে। আমাকে ছাড়া থাকতে পারছে না, এই ইঙ্গিতই জমিলা এখানে করেছে। ভারি ছেলেমানুষ। ভাবে, আমি বুঝি কিছু বুঝি না।

খোকা দুটি মূর্খ হয়ে রইল, মেয়েটা আহাম্মকের একশেষ, ছেলে দুটি তবু দুষ্টামি করে বাঁচে; তোমার কথা তুলে মাঝে মাঝে মুখ ভার করে আর মাঝে মাঝে মুখ ভেঙচায়; কিন্তু মেয়েটা সময় সময় বড় গম্ভীর হয়ে যায়। অতোটুকু বাচ্চা মেয়ে– তোমার কথা উঠলে এমন করে কোনো একদিকে চেয়ে থাকে যে, মনে হয়, কোন সুদূর বুঝি তাকে ডাকছে; এখনি বুঝি সে ছুট দেবে। আমার বড্ড ভয় করে। কিন্তু ছেলে দুটি তাকে এমন করে থাকতে দেয় না। চুল টেনে, ক্ষেপিয়ে, কাঁদিয়ে একশেষ করে। শেষে হাসিয়ে তবে ছাড়ে। কি দুষ্ট গো তোমার ছেলে দুটি। আর শোনো, সেদিন হয়েছে কি–

এইখানে জমিলা দুষ্ট দুটির কিছু কীর্তি-কাহিনী ফাঁস করে দিয়েছে। কি বেড়ে হয়েছে চিঠির এইখানটা। একবার পড়ে রেখে মন থেকে সেটাকে ভেবে বের করতে ভালো লাগে না– তেমনটি করে লিখেছে, আখরে আখরে না পড়লে পুরাপুরি তৃপ্তি আসে না।

চিঠিটা আবু মিয়ার বুক পকেটেই থাকে। স্টালিনগ্রাডে নাৎসি সৈন্যের অভিযান–তার ফলাফল ঘড়ির কাঁটার মতো দুলছে–আপিসে বসে আবু মিয়া একপিঠ শাদা একপিঠ ছাপা প্যাডের কাগজে তারই খবর সংক্ষিপ্ত করে লিখছিল। আগে থেকে ধারনা করা একঘেয়ে খবর। অচেতন মনকে ছেড়ে দিয়ে কেবল হাতে-পাওয়া মনটুকু নিয়েও খসখস করে কলম চালানো যায় এলেখা লিখতে। লেখা খারাপ হয়, লাইন বেঁকে যায়, মাঝে মাঝে শব্দ ছাড় পড়ে। কিন্তু তাতে মারাত্মক কিছু কাণ্ড ঘটে না। কম্পোজিটররা, খারাপ লেখা বোঝার পোকা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা কাগজগুলো ডাস্টবিনে ঢোকে বলে লাইন বাঁকা হওয়ার অসম্মান থাকে না। আর ছাড়-যাওয়া শব্দগুলিও কম্পোজিটররাই বসিয়ে দিতে পারে। তারও শেষ প্রুফ তো তারই হাতে।

কেবল বিরক্ত করে খবর ছাপাতে যারা আসে।

আদাব।

আদাব; বসুন। কি চাই আপনার? আবু মিয়া সময় সংক্ষেপ করার জন্য রীতিমতো নির্মম হয়ে ওঠে।

আগন্তুকের বসবার ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অনেক কথা বলার ভাব।

অনেকের অনেক জিনিস ছাপবার আবদার আসে। এমন দুর্ভাগাও কখনো কখনো আসে যার ছেলে হারিয়েছে; তারি খবরটুকু কাগজে ছেপে দেবার জন্য করে কাকুতি।

আবু মিয়ার মন একবার অনেক দূরের সেই পশুপতিপুরের গ্রামের ছায়া-ঘেরা পুকুরের পাড়, কয়েকটি পরিচিত পেয়ারা গাছের তলা–এসব ঘুরে এসে ডেস্কের উপর অবস্থিত হয়। সেই পেয়ারাতলায় না হয় কামরাঙা গাছের ছায়ায় রোগাপটকা দুটি শিশু খেলছে–খেলছে তো ভারি, খালি দুষ্টামি করছে–ধুলো দিচ্ছে এ ওর গায়ে, না হয়তো ছাগলের পিঠে চড়ে কান মুচড়ে ঘোড়া ছুটাচ্ছে; আরো কত কি কাণ্ড করছে যার ইতিহাস জানে শুধু নির্জন সেই পুকুর পাড়ের কয়েকটি গাছ-গাছড়া।

কিন্তু এ দুটিও যদি একদিন হারিয়ে যায়! জমিলা সারাদিন খাটে। হাতের কাজ তার ফুরোয় না। পরের বাড়িতে থাকে সে। হোক তার বাপের বাড়ি, তবু আপন বাড়ি

নয় যখন, সেটাতো পরেরই বাড়ি। নিজের বাড়ি-ঘর না থাকা কত দুঃখের। জমিলার থাকত শাশুড়ী, গুটিকয় ভালো ননদ, আর দুই তিনটি জা, এরা ভালো মানুষ নাই বা হবে কেন। এমন সোনার মানুষ জমিলাকে অনাদর করবেই বা কেন এরা; হ্যাঁ জমিলার সুখ হতো, তার কাজগুলো আমার বোনেরা-ভাবিরা কেড়ে নিয়ে নিজেরা করে দিতো। জমিলা তার ছেলে-মেয়েদের দিকে আরো একটু নজর দিতে পারত। তা যখন পারছে না, তখন জমিলা তো খালি খাটছেই। খেটে খেটে নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়ে সহসা চকিতে মনে পড়ছে তার রুমু-জমু আর পান্নার কথা। এরা এখন কোথায়? নিশ্চয় সেই পেয়ারাতলায়। ডেকে নিতে এসে যদি দেখে ওরা সেখানে নেই! সেখানে নেই, পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে নেই, পাড়ার বারোয়ারি তলায় নেই– কোথাও নেই। তারা হারিয়ে গেছে। তাহলে জমিলার কেমন লাগবে–চিঠিতে খবরটা জানতে পেয়ে আবু মিয়ারই বা কেমন লাগবে!

বুকটা খচখচ করে। হতের কলম স্তব্ধ হয়ে যায়। চিবুকে দুখানা হাতের চেট রেখে আবু মিয়া কোনো একদিকে চোখ মেলে দেয়। চারদিকে পাকা দেওয়াল। জানালার দিকে চাইতে হলে কষ্ট করে ডানদিকে ঘাড় ফেরাতে হয়। বিশেষ কিছু দেখাও যায় না। দেখা যায় কেবল পাশের জুবেনাইল জেলের উঁচু পাঁচিল আর তারও উপরের কাঁটা-তারের দু তিনটা সারি। অনেকগুলো ছেলেকে এরা এখানে আটকে রেখেছে। ছেলেদের অপরাধ, তারা দুষ্ট। রমু-জমুও খুব দুষ্ট। তাদের দুষ্টমির আর এক ফিরিস্তি তাদের মা এই বুক পকেটের চিঠিতেই দিয়েছে। এই জেলের ছেলেরা পালাতে পারছে না, কত উঁচু পাঁচিল তারও উপর কাঁটা তারের বেড়া। ছেলেরা বন্দী। রমু-জমুও কি বন্দী? এ দুটি দুষ্টও কি আমাদের জন্য পালাতে পারছে না। আমার জন্য আর জমিলার জন্য। আমরা ছেড়ে দিলে এরা কি নদীর পাড় ধরে বনের রেখা ধরে আকাশের কোন ধরে অনেক দূরে চলে যেত? জমিলা তা হলে কি করে? আমি তা হলে কি করি? সেই থেকে লেখা একটুও এগোয়নি।

হেড কম্পোজিটার এসে ভাঙা গলায় খেকিয়ে গেছে : আবু ভাই আপনি কপি-পত্র দিচ্ছেন না। এবারও লেট হয়ে যাবে, বলে রাখলুম।

এস্বরকে বড় ভয়। মালিকের কাছে অবাধে কৈফিয়ত দিয়ে বসবে, আবু মিয়া সাহেব কপি দিতে দেরি করেছেন, আমরা কি করব। তারপর আবু মিয়া তুমি একা ঠেলা সামলাও।

কিন্তু এরও প্রতিকার আছে। মিষ্টি করে বলে দিতে হয়, 'এই দিলুম বলে, খবরগুলো বড্ড এলোমেলো করে লেখা আছে কি না, খুঁজে পেতে দিতে দেরি হচ্ছে। এই হয়ে এল বলে।' মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে এরা–এই কম্পোজিটারেরা কয়েক গেলাস চা মেরে রোজের কাজ হাফ রোজে করে দিতে পারে।

শুধু ওদের বিগড়োতে নেই।

কিন্তু এবার সে যুদ্ধে নেমে পড়েছে। দূরে থেকে দেখছিল আবু মিয়া অনেকক্ষণ ধরে কিছুই লিখছে না। আঙুলের কারসাজিতে কলম বাগিয়ে সেই বাকানো হাত চিবুকে

রেখে মিছিমিছি সময় কাটিয়েছে। ডবল শিফটে কাজ করে সেও পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়—কাগজ বার হওয়া না হওয়ার অর্ধেক দায়িত্ব তার। সে ছাড়বে কেন?

রাগের মাথায় কেবল 'আবু ভাই' কথাটি বলেই সে অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু এ কোন রাজ্যে আছে? ধ্যান তো ভাঙছে না আবু মিয়ার।

আবু ভাই! জলদি জলদি লেখাটা শেষ করতে বলে গেলাম, কিছুই করছেন না যে।

হাতে একটা রোটারি মেসিন বাঁধবো না কি!—চটে ওঠা আবু মিয়ার স্বভাব নয়, কিন্তু এরা তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না যে। আবু মিয়ার মন বলে যে জিনিসটা আছে, সেটা আফিমের মতো তেতো আর আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু পকেটের চিঠিখানা এক কাপ গরম চায়ের মতো কাজ করে। নিঃশঙ্ক বেপরোয়া মনে চিঠিখানা শেষ করে নিজের মনেই বলে ওঠে, ধ্যেৎ, ওরা পালাবে কোথায়? ওরা আমাদের বুকে চিরদিন বেঁচে থাকুক। আমার বুকে আর জমিলার বুকে।

চারদিন পর জমিলার আর একটা চিঠি এল। জমিলা লিখেছে, ওগো কাল এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। আবু মিয়ার হাত কাঁপছে; বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে, না জানি কি খবর জমিলা লিখেছে তার চিঠিতে।

তারপর জমিলা লিখেছে : পাখিটা মুক্তি পেয়ে গেল। আবুর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে; চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে—আবু বুঝি বা এখনি পড়ে যাবে—

এক মিনিটে সে আপনাকে শক্ত করে নিল; না চিঠিটা পড়তেই হবে; যত খারাপ যত মারাত্মক খবরই জমিলা দিক না, আবু মিয়া সব কিছুর জন্য তৈয়ার। সে বুক বাঁধবে।

আবু মিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে চললো ঃ সেদিন তোমার ছেলে দুটো করলো কি, না একটা পাখি ধরে আনলো! এনে খাঁচায় পুরলো! খাঁচার বন্ধনে পড়ে পাখিটা লাগল ছটফট করতে। খাবে না, নাবে না, কিছু করবে না, খালি খালি ডানা ঝাপটাবে।

শেষে তোমার মেয়েটা করল কি, না খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিল।

মাসিক মোহাম্মদী : পৌষ ১৩৫২

সন্তানিকা

ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বগলে খানকয়েক বই খাতা লইয়া নরেশ বাড়ির পথটি ধরিয়া চলিতে থাকে। পশ্চাতে যে এক বুড়া ডিটেকটিভের মত তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পিছু লইয়াছে, ইহা সে লক্ষ্য করে নাই। লক্ষ্য করিলে বুড়ার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হইত।

নরেশ মাইনর স্কুলের ছাত্র, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ভূষণের পারিপাটা নাই, চুলগুলি উস্ক-খুস্ক। অর্ধমলিন পাঞ্জাবীর হাতাটায় এক ছোপ কালির দাগ। উহা দ্বারা কখন সে মুখের ঘাম মুছিয়াছিল–মুখেও কালির সবুজ স্পর্শ লাগিয়াছে। কোঁচাটা মাটিতে লুটাইত যদি সে বাম হাতে উহা উঁচু করিয়া ধরিয়া না রাখিত। মোটের উপর বেশ নিরীহ গোবেচারা ছেলে। ক্ষুধার তাড়নায় বেশ একটু জোরে জোরেই পা ফেলিয়া চলিতে থাকে।

বুড়া তাহার সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া হাঁটিতে পারিতেছে না।

বুড়ার বয়স হইয়াছে নেহাত কম নয়। হাঁটু পর্যন্ত পরতে পরতে ধূলা লাগিয়াছে–যেন মোজা পরিয়াছে! বহু দূর হইতেই হাঁটিয়া আসিতেছে হয় ত। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, বাম কক্ষে একটা শত মলিন কাপড়ের পুঁটলি। শত তালি দেওয়া চটি জোড়াটা সে বাম হাতে রাখিয়াছে। ডান হাতে একটা পুরানো ছাতা আর একটি বাঁকা লাঠি। যেন একজন ঘোর পর্যটক! কোথা হইতে কেমন করিয়া সে জীবনের এই শেষের পথে আসিয়া পড়িয়াছে সে ইতিহাস একমাত্র সে-ই জানে। দুনিয়ার আর কে কে জানে জানি না।

নরেশের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে বুড়া।

বীরেশবাবু বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরেই বলেন, মশায়ের নাম কি? থাকা হয় কোথায়?

হাঁটিয়া হাঁটিয়া বুড়া শ্রান্ত হইয়াছে। লাঠিটায় ভর রাখিয়া বসিয়া পড়ে মাটির উপর। বলে, আমার নাম ধনঞ্জয় ঘোষাল। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করছেন বাবু! বাড়ি আমার নেই। ছিল, সবই ছিল, এখন কিচ্ছু নেই!

এখানে কি চান্?

আজ্ঞে, বড় একটা আশা নিয়ে আপনার দ্বারে এসেছি। আপনার বাড়িতে ইস্কুলের ছেলে আছে, গৃহশিক্ষকের দরকার পড়ে নিশ্চয়। যদি আমাকে গৃহশিক্ষক হিসাবে আপনার গৃহে স্থান দেন তবে বিশেষ কৃতার্থ হই।

বীরেশবাবু আবার বৃদ্ধের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলেন, অন্যত্র চেষ্টা করুন। এখানে আপনার সুবিধে হবে না।

বুড়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, তা একটু আধটু অসুবিধা হলেই বা, আমি সব চালিয়ে নিতে পারব। আপনি সে জন্য ভাববেন না বাবু। সংসারে আমার আর কেউ নেই। দোহাই আপনার, আমাকে নিরাশ করবেন না।

বুড়ার সবিনয় কাতরতায় বাবুর মন গলিয়া যায়। সুর একটু নরম করিয়া বলেন, আপনি কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে পারেন?

বুড়া বলে, আমি বরাবরই উচ্চ প্রাইমারী ইস্কুলে হেডমাস্টারি করে আসছি। কি করব, অদৃষ্ট মন্দ, ইস্কুল উঠে যায়, আর আমিও হয়ে গেছি একেবারে নিরাশ্রয়।

বুড়া ধনঞ্জয় ঘোষাল থাকিয়া যায় বীরেশবাবুর বাড়িতে।

বীরেশবাবু ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। বুড়া খাইতে বসে বারান্দায়। এ-টা সে-টা দিয়া পেট পুরিয়াই সে খায়, বুঝে, গিন্নীমার আদর আছে যথেষ্ট, মনটাও স্নেহ-প্রবণ। পেট চিনিয়া খাওয়াইতে জানে। ভাত ব্যাঞ্জন পাতে দিয়া গিন্নীমা তাহার নিকটে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়, একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে। বুড়া ধনঞ্জয় বলিয়া যায় তাহার জীবনের কাহিনী।

ছেলেবেলায় খুব ভাল ছাত্রই ছিল সে। তবু তাহার গুরু মহাশয়ের কি কড়া শাসন! ও-বাবা! সে আজ অনেক দিনের কথা। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় পাঠশালা বসিত। প্রত্যেক ছাত্রের এক একখানা করিয়া ছোট মাদুর থাকিত। ছাত্ররা সুর করিয়া কড়াকিয়া, নামতা, ক-য় আকারে কা, এই সব মুখস্থ করিত, আর বালক ধনঞ্জয় উত্তর দিককার খোলা মাঠটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কিছুই ভাবিত। ভাবিত, পণ্ডিত মহাশয় কতক্ষণে ছুটি দিবেন, কতক্ষণে গিয়া সে হিজল গাছের খোপ হইতে পাখীর ছানা পাড়িয়া আনিবে! হাঁ, পাখী পুষিবার সখ ছিল তাহার পুরা মাত্রায়। তারপর সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া মাস্টারি-জীবন সুরু করে। ওঃ সে অনেক কথা। তখনকার ছাত্রবৃত্তি ছিল আজকালকার এল-এর দাদা! কত কিছুই না তখন ছেলেরা শিখিত; আর আজ.... মাছের ঝোলটা হয়েছে অতি উৎকৃষ্ট মা—বলিয়া ক্রমাগত কয়েকটি গ্রাস মুখে পুরিয়া বুড়া আবার তাহার গল্প আরম্ভ করে—

কত বামুন কায়েতের ছেলেকে সে মানুষ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এল-এ বি-এ পাশ করিয়াছে, অনেকে ডেপুটী মাজিষ্টর হইয়াছে। ওঃ, কতদিন সে মাস্টারি করিয়াছে! তাহার কত ছাত্রের চুল পাকিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে—আবার অনেকে চলিয়া গেছে ও-পারের ডাকে! কত হেডমাস্টার এখনও পথে দেখা হইলে তাহাকে সসম্মানে নমস্কার করে। এখনও সে বাঁচিয়া আছে। মস্তিষ্কের গোলযোগ মোটেই হয় নাই, সব মনে রাখিতে পারে। ছেলেদের পড়াইতে খুব ওস্তাদ সে, অনেক কায়দাকানুন জানে। বখাটে ছেলেদেরও মানুষ করিবার অনেক অভিজ্ঞতা সে তাহার সুদীর্ঘ মাস্টারি-জীবনে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যে কোন যুবক মাস্টারের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত।

শিক্ষকতা কার্যকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। এমন পবিত্র কাজ দুনিয়ায় আর দুটী আছে? ছেলে মানুষ করা, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের গঠন করিয়া তোলা! সারাটা জীবন সে এই কাজে কাটাইয়াছে। জীবনের অপরাহ্ন—বাকি দিন কটা এই কাজেই কাটাইতে পারিলে তাহার আজন্ম-সাধনা সফলতা লাভ করে।

আহার সারিয়া সকড়ি ধুইতে যায়। গিন্নীমাকে মনে মনে প্রণাম করে। সে লক্ষ্য করিয়াছে গিন্নীমা তাহার প্রত্যেকটি কথা মন দিয়া শুনিয়াছে। এমন ধৈর্যশীল শ্রোতা সে জীবনে অল্পই পাইয়াছে। বাস্তবিক গিন্নীমা সোনার মানুষ ....

সন্ধ্যার পর ছাত্র লইয়া বসে। তিনটি ছাত্র। নরেশ আর তার ছোট দুটি ভাই বোন। ভাইটি পড়ে বর্ণপরিচয়। বোনটির মুখ দিয়া এখনও স্পষ্ট কথা ফুটে নাই। নূতন মাস্টারের নিকট আজ হইতে অ আ শিখিতে সুরু করে।

এই সরল মোটা দাড়িওয়ালা নূতন জীবটিকে দেখিয়া খুকী ভয় পায় না—মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠে, ভাব করিতে চায়। কোল ঘেঁষিয়া বসিতেও আপত্তি নাই। খুকীর এ একটি মস্ত গুণ ....

নরেশ ভাবে এ কোথা হইতে আসিল? ইহার শাসনের গণ্ডীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে হইবে। জীবনের এই নূতনতম সাথীটার কথা ভাবিতে বসে, পড়া ভুলিয়া মুখের দিকে তাকায়, প্রকাণ্ড শরীরটার দিকে চাহিয়া থাকে।

মাস্টার আলোটা একটু বাড়াইয়া দিতে মনোযোগ দেয়। মিনিটখানেকের জন্য সব চুপচাপ হইয়া নূতন জীবটিকে চাহিয়া দেখে। বাবু ও-ঘর থেকে ঝঙ্কার দিয়া বলেন, কি-রে নরেশ, সব চুপ যে! এই-ই বুঝি তোদের পড়া!

মাস্টার সচকিত-সচেতন হইয়া উঠে। নরেশকে দেয় এক ধমক। মৌচাকের অলি গুঞ্জনের মত আবার পড়া চলিতে থাকে।

নরেশকে ধমক দিবার সময় খুকী মাস্টারের মুখখানার দিকে চাহিয়াছিল—এমন সরল মুখখানা এতখানি বিকৃত হইতে পারে! খুকী ভয় পায়, বলে, মার কাছে যাব। মাস্টার বলে, আগে পড়া শেখ, পরে যেও মার কাছে।

খুকী ক্রমে ক্রমে কান্না জুড়িয়া দেয়। বুড়া আদর করিয়া খুকীকে কোলে তুলিতে চায়। খুকী নারাজ। এই দাড়িওয়ালা বিরাট মনুষ্যটা কি জুজু-বুড়িরই রূপান্তর! খুকী প্রাণপণ শক্তিতে কোল হইতে নামিয়া পড়িতে চায়। বুড়া একটা মজার ছড়া কাটিয়া খুকীকে হাসাইবার চেষ্টা করে। খুকী চীৎকার করিয়া কাঁদে।

বুড়ার এই সঙ্কটের কালে গিন্নীমা আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। জীবনের দুই প্রান্তের দুইটি বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে রফা করিয়া দেন। আবার পড়াশুনা চলিতে থাকে।

ও-ঘর হইতে বাবু বলিয়া উঠেন, মাস্টার মশাই, আজকের মত পড়া বন্ধ করুন। ছেলেদের ছুটি দিন।

ছেলেদের লক্ষ্য করিয়া বেশ একটি মুরুব্বিয়ানার সুরেই মাস্টার বলে, আজ এতটুকুতেই বিদায় দিচ্ছি—কাল কিন্তু ওটা হবে না। এত শীঘ্র ছুটি পাবে না।

এইভাবেই ধনঞ্জয় ঘোষালের ছাত্র মানুষ করা চলিতে থাকে।

মাস্টার তামাক টানে খুব বেশি। বাবুর নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া সে একটা কলি-হুঁকা, দুই পয়সার মাখা তামাক, ও এক পয়সার টিকা কিনিয়া আনিয়াছে। বাঁশের দুইটা চোঙা সে আপনা হাতেই তৈয়ার করিয়াছে তামাক টিকা রাখিবার জন্য। বাবুর ছেলে নরেশকে সে হুকুম দিতে ভয় পায়, বাবু যদি রাগ করেন! সে নিজ হাতেই তামাক সাজিয়া গুড়ুক গুড়ুক করিয়া টানে। এই বাড়িতে তামাক-সুন্দরের অস্তিত্বের

প্রমাণ ঘোষণা করিতে থাকে। তার মনে পড়ে আগেকার কথা,–পাঠশালার ছুটির পর পাড়ার নবীন পাল, সাচুনী শীল, বিনোদ কর্মকার প্রমুখ পাঁচজনের সাথে কি আরামেই না তামাকের সদ্ব্যবহার চলিত! তখন এই তামাক কভই না ভাল লাগিত। আজ আর এমনটি হয় না। কোন ভাল জিনিষ কি একা একা উপভোগ করা যায়!

দুপুর বেলাটা সে গিন্নীমার নিকট বসিয়া সুর করিয়া মহাভারত পড়ে। গিন্নীমাকে মা বলিয়া ডাকিতে তাহার কোথাও বাধে না, যদিও তিনি তার মেয়ের সমান বয়সী। সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী– সেও এই পরিবারের একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনটা যদি এইভাবেই কাটিয়া যায়! জীবনের সূর্যটা ডুবিবার আর কতটুকুই বা বাকি ...। বাকি কয়টা দিন যদি এইখানেই থাকিতে পারে! চিরনিদ্রাটা যখন একদিন আসিবেই তখন ... ভাবিতে তাহার কতকটা আনন্দ আসে। মৃত্যুর তিক্ততা সে জীবনে বহুবার অনুভব করিয়াছে। মরণের কথা স্মরণ হইলে আগে সে শিহরিয়া উঠিত। এখন সে মৃত্যুকে ভয় পায় না। কিন্তু বেঘোরে মরাটাকে সে বড় ভয় করে। কোথায় কোন পথের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে নদীতটে কিংবা উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িয়া মরিবে, ভীষণ পিপাসার কালে ক্ষীণকণ্ঠে জল জল বলিয়া চেঁচাইবে, কেউ শুনিবে না। তার ক্লান্ত নিমীলিত আঁখিযুগল বৃথাই আকাশে বার দুই মৃত্যুস্পর্শ হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিবে–কেহ দেখিবে না, কেহ শুনিবে না, ইহা সে বড় কষ্টের বিষয় বলিয়া মনে করে।

এখন মৃত্যুকে ভয় করে না সত্য। কিন্তু যখন প্রকৃতই মৃত্যু আসিয়া তাহার তুহিন শীতল হস্তদ্বয় স্পর্শ করাইবে–তখন যে বড় ভয় করিবে! একাকী সেখানে সে কেমনে মরিবে! আর মরিলেই বা কি, তাহার অসহায় অসাড় দেহটাকে লইয়া শৃগাল কুকুর শকুনিতে টানাটানি করিবে। একটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে যে ......

ভাবিতে ধনঞ্জয়ের শরীর শিহরিয়া উঠে। এখানে মরিতে পারিলে তার কোন ক্ষোভই থাকিবে না। নিঃসহায় বলিয়া জগতের কাছে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কোন অভিযোগই নাই। সে শুধু শান্তিতে মরিতে চায় ....

সকাল আটটা বাজিতে না বাজিতেই ধনঞ্জয়ের বড় ক্ষুধা পায়। সে অন্য সব সহ্য করিতে পারে, গালমন্দও নির্বিকার চিত্তে হজম করা তার অসাধ্য নয়। কিন্তু ক্ষুধা সে সহ্য করিতে পারে না। এই সময় রাগটা একটু বাড়ে। পিটিয়া মানুষ করিবার দায়িত্ব বোধটাও এই সময় সজাগ হইয়া উঠে। ক্রোধ সম্পূর্ণ পড়ে গিয়া নরেশের উপর। বিকৃত মুখের তর্জন গর্জন, প্রহারোদ্যোত হস্তের তাড়না যুদ্ধ দেহি অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি সকল মিলিয়া তাহাকে ক্ষিপ্তের ন্যায় করিয়া তুলে। নরেশ ভয় পায় না। মাস্টারের এই মারমুখো ভাব তার গা-সহা হইয়া গিয়াছে। নরেশ মাথা নিচু করে। মাস্টার ক্ষিপ্তের ন্যায় চক্ষু লাল করিয়া বলে, তোর কিছু হবে না। তোকে মেরে খুন করে ফেলা উচিত।

ঐ ঔচিত্যের ভাবটুকু সে অন্য কাহারও জন্য রাখিয়া দেয়। মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবার মত সাহস এবং উৎসাহ বৃদ্ধের শেষ পর্যন্ত থাকে না।

সহসা কি ভাবিয়া নরেশ এক দৌড়ে বাহির হইয়া যায়, মাস্টারের কাছে বলিয়াও না, আদেশ বা অনুমতি লওয়া তো দূরের কথা! মাস্টারের ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা থাকে না। এইবার হাতে পাইলে খুন করিয়া ফেলাও বিচিত্র নয় ....

কিন্তু বুড়ার উঠিয়া গিয়া ধরিয়া আনিয়া শাসন করিবার মত বয়স এবং দিন এখন আর নাই। করিয়াছে কোন দিন! ছাত্রের মার কোল হইতে তাহাকে ধরিয়া স্কুলে আনিয়া টেবিলের পায়ার সাথে বাঁধিয়া সে পিটিয়াছে! কিন্তু সে দিন আর নাই।

কতক্ষণ পরেই দেখে, নির্লজ্জ ছেলেটা এক ডালা মুড়ি আর গুড় লইয়া হাসিমুখে হাজির! আনন্দে বুড়ার সর্বাঙ্গে পুলক শিহরণ বহিয়া যায়। অনেখ বুড়ার স্বভাব ঠিক শিশুর মতই হইয়া যায় কি না! এই ছোটখাট সংকট ত্রাণকারী জীবটিকে কাঁধে তুলিয়া নাচিতে পারিলে তাহার অপরিসীম আনন্দের খানিকটা প্রকাশ করিতে পারা যায়। ধনঞ্জয় মুচকিয়া হাসিয়া ডালাটি গ্রহণ করে। বলিতে লজ্জা হয়, তাই বলিতে পারে না, চিরজীবী হও বৎস! তবু মনে মনে আশীর্বাদ না করিয়া ছাড়ে না।

এতখানি বয়সে এত খাটিয়া পড়ানোটা রক্তমাংসের জীবের পক্ষে কষ্টের ব্যাপারই। পড়াইতে পড়াইতে বুড়োর ঘুম আসে—বড় আরামের ঘুম। আবেশে চোখের পাতা বুজিয়া আসে। তবু কান দুইটা সে যথাসম্ভব খাড়া করিয়া রাখে ও-ঘরের পানে, বাবু কিছু বলে কি না। কৌতুকী ছেলেটা ডাকে, মাস্টার মশাই, অ-মাস্টার মশাই!

মাস্টারের নিদ্রার ভারি ব্যাঘাত হয়। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মুখ খিঁচাইয়া দুই কথা শুনাইতে চায়। তারপর রাগ পড়িয়া আসে। বলে, শিখেছিস পড়াটা? বল্, সের-কষার আর্যাটা!

নরেশ বলিতে পারে না। মাস্টার কাঠের রোলারটা লইয়া তাহার ডান হাতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে থাকে। সে ক্ষিপ্র গতিতে বাম হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলে, এই হাতে আরেকটা মাস্টার মশাই!

এইবার মাস্টার ফিক করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, তোদের কি আমি মিছামিছি মারি রে! আমার কি মনের সাধ যে, তোদের পিট্টি দিই! পড়া শিখবি না, তা একটু আধটু মারব না ত কি করব?

ছাত্র সোহাগে বিগলিত হইয়া বলে, মাস্টার মশাই, তামাক সাজিয়া আনি?

এইবার এই সূক্ষ্মদর্শী বালকটির প্রতি স্নেহে বুড়ার প্রাণ মন আপ্লুত হইয়া উঠে। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া তাহার সমস্ত বালাই টানিয়া আনিতে চায়! মুহূর্তে তাহাকে চিরঞ্জীব করিয়া তুলিতে চায়।

মাস্টার গল্প করিতে খুব ভালবাসে! বিশেষ তাহার নিজ জীবনের কথা বলিতে গিয়া সে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া যায়। গল্প করিতে বসিলে তাহার ঘুম পায় না। পড়াটা কঠিন ঠেকিলেই ছাত্র বলিয়া উঠে, মাস্টার মশাই সেই গল্পটা ....

মাস্টার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া গল্প জুড়িয়া দেয়—

সে এক বিবাহের বরযাত্রী গিয়াছিল। বিয়ে বাড়ি সে এক মজার ব্যাপার, বর বদল হইয়াছিল সেখানে। কন্যার পিতা দেখে বরের এক চোখ কানা! অবশেষে বর্তমান মাস্টারটির যুবক সংস্করণটিকেই তারা ধরিয়া-টরিয়া বরের আসনে উঠাইয়া দেয়! হাঁ হাঁ, কি মজার কাণ্ড .... ইত্যাদি ইত্যাদি বুড়া হাসিয়া উঠে। জীবনের সেই শুভ আনন্দময় গৌরবময় দিনটিকে স্মরণ করিতে বুড়ার দীর্ণ বুকে আজও আনন্দের বান

ডাকে—চোখে পুলকের ধারা নামে। এই সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ত কম নয়! বুড়ার গল্প আর থামিতে চায় না।

পড়াশুনা কিছুই হয় না। বাজে গল্পেই সময় কাটে ...

বার্ষিক পরীক্ষার ফল বাহির হইলে বীরেশবাবু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখেন, ছেলে শোচনীয় ভাবে ফেল করিয়াছে! তাঁহার সুকঠোর মুখভাব, ক্ষমাহীন নয়নদ্বয় যেন বুড়াকে তিরস্কার করিয়া বলিতে চায়, এ বাড়িতে তোমার কোন দরকার নাই মাস্টার, তুমি অন্যত্র দেখিতে পার ...

বুড়া ইহা বুঝে—ভাল করিয়াই বুঝে। বাবুর সামনে অপরাধীর মত ক্ষমা চাহিবার সুরে বলে, এবার থেকে তাকে বেশি করে মারব, বেশি শাসন করব—আরো ভাল করে পড়াব।

বাবুর কাছ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সে ভগ্নবুকে ফিরিয়া আসে। সরস্বতীর কাছে অভিযোগ করে—কত ছেলে পাশ করে, সে কেন পাশ করিতে পারে না ...

বীরেশবাবুর মেজাজটা বড় কড়া। তাই বড় ভয় হয় তাঁহাকে। তাঁহার মুখের একটি কথার উপর ধনঞ্জয়ের জীবনের সবটুকু নির্ভর করে যেন! একে সে বুড়া—থুরথুরে বুড়া হইয়া গিয়াছে—হালশূন্য জীবনের তরণীটা যদি বা ভাসিতে ভাসিতে আশাতীতের মত এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, একটা কিনারা সে পাইয়াছে, এই কূল হইতে তাহার ডুবো-ডুবো তরীটাকে ভাসাইয়া দিলে সে আর কূল পাইবে কি না কে বলিবে। হয়ত একটা বি-পাকে একটা ঘূর্ণিপাকে টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইবে, কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না। ভবের মহাসমুদ্র কল্লোল হইতে উত্থিত একটা ক্ষুদ্র বুদ্বুদ—চক্ষুর নিমেষে মিলাইয়া যাইবে!... ইহাকে ধনঞ্জয় বড় ভয় করে।

এক একবার তাহার মনে হয়, বীরেশবাবু সর্বশক্তিমান্—সৃষ্টিকর্তার নাড়ির সঙ্গে তাঁহার নাড়ির কোথায় যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে—সেইটা দুনিয়ার আর যেন কোন মানুষের সঙ্গে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই ধনঞ্জয়ের অদূরাগত মৃত্যুটার উপরেও যেন কারিকুরি করিতে পারেন। তাহাকে যেন কোন্ স্বর্গ হইতে আনীত অমৃত দিয়ে মৃত্যুর মধ্যেও অমর করিয়া রাখিতে পারেন।

কিন্তু ওই অটল শক্তিধর মুখখানার দিকে তাকাইলে সে ভরসা মোটেই থাকে না। বিধাতা কি কঠোর করিয়াই না ঐ মুখখানা সৃষ্টি করিয়াছেন! বিশ্বের অর্ধেক কঠোরতা ওই মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন। আর তাহা না হইবেই বা কেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি ত তিনি! সৃষ্টিকর্তার মুখই বা কোন কোমলতায় গড়া ...

... একটু অবসর পাইলেই এইসব উদ্ভট ভাবনা সে ভাবিতে থাকে। ভয়টা ক্রমে নিদারুণ আশঙ্কায় গিয়া দাঁড়ায়। বাবুর মুখখানা দেখিলে এখন তার বুকটা মোচড় দিয়া উঠে। শিশু যেমন অলৌকিক কিছু দেখিলে আঁতকাইয়া উঠে, এও তেমনই ...

এমনই ভীরু এই ধনঞ্জয় ঘোষাল!

আজকাল মাস্টারের আহার কমিয়া আসিয়াছে। রাত্রিতে আহারের রুচি থাকে না মোটেই। জিহ্বাটা যেন নিমের মত তেতো হইয়া থাকে। আবার রাত্রিতে জ্বর হয়, ঘুষঘুষে জ্বর, হাড়ে হাড়ে, শিরায় শিরায় এই জ্বর ক্রিয়া করে। কাঁপুনি ধরে না, তবু এ

যেন অসহ্য জ্বর! রাত্রিতে বিছানায় শুইলে কোথা হইতে কি একটা যেন আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসে।—তারপর শরীরের ভিতরস্থ একটা নির্দিষ্ট স্থান হইতে নিমনিমে বেদনার মত একটা কিছু বাহির হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে।

অর্ধ জাগরিত অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখে—নানান বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন।

মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায়—সহজে ঘুম আর আসে না। তখন সে চিন্তা করিবার প্রচুর সময় পায়। শুইয়া শুইয়া চিন্তা করে। এই চিন্তায় বাধা দিবার কেহ নাই।

চিন্তার স্রোত নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে—এত চিন্তাশীল সে।

শেষ রাত্রের দিকটায় আবার একটু ঘুম আসে। সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিতে যাইয়া দেখে, সমস্ত শরীরে ব্যথা—মাথাটা যেন এক মণ ভারি, কপালটার ভিতর যেন কে জ্বলন্ত চুল্লী বসাইয়াছে।

ধনঞ্জয় শয্যা লইয়াছে। ভয়টা এবার আরও বাড়িয়াছে—মরিবার সময় পৃথিবীর সর্ব শেষের—সর্বাপেক্ষা ভয়ানক দুঃসময়টার কালে সে কাহারো করুণ মুখ দেখিতে পাইবে না। বেদনার অশ্রু, শোকের অশ্রু সে আশা করিতে পারে না, চাহেও না,—তবু একটু করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ...

জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে সুরু করে। রক্তজবার মত লাল চক্ষু দুইটা চামড়ার আবরণীতে ঢাকিয়া যেন সে ধ্যানস্থ হইয়া যায়। বহুক্ষণ পরে ধ্যানলোক হইতে বাস্তবে ফিরিয়া আসে। চক্ষু মেলিয়া চায়, দেখে বীরেশবাবু ও গিন্নীমা শর্য্যার কিনারায় বসিয়া। উভয়ের মুখেই চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ! বাবু তাহার হাতের কব্জী ধরিয়া কপাল টিপিয়া দেখেন। ভারি আরাম বোধহয় ধনঞ্জয়ের। বাবু বেদনার্দ্র স্বরে বলেন, মাস্টার, তুমি কি সত্যই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে!

এইবার ধনঞ্জয়ের মনে একটা খটকা বাধিয়া যায়। ইহার মীমাংসা করিতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। সত্যই কি সংসারে তাহার কেহ নেই? তবে, এমন করুণাপূর্ণ কথা যিনি বলিতে পারেন তিনি কে? তবে সংসারে এমন লোকও আছে, ধনঞ্জয়ের অভাবে যাহার মনে বিন্দুমাত্রও বেদনার সঞ্চার হইতে পারে। তবে সংসারে তাহার আরও একটু প্রয়োজন আছে!

অন্তরের খটকাটা সে সত্যই এবার মীমাংসা করিয়া ফেলে। দুই চোখের কোন বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। বাবুর হাতখানা ধরিয়া আপনি কপালে ঠেকাইয়া সে বলে। আমি মরব না বাবু, আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। আমি আবার বেঁচে উঠব, শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠব।

সত্যই ধনঞ্জয় মরে না, কিছু দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া উঠে।

আবার সেই ছাত্র পড়ানো, ছেলেমানুষী হাসি, গল্প, তামাকু সেবন— সেই ছন্দহীন একতালা জীবনস্রোত একঘেয়ে ভাবেই চলিতে থাকে।

গিন্নীমায়ের ছোট বোনের আগমনে বাড়িতে একটা ছোটখাট রকমের উৎসব চলিতে থাকে। মাস্টারের উৎসাহের আর অভাব নাই—পারে ত ছুটাছুটিই করে আর কি! খুশিতে প্রাণটা ভরিয়া উঠে তার,—এ-যে তার নিজেরই কাজ! উৎসবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া এই স্থবিরত্বের বদ্ধ জলাটায় যেন সে নূতন স্রোত বহাইতে চায়!

রাত্রিতে আহারের পর সে তার নিজের উচ্ছিষ্ট বাসন ধুইতে পুষ্করিণীর ঘাটে যায়। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো ঘাট।

চতুর্দশীর চাঁদের আলো আসিয়া লুটাইয়া পড়ে পুষ্করিণীর জলে, গাটে, আর ধনঞ্জয়ের চোখে-মুখে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চাঁদের আলো! শেওলা-ধরা গাছের গুঁড়িটার উপর বসিবার সাধ যায়। বসিলেই ভাবনা আসে, আনন্দও হয়। তবে আনন্দটা শুধু আজকের জন্য নয়। চাঁদের আলো বয়সের তারতম্যানুসারে সকলকে সমানভাবে আনন্দ দিতে পারে না বটে। তবে, কোন কোন দিনের কথা মনে জাগাইয়া তোলে।

ধনঞ্জয় তাহার গত জীবনের সুখের দিনগুলির পুলকমিশ্রিত স্মৃতি মনে করিতে চায়—

সহসা বীরেশবাবুর তিক্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর তীরের মত আসিয়া তার শ্রবণেন্দ্রিয়টাতে বিদ্ধ হইতে থাকে—বলি, মাস্টারটা গেল কোথায়? এমন আহাম্মক নিষ্কর্মা অপদার্থ লোক দুনিয়ায় দুটি নাই! দেব কাল বিদায় করে যেখানে খুশি পড়ে মরুকগে : আমার বাড়িতে আর ওর ঠাঁই হবে না। ও আমার কে যে, বসিয়ে বসিয়ে পিণ্ডি যোগাব!

শায়ক-বিদ্ধ পাখির মতই ধনঞ্জয় ছটফট করিতে করিতে ধাইয়া আসে। ছেলেদের পড়াইতে বসে, কিন্তু পড়া জমিয়া উঠে না।

আবার কি একটা বজ্রপতনের যেন আশঙ্কা করিতে থাকে সে। সেটা পলে পলে তাকেই সচেতন করিয়া রাখে।

পরদিন বহু দূরের অনাহূত নীল আকাশটা সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া পড়ে ধনঞ্জয়ের মাথায়। বাবু তাহাকে পরিষ্কার ভাবেই বলেন, তোমাকে ত এতদিন রেখেছি মাস্টার, এখন আমি ছেলের জন্য অন্য মাস্টার নিযুক্ত করতে চাই। তুমি এখন অন্যত্র চেষ্টা করে দেখ।

কথা শুনিয়া ধনঞ্জয় কাঁদে না, চরণে লুটাইয়াও পড়ে না। শুধু অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকে নিষ্করুণ চক্ষু দুইটির পানে। গিন্নীমায়ের প্রসন্ন মুখ মনে পড়ে। ভাবে, গিন্নীমা ছেলের মা, এত নিষ্ঠুর কিছুতেই হইতে পারিবেন না। মাস্টার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথা বলে না।

ক্রমে বেলাটা বাড়িতে থাকে—ক্ষুধাটাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। অবাধ্য ক্ষুধা।

কি কাজের ছলে গিন্নীমা বার দুই ধনঞ্জয়ের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গেলেন, একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না।

ক্ষুধার তাড়নায় সে অস্থির হইয়া উঠে। সে ইচ্ছা করিয়াই গিন্নীমাকে দেখাইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া দুই তিনবার যাওয়া আসা করিল—গিন্নীমা যেন দেখিয়াও দেখেন না।

এবার লাজের মাথা খাইয়া ডাকে, গিন্নীমা!

গিন্নীমা চোখ তুলিয়াই মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া চলিয়া যান। সে মুখে ঘৃণা, কি ক্রোধ—ধনঞ্জয় স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

এইবার ধনঞ্জয়ের মনে বড় রকমের একটা খটকা বাধে। গিন্নীমার আজ কি হইয়াছে? তাঁর খুকীটার না হয় অসুখ করিয়াছে, তাঁর ছোট বোনটি না হয় বাড়িতে চলিয়া গিয়াছে। এ জন্য ধনঞ্জয়ের অপরাধ কি! সে কেন আজ উপবাসী থাকিবে! ... অবশেষে আপনা হইতেই এই খটকার মীমাংসা হইয়া যায়।

বহুদিনের সেই জীর্ণ পুঁটুলিটা আবার কক্ষে তুলিয়া লয়!

চল্লেম বাবু, আপনাদের বহু বিরক্ত করেছি, সব ক্ষমা করবেন!

বাবু মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিলেন, এস গিয়ে।

এই নিদারুণ ঔদাসীন্যে ধনঞ্জয় চোখের জল রাখিতে পারে না। বাহির হইয়া পড়ে পথের মাঝে,–নিরুদ্দেশের পানে ...

খোলা মাঠের অপর প্রান্তে পুরানো বটগাছ। মোহাবিষ্ট দেহটাকে টানিতে টানিতে সেইখানে–সেই বটতলায় গিয়া বসে। কত লোক আসে যায়, সেদিকে তার লক্ষ্য নাই। সে ভাবিতে বসে। ভাবনায় কপালটা আবার ব্যথা করিয়া উঠে। বসিয়া থকিতে অসহ্য লাগে–অবশেষে পুঁটুলিটা শিয়রে দিয়া শুইয়া পড়ে।

আবার সেই চিন্তাটা আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসে। বড় ভয় লাগে তার। একাকী সে মরিবে কেমন করিয়া! যতদূর দৃষ্টি যায়–চাহিয়া দেখে–এই বিপুল বিরাট আকাশ, এই বিশাল পৃথিবী! তাহার জন্য একটুও স্থান নাই! ...

অতিকষ্টে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া ধনঞ্জয় বলে, আবার এসে পড়েছি গিন্নীমা। আর যাবই বা কোথায়, ত্রিসংসারে আমার আর কে আছে!

এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়টিতে এত ব্যথা, এত চাপা কান্না থাকিতে পারে! গিন্নীমার বুকে কাঁটার মত গিয়া বিঁধে।

গিন্নীমা থমকিয়া দাঁড়ায়–এই ব্যথাক্লিষ্ট সর্বহারাটির দিকে চাহিয়া বুকের দরদ যেন উথলিয়া উঠে–এ যেন বিশ্বের স্নেহ বুভুক্ষিত সন্তান মাতৃহৃদয়ের দ্বারদেশে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে! গিন্নীমার মুখখানাও বেদনা ও করুণায় এমন আকার ধারণ করিয়াছে–যেন বিশ্বের চিরন্তন মাতৃমূর্তি অজস্র স্নেহ বক্ষে লইয়া তৃষিত সন্তানকে অভয় দিতেছে!

বুড়া অভিভূতের ন্যায় বসিয়া পড়ে।

গিন্নীমা বলে, শীগ্‌গির ওখানে বস গিয়ে, আমি, খাবার নিয়ে আসছি।

কান্না

গুরুদয়ালের পায়ে ব্যথা, হাঁটিতে কষ্ট হয়। তবু না হাঁটিলে বুঝি তার চলে না? সকালবেলা বাহির হইয়া যায়। কোনোদিন দুপুরে ফিরে, কোনোদিন ফিরেও না। কোনোদিন সূর্যের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ফিরে, ফিরিয়া হয়তো অপরিচ্ছন্ন বিছানাটা হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া 'ডিবা' জ্বালিল, না-হয় তো বাড়ির পূব দিককার নিমগাছটার তলায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া গান ধরিল :

রাধে, রাধে গো রাধে,
তোর লাগি মোর পরাণ কাঁদে;
নইলে কি আর কালো শশী
অতি সাধের চূড়া বাঁশী
অই চরণে তুলে দিল সাধে,
রাধে, রাধে গো রাধে ...

বাড়ির একমাত্র অধীশ্বর সে। সে ছাড়া এবাড়িতে আর একটিও জীবন্ত প্রাণী নাই। কাজেই তার এই স্বেচ্ছাচারিতা। কেহই বাধা দেয় না।

প্রতিবেশীদের কেহ কেহ বলে, কি হে গুরুদয়াল, তুমি যে বড্ড ঘোরাফেরা কর! ঘরে তো একবারও পাবার জো-টি নেই। গুরুদয়াল একটু মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি করব বল, ঘরে যে মন টেকে না!

পূর্ববর্তী বক্তা হয়তো একটি ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সংক্ষেপে বলে, তাইতো।

আবার কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করে, বলি ও গুরুদয়াল, বাইরে বাইরে ঘুরেই বা তুমি কোন শান্তিটা পাও বল দেখি। যার ঘরে শান্তি নেই তার বাইরেও অন্ধকার! কথায় বলে লক্ষ্মীছাড়া ...

বলো না, বলো না, বলতে নেই, গুরুদয়াল প্রবলভাবে বাধা দিয়া বলে, ও কথা আর মনে করিয়ে দিও না দাদা, পায়ে পড়ি তোমার। তাকে ভুলতে দাও, ভুলতে দাও।

—আ আমার পোড়া কপাল! মনের মধ্যে যে সব কিছু গেঁথে রেখেছে, তাকে যে একটুও ভুলতে পারছো না, তা কি আমরা জানি না? যতই বল না কেন, গুরুদয়াল, তুমি যে তাকে ভুলে গেছ, বাইরে ঘটা করে সে কথাটা জানিয়ে দিলেও, আমরা তোমার অন্তরের খবর জানি। কচি খোকা নই আমরা। আহা, কি ভালো মানুষ—

—পাগল করলে দেখছি! আচ্ছা বল দেখি, চিরদিনের জন্য কে সংসারে আসে? গানে আছে না, জন্মিলে মরিতে হবে খাঁটি জানা শুনা, দুদিনের তরে কেন এতো বিড়ম্বনা! যে মরেছে, সে বেঁচেছে।

বাস্তবিক গুরুদয়ালের সঙ্গে কথায় পারিবার জো নাই। সহানুভূতিশীলগণ অগত্যা সরিয়া পড়েন।

অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে গুরুদয়ালের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কেউ বলে বেচারা ঘুরে ঘুরে সারা, অথচ কি কাজে কোথায় যে ঘোরে বলা শক্ত। আমার মনে হয় একটু ছিট ধরেছে।

নিবারণের মার এক বোন-ঝি বেশ লেখাপড়া জানে। তার মুখেই নিবারণের মা শুনিয়াছিল। তাই বলিল, একটা নেশা গো, বিনোদের মা, তুমি যাই বল না, কেন, একটা নেশা। এতে কিন্তু যা আনন্দ পাওয়া যায়, ঘরের কোনে বসে থাকলে তার অর্ধেকও পাওয়া যায় না। একে বলে ভ্রমণের আনন্দ।

– রেখে দে তোর ভ্রমণের আনন্দ। থাকতো বউটা আজ। এক নাক-ঝাড়ায় উঠাতো আর এক মুখ-নাড়ায় বসাতো। অমন করে ঘুরে বেড়ানো–তার সাধ্যি ছিল কি, বাড়ির উঠান থেকে পা বাড়ায়। আমি জানি গো, সব জানি, বউটা মরে যেতে না যেতেই,–ও মনুর মা কথা বলছিস না যে, শুনিস নি কি তুই চর রাজপুরের সেই কেলেঙ্কারীটা! কেমন মানুষ সে, তা আমার ভালো মতোই জান্য আছে। পড়ত আমার হাতে, ঝেঁটিয়ে–প্রবীণা গৌরাঙ্গসুন্দরীর মা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

গুরুদয়ালের এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসী বলে, যাই বল না কেন বড়-বউ, ছেলেটার জন্য ভারি কষ্ট হয় আমার! দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। তবু তার ধর্মে মতি হয়েছে বলে আমার ভারি আনন্দ হয়। দেখিস নি, যতক্ষণ বাড়িতে থাকে কারো সঙ্গে কথাটি বলে না। সে আবার নাম জপ করে। কোনো গোঁসাইর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে বুঝি! কিন্তু ও থাকবে না, তিনি বা হাতে চোখের কোন হইতে একটু জল মুছিয়া লইয়া বলেন, ও বেচারা সংসারে থাকবে না, শীগগিরই একটা সন্ন্যেসী টন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে-জন্য তো আর কারো কোনো দুঃখ হবে না। যদি হয়, হবে এই পিসী আবাগীরই।

গুরুদয়ালের অভাবে পিসীমার কতখানি ব্যথা বাড়িবে, ইহার পূর্বে তার পরিমাপ করিবার অবকাশ তাহাকে না দিয়াই একদিন সত্য সত্যই গুরুদয়াল নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না।

পিসী তার অভ্রান্ত অনুমানটি এমন অব্যর্থ হইতে দেখিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পা ছাড়িয়া কাঁদিতে বসিলেন। গৌরাঙ্গসুন্দরীর মা সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বলিল, কেঁদে কি হবে বোন–গিয়েছে, তাও মন্দের ভালো।

পিসীমার প্রবল শোকও অন্তরিত হইল, পলাতকের সম্বন্ধে পাড়ার আলোচনাও ঠাণ্ডা হইল, এমন সময় সহসা একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, গুরুদয়াল তার আপন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চুল আঁচড়াইতেছে। মেয়েমানুষের চুলের মতো বড় বড় চুলগুলি তার কাঁধে ও পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দাড়ি গোঁফ বেশ করিয়া কামানো। চেহারারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবটার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

এখন সে সারাদিন ঘরে বসিয়া থাকে। ক্বচিৎ বাহির হয়। লোকে দূর হইতেই বলাবলি করে, মানুষটার ভাব-চরিত্র বোঝা ভার। পিসীমার আনন্দ আর ধরে না।

লোকের সঙ্গে এখন বেশ আলোপ জমাইয়া তুলে সে। একথা সেকথা পাড়ে। ছিরিক্ষেত্র, বিন্দেবন, কোনো জায়গার কথাই বাদ যায় না। কত জায়গায় গিয়াছে সে, কত রকমের মানুষ, কত সাধু সন্ন্যেসীর সঙ্গে তার দেখা হইয়াছে। লোকে ভক্তি-গদগদ চিত্তে তার মুখের কথা শুনিতে থাকে। শুনিতে শুনিতে ভারি আশ্চর্য হইয়া যায়–বলাবলি করে, না, একটা মানুষের মতন মানুষ বটে। কত গিয়ান যে রাখে। তার অর্ধেক গিয়ানও যদি আমাদের থাকতো।

অনেকে ঝুপ করিয়া মাথা নুয়াইয়া পায়ের ধূলাটাও লইয়া ফেলে।

রোজ একখানা আড্ডার মতো জমে। কথাও জমিয়া ওঠে বেশি রকমে। ছিরিক্ষেত্র বিন্দেবনের কথা বলিতে বলিতে অবশেষে এমনি একটা কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল যে, যারা শুনিল, চোখ দুইটি ছানাবড়ার মতো করিয়া হাঁ করিয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কিছু যেন তারা বুঝিল না।

সে যে কথাটা একটুও মিথ্যা বলে নাই, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য সে একখানা চিঠি হাত-বাক্স হইতে বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। দূর্বাঘাসে বাঘ গজানো বরঞ্চ সম্ভব, কিন্তু গুরুদয়াল আবার বিবাহ করিবে, চোখে দেখিলেও যে বিশ্বাস করা যায় না!

পিসীমা শুনিয়া মা-মনসার চরণে একজোড়া কবুতর মানত করিলেন।

গুরুদয়াল একদিন তার পৈতৃক জমিজমা হইতে কিয়দংশ কয়েক শত টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অবিশ্বাসীদের এতদিন পর বিশ্বাস হইল, এবার গুরুদয়াল নিশ্চয়ই সংসারী হইবে।

গুরুদয়াল তার মাথার লম্বা চুল দশ-আনি ছ-আনি করিয়া কাটাইল। অতঃপর ধোপ দুরস্ত কাপড়-চোপড় পরিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু গন্ধ দ্রব্যও।

বউ মরাদের বাড়িঘরের এতোটুকুওশ্রী থাকে না। কিন্তু না থাকিলেও চলে না। গুরুদয়াল বহুদিনের পর এখন বাড়িঘরের শোভা সৌন্দর্যের দিকে মনোযোগ দিল।

বিবাহের উদ্যোগ পর্ব চলিতে লাগিল। বিবাহাদি ব্যাপার তো আর অত চোখ বুঁজিয়া সমাধা করা যায় না। এ-গ্রামে সে-গ্রামে তার যে দু'পাঁচ ঘর আত্মীয় স্বজন আছে তাহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইল। সকলেই শুনিয়া খুশি হইল। সবচেয়ে খুশি হইল গুরুদয়াল নিজে। মাঝে মাঝে দু'একজন তাহাকে বলিয়া ফেলে, বউ ঘরে না আনতেই অতটা খুশি হচ্ছ কেন?

খুশিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া গুরুদয়াল জবাব দেয়—খুশি হচ্ছি কেন জিজ্ঞাসা করছ? আমি বেশি কথা বলব না। শুধু সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি, এমন বউ তোমাদের কারো ঘরে আসে নি।

পূর্ববর্তী বক্তা মনে মনে বলে, ভারি তো বউ! করতে যাচ্ছেন তো বিধবা-বিয়ে। আবার বড়াই করেন!

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া গুরুদয়াল সগৌরবে মাথা দুলাইয়া বলে, বুঝতে পারছ।

সবিনয়ে জবাব দেয়, পারছি।

বিবাহের আরও কিছুদিন বাকি। গুরুদয়ালের তর সহিতেছে না। দুইদিন পর, তিনদিন পর, একবার করিয়া তাহার ভাবী শ্বশুরালয়ে যাওয়া চাই। হিতৈষীরা বলাবলি করে, এ কোনদেশী রীতিরে ভাই? এখনই এতোটা মাখামাখি! বিয়ে হলে মথুরাতেই সে হয়তো থেকে যাবে। সাক্ষাতে বলে, অতটা কিন্তু ভালো নয় গুরুদয়াল।

গুরুদয়াল মাথাটা একটু নোয়াইয়া চোখ দুইটি একটু বাঁকাইয়া সামান্য একটু অর্থপূর্ণ হাসিয়া জবাব দেয়, মন্দটাই বা কি শুনি।

কিন্তু বিবাহের সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত টিকিল না। একদিন কন্যা-কর্তার নিকট হইতে পত্র আসিল, তিনি তাহার কন্যাকে অন্যত্র বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, তবু পাড়াতে বেশ সাড়া পড়িয়া গেল। গুরুদয়ালের হিতৈষীরা আড়ালে একটু হাসিয়া লইয়া বেদনার্দ্র স্বরে তাহার নিকট দুই একটি সহানুভূতিসূচক কথা বলিল। কিন্তু ভরসা পাইল না মোটেই।

কি এক উৎকট আনন্দে গুরুদয়াল সহসা হাসিয়া উঠিল। এ যেন শ্মশানবাসীদের অট্টহাসি।

কিন্তু সে যে কতখানি জ্বালা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ইচ্ছা বুকে চাপিয়া এমন ভাবে হাসিতে পারিয়াছে তাহার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়িত।

পিসীমার রোদন-পর্ব আরম্ভ হইবার পূর্বে গুরুদয়াল তাহার সবকয়টি কাপড়-জামা বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া চুপ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দীর্ঘ আলোচনার পর হিতৈষীরা সিদ্ধান্ত করিল গুরুদয়াল আর ফিরিবে না। কোমলপ্রাণ রমণীরা ভাবিয়া স্থির করিল, এ-যাত্রা সে হয় জলে ডুবিয়া মরিবে, না-হয় পাগল হইয়া বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিবে।

কিন্তু তাহাদের কাহারও মতামতের ধার না ধারিয়াই, মাস দুই যাইতে না যাইতেই গুরুদয়াল ফিরিয়া আসিল, একা নয় সস্ত্রীক।

পাড়াতে সাড়া পড়িল, সকলেই সোরগোল করিয়া বউ দেখতে আসিল। খুশি হইল না কেহই। এমন বিশ্রী বউ! না আছে নাকের ডগা, না আছে চুলের বাহার, রংটিই বা কত ফর্সা রে!

হিতৈষীরা বলে, কি হে গুরুদয়াল, অবশেষে ...

গুরুদয়াল উত্তর দেয় না। তাহাদের উৎসাহ দমিয়া যায়, বুঝিতে পারে বউ-এর প্রসঙ্গ তুলিলে সে বিরক্ত হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা আবিষ্কার করিল, গুরুদয়াল তাহার বউকে একটুও ভালোবাসে না। কারণে-অকারণে সে প্রায়ই বউটিকে বড় ঠেঙায়। দাঁত-মুখ খিচাইয়া বেচারীকে একেবারে নাজেহাল করিয়া তুলে। কিন্তু বউ শব্দটিও করে না, চোখ বুজিয়া সব সহ্য করে। মা বাপ মরা বালিকা, বড় কাঙাল, বড় অসহায়।

গোকনঘাট হইতে নবীনগর পর্যন্ত তিতাস নদীতে মোটর-লঞ্চ চলে। গুরুদয়াল কি একটা কাজে কোথায় যাইতেছিল। 'লঞ্চে' উঠিয়াই যাহা দেখিল, অবাক না হইয়া পারিল না। যাহার সহিত পূর্বে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল সেই বিধবা তরুণী। গুরুদয়ালের বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়া উঠিল।

তিতাস নদীর ঢেউগুলিকে দুইধারে ভাগ করিতে করিতে দ্রুতগতিতে মোটর-লঞ্চ চলিয়াছে, দুই পাড়ে সবুজ গ্রামগুলি একে একে চোখের আড়াল হইয়া যাইতেছে। গুরুদয়াল 'লঞ্চ' হইতে নামিয়া পড়িতে পারিলে যেন রক্ষা পাইত। বুঝি সাপ দেখিয়াছে। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া গুরুদয়াল চমকাইয়া চাহিয়া দেখে, আহ্লাদী তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুরুদয়াল দারুণ অবজ্ঞাভরে হাতখানা ঠেলিয়া দিল। কিন্তু আহ্লাদী তাহার পাশেই বসিয়া পড়িল। বলিল, রাগ করো না, লোকে কি মনে করবে?

কার সঙ্গে এসেছ? গুরুদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, যাবে কোথায়?

এসেছি দাদামশাইয়ের সঙ্গে; যাব শ্রীরামপুর। বলিতে বলিতে তরুণী কাঁদিয়া ফেলিল।

—তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায়?

—বিয়ে হয় নি এখনো। তিন চারদিনের মধ্যেই হবে।

—কোথায়?

—চন্দনপুর।

—ওঃ, সেই কানা আধবুড়োটার সঙ্গেই তো? অবশেষে এই বরটাকেই পছন্দ হল?

—পছন্দের মালিক কি আমি? বাবা টাকা পাবে তাই তো—

আহ্লাদী ঘোমটাটি আরও একটু টানিয়া দিল। গুরুদয়াল বুঝিল ইহার চোখের জল লুকাইবার চেষ্টা। অলক্ষ্যে তাহার চোখের পাতাও ভিজিয়া উঠিল।

আসছে শনিবার বিয়ে, তোমার কিন্তু যাওয়া চাই। শ্রীরামপুরে মামার বড় অসুখ, তাঁকে দেখতে চলেছি দাদার সঙ্গে, আজকেই আবার ফিরে আসব।

গুরুদয়াল কোনোমতে বলিল, আমি যেতে পারবো না, আমার কাজ আছে।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আহ্লাদী বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করলে? কিন্তু আমার তো দোষ নেই, আমার কি মনের সাধ যে, একটা বুড়োর সঙ্গে ...

সে তো ভালই হবে, তোমার বাবা টাকা পাবে, তুমি সুখী হবে। গুরুদয়াল শ্লেষের সুরে বলিল।

—একটা কথা বলব? শুনবে?

—কি, বল।

—এখনও তো সময় আছে। বিয়ের তো আরও দু'দিন বাকি। তুমি যদি অমত না হও...... কিন্তু গুরুদয়াল কোনো উৎসাহই দেখাইল না। আহ্লাদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। গুরুদয়াল যে বিবাহ করিয়াছে এ সংবাদ আহ্লাদী জানে না, জানিলে এতটা আশা করিত না।

—এক কাজ করবে?

—কি বল।

—আমি কিছুতেই বুড়োকে বিয়ে করব না, বিয়ের রাতে তুমি যাবে। যা যা করতে হবে, সব আমি ঠিক করে রাখবো।

গুরুদয়াল সংক্ষেপে শুধু বলিল, হুঁ।

যে দিন আহ্লাদীর বিবাহ হইবার কথা, সেই দিন বিকালে গুরুদয়াল বেশ একটু সাজগোজ করিল। বউকে ডাকিল, বউ আসিয়া নতমুখে নিকটে দাঁড়াইল। তাহার মৌন মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তুলনা করিল একখানা কলমুখর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ, আর একখানা নির্বাক শ্রীহীন বেদনাময় মলিন মুখ। অন্যসময় হইলে সে অনায়াসে বউটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার কি যেন হইল, সে দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া কেবল ভাবিতেই লাগিল। ভাবিল, এটা বড় অসহায়!

বেলা পড়িয়া আসিল, সাঁঝের বাতি জ্বলিয়া উঠিল; চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। গুরুদয়ালের ভাবনার অন্ত নাই। ভাবিল : এতক্ষণে হয়তো সেই বুড়া বরটা সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাদ্য-বাজনা, মেয়েলী গান, হুলুধ্বনি, কল-কোলাহল সবকিছু অগ্রাহ্য করিয়া এক জোড়া জাগ্রত আঁখি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তারপর, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। বরকর্তা বলে, মেয়ে বার কর, পুরোহিত বলে, আর দেরি করা যায় না। নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া আহ্লাদীকে বাহিরে আনিল। সে হয়তো

আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা তাহা শুনিবে কেন? তারপর—বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন হয়তো—ফুলশয্যা—

গুরুদয়ালের চিন্তায় বাধা পড়িল। সে অসম্ভব রকম ক্রুদ্ধ হইয়া নিরপরাধ বউ-এর গালে-মুখে দুই চড় বসাইয়া দিল, বউ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরদিন হইতে বউয়ের উপর দ্বিগুণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। সে মরিয়া হইয়াই যেন উঠিতে বসিতে মিছামিছি বউকে মারধর করিতে লাগিল। মরিবার জন্য, এক্ষুণি এই মুহূর্তে নিপাত যাইবার জন্য সে বউকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। এতো লোকের কলেরা হয় এতো লোক মরে, বউটিকে কেন যমে দেখে না, এই যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যটিও সে ঘন ঘন করিতে লাগিল—তুই মরলে এখনি আমি রক্ষা পাই, ঠ্যাং হাত ধুয়ে দিই তোর কপালে।

বউ তবু মরে না।

পাড়ার লোকেরা ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল গুরুদয়ালের উপর, এত মারপিঠ, এত কান্নাকাটি কয়দিন তাহার সামলাইবে?

মেয়েরা বলে, কি পাষাণ, মাগো! একটুও মায়া নেই।

কেউ বলে, বউটা মরে যায় না কেন? মরলে তো বাঁচত।

কিন্তু যে মরে, সে কাহারও মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। গ্রামে মা চণ্ডীর দয়ায় এদিকে সেদিকে কয়েকটা মরিল। গুরুদয়ালের বউও মরিল। গত দিন কয়েকের সবকিছু অত্যাচার সবকিছু গালমন্দ বুকে লইয়া সে একদিন চিরদিনের জন্য চোখ দুইটি বুজিয়া ফেলিল।

পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আসিয়া জড় হইল, একবার শেষের দেখা দেখিবার জন্য। কারো কারো মনে একটু ব্যথাও জাগিয়াছিল, বউ বড় দুঃখে ছিল।

গুরুদয়াল অতটা আশা করে নাই। আচমকা সে বউয়ের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া কপাল চাপড়াইয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েরা বলাবলি করিতে লাগিল, দেখেছিস কেমন মায়া। হাজার হোক, স্বামী তো! দুঃখ হলে তারই তো হবে।

—অথচ বউকে যে সে এতো ভালোবাসতো, এতোদিন জানতে দেয় নি। কি মারটাই না মেরেছে ক'দিন ধরে। যাক, তবু বউটার জন্য তার প্রাণে খুব লেগেছে দিদি।

গুরুদয়ালের কান্না যেন কিছুতেই থামিতে চাহে না।

হিতৈষীরা বলে, এখন আর কেঁদে কি হবে, সে তো আর ফিরে আসবে না!

তবু তার কান্না থামে না।

তারা ভাবে, গুরুদয়ালের মনটা বাইরে সে যাই দেখাক না কেন, সত্যি খুব দরদী।

কিন্তু দরদী যে মোটেই নয় তাহা আমরা জানি বলিয়াই ভাবিতে পারি যদি এমন একটি দর্পণ থাকিত, যাহা দ্বারা তাহার মনের ভিতরটা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো দেখা যায়, তবে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিত, গুরুদয়াল আঁখির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া যেন বলিতে থাকে, মরিল তো কিন্তু আর ক'টা আগে কেন মরিল না।

সত্যিই কি তাই?

স্পর্শদোষ

দরিদ্র হওয়াটাই কষ্টকর নয়। দারিদ্র্যের কুয়াশার ফাঁক দিয়া প্রাচুর্যের প্রতি ব্যর্থ চাহনিটাই জ্বালাময়। যে মানুষ সারাদিনের উপার্জনের সম্বল দুই এক বোঝা তাচ্ছিল্য ও অনাদরের সহিত দুই এক পয়সা লইয়া শহরের খোলা রাস্তা দিয়া নির্বিকারচিত্তে পথ চলিতে পারে, তাহা দেখিয়া আমাদের দৃষ্টি বেশি ভারাক্রান্ত হয় না, মনও বেশি পীড়াবোধ করে না—মনে হয় শহরেরই সে একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃচ্ছ্রতার ছিটানো কালির তিলক পরিয়া ও বুকজোড়া বুভুক্ষা নিয়া কাঁচের দরজার ফাঁকে রেস্টুরেন্টের সুখাদ্যের দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া কিছুকাল কাটাইয়া দেয়—তাহাকে দেখিয়া বুকের ভিতরটা খচ্ করিয়া উঠে বৈকি!

পল্লীর যে-বধূ শাশুড়ীর গঞ্জনা মাত্র ভক্ষণ করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত উদরটাকে দিনের পর দিন শূন্য রাখিয়া নির্বিবাদে চলে—তাহাকে দেখিয়া যতটা ব্যথা না পাই, যে-বৌ শাশুড়ী-রক্ষিত সুখাদ্য চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে, সে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে বেশি।

অভাব লইয়া যাহারা বাঁচে, অভাব তাহাদের গা-সহা। বৈদান্তিকের তাহারা নির্মল প্রশংসার অধিকারী। অভাব লইয়া যাহারা কাঁদে মানুষের বুকে দেয় তাহারা আঘাতের পর আঘাত।

কে জানিত উপরের কথাগুলি দুইটি জীব অন্তত তাহাদের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া ছাড়িবে।

বুভুক্ষা শুধু উদরের নিজস্ব জিনিস নয়। মনেরও বুভুক্ষা বলিয়া একটা কিছু আছে। মনের বুভুক্ষা চাহে, প্রেম, প্রেম চাহে স্পর্শ—বাস্তব জীবনে ইহাই স্বাভাবিক। আবার কালির আঁচড়ে যাহারা চরিত্র সৃষ্টি করে, আচমকা প্রচণ্ড স্পর্শ হইতে প্রেম ও প্রেম হইতে বুভুক্ষার উন্মেষ—তাহাদের নিরূপিত এই সিদ্ধান্তও অনেক সময় বাস্তবক্ষেত্রে চোখে পড়িয়া যায়।

নিউ পার্ক স্ট্রিটের উত্তর দিকের ফুটপাথ আর বাঁ দিক হইতে আগত একটি অতি সরু গলি—তারই সংযোগস্থলে দুই প্রাণীর অভাবিত সংঘর্ষ গুটিকয় দর্শকের মনে যে অদ্ভুত সহাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নিতান্তই সাময়িক।

ফুটপাথ দিয়া একজন যাইতেছিল রাস্তার পাশের গাছের মাথায় কচি-কিশলয়ের উপর অকাল বর্ষণের আয়োজনের দিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে। অন্যজন আসিতেছিল বাঁ দিকের সরু গলি হইতে অতি বেগে ছুটিতে ছুটিতে, সম্ভবত পশ্চাদ্দিক হইতে তাড়িত হইয়া। উভয়েই আত্ম-অসংবৃত। তাহাদের একজনের হাঁটুতে এবং অন্যজনের থুঁতনিতে লাগিয়া গেল প্রচণ্ড ধাক্কা।

তাহাদের একটিকে কুলী মজুর বা ভিখারী, বেশভূষা দেখিয়া যে-কোন একটি ভাবিয়া নেওয়া যায়। নাম কাহারও জানা থাকিবার নয়। ইচ্ছামত ভজা বলিয়া নিলেও

কাহারও আপত্তি উঠিবার নয়। অন্যটি একটি কুকুর। বড়লোকের বাড়ির নয় যে, আদর করিয়া একটি ভাল নাম দিবে। নিতান্তই পথেরই খেঁকী কুত্তা। দর্শকের উচ্চ হাসির মধ্যে ইহারা বড় অপ্রস্তুত হইল।

খেঁকী তাহার লম্বা থুতনি নিচু করিয়া প্রশস্ত ফুটপাথ ধরিয়া ভজার সোজা পশ্চাতের বিপরীত দিকে চলিল। একটু দূরে আসিয়া সে ঘাড় বাঁকাইয়া সংঘর্ষের সাথীকে বারবার দেখিয়া দেখিয়া চলিল। সংঘর্ষের চোটে সে কিঞ্চিৎ দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল।

স্তম্ভিত ভজাও হাঁটুর আঘাতের স্থানে একটু হাত বুলাইয়া লইয়া এবং খেঁকীর দিকে চাহিতে চাহিতে গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। পার্ক স্ট্রিট যেখানে সার্কুলার রোডে মিশিয়াছে তাহারই নিকটে একটি জনবিরল স্থানে গাছে ছায়াটি দূরাগত আলোর অত্যাচারে আবছা ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। শ্রান্ত ভজা মাথার মোটটা নামাইয়া বসিয়া পড়িল। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া কাগজের কুচি সংগ্রহ করিয়াছে সে। দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ের পাশে হয়ত সে সংকীর্ণ গরমের রাত্রিটা কাটাইয়া দিবার জন্যই বসিয়াছে। পথের মালিক তো ইহারাই।

মোটের একদিকে খাবারের একটি ঠোঙা গুঁজিয়া রাখিয়া ভজা অদূরের দুই তিনখানা খাবারের দোকানের সামনে দিয়া ঘুরিয়া আসিতে গিয়াছিল। মোটের সন্নিকটে দ্বিতীয় প্রাণীর আগমন তাহার সন্ধানী দৃষ্টি দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেঁই হেঁই করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া সে অপহারকের মুখ হইতে খাবারের ঠোঙাটি উদ্ধার করিয়া লইল। চাহিয়া দেখে—একদা দেখা সেই লম্বা থুতনি। বিকট ধমক খাইয়া খেঁকী নড়িল। কিন্তু অল্প একটু দূরে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

খেঁকীর লোলুপদৃষ্টির সম্মুখে ঠেকাইয়া দেখাইয়া ভজা সব খাবার শেষ করিয়া ঠোঙাটা খেঁকীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিতেই খেঁকী সশব্দে ভজার দিকে আক্রমণের সবকয়টি চিহ্ন প্রকটিত করিয়া ছুটিয়া আসিল।

ভজা টুকরা কাগজের মোট ছুঁড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। খেঁকীর বুকের নেশা কিন্তু কমে নাই। দ্বিগুণ বিক্রমে সে স্বভাব সুলভ শব্দ করিয়া উঠিল। ইহার পর ভজাকে এমন এক ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা গেল—এমন এক রূপ পরিগ্রহ করিতে দেখা গেল যে, ইহাতে খেঁকী প্রথমটায় হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে পারিল না। আক্রমণের শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বে সে অপ্রস্তুত হইয়া তিনপদ পশ্চাদাপসারণ করিল। ভজা কোমর গোড়ালি পর্যন্ত নত করিয়া কনুই পর্যন্ত হাত দুইটি ভূমিতলে স্থাপন করিল। তারপর খেঁকীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া থুতনি বাড়াইয়া বিকট এক শব্দ করিয়া উঠিল। খেঁকী উহার মধ্যে নিজের স্বরূপ দেখিয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু ভজার পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার আক্রমণোদ্যত হইল। ভজা তাহার দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার পূর্ব কার্যের অনুকরণ করিল। খেঁকী রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

তাহাদের দ্বিতীয় মিলন এইরূপ বিয়োগান্ত।

ইহার পর কিছুদিন কাটিয়া যায়। খেঁকী সম্ভবত খেঁকীদের দলেই মিশিয়া বেড়ায়, ভজার সঙ্গে সংঘটিত এক রাত্রির এক ঘটনাকে তাহার মনেও নাই। সমব্যবসায়ীদের

সঙ্গে কাগজের কুচি কুড়াইতে কুড়াইতে খেঁকীর কথা ভুলিয়া যাওয়া ভজার পক্ষেও হয়ত অসম্ভব নয়।

হিটলার প্রতিবেশীদিগকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কাগজের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। কুড়ানো কাগজের কুচির চাহিদাও বাড়িয়াছে। ভজার ও তাহার সমব্যবসায়ীদের আর অবসর নাই।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে রোদের বাড়াবাড়ি—রাস্তার কলগুলির জলে আগুন লাগিয়াছে। ভজার দল খোলা রোদে একটি কলের পাশে বোঝা নামাইয়া সেই জলই পান করিল। অন্যান্যেরা মাথায় নিজ নিজ বোঝা উঠাইয়া ভজার দিকে চাহিয়া দেখে, সে এক তেলে-ভাজাওয়ালার ডালার প্রতি তন্ময় হইয়া চাহিয়া আছে।

পঁয়ত্রিশ বছরের ভজা খাবার দেখিলেই পাঁচ বছরের বালকটি হইয়া যায়।

চকিত হইয়া মাথায় বোঝা উঠাতেই দেখে একদল কুকুর মন্থর গতিতে ফুটপাথের রৌদ্র অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে খেঁকীকে সে অনায়াসেই চিনিয়া লইল। সহযাত্রীদিগকে চমকিত করিয়া ভজা মাথার মোট ফেলিয়া দিল। কুকুর বাহিনীর সম্মুখে গিয়া চলমান খেঁকীর কাছেই গোড়ালি অবধি কোমর চিনু করিল, কনুই-অবধি হাত দুইটি প্রসারিত করিল তারপর সমস্ত কুকুরজাতিটাকে ব্যঙ্গ করিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল— খেঁকী কি ভাবিল জানি না। হতভম্ব অন্যান্য খেঁকীদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখেই সে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিকটবর্তী সরু গলির ভিতরে আত্মগোপন করিল। অন্যান্য খেঁকীদের কেউই তাঁহার পশ্চাতে ধাওয়া করিয়া আসিল না বা ভজার দিকেও কথাটি বলিল না—তাহাদের অবস্থা তখন না যযৌ ন তস্থৌ।

যুদ্ধহেতু দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। লোকের কর্মব্যস্ততাও বাড়িয়াছে। সংবাদপত্রসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক আগেই কমিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে পরিত্যক্ত অব্যবহার্য কাগজেরও শেষে অভাব হইয়া উঠিল—ভজার সমব্যবসায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

দীপ্ত দুপুরে দমকা বাতাস যেন কোন সুদূর দেশের আকুলতা জানাইয়া দিয়া যায়। হিটলার হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আয়ত্তে আনিয়া প্যারিস আক্রমণ করিয়াছে—মিত্রপক্ষের জয় ঘোষণারত খবরের কাগজগুলিতে পাবলিক আর মৈত্রীর সন্ধান খুঁজে না। এক পয়সার টেলিগ্রাফের উৎপাত কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। জনমনের নিভৃত কন্দরে অনুক্ষণ অনুরণন দিয়া যায় যদি বোমা ফাটে! নিবিড় শীতের সর্পস্পর্শের মতই কানের ভিতর দিয়া হাড়ে একটি করাল শিহরণ জাগায়—তাহা হইলে না জানি কেমন হয়। তাহা ছাড়াও আছে অদূর ভবিষ্যতের উদর চালানোর চিন্তা। রাস্তায় আর কাগজের কুচি পাওয়ার উপায় নাই। এক টুকরা কাগজ দেখিলে তিনজনে কুড়াইবার জন্য হাত বাড়ায়। ভজার সমব্যবসায়ীদের অনেকেরই ভাত উঠিয়াছে। যাহাদের উঠিয়াছে তাহারা সাম্প্রতিক উপবাসকে বরণ করিয়া কার্যান্তরে আত্মনিয়োগের চেষ্টায় আছে। ভজা তাহা পারে নাই, তাই অসহায়ের শেষ পথ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ছাড়া সে আর গত্যন্তর দেখিল না।

সার্ধ দিবসের গলাবাজির ফলে একটি পয়সা সে পাইয়াছে। হয়ত তাহাও পাইত না। হাজার খানেক লোকের কাছে হাত পাতিয়া একই উত্তর সে পাইয়াছে। কিন্তু হাজার লোকের মধ্যে ভিন্ন প্রকৃতির দুই একটা লোকও অন্তত আছে বলিয়াই ভজার দল টিকিয়া থাকে।

পশ্চিমা লোক হইলে এক পয়সার ছাতু ও তিন ঘটি জল খাইয়া দিন কাটাইয়া দিত। বিলাসী ভজা ঢুকিল তেলেভাজার দোকানে।

সেই দোকানেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে খেঁকীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

খেঁকীর চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। না খাইতে পাইয়া হাড়পাঁজরাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অস্বাভাবিক তেজবিশিষ্ট চক্ষু দুইটিতে অকারণ কষ গড়াইতে গিয়া শুকাইয়া দাগ পড়িয়াছে। দোকানের ছাঁচে খাবারের এঁটো টুকরীগুলি সে অলসভাবে শুঁকিতেছিল।

বুভুক্ষু সংসারে পরিতৃপ্তি বলিয়া কিছু নাই। দোকানের মাইনে করা বালক মালিকের চক্ষু বাঁচাইয়া একখানা জিলিপী মুখে পুরিবার জন্য একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সের আড়ালে মাথা গলাইল।

নোংরা সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াইয়া খেঁকী হরিজনের মত ব্যাকুল চোখে ভজার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ নত করিল। হাতের কাছেই একখানা তক্তার উপর মোটামোটা একতাল রুটি। অন্যমনস্কতার ভান ও কনুই-এর ধাক্কা—রুটির কাঁড়ি ড্রেনে গড়াইবার পূর্বেই সন্ধানী খেঁকী মুখ বাড়াইয়া তালশুদ্ধ রুটি লইয়া নিরাপদস্থানের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল। কয়েকটি মিষ্ট সম্ভাষণের অধিক কিছু ভজার ভাগ্যে ঘটিল না। অবিলম্বে সে খেঁকীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

খেঁকীর ভয় ও উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। অভিজ্ঞ সে। বুভুক্ষু স্বগোত্রের সতর্ক দৃষ্টি আর ভিখারীদলের কাড়াকাড়ি সব কিছু বাঁচাইয়া সে বিলাতী কবরের দেওয়াল ঘেঁষা এক গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসিয়া পড়িল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভজা গিয়া দেখে সে কুণ্ডলী পাকাইয়া কোলের মাঝে রুটিগুলি লুকাইয়া একখানা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে।

মানুষের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য জীবনে ভজা অনেক পাইয়াছে। অবস্থা বিপর্যয়ে মানুষ তাহাকে পর করিয়াছে। এখন ইতর জীবের সঙ্গে বন্ধুত্বে তাহার আপত্তি নাই। ক্ষুধার্ত সে, পরম আগ্রহে অগ্রসর হইয়া খেঁকীর কোলের কাছে তাহার ব্যাকুল হাতখানা বাড়াইল। খেঁকী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া এমন ভাব দেকাইল যেন লুণ্ঠিত মালের অংশ দিতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। সে একখানা থাবা উঠাইয়া মুখব্যাদান করিয়া নখ ও দাঁত দেখাইল এবং মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া অসন্তোষ জানাইল। জোরজবরদস্তি করিলে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার হইবে বুঝিয়া ভজা পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় মনে করিল।

অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা থাকা উচিত। ভজা খেঁকীর নিকট হইতে এতখানি দুর্ব্যবহার আশা করে নাই। তাই খেঁকীর ব্যবহারটা তাহার মাথায় দাগ কাটিয়া বসিয়া গেল। সেদিন আর সে কিছু খাইবার চেষ্টাও করে নাই। খেঁকীর উপর একটা পৈশাচিক আনন্দপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

উক্ত ঘটনার পর খেঁকীর সঙ্গে যতবারই রাস্তায় দেখা হইয়াছে—কটিদেশ গোড়ালির নিকট আনিয়া, কনুই পর্যন্ত হাত দুইটা ভূমিস্থলে স্থাপন করিয়া ভজা কেবল খেঁকীকে ভয়ই দেখাইয়াছে। খেঁকী প্রথম প্রথম নীরবেই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইত—তাহার শীর্ণ চেহারাতেও এই ভাব ফুটিয়া উঠিত যেন ভজার নাটুকেপনাতে সে বরং কৌতুকই উপভোগ করিয়াছে। এবং ইহাও সে বুঝিতে পারিত বলিয়া মনে করিত যে ভজাও তাহার সহিত নেহাৎ কৌতুক ভিন্ন আর কিছুই করিতেছে না। কিন্তু রৌদ্র ঝলকিত দ্বিপ্রহরে ঘর্মাক্ত কলেবর ভজা যখন খেঁকীর দেখা পাওয়া মাত্রই মাটিতে বসিয়া তাহাকে অভ্যস্ত উপায়ে ভয় দেখাইত, আবার সন্ধ্যার ছায়ালোকে ভজা যখন খেঁকীর প্রতি পূর্বোক্ত উপায়ে ভয় দেখাইয়া বিকৃতকণ্ঠে 'ঘেউ' করিয়া উঠিত—খেঁকী তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইত, এ তো নেহাৎ খেলা নয়—ঠাট্টা নয়—ভজার চোখ দুইটা অস্বাভাবিক তীব্রতায় ঝলসাইয়া উঠিতেছে—দাঁতগুলি কড়ুকড়ু করিয়া মানবিকতার সীমা অতিক্রম করিতেছে। সে তখন ক্ষণমাত্র ভজার হিংস্র চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া ভয়ে ছুটিয়া পলাইত। তাহাকে পুনরায় ভয় দেখাইবার জন্য খুঁজিয়া বাহির করিতে ভজাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত।

ক্রমে ভজার অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইল যে খেঁকীকে সে দিনমানে কয়েকবার ভয় দেখাইতে না পারিলে সে যেন উপবসা থাকিত। সারাদিন সে এতটুকু সোয়াস্তি পাইত না। সে অস্থির হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিত।

খেঁকীর দিনরাত্রির শান্তি যেন ভজা লুটিয়া খাইয়াছে। ভজার এ কয়দিনের অত্যাচারে খেঁকী আরও শুকাইয়া গিয়াছে। পথ চলে সে সন্তর্পণে—পাছে ভজার সঙ্গে মুখোমুখি হয়। পথ চলিতে ভজার ছায়ামাত্র দেখিলে খেঁকী ছুটিয়া পালায়। আবার, খেঁকীর ছায়ামাত্র দেখিলে ভজা তাড়া করিয়া যায়— দৌড়াইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া আসে। ক্রমে খেঁকীর সহনশক্তি সীমা অতিক্রম করিল। রাস্তায় বাহির হওয়াই সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ভজা তাহাকে বৃথাই খুঁজিয়া মরে।

এই বিপুল জনারণ্যে কাহারও মাথা ভাঙিলে জানিবার লোকের অভাব হয় না—কিন্তু কাহারও বুক ভাঙ্গিলে, সে খোঁজ কেহই রাখে না। মনের দিক দিয়া শুখাইতে শুখাইতে যাহার দেহ কাঠ হইয়া যায়—অনাহারের দোষই তাহার প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু না খাইয়া মরার অপেক্ষা সে তো আরও সাংঘাতিক।

এই দুইটি প্রাণীর জীবন-পথে চলার ইতিহাস নিতান্ত তুচ্ছ। তাই আর মাত্র একটি দিনের কাহিনী বলিয়া এ গল্পে ছেদ টানা যায়।

সেদিন সকালে একবার ও দুপুরে দুইবার ভজার নিকট হইতে অমানুষিক তাড়া খাইয়া শ্রান্ত খেঁকী ভজার জ্বলন্ত চোখ দুইটি এড়াইবার জন্য একদিকে ছুটিয়া চলিল! বড় বড় দুইতিনটা রাস্তা ছাড়াইয়া সে এক বড়লোকের বাড়ির বাড়তি ভূমিতে কতকগুলি আগাছার আড়ালে আত্মগোপন করিল। একটুখানি ছায়া—একটুখানি ঝিরঝিরে বাতাস। সে আর পারে না—শ্রান্ত সে, সে চায় নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম।

অনেক রাস্তা খুঁজিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভজা খেঁকীর দেখা পাইল। এবার খেঁকী উঠিল না, ভাষাহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ভজার চোখ দুইটির দিকে।

ভজা পৈশাচিক ব্যগ্রতায় আগাইয়া আসিল। দৈহিক অসামর্থ খেঁকীর মস্তিষ্ককে গরম করিয়া দিল। মগজ বুঝি আর তাহার বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্তে থাকিতে চাহে না।

খেঁকীর চোখ দুইটি চকচক করিয়া উঠিল, ঢুলিয়া পড়িল,– এক অস্বাভাবিক মাদকতায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল– এরার সত্যসত্যই তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল এবং ভজা তাহার স্বভাবসিদ্ধ মূর্তিতে বসিয়া 'ঘেউ' করিবার পূর্বেই খেঁকী উঠিয়া এক লাফে পথে নামিল এবং সম্মুখের এক পথবাহী যাত্রীর পা কামড়াইয়া দিয়া মধ্যরাস্তা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল।

পরদিন সন্ধ্যায় একটি কুকুরের মৃতদেহের চারিপাশে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। বীরবরদের লাঠির আঘাতে কুকুরটির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, জমাট রক্ত তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। জিহ্বাটা অনেকখানি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি লোহার শলার খানিকটা একটা চক্ষুকে ফুঁড়িয়া দিয়াছে। রণজয়ের আনন্দে গর্বিত লোক কয়টির একজন উৎসুক জনতাকে বলিতেছে, মশায় এ কুকুরটা পাগল হয়ে গিয়েছিল, অনেক লোককে কামড়ে দিয়ে তবে ব্যাটা নিজে মারা পড়ল।

ক্ষুদ্র জনতার এক কোন ভাঙিয়া ভজাও আগাইয়া আসিল। খেঁকীকে চিনিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। প্রথমে সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, যেন তাহার প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এমনি ভাবে সে জ্ঞানহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িতে পড়িতেও সামলাইয়া লইল। তারপর বিস্মিত স্তম্ভিত জনতাকে ভাবিবার অবসর না দিয়া সে খেঁকীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে চলিয়া গেল। কেহ বাধা দিল না, কেহ কিছু বলিল না।

জনতার মধ্য হইতে একজন হিন্দুস্থানী আধা বাংলায় শুধু বলিল, এ ভি পাগল হোয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে যখন না-খেয়ে মরার হার সপ্তায় দু-হাজারে উঠে গেল, তখন রাজপথ থেকে মড়া তুলে নেবার ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু প্রচার বিভাগ মৃতের সংখ্যা না দেবার প্রাচীর তুলে দিল যারা বেঁচে থাকলো তাদের চোখের সামনে।

সাগর তীর্থে

লাইট হাউস

জাহাজ ধীরে ধীরে সাগরে গিয়ে পড়ল। টের পেলুম না, কখন, কি করে সাগরে এসে গেছি। তীরের উপর চোখ রেখে চলছিলুম– সেই তটরেখা এক সময় চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল– স্বপ্ন যে ভাবে মিলিয়ে যায়– তেমনি ধীরে ধীরে।

যাত্রীদের দিকে তাকালে করুণা জাগে–এত বড় একটা সাগর, যার সঙ্গে মিশেছে মহাসাগর–দুনিয়ার সকল মহাসাগরের সঙ্গে যার যোগাযোগ– তার সম্বন্ধে তারা একান্ত ই উদাসীন। চোখ তুলে তাকাবারও যেন গরজ নেই কারো। বিরাট একখানা উপন্যাসের মত জাহাজটা সাঁতার কেটে চলেছে। তার ভেতরে অনেক চরিত্র, অনেক চঞ্চলতা, অনেক উপাখ্যান– আপনাতে আপনি মশগুল তারা, বাইরের দিকে বড় একটা কেউ তাকায় না– তাকালেই যেন তাদের জীবনের ছন্দপতন হয়ে যাবে। উপন্যাস এগিয়ে চলেছে নিজের জোরে। ততোধিক এক বিরাট পুরুষ যেন ধ্যানস্তিমিত চোখে সেখানা পড়ে চলেছেন। তাঁরই মনের চৌম্বক আকর্ষণে সব কয়টি চরিত্র একটি দ্বীপের লবণাক্ত জলে ধুয়ে মুছে নিত্য পরিষ্কার করা একটি ক্ষুদ্র বালুচরের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে এগিয়ে চলেছে। সে পাঠকের যে কোন নাম হতে পারতো। পুরাণ রচয়িতা তাঁর নাম দিয়েছেন কপিল মুনি।

সাগর আমার চোখ জুড়িয়েছে। কিন্তু মনে চিন্তার উদ্রেক করেছে যারা, তারা বহু যোজন ব্যবধানে, দুইটি দ্বীপাগ্রভাগে অবস্থিত বড় বড় দুইটি লাইট হাউস। বিপলু দুর্গম, ভয়াবহ সুন্দরবন তাদের হাঁটুর নিচে পড়ে আছে, আর স্পর্ধাভরে আকাশে মাথা তুলে আছে শাদা-কালোর ডোরাকাটা বিরাট দুইটি লাইট হাউস। মানুষের তৈরি; কিন্তু মানবাতীতের ইঙ্গিত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেলায় একদিন হোগলার চালার নিচে রাত্রি যাপন করছিলুম। একধারে গুটিকয় পুরুষ, অন্য ধারে তিন-চারজন মহিলা। অনেকেই অনেকের নিকট অপরিচিত। অথচ একই চালার নিচে।

বাইরের জ্যোৎস্না, হোগলার ফাঁক দিয়ে ভেতরের আঁধার পাতলা করে দিচ্ছে। বহু যাত্রীর ছাউনি বনের ধারে। মাঝরাতে সেখান থেকে সহসা সমবেত কণ্ঠের এক আর্তনাদ ভেসে এলো। অমনি চারদিক থেকে গুঞ্জন উঠলো, বুঝি বাঘ এসেছে। ধর্ম বিশ্বাসীদের সংখ্যাই বেশি। তারা অনেকে বললো, "বাঘ ফি বছরেই আসে, মানুষও ধরে নেয়; কিন্তু একটার বেশি নেয় না। বাবা কপিলমুনি এই বিধান করে গেছেন। আজও তা উপেক্ষিত হয়নি।"

একেবারে কো-এডুকেশন। কারো চোখে ঘুম নেই। এই রকম পরিবেশে গল্প খুব জমে। জমলোও। ও হরি, কেবল বাঘের গল্প। অথচ অন্য জিনিস নিয়েও তখন গল্প চলতে পারতো। বুঝলুম, কপিল মুনির শাসনাধীনে এসে আমরা রসবোধ হারিয়ে বসেছি। লাইট হাউস দুটি আমার মনে বেশ রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

বললুম, তলায় সোঁদর বন, দিনরাত বাঘ ভালুকের হামলা, এর ভেতর মানুষ থাকে কি করে। উত্তর দিলেন এক মহিলা—"নিতান্তই দ্বীপচরের বনবাসী। কয়েকজন লোক মশাল জ্বালিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সম্বৎসরের খোরাক দিয়ে আসে। লোকগুলি সারা বছরে তাই খায়। উপরে খায় উপরে থাকে, তলায় নামে না।"

"বেশ ত জানেন আপনি। আপনার স্বামী বুঝি জাহাজ কোম্পানীর বড় অফিসার। আপনি বুঝি সেই জাহাজে কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছেন; আর লাইট হাউসগুলোকে স্টাডি করেছেন," এই কথাগুলি তাকে বলতে পারতুম; কিন্তু রাত্রিকাল বলে কথা বাড়ালুম না।

মেলায় নেমে আমার এক নতুন উপলব্ধি হয়েছিল। চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো বহুযুগ আগেকার এক দৃশ্য। সে দৃশ্য প্রাগৈতিহাসিক সময়ের। মহামুনি কপিল তখন এইখানে তপস্যা করতেন। দক্ষিণে দিক-দিগন্ত প্রসারিত সীমাহীন বারিধি। অতলস্পর্শী লবণাক্ত জল এই খানে আছড়ে পড়তো। বিশাল পুরুষ কপিল কমণ্ডলু হস্তে এসে সেই জলে হস্তপদ প্রক্ষালন করতেন। তারপর তেজোদ্ভাসিত বদনমণ্ডলে তপের কঠোরতা মাখিয়ে সগর্বে পদচারণা করে ধ্যানের আসনে গিয়ে বসতেন। সামনে সীমাহীন নীলাম্বু, পশ্চাতে গভীর গহন বনরেখা। এই অসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে বসে তিনি ধ্যানের গহনতায় ডুব দিতেন।

দুটো একটা বাঘ গভীর বন থেকে মাঝে মাঝে জলপান করতে এসে (লোনা জল পানে তারা নিশ্চয়ই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল) দূরে দূরে থেকে তাঁকে নিরীক্ষণ করত, তারপর সভয়ে তাঁর দিকে চাইতে চাইতে আবার বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করত। শুনলুম সমুদ্রে এখানে কোনকালেই ঢেউ উঠে না; আজও উঠেনি। কোনোদিন ঢেউ হয়তো ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। তাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে আছে।

শোনা যায় তিনি খুব রাগী ছিলেন। তাঁর বিদ্যুৎনেত্র দিক-দিগন্ত ভেদ করে সাগরের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াতেন, দিগন্তের পর দিগন্ত ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি ক্ষিপ্রগতিতে বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হতো। ছোট ছোট ঢেউগুলি তাঁর পা দুটি ধুয়ে দিত। খানিক বিলম্ব করে তিনি আবার আসনে গিয়ে বসতেন। তাঁকে নিয়ে এই স্বল্পপরিসর বালিময় বেলাভূমিটুকু একটি লাইট হাউসের মতই জ্বল জ্বল করতো। আজও দেখে মনে হলো, পুণ্যার্থী মানবগণের তীর্থ-সলিল উত্তরণের এ একটি লাইট হাউস। দিশেহারা, দিকহারা, কূলহারা মানুষ অনেক দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে এখানে এসে উপস্থিত হয়। কেন? কিসের আশায়? এর জবাব দেওয়া সহজ নয়।

পথে ও পথের প্রান্তে

এইবার গোড়ার কথা বলছি।

সামান্য কিছু পৌটলাপুঁটলি বেঁধে গাড়িতে চাপলুম। খুব ভিড় ছিল না। যাত্রীরা কোনমতে একরূপ ঠাঁই করে নিয়েছিল। কিন্তু ঝামেলা বাধাল ডেইলি প্যাসেঞ্জারের দল। তারা আসবে ঠিক শেষ মুহূর্তে, অথচ প্রাত্যহিক অভ্যাসের ক্ষিপ্রতায় নিজের জন্য

হাজার ভিড়েও জায়গা ঠিক করে নেবেই। প্রত্যেকের হাতেই একটা কিছু দ্রব্য–সওদা করে এনেছে, রাতে ও প্রাতে রান্না হবে; কাল সকালে খেয়ে গাড়িতে উঠবে। ইলিশ মাছের দিনে থাকে ইলিশ মাছ, সেদিন ছিল প্রত্যেকের হাতে একজোড়া করে কপি। এদের মধ্যে এই একটা সাধারণ ধর্ম চোখে পড়ল, কারো জন্যে এদের কারো সহানুভূতিও নেই বিরাগও নেই। একজন হয়ত শতজনের বাধা নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষা করে গাড়ির কামরায় এসে ঢুকেছে। পরের জন্য ঢোকবার সময় সে-ই দিল প্রথমে বাধা। অথচ সে বাধা উপেক্ষা করে শেষের জন ঢুকে যেই তার পাশে বসলো, অমনি দু'জনের মাঝে জমে গেল হৃদ্যতার আলাপ। তারপর যেই তৃতীয়জন ঢুকতে পা দিয়েছে, অমনি দু'জনাতে মিলে জায়গা নেই, অন্য গাড়িতে যান বলে প্রবল বাধা দিতে থাকে। এসব বাধা ঠেলে এক প্রৌঢ় উঠে এলো, বাধাদানকারীদের মাঝে বসে গল্প জাঁকিয়ে তুললো, কিন্তু একটু পরে যেই আরেকজন উঠতে যাবে, সে উঠে গিয়ে মারমুখো হয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল।

গাড়ি চলার বিশ মিনিটের মধ্যেই কোন এক ছোট স্টেশনে সে নেমেও গেল, কিন্তু নেমে অন্ধকারে পা ফসকে গড়াতে গড়াতে একেবারে খানায় গিয়ে পড়ে আর কি; হাতের কপি-জোড়াটি হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ এই যে একটু আগে যারা তার সঙ্গে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করছিল, তাদের সে কি হাসি! ভারি নিঃসঙ্গ মনে হলো বেচারাকে। হয়ত এরই সঙ্গে এদের কেউ কেউ একই অফিসে কলম পেষে। রেলে না হয় কোন সদাগরি অফিসে। গাড়ি চললো। এবার কান গেল মাড়োয়ারিদের কোলাহলের দিকে। কিন্তু একটা লোক তখনো হেসে চলেছে। হাসছে, আর টুকরো টুকরো কথা বলছে–" গোড়ার দিকটা দেখতে পাইনি মাইরি। আমি যখন চাইলুম, তখন দেখি বেটা গড়াচ্ছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। চাল মেরেছিল; বলে কিনা কপির দাম দশ আনা! আমার ছ' আনারটার চাইতে কোন দিক দিয়ে ভালো, বলতে পারো? যাক কপি তো হাত থেকে খুলে গেল। চেয়ে দেখি বেটা গড়াচ্ছে আর হাত দুটো এইরকম এইরকম করছে–"

সে-রাতে ডায়মন্ডহারবারে এক বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। আমার কেউ নয়। সহযাত্রীর আত্মীয় তারা। বাড়িটাকে মনে হলো ভয়ানক নিঃসঙ্গ। খোলা মাঠে দ্বিতল অট্টালিকা। পুরুষদের অনেকে বিদেশে চাকরি করে। যারা তা করে না, তাদেরও সকাল থেকে অনেক রাত অবধি চোখে দেখবার উপায় নেই। ভোজনের আহ্বানকে উপেক্ষা করলুম। উপর থেকে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা এসেছিল, তার পাশে ছিন্ন কম্বলে 'পর্যঙ্ক' রচনা করে তাকে উপেক্ষা করলুম। এই সব করে নিজেকে সেখানে অন্তত, কিছুক্ষণের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলুম। পরের দিন দুপুরের আগে। গিন্নিবান্নিরা ভেতরে রান্না দেখছেন, আমার সাথীরা গিয়েছে সওদা করতে। বাইরে মিঠে রোদ। গলা সাধার মিষ্টি আওয়াজ এলো কানে। অত্যন্ত ভালো লাগছে বলেই শুনবো না বলে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়লুম বুক ভরে অক্সিজেন নেবার জন্যে। বিদায়ের সময় গিন্নিমায়েরা বল্লেন, যাও বাছারা, সাগর দেখে এসো গে; সংসারের সাত ঝামেলায় অস্থির; আমাদের আর সাগরে যাওয়া হল না।

জাহাজঘাটায় গিয়ে যা দেখলাম, বলবার নয়। সেখানে মধ্যাহ্নের কড়া রোদ মাথায় নিয়ে হাজার হাজার লোক পোঁটলা-পুটলি নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতীতে মিলে হাজার হাজার। কতক্ষণ ধরে ঠায় বসে আছে কে জানে। যাদের রং ফরসা, রোদে তারা তামাটে হয়ে গেছে। কালো যারা, তাদের তো কথাই নেই। কচি কচি দুধের শিশুদের মায়েরা আঁচলে ঢেকে-ঢুকে কোনমতে আতপ-তাপ থেকে রক্ষা করছে। রোদে, ক্ষুৎপিপাসায়, উৎকণ্ঠায় তারা প্রায় নেতিয়ে পড়েছে বললেই হয়।

কয়েকঘণ্টা পরেই এখানে যে এক শোচনীয় ট্রাজেডি ঘটে যাবে তারা কি তা জানতো? জানতো কি, যে শিশুর মুখে রোদ লাগছে বলে মা আঁচলের আড়াল দিচ্ছে, সে-শিশু শত শত মানুষের সঙ্গে, মার সঙ্গে, মার প্রতিবেশীদের সঙ্গে জেটির তলায় পড়ে পিশে যাবে? যে পল্লীবাসী নিজের ঘরের ও পরের ঘরের মেয়ের দঙ্গল নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে রেখে এগুচ্ছিলো পাছে কেউ হারিয়ে যায়, স্বপ্নেও কি ভাবতে পারছিল সে, হয়ত সব কয়জনাই তার হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য? অথবা সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—কে হারালো, কে থাকলো হিসেব নেবার জন্য আর সে আসবে না?

মানুষের প্রাণ যে কত সহজে কত অবলীলাক্রমে কত মর্মান্তিক রকম বেঘোরে শেষ হয়ে যেতে পারে তারই রক্তমাখা গোটা একটা অঙ্কের অভিনয় দেখা গিয়েছিল সে দিন ডায়মন্ডহারবারের জাহাজ ঘাটায়। যারা বাখারীর মত সরু লিকলিকে কেরোসিন কাঠের চিলতার রেলিং দিয়ে জেটি বেঁধে দিয়েছে, তারাও ভাবেনি এ জেটি ভেঙে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে।

শোনা যায় যারা জেটির উপর অবরোধ রচনা করে টিকিট চেক করবার চেষ্টা করেছিল, তারাও ভাবেনি জনতা বাধা পেয়ে ফুলে উঠবে, ফেঁপে উঠবে, আর নিরুপায় জেটিখানা ভেঙে গিয়ে মানুষের আশু মৃত্যুর পথ করে দেবে! যে নরস্রোত উপর থেকে জেটির সঙ্কীর্ণ নালা বেয়ে নেমে আসছিল তারাও ভাবেনি তারা কোথায় যাচ্ছে—সামনের মানুষগুলি কোথায় তলিয়ে গিয়ে তাদের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে! কি যে হচ্ছে বা হতে চলেছে, কেউ তা ভাবতে পারেনি। অদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই না ভাবতে পারার অন্ধতাই এতগুলো লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই।

দুর্ঘটনার কয়েকঘন্টা আগে বোটে চড়ে বসেছিলুম বলে নিজে মারা পড়িনি। জাহাজে উঠলুম। বিকানির থেকে এসেছেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। ভালো হিন্দী জানি না। তবু তাঁর সঙ্গে আলাপ জমতে দেরি হয়নি। আলাপে আন্তরিকতা থাকলে ভাষায় দখল বেদখলের কথা মুখ্য হয়ে ওঠে না, তা বুঝতে পারলুম সেই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করেই। দূর পথের বিঘ্নসঙ্কুল যাত্রা বলেই বোধ হয় যাত্রীরা অচেনা অজানা হয়েও পরস্পরকে আপন করতে চায়।

জাহাজ তখনো ছাড়েনি। একটি বাঙালী স্ত্রীলোক হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল। আর পাগলের মত বলতে লাগলো, আমার সব গেছে গো, আমার সব গেছে, কেউ বেঁচে নেই। তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি এমনসময় বিকানিরের মহিলাটি দুই হাতে আমার একখানা হাত সাপটে ধরে বললেন, মৎযাইয়ে, ভাইয়া মৎ যাইয়ে। দেখি, তার মুখে

মিনতি এবং চোখে জল। এ জিনিস বাঙালী মেয়েরই একচেটিয়া বলে জানতুম। হাত ছাড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে উড়ে মতন একটা লোককে বলতে শোনা গেল–কেউ মরেনি, সব বেঁচে আছে। হায়, তখন কি আর জানতুম, যাদের পেছনে রেখে জাহাজে চড়েছি, তাদের বহুজনের যাত্রা এখানেই ফুরিয়ে গেছে। জাহাজ ভাসলো। সাগরের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা বসে আছি জাহাজে–পশ্চাতে পড়ে আছে বহু লোকের রক্তে রঞ্জিত একটা বেদনার স্বাক্ষর।

মেলায়

শেষ রাত্রিতে জাহাজ সাগর দ্বীপে নিয়ে নোঙর করলো। পরের দিন, সকালে নৌকোয় করে জাহাজ থেকে তীরে গিয়ে নামলুম। মারোয়াড়ি বৌঝি ও গিন্নিমায়েরা নৌকোয় উঠে তীরের প্রতি দৃষ্টি রেখে করতালি দিয়ে গাইছে। গোপাল হরে, গোবিন্দ হরে। একখানা নৌকোয় দেখলুম বিকানিরের সেই মহিলাটি উঠেছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমি হিন্দী করে বললাম, মেলা মে মোলাকাত হো যায় গা। কিন্তু তা আর হয়নি। সাগরের কিনারা দেখে চোখ জুড়ালো। সত্যি এ আভাতি বেলা লবণাম্বু রাশে। নৌকা থেকে নামবার সময় জনৈক স্বেচ্ছাসেবকের মুখে অনুযোগ শুনতে পেলুম,

এতগুলো পুলিশ এখানে পাঠানো হলো–ওরা কেবল গুঁতোবার বেলাতেই এগিয়ে আসে–শ্রমসাধ্য বা দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজের বেলা ওদের পাওয়া যায় না। এ রকম অভিযোগের একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল পরে। মেলা ভেঙ্গে যাওয়ার পর শেষ দিনে মার্তাবান জাহাজে করে স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে আসছিল, তখন পুলিশেরা ধরে প্রায় অর্ধশত স্বেচ্ছাসেবককে ঠেঙিয়েছিল। সেবার কাজে এসেও তারা জুলুম ছাড়তে পারে না। তাই দেখে মনে হয় এদেশের পুলিশ কোনোকালে মানুষ হতে পারবে না।

এতদূর থেকে এসে সাগরদ্বীপের মেলায় যা অবস্থা দেখলুম, তাতে মনে খুব দুঃখ হলো। দেখলুম সরকারি হস্তক্ষেপে জায়গাটির যথেষ্ট মর্যাদাহানি ঘটান হয়েছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে বাজছে নানা রকম খোশআমুদে গান। একটা সরকারি পাবলিসিটি দপ্তরও খোলা হয়েছে। কয়েক বছর থেকে দেখছি সরকার পাবলিসিটির জন্য মেলা ইত্যাদিকে কাজে লাগাচ্ছেন। সেখানে সরকারি কেরামতির নানা পরিচয় সঞ্চয়ের আশায় এখানে এসে থাকে। এখানে এ রকম বিলাসিতার আমেজ তাদের তীর্থের কৃচ্ছ্রতার উপর মৌজ ধরিয়ে দেবে না কি? তাতে আমোদ হতে পারে, কিন্তু তীর্থে আসার উদ্দেশ্যকে মাটি করে দেওয়া হয়। এবার যা ব্যাপার দেখলুম, তাতে মনে হয়, আগামীতে এখানে যাত্রীদের মনোরঞ্জনার্থে দুই–একটি সিনেমা টকীর আমদানি হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। আমার মতে তীর্থস্থানের দুর্গমতাকে; তার কৃচ্ছ্রসাধ্যতাকে এভাবে পঙ্কিল করে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। বিশেষ করে এই স্থানে আমোদ-প্রমোদের আমদানি একান্তই গর্হিত।

আর এক কেরামতি দেখলুম এবার সেখানে। মেলার জায়গাটাকে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থের নামে ভাগ করে সাইনবোর্ড দেওয়া হয়েছে। এখানে এলে সর্বতীর্থের ফল লাভ হয় এইটি বোঝানোই কি এর উদ্দেশ্য? যাত্রীদের এভাবে বোকা বানানোর চেষ্টা হাস্যকর নয় কি? 'কাশী, বৃন্দাবনে'র পাশেই দেখলাম, এক জায়গায় লেখা আছে, জসিমুদ্দীন রোড। এ কি সব ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা?

আমার মনে হয়, তীর্থক্ষেত্রে যাবার জন্য যেদিন থেকে আমরা যান্ত্রিক যানবাহন অবলম্বন করতে শিখেছি, সেই দিন থেকে তীর্থ আমাদের নিকট তাদের মাহাত্ম্য কিছু কিছু হারাতে বসেছে। যানবাহনের সুলভতার দরুণ আমরা বহুসংখ্যক লোক দলে দলে যাই, দলে দলে মারা পড়ি, আর পরম প্রার্থিত দুর্লভ স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখি, যে-কৃত্রিমতায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অভ্যস্ত, এখানেও সেই কৃত্রিমতারই স্বাক্ষর।

বিদায়ের বেলাটি বেশ মর্মস্পর্শী। মেলা ফিকে হয়ে আসছে। যাত্রীরা কতক কতক চলে যচ্ছে। বাকি কাল যাবে। দুজন প্রৌঢ়া বিধবা আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, বললেন—আমাদের সঙ্গের লোকদের পরের জাহাজে আসবার কথা ছিল আসেনি; ডায়মন্ডহারবারের খবর কিছু জানো বাবা? কত লোক মরেছে বলতে পারো? যা শুনেছিলুম জানলুম। উদ্বিগ্ন হলেন এবং ঘনিষ্ঠতা করার জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু নাম শোনার পর তাঁদের উৎসাহ দমে গেল। আমার নামের দুরুচ্চারতা তাঁদের নিরাশ করলো। তাঁরা হয়ত চেয়েছিলেন অমিয়ভূষণ কী তপনকুমার এমনি একটা কিছু।

ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরের বালিতে গা এলিয়ে আবার সরে যাচ্ছে। সেই বালিতে দেখলাম কয়েকজন আঙুলের ডগায় নাম লিখছে। এ লেখা কতক্ষণ থাকবে, কে পড়বে? তবু তাদের দেখাদেখি আমিও আমার নাম লিখে ফেললুম। সন্ধ্যায় মহিলারা সাগরকে বাতি দেখাচ্ছে গান গেয়ে গেয়ে। এতে বেশি উৎসাহ দেখলুম মারোয়াড়ি মেয়েদের।

সাগরের উপর চাঁদ উঠেছে। জাহাজ চলেছে নিস্তরঙ্গ সাগরজলে আলোড়ন তুলে। যতক্ষণ দেখা গেল মহামুনি কপিলের তপস্যা-ভূমি চোক ভরে দেখে নিলুম, তারপর এক সময় চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল।

সাপ্তাহিক দেশ : ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৪৬, ফাল্গুন ৪, ১৩৫২

কবিতা

বিদেশী নায়িকা

বাধাহীন বারিধির কালো কলধ্বনি
তারই ওপারে তোমার দেশ—সেই শ্বেতদ্বীপে।
রূপসী সপ্তদশী তুমি—
সপ্ত সমুদ্রের শূন্যতা পেরিয়ে
আমার তটে এসে মূর্ছনা জাগায়—তোমার রূপের ঢেউ।
এত রূপ তোমার, এত যৌবন।
তুমি বাস্তবের নও, কল্পনার
নইলে এত রূপ তোমার থাকতো না—
ঈশ্বরের অপটু হাতের খেয়াল তুমি নও,
কল্পনার রাজ্য উজাড় করে তোমাকে সৃষ্টি করেছে এক কথাশিল্পী—
—বিদেশী উপন্যাসের তুমি এক নায়িকা :
আর তুমি এত সুন্দর !

গল্পের মাঝখানে তুমি মরে গেছো
নির্মম শিল্পী তোমায় ডুবিয়ে মেরেছে
পুষ্প হিন্দোলায়িত এক সরোবরের জলে
সেই ক্ষণিকার বুকে লেখা হয়ে রইলো
ডিভাইন কমেডির এক অক্ষয় স্বর্গ
—জীবনের ট্রাজেডি সেই থেকে তোমার পদচিহ্নকে
বৃথাই খুঁজে মরছে।

তুমি যদি বেঁচে থাকতে—
প্রত্যহের ক্ষয়িষ্ণু ধরিত্রীর নির্মম বিবর্তনের বুকে
যদি তুমি বেঁচে থাকতে—
কালের রথচক্রের তলায়—এত রূপ এত যৌবন
জরার কুঞ্চনে কুঁচকে যেতো—'দলিত দ্রাক্ষা সম'।
তোমায় পারতমা না এমন করে ভালোবাসতে,
মুগ্ধ মধুপের মতো স্পর্শকাতর মন আমার,
সপ্তদশ বসন্তে রসায়িত তোমার ঐ তনুমনের কূপে কূপে
মেলাত কি নিষ্ঠার বহু-বেণী-সঙ্গম।

দুশো বছর তোমার বয়েস—
অষ্টাদশ শতাব্দীর এক প্রাচুর্যময় প্রাতে তোমার আবির্ভাব—
এতদিনের প্রাত্যহিকতায় তোমার জীবনে কী না আনতে পারতো!

ব্যর্থতা, গ্লানি, ঈর্ষা, নৈরাশ্য আরো কত কী।
আর, আর কল্পান্তিক সত্যের ছাঁচে ঢালাই করা
সেই রোগশয্যায় বিশ্রী রকমের মৃত্যু।

সেই যে ডুবেছিলে আর ওঠো নি–
মৃত্যুর বিধাতাকে তুমি দিয়েছ ফাঁকি
–যারা তোমায় জানতো ভালোবাসতো,
অনন্ত তারা তো কেউ দেখে নি!

কাহিনীর আধেক পথে তুমি মরে গিয়েছিলে,
তাই আজো তুমি বেঁচে আছো–
আজো তুমি রূপসী, সপ্তদশী, যৌবনবতী
–আজো তুমি প্রিয়া!

সূত্র : মৃত্তিকা : ১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, হেমন্ত ১৩৪৯
অদ্বৈত রচনা সমগ্র ২০০০ এ সংকলিত হয়েছে

শুশুক

অগাধ জলের তলে সঞ্চরি' ফিরে গো,
কভু চলে উচ্ছ্বাসে, কভু চলে ধীরে গো,
ভোঁস করে ভেসে উঠে
নিশ্বাস ছাড়ে সে,
মসৃণ কালো রূপ অতলের কালিমায়
মিশে হয় একাকার, কিছুই না ধরা যায়,
দূরে দূরে থাকে সদা
ঘেঁসে নাকো পাড়ে সে।
অগাধ মানব-স্রোত বিচারিয়া ফিরে সে
কভু চলে ডাঙায়, কভু চলে নীরে সে,
হাজারের ট্যাক কেটে
ট্যাকে গুঁজে মারে ডুব
গোপনের কালিমায় লুকিয়ে সে চলে গো,
মসৃণ দেহে কোনো দাগ নাহি জ্বলে গো,
মানুষের স্রোতে মিশে
তলাইতে পারে খুব।

সূত্র : মোহাম্মদী : ১৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫২
অদ্বৈত রচনাসমগ্র ২০০০ এ সংকলিত হয়েছে

যোদ্ধার গান

তের শতকের একটি আরবী কবিতার অনুবাদ।

করুণায় আর গৌরবে সুমহান
আল্লা ব্যতীত কারো কাছে আমি নুয়াইনি কভু শির–
উপলাকীর্ণ বন্ধুর পথে ধরি কর-অঙ্গুলি
চালায়েছে মোরে চির বিজয়ের পথে–
দিয়েছে আমায় সম্পদ রাশি, দিয়েছে সিংহাসন,
হস্তে দিয়েছে বিজয়ীর তরবারি।

অজানা দেশেতে আমারে, জানার গৌরব দিয়াছেন,
মোর রাজত্ব-ছায়া দিয়ে তিনি ধরারে ঢাকিয়াছেন
অজ্ঞাত ছিনু, অখ্যাত ছিনু, তাঁহারি মেহেরবাণী
দিকে দিকে মোরে বিজয় দিয়েছে আনি।

তার শত্রুরা পতঙ্গসম পলাইয়া গেল
মোর সম্মুখ হতে।
তিনি চাহিলেন করুণা করিতে, নিলো না সে দান তারা
জাহান্নামের চির তমসায় সব শয়তানী সহ
বিরাম লভিল তারা।

আমরা লভেছি বীরের মৃত্যু,
আমরা শুয়েছি বীর-শয্যার সমর অঙ্গনেতা।
তিনি আমাদের ঠাঁই করেছেন তৃণ পুলকিত
চির সবুজের দেশে
মধুগন্ধী সে শাশ্বতী নদী কূলে

সূত্র : মোহাম্মদী : ১৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫২। পত্রিকামধ্যে অনুবাদকের নাম নেই, তবে বার্ষিক সূচীপত্রে লেখক হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাম উল্লেখ আছে। কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন– এটি কবি ফররুখ আহমদের অনুবাদ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবস

মেঘ-তূর্য্য-নিনাদিত আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
স্মৃতির পশরা লয়ে বসে আজি আকুল হরষে
বাতায়ন পথে, মোর দৃষ্টি ধায় দূর-দূরান্তরে,
কত বিস্মৃতির হায় কত কথা আজি মনে পড়ে।

লাজনম্র দিগঙ্গনা মুখে দিছে আবরণ টানি,
বিজলি-চকিতে, কভু হেরি তার মৌন মুখখানি।
সম্মুখে 'তিতাস' বহে এলায়ে বিপুল দেহভার,
পলে পলে বেড়ে উঠে, বুকে তার কি ক্ষুব্ধ ঝঙ্কার।
কত সুখ, কত দুঃখ, কত হাসি, কত কান্না হায়,
কত পরিচিত মুখ ভাসি উঠে আজি গো হিয়ায়,
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বুঝি বা এমনি দিনে
বৈষ্ণব কবিরা হায় গেয়েছিল বিরহের বীণে
চিরন্তন প্রেম কান্না। জয়দেব গেয়েছিল গীতি ;
স্বপ্নসম ভেসে আসে অতীতের মোহময় স্মৃতি!
এমনি বুঝি বা আষাঢ়ের প্রথম দিবস
কবিরে করিয়াছিল বেদনার পুলক বিবশ।
রচেছিল মেঘদূত, কাব্যকুলে ফুল্ল পারিজাত
নিখিল বিরহ সুর যে তন্ত্রীতে করে গো আঘাত।
মনে পড়ে ক্ষুব্ধ যক্ষ, অভিশপ্ত ব্যথা-ভার লয়ে
মেঘেরে ডাকিয়া অই প্রিয়ার বারতা দেয় কয়ে;
একাকিনী যক্ষবালা মণিময় অলকা নগরে
অশ্রু মুকুতায় হায় মালাগাঁথি কারে যেন বরে
স্মৃতির প্রাঙ্গণ তলে আষাঢ়ের প্রথম দিবস—
তারে ছেয়ে আছে যেনো কত সুখ-দুঃখের পরশ।

[অধ্যক্ষ তিতাশ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে]

ধারা শ্রাবণ

শাঙন রে তোর কেমন ধারা!
দিবস নিশি ঝরাস বসি
কোন্ বিরহীর আঁখির তারা?
কানন ভরে বাদল সাজাস্
ঝরঝর সুরে মাদল বাজাস্
কেয়ার বুকে জাগাস সাড়া
কেমন ধারা।

নীপের শাখে কেশর মাখি
তুই রে বহাস উতল বাতাস
মনোমোহন গন্ধ তারি
কানন মাতাস।

নুয়ায়ে দিয়ে ফুলের বীথি
তুই শুধু গাস্‌ জলের গীতি
কল্লোলেতে আকুল পারা
কেমন ধারা!
গতদিনের কত স্মৃতি
হৃদয়পটে তুই রে জাগাস,
চক্ষেতে তুই মোহাঞ্জনের
আবেশ লাগাস্‌!

রসঘন কেশর রেণু
ব্রজের কালার কিশোর বেণু
দুর্যোগাভিসারের সাড়া
কেমন ধারা !

শাওন রে তোর কেমন ধারা
তোর গানেতে কান পাতিয়ে
হয়ে যাইরে আপন হারা।
অবিশ্রান্ত বারি ঝরাস্‌
গানে গানে পরাণ ভরাস
জলে ভরাস চোখের তারা
কেমন ধারা!

[অধ্যক্ষ তিতাশ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে]

মোদের রাজা মোদের রাণী

এক.

মোদের রাজা মোদের রাণী
মোদের আপন পিতামাতা,
ভক্তিভরে অই চরণে
চলনা ও ভাই লুটাই মাথা;

কোথায় পাবি এত স্নেহ
এমন কি আর আছে কেহ,
মোদের দুঃখে আর কি কারো
সিক্ত হবে আঁখির পাতা?
রাজা মোদের বাপ ও ভাই
রাণী মোদের মা,

অই চরণে লুটিয়ে এবার
ধন্য হয়ে যা!

দুঃখ-ব্যথা ভুল্,
ও ভাই হাসির তুফান তুল্
তাঁদের দয়ার নাই রে তুল্
অই প্রাণে ঢেলে দিতে—
সাজা প্রাণের ফুল—

মোদের শিরে উদ্যত কার
কৃপালু অই অভয় বাণী,
এ যে মোদের রাজা, মোদের রাণী।

দুই.

মোদের রাজা মোদের রাণী
আমরা তাঁদের ছেলেমেয়ে,
দে ছে মনে পুলক মোদের
তাঁদের স্নেহ্ ধারায় নেয়ে;

দুঃখ-বিপদে যেথাই আমি
নামটি ধরে বারেক ডাকি
পরাণ মোদের ভরে উঠে
ওই নামেরি গানটি গেয়ে।

রাজা মোদের শাসন করেন,
রাণী ধরেন কোলে;
পুলক জলে পরাণ ভাসে
অশ্রু পড়ে গ'লে।

সকল ছেলের দল্
তোরা সমস্বরে বল্
হউক, নবস্বাস্থ্য বশ্
এই সুখেতে মেপে না পাই
আনন্দেরি তল—

দুঃখ ব্যথায় রক্ষা করে
জীবন্ত কার আশীস বাণী,
এ যে মোদের রাজা, মোদের রাণী।

[অধ্যক্ষ তিতাশ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে]

ত্রিপুরা লক্ষ্মী

অমার তিমিরাচ্ছন্ন ত্রিপুরার ব্যথা-দুঃখ ঘেরা ভাগ্যাকাশ পটে
প্রসারিয়া পূর্ণিমার সুবিমল জ্যোৎস্নারাশি, মাগো, আয় মা, নিকটে,
আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী, স্বপ্ন তুলি বুলায়ে দে চোখে, জাগা মা হরষ;
উঠুক আনন্দ হাসি ব্যথাম্লান মুখগুলি হ'তে, পেয়ে তব স্নেহের পরশ।

আয় মা করুণা করি, দেখ মাগো, দেখ ভালো করে মেলিয়া দু'নয়ন,
সম্মুখে মরণসিন্ধু, বেলাভূমে দুঃখের পসরা করিছে চয়ন।
বড় দীন, বড় দুঃখী, শোকতপ্ত, বড় ভাগ্যহারা, সন্তপ্ত পরাণ;
তুই না চাহিলে ফিরে কে এদেরে করিবে জননী, স্নেহভরে কৃপাদৃষ্টি দান?

অনশনে, অর্দ্ধাসনে, জীর্ণ-শীর্ণ কংকালের মত রয়েছে পড়িয়া,
নাহি মা প্রাণের সাড়া, নাহি উৎসবের ধারা প্রাণে আছে যেন মরমে মরিয়া।
বুকগুলি ধুকিতেছে, মুখগুলো ব্যথা মলিন, বলহীন দেহ
তোর ছেলে দুঃখে মরে তুই না চাহিলে ফিরে, মাগো অন্য কেহ করিবে কি স্নেহ?

সবাই জুড়িছে তর্ক বড় বড় কথা নিয়া হায়, কয় বড় কথা
ছোট ছোট প্রাণগুলি মৃত্যুমোহ তন্দ্রাতে বিলীন, কে বুঝিবে ব্যথা?
দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়—এক এক করি হয় অবসান,
দুঃখ-দুর্ভিক্ষের বোঝা দিনে দিনে হয়ে উঠে ভারী—জ্বলে চিতা দাবাগ্নি সমান!

আয় মা ত্রিপুরা লক্ষ্মী, ত্রিপুরার আকাশ-বাতাস করি মধুময়,
ত্রিপুরার মাঠে-ঘাটে পূর্ণ ফসলের হাসি নিয়ে আয় এ সময়।
অরুণ মুকুট শিরে, চরণে কুসুমমালা পরি হস্তে পূর্ণ শস্য-আশীর্বাদ,
চরণ মঞ্জরী নব-জীবনের উঠুক ঝংকার, জাগিয়ে দে বাঁচিবার সাধ।

সূত্র : ত্রিপুরালক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৪২। [অধ্যক্ষ তিতাশ চৌধুরীর সংগ্রহ থেকে]

শ্রীমতী শান্তি বর্মণকে

ঈশ্বরের খেয়ালেতে নেমে আসে ঝড়
নেমে আসে ধ্বংস ভয়ংকর
প্রকৃতি আপন হাতে পরম যতনে
ধ্বংস রেখাগুলো
মুছে দেয় শুধু অকারণে।

সাজাইয়া তুলে ধরা নিত্য নিত্য নবরূপ দিয়া
তৃণে শস্যে পুষ্পেতে ভরিয়া।
বাহিরে আমরা ফিরি ধ্বংসের খেয়ালে

গৃহে তোমাদের হস্তে সৃষ্টির কল্যাণ
তোমাদের স্বর্ণদীপ্তি দিগন্তের ভালে
মোদের জীবন সূর্য করে মহীয়ান।

আশা শান্তিকামনায় ঘেরা
ঘরে ঘরে রয়েছে মায়েরা।
সুখের দুঃখে দুর্দিনে সুদিনে
সংসারেতে এরা লয় চিনে।

বক্ষে ধরি সংসারের সর্ব প্রয়োজন
ভগ্নিরূপ-কন্যারূপ-প্রিয়ারূপ ধরি
ভালবাসিবার স্বতঃ আনন্দে মগণ
দীর্ণ সংসারেরে এরা রাখিয়াছে ভরি'।

[অদ্বৈত মল্লবর্মণ বন্ধু চিত্তরঞ্জন বর্মণ এবং
শান্তি বর্মণের শুভ বিবাহ উপলক্ষে কবিতাটি লিখেছিলেন।
'ভাসমান'-২, ২০০০ সংখ্যায় ছাপা হয় অমিত সরকারের সৌজন্যে।
ভাসমান-২ থেকে সংকলিত]

সন্ধ্যা-বিরহিনী

গোধূলি বেলার সুপ্তি জড়ানো
বাতাসে ফুলের গন্ধ ঝরে,
সন্ধ্যা-মালতীর গন্ধে।
অপরাজিতার নীলাভা ছড়ানো
ধূসর আলোরে অন্ধ করে
সমাপ্তি আনে ছন্দে।

প্রাঙ্গন কোণে নতমুখী এসে দাঁড়ালো রাধা
দিনের আলোতে ভুলে গেছে তার অলক-বাঁধা
দিঠি কোণে তার প্রেমের ধাঁধা
কালো বরণেরে বন্দে—
দিবসের যতো প্রসাধন তার ভূষণ-সাধা
সমাপ্ত সাঁঝ-ছন্দে।

গোধূলী বেলার সুপ্তি আসে তো
অসীমতা দিয়ে পরাণ ভরে

অঞ্জন মেখে চক্ষে
সন্ধ্যামণির ফুলের বাসে তো
শ্রান্তি শেষের মরণ ঝরে
হাহাকার আনে বক্ষে।

ছায়ায় ছায়ায় একাকার হলো নীল-আকাশ
ভেসে আসে ওই হাজারো নারীর চপল-শ্বাস
বিরহিনীদের ভীরু-বিলাস–
অসীম নিশার লক্ষ্যে;
হাজারো রাধার, শকুন্তলার, বিগতবাস,
হাহাকার আনে বক্ষে!

সূত্র : সাপ্তাহিক নবশক্তি, ৪ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা
২৯ জুলাই ১৯৩৮, ১৩ শ্রাবণ ১৩৪৫, শুক্রবার পৃষ্ঠা-৩১

মোহনলালের খেদ

গোধূলিতে ভাগীরথীর মৃদু কলধ্বনি
এপারে রক্তাক্ত খণ্ডিত শবকূল,
ওপারে সূর্য অস্ত গিয়াছে।
ষড়যন্ত্রের কৃষ্ণ ঊর্ণনাভের জাল
আর প্রেতের মসিলিপ্ত আশা–

আম্রবনের অন্তরালে ঝঞ্ঝাহত পক্ষীশাবকের মত ঝিমায়
নিথর রণস্থল নিতল তমিস্রায় ঢাকা।
গলিত শবের ন্যায় ধরিত্রীর চক্ষু গেছে ক্ষয়ে–

শুধু জেগে আছে মোহনলালের দুটি চোখ
মহাপ্রলয়ের শেষ রশ্মি নিয়ে।

আজিকার সূর্য কালও উঠবে–
আজিকার দিন কালও আসবে
কিন্তু সে সূর্যে থাকবে না ঔজ্জ্বল্য।
সেদিনের থাকবে না দিবার মত তেজ–
নিষ্প্রভ আলো ও অস্ফুট গুঞ্জনের তলে
নৃত্য করবে জগৎশেঠ আর মীর জাফরের দল।

বুক ভরা বীর্য, মনভরা ক্ষোভ আর চোখ ভরা ব্যর্থতার
যে-সিরাজ প্রেতের রঙ্গমঞ্চ করলো ত্যাগ জ্বালা নিয়ে
তারি অনুগামী হয়ে মোহনলালের খেদখিন্ন চক্ষুর
জ্বালার দাবানল
যুগ-বিপর্যয়ের দিনের আশায় আজো আছে জেগে—
স্বার্থী-ষড়যন্ত্রীদের শিবা-কণ্ঠের অনুচ্চ রব
তারি তেজে নির্বাণ লাভ করেছে সে কতকাল।

সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী, সিরাজস্মৃতি সংখ্যা
১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭

সিরাজ

মরণবিহীন স্মরণ-সিংহাসনে
হে রাজাধিরাজ তুমি বসিয়াছ আজ
তোমার আসন বঙ্গ-হৃদয়াসনে
মৃত্যু তোমারে পরালো অমৃত-সাজ
সিরাজ হায় সিরাজ।

পাখী বলে আজ সেতো যায়নি ক' চলে'
রয়েছে মিশিয়া মাটির মায়ের কোলে
দেহহীন-ফুল জাগিছে গন্ধরোলে
অ-দেখার তীরে গোপন গন্ধরাজ
সিরাজ হায় সিরাজ।

শহীদ সিরাজ চির গৌরবময়
ইতিহাস রচে মিথ্যার গ্লানি হায়
অসীম প্রাণের মরণেও নাহি ক্ষয়
আত্মা যে তাঁর দেশের মুক্তি চায় ;

হায়রে পলাশী তোমার বনাঞ্চলে
গৌরব-রবি গিয়াছে অস্তাচলে
কাঁদে জাহ্নবী বাঙলার আঁখি জলে
বন্দিনী মা'র কে ঘুচাবে আজি লাজ?
সিরাজ হায় সিরাজ।

সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী, ১৩ বর্ষ
১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৭

পলাশী

তুমি যে বাজালে অস্তাচলের বাঁশী
পলাশী হায় পলাশী,
আলোক নিভায়ে পলকে নিভালে হাসি
ঝরায়ে অশ্রুরাশি—
পলাশী হায় পলাশী ॥

বনের কুসুমে অকালে করিলে ম্লান
মুক্ত পাখীরা হারায়েছে আজি গান
গৃহে গৃহে আজি দীপ হলো নির্বাণ
নিভে গেছে সুখ হাসি
পলাশী হায় পলাশী ॥

রণলক্ষ্মী যে সিঁদূর মুছিল হায়
মণিহার খুলি' শৃঙ্খল পরে গলে
কালের আকাশে মরণের মেঘ ছায়
ঘুমায়, সিরাজ মৌন সমাধিতলে;

মহামরণের হে মহা তীর্থ ভূমি,
মোহনলালের মৃত্যুললাট চুমি'
রুধিরে লিখিলে একি ইতিহাস তুমি
অশ্রু-সাগরে ভাসি
পলাশী হায় পলাশী ॥

সূত্র : পূর্বোক্ত মোহাম্মদী

হলওয়েল স্তম্ভ

তোমায় দেখে সবাই মোরা ঘৃণায় ফিরাই মুখ,
তবু তুমি রইবে চেয়ে একি গো কৌতুক।
অলীক তুমি মিথ্যা তুমি, স্বপ্ন তুমি ভাই,
এই কথা তো নিজেই বুঝো, সন্দেহ কি তাই।
গণ্ডিকাতে·পোক্ত সে-কোন্ বিষম গল্পবাজ।
বঙ্গ শিরে হান্‌লো তোমায়–কলঙ্কেরি তাজ।

নিবিড় তোমার ভালোবাসা গভীর তোমার প্রেম–
মোদের সাথে জড়িয়ে আছো– লৌহ সাথে হেম;
দুঃখে সুখে সঙ্গে আছো ভুলবো না সে কথা–
করবো কি ভাই, জাগছে আজি যুগান্তরের ব্যথা!

কখন থেকে সঙ্গে ছিলে, কখন থেকে নাই–
হাজার কাজের ভিড়ে মোরা জান্‌তে নাহি পাই :
মিথ্যা সে তো আপনি মরে–এই তো ধরার রীত–
প্রতিবাদের মর্যাদাতে করবো তারে স্ফীত?
ভুলেই গেছি, দাঁড়িয়ে আছো–মুখটি করে নীচু
উত্তরীয়ে কর্ণ ঢাকি'–কইনি মোরা কিছু!

আজকে দেখি শিকড় তোমার গভীরে গেছে নেমে,
পালিশ করা গাত্র উঠে চেক্‌নাই'-এতে ঘেমে।
প্রেতের মতো, ক্ষতের মতো, ছায়ার মতো হয়ে
কালের স্রোতে রয়েই গেছো– যাচ্ছো নাকো ক্ষয়ে।

আপ্‌না হতে যাওনি তুমি, লজ্জা তোমার নাই–
স্বরূপ নিয়া করছো জাহীর নিজের মিথ্যাটাই।
আর তো মোরা বইতে নারি স্বপ্নে-রচা ভারী :
শোলার মতো হালকা ছিল, হচ্ছে ক্রমেই ভারী।
হয়তো তোমায় গুঁড়িয়ে দিয়ে, থেঁতলে দিয়ে ধার–
জন্ম-তরে মিথ্যারে ভাই করবো বহিষ্কার।
ঘৃণ্য তোমার অস্থি-রেণু প্রাচ্যেতে না সাজে
সাত-সাগরের ওপার গিয়ে মুখটি ঢাকো লাজে!

সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা। ১৩ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬২৩
সংগ্রহ : বাংলা একাডেমী, ঢাকার গ্রন্থাগার থেকে।

গাওয়ের পরধান মদন সরকার, রতন জাওলার বেটা।
তাহান মত বুদ্ধিকৌশল জানতে পারে কেটা ॥
কাজল্যা ধইল্যা বোয়াল্যা নামে আছে তিনখান বিল।
মাইরপিট লাগলে হগ্গলে খায় মদনের হাতের কীল ॥
তাহান বেটা ফটিকচান্দ বাঁইট্যা-খুইট্যা মাল।
ছাইলাপানের সাথে করে কাজিয়া-কেরাঙ্গাল ॥
দুই হাতে পাছড়াইয়া ধইরা মাটিতে ফেলাইয়া।
জাইত্যা জুইত্যা ছাইড়া দেয় তেলিচ্‌মৎ দেখাইয়া ॥
কেহ্ বলে রাখ রাখ, কেহ্ বলে ছাড়।
গর্জিয়া জোয়ান্যার পুলা বলে মার মার ॥
বয়স হইল মদ্দার ছাইলার পরথম যৈবন।
কেমন কেমন কইরা উঠে ঘর-বিরাগী মন ॥
হাতে লইল গুলাইল ফটিক কোচড়ায় লইল গুলি।
পইখ মারিবার ছলে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি ॥
চিল মারে, কৈতর মারে, মারে কাউয়া-কুলি।
চড়া মারে, শাইলকা মারে, মারে গাঙ্গের টুনী ॥
মাছরাঙ্গী কাঠঠুক্‌রাণী বাইচ্ছা মারে টিয়া।
ডাহুক মারে ডুম্বুর মারে আড়ার মধ্যে গিয়া ॥
তোতা মারে, চইট্‌কল মারে, মারে চৈতার বউ।
ডাকদা বলে আরো পইখ কোথায় আছে কও ॥
পইখ মারে নানান রকম চিত্ত না রয় স্থির।
দ্বিগুণ আগুন জইলা উঠে, পুইড়া যায় শরীর ॥
হাতে লইল ফটিকচান্দ কাঞ্চা মূলির বাঁশী
ঘর থেকে বাহির হৈল হইয়া উদাসী ॥
চক্ষু বুইজ্যা ফটিকচান্দে বাঁশীত্ দিল টান।
ঘরের যত মাইয়া লোকের চমকাইল পরাণ ॥
দারুন্যা বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেঁদা।
নাম ধরিয়া ডাক্‌ত বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা ॥
এই বাঁশীত্, কালাচান্দে যখন দিত টান।
ঘরে থাইকা চইম্‌কা উঠত অবলার পরাণ ॥
সকল নারীর পাশে এক আবিভাতা ছুঁড়ি।
তণুতে দিয়াছে দেখা যৈবনের কুঁড়ি ॥

এক ধারে উবা হৈয়া শরীর মাঞ্জন করে।
কাঞ্চা-না লাবণী যেন শরীর বাইয়া পড়ে ॥
কাঞ্চীকাটা নাক তার চিরলকাটা চোখ।
মেঘের বরণ কেশের বাহার চান্দের বরন মুখ ॥
ছেমড়ির পানে ফটিকচান্দে আড়ে আড়ে চায়।
দুই চোখ তুইল্যা গুণের ছেমড়ি তার পানে তাকায় ॥
সিঁথায় দেওরে কাম-সেন্দুর মাথায় দেওরে তেল।
এই-না মতে ছেমড়া-ছেমড়ির পীরিত লাইগ্যা গেল ॥
পরমা সুন্দরী কন্যা বিন্দা তাঁতির মাইয়া।
হাঁইট্যা যাইতে পথের মানুষ বারেক থাকে চাইয়া ॥
অত ডাঙ্গর হইছে ছেমড়ি না দিয়াছে বিয়া।
বাইষ্যা মাসে বিয়া দিবে ভালা জামাই চাইয়া ॥
হাতে নাই-গো টাকা-কড়ি, কেমনে দিবে বিয়া।
বাইষ্যা মাসে বিয়া দিবে ক্ষেতের পাট বেচিয়া।
এই-না গুণের হীরামতি কিনা কাম করিল।
জলের ঘাটে গিয়া সেইদিন পীরিতে মজিল ॥
মেঘ-বরণ শরীর খানি, কাজল-বরণ মুখ।
সেই-না মুখই পাগল করল হীরামতির বুক ॥

তিন কড়া মূল্য রে মূলি-বাঁশের বাঁশী।
তার না সুরেই হীরামতির পরাণ হৈল উদাসী ॥
মা'না দেখল চাইয়া রে, বাপ না দেখল চাইয়া।
হেই-না রূপে মজলো ছেমড়ি, কুলের মাথা খাইয়া ॥
খাইতে শিন্ধতে শুইতেরে, আর না ভালা লাগে।
ফটিকচান্দের কালো রূপ চক্ষে সদাই জাগে ॥
পন্থঘাট নীরব থাকে ঠিক দুফুইরা বেলা।
হেই-না সময় কি কাম করে বিন্দা তাঁতির বেইলা ॥
জলভরা মাইট্যা কলসী কাক্কেতে তুলিয়া।
সেই-না ঘাটে চলে ছেমড়ি হেলিয়া-দুলিয়া ॥
ভরা-কলসী ভরে মাইয়া, শব্দ নাহি করে।
কার-বা কালো ছায়া দেখে জলের ভিতরে ॥
হেঁচ্‌কা টানে মাটির কলস কাক্কে তুইল্যা লৈল।
এমন সময় ফটিকচান্দ সামনে দাঁড়াইল ॥

লজ্জা পাইল হীরামতি মুখে নাই সে রাও।
ঢাইল্যা দিল কলসীর জল সেই-না ঘাটের গাও ॥
কাক্কের কলসী ভূমে থুইয়া চক্ষে চক্ষে চাইয়া।

দেখতে লাগল কালো রূপ দুই নয়ন ভরিয়া ॥
'জল যে ভর ওলো ছেমড়ি শুনো আমার কথা।
আঁখি তুইল্যা রাও না কর, খাও আমার মাথা ॥
'তুমি যে রে পরের ছাইলা আমি পরের মাইয়া।
কেমনে করিব রাও তোমার পানে চাইয়া ॥
'তুমি একা আমি একা, খাও লাজের মাথা।

বিনয় করি, এলো ছেমড়ি কও দুইচাইরখান কথা ॥
'ঘরে আছে মা বাপ আইসাছি বলিয়া।
তিলেক বিলম্ব হৈলে উঠিবে রাগিয়া ॥
ঘরে আছে বড়-বৌ, সেই-না পথের কাঁটা।
নানা কথা কইয়া কইয়া আমারে দিবে খোঁটা॥
পাড়ার যত মন্দ লোকে দিবে বদনামী।
কুল যাবে কলঙ্ক হবে ছাড়-গো পাগলামী ॥

'রাইখ্যা দে তোর কুলমান রাইখ্যা দে তোর জাতি।
যে দিবে বদনামী তার শিরে মারব লাথি ॥
তবু যদি তাঁতির ছেমড়ি কথা না কহিবা।
দুই হাতে বেড়াইয়া রাখব, পন্থ না পাইবা ॥
মাইট্যা কলসী ভাইঙ্গা দিব মাইরা বাঁশীর বাড়ি।
টানিয়া ছিঁড়িব তোর কাঞ্চা পাটের সাড়ি ॥'

'স্বভাবে জালিয়ার ছাইলা, দুনিয়ার নাটা।
মাইয়ার সাথে ছাইলার জুলুম ধন্য বুকের পাটা ॥
একলা পাইয়া অবলার যৈবন করবা চুরী।
লোকে বলবে ধন্য ধন্য ছাইলার বাহাদুরী॥
পন্থ ছাড় গুণের ছাইলা না কর চাতুরালী।
একদণ্ড বিলম্ব হৈলে মায়ে দিবে গালি ॥'
'সোনা দিব রূপা দিব, দিব টাকাকড়ি।
বালা দিব, বাজু দিব, দিব হাতের চুড়ি ॥
মিনা দিব, নোলক দিব, দিব নাকের ফুল।
সোনা দা' গড়াইয়া দিব দুইখান কানের দুল ॥
নাও বেইচ্যা কিন্যা দিব কাঞ্চা পাটের সাড়ি।
জাল বেইচ্যা গড়াইয়া দিব আংটি সারি সারি।
বেইচ্যা ফেলব হাতের বাঁশী তিনকড়া যার মূল।
তোমার লাইগ্যা কিন্যা আনব অই-না মাথার ফুল ॥'

চালে ধরে চাল-কুমড়া বেড়ায় ধরে লাউ।
এইবার গুণের ছেমড়ি মুখখান তুইল্যা চাও॥

'না চাই সোনা, না চাই রূপা, না চাই টাকাকড়ি।
পাথর দিয়া ভাইঙ্গা ফেলব বাজু-বালা-চুড়ি ॥
জঙ্গলায় ফালাইয়া দিব নোলক আর নাকফুল।
আড়ার মধ্যে গুঁইজ্যা থুইব কানের দুইখান দুল ॥
আগুনে পুড়াইয়া ফেলব কাঞ্চা-পাটের সাড়ি।
ইডাদা' ফালাইয়া দিব আংটি সারি সারি ॥
গাঙ্গেতে ভাসাইয়া দিব অই-না মাথার ফুল।
হস্তের বাঁশী হস্তে থাকুক লক্ষ-টেকার মূল ॥
কোন্-বা দেশের ধনীর কুমার ধনের গৈরব কর।
কি ধন তোমার ঘরে আছে, কি ধন দিতে পার ॥
টেকা-পয়সার পীরিত রে জোয়াইরা জলের পানি।
এক নিমিষে শুখাইয়া যায় রে, লোকের জানাজানি ॥
ডরে-ভয়ের পীরিত রে বাসি ফুলের মালা।
বোঁটা খইস্যা ঝইরা পড়ে ঠিক দুফুইরা বেলা ॥
মনে-মনের মিলরে সমুদ্দুরের জল।
আড়াই-কড়ার কুলমান পাইড়া করে তল ॥
'নিম পাতা চিরল-চিরল বাসক পাতা কালা।
তোমার মুখের কথা কন্যা বড়ই লাগে ভালা ॥
আম ধরে ছুপা-ছুপা তেঁতুল ধরে বেঁকা।
বড় ভাগ্যে হইল কন্যা জলের ঘাটে দেখা ॥
জলে থাকে জলকুম্ভীর আকাশে থাকে চিল।
এইবার সুন্দরী আমার মন কইরা দে মিল ॥
আড়ায় থাকে দোয়েল রে কোয়েল থাকে গাছে।
তোমারে না দেখলে আমার পরাণ নাহি বাঁচে ॥
বনে থাকে বনরুইত ময়দানে চরে গরু।
এইবার পরাইয়া দে কন্যা শ্যামপীরিতের খাড়ু ॥
বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা, ঘরের শোভা পিড়া।
তোমার মাইঝে আমার শোভা ফুলেতে ভোমরা ॥
কত জান লীলা কন্যা কত জান ঢং।
তোমার নি পছন্দ হইবে এই-না কালো রং ॥
বুঝলাম কন্যা তুমি না হও আমার অনুরাগী।
মাইয়ার মন পাষাণের মত, পুরুষ দোষের ভাগী ॥'
'মাইয়ার থেকে বেশি দরদ পুরুষ-লোকের প্রাণে।
এই কথাখান কোথায় শিখ্‌লা কওনা আমার স্থানে ॥

কত জান ঢং বেরসিক কতই জান ঢং।
শতেক চান্দের জ্বীলা তোমার অই-না কালো রং ॥
কালো আমার চোখের মণি কালো মাথার কেশ,

কালো রূপের লাইগ্যা আমার শরীর করলাম শেষ ॥
মাইয়ার বুকের খবর বন্ধু তুমি বুঝবা কি?
মনপ্রাণ এই চরণে আমি বেবাক সঁইপাছি ॥
তুমি যে রে পরের পুরুষ আমি পরের মাইয়া।
আপনারে পর করিলাম তোমার পানে চাইয়া ॥
এক পহর রাত্রি হৈলে বাঁশীতে দেওরে টান।
ঘরে থাইক্যা চইমক্যা উঠে অবলার পরাণ ॥
দুই পহর রাত্রি হৈলে ঘরে জাগে লোক।
ছুইট্যাইয়া ছুইট্যাইয়া উঠে অভাগিনীর বুক ॥
তিন পহর রাত্রি হইলে মা-বাপ ঘুমায় ঘরে।
নাম ধরিয়া ডাকে যেন তোমার বাঁশীর সুরে ॥
চারি পহর রাত্রি হৈলে আবার বাজাও বাঁশী।
দারুণা বিধি পাখ্ না দিলে বাতাসে উইর‍্যা আসি ॥
পাঁচ পহর রাত্রি হৈলে বানু উদয় পুবে।
জাইগ্যা উঠে পাড়াপড়সী বাঁশী শুনবার লোভে ॥
তুমি বুঝি জান রে বন্ধু এত যাদু টোনা।
আমার মন কইরাছ চুরিরে বন্ধু রাঙ্ কইরাছ সোনা ॥'

এই-না বইল্যা তাঁতির ছেমড়ি কি-না কাম করিল।
ঝাম্প দিয়া জালুয়ার ছাইলার চরণে পড়িল ॥
চরণ ভাইস্যা গেল ছেমড়ির দুই-না আঁইখ্যের জলে।
সোহাগ, কইরা নাগর তারে তুইল্যা লইল কোলে ॥
শতকাম ফালাইয়া ছেমড়ি লড়'দা আসে জলে।
শ্যামপীরিতের লীলাখেলা এই-না মতে চলে ॥
ছেমড়া-ছেমড়ি পীরিত করে জলের ঘাটে, রইয়া।
শত্রুরবাদী পাড়াপড়সী বাড়ীত দিল কইয়া।
বড় ভাইয়ের বউরে বড় গুণবতী।
পাড়ার লোকে হগ্‌গলে কয় তাইন বড় সতী ॥
ডাকদা' বলে, 'গুণের ছেমড়ি হেথায় চইল্যা আয়।
দুইচাইরখান পীরিতের কথা শিখবাম লো তোর ঠাঁই ॥
কোন সাহসে গুণের ছেমড়ি কও লো আমার কাছে।
জ্বলন্ত আগুন তুইল্যা দিলি ফলন্ত নয়া গাছে ॥
লইজ্যা নাই নিলইজ্যা মাইয়া লইজ্যা নাই লো তোর।
ভাঙ্গা-কলসী গলায় বাইন্ধ্যা সায়রে ডুইব্যা মর ॥'
নিম বড় তিতা রে তিতা চিরতার পানি।
তার চাইতে অধিক তিতা বড়-বৌয়ের বাণী ॥
মায়ে বলে চাইয়া রে বৌ যে বলে চাইয়া।
মইরা যা লো কপালপুড়ী, বিষের পানি খাইয়া ॥

বড়-বৌয়ে ডাকদা' বলে বড় ভাইয়ের ঠাঁই।
'তোমার ভইনের মত সতী জন্মে দেখি নাই ॥
কুলের রতন বংশের রতন থাকুক বাঁচিয়া।
ঘরে রাইখ্যা পূজা কর পুষ্পচন্দন দিয়া ॥'
বড়-বৌয়ের কথা শুইন্যা বড়-ভাইয়ে কয়।
'চিক্কন মাইনষের চিক্কনী কথা অঙ্গে নাহি সয় ॥'
বড় বৌয়ে বলে, 'তোমার চরণে পরণাম।
আগপাছ ভাইব্যা তুমি একখান কর কাম ॥
কি করিব কোথায় যাব বুঝিতে না পারি।
জন্মের মতন রাইখ্যা আইস মামাশ্বশুরের বাড়ী ॥'
মা বলে কেমনে ধৈরয ধরিব অন্তর।
বাবা বলে অভাগীরে পুরীর বাহির কর ॥
নিশিরাইতে দুঃখিনী মায়ে কাপড়-গামছা বান্ধে।
আঞ্চলেতে মুখখান ঢাইক্যা বেগবেগাইয়া কান্দে ॥
অভাগিনীর মায়ে বলে ধইরা দুইখান হাত।
'খাইয়া যা লো দুঃখিনী মাইয়া এই জনমের ভাত ॥
মেঘ-না আন্ধাইরা রাইত চমকে বিজুলী।
ঝিঞ্জি-পোকায় ডাক ছাড়ে আকুলি-বিকুলি ॥
নিদয়া নিষ্ঠুর ভাই নাই দয়া-মাইয়া।
আন্ধাইরে জ্বলে চক্ষের আগুন ভইনের দিকে চাইয়া ॥
পাওখান ধুইয়া গুণের ছেমড়ি নাওখানে দিল পাড়া।
উঠিয়া বসিল যেন আশমানের তারা ॥
কাইন্দা বলে, তাঁতির ছেমড়ি, 'ওরে জালুয়ার ছাইলা।
এমন নিদানের কালে কোথায় তুমি রইলা ॥
আঁইট্যা পিন্ধলাম দীঘল-সাড়ি, ঝাইড়া বান্ধলাম কেশ।
জন্মের মত ছাইড়া যাই রে মা ও বাপের দেশ ॥
আমি যে মরিব বন্ধু ইথে দুঃখ নাই।
তোমারে সঁপিয়া বন্ধু যাইব কার ঠাঁই ॥
বাঁচি বা না বাঁচি বন্ধু আসি বা না আসি।
অভাগিনীর লাইগ্যা তুমি হইও না উদাসী ॥

অতিবলবন্ত মামা, গ্রামের মোড়ল।
ছত্রিশ ময়ালের মাইঝে তাইনের কুশল ॥
কপালপুড়ী হীরামতির কপালে সুখ নাই।
দিবানিশি বিষের জ্বালায় কাইন্দা মরে তাই।
দিনের আশা রাইতের আশা বিহনে হয় বাসি।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা গায় কন্যা দুঃখের বারমাসী ॥
'এইত পৌষ-না মাসে পুষ্প-অন্ধকারী।

নওলা ফুলের যৈবন রাখিতে না পারি ॥
কেহ চায়রে আড়ে আড়ে কেহ চায়রে রইয়া।
কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হৈয়া ॥
এইত মাঘ-না মাসে হিমাইলে ছাড়ে ডাক।
মেঘেলা বাতাসে ভিজে বাঘিনীর গাওয়ের তাপ ॥

তুমি থাক সিংহাসনে আমি থাকি বনে।
লাগাইয়া প্রেমের ডোর পরাণশুদ্ধা টানে ॥
এইত ফাল্গুন মাসে কোকিলায় করে কু।
মনে লয় উড়িয়া যাইতে আশার মদনপুর ॥
আগে যদি জানতাম তুমি যাইবা রে ছাড়িয়া।
দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া ॥
এইত চৈত্র-না মাসে খরায় পুড়ে দেশ।
তুই বন্ধুর লাগিয়া আমার পাগলিনীর বেশ ॥
বটবৃক্ষের তলায় গেলাম ছায়া পাইবার আশে।
পত্র ছেইদ্যা রদ্রি লাগে আপন কর্ম্মদোষে ॥
বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী ঢাকে পড়ে বাড়ি।
এমন দুর্দিনের কালে বন্ধু রইছে ছাড়ি ॥
পুষ্করণীতে জল নাইরে কি করবে তার সোতে।
যে নারীর পুরুষ নাই রে কি করবে তার রূপে ॥
জ্যৈষ্ঠি-না মাসের দুঃখ সহন না যায়।
মেওয়ামিষ্টি আম্র কাঁঠাল সর্ব্বলোকে খায় ॥
আমগাছে আম নাই, ইটা কেনে মার।
তোমার আমার দেখা নাই আঁখি কেনে ঠার ॥
আষাঢ় মাসের দুঃখ বরিষা গম্ভীর।
একেলা কাটাব নিশা এ জোড়-মন্দির ॥
সকলের সকলি আছে আমার নাইরে কেউ।
অন্তরে গরজি' উঠে সমদ্দুরের ঢেউ ॥
এইত শাউন মাসে অগাধ বরিষা।
গাঙ্গে-বিলে একাকার জীবনের নাই আশা ॥
নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে।
নাও আছে কাণ্ডারী নাই, শুধু ডিঙ্গা ভাসে ।
এইত ভাদর মাসে ডাহুকে করে রাও।
যেই দেশে নাই ডাহুক ডুম্বুর সে দেশ চইল্যা যাও ॥
ডাহুক মারুম ডুম্বুর মারুম পাইড়া ভাঙ্গুম বাসা।
তুই বন্ধুর লাগিয়া আমার তরুতলে বাসা ॥
এইত আশ্বিন মাসে আশায় কাটে নিশা।
দিবসে ডাকাতি হৈলে পাবনি রে দিশা ॥

গিরস্থ বৈদেশে গেলে বাড়ি পড়ে ছাড়া।
কেহ টানে চালের ছন কেহ টানে বেড়া ॥
এইত কার্তিক মাসে গিরস্থে বীজ বুনে।
তুমি না রে প্রাণের বন্ধু নিদয় হৈলা কেনে ॥
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি শওরা নলের বেড়া।
হাত বাড়াইয়া পান দিতে কপাল গেল পোড়া ॥
এইত অগ্রাণ মাসে বছর হৈল শেষ।
রইও না অবলার বন্ধু রইও না বৈদেশ ॥
তুমি হইও বুকের হার আমি গলার মালা।
তোমার সনে কইরা প্রেম বাসা কদমতলা ॥
দিনের পরে আসে দিন নিশি চইল্যা যায়।
বিরহের নিশা কন্যার তবু না ফুরায় ॥

ডাকদা বলে মামা ঠাকুর, 'শুন আভাগী মাইয়া।
কালকা তোরে বিয়া দিব সুন্দর জামাই চাইয়া ॥
এইখানে ছেমড়ির কথা বন্ধ হইয়া থাক।
ফটিকচান্দের কথাখানি বেবাক বলা যাক ॥
পুত্রেরে উড়ুক্কু দেইখ্যা মায়ের উল্লাস।
পুত্রের লাগিয়া বৌ করাইল তল্লাস ॥
সোহাগ মাগিতে যায় মা ব্রাহ্মণের পাড়া।
ছালনাতলা হৈতে তখন পুত্র হৈল হারা ॥
কেহ বলে, খোঁজ খোঁজ, কেহ বলে কি?
সবাই বলে পাগল করল বিন্দা তাঁতির ঝি ॥
ঐদিকে হইবে যখন সন্ধ্যা-লগ্নে বিয়া।
আন্ধাইরে পলাইল ছেমড়ি চক্ষে ধূলা দিয়া ॥
কেহ বলে খোঁজ খোঁজ, কেহ বলে পাইলা?
সবাই বলে পাগল করল মদনা জাওলার ছাইলা ॥
এক গাঁওয়ের ছাইলা গেল আরেক গাঁওয়ের মাইয়া।
রইল যারা তাদের মধ্যে হইল তখন বিয়া ॥
কেউ কারে দেখে নাই, মনে নাহি জানে।
আচম্বিতে হৈল বিয়া তাদের মধ্যখানে ॥
মনে-মনের মিল যাদের ছিল জানা-শোনা।
কোথায় তারা গেল চইল্যা না হইল নিশানা ॥
লোকাচারের বিয়া নিয়া সুখে বাস করে।
মনে-প্রাণের বিয়া নিয়া জলে ডুইব্যা মরে ॥

সূত্র : মাসিক মোহাম্মদী, ১৩ বর্ষ, ৮ সংখ্যা
জৈষ্ঠ্য ১৩৪৭, পৃ: ৫৭১-৭৪

প্রবন্ধ

ভারতের চিঠি-পার্লবাককে

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অনেক নারীই তোমার মতো পেয়েছে। তাদেরকে জানি, পড়েছি, ভালো লেগেছে। গুণগ্রাহিতা দেখিয়ে তাঁদের উপর বা তাঁদের বইয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতেও পারি। তবু বলবো, তোমাকে যত ভালবাসি, তাদেরকে তত বাসি না। তাদেরকে যে প্রেম-সিক্ত শ্রদ্ধা দেবার কথা কখনো ভাবি না, তোমাকে তা-ই দিতে পারি অক্লেশে।

এর কারণ জানো? তাঁরা কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। সে সৃষ্টি করেছ তুমিও। তবু তোমাদের মধ্যে তফাৎ অনেক।

সমালোচকেরা বলবেন : তাঁরা মানুষ সৃষ্টি করেছেন; প্রজ্ঞার উত্তাপে তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রিত করেছে মানুষকে, মানুষের মনকে। সে-মানুষ নিজের পরিবারে বা কাহিনী-সংশ্লিষ্ট মহলে পরিচিত। সে-মানুষ শুধুই মানুষ। তার নাড়ি টিপলে তার একক বিকাশের স্পন্দনই উপলব্ধ হবে। জাতির মর্মজড়ানো মন ও বুদ্ধি সে পায়নি। তার জাতির প্রতিনিধি সে নয়। তুমি যাদের সৃষ্টি করেছ, তারা একটা মহাজাতির এক একজন প্রতিনিধি। তাদের সৃষ্টি যদি মহৎ, তো তোমার সৃষ্টি মহত্তর। তাদের সৃষ্টি মননকেন্দ্রিক, ব্যক্তি বা সমাজকেন্দ্রিকও বলতে পারো, আর, তোমার সৃষ্টি একটা মহাজাতির আত্ম-কেন্দ্রিক। তুমি তাদের থেকে পৃথক।

এহো বাহ্য। এদেশের যারা তোমার গুণমুগ্ধ, তাদের কেউ কেউ বলতে পারে : তোমার ঘরের চারপাশে সৃজনের এত সব উপাদান পড়ে থাকতে, একটা অবজ্ঞাত, অনগ্রসর, অপরিচ্ছন্ন অতিকায় জাতির স্বরূপ রূপায়নের সংকল্প নিয়ে তুমি লেখনী ধরেছিলে। শাদা egoist-দের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করার যে স্বাজাতিক স্পীরিট, তার মত্ততা তোমাকে প্রমত্ত করার অবকাশ পায়নি। ভেতরে মার্কিনী রক্ত, বাইরে প্রতীচ্য শুভ্রতার নির্ভেজাল উপায়ন তোমার মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি; নিঃস্ব, অমার্জিত চৈনিক জীবন যেমন তোমাকে নাড়া দিয়েছিল। (ওদের মাঝখানে দীর্ঘজীবন কাটিয়েছ, তারই কি ফল এটা? এমন তো অনেক শ্বেতাঙ্গ কালাদের মাঝে বাস করে যায়, তারা তো কই এমন পারে না!)

শুধু খ্যাতির লোভ নয়, তারও উপরের অনেক কিছু ছিল তোমার মনে। আর সব নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তাদের থেকে তাই তুমি আলাদা!

কিন্তু এই কি যথেষ্ট? না দিদি।

তুমি কথাশিল্পী হয়েও যুগের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে চলেছ। ব্যক্তি ও সমাজকে রূপবান করে দিয়ে তারা মুছে না গেলেও নিত্য বর্তমানের টপি্কস এর

বিষয়বস্তু তারা ঠিক নয়। তাদের সৃষ্টিও তা নয়। তাদের সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের বুকে এক একটা স্থান চিহ্নিত করে রেখেছে, কিন্তু তোমার সৃষ্টি এমন একটা উৎসের মুখ খুলে দিয়েছে, যার থেকে একটা মহাজাতির প্রাণধারা উৎসারিত হচ্ছে, আজও, আগামী কালের জন্যও। তুমি মেয়ে হয়ে মেয়ের কাজ সমাধা করেই ক্ষান্ত হওনি, পুরুষের কাজও করে যাচ্ছো। এই খানেই তোমার স্বাতন্ত্র্য!

অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টি মাত্রই মেয়ের কাজ নয়; কাজটা পুরুষেরও, কিন্তু কি জানি কেন ধারণা জন্মে গেছে, রাজনীতিটা হচ্ছে পুরুষের কাজ। অ্যানি, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, র‍্যাথবোন এরা রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া সত্ত্বেও এরা মানব জাতির—সম পরিমাণে পুরুষ ও নারীর প্রতিনিধির কাজ করতে পারছেন না—চার্চিল, রুজভেল্ট, গান্ধী, স্টালিন, হিটলার-এর মতো লোককে দেখে, এবং তাঁদের মতো রাষ্ট্রপ্রাধান্য কোনো নারীকে লাভ করতে না দেখেই কি এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? তুমি বিচার করো।

সবটুকু বলা হলো না।

তোমার লেখনী যে মানুষগুলিকে সৃষ্টি করেছে, ঘটনাবর্তের মাঝে তারা নিরুপায়। তাদের দৈন্য আছে, ঈর্ষা আছে, সুখ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝে বেঁচে থাকার দুর্বার প্রচেষ্টা আছে। এক কথায়, তাদের জীবন আছে; তারা মানুষ। দেবতার মতো সহজলভ্য সুখ পাওয়ার কল্পনা-বিলাস তাদের চোখে স্বপ্নেও কোনোদিন ধরা দেয়নি। তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে শক্তি-পরীক্ষা করে-করে, বহু যুগের অভ্যাসের দরুন আপনা থেকেই তারা কঠিন হয়ে উঠেছে। নিত্যদিনের আঘাত তাদের এমন দুর্বার করে তুলেছে যে, মৃত্যুর আঘাতও তাদের ঘাতসহ বুকে আতঙ্কের সৃষ্টি করে না।

এদের বুক যে দিয়েছে—জানি না সে কোথায়— সে এদের দুঃখ দিতে ভুল করেনি; অধিকন্তু, এদের পাছে পাছে মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছে। এরা মরে। পঙ্গপাল এসে এদের শ্রমের ফসল নষ্ট করে। দুর্ভিক্ষ এসে উজাড় করে নিয়ে যায়। পাছে পাছে লেলিয়ে দেওয়া মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দলে দলে শহরে যায়। ভিক্ষা করে। লাথি ঝাঁটা খায়। শহরে চোর-বাটপাড়ের হাতে লাঞ্ছিত হয়। লুঠতরাজ করে। গুলি খায়। তবু বেঁচে থাকতে চায়। দেব-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে কর্মযোগের ভেতর দিয়ে করে যায় বেঁচে থাকবার দুশ্চর সাধনা। একখণ্ড ভূমিকেও হাতছাড়া করে না। প্রতীতি দৃঢ়তর হয়, জানে, নূতন দিনের আলো অবশ্যই আসবে।

এই আশায় বুক বাঁধার ইঙ্গিত তুমি দিয়েছ। তারই তরঙ্গিত সঙ্গীত একটা একক জাতির, অনন্য জাতীয় সত্তাকে আন্তর্জাতিকের পর্যায়ে তুলে এনেছে। একটা দেশের সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্লাসিক সুর ডেকে নিয়ে কাছে বসিয়ে ঘরোয়া খবর জিজ্ঞেস করেছে।

শুধু তাই নয়।

মানুষের প্রতিদিবসের দুঃখ-যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। এর সাথে অবিরত সংগ্রাম করে মানুষ কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছে। তুমি দেখিয়েছ : প্রকৃতি এই মানুষগুলিকে ধ্বংস করার জন্য নিত্যনিয়তই যেন একটা যম-দণ্ড উঁচিয়ে রেখেছে। সে অমোঘ দণ্ডকে উপেক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গেই vested interest-এর সঙ্গেও তাদের মৃত্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। সে-সংগ্রাম প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষাও সাংঘাতিক। কারণ তা সদর-দরজা দিয়ে মার-মুখো হয়ে এসে সন্ত্রস্ত ও সশস্ত্র হবার সুযোগ দেয় না। সে আসে সিঁদেল চোরের রূপ নিয়ে, আঁধারে, ঘরের কোণ ঘেঁষে।

নৈসর্গিক উপপ্লব, অজন্মা, প্লাবণ, অনাহারের সুযোগ নিয়ে সে interest দুই রূপে এসে সাঁড়াসী বার করে—এক, নগণ্য দাদনে মানুষের অমূল্য শ্রম-শক্তিকে কিনে নেয়; দুই, অবস্থার সুযোগে মানুষের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদকে নামমাত্র অর্থ দিয়ে হাতিয়ে নেয়।

শুধু এ-দুটির সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষের পক্ষে হয়ত ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সম্ভবই হতো। কিন্তু এক বৃহত্তর, ব্যাপকতর vested interest তাদের উপর যে স্টিমরোলার চালাচ্ছে, তার চাপে তারা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। বুক পিষে যাচ্ছে—তাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষুদ্রতর স্বার্থরাশির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি ক্রমেই শুষে নিচ্ছে।

এই শেষোক্ত শক্তির শক্তিশোষণের কথা তুমি তোমার সাহিত্যের পঙক্তিগুলোর ভেতরে স্থান দেবার সুযোগ পাওনি; পাওনি উপযোগিতাবোধ। কারণ, সে-শক্তির নগ্নতাটুকু এতদিন প্রকাশ পায়নি। রেশমী আবরণে প্রচ্ছন্ন ছিল।

এবারের যুদ্ধ সে-পর্দা ফাঁক করে দিয়েছে।

তোমার সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব এইখানে। এর জন্যে যেটুকু গলতি তোমার সাহিত্যে ছিল, সময়ের পরিণতিতে তা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে তুমি বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে ফেলেছ। অর্ধমৃত মহাচীনের বুকে জাপ-শকুনির মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার যে উৎসব চলছে, তারি সঙ্গে সঙ্গে, বরং আরো আগে থেকে, ইঙ্গমার্কিন vested interest-এর রক্তমোক্ষণ-কার্য পুরোদমে ও পূর্ণ-উদ্যমে চলে এসেছে, এবং মহাচীনকে বাঁচাতে হলে, তা যে চলা আর উচিত নয়, এ-দাবী তুমিই বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে তোমার সাহিত্যজগতের খেলাঘরের জীবন্ত পুতুলগুলিকে, হে মার্কিনবাসিকে, রক্ষার কাজে তুমি চেষ্টাবতী হয়েছ।

সর্বোত্তম তুমি এইখানটায়, যেখানটাতে দেখছি, যুদ্ধাস্ত্রকে ব্যাহত করার মিথ্যা একটা দোষারোপ করে, তোমার কণ্ঠ রোধ করার জন্য সেই One & unique vested interest ভরসাই পাচ্ছে না। এত বড় একটি ব্যক্তিত্ব তুমি নিজের জন্য ধরে রাখতে পেরেছ।

আজকের দিনে ব্যক্তিত্বের বড়ো দুর্দশা : মহাস্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দাও, দেখবে, সে-স্রোত আবর্তের বুকেও তোমার ব্যক্তিত্বকে করুণায় ঠিক রাখছে; বেঁকে বসো, তা হলে দেখবে সে-ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ড হয়ে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।

তারা তো মানুষ সৃষ্টি করেই খালাস; তুমি তা নও। সৃষ্ট মানুষগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যতে সংগ্রাম করার কথা তারাতো কেউ কল্পনায়ও আনতে পারেনি। কিন্তু তাদের থেকে তুমি আলাদা।

উক্ত দুই শ্রেণির, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ vested interest ভারতবর্ষকে কোথায় নিয়ে এসেছে তা তুমি, যদিও ভারতে বাস করনি কখনো, হয়ত অনুমান করতে পারবে। এই সময়ে এখানে থাকলে তুমি একখানা নূতন Good Earth লিখতে পারতে। সে হতো মহাচীনকে নিয়ে লেখার চেয়েও বেশি চমকপ্রদ, মর্মস্পর্শী ও মর্মদাহী। কারণ, আজিকার মৃত মহাভারত বিশ্বের সর্বশেষ, সর্বাধুনিক সমস্যার শাণিত আঘাতে জ্বরজ্বর। নিঃশেষে মরে যেতে পারছে না। তার উপর বিভীষণের চির-অমরতার অভিশাপ বর্তে আছে। সে কখনো মরবে না। শুধু ভুগবে; না পাবে ওষুধ, না পাবে পথ্য—পাবে খালি পদাঘাত আর গালি-গালাজ।

পথ চলতে লক্ষ অন্নহীনের ভিড় ঠেলতে হয়। তারা যেন তোমার Good Earth-এর চিত্রিত মানুষগুলিরই প্রতিচ্ছবি। না খেতে পেয়ে দলে দলে শহরের পথে পাড়ি দিয়েছে। কতক মরে কতক বেঁচে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মানুষের সহানুভূতি পাবার আশায় নানারকম সুর তুলে কাতরাচ্ছে। শিল্প কারখানাগুলিতে কাজ করে যারা যথেষ্ট বিড়ি টানবার পয়সা পাচ্ছে, তাদের মুখ-নিঃসৃত জ্বলন্ত বিড়ির শেষাংশের জন্য কাড়াকাড়ি করে। তাদের নারীদের কাপড় নেই; সেইদিকে চোখ রেখে ওরা বিড়ির টুকরো ফেলে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অফিস ফেরতা ক্লান্ত বাবুদের মুখনিঃসৃত আমের আঁটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঐ নারীরা শীর্ণ শিশুগুলির মুখে পুরে দেয়। আমের দাম বেড়ে গেছে। আঁটি দুষ্প্রাপ্য। ডাস্টবিনের পচাগলা কুকুর-বিড়াল ইঁদুরের মাংসের সঙ্গে মিশে আছে যে খাদ্যকণিকা, স্বর্ণ-রেণু, অনুসন্ধানের অভিনিবেশ নিয়ে তাই তারা খুঁজে বার করে। সাহেব বাড়ির চাকর ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিত্যক্ত পচা রুটির টুকরো ছিটিয়ে দেয় কাদার উপর। তাই নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি মারামরি করে। ধরতে না পারলে গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়।

তারপর, এই করে কিছুদিনের পর সবটুকু জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে, ফুটপাথের উপরে র‍্যাফেলওয়ালের আড়ালে শুয়ে পড়ে; একটা ব্যঙ্গের হাসি রেখে মরে যায়। আরো দুঃখের বিষয়, তাদের বিকৃত দেহগুলোকে যথাসময়ে সরিয়ে নেবার মতো সভ্য নাগরিক ব্যবস্থাটুকু পর্যন্ত আমাদের নেই।

যদি আসতে একবার আমাদের দেশে, তবে দেখতে পেতে, বই লেখার কি চমৎকার উপাদান—রাশি রাশি জমাট বাঁধা মাল মসলা এখানে পড়ে আছে। আমাদের তেমন দৃষ্টিশক্তি নেই। তাই এতসব দৃশ্যকেও উপেক্ষা করে আমরা ঠিক বেলা দশটায় আহার সমাধা করি, রাইটার্স বিল্ডিংসগামী ট্রামে পান চিবুতে চিবুতে উঠে, 'আনন্দবাজারে'র ভাঁজ খুলি। বেশ আছি আমরা!

মহাচীনকে নিয়ে যে-সৃষ্টি তুমি করেছ, সে-সৃষ্টির সাথে, মহাভারতে বসে যা সৃষ্টি করতে তার সব ব্যাপারে মিলে গেলেও, কয়েকদিক থেকে মিলতো না—তা জানিয়ে রাখছি। জেনে রাখো : এরা শহরে এসে ভিড় করেছে সত্যি, কিন্তু লুঠতরাজ এরা করবে না কোনো কালে। ক্ষুদ্রতর vested interest-কে রক্ষা করা বৃহত্তর vested interest-এরই কর্তব্য। তাই চীনে তোমার চীনা Good Earth-এ যেমন হয়েছে।

> "এখানে তারা লুঠপাট করলে তাদের উপর হয়ত লাঠি-গুলি সবই চলবে, এবং তাদের বর্তমান অবস্থা সেই লাঠি গুলি অপেক্ষা অধিক লোভনীয় মনে করবার কারণ নেই বলে তারা কি জানে না? তবু তারা এ-কাজ করবে না। এ তাদের ধাতে নেই বলে করবে না। একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের দুই শতাব্দী ব্যাপী জড়ানোর চাপে এরা দুর্গতি-অবসানের দুঃসাহস হারিয়ে ফেলেছে।"

— তুমি যদি আগাম এই কথা লিখে দাও তোমার বইতে তা হলে সে-বই বাজেয়াপ্ত হবে। তোমার প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতবর্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্ররোচনা দেওয়ার অজুহাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি না পেয়ে, তুমি বরং আন্তর্জাতিক অখ্যাতিই পাবে। অথচ দেশে যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপাদান নীতির বলে জিইয়ে রাখছে, সীজারের স্ত্রীর মতো তারা সর্বদোষমুক্ত।

আরো একটা কথা ধরে রাখো : যে-সমস্ত বই চীন সম্বন্দে লিখে তুমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছো, সে-বই ভারতবর্ষকে নিয়ে লিখলে, তুমি আর যাই পাও নোবেল পুরস্কার যে পেতে না, তা বিনা দ্বিধায় বলার অধিকার আমাকে তুমি দিতে পারো। কারণ আমাদেরকে তুমি যতখানি জানো না, আমরা নিজেরা ততখানি জানি বলেই বলছি, তোমার খ্যাতি তাতে বিলেত পর্যন্ত পৌঁছত কিনা সন্দেহ।

আচ্ছা দিদি, বলতে পারো এই বৈষম্যের কারণ কি? এই বৈষম্যকে যদি তুমি দুষ্টনীতি বলে মেনে নিতে পার, তা হলে বলবে কি আমায়, এর বিরুদ্ধে যুঝতে যাওয়া কি কোনো জাতির পক্ষে অস্বাভাবিক কাজ? তবু তুমি ভারতের ন্যাশনালিস্টদের সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারনি কেন?

কেন, সেকথাও আমরা জানি। রাগ করো আর যাই করো, সত্যের অনুরোধে কয়েকটি তিক্ত কথা বলবো তোমায়।

চীনের কথাই ধরো না কেন। বন্যা এসেছে। হু হু করে জল বাড়ছে। মানুষগুলি সন্ত্রস্ত। তাদের সব সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শীতে তারা কাঁপছে। আরো বেশী করে কাঁপছে অত্যাসন্ন মৃত্যুর ভয়ে। এখনি এই মুহূর্তে আর একটা কল্লোলধারা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। উপায় নেই। তারা আকাশের দিকে চাইছে—এখনি শেষ মরণ-চীৎকার দিয়ে তলিয়ে যাবে। আর একটু—আর একটু—আর একটু—ব্যস্; আর একটু হলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

এমন সময়ে দেবতার আশীর্বাদের মতো এলো একটা নৌকো। তারা মার্কিন। তাতে আছে এক পাদরি। তারা তুলে নিয়ে গেল মরণযাত্রীদেরকে মরণের মুখ থেকে তাদের নৌকোয়।—এমনি ধরনের একটা গল্প কি তুমি লেখনি? কেন তাদের মরে যেতে দিলে না? তাদের মরে যেতে ক্ষতি কি, যদি নিজের চেষ্টায় বাঁচতে না পারলো? বিদেশী মিশনারীর হাতে আত্মিক মৃত্যুলাভ অপেক্ষা সলিলাবর্তে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু অন্তত গৌরবের দিক দিয়ে কম কিসে?

না, তারা মরবে না। vested interest-এর কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার জন্য তাদেরকে বেঁচে থাকতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা : বেঁচে থাকার যে আলো তারা দেখতে পেলো চারদিকে ঘনিয়ে আসা মৃত্যুর অন্ধকারে, সে-আলো তাদের আত্মার কোনো বিশেষ সম্পদকে কি কেড়ে নেয়নি? কোনো এক অতি-সূক্ষ্ম আত্মিক বিষয়ে তারা কি একটুখানি, এমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়নি যা পূরণ করার ক্ষমতা তাদের নেই, বৃটিশ বা আমেরিকার মতো শক্তিমান রাষ্ট্র তাদের নেই বলে?

তুমি স্বাভাবিক কাজই করেছ। এটুকু না দেখালে তুমি অপূর্ণ থেকে যেতে। এতে তোমার বীর্যের মর্যাদা রক্ষা পেতো না। সত্য কথা বলতে কি বীর্যের এই সবলতাটুকু তোমাতে ছিল বলেই তোমাকে আরো বেশি করে ভালবেসেছি। এতে তুমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছ। আন্তর্জাতিক জগতে এই বলিষ্ঠ বীর্যবোধই তোমার 'ভয়েস'কে জোরালো করতে সাহায্য করেছে। তোমার কাছ থেকে এ জিনিসটুকু আমাদেরো শেখা উচিত, দুঃখের সহিত এ স্বীকারোক্তি করছি।

সি. এফ. এন্ডরুজ প্রমুখ মনীষী-মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি যাঁরা আমাদের হয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয়-মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁরা একটা পরাধীন দেশের এত উপকার করলেও আমাদের দিকে চেয়ে বলতে হচ্ছে, তাঁরা বীর্যের অভাব দেখিয়েছেন! মাদাম চিয়াং কাইশেক বেড়াতে এসে কতকক্ষণের জন্য শাঁখা-সিন্দুর পরে বীর্যের অভাবের সাথে আরো একটু দুর্বলতা যোগ করে গেছেন, এও আমাদের বোধগম্য না হবার নয়, তোমাদের তো নয়ই—যদিও বিষয়টি সূক্ষ্ম।

তুমি মার্কিন এ কথা তোমার ভুলে গেলে চলে না। তেমনি আমরা ভারতীয়েরা ভারতবাসী, চীনারা চীনবাসী—এ কথাও ভুলে যাওয়া সম্ভব কি?

—এসব ঠাট্টার কথা হলেও, তোমরাই এসব কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ। অন্তত তোমাদের রাষ্ট্রকর্ণধারেরা তো হামেশাই দিচ্ছেন!

তোমাদের ভারতসচিব আমেরির কথাটা একবার শুনেছো?

"Our whole policy in India, our whole policy in Egypt, stand condemned if we comdemned Japan."

এর সঙ্গে চার্চিল-সাহেবের কথাটাও যোগ কর :

"আমি কি সাম্রাজ্যের দেউলিয়া-গিরিতে সরদারী করতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছি?"—ভারতের স্বাধীনতা-দাবীর এই জবাব!

এরপর ভারতের পক্ষে এই দুই কর্ণধারকে বিশ্বাস করা সম্ভব কি? ভারতের ভবিষ্যৎ এই মানুষ দুজনার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকা, যে-জাতির প্রাণে একটুখানি স্পন্দন আছে, সে-জাতির পক্ষে কেমন করে চলতে পারে? তুমি শাঁখা-সিন্দুর পরে আমাদের হওনি। মিস মেয়োর মতো নর্দমাও ঘাঁটোনি। তোমাকে এ প্রশ্ন করার তাই অসার্থকতা দেখছি না।

ভারতের জাতীয়-আন্দোলন ও উহা দমনের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তুমি বিচক্ষণ, তুমি নিজেই বুঝতে পারো : পৃথিবীর শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের মৃত্যুপণের বেগ নিয়ে হাত-পা নাড়া দিয়ে ওঠা যেমন নূতন নয়, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদেরকে দমিত রাখবার উদ্দেশ্যে পাখির মতো হত্যা করাও পুরাতন ব্যাপার—এ কথা সত্য কি না।

রাজ্য—বা—সাম্রাজ্য—তন্ত্রটাই এমন জিনিস, যাকে টিকে থাকবার জন্যে তাকে আগে রাখতে হয় মর্যাদা রক্ষারও পর্যাপ্ত ভয় দেখাবার ক্ষমতা, তারপর তার রক্তপিপাসু হয়ে ওঠার মতো নৃশংসতা—না হলে তার কণ্ঠ অনেক আগেই জনতার চাপে নিষ্পেষিত হয়ে যেত।

তোমরা বলবে, ভারতের 'ন্যাশনালিস্ট'রা ভুল করেছিল। অবশ্য খাঁটি ন্যাশনালিস্টরাই যে এ-আন্দোলন করেছিল সে-সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। যেহেতু তাদের ঘাড়ে 'দোষ' চাপানোর পর নিরপেক্ষ, প্রকাশ্য বিচারে বেরিয়ে আসতে vested interest-ধারীরা রাজি নয়, কেন, তার সন্তোষজনক উত্তর দেবারও তোয়াক্কা তারা রাখে না। তবু সরল চিত্তে যারা সব কিছু স্বীকার করতে পারে, তাদের হয়ত স্বীকার করতে কষ্ট হবে না, খাঁটি creed-মাফিক ন্যাশনালিস্ট না হলেও, এ কাজ যারা করেছে, তারা কতকটা ন্যাশনালিস্ট স্পীরিট নিয়ে করেছে একথা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়।

হয় তো তোমাদের কথাই ঠিক যে, তারা ভুল করেছিল। কিন্তু এ কথা তুমি অস্বীকার করে বসবে না তো যে ভুল মানুষেরা করে, প্রেতেরা করে না।—এমত অনেক ভুলেরই মতো এ-ভুলটাও করা সৃষ্টির আদি থেকে মানুষের মজ্জাগত ব্যাধি। আর, এ সব ভুলের জন্য অনেকে পুজোও পেয়েছে, ইতিহাসে তার নজির হয়ত তুমি পেয়েছ। জিজ্ঞাসা করি, যে-ভুল করে মানুষ পুজো পায়, সেই একই ভুলের জন্য মানুষ গুলি খেয়ে কেন মরে! এই গুলি-করে মারাও যে একটা ভুল নয়, তার মীমাংসার জন্য ন্যায়-শাস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে না কী?

আবার বলছি : রাজ্য—বা—সাম্রাজ্য—তন্ত্রটাই এক সাংঘাতিক চীজ। যে শ্রেণির স্বকীয় আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে রোমের সম্রাট নীরো মৃত্যুহীন অগৌরব লাভ করেছেন, যে আদর্শ বয়ে বয়ে রাশিয়ার জার নিজের অজ্ঞাতে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব আসার পথ করে দিয়েছিলেন, বর্তমান যুগের 'ইজমে'র পোষাক পরা সাম্রাজ্য বা নাৎসীপ্রথা কি

তারই উত্তরাধিকারী নয়? অবশ্য কালক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের মনোবিকর্ষণের ধাপে ধাপে চলতে গিয়ে তাকে অনেকটা সভ্য ও মার্জিত রূপ নিতে হয়েছে। নিতে হয়েছে বেঁচে থাকবারই প্রয়োজনে।

নীরো বা জারের আমলের ভোঁতা রূপ নিয়ে এই সুসভ্য যুগের মানুষের বুকের উপর দিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন যে-জিনিসকে ভারে কাটা যেতো, এখন কালের পরিণতিতে এবং মানুষের মন ও চিন্তার পরিবর্তনে, সে-জিনিসকে ধারে কাটতে হয়। এই জন্য সে-অস্ত্রের অগ্রভাগ এখন শক্ত আর সূক্ষ্ম করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিশ্বপরিবর্তনের মুখ চেয়েই তার এই পরিবর্তিত রূপ সে গ্রহণ করে আসছে।

এক-একটা মহাযুদ্ধে অনেক কিছু ওলট-পালট করে। এবারের মহাযুদ্ধের পরেও কি বিজ্ঞান, কি সংস্কৃতি, কি সমাজ, কি মানুষের মনোজগতের বিধি-ব্যবস্থা সব কিছুই পরিবর্তিত হয়ে একটা নূতন রূপ নেবে, একথা ঠিক। এবং সেই পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য হয়ত তাকেও আরও মার্জিত, আরও পালিশ–সহনশীল, আরও আপাতদৃষ্টিসুখকর পরিচ্ছদ ধারণ করতে হবে। মুখে হয়ত আরো একটু মিষ্টি, বিভ্রান্তিকর হাসির প্রলেপ মাখা থাকবে তার। তবু তো সে হবে সেই আদিম বর্বরতারই উত্তরাধিকারী–নয় কি?

মানুষের বা জাতির উপর মানুষের বা জাতির জোর করে কর্তৃত্ব করা এবং সে-কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে বর্বরতা বললে যদি তুমি ব্যথা পাও, তাহলে তোমাদের কাছে ও-বস্তুটিকে বর্বরতা না বলে সভ্যতাই না হয় বলবো।

ফিউডালিজমের এই দুর্দান্ত শিশুটি পৃথিবীর নানা দেশে নব নব রূপে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কোনো মানুষের শুক্র যেমন বংশ-পরম্পরায় তার একটা নির্ভেজাল ধারা (অবশ্য তার ক্ষেত্র যদি অবিশ্বাসী না হয়, তবেই এই সঙ্কর হওয়ার ভয় থেকে সে মুক্ত থাকে) সৃষ্টি করে যাচ্ছে,–(এক অর্থে একই জিনিস, একই seed ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে প্রাণবান হয়ে উঠছে তো)–রাজ্য-সাম্রাজ্যতন্ত্রের দুষ্ট শিশুটিও তেমনি এক সমধারায় কোন্ আদি যুগ থেকে নব নব ক্ষেত্রে জন্মলাভ করে বর্তমানের রূপ পেয়েছে। একটু ভদ্র রূপ পেয়েছে, কিন্তু দুষ্টুমি তার একটুও কমে নি। একটুখানি বুদ্ধি বেড়েছে উপযুক্ত স্থান-বিশেষে সে-বুদ্ধি প্রয়োগ করার অনেকটা পাকামো গজিয়েছে এই যা।

হিন্দু পুরাণ পড়া থাকলে জানতে পারতে, রক্তবীজ দানব এক এক ফোঁটা রক্ত থেকে কেমন গজিয়ে উঠেছিল। একে মেরে শেষ করা যাচ্ছিল না। যত মারা হচ্ছিল, তার থেকে অনেক অধিক সংখ্যায় গজিয়ে উঠছিল। আমাদের আলোচ্য শিশুটি সেই দানবীয়তার কাছ থেকে বীজাণুবহুল অমরতা পেয়ে এসেছে।

আর এ যুগের–বাহ্যত এটা দৈত্যদানার যুগ নয়–সামুদ্রিক জীব অক্টোপাশের কাছ থেকে পেয়েছে জড়াবার বিপুল শক্তির ইঙ্গিত। এরই বীজবহুল রক্তবিন্দুকে সম্বল করে নিয়ে ইংরাজরা সূর্য অস্ত যায় না এতবড় বিশাল আত্ম-বিস্মৃতি লাভ করেছে। এরই

উত্তেজনায় পাগল হয়ে এককালে সেরা সেনরা দেশের পর দেশ রক্তে প্লাবিত করেছিল। ভারতের পৌরাণিক যুগের রাজাদের থেকে শুরু করে আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, তইমুরলঙ, ইব্রাহীম লোদী, সুলতান মাহমুদ রক্তস্রোতে রাজপথের পর রাজপথ ভাসিয়ে দিয়েছে, নেপোলিয়ন সৈন্যসেনা নিয়ে এরই তাড়নায় প্রবৃত্তিমার্গে ছোটাছুটি করেছে। মুসোলিনীর আবিসিনীয়া–বিজয় বা হিটলারের সাম্প্রতিক ইউরোপে আত্মবিস্তৃতি তো তারই 'ইন্টারপ্রিটেশন।'

আরো মজার ব্যাপার এই যে, প্রভূত আত্মদানের বিনিময়ে যে-আমেরিকা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল, সুদূরপ্রাচ্যে vested interest-এর বজ্রবাহু জড়িয়েছিল, সেই ভুক্তভোগী আমেরিকা সেই একই আদর্শের প্রেরণায়, সেই একই আদর্শের তল্পিধারত্ব শক্তভাবে কায়েম রাখার জন্যই বৃটেন বলতে পেরেছে–বর্তমান যুদ্ধের (এটা নাকি জন-যুদ্ধ) উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। জার্মানী যেসকল জাতিকে শৃঙখলাবদ্ধ করেছে তাদেরকে মুক্ত করাই কিন্তু প্রয়োজন, ভারতকে মুক্ত করে দেবার প্রয়োজন নেই। ভারত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চেয়েছে, জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুঝবার স্বাধীনতা চেয়েছে–কিন্তু সে-চাওয়ার জবাব দেওয়া হচ্ছে নির্মম ভাবে–এও সেই একই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবাদিতার পরিচয় নয় কি?

সাম্রাজ্যবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি এক একটা বিরাট অর্গেনিজেশন জন-শোষণের যা কাজ করছে; তাদের যে অগণ্য সন্ততিসকল দেশ ছেয়ে আছে, জন-শোষণের ক্ষেত্রে তারাও কম কাজ করছে না। পুঁজিদার, ব্যবসায়ী, কল-মালিক, ভূম্যধিকারী, কৃষক-খাটানে জমি-মালিক–মানুষের শ্রম, সম্পদ ও সুখশান্তি অপহরণে তারা কেউই কম পটু নয়। এরা প্রত্যেকেই বৃহত্তর vested interest-এর অসংখ্য খুঁটি। একে মাথায় করে উঁচু করে তুলে ধরে রেখেছে এরাই। তাদের কাঁধে পা রেখেই-না সে সগর্বে নিজের জয় গাইছে। এদের স্বগোত্রীয় কার্যকলাপের ফলে যারা অত্যাচারিত, নিগৃহীত ও হৃতসর্বস্ব হয়েছে, তাদের দিকে দৃক্‌পাত করে অনেক জননেতা ঐ বৃহত্তর কায়েমী স্বার্থের হাতে বেদম মার খেয়েছে। খেয়ে, কেউ কেউ প্রতিনিবৃত্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ হয়নি। হয়নি যারা, তারাও এ পর্যন্ত এমন কোনো সঠিক কার্যপদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি, যার দ্বারা সেই সর্বগ্রাসী অজগর মরে গিয়ে লাখ লাখ প্রাণীকে বাঁচাবে, তার মর্মান্তিক আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর অর্ধাধিক মানুষ সুস্থ হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।

প্রকৃত মানবতাধ্বংসী এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনতনয়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক একদল অভিযাত্রী যুগে-যুগে দুর্গম দুঃসাধ্য অভিযানে বেরিয়েছে। কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছে, কেউ কেউ এর কাছ পর্যন্ত পৌঁছবার পূর্বেই উষ্ণতা হারিয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে; কারাওবা এর বিরাট বপুর এককোণে আপন সত্তাকে আবিষ্কার করে অধোবদন হয়েছে এবং এর কাঁধেই গিয়ে কাঁধ মিলিয়েছে। এর সাথে সংগ্রামে কেউ এঁটে উঠতে পারেনি।

এর কারণ,—এরা দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী ঠিক, কিন্তু দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতই দেখা গিয়েছে এদের প্রচেষ্টা। একদমে যতদূর দৌড়তে পেরেছে দৌড়িয়েছে, তারপর স্প্রিং-এর জোর কমে গিয়ে ধরাশায়ী হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেশীর তরফ থেকেও বাধা কম আসেনি।

মোটের উপর এর জড়-শিকড় যে যে স্থান থেকে রস-সঞ্চয় করেছে, নিজে বাঁচবার জন্য, সেই-সেই স্থানে একটা নিঃস্ব আত্মসমর্পণের ভাব জাগিয়ে রেখেছে।—একে সাহায্য করারও এমনি মোহ যে, যে একবার তাকে কিছু দিয়েছে, সবটুকু উজাড় করে দেবার তার একটা প্রবণতা এসে যায় আপনা থেকেই। তেমনি এর শাখাপ্রশাখা যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তারাও একে কিছু দেবার জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত হয়ে থেকেছে।

আবার এর পক্ষপুটে যেয়ে যারা প্রাণ পাচ্ছে, বেড়ে উঠছে, তাদের তো কথাই নেই। তারা আত্মবিপন্নবোধের আশঙ্কায় এর প্রতিকূল সব কিছুকে নাশ করে দেবার জন্য নিঃশেষে আত্মদান করতে প্রস্তুত। কাজেই এর এতখানি কৌলিণ্য ও মর্যাদার নিকট দম-দেওয়া কলের প্রচেষ্টা বার বার প্রতিহত হয়েছে।

এত হাতে সৈন্যের প্রাণ উচ্চমূল্যে বিকোচ্ছে, যন্ত্রশালায় মোটা অঙ্ক ধার করতে এর ভাণ্ডারে যথেষ্ট কাঞ্চন সঞ্চিত আছে। চক্রবৃদ্ধি হারে পরমায়ু বাড়িয়ে নেবার যথেষ্ট সংস্থান এর হাতে মজুত রয়েছে। পক্ষান্তরে এর প্রতিপক্ষের সম্বল শুধু একটা জন-কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা। এর মাইনে দিয়ে সৈন্য পুষবার ক্ষমতা নেই। যা কিছু এর অল্প স্বল্প সৈন্য বিনা মাহিনায় শুধু ত্যাগের প্রেরণায় প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে। এদের পরমায়ু বৃদ্ধির সংস্থান নেই। তাই এরা প্রচেষ্টার মাঝ পথে মরে গিয়ে চুপ মেরে যাচ্ছে। যে গণ-কল্যাণের দায়িত্ববোধ এদেরকে সব সময়ে খুঁচিয়ে উৎপ্রেরিত করে রাখে, সেই জনগণের কাছ থেকেই কিন্তু তারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় সাধারণত। কতক উৎকোচে, কতক ভয়ে, আবার কতক নূতনত্ব গ্রহণ পরান্মুখ সহজাত প্রবৃত্তির বশে এদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছে।

যেখানে ভয় বা উৎকোচ কোনো কিছুতেই জনগণকে দমাতে পারেনি—একমাত্র সেই দেশেই আমরা সেই বিরাট শিশুর অপমৃত্যু দেখেছি। কিন্তু সে-দেশকে, 'ছোঁয়াচ'-লাগার ভয়ে তোমরা সর্বক্ষণই অপাংক্তেয় করে রেখেছ। তাকে ঘৃণা কেবল তোমরাই করনি, ঘৃণা করতে অপরকেও শিখিয়েছ। আমরা কিন্তু নিজেদের বাঁধন-খসার আনুকূল্যের আশায় তাকে চিরদিনই সমর্থন করে আসছি। একে সমর্থন করার দায়ে তোমাদের নিকট গালই শুধু খাইনি, তোমাদের প্রাক্তন শক্রশোণিতধারীদের হাতে মারও অনেক খেয়েছি।

নিজস্ব প্রকৃতির আত্মিক বলটুকু বজায় রেখে তোমরা যেমন তার সাথে মানিয়ে চলতে পারনি, তেমনি প্রসারণ বিশারদ নাৎসীবাদও তার সাথে রফা করে চলাকে নিজেকে অপঘাতমৃত্যুর সামিল মনে করেছে। কাজেই যে যে স্থানে সেই বিরাট শিশুর

শোণিতবিন্দু পড়েছে—পড়েছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র—সব দেশই তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। দুই সমান তেজ ও শক্তিবিশিষ্ট গজ-কচ্ছপ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো, তখন অঘটন-ঘটন পটু ভগবানের যাদুর প্রভাবে—কিসের সঙ্গে কাকে জুড়ে দেবার তাঁর উৎকট প্রাকৃতিক খেয়ালের বিলাসে, তোমরা সে-দেশকে স্বদলে পেয়ে গেলে এবং তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে জগৎকে তাক লাগিয়ে দিলে। পৃথিবীর অর্ধেক লোকের মনে তখন থেকে একটা অস্পষ্ট আশা জেগেছে—এবং সে-আশা এখনো তাদের মন থেকে মুছে যায়নি।

সে সাধু-আশা এই যে, এবার বুঝি সেই বিরাট শিশুর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। যারা তোমাদের চির বৈরী ছিল, দুনিয়ায় যারা সাম্যের আলো জ্বালাতে চায়, তাদের কথা বলছি—এবং স্বভাবতই যারা নাৎসীবাদ ফ্যাসিস্টবাদ প্রভৃতি জঘন্য পদার্থেরো বৈরী এবং পাশ্চাত্য শোষণ-বাদের প্রভায় প্রভাবান্বিত আত্ম-বিস্তৃতিশীল জাপানেরো বৈরী—তোমাদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে যারা অনেক শক্তি ক্ষয় করেছে—এবং সে শক্তিক্ষয় বৃথাই করেছে—এবং যারা তোমাদের বিপদে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসার কথা মনেও ভাবেনি, বরং তোমাদের বিপদে উল্লসিত হবার কথাই ভেবেছে,—তাদেরও জীবনে এলো এক নূতন আশার আলো। তারা সত্য মনপ্রাণ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। তোমাদের শত্রু—কাজেই মানবতার শত্রু— যে শত্রু মানুষকে মানুষের অধিকার দিচ্ছে না, খালি কেড়ে নিচ্ছে, সেই ফাসিস্ট শত্রু—মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতার শত্রুকে চিরদিনের জন্য অচল করে দেবার উদ্দেশ্যে বন্ধুভাবে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়েছে।

তাদের যার যতটুকু সাধ্য ছিল, সেটুকু দিয়েই তোমাদের সাহায্য করার জন্য ছুটে এসেছে। তোমাদের পক্ষ মুখে মিষ্টি বুলি ঝেড়ে মনে যতই তরুণশীলতার পরিচয় দিক না কেন, এ দল কিন্তু তাদের কাজ হাসিল করে নেবার সঙ্কল্পে অটল। এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরূপে জিইয়ে রাখার জন্য তোমরা যতই আট-ঘাট বেঁধে চল না কেন, ছিন্ন-তুষারের মতো সব ভেসে যাবার আভাস তারা দেখতে পেয়েছে। তারা এ যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবার জন্যে সন্ধানী দৃষ্টি খোলা রেখেছে। কারণ এরা প্রকৃত জনযুদ্ধের মাঝে ফ্যাসিস্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দুয়েরই মৃত্যুর আভাস দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে সে স্বপ্নচ্ছবি যতই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, ততই তারা এ যুদ্ধে আমাদের এমন সব বজ্রদৃঢ় শ্লোগান তুলে দৃঢ় আন্তরিকতার সহিত তোমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছে।

এখন, এ আন্তরিকতা তোমাদের কাছেও একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, সত্যি সাম্রাজ্যবাদ যাবে নাকি? এ ব্যাপারে তোমাদের একদল চিন্তাশীলের প্রচেষ্টা সত্যি স্মরণীয়। আর তোমরা এরই মধ্যে যুদ্ধের দায়ে কিছু কিছু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছেড়ে দেবার কথাও ভাবতে শুরু করেছ। যেমন ভারতবর্ষে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করার স্বপ্নও তোমাদের অসহনীয় বোধ হচ্ছে। কিন্তু

অনিচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র ত্যাগ অনিচ্ছাকৃত বৃহৎ ত্যাগকে খসিয়ে নিতে পারেই না, তার শেষে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। তাই আমরাও নিরাশ হই না।

তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত মাথার অধিকারী; তাদের মনে দোলা দিয়েছে, সত্যিই কি এই শিশুর অপমরণ ঘটবে? ঘটবে যদি ঘটুক না। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান নয় তাই তাদের ভয়েস কার্যক্ষেত্রে এখনো রূপ পাচ্ছে না। কিন্তু তুমি তো জানো গুটিকয় রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিত্বের কালও সীমাবদ্ধ!—জনমনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যাদের দিবারাত্রির কল্যাণ চিন্তা রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্রে আজ ভাষা পাচ্ছে না, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাই একদিন যে গণচিত্তের উৎসমুখ দিয়ে—দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে না তা বলতে পার কি?

তাই তোমাদের সাধুসজ্জনদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক : একদিন যার মৃত্যু হবেই, আজই কেন তার মৃত্যু হোক না। তাই তোমাদেরও প্রবল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে : এ আপদ থাকবে কি যাবে!

একে তোমাদের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন বলব কি? চিন্তা জগতে এ আলোড়নে যে-বিপর্যয়ের সলিলোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে তার ফলাফল কত করাল, কত সুদূরপ্রসারী, এ নিয়ে তোমার একটা বই লেখা উচিত।

যে-শিশুর মৃত্যু-সম্ভাবনায় এরকম সাধু কামনা পোষিত হচ্ছে,—এরা জানে না সে কত বড় চালিয়াৎ, কতখানি সে জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। একে মারতে গেলে তার শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে—তার আওতায় যে-সকল ক্ষুদ্রতর কায়েমী শিশুর দল পুষ্ট হচ্ছে তাদেরও গঙ্গাযাত্রা আশু প্রয়োজন। এসব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, সে যখন আর কোথাও দাঁড়াবার অবলম্বন পাবে না, শিকড় গভীরে ঢুকিয়ে দিয়েও সঞ্চয়ের জন্য রস পাবে না, এবং বিস্তীর্ণ বিশ্রান্তিকর পত্র-প্রশাখা ছড়িয়ে আহ্বান জানালেও তার তলায় যেদিন আশ্রয় প্রার্থীর ভিড় জমবে না, সেদিন দেহে মনে শুকিয়ে মরা ছাড়া তার আর অন্য উপায় থাকবে না।

তোমরা বিশ্বের সমস্যা নিয়ে খুবই তো মাথা ঘামাচ্ছো, vested interest-এর আওতায় জনগণের ও গণমতের কাহিল অবস্থা দেখে তোমরা, বিশেষত তোমার মত দরদী শিল্পীরা, অনেক অশ্রুইত ঢেলেছ। সর্বহারাদের থেকে কেড়ে খাওয়ার জন্য, তাদের বিপদের সুযোগ নিয়ে তাদের শ্রমকে নিজের কাজে লাগাবার জন্য তাদের সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করবার জন্য যে সকল স্বার্থীর দল ওৎ পেতে থাকে, তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সর্বহারাদেরও মনোবল আছে—এ ইঙ্গিতও তো তোমার কথাসৃষ্টির মাঝে সুস্পষ্টভাবেই করেছ।

অতঃপর কি কর্তব্য, তা নিয়েও তো অনেক চিন্তাশক্তি ব্যয় করেছ। এজন্য মানব মনের শ্রদ্ধা তোমার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু শুধু চীনকে নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। মহাচীনের মতো অনেক দেশই তো মহাস্বার্থের মরণ-কামড়ে ধুঁকছে। তাদের কি জানতে শুনতে নেই? এক মহাচীনকে অমর করে, বাকী তাদের সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়

দিলে তো তোমার "মিশন" পূর্ণ হবে না। মহাচীনের স্বাধীন সত্তা আজো সর্বসাকুল্যে খর্ব হয়নি, তার সম্বন্ধে তার কল্যাণের দিক চেয়ে, ইচ্ছা মাফিক বই লিখেও তুমি বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন পেয়েছো। আর যাদের স্বাধীন সত্তা সর্বানুকূল্যে খর্ব হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে ইচ্ছামাফিক বই লিখে (এ-ইচ্ছা যে সর্বহারাদের স্বার্থের অনুকূল হবে, এবং কাজে কাজেই কায়েমী স্বার্থীদের পুঁজি সংরক্ষণের পথ এতে বিঘ্নসংকুল হতে বাধ্য এ তো জানা কথা) সে-সম্মান তো পাবেই না।

হয়ত এজন্য তোমাকে বিপদের ঝুঁকিও মাথায় নিতে হবে একথা আগেই বলেছি। এই যে পক্ষপাত, এর সমাধান কোথায় ভেবে দেখা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তোমাদের যাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা আছে, voice আছে, তারা ভাবলেই বিষয়টা জোরালো হবে এবং বিশ্বনিয়ন্তা রাষ্ট্রপ্রধানদের চিন্তাক্ষেত্রে আলোড়ন আসতে সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বই লেখো এ আহ্বান তোমাকে জানাচ্ছি না ভারতের মর্যাদার খাতিরেই। মিস মেয়ো ভারতের একটা দিক দেখে গিয়ে এক বই লিখে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি ও কিছু কিছু অখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তোমার চিন্তা সে-ধার দিয়েও যাবে না, তোমার কল্যাণ-বুদ্ধি মানুষের অকল্যাণের প্ররোচনা দিতে পারে না জানি—তবু তুমি মার্কিন, এংলোসেক্শন রক্ত তোমার শিরায় বয়ে চলেছে। ভারত যখন বন্যায় ডুবে যাবে, তখন এক জাহাজ মিশনারী এনে ভারতবর্ষ বাঁচাবার ইঙ্গিত যদি তুমি দাও, মহাচীন সেটা কতটুকু প্রাণ দিয়ে মেনে নিয়েছে জানি না—আমরা সেটা মেনে নিতে মনে মনে খুবই ব্যথা পাব। অবশ্য সাগর-পারের সাম্রাজ্যবাদ যাদের মনের গহনে নিহিত, সহজাত সাম্রাজ্যবাদপ্রীতির প্রবৃত্তিকে যারা লালিত করে এসেছে, তারা এতে কি মনে করবে জানি না। তবু চীনের মতো এবস্তু মেনে নিতে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগবে, তার কারণ আমাদের সবগুলো মানুষ এখনো তার মতো আফিংখোর হয়ে উঠেনি।

আমি শুধু বলতে চাই, তোমার Good Earth-এরই মালমসলা চরম রূপ নিয়ে এদেশে আহরণের চেষ্টা খুঁজছে। এবং এ-নিয়ে বইটার একটা দ্বিতীয় খণ্ড তুমি লিখলে, তোমার নোবেল প্রাইজের অর্থ প্রত্যার্পণের দাবী ওঠার সম্ভাবনা আছে—এটা যে-যুগ, তাতে এও অসম্ভব নয়।

মিলিটারী মেজাজ বিশ্বের বুকে যে-ক্ষতের সৃষ্টি করে চলেছে, তার জন্য শান্তির প্রলেপ তৈরি করার কাজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নয়; সে-কাজ চিন্তাশীল মননশীল জগতের। এ জগতে যারা বিরাজমান তারা যে-কোনো দেশের যে-কোন শক্তিরই অন্ত র্ভুক্ত হোক না কেন, তাদের চিন্তা ও ভাবধারায় একটি বিশ্বজনীন কল্যাণ প্রচেষ্টা থাকা চাই। তা না থাকলে মনীষা জগতের অর্থই অনর্থসূচক হয়ে পড়ে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসক শক্তিবর্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করেছে, এবং তাদের একের উদ্দেশ্য যদিও নিঃসন্দিগ্ধভাবে অন্যের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী—বিরোধী, কেন না প্রত্যেকেই তারই দেশের সমাজের ও রাষ্ট্রের হিতের দোহাই

পেড়ে যুদ্ধ করছে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব নীতিকে বলছে সর্বোত্তম এবং তারই সমর্থনে প্রতিপক্ষকে ফেলছে শয়তানের পর্যায়ে। তবু সামরিক জগতের উর্ধে যে-জগত, সূচঁ-সূতো হাতে নিয়ে জোড়াতালির কাজে উদ্যোগী হয়ে আছে, এবং ক্ষতাদগ্ধ ধরিত্রী করুণ নেত্রে যাদের দিকে চেয়ে আশায় বুক বাঁধছে, তাদের চিন্তা আদর্শ দেশভেদে বিভিন্নরূপী হলে তো চলবে না।

অতীতেও দেখা গিয়েছে, কথাশিল্পী যে কথাচিত্র এঁকেছেন, চিত্রশিল্পী যে ছবি এঁকেছেন–বিশ্বের সর্বজাতির কেবল বুদ্ধিজীবীই নয় একমাত্র, অন্নজীবী মাত্রেই নানাভাবে তাঁর বক্ষে পুষ্টিলাভ করেছে। যে সব চিন্তাবীর মনের দ্বারা খুঁজে ধ্যানের ছবি এঁকেছেন, সমগ্র বিশ্ব তাঁর থেকে গ্রহণ করে মনের প্রসারতা বাড়িয়েছে। দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা যা দিয়েছেন, জগৎ সমভাবে তা গ্রহণ করেছে। এমন কি, তা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের চিন্তা ও কর্মের স্রোতকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে একই ভাবে সংক্রেমিত করেছে। আজ তারা যদি চিন্তার স্রোত কেবল স্বদেশের সংকীর্ণ খাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখেন, নিজ জাতির স্বার্থের প্রয়োজনে তারা যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রে দেশ বা জাতির নববিধানকে অকল্যাণে কলুষিত করে তুলতে প্রয়াস পান তা হলে পরবর্তী বিশ্ববিধানে যে-ফাটল ধরবে তার ফলাফল অনেকদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষকে ভুগতে হবে।

অবশ্য আপাত-আত্মস্বার্থীদের অপেক্ষা তাঁদের দৃষ্টি অধিকতর সুদূর প্রসারী হওয়ার দরুন চিন্তা-নিয়ন্তুগণ যা বললেন, রাষ্ট্রনিয়ন্তুগণের নিকট তা সকল সময় প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে। এজন্য অনেক চিন্তাবীরকে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে দেখা গিয়েছে। নাৎসী জার্মানীর স্বৈরশাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে সেখানকার দ্রষ্টা ও স্রষ্টাদের নানা প্রকার নির্মম দণ্ডলাভ জুটেছে। এমন কি ডিক্টেটরের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ পুঞ্জিত হয়ে গণচিত্তকে সেই সব নায়কত্বের প্রতিকূলে সচেতন করে তুলতে পারে এই আশঙ্কার সম্ভাবনাটুকু নির্মূল করার জন্য অনেক নিরপরাধ বুদ্ধিশীল মানুষের সেখানে কঠোর দণ্ড জুটেছে তাও আমরা শুনেছি।

এতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, হিটলারী দণ্ড যত কঠোরই হোক না কেন, মানব কল্যাণকামী দ্রষ্টা ও স্রষ্টারা তার প্রতিবাদ করেন– পৌরাণিক যুগের সেরা সব লাঞ্ছনার ভীতিকে গ্রাহ্য না করে সে-প্রতিবাদ তারা করেন। এবং অনেকের পক্ষে সে-প্রতিবাদ করার সম্ভাবনাও ছিল।

পাশ্চাত্য নাৎসীবাদের এশিয়াটিক দোসর জাপানের বিশ্বচিন্তাজগতে দানের বিষয় কিছুই আমরা জানি না। শুধু জানি ভারতের কবি যেস্থলে সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজসম্মান পদদলিত করে থাকেন, জাপানের কবি সে-স্থলে সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হয়ে মানবধ্বংসী প্রচারকের কাজে আত্মসত্তা বিকিয়ে দেন। এই জাপান। তার পশ্চাতে গৌরবময় অতীত মনীষার ইঙ্গিত না দেখতে পেয়ে তাকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যহীন বলে মেনে নিতে পারো। তার লোভ ও লালসা,

প্রতিপক্ষীদের প্রতি তার শাস্তিবিধানের আদর্শ এসব দেখে তাকে, কালচার যাকে পালিশ করে তুলেছে এমন কোন জাতির সমকক্ষ—অন্তত মনীষার দিক থেকে—ভাবতে পার না।

যদিও সে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখিয়ে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। মনে হয়, প্রকৃত দ্রষ্টা ও স্রষ্টার অভাব তার রাষ্ট্র শক্তিকে মনিষী-পীড়নের অপ্রিয় দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে—কারণ যার মাথা নেই তার মাথাব্যথাও থাকতে পারে না। নব্য এশিয়াটিক ভাবী সাম্রাজ্যের পরিকল্পনার প্রচারক বলেই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও নোগোচিকে প্রকৃত চিন্তানায়কদের দরবারে স্থান দেওয়া যেতে পারে না, কেন না, প্রকৃত চিন্তানায়ক রাষ্ট্রের নিকট আত্মবিক্রয় করতে পারেন না।

চিন্তাজগতে মহাচীনের গৌরবের দানকে কে অস্বীকার করছে? বিশ্বসভ্যতায় ভারত ও মিসরের সুপ্রাচীন অবদানের সঙ্গে তারও দান স্মরণীয়। আত্মাভিমানী প্রতীচ্য এসব দান অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু যে সকল বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে চীন ও ভারত আজও টিকে আছে তাতে করে মেনে নেওয়া যায়, সকল বাধা বিপত্তিতে সোজা হয়ে থাকার মেরুদণ্ড সে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে পেয়েছে। কিন্তু যারা কোনো বস্তুকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখার সৌজন্য একেবারে হারায়নি, ঐ জিনিসের কদর তাদেরকে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এ-সকল কথা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার কথা হচ্ছে—জার্মানীর ন্যায় দ্রষ্টা ও স্রষ্টার সংখ্যাধিক্য যদি জাপানেও থাকত, তা হলে সেখানেও জাপানী স্বৈরাচারের দম্ভকে হয় তাঁদের মাথা পেতে নিতে হতো, না হয়তো প্রতিবাদ করতে হতো। আর প্রতিবাদ করলে তাদের কপালে অনুরূপ লাঞ্ছনা জুটতো।

তোমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে বলছি : রাষ্ট্রকর্ণধারের অত্যাচার সব দেশেই হয়; কোনো দেশে কম কোথাও বেশি, এই যা। কিন্তু যে-দেশে তার জোরালো প্রতিবাদ হয়েছে— সে দেশের আত্মসত্তা মরে যায় নি, মাথা উঁচু করে আছে এ স্বীকার করে নিতে দোষ নেই। এও স্বীকার করে নিতে দোষ নেই, যে দেশে যত অধিক মনীষা-পীড়ন হয়েছে, বুঝতে হবে সে-দেশই আমিত্ব-বলে সর্বাধিক বলীয়ান। কারণ, প্রমাণ হয়ে গেল—মনীষা তথায় ধুলায় না লুটিয়ে শির উঁচিয়েছে।

ঘটনার স্রোত যদি অন্যদিকে প্রবাহিত হতো; তোমাদের মিত্রদের যদি অক্ষ-শক্তির সঙ্গে রফা করে চলতে হতো, তা হলে রাষ্ট্রের রথচক্রে পিষ্ট জনগণের চোখের জলে পিছল হয়ে সেই রথই অচল হওয়ার উপক্রম হতো। তা হলে জনগণের সেই দুর্দিনে দেশের মনীষীরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করত এবং তোমরা হয়ত এজন্য তাদের গুরুতর দণ্ডেরই ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু যাক সে-কথা, বহু চেষ্টা করার পরেও যুদ্ধ না ঠেকার দরুন জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা লাঘব ও ব্যক্তিক বন্ধন মোচনের উদ্দেশ্য নিয়ে মিত্ররা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু সীজারের স্ত্রী হলেই তাকে সর্বপাপমুক্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না। মিত্রগণের যাবতীয় কার্যকলাপই ভবিষ্যদ্রষ্টা চিন্তানায়ক ও ভাবী

বিশ্বরূপ রচয়িতাদের মনঃপূত ও সমালোচনার অতীত হবে, এমন আশা কেউ করতে পারে না। কিন্তু বার্ণার্ড শ'র দ্ব্যর্থবোধক উক্তি ছাড়া, বিলাতের বা আমেরিকার চিন্ত নায়কদের—তাদের দুর্ভিক্ষ দেশে এখনো হয়নি নিশ্চয়ই—ক'জনকে দেখেছ মিত্রদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করতে? নাৎসী রাষ্ট্রের মতো এখন তো তাঁদের উৎপীড়িত হবার আশঙ্কা ছিল না।

তবু এক বার্নার্ড শ'র দ্ব্যর্থবোধক মিঠে কড়া বোলচাল এবং কমন্স-এ দুই একজন শ্রমিক নেতার ছাড়াছাড়া দুই একটি অকেজো উক্তি ছাড়া অপর কোনো মনীষীকেই কথাটি বলতে শুনছি না কেন? শেপ অব থিংস টু কাম্-এর গাল্পিক লেখক প্রমুখ দুইচারজন ভাবী বিশ্বের রূপ নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তাদের সেসব রচনায় নাৎসীভীতি ও তার দূরীকরণের ব্যঞ্জনা যেরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সাম্রাজ্যস্ফীতি ও তাকে নিরাপদ রাখার ব্যঞ্জনাও তেমনি সমভাবে রূপলাভ করেছে। অথচ কে না জানে সাম্রাজ্যবাদীদের অধিকৃত দেশগুলিতে লোকে নাৎসী অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। ট্যাংক এরোপ্লেন মর্টারের ঘর্ঘর্ দ্রিম্‌দ্রিম্ আওয়াজ আর বারুদাগারের ধোঁয়া তোমাদের চিন্তারাজ্যকে বধির ধোঁয়াটে করে দ্যায় নি তো?

ভারতের কথা আমাদের মুখে তোমাদের কাছে ভাল শোনাবে না তা জানি। আমাদের যারা অভিভাবকত্ব করছে, আমাদের বিষয়ে সকল কথা তোমাদেরকে তারাই নিখুঁত ভাবে বলতে পারবে। অন্তত কতটুকু নিখুঁত করে বললে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, ততটুকু নিখুঁত ভাবে। আমাদের মুখে আমাদের কথা তোমাদের রুচবে না। তাই যদি বলি মার্কিন স্বাধীনতার সেই অমর দশ মহাবাণী সকল মানুষের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নয় কেন? বাক্যের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার দাবীর জন্য মানুষের আজও নির্যাতন ঘটে কেন? রাম যখন শ্যামের অধীনতা পাশ থেকে রহিমকে মুক্ত করতে যায়, তখন রামেরই অধীনে রঘু কেঁদে বলছে : তুমি আমাকে আগে মুক্ত কর! এই কান্নায় রাম কান দেয় না কেন? আফ্রিকাতে আজ ভারতীয় বাসিন্দাদের এমন অনাদর কেন? জগতের অপর কোনো দেশে তোমাদের শ্বেতাঙ্গদের এমনি অধিকার হরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তোমরা কি করতে! মেনে নিতে পারবে কি এই জঘন্য ব্যবস্থাকে! কোথায় তোমাদের মনীষীদের সুস্থবুদ্ধি।

ব্যাপার দেখে মনে হয় সুস্থ বুদ্ধি কোথায় যেন চাপা পড়ে গেছে—সুস্থ চিন্তার সার্বজনীন স্রোতধারায় শৈবাল এসে পড়েছে। প্রকৃত মনীষা আজ জড়তাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভাব ও ধারা নিয়ন্ত্রণের তিনটি প্রবাহ তিনভাবে আজ যুদ্ধেরই কোলে আত্মবিলোপ করে দিয়েছে। জ্ঞান-প্রতিভা নিরেট হয়ে পড়েছে—আর মানুষের বিজ্ঞান-প্রতিভা মারণাস্ত্র নির্মাণের গবেষণাগারে উন্মাদ হয়ে ফিরছে। সাহিত্য সৃজনী প্রতিভা প্রচারপুস্তিকা রচনায় ব্যাপৃত হয়েছে, আর দার্শনিক চিন্তা ও বিচারবোধ চাপ-খাওয়া মাথায় খুলির নিচেই পচে মরছে।

তবু মানুষের বিলাস যায় না। মুক্তবুদ্ধি পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও, মুক্তবোদ্ধার ভাণ করার অধিকারটুকু ত্যাগ করতে সে রাজি নয়। এজন্যই দেখি, স্বার্থ ও সংস্কারে চিন্তা ও বুদ্ধি যাদের biased, বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করেন তাঁরাই। মানে বিশ্বের বর্তমান দুর্দশার লাঘব ও ভাবী মঙ্গল বিধানের জন্য যারা এখনি চেষ্টা করবেন বলে জগৎ আশা করছে এবং চেষ্টা করতেও দেখছে, তাদেরই মন হয়ে পড়েছে পক্ষপাত দুষ্ট। কূটনীতিক চালের আড়ালে শঠনীতির বুদ্ধির খেলাকে ভাবপুষ্ট করে চলেছেন তারাই। কাজেই নববিধান সম্পর্কে তাঁরা যতই ফরমূলা বার করছেন, কারোরই তা মনঃপূত হচ্ছে না এবং সে-সব ফরমূলার একটিও বিশ্বের বর্তমান দুর্গতি লাঘব ও ভাবী মঙ্গলের রূপায়ণ সম্পর্কে কার্যকরী হওয়ার আশা দেখা যাচ্ছে না। এমন কোন পরিকল্পনা দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না, যা মানুষের বিক্ষত মনে আশা আনতে পারে আর পাশব যুদ্ধ ব্যবসায় নৃশংস কাড়াকাড়ির জায়গায়–ক্ষান্তি ও শান্তির আভাস জাগাতে পারে।

বর্তমান জগতে সমগ্রভাবে চিন্তার পরিবর্তন আনাই আজিকার দিনের সর্বাগ্রগণ্য কাজ হতে হবে। প্রত্যেকের পরিকল্পনাই যদি নিজের দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধির যুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে বাহিরের জগৎ তাকে গ্রহণ করবে কেন? বাহিরের যে-রাষ্ট্র তাকে গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আদিষ্ট হবে, সেও তো তা হলে নিজের অনুকূলে পাল্টা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে চ্যালেঞ্জ জানাবে। আর, প্রত্যেকেরই তা হলে স্ব স্ব আদর্শের প্রতি প্রীতির সংকীর্ণতা উথলে উঠবার প্রেরণা জাগবে–আর এই সংঘাতের দিনে সে প্রীতি প্রতিপক্ষের অপ্রীতিকর না হয়েই পারে না।

আগেই বলেছিঃ যুদ্ধযুগের বৈজ্ঞানিক মন অস্ত্রের কারখানায় বন্দীঃ ধ্যানী, রসিক ও শিল্পী মন প্রচারের ফন্দীফিকিরের ধূর্ত অন্বেষী। এর মধ্যে মুক্তচিন্তাশীল মনের পদমূলে ভূমিস্পর্শ পাওয়ার সুযোগ কোথায়? চিরন্তন ন্যায় ও নীতির দোহাই দিয়ে কেউ কোনো সত্য ও সভ্য শর্ত উপস্থাপিত করলেও স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরোধী বিবেচনায়–যথেষ্ট যুক্তির অবসর না দিয়েই তাকে বাতিল করে দেবার পক্ষপাতী। নিজস্ব ভাবধারার ও স্বার্থের অনুকূলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষীরা বিশ্ববিধান রচনার আয়োজনে ব্যস্ত।

বলাবাহুল্য এতৎদেশের অস্ত্রঝনঝনার অনুকূলেই তাদের ঐ ভাবঞ্জনার মূর্তি প্রকাশিত হবে। এবং সেই সাংঘাতিক ব্যঞ্জনার মাঝে যে ভাবের সংঘাত ও চিন্তার সংঘাত উন্মুখ হয়ে আছে–রণক্লান্ত বিশ্ব মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতই শঙ্কিতচিত্তে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই গ্রহণের পরিণাম ভাবী বিশ্বের মঙ্গলের কারণ না হয়ে আর একটা মহাসংগ্রাম অদূরবর্তী করারই কারণ হয়ে উঠবে। কাজেই বর্তমান চিত্ত ারাজ্যের এই জড়তা, সীমাবদ্ধতা ও এক দেশ-দর্শিতা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বিশ্বের সর্বত্র আপাত সহজভাবে গ্রহণের উপযোগী মনে না হলেও উহাকে গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে উপকৃত হবে। নয়া বিশ্বব্যবস্থায় এরূপ একটি ফ্যাক্টর রচনা

করা সম্ভব কিনা এ তার চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। যুধ্যমান শুম্ভ-নিশুম্ভেরা হয়ত এ খসড়ার প্রতি দাঁতমুখ খিঁচাবেই। কিন্তু তবু একথা স্বীকার্য, ক্লাসিকাল সংগ্রামে রত গজ-কচ্ছপের ক্লান্ত হয়ে পড়ার পর ঐ খসড়াই পৃথিবীর রক্তমৌক্তিক ক্ষতগুলিতে শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ও ঐশ্বর্য দেখে তার পাল্টা ব্যবস্থায় জগৎ-শোষণের জন্য নাৎসীবাদ চালাচ্ছে, তাদের দ্বারা যেমন এরূপ কোনো খসড়া রচনার সম্ভাবনা নেই, তেমনি, যারা নিছক সাম্রাজ্যবাদের বিপদ কাটাবার জন্য নাৎসীবাদকে ধ্বংস করতে কোমর বেঁধে লেগেছে তাদের দ্বারাও উহা সম্ভব হবার নয়।

আর আজ যে-সব চিন্তাশীল ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদের পাল্কী বহন করে, কেউ কেউ আবার বহন না করেই হাঁফিয়ে মরছে, তাদের দ্বারা যেমন এরূপ কোনো উপকারই হচ্ছে না, তেমনি যারা ন্যায় ও নীতি রক্ষিত হবে না আশঙ্কায় চুপ করে আছেন তারাও সেইরূপ কল্যাণ ব্যবস্থার ভীষণ ক্ষতি করছেন।

এর কারণও আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে-যুগে যে যে মনীষী চিন্তাজগতে আবির্ভূত হয়ে সত্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন, তাঁরা তা না দিয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকলে সে-যুগ সমৃদ্ধ হতে পারত না বলে, তাঁরা যুগের মানুষের ক্ষতির কারণ হতেন। যুগের দায়িত্ব পালন না করার দরুন তারা ন্যায় ও নীতির নিকট অভিযুক্ত হতেন।

ভাবী বিশ্বে মানুষ পরাধীন থাকবে না, এবং মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান হবে এমনি ধরনের কথা মাঝে মাঝে নিরপেক্ষীয় সুধীদের মুখ থেকে শোনা যায়। এখানে ভাবী বিশ্ব মানে সুদীর্ঘকাল পরের ভাবী বিশ্ব নয়—বর্তমান যুদ্ধটা কোনোরকমে জয় শেষ হয়ে গেলেই তাদের ঐ কল্পিত নয়া ব্যবস্থা-মতো কাজ হয়ে গেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা বিশ্ব বলতে ইউরোপ আর আমেরিকাকেই বোঝে। আর সমস্যা বলতে ঐ দুই মহাদেশের সমস্যাকেই সমাধানযোগ্য বলে মনে করে। বর্তমান যুদ্ধে সাময়িকভাবে ইউরোপে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র (শ্বেতজাতির রাষ্ট্র) পরাধীন হয়ে পড়লেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমান দুনিয়ার চিরস্থায়ী ভাবে কোনো শ্বেতজাতির রাষ্ট্র অপর কোনো শ্বেতজাতির পদানত নহে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যতগুলি রাষ্ট্র এখন পরাধীন আছে, তাদের সবগুলিই অশ্বেত জাতির। আর, যারা পরাধীন করে রেখেছে তাদের অনেকে শ্বেত জাতি। হিন্দুর ব্রাহ্মণের মতই তারা সমস্যা, সুখ সুবিধা সব কিছুর গুরুত্ব, কেবল নিজের পক্ষ থেকে দেখছেন এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ কি থাকতে পারে! তাদের অধিকাংশ জমিদারী প্রাচ্যদেশগুলিতেই বিস্তৃত। কাজেই প্রাচ্যের সমস্যা যে আলাদা কিছু, তাদেরও যে পৃথক একটা সত্তা থাকতে পারে তা তারা কার্যত স্বীকার করতে চান না। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে প্রায়ই তারা নীরব থাকেন। আর যদিই বা কিছু বলেন, তাতে সাম্রাজ্যিক-স্বার্থ রক্ষার ভাব এত প্রকট হয়ে উঠে যে, তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়ে আলোচনার ইতি করে দেন। বাড়তে দেন না—না দেবার মালিকও তারাই কি না! তাদের দুই একজন যদিও বা নূতনত্ব দেবার জন্য উচিত কথা

বলে ফেলেন, অমনি চারদিক থেকে তারা পাগল পাগল বলে রব তুলে তাদের নিরস্ত্র করে দেন।

তারা মনে প্রাণে জানেন প্রাচ্যের আবার সমস্যা কি? প্রাচ্যের তাদের অধিকারগুলিকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখা দরকার। কিন্তু তা ঐ অধিকারগুলোর নিজের খাতিরে নয়, তাদেরকে অধিকারভুক্ত রাখারই খাতিরে। মানবতার বিপন্ন অবস্থা দেখে তারা বিচলিত; আর হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ মানবতা। এই মানবতাকে রক্ষা ও পুষ্ট করার জন্য তাঁরা স্ব স্ব অধিকারগুলিকে নিয়ে স্বাধীন থাকতে চায়—"আমরা আমাদের ডমিনিয়নগুলোকে নিয়ে স্বাধীন থাকতে চাই।" মিঃ চার্চিলের এই কথায় কী বোঝায়? বোঝায় ঃ "আমাদের ওদের উপর এসে যেন কেউ ভাগ বসাতে না পারে। এদের উপর অধিকারের কাজে আমারা যেন স্বাধীন থাকতে পারি।"

এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক লুঠতরাজ এবং কতকগুলি দেশকে আন্তর্জাতিক লুটের মাল বললে হয়ত বিজ্ঞ রাষ্ট্র-প্রধানরা খুশী হবেন না। কিন্তু গতযুদ্ধ অবেলায় ভেঙে যাওয়ার ফলে, তখন শান্তির অর্থ স্থিরীকৃত না হওয়ার দরুন আন্তর্জাতিক শান্তিমন্দির লীগ-অব-ন্যাশনস যে ভাবে খেয়াল খুশী মতো ব্যবহৃত হয়ে পশুদশা প্রাপ্ত হয়েছিল,—বর্তমান যুদ্ধের সময়েও মানবতা অর্থে বিশ্বের সমগ্র মানবতা না বোঝালে এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হাত শুধু সংযত নয় একেবারেই ভঙ্গ না হলে মানবতার যাবতীয় ফাঁকা বুলি মিথ্যায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে।

গত যুদ্ধের শান্তির ফাঁক এবার যেরূপ ফাঁকি হয়ে দেখা দিয়েছে, অদূরবর্তীকালে এসব ফাঁকা বুলিও তেমনই কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হবে। এংলোসেক্‌শন জাতি যদি একাই সগর্বে দুনিয়ার বুক মাড়িয়ে মার্চ করে চলতে চলতে লক্ষ্যস্থলে পৌছায়, তা হলে যুদ্ধ জয় হয়ত হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের বহুঘোষিত সদুদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

পক্ষান্তরে জাপ সাম্রাজ্যবাদ প্রাচ্যে তার জাপানী নয়া-বিধান প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে, সে-স্বপ্ন নতুন কিছু উদ্ভাবিত বস্তু নয়। আন্তর্জাতিক লুটের মালগুলির মাঝে চীন অন্যতম। জাপ-আক্রমণের বহু পরে আমেরিকান মনীষীদের মনে একটা সুমতি এসেছিল এবং তাতে তারা স্বীকার করেছিলেন যে, চীনের উপর থেকে ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থের হস্ত কিছুটা সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের মতই এই মৃদু আন্দোলন বড় কার্যের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র কার্যের রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং প্রয়োজন শেষে আবার তা মিলিয়ে যেতেও দেরি হয় না।

কোন উৎসমুখ থেকে জাপান তার আদর্শের ফোয়ারা আবিষ্কার করেছে তার বিচার না করেও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তার থেকেও বিশ্বের বিপন্ন হবার সম্ভাবনা কম কিছু নয়। গত যুগের অমীমাংসিতভাবে গৃহীত নীতির রক্তকণিকা থেকেই এই রক্তবীজের উদ্ভব। কাজেই অন্যান্য স্বার্থের ন্যায় এ স্বার্থেরও উদ্ভব অনিবার্য। মনে

রাখা ভালো যে, এ সবার অভ্যুদয় দিনেকের ব্যাপার নয়। বহুদিবসের প্রস্তুতির রূপ নিয়েই এরা অভ্যুদিত হয়–যেরূপ হয়েছে হিটলারের শক্তি, যেমনটি হয়েছে জাপশক্তি–যে রকমটি হয়ে আছে বহুশতাব্দীর শোণিতলেহী পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়।

ভাবী বিশ্ব যদি হিটলারের মতানুযায়ী ব্যবস্থিত হয়, তা হলে মানবতা একদম লোপ পাবে–মিত্রপক্ষের এ শ্লোগানের প্রচারে প্রচারকৌশল অনেকখানি আছে এ মেনে নিলেও ফ্যসিস্তবাদের প্রকৃতির সহিত যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তারা এর সততায় মোটেই সন্দেহ প্রকাশ করবে না। জাপ-আদর্শে বিশ্বব্যবস্থিত হতে পারে না; তার দৃষ্টি অতটা সুদূর প্রসারী নয়। এশিয়াকে নবব্যবস্থায় লীলায়িত করার তার সংকল্প–তার নিখিল এশিয়াকে শ্বেতাঙ্গ শোষণ থেকে স্বাধীন করার শ্লোগানের অর্থ আজ যারা শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে তাদের শোষণ করার দায়িত্বটিকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া অপর কিছু হতে পারে–এ যারা ভাববে–তারা ভুল করবে।

কিন্তু আত্মিক বলে বলীয়ান এশিয়ার ন্যায় একটি মর্যাদাসম্পন্ন গোটা মহাদেশ প্রাচ্যের ধার করা আত্মবিস্তৃতিবাদদুষ্ট একটা রাষ্ট্রের পাশব শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে না। ভাব-লোকে আত্মপ্রসারের ইঙ্গিত প্রাচ্যের ঐশীবাণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আত্মপ্রসারের বস্তুতান্ত্রিক দিকটা পাশ্চাত্য থেকেই ধার করা বস্তু। তার এ ব্যবস্থা মেনে নিয়ে এশিয়া তার আত্মিক মরণ ডেকে আনতে পারে না। (তার আত্মিক সত্তার নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই আমরা করছি না–এটুকু মনে রাখতে হবে।)

বাকি রইল ভাবীবিশ্ববিধানে আদর্শের প্রভাব বিস্তারের কথা। কথাটা একটু শক্ত হলেও সত্য যে, তাদের কোনো সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন নীতি এ যুগের সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি জুড়েও কোথাও চোখে পড়েনি। আদর্শের সাথে খাপ খাইয়ে যুদ্ধকে তারা বিবর্তিত করছেন, এ কথা সত্যাশ্রয়ী কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে বেরুতে পারে না। যে-মানবতার জন্য তারা লড়ছেন, তা কোন মানবতা? কবির বন্দিত–'বিশ্ব জুড়িয়া এক জাতি আছে সে-জাতির নাম মানব জাতি' গণসমাজের এ মনাবতা কি? তা যদি হতো–তা হলে অনেক জটিল বিষয় সহজ হয়ে পড়ত।

যুদ্ধের অবস্থা শনৈঃ শনৈঃ আশাপ্রদ হয়ে যাচ্ছে। মানবতামুক্তির আশা একটু একটু করে আলোকশিখা দেখাচ্ছে। অন্তত সুধীসমাজকে আনন্দ দিতে পারে এমন পরিস্থিতি যুদ্ধের চাপে দেখা যাচ্ছে। তা হচ্ছে জাপান-জার্মানীর বিরুদ্ধে বিরাট এক সংঘবদ্ধতা। এ কিন্তু, যুদ্ধাস্ত্রের ঘন সন্নিবেশ নয়–যে মস্তিস্ক যুদ্ধাস্ত্রের চালকদেরও চালক, এ হচ্ছে তারই ঘন সংবদ্ধতা, এ শুধু বহুরাষ্ট্রের সংঘবদ্ধতা নয়–বহু কর্মীর গুষ্ঠি গঠনও। ফলে এযুদ্ধ এমন এক দুরূহ পথে বিপতিত হতে চলেছে যে, অনেকেই একে গণযুদ্ধে রূপ নেবারই আশার আলোক দেখছেন।

রাশিয়ার যোগদান আচমকা ও আকস্মিক হলেও এর ফল সুদূর প্রসারী হতে বাধা নেই। মজার ব্যাপার এই যে, দুটি যুযুধান সম আদর্শের পালোয়ানের এক পক্ষ নিয়ে

দুনিয়ার এক বড় অংশ সেই অবলম্বিত পক্ষকে নিজের pious water খাইয়ে পুষ্টও করছে। আহার জীর্ণও করছে, আরেক পক্ষকে ঘা মারার জন্য। এতে অন্য পক্ষ বল পাচ্ছে, কিন্তু তার খোলস বদলানোর সকল অনিচ্ছাকে আড়াল করে তার আপন স্বরূপ ফিকে হয়ে যাচ্ছে এবং তার নেড়া শাখায় সবুজ আভা দেখা যাচ্ছে।

ঐ আভা যারা দেখছেন, এ ডামাডোলের বাজারে তারা কিন্তু বসে নেই, ওরা একদল দুঃসাহসী যাত্রী। যাবতীয় জনপ্রিয় ব্যবস্থা থেকে ওরা আলাদা। কায়েমী ব্যবস্থার আফিমী নেশায় দুনিয়ার লোক মশ্গুল। পায়ের তলার গভীর ফাঁকে দেখছে না এ খাল কেটে চলেছে তারাই, যারা ঐ বিরাট শিশুর রক্তে বলীয়ান। ছিন্নমূল ডাল পাতার সবুজ ফাঁকা আস্তরণ সে-ফাঁককে রমণীয় করে রেখেছে। মানুষ মরছে সেই ফাঁকে পা দিয়ে দিয়ে। মরবার আগে শান্ত্বনা নিচ্ছে হোক না সে ফাঁকি–কিন্তু তার পুরোভাগে তো ছিল সবুজেরি স্বপ্ন–ওরা মানুষের পায়ের তলায় সে-ফাঁক দেখিয়ে দিচ্ছে বলে মানুষ এদের উপর খাপ্পা। আফিম দেওয়ার রাষ্ট্রগুলি আর আফিম-খাওয়া মানুষগুলির ঐকান্তিক ঘৃণা ও বিরোধিতার কর্দমকণ্টকে দুর্গম পথ দিয়ে এদের যাত্রা, তাই বলেই না এরা দুর্গমের যাত্রী?

কিন্তু এদের ছোঁয়াও বড় শক্ত, বড় তল প্রসারী। এ ছোঁয়াও মানুষের রাষ্ট্রে যতই বাঁচিয়ে চলতে চাইছে, এর প্রভাব ততই মনের গভীরে শিকড় মেলে দিচ্ছে। এর ভিতরে যারা বিভীষিকা দেখেছেন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য বুদ্ধির শায়িত হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে অগৌরবের নয়। তাই দেখা যাচ্ছে, তাঁদের উদ্দেশ্য আগাগোড়া মানবতার রক্ষা হলেও সমব্যবসায়ীদের প্রতি সহানুভূতিতে তারা কৃপণ নয়।

এক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ আরেক রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট রাখার জন্য যথেষ্ট করেছে তারা–এর নজীরের অভাব নেই। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল কি কেবল আর্থিক সম্পদে কিংবা বৈষয়িক ব্যাপারে লাভবান হওয়ায়? না, তা ছাড়া আরো কিছু এর পেছনে আছে? সাম্রাজ্যবাদকে একটা বিরাট ব্যবসায় বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই ব্যবসায়ের স্বার্থের খাতিরে অনেক রাঙ্কে সোনা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকবারইতো দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিন্ন হলে এ বেনিয়া-বৃত্তিকে চালু রাখা যায় না। তাই এ বেনিয়া বৃত্তিকে তারা আন্তর্জাতিক করে তুলেছেন আত্মপুষ্টির খাতিরে এবং আবিসিনিয়ার যুদ্ধে যারা আক্রমণকারী ইতালীকে অস্ত্র যুগিয়েছেন এবং এই সেদিনও যারা চীনের বুকে জাপ হানাকে সমর্থন করেছেন (নোগোচির প্রতি রবীন্দ্রনাথের উত্তরাঘাত স্মরণীয়। এবং পরাধীন ভারতের আত্মিক মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিত্ত ার সাথে তাদের স্বাধীন মনের অসত্যশৃঙ্খলিত অমুক্ত ভাবধারার তুলনা কেউ করবে কি?)–এ তারা করেছেন কি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরে?

দেশবিদেশের কায়েমী রক্তে জড়ত্ব বিধ্বংসী বীজের অনুপ্রবেশের প্রতিবাদের খাতিরে এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখার চেষ্টা কি এর মধ্যে নগ্ন হয়ে উঠেনি? এ সমস্ত গলদ নিয়েও তারা বিজয় গর্বে রথ চালিয়ে

যাওয়ার জোর আগের মত যে পাচ্ছে না, তার প্রমাণ এই যে তাদের শ্লোগানের ধারা আগের থেকে অনেক বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনকে খালি প্রচার-কৌশল বলে ভুল করে এর থেকে কান ফিরিয়ে নিলেই আমরা লাভবান হবো তা মেনে নেওয়া চলে না। এর যতটুকু আমাদের অনুকূলে সে-টুকু গ্রহণ করে, প্রতিকূলটুকুকেও অনুকূল করে নিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বে নবব্যবস্থার ডালপালা বিস্তার করাই এরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মেনে নিয়েছে।

তাই আগে যারা গ্রাহ্যের বিষয় ছিল না, কিন্তু এখন একটা নূতন সমস্যা এরা বয়ে নিয়ে এসেছে। এখন এই sweet devil গুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে পথ চলা একেবারেই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃদ্ধ তার তরুণী ভার্যা সম্পর্কে তার তরুণ শত্রুকে নিয়ে যে-সমস্যায় পড়ে, এই "মিষ্টি শয়তান" গুলিকে নিয়ে এই বৃদ্ধ এঞ্জেলের দল ঠিক সেই সমস্যায় পড়ে গেছে। এর কারণ, নানা দেশের অলিগলিতে বৃহত্তর vested interest-এর যে-সকল খুঁটী রয়েছে (এ সকল খুঁটি তার উপজীব্য ও উপকরণ–তাদের উপজীব্য আবার সর্বহারা শ্রেণির জনসাধারণ) তাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেই। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে বৃহত্তম vested interest-এর আশু বিপদ দেখা না গেলেও তার অণুশিকড়গুলিতে ঘূণ ধরার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

এখন কথা হচ্ছে যাদের এখন ছাড়ানো যাচ্ছে না, নূতন বিশ্বব্যবস্থা রচনা কালে এই sweet devil-দেরকে তাতে কতটুকু voice দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক কোমিন্টার্ন গিয়েছে, কাজেই তাদের আন্তর্জাতিকভাবে দলবদ্ধ থাকবার সুযোগ ফুরিয়েছে। এই অবস্থায় ঐকদেশিক স্বার্থের ধমক তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে যদি অস্পষ্ট করে না ফেলতে পারে, তা হলে ভাবী বিশ্বে তাদের স্থান নগণ্য জায়গায় নাও হতে পারে।

প্রধানত জগতের তিনটি দেশই চিন্তা জগতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। স্পেন, চীন ও রাশিয়ার কথা বলছি। ভারতবর্ষের কথা ইচ্ছা করেই বাদ দিলাম; কারণ, সেই অপকৃষ্ট শ্রেণির স্বার্থ বোধ হাবসী সম্রাটের করুণ কান্নায় ও আমিষগন্ধী নিরপেক্ষতা নীতি ছেড়ে দেয়নি। সেই বোধ প্রবণ তাই মেনে নিয়েছে যে ভারত হচ্ছে বৃটেনের ঘরের জিনিস। তার সমস্যা হচ্ছে বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার। একে বিশ্বসমস্যার দরবারে ডেকে আনা চলে না। একে নিয়ে যা করবার বৃটেনই করবে। নবব্যবস্থার ধারকদের, মানব মুক্তির পথপ্রদর্শকদের, দুর্বৃত্তের কবল থেকে পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনে দেবার জন্য আত্মনিবেদিত 'হিরো' দের ভারতকে নিয়ে কিছুই করবার নেই!

বলছিলাম, ঐ তিনটি দেশেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা বিপন্ন হবার উপক্রম হওয়ার নজীর নানা ক্ষেত্রে রয়েছে। স্পেনের গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে ডিক্টেটারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাশিয়ার সাম্যবাদী গণতন্ত্র ভেঙে দিয়ে সেখানে হিটলারী ভাবধারা প্রবেশের

জন্য মরণপণ চেষ্টা করেছে। চীনে একদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অন্যদিকে জাপ আক্রমণ তার দেহ ও মন দুটিকেই ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। এই তিন দেশ সম্পর্কেই আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী গণতন্ত্রীদের অতীতের ব্যবহার ভালো নয়। এ ব্যবহারের দরুণ তারা যে বিশ্বাস হারিয়েছিল, আজ পরিবর্তিত ব্যবহারের দ্বারা সে বিশ্বাস অর্জনের পথে যেমন পা বাড়িয়েছে, তেমনি এক চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় শিহরিত হয়ে উঠেছে। কারণ প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার মুখোস নিয়ে পরোক্ষে উস্কানী দেবার যে নীতি তারা একদা গ্রহণ করেছিলেন তার ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বত্রই অল্পবিস্তর একটা নূতন মননের সৃষ্টি হয়েছিল। তার সবচেয়ে বেশি প্রকাশ হয়েছিল ভারতবর্ষে। তারে নিজের পরাধীনতার মর্মঘাতী জ্বালা মনে করেই রাশিয়ার মানববুদ্ধির আদর্শকে স্পেনের ইঙ্গমার্কিন অথর্বতাকে এবং চীনের জাপ বর্বরতার আস্ফালনকে এত অধিকবার নিন্দা অসমর্থন করেছে এবং ইঙ্গমার্কিন নৈতিক বলকে সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার তাগিদ দিয়েছে। শুধু তাই নয়। এসব দেশের দুঃখে তাদের বুক কান্নায় ভেঙে আসছিল বলেও নয়। তাদের এ ব্যাপারের অন্তরালে আরো একটা ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা হচ্ছে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যবাদী ভণ্ডামী দুইয়েরই প্রতিকূলে একটা বিশ্বনৈতিক ও বিশ্বজনীন প্রতিবাদ খাড়া করে তোলা।

দেখা যাচ্ছে, ভারত নানা দেশের যত সব অত্যাচারিতের দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যাকে নিজের বুকের মাঝেই অনুভব করে, ঐ সব দেশের লক্ষ্য কিন্তু ততটা ভারতের দিকে নেই। তাই রাশিয়া সম্বন্ধে ভারতে রাশি রাশি হিটলারবিরোধী পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে সেখানে টু শব্দটিও নেই। শেষ পর্যন্ত অনূদিত হতে চলেছে সেখানে মহাভারতের একটা রুশ কাব্যানুবাদ! স্পেনের জাতীয় স্বাধীনতা অপহৃত। তার কথা ওঠে না। স্বাধীন চীনেরও দুটো মৃদু সহানুভূতির বাণী দেওয়া ছাড়া ভারত সম্পর্কে আর কিছু করবার নেই। এর থেকে কি সিদ্ধান্ত টেনে আনা যায় না যে, দুনিয়ায় সাম্যবাদও যথার্থ পথে চলছেনা—স্ব-আদর্শ-বিরোধী যে কোন অন্যায় আচরণের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করার শক্তি তারা এখনো আয়ত্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ ভাবী বিশ্ববিধান নিজের আদর্শ ও অভিমত প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা অর্জনের তাদের এখনো অনেক দেরী!

অনেক কথা বলা হোল। কিন্তু শেষ কথাটি বাকি আছে।

আজ মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এইখানে ঃ নিজের অনুকূলে অপরের প্রতি অন্যায়ের অনুষ্ঠানকে প্রতিবাদে নিরস্ত করার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত আদর্শনিষ্ঠার গলতিকে, আদর্শের নাম দিয়ে একটা পঙ্গুতাকে অস্ত্রের পিছনের শক্তির বলে আদর্শ বলে চালাচ্ছে! এখানে লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় অনলে ঝাঁপাচ্ছে, লক্ষ মানুষ নিদারুণ অনিচ্ছায়, না খেতে পেয়ে মরছে। আর লক্ষ মানুষ সত্য কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কচুকাটা হচ্ছে। এসবের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আধুনিক জগৎ মানুষের প্রাণের দাম দেয় না, লক্ষ লক্ষ আর্তজনার প্রতিবাদ মানে না, কোটি কোটি

নিরন্নের হাহাকারে কর্ণপাত করে না। বুদ্ধির জগৎকে পঙ্গু করে দিয়ে কোটি মানুষের বুকের উপর দিয়ে সে তার আদর্শের রথ চালিয়ে নেবেই।

তোমার মুখে এবং তোমাদের আরো কারো কারো মুখে এর একটা মৃদু প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সে-প্রতিবাদ এত অস্পষ্ট যে, বেশী দূর থেকে ভালো করে শোনাই যায় না। পুঁজিবাদের বিষ আকণ্ঠ পান করে তোমরা নীলকণ্ঠ হয়ে আছ। তাই বিবেকের তাড়নাকে তোমরা মৃত্যুবরণের সাহস নিয়ে অভয় দিতে পারছ না। কতকটা সহায়তা পাচ্ছ না বলেই হয়ত তোমাদের প্রতিবাদ খুব জোর পাচ্ছে না। চীনের তুমি যে-সমস্ত মানুষ অঙ্কন করেছ, তাদের মতো অনেক দেশেই এমন অনেক মানুষ আছে। এ খোঁজও তোমাদের না রাখার কথা নয়। এ সব মানুষের মাঝে অনেক ঠেকে শেখা একটা বিরাট প্রতিবাদের হাঁপর ফোঁপাচ্ছে। বৃহত্তর vested interest-এর ধারক ও বাহক ক্ষুদ্রতর কায়েমী স্বার্থের মানুষগুলিকে এ ফোঁপানি সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। বৃত্তের কয়েকটি স্বার্থকে আপাতত তারা নাগাল পাচ্ছে না—পাওয়ার দরকারও নেই। সর্ব মানবকে স্বাধীন করার বিলাসে ডোমিনিয়ন নিয়ে স্বাধীন হওয়ার নয়া সংকল্প নিয়ে যারা অনির্বাণ সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং যাদের আদর্শের স্বার্থে সকল কপট ও ভণ্ড আদর্শের স্বার্থের খাতিরে অমিল হতে বাধ্য—তাদের সাথে তোমরা হাত মেলাতে পার কি? তা যদি পারতে, তা হলে হিটলার ধ্বংস হতো, নাৎসী-ফ্যাসিস্তবাদ পুড়ে মরতো, এমন কি সাম্রাজ্যবাদেরও ভরাডুবি হতো এবং পুঁজিবাদের শিকড় শুদ্ধ টান পড়তো। কিন্তু গোড়াপত্তন হতো মুক্ত মানবতার সুস্থ জীবন ধারার।

পরিশিষ্টের কথাগুলি শোনো;

নববিধানে মানুষের অধিকারটাকেই বড় করে স্থান দিতে চেষ্টা করো। যারা ঐ বিধান রচনা করবে প্রবন্ধ লিখে বা জোরালো বিবৃতি দিয়ে তো নিজের মত প্রতিষ্ঠা করো। তাদের মন ও মতিকে আর জনমতকেও টেনে নিও তোমার মতের অনুকূলে।

আজ পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রই মানুষের পুরা অধিকার দেয় নি। রাষ্ট্রের রক্ষার খাতিরে তার পাদমূলে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষের বলি হয়েছে। এ আর হতে দিও না।

ভিন্ন মানুষের ভিন্ন অভিমত থাকবেই। নিজের মত নিয়ে তারা দল গঠন করে, মনে করে এই মতে রাষ্ট্র চললে বা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হলে রাষ্ট্রের ও মানুষের মঙ্গল হতে পারে। প্রকৃতি তাকে যে মত পোষণের স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে যেন গলা টিপে মারার চেষ্টা না হয়। কারণ কে জানে তারই হাতে ক্ষমতা গেলে, সেও পূর্ববর্তীদের মতকে গলা টিপে মারবে না! এ-ব্যবস্থায় চক্রবৃদ্ধি হারে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে চলেছে এবং চলবে। কল্যাণাদর্শ স্থাপন অপেক্ষা স্থাপনের উগ্রতাটাই সব সময় বড় হয়ে দেখা দেয় বলে তার ফল হয় বড় নিষ্ঠুর রকমের সাংঘাতিক।

রাষ্ট্রাদর্শ একটা নিত্যকালের মিথ্যা জিনিস। সনাতন সত্যের দরবারে তার স্থান নেই। তাই দেখতে পাই, একসময়ে যাকে উত্তম বলে গ্রহণ করা হয়, অধম হয়ে পরিণত হয় সেটা। অধম বলে গলা টেপা হয় যে-আদর্শের, ক্ষমতা হাতে পেলে সেটাই

উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। আবার আরো উত্তমতা চিরস্থায়ী হয় না। কাজেই এই ভূয়া জিনিসের জন্য পূর্ণবয়স্ক, sensible, সুস্থ দেহ মনের অধিকারী মানুষকে শুধু মতবিরোধের জন্য দৈহিক নির্যাতন প্রদান কসাইগিরি অপেক্ষাও অধম কাজ, এ কথাটা তুমি উত্তমরূপে প্রচার করতে পারো তোমার কোনো বই-এ। মনে রেখো রাষ্ট্রের হাতে নিগৃহীত না হওয়া মানুষের প্রাথমিক অধিকার হওয়া উচিত।

আর দেখো, রাষ্ট্রের নির্মমতার সঙ্গে সংগ্রাম করে করে জগতের অনেক ভালো আদর্শের শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্র নামক পদার্থটির যদি এত শক্তি না থাকতো, মানুষের কল্যাণকর অনেক ভালো জিনিস তা হলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো। জগতের বর্তমান চেহারা ঠিক বদলে যেতো--একি শুধু pious hope?

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কথা তিনটি মানুষের জপমালার মতো হয়ে আছে! কিন্তু এই তিনটিকেই পদে পদে অবমানিত করা হয়, এবং এর একটিরও কোনো দাম দেওয়া হয় না, তিনটিকেই নির্মম ভাবে বলি দেওয়া হয় দেবতারূপী দানবের পাদমূলে, কোন্ অভীষ্ট লাভের জন্য? বিশ্লেষণের প্রয়োজন কি আজো আসেনি? এই বস্তুত্রয়কে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার সৎসাহসে রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার আগ্রেয় প্রয়োজনবোধ কি আজও চিন্তানিয়ন্ত্রণকারীদের লেখনী মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে? —অলমিতি

নাটকীয় কাহিনী

গ্রন্থকার, সমালোচক এবং জনসাধারণকে লক্ষ্য করে এই প্রবন্ধের অবতারণা। থিয়েটার নাট্যাভিনয় কি করে শুরু হয়,—রচনার শুরু থেকে প্রথম রজনীর অভিনয় পর্যন্ত তাকে কি কি রকমারি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, এই প্রবন্ধে তাই বোঝাব। নাটক আমরা বুঝি এ বলে সত্যের অপলাপ আমরা করতে চাই না। সত্যি বলতে কি, থিয়েটার আদতে কেউ বোঝেই না, এমন কি যারা থিয়েটার করে করে হাড় পাকিয়েছে, তারাও না। যে-সব পরিচালক চুলদাড়ি পাকিয়েছেন, তাঁরাও না, এমন কি সমালোচকরা নিজেরাও না। আগে থাকতে নাটক-লেখক যদি জানতেন তাঁর লেখা সার্থক হবে, পরিচালক যদি জানতেন 'হাউস' প্রতিদিন 'ফুল' হবে, আর অভিনেতৃগণ যদি জানতেন নাটককে তাঁরা উৎরে দেবেন,—হায় হায়, নাটক মঞ্চস্থ করা যে তা হলে ছুতোর মিস্ত্রীর আর সাবান তৈরির কাজের মতই সরল হয়ে যেত! তা হবার নয়।

থিয়েটার জিনিসটা যুদ্ধবিগ্রহের মত একটা আর্ট-বিশেষ আবার সাপ-সিঁড়ি খেলার মত জটিল। কি রকম হয়ে এটা আত্মপ্রকাশ করবে, আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। শুধু প্রথম রাত নয় রাতের পর রাত, এ যে হয়ে চলে, সেইটেই আশ্চর্য। শুরু থেকে একে সমাপ্তি অবধি চালিয়ে নেওয়া, সেও এক বিরাট আশ্চর্য। আগে থেকে ছক কেটে নিয়ে সেই ছাঁচে তাকে শেষ করা—থিয়েটারের বেলা এ নিয়ম খাটে না'ক; অসংখ্য অভাবিত বাধাবিপত্তি ক্রমাগত জয় করে তবেই তার রূপায়ণ। সিনারির একটিমাত্র কাঠি, অভিনেতার একটিমাত্র স্নায়ু কেবল এক মুহূর্তে বিকল হলেই এ তাসের রাজ্য ধ্বসে যেতে পারে। তবে সাধারণতঃ তা হয় না—কিন্তু হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা নিয়েও মরিয়া হয়ে তাকে প্রতিদিন চালিয়ে নেওয়া হয়।

নাটকীয় কলা (art) ও তার রহস্য (misteries) নিয়ে কিছু বলতে চাই না, নাট্যশিল্প (creaft) ও তার ঘরোয়া খবরের (secrets) কিছু পরিচয় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। রঙ্গমঞ্চ আমাদের কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে তাকে আদর্শানুরূপ করা যায়, সে সব বিবেচনা করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু আদর্শ নিয়ে কথা বলছেন কি অমনি, এর জটিল বাস্তবের দিকটা ধামাচাপা দিতে হবে। কারণ এর যা ঝামেলা!

বারোয়ারি নাটক বা গঠনমূলক রঙ্গমঞ্চের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কিছু বলবার নেই। রঙ্গমঞ্চে সব কিছুই সম্ভব। এ একটা আজব কারখানা। আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য—আদৌ নাটক যে হয়। সাড়ে ছ'টায় যখন পরদা উঠল, ভিতরের খবর জানলে একে স্বাভাবিক বলে ভাবতেই পারবেন না; মনে হবে কোন দৈবের ঘটনা।

নাটকের গোড়াপত্তন

নাটকের গোড়াপত্তন কিন্তু নাট্যশালায় নয় বাইরে—উৎসাহী লেখকের লেখবার টেবিলে। লেখক যখন বুঝবে যে এইবার সম্পূর্ণ হয়েছে,—নাটকের তখনই রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ।

অবশ্য শীঘ্রই (পাঁচ ছ'মাসের মধ্যেই) দেখা গেল—না ত, এ ত পূর্ণাঙ্গ নয়। ছোট করো, আরো ছোট করো, শেষ অঙ্কটা ছেঁটে ফ্যালো। লেখক নিজে অবাক হয়, আমরাও অবাক হই,—যত দোষ কি ঐ শেষ অঙ্কের? তাকে ছেঁটে কেটে পালটে ফেলতে হবেই—সব ক্ষেত্রে। এর কারণ রহস্যাবৃত। আবার এও কম রহস্যময় নয়— যে সব ক্ষেত্রে নাটক ব্যর্থ হয়, তাও ঐ শেষ অঙ্কেরই জন্য। নাট্য-সমালোচকরাও যত দুর্বলতা, যত পঙ্গুতা খুঁজে বার করে ঐ শেষ অঙ্কে। আমি বুঝি না এসব দেখেশুনেও নাট্যকারেরা নাটকে কেন একটা শেষ অঙ্ক জুড়তে যায়। নাটকে শেষ অঙ্ক বলে একটা কিছু থাকাই উচিত নয়। আর থাকলেও যে উদ্দেশ্যে ডালকুত্তার ল্যাজ কেটে ফেলা হয়, তেমনিভাবে শেষ অঙ্কও কেটে বেমালুম আলগা করে ফেলা উচিত, যেন সারাটা জিনিসকে সে ধ্বংস করে দিতে না পারে। কিংবা আরও এক পথ ধরা যেতে পারেঃ নাটক শেষ অঙ্ক থেকে শুরু করে প্রথম অঙ্কে গিয়ে শেষ করুক—যখন শেষ অঙ্ক এত খারাপ আর প্রথম অঙ্ক এত ভাল। যাই হোক, শেষ অঙ্কের অভিশাপ থেকে লেখককে নিষ্কৃতি দেবার জন্য এমনি কিছু একটা ঘটানো দরকার।

এই ভাবে কেটেকুটে, আবার লিখে আবার কেটে, আবার লিখে, শেষ অঙ্কের পালা শেষ হয়। শেষ অঙ্কের দশা শেষ হলে লেখক উপস্থিত হয় প্রতীক্ষার দশায়। এ এক প্রকার নির্বিকল্প সমাধিক দশা—লিখতে পারে না, পড়তে পারে না—খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না—তার বইটা মঞ্চে যাবে—কি করে যাবে, কি করে হবে, কেমনটি হবে এসব আশা-নৈরাশ্যের ঢেউ এসে তার বুকের তটে তোলপাড় করে। এইরূপ কোন প্রতীক্ষমান নাট্যকারের কাছে যান তো দেখে অবাক হবেন, সে যেন আরেক জগতে পৌঁছে আছে। তার সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না। একেবারে ঝানু নাটকলেখক যাঁরা, এই রকম হৃদয়াবেগ ও অস্থিরতাকে কেবল তাঁরাই কিছুটা চেপে রাখতে পারেন, আর কেউ পারে না। ঝানুরাও অনেক সময় পারে না। জিজ্ঞেস করুন, "কি ভাবছেন?" বলবেন, "ভাবছি? ও হাঁ, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার বাজার, চাকরটা সেই সকালে বেরিয়েছিল".... ইত্যাদি। দেখাতে চান যে, নাটকের কথা মোটেই ভাবছেন না।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

মহড়া শুরু করার আগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পালা। এইখানে নাট্যকার সত্যিকার বিপত্তির সম্মুখীন হন। তিনি হয়ত নাটকে পাঁচজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার জায়গা করে রেখেছেন। এই আটজন হবেন নাটকের প্রধান কুশি-লব। থিয়েটারে যত অভিনেতা-অভিনেত্রী রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আট-নয়জনকে বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নাট্যকার তাঁর নাটক রচনা করেছেন, এই কয়জনা ছাড়া আর কারও কথা, নাটক লেখার সময় তাঁর মনেও ছিল না। পার্ট বন্টনের প্রাক্কালে প্রযোজককে তিনি এই আটজনের কথা জানালেন, প্রযোজক বললেন, "তথাস্তু।"

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—

ঐ আটজনের মধ্যে—

১. শ্রীমতী 'ক' নায়িকার পার্ট নিতে পারবেন না, কেননা এখন তিনি আরেক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছেন।

২. শ্রীমতী 'খ' বলে পাঠিয়েছেন তাঁর জন্য নাট্যকার যে পার্ট বরাদ্দ করেছেন, সে তাঁর যোগ্য পার্ট হয়নি—

৩. কুমারী 'গ'কে নাট্যকারের খুশিমত পার্ট দেওয়া গেল না, কেননা কুমারী গত সপ্তাহে কোন্ রাজকুমারের কাচে চাকরি নিয়ে চন্দনগড় চলে গেছেন। তাঁর স্থানে কুমারী 'ঘ'কে নিয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই।

৪. শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে নায়ক করা চলে না; নায়ক করতে হবে শ্রীযুক্ত 'চ'কে; কারণ, গত বারের 'বাজ পড়ে রে ঘর পোড়ে' নাটকে শ্রীযুক্ত 'চ' নায়কের পার্ট চেয়েছিলেন, তাঁকে বঞ্চিত করে সে পার্ট দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত 'ছ'কে।

৫. তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ শ্রীযুক্ত 'ঙ'কে ৫ম পার্টটি দেওয়া যেতে পারত, দুঃখের বিষয় নাট্যকারের উপর খাপ্পা হয়ে সে পার্ট ফিরিয়ে দিয়েছে। ৪র্থ পার্টটিই ছিল তাঁর যোগ্য ভূমিকা; সেটি তাঁকে কেন দেওয়া হল না, এই তাঁর উষ্মার কারণ।

৬. শ্রীযুক্ত 'জ'কে যা'ই দেওয়া হবে, সে তা-ই নেবে; কারণ, সম্প্রতি খোদ-মালিকের সঙ্গে ঝগড়ার পর সে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

৭. শ্রীযুক্ত 'ঝ' ৭নং পার্ট নিতে পারবে না, কেননা যে ৫নং পার্ট ফেরৎ এসেছে, তার জন্য উপযুক্ত লোক আর কেউ না থাকায় তাঁকেই সেটি গ্রহণ করতে হবে।

৮. অষ্টম পার্ট (ডাক-পিয়নের ভূমিকাটি) ঠিক লেখকের খুশিমত লোককেই দেওয়া হবে; আর কাউকে নয়।

কাজেই, দেখতে পাচ্ছেন—অনভিজ্ঞ নাট্যকার যা ভেবে ঠিক করেছিলেন, ব্যাপার হয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্যরূপ; শুধু তাই নয়, অভিনেতৃবর্গের পছন্দমত ভূমিকা হয়নি বলে, নাট্যকারকে তাদের বিরক্তিভাজনও হতে হল।

পার্ট দেওয়া-দেয়ি চুকে যাবার পর থিয়েটারের ভেতরে আবার দু'রকম অনুযোগ শোনা গেল—একদল বলছে, নাটকে অত ভাল ভাল পার্ট থাকতে কেন, বেছে বেছে আমাদের দিয়েছে খারাপ পার্টগুলো। অন্য দল বলছে, নাটকের পার্টগুলোও হয়েছে যেমন, এ দিয়ে কিস্সু করা যাবে না, ঘাড়ে ঠ্যাং তুলে নাচলেও এর থেকে রসকস কিছু বেরুবে না।

প্রযোজনা

নাটক এবার দেওয়া হল প্রযোজকের হাতে। নাটক হাতে নিয়ে প্রযোজক গোড়াতেই বিজ্ঞতার সঙ্গে, যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বলতে শুরু করলঃ নাটককে দাঁড় করাতে হলে একে সাহায্য করতে হবে, একে নাট্যকার যে ধারণায় খাড়া করেছেন, তার থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে খাড়া করে তুলতে হবে।

শুনে নাট্যকার বললেন, "কি আমার আইডিয়া, তা তো বুঝতেই পারছেন। দুঃখ, বেদনা ও মমতা মিশিয়ে গড়ে তুলেছি নাটকের আখ্যানবস্তু।"

প্রযোজক বললেন, "তা করলে তো মশাই চলবে না। একে পুরোপুরি একটা প্রহসনরূপে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাতে হবে যে।"

নাট্যকার বোঝাতে চেষ্টা করে, " দেখুন, নায়িকা উমাতারা হচ্ছে এক ভীরু গ্রাম্য বালিকা, তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না–"

" মোটেই না, মোটেই না। সে হচ্ছে খৃষ্টানী ঘেঁষা শহুরে মেয়ে। নাটকের ৪৭-এর পাতায় এইখানটাতে দেখুন, দীনেশচন্দ্র তাকে বলছে, আমায় আর কষ্ট দিও না উমা; দীনেশ এখানটায় মেঝেয় গড়িয়ে পড়বে, আর উমাতারা হিস্টিরিয়ার ফিটের মত তার উপর 'স্প্রিং' করে দাঁড়াবে, বোঝেছেন? এই রকম করেছেন ত?"

"আজ্ঞে না। আমি এই রকম ভাবিও নি।"

"ভাবেন নি, অথচ এই দৃশ্যটি হবে সবচেয়ে জোরালো। এইরকম না করলে প্রথম অঙ্কের ভাল সমাপ্তি তো আর–কোনোরকমে হতেই পারে না।"

" দেখুন, এই দৃশ্যটা হচ্ছে সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বৈঠকখানা।" নাট্যকার আবার বললেন।

"তা হোক। কিন্তু সিঁড়ি থাকবে বেশ উঁচু। এক সারি বড় বড় সিঁড়ি।"

"সিঁড়ি? সিঁড়িতে কি হবে?"

"উমাতারা তার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলবে 'কক্‌খনো না দীনেশ, কক্‌খনো না।' এই কথাটাকে জোরালো করার জন্য চাই সিঁড়ি, বুঝেছেন, সিঁড়ি হবে অন্তত দশ ফুট উঁচু, তৃতীয় অঙ্কে কালীচরণ এর উপর থেকে লাফ দেবে।"

"লাফ দেবে? লাফ কেন দেবে?"

"এইখানটায় আপনি লেখেন নি যে যেন ছিটকে এসে সে ঘরে ঢুকলো? বেড়ে লিখেছেন। ঐ, লাফ দিয়ে ছিটকে গিয়ে ঘরে ঢুকবে। এখানে ঢোকাটা যা 'স্ট্রাইকিং' হবে মশাই। আপনি তো জানেন, নাটকে কি চাই– কেবল প্রাণ চাই, প্রাণ। এমনি করেই নাটক প্রাণবান হয়ে ওঠে।"

নাট্যকলার গভীরে তলিয়ে যেতে যদি পারেন তো দেখবেন, মঞ্চের সঙ্গে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিশীল নাট্যকার, আর মূল গ্রন্থের সঙ্গে সংযোগ রাখবার বাসনা যাঁর নেই, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিশীল প্রযোজক। আর সৃষ্টিশীল অভিনেতা,–এ বেচারার মাত্র দুটি পথ বেছে নেবার আছে, হয় তাকে নিজের মনের মত অভিনয় করতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে নাটক ভুল পথে প্রযোজিত হচ্ছে বলে প্রযোজনাকে দায়ী করা হয়) নতুবা তাকে প্রযোজকের ধারণামাফিক চলতে হয় (এরূপ ক্ষেত্রে অভিনেতাকে দায়ী করা হয় যে, নাটক সে বুঝতেই পারে নি)।

গ্রহ-নক্ষত্রের কোন এক অপূর্ব যোগাযোগের ফলে দেখা গেল অভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে সংলাপ কারো মুখে ঠেকল না, খটখটে নড়বড়ে সিনসিনারিগুলো ধ্বসে পড়ল না, লাইটগুলোও 'ফিউজ' হল না, আর কোন বাধাবিপত্তি এসেও পথ রোধ করল না। তখন সব কিছুর প্রশংসা পায় প্রযোজক। সমালোচকরা তারই পিঠ চাপড়ে বলে 'বেড়ে মাল হয়েছে দাদা'! তবে এরূপ হওয়া কেবল দৈবেরে ঘটনা। এই প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত হতে গেলে মহড়ার অনেক খুন-খারাবির মধ্য দিয়ে আমাদের এগুতে হবে।

প্রথম পাঠ

আপনি যদি নাট্যকার হন, কিংবা হতে চান, মহড়ার প্রথম দিন উপস্থিত না থাকতে আপনাকে পারামর্শ দিচ্ছি। সে বড় বিরক্তিকর ব্যাপার। সাত-আটজন অভিনেতা যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁরা বেজায় ক্লান্ত; কেউ-বা বসে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে, কারো আসে কাসি কারো বা হাঁচি, নিরতিশয় বিরক্তিতে তারা ভেঙে পড়ে। প্রযোজক এক সময়ে হাঁকে, "এবার শুরু করি, কেমন?"

তাঁরা অনিচ্ছায় আসন গ্রহণ করেন।

'উমার বর', চার অঙ্কের প্রহসন নাটিকা। এক গরীব মধ্যবিত্তের বৈঠকখানা। ডানদিকে দরজা, বাঁদিকে শোবার ঘর। দীনেশ এসে ঢুকল। কোথায় দীনেশ–দীনেশ।

কে একজন বলল, "সে তো 'আতসবাজি' নাটকে স্টেজ রিহার্সেল দিতে গেছে!"

"তার পার্ট তাহলে আমারই বলতে হচ্ছে। দীনেশ ঢুকল, বলল, 'উমাতারা, কি যেন আমার হয়েছে। উমাতারা?"

কেউ সাড়া দিল না।

" কোথায় উমাতারা? গেছে কোন্ চুলোয়?"

কে একজন বলল, "সে যে বিক্রমপুরের এক জমিদার বাড়িতে নাচতে গেছল আজও ত' ফেরে নি।"

"তবে তারও পার্ট আমাকেই বলতে হচ্ছে।" সে উমাতারা আর দীনেশচন্দ্রের সংলাপ আবৃত্তি করে চলল। কেউ তার কথা শুনছে না। যে যার আলাপে মশগুল।

প্রযোজক–"এবার কালোশশী ঢুকবে। কুমারী অঞ্জুবালা, অ কুমারী অঞ্জুবালা, তুমি কালোশশী হয়েছ কিন্তু।"

"জানি গো মশাই জানি।"

"তবে পার্ট পড়। প্রথম অঙ্ক। কালীচরণ ঢুকল–"

"পার্ট আমি বাড়িতে ফেলে এসেছি।"

প্রযোজক এবার কালীচরণ-কালোশশীর পার্ট নিজেই পড়ে চলল। কেউ শুনছে না, একজন ছাড়া। সে নাট্যকার নিজে।

প্রযোজক–"এবার দুঃখহরণ সরকারের ইংরাজি-জানা গিন্নির পার্ট। কই, ইংরাজি-জানা গিন্নি– ঘোমটা খুলে মুচকি হেসে বলবে, "আমার হাসবেন্ড বাড়ি নেই–"

গিন্নি কপি হাতে নিয়ে তার পার্ট বলছে, "আমার সার্ভেন্ট বাড়ি নেই।"

"হাসবেন্ড।" প্রযোজক শুধরে দেয়।

"উঁহু, আমার কাগজে সার্ভেন্ট লিখে দিয়েছে। এই দেখুন না।"

"ওটা নকল করার সময় ভুল হয়ে গিয়েছে।"

"ভুল হয়ে যায় কেন? খালি আমাদের ভুলই ভুল, ওদের বেলা সাত খুন মাপ।"

দেখে শুনে নাট্যকার একেবারে দমে গেল। মনে হল, তার মত অত খারাপ নাটক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেউ লেখেনি।

এবার পরবর্তী স্তর শুরু হয়। স্থান রিহার্সেল কক্ষ। প্রযোজক ও কুশিলবেরা।

প্রযোজক—"এই যে দেয়ালে ছবি ঝুলছে, ধরে নাও ও একটা দরজা। আর ওই ফাঁকা জায়গাতে আরেকটা দরজা। সামনে গোল টেবিল আর একটা হারমোনিয়াম। এদিকের দরজা দিয়ে উমাতারা ঢুকে হারমোনিয়ামে হাত দেবে, ওদিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে দীনেশ। কই দীনেশ, আই মিন আলেখ্য বিশ্বাস?"

একসঙ্গে দুজনের কণ্ঠ শোনা গেল, "তিনি 'ভবতারিণীর খাট' চিত্রের মহড়া দিতে চন্দ্রাবলী স্টুডিওতে গেছেন।"

"আচ্ছা, তার পার্ট আমিই বলছি।" প্রযোজক কাল্পনিক দরজার দিকে এগিয়ে গেল : "উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা, এখন উমা, আই মিন লীনা বাগচি, আপনি তিন পা এগিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াবেন, আর বেশ অবাক হয়ে গেছেন এই ভাব দেখাবেন। উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা। এখন দীনেশ জানলার কাছে এগিয়ে যাবে। এই চেয়ারটাতে বসবেন না যেন, জানেন না, ও হচ্ছে জানলা। আচ্ছা, আবার। আপনি ঢুকবেন বাঁ দিক থেকে দীনেশ ঢুকবে বিপরীত দিক থেকে। 'উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা।"

"বাবা, বাবা, সে চলে গেল, সে চলে গেল বাবা।"

প্রযোজক, "ও কি পড়ছেন?"

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতা।"

"প্রথম অঙ্কের দুয়ের পাতায় ও রকম কিছু লেখা নেই।" বলে প্রযোজক লীনার হাত থেকে পার্ট ছিনিয়ে নেয়, "কই দেখি। হায়রে হায়, এ তো এ বইয়ের পার্ট নয়, অন্য কোন বইয়ের।"

"ও হাঁ, ওরা—মানে ওরা কার্ড পাঠিয়েছিল। বদল হয়ে গেছে।"

" স্টেজ ম্যানেজারের বই দেখে আজকের মতো তো চালান। এই দেখুন, আমি ডান দিক থেকে ঘরে ঢুকছি।"

"উমা, আমার কি যেন হয়েছে উমা"—লীনা পড়তে শুরু করে।

"ও ত আপনার পার্ট নয়। উমা আপনি, আমি নই।"

এইভাবে এগিয়ে চলল। এল কালীচরণের পার্ট।

কালীচরণ ঘড়ি দেখ বলল, "মাই গড। শান্তা স্টুডিওর গাড়ি বোধ হয় এসে গেছে। কি করব, আধ ঘণ্টা ধরে তো দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা চললুম, নমস্কার।"

নাট্যকার ভাবে সব কিছু দোষ তার নিজের। দীনেশ অনুপস্থিত, কালীচরণ চলে গেল। সংলাপের কোনো মহড়াই হল না।

ঝি বলছে, "কালীচরণবাবু এসেছে।" আর উমা বলছে, "তাকে ভেতরে নিয়ে এস," এইটারই সাতবার পুনরুক্তি করে প্রযোজক সবাইকে ছুটি দিল।

নাট্যকার বেদনাদগ্ধ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এল। মনে মনে বলতে লাগল, এভাবে চললে সাত বছরেও মহড়ার কিছুই হবে না।

আরো মহড়া

রিহার্সেল কক্ষ। এখানে দেয়ালে-টাঙানো ছবি হয় দরজা, ভাঙা টেবিল হয় হারমোনিয়াম, শোলার টুপি হয় তুলসী-মঞ্চ। মহড়া হয় বইয়ের শেষ দিক থেকে, এগিয়ে আসে গোড়ার দিকে। ছোট ছোট দৃশ্য বিশবার মহড়া দেয়। বড় বড় দৃশ্যে হাতও পড়ে না। অর্ধেক পাত্রপাত্রী সর্দিগরমির দরুণ অনুপস্থিত, অনেকে পর্দায় মহড়া দিতে যায় বলে এদিকে আসতেই চায় না। তা সত্ত্বেও কাজ এগিয়ে চলে, নাট্যকার বুঝতে পারে, বিশৃঙ্খলার নীহারিকা পিণ্ড সত্যি সত্যি একটা আকার নিয়ে দানা বাঁধছে।

তিন-চার দিনের মধ্যে আরেক ব্যক্তির শুভাগমন হয়। তিনি প্রম্পটার। এখন থেকে কুশিলবরা পার্ট আর পড়ে না, অ্যাক্ট করে। অ্যাক্টে, পাকা-পোক্তরূপ অঙ্গসঞ্চালনাদি দেখে নাট্যকারের আনন্দ ধরে না। সে ভাবে, প্রথম অভিনয় আজ রাতেই তো হতে পারে। অভিনেতারা বলে, আগে স্টেজে রিহার্সেল দিয়ে নিই, তবে তো প্রথম রজনী! অবশেষে অর্ধসমাপ্ত নাটক মঞ্চে দেখা দেয়—পর্দার ওপারে তারা তখনো মহড়া চালাতে থাকে। প্রম্পটার টেবিলে বসে বলে যায়। কিন্তু হচ্ছে না মোটেই।

তিন-চার মহড়ায় বাকি দোষ-ত্রুটি সারিয়ে নিয়ে প্রযোজক আদেশ দেয় প্রম্পটারকে প্রম্পটিং বক্স এ গিয়ে বসতে। এই সময় ঝানু অভিনেতাদের মুখও আমসি হয়ে যায়। তার কারণ, সেই আদি ও অকৃত্রিম "কিছুই হচ্ছে না।' এই সময় তারা কি বলছে, প্রযোজকের খেয়াল সেদিকে থাকে না, তারা কি করছে, খেয়াল থাকে সেদিকে।

ড্রেস-রিহার্সেল

ড্রেস-রিহার্সেল বড় মজার জিনিস। সবকিছুই তৈরি হচ্ছে, অথচ কোনটাই সম্পূর্ণ হচ্ছে না। নায়কের কোটে এখনো বোতাম লাগানো হয়নি, নায়িকার জন্য মোস্ট আপ টু-ডেট ব্লাউজখানা দরজির এখনো মনের মতন হয়নি; সিনসিনারিতে রং লেগেছে, শুকায় নি। কত কিছু দরকার— কোথায় সব? না, পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, অথচ পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যেই ড্রেসরিহার্সেল শুরু। কি যে ঘটবে, দেখবার জন্য নাট্যকার স্টলে চুপ করে বসল। অনেকক্ষণ ধরে কিছুই ঘটল না। মঞ্চ খালি পড়ে আছে। অভিনেতৃগণ আসছে, হাই তুলছে, আর ড্রেসিং-রুমে অন্তর্হিত হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, "পার্টে এখনো চোখ বুলুতে পারিনি।" তারপর আসছে সিনারি, আর গড়িয়ে গড়িয়ে আনছে মিস্ত্রিরা। নাট্যকার অধৈর্য—বড় ঢিমে তেতালায় চলছে, পারতুম যদি নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত মেলাতুম, তবু একটু এগুত। পান-চিবানো পায়জামা-পরা একটি ছেলে একখানা ক্যাম্বিসের দেয়াল টেনে আনল। আনা হল, আরেকখানা। চমৎকার। তৃতীয় দেয়ালখানা এখনা পেন্টিং-রুমে; কাজেই আপাতত ওদিকে একখানা কাপড় টাঙিয়ে দাও, কাজ ত চলুক, প্রযোজক বলে দেয়।

"হাঁ কাজ চলুক।" নাট্যকারের গলা।

প্রযোজক, "ওহে প্রম্পটার, স্টেজ ম্যানেজার প্লিজ।"

স্টেজ ম্যানেজার, " রেডি।"

পরদা পড়ল। ঘরময় আঁধার। নাট্যকারের বুক লাফাচ্ছে—এতক্ষণে, এতক্ষণে তার নাটক সে দেখতে পাবে।

স্টেজ ম্যানেজার প্রথম বেল বাজালেন। যা ছিল শুধু কথার সমষ্টি, এতক্ষণে তা শরীরী রূপ নেবে। দ্বিতীয় বেলও বাজল; কিন্তু পরদা তো কই উঠছে না। তার বদলে পরদা ভেদ করে ইথারে ভেসে আসছে ভিতরে দুই কণ্ঠের কোন্দল ধ্বনি।

"আবার ওরা তর্ক বাধিয়েছে," বলে প্রযোজক চটেমটে ভেতের ঢোকে।

অবশেষে আবার বেল বাজল এবং ঝাঁকুনি খেয়ে পরদাটাও উঠল।

সম্পূর্ণ নূতন একজন মঞ্চে এসে দেখা দেয়, বলে, "উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা!"

একজন মহিলা ওদিক থেকে এগিয়ে আসে, "কি হয়েছে দীনেশ?"

"থামো! এই জানালায় চাঁদের আলো দেখা যাচ্চে না, চাঁদের আলো কই?"

মঞ্চের তলা থেকে কে বলে ওঠে, "চাঁদের আলো ত দিয়েছি!"

"একে তুমি চাঁদের আলো বলছ! আরো আলো চাই; বেশি করে ঘুরিয়ে দাও।"

রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল একদম ঝামেলায় ভরতি। প্রযোজকের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আরো অনেকে যার যার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন সিন্-আর্টিস্ট, স্টেজ ম্যানেজার, বড়ো মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ বিভাগের বড়ো মিস্ত্রি, কারুকৃৎ, প্রপার্টিম্যান, প্রম্পটার, মাস্টার টেলর, মাস্টার ড্রেসার, ফার্নিচারম্যান, স্টেজ ফোরম্যান ও আরো অনেক যান্ত্রিক বিশারদ ব্যক্তি। সজ্জনদের এই সম্মেলনে কেবল ধারালো অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া সব কিছুই ব্যবহার হয়, যেমন চীৎকার, ফেটে পড়া, দাঁত কিড়মিড় করা, চাপা গলায় গালি দেওয়া, গলা ছেড়ে গালি দেওয়া, এক মুহূর্তে চাকুরি খাওয়া, আত্মসম্মানে ঘা খেয়ে টগবগ করে ফোটা, পরিচালকের কাছে নালিশ করা, কথায় রঙ লাগিয়ে শ্লেষ করা এবং হিংসা ও ক্রোধোদ্রেককারী আরো অনেক কিছু করা।

এতে আমি বলতে চাই না যে, থিয়েটারের আবহাওয়া নিতান্ত বুনো কিংবা ভয়ঙ্কর। সে সব কিছু নয়। এর আবহাওয়া একটু খিটখিটে আর খ্যাপাটে ধরনের, এই যা। বড় বড় থিয়েটারগুলো নানা বিরুদ্ধমনা লোক আর বিপরীতধর্মী কাজের সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পরচুলা পরাবার লোক থেকে শুরু করে, যার প্রযত্নে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয় সেই প্রযোজক পর্যন্ত সকলের মধ্যে এর দূরতিক্রমনীয় বিরুদ্ধ মতের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রপার্টিম্যান আর ডেকরেটারের মধ্যে রুচির এক চিরন্তন সংঘর্ষ বিদ্যমান। টেবিলে কাপড় বিছানো ডেকরেটারের কাজ, আবার ঐ টেবিলেই প্লেট কাপ রাখার কাজ পড়ে প্রপার্টিম্যানের কাজের আওতায়। আবার ঐ টেবিলেই যদি ল্যাম্প রাখতে হয় তো সে কাজ বিদ্যুৎ মিস্ত্রির দায়িত্বাধীন।

প্রভু বললেন, "আলো হোক।" অমনি আলো হল। বাইবেল এটুকু বলেই নিরস্ত হয়েছে। সে আলো কেমন হল; হলদে, লাল, নীল না বেগুনি সে সব কিছুই বাইবেলে লেখা নেই। সে আলো কত 'ওয়াটের'—পঞ্চাশ-এক শ' না হাজার। সে কি 'আর্ক', না

'স্লাট', 'ব্যাটেন' না 'ফোট'—সে সম্বন্ধেও বাইবেল নিশ্চুপ। 'ডিমার', 'রিফ্লেক্টার', 'শ্যাডো'— সে সব তো দূরের কথা। প্রভু এ-ও বলেন নি, " সেকেন্ড ব্যাটেনের সুইচ্ খুলে দাও, ঢালা নীল আলো ছাড়ো—না না, নীল চাই না—চাঁদি চাই, চাঁদি আলো।" প্রভুর সময় এসব ঝামেলা ছিল না। তখন সময় ছিল সহজ। তার কারণ, তখন থিয়েটার ছিল না। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন আলো, তারপরে মানুষ, তার পরে থিয়েটার। ড্রেস রিহার্সেলকে "আলো হোক" ব্যাপারটির রিহার্সেল বলা চলে। পার্থক্য এই, প্রভুর সময়ে ব্যাপারটি যত সহজ ছিল, এ ক্ষেত্রে তত সহজ নাই।

নায়ক হাঁক দিলেন প্রযোজককে, "মশাই, রিহার্সেল কি আমরা করব, না করব না।"

চীৎকার-ক্লান্ত প্রযোজক ফেটে পড়েন, " কেন, করেন নি কেন? কি করছেন এতক্ষণ ধরে?

"উমা, কি যেন আমার হয়েছে উমা!"

প্রযোজক, "এই, এই, হচ্ছে না, থার্ড ব্যাটেনের আলো অর্ধেক কমিয়ে দাও।"

আমার কি হয়েছে দীনেশ?

"আরো হবে, আরো। আরো নীচু করো। কথাও, আরো কমাও।"

বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি, "মশাই, থার্ড ব্যাটেনের আলো একবোরেই নিবে গেছে—আর কমানো চলল না।"

"নিবে গেছে? তবে ওখানে জ্বলছে ওটা কি?"

"ওটা অ্যাক্টিং এরিয়া লন্ঠন। অ্যাক্টিং এরিয়াতে ওটা জ্বালিয়ে রাখতে আপনিই বলেছিলেন।"

"থামো, আমি কি বলেছিলাম না বলেছিলাম তোমার দেখে কাজ নেই। তুমি অ্যাক্টিং এরিয়া লন্ঠন নিবিয়ে দাও, আর, দেখ, থার্ড ব্যাটেনের সুইচটা ছ' অবধি তুলে ধর।"

"তোমার কি হয়েছে দীনেশ?"

"ভুল হয়েছে। অ্যাক্টিং এরিয়াতে হলদে আলো চাই—'ফ্লোট' মারো।"

এক মুহূর্ত সব চুপচাপ—স্তব্ধ, শান্তিপ্রদ নীরবতা।

প্রযোজক, "ওকি, কেউ কিছু বলছে না যে।"

স্টেজ ম্যানেজার, "উমা ওদিক দিয়ে কোথায় যেন গেল স্যার।"

"যাওয়া উচিত হয় নি। তাকে এক্ষুনি স্টেজে যেতে হবে।"

"কিন্তু।"

"রাখুন আপনার 'কিন্তু'। শুরু হোক।"

শুরু হয়।

"উমা, আমার যেন কি হয়েছে উমা।"

" তোমার কি হয়েছে দীনেশ?"

এমন সময় দুজন লোক একটা 'সাইড-সিন' টেনে নিয়ে এলো এবং জানালার ধারে সেটা দাঁড় করাতে লাগল।

সুর সপ্তমে চড়িয়ে প্রযোজক বলেন, " তোমরা এখানে কি চাও?"

"পরদা টাঙাতে চাই।" বলে তারা নির্লিপ্তভাবে সিঁড়িতে পা দিল।

"কি টাঙাতে চাও? কিসের পরদা? ভাগো। কেটে পড়। আগে টাঙাওনি কেন?"

"কাপড় আগে পাঠানো হয়নি বলে", "তৈরি করতে দেরি হয়েছে স্যার"–টেকনিক্যাল এজেন্ট এই কথা বলতে না বলতেই প্রযোজক চটেমটে তাকে মারতে এলো; তাকে ধাক্কা মারতে এলো, সিঁড়ি মইগুলোকে লাথি মারতে এলো, উপস্থিত যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে দলিত, মথিত ও বিমর্দিত করতে এলো এবং এসে থেমে গেল।

নাট্যকার চোখ কান বুজে বসল। তার তাক লেগে গিয়েছে। এরই নাম ড্রেস রিহার্সেল। প্রকৃতির উপর যেমন ঝড় আসে, এখানেও তেমনি ঝড় আসে। এখানে সবাই রেগে আছে–প্রযোজক, অভিনেতা, মিস্ত্রিরা, সবাই। রাগ, অসন্তোষ, ক্লান্তি, বিরক্তি, বিমর্ষতা,–সবকিছু মিলে বিদ্রোহ জাগায়–এই, ক্লান্তিদায়ক, এই নিরবয়ব নাট্যশালা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। এই হচ্ছে ড্রেস রিহার্সেলের সত্যিকার 'মুড'।

অবশেষে প্রযোজক স্টলে তার নিজের জায়গায় ফিরে আসেন। দেখে তাকে মনে হয় দশ বছর বুড়িয়ে গেছেন। ভাঙা গলায় বলেন, "আবার শুরু হোক।"

"উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা।" নায়ক বলে।

" তোমার কি হয়েছে দীনেশ?" নায়িকার কণ্ঠে গাঢ়তা।

শ্রান্তি, বিমর্ষতা এবং তিক্ততার মধ্য দিয়ে এভাবে ড্রেস রিহার্সেল এগিয়ে চলে।

"খারাপ! স্রেফ খারাপ হচ্ছে", প্রযোজকের গলায় সহসা অসম্ভব জোর এসে যায়; "কিছুই হচ্ছে না, আবার ফিরে শুরু করতে হবে।" অভিনেতৃদল ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে, তাদের পা কাঁপে, গলায় কথা বসে যায়, স্মৃতিশক্তি উবে যায়, মনে শুধু এই জিজ্ঞাসা কতক্ষণ এর শেষ হবে।

অবশেষে এর শেষ ঘনিয়ে আসে। অভিনেতাদের মুখে কথা নেই। তারা ছাড়া পাওয়া বদ্ধ জলার মাছের মতো বাইরে মুক্ত বায়ুতে গিয়ে হাঁফ ছাড়ে। নাট্যকার কাঁধে এক বোঝা ক্লান্তি নিয়ে মাথা নিচু করে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কাল প্রথম রজনী। যা দেখছে, তাতে প্রথম রজনী তার চোখে শেষ রজনীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

হায় নাট্যকারবৃন্দ, হায় প্রযোজক আর অভিনেতার দল! হায় ছুতোর মিস্ত্রি, বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, সজ্জাশিল্পী, কারুশিল্পীর দল! তোমরা সবাই জান– ড্রেস রিহার্সেল কতখানি বিরক্তিকর। তবু তোমরা আবার পরবর্তী ড্রেস রিহার্সেলের দিনটির প্রতীক্ষা কর! সে কি ক্লান্তি আর বিরক্তিকর বলেই?

নাটকে নাট্যকারের স্থান

নাট্যকার নাটক লিখে থিয়েটারে দেবার পর যে-সমস্ত কাণ্ডকীর্তন হয়, তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। প্রথমবারের 'পাঠের' পর সে নাটকের কি চেহারা হয়, তারপর

প্রথম রিহার্সেল থেকে ড্রেস পর্যন্ত যা ব্যাপার ঘটে, তারও কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। নাট্যকারের রচিত কথা থিয়েটারের অবয়বে রূপ পেতে দেখে নাট্যকার কেমন বোধ করে, তাও দেখানো হয়েছে। আরো দেখিয়েছি—নাট্যকার তার নাটক নিয়ে তার-কেন্দ্ররূপে বিরাজ করে—আর সমগ্র থিয়েটারি পদ্ধতিটা কিভাবে আবর্তন করে।

দেখেছি, লেখক যা লিখেছিল, তার মধ্য দিয়ে নাট্যকলা লক্ষ্মীকে সশরীরে উদ্বোধনের জন্য কি রকম সাংঘাতিক জটিলতার উদ্ভব ঘটে, অথচ, নাটক রচনায় নাট্যকার অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও (নাট্যকার ছাড়া কে আর নাটক লিখতে পারে বলুন) নাট্যশালায় নাটক-অগ্রগতির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাকেই মনে হয় সবচেয়ে নগণ্য। নাটক নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ও বেচারার কথা কাকেও বড় কানে নিতে দেখা যায় না। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও বড় একটা করে না। নাট্যশালার শশব্যস্ত "বিদারণ আর উদ্‌গীরণাত্মক" ভাবের মধ্যে নাট্যকারকে মনে হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। একমাত্র সেই এর মধ্যে ঝঞ্ঝাট আর ঝকমারির পাত্র নয়। 'ফ্লাড লাইট' বা 'স্পট লাইট' দিয়ে তার ব্যক্তিক অবয়বকেও উজ্জ্বল করে দেখানো হয় না। রঙ মেখে সঙ সাজার বালাইও তার নেই। অভিব্যক্তি প্রকাশের সুবিধার জন্য তার পায়ের তলায় সিঁড়ি আর পিঠের পাশে দরজা রাখারও প্রয়োজণ নেই। অথচ তার নাটক-লেখক হওয়ার দরুণ এখানে যা-কিছু ঘাতপ্রতিঘাতের, তোল-পাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নাটকের খাতিরে, তাকে উৎকর্ণ হয়ে সব কিছুর দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিতে হয়। তবু সারাক্ষণ তার মনে হয়, এখানে তার কোনো গুরুত্ব নেই। সে যে এতবড় একটা যজ্ঞকাণ্ডের মূল পুরোহিত, এ কথা যেন কেউ মনেই আনতে চায় না। আসবাববাহীরা টেবিল চেয়ার বয়ে নিয়ে যথাস্থানে রাখে—নাট্যকার যেন তাদের আসাযাওয়া পথের একটা বিঘ্ন মাত্র; এছাড়া আর কিছুই নয়। সে কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, কাজে লাগাতে পারে না। বরং বিদ্যুৎ মিস্ত্রি আর ছুতোর মিস্ত্রিদের যাতায়াতের ব্যাঘাত ঘটায় বলে, অপরাধীর মত, সে নাট্যমঞ্চের অভ্যন্তরে সন্তর্পণে পায়চারি করে।

কার্যতও তাই। শুধু তাই নয়, আরো বেশি। বস্তুত নাট্যকার নিজেকে, সেখানে যতখানি নগণ্য মনে করে, তদপেক্ষা সে আরো অধিক নগণ্য। তার সবটা কাজই তখন অপরের দায়িত্বের অধীন হয়ে গেছে। প্রযোজক নিজের মনে এই দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করে নেয় যে, নাটকটা হতো খুবই ভালো, কেবল নাট্যকার তার গল্প দিয়ে ওটাকে মাটি করে দিতে বসেছে। প্রযোজক নিজে কি সুন্দর নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, অথচ নাট্যকার তার বই দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। কাজেই, যে বইয়ের আদৌ কোনো নাট্যকার নেই, সেই হবে শ্রেষ্ঠ নাটক। অভিনেতা অভিনেত্রী না থাকলেও বোধ হয় ভাল হত, কেন না, নাটকের সাফল্যের মূলে এরাও এক একটা প্রতিবন্ধক। প্রযোজকের সৃষ্টিকার্য যেমন কঠিন, তেমনি কঠোর। যা লেখা হয়েছে তাঁকে তার চাইতেও মহৎ কিছু উত্তম কিছু সৃষ্টি করতে হয়।

প্রথম রজনী

অবেশেষে প্রথম রজনীর সাংঘাতিক মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। এবার নাটকখানা একটা 'বস্তু'তে পরিণত হবে, একটা ঘটনা হয়ে দেখা দেবে। শেষ মহড়া পর্যন্ত এর পরিবর্তন আর পরিবর্জন চলে। কারণ এ তখনো বস্তু হয়ে ওঠেনি। পৃথিবী যেমন কাঠিন্য প্রাপ্তির পূর্বে ছিল অগঠিত, উত্তাপের আকার বিশেষ, নক্ষত্র যেমন শুরুতে ছিল নীহারিকার ধূম্রজালে নিরবয়ব অগঠন; এও ছিল ঠিক তেমনি। তাকে নিজের পথে চলবার, গতি নেবার অধিকার দেওয়া হয় যখন– সে হল প্রথম রজনী। এই সময়ে নাট্যকার বা প্রযোজক আর নিজের ঘাড়ে বোঝা না রেখে অপরদের ঘাড়ে তুলে দেয়। এখন আর প্রতিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার তাদের আর সুযোগ থাকে না।

প্রথম রজনীর সকাল বেলা হয় শেষ মহড়া। কুশীলবরা অতি দ্রুত তালে, সুর না করে, কেবল চাপা গলায় পাঠগুলো আওড়াতে থাকে–চাপা গলায়, তার কারণ, সকালে পাঠ পড়ে বিকালের গলা পাছে নষ্ট হয়, ভেঙে যায়।

প্রথম রজনীর একটা নিজস্ব ভঙ্গি, স্বকীয় সত্তা আছে। প্রথম রজনী হচ্ছে চিরকেলে প্রথম জননী। জনসাধারণের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যারা মাত্র প্রথম রজনীতে থিয়েটার দেখতে যায়। তারা নাট্যানুরাগপ্রবণতার তাগিদে, কৌতূহলের পরবশতায় কিংবা বাহাদুরি দেখবার জন্য অথবা বন্ধুদের মনোরঞ্জনার্থ তাদের নিয়ে অথবা প্রণয়িনীদের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তাদের নিয়ে প্রথম রজনীতে থিয়েটার দেখতে যায়। তারা যাবেই, এবং প্রথম রজনীতেই যাবে, আর কোনো রজনীতে নয়। এই হচ্ছে অনেকের অভিমত। এ অভিমত সত্য কিনা জানি না। তবে আমার অভিমত হচ্ছে, তাদের এ যাওয়ার মধ্যে এক নৃশংস নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান। অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্খলন ও বিচ্যুতি, নাট্যকারের মর্মবেদনা এবং প্রযোজকের মনোপীড়া–এগুলিকেই নিতান্ত জান্তব রক্তপিপাসার তাগিদে প্রাণ ভরে ভোগ করার জন্য তারা প্রথম রজনীতেই যাবে এবং প্রথম রজনীতে যাবেই।

পুরোনো রোম নগরীতে প্রথম যুগের খ্রিস্টভক্তদের উপর নির্যাতন প্রত্যক্ষ করবার জন্য যেমন নৃশংস মনোবৃত্তি নিয়ে লোকে সার্কাসে যেতো, প্রথম রজনীতেও লোকে যায় সেই মনোবৃত্তি নিয়ে। সেদিন থাকে এমনি একটা ভাব : যে কোনো মুহূর্তে এই বুঝি সব ভেস্তে যাবে, মঞ্চের উপর যা হচ্ছে, এই বুঝি কোনো একটা কারণে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাদের এই মর্মন্তুদ অবস্থাকে উপভোগ করা আর যাই হোক রসিকের কাজ নয়।

প্রথম রজনীতে দর্শকরা যখন স্ব স্ব আসনে বসে মৃদু গুঞ্জন করতে থাকে, নাট্যকারকে তখন দেখা যায় হলের এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে কিসের এক অসহ্য অননুভূত উৎপ্রেরণার চাপে। কুশীলবরা মেক-আপ নিয়ে আড়াল থেকে হলের দিকে উঁকি মারছে। সবারই চোখে 'প্রথম রজনীর আতঙ্কের ছাপ।' সাজের কক্ষ থেকে শোনা যাবে রাগ বিরাগের পালা; টুপিটা খোলতাই হয়নি, শাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না; অমুকটা আমার না হয়ে অমুকের হল কি করে। ইত্যাদি। প্রযোজক গজরাতে থাকে,

প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের সিনারি এখনো এসে পৌঁছলো না। স্টেজ ম্যানেজার ড্রেসিং রুমের জন্য শেষ ঘন্টা মেরেছে, সব কিছু তৈরি; তারপরে দেখা গেল শেষ সিনারি তৈরি হয়ে পৌঁচেছে।

এই সময়ে আপনি গুঞ্জনমুখর হলের মধ্যে বসে, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে যদি বলেন, "নাঃ, এতক্ষণে শুরু হওয়া উচিত ছিল", সেই মুহূর্তে যদি পরদার দিকে কান পাততে পারতেন তো শুনতে পেতেন : হাতুড়িঠোকার সঙ্গে মনুষ্যকণ্ঠের চাপা আওয়াজ।

"বলি ওটা রাখব কোথায়?"

"এটা আবার এখানে ঢোকাচ্ছিস, বোকা কোথাকার।"

"এই, এদিকটা ঠেলে ধর, পড়ে না যায়।"

" রেখে দে, আজ আর হয়ে উঠলো না। কাল দেখা যাবে।"

ক্রিং। প্রথম ঘণ্টা পড়ল। আলো নিবলো। হল নিশ্চুপ। তবু ভেতরে হাতুড়ির শেষ কটা আঘাতের শব্দ শুনতে পাবেন। আর পাবেন ভারি ভারি চেয়ার টেবিল টানার শব্দ। আর চাপা চিৎকার

"ওটা থাক এখন সরো!"

"এটা ঠেলে ধর। জলদি।"

ক্রিং। পরদা উঠছে। যারা কাজ করছে তাদের পায়ের গোড়ালির উপর দিয়ে পরদা উঠল।

আর তার সঙ্গী। কপালে স্বেদবিন্দু। কিন্তু দর্শকের আসন থেকে তা চোখে পড়বে না। সঙ্গী ঢুকলো সাহেবী কায়দায়। টুপিটা টেবিলে না রেখে রাখল চেয়ারের উপর। রাখল বললে ঠিক হবে না। যেন ছুঁড়ে মারল। কণ্ঠে গাঢ়তা এনে বলল, "গুড় মর্নিং, ভাল আছ উমা?" সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিল : "আই মিন (অনুচ্চ), উমা, আমার কি যেন হয়েছে উমা!"

উমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। সে খেই হারিয়ে ফেলল। সব ভুলে মেরে দিয়ে উপস্থিত বলে ফেলল, "গুড মর্নিং।"

" .... আমার কি যেন হয়েছে।" বলে দিল প্রম্পটার চাপা কণ্ঠে।

কি বলবার ছিল তার সঙ্গে খেই রাখতে গিয়ে অভিনেতা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল। সে স্মরণে আনলো যে, নাট্যকারের মতে এখন মর্নিং নয়। বিকেলের শেষ।

উমা অনুচ্চকণ্ঠে বলে দেয়, "এখন তো মর্নিং নয়; ভেবে চিন্তে শুরু করুন।"

"ও হ্যাঁ, ঠিক। উমা, কি ...... ও হ্যাঁ!"

"তোমার কি যেন একটা হয়েছে, তাই না?" উমা চাপা গলায় তাকে সাহায্য করতে লাগল।

"হাঁ হাঁ", সঙ্গী উৎসাহিত হয়ে উঠল, "উমা, আমার কি যেন হয়েছে, উমা।"

"তোমার কি হয়েছে?" উমা টপ করে বইর সঙ্গে খেই মিলিয়ে দিল। নাট্যকার তার বক্সে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। ওঃ, যা দুর্ভাবনা তার হয়েছিল। যা হোক, উপস্থিত বাঁচা তো গেল। কিন্তু তার মগজ বুঝি বা বিগড়ে যাবে। ইচ্ছা হল, বক্স থেকে

লাফিয়ে দর্শকদের মাঝখানে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে, "আবার শুরু কর, এটা এ রকম তো হবে না। আবার শুরু কর। আর একবার।" ধীরে ধীরে সে আপনা থেকে শান্ত হয়ে আসে।

মঞ্চের উপর সংলাপগুলি বিদ্যুতের ছুরির মতন ধ্বনিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে উমার চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়বার কথা, কারণ তার পা দুটো ভেঙে আসবে। কিন্তু ও হরি, তার সঙ্গী ওখানে টুপি রেখেছে যে। আনমনা হয়ে বসতে হবে; ওটা সরিয়ে দিয়ে বসা তো চলবে না। তা হলে সবটা দৃশ্য মাটি হয়ে যাবে। উৎকণ্ঠায় নাট্যকারের হাত-পা ঘেমে উঠল। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না ওই সর্বনাশা টুপিটাকে ছাড়া। ওই সর্বনাশা মুহূর্ত যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। এসে পড়ল যে ওই মূর্ছিতের মতো চেয়ারে ঢলে পড়বার মুহূর্ত। এখন কি করা যায়? এখন যদি বাইরে সাইরেন বাজতো! যদি নূতন করে ছোরা মারামারি লেগে যেতো। কোনরকমে ঘরে একটা গোলমাল লেগে যেতো যদি, উপস্থিত তা হলে মান বাঁচত? কি করব! কি আমি করব? "আগুন আগুন" বলে চেঁচাব?

এই এলো, এই এলো সেই মুহূর্ত। বিদ্যুতের বেগে, এই এলো। এই এক্ষুণি উমা এই আপদ টুপিটার উপর ভেঙে পড়বে—এই, এই—নাঃ, ঈশ্বরই উমাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে। আত্মসচেতন উমা বেমালুম টুপিখানা হাত দিয়ে তুলে নিল তারপর—মাত্র তারপর সে মূর্ছা খেয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়ল। টুপিটা তখনো তার হাতে। কিন্তু এটাকে দিয়ে উমা করবে কি? দৃশ্যের শেষ পর্যন্ত কি ওটাকে সে হাতে নিয়েই থাকবে না কি? টেবিলে রেখে দিলেও তো পারত। অবশেষে তাই করল মূর্ছিতাবস্থাতেই টুপিটা টেবিলে রাখল। কি ভয়ানক ব্যাপার। নাট্যকার দর্শকদের দিকে চোখ দিয়ে তাকাল। যা, টুপির পর্বটা দেখছি সকলেরই দৃষ্টি এড়িয়েছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল তার। মঞ্চের দিকে তাকালো। কই সংলাপ তো একটুও এগুচ্ছে না। ওই 'ভাব' দেখাতেই যে সময় কাবার হয়ে যাবে। সত্যি এ বড় একঘেয়ে লাগছে—এভাবে সময় নষ্ট করা।—এটা আমার কেটে দেওয়া উচিত ছিল। এটা বড় দুর্বল, একঘেয়ে আর বড্ড খারাপ। এখানটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিলে ভাল করত। তা করছে কই? কি করা যায়? উঠে চেঁচিয়ে বলা যায়, "থামো, থামো, এটা আমি কেটে বাদ দিচ্ছি।"

শেষ পর্যন্ত ওটা শেষ হল—এই নির্বাক ভয়ানক অবস্থাটা। এখন নায়ক-নায়িকার সংলাপের দ্বারা আত্মবিকাশের স্থানটা এসে পড়ল। এটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান—সারাটা দৃশ্যের এটা চাবি-কাঠি। তিন পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত মিঠে-কড়া সংলাপ। ভয়ে ও উত্তেজনায় নাট্যকারের দেহ কুঁকড়ে যেতে চাইছে। সুনয়নী হুমড়ি খেয়ে মঞ্চে ঢুকল। তার মঞ্চে প্রবেশের কথা ছিল পাঁচ মিনিট পরে—সংলাপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। হা ভগবান! এখন কি হবে। "পরদা ফেল, পরদা ফেল" বলে নাট্যকার চিল্লাতে গেল, কিন্তু স্বর বেরুলো না, গলা তার ভয়োত্তেজনায় আটকে গিয়েছে। মঞ্চে যে দুজন রয়েছে তারাও বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে না। এদিকে সুনয়নী তার পার্ট বলতে শুরু করেছে যে! আগের দুজন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

এভাবে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী সংলাপের হল সমাধি। সমগ্র দৃশ্যের চাবিকাঠি ধূলোয় গড়াচ্ছে। যা হয়েছে, তাতে, নাটকের কিছুই দর্শকরা বুঝতে পারবে না, নাটকে কি আমি বলতে চেয়েছি, লোকে তার এতটুকু জানতে পারবে না। সব উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে গেল। সব সংঘাত টুকরো হয়ে গেল। ওই তিন পৃষ্ঠা সংলাপ বাদ পড়াতে সবটা নাটক অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সুনয়নীটা কি করল। এত আগে স্টেজ ম্যানেজারই বা তাকে স্টেজে ঢুকতে দিলে কি করে? দর্শকরা নাটকের এই অসংলগ্নতায় বিরক্ত হয়ে এখনি হয়ত চাপা গুঞ্জন শুরু করে দেবে। নিতান্ত বালকেও বুঝতে পারবে, নাটকটার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই প্রযোজক কি করবে?

সে নাটক বন্ধ করে দেয় না কেন? নাট্যকার চকিতে একবার দর্শকদের দিকে তাকায়। তারা ইতিমধ্যেই কলরব শুরু করেছে কিনা, প্রতিবাদ করতে আস্তিন গুটাচ্ছে কিনা। না, তারা শান্ত আছে, তাদের কারো কারো নাক ডাকছে, কেউ কেউ কাশছে--কখনো কখনো তাদের এখানে ওখানে টুকরো হাসির ঢেউ খেলছে। বোধ হচ্ছে যেন, সুনয়নী ঠিক কাজই করেছে। দর্শকরা খুশি আছে, অঙ্কের শেষে বোধ হয় তারা শিস দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে। নাট্যকারের অবস্থা ঠিক ত্রিশঙ্কুর মতো হয়ে যায়, না পায় মাটি না পায় স্বর্গ। বক্স থেকে এক দৌড়ে উইং এর দিকে যায়। মঞ্চে আগুন লাগিয়ে দিলেও বুঝি তার জ্বালা জুড়োবে না। দর্শকদের সামনে সে আর কখনো মুখ দেখাতে পারবে না। একটা সাজকক্ষে ঢুকে পড়ল সে। মাথা গুঁড়ে ভাবতে লাগল। দুই হাতে মাথা চেপে ধরল।

মাথা তুললো কয়েক ঘণ্টা পর। অসহনীয় অচিন্ত্যনীয় কয়েকটা ঘণ্টা তার ভাবনার সমুদ্রে ডুবলো। তারপর সে মাথা তুললো। বাইরে কি যেন হচ্ছে। জলের যেন স্রোত বয়ে চলেছে। কল কল কুল কুল শব্দে। সে শব্দ চীৎকারে পরিণত হল। সাজ-কক্ষের দ্বারে এসে তা ধাক্কা দিল : "এইখেনে নাট্যকার বসে আছেরে, এইখেনে।" কে এসে তার হাত ধরল, টেনে চলল তাকে নিয়ে। তারপর এক তুমুল কাণ্ড। টেনে, ধাক্কা মেরে ঠেলে, উঁচু করে তুলে তাকে নিয়ে চলল। বাধা দেবার জন্য সে জোর করল, ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল, কিন্তু পারল না। সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, চোখে কিছু দেখছে না, কানে কিছু শুনছে না, কি যে হচ্ছে, কিছুই তার ধারণায় আসছে না। জনতা টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে শেষে মঞ্চের উপর নিক্ষেপ করল। কামান থেকে যেভাবে গোলা নিক্ষেপ করা হয় ঠিক সেইভাবে। সেখানে উমা আর সুনয়নী দুদিক থেকে তার দুই হাত ধরে ফুট লাইটের দিকে টেনে আনল। নিচে জনসমুদ্র—শত শত হস্ত, শত শত চক্ষু—সব তার দিকে উদ্যত। সে একবার বোকার হাসি হাসতে চেষ্টা করল। ঘাড় নাড়ল এবং কম্পিত হস্তে জনতাকে নমস্কার করল।

পরদা পড়ল। আবার কোলাহল। এবার শত শত হাততালি। আবার উঠল পরদা। যারা চেনা লোক, তারা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। অচেনা যারা নানারূপ ধ্বনি দ্বারা তাকে অভিনন্দিত করল। সকলের মুখে হাসি আর কোলাহল। নাট্যকারের দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এইক্ষণে মনে হয়, এ রঙ্গমঞ্চের যেন সেই অভিনেতা। আবার সে অসহায় বোধ করে। বিপন্নের মতো কোনো রকমে সে এক পাশে কেটে পড়ল।

উত্তেজনা থেমে এলে প্রযোজক স্বগত বলল, "যদি খারাপ কিছু না ঘটে, তা হলে নাটকের সাফল্য মারে কে?"

নাট্যকার কোনো রকমে ঘাড় তুলে বলল, " দেখুন মশাই উমা তো চেয়ারখানাতে টুপির উপরেই বসতে পারত। আমি প্রথম দৃশ্যের কথা বলছি যেখানে উমা মূর্চ্ছিত হয়ে চেয়ারের উপর ভেঙে পড়ল। দর্শকরা হয়ত টিটকারি দিয়েছে ঐ দৃশ্যে।"

"টিটকারি দেবার কিছু নেই মশাই নাট্যকার। চলুন চলুন, এগারোটা নাগাদ বসে থাকার কোনো মানে হয় না।" বলে প্রযোজক উঠে পড়েন।

বেচারা নাট্যকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের ধন্যবাদ দিতে গেল। তারা তখন চা খাচ্ছে। নায়ক পেয়ালা মুখ থেকে সরিয়ে ধন্যবাদের উত্তরে বিনীত হেসে বলল, "বইয়ের তিন পাতা পার্ট আমরা বাদ দিয়ে অভিনয় করেছি, কারণ পেরেকে ঠেকে উমার শাড়ি গেল ছিঁড়ে আর অসময়ে ঢুকলো এসে সুনয়নী।"

সুনয়নী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, "অত সময় ঠিক করে কেমন করে ঢুকবো, আমি কি ঘড়ি চিনি? না আমাকে ভালো মাইনে দেয়—"

উমা কেঁদেই ফেলল, "এই রকম করে শাড়ি পরায়,....... প্রথম রাতেই........এখন আমি কি করে বাকি অভিনয় করব। আমার কি হবে ...... এ ......"

নগণ্য নাট্যকার তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, "তাতে কি, তাতে কি—তিন পাতা সংলাপ বাদ পড়েছে, কি হয়েছে তাতে। দর্শকদের কারুর চোখেই ওটা পড়েনি।"

নাট্যকার যা ভেবেছিল। তার থেকে এখানে যা বলেছে তাই বেশি ঠিক। বাস্তবিক, প্রথম অঙ্কটার যে না হয়েছে মাথা না হয়েছে মুণ্ডু দর্শকদের কেউ তা ধরতেই পারেনি।

প্রথম রজনীর পর

প্রথম রজনীর পর নাট্যকার ভাবতে থাকে, তার নাটক সফল হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে। কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না। দর্শকরা তাকে তুমুল চীৎকারে নন্দিত করেছে। কিন্তু এওতো হতে পারে তারা তাকে বোকা বানাবার জন্যই ওরকম করেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় তার সময় কাটে। বন্ধুদের তার সম্বন্ধে কথাবার্তা যা তার কানে আসে তা এই রকম :

"তুমিতো বেশ নাট্যকার হয়েছ হে।"

"আমি যদি তুমি হতুম, প্রথম অঙ্কটার খানিকটা কেটে বাদ দিতুম।"

"অভিনয় করেছে বেড়ে, মাইরি।"

"আমার মর্মোচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন তোমাকে আমি জানাই বন্ধু।"

"তৃতীয় অঙ্কটা আরো খাটো করা যেত হে।"

"আমি লিখলে, শেষটা অন্য রকম হত।"

"শেষ দৃশ্যটাই হয়েছে চমৎকার।"

"দ্বিতীয় অঙ্কটা একটু একঘেয়ে লেগেছে।"

"তুমি যা লিখেছ তার জন্য তুমি সন্তুষ্ট বোধ করতে পার।"

নাট্যকার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, ওটা কি সার্থকি হয়েছে, না ব্যর্থ হয়েছে। সে বাজারের সরকয়টা কাগজ কিনে আনল। তারা কি লিখেছে দেখবে।

কাগজগুলো পড়ে সে যা বুঝতে পারল তা এই যে, তার নাটকে একটা আখ্যানবস্তু আছে সন্দেহ নেই, তবে আর সব যে কি হয়েছে না হয়েছে সে সম্বন্ধে সমালোচকদের নানা মুনির নানা মত। তাদের লেখা থেকে সে বুঝল যে, তার নাটক : ১. অনেকের ভালো লাগবে, ২. অনেকের ভালো লাগবে না, ৩. দর্শকদের একাংশ শিস দিয়েছে, ৪. নাট্যকারের সাফল্য অনেকের আনন্দের কারণ হয়ে থাকে।

প্রযোজক সম্বন্ধে : ১. ওর কিছু করার ছিল না, ২. যা পেরেছে করেছে, ৩. মূল বই অনুসরণ করেনি, ৪. কষ্ট করেছে যথেষ্ট।

অভিনয় সম্বন্ধে : ১. জোরালো হয়েছে, ২. মন্থর হয়েছে, ৩. উৎসাহের সঙ্গে করেছে, ৪. পাট তারা বুঝতে পারেনি, ৫. নাটকের সাফল্যের জন্য তারা অনেক খেটেছে ইত্যাদি।

কাজেই এ সব মতামত পড়ে লেখক বুঝতেই পারল না নাটক সার্থক হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে।"

সাপ্তাহিক দেশ : ১৫ বর্ষ ৫ ও ৬ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ২০ ও ২৭, ১৩৫৪
তে প্রকাশিত দু সংখ্যায় ছাপা হয়। দ্রঃ পৃঃ ২১২-১৫, ও ২৫৭-৬১

পাদটীকা :

এই রম্যরচনাটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনা করেন চেক নাট্যকার কার্ল কাপেকের How a drama is produced অবলম্বনে। দেশে ছাপার সময়ে অলঙ্কৃত করা ছিল। রেখা অঙ্কনগুলো এখানে বর্জন করা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ নামে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রাচীন চীনা চিত্র-কলার রূপ ও রীতি

প্রাচীন চিত্রকলার আদি ও অন্ত দুই-ই রহস্যাবৃত। এর উৎস কোথায়, তা যেমন খুঁজে বার করা সহজ নয়, তেমনি কবে থেকে প্রজাপতির মত রঙিন-এর পাখাগুলো খসতে শুরু করেছিল, অন্তর্ঘাতী আত্মবিপ্লবে বিক্ষত চীনের বিশৃঙ্খল ইতিহাস খুঁজে তা বের করা দুঃসাধ্য। তবে, চীনা শিল্পে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় যে রূপই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বহুদিন থেকে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তাকে জাগাবার প্রয়োজনেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে চীনা নব্য চিত্রকলার গোড়াপত্তন হয়।

এই নব্য চিত্রকলাকে বর্ণসঙ্কর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এর মূর্তি স্বদেশে হলেও তার অঙ্গরাগ হয়েছিল বিদেশী রূপ ও রসে। কয়েকজন চীনা যুবক ঐ সময়ে ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে গিয়ে সেখানকার রূপ ও পদ্ধতি শিখে এসে চীনে তা প্রবর্তিত করেন। একদল আবার জাপান থেকেও কিছু পাশ্চাত্য প্রভাব আহরণ করেন; ঐ প্রভাব জাপানে এর আগেই স্থান করে নিয়েছিল।

মোটামুটি ভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে এঁরা নানা নব্য ভাবধারায় চীনা শিল্পকে রূপায়িত ও রসায়িত করেন। এঁদের মধ্যে হোয়ান-চুন-পি, ফাঙ শিউন কিং, শিয়া ও-তিন, কুয়ান-শান-ইয়ে, চ্যাঙ তা-চিয়েন ও শজুপিও'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জনকে নব্য চীনের শিল্পাচার্য বলা যেতে পারে। শিল্পচর্চা তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হলেও তাঁর জীবনের মুখ্য ব্রত হচ্ছে শিল্প শেখানো। তাঁর আরও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও চীনা শিল্পের প্রাচীন রীতি পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন। শিল্পের বর্ণসঙ্করত্ব তাঁর অভিপ্রেত নয়।

বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবী এক হিসেবে তার বিশালত্ব হারিয়েছে। তেমনি বড়ো দেশগুলি তাদের বৈশিষ্ট্য খোয়াতে বসেছে। এ যুগ দূরকে করেছে নিকট আর পরকে করেছে ভাই। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতিতে এখন আর রক্ষণশীল বলে কিছু নেই। একটা বর্ণসঙ্কর ভাবধারা অনিবার্যভাবেই সব কিছুকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো দেশের কতকগুলো মৌলিকতা আজও অক্ষুণ্ন আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। গ্রীক দর্শনে খাদ মেলাবে কে? ভারতের উপনিষদের ঋষিরা যা দিয়ে গিয়েছেন, তাতে মিশ্রণ ঘটাবে কোন্ দেশের ভাবধারা? এদেরই মতো চীনের প্রাচীন চিত্রকলাও এমনি একটা জিনিস, যাতে কোনো কিছু মেশাবার যোগ্যতা কারো হতে পারে না। এর গড়ে ওঠার ইতিহাস আলোচনা করলেই একথার প্রমাণ হবে। প্রাচীন শিল্প-সম্পদ সব দেশেরই আছে; কিন্তু চীনের সঙ্গে তাদের কারো তুলনা হয় না, কেন না, আর সব দেশেই লিখন-রীতি ও চিত্রণ-রীতি দু'টি আলাদা বস্তু, কিন্তু চীনে লিখন-রীতির মূলটাই চিত্রণরীতি। সেখানে অক্ষরগুলো চিত্র আর কথাগুলো চিত্রসমষ্টি। লেখার কাজ কলম দিয়ে হত না, হত তুলি দিয়ে। যাকে কিছু লিখতে হত, তাকে বস্তুত চিত্রকার্যই করতে হত। এজন্য সেখানে চিত্রকলা হয়েছে সাহিত্যের বাহন। পদ্ধতিটা

আদিম এবং অসুবিধাজনক হলেও, এতে চিত্রকলা মানুষের কাছে অসীম মর্যাদা পেয়েছে। যুগযুগান্তের সাহিত্যসেবীদের এই অপরিহার্য শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে চীনের চিত্রকলা একটা সুমহান রূপ পেয়েছে। জীবনকে ব্যাখ্যা করা যদি শিল্পের কাজ হয়, তবে সেখানে শিল্প পেয়েছে চরম সার্থকতা। আর প্রকৃতিকে রূপ দেওয়া যদি সার্থকতা হয়, তবে প্রাচীন চীনা শিল্প তুলনাহীন। ইয়াংসি নদী যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী নীরবে বয়ে চলেছে, তাতে ভাঙন নেই, স্রোতের প্রখর বেগ নেই, কূল-ভাঙ্গানে ঢেউও নেই, অথচ চলার তার বিরামও নেই, তেমনি নীরবে বয়ে এসেছিল প্রাচীন চীনে নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা। এরই সীমাহীন প্রশান্তি, শান্ত মৌন মন্থরতা, জ্ঞান-গম্ভীর নীরবতা এবং অবিরাম গতিশীলতা প্রতি যুগের চীনা শিল্পে ধরা দিয়েছে। আর প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগাযোগের কথা বলতে গেলে, বলে শেষ করা যাবে না।

চীনের একটি প্রবচনে আছে 'দূরের মানুষের চোখ নেই, দূরের গাছে পাতা নেই, দূরের পাহাড়ে পাথর নেই, দূরের জলে ঢেউ নেই।' মানুষই হোক আর প্রকৃতিই হোক একান্ত কাছে এসে না দেখলে তাকে ঠিক ঠিক দেখা হয় না। প্রাচীন চীনা শিল্প মানুষকে বুকে জড়িয়ে আর প্রকৃতিতে মগ্নচৈতন্য হয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। চীনা শিল্পীরা প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন, সেইভাবে চিত্রিত করেছেন। বুদ্ধি দিয়ে তার অপ্রাকৃত সত্তাকে কোথাও ক্ষুণ্ন করেন নি। এজন্য তাদের যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে বুদ্ধি দিয়ে পারব না, চোখ দিয়েই পারব শুধু। এখানে শাণিত বিশ্লেষণী বুদ্ধি চলবে না। আর্টের 'থিয়োরী' গুলিও ভুলে যেতে হবে; এঁরা যেমন বিচার বিতর্ক ভুলে কেবল মুক্ত প্রকৃতিকে সামনে রেখে এঁকে গিয়েছেন, তেমনি একে উপলব্ধিও করতে হবে কেবল দৃষ্টি দিয়ে।

এ শিল্পের আর এক বৈশিষ্ট্য পটভূমির ব্যাপকতা। এক একটা চিত্রে প্রকৃতি বহু যোজন বিস্তৃত। মানুষ কীট পতঙ্গের মতো ছোট হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির রূপ রসে সে প্রায় আত্মবিলীন। জ্ঞানগম্ভীর মৌনব্রতা নিয়ে সে প্রকৃতির কোলে স্তব্ধ। তার প্রকৃতিতে ঝটিকা নেই, তার অন্তরেও উপল-ভাঙা চাঞ্চল্য নেই, তার নদীতে নৌকা ডোবে না। নিস্তরঙ্গ জলে নিরবিচ্ছিন্ন মন্দ স্রোতে নৌকা রেখে সে ছিপ ফেলে। চোখের দৃষ্টি তার স্তিমিত। কেন এ স্তিমিত ভাব? কনফুসিয়াস, লাউৎসে প্রমুখ ঋষিরা যে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে গিয়েছেন, তারই অন্তরপ্লাবী আলোয় তার দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে গেছে। এ তারই প্রশান্তি। দীর্ঘ, পত্রমর্মরিত দেবদারুশ্রেণী, শাখায় উপবিষ্ট পক্ষিশাবক, ধ্যানগম্ভীর শৈলমালা, যোজনব্যাপী প্রান্তর সবকিছুতেই একটা অচঞ্চল অবিচলিত ভাব—অথচ কোনোটাই নিষ্প্রাণ নয়। যে প্রাণের গতি মন্থর, কিন্তু যাত্রা বিরতিহীন। সৃষ্টির আদি যুগ আর প্রলয়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন এই প্রাণধারা বয়ে চলবে। পুড়িয়ে দিয়ে ফুরিয়ে দেবার কোনো লক্ষণ এখানে নেই। ভাঙা-গড়ার মত্ততা এখানে অচল। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন চীনের এই ছিল প্রকৃত রূপ। যে যুগের শিল্পীরা এই রূপকেই দুহাতে লুটে নিয়েছিল। তারা যেন ডেকে বলছে : 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে—', শিল্পীকে 'লজিকে'র পাঁচিল-দেওয়া কোঠাঘরে আবদ্ধ করো না। সে যেমন সহজে বেরিয়েছে, তেমনি তাকে সহজেই তোমার অন্তরে ঢুকতে দাও, প্রকৃতি এখানে অবিকৃত। তাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ কর, তাকে বিশ্লেষণ করে ক্ষুন্ন করতে যেয়ো না।

শিল্পরসিকদের মতে, চিত্রকলার দিক দিয়ে চীনকে একমাত্র ইতালির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য শিল্পকলায় ইতালির যে স্থান, প্রাচ্য শিল্পে সে-ই স্থান চীনের।

চীনা শিল্পের প্রাচীনতার পরিমাপ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে, 'খ্রিস্ট জন্মের তিনশ' বছর আগে তুলির প্রচলন ছিল। লিখন ও চিত্রণ দুই কাজেই ছিল এই তুলির ব্যবহার। তখন থেকেই চীনারা এ কাজে সুদক্ষ। তখন রেশমি বস্ত্রে ছবি আঁকা হতো। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সেখানে কাগজের প্রচলন হল। তার আগে কাঠের তক্তায় বা বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে দেওয়ালের গায়ে চুন দিয়ে এঁকে রাখা হত চিত্র। সে সব চিত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ঐসব 'ম্যুরাল' (প্রাচীর চিত্র) কারুকার্যে প্রধানত ইতিহাসের ঘটনা আর মানুষের মূর্তি চিত্রিত হতো। ঋষি কনফুসিয়াস এই রীতির খুব অনুরক্ত ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগে প্রকৃতির প্রাণবত্তা ও শক্তিধারার প্রতীকরূপে বাঘ ও ড্রাগনকে গ্রহণ করা হয়েছিল—চিত্রকলায় এ দুটির ছিল খুব প্রাধান্য। ঋষি লাউৎসের মরমী ভাবধারণা, তার শিষ্যগণের কথা ও কাহিনী তখন শিল্পীর কল্পনাপ্রবণ মনে শিল্পের উপজীব্য হয়ে ধরা দিয়েছিল। তারপর বুদ্ধের সৌম্যমূর্তি, অনন্তের পথে তার বিরামহীন ধীরগতি যাত্রা চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তখনো বুদ্ধ ও লাউৎসের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য করা হত না। সৌম্য, শান্ত বুদ্ধ-মূর্তিকে অনেক সময় তারা প্রজ্ঞাবান লাউৎসের মতোই ঋষি বানিয়ে ফেলত।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রকৃতি-খণ্ডের (প্রাকৃতিক দৃশ্যের—landscape) চিত্র আঁকা শুরু হয়। তখন থেকে শিল্পীরা নিজ নিজ নামে খ্যাতিমান হতে থাকেন। কো-কাই-চীন নামে একজন শিল্পী চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর 'প্রসাধন' শীর্ষক ছবিখানা বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাও বংশধারার (৬১৮—৯০৭ খৃ) অন্তর্গত য়ু-তাউৎজু ছিলেন সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। 'শাক্যমুনি' নামক ছবিখানা তাঁর অঙ্কিত বলেই এতকাল প্রসিদ্ধ ছিল। এখন গবেষকরা বলছেন, তাঁর অনেক আগেই কোনো শিল্পী চিত্রখানি এঁকেছিলেন। 'ওয়াঙ-চুয়াঙ-এর দৃশ্য' শীর্ষক ছবিটি অষ্টম শতাব্দীতে আঁকা। 'ইউয়েন' বংশধারার চাও মেঙ-ফু এছবির শিল্পী। শিল্পী ওয়াঙ-ওয়ে নদীর পাড়ে বাড়ি তৈরি করে তার এক ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি অবলম্বন করে এটি আঁকা। চীনা শিল্পে প্রকৃতি খণ্ডকে রূপ দেবার এবং চীনা সুলভ শান্তি ও সৌম্যভাবে ফুটিয়ে তুলবার সম্ভবত এই প্রথম চেষ্টা। এ হিসেবে এই ছবিটির খুব গুরুত্ব আছে। পরবর্তীকালের শিল্পীরাও প্রকৃতি খণ্ড আঁকার বেলায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন। শিল্পী ওয়াঙ ওয়ের কবি হিসেবেও প্রসিদ্ধি ছিল। চিত্রে ভাবালুতা, বর্ণ মাধুরীর চমক, দূরবর্তী পাহাড় ও দিকচক্রবালের মায়াময় হাতছানি তাঁর চিত্রেই প্রথম ধরা দিয়েছিল। তাঁর আঁকা ছবি একখণ্ড গীতি কবিতার মতো অন্তরস্পর্শী।

এরপর বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন শিল্পী বংশধারায় আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সবাই নতুন নতুন ধারণা ও রূপ সৃষ্টি করে চীনের শিল্পসম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। এদের মধ্যে সুঙ

(৯৬০-১২৭৯ খৃ). ও মিঙ বংশধারার কোন অজ্ঞাত শিল্পীর ছিপ দিয়ে 'মাছ ধরা' বিখ্যাত ছবি।

চীন সম্রাটগণ চিত্রশিল্পের খুব বড়ো উৎসাহদাতা ছিলেন। এ সম্পর্কে সম্রাট নিঙ-সুয়াঙ এবং পেন-ৎসুয়াঙ-এর নাম পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত সম্রাট 'বুদ্ধের বোধিবৃক্ষ অভিমুখে যাত্রা' শীর্ষক ছবির শিল্পী নিঙ-তাই (১২০০ খৃ.) এর উৎসাহদাতা ছিলেন। বুদ্ধকে ঋষির বেশে চিহ্নিত করার রেওয়াজ তখনো ছিল। 'প্রকৃতির কোলে প্যাগোডা' চিত্রের শিল্পী কুও হ্সি (১০২০–১০৯০) সম্রাট শেন-ৎসুয়াঙ-এর অধীন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। প্রকৃতিখণ্ডের রূপায়ণে এক ছন্দায়িত 'মিষ্টিক' ভাব, হালকা কুয়াশার একটা বর্ণমধুর ব্যঞ্জনা ও চমক জাগিয়ে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিল।

'অর্কিড ও বাঁশবন' শীর্ষক ছবিটার দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এর মধ্যে তুলির যে জোরালো টান পড়েছে, তাতে শিল্পী শিহ-তও-এর (১৬৬০–১৭১০ খৃ.) একটা নিজস্ব ধারণা ও ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয়, আগেকার 'মিষ্টিক' শিল্পধারণাকে তিনি যেন সবলে ছিন্ন করতে চেয়েছেন। বস্তুত তাঁর থেকেই প্রকৃতিখণ্ড আঁকার রীতিকে প্রাচীন শিল্পীদের প্রভাবমুক্ত হওয়ার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

চীনা শিল্পের চরমোৎকর্ষ প্রায় তেরোশ বছরের পুরোনো। চীনা শিল্পীরা রঙের চেয়ে রেখার চমক লাগানোরই বেশি পক্ষপাতী ছিলেন বলে মনে হয়। তবে যখনই তারা রঙ ব্যবহার করেছেন, সব সেরা সোনালী রঙকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ যুগের চিত্রে রঙের চাতুর্য বেশি দেখানো হয়েছে। প্রকৃতিখণ্ড আঁকতে তাঁরা রেখাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাঁদের চিত্রে তথ্য বা ঘটনার স্থানগুলি মুখ্যত তাঁরা চিত্রে এক-একটা অলিখিত খণ্ড কবিতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো আবার রচিত কবিতা পুরোপুরিভাবেই ছবিতে ছড়িয়ে নিয়েছেন।

চীনের একটা পুরোনো প্রবচনে বলা হয়েছে–'ছবি জিনিসটা একটা নির্বাক কবিতা মাত্র।' একথা চীনের চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব সত্য। যশস্বী শিল্পীদের অনেকেরই কবি খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। তাঁরা মনের অঙ্কিত কাব্যবস্তুকে ইচ্ছামতো কখনো লেখায়, কখনো চিত্রে রূপ দিতেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের সমান কৃতিত্ব প্রকাশ পেতো। তাঁদের সৃষ্টি আঙ্গিকের দিক থেকে দুই বস্তু হলেও, ভাবনার দিক থেকে ছিল একেবারে অভিন্ন।

আনন্দবাজার পত্রিকা : মে ২৯, ১৯৪৯

ছোটদের ছবি আঁকা

শিশুটি আপন মনে কত কি বকে গেল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না। কী বা সুর। না আছে খাদ, না আছে নিখাদ। আবোল তাবোল কথাগুলো তারই ছকে ফেলে এক দুপ্‌পর বসে বসে গাইল; শেষে আপনি এক সময় গান বন্ধ করে উঠে গেল। তারপর, কি বা ছবির ছিরি। মাথা নাই মুণ্ডু নাই তার। নখ দিয়ে মাটির উপর তাই বসে বসে আঁকল। চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর মুছে ফেলে উঠে গেল। রইল না কোনো চিহ্ন।

তার কথা বুঝলাম না, সুর বুঝলাম না, আঁকিবুকি গুলোও বুঝলাম না। কিন্তু ভাল কি লাগছে না একটুও? জোর করে বলতে পারি কি যে, একেবারেই একেঘেয়ে, বিরক্তিকর লেগেছে? ভগবান তাকে শিশু করেছেন বলেই, তার ভেতরে যে সম্পদ দিয়েছেন তাও শিশু। তাই তার আয়োজিত আনন্দের পশরা বয়স্কের নিকট অকিঞ্চিৎকর? কিন্তু ভাল-লাগার ঋদ্ধিটুকু দিয়ে তাকে গৌরবান্বিত করতে সৃষ্টিকর্তার ভুল হয়নি।

সে যতদিন শিশু থাকে, প্রকৃতির সঙ্গে থাকে তার নিবিড় যোগাযোগ। বুদ্ধি পেকে ওঠেনি বলেই সে শিশু। কাজেই কোন কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। প্রকৃতি নিজে শিল্পময়ী। তার মধ্যে অনন্তকালের অফুরন্ত শিল্পের স্রোত বয়ে চলেছে। শিশু তারই সান্নিধ্যের বস্তু; কাজেই তাকেও শিল্পের পরশ দিয়ে প্রকৃতি নিজের আনন্দবোধ কতকটা চরিতার্থ করে নেয়। শিশু যে আপন মনে কথা বলে, সৃষ্টিছাড়া সুরে অর্থহীন শব্দ যোজনা করে গান করে, দেয়ালে মাটিতে সেলেটে অর্থহীন আঁকিবুকি করে, তাতে তার সেই শিল্প প্রেরণারই উপচানো রস খানিকটা মোক্ষণ হয় মাত্র। তাই তাতে অর্থ না থাকলেও, সামঞ্জস্য বা সৌষ্ঠব না থাকলেও ভালই লাগে; কেননা শিশু যে আনন্দময়। শিল্প অর্থই আনন্দ। আনন্দ অর্থই রস। আবার রসেই জীবন।

জীবনে বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয়, তখন আমরা যে শিল্প রচনা করি, তা দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই, নিজে খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচজনকে খুশি করতে চাই। পাঁচজনের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পের উৎস ক্রমে বেড়েই চলে। বারোয়ারি কারবারে আমাদের শিল্পের হয় বেচাকেনা এবং বিস্তৃতিসাধন। শিশুর ব্যাপার ঠিক উল্‌টো। যেই দেখল, আর কেউ তার শিল্পের সুর কান পেতে শুনছে বা তার রূপ চোখ পেতে দেখছে, অমনি তার সহজ ধারাটি যাবে স্তব্ধ হয়ে, উৎসটি যাবে রুদ্ধ হয়ে। এর কারণ, অন্যকে খুশি করার তাগিদ তার মধ্যে আসেনি; সে খুশি তার নিজের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। নিজের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে মশগুল হয়েই তার শিল্পরচনা। সে তখন মন-সর্বস্ব। অজানা মুলুকের এক রঙিন প্রজাপতির পাখায় ভর করে সে-মন তার ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। বুদ্ধির সেখানে এখনো পাখা গজায় নি।

বুদ্ধির পাখা যেদিন গজাবে, সেদিন তার মনে ইম্‌প্রেশনের (impression) জায়গায় বিশ্লেষণ এসে ছড়ি হাতে জেঁকে বসবে। বলবে এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে; এ

ভালো নয়, সে ভালো। বিশেষজ্ঞদের মতে, তার এ বয়সটা আরম্ভ হয় বারো তেরো বছরের পর থেকে। দুই কিংবা তিন বছর থেকে তেরো বছরে আগে সময়টাই মোটামুটিভাবে সে থাকে মন-সর্বস্ব। এই সময়টাতেই তার 'ইম্‌প্রেশন' থাকে সজীব। ইম্‌প্রেশন বলতে এখানে বুঝতে হবে–যখন সে বস্তু দেখে চেনে, কিন্তু বিশ্লেষণ করে না, চোখকে আকৃষ্ট করে যে বস্তু, তাই প্রধান হয়ে ওঠে। মন জুড়ে থাকে কৌতুহল, চোখ জুড়ে থাকে বিস্ময়। কিন্তু বিশ্লেষণের বুদ্ধি মনের কোনে দানা বাঁধে নি তখনো! শিল্পের সংজ্ঞায় এইটেই শৈশবকাল। এই সময়ে শিশুচিত্তে শিল্পের যে অঙ্কুর জাগে, তাকে অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে, দেখিয়ে শুনিয়ে এবং প্রয়োজন হলে শিখিয়ে পড়িয়ে, বাড়িতে শিক্ষিত হলে, শেষে তা শাখাপল্লবে সম্প্রসারিত করতে পারে। দেশের শিল্পশিক্ষকেরা যদি এই সময়টাতে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শিশুদের মনে প্রেরণা ও পারিপার্শ্বিকের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন তো ছবি আঁকাতে তারা পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শিশুদের যাঁরা ছবি আঁকা শেখাবেন, তাঁদেরকে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে শিশু হয়ে যেতে হবে। বয়সের দরুণ তাঁদের বুদ্ধি পেকেছে এ বোধ তাঁদের সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তুত, শিশুমনই ক্রীড়াক্ষেত্র। তাই দেখা গেছে, শিল্পীরা প্রায় সবাই খেয়ালী। তাদের বয়স যাই হোক না কেন, তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক শিশুর মত। এতেই প্রমাণ করে, মানুষের মনে এক চিরন্তন শিশু রয়েছে। সে সর্বদাই অর্থহীন খেয়ালে মগ্ন। আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে; পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আর বাড়ে অভিজ্ঞতা। এসব যতই বাড়ে, ততই যেন আমরা প্রকৃতির স্পর্শ থেকে আলগা হয়ে পড়ি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ যে আমাদের নাড়ির, চিরন্তনের। সেইজন্যই আমরা সব সময়ের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধিমান থাকি না। মাঝে মাঝে বুদ্ধির রাশ আপনা থেকে কিছুটা সময়ের জন্য আল্‌গা হয়ে পড়ে। তখন আমরা যে কে সেই–অর্থাৎ শিশু হয়ে যাই। শ্রোতা কাছে না থাকলেও কথা কয়ে উঠি। অকারণ হেসে উঠি। নির্জন প্রান্তরে পথ চলতে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠি। অথচ লোকের সঙ্গে যখন কথা কই, সেটা মেজেঘষে কৃত্রিমতা মিশিয়ে; লোকের সামনে যখন হাসি, সেটা ওজন করে। আর লোকের সামনে যখন সুরে বা শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করি, সেটা সতর্কতার শেকলে জড়িয়ে। তাই সে প্রকাশ সহজের নয়। কিন্তু সহজ প্রকাশের মানেই শিশুর প্রকাশ।

শিল্প প্রকাশের প্রধান তিনটি ধারা। এই তিন ধারায় প্রবাহিত শিল্পকে তিনটি নাম দেওয়া যায়–কথাশিল্প, সুরশিল্প, চিত্রনশিল্প। কেবল কথায় যারা শিল্প প্রকাশ করে, এ জগতে তাদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সংসারে এমন লোকের অন্ত নেই–যারা অন্তরের শিল্পবোধকে কেবল কথা দিয়ে প্রকাশ করে উঠতে পারে না। তাদের অন্যান্য উপায় খুঁজতে হয়। শিল্পবোধকে তারা কেউবা সুরে সুরে ছড়িয়ে দেয়, কেউ বা লাইনে, রেখায় গতিতে পরিস্ফুট করে তোলে। এই রঙে রেখায় যাদের শিল্পবোধ বিকশিত হয়, মোটামুটিভাবে বলা যায় তারাই বড় শিল্পী। কারণ তারা সমসাময়িক ও ভাবী মানবের

উপভোগের জন্য শিল্পের যা কিছু রচনা রেখে যায় বা রেখে গিয়েছে, মানুষের কাছে তা শাশ্বত সম্পদরূপে পরিগণিত।

আগেই জেনেছি, শিল্পের ধারা তিনটি : কথা, সুর ও চিত্রন। প্রকৃতির মধ্যে এই তিন বস্তুর বহুল বিকাশ দেখতে পাই। মানবের কথা ব্যাকরণের সূত্রে বাঁধা, সুর রাগ রাগিণীর জালে আবদ্ধ, আর চিত্রন রঙ আর তুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতিতে এই তিনটিই অবাধ। বৃক্ষের পত্রমর্মরে সেই কথা, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই কথা, বেণুবনের হাওয়ায় সেই সুর, মেঠো পথের কিনারে কিনারে, ধানগাছের দোলাতে দোলাতে সেই সুর। আর ফুলে ফুলে সেই রঙ, আকাশের মেঘে মেঘে সেই চিত্র। শিশু তো এসবেরই উত্তরাধিকারী। কাজেই তার সব কিছু আমাদের নিকট অর্থহীন মনে হবে বৈ কি? কাজেই তাকে শেখাতে গিয়ে তো অর্থ বলে শেখানো চলবে না। তার মধ্যে যা অবান্তর, তার অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে তাকেই অর্থবান মনে করে নিয়ে তাকে শিল্পের পাঠ দিতে হবে। কাজেই ছোটদের আর-সব কিছু শেখানোর চাইতে চিত্রন শেখানো অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

যাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তারা নিজেদের শৈশবকে একবার স্মরণ করে দেখতে পারেন। ফুলের পাপড়িতে, প্রজাপতির পাখায়, মেঘেদের গায়ে, যে নিত্য নূতন রঙের সমারোহ ঘটে, তা প্রথম যেদিন চোখে পেড়ে, সেদিনের কথা হয়ত মনে আনা যায় না। কিন্তু সেদিন যা আনন্দ হয়েছিল তা কল্পনা করতে পারি। চারপাশের প্রকৃতিদত্ত সম্ভারের নানা রূপ, নানা আকার একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে সেদিনকার। শিশুমনে ধরা যে দিয়েছিল তাতে ভুল নেই। সেদিন সে শিশু আপনা থেকে শিল্পী হয়ে উঠেছিল। এভাবে সে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। এই সময়ে তাকে যে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষাও দেওয়া দরকার—এ বোধ আমাদের দেশে আগে ছিল না বললেই চলে। বিদ্যালয়ের নিচু শ্রেণিতে যে ড্রইং এর ক্লাশ হয় তাতে শিশুদের শিল্পবোধ উদ্বুদ্ধ হওয়ার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। কেননা, সেখানে কতকগুলি হাতিঘোড়া বা তৈজসপত্রের রেখাচিত্রকে নকল করতে দেওয়া ছাড়া আর কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতিতেই চিত্রন শিক্ষা দেওয়া হয় না।

কাজেই তাতে শিশুর শিল্পৈষণা পরিস্ফুট হতে পারে না। আমরা যতদূর জানি, শিশুদের কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতি ধরে শিল্প শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথের মনেই সর্বপ্রথম জাগে। এবং তিনিই এ শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তাঁর বিশ্ববন্দিত বিদ্যায়তনের শিল্পীবৃন্দের উপর অর্পণ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় শুরু থেকেই সেখানে ছোটদের ছবি আঁকা শেখানোর—শুধু শেখানোর নয়—শিশুর প্রকৃতিদত্ত শিল্পবোধ যাতে উপযুক্ত পরিচালনায় বিকাশলাভ করতে পারে তার সর্ববিধ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের এই ধীর্ঘকালের শিল্পচর্চার ফলে দেশে শিল্পের প্রতি অনুরাগ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে স্বভাবশিল্পী শিশুকে অবহেলা করে আমরা যে ভুল করেছি সে ভুল ভাঙবার চেষ্টা।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখানো হয়। সেখানে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে সেখানকার শিল্পশিক্ষকেরা অতি সহজ পথে সে

দুরূহ দায়িত্ব বহন করছেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁরা এ কাজের চমৎকার সৌকর্যসাধন করেছেন। তাঁদের এ সকল অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতির অনুকরণে অন্যত্রও যদি ছোটদের ছবি আঁকা শেখানো হয়, তা হলে উত্তম ফল যে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাঁরা নিজেদের জ্ঞানকে ঝালিয়ে নিয়ে শিশুদের শিল্পশিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান, তাঁদেরকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তাঁদের প্রাথমিক ধারণা অবশ্যই থাকা চাই। কেবল শিল্পশিক্ষা নয়, রবীন্দ্রনাথের সব শিক্ষারই আদর্শ হচ্ছে—সহজের সাধনা।

বেত মেরে শিক্ষা দেওয়ার নীতি সেখানে অচল। সেখানে, প্রকৃতি শিশুকে বিশ্বদৃষ্টে বিস্ময় লাগার যে মায়াকাঠি ছুঁইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই হবে শিক্ষকের হাতের অবলম্বনীয় দণ্ড। শিশু প্রকৃতির মাধুরীতে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনা থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠবে—শিক্ষক থাকবে শুধু তাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য—তাকে নানা ইঙ্গিত দেখিয়ে সাফল্যের পথে চালিয়ে নেবার জন্য। যারা অঙ্কন শেখাবেন তাঁদের কাজও এই হবে। অবশ্য শিশু যখন আর শিশু থাকবে না, সে যখন তেরো চৌদ্দ বছর পেরিয়ে যাবে, তার মধ্যে 'ইম্‌প্রেশন' ছাড়িয়ে যখন বিশ্লেষণ বুদ্ধি দেখা দেবে, তখন তার জন্য শেখাবার পদ্ধতিরও হবে কিছু কিছু পরিবর্তন। কিন্তু শিশুকে শেখাতে হলে শিক্ষককেও শিশু হতে হবে, এইটে ভুললে চলবে না।

অধুনা দেশের শিক্ষারীতির পরিবর্তন হতে চলেছে এবং আরো হবে। শিক্ষাকে এখন গ্রন্থ মুখস্থ করানোর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষা বলতে এখন আত্মবিকাশ বলে মেনে নিতে হবে। এ বিকাশ তিক্ততার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে, অনিচ্ছার মধ্যে হতে পারে না।

শিক্ষককে শিশুর মনের খবর জানতে হবে। সহানুভূতি ও সমবেদনার আলোকে তার মনের তলদেশটুকু পর্যন্ত দেখে নেবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকা চাই। শিশুমনের শিল্প-লতা বার বার মাথা তুলতে গিয়ে হয়ত এলিয়ে পড়বে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে তাকে ঠিক জায়গাটিতে বাহিয়ে দেওয়া—যেখানে থেকে সে নৈরাশ্যের বাতাসে এলিয়ে পড়বে না কিংবা অত্যুৎসাহের উত্তাপে তার কিশলয়গুলি শুকিয়ে মিইয়ে আসবে না। তার কাছে নানারকমের রঙ থাকবে; থাকবে আঁকবার যাবতীয় উপকরণ। রঙের প্রাচুর্য নিকটে থাকলে তবেই সে প্রকৃতির সদাপরিবর্তনশীল চিরনূতন রূপ থেকে আহরণ করে তাকে তুলির সাহায্যে ব্যঞ্জনা দিতে সক্ষম হবে।

তার আঁকা ছবিকে পাকা মন দিয়ে দেখলে চলবে না। তা হলে তার মধ্যে হাজারো ত্রুটি চোখে পড়বে। দেখতে হবে তারই সমবয়সী চোখ নিয়ে। বড়দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা তুলনীয় হতে পারে না কিছুতেই। তার শিল্পকে তারই অভিজ্ঞতার মাপকাঠি নিয়ে যাচাই করতে হবে।

ছোটদের আঁকা ছবিতে বয়স্কজনোচিত পরিবেশ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব আশা করা বাতুলতা। তার মনের মধ্যে যে শাশ্বত প্রেরণা রয়েছে, সেটাই আত্মপ্রকাশের জন্য সর্বদা চেষ্টাপরায়ণ। তার প্রকাশের পথ করে দেওয়া এবং সে পথ নির্মুক্ত করে দেওয়া

হলেই যথেষ্ট করা হল। তারপর সেই প্রেরণা শিল্পের খাতে আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে, আপনাআপনি রূপ নেবে এবং সে-রূপ আপনি রসে অবগাহন করে উঠবে। এতে সফলকাম হতে হলে মোটামুটি কি কি উপায় অবলম্বনীয়, বিশেষজ্ঞদের জবানিতে তা একানে উদ্ধৃত করছি। শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর আত্মপ্রকাশের যাবতীয় সুযোগ দিতে হবে।

কাগজ, তুলি, খড়ি, জলরঙ, তেল রঙ যথেষ্ট পরিমাণে তাকে দিতে কার্পণ্য করলে চলবে না। তার মন যখনই যেমনটি চায়, তখনই তেমনটি যেন সে কাজে লাগাতে পারে। এতে অভিভাবকের ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা, এসব কিনে দিতে খরচা তেমন কিছু বেশি পড়বে না। যারা শিশুর খাওয়া-পরা জুগিয়ে আসছেন, তারা এ খরচাটুকুও অল্পায়াসে জোগাতে পারবেন। শিশু শিল্পীটির আবেষ্টনী হওয়া চাই শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি শিল্প-বিরোধী হলে চলবে না। সেখানে প্রকৃতিদেবীর অনুপস্থিতি না থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পী যেন প্রকৃতির অন্তরের স্পর্শ সর্বদাই পায়, তার চিরনূতন রূপ থেকে সে যাতে নূতন নূতন ইম্প্রেশন আহরণ করতে পারে।

শিশু নিজে যেটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছে; কেবলমাত্র তারই আলোকে ছবি আঁকতে শিক্ষক তাকে বলে দেবেন এবং যদি দেখেন সেই অভিজ্ঞতার অনুপাতে বস্তুটুকু বেশ পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তবে তাতেই তাকে তুষ্ট থাকতে হবে। এরই মধ্যে থেকে সময় সময় এমন প্রাণপূর্ণ রূপে বেরিয়ে যাবে, যা দেখে শিক্ষক নিজে খুশি না হয়ে পারবেন না।

শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন, তার ড্রইং-এ যাতে বর্ণিতব্য রেখাগুলি পরিষ্কার রূপ পায়। তবে কথায় কথায়, ভাল হয়নি, খারাপ লাগছে বলে তাকে নিরুৎসাহ করাও চলবে না। কেবল তার অঙ্কনগুলিতে ছোটখাট ত্রুটিগুলি শুধরে দেওয়া যেতে পারে। যতদূর সম্ভব সুন্দর ভাবে শিশু যাতে তার নিজের শিল্পচেতনাকে প্রকাশ করতে পারে তাতে সাহায্য করাই শিক্ষকের মুখ্য কাজ।

তারপর শিশু যখন শিল্পে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, তখন কি করে তার শিল্পচেতনাকে অব্যাহত রাখতে হবে, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে—তাদের ছবিগুলি নিয়ে সময় সময় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। তাদের লিনো-কাট ও উডকাটের প্রিন্ট তুলে নিয়ে এলবাম তৈরি করা। তাদের নিজেদের ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র থাকবে—তাতে ছবি এঁকে দেবার জন্য তাদের উৎসাহিত করা।

শান্তিনিকেতনে এ সকল দিকে দৃষ্টি রেখেই ছোটদের ছবি আঁকা শেখানো এবং তাদের উৎসাহ বাড়ানো হয়। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বহু ছবি কলাভবন মিউজিয়মে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, যার থেকে পরবর্তী শিশুরাও উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে থাকে।

কোনো অভিভাবক এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমরা শিশুদের যে ছবি আঁকা শেখাব, তা কেন শেখাব? সব লোক আর্টিস্ট হয়ে গেলে তারা কে কার অন্ন যোগাবে?

অবশ্য আর্ট শিক্ষা দিলেই যে তারা সকলেই বিশেষজ্ঞ আর্টিস্ট হয়ে উঠবে তার কোনো মানে নেই। তবে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি ভবিষ্যতে ভাল আর্টিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে সে তো হবে আনন্দেরই কথা। তার জন্য বরং তার পিতামাতার ও শিক্ষকের গৌরবান্বিত হবারই কথা। আর যারা তা হল না, তারাও আমোদের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে, প্রকৃতিদত্ত অনুভূতির সঙ্গে একটা সুকুমার কলা সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকল, সেটাই বা কম কিসে।

শিল্প শিক্ষা যে মানুষকে মানুষ করে তোলে, তার মধ্যে রসবোধ রুচিবোধের উদ্রেক করে, তার মনন ও কামনাকে মার্জিত করে, একথা তো অস্বীকার করা যায় না। যে-শিক্ষার দ্বারা নিজের ও পরিজনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটানো যায় সে-শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি যে-শিক্ষার দ্বারা নিজের রুচিকে মার্জিত ও উন্নত করা যায় এবং অপরকে আনন্দদান করা যায় সে-শিক্ষারও তো প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষত প্রকৃতি যে জিনিস আপন হাতে শিশুর মনে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা অভিভাবকেরা তাকে সে জিনিস কেন কুড়িয়ে নিতে সাহায্য করব না।

যেসকল শিশুশিল্পীর 'উড্‌কাট ও লিনোকাট প্রিন্টগুলি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের শিল্প-শিক্ষক শ্রী যদুপাত বসু ও শ্রীমতী অমলাবসুর ছাত্রদের ধারা অঙ্কিত এবং বিশ্বভারতী কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত' হয়–তাঁরা হলেন, ১. দেবজ্যোতি নেপালী বয়স ১০ বৎসর। ২. অতীন্দ্র দত্ত ১০ বৎসর। ৩. সুপ্রবুদ্ধ সেন ১০ বৎসর। ৪. দিলীপ বসু ১২। ৫. প্রেমনাথ ১০। ৬. কমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ১২। ৭. আভাস সেন ১২। ৮. ভক্তপদ নেপালী ১১। ৯. নবমুখার্জী ১১। ১০. বালাবসু ১১। ১১. অরূপগুহ ঠাকুরতা ১২। ১২. সুজিত রায় ১১। ১৩. আভাস সেন ১২। ১৪. গুরইকবাল ১২। ১৫. অভিজিৎ চন্দ্র ১২। ১৬. আভাস সেন১২।

সচিত্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৫-র শারদীয়া দেশ পত্রিকায়। ১৪ জন শিশুশিল্পীর ১৬টি ছবি ছাপা হয়েছিল–যা এখানে সংযোজন করা হয়নি।

এদেশের ভিখারী সম্প্রদায়

শৈশবে আমরা প্রথম পাঠ আরম্ভ করিয়া 'গুরুজনে মানিয়া চল', 'চেঁচিয়া কথা কহিও না'র সঙ্গে সঙ্গে 'ভিখারীকে ভিক্ষা দিবে' কথাটাও মুখস্থ করিয়া রাখি এবং পরে বড় হইয়াও আমাদের, ভিখারী মাত্রকেই ভিক্ষা দিবার প্রবৃত্তিটি সংস্কারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা ছাড়াও, ত্যাগ বা দয়ার আতিশয্যের আমাদের মধ্যে আরও কারণ আছেঃ আমরা ঋষির বংশধর, আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিরা সংসারের টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার নিয়া কখনো মাথা ঘামাইতেন না,– অর্থমনর্থম বলিয়া ইহার সংশ্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া তপোবনে বৃক্ষতলে বা কুটীরে বসিয়া সোমরস পানে মাতোয়ারা হইয়া সামগানে দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেন। ইহার প্রতিটি কথায়, সুরের প্রতিটি স্পন্দনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত কেবল ত্যাগের সুর, দিত জগদ্বাসীকে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের সুরই এখন পর্যন্ত আমাদের শিরা উপশিরায় এবং প্রত্যেকটি রক্তকণিকায় অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

এইজন্যই পরের দুঃখে বিগলিত হওয়া আমাদের আজন্ম সংস্কার। ভিখারী দেখিয়া দান না করিয়া আমরা পারি না। মানবতা এবং চিত্তের কমনীয়তার দিক দিয়া এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে এই প্রকার দানের প্রবৃত্তিই মানুষকে ক্রমশ ভগবানের কাছে টানিয়া নেয়। বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়া ইহার বিচার চলে না, ভাষা দিয়া ইহার সমালোচনা চলে না, ইহা শুধু মনের জিনিস ঃ আমি ভিখারীকে দান করিয়া তৃপ্তি পাই, আপনি কেন বাধা দিতে চান! কিন্তু জগতের অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহার বিচার চলে।

পৌরাণিক যুগে অতিথি বৎসলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতিথি ও ভিখারী এক না হইলেও অনেক রকমে ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অতিথি যেমন আকস্মিকভাবে আসিয়া থাকে, ভিখারীও তদ্রূপ। অতিথি অসময়ে (বিশেষত দুপুরে বা রাত্রে) আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করে এবং রাত্রিবাস করিয়া চলিয়া যায়। ভিখারী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াই চলিয়া যায়। বিশেষ দায়ে পড়িয়া অতিথি গৃহীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, আর ভিখারীর পেশাই ভিক্ষা, আজ এ-পাড়া, কাল ও-পাড়া এই রকম করিয়া তাহার দিন গুজরায়।

পৌরাণিক যুগে আমরা অতিথির কথাই জানিতে পাই, তথাকথিত ভিখারীর স্বরূপ বিশেষ খুঁজিয়া পাই না। তখনকার অতিথিদের বেশির ভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহারা ছিলেন দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। কাজেই একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না যে ইঁহারা পরোক্ষভাবে ছিলেন ভিখারীই। ভিক্ষা কথাটা তখনো বিশেষ সম্মানাস্পদ ছিল না বলিয়াই বোধহয় তাঁদের ঐ ভিখারী জীবনটাকে অতিথি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছে।

তখনকার যুগে লোকে অতিথি সেবার জন্য সর্বক্ষণের জন্য নিজেরা প্রস্তুত থাকিত, দ্বিপ্রহরে রন্ধনের পর সহজে নিজেরা আহার করিতে চাহিত না, তটস্থ হইয়া বসিয়া থাকিত, রুদ্ধনিশ্বাসে পথ পানে চাহিয়া থাকিত, তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতে কোন

অতিথি তথা ভিখারী আসে কি না। কিন্তু এত যে অতিথি তথা ভিখারী সৎকারের আয়োজন, ইহা শুধু দান করিবার প্রবৃত্তির জন্যই নয়, নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া কাঙাল সাজা নয়—ইহার পেছনে ছিল একটা ভয়ানক স্বার্থপরতা।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে হয়। তখনকার ভগবানের কি যে বদখেয়াল ছিল, তখন তিনি সময়ে অসময়ে প্রায়ই লোকদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিতেন এবং আসিতেন অতিথি তথা ভিখারীর বেশে, আসিতেন দরিদ্র আর্ত ব্রাহ্মণের বেশে। তখনকার লোকেরা ইহা মনে প্রাণেই জানিত। তা ছাড়া তিনি কখন যে কার ঘরে আসিয়া 'সেবা' চাহিয়া এবং গৃহীর হাড়ভাঙা খাটুনির দ্বারা উপার্জিত অন্নের বেশিরভাগ দ্বারা উদর পূরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহীর স্বগুষ্ঠি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটাইতেন তা তো বলা যায় না। তাই তারা সর্বক্ষণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখিত—'ভিখারীর বেশে এই বুঝি আসে মনচোর, শুনি তার নূপুরের ধ্বনি রিণি ঝিনি—কতদূর ওগো কতদূর।'

এই জন্য বলিতে ছিলাম সে যুগের অতিথি পরায়ণতার উদ্দেশ্যই ছিল নিজেদের স্বার্থোদ্ধার—অতিথিকে দুটি খুঁদ-কুড়া খাওয়াইয়া একেবারে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি! তখনকার অতিথি পরায়ণতা সময় সময় বেশ একটু মারাত্মক গোছের হইয়া দাঁড়াইত, অতিথির যাঞ্চাও বেশ রকমের আরামসূচক ছিল না। যেমন ধরুন কর্ণের কথা, তিনি আপনার ছেলে বৃষকেতুর মাংস দিয়া মাংসাশী দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপী অতিথি তথা ভিখারীকে পরিতোষ করাইলেন। তারপর দ্রোণের স্ত্রী ধরা, তিনি নিজের স্তন কাটিয়া দিয়া দোকানীর নিকট হইতে চাউল ডাইল আনিয়া একবার অতিথি তথা ভিখারীরূপী ভগবানের সর্বনাশা উদরটিকে পরিপূর্ণ করাইয়াছিলেন। ঐসব অতিথিরাই ছিলেন তখনকার ভিখারী এবং এই 'অতিথি তথা ভিখারীর বেশে কখন যে কে আসেন বলা যায় না'—এই ভাবটিই এখন পর্যন্ত আমাদের হিন্দুসমাজকে ভিখারীমাত্রকেই খুশিভাবে ভিক্ষাদান ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে।

ফকির-বোষ্টম ও মহাপ্রভুর ভেক

আসিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের যুগ। তিনি 'প্রেমিক গোরা' রূপে আসিয়া প্রেমের বন্যায় হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী পর্যন্ত পরিপ্লাবিত করিলেন, করিলেন পাষণ্ড দলন, করিলেন হরিনামে সবাইকে মাতোয়ারা। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার এমন মধুময় ধর্ম অবিকৃত রহিল না। একদিকে যেমন বহু 'পামর ব্যক্তি' প্রেমাস্বাদে মাতোয়ারা হইয়া পাপতাপময় সংসারে নিজেদের মনের মধ্যে 'নিত্য বৃন্দাবন' সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তেমনি, তাহার প্রেমের সুযোগে সমাজে সৃষ্টি হইল কতকগুলি ভিক্ষোপজীবী পরগাছা, আর কতকগুলি অনাচারী সহজিয়া বা পরকীয়া ভজনকারী মুখোসপরা লম্পট! মহাপ্রভুর 'ভেক' নেওয়া কি চীজ তাহা অনেকেই জানেন। প্রকৃত ধর্মপ্রেরণায় শত শত লোক 'ভেক' গ্রহণ করিতেছেন একথা সত্য কিন্তু ইহার আরও একটা দিক আছে। মহাপ্রভুর 'ভেক' গ্রহণ করিলে কোন শ্রমসাধ্য কাজ করিতে হইবে না, লোকের দশ দুয়ারে মাগিয়া খাইয়া জীবনটা চালাইয়া নিতে পারা যাইবে। এই প্রেরণা হইতেও শত শত লোক এই 'ভেক' গ্রহণ করিতেছে। এইভাবে সমাজে বৈষ্ণব বা বোষ্টম বা বৈরাগী নামে আর এক শ্রেণির ভিক্ষোপজীবীর উদ্ভব হইয়াছে। আউল বাউল নামে ইহাদের আবার শাখাও আছে।

হিন্দু সমাজের বৈষ্ণব, বোষ্টম ও বৈরাগী শ্রেণির ভিখারী সম্প্রদায়ের কথা আগেই বলিয়াছি, ইহারা ছাড়া আরও এক শ্রেণির সম্প্রদায় হিন্দু সমাজে আছে। গেরুয়া বা হলদে রঙের কাপড় বা কৌপিন পরিয়া, গায়ে একটা সেই রঙের ঢিলা আলখাল্লা লটকাইয়া আর এক হাতে এক একটা ঠাকুরের ছোটখাট মূর্তি লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ শনির মূর্তি, কেউ লক্ষ্মীর আবার কেউ বা শুবচুনী বা নারায়ণের মূর্তি লইয়া বাহির হয়। সেই সেই দেবতার পূজারী সাজিয়া দেবতার দোহাই দিয়া ইহারা এক একটি পয়সা করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ি হইতে মাগিয়া নেয়।

মুসলমানদের মধ্যে ফকির জাতীয় ভিখারী সম্প্রদায়টাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আমাদের সমাজে বৈরাগী বলিতে যাহা বুঝায় ফকিরও অনেকটা তাই। এক একটা 'দরগা'কে কেন্দ্র করিয়া ছোট খাট এক একটা পাড়ায় ফকিরদের বাস।

এই ফকিরদের সংখ্যা এত অধিক যে পল্লীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই ইহাদের জ্বালায় যার-পর নাই অস্থির হইতে হয়। ইহারা গৃহস্থগণকে কত যে বিরক্ত করিয়া মারে তাহা ভুক্তভোগী পল্লীবাসী মাত্রেই স্বীকার করিবে। সাধারণ পল্লীবাসীদিগকে ইহারা প্রায় জ্বালাইয়া মারে। বয়স্ক বা অসমর্থদের ত কথাই নাই, বলিষ্ঠ জোয়ান যারা, যারা খাটিয়া খাইতে পারে, কর্মানুরাগী ভগবান কর্ম করিবার জন্য যাদের প্রচুর স্বাস্থ্য দিয়াছেন তারাও এইভাবে পল্লীর প্রতিটি গৃহস্থকে বিরক্ত করিয়া ভিক্ষাস্বরূপ চাইল বা পয়সা আদায় করিয়া তবে ছাড়ে।

স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন গৃহী ভিক্ষা দিতে অসমর্থ হইলে বা বিরক্ত বোধে বিমুখ করিলে ফকিরেরা নানা প্রকার শাপমন্যি করিতে আরম্ভ করে। তাই নিজেদের এবং প্রতিবেশীর মঙ্গলার্থেও গৃহী তাহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য হয়। এই সম্প্রদায়টি ছাড়া মুসলমান সমাজে আরও যে একটা ভিখারী সম্প্রদায় আছে, সেটা আরও মারাত্মক। যাহারা পল্লী গ্রামের ছোট বড় হাটগুলি দেখিয়াছেন তাহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, সেখানকার হাটের গলিতে গলিতে প্রায়ই দুই চারটে অঙ্গহীন লোক পিণ্ডবৎ পড়িয়া থাকে। কেউ হস্তপদহীন, কেউ চোখে দেখে না। কারো দেহগঠন ভগবানের রাজ্যে নিতান্ত অস্বাভাবিক।

ভগবানের শাপে এমন অবস্থায় পতিত দুনিয়ার এই শ্রেণির হতভাগ্যদের জন্য করুণা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষ এতটা হীন নয় যে এই দুর্ভাগাদের দেখিয়া নিজের আড়ালেও অন্তত একটা ব্যথার নিশ্বাস ফেলিবে না। কিন্তু ইহাদের লইয়া পুরা একটা সম্প্রদায় বাঁচিয়া রহিয়াছে ভিক্ষা-উপজীবীকাকে অবলম্বন করিয়া। ইহাদের এক একটাকে বাঁশের মাচায় সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া দুই তিনজনে কাঁধের উপর তুলিয়া পল্লীর জমজমাট হাটগুলিতে বিনাইয়া বিনাইয়া দুঃখের কেচ্ছা গাহিয়া ইহারা কেবল পয়সা আদায় করে না, হাটের পসারী ও অন্যান্য লোকেদেরও করে অসুবিধার সৃষ্টি। লোকে করুণায় বিগলিত হইয়া পয়সা, দেয় সেই পয়সায় অভাগাদের কতটুকু উপকার হয় জানি না। তবে ঐ পয়সা দ্বারা এই অভাগ্যদের অন্তরালে থাকিয়া অনেকগুলি নিষ্কর্মা লোক যে সংসারে প্রশ্রয় পাইতেছে একথা সত্য।

মোটামুটিভাবে সম্প্রদায়গত কতকগুলি ভিক্ষোপজীবীর বিষয় উল্লেখ করলাম, এখন দেখিতে হইবে যে এই প্রকার ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া ইহারা অন্য কোন কাজ করিয়া খাইতে পারে কিনা।

বৈষ্ণব, বোষ্টম বা বৈরাগীদের কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। মহাপ্রভুর 'ভেক' গ্রহণ করিলে সংসারের প্রতি কোন আসক্তি রাখা যায় না, পরের দুয়ার হইতে মাগিয়া দুটো 'প্রসাদ' তৈয়ার করিয়া শ্রীগোবিন্দের নামে নিবেদন দিয়া উদরস্থ করিতে হয়–ইহাই এই সমাজের একটি সাধারণ প্রথা। ইহাতে দোষের কিছু নাই, যেহেতু মহাপ্রভু নিজে ভিক্ষা করিতেন। এই ভিক্ষা গ্রহণের স্বরূপ তখন পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙাই ছিল না, ইহার অন্য স্বরূপ ছিল। সংযম ও নিবৃত্তি মার্গে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে তখন মাত্র দু এক মুষ্ঠি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলেই দিন গুজরান করিতে হইত। এই জন্যই বোধহয় তখন, কেহ কেহ বলিয়া থাকে, সন্ন্যাসী বা মহাপ্রভুর ভেকধারীদিগকে দিনে মাত্র তিনটি ঘর হইতে তিন মুষ্ঠি তণ্ডুল গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু আজ এমন নয়। আজ প্রশ্রয় পাইয়া বহু নরনারী যত না যথার্থ ধর্মপ্রেরণায় তার চেয়ে বেশি খাটিয়া খাওয়ার ভয়ে দলে দলে বোষ্টম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতেছে। নিরক্ষর হিন্দু সমাজে অনেক স্থলেই দেখা যায় অসহায় বিধবাদের মধ্যে অনেকেই আবার অন্য কোন পথ না পাইয়া মহাপ্রভুর ভেক গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।

তারপর পুরুষ বোষ্টমদের কথা। আমি এক ভেকধারী বোষ্টমকে জানিতাম। মহাপ্রভুর ভেক গ্রহণের পর স্বতন্ত্র জায়গায় এক আখড়া পাতিয়া সে থাকিত। তাহাদের ধর্মের সনাতন রীতি অনুযায়ী ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারাই তার ঘরে স্থাপিত রাধামাধব জীউর ছোটখাট বিগ্রহের ভোগ্য প্রদান করিত। কিন্তু একদিন ভিক্ষা করিতে যাইয়া কোনও ভিক্ষাদাতার একটি মাত্র শ্লেষপূর্ণ কথায় তার চৈতন্যের উদয় হয়। ইহার পর সে আর ভিক্ষায় যায় নাই। তাহার আখড়ায় রাধা মাধবজীব কুটীরের এখানে সেখানে লাউ কুমড়া সীম গাছ রোপন করিল। লতাইয়া লতাইয়া সেগুলি ঠাকুর ঘর ঘিরিয়া ফেলিল। পরে সত্যি তার তার পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে ছাগল পুষিত, তাহার দুধ বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিত। কয়েকটা আম গাছ তাহার ছিল, আম বিক্রয় করিত।

এমন কি আম গাছের খোপ হইতে শালিক আর দোয়েল পাখির ছানা পর্যন্ত বিক্রয় করিত। করিয়া সেই পয়সায় কেনা চাউল ডাইল রান্না করিয়া বিগ্রহের ভোগ লাগাইত। এই সকল ধর্মবহির্ভূত কাজ করার দরুণ আশেপাশের বৈষ্ণব সমাজে স্বভাবতই তাহার পাত উঠিল। আমাদের দেশের তথাকথিত ভিখারী বৈষ্ণবগুলিকে যদি আমার চেনা বৈষ্ণবটির পন্থা অনুসরণ করিতে বলি তবে তারা নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, সংসার ছেড়েছি কি সংসারে আবার জড়াবার জন্যে। কিন্তু কর্মহীন অলস জীবনযাত্রায় আর আত্মার এবং দেহের অবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে ভগবানের কোন সত্তাই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না একথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার দিন আজ আসিয়াছে। নিজের শ্রমদ্বারা অর্জিত অন্নদ্বারা ঠাকুরের ভোগ লাগাইলে ঠাকুর যে তাহা অধিকতর পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হৌক আমার সে বৈষ্ণবটি আর ভিক্ষাবৃত্তি করে নাই। তাহার সমাজের অন্যান্য বৈষ্ণবদের পীড়াপীড়িতে মাঝে মাঝে তাহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত সত্য কিন্তু সরাসরিভাবে চাহিয়া কাহারও নিকট হইতে সে কিছু গ্রহণ করিত না। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। গোপীযন্ত্র, খঞ্জনী বা রসমাধুরী বাজাইয়া বাড়ি বাড়ি গান গাহিয়া সে লোককে মুগ্ধ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা গ্রহণ করিত তাহাকে সে ভিক্ষা বলিয়া মনে করিত না, মনে কবিত পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ।

ফল কথা প্রত্যেক পল্লীতে সহজসাধ্য কুটীর শিল্পাদির প্রর্বতন করিতে পারিলে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখাইল ইহাদের সংখ্যা কমিতে পারে। আর কমিতে পারে ইহাদিগকে অনাসক্তির মোহ কাটাইয়া নাম-সন্ধ্যা-মালা-জপের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক খাটুনিতে প্রলুব্ধ করিলে; নিষ্প্রাণ ঠাকুর বিগ্রহদেবের সেবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মময় বাস্তব অনুভূতির সৃষ্টি করিলে।

এবার ফকির ভিখারী সম্প্রদায়ের কথা। এদেশের মুসলমানগণই সাধারণত কৃষিজীবী। ফকিরদেব সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া ছোটখাট কৃষিকাজগুলিতে লাগাইলে এদের দ্বারা বেশ কাজ হইতে পারে। এ স্থলে বিচার্য যে দরগার চারিপাশে আড্ডা গাড়িয়া ধর্ম সাধনার চাইতে খাটুনি হইতে শরীরকে বাঁচাইয়া 'সুখের ভাত' খাওয়াই অনেক স্থলে ইহাদের লক্ষ্য। ভিক্ষার আকাল পড়িলে অনেক সময় ইহারা গুণ্ডামির আশ্রয় নেয়। ইহাদের অনেকেই আবার রাত্রিতে জাঁকালো ফকিরি স্টাইলের পোষাক পরিয়া পঞ্চ প্রদীপ সাজাইয়া বড় বড় হাঁকডাক দিয়া ধর্মভীরু পল্লীবাসীদিগকে চমকাইয়া দিয়া পয়সা আদায় করিতেও দেখা যায়। এই উৎকল ব্যাপার নিশ্চয়ই খাঁটি ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ নয়।

পল্লীবাসীরা ধর্মভীরু, তারা সবল প্রাণ, তারা খাটিয়া খাইতে জানে। কর্মবিমুখতা এখনো তাদের মধ্যে দেখা দেয় নাই। এই কথাটি তাদের অনেকেরই জপমালা--

সোনা রূপার দুখানা হাত
যেখানে লড়িবে সেখানে ভাত।

ভগবান হাত দিয়াছেন কাজ করিবার জন্য, ভগবানের আশিষ রূপ এই দুইখান হাত দিয়াই মানুষ কত বড় বড় কাজ করিতেছে। ইহাকে কাজে না লাগাইয়া নিতান্ত অপমানিতভাবে পরের দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার কারও অধিকার নাই!

এই কয় বৎসরের অর্থকষ্টের ফলে দেশে অনেকগুলি নূতন ভিখারীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ভিক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে পাষাণও বুঝি গলিয়া যায়। কারো উপুসী ছেলের মুখে দিবার একটু ভাতের মাড় মিলে না, কারো পরিবারে সব কয়টি প্রাণী পাঁচদিন ছ'দিন ধরিয়া উপবাসী এইসব। এরা নাকি আর কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই গলায় গামছা জড়াইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। কিন্তু সত্যই কি ভিখারীদের কোন উপায় নাই, বা করিবার তারা কিছু পায় না? এমন অনেক কাজ নিশ্চয়ই আছে যা লোকে করিতে সাধারণত কুণ্ঠাবোধ করিবে। কিন্তু এক চুরি করা ছাড়া যে কোন কাজ মাত্রই ভিক্ষা করার চাইতে ভাল। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অসম্মানজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিক্ষার অপমান এতে নাই।

পল্লীতে বার মাসে তের পার্বণ হয়। এক এক সময়ে একটা না একটা লাগিয়া থাকে, তাতে ভিখারীরও আমদানি হইয়া থাকে। তারা ভিক্ষা হিসাবে এক পেট খাবার না খাইয়া, উৎসব বাড়ির অনেকগুলি খুঁটিনাটি কাজের কিছু কিছু করিয়া দিয়াও খাইতে পারে। এ খাওয়াকে ভিক্ষা বলিলে সত্যি ভুল বলা হবে।

পল্লীর গ্রামে গ্রামে শত শত হাট-বাজার আছে, কোনটা সপ্তাহে দুইবার তিনবার করিয়া কোনটা বা প্রতিদিন করিয়া বসিয়া থাকে। যে কেউ দেখিয়াছেন তিনিই জানেন হাট-বাজার বসিবার জায়গাগুলি কত অপরিষ্কার অপরিচ্ছিন্ন। এতে কত রোগের বীজাণু উৎপন্ন হইয়া থাকে, কত দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে এবং হাটের পসারীদের অসুবিধা ও স্বাস্থ্য হানির কারণ ঘটাইয়া থাকে। ভিখারীরা হাট বসিবার আগে অনায়াসেই ঝাঁটা হাতে করিয়া সে সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করিয়া রাখিতে পারে। এতে পসারীদের কত আনন্দের কারণ হয়। তখন তাদের কাছে শ্রমের মূল্য স্বরূপ কলাটা মূলোটা চাহিলে সেটা ভিক্ষা করা হইবে না। তারাও সানন্দে উহা দিতে ইতস্তত করিবে না।

পল্লীতে রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও আবর্জনা দূর করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। ভিক্ষা ভিন্ন যাদের গত্যন্তর নাই তারা সেই সব পরিষ্কার করিয়া অল্পায়াসে পাড়ার লোকেদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে। ভিক্ষা না করিয়া মরশুমের সময় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ধান ভানিয়া বা নালিতার মরশুমে নালিতা ছাড়াইয়া দু' মুঠোর জোগাড় করিতে পারে। চেষ্টা করিলে ছোটখাট কুটীরশিল্প সংক্রান্ত কাজগুলি তারা অনায়াসে করিতে পারে। সস্তা দরে বাঁশ কিনিয়া চুপড়ি ঝাঁপি প্রভৃতি জিনিস অনায়াসে তৈরি করা যায়। এসব কাজ আজকাল লাভজনক না হইলেও ভিক্ষার চাইতে শতগুণে ভাল। নিতান্ত ভিখারী হইলেও মাথা গুঁজিবার মত একখণ্ড ভূমি নিশ্চয়ই তাদের থাকে। মাটিতে পরিশ্রমীর জন্য ভগবান সোনা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কষ্ট করিয়া মাটি কোপাইয়া লাউ-কুমড়া সিমের গাছ ইচ্ছা মাত্রই করিতে পারে। অথচ এগুলি বাজারে কত চড়া দামে বিক্রয় হয়। আরো কত কাজ আছে যা নাকি ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে অনায়াসে করিয়া ভাতের জোগাড় করা যায়। তবেই চাই সেই অনুপাতে মনোবৃত্তি। 'মাগিয়া খাইব না' বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে এবং শরীরে এতটুকু শক্তি থাকিলে মানুষ উপোসে মরিবে না, একথা সত্য।

যাদের জন্য এত কথা বলিলাম তারা হয়ত এসব বুঝিবে না। কখনো এ লেখা তাদের হাতে পড়িবে না। এ লেখার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে আমাদেরই। তাহাদিগকে কাজের কথা দেখাইয়া হীন ভিক্ষামনোবৃত্তি তাদের দূর করিতেই হইবে। তাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে, তুমি ধর্মার্থী সাধু সন্ন্যাসী আর ফকির বাবাজী যাই হও না কেন, কাজ করিয়া খাও, পরের শ্রমের অন্নে ভাগ বসাইবার তোমার কোন অধিকার নাই। নির্ঝঞ্ঝাটে ভগবৎ আরাধনা করিতে চাও, বেশ ত কর না, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া করিও না। নিজের শ্রমের দ্বারা পেট চালাও, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম উপাসনা যাহা করিতে হয় কর।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মে ১৫, ১৯৩৬

আম্রতত্ত্ব

আমাদের দেশে আমের সম্বন্ধে নতুন কিছু বলিতে যাওয়াও যাহা, চক্ষুষ্মান সুজনকে আলো দেখাইতে যাওয়াও তাহা, কারণ এদেশের নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই অত্যুৎকৃষ্ট ফলটির সঙ্গে সুপরিচিত। আমাদের দেশ গরীবের দেশ। আঙুর, বেদানা, কিসমিস পয়সা দিয়া কিনিয়া প্রচুর পরিমাণে উদরসাৎ করা খুব কমলোকের ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু বাঙলার পল্লী অঞ্চলে এমন গৃহস্থ খুব কমই আছে যাহার বাতায়ন সন্নিকটে, রান্নাঘরের পিছনে কিংবা বাড়ির আশে পাশে দুই একটা আমগাছ নাই, বড় বড় বাগওয়ালাদের কথা নাই বা বলিলাম। প্রকৃতির আশীর্বাদমণ্ডিত দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের প্রভাবেই হৌক, আর বাঙলার মাটি বাঙলার জলের পুণ্য প্রভাবেই হৌক–স্বাদে গন্ধে উপকারিতায় পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন সুখ্যাত ফলের সঙ্গে গুণ-গরিমায় সমতুলনীয় এই আম্র ফলটির সদ্ব্যবহার রাজা জমিদারদের প্রাসাদ হইতে চাষাভূষাদের আঙিনা পর্যন্ত সবখানেই চলিয়া আসিতেছে।

এমন একটি গুণময় সর্বজনীন ফল হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত হইলে রসনা পরিতৃপ্তিকর আর কোন চিজ দিয়া যে ইহার ক্ষতিপূরণ চলিত তাহা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। আমকে বলা হয় ফলের রাজা। এই রাজাটিকে মনোহর বেশে নানা দেশে দেখা গেলেও ভারতবর্ষেই তার পূর্ণ আধিপত্য এটুকু বলিলে বোধ হয় বেশি বলা হয় না। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ-মাধুর্য, আকারের বৃহত্ত্ব, ফলনের প্রাচুর্য প্রভৃতির দিক দিয়া ভারতবর্ষের আমই সর্বশ্রেষ্ঠ একথা ভুল নয়। এই আম এখন যেমন ভারতের সর্বজাতির রসনা জোগাইতেছে, ভবিষ্যতে যেমন জোগাইবে তেমনি সুদূর অতীত হইতেই জোগাইয়া আসিতেছে। এবং সে সুদূর অতীত যে কতখানি সুদূর, কতকাল হইতে যে এইভাবে জোগাইতেছে বলা শক্ত। এমন একটি আস্বাদপূর্ণ সরস ও সরেস ফলের জন্ম কিভাবে হইল, কোন দেশ হইতে কিভাবে সর্বপ্রথমে এদেশে আসিল, বিশ্বামিত্রের মত কোন মহাঋষি নব ভূভাগ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া গাছে মানুষ (নারিকেল) ফলাইবার মত কোন মহত্তর সংকল্প লইয়া এতবড় রসাল সৃষ্টি করিয়া বসিলেন কিনা, এ সকল প্রশ্ন লোকের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। সেকালের খোকা খুকিদের মনে খেলাধুলার অবসর ক্ষণে এসকল প্রশ্ন জাগিত। আর সেকালের ঠাকুরমারা তাদের সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তারা বলিতেন, আম সত্যযুগে কোথায় ছিল জানা যায় না, ত্রেতাযুগে ছিল লঙ্কাতে। হনুমান বাবাজী নির্বাসিতা সীতার নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত হইয়া উহা রসনাসংযোগে ও উদরস্থ করিবার কালে এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে তৎক্ষণাৎ তাহার পোড়া স্বদেশের কথা মনে পড়িল। সে দেশ এই ফলটি হইতে বঞ্চিত। তিনি আম খাইয়া ইহার আঁটি সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙাইয়া তাহার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে ফেলিতে লাগিলেন। তখন হইতেই এদেশে আমের জন্ম। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বিচার

বুদ্ধিশীল পাঠক হাসিবেন না। যিনি একলাফে সমুদ্র ডিঙাইতে পারেন, যিনি সূর্যকে বগলদাবা করিয়া গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন করিতে পারেন, তাহার শ্রীহস্তের 'ঢিল' যে লঙ্কাদ্বীপ হইতে ছুঁড়িত হইয়া ভারতে আসিতে পারে না তার স্বপক্ষে কোথাও যুক্তি নাই। হনুমানের স্বদেশপ্রিয়তাটুকুই অনুকরণীয়।

হারুণ অল রসিদের আমলের একটি গল্পেও ভারতের আম জয়যুক্ত হইয়া আছে। তিনি ভারতের আমের সুখ্যাতি শুনিয়া উহার জন্য জনৈক শ্মশ্রুধারী কাজীকে পাঠাইয়াছিলেন। কাজী বাবাজীর ফিরতি পথে আম নষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি স্বীয় শ্মশ্রুতে তেঁতুল আর গুড় মাখিয়া প্রথমে রাজা হারুণ অল রসিদ, তারপরে তস্য রানী, তারপরে ক্রমশ পদমর্যাদা অনুসারে অন্যান্যকে তাঁহার শ্মশ্রু চুষিতে দিয়া আমের স্বাদ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলেন।

বাঙলাদেশের ছড়া বা হেঁয়ালিতেও আমের স্থান আছে। পল্লী লোকদের প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য কিংবা বাড়িতে নয়া জামাই আসিলে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্মতা পরীক্ষার জন্য এইরূপ হেঁয়ালি কাটিতে দেখা যায় :

মকরেতে জন্ম তার কুম্ভে তারে চায়।
মীন সংযোগে তারে কিছু কিছু খায় ॥
ভালোমতে খায় তারে মেষে আর বৃষে।
মূর্খে বুঝিবে থাক পণ্ডিতে বুঝে শেষে ॥

মকর অর্থাৎ মাঘ মাসে তার জন্ম, কুম্ভ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে গাছের পাতার ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করিলে গ্রাম্য ছেলেদিগকে উহার প্রতি লুব্ধ লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে দেখা যায়। মেষে আর বৃষে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উহা যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখন সবাই পরিতৃপ্তির সহিত খাইতে পারে।

এই সবই ত গেল একদিককার কথা। এখন কাজের কথায় আসা যাক। হাস্য পরিহাসের অন্তরালে করুণ ব্যাপার এই যে প্রকৃতিগত এত বড় একটা ভাল জিনিস থাকা সত্ত্বেও ইহার ফলনকে উন্নততর প্রণালীতে বর্ধিত করিবার বা এই গরীব দেশে ইহার ব্যবহারকে 'অর্থকরী' ব্যাপারের দিক দিয়া কাজে লাগাইবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই নাই। পল্লীর গৃহস্থেরা দুই চারটি করিয়া প্রায় প্রতি বাড়িতে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে সত্য কিন্তু উহা দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মিটানো ছাড়া আর কোন কাজেই লাগানো হয় না। যথারীতি পরিশ্রম করিয়া 'বাগ' নির্মাণ, কলপ দেওয়া, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্বাদের আকারের ও বর্ণের আম ফলাইয়া পয়সা উপার্জন এরূপ চেষ্টা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সত্য, কিন্তু তা অতি সামান্য। পল্লী বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি অনেক রকমের অভাবই আছে। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ বাড়িতেই মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু ছাড়া প্রয়োজনের বাহিরের কম বেশি কিছু না কিছু জায়গা আছে। আবার অনেক জায়গা পতিত অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিতেও দেখা যায়। এই সকল জায়গা অবসর সময়ে পরিশ্রম করিয়া কৃষি ফলাইলে নিজেদের প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও দুই পয়সা আয় হইতে পারে।

কোনও বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি যত্ন করিয়া আম ধরাইতে পারিলে এক একটা গাছে অনেক টাকার আম পর্যন্ত ফলানো যায়। বাজারে আমের চাহিদা অসাধারণ। উহার জনপ্রিয়তাও কস্মিনকালে কমিবার নয়। উহার ফলন দ্বিগুণ বর্ধিত হইলেও বাজার নেহাৎ মন্দা হইবার আশঙ্কা নাই। কাজেই প্রায় প্রত্যেক গৃহস্ত বাড়িতেই ইহার কয়েকটা গাছকে সযত্নে ফল ধরাইয়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখিলে লাভবান হওয়া যায়।

শুধু রসনা পরিতৃপ্তির জন্যই আম্রের সৃষ্টি নহে। উহার কাঠ খুব সারবান ও দামী। উহা দ্বারা প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, ইহা সকলেরই জানা আছে। আমের আঁটি কবিরাজী ও নানা টোটকা চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ইহা ছাড়া আম্রকে কুটীরশিল্পরূপে ব্যবহার করার ইঙ্গিত আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। বৈশাখের জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে যখন গাদা গাদা কাঁচা আম গাছ তলায় ঝরিয়া পড়ে, ছেলেদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে 'আম কুড়াইবার ধুম' লাগিয়া যায়, তখন ঐ কাঁচা আম শুধু ছেলেদের রসনার খোরাক যোগাইতে না দিয়া ঐ আম টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া আমশী প্রস্তুত করিলে গরীব ঘরের উদরান্নের জন্য উদ্বাস্ত পুরলক্ষ্মীগণের দু'পয়সা আয়ের পথ হয়। পল্লীগ্রামের অনেক হাট বাজারেই আমশী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। উহা ব্যঞ্জনে ব্যবহার করা চলে। আমের জেলিও রসনায় জল আনয়নের বিশেষ অনুকূল পদার্থ।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মার্চ ১২, ১৯৩৭

বর্ষার কাব্য

ভারতীয় কথাসাহিত্যে বর্ষা উপভোগের তিনটি যুগধারা আমরা দেখিতে পাই। তিনটি ধারাই বিরহানন্দের অশ্রু-মদির প্রবাহ বেগে চলিয়াছে। বেদনা মাধুর্যের এমন অকপট প্রকাশ কাব্যের অন্য কোন ধারাতেই নাই। মেঘ দর্শনে বিরহী যক্ষের হৃদয়াবেগ ছন্দে গাঁথিয়া কালিদাস অমর হইয়া আছেন। পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব কবিগণ প্রিয়সুখবঞ্চিতা ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যাকুলতা ও প্রতীক্ষমানতা লইয়া অপূর্ব বর্ষাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে রবীন্দ্রনাথের যুগ। তিন যুগের বর্ষা কাব্যের মূল সুর বেদনার সুর, না পাওয়ার সুর, আর না পাইয়াও গভীরভাবে অনুভব করিবার সুর। কিন্তু উহাদের প্রকৃতি ত্রিধারায় বিভক্ত।

বর্ণনার পুষ্টতা ও বলিষ্ঠতা এবং রাজসিক ঐশ্বর্যের সালঙ্কার আড়ম্বরে কালিদাসের বর্ষাকাব্য অমর হইয়া আছে। কালিদাসের মেঘ কোথাও শৈলগাত্রে সোহাগমত্ত মাতঙ্গকে মাতাইয়া, কোথাও বা বিদিশা ইত্যাদি নগরীর পুষ্প স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা রূপসী প্রেমার্ঘ্য রচয়িত্রীদিগকে সুখ স্বপ্নের স্পর্শ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভারতের দুই প্রান্তে প্রিয়প্রিয়াবিচ্ছেদাকুল দুইটি নরনারী শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও উহাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে যে মেঘ উত্তর ও পূর্ব মুখে যাত্রা করিয়াছিল তাহার গতিপথের সর্বত্র যে বিদগ্ধপুলকের প্রাচুর্য ছড়াইয়া গিয়াছে। এই ঐশ্বর্যবিস্তৃতির সজীবতার পর ব্রজ-বিরহের ভাববিস্তৃতি বর্ষাকাব্যকে রসমধুর করিয়াছে। কালিদাসের অলঙ্কার সম্ভেগের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিগণের লীলামাধুর্য মণ্ডিত হৃদয়াবেগ আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করে।

এখানে স্থানব্যাপ্তির বাহুল্য নাই, নগরী-নাগরী ও করীযুথের সঙ্গে করমর্দনের প্রয়াস নাই। ব্রজাঙ্গনা–শিখা নৃত্য, তমাল শাখার মধ্যপথে মেঘ সমাগম, যমুনা-নীরে মেঘচ্ছায়া, স্থানে স্থানে কদম্বরেণুর আবেগময় আবেশ এই নিয়াই প্রাণের অর্ঘ্য বিরচনে নিরত। এখানে মেঘের রূপের মধ্যদিয়া দয়িতের রূপ উপলব্ধির আড়ম্বরহীন বাসনা বিলাস। একাকিত্বের ভয়-বিজড়িত প্রিয়সঙ্গবাঞ্ছার ফুকার এবং মেঘময় মেঘবরণের বুকে আত্মসমর্পণের গভীর ঐকান্তিকতা এখানে বর্ষাকাব্যের রূপ দান করিয়াছে।

চির সঙ্গসুখানুলিপ্তের সাময়িক বিচ্ছেদের আকুলতাকে কালিদাস কল্পনার দৌলতে বেগবান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব বর্ষাকাব্যের মূলতত্ত্ব ছিল পাওয়ার উৎকণ্ঠা বা গভীর আসঙ্গলিপ্সা। রবীন্দ্র বর্ষাকাব্যের পরমাত্মা পাওয়া বা পাওয়ার হর্ষ দোলায় আন্দোলিত। বর্ষার নিবিড়তার মাঝে, বাঞ্ছিত অনুষঙ্গকে হৃদয় দিয়া উপভোগ করার সুখানুলেপ এখানে প্রত্যক্ষ নহে। বর্ষার সমগ্র রূপকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া উপলব্ধির আনন্দ এখানে স্বতঃউৎকর্ণ হওয়ার প্রশ্ন এখানে না উঠিয়া বরং প্রকৃতির সঙ্গে, কেয়া

নীপাদির আন্দোলিত শাখাপত্রের প্রচুরতার সঙ্গে বর্ষণের রিম-ঝিম রুণু-রুণু ধ্বনিকে মনের গভীরে ধ্যান করিবার আনন্দই এখানে অখণ্ডরূপে বিরাজিত।

বর্ষাকাব্যের চতুর্থ স্তর এখনো বিরচিত হয় নাই। বঙ্গ পল্লীতে কেয়া কদম্ব সবই ফুটিয়া বর্ষার রূপমাধুরী বিকাশ পায়। কিন্তু পল্লীর লোকেরা উহা উপভোগ করিতে পারে না। আকাশে বর্ষা মেঘময় বেণী এলাইয়া দিলে উহারা আপনাদের অবিন্যস্ত ঘর ঝরানো কুটিরের চালের ফুটা দেখিয়া শঙ্কিত হয়–শিশু সন্তান ও তাহাদের ছোট ছোট জামাকাপড়গুলিকে হয়ত বাঁচানো যাইবে না। বর্ষণ আরম্ভ হইলে আতঙ্কে অস্থির হয়–যে বর্ষা তাহাদিগকে ফসল জন্মানোর সুযোগ দিয়াছে সেই বর্ষা হয়ত পক্ক শস্য ঘরে তুলিবার সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবে। শুধু তাই নয়, প্রথম বর্ষণের পর যে প্লাবণ আসে, তাহাতেও নিমজ্জমান ধান ও পাট গাছগুলির দিকে তাহারা শায়কবিদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সকাতরে তাকায়, দেখে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করিয়া গাছগুলি ক্রমশ কেমন ভাবে জলের নিচে তলাইয়া যাইতেছে। বর্ষা মঙ্গলের চতুর্থ ধারা কোন ভাষায় কোন সুরে লেখা হইবে কে জানে সে কথা।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : মার্চ ৩০, ১৯৩৯

রোকেয়া জীবনী

পুস্তক-সমালোচনা

যে আদর্শ মহিলার কর্মবহুল জীবনালেখ্য আলোচ্য পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে, তিনি অসাধারণ সংগঠনশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্তব্যপথের সমুদয় বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার অদম্য উদ্দীপনা তাঁহাতে ছিল। সর্বোপরি জ্ঞানার্জনের অফুরন্ত স্পৃহা তাহাকে সকল প্রকার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যদিয়াও সাফল্যের উচ্চশিখরে উন্নীত করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আশানুরূপ সুপ্রচার হয় নাই। ইহার জন্য তাঁহার নীরব সাধনা যতখানি দায়ী, মুসলমান সমাজের তাঁহার প্রতি অমনোযোগিতা তাহা অপেক্ষা কম দায়ী নহে।

প্রায় পৌনে এক শতাব্দী পূর্বে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের রক্ষণশীল মুসলমান বড় ঘরের যেসব চিত্র আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন বোরকার অন্ত রালে অবরোধবাসিনী হতভাগিনীগণকে কি রকম ক্লেশময় কারাজীবন অতিবাহিত করিতে হইত। সেখানের মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার কথা ছিল কল্পনারও অতীত। সেই ভীষণ অতি রক্ষণশীলতার জ্বালাময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও কতদূর আগ্নেয়-জ্ঞানপিপাসা থাকিলে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জীবনকে জ্ঞানামৃতে অভিসিঞ্চিত করা যায় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই রোকেয়া জীবনী।

মুসলমান নারী সমাজের প্রতি তৎকালীন মর্মবিদারী অভিশাপ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার স্বীয় জীবনের জ্বালাময় অভিজ্ঞতা হইতে; এবং পরবর্তী জীবনে তিনি অপরাজেয় কল্যাণবুদ্ধি লইয়া এক হস্তে সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং কুসংস্কার নারীত্বের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং অন্য হস্তে শিক্ষা-বর্তিকা ধারণপূর্বক জাগরণের অভয়বাণীতে নারী সমাজে মঙ্গলময় উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বীয় জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া এবং স্বামীর ও স্বীয় উপার্জনের শেষ কপর্দকটি দিয়া তিল তিল করিয়া যে সুবিখ্যাত সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্ল স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সে সাধনা আজ পরিপূর্ণভাবে সফল হইয়াছে।

বস্তুত বঙ্গীয় মুসলিম নারী সমাজ তাঁহাদের জাগরণের জন্য এবং শিক্ষাদীক্ষার পথ সুগম হওয়ার জন্য এই মহীয়সী মহিলার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞাকিবেন। নারীজাতির জন্য তাঁহার অন্তরের দরদই তাঁহাকে নারীদের কল্যাণের জন সর্বস্ব সমর্পণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শুধু মুসলমান নারীগণের নহে, হিন্দু মুসলমান সমভাবে সকল নারীগণেরই তাই এই বিশালপ্রাণ মহিলা প্রাতঃস্মরণীয়া।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা এই বিরাটপ্রাণা মহিলা কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার, তাঁহাকে বুঝিবার এবং একসঙ্গে নারীহিতমূলক কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কাজেই তিনি যে তাঁহার জীবনী-গ্রন্থ প্রণয়নের অধিকারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি নিজেও বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখিকাগণের অগ্রগণ্যা। 'বুলবুল' নামক উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য বিষয়ক একখানা মাসিকপত্র সম্পাদনা করিয়া এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে যশ অর্জন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার লেখা সম্বন্ধে পরিচয় দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানার সর্বত্রই তাঁহার পাকা হাতের পরিচয় রহিয়াছে। লেখিকার ভাষা চমৎকার, বর্ণনাভঙ্গী উপভোগ্য, প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। সমগ্র গ্রন্থখানা আগোগোড়া একখানা মনোরম উপন্যাসের মতই এক নিঃশ্বাসে শেষ করিবার মত। ভাষার সংযম এবং শুচিতাও গ্রন্থখানার অন্যতম সম্পদ। বাঙলার প্রত্যেক শিক্ষানুরাগিণী মহিলা ও শিক্ষার্থীগণের হাতে এই গ্রন্থখানা শোভা পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষ করিয়া, স্কুলের মেয়েদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এখানা সর্বাংশে যোগ্য। আমরা টেক্সট বুক কমিটির কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বইখানার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

সামসুন নাহার বি. এ প্রণীত। ২৩ ক্রেমেটোরিয়াম স্ট্রীট, কলকাতা 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' হইতে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বি. এ কর্তৃক প্রকাশিত। উৎকৃষ্ট কাগজে আগাগোড়া পাইকা হরফে পরিষ্কার ছাপা, কাপড়ের বাঁধাই, দাম এক টাকা।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : জানুয়ারি ২১, ১৯৩৮

টি এস এলিয়ট

মিঃ টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) এ বৎসর (১৯৪৮) নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। গত ৪ঠা নবেম্বর সুইডিস একাডেমির সাহিত্য শাখার এক অধিবেশনে এই পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশের কাব্যরসিকগণ নিশ্চয় আনন্দিত হবেন। কারণ, বড় কবি মাত্রই দেশকাল ভেদে সকল কবিরই স্বগোত্র হলেও, কবি এলিয়টের প্রভাব সমসাময়িক কবিতায় ও কবিদের মধ্যে যত গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে, তেমনটি খুব কমই দেখা যায়। সেদিনের রোমান্টিক পৃথিবী থেকে আজকের পৃথিবী অন্য রকম। তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর কাব্যাদর্শেরও যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবার ছিল, এলিয়টের ন্যায় শক্তিধর কবি সে কাজ সিদ্ধ করে যুগের চাহিদা পূরণ করেছেন বলা চলে।

রোমান্টিক কবিতা ও এলিয়টের কবিতার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভবপর নয়। কথা ছন্দ ভাবের ললিত বিলাস ও তার বাহুল্য রোমান্টিক কবি ও পাঠক উভয় গোষ্ঠীকেই মশগুল করে রাখে। মানুষকে সেখানে মাটিতে পাওয়া ভার, তারা হাওয়াতে উড়ে বেড়ায়। সেখানে মানুষ সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলাই রসের উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই অতিবিরাট, সুতীব্র অনুভূতিপ্রবণ, প্রভাবশালী কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামশীল আজকের এই টি এস এলিয়ট।

রোমান্টিক কবিতার মূলে আছে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ প্রেরণা মাত্র; কিন্তু এলিয়টের কবিতার মূলে আছে সমষ্টির দুঃখবেদনা অভাব নৈরাশ্যকে বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখার এবং এমন কি নির্মম হয়েও, তার অন্তরের হাহাকারকে ভাষা দেবার ক্ষমতা। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার বলেই রোমান্টিকের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা দেশের কাব্যজগতে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সর্বত্রই কবিচিত্তে একটা সংগ্রামশীলতা জাগিয়ে তুলেছে। এই একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র করে কাব্যের, একটা বিরাট জগৎ গড়ে উঠেছে–আকাশে তার পক্ষবিস্তার নয়, মাটিতে তার পদ দৃঢ়সংবদ্ধ। তাঁর প্রতিভা যেমনি মৌলিক তেমনি প্রচণ্ড না হলে, এটা সম্ভবপর হত না।

সম্ভবত এই দিকটি লক্ষ্য করেই 'ক্ষুরস্য ধারা'র (Razor's Edge–ঔপনিষদিক পট–ভূমিকায় রচিত যুগান্তকারী উপন্যাস) লেখক সমরসেট মম এলিয়টকে বলেছেন বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর মৌলিক কবি।

কোথায় এই মৌলিকতার উৎস, সে বিচার করতে হলে আমাদের অধিক দূর যেতে হবে না।

ইংরাজী ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়টা ইংরাজী সাহিত্যে ভাবধারার দিক দিয়ে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ের নূতন এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী দৃঢ় পদচারণায় এগিয়ে আসেন সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে; একদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী মানসে

এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠক সাধারণের মধ্যে তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন।

১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়েই তাঁদের যুগান্তকারী লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। ত্রিশ সালের এই তরুণ বিদ্রোহীদের দলে অগ্রগণ্য রূপে পাই কথাশিল্পীদের মধ্যে জেমস জয়েস, অলডাস হাক্সলি ও ভার্জিনিয়া উলফকে এবং কাব্যস্রষ্টাদের মুখপাত্ররূপে পাই টি এস এলিয়টকে। যুদ্ধপূর্ব যুগের জনপ্রিয় কথাশিল্পী গলসওয়ার্দি, ওয়েলস, বেনেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফ তো পুস্তিকা লিখে সংগ্রামই ঘোষণা করে দিলেন। এদিকে অলডাস হাক্সলিও ঔপন্যাসিক ধারণায় ঘটালেন বিপ্লব।

এদিকে এঁরা অগ্রযুগের গদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম চালালেন, এলিয়টও তেমনি পদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে তূণ থেকে বার করলেন ব্রহ্মাস্ত্র: নূতন চিন্তা, নূতন টেকনিক, নূতন মননের নিদর্শন নিয়ে বেরুল তাঁর কবিতা। এই 'নূতন' আসলে কি? তাঁদের রচনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই নূতনকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হবে না। বহুপুরাতনের মণিকোঠা থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে এই নূতন। এই নূতনই হাক্সলি ঈশার-উডকে যোগী বানিয়েছে! এলিয়টের কাব্যের যে রোমাঞ্চকর মৌলিকতা, এরও উৎস কি এইখানেই? সমুদ্র মৌলিক, কিন্তু তাকে মন্থন করে, যে সুধা ওঠে, তাকেও কি মৌলিক বলব না? উপনিষদের ক্ষীর-সমুদ্র থেকে মন্থন করেই তোলা হয়েছে এই মৌলিক কাব্যসুধা আজকের দিনে একথা অসম্ভব মনে নাও হতে পারে! অন্তত এ যুগের যে সকল পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিবর্তিত করেছেন তাঁদের অনেকেই যে মনে প্রাণে বৈদান্তিক একথা সুবিদিত। এলিয়টের কাব্য পাঠে মনে হবে বেদান্তের হাওয়া এর গায়েও কিছু লেগেছে। রোমান্টিসিজমের সঙ্গে সংগ্রাম এক হিসাবে ভোগ-লালসা ও ক্লেদাক্ত বিলাসিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারায় সর্বত্র ত্যাগকে ছোট করে ভোগকে বড় করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আদর্শ তার ঠিক উলটো। এখানে মানুষকে মানুষরূপেই দেখা হয়েছে এবং পার্থিব অসারতা ও নশ্বর ভঙ্গুরতাকে ইন্দ্রিয় সুখলালসার থালা সাজিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা হয়নি। এলিয়টের কাব্যজগৎ যদি এইখানে ভূমিস্পর্শ পেয়ে থাকে তো সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

২.

এলিয়ট নোবেল প্রাইজ পেলেন ষাট বৎসর বয়সে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান মাতাপিতার সন্তান এলিয়ট মিসৌরীর অন্তর্গত সেন্ট লুইনাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ইংলন্ডে বসবাস করছেন।

এলিয়ট পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করে হারভার্ড গ্রাজুয়েট স্কুলে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১০-১১ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের Sorbonne-এ ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরের তিন বৎসর তিনি আবার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে থাকেন। ১৯১৩-১৪

খ্রিস্টাব্দে হারভার্ডে দর্শন বিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন, কিন্তু ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পেয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মানিতে কাটান।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Merton কলেজে গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। লিবনিজ ও ব্র্যাডলির উপর দুটি স্মরণীয় প্রবন্ধও তিনি ঐ সময়েই রচনা করেন। কবিতায় তাঁর প্রথম পরিণত রচনা হচ্ছে Alfred Prufroch-এর প্রেমের কবিতা; বেরোয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময়েই তাঁর বিবাহ হয় এবং ঐ সময়েই লন্ডনের নিকটস্থ হাইগেটস স্কুলে ফরাসী, ল্যাটিন, গণিতশাস্ত্র, ড্রইং, সন্তরণ, ইতিহাস, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। এর পর লয়েডস ব্যাঙ্কে কিছুদিন চাকরি করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে চাকরি পেয়েও স্বাস্থ্যের অজুহাতে বঞ্চিত হন।

১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এলিয়ট 'এগোয়িস্ট' পত্রের সহকারী সম্পাদকতা করেন; এবং 'এথেনিয়ান' পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রৈমাসিক পত্র 'ক্রিটেরিয়েনের' সম্পাদক পদে বৃত হন। এখন তিনি 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার' নামক পুস্তক প্রকাশালয়ের একজন ডিরেক্টর।

তাঁর প্রধান প্রধান রচনা

কবিতা : The Waste land (1922) ; Ash Wednesday (1930); East Coker (1940); Burnt Norton (1941); Dry Salvages (1941); Poems (1909-25); Later Poems (1925-35)

নাটক : Murder in the Cathedral (1935); Family Reunion (1939);

প্রবন্ধের বই : Homage to John Dryden (1928); Selected Essays (1917-32); Elizabethan Essays (1908); Essays in Criticism; An Essays on Poetic Drama; The Sacred Wood.

বর্তমান সভ্যতা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত তার বিশ্লেষণ করে দেখলে, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা হবে। এই সভ্যতা যেন নিজে যা নয় তার চাইতেও বেশি বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। এলিয়ট এর বিরুদ্ধে বজ্রসম, তীব্রতম অভিযোগ এনেছেন; তাঁর Waste Land কবিতা-পুস্তকে তিনি এই সভ্যতার স্বরূপ, এই সভ্য মানুষের খাঁটি রূপ নির্মমভাবে উদঘাটিত করেছেন। এই সভ্যতা যে কতখানি অসার, তাকে নিয়ে গর্বান্ধ মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর, কবি তা নির্মমভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। এই দেখানোর মধ্যে অবশ্য একটা দুঃখবাদের রেশ, নৈরাশ্যের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যা মানুষকে আনন্দ না দিয়ে দেবে বেদনা। কিন্তু এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, প্রচলিত মেকি অথচ দুর্বার এক সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে মুষ্ঠি দৃঢ়বদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন তিনি একা। কিন্তু আজ আর তিনি একা নন। তাঁর বজ্রদৃঢ় অভিযোগই প্রধানত এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের বিবর্তনে এলিয়টের দান অসামান্য। ১৯১১ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আধুনিকপন্থী কবিদের রচনা নিয়ে জর্জিয়ান পয়েট্রি নামে কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে এবং ইংরাজী কাব্যে সেগুলি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম রূপার্ট ব্রুক যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন।

এবং যুদ্ধেই নিহত হন। এই দলের আরো একজন কবি, উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে সিগফ্রিড সেশুন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন এবং সেখানকার লেখা কিছু কবিতা সঙ্গে করে আনেন। সেগুলি ছাড়া, ঐসময়ের এদলের লেখা কবিতা যুগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগের প্রকৃত জগতের কোন ধারণাই সেগুলিতে পাওয়া যায়নি।

এই অধোগতিকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অধোগতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তখন ফ্যাসিবিরোধী গান ও কবিতা হয়ে পড়েছিল বাংলা কবিতার নিরিখ। যা হোক, তখন চলছিল শ্রেণি-সংগ্রাম আর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চিন্তারাজ্যের ভিত্তি তখন বিপ্লবমুখী সমাজ-বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণী ধারণা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলরব প্রভৃতির অভিঘাতে প্রায় নড়ে উঠেছিল। জর্জিয়ান কবিরা এইগুলিকেই গেঁথে গেঁথে কবিতা সৃষ্টি করে চললেন। কিন্তু এলিয়ট প্রগতিপন্থী হয়েও গড্ডলিকা প্রবাহে পা বাড়াতে অস্বীকার করলেন। এঁদের থেকে তাঁর সাহস যেমন ছিল অধিক, তেমনি সত্যিকার বুদ্ধি ও মননের দিক থেকেও তিনি ছিলেন তাঁদের অনেক ওপরে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বই Prufroch এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে Poems বের করলেন। এই দুটি বই সেই সময়ের কবিতা লেখার ফ্যাশনকে অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই কবিতাগুলিতে অভ্রান্ত সিনিসিজম-এর যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুদ্ধিজীবী গণ-মানসে বিশেষ আবেদন জাগিয়ে তুললেন। যেন তারা এইরকম সুর শোনবার জন্যেই এত দিন কান পেতে ছিলেন।

তার পর বেরোয় তাঁর যুগান্তকারী কাব্য গ্রন্থ Waste Land ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। এ বই বেরুলে তরুণ সমাজ তাঁকে আদর্শ প্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণ করল এবং তাদের মনোরাজ্যে তিনি একক কাব্যস্রষ্টারূপে স্থান পেলেন। এই বইটিতে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের গতিপ্রকৃতির অসারতা নির্মম রেখায় রূপ পেয়েছে; সভ্যতার চক্র আটকে পড়েছে, তার আর ঘুরবার ক্ষমতা নেই, এই ভাবটি কবি তাঁর কাব্যের লাইনগুলিতে নিবিড়ভাবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এই ভঙ্গুর সভ্যতা আর জীবন্মৃত মানুষ চিত্রিত করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে আপনাকে শুধিয়েছেন 'কবি একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।' সেই বিশ্বাসের ছবিই তাঁর Ash Wednesday বইখানা।

এলিয়ট ইংলন্ডের গত বিশ বছরের চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছেন। গত বিশ বছর ধরে যাঁরা কবিতা লিখে আসছেন, তাঁদের মধ্যে সমালোচক হিসাবেও আজ তাঁর আধিপত্য সর্বজন-স্বীকৃত। চিন্তাশীল মানবমনে তিনি ধর্মবোধ উজ্জীবনার্থে নিজের পড়াশোনা ও প্রতিভাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

কাব্যশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সর্বযুগের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তিতে প্রবাহিতঃ যেন মনের ঐকান্তিকতা থেকে বিনা চেষ্টায় এগুলি বেরিয়ে আসে। তাঁর রচনা ও জীবন দর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরাজী ও আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে।

সাপ্তাহিক দেশ : নভেম্বর ১৩, ১৯৪৮

সিরাজের কাল

ইতিহাস সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। ইতিহাসের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতির অবমাননা করিলে সেই অবমাননার জন্য দায়ী সাহিত্যই। সাহিত্য ইতিহাসকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে, কাজেই সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাসজাত সত্য-মিথ্যার সকল দায়িত্বকে। সিরাজের প্রতি বিদেশীয়গণের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণেরও কেহ কেহ ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। এইজন্য এদেশীয় সাহিত্যের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত।

সিরাজ সম্বন্ধে যিনিই আলোচনা করুন না কেন, তাঁহার প্রতি ইতিহাসের অবিচার-প্রসঙ্গে দেশীয় ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকগণ কর্তৃক কৃতকর্মের কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচনাতে উল্লেখ হইবেই। ইংরাজগণ স্বার্থের খাতিরে যাহা রচনা ও রটনা করিয়াছেন, কেহবা অনুরূপ মিথ্যা রচনা ও রটনা করিয়া এবং কেহবা ইংরাজের পদাঙ্কানুসরণে তাহাদের মিথ্যা কথা সমর্থন করিয়া ইতিহাস-অবমাননা ও সাহিত্যের মানহানির দায়ে পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া এখন আর ফল নাই, কারণ তাহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে। মীরজাফর জগৎশেঠ উমিচাঁদ প্রভৃতি দুর্ভোগাদের প্রতি জাতির যে-রকম পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষ্যমান লেখকগণের প্রতি তাহা অপেক্ষা কম প্রকাশ পাইয়াছে বলা যায় না। কাজেই বহুবার বলা কথার পুনরাবৃত্তি না করিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বেশি লাভবান হইব।

বহুদিন ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমাজগত ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া আছে। ধর্মগতভাবে কতকটা না-বোঝা এবং কতকটা ভুল-বোঝা এই ব্যবধানের মূল-কারণ। হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মধুভাণ্ড 'চন্দ্রচূড় জটজালে' আবৃত, স্বল্পকালের সাধনায় অপর ধর্মাবলম্বী কাহারও উহার সম্বন্ধে অবগতির উপায় নাই। আর হিন্দুগণের একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, সাধারাণ অ-বিদ্বান ও স্বল্পবিদ্বান হিন্দুগণ ধর্মের কিছুমাত্র না বুঝিয়া কেবল বিশ্বাসের জোরেই ধর্মকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে একথা বলা যায় না। এইরূপ একটুখানি বিশ্বাসমাত্রকে সম্বল করিয়া অপর ধর্মের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সত্যসত্য শ্রদ্ধাপোষণ করিবে এতখানি আশা করা যায় না। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য হইলেও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে।

সকলেই জানেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের দিক দিয়া যোগসূত্র স্থাপনে খ্রিস্টান মিশনারীদের 'মিশন' যতখানি কাজ করিয়াছে অপর কেহ সেরূপ করেন নাই।

পাদরীদের সুপ্রচারের প্রথম অবস্থাকে স্মরণ করুন। মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে হয়ত তাহারা ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থাদির সাহায্যে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ যতনা দুরূহ তাঁহাদের উপযোগী গ্রন্থপ্রাপ্তি আরও দুরূহ। যাহা হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইহাতে বাধা জন্মায় নাই। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর

ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর কতকগুলিকে মিথ্যা, কদর্থ করিয়া এবং কৃষ্ণচরিত্রের পাদরীদের অগম্য কতকগুলি মিথ্যা দোষক্রটি বাহির করিয়া তাঁহাদের যাত্রাপথের সহায় করিয়া লইলেন এবং ঐ সঞ্চয়কে সম্বল করিয়া নিরক্ষর সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। হিন্দু ও মুসলমান কেহ কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ ছিল না, পাদরীদের মধ্যস্থতায় উভয়ে উভয়কে কিছু কিছু বুঝিতে পারিল—পরস্পর পরস্পরকে নিন্দা করিবার মুখরুচক উপাদান কিছু কিছু তাহারা পাদরীদের প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইল। ইহাতো গেল অজ্ঞসাধারণের কথা। প্রাজ্ঞজনের মনে এইরূপ হীন প্রচার বেশি ক্রিয়া করে নাই।

প্রাজ্ঞ হিন্দুগণের কেহ কেহ প্রবল অনুসন্ধিৎসাবলে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিলেন। স্বীয় ধর্মের উদারতার বশে পরধর্ম হইতে রত্ন আহরণের প্রেরণা তাঁহাদের সেই প্রয়োজনবোধে শক্তিসঞ্চার করিল। আরবী শিক্ষার কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে, ইংরেজিনবীশ তাহারা, ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয়দের লিখিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ গ্রন্থাদিরই তাহাদের কেহ কেহ আশ্রয় লইলেন। ফলে তাহারা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে বর্ধিত করিবার পরিবর্তে ভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা মনের মণিকোঠা পূর্ণ করিলেন। সেই জ্ঞান লইয়া তাহারা আবার গ্রন্থাদিও লিখিলেন। সেই চর্চা মুসলমানদের মনে গৌরববোধ অপেক্ষা বেদনারই সঞ্চার করিল। মুসলমান প্রাজ্ঞগণ কিন্তু পূর্বাপর থেকে অনুরূপ চেষ্টা হইতে বিরত রহিলেন। তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বা গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষান্ত রহিলেন। উক্ত প্রাজ্ঞগণ মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে প্রমাদে পড়িয়াছিলেন, মুসলমান নরপতি সিরাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রমাদেই পড়িলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়ত ভালই ছিল, ইংরাজের মুখে ঝাল খাইতে গিয়াই হয়ত তাহারা এইরূপ ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন।

শুদ্ধ সাহিত্যে যাঁহারা সিরাজের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্বর্গীয় কবি নবীন সেনের নাম উক্ত হইয়া থাকে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পর্যন্ত নবীন সেনকে ক্ষমা করেন নাই— পরবর্তীয়গণকে যে ক্ষমা করিবেন না ইহা বলাই বাহুল্য। নবীন সেন ঐতিহাসিক উপকরণ লইয়াছেন ইংরেজদের নিকট হইতে ধার করিয়া, আর কাব্যিক উপকরণ লইয়াছেন, কিছুটা স্বকপোলকল্পনা হইতে আর কিছুটা বিজাতীয় কবির কাব্য হইতে। এই উক্তি সম্বন্ধে অনেকেই যে একমত তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু একটানা একটি স্বজাত্য ও স্বাদেশিকতাবোধের সুর কাব্যখানকে পাঠকসমাজে বহুকাল ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

পলাশীর যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া নবীন সেন দেশের উপকার ও অপকার দুইই করিয়াছেন। উপকারের স্বপক্ষে অধিক কিছু না বলিয়া দেশদরদী পাঠকগণের ছাত্রজীবন স্মরণ করিতে বলি। পাঠ্যাবস্থায় অধিকাংশ যুবকই নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" বলিতে অজ্ঞান। জাতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল মণিরূপে গ্রন্থখানি এককালে বহু কর্তৃক পঠিত হইত। ইহার এই বহুলপ্রচার মিথ্যাপ্রচারে বহুল সহায়তা করিয়াছে। স্বাদেশিকতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা বক্তব্যাদিও সুললিত ছন্দে বিস্তৃতরূপে প্রচার লাভ করিয়াছে— একথা মিথ্যা নয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, সিরাজ সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথাই আমরা বহিপত্রে পাঠ করি না কেন, সর্বমিথ্যাকে আড়াল করিয়া পাঠের পরবর্তী সময়ে বাংলার খাঁটি সিরাজকেই স্ব-দীপ্তিতে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়।

সিরাজ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা আজকার কোন পাঠকের মনে বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করে না। আর আমরা মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি।

বাংলা সাহিত্য সিরাজ সম্বন্ধে বলিয়া যতখানি কলঙ্কিত হইয়াছে, আমাদের মনে হয় তদপেক্ষা অধিক কলঙ্কিত হইয়াছে সিরাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ না বলিয়া। সিরাজ ও সিরাজের সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে সাহিত্যের বাক্যস্ফুটের অপ্রাচুর্য অমার্জনীয় ক্রটি! ঘটনাবহুল সিরাজের কালের সম্যক পরিচয় ও তৎপ্রসঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশে বহুখণ্ড গ্রন্থ, রাশি রাশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পথ রহিয়াছে। জাতির জীবনে এতবড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা কি আর হইতে পারে? অদ্যাবধি সিরাজের যুগ অন্ধকারে রহিয়াছে। বহুকালের এই পুঞ্জীভূত মিথ্যা সরাইয়া সিরাজকে তাঁহার স্বদীপ্তিতে প্রতিভাত করা দুই একজন ঐতিহাসিকের কাজ নহে। আজ ইংরাজ জাতি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে কেবল সাহিত্যের প্রাচুর্যের মধ্য দিয়াই তাহারা এতদিনে জাতির ভাগ্য নির্ণয় করিয়া লইত।

সিরাজের কাল জাতির বক্ষে বেদনাদায়ক কাল হইলেও অগৌরবের কাল নহে। চক্রান্তকারীদের শয়তানীর অনুকূলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নরপতি আত্মসমর্পণ করেন নাই। আর রাজা হইয়া বণিকের নিকট পরাজয় বরণও করেন নাই। প্রতিকূল অসহ্যাবৈগুণে চতুর্দ্দিককার ন্যাক্কারজনক পারিপার্শ্বিকতা হইতে সরিয়া পুনরায় সমরের আয়োজন করিবার কালে জ্ঞাতিশত্রুর হস্তে নিহত হন। এদেশে গবেষকের অভাব নাই। লেখকগণের সময়েরও অপ্রাচুর্য নাই। দেবাসুর সংগ্রামে জগতের কতদূর ক্রমবিকাশ হইল, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়কাল ঠিক কখন—এ সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক গবেষণায় মস্তিষ্ক ব্যয় করিবার মত লোকের তো এদেশে অভাব নাই।

দেশে এত গবেষক থাকা সত্ত্বেও সিরাজের কাল দেশের সম্মুখে এখনও যথেষ্টরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। সিরাজের কাল নিয়া গবেষণা করিলে এবং সত্য তথ্যাদি নির্ভীকভাবে প্রকাশিত করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকম্পালাভের আশা কম এবং সরকারের বিরাগভাজন হইবার আশা বেশি—তর্কের খাতিরে এ সকল কথা স্বীকার করিয়া নিলেও, আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির তোয়াক্কা না রাখিয়া এবং সরকারি বিরাগকে কদলীপ্রদর্শন করিয়া অনেকে অনেক কিছু লিখিয়াছেন একথা মিথ্যা নহে। জ্ঞানী লোকে বলেন—যে মাটিতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধরে। একটা গোটা দেশের পতন-ইতিহাসকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আরোপিত মিথ্যা কলঙ্কজাল হইতে মুক্ত করিয়া উত্থানের নির্দেশ দানই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতীয়তা নয়? দেশের দুঃসাহিক দল সিরাজ-সমসাময়িক মিথ্যার ধূলিজাল অপনোদনে সত্য কথা অকপটে বলিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন না কেন? এই কেনর উত্তর কে দিবে। অথচ এদেশেরই ইতিহাস, এদেশের সাহিত্য গর্ব করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে—

মোরা সত্যের' পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
মোরা পূজিব সত্য খুঁজিব সত্য
সেবিব সত্য ধন।

সূত্র : সাহিত্য প্রসঙ্গ, মাসিক মোহাম্মদী, সিরাজস্মৃতি সংখ্যা: ১৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭

কাব্য-সমালোনা
একটি চিঠি

From Adwaita Malla Barman
Gokanghat, Tripurah
23.6.34

প্রিয় ভ্রাত

আপনার কাব্যখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এ সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তা আমি এই পত্রে আপনার নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি, আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। কাব্যখানার যেখানে যেখানে কোন দোষ, বৈসাদৃশ্য, ছন্দ ত্রুটি প্রভৃতি আছে, সেইখানে আমি চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, সংশোধনের ভার আপনার স্কন্ধেই চাপাইলাম।

কাব্য ছাপানো সম্বন্ধে এটুকু বলিতে পারি... কাব্য মন্দ হয় নাই, নতুন লেখকের পক্ষে আশাতীতই হইয়াছে, তবু সর্বতোভাবে প্রকাশের উপযুক্ত হয় নাই। এইজন্য বলি, আপনি ইহা ছাপাইবার চেষ্টা করিবেন না। নিরাশ হইবেন না, অনবরত লিখিতে থাকুন, আপনি অল্প সময়েই বেশ নাম করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস এবং ভরসা আমার আছে।

এখানে কবিতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলুন :

১। গীতিকাব্য (Lyrical Poems) ২। খণ্ডকাব্য (Narrative Poems) ৩। মহাকাব্য (Epic).

আপনাকে প্রথমতঃ গীতিকবিতায় হাত পরিষ্কার করিতে হইবে। Picture-ই গীতি কবিতার প্রাণ। কাজেই আপনি Picture ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তারপর খণ্ড কাব্যে হাত দিবেন। অতীত বা বর্তমান ঘটনাবলী লইয়া আপনি খণ্ডকাব্য লিখিতে পারেন, তবে অতীতকে নিয়া লেখাই প্রথমতঃ আপনার সুবিধাজনক হইবে। কারণ অতীতের উপর লেখকের কল্পনাকে উদ্দাম গতিতে চালানো যায়। বর্তমান সম্বন্ধে অনেক বিপদের আশঙ্কা, ইহা আপনি ক্রমে ক্রমে বুঝিবেন। কিন্তু সাবধান, এখন আপনি epic এ হাত দিবেন না। উহা ভয়ানক কঠিন কাজ। বিশেষ সিদ্ধহস্ত হইলে পর আপনি epic লিখিতে পারেন। হিন্দুশাস্ত্রে epic সম্বন্ধে বলে যে, উহাতে at least নয়টি সর্গ থাকিবে। অতীত হইতে material সংগ্রহ করিতে হইবে। Stytle খুব grand হওয়া চাই। একাধিক ছন্দ ব্যবহার করা যায় না। ইত্যাদি। Narrative বা epic এর materials আপনি হিন্দু বা মুসলিম mythology কিংবা history হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। কাব্যের পূর্বাপর যাহাতে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি

থাকা চাই। ভাষা বা expression এর উপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। আপনার তাহা আছে এবং আপনি অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন। প্রকৃতিকে লইয়াই কবির কারবার, আর "nature is itself a grand picture" এই জন্যেই বলিতেছিলাম, আপনি picture ফুটাইতে বিশেষ যত্ন করিবেন। আর এক কথা– lyrics গুলি সামান্য বিষয়ের উপরই লিখিবেন। বড় বড় জিনিসের উপর রস ফুটাইয়া তোলাই কবির কৃতিত্ব। এ সম্বন্ধে আপনি যতই culture করিবেন ততই আনন্দে আত্মহারা হইবেন।

কাহাকে follow করিবেন না। সর্বদা সর্বত্র আপন ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিবেন। অনুসরণ এবং অনুকরণ এর প্রভেদটুকু আপনি অবশ্যই জানেন। আপনি মধুসূদনের Blank verse এর অনুকরণ করিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়তা বা মরমীবাদ বা mysticism এর অনুকরণ করিলে ইহা দোষের কারণ হইবে।

আর একটি মাত্র কথা বলিয়াই চিঠি শেষ করিব। সাধনা না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে নাই। আর সাধনা যাহা করিবেন তাহা নীরবে নীরবেই করিবেন। আগুন কখনো ছাই ঢাকা থাকে না। আপনার প্রতিভাও একদিন নিশ্চিত সুধীজন সমাজে আদৃত হইবে। ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আমার প্রতি যদি আপনার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে তবে আমার কথায় বিশ্বাস করুন, অনবরত লিখিতে থাকুন।

As a true friend আমি আপনাকে আমার সব বক্তব্য বিষয়গুলো খোলাখুলি ভাবে লিখিলাম, ইহাতে যদি আপনার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি

আপনার
শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ

টীকা :

পত্রটির প্রাপক কবি মতিউল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া-তে মল্লবর্মণের বন্ধু ছিলেন। চিঠি লেখার সময় অদ্বৈত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির আর মতিউল ইসলাম দশম শ্রেণির ছাত্র।

সম্পাদকীয়-স্তম্ভ

সাহিত্য ও রাজনীতি

রাজনীতি ও সাহিত্য বিভিন্ন বিষয় হইলেও উভয়ের মধ্যে আত্মিক যোগ সন্ধান অসম্ভব কিছু নয়। সাহিত্য মানুষ গড়ে, রাজনীতি গড়ে মানুষের ভবিষ্যৎ। সাহিত্য রাজনীতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাহার চরম বিকাশ দেখিতে পাই রাশিয়াতে। সাহিত্য সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সেই জন্য ইহা গণজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রস-সঞ্চারি। সমগ্র জাতির অটুট প্রাণবন্ধনে সেখানে সাহিত্যের সার্থকতা। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সাহিত্যে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের কূটনীতি বিকাশ দেখিতে পাই। এসব সাহিত্যে বুদ্ধির খেলা আছে, নাই গণ-বন্ধনের প্রয়াস; স্বচ্ছ সহজ অহমিকাবোধের সাড়ম্বর প্রাচুর্য আছে, কিন্তু নাই দৈন্যের গভীরে অনুপ্রবেশের মনঃসম্পদ। এইরূপ সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে যে রাজনীতির উদ্ভব তাহাকে কোন মূল্যের বিনিময়ে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইবে কে জানে?

বাংলাও একটি দেশ, ইহারও নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা রহিয়াছে। যাহার প্রমাণ আমরা অহরহ পাইতেছি। ইহার সাহিত্যে দ্বন্দ্বের বিরাম নাই, রাজনীতিতে তো সংঘাত লাগিয়াই আছে। এদেশের সাহিত্যিক স্বেচ্ছাচার গণজীবনের একান্তই ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিষ। রাজনীতিও বোধ হয় তদ্রূপ। শরৎ রাবীন্দ্রিক যুগকে সদম্ভে অস্বীকার করার আড়ম্বর আছে, নাই নবসৃষ্টির শক্তি। সুষ্ঠু, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকে ধিক্কার দিবার সাধু ও অসাধু চেষ্টা রহিয়াছে, নাই কেবল গ্রহণযোগ্য পথ প্রদর্শনের বালাই। সাহিত্য ও রাজনীতিতে দুর্যোগের এমন সুসামঞ্জস্য সংযোগ কোথাও দেখা যায় না। আমাদের সাহিত্য ও রাজনীতির দুর্দিন ঘুচিবে কবে? সাহিত্য কবে কয়েকজন স্বল্পক্ষম সাধু ব্যক্তির খেলায় পুতুলের মত না থাকিয়া গণজীবনের মনের গহনে প্রবেশের পথ খুঁজিবে, এবং আমাদের নেতারা কবে আকাশচারিতার মোহ পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবাশ্রয়ী হইবার প্রয়াস পাইবেন? উভয় ক্ষেত্রেই স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন সর্বাগ্রে : সাহিত্যিককে ছাড়িতে হইবে অহমিকা-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও জাতিবর্ণের অহমিকা, যাহা না ছাড়িলে দেশ ব্যাপ্ত নিম্ন সাধারণের দুঃখ বেদনার থই মিলিবে না, মিলিবে না তাহাদের প্রতি মমত্ববোধের কেশাগ্রস্পর্শ। পক্ষান্তরে নেতাকে প্রথমে ছাড়িতে হইবে নেতৃত্বের মোহ, নতুবা গণসাধারণের প্রতি দৃষ্টি তাঁহার ঝাঁপসা হইয়া আসিবে মাত্র। রাজনীতির সুপরিচালনার জন্য আজ আমরা সর্বাগ্রে সাহিত্যিকের উদ্যত লেখনীরই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

সূত্র : সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নবশক্তি : ৭ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

জিজ্ঞাসা

মনে হয় আমরা মৃত্যুর অতল অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। আমাদের মনুষ্যত্ব যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এই যে শোণিত লোলুপ মানুষ–রক্তে যাহার মৃত্যুর উন্মাদনা, দৃষ্টিতে যাহার হিংস্র নির্মমতা, এই যে হানাহানি রক্তপাত–তার মধ্যে সেই বিরাট মানব সত্তা, সেই মানুষের তপস্যা, সেই মানুষে মানুষে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপনের সাধনা যেন বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত হইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সেই অখণ্ড মানব সমাজের কল্যাণ কামনা, মানুষের পরম এবং সার্বিক আত্মাকে আবিষ্কার করিবার ও প্রতিষ্ঠা করিবার বিরামহীন প্রচেষ্টা আজ হিংসা ও শোণিতের বন্যায় বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত। মানুষ কি চায়? কেন আজ এই আত্মবিক্ষেপ, এই বিক্ষোভ, এই বিদ্রোহ? বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির এই সংঘাতের মধ্যেই কি সেই পরম সত্যের সন্ধান মিলিবে যেখানে মনুষ্যত্ব চরম পরিণতি লাভ করিবে? এই সংঘর্ষের হলাহলের মধ্যেই কি জন্মলাভ করিবে মনুষ্য ধর্মের পূর্ণতম অভিব্যক্তি–মানবাত্মার পূর্ণতম প্রকাশ?

সূত্র : সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নবশক্তি : ৭ বর্ষ, ৭ সংখ্যা ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

লোক গণনা

আমরা হিন্দু ও আমরা মুসলমান–ইহার অধিক পরিচয় আজ আমাদের নাই। আমরা যে মানুষ এবং সবার উপরে যে মানুষ সত্য–এই সহজ কথাটা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মন্দির ও মসজিদ লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে, অকারণে তুচ্ছ কলহে দেশের আবহাওয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। মক্তব ও বিদ্যাপীঠে বিরোধ, টুপি ও টিকিতে বিরোধ, প্রতীক লইয়া বিরোধ, উপাসনার পদ্ধতি লইয়া বিরোধ, সাহিত্যে প্রকাশ ভঙ্গী লইয়া বিরোধ–জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী আজ আমাদের জাতীয় জীবন হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহার কি প্রতিকার নাই?

লোক-গণনাকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস রূপ আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আজ দেশের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত ও সংহত করা প্রয়োজন। কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের সাধনায় মনুষ্যধর্মের যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে–সর্ব মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মৈত্রীর যে আদর্শ আজ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের কাম্য হইয়া রহিয়াছে তুচ্ছ অকারণ কলহ বিদ্বেষ-দুষ্ট বিরোধের দ্বারা তাহা আমরা ধ্বংস করিতে বসিয়াছি। হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য, হিন্দুর ও মুসলমানের কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা মনুষ্যধর্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। তাহা এমন

কিছু হইতে পারে না যাহা মানুষকে অমানুষ করিয়া তুলিবে, ক্ষুদ্র, নীচ ও কলহপরায়ণ করিয়া তুলিবে। যদি হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাস 'সত্য' হয়,তবে তাহাতে বিরোধ ও কলহের স্থান নাই। লোক গণনার ফলাফল যাহাই হোক–তাহার দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ, মনুষ্যধর্মের ভবিষ্যৎ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে না। ঘরোয়া বিবাদে মত্ত হইয়া আমরা যেন ইহা ভুলিয়া না যাই এবং ইহা যেন ভুলিয়া না যাই যে "সবার উপরে মানুষ সত্য"।

সূত্র : সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নবশক্তি, ৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা ৭ মার্চ ১৯৪১

ভারতীয় সংস্কৃতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁহার অভিভাষণে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের একটি সাধারণ সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা আজ সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া বাঁচিতে পারিনা–আজ উত্তর মেরুর মানুষের সহিত দক্ষিণ মেরুর মানুষের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। কূপমণ্ডুকত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং আমরা আর তথাকথিত স্বকীয় এবং সনাতন সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না।

বিগত পাঁচ বা ছয় শতাব্দী ধরিয়া যে সংস্কৃতি ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা হিন্দুর নহে, মুসলমানের নহে, তাহা ভারতবর্ষের। আজ তর্ক ও কলহের দ্বারা আমরা সেই ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির অভ্যুত্থান রোধ করিতে পারি না। ভারতীয় জাতীয়তা, ভারতীয় সংস্কৃতি–ইহারই পরিবর্ধন আজ আমাদের শিক্ষার ও সাধনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ক্ষুদ্র কলহ ও বিরোধ–সেই সর্বভারতীয় সংস্কৃতির গর্ভেই মিলিবে তাহার সমাধান, মিলিবে সমস্ত বিরোধের সমন্বয়। যে সুমহান ভবিষ্যতের আভাস আমরা এই পরিবর্ধমান নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে পাইয়াছি ও পাইতেছি, সমস্ত সংশয় বিরোধ ও বিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া তাহা আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে–ইহাকে আজ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, অবজ্ঞা করিতে পারি না। সেই ভবিষ্যৎকেই আজ আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

সূত্র : সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নবশক্তি : ৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৪ মার্চ ১৯৪১

মৈত্রী সম্মেলন

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাট ভবনে যে নেতৃ-সম্মেলন আহূত হইয়াছে–ইহার ফলাফল যাহাই হোক, এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। কারণ যাহাই হোক–বিরোধ বিদ্বেষ ও ঈর্ষার বিষবাষ্পে বাংলার আকাশ বাতাস আজ প্রধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে। অসুস্থ মন ও অস্বচ্ছ আবহাওয়ার মধ্যে একটা জাতি বাঁচিতে পারে না, কলহ ও ঈর্ষার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে একটি জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না– এই সাধারণ সত্যটুকু উপলব্ধি করিবার মত শুভবুদ্ধিও যদি এই সম্মেলনের ফলে আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে–এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

যাহারা মনে করেন বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ আজ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এমনই একটা সংস্কৃতিগত বিরোধ যে ইহার কোন সমাধান নাই–তাহাদের সহিত আমরা একমত নহি। আমাদের মতে এই বিরোধ এমনই একটা ঠুনকো কাল্পনিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছে যে আমাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইলেই এই বিরোধের অবসান ঘটান যাইবে।

প্রকৃতপক্ষে ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে–মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের সংঘাত মাত্র। যাহারা আজ বাংলার জন-সমাজের নেতা হিসাবে এই সম্মেলনের আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন– তাহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাহারা যেন এই সম্মেলনকে একটা তর্ক সভায় পরিণত না করেন, তাহারা যেন দেশের ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের কথা মনে করিয়া মিত্রভাবে এই প্রশ্নের সমাধানে ব্রতী হন।

সমস্যাকে মীমাংসার অতীত জটিল বলিয়া ধারণা করিয়া যদি তাহারা সমাধানের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সহজ জিনিসও নিরর্থক গুরুত্ব লাভ করে। সহজ শুভবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রেরিত হইলে–বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন সম্ভব ও সহজলভ্য ইহা আমরা বিশ্বাস করি; এবং ইহাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি যে সম্মেলনে আহূত নেতৃবৃন্দও যেন অনুরূপ বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রেরিত হন।

সূত্র : সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক নবশক্তি : ৭ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২১ মার্চ ১৯৪১

লোক-সাহিত্য সংগ্রহ

অপ্রকাশিত পল্লী গীতি

শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই পল্লী-সঙ্গীতের আদর করেন। তার কারণ এগুলি মনন, চিন্তা বা কল্পনা দিয়া গড়া নয়; পল্লীবাসীর নির্ভেজাল মনের উৎস হইতে উৎসারিত; এগুলিতে পাওয়া যায় খাঁটী প্রাণের স্পর্শ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই এমন কয়েকটি গান এখানে দেওয়া গেল।

সারিগান

নদী বহুল পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে নৌকা দৌড় বা বাইচ খেলা হয়। নৌকা ও তার বৈঠাগুলি থাকে যেমন রঙ মাখানো, যারা বৈঠা 'মারে' তাদেরো মনে থাকে রঙের ছোঁয়াচ। গানগুলিও গায় তারা মনের রঙ মিশাইয়া।

'জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উথলে গো,
যাইস্ না যমুনার জলে।
যমুনার ঘাটে যাইতে বাইরে ঘরে জ্বালা,
বসন ধরিয়া টানে নন্দের ঘরের কালা।
যমুনার ঘাটে যাইতে দেওয়াছে করল আন্ধি
পন্থহারা হয়ে আমরা কৃষ্ণ বলে কান্দি।'

গাথা-সঙ্গীত

চাষীর ছেলে বিনন্দ কোড়া পাখি শিকার করিতে গিয়া সাপের কামড়ে প্রাণ হারাইয়াছিল। তাহারই করুণ কাহিনী পল্লীবাসীরা কথায় ও সুরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে–

'বিহানে উঠিয়া বিনন্দ হাতে লৈল দাও,
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া বিনন্দ পিঞ্জরা বানাও।
পিঞ্জরা বানাইয়া বিনন্দ ভাতের দিল তাড়া,
অভাগিনী মায়ে বলে চা'লত নাই মোর কাড়া।
ভাত না খাইয়া বিনন্দ মুখে দিল পান,
ঘরের থেকে বাহির হইল পূর্ণমাসী চান্দ।
জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে ঝরার তলে পানি,
কোড়ারে আউলানি দিতে দংশিল সাপিনী।
খবরিয়া খবর কইও আমার মায়ের আগে

তোমার বিনন্দেরে খাইছে জঙ্গলার বাঘে।
মায়ে কান্দে পুত্র পুত্র ভইনে কান্দে ভাই,
অভাগিনী স্তিরি কান্দে আর ত লক্ষ্য নাই।'

বুরুজ নামক এক ব্রাহ্মণের কিভাবে জাতি নষ্ট হইয়াছিল তাহারই করুণ কাহিনী :

'হস্তেতে লইয়া লাঠী, কান্ধে ফেলিয়া ছাতি
যাবে বুরুজ দীঘল পরবাস।
পথের ধূলির তাপে পিঙ্গলিয়া রৌদ্রির তাপে
লগিয়া গেল দারুণ জল পিপাস।'

তৃষ্ণার্ত বুরুজ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখে—

'ঘরখানি লেপা পুছা, দুয়ারে চন্দনের ছিটা,
এটা বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ি।
ঘরে আছে ঘরণী ভাই জল নি আছে খাইতে চাই,
দুই চার দণ্ড বসিব তোমার বাড়ি।'

তারপর—

'ডান হস্তে জলের ঝাড়ি বামহস্তে পানের খাড়ি,
যায়ে কন্যা জল পান করাইতে।
জল খাইয়া শান্তি হইয়া জিজ্ঞাস করে তুমি
কোন্ জাতের মাইয়া,
বলে—জাতে আমার গন্ধ ভূঁই মালী।'

ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইল; দুঃখ করিয়া বলে—

সঙ্গের যত সঙ্গিয়া ভাই কইও খবর মা বাপের ঠাঁই,
আমার জাতি গেল ভূঁইমালীর ঘরে।

মাসিক মোহাম্মদী : ১৮ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১

ত্রিপুরার বারমাসী গান

বারমাসী গানগুলি পল্লীর নিরক্ষর সমাজের প্রাণস্বরূপ। কে বা কাহারা এইসকল বিরহ ও বেদনা পূর্ণ ভাষায় গানগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও এইশ্রেণীর গানগুলি মুখে মুখে নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া সর্বদা পল্লীবাসীর মানসিক আনন্দের খোরাক স্মরণাতীত কাল হইতেই যোগাইয়া আসিতেছে। বিরহ বা বেদনার সুরটিই হইল এই গানগুলির প্রাণ। সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও নানা খুঁটিনাটিতে চির ভারাক্রান্ত, হইলেও পল্লীবাসীদের কেহ কেহ নিশীথিনীর শান্তিপূর্ণ মধুময় রাগিনীর সঙ্গে তাহাদের প্রাণের আবেগ-পূর্ণ রাগিণী মিশাইয়া দিয়া এই গানগুলি গাহিয়া থাকে।

গানগুলি প্রধানত দুইটি নায়ক ও নায়িকার মধ্যে, নায়ক চলিয়া যায় বিদেশে বা প্রবাসে আর নায়িকা থাকে অন্তঃপুরে। অসহনীয় বিরহ বেদনায় এবং প্রিয় অদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া নায়িকা তাহার নায়কের আগমনের জন্য পথপ্রান্তে চাহিয়া থাকে। কিন্তু নায়ক আসে না। নায়িকা ক্রমেই অধৈর্য হইতে থাকে।

সারাটি বৎসর নায়ক বিহনে, নায়কের জন্য পথ চাহিয়া কেমন করিয়া যে হতভাগিনী কাল কাটায় তাহাই গানগুলিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে। বারটি মাসের সকল দুঃখ বিনাইয়া বিনাইয়া অজ্ঞাত কুলশীল কবি গানগুলির মধ্যে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই গানগুলি বেদনাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী।

পল্লীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেসকল যুবতীর স্বামী বিদেশে থাকে, তাহারাই প্রধানত বর্ষীয়সীদের নিকট হইতে শিখিয়া শিখিয়া এই গানগুলি গাহিয়া তাহাদের অন্তরের মধ্যে স্বামী বিরহটিকে উজ্জ্বল করিয়া জাগাইয়া রাখে। গানগুলি সকরুণ সুরে গাহিবার সময় তাহাদের নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে দেখা গিয়াছে। পাড়ার পাঁচ-সাতজন মেয়েছেলে একত্রিত হইয়া কোন কাজ করিতে বসিলে কোন একজন স্ত্রীলোক বারমাসী গায় এবং সকলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়া যায় সেই অশ্রুময় কাহিনীগুলি।

ত্রিপুরার পল্লীগ্রামগুলিতে প্রধানত লীলার বারমাসী, ফুল্লরার বারমাসী, সীতার বারমাসী, মা-বাপের বারমাসী, রাধার বারমাসী, ভেলুয়ার বারমাসী এবং শান্তিকন্যার বারমাসী—গীতগুলি গীত হইতে দেখা যায়। কি কবিত্ব হিসাবে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি শব্দমাধুর্যে সবগুলি বারমাসীই খুব সুন্দর। পল্লীর প্রাণের যথার্থ আবেগ ও বেদনা যেন গানগুলিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

পল্লীকে বুঝিতে হইলে, পল্লীর ব্যথা বেদনা ও সাধ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পল্লীর নিজস্ব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া

মনে করি। কারণ, ইহার মধ্যে পল্লীর নিজস্ব ভাবধারাটি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। এখন শান্তি কন্যার বারমাসী নামক গানটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

শান্তির শৈশবে কোন ধনী সদাগরের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর সদাগরিপ্রথা অনুসারে শান্তির স্বামী বার বৎসরের জন্য 'বার বাইস তের ডিঙা' সাজাইয়া বাণিজ্য করিতে গেল।

দেখিতে দেখিতে শান্তি বাল্যসুলভ চাপল্যের মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল, শরীরে নবযৌবনের মুকুল অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কিশোর তনিমা ছাপাইয়া রূপলাবণ্যের জোয়ার আসিল, ভাদ্র মাসের কূলে কূলে পূর্ণসলিলা তটিনীর মত। এই সময় স্বভাবত প্রাণাধিক প্রিয়তমের জন্য প্রাণ তাহার আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। এই সময় সে তাহার পিত্রালয়ে।

এদিকে শান্তির স্বামীও বহুদিনের প্রিয়া বিচ্ছেদের দরণ নিতান্ত আকুল হইয়া প্রবাসে থাকিয়াই বারবার তাহার প্রিয়াকে স্মরণ করিতে লাগিল। তারপর বাণিজ্যের বার বৎসর পূর্ণ হইবার এক বৎসর বাকি থাকিতেই সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকায় সে শান্তির চরিত্রে সন্দিহান হইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মনোযোগী হইল।

একদিন কলসী লইয়া শান্তি সরোবরে জল ভরিতেছিল, ইত্যবসরে তাহার স্বামী ছদ্মবেশে অপরিচিত প্রণয়ীর বেশে উপস্থিত হইয়া শান্তির নিকট তাহার অবৈধ প্রণয় জ্ঞাপন করিল। শান্তি তাহার প্রেম ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিল। তারপর সে দীর্ঘ বারটি বৎসর পর্যন্ত নানাভাবে শান্তির প্রেম পাইবার জন্য চেষ্টা করিল। কিন্তু অচলা-অটলা শান্তি কিছুতেই তাহাকে আমল দেয় নাই। শান্তির চরিত্রে এইরূপ অপূর্ব দৃঢ়তায় এবং পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া শেষে সে আত্মপরিচয় প্রদান করে। দীর্ঘ দিবসের পর স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়।

ছদ্মবেশী স্বামী– জল ভর শান্তিকন্যা, জল ভর, তুমি।
যে ঘাটে ভরিবা জল গো, চৌকিদার আমি ॥
শান্তি– রাজা দিছে রাজদীঘি, শানের বান্ধান ঘাট।
শান্তিকন্যা জল ভরিতে কিসের চৌকিদার ॥
ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি, না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে কার্তিক মাস ॥ (ধূয়া)
ছ. স্বা– এইত কার্তিক মাসে দুই ত্যার[১] উঠে চান্দ্।
দেখা দিয়া রাখ শান্তি নাগরের পরাণ ॥
শান্তি– তুমি যেরে পরের ছাইলা, আমি পরের নারী
আমার কি রে শকতি আছে, দেখা দিতে পারি ॥
ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে অঘ্রাণ মাস ॥ (ধূয়া)

এইত অগ্রাণ মাসে ধানে বান্ধে কীট।
তোর যৈবন দেখে আমার চিত্ত নহে স্থির॥

শান্তি– আপন সোয়ামী যার দীঘল পরবাসী।
যৈবনের মুখে তার ছাই আর মাটি॥

ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে পৌষমাস॥ (ধূয়া)
এইত পৌষ না মাসে শীতের অঙ্কুরি।
তোমার বাড়ি অতিথ্ হইলে রসুই দিবা কি॥

শান্তি– ডাইল দিবাম চাউল দিবাম, আর দিবাম হাড়ি।
রসুই কইরা খাইতে দিবাম সুবর্ণের থালি॥

ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে মাঘ মাস॥ (ধূয়া)
এইত মাঘ না মাসে রাজা খেলায় পাশা।
আম-ডাল ভরসা কইরা কোকিল করে বাসা॥

শান্তি– বাসা করুম লণ্ডভণ্ড, পাইড়া মারুম ছাও।
যথায় গেছে প্রাণের সাধু[২], যাইব তথায়॥

ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে ফাল্গুন মাস॥ (ধূয়া)
এইত ফাল্গুন মাসে রৈদের বড় জ্বালা।
রৈদের তাপে সোনার শরীল হইল তোমার কালা॥

শান্তি– পুষ্কণিতে নাই জল, কি করবে তার উভে[৩]।
বৈদেশে যাহার পতি, কি করবে তার রূপে॥

ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পুরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে চৈত্রী মাস॥ (ধূয়াঁ)

শান্তি– এইত চৈত্র না মাসে গেরুস্ত ব্যইন্যায়[৪] বীজ।
আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ॥
বিষ খাইয়া মইরা যাইবাম, কান্দবে বাপ মায়।
আর তনা দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই॥

ছ. স্বা– এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে বৈশাখ মাস॥

শান্তি– এইত বৈশাখ মাসে ভূমিতে নালিতা।
সর্বলোকে খায় শাকরে, নারীর আঙ্গে[৫] তিতা॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া শাকরে তুইল্যা লইলাম থালে।
প্রাণের সাধু দেশে নাই শাক পারশিব কারে॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে জ্যৈষ্ঠ মাস ॥

শান্তি— এইত জ্যৈষ্ঠি না মাসে নানা কৃষির ফল।
দেশে আর বৈদেশে যায়রে এ আম কাঁঠাল ॥
আহা রে পাপিষ্ঠ ফলরে পাকিলে সে ঝরে।
অভাগিনী শান্তির যৈবন আঞ্চল বাইয়া পড়ে ॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি, না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে আষাঢ় মাস ॥

শান্তি— এইত আষাঢ়া মাসে গাঙ্গে নয়া পানি।
কত কত সাধুর নাওরে উজান আর ভাইটানি ॥
যে-অ সাধু পাছে গেছে সে-অ আইল আগে।
অভাগিনীর প্রাণের সাধু খাইল লঙ্কার বাঘে ॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে শাওন মাস ॥

শান্তি— এইত শাঙ ন মাসে শাঙানিয়া ধারা।
ডাহুক ডুম্বুরার[৬] ডাকে শরীর কইলাম কালা।
ডাহুক মারুম ডুম্বুর মারুম, পাইড়া মারুম বীজ।
যথায় গেছে প্রাণের সাধু করিবাম উদ্দিশ ॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে ভাদর মাস ॥

শান্তি— এইত ভাদর মাসে গাছে পাকা তাল।
প্রাণের সাধু দেশে নাইরে কেবা খাইবে তাল ॥
তাল খাইত পিঠা খাইত, নবীন গাভীর দুধ।
জোড়া-মন্দির ঘরে গিয়া কহিতাম দুঃখ সুখ ॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাঁড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নব রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে আশ্বিন মাস ॥

শান্তি— এইত আশ্বিন মাসে নব দুর্গার পূজা।
কেহ মানে মেষ মহিষ, কেহ মানে অজা ॥
কেহ মানে মেষ মহিষ, কেহ মানে ছাগেলা।
আমার সাধু দেশে আইলে দিতাম জোড়া পাঁঠা ॥

ছ. স্বা— এই মাস ভাড়াইলে শান্তি না পূরাইলে আশ।
নর রঙ্গ ছুরুত লইয়া সামনে কার্তিক মাস ॥
এইত কার্তিক মাসে বৎসরের শেষ। (ধূয়া)
হাইস্যা[৭] বিদায় দেওগো কন্যা যাই গো আপন দেশ ॥

শান্তি– ভিন্ন দেশের ভিন্ন পুরুষ, আমি ভিন্ন নারী।
আমার কিরে শাকতি আছে বিদায় দিতে পারি ॥
আইস আইস ওরে পুরুষ, বইসা থাক তুমি।
ঘরে আছে বৃদ্ধ মা বাপ জিজ্ঞাস করি আমি ॥
কি করগো বৃদ্ধ মা বাপ, কি কর বসিয়া।
কারথে[৮] লইছিলে টাকা কড়ি, কার ঠাঁই দিছিলা বিয়া ॥
সোনার বাঁটায় ধান্য দূর্বা, রূপার বাঁটায় তেল।
ধীরে ধীরে বুড়াবুড়ি জামাই চাইতে গেল ॥
আউলাইয়্যা মাথার কেশ দুই ভাগ করিয়া।
প্রণাম জানাইল সতী চরণে ধরিয়া ॥
আইস আইস শান্তিকন্যা, তোরে দেই গো বর।
আশমানের চন্দ্র যেমন বেড়িল তারাগণ।

---

[১] দুই ত্যার–দ্বিতীয় বার
[২] সাধু–স্বামী, বণিক বা সদাগর।
[৩] উত্তে–বেধে, স্তারে
[৪] বাইন্যায়–বনে
[৫] আজে–নিকটে
[৬] ডাহুক ডুম্বুর–পক্ষী বিশেষ
[৭] হাইস্যা–হাসিয়া
[৮] কারথে'–কার নিকট হইতে

সাপ্তাহিক নবশক্তি : ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬

দুটি বারমাসী গান

পল্লী অঞ্চলের নিরক্ষর লোকেরা যে সব গান গাহিয়া তাহাদের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, অবসর বিনোদন করে কিংবা গুরুশ্রমভার লাঘব করে সেগুলির মধ্যে বারমাসী গানগুলিই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। শিক্ষিত সমাজের মত মহলা দিয়া বা বৈঠক বা আসর গুলজার করিয়া ওস্তাদি লাইনের গান চর্চা করিবার মত সময়, সঙ্গতি এবং ক্ষমতা তাহাদের এতটুকুও নাই। তাহারা গান গায় কাজ করিতে করিতে। গানে যশ লাভের স্বপ্ন তাহাদের মধ্যে খুবই কম। প্রাণের সহজ স্ফূর্তিতে তাহারা আবেগভরে গানগুলি গাহিয়া যায়। তাহাদের ঠিক প্রাণের দাবি অনুযায়ী গান রচনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, পল্লীরই অজ্ঞাত অখ্যাত নাম-হারা কবিরা গ্রাম্য ভাষায় এবং গ্রাম্য সুরে গ্রাম্য বিষয়বস্তু লইয়া গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। কৃষকেরা ধান কাটিবার কালে বা নালিতা নিড়াইবার কালে জেলেরা জাল বুনিবার কালে এবং নদীর মাঝিরা নৌকা বাহিতে বাহিতে এই সকল গান গাহিয়া তাহাদের শ্রমের লাঘব করে।

লোকে জ্যোৎস্নারাতের উদাস হাওয়ায় পাপিয়ার গান শুনিয়া প্রিয়জনকে স্মরণ করে, অলস মধ্যাহ্নে আম্র শাখায় কোকিলের গান শুনিয়া প্রিয়জনের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু পল্লীর এই সকল মনুষ্য-বেশধারী পাপিয়া বা কোকিলগুলির প্রাণঢালা ভাটিয়াল গান মধ্যাহ্নের নীরব নিঃঝুম মুহূর্তগুলিতে কিংবা বৈকালের শান্তস্নিগ্ধ আবহাওয়াতে যাহারা যথার্থ দরদের সহিত শুনিয়াছেন, তাহারা কিছুতেই পুনর্বার শুনিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবেন না।

ভাটিয়াল গান দুই শ্রেণির—কতকগুলি প্রেম সম্পর্কীয়, এগুলিতে থাকে প্রিয়জনের বিচ্ছেদের হাহাকার, ইহার মূল সুর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিচ্ছেদের চিরন্তন উৎস হইতেই উৎসারিত, আর কতকগুলি মানব জীবনের শেষ পরিণতি সম্পর্কীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খেয়া'র সুরটিই ব্যাপকভাবে অগোছান গ্রাম্য ভাষার ভিতর দিয়া এই গানগুলিতে মূর্তিমান হইয়া আছে। এই সংসার আমাদের চিরদিনের আবাস নয়, দুই দিনের জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি, দূরের গ্রাম হইতে লোকে যেভাবে হাতে পয়সা লইয়া হাট করিতে আসে, তেমনই ভাবে আমরা আসিয়াছি, এখন হাট ভাঙিয়া যাইতেছে, বেচাকেনা ফুলাইয়া যাইতেছে; যে যার আপন-আপন আবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এখনি সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে, অন্য সকলের মত আমাদেরও যাইতে হইবে, কিন্তু যাইবার কালে 'মূল মহাজন'কে ত তাহার পুঁজি বুঝাইয়া দিতে হইবে! উপরন্তু যাহা লাভ থাকিবে তাহা দিতে হইবে খেয়ানীকে, নতুবা সে পার করিবে কেন? কিন্তু হিসাব চুকাইবার কালে দেখি, লাভের কোঠায় শূন্য, মাথায় দেনার বোঝা। এখন রিক্তহস্তে পারঘাটেতে বসিয়া খেয়ানীর পায়ে মাথা খুড়ানো ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই গুলিই সত্যিকারের ভাটিয়াল গানের বিষয়বস্তু!

ভাটিয়াল গানের মত বারমাসী গানগুলিও দুই শ্রেণির। কতকগুলি প্রেম সম্বন্ধীয় এবং অন্য কয়েকটা ধর্মমূলক। 'লীলা', 'ফুল্লরা', 'শান্তি' প্রভৃতি বারমাসী গানগুলি প্রথম পর্যায়ভুক্ত। ধর্মমূলক বারমাসীর মধ্যে সীতা এবং রাধার বারমাসী দুইটিই উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণের রচনায় রাধার চিরন্তন প্রেমকান্না, মান অভিমান যেইখানে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল পদ বঙ্গের শিক্ষিত সাহিত্য রসিকগণের অন্তরে যারপরনাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গৌড়ীয় সাধক সমাজের মধ্যেও রাধা চিন্ময়ী শক্তি স্বরূপিনী এবং আরাধ্যতমা। কাজেই আমরা ব্যাপকভাবে ধরিয়া নিতে পারি যে বাঙালী জীবনে কি ধর্ম ক্ষেত্রে, কি প্রেম চর্চায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজকে আলাদাভাবে ধরিয়া নিলে যে অসংখ্য, শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত পল্লীবাসী নরনারী থাকিয়া যায় তাহাদেরও, কি পারিবারিক জীবনে কি ধর্মজীবনে রাধা কৃষ্ণের প্রেম খুব প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তাহাদের মত নিরক্ষর গ্রাম্য কবিদের রচনায় রাধাকে তাহাদের ঠিক ঘরের বধূটির মত করিয়াই সাজাইয়া নিয়াছে। তাহাদের রাধা 'বৃন্দাবনী' ধাঁচে কাপড় পরে না, আহিরী মাথায় করিয়া দধি বিক্রয় করিতে যায় না। তাহাদের রাধা তাহাদেরই ঘরের বধূটির মত রান্না করিতে করিতে কৃষ্ণের বাঁশি শুনিয়া চমকাইয়া ওঠে, ধূয়ার ছলে অশ্রু বিসর্জন করে–

তুমি যখন বাজাও বাঁশি, আমি তখন রান্ধি।
কাঞ্চা চুলা ভিজা কাষ্ঠ, ধূয়ার ছলে কান্দি ॥

তাহাদের রাধার হস্তের হলুদের দাগ কখনও মুছিয়া যায় না, সর্বদা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের রাধার বসন মলিন, চুল আলুথালু–শাশুড়ী ননদীর গঞ্জনা নিরন্তর পোহাইতে হয় বলিয়া তাঁহাদের রাধার নয়নদ্বয় সর্বদা জলভারে আনত। তাহাদের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়া পাড়াতে কলঙ্কিনী নাম কিনিয়াছে কিন্তু যাহার জন্য সে কলঙ্কের ডালাকে ফুলের ঝারি বলিয়া বরণ করিয়া নিয়াছে সে সময়-সময় তাহাকে অত্যন্ত নাকাল করিয়া ফেলে। এইজন্য রাধার দুঃখের শেষ নাই। এমন ঘরে-পরে জ্বালা গ্রাম্য রাধার মত বুঝি আর কাহাকেও পোহাইতে হয় নাই। এই রাধার জল ভরার দৃশ্যটিও বঙ্গ পল্লীর নিজস্ব উপভোগ্য জিনিস।

অতি মাত্রায় প্রেমের যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাহাই হইল। কৃষ্ণ গোকুল অন্ধকার করিয়া রাধার প্রাণ শূন্য করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। একদিন অক্রূর আসিয়া নিতান্ত নির্দয়ের মত রাধার প্রাণ হইতে যেন ছিনাইয়া কৃষ্ণকে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণ বিচ্ছেদে উন্মাদিনীবৎ হইয়া রাধা বারটি মাসের বার রকমের দুঃখের কাহিনী এই বারমাসী গানটিতে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিয়াছেন।

এই 'রাধার বারমাসী' গানটির ভাষা স্থানে স্থানে একটু উঁচু রকমের হইয়া যাওয়ায় ভাবের এবং সরলতার অমর্যাদা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহারও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এই বারমাসীটি পল্লীর মেয়েদের খুব প্রিয়; অনেক পল্লীতে দেখিয়াছি,

কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পরব উপলক্ষে কয়েকজনে মিলিয়া কোন কৃষ্ণমন্দিরে বা নিজেদের আঙিনায় বসিয়া এই গানটি গাহিয়া থাকে। সাধকপ্রবর নরোত্তম দাসের রচিত কৃষ্ণের 'শতনাম'টি যেমন অনেক ধর্মপ্রাণ পল্লীর রমণীর কণ্ঠস্থ, এই বারমাসীটিও তেমনই তাহাদের অনেকের কণ্ঠস্থ।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেবের 'হারামণি' পুস্তকে রাধার বারমাসী নামক গানটি প্রকাশিত হইয়াছে। বারমাসীর কোন লক্ষণ ঐ গানটিতে নাই, তবু জানি না কি করিয়া তিনি উহাকে বারমাসী নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহা রাধার ও কৃষ্ণের অনুরাগের সময়কার একটি অতি সাধারণ, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত গান মাত্র।

সীতার বারমাসীটি সম্বন্দে দুই একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। এই বারমাসীটির শেষে একটি ভনিতা আছে, তাহাতে মনে হয় ছিরিধর বাণিয়া বা শ্রীধর বণিক নামক কোন লোক উহার রচয়িতা। তাহার ছেলের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রজাপতি। (ছিরিধর বানিয়া নারে প্রজাপতির বাপ) এই রকমভাবে ছেলের নাম জাহির করিবার যে কি অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে ছেলেরও হয়ত সঙ্গীত রচনায় হাত ছিল, কিংবা অন্য কোন বিষয়ে তৎকালে প্রজাপতি বাণিয়ার নাম ছিল। কবি এই বলিয়া গান শেষ করিয়াছেন, 'যে-বা শুনে যে-বা গায় শরীরের খণ্ডে (ঘুচে) পাপ।' সত্যি, জনম-দুঃখিনী সীতার অশ্রুমাখা কাহিনী শুনিলে যদি শরীরের পাপ না ঘুচে তবে আর কিসে ঘুচিবে জানি না! করুণ রাগিণীতে এই অশ্রু করুণ কাহিনীটি গাহিয়া অনেক পল্লীরমণীকেই অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে।

এই গানটির এক স্থানে আছে, 'বার বচ্ছর বনবাস সেও গেল বইয়া। রামের মা কশল্যা কান্দে অযোধ্যায় বসিয়া।' বনবাস বার বচ্ছরের নয়, চৌদ্দ বছরের। পরের লাইনটি ভারি সুন্দর। একমাত্র পুত্রকে অভিষেকের পূর্বক্ষণেই বনে পাঠাইয়া দিয়া রামের মা কৌশল্যা যে কি নিদারুণ শোকভার বুকে বহন করিয়া আসিতেছেন তাহা অবর্ণনীয়। এদিকে বনবাসের কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে–মায়ের প্রাণ সন্তানের আগমনের জন্য ছটফট করিয়া মরিতেছে! রাম দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে যে সবচেয়ে বেশি আনন্দ হইবে কৌশল্যার প্রাণে!

রাধার বারমাসী

কৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া গোকূল অন্ধকার করিয়া বহুদিন হয় মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়া রাধা এই বারমাসী গানটি গাহিয়াছেন।

দারুণ অক্রূর সনে কি বাদ' হইল।
দারুণ বিধি আমার কি বাদ হইল।
গুণের মাধব হইরা নিল; সই গো
দারুণ অক্রূর সনে–(ধূয়া)

কার্তিক মাসেতে রাই গো মুরলির তান।
চইমক্যা উঠে রাধার চিত্ত, দগধে পরাণ।
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম আমি রাই,
কলঙ্কের আর সীমা নাই, সই গো,
দারুণ অক্রূর সনে ॥

আঘ্রাণ মাসেতে রাই গো বন্ধুহারা হইয়া।
অভাগিনীর ঝুরে আখি পান্থ পানে চাইয়া ॥
আঘ্রাণ বহিয়া যায় গো, পৌষের তিন দিন।
অভাগিনীর প্রাণের কৃষ্ণ আসিবে কোন দিন ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই। ইত্যাদি।

পৌষ না মাসেতে রাই গো পুষ্প ছিটিল[২] ডালে।
গেঁথিয়া বন ফুলের মালা দিব কার গলে ॥
ভূমের[৩] শয্যা ভূমে রইল, মালা হইল বাসি।
আজোকা পরাণের কৃষ্ণ হইল বৈদেশী ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই, ইত্যাদি।

মাঘ না মাসেতে রাইগো ভূমি-একাদশী।
স্নান করিতে যায়গো রাধা গঙ্গা ভাগরথী ॥
নিঠুর কালিন্দীর জল রে না হেরিব আর।
যথায় গেছে প্রাণের কৃষ্ণ যাব সেই পথে।
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই। ইত্যাদি।

ফাল্গুন মাসেতে রাইগো 'দোল' পড়িল মনে।
গোকুলে গোবিন্দ নাই 'দোল' করিব কেমনে ॥
আবির কুম্‌কুম্‌ চন্দন ভূমিতে ফেলিব।
নয়নের জল দিয়া মৃত্তিকা লেপিব ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই। ইত্যাদি।

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী নিকুঞ্জে বসিয়া।
দিবা নিশি ঝুরে আঁখি কৃষ্ণগুণ গাইয়া ॥
আহা রে পাপিষ্ঠ পাখী ডাকিও না এইখানে।
নিঠুর কালিয়ার নামরে না শুনিব কানে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই। ইত্যাদি।

বৈশাখ মাসেতে রাইগো একাকিনী হইয়া।
কোথায় জানি রইল কৃষ্ণ রসবতী পাইয়া ॥
দুই আইখ্যের[৪] পানি খানি আইকোতে শুকাইব।
কি রাইখাছে গুণের কৃষ্ণ তাহারে দেখিব ॥
কৃষ্ণ প্রেমে ...... ইত্যাদি।

জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে রাইগো শরীর হইল হান[৫]।
কত বা সহিবে দুঃখ রাধার পরাণ ॥
তোমরা যদি করগো দয়া
দেহ কৃষ্ণের পদছায়া সই গো
দারুণ অক্রূর সনে।

আষাঢ় মাসেতে রাইগো আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে কৃষ্ণ রথের সংবাদে ॥
কি মোর কপালের দুঃখ লিখেছিল বিধি।
জীয়ন্তে না পাইব সই গো (আমার) কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মইলাম ওগো রাই .... ইত্যাদি।

শ্রাবণ মাসেতে রাই গো বরিষা পাথার।
কেমনেতে আসিবে কৃষ্ণ না জানে সাঁতার ॥
অফলা কদম্বপুষ্প তুলির যতনে।
তুই ফুলেরে দেখিলে আমার কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে .... ইত্যাদি।

ভাদ্র না মাসেতে রাই গো দেখিল স্বপন।
মোর মনে লয় গো সখি আইছে নারায়ণ ॥
এ-ও মাস গেল রাধার ভাবিতে চিন্তিতে।
না হয় শুক্না না হয় জল আসিবে কিমতে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে .... ইত্যাদি।

আশ্বিন মাসেতে রাই গো উদ্ধব আইল দেশে।
ডাক দিয়ে বলে রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশে।
(আশ্বিন মাসেতে রাধার নিদ্রার আবেশ।
কোথায় জানি আছে কৃষ্ণ না জানি উদ্দেশ)
কহ কহ উদ্ধব ঠাকুর, কহ বিবরণ।
কুশলে কি আছে কৃষ্ণ রাধার প্রাণধন ॥
তোমরা যদি কর গো দয়া,
দেহ মোর পদ ছায়া সই গো,
দারুণ অক্রূর সনে।

---

১. বাদ–বিবাদ
২. ছিটিল–ফুটিল
৩. ভূমের–ভূমির
৪. আইখ্যের–চোখের
৫. হান–অসুস্থ

সীতার বারমাসী

জন্ম দুঃখিনী সীতার অশ্রুমাখা করুণ কাহিনী কে না জানে? পল্লী কবির রচনায় তাঁহার বারটি মাসের দুঃখপূর্ণ দিনগুলি কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। এই গানটিতে সীতার অশোক বনে অবস্থানকালীন দুঃখ ও বেদনা বর্ণিত আছে। সীতা তাহার বনবাসের পূর্ব হইতে চতুর্দশ বৎসরের শেষ পর্যন্ত সকল কথা সংক্ষেপে বার মাসের বারটি পদে ব্যক্ত করিতেছেন :

বৈশাখ মাসের দুঃখরে, নানান পুষ্পময়।
রামচন্দ্র হবেন রাজা সর্বলোকে কয় ॥
আহা রে পাপিষ্ঠ বিধি দৈবের লেখন।
ভরতকে রাজত্ব দিয়া রাম যায় রে বন ॥
কনিষ্ঠ ভরত হইয়া পাইল সিংহাসন।
বাসর সাজাইয়্যা দিল যত দেবগণ ॥

জ্যৈষ্ঠ না মাসের দুঃখরে, প্রভুর সহিতে।
দেখিলাম সুবর্ণের মৃগ পাশা না খেলাইতে ॥
হস্তের পাশা ভূমে থুইয়া জোড় করি হাত।
মৃগ বধি এনে দেহ ত্রিজগতের নাথ ॥
মৃগ বধিবারে গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শূন্য গৃহ পাইয়া সীতা হরিল রাবণ ॥
একেতে রাবণ রাজা দুষ্ট দুরাচার।
রথে তুইল্যা সীতা দেবী লঙ্কা করল পার ॥

আষাঢ় মাসের দুঃখেরে ঘন বরিষণ।
কোথা প্রভু রামচন্দ্র দেবর লক্ষ্মণ ॥
কর্মদোষে হইলা বন্দী রাক্ষসেরি ঘর।
নিস্তার না দেখি প্রভু কিবা গতি হয়।

শ্রাবণ মাসের দুঃখের বরিষা সমদ্দুর।
নানান পইক্ষের কলরব রে শুনিতে মধুর ॥
নানান পইক্ষের কলরব রে শুনিতে মধুর।
রামচন্দ্র গুণনিধি রইলা কত দূর ॥

ভাদ্র না মাসের দুঃখরে ভাবনা চিন্তায়।
সীতার কপালের দুঃখ লেখন না যায়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া সীতার শরীর হইল কালা।
রামচন্দ্র গুণের সাগর কোন দেশে রইলা॥

আশ্বিন মাসের দুঃখরে, দেখিলাম স্বপন।
সমদ্দুর লঙ্ঘিয়া আইল পবন-নন্দন॥
কহ কহ পবনপুত্র কহ সমাচার।
কুশলে কি আছে রাম কমল লোচন॥

কার্ত্তিক মাসের দুঃখরে করুণাসদয়।
সীতাকে উদ্ধার কর রাম দয়াময়॥
নিত্য নিত্য আসে রাবণ করিয়া কল্পন।
আজুকা সীতার ভাগ্যে অবশ্য মরণ॥

আঘ্রাণ মাসের দুঃখরে, হিমাইলে ডাক ছাড়ে[১]।
যার যার পতি আছে অঞ্চল নগরে॥
যার যার পতি আছে সুখে বঞ্চে[২] রাত্রি।
জনম দুঃখিনী সীতার অনেক দুর্গতি॥

পৌষ না মাসের দুঃখরে পুষ্প ঝইরা যায়।
জনম দুঃখিনী সীতার না ঘুচিল তায়॥
ইঙ্গুলের[৩] মাটি দিয়া তনুরে লিপিল।
দরিয়ার তরঙ্গ দেইখ্যা কাইন্দা বাহির ইহল।
পুষ্প ছিটিলেরে[৪] গন্ধর্বে চালায় বাস।
যে নারীর পতি নাইরে পুষ্পের কি তার সাধ॥

মাঘ না মাসের দুঃখরে দেখিলাম স্বপন।
সমদ্দুর লঙ্ঘিয়া আইল শ্রীরামের চর॥
মন্দোদরী বলে রাবণ কি কর্ম করিলা।
আপনার লঙ্কাপুরী আপনে মজাইলা॥
সীতা দিয়া কর ভজন শ্রীরামের চরণ।
কদাচিত রামের বানে নাই তোমার মরুণ॥
সীতাকে রাখিলে রাবণ আর ত লক্ষ্য নাই।
চন্দ্রবাণে কাটবে তোমার কুম্ভকর্ণ ভাই॥

ফাল্গুন মাসের দুঃখরে পবনে চালায় শীত।
লক্ষ্মণের বাণে মইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥
ইন্দ্রজিত পড়িল রণে লঙ্কা হইল খালি।
ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥

চৈত্র না মাসের দুঃখরে রণে দিয়া মন।
লঙ্কাতে রাবণ রাজার হইল পতন ॥
এক লক্ষ পুত্র ছিল সোয়া লক্ষ নাতি।
একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি ॥
বার বচ্ছর বনবাসরে সে-ও গেল বইয়া।
রামের মা কশল্যা কান্দে অযোধ্যায় বসিয়া ॥
পুষ্পের মধ্যে কণক-চাম্পা ধানের মধ্যে খাম[৫]।
নারীর মধ্যে সীতা সতী পুরুষের মধ্যে রাম ॥
বার মাসের তের পদরে লাওরে গণিয়া।
এই গীত বান্ধিয়া দিছে ছিরিধর বানিয়া ॥
ছিরিধর বানিয়া নারে প্রজাপতির বাপ।
যে-বা শুনে যে-বা পায় শরীরের খণ্ডে[৬] পাপ ॥

---

১. হিমাইলে ডাক ছাড়ে — হিমেল হাওয়া বা শীতের বাতাস বহিতে শুরু করে।
২. বঞ্চে — কাটায়।
৩. ইঙ্গুলের — লাল মাটি?
৪. ছিটিলে — ফুটিলে।
৫. খাম — এক প্রকার ধানের নাম।
৬. খণ্ডে — বিদূরিত হয়।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : জানুয়ারি ১০, ১৯৩৬

পল্লীসঙ্গীতে পালা গান

ভাটিয়াল গান, বারমাসী গান, হাজনী গান প্রভৃতির 'পালা'-গানগুলিও পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ। পল্লীর লোক-সাহিত্যের উপকরণ অন্যান্য গান পাঁচালী প্রভৃতি প্রাচীন সম্পদের মত 'পালা' গানগুলিও অধুনা লোপ পাইতে বসিয়াছে। নিতান্ত অজ পাঁড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেদের মেয়েরা এখনো নানা জায়গায় এগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক ঐ সকল জায়গা হইতে এগুলিকে সংগ্রহের চেষ্টা করিলে প্রাচীন বাংলার পারিবারিক জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখের অনেকখানি ইতিহাসের যে পুনরুদ্ধার করা যায় ইহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্ধার লাভ সম্ভবপর হইয়াছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় স্থান লাভ করার মূলে যাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও শ্রম এক রূপে কার্যকরী হইয়া রহিয়াছে– বাঙলার সেই সুসন্তান ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় পূর্ববঙ্গ পল্লীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যতগুলি পালা গান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। বঙ্গ পল্লীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ইহাদের এক-একটিতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে! আমাদের খাঁটি জাতীয় জীবনের হাসি কান্নায় ইহাদের এক-একটি সমুজ্জ্বল। সেই কাঞ্চনমালা মধুমালা মালঞ্চমালা মহুয়া, সেই মাধব নৈদার ঠাকুর হীরাধর বানিয়াকে কে ভুলিতে পারিবে? পল্লী কবির কাব্য-খনির ইহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সমুজ্জ্বল কোহিনূর খণ্ড। আমাদের সাধ্য কি যে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে ইহাদের হাসি অশ্রুকে মুছিয়া ফেলিতে পারি।

আজকাল যে সকল পল্লী কবি বা সাহিত্যিক পল্লী সাহিত্য নিয়া আলোচনা করেন তাহাদের মধ্যে যে originality মোটেই নাই, শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর শ্রমলব্ধ সংগ্রহগুলির ধূয়া ধরিয়াই যে তাঁহাদের কেহ কেহ সস্তায় নাম ছড়াইতেছেন বড় দুঃখে একথা আজ স্বীকার করিতে হইতেছে। পল্লীর গান বা গাথাগুলি সংগ্রহপূর্বক উহাদের মধ্য হইতে পল্লীবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া কোন কোন নামকরা পল্লী কবি সাপ্তাহিক ও মাসিকের পৃষ্ঠায় সেগুলিকে বেমালুম নিজের নামে চালাইয়া দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না এমন উদারণ বিরল নহে। ইহাতে আর কিছু না হোক রচিয়তাদের প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ত্রিপুরা জেলার বহু স্থানে গীত একটি 'জলভরা' গান কোন পল্লী কবি কোন এক তৃতীয় শ্রেণির সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় 'জলভরণী' নামে ল্যাজমুড়া ছাঁটিয়া উহার সহিত রচয়িতা হিসাবে নিজের নাম সংযোগ করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। পল্লীর লুপ্ত সম্পদ যিনি যাহা সংগ্রহ করিবেন তাহাই অক্ষতভাবে রাখিয়া প্রকাশ

করিবেন এবং উহা হইতে পল্লীর পারিবারিক জীবনকে study করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলেই তিনি ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

আরও দেখিতে পাই, অনেকেই শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর সংগ্রহগুলি চর্বিত-চর্বণ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। এইরূপ না করিয়া পল্লী হইতে নূতন নূতন রত্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে আমার বিশ্বাস অনেকেই সফলকাম হইবেন। অবশ্য ইহার জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার আবশ্যক, ইহার জন্য সুদূর পল্লীতে যাইতে হইবে, নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিশিতে হইবে, ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে; তবেই ঐগুলির উদ্ধার সাধন সম্ভবপর হইবে। শুধু তাহাদের গানের কথাগুলি সংগ্রহ করিলেই চলিবে না; প্রতিটি কথা এবং সুরের প্রতিটি স্পন্দনের মধ্যে পল্লী কবি পল্লীবাসীদেরই যতখানি দরদ সাধ আহ্লাদ ও অশ্রু ঢালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন সেগুলিকে মনে-প্রাণে অনুভব করিতে হইবে, যিনি মনে-প্রাণে তাহাদেরই একজন হইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই উহাদের প্রকৃত রসগ্রহণে সমর্থ হইবেন।

শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর 'পালা' গানগুলি কালক্রমে পল্লীবাসী নির্মত হইয়া গেলেও বাংলা সাহিত্য হইতে সেগুলি কখনও মুছিয়া যাইবে না। সেগুলি সাহিত্যে রেকর্ডবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐগুলির পরিচয় প্রদান নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। ঐগুলি ছাড়াও পল্লী অঞ্চলে সেকেলে পল্লী কবিদের রচিত ছোট ছোট আকারের বহু 'পালা' গান প্রচলিত আছে। উহাদের মধ্যে যে কয়েকটা আমার খুব বেশি ভাল লাগিয়াছে সেইগুলিকেই সংগ্রহ করিয়াছি। সংগ্রহগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি 'পালা' গানের পরিচয় এখানে প্রদান করিতেছি। প্রধানত নিরক্ষর জেলে এবং কৃষক মেয়েদের নিকট হইতে এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। উহাদের কোন সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন।

বিনোদের পালা

বিনোদ নামক একটি পল্লী যুবক 'কোড়া' পাখি শিকার করিতে যাইয়া সাপের কামড়ে কিভাবে বেঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিল তাহাই এই 'পালা' টিতে বর্ণিত হইয়াছে।

'কোড়া' এক প্রকার বৃহদাকার জলো পক্ষী। বর্ষাকালে পল্লীর চারিধারে যখন জল বাড়িয়া উঠে তখন আধডুবো নালিতা ও ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে কোড়া পাখি ডাকিতে থাকে। নিরক্ষর পল্লীবাসীদের অনেকেরই এই পাখি পুষিবার দারুণ শখ আছে। ময়না ইত্যাদি পাখি যেমন সৌখিন লোকেরা প্রাণসম আদরে পুষিয়া থাকে, পল্লীর বালকেরা কোড়াও তেমনিভাবে পোষে। পল্লীতে যাহাদের কোড়া পুষিবার বাতিক আছে তাহারা 'কোড়া ঋতু'তে ধান নালিতা জমির অন্তরালে কোড়ার ডাক শুনিলে 'শিকারের' জন্য, উন্মত্ত হইয়া উঠে। আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া যায় জীবনের মমতা। এখানে শিকার করার অর্থ মারিয়া ফেলা নয়, জ্যান্ত ধরিয়া আনিয়া পোষ মানানো। পোষ মানা কোড়ার সাহায্যেই 'জঙ্গলে' কোড়া শিকার করিতে হয়। এই কোড়া শিকার ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ধান নালিতা গাছগুলো প্রায় ডুবো ডুবো হইয়া যায় তখনই কোড়া ধরিবার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে শৈবাল ইত্যাদি জায়গায় জায়গায় জড়ো করিয়া উহার উপর কোড়ারা ডিম পাড়ে, তখন দিনে কিংবা রাত্রিতে বিল অথবা ডুবো জমির উপর দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইবার কালে কোড়ার ডাক শুনা যায়। কোড়া শিকারীরা এই সময় বৃহদাকারের এক প্রকার (বিশেষ করিয়া কোড়ার জন্য নির্মিত) পিঞ্জরাতে পোষমানা কোড়াকে লইয়া ডুবো জমিতে যায়। ইহারা ধান গাছের ফাঁকে জল-শেওলার উপর কোড়া শুদ্ধ পিঞ্জরাটি স্থাপন করিয়া অতি সন্তর্পনে আধ-ডুবো ক্ষেতের আলের উপর গভীর অন্ধকারে শুইয়া থাকে। পোষমানা কোড়ার ডাকে আকৃষ্ট হইয়া জঙ্গলে কোড়া উহার নিকটে আসে এবং দুই বীরের মধ্যে তখন রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া যায়। শেখানো পোষমানা কোড়াটি তখন বন্যটিকে সবলে আকৃষ্ট করিয়া পিঞ্জরার ভিতর পুরিয়া দেয়। এবং ইত্যবসরে দরজা বন্ধ হইয়া 'বুনো' বন্দী হয়। অনেক সময় শিকারী কোড়াশুদ্ধ পিঞ্জরাটিকে মাথার উপর রাখিয়া গলাজলে নাসারন্ধ্রটুকু মাত্র ভাসাইয়া ডুবিয়া থাকে। তাহাদের কোড়া ধরিবার শখ এমনই প্রবল যে সাপ জোঁক পরিপূর্ণ বিলে বা ডুবো জমিতে গভীর রাত্রিতে জলে ডুবিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিতেও ভয় করে না।

উপরিউক্ত পালা গানটিতে সামান্য একটি ঘটনার ভিতর দিয়া পল্লী কবি পল্লী-সুলব ভাষায় ও ভাবে মাতাপুত্র-ভগিনী পরিবেষ্টিত একটি গ্রাম্য পরিবারের অশ্রুপূর্ণ একটি tragedy মাত্র কয়েকটি লাইনের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিনোদ একজন পাকা কোড়া শিকারী। পরিবারের মধ্যে সে, তার মা, স্ত্রী এবং বোন এই কয়টি প্রাণী–

মায়ে কাটে চিকণ সূতা বৌ-য়ে রান্ধে ভাত।
অভাগ্য ননদীরা গলায় পাড়া করে মাত ॥

বৌয়ের মাথায় তেল সিন্দুর ভইনের মাথা উড়া।
অভাগ্যা শাশুড়ীর মাথায় পাকা শনের নূড়া ॥

বিনোদের স্ত্রী যুবতী, বোন বিধবা এবং মা বৃদ্ধা। বোন বড় ঝগড়াটে। পল্লীর অশিক্ষিত অমার্জিত গার্হস্থ্য জীবনের অন্তঃপুর-বধূকে শাশুড়ী ও ননদ কর্তৃক বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইতে দেখা যায়! এ সম্বন্ধে পল্লী কবিদের রচিত বহু ছড়া এবং গান আছে। বিনোদের বোনও যে পাড়া-প্রতিবেশীদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বৌকে গালি পাড়িবে না তাহারই প্রমাণ কি?

যখন নূতন বর্ষা আসিল, যখন বিনোদের ক্ষুদ্র পল্লীখানির চারিদিক নূতন জলে ভরিয়া গেল, ধান ও পাট জমিগুলি আধডুবো হইয়া গেল–অর্থাৎ বিনোদের 'কোড়া শিকারে'র উপযুক্ত সময় আসিল, তখন–

বিহানে উঠিয়া বিনোদ হাতে নৈল দাও।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া বিনোদ পিঞ্জরা বানায় ॥
কিছুদিন গেল বিনোদের পিঞ্জরা বানাইতে।
আরো কিছু দিন গেল বিনোদের কোড়ারে শিখাইতে ॥
কোড়ুয়া শিকারী মায়ের বিনোদরে ॥ (ধূয়া)

পিঞ্জরা তৈরি করা হইল এবং পোষমানা কোড়াটিকেও বিশেষ করিয়া 'কোড়া ধরা'র ফন্দী ফিকির শেখান হইল। তারপর–

কোড়ারে শিকায়্যা বিনোদ ভাতেরে দিল হাড়া'।
অভাগিনী মায়ে বলে, ওরে বিনোদ চা'লত নাই মোর কাড়া ॥

বিনোদের স্বল্প পরিসর দরিদ্র গৃহস্থালির একটি মর্মস্পর্শী চিত্র বটে। বিনোদের মার চাউল কাড়া না থাকিলেও তার স্ত্রী কিন্তু বসিয়া নাই। বিনোদ সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রির জন্য কোথায় কোন বেঘোরে গিয়া পড়িয়া থাকিবে, সে না খাইয়া গেলে স্ত্রীর মনে ব্যথা বাজিবে না তো বাজিবে কার মনে। সে প্রতিবেশীদের নিকট হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া চাউল আনিয়া রান্না করিতে লাগিয়া গিয়াছে :

মায়ে বলে পুত্র বিনোদ, ভইনে বলে ভাই।
অভাগিনী স্ত্রী বলে ভাতের অভাব নাই।
ভইনে দিল জল ধূতি মায়ে কাটে পাত।
অভাগিনী স্ত্রী বলে খাইয়া যাও মোর ভাত ॥

কিন্তু মায়ের মোটেই ইচ্ছা নাই যে এই দুর্যোগের দিনে বিনোদ কোড়া শিকার করিতে যায়। গেলে তার যে একটা অমঙ্গল হইতে পারে ইহা মায়ের প্রাণে পূর্বাহ্ণেই জাগিয়া ওঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু একগুয়ে ছেলে তার, নিষেধ করিলেও মানিবে না, যাইবেই। তাই যখন–

ভাত যে খাইয়া বিনোদ মুখে দিল পান।
ঘর হইতে বাহির হইল পূর্ণিমাসীর চান্দ ॥

তখন মা টিকটিকিকে লক্ষ করিয়া বলিতেছে–

তোরে বলি টিকটিকিয়া রে আরে টিকাটিকিয়া কইয়া বুঝাইরে তোরে।

আমার বিনোদ যাইবার কালে টিকটিকাইও জোরে ॥

মায়ের মনে আশা আছে যাত্রার সময়ে টিকটিকির শব্দ হইলে বিনোদ হয়ত বাধা পাইয়া না যাইতে পারে–

তোরে বলি কপালিয়ারে আরে কপালিয়া কইয়া বুঝাইরে তোরে।

আমার বিনোদ যাইবার কালে লাগিও তার কপালে ॥

যাত্রা করিবার সময়ে ঘরের কপালীর সঙ্গে কপাল ঠুক্কর লাগিলে অমঙ্গল আশঙ্কায় কোথাও যাইতে নাই।

কিন্তু বিনোদের পক্ষে ইহার কিছুই হইল না। সে পৌর্ণমসীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ যখন যাইতে যাইতে চোখের অন্তরাল হইয়া গিয়াছে উঁচু নালিতা গাছগুলির ফাঁকে আর যখন বিনোদের ছোট ডিঙিখানা দেখা যায় না তখন, কি জানি কি ভাবিয়া মা ডুকরিয়ে উঠিলেন। ইহা দেখিয়া–

ভইনে বলে গেছে গেছে, বৌয়ে বলে ভালা।
আভাগিনী মায়ে বলে আমার বুকে যে করে জ্বালা ॥
ভূমিতে লুটাইয়া মায়ে বুকে মারে হাত।
জন্মের তরে সোনার বাছায় খাইয়্যা গেল ভাত ॥

ওদিকে বিনোদ তাহার ছোট ডিঙিখানা লাগি ঠেলিয়া ধান জমির উপর দিয়া লইয়া চলিয়াছে। আষাঢ়ের বরষা–ধান জমিগুলিতে হাঁটুজল, চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ডিঙিখানা অনেকদূরে আগাইয়া নিয়া সে গভীর রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সূর্য ডুবিল, অন্ধকার চারদিক গ্রাস করিল। কোড়া বাহির হইবার সময় যখন হইয়া আসিয়াছে তখন সে জলে নামিয়া বন্য কোড়াকে আকৃষ্ট করিবার জন্য জলে হাত নাড়িয়া এক প্রকার শব্দ উৎপাদন করিতেছিল। এমন সময়–

জৈষ্ঠী না আষাঢ় মাসে ঝড়ার তলেরে পানি।
কোড়ারে আউলানি দিতে দংশিল নাগিনী ॥

বিষাক্ত সর্পের দংশনে বিনোদ আধডুবো আধশুকনা ক্ষেতের আলের উপর ঢলিয়া পড়িল–

তোরে বলি আরে নাগরে কইয়া বুঝাই তোরে।
আমি মায়ের এক পুত্র ছাইড়্যা দে আমারে ॥
তোরে বলি আরে নাগরে কইয়া বুঝাই তোরে।
ঘরে আছে যুবৎ বধূ কি জব[১] দিবে তারে ॥
আমি যে মরিব নাগরে ইতে দুষখ নাই
আমি মইলে আমার মায়ের আর যে লক্ষ্য নাই ॥

কিন্তু সব বৃথা হইল। সর্প তাহাকে দংশন করিলই–

একেত কালিয়া নাগরে বিষের কামড়।
লম্ফ দিয়া উঠে বিনোদ, আরে বিনোদ, ডিঙার উপর ॥
ডিঙাতে উঠিয়া বিনোদ লাগিতে দিল হাত।
এখনি দেখাইয়া দিতাম আরে নাগরে কেমন বজ্জাত ॥

কিন্তু বিনোদের সাপ মারা হইল না। সাপ কোথায় লুকাইল। তার শরীর বিষে আচ্ছন্ন অবশ হইয়া গেল–

বিষের কামড়ে বিনোদ কইলজা ফাটি যায়।
এমন নিদান কালে কে দেখাবে মায় ॥
ভাটি স্রোতের ডিঙি নাওরে উজান স্রোতে চলে।
বক্ষ ভাইস্যা যায়রে বিনোদ দুই না আইক্ষের জলে ॥

আসন্ন মৃত্যু ভীতিবিহ্বল স্নেহকাঙ্গাল বিনোদ নিকটে কোন জন-মানব না দেখিয়া অচেতন নৌকাটাকেই সম্বোধন করিয়া বলে–

তোরে বলি ডিঙি আরে কইয়া বুঝাইরে তোরে।
তুমি নি লইয়া জাইতে পার আমার মায়ের গোচরে ॥

সংজ্ঞা বিলাপের প্রাক্কালে যখন তার চোখ দুইটি মরণ-ঘুমে জড়াইয়া বুঁজিয়া আসিতেছিল তখন সে বলে–

তোরে বলি দুই না আক্ষিরে আরে আক্ষি কইয়ারে বুঝাই।
কাল ঘুমের আগে আমিরে আমার মারে দেখতে চাই ॥
তোরে বলি দুই না আক্ষিরে আক্ষি আরে কইয়ারে বুঝাই।
কাল ঘুমের আগে আমিরে আমার বৌয়েরে দেখতে চাই ॥

তারপর তার নিরুপায় চঞ্চল আঁখি দুইটিতে যখন সত্য সত্যই কাল নিদ্রা নামিয়া আসে তখনও আচ্ছন্নের মতই সে বলে–

খবর কইও খবরিয়ারে হারে খবরিয়া আমার মায়ের আগে।
তোমার যে বিনোদেরে খাইলরে হারে মারে কালিদহের নাগে ॥

এ-ই ছেলের শেষ বুক ফাটা কান্না! ওদিকে যখন কোনও উপায়ে বিনোদের মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে আসিয়া পৌঁছাইল তখন–

মায়ে কান্দে পুত্র পুত্র, ভইনে কান্দে ভাই।
অভাগিনী স্ত্রীর কান্দে আর ত লক্ষ্যা নাই ॥

শেষকালে পালা রচয়িতা এলেন–

মায়ের কান্দন যাবজ্জীবন, ভইনের দিন কয়।
অভাগিনী স্ত্রীরির কান্দন যাবত চন্দ্র রয় ॥

---

১. হাড়া–তাড়া

২. জব–জবাব

কটুমিঞার পালা

কটুমিঞার পালা গানটিতে পূর্ববঙ্গের এক মুসলমান পরিবারের একটি মর্মান্তিক চিত্র প্রকটিত। শ্বশুরালয়ে বেড়াইতে গিয়া তথায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর হাতে দেওয়া বিষ খাইয়া কটুমিঞাকে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। ইহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা জানি না, পল্লী কবি মনে মনে কল্পনা করিয়া কটুমিঞার এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটাইয়াছিল কিনা তাহাও নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কিন্তু নিরক্ষর পল্লীবাসীরা যে হতভাগ্য বিনোদের কাহিনীরই সঙ্গে কটুমিঞার দূরদৃষ্টের কথাও অশ্রুজলের সহিত গাহিয়া থাকে ইহাতে সন্দেহ নাই।

১. সোনার বরণ কুটমিঞারে ইটা-চল্লিশ বাড়ি।
বাপে যে করাইছিল বিয়া জমিদারের বেটিরে
হায় কান্দে, কান্দেরে দেওয়ান কটুমিঞার মায়ে ॥ [ধূয়া]

কটুমিঞার বউ বহুদিন হয় বাবার বাড়িতে আছে—একদিন কটুমিঞার সাধ হইল শ্বশুরবাড়িতে যাইবে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য।

২. ফজরে উঠিয়া মিঞা হাতে লইল ঝাড়ি।
উজু করে নমাজ করে যাইতে শ্বশুরবাড়ি ॥

কটুমিঞার মা তাহাকে শ্বশুর বাড়ি যাইতে নিষেধ করেন। তখন কটুমিঞা বলে—

৩. ভাত, যে রান্ধিবা মাগো না গালিও ফেনা।
শ্বশুরবাড়ি জামাই যাইতে কেন কর মানা ॥

৪. খানাপিনা খাইয়া মিঞা মুখে দিল পান
ঘর থনে বাহির হইল পুণ্যিমাসী চান্দ ॥

৫. তোরে বলি ঘোড়ার কোচ্‌মান ঘোড়ায় লাগাও জীন।
বিবি যে নাইওরে গেছে আজকে কত দিন ॥

৬. কটুমিঞার ঘোড়ারে কদম্বের ধূলা।
মঞ্জর নদীর পাড়ে গিয়া শূন্যে করিল উড়া ॥

৭. ঘোড়া থেকে নামিয়া মিঞা জুতা লাগায় পাও!
বান্দী দাসী উঠিয়া বলে আন্দার বাড়িতে যাও ॥

কটুমিঞার স্ত্রী ভ্রষ্টচরিত্রা। সে এই সুযোগে কটুমিঞাকে মারিয়া ফেলিবার ফন্দী করিল—

৮. তোরে বলি বান্দী দাসী, কার বা রাখিস ডর।
সাইয়েবের বিছানা দিও দু'মহ্‌লার উপর ॥

এদিকে তার গোপন প্রণয়ীকে সাবধান করিয়া বলিতেছে–

৯. তোরে বলি রঙ্গিলা বাঁরৈ রে, বাঁরৈ আরে কার বা রাখিস ডর ॥
মিছিলের বাজার থেকে আন' সপ্ত তোলা জর[১]।

রচয়িতা বলিতেছেন–

১০. ছোটলোকের খানা পিনা বিহানে বৈকালে।
বড়লোকের খানা পিনা রাত্রি নিশাকালে ॥

কটুমিঞার স্ত্রী বলে–

১১. তোরে বলি জয়ধন দাসী গো খানা দিও তুমি।
বেলোয়ারী বাটীতে নিয়া জরগুলি আমি ॥

কটুমিঞাকে যখন বিষ খাওয়ান হইল তখন সে বলে–

১২. কি খানা খাওয়াইলে নেছাগো বুক যায় জ্বলিয়া।
একটুখানি 'কর'[২] দেও গো আপনা জানিয়া ॥

১৩. দামলাপুরের দাম্‌লা ছেমরী খোপা বান্ধস তেড়া
কার বা শলায় পতি মাইরা দেশে রাখলি খোটা ॥

১৪. না লইও লাঠি সোটা না লইও 'ছিয়া'[৩]
জন্মের মতন কটুমিঞা গেল তালাক দিয়া ॥

১৫. খবরিয়া খবর কইও আমার মায়ের কাছে।
তোমার ছাওয়াল মারা গেছে বেধের বেরামে ॥

---

১. জর - বিষ।
২. কর - ঔষধ।
৩. ছিয়া - প্রহার মন্ত্র।

শেওলার পালা

ইহা শেওলাবালা নামক এক পল্লীরমণীর বুকভরা হতাশ প্রেমের করুণ ট্রাজেডি। কালাচাঁদ নামক এক যুবককে ভালবাসিত। ভালবাসা প্রথমে কিভাবে অঙ্কুরিত হইল তাহার ইতিহাস আছে। একদিন শেওলাবালা অন্যান্য রমণীদের সঙ্গে নদীর ঘাটে জল আনিতে গেলে সেই ঘাট দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইবার কালে কালাচান্দের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হয়—

কি না কাষ্ঠের ডিঙ্গাখানি কুন বা দেশে যাইবা জানি
আরে নাগর কইয়া যাও তুমি
বামন হইয়া যে নাগরে আকাশের চন্দ্র ধরে—
আমি বালা জানি না উদ্দিশরে।
তুমি কোন ঘাটের কালাচান ঘাটে লাগাইয়া পান
খাইও না ওরে বন্ধুরে। [ধূয়া]
এক শেওলা দুই শেওলা তিন শেওলা যায়ে তারা জলে না রে।
মধ্যের যে শেওলাবালি চিকন মাঞ্জা হেলি পড়ে না ওরে বন্ধুরে।

এই শেওলাবালার সঙ্গেই কালাচান্দের প্রেমের সঞ্চার হইল। প্রেম যখন আরও একটু ঘন হইয়া উঠিল তখন শেওলাবালা কালাচান্দকে—

পান দিল আড়ে আড়ে. গোয়া দিল খিড়কি দোয়ারে না রে—
চুনের ছইলে বালা জোড়-মন্দিরে যায় সুন্দর বন্ধুরে সঙ্গে লৈয়া।

শেওলা কালাচান্দকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। তথাপি তাহাকে পাইল না। শেওলার বিবাহ হইল বহু দূরে একজায়গায় সম্পূর্ণ অচেনা এক লোকের সঙ্গে। শেওলার বিবাহের পর—

নদীর কিনারে কালা বইসা থাকে সারা বেলা,
কেমন দুঃখ কইতে না জুয়ায়
কত নারী যাইবার কালে আড়েবেড়ে চাইয়া বলে
এ জনার মা বাপ বুঝি নাই।
শেওলা যখন জলে যায়, আঁখি মেলিয়া
কালচান তার দিকে চায় হারে
শেওলা ছাইড়্যা গেলা কিনা দোষ পাইয়া।
অত সাধের শেওলারে বালী কইত করিলা নাগরালি
হারে শেওলা কেম্‌নে থাক্‌বা বুকে পাষাণ দিয়া।

শেওলার অবস্থা তখন আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া যায়।—

ঘাট পিছল পন্থরে পিছল তাতে লুটায় শেওলার বসনের অঞ্চলরে।
হারে শেওলার বক্ষে ভাসে দুই না আইক্ষের জলেরে ॥

কান্দা দেওয়ায় মারে রে ডাক
শেওলার বুকে লাগে দারুণ কাঁপ
আইন্ধার আসে গাঙের চাইর পাড়ে।
দুই না আইক্কের মুছিতে জল
ঢালিয়া পড়ে শেওলা ঘাটের তল
কলসী ভাঙিয়া শেওলা ঝুরে ॥

বিবাহ হওয়ার পরেও তরুণ বয়সের প্রেমিক-যুগল পরস্পরকে ভুলিতে পারিল না। কিন্তু ইহার পর আর তাহাদের মিলনের কোন ভরসাই রহিল না। অবশেষে শেওলার শ্বশুরগৃহে কেমন করিয়া কালাচান্দের সঙ্গে মিলন হইয়াছিল এবং মিলনের পরিণাম কেমন শোচনীয়তায় প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাই 'পালা' গানটির শেষ অংশে বর্ণিত আছে।

শেওলার যখন স্বামীগৃহে যাইবার দিন আসিল তখন কালাচান্দ কোনো ফাঁকে তাহার সহিত দেখা করিয়া বলে–

তুমি ত যাইবারে হারে শেওলা ছয় মাসের নাইওরে রে।
হারে শেওলা আমি কালার কি করিবা উপায়।
আমার যে অবলা মন বুঝাইলে না বুঝেরে
লওয়াইলে না লয় পরার নাম ॥

শেওলা তখন বলে–

আমি যাব সোয়ামীর দেশে তুমি যাইও তথায় হরিণের বেশে
আমার সাধের বিন্নি ধান খাইও–
আঞ্চল না উড়াইতে আখি না ঘুরাইতে
বনের হরিণ বনেতে পলাইও ॥

'সোয়ামী' যখন শেওলাবালাকে নৌকায় করিয়া লইয়া যাইতেছে তখন শেওলা স্বামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করে নাই। আশৈশব যাহার সঙ্গে প্রাণ বিনিময় তাহাকে ছাড়িয়া অপরিচিত একটা লোককে কেমন করিয়া সে স্বীকার করিবে? এই জন্য শেওলাকে চরিত্রহীনা বা ভ্রষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার নিজের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ন্যায়ত অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহ হইলে কি হইবে, শেওলার মতই কালাচান্দকে ভুলিবার উপায় নাই। শেওলা দুঃখ করিয়া বলে–

এই না নদীর আড়ে আড়ে এই না নদীর পাড়ে পাড়ে
একদিন বন্ধু বাহিয়া যাইতে নাও
কাঞ্চনপুরের ভাটির বাঁকে যে মানুস পলাইল
একন কি সে মানুষের উদ্দিশ পাও।

স্বামীগৃহে যাইয়াও শেওলা পথের দিকে চাহিয়া থাকে কখন কালাচান্দ আসিবে। জল আনিবার জন্য নদীর ঘাটে যখন যায় তখন–

এই না নদীর বাঁকে বাঁকে কত সাধুর ডিঙ্গারে থাকে
আসে সাধু যায় সাধু ঘরে
আমার সাধু কালাচান্দ পাতিয়া গেল পীরিতির ফান্দ।
সে মানুষের উদ্দিশ কেবা করে।
পুবের সুরুজ পশ্চিমে চলে আঞ্চল ভিজে শেওলার চক্ষের জলে
পুরুষের মন কেমনে যায় জানা
সেই না নদীর কিনার দিয়া কতদিন নাও যাইতে বাইয়া
এখন বাইতে কে করিল মানা!

তারপর একদিন কালাচাঁদ আসিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিন্নি ধানের ক্ষেতে দেখা হইল। কিন্তু এই দেখা সুখের হইল না, লোকে টের পাইল, শেওলার শ্বশুর ভাসুর দেবর ইহারা ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া, বিন্নি ধানের ক্ষেতে কি আছে, শেওলা সেখানে কেন যায় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। লোকলজ্জা ও কুল কলঙ্কের ভয়ে শেওলা যেন এতটুকু হইয়া গেল। সে ডাকিয়া বলে–

কোথায় আজ শ্বশুর ভাসুর কই রইয়ালে হিরামন দেওর
এই না বেলা দেখরে আসিয়া
বনের হরিণ রে কেমনে আসিয়া রে
আমার মাঠের বিন্নি ধান যায় খাইয়া।

হীরামন দেওর তখন কি করিল–

হাতে লইল ধনুকরে দেওর, কোঁচড়ায় লইল গুলিরে দেওর
শেওলার পানে ফিরি চায়
হরিণ মারিবার ছইলে রে কোন হরিণ মারিতে রে
গুণের দেওর ধীরে ধীরে যায়
এক গুলি মারে দেওর সে গুলি বিফলে যায়
পড়ে গিয়া হাওরে পাথারে।
আর গুলি মারিতে রে নাগর কাঁলাচাঁদ
ভূমিতে ঢলিয়া পড়ে।

'হরিণ' দেখিয়া ত সকলে অবাক! হীরামন দেওর তখন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া–

কাটারি লইয়া হাতে ছুঁড়িয়া মারে হরিণের গায়ে
বিন্নি ক্ষেত রক্তে হইল লাল
পাঁচ আত্মা পাঁচ পরাণ বাহির করিল রে
কাটা গেল নাগরের 'কলিজা' খান।

এই ব্যাপারে শেওলাবালা কতখানি মর্মাহত হইল দেখুন–সে কপালে কর হানিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কালাচাঁদ বধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল–

রান্ধিতে হানাহারি বাড়িতে ঝরে চক্ষের পানি

যখন কান্না চাপিয়া রাখা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে তখন–

বার বাড়ির পিছনে গিয়া লম্বা 'ওয়া' মেলিয়া
শেওলাবালা জুড়িল কান্দন
খাইলাম না বিলাইলাম না ধন কেমনে গেল নারীর যৈবন
আইছিলা তুমি দিঘল পরবাস
দেড় দিনের পীরিতির লাগি পুরুষ বধের হইলাম ভাগী
নরকে নি হইবে আমার বাস!

তারপরের ঘটনা আরও মর্মান্তিক। শেওলাবালা নিজের প্রাণ নিজে নষ্ট করিয়া কালাচাঁদ-বধের প্রায়শ্চিত্ত করিল–

চিকন চিকন নালিতা শাক, সে শাক তুলিতে রে
খাড়ী হাতে শেওলা কন্যা যায়
বন্ধুয়ার রূপ ধরি' কাল নাগিনীরে
দংশিল সুন্দরী শেওলার গায়।
অত সাধের শেওলা লো বালা, সোনার অঙ্গ হইল কালা
ঢলিয়া পড়ে বিন্নি ধানের ক্ষেতে–

শেওলাবালা যে সাপের কামড়ে মরে নাই তাহা আমরা এখনই দেখিব–

এক ওঝা ঝাড়ে পাড়ে, আর এক ওঝা মন্ত্র পড়ে
আর ওঝা চক্‌বকাইয়া চায়–
ধন্বন্তরী ওঝা কয় এ মরা ত সর্পের নয়
বন্ধুয়ার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়।

তারপর শেওলাবালার জীবন-প্রাপ্তির আশায়–

শ্বশুর মানে ভেড়া ছাগল, ভাসুর মানে হীরামন কৈতর
দেওর মানে কালিনাগের পূজা
আপন সোয়ামীরে সেজন মানিল রে
আমি দিমু জোড়া মহিষ বলি!

কিন্তু শেওলাবালা আর উঠিল না। কালাচান্দের সঙ্গে শীঘ্র মিলনের জন্য সে চিরতরে ইহা ধাম ত্যাগ করিয়াছে। আত্মীয়স্বজনরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া হয়ত বিলাপ জুড়িয়া দিয়াছে–

শ্বশুর বলে গেল গেল, ভাসুর বলে একীরে হৈল
দেওর বলে কপালের লেখা
আপন সোয়ামী রে ধূলাতে লটাইল রে
এ জীবনে আর নি হইবে দেখা!

হতভাগ্য স্বামী যে হতভাগিনীকে কেমন নির্মলভাবে আন্তরিকতার সহিত ভালবাসিত তাহা তাহার শেষ কথা কয়টিতেই পরিস্ফুট।

সাপ্তাহিক নবশক্তি

বরজের গান

ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে পাচীন পল্লীবাসিগণের নিকট শ্রুত বরজ বা ব্রজের গানটি সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। পল্লীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রথার সকল গীত রচয়িতাগণ সাধারণত দুইটি প্রধান ভাবধারা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া থাকেন ইহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের গান সাধারণত প্রেম ও সাধনামূলক। প্রেম সঙ্গীতের উৎস বৃন্দাবনের চির কিশোর-কিশোরীর প্রেমের ফল্গু হইতেই সৃষ্টি লাভ করিয়া পল্লীবাসীগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই প্রেম তাহাদের জীবনের হাসি-কান্নার সঙ্গে এমনই নিবিড়ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে একই ধরনের প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়া একদিকে ভাবুক পল্লীবাসীবৃন্দ অশ্রু বিসর্জন করে, বিরহীরা গাহিয়া বিরহ যাতনা কিঞ্চিৎ লাঘব করে, আবার সেই গান গাহিয়াই দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রণয়-প্রণয়িনীকে কিংবা প্রণয়িনী প্রণয়ীকে আহ্বান করে। সাধনা সঙ্গীতগুলি ঐহিক ঐশ্বর্য হইতে মনকে গুটাইয়া তুলিয়া মৃত্যু পরকাল সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করিয়া দেয়।

কিন্তু এই দুইটি বিভাগ ছাড়াও সমাজের দুর্নীতির প্রতি, অথবা সমাজ গঠনের প্রতি ইঙ্গিতও যে সেকালের গীত রচয়িতাগণের গীত রচনার উপকরণ ছিল তাহা অনেকেই জানেন না। এখন 'বরজ' (ব্রজ?) নামক এক নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণতনয় কেমন করিয়া এক ভুঁইমালী নন্দিনীর প্রেমজালে আটকা পড়িয়াছিল তাহার সকরুণ কাহিনী বলা যাইতেছে।

> হস্তেতে লইয়া লাঠি,
> কান্ধেতে ফেলিয়া ছাতি,
> যায়ে বরজ--
> যায়ে বরজ দীঘল পরবাসে।

বরজ ব্রাহ্মণ সন্তান। গুরুগৃহে অধ্যয়নের জন্য কিংবা ব্যবসায়ের ব্যাপদেশে সে দীর্ঘকাল প্রবাস জীবন যাপন করিতে যাইতেছে গীত রচয়িতা তাহা বলেন নাই। যাহোক ছাতি এবং লাঠি লইয়া সে পল্লী-পথে চলিয়াছে।

তখন গ্রীষ্মকাল। পল্লীর ঘাটে ও মাঠে পল্লীপার্শ্বের পথে তখন খররৌদ্রের অফুরন্ত তেজ। এই পথ দিয়াই বরজ চলিয়াছে। ছাড়া ছাড়া ছোট গ্রামগুলি একটার পর একটা হয়ত বরজের মনে নির্মম এক মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এই খর রৌদ্রের অত্যাচারের মধ্যেও ছায়া সুশীতল পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিলে দেহ-মন শীতল হইয়া যায়। কিন্তু অন্য গ্রামের যুবকের কারণ বাতিরেকে পল্লী গৃহসমূহের উঠান বা গৃহসংলগ্ন বৃক্ষাদির

ছায়া পথ দিয়া হাঁটিবার ন্যায়ত অধিকার নাই। উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যা হোক বরজ গ্রাম পার্শ্বের মেঠো পথ দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু–

চৈত্রি না বৈশাখ মাসে
পিঙ্গুলিয়া রৌদ্রের তাপে
হায়রে লেগে গেল
লেগে গেল দারুণ জল-তিয়াস।

তাহার গন্তব্য স্থান অনেক দূরে। তাহার পায়ে চলা পথখানি বুঝি দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। দূরের রৌদ্রের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া পথটা বুঝি নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই নির্মম পথ পরিত্যাগ বাসনা বুঝি সে ভুলিতে পারিতেছে না।

পন্থখানি বাঁকা চোরা
ব্রাহ্মণের চরণ যায়রে পোড়া
হায়রে, গ্রামখানি
গ্রামখানি বড়ই লাগে মিঠা।

বরজ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে। সম্মুখেই দেখে একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাটী। দেখিয়াই তাহার ধারণা হয়–

ঘরখানি লেপা পুছা
দুয়ারে চন্দনের ছিটা
এটা বুঝি–
এটা বুঝি ব্রাহ্মণের বাড়ি।

স্বীয় জাত্যাভিমান সম্বন্ধে বরজ অত্যন্ত সচেতন। কাজেই মনে মনে কৃতনিশ্চিন্ত হইয়া সে ডাকিয়া চলে–

ঘরে আছ ঘরোয়া ভাই
জল নি, আছে খাইবারে চাই,
জাতে আমি
জাতে আমি ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।

গৃহকর্তার অনূঢ়া কন্যা দূর হইতে ভিন্ দেশী ব্রাহ্মণের ছেলেকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যায়। সে পরম যত্নের সহিত জলপানের উপকরণ লইয়া ব্রাহ্মণ তনয়ের নিকট উপস্থিত হয়–

ডান হস্তে জলের ঝাড়ি,
বাম হস্তে পানের থালি,
হায়রে, যায়ে কন্যা–
যায়ে কন্যা জলপান করাইতে।

বরজ এই রূপসীর রূপে মুগ্ধ হয়। কিন্তু সর্বাগ্রে তাহার প্রয়োজন হইল জল পিপাসা নিবারণ করা–

জল খাইয়া শান্ত হইয়া
জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন জাতের মায়া!
বলে, জাতে আমরা–
জাতে আমরা গন্ধ ভূঁইমালী।

প্রেম এবং হৃদয়বত্তারও ঊর্ধে হইল ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান। কাজেই–

আছাড় খাইয়া বরজে কান্দে
পিছাড়া খাইয়া বরজে কান্দে
জাতি গেল ভূঁই মালিয়ার ঘরে।

জাতি যখন গিয়াছেই, তখন গৃহে সে আর ফিরিতে পারে না, তাহাকে সারা জীবন এখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে, পিতৃগৃহের অর্গল তাহার জন্য এতদ্বারা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল, কাজেই সে নিরুপায় হইয়া বলে–

সঙ্গের যত সাঙ্গিয়া ভাই,
কইও খবর মা বাপের ঠাঁই,
আমার জাতি গেল;
জাতি গেল ভূঁই মালিয়ার ঘরে।

গানটির রচনাকাল খুবই প্রাচীন। পল্লীর নিতান্ত সেকেলে কোন কোন বৃদ্ধকে হাতের কাজ সহ গলা ছাড়িয়া ভাটিয়াল সুরে ইহা গাহিতে শোনা যায়। ইহার সুর খুব দীর্ঘ, কাজেই কথা অল্প হইলেও গাহিয়া শেষ করিতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।

গানটিতে একটি লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, হিন্দু সমাজের যে অস্পৃশ্যতা সম্প্রতি কালের কুটিল গতি অনুসারে অভিশাপ হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহার চিন্তা সেকালের লোকেরাও করিত। অনুন্নতগণ চোখ বুজিয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিলেও তাহাতে তাহাদের মন সায় দিত না। এই জন্যই হয়ত কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির পল্লীকবি প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এক ব্রাহ্মণ নন্দনকে মালীনন্দিনীর নিকট 'জাতিনাশ' করাইয়া গানটি রচনা করিয়াছে। ইহার ঠিক উল্টা পরিকল্পনা যে রচয়িতার মগজে আসে নাই তাহাতে তাহার নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ ভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : ডিসেম্বর ২, ১৯৩৮

জলসওয়া গীত

বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক ব্যাপারে জলসওয়া একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বা স্ত্রী আচার। বিবাহের বর এবং কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য নিকটস্থ নদী বা পুষ্করিণী হইতে কয়েক কলসী জল তুলিয়া আনাই জলসওয়া। পল্লীর কতিপয় এঁয়ো স্ত্রী ধানদূর্বা প্রভৃতি সাজাইয়া কলসী লইয়া নদী বা পুষ্করিণীর ঘাটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একদল স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে চলিতে থাকে। একদল স্ত্রীলোক যে-সকল গান গাইয়া যায় সেগুলিকেই জলসওয়া গীত বা জলভরা গীত বলা হয়। পল্লীর অন্যান্য গীতের মতন এই গীতগুলিরও অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহ নিয়াই রচিত। এই সকল গীত পূর্বে মেয়েরাই রচনা করিত। এখনো পল্লীর প্রাচীনাদিগকে এই গীত রচনা করিয়া দিতে দেখা যায়। তবে ভাষা, ভাব ও সুরের মর্মস্পর্শিতার দিক দিয়া প্রাচীন ও আধুনিক এই শ্রেণির গানে অনেক প্রভেদ আছে। আমাদের সংগৃহীত কয়েকটি অপ্রকাশিত এই শ্রেণির গান এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রবীণা পল্লীবাসিনীরা আধুনিক গান পছন্দ করে না, তাহারা প্রাচীন গানই গাহিতে ভালবাসে। যথা–

১. জলে কালো রূপ আমি নিরখি
জলে ঢেউ দিও না, কথা গো রাখো,
জলে না ডুবাইও কলসী।
কদম্বডালে ঠাকুর গো কৃষ্ণ
বাঁজায় মোহন বাঁশরী।
জলে ঢেউ দিও নাগো সখী ॥

যমুনাতীরস্থিত কদম্বডালের যে ডালটিতে বসিয়া কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় তাহারই ছায়া জলে পড়িয়াছে। জলে ঢেউ দিলে তাহার ছায়াখানি খান খান হইয়া যাইবে। কুলবধূ রাধা উপর দিকে চাহিতে পারে না। জলে ছায়া দেখিয়াই কৃষ্ণ দর্শনের সাধ মিটাইতেছে। কাজেই সখীদিগকে জলে ঢেউ দিতে নিষেধ করিতেছে, ইহাই গানটির মর্মার্থ।

২. নতুন কুম্ভীর এলো যমুনায়।
দেখে কুটীল আয়নকে সমজায়।
নতুন নদীর নতুন জল দেখে এলাম সুশীতল
বৌ দেখিয়া আড় নয়নে চায়
কুম্ভীর বালা বৃদ্ধা চায় না নিতে, ও দাদা,
শুধু যুবৎ নারী ধরে খায়।
ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে বৌ-ঝিয়েরে নিষেধ করে
জল আনিতে যাসনে যমুনায়

তোমার বধূ আগ বাড়ায়ে ও দাদা।
জলে না গেলে মাথা ঘুরায় ॥

৩. প্রাণ সখী গো, আর যাব না কদমতলায় বান্ধা ঘাটে
রূপার বান্ধান কলসী, সোনার বান্ধান কাঁধা
কাঁধার উপর লেখে গেছে, শ্যাম-কলঙ্কী রাধা।
গ্রাম দেখি না, ঘর দেখি না চোর বলিব কারে।
'সে' না নিলে রাধার বসন নিবে কেমন চোরে ॥

৪. সুন্দর ভাগিনা, কানাইয়া রে
পন্থ ছাড় জল আনিরে–
কাঁখের কলসী ভাঙিবে রে।
পরণের শাড়ি ছিঁড়িবে রে
তোর মামা শুনিলে বধিবে রে।

৫. জ্যৈষ্ঠি না আষাঢ় মাসে যমুনা উতলে গো,
যাসনে যমুনার জলে
যমুনাতে যাবে বধূ ননদ করল আড়ি,
জল গামছা ফেলিয়া রাধা পিন্ধে পাটের শাড়ি।
যমুনার ঘাটে যেতে কূলে নাই মোর কেউ
মাথার উপরে ওঠে সমুদ্দুরের ঢেউ ॥
যমুনার ঘাটে যেতে বাইরে-ঘরে জ্বালা।
পন্থে-ঘাটে ছোঁয়াছুঁয়ি নন্দের ঘরের কালা।
যমুনার ঘাটে যেতে দে'আয় করে আন্ধি
পন্থহারা হয়ে আমরা কৃষ্ণ বলে কান্দি ॥

জলসওয়া শেষে বাড়ি যাওয়ার পর–

৬. জলে কি রূপ দেখিয়া
এলাম গো বিশখে–
মেঘেরি বরণ শ্যাম.......
তার হাতেতে বাঁশী মুখেতে হাসি
চরণে নূপুরা গায়।
রুনুঝুনু শব্দ শোনা যায়।

সময় সময় এক আধটুকু আদিরসের আভাসও দেখা যায়–

৭. প্রাণসই, জলে গিয়েছিলাম একেলা–
গিয়েছিলাম শেষ বেলা–
রাখছে না গো শ্যামকালা–
একে তার বাঁশীর জ্বালায় শরীর কালা,
করেছে কালা রঙ খেলা।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : এপ্রিল ১, ১৯৩৮

নাইওরের গান

নববধূকে সাময়িক ভাবে কিছু কালের জন্য স্বামী গৃহ হইতে পিতৃগৃহে নেওয়াকে 'নাইওর' নেওয়া বলে। এরূপ স্থলে সেই কন্যাকে বলা হয় 'নাইওরী', আর যাত্রাকে বলা হয় 'নাইওর।'

একটি বালিকা বধূর স্বামীগৃহে অবস্থানকালে পিতৃগৃহে গমনের উন্মুখতা একটি পল্লী সঙ্গীতে চমৎকার বিকাশ পাইয়াছে। বালিকা নিকটবর্তী নদীর ঘাটে কলসী ভরিতে আসিয়া দেখে দুই কূল উপছানো নদীতে নৌকা গমনাগমন করিতেছে। একটি নৌকাকে তাহার বাপের দেশের নৌকার অনুরূপ মনে হওয়ায় সে বলে–

লাল বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর,
আমার ভাইয়ের কাছে কইও খবর।

বালিকা স্বামীগৃহে শ্বাশুড়ী ননদের নির্যাতনে ব্যতিব্যস্ত। সে যেন কল্পনায় শুনিতে পায়, ভাই তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে–

থাক থাক ভইন গো পথের দিকে চেয়ে,
আশ্বিন মাসে নিতে আসব পাটের টাকা পেয়ে।
ধলা পাটের ধলা রোশনাই বাতাসে উড়ায়,
এমন সুন্দর ভইন-কে পরে নিয়ে যায়।

ভাই আশ্বিনেও আসিল না। পূজা উপলক্ষে সকল 'নাইওরা'ই বাপের বাড়ি গিয়াছে, কেবল তাহার ভাই তাহাকে নিতে আসিল না। নদীর জলে ভাটা পড়িয়াছে। বালিকা কলসী ভরিতে গিয়া দেখে পাট ব্যাপারীদের অনেক নৌকাই পর পর নদীপথ বাহিয়া চলিয়াছে, কেবল তাহার ভাই-এর পাটের নৌকার দেখা নাই। সে বলে–

ধলা বৈঠা বেয়ে যাও কোন সদাগর,
আমার ভাইধন-এর কাছে কইও খবর।

স্বামীগৃহে নির্যাতনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পূজার সময় ভাই না আসিলেও এবার নিশ্চয় আসিবে। তাই সে এই ভাবিয়া নিজে নিজেই আশ্বস্ত হয় যে ভাই হয়ত বোনটির কথাই ভাবিতেছে, বোনের আহ্বান শুনিতে পাইয়া সে বলিতেছে–

থাক থাক ভইন গো, পথের দিকে চেয়ে
অঘ্রাণেতে নিতে আসব ধানের টাকা পেয়ে।
মাইটা ধানের ঝিকিমিকি 'কেরি' পোকায় খায়।
এমন সুন্দরি ভইনকে পরে নিয়া যায়।

বালিকা বসিয়া-বসিয়া ভাবে, তাহার বাপের বাড়ির মাঠে মাঠে ধান পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহার ভাই জন-মুনিষ লইয়া সারি গান গাহিতে গাহিতে ধান কাটিয়া

ফেলিতেছে। সারা মাঠে সমারোহের শেষ নাই। তারপর সেই ধানে নৌকা বোঝাই করিয়া ভাই বুঝি মেড়াতলির হাটে বেসাত করিতে গিয়াছে। সাঁঝের বেলা ধানের টাকা ট্যাকে গুজিয়া ভাই বাড়ি ফিরিয়াছে, পরদিন বোনকে নিতে আসিবে।

নদী শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া গিয়াছে। সারি সারি ধানের নৌকা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কোন-কোনটি তাহার বাপের দেশের ইহা সে বুঝিতে পারে কিন্তু বাপের বাড়ির সেই চির পরিচিত নৌকাটি তো সে দেখিতে পাইল না। বুক ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসে। ভাই বুঝি এবারও তাহাকে নিতে আসিল না! কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় না। সামনে আরও একটি 'খন্দ' আছে। ভাই তখন আসিতে পারে। সে বলে–

কালা বৈঠা বেয়ে যাও কোন্ সদাগর,
আমার ভাইধন-এর কাছে কইও খবর।

এইবার সে আশাতে বুক বাঁধে, ভাই আসিবার জল্পনা করিতেছে এবং এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছে–

থাক থাক ভইন গো পথের দিকে চেয়ে
মাঘ মাসে নিতে আসব সরষার টাকা পেয়ে।

হাজার হউক মায়ের পেটের ভাই'ত। বোনের জন্য ভাইয়ের দরদ আছে ইহা বালিকা একেবারে অস্বীকার করিয়া মরীচিকার মতন মনে পোষা সান্ত্বনাটুকু নষ্ট করিতে চায় না। তাহার আশাবাদী মনের কান দুইটাতে যেন আসিয়া ঢোকে, ভাই দুঃখ করিয়া বলিতেছে–

সরষা ফুলের ফরসা 'ঝীলা' বাতাসে উড়ায়
এমন সুন্দরী ভইনকে পরে লয়ে যায়।

ঘর সংসার পাতিবার পক্ষে বালিকার যথোপযুক্ত বয়স এখনও হয় নাই। শিশুমন তাহার এখনও পিত্রালয়ের পেয়ারাতলায়, পানা পুকুরের পাড়ে আর বনবাদাড়ে খেলার সাথীদের খুঁজিয়া বেড়ায়। ভাই অতঃপর তাহাকে আর নিতে আসিয়াছিল কিনা গীতরচয়িতা তাহা প্রকাশ করিয়া যান নাই। কিন্তু না বলিয়া ভালই করিয়াছেন। কারণ মানুষের বয়স একস্থানে স্থির হইয়া চিরদিন থাকে না। বালিকার বালিকা-বয়সও কিন্তু চিরদিন থাকিবে না। কিছুদিন পরেই হয়ত বালিকা আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, তাহার শরীরে ইতস্তত বাসন্তী জল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছে। ভাই তখন নিতে আসিলেও সে পালাইয়া বাঁচিবার পথ পাইবে না।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : নভেম্বর ৪, ১৯৩৮

পাখির গান

প্রেমাস্পাদকে পাখীর সঙ্গে উপমা দিয়া গান রচনা করা গ্রাম্য কবিগণের এক বাতিক ছিল। বিভিন্ন গ্রাম্য সঙ্গীতে তাই পাখীর প্রচুর উদাহরণ রহিয়াছে। পাখী উপলক্ষ-করা গান দুই শ্রেণির। প্রেম-মূলক ও তত্ত্ব-মূলক। প্রেম-মূলক গানগুলিতে পাখীকে প্রণয়ীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। পাখী যেমন শত আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া সুযোগ পাইলেই গগন-মার্গে উড়িয়া যায়, কোন কোন প্রেমাস্পদ ব্যক্তিও প্রণয়িনীর সকল কামনার মুখে ছাই দিয়া চলিয়া যায়। তত্ত্ব-মূলক গানগুলিতে মনকে পাখীর সামিল করা হইয়াছে।

১. আমার কাজল পরা পাখী গো সই, ধরে দে ॥
বৃন্দাবনের পাখী গো আমার বনে বনে বাসা।
এক দণ্ড ছাড়িয়া গেলে প্রাণের নাই মোর আশা।
একই স্থানে রয়না পাখী ফিরে বনে বনে।
সন্ধ্যাকালে উড়িয়া পড়ে যমুনার পুলিনে।
চোখে কাজল, পাখায় কাজল, কাজল শ্রীচরণে।
নয়নে মিশায়ে রাখি হেন লয় মোর মনে।

২. পাখীরে বুঝাব কত, হয়না পাখী মনের মত।
পাখী, ইদিক সিদিক ঘুরে বেড়ায়,
শিক্‌লি কাটা টিয়ার মত।

৩. আমার সোনার চান্দ্‌ পাখী
আমি তোরে ডাকি মন রে,
আরো, ঘুমাবি নাকি।
এতকাল পালিলাম পাখী দুগ্ধকলা দিয়া।
যাবার বেলা বেইমান পাখী না গেল বলিয়া।
আগে যদি জানতাম পাখী যাবিরে ছাড়িয়া।
পাখীর দুই চরণ বান্ধিয়া রাখিতাম মাথার কেশ দিয়া।

একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গান–

তমালেরি ডালে বসি কোকিলায় কি বলে রে।
কোকিলায় কি বলে শ্যাম বেইমানে, কি বলে রে।
টিয়া পাললাম, শালিক পাললাম
আরো পাললাম ময়না রে।
সোনামুখী দোয়েল পাললাম,
আমার কথা কয় না রে ॥

ভ্রমর দূত

ভ্রমর, কইও গিয়া,
শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধার চিত্ত যায় জ্বলিয়া
ভ্রমর কইও গিয়া
ভ্রমর রে—না খায় অন্ন না লয় পানি,
না বান্ধে মাথার কেশ
তুই শ্যামের লাগিয়া রাধার পাগলিনী বেশ।
ভ্রমর রে—মাতা ছাড়লাম, পিতা ছাড়লাম
ছাড়লাম সোদর ভাই;
তুই শ্যামের লাগিয়া আমার ঘরে
না দেয় ঠাঁই।
ভ্রমর রে—কুল দিলাম, মান দিলাম,
আর বা দিব কি।
তার চরণে ভরা গঙ্গা সঁপিয়া দিয়াছি।

মেওয়া মিছরির গান

গৌর নাম সুধানিধি পান কর নিরবধি
হবে না ছয় জনবাদী, ব্রজনাথে।
নামের রাস্তায় পথ চলিয়া প্রেম বাজারে যাইও।
প্রেম বাজারের মেওয়া মিছরি উদয় ভরে খাইও।
হলে শুচি মনে রুচি নামের লুচি চাইও।
গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা মিঠাই প্রাণটা ভরে খাইও।
যদি খেয়ে লুচি হয় অরুচি তাতে গুড় মিশাইও।
প্রেমবাজারে রাধা হাওলাইর নামের পায়েস খাইও।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : নভেম্বর ২৫, ১৯৩৮

উপাখ্যানমূলক সঙ্গীত

উদ্ধবের গান

একটি গৃহকোণাবদ্ধা নারী হৃদয় ও একটি সংসারের বাহির করা আনমনা ছন্দছাড়া পুরুষ হৃদয়ের ব্যবধানের সপ্ত সমুদ্রকে 'উদ্ধবের গান' নামক পল্লী-সঙ্গীতটিতে পল্লী কবি যেভাবে রূপদান করিয়া গিয়াছেন তাহা এ যুগের কবিগণেরও অনুধাবনযোগ্য। নিতান্ত অমার্জিত অবস্থায় পল্লীর অশিক্ষিত কন্দরে পড়িয়া থাকিয়া এই প্রাচীন গানটি আজও পল্লীর বিরহী বিরহিনীদের মনে মাধুর্যের সঞ্চার করে। আধুনিক কবি এমন একটি ভাবমূলক সঙ্গীত 'ভদ্রলোকী' ছন্দে গাঁথিয়া সাহিত্যে পরিবেশন করিলে ইহাই একটি অনন্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন, নাম-না জানা পল্লী কবিগণের যে যথার্থ কবি-প্রতিভা ছিল এইসব সঙ্গীতে তাহা সুপরিস্ফুট।

এক গৃহবদ্ধা নারী উদ্ধবকে ভালবাসে, কিন্তু তাহাকে সে পায় না। তাহার গতিবিধি সর্বদা লক্ষ করিয়া তাহার সহিত নিভৃতে দু' দণ্ড কথা কহিবার অবসর খোঁজে। এটুকু পাইলেই সে তৃপ্ত, কিন্তু তাহাও তাহার ভাগ্যে জোটে না। সে বলে–

উত্তরের পাথারে রে সোনাবন্ধু হাল চষে রে,
লাঙলে বাজিয়া ওঠে উড়া শেকড়
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দ মুখ শুকায়ে যায়,
কার হাতে পাঠাব পান গুয়া।

তরুণীর দরদ উদ্ধবের জন্য উথলিয়া উঠিয়াছে। উত্তর দিকের প্রান্তরে সে হাল চাষ করে। তাহার চাঁদ মুখ বাতাসে শুকাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্যই গৃহকোণে বসিয়াই সে কল্পনা করিতে পারে। এই সময়ে পান গুয়া খাইতে পাইলে তাহার শ্রান্তি অপনোদিত হইতে পারিত। কিন্তু সে গৃহকোণে আবদ্ধা। এমন কেহ তাহার নাই, যাহার হাতে সে উদ্ধবের নিকট পান গুয়া পাঠাইতে পারে। নিম্নলিখিত লাইনগুলিতে তাহার দরদ উদ্দাম হইয়া উঠে–

হাম নারীর বাড়ির কাছে রামকলার বাগ আছে
বাদুড়ে চুষিয়া করে নাশ–
এমন সময় কালে যে তারে খাওয়াইত রে,
বৈকুণ্ঠেতে হইত তার বাস।

দুপুর গড়াইয়া যায়। বিকাল হয়। রমণীর মনে আশা জাগে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জল আনিবার ছলে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া তাহাকে 'এক নজর' দেখিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু তাহার অপ্রসন্ন ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়া উঠে না।

পুষ্করিণীর চারি পাড়ে ঝিকিমিকি পাখী উড়ে,
সোনা বন্ধু বাজায়ে যায় বাঁশী।

এ পোড়া ঘরের কাম　　　　সারিতে না পারি রে
বাহির হয়ে শুনিতে বন্ধুর বাঁশী।

যথা সময়ে গৃহকর্ম সমাধা করিতে পারে নাই। অন্যান্য বাড়ির রমণীরা যখন কলসী কাঁকলে লইয়া তাহারই বাড়ির উঠানের পথ ধরিরা পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে চলিয়া যায়, সে তখন তাহার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ কাজগুলিতে মগ্ন। কাজ সমাধা করিয়া যখন সে তাড়াতাড়ি করিয়া পুকুর ঘাটের দিকে ছুটিল, তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য রমণীরা কলসী ভরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। উদ্ধবও পুষ্করিণীর চারি পাড়ে ইতস্তত বাঁশীর সুরজাল ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে বিচ্ছেদের বিভেদ আরও প্রশস্ততর হয়–

হংস যে পালিলাম,　　　　কবুতর যে পালিলাম,
পিঞ্জরায় পালিলাম টিয়া,
হীরামন কবুতর হইয়া　　　　যাইতাম উড়িয়া রে,
যে দেশে গিয়াছে প্রাণ পিয়া।

কিন্তু তাহার অম্লান আশার বুক কালিমাঙ্কিত হইয়া যায়। সন্দিগ্ধ মন তার একটি নূতন অভিজ্ঞতা আবিষ্কার করে–

কৃষ্ণ হইল বনাচারী　　　　মথুরায় বেন্ধেছে বাড়ি,
পরার প্রেম কি এতই মিষ্টি লাগে,
নবীন পীরিতি রে　　　　পুরান হইল রে,
নিম হইতে অধিক তিতা লাগে।

সে মরিয়া হইয়া উঠে। তাহার দয়িতের খোঁজে সে আপনার ভবিষ্যৎ কিছু না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়ে :

নদীর আড়ে আড়ে　　　　নদীর পাড়ে পাড়ে,
আমার বন্ধু গাহিয়া গেছে গীত,
কুক্ষণে বাড়াইলাম পাও,　　　　খেয়া ঘাটে নাহিরে নাও
খেয়ানীরে খেয়েছে বনের বাঘে।

রমণীর আশা পূর্ণ হয় নাই। গৃহ পরিত্যাগ করিবার মত সাহস সে সঞ্চয় করিয়াছিল, কিন্তু খেয়া ঘাটে খেয়া নৌকা সে পাইল না বলিয়া দয়িতের খোঁজে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। নিরুপায়ের চরম বেদনা গানটিতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সর্ব প্রচেষ্টার নিষ্ফল পরিণতি কারুণ্য গানটির সর্বত্র বিরাজমান। পল্লীর সূচীপত্রহীন প্রেম-সাহিত্য কোন বিস্মৃত সময়ের এক রমণী 'উদ্ধবে'র নয়নের জলে গানটি গাহিয়াছিলেন, কিন্তু আজিকার অনেক পল্লীবাসী মনপ্রাণ ডুবাইয়া দিয়া গানটি গাহিয়া গভীর তৃপ্তি উপলব্ধি করে।

পাদটীকা : ১. বাজিয়া- বাঁধিয়া; ২. উড়া-শেকড়।

বানিয়ার গান

বানিয়ার গানটি নিছক প্রবৃত্তিমূলক। কোন উচ্চভাবের ইঙ্গিত এই গানটিতে নাই। গাহিয়াও থাকে খুব নিচু সমাজের লোকেরা। বহু বহু মাইল ব্যবধানের পল্লীসমূহেও এই গানটি প্রচলিত দেখিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। ইহার রচয়িতা যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল তাহা সহজেই বোঝা যায়, কারণ গানটিতে ছন্দ বা মিলের বালাই নাই। শুধু সুরের টানে কথা দিয়া রচনা করিবার পর ইহা মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাংলার দাম্পত্য জীবন সমস্যার একটি প্রধান দিক ইহাতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

শৈশবে একটি বালিকা একটি বালকের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বর্ধিত হয়। পরে বালিকার এক দূর গ্রামে বিবাহ হইয়া যায় এবং বালক বড় হইয়া বানিয়া-বৃত্তি অবলম্বন করে। যে সমস্যায় জ্বলিয়া ইদানীং তরুণ তরুণী লেকে ডুবিয়া মরে, যে সমস্যার দরুণ অনেক আধুনিকা নারীই মুখের হাসি দিয়া বুকের জ্বালা ঢাকিয়া পুরনো বান্ধবকে ভুলিয়া বিষ গেলার মত স্বামীর ঘর করে ইহা সেই সমস্যা।

তরুণী বাপের বাড়ি আসিয়াছে। বানিয়ার সঙ্গে সহসাই সেখানে তাহার দেখা হইয়া যাওয়াতে সে বড় লজ্জা পাইল।

আজুকার সিনানে রে,
ওরে বানিয়া, আমি বড় লজ্জা পাইলাম রে
লজ্জা পাইলাম শানের বান্ধান ঘাটে রে,
মা বাপে শুনিলে রে পরাণে ত বধিবে রে,
ওরে বানিয়া লোকে বলবে পুরুষবন্ধা নারী।

বানিয়া বলিতেছে–

তুমি ত যাইবে গো, ছয় মাসের 'নাইওরী' গো
আমি বানিয়ার কি হবে উপায়।

তরুণী বলিতেছে–

আমি ত যাইবরে বানিয়া পরের দেশের দেশারী,
তুমিও যাইওরে বানিয়া সেই না দেশের পশারী রে।
অতিথি বইলে স্থান দিব আমি।
ডাল দিব চাল দিবরে বানিয়া রসুই করে খাইওরে।
শুইতে দিব যোড় মন্দির ঘররে।
রাত্রি নিশা কালেরে বানিয়া পানের বাটা সাজাবরে;
হাসি খুশি পশাইব রজনীরে।

তরুণীর বুকের পাটা কম নয়!

সাপ্তাহিক নবশক্তি : ডিসেম্বর ৯ ও ১৬, ১৯৩৮

ভাই-ফোঁটার গান

ভাই ফোঁটা বাংলার হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট উৎসব। এই উৎসবে বোন ভাইকে ফোঁটা দিয়া তাহার সকল আপদ বালাই দূর করিয়া দেয়; বলে, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পল্লীর মেয়েরা যে সব গান গাহিয়া থাকে, তাহারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল–

১. আশ্বিন যাইতে রে কার্তিক আসিতে রে
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা।
কাটিয়া কলার পাতি সাজাইয়া তৈলের বাতি
আশীর্বাদ বানাইল ভইন একা।
পূবের ঘরে রান্ধনী গো পশ্চিমের ঘরের পরিবেশনী গো
উত্তর ঘরের ভইন বলে ডাকি,
পানের বটুয়া দিয়া কাজল করিল গিয়া
ফোঁটার আর কয়দিন বাকি।

২. দ্বিতীয়ার চান্দ দেখে ভইনের উল্লাস।
এমন সময় কালে ভাই-ধন পরবাস ॥
ভাই-এ ত দরবার করে রাজ্যসভা লইয়া ॥
পরোয়ানা পাঠাইল ভইন কাজলে লেখিয়া।
বসেছে ভইনের ভাই-ধন রাজ্যসভার ভিৎ।
এমন সময় কালে পরোয়ানা উপস্থিত।
'থাক থাক' রাজ্যসভা এখানে বসিয়া।
আমি আগে আসি গিয়া ভইনের ফোঁটা লইয়া ॥

৩. ভাই-এর বোন্ গো সর্বতারা দূর্বা তোল গিয়া।
দূর্বা তুলে ভরিল বাটা ভাই-ধনকে দিতে ফোঁটা।
ভাই-এর বোন্ গো সর্বতারা চন্দন পিশ' গিয়া।
চন্দন পিশে ভরিল বাটা ভাই-ধনকে দিতে ফোঁটা ॥

৪. রাধা বলে ঠাকুর কৃষ্ণ ফোঁটা পেলে কই?
কাল কে গেছিলাম বোনের বাড়ি ফোঁটা পেয়েছি।
রাধা বলে ঠাকুর কৃষ্ণ চন্দন পেলে কই?
কাল যে গেছিলাম বোনের বাড়ি চন্দন পেয়েছি। ইত্যাদি।

মাতৃস্নেহসূচক কয়েকটি অপ্রকাশিত প্রাচীন সঙ্গীত

১.　কার কাছে বলিব দুঃখ মা নাই ঘরে।
অলখের ভাঙা কপাল কি দিল ভাই জুড়ে॥
সত্যই মায়ের কথা যেন মধুরস বাণী।
কাটারি দিয়া গোড়া কাটে উপরে ঢালে পানি॥
শয়নের সুখ ভাল উত্তম বিছানা
রোদনের সুখ ভাল মা যদি করে মানা
ভোজনের সুখ ভাল মায়ের হাতের খানা।

২. পার্বতী বিবাহের পর কিছুদিন শিবের ঘর করিয়া আসিয়া তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার কথা মেনকাকে বলিতেছেন–

শোন যাই,
আচ্ছা সুন্দর তোর জামাই।
হাতে সাপ গলায় সাপ
আর এক সাপে ধরেছে 'থাপ'
আর এক সাপে লক্ লক্ করে
ডরে মরে যাই।

অন্য একটি গানে–শিবগৌরীর দারিদ্র্যপীড়িত গৃহস্থালির একটি চিত্র মর্মান্তিক ভাবে ফুটিয়া উঠে;

মৃদু বাতাস এলে হাঁড়ি খুঁড়ি নড়ে,
ওমা মেনকা, আমার মন চলে না
　　ভাঙড়া শিবের ঘরে।
শিবের ঘর নাই দুয়ার বান্ধে
বসনে ছাউনি ছান্দে
　　খোপে খোপে সাপের আঁটুনি
হিমেলি হিমের বাও,
বসন বিনা কাঁপে গাও,
　　সিদ্ধি কুটিতে আঁখি ঝুরে॥

সাপ্তাহিক নবশক্তি : অক্টোবর ২৮, ১৯৩৮

পরিহাস সঙ্গীত

পল্লীর নিতান্ত অশিক্ষিত সমাজ হইতে সংগৃহীত, ঐ সমাজে পরিচিত কয়েকটি রহস্যসূচক গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানগুলিতে কিছু কিছু নিম্নশ্রেণীর রসিকতা আছে ইহা অস্বীকার করা না গেলেও এ গুলিতে যথেষ্টভাবে রচয়িতার আন্তরিকতা ও কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

নাতীনের গান

নাতনী বিরহ যাতনায় অধীরা। তাহার 'বঁধূয়া'র সহিত তাহার দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। তাহার মনের নিভৃত কন্দরের গোপন ব্যথাটি একমাত্র দরদী 'দিদি'ই বুঝিতে পারে। একদিন নাতনী নিতান্ত অধৈর্য হইয়া গেল। মুখ ফুটিয়া এই গানটির ভিতর দিয়া সকল জ্বালা নিবেদন করিল–

আমার প্রাণ-বঁধূয়া রে তোরে ডেকে গো দিদি,
ডেকে দে দালানের বার হইয়া।
অবুঝ পরাণ মন, বুঝাইলে না বুঝে দিদি গো,
মুখের কথায় কত থাকব সইয়া।
কেহ তাকায় আড়ে বেড়ে গো দিদি, কেহ যায় গো রইয়া।
কত কাল রাখিব যৌবন গো দিদি, বসনে বান্ধিয়া

আমার বন্ধু খাবে ভাত, কিনিয়া আনিলাম মাগুর মাছ
দুধের লাগি' পাঠাইয়া দিলাম কড়ি।
সেই বন্ধু আসিবে বলি' দুয়ারে না দিলাম খিল,
ধন থুইয়া যৌবন হইল চুরি।
আমার বন্ধু রঙ্গী চঙ্গী হাওরে বেঁধেছে টুঙ্গী
টুঙ্গীর নাম রেখেছে উদয় তারা,
লাগিয়া পুবালীর বাও মুইধন নারীর কাঁপে গাও,
জোয়ারের জলে না দেয় বন্ধু ধরা।
দিদি, প্রাণ বন্ধুয়ারে তোরা ডেকে দে।

ঝিয়ারীর গান

পল্লীর অতি নিম্নস্তরের কোনও পরিবারে হয়ত এই ঘটনাটি ঘটিয়া থাকিবে, যাহা হইতে 'ঝিয়ারীর গান' নামক নিম্নস্তরের রসিকতাপূর্ণ গানটির জন্মলাভ ঘটিয়াছে। ঘটনাটি এই : এক 'ঝিয়ারী' তাহার 'ভাতৈ' এর সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বেশ-ভূষার পারিপাট্যে অনুরাগিনী কোনও পল্লীবালার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া ছিদ্রান্বেষী প্রতিবেশীরা এই গানের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে।

ও রসের ঝিয়ারী
নাগর কি গিয়াছে তোর বাড়ি?

পল্লীর নিরক্ষর লোকসমাজের মেয়েদের সাজ-সজ্জা করাটা একটা মস্ত অপরাধ। কোন মেয়ে কোনও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করিলে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন বস্ত্রালঙ্কারাদি ব্যবহার করিলে প্রতিবেশীদের মনে ঐ মেয়ের চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবত সন্দেহ জাগিয়া উঠে। আলোচ্য গানটির victim 'ঝিয়াবী'ও হয়ত তাহার স্বভাবগত একটু অতিরিক্ত বিলাসপ্রিয়তার দরুন পাড়ার লোকের অনেক ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য করিয়া আসিয়াছে–

ঝিয়ারীর মাথার দিঘল কেশ খোঁপী বান্ধে নানান বেশ
খোঁপার উপর গুঞ্জরে ভোমরা।
গাঙে গেলে আঞ্জন মাঞ্জন বাড়িতে গেলে কেশের যতন,
তবু ঝিয়ারীর নাগর না দেয় ধরা।

তারপর নিষ্ঠাবাদী গীতরচয়িতা এই 'ঝিয়ারীর' চাঞ্চল্যময় যৌবনের অনিত্যতা গানের পরবর্তী লইনগুলোতে প্রকাশ করিয়াছেন–

ঝিয়ারীর যৈবন তামা কাঁসা দেশ বিদেশে করে আশা
এই যৈবনের গৈরব করা ভাল না;
ঝিয়ারীর যৈবন মেঘের ফোঁটা দেশ বিদেশে রইল খোটা,
আম কাঁঠাল ত আষাঢ়ের পর থাকে না–
এ যৈবনের গৈরব করা ভাল না।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : নভেম্বর ১৮, ১৯৩৮

মাঘ-মণ্ডল

পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের পল্লীগ্রামসমূহের অবিবাহিতা হিন্দু বালিকাদিগকে সূর্য-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। এই ব্রত মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পূর্ণ একমাস কাল ব্যাপিয়া করিতে হয়। স্থান ভেদে এই ব্রত 'সূর্যব্রত', 'লালঠাকুরের ব্রত', 'সিঁড়ি পূজা' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য পার্বণাদির ন্যায় ইহাও একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। মেয়েরা প্রচুর আনন্দ, নিষ্ঠা এবং ভক্তির সহিত এই পূজা করিয়া থাকে। পূজার সময় মেয়েরা কতকগুলি ছড়া বা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। পল্লীর অন্যান্য ছড়ার ন্যায় এইগুলিও উপভোগ্য।

পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনেই ব্রতচারিণী মেয়েরা 'সংযম' করে। পরদিন ১লা মাঘ খুব ভোরে উঠিয়া অন্ধকার থাকিতেই নদী কিংবা পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া যায়। এক-পাড়ার সকল মেয়ে, কিংবা তিন চারি বাড়ির মেয়েরা একত্রিত হইয়া একযোগে স্নান করিতে যায়। জলে নামিবার পূর্বেই তাহারা সমস্বরে আবৃত্তি করে–

কাকে বকে না চাইতে মুই চাইলাম আগে
চাইলাম চাইলাম দুপুরের আগে
দুপুইরা মাগো সরস্বতী, কিনা বর মাগে
ভাইয়ের বউ, ভাইয়ের বউ, ভাইয়ের বউ মাগে
ভাইয়ের বউ খড় কুড়ানি, ভইনে রান্ধে তোষ
ভূষিতে তুষিতে ভইন, 'ডেউয়া' 'ডোমফল' খায়–
তাথে ফেলিলাম আলি (আঁটি)
তাথে হইল গাছ গাছালি
গাছের উপর কুড়ুয়ার বাসা
কুড়ুয়া রাজা, কুড়ুয়া রাজা তোর নি নাগাল পাই
হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া সায়রে ভাসাই।
সায়রের পানিখানি টলোমেলো করে।
হাতে নিয়া দেখি যেন ফটিক খান ঝরে।

এই মন্ত্র তিনবার গাহিবার পর মেয়েরা জলে নামে। স্নান সমাপ্ত হইলে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অঞ্জলি পুরিয়া জল লয় এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবকে নিবেদন করে–

লও লও সুরুয ঠাকুর লও তোষের জল
মাপিয়া জুখিয়া দিমু সপ্ত আঁজল
সপ্ত আঁজল নারে এক আঁজল উনা
উনা দুনা ভইরা দিমু নাইওরের সোনা

নাইওরের সোনা নারে হাঁটুগুটু পানি
তাথে দিয়া আইলাম্ সূর্যের পানি।

সূর্যকে জল নিবেদন সমাপ্ত হইলে তাহারা আবশ্যকমত অগ্নিসেবন করে। কিন্তু প্রথমেই সূর্যদেবকে সেবানার্থ অগ্নিনিবেদন করিতে হয় : কতকগুলি খড় কুটাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পূর্বদিকে হাত বাড়াইয়া উঁচু করিয়া ধরিয়া মেয়েরা গায়–

লালঠাকুরের পুণ্যে অরি বোলহরি
যে না বলে হরি হরি–
তার গলায় ছাগলের দড়িহরি বোল হরি
ছাগলের দড়ি পোড়া যায়
ভাগ্যবতী স্বর্গে যায়হরি বোল হরি
চান্দ সুরজ দুই ভাইয়ের পুণ্যে–হরি বোল হরি
কানাই বলাই দুই ভাইয়ের পুণ্যে–হরি বোল হরি

তারপর প্রত্যেকে আপন-আপন বাড়িতে গিয়া স্বতন্ত্রভাবে 'সিঁড়ি' পূজা করে। এই 'সিঁড়ি' পূজা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। পল্লীর প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই একখানা করিয়া পূজার্থ তুলসী বৃক্ষ থাকে। সাধারণত এই তুলসীতলাতেই সিঁড়ি পূজার স্থান নির্বাচন করা হয়। তুলসীতলার প্রাঙ্গনখানা ভাল করিয়া লেপিয়া পুছিয়া পরিস্কার করা হয়। এই পরিষ্কৃত স্থানের পুরোভাগে একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট নাতিবৃহৎ 'সিঁড়ি' প্রস্তুত করা হয়–উহাতে তিনটি থাক্ বা স্তর থাকে। থাক্গুলি ক্রমান্বয়ে ছোট হইয়া যায়। ঐ সিঁড়ির সম্মুখে একটি ছোট গর্ত করা হয়। উহার ভিতরটিও মাটি দ্বারা লেপিয়া সমান করা হয়–উহার নাম 'পুষ্করিণী'। এই পুষ্করিণীর সন্নিকটবর্তী স্থানে নানা প্রকার চিত্রাদি এবং আলিপনা অঙ্কিত করা হয়–সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে চাঁদ সূর্য, তিনকোণা পৃথিবী এবং মাঘমণ্ডল প্রভৃতি আঁকে। সিঁড়ির বামদিকে হাতি ঘোড়া, পুথি ঘাট প্রভৃতি এবং পুষ্করিণীর নিকটে শুয়া পক্ষী, বাজ পক্ষী, তেল-কলসী, ঘি-কলসী, বালা প্রভৃতি অঙ্কিত করে। সিঁড়ির উপরে এবং পুষ্করিণীর তীরবর্তী স্থানটুকুতেও নানাপ্রকার আলিপনা আঁকা হয়। শুষ্ক নিমপত্র চূর্ণ, আতপ-তণ্ডুল চূর্ণ, ইট চূর্ণ এবং দগ্ধ তুষ চূর্ণ এইগুলি নানা প্রকার রংয়ের কাজ করে এবং এইগুলি দিয়াই প্রধানত চিত্রাদি ও আলিপনা আঁকা যায়। প্রত্যেক ব্রতিনীরই এক একটি 'ঝোটা' বা 'মুঠা' থাকে–দূর্বাদল, বাসক ইত্যাদি নানা ফুল দ্বারাই এই ঝোটা প্রস্তুত করা হয়। এই ঝোটা দ্বারা পুষ্করিণীর জলে স্পর্শকরত ব্রতীবালিকা অঙ্কিত চিত্রাদির প্রত্যেকটির উপর স্বতন্ত্রভাবে জল ছিটাইতে থাকে এবং ঐ চিত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিতে থাকে।

প্রথমেই চন্দ্র সূর্যের উপর জল ছিটাইয়া পূজা করে। ইহার মন্ত্র–

চান্দ পুজলাম চন্দনে
সুরজ পুজলাম বন্দনে
চান্দ পুজ্যা পাইলাম স্থান
সুরজ পুজ্যা স্বর্গ ধাম

তারপর তিনকোণা পৃথিবী, মাঘ-মণ্ডল, পুষ্করিণী, শুয়া পক্ষী, পুথি ঘাট প্রভৃতির পালা। তিনকোণা পৃথিবীর মন্ত্র

তিনকোণা পিরথিবি জলে যায় ভাসিয়া।
বর্তি ভইনে বর্ত করে সিংহাসনে বসিয়া।

মাঘ-মণ্ডলের মন্ত্র

মাঘ-মণ্ডল সোনার কুন্ডল
বাপ রাজা ভাই বাদসা
মা বিদ্যাধরি
বছরে বছরে পূজা করি ৷৷

পুষ্করিণীর মন্ত্র

মামা দিছে পুষ্কর্ণি, ভাগনা দিছে পার
শুয়া পক্ষে পানি খায়
সুমুদ্দুর শুকায়া যায়

পুথি মন্ত্র

পুথি আঁকলাম পুথীশ্বর
বাপ ভাই হউক লক্ষেশ্বর

ঘাট মন্ত্র

ঘাটে আইলাম ঘাটে গেলাম
মামার বাড়ি দুধ কলা খাইলাম

তেল-কলসী ঘি-কলসী মন্ত্র

তেল-কলসী হাতে
ঘি-কলসী মাথে
তোমার আমার দেখা হইল
ছিরিপঞ্চমী রাইতে।

বাজ পাখী মন্ত্র

ওরে ওরে কুড়ুয়া
ডালে তোর বাসা
খালে তোর আশা
বর্তি ভইনে বর্ত করে
সিংহাসনে বইস্যা।

ঘোড়া মন্ত্র

উতুল ঘোড়া দুতুল ঘোড়া

যোল্ল ভইনের ষোল ঘোড়া
বর্ত্তি ভইনের একঘোড়া

পূজাশেষে সূর্যদেবের নিকট প্রণতি করিয়া 'বর' চাওয়া হয়।

এইভাবে প্রতিদিন একই নিয়মে এক মাস সিঁড়ি পূজিত হয়। এই মাসে প্রত্যেক রবিবারের ব্রতিনীরা নিরামিষ আহার করে এবং দ্বিপ্রহরে নদীতে 'ভেউড়া' বা ভেলা ভাসায়। কদলীপত্রমধ্যস্থ 'ডগা' সমান সমান করিয়া কাটিয়া দুটি বংশ শলাকা দ্বারা গাঁথিয়া এই 'ভেউড়া' বানানো হয়। উহার উপর নৌকার ছৈয়ের মত কলার খোলের ছৈ দিতে হয়। উহার ভিতর আতপতণ্ডুল চিনি বাতাসা ঘি মধু কলা প্রদীপ প্রভৃতি সাজাইয়া দেয়। ব্রতিনী সেই 'ভেউড়া' মাথায় করিয়া আস্তে আস্তে নদী বা পুষ্করিণীর ঘাট-পানে চলে। একদল স্ত্রীলোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গান গাহিয়া গাহিয়া চলে। বালিকা উক্ত 'ভেউড়া' নদী পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া আসে।

সাপ্তাহিক নবশক্তি : জানুয়ারি ১৪, ১৯৩৮

অপ্রকাশিত পুতুল বিয়ের ছড়া

কয়েকটি ছড়ার ভিতর দিয়া বালিকার পুতুল বিয়ের আবহাওয়া বেশ বিকাশ পাইয়াছে। এই পুতুল বিয়ের মধ্য দিয়া বিজলীচমকের মতই বালিকার নিজের বিয়ের কথাটিও তাহার মনে খেলিয়া যায়।

পুতুলটির নাম 'সুনাই'। কেমন আচমকা তাহার বিবাহ হইয়া গেল–

একটা কাক বসে আছে পান হাতে লয়ে,
একটা কোকিল বসে আছে সুপারি হাতে লয়ে,
যেমনি গেল কুল কুড়াতে, ওমনি হল বিয়ে,
আমার সুনাইকে লয়ে গেল ঢোলে বাড়ি দিয়ে।

সুনাইকে অনেক দূরদেশে বিয়ে দিবার কথাবার্তা হইতেছিল–
মায়ে ত দিল শঙ্খশাড়ি, বাপে ত দিল কয়ে,
কত না টাকা পেয়েছে বাবা দূরেতে দিতে বিয়ে!

সুনাই-র বর সুনাইকে পছন্দ করে না। সে সারাক্ষণ মুখ ভার করিয়া আছে–

দোয়েলা পাখী দোয়েলা পাখী
মাঝঘরে বসে ঝরে,
কনের মাকে সুন্দর দেখে
জামাই গোসা করে
জামাই নাকি ও ভালোমানুষের বেটা
তোমার শাশুড়ী করে রেখেছে
শত মুখী পিঠা

তথাপি জামাই-এর মুখ খুশিতে ভরিয়া উঠিল না। বাড়ির সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল–

খাট দিলাম পালঙ্ক দিলাম
কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাই রাগ করে
কিসের অভিমানে।
তামা দিলাম কাঁসা দিলাম
কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাই কয় না কথা
কিসের অভিমানে।

আসন দিলাম বসন দিলাম
কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাইর মুখখানা ব্যাজার
কিসের অভিমানে।
হাতি দিলাম ঘোড়া দিলাম
কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাইর মন পাই না
কিসের অভিমানে।

কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান হয় এবং তাহা হয় অদ্ভুত এক উপায়ে। পল্লীর লোকদের সরলতার সুযোগে এই ধারণাটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, জামাই কি চায় তাহা কন্যারূপী পুতুলের মা অর্থাৎ ক্রীড়ারতা বালিকা বেশ করিয়া টের পায়—

দাসী দিলাম বাঁদী দিলাম
কন্যা দিলাম দানে
তবু জামাই দাবি করে
শাশুড়ী যেতে সঙ্গে!

তারপর বর যখন বধূকে সঙ্গে করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে তখন শুরু হইল ক্রন্দনের পালা—

বড় ভাইয়ের বউ কান্দে উনুন পাড়ে রয়ে
ভাই কান্দে বাবা কান্দে গামছা মুখে দিয়ে,
সোনামুখী ভইনে কান্দে পন্থপানে চাইয়া।
পেট-পোড়ানী মায়ে কান্দে ভূমিতে লুটাইয়া॥

হু হু করিয়া পাল্কী ছুটিয়াছে। বহু দূর গিয়াও যেন সুনাই তাহার মার কান্না শুনিতে পাইতেছে, তাই বলে—

সোনার গাঁয়ের বাজানিয়া রে,
রয়ে রয়ে বাজাইও রে,
মায়ের কান্দন যেন শুনি রে॥

সাপ্তাহিক নবশক্তি : অক্টোবর ২১, ১৯৩৮

অপ্রকাশিত বাউল সঙ্গীত

১.

দেহের মধ্যে থাকে যে মনোরায়
তারে চেনা নাহি যায়।
ধানের মধ্যে দানা রে ভাই সরষের মধ্যে তেল।
ডিমের মধ্যে বাচ্চা থুইয়ে প্রাণটি ক্যাম্‌নে গেল ॥
মাছেতে চিনে কালাপানি পক্ষীতে চিনে ডাল।
গুরু জানে শিষ্যের বেদন, খঞ্জনায় চিনে খাল ॥

২.

আমরা দুই ভাই-এ এক ডোলা বানাই
তনা বলে ওরে মা ভাই ॥
আমরা বানাব এক ডোল,
উপরে রেখো সাড়ে তিন হাত,
মুখখান রেখো গোল।
ডোলের মধ্যে আছে বৈতরণী,
চৌদ্দ ভুবন দেখতে পাই।

৩.

রঙিলা ঘোড়া রে,
তুমি, কোথা থেকে কোথায় লইয়া যাও ॥
ফকিরে ফিকির করে গাছতলা বসিয়া
গাছের ফল গাছেই থাকে, ডাঁটা যায় খসিয়া ॥
একটি গাছের তিনটি গোটা, বঁটু নাই ফল ঝুলে ॥
পাইলে প্রেমের ব্যাত্যা আপনি সে ফল ঝরে ॥

৪.

আমি ঘোড়ার মুখে না লাগালেম জিন্–
এখন কান্দিয়া কাটাই রাত্রি দিন ॥
সুবর্ণের খাট সুবর্ণের পালঙ্ক সুবর্ণের বিছানা,
তাহাতে না ঘোচে গো রাধার অন্তরের বেদনা।
যমুনাতে যাইতে নারি দেয়ায় অন্ধ করে,
আমি যে ডালের ভরসা করি, সেই ডাল ভেঙে পড়ে।
প্রথমে বেইমান গো ঘোড়া আপোসে দিল ধরা,
অর্ধ পথে নিয়ে গো ঘোড়া শূন্যে করল উড়া ॥

৫.

দেশে সুখ নাইরে, আমার সুখ পরাণের বৈরী,
আমার হাতে পায়ে লোহার শিকলরে
আমি জেলায় জেলায় ঘুরি।
দেহে আছে এক দেশ, বৃন্দাবনে যার দেশ,
সে ঘোরে সে-দেশের নাগাল পাইয়া।
সেই দেশের যে দেশী হয় ঘোচে তার শমনের ভয়,
তারাই হল ব্রজের মত মাইয়া ॥
দেশের লাগিরে,
আমার দেশের লাগি কান্দে প্রাণ
বিদেশে ঘুরে মরি।

৬.

সোনার বন্ধু কি আরে বন্ধুরে,
তুই শ্যামে রাধারে করিলি কলঙ্কিনী।
প্রেম-দরদীর হাটে আমার ফুরাল বিকিনিকি ॥
সোনার বন্ধুরে–
তেল নাই সলিতা নাই কিসে জ্বলে বাতি।
কেবা বানাইল ঘর কেবা ঘরের পতি ॥
সোনার বন্ধুরে–
উঠান-মাটি ঠন ঠন পিড়া নিল স্রোতে
গঙ্গা মইল জলপিপাসায় ব্রহ্মা মইল শীতে ॥

সাপ্তাহিক নবশক্তি : অক্টোবর ১৪, ১৯৩৯